১৩০৪ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা।	বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।	১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। সহ নাববতু। সহ নৌভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাব হৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাব হৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্পাদকের নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের এবং বর্ত্তমান অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত হইল। নূতন বর্ত্তমান এবং নূতন ভবিষ্যৎ লইয়া মানবের পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন, ভগবানের প্রবর্ত্তিত সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূল ক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যতীত মানবের উপায়ান্তর নাই। যাহা কিছু করিতে হইবে, মানবজীবনেই তাহা করিতে হইবে। মানবদেহই কর্ম্মদেহ। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন :—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর।

"এবং ত্বয়ি নান্যথাস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।"

নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, মানবকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারে না।

ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ। অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

এই প্রবর্ত্তিত সংসারচক্র যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, তাহার জীবন পাপপূর্ণ, সে ইন্দ্রিয়াদিতেই তৃপ্ত থাকিয়া বৃথা জীবনধারণ করে। সুতরাং যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ভগবানের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকুন না কেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনী, ভিক্ষু, সকলেরই স্বীয় স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে জগতের হিতসাধন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি যে ভাবে এই সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূলতা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যাঁহার যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি বিকাশিত করিয়া জগতের হিতকল্পে নিয়োজিত করিতে পারিলে, জীবন বৃথায় অতিবাহিত হয় না। কাষ্ঠমার্জ্জার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও, ভগবান্ রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের সহায়তা করিয়াছিল। মানবের মধ্যে সকলে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন না হইলেও, সকলেই সংসারচক্রের আবর্ত্তনের কিছু না কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

হিন্দুপত্রিকাও ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্না হইয়াও হিন্দুসমাজের কিছু না কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে বলিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। সংসারে আমাদের কেবল কর্ত্তব্য-সাধনের অধিকার আছে, ফল ভগবানের হস্তে। তবে যদি গত তিন বৎসরকাল হিন্দুসমাজের কোন এক ব্যক্তিরও হিন্দুপত্রিকা দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। হিন্দুপত্রিকা হিন্দু-সমাজের মুখ-পত্রিকার অনুপযুক্তা হইলেও, ইহা হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দুপত্রিকার উন্নতির জন্য নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, এই নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; এবং আশা করি যে, হিন্দুপত্রিকার প্রতি তাঁহাদের যে অনুগ্রহ আছে, তাহা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকিবে। এই স্থলে তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে, গতবৎসরে হিন্দুপত্রিকার গ্রাহক সংখ্যার যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে হিন্দুপত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারি-আশ্রম কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নববর্ষ হইতে হিন্দু-পত্রিকা সম্বন্ধে যে সমুদায় পরিবর্ত্তন হইল, তাহা বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দ্রষ্টব্য।

আমিত্বের প্রসার।

(ব্রাহ্মণ।)

মর্ত্ত্যে যদি দেবতা থাকেন, ব্রাহ্মণই সেই দেবতা, এইজন্য ব্রাহ্মণ 'ভূদেব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য যিনি আত্মসমর্পণ করেন, জগৎ

তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কৃতার্থ হয়, চন্দনজ্ঞানে চরণ-রেণুদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে ব্যাকুল হয় এবং সুধাজ্ঞানে চরণোদকপানে লোলুপ হয়। তুমি সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পার, কুবেরের অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পার, কিন্তু তোমাতে পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, জগৎ কখনও তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। তুমি রাবণের ন্যায় দেব-দেবীদিগকে দাস-দাসী করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তোমার পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, তোমার আমিত্বের প্রসার না হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবও তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। রম্যহর্ম্যবাসীও পর্ণকুটীরবাসীর পাদযুগল বক্ষে গ্রহণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছে, মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছে, আপনাকে দাসানুদাস জ্ঞান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, ইহার গূঢ় রহস্য কি? যিনি ষোড়শোপচারে ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হন না, তিনি হবিষ্যান্নভোজীর প্রসাদ-প্রত্যাশী, ইহার গূঢ় রহস্য কি? রাজাধিরাজ ভিক্ষুকের পদদেশে কেন লুণ্ঠিত, ইহার গূঢ় রহস্য কি?

পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহার গূঢ় রহস্য কি।

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবাসী পরাধীন কেন, তাহার উত্তরে আমি বলি, ভারতবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়া। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে অন্নাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বিউবনিকপ্লেগ আদি রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে—নিশ্চয় জানিও,—ভারতে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিয়া। এক ব্রাহ্মণের অভাবই ভারতের যত কিছু দুর্গতির কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, স্বাস্থ্য, সকলই ব্রাহ্মণানুগত ছিল এবং একের অভাবে ভারতে এ সকলেরই অভাব হইয়াছে। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন ধন, বিদ্যা, বল, আয়ু, স্বাধীনতা, এ সবই ছিল। বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে কি কখনও শাখা-পত্র জীবিত থাকিতে পারে? সমাজের জীবনস্বরূপ ব্রাহ্মণ না থাকিলে, সমাজ কি কখনও জীবিত থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ অভাবেই সমগ্র হিন্দুসমাজ যেন মৃতপ্রায়। এই মৃত সমাজকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও পুনর্জীবিত করিবার সাধ্য নাই। মৃতসঞ্জীবনমন্ত্র দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ এই মৃত ভারতকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন, তবেই ভারত পুনর্ব্বার জাগরিত হইবে; তবেই ভারত পুনর্ব্বার সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ কেবল মর্ত্ত্যে দেবতা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিৎ স্বয়ংই ব্রহ্ম। যাঁহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যিনি স্বীয় "আমি"তে বিশ্বের তাবৎ "আমি" দৃষ্টি করেন, যিনি বিশ্বের তাবৎ "আমিতে" স্বীয় "আমি" দৃষ্টি করেন, তিনি যদি মানবের আরাধ্য না হইবেন, তবে আর আরাধ্য হইবে কে?

মানব যদি তাঁহার পদোদক পান না করিল, তাঁহার পদরজ শিরে ধারণ না

করিল, তবে মানবে আর পশুতে প্রভেদ কি? নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, ব্রাহ্মণই সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব ব্রাহ্মণ মানবের পূজ্য। ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শই অনুসরণ করিয়া ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে হয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন এই বিধিই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের অভাব হওয়াতেই প্রতিমা-অর্চ্চনার নিয়ম প্রচলিত হয়।* হায়! হিন্দুসমাজ! তুমি ব্রাহ্মণের তত্ত্ব না বুঝিয়া, ব্রাহ্মণত্বের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইহকাল ও পরকাল, দুই কালই হারাইয়াছ। ভেবে দেখ দেখি, তোমার আছে কি? ভেবে দেখ দেখি, তুমি ছিলে কি এবং হইয়াছ কি? ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ জীবনের আদর্শ কর, ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কর, দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ পূজা কর, তোমার দুর্দ্দিন থাকিবে না; অচিরে তুমি পূর্ব্ব গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে; অচিরে তুমি পূর্ব্ববৎ জগতের পূজ্য হইতে পারিবে।

মানব মানবের পূজ্য হয় কিসে? তুমি অযুত হস্তীর বল রাখিতে পার, কিন্তু তোমার বল যদি জগতের উপকারে নিয়োজিত না হইল, বরং জগতের পীড়নের জন্যই উহা নিয়োজিত রহিল, তাহাহইলে তোমাকে কে পূজা করিবে? পাশব বলই যদি জগতের পূজার্হ হইত, তাহাহইলে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতিই দেবতাদিগের সিংহাসন অধিকার করিত। পরোপকারবৃত্তিই পূজ্য হইবার অধিকার প্রদান করে। গগনমণ্ডলে সবিতা হইতে বহু বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডল আছে, কিন্তু তাহারা সবিতার ন্যায় পূজ্য নহে কেন? সবিতা যেরূপ এই জগতের কল্যাণে নিযুক্ত, তাহারা তদ্রূপ নহে বলিয়া। সবিতা কখনও তোমার নিকট পূজা চাহেন না, কিন্তু সবিতার পরোপকারবৃত্তি স্মরণ করিয়া, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেছ; অবনত করিতে তোমাকে কেহই বাধ্য করে না, কেহই কোন বাহ্যবল প্রয়োগ করে না।

তুমি বৃহস্পতি অপেক্ষাও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইতে পার, কিন্তু তোমার জ্ঞান যদি জগতের কার্য্যে না আসিল, উহা যদি সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূলতা না করিল, তবে তোমার জ্ঞানের ফল কি হইল? বন্ধ্যা স্ত্রী কি কখনও পুত্রবতী পত্নীর স্থান অধিকার করিতে পারে? পত্নী রূপে গুণে বিভূষিতা হইয়াও বন্ধ্যা হইলে, স্বামীর চিত্তের অভাব দূরীভূত হয় না। পুত্রের অভাবে পত্নী পত্নীতুল্য জ্ঞান হয় না। বহুযত্ন-পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষে যদি ফল না জন্মে, মানব তাহাকে কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলে। অতএব পরোপকারবৃত্তিই জগতে আদৃত,—জগতে পূজ্য হইবার একমাত্র কারণ। তোমার ভাণ্ডারে যদি অক্ষয় ধনও থাকে, আর উহা যদি দীন-দুঃখীর দুঃখনিবারণে নিয়োজিত না হয়, তবে তোমার ধনের মূল্য কি? সাগর-গর্ভে কিম্বা আকরাদিতেও ধন-রত্ন নিহিত আছে; আকরের ধন যদি আকরেই

* দৃষ্ট্বা তেষাং মিথো নৃণামবজ্ঞানাদ্যতাং নৃপ ত্রেতাদিষু হরেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈঃ কবিভিঃ কৃতাঃ॥

রহিয়া গেল, মানব যদি উহা জগতের ব্যবহারে নিয়োজিত না করিতে পারিল, তবে ঐ ধন থাকা না থাকা সমান। আর তোমার ধন যদি পরোপকারে সদাই নিয়োজিত হয়, তবেত কথাই নাই। দরিদ্র দাতাই চিরকালই ধনবান্ কৃপণেরও পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। পরোপকারবৃত্তি—আমিত্বের প্রসারই মানবকে মানুষের পূজ্য করে। আমিত্বের প্রসারহেতুই মনুষ্য পশু-পক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, পশু-পক্ষী বৃক্ষাদি হইতে শ্রেষ্ঠ, এবং বৃক্ষাদি প্রস্তরাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিত্বের প্রসারহেতুই বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে যত আত্মপর-ভেদজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে, যে যত পরকে আপনজ্ঞান করিতে পারে, যে যত আপনা ভুলিয়া পরের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে, যে যত তামসিক 'আমি'কে রাজসিক 'আমি' এবং রাজসিক 'আমি'কে সাত্বিক 'আমি' করিতে পারে, সে ততই পূজ্য হয়। যে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-পর্য্যন্ত কাহারও পদপ্রান্তে পড়িতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কখনও পরের পূজ্য হইব বলিয়া উচ্চাভিলাষ করে না, যে কখনও পূজা না পাইলে উদ্বিগ্নচিত্ত হয় না, পূজা পাইলে যে কখনও উন্মত্তচিত্ত হয় না, তাহার পদপ্রান্তে পড়িতে, তাহার পদরজ শিরে ধারণ করিতে, তাহার পদোদক পান করিতে কাহারও আপত্তি থাকে না।

আবার জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ যে হিন্দুসমাজে পূজ্য, দেবতুল্য পূজ্য, পরব্রহ্মতুল্য—ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধ্য, তাহার গূঢ় রহস্য কি? পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, ইহার কারণ কি। ইহার কারণ, পরোপকারবৃত্তি, ইহার কারণ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত-দর্শন, ইহার কারণ "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি"—ইহার কারণ—এক কথায়—আমিত্বের প্রসার।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে গোষ্পদ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, বিশ্বের ধনরাশি লোষ্ট্র অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, যিনি নিজের জন্য কখনও কিছু ভাবেন না, যিনি পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, হবিষ্যান্নমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য না করিয়া, বিশ্ব-হিত-তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিবে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে? যাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র এই বিশ্ব-জীবনের মূলমন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বজীবনের সহিত যাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য অপনোদিত হইয়াছে, যাঁহার জীবনের হৃদয়-তন্ত্রীর সুর এই বিশ্বের অন্তর্যামীর তন্ত্রীর সুরের সহিত অভেদে মিশিয়াছে, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে?

তুমি সাম্যবাদী, তুমি প্রশ্ন করিবে যে, ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিসে? আচ্ছা, আমি তোমায় বলি, ঐ যে উচ্চশৃঙ্গ গিরিরাজ হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত অধিকার করিয়া আছে, উহার সহিত কি অন্যান্য পর্ব্বতের সমকক্ষতা চলে? প্রশস্তবক্ষা পূতসলিলা

ভাগীরথীর সহিত অন্যান্য নদীর কি সমকক্ষতা চলে? অভ্রভেদী সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচ্যুত করিয়া, যদি তোমার আশ্রম-সম্মুখস্থিত উচ্চ বল্মীক-স্তূপকে তাহার স্থানে বসাও, তাহা কি কখনও হয়? তীর্থ-বাহিনী, বাণিজ্য-সহায়িনী, ক্ষেত্রোর্ব্বরতা-দায়িনী, প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-তাপজনিত-তৃষ্ণানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্ত্তব্যাপিনী, ত্রিতাপনাশিনী পতিতপাবনী গঙ্গার পদবীতে শৈবালবিশিষ্টা, অস্বাস্থ্য-সলিলা, কোন স্রোতবিরহিতাকে অধিরোহণ করাইলে কি কখনও হয়? যাহার ভিতরে চৈতন্য-শক্তি যত অধিক পরিমাণে থাকে, সে তত বড় হইবেই হইবে; কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে না। একটি অশ্বত্থবীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বত্থবীজ একটি সর্ষপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র, এবং ঐ নারিকেল অপেক্ষা লক্ষ গুণ ক্ষুদ্র; এখন এই দুই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ড-শাখা-পত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডৈকবিশিষ্ট সামান্য নারিকেল বৃক্ষ কেন? উভয় বীজ সমান ভাবে তাপ-জল-বায়ু দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন? নারিকেল যেখানেই রোপণ কর না কেন, উহা অশ্বত্থবীজের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইবেনা। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বত্থবীজের এমন একটি শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও, উহার মৃত্তিকা-রসাকর্ষণীশক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ঐ শক্তিদ্বারা সে মৃত্তিকার সারভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া, সে অত বড়; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। উপমাটি সম্পূর্ণরূপে সদৃশ হইল না, স্বীকার করি। মনুষ্যে মনুষ্যে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় এবং অশ্বত্থবীজে ও নারিকেলবীজে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়; কিন্তু বিজাতীয়শক্তির যেমন ইতরবিশেষ আছে, স্বজাতীয়শক্তিরও তদ্রূপ ইতরবিশেষ আছে। সকল নদীই গঙ্গা নয়, সকল পর্ব্বতই হিমালয় নয়, সকল কবিই কালিদাস নয়, সকল দার্শনিকই কপিল নয়, সেইরূপ সকল মনুষ্যই ব্রাহ্মণ নয়। জড়জগৎ যে নিয়মে নিয়মিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়জগতের ক্রিয়া নাই, মানবজগতের উন্নতি অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়াসাপেক্ষ। সকল মনুষ্যতেই 'ব্রাহ্মণ' হইবার শক্তি-বীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়; যাহার হয় না, সে 'ব্রাহ্মণ'ও হয় না; সে ইতর মনুষ্য রহিয়া যায়। প্রাগুক্ত উদাহরণ স্মরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বত্থ-বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনি অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অল্পাধিক্য আছে। সৃষ্টিই বৈষম্যময়; আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, বৈষম্যই সৃষ্টি। যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—তাঁহাতে কোন ভেদ নাই; স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত, কোন ভেদ নাই। তাঁহার অবয়বাদিজনিত কোন ভেদ নাই।

মনে কর, একটি মানুষ একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। এস্থলে বলা যায়, ঐ মানুষে স্বগত-ভেদ নাই। এক মানুষের সহিত অপর মানুষের যে ভেদ, তাহাকে বলি স্বজাতীয় ভেদ। তোমারও হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু আদি আছে, আমারও ঐ সমুদায়ই আছে; অথচ উহা তোমার হস্ত-পদাদির ন্যায় নহে। তোমাকে দেখিলেই, আমি যে তুমি নয়, তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মে এই স্বজাতীয় ভেদও নাই। অর্থাৎ প্রথমে একটি মানুষকে স্বগত-ভেদশূন্য করিয়া কেবল সুগোল মাংসপিণ্ডবৎ কল্পনা কর, তৎপরে তাবৎ মনুষ্যকেই ঐরূপ কল্পনা কর। তাহাহইলে স্বগত ও স্বজাতীয় ভেদ-রাহিত্য পাইলে। তৎপরে দেখ যে, মনুষ্যের সহিত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং উহাদের অন্তর্ভূত বহুবিধ পদার্থের ভেদ আছে। তখন যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ পদার্থকেই একটি মাংস-গোলকের ন্যায় জ্ঞান কর, অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদও কল্পনাদ্বারা দূরীভূত কর, তাহাহইলে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পাইলে। পাঠককে অবশ্য ইহা বুঝাইতে হইবে না যে, ব্রহ্মপদার্থ মাংসপিণ্ড নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ইহা আনুষঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে মাত্র। এইক্ষণ ইহাই বুঝাইতে চাই যে, ব্রহ্মে কোন ভেদ বা বৈষম্য নাই। বৈষম্য হয় কিসে? ব্রহ্মের একটি অঘটন-ঘটন-পটীয়সীশক্তি আছে, তাহার নাম মায়া। সৃষ্টির সময়ে, ব্রহ্ম এই মায়াশক্তির বিকাশ করেন। মায়া কিন্তু ব্রহ্ম নহে। এই প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি যেমন আমি নহে, তদ্রূপ মায়াও ব্রহ্ম নহে; ইহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। এই শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। এই মায়ার আর এক নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আবার দুই প্রকার; সত্ত্বের বিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা 'মায়া' নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের অবিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা 'অবিদ্যা' নামে অভিহিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বা মায়া আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'ঈশ্বর'পদে বাচ্য হয়েন এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, তিনি 'প্রাজ্ঞ' বা জীবাত্মা পদে বাচ্য হয়েন। তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশের উদ্ভব হয়। অবিশুদ্ধসত্ত্ব বা অবিদ্যা আশ্রয় করিলে, দেব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা হয়, এবং উপাধিভেদে দেবাত্মা, পাশবাত্মা প্রভৃতি নামে বাচ্য হয়।

এইক্ষণ বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির বৈষম্যহেতুই চৈতন্যের আধারের বৈষম্য হয়, এবং চৈতন্যের আধারের বৈষম্য হওয়াতেই সর্ব্বত্র চৈতন্যের সমান বিকাশ হয় না। লোষ্ট্রেও যে চৈতন্য, বৃক্ষেও সেই চৈতন্য, পশুতেও সেই চৈতন্য এবং আমাতে তোমাতেও সেই চৈতন্য; কিন্তু উহার বিকাশ সর্ব্বত্র সমান নহে। লোষ্ট্রে সুখ-দুঃখ জ্ঞান নাই; উহা বৃক্ষের ন্যায় মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে না, পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তৎপরে বৃক্ষের ন্যায় শুষ্কত্বও প্রাপ্ত হয় না। বৃক্ষ রস-গ্রহণ করিলেও এবং তাহার ক্ষয়-বৃদ্ধি থাকিলেও, তাহার গমনাগমনের শক্তি নাই। তাহার শব্দ করিবার

বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এত শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, সত্যনিষ্ঠা, এ সমুদায়ের প্রয়োজন কি? এত যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা, ব্রত, নিয়মের প্রয়োজন কি? এত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধির প্রয়োজন কি? এক কার্পাস-সূত্র যদি এতই গুণবিশিষ্ট, এক কার্পাসসূত্রে যদি এতই সত্ত্বগুণ বিদ্যমান থাকে, তাহাহইলে মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং এমন কি—বৃক্ষাদিকেও কার্পাসসূত্র ধারণ করাইয়া দিলে, তাহাদেরও মুক্তির পথঃপরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়! তুমি যদি বল, আমি কার্পাসসূত্রধারী ব্যক্তিকেই 'ব্রাহ্মণ' এই পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলাম, সে পৃথক্ কথা। যদি তুমি বল যে, লৌহকে স্বর্ণবলিব, তাহা অনায়াসে বলিতে পার; কারণ শব্দ প্রয়োগ তোমার আয়ত্তাধীন; কিন্তু বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা-সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ স্বর্ণকে লৌহ বলিলে, তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, কিম্বা লৌহকে স্বর্ণ বলিলে, তাহার লৌহত্ব যায় না। তদ্রূপ তুমি যে বস্তকেই কার্পাসসূত্র ধারণ করাও, এবং তাহাকে যে সংজ্ঞার দ্বারাই অভিহিত কর, সেই বস্তুর সেই বস্তুত্ব যাইবার নহে। বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা-সিদ্ধি হয় না।

পাঠক, এখন পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য কি, তাহা চিন্তা করুন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য তাঁহার আমিত্বের প্রসার, তাঁহার প্রজ্ঞা, সাত্ত্বিকতা, তাঁহার পরোপকারবৃত্তি। বিশ্বের বৈচিত্র্য তিনটি শক্তি লইয়া; ঐ তিনটি শক্তি বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত থাকে, যথা—অ, উ, ম; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; সত্ত্ব, রজ, তম; বায়ু, পিত্ত, কফ। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও যাহা, সত্ত্ব, রজ, তমও তাহাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দেখিতে পাইবেন, কোন: প্রভেদ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, তিনই আদ্যাশক্তি-সম্ভূত। এই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মের শক্তি, মায়া, প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণ-বিশিষ্টা; এক এক গুণের আশ্রয়কারী চৈতন্যকে ব্রহ্মা. বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ত্রিশক্তি সর্ব্বাধারেই আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই তিন শক্তি বিদ্যমান। ঐ যে অশ্বত্থবীজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ অশ্বত্থবীজের মধ্যেও এই তিনটি শক্তিই পরস্পরের অস্তিত্বের জন্য পরস্পর সাপেক্ষ। একটী না থাকিলে আর দুইটি থাকে না। এই সমুদায় কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে; যাহাহউক, সংক্ষেপতঃ যতদূর পারি, চেষ্টা করিব। অশ্বত্থ-বীজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ অশ্বত্থবীজ কি করে? মৃত্তিকায় পতিত হইলেই ভূমি, বায়ু এবং আলোকাদি হইতে উহা উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকে। এইটি বড় কষ্টের অবস্থা। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখিতেছি; ঐ কবিতা লিখিতে আমার

ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করিতে হইতেছে; এক-বার হয়ত ভাব হইল, শব্দ হইল না, আবার শব্দ হইল ত ভাব হইল না, ইহাকেই রাজসিক অবস্থা বলে, ইহাকেই ক্রিয়ানিষ্পাদনকরী অবস্থা বলে। যে পর্য্যন্ত আমার ভাব-শব্দ না হইতেছিল, সে পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলাম; ভাব-শব্দ যুটিলে মনে অতুল আনন্দ আসিল; ইহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। অশ্বত্থবীজেরও অঙ্কুর-উদ্গম হইল, সেই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা হইল, বলা যাইতে পারে। তৎপরে যতদিন ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে, ততদিন উপর্য্যুপরি উহার রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা হইবে। কিন্তু এই দুই অবস্থা ব্যতীত, উহার আর একটি অবস্থা হইতে পারে; ঐ অবস্থার নাম তামসিক। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। দুইটি বীজ এক-স্থানে স্থাপন কর, একটির অঙ্কুর-উদ্গম হইল, আর একটির হইল না। যদি বল, বাহ্য জল, বায়ু, মৃত্তিকা বা আলোকের বিরুদ্ধ-স্বভাব-ক্রিয়া-বশতঃ উহার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই, তাহার উত্তরে বলি যে, যদি তাহা হইল, তবে আর একটির ধ্বংস হইল না কেন? তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ বীজে এমন একটি অবস্থা অধিক পরিমাণে ছিল, যে অবস্থা অপরটিতে ছিল না, এবং যে অবস্থার আধিক্যহেতু জল-বায়ু আদি—যাহা একের বর্দ্ধক হইল, তাহা অপরের সংহারক হইল। এই অবস্থাই তামসিক। ঐ অশ্বত্থবীজটিতে তামসিকগুণ অধিক পরিমাণে থাকাতে, উহা বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে পারিল না, ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গেল। যদি বল, জল-বায়ু আদিতেই ধ্বংস-শক্তি আছে, তাহাহইলে জল-বায়ু আদি দ্বারা অপর বীজটি পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, ঐ জল-বায়ুতেও ধ্বংসশক্তি ও বর্দ্ধনশক্তি, এই দুই শক্তি প্রতিপন্ন হইল। বস্তুতেই বুঝ, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির মধ্যে যেরূপ সংহারোপযোগিনী কটি শক্তি আছে, সেইরূপ বর্দ্ধনোপযোগিনী একটি শক্তি আছে। ঐ বর্দ্ধনোপযোগিনী শক্তির নাম বিষ্ণু-শক্তি বা রজ (মতান্তরে সত্ত্ব) এবং সংহারোপযোগিনী শক্তির নাম শিবশক্তি বা তম; আর বর্দ্ধনোপযোগিনী শক্তি যখন সংহারোপযোগিনী শক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয়, এবং বস্তুর বিকাশ বা প্রকাশ বা সৃষ্টি হয়, তখনই বস্তুর সাত্ত্বিকগুণ প্রতিভাত হয়। উহাই তাহার সাত্ত্বিক অবস্থা। এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই দেখিবে যে, বিষ্ণু ও শিবের সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে বিশাল সংগ্রাম চলিতেছে। এক জন জগৎ ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত, আর এক জন জগৎ পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কটিবদ্ধ। প্রত্যেক অণুতে অণুতে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এই দুই শক্তি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। এক শক্তি না থাকিলে, আর এক শক্তি থাকিতে পারে না। আমার এই কাচের মস্যাধারের অণুর মধ্যেও সংগ্রাম চলিতেছে। অণুগুলিতে তামসিকশক্তি থাকায়, উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মস্যাধারের ধ্বংস সাধন করিবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে রাজসিকশক্তি

আছে, তাহা আবার উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছেনা, একত্র করিয়া রাখিতেছে। যখন রাজসিকশক্তির দ্বারা তামসিক ধ্বংসশক্তি পরাভূত হইল, তখন মস্যাধার উৎপন্ন হইল; উহাই মস্যাধারের সাত্ত্বিক অবস্থা। বস্তুর প্রকাশাত্মক অবস্থাই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা। কিন্তু এই প্রকাশক সাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যেই ঐ দুই শক্তি, অর্থাৎ তামসী ধ্বংসশক্তি এবং রাজসী রক্ষণ বা বৰ্দ্ধনশক্তি নিহিত আছে। ঐ মস্যাধার অগ্নিতে উত্তপ্ত কর, উহার ধ্বংসকরী তামসীশক্তির বৃদ্ধি হইয়া, উহা এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর প্রকাশভাবই তাহার সাত্ত্বিকভাব, বিকাশ বা প্রকাশোন্মুখ ভাব রাজসিক ভাব, বিকাশ বা প্রকাশের বিঘ্নকারী ভাব তামসিক ভাব। কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা রাজসিক, কার্য্য করিতে যে অনিচ্ছা, তাহা তামসিক-ভাব। রাজসিক শক্তিকে কর্ম্মশক্তি বলা যায়, তামসিকশক্তিকে অকর্ম্ম-শক্তি বলা যায়। রাজসিক শক্তি দ্বারা বীজ, অঙ্কুর, পত্র, শাখা, ফল, পুষ্পাদি হইতেছে, তামসিকশক্তির দ্বারা আবার উহারা শুষ্ক হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত রাজসীশক্তির প্রবলতা থাকে, সে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সজীব, তামসীশক্তির প্রবলতা হইলেই বৃক্ষ নির্জীব। মৃত্যুকালে সকলেরই কফ, শ্লেষ্মা, শিব বা তমঃশক্তির অধীন হইতে হয়। এখন দেখ, এই তমঃশক্তি আছে বলিয়া এই রজঃশক্তি। আমার সম্মুখে পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে, আমি উহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিলাম, আবার একটি বালক উহা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। বিশৃঙ্খলা না থাকিলে শৃঙ্খলা কোথায় থাকিত? মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম আছে। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, তাহাহইলে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিত না। উপরোক্ত মস্যাধারের উদাহরণ লউন। উহার প্রত্যেক অণুতে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা অপর অণুর সহিত মিলিত হইয়া, উহার প্রকাশ বা সাত্ত্বিকভাব মস্যাধারে পরিণত হয়, এবং উহার প্রত্যেক রেণুতে আর একটি এমন শক্তিও আছে, যে প্রত্যেক রেণু অপর রেণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সাত্ত্বিকভাব-পরিণত মস্যাধারের ধ্বংস সাধন করে। পৃথিবীগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কেবল দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাব-গতি বা শক্তি আছে বলিয়া। উহার একটি শক্তিদ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আর একটি শক্তিদ্বারা বিপরীতদিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুই শক্তির বলে উহা সূর্য্যের মধ্যেও পতিত হইতে পারিতেছে না এবং সূর্য্য ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছে না, সূর্য্যের চারিদিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। মস্যাধারের অণুগুলি তম-শক্তিবলে বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই, রজঃশক্তি-বলে উহারা একত্রিত হইয়া মস্যাধারের উৎপত্তি করিয়াছে। শরীরের ক্ষয় আছে বলিয়াই উহার বৃদ্ধি আছে এবং বৃদ্ধি আছে বলিয়াই ক্ষয় আছে।

উহার একটি না থাকিলে, আর একটি থাকিতে পারে না। যদি ক্ষয় না থাকে, তাহাহইলে বৃদ্ধির উপলব্ধি কোথায়? এবং যদি বৃদ্ধি না থাকে, তাহাহইলে ক্ষয়ের উপলব্ধি কোথায়? বস্তুর ধ্বংস না থাকিলে, উহার অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই এবং অস্তিত্ব না থাকিলে, ধ্বংসের উপলব্ধি নাই। বিকর্ষণ না থাকিলে, আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে; যদি চুম্বক আর লৌহের মধ্যে একটি বিকর্ষণ-শক্তি না থাকিত, তাহাহইলে আকর্ষণ হইত কেমন করিয়া? এই লেখনীর অণুগুলি পরস্পর মিলিত, কিন্তু ইহারা অমিলিত অবস্থায় ছিল বলিয়াই মিলিত হইয়াছে; যদি অমিলিত অবস্থায় না থাকিত, তাহাহইলে মিলিত অবস্থাটির উপলব্ধি কোথায়? লেখনীটি চূর্ণ করিয়া ফেল, ঐ দেখ অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং সত্ত্বের সংস্থাপক রজ ও নাশক তম পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকাশের বিঘ্নকারী বা প্রতিকূল ভাব থাকাতেই প্রকাশের অনুকূলভাব আছে। এই জগৎ হরিহরাত্মক। বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহেন। শিবের সংহার-শক্তি আছে বলিয়াই, বিষ্ণুর রক্ষাশক্তি। রোগে প্রাণ নষ্ট হয় বলিয়াই, ঔষধদ্বারা উহা পরিরক্ষিত হয়, এই জন্যই রোগের সময় বিষ্ণু ও মহাদেবের যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণের ব্যবস্থা। তম ও রজঃশক্তির সামঞ্জস্যই হরিহরাত্মক বিশ্ব। হরিহরের দ্বন্দ্বই দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্ব।

সত্ত্বগুণেই প্রকাশ-অবস্থা; গীতা বলেন:—'সত্ত্বং প্রকাশকম্'। রজ ও তমের সংগ্রাম-মধ্যগত সামঞ্জস্যভাবজনিত বস্তুর যে সম্পন্নতা, তাহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। রজোগুণ "রাগাত্মকং" এবং উহার ফল "কর্ম্ম-সঙ্গ"। যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহাই রজঃশক্তি; যে শক্তি দ্বারা বিশ্বের এই ক্রিয়াশীলতার বিঘ্ন ঘটে, তাহাই তমঃশক্তি। অনেক সময়ে তামসিক ভাবের সহিত সাত্ত্বিক ভাবের ভ্রম হইতে পারে। গোলাপটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাতে আর রজঃশক্তির কোন্ ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে না। তুমি মনে করিতে পার যে, ওটি উহার তামসিক অবস্থা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থাই সাত্ত্বিক ভাব। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার ন্যায় কখন কখন পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়ী খুল, উহার স্প্রিংএর গতি লক্ষ্য কর, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে যে উহা গতিশূন্য, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সমুদায় জগতে যে ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, মানবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, কার্য্যাদিতেও ঐ ত্রিবিধ ভাব দৃষ্ট হয়। ফুল্ল ফুল কি আনন্দপ্রদ! উহাই ফুলের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং উহার ফল সুখ। সত্ত্বগুণের ফলই সুখ। "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি"। ক্রিয়াত্মক রজোগুণের ফল দুঃখ। যখন কোন সমস্যা পূরণ করিতে হয়, সেই অবস্থাটি স্মরণ করুন্ এবং ঐ সমস্যা পূরণ হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাও স্মরণ করুন্। প্রথমটি রাজসিক, দ্বীতয়টি সাত্ত্বিক ভাব। আর যখন কোন দ্বন্দ্বই হইতেছে না, চেষ্টাও হইতেছে না,

অন্তঃকরণ জড়বৎ রহিয়াছে, সেই অবস্থাটিও চিন্তা করুন্। উহাই তামসিক অবস্থা। সাত্ত্বিক ব্যক্তির সাত্ত্বিক কার্য্য, সাত্ত্বিক আহার-বিহার হইয়া থাকে এবং সত্ত্বগুণোপযোগী কার্য্য, চিন্তা এবং আহারাদির দ্বারা সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক মানবেতেই তিনটি গুণই রহিয়াছে; ইহার যেটি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই বৃদ্ধি করিতে পার এবং যেটি হ্রাস করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই হ্রাস করিতে পার।

সাত্ত্বিক চিন্তা, সাত্ত্বিক কার্য্য, সাত্ত্বিক আহার-বিহার দ্বারা সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয়। সাত্ত্বিক জ্ঞান হইলে, সর্ব্বভূতে অব্যয়ভাব—অর্থাৎ এক নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব দৃষ্ট হয়, ঐ পরমাত্ম-তত্ত্ব পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অবিভক্ত।

'সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥'

গীতা ১৮।২০

যখন সর্ব্বভূতের "আমিতে" আমার "আমি" দেখিতে পাইলাম, যখন আমার "আমিতে" সর্ব্বভূতের "আমি" দেখিতে পাইলাম, তখনই সাত্ত্বিক জ্ঞান হইল। অতএব আমিত্বের-প্রসারই সাত্ত্বিকতার কারণ, সাত্ত্বিকতাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। এই জন্য ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় ক্রিয়া স্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

'শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥'

গীতা।

কিন্তু যে ব্যক্তির সাত্ত্বিক গুণ নাই, কিম্বা যে ক্রিয়াদ্বারা সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইতে পারে, এমন ক্রিয়াও নাই, তাহার গলদেশে পৃথিবীস্থ তাবৎ কার্পাসসূত্র দিলেও তিনি সাত্ত্বিক হইতে পারিবেন না। আমিত্বের প্রসার দ্বারাই সাত্ত্বিকতা অধিকার করা যায়, এবং সাত্ত্বিকতা দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অতএব হে মানব! মানবের এই কর্ম্মদেহ ধারণ করিয়া যদি তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিলে, তবে আর তোমার জীবনে ফল কি? ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই দুর্লভ মানব-জন্ম সার্থক হয় এবং না জানিতে পারিলেই বৃথা যায়।

'ইহচেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্ মহতীবিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি'॥

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, তাহার জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে, তাহার মহান্ বিনাশ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণাদির ক্লেশ সহ করিতে হয়। এই জন্য ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, ইহলোক

হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। অতএব হে মানব! সর্ব্বভূতে স্বীয় "আমি" প্রসারিত কর, ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ হৃদয়-মন্দিরে স্থাপন করিয়া উহার দিকে অগ্রসর হও, জীবন বৃথায় যাইবে না। ক্রমশঃ—

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

আমিত্বের প্রসার।

কুকুরের স্বর্গারোহণ।

(গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা।)

আমি যে পল্লীতে বাস করিতাম, সেই পল্লীতে একটি কুকুর ছিল। সে কাহারও পালিত নহে, এই জন্য তাহার কোন নাম ছিল না। বালক-বালিকারা তাহাকে ডাকিবার সময় "আতু" বলিয়া ডাকিত; শেষে "আতু"ই তাহার নাম দাঁড়াইল। আতু মানুষের, বিশেষতঃ বালক-বালিকার সঙ্গ বড় ভালবাসিত। আতুকে অন্য কুকুরাদির সহিত প্রায় মিশিতে দেখা যাইত না। আতু যখন মানুষ-সঙ্গ না পাইত, তখন এক প্রতিবেশীর ছাদের উপর যাইয়া কার্নিসের উপর শুইয়া থাকিত! ছাদে উঠিবার জন্য বাহিরে একটি সিঁড়ি থাকায়, তাহার এই কার্য্যে কেহ কখনও বাধা দিত না। বালক-বালিকা দেখিলেই আতু ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। বালক-বালিকারা আতুর উপর কত সময় কত অত্যাচার করিত, কিন্তু আতু তাহাদিগকে কখনও কামড়ায় নাই বা আঁচড়ায় নাই। কোন কোন দুরন্ত বালক কখন কখন আতুর মুখের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইত, কিন্তু আতু কিছুই বলিত না! আতুর গলায় দড়ী বাঁধিয়া কখনও তাহারা ভালুক-নাচান খেলা খেলিত, কখনও তাহার পৃষ্ঠে অশ্বারোহণের ন্যায় আরোহণ করিত, এবং উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিত, কিন্তু আতু নিঃশব্দে সমুদায় অত্যাচারই সহ্য করিত। যখন বেশী যন্ত্রণা বোধ করিত, তখন আতু মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু পালাইবার চেষ্টা করিত না কিম্বা বালকদিগের উপর কখনও কোন অত্যাচার করিত না। আহারদিতে আতুর বিশেষ আসক্তি ছিল না। 'আতু' বলিয়া ডাক দিয়া, যে যাহা দিত, আতু তাহাই খাইত; কেহ না ডাকিলে, আতু নড়িত না। এইরূপে আতু কাল কাটাইত। আতুর কিন্তু একটি বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। আতু বড় একটা কুকুরদিগের সহিত মিশিত না। কুকুরগণ আতুকে পাইলেই আক্রমণ করিত এবং আতু কখন কখন তাহাদের দন্তাঘাতে বড়ই কষ্ট পাইত। আতুর মাঝে মাঝে এইরূপে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। আতুর ঘাড়ে ক্ষত হইল, তাহাতে দুর্গন্ধ হইত; তখন আর তাহার আদর থাকিত না; বালকেরা ঢিল, লাঠি মারিয়া তাহাকে তাড়াইত; আতু অপারগ হইয়া শেষে পল্লী পরিত্যাগ

করিয়া কোথায় যাইত, কেহই জানিত না। এইরূপ মাঝে মাঝে তাহাকে পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইত এবং ক্ষত সারিলেই সে আবার আসিত। একবার এইরূপ অনেক দিন পরে আতু ক্ষত সারিয়া পল্লীতে উপস্থিত। এই সময়ে কুকুরীগণ প্রসব করিয়াছে এবং একটি কুকুরী পাঁচ ছয়টি ছানা রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছে। দুই তিন দিন যায়, ছানাগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইল। এই সময় আতু সেই স্থানে উপস্থিত। আতু সেই দিন হইতে নিজে আহার করিয়া ছানাগুলির নিকটে যাইয়া বমন করিতে-আরম্ভ করিল এবং ছানাগুলি তাহা উদরস্থ করিয়া জীবিত রহিল। ক্রমে ছানাগুলি বড় হইল এবং নিজেরা আহারের সংস্থান করিতে শিখিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, আতুর সহিত ছানাগুলির সন্তান-সম্বন্ধ ছিল না। ইতি মধ্যে আতু আবার কয়েকটি কুকুরদ্বারা আক্রান্ত হইল। দন্তাঘাতে তাহার ঘাড়ে ক্ষত হইল, এবং ঐ ক্ষততে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায়, আতু আবার পল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেক দিন পরে আতু উপস্থিত হইল, কিন্তু আতুর ক্ষত এবার সারে নাই।

আতুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে রাস্তার উপর গেলাম। আমি না যাইতেই আতু রাস্তার উপর পড়িয়া গেল ও সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং যেন নীরব-ভাষায় বলিতে লাগিল, "কুকুরের যে আমিত্বের প্রসার আছে, মানুষের তাহাও নাই, ধিক্ মানুষে! কিন্তু আমার দুঃখের অবসান হইল, আর তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাড়িত হইতে হইবে না"—আতু উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমিও ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—মৃত কুকুরের দেহের উপরে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ! কুকুরের দেহ হইতে আর একটী জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া উহার সহিত মিশিয়া গেল! আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

আমিত্বের প্রসার!

কোকিলের অভিশাপ।

কে জানে কেন, কোকিলের রব আমায় বড় ভাল লাগিত। কে জানে কেন, কোকিলের রব শুনিলে আমার আহার-নিদ্রা থাকিত না। কোকিল এক বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, আমিও কোকিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এইরূপে সারাদিন হয়ত কোকিলেরই অনুসরণ করিতাম। কোকিলের ডাক একবার শুনিয়া পুনর্ব্বার শুনিতে না পাইলে, হৃদয়ে যে অভাবের উপলব্ধি হইত, সে অভাব অন্য কিছু দ্বারাই পূর্ণ হইত না। প্রেম-তরঙ্গ কখনও হৃদয় উদ্বেলিত করে নাই, অথচ কোকিলের রব ভাল লাগিত। বিরহ কখনও হৃদয় তাপিত করে

নাই, অথচ কোকিলের ডাকে মন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রিয়জন ছিল না, অথচ যেন তাহার অভাব হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিত। কোকিলের ধ্বনিই যে শুধু ভাল লাগিত, তাহা নহে, তাহার রূপও বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত। যত দেখিতাম, ততই দেখিতে ইচ্ছা করিত। যে কবি এহেন কোকিলকে কুরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাকে শত ধিক্কার। অপরের যাহাই হউক, আমি কিন্তু কোকিলকে বড়ই সুন্দর দেখিতাম। কোকিল আমার, নতুবা কোকিলকে এত ভালবাসি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে হৃদয় শূন্য বোধ করি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে আমার আমিতে 'আমি' নাই বলিয়া বোধহয় কেন? কোকিল আমারই হইবে, কোকিলকে আমারই করিব, এই পণে এক দিন বৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল আমার হুইল না, সে বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল; আমিও বৃক্ষান্তর আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল কিন্তু এবারও আমার হইল না, সে আবার বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আমি কোকিলকে আমার করিতে কৃতসঙ্কল্প; কোকিল আমার হইবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। কোকিল ও আমাতে, 'আমার করিব'—'আমার হইবে না', এই ভাবে আমিত্ব ও অনামিত্ব, এই উভয়ের মধ্যে কিছু দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে কোকিলের পরাজয় হইল, আমার "আমার করিবারই" জয় হইল। ব্যাধের কৌশল-সাহায্যে এক দিন কোকিলকে 'আমার' করিলাম। কোকিলকে আমার করিয়া, আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে, আমার কোকিল আমি রাখিলাম,—আমার কোকিলের ধ্বনি আমি শুনিব, আমার কোকিলের রূপ আমি দেখিব বলিয়া—দিবারাত্র—অবিরাম-ভাবে। কোকিল কিন্তু আমার হইয়াও আমার হইল না। কোকিল আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে অনশন ব্রত ধারণ করিল। কোকিল আর ডাকে না। যে ডাক শুনিতে কোকিলকে আমার করিলাম, সে ডাক আর ডাকে না। যে রূপ দেখিতে কোকিলকে আমার করিলাম, কোকিলের সে রূপ আর রহিল না। কোকিল যথার্থই কুরূপ হইল। এইরূপে এক দিন যায়, দুই দিন যায়, কোকিল কিছুতেই আমার হয় না। কত সাধাসাধনা করিলাম, কিছুতেই ডাকে না। কত সুমিষ্ট ফল আনিয়া দিলাম, কিছুই খায় না; চক্ষু মুদিয়া পিঞ্জর মধ্যে সে তার নিজের ভাবেই ভোর হইয়া রহিল! কিছুতেই চোক মেলে না। এইরূপে তিন দিন গেল; চতুর্থ দিন আবার কত বিনয়বাক্য বলিলাম, কত সাধাসাধনা করিলাম, কত সুমিষ্ট ফল দিলাম, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোকিল সকলের; কোকিলকে কেবল আমার করিবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু আমিত্ব, অনামিত্ব বা আমিত্বের প্রসারকে পরাভব করিয়া প্রবলই রহিল। কোকিলকে আমারই পিঞ্জরে আমারই করিয়া রাখিলাম বটে, কোকিল কিন্তু আমার হইল না; আমাকে

তদবস্থ দেখিয়া কোকিল চক্ষু মেলিয়া তাহার নিকট যাইতে ইঙ্গিত করিল। কোকিল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে ভাবিয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলাম। কোকিল তখন অস্ফুট ও অস্পষ্ট ক্ষীণ চিঁ চিঁ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিল "তোমার আমিত্ব অতি প্রবল। আমিত্ব প্রবল থাকিলে, কাহাকেও 'আমার' করা যায় না; সুতরাং তুমিও আমাকে তোমার করিতে পারিলে না। আমি আমার নই, তোমারও নই, আমি এই অনন্ত বিশ্বের। যে আমিত্বের প্রসার করিতে পারে, সেই জগৎকে নিজস্ব করিতে পারে।" আমি কোকিলের কথার উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে কোকিল আমাকে বাধা দিয়া পুনরায় কহিল "তোমার তর্ক, বিচার শুনিতে চাহি না; তুমি আমাকে তোমার করিবার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোমাকে আমার ন্যায় চিরগৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে হইবে এবং যখন তুমি তোমার প্রবল আমিত্বের ধ্বংস করিয়া, আমার ন্যায় জগতের হইয়া জগতের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তোমার এই অভিশাপের মোচন হইবে, অর্থাৎ পরম-ধাম-প্রাপ্তি হইবে।" এই বলিতে বলিতে কোকিলের ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল; আমার সেই সাধের কোকিল জন্মের মত আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

(কস্যচিৎপরিব্রাজকস্য।)

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১২।

কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূর্খস্তু কো যস্তু বিবেকহীনঃ। কার্য্যা সদা কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ কিং জীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ॥

৩২। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, প্রাণিগণের জ্বর কি? গুরু উত্তর করিলেন—চিন্তা।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥"

যে রোগে এক সময়েই ঘর্ম্মাবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বশরীর আক্রান্ত হয়, তাহারই নাম জ্বর। "জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ" জ্বর অতিশয় ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বার এবং ইহা হইতে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। চিন্তাদ্বারাও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে; তাই বলিয়াছেন,—

"চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং ক্ষুধাং নিদ্রাং বলং হরেৎ। রূপমুৎসাহবুদ্ধিং শ্রীং জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ॥"

চিন্তাই মানবগণের জ্বর; ইহা ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী ও প্রাণ,

সমস্তই হরণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্বর দারুণ রোগ হইলেও চিন্তাজ্বর তদপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর; কারণ—

"জ্বরে ব্যতীতে ষড়হে জীর্ণজ্বর ইহোচ্যতে।
অসৌ চিন্তাজ্বরস্তীব্রঃ প্রত্যহং নবতাং ব্রজেৎ॥
সত্যমুক্তং পুরাবিদ্ভিশ্চিন্তা মূর্ত্তিঃ সুদারুণা।
ন ভেষজৈর্লঙ্ঘনৈর্ব্বা নৈবান্যৈরুপশাম্যতি॥
চিতা চিন্তা দ্বয়োর্ম্মধ্যে চিন্তানাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ॥"

সচরাচর যে জ্বর হয়, ছয়দিন অতীত হইলেই তাহাকে জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকে; কিন্তু এই চিন্তাজ্বর অতীব ভীষণ, প্রতিদিনই ইহা নূতন আকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে, কোনকালেই জীর্ণ হয় না। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে, ঔষধ, লঙ্ঘন, অথবা তৎসদৃশ অন্যবিধ উপায়, কিছুতেই এই সুদারুণ চিন্তার উপশম হয় না। চিতা ও চিন্তা, এ উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী, যেহেতু চিতা নির্জ্জীবকে দাহ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

"চিন্তনে নৈধতে চিন্তা স্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।
নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেন্ধন ইবানলঃ॥"

যেমন শুষ্ককাষ্ঠসংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ চিন্তাদ্বারাই চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয়। যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে বহ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ চিন্তার অভাবে চিন্তা বিনষ্ট হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী সাধক "আত্মীয়যোগ-ক্ষেমোপায়-আলোচনাত্মিকা" বিষয়-চিন্তা ও সর্ব্ববিধ অসৎচিন্তা পরিহার করিয়া, নিত্য শান্তি-সঙ্গ ভগবচ্চরণারবিন্দ চিন্তা করিবেন।

৩৩। মূর্খ কে? যে ব্যক্তি বিবেকহীন, সেই মূর্খ। মূর্খ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—'মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ' যে ব্যক্তি সৎপদার্থ আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, অসৎপদার্থ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি হয়, সেই মনুষ্যই প্রকৃত মূর্খ। "ব্রহ্ম সত্য" এবং "জগৎ মিথ্যা" এইরূপ অবধারণকে বিবেক কহে। এই বিবেক যাঁহার আছে, তিনিই পণ্ডিত; কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মনুষ্য পণ্ডিত হয় না। পণ্ডা (আত্মবিষয়া বুদ্ধি) যে ব্যক্তির আছে, অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

৩৪। সর্ব্বদা কি কর্ত্তব্য? শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি।

"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাত্মনি। সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥"

(ভাগবত)

অখিল বিশ্বাত্মা ভগবানে (শিবে বা কেশবে) ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত শুভজনক পন্থা বা উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

ভক্তির স্বরূপ।

(১) "সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা, অমৃত-স্বরূপা চ, যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি" অর্থাৎ সেই ভক্তি ঈশ্বরের ঐকান্তিক প্রেমরূপা, এবং অমৃতস্বরূপা, যাহা লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(২) "পূজাদিষনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ"—পরাশর নন্দন মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, ভগবানের পূজাদিতে অনুরাগের নাম ভক্তি। (নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৩৪) "কথাদিষনুরাগ ইতি গার্গঃ"—গর্গ বলেন, ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে ও কীর্ত্তনে অনুরাগের নাম ভক্তি। (নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৪) "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগের নাম ভক্তি।

(শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র)

(৫) "অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ।" (নারদপঞ্চরাত্র)

যখন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না করিয়া একমাত্র ভগবানের প্রতি অন্তঃকরণ একান্ত অনুরক্ত, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত ঈশ্বরাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি কহা যায়, ইহা ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ বলিয়াছেন।

ভক্তির মাহাত্ম্য।

"ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী" "অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ" ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই যিনি সর্ব্বদা সমভাবে সদ্রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের ভক্তিই প্রধান, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে ভক্তি-সাধনই অন্যান্য সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা সহজ, সুগম এবং শ্রেষ্ঠ। (নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

"ভক্ত্যৈব পূজ্যতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ।
তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে॥" (নারদীয় পুরাণ)

অভীষ্টফলদাতা বিষ্ণু একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আরাধিত হন, এজন্য ভক্তি সর্ব্বলোকের মাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন:—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতিমন্নিষ্ঠাশ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥" (ভাগবত)

শ্রদ্ধা-সহকৃত কেবল এক ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয় বস্তু যে আমি—সাধুগণের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়ভক্তি, তাহা চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করে।

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥" (ভাগবত)

"ভগবান বাসুদেবে দাস্য-সখ্যাদি-সহিত ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমানের প্রচার রুদ্ধ হইয়া, সংসারে অনমুরাগ সমুদ্ভাবন ও অনুষঙ্গতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব সম্পাদন করে। শুষ্ক তর্কাদি কখনও এই জ্ঞানকে পরাহত করিতে পারে না"।

"ভক্তির্জ্জগিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।" (অধ্যাত্মরামায়ণ)

ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে, ভক্তিদ্বারাই জীব মুক্তিলাভ করে।

সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন:—

"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"

"আমি ভক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"।

ভক্তির লক্ষণ।

"শ্রবণংকীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।

অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।

ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥" (ভাগবত)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, ভক্তির এই নয়টি লক্ষণ।

ভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয়?

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। (নারদীয় পুরাণ)

ভগবদ্ভক্তগণের সহবাসে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন:—

"তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ।

সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘং।

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।

মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥" (ভাগবত)

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের নিকটে শিষ্ট জনের হিতজনক মদীয় কথন উপস্থিত হয়, তাহা শ্রোতা ভক্তগণের হিতকারী হইয়া পাপ মোচন করে। যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে।

ভক্তিসাধন করিতে হইলে কি কর্ত্তব্য, তাহা নারদ বলিয়াছেন:—

"ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্দ্ধককর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি"। "অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়া-আস্তিকতাদি চারিত্র্যাণি পালনীয়ানি"। (নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

"ভক্তিশাস্ত্র (ভাগবতাদি) মনন করিবে, ভক্তি-বর্দ্ধনোপযোগী কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, তীর্থপর্য্যটন, ভগবৎকথা-শ্রবণ, ভক্তগণের সহিত সদালাপ, ভগবৎ-সেবা

ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিতে থাকিবে, এবং অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিকতাদি বিধিবৎ পালন করিবে।"

যাহার উদয় হইলে, অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন থাকে না, যাহা লাভ করিলে, জীব পরমানন্দরূপ পীযূষ-পানে বিভোর হয় এবং ইহ-পরলোকে কোন সুখ-ভোগের বাসনা থাকে না, এবং যাহাদ্বারা ভব-সন্তাপহারী ভবকাণ্ডারী ভগবানের করুণামৃত লাভ করিয়া, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারা যায়, সেই ভক্তির সাধনা করা মুমুক্ষু মাত্রেরই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

৩৫। প্রকৃত জীবন কি? দোষ-পরিশূন্য জীবনই প্রকৃত জীবন।

গরুড়পুরাণেও বলিয়াছেন :—

"স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণ-ধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফলং তস্য জীবনম্॥

যে ব্যক্তি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক, তাহারই জীবন সার্থক; যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্ম্মিক, তাহার জীবন নিষ্ফল। সাধু-সমাজে এরূপ ব্যক্তি হেয় বলিয়া তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। উচ্চবংশোদ্ভব ও ধনসম্পন্ন হইলেও দূষিতচরিত্র অসাধু পুরুষ জগতে আদৃত হয় না।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মশীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতি কুলে নহি।
ন জ্যাতা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে॥" (শুক্রনীতি)

এ সংসারে লোকে মনুষ্যের সৎকার্য্য, সৎস্বভাব ও সদ্‌গুণেরই পূজা করিয়া থাকে; জাতি এবং বংশের পূজা কেহই করে না এবং জাতি কুলের দ্বারা কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব সাধুতা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

অবতারতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই জন্য ভারত রত্ন-প্রসবা নামে খ্যাত। পশু জগতে শারীরিকবলে সিংহ, বুদ্ধি-বলে বানর প্রধান। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যখন প্রকৃতির এক এক পৈটা ঊর্দ্ধে উঠিবার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ নিম্ন ক্ষুদ্র জীব হইতে ক্রমে উচ্চতর বৃহৎ জীব সৃষ্ট হয়, তখন প্রাকৃতিক কর্ম্মের (অর্থাৎ জাগতিক কর্ম্মের স্বাভাবিক যে নিয়ম আছে, তাহার) ব্যতিক্রমী নিয়মানুসারে নব বলের বা নব শক্তির

প্রয়োজন হয়, ইহাই দার্শনিক দিগের মত। * বোধ হয়, এই মতবাদ হইতেই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার বর্ণিত হইয়াছে। যাহাহউক, নৃসিংহ-অবতার দ্বারা হিরণ্যকশিপুরূপ হিংস্র আসুরীশক্তি দমনপূর্ব্বক নরদেহে প্রহ্লাদরূপ মানবাত্মার বিকাশ হউক বা ডারউইনের থিওরী অনুসারে মানবজাতি বানরকুলোদ্ভূতই হউক, অর্থাৎ উহাকে বৈশৃঙ্খলিক নিয়ম ('Missing link) বলা যাউক বা "নরসিংহ" অবতারই বলা যাউক, তাহা আমাদের এ প্রস্তাবের বিচার্য্য নয়। তবে আর্য্যজাতির ভারতাগমনের পূর্ব্বে ভারতের আদিমবাসী মানব যে রাক্ষস্ ও বানর নামে অভিহিত হইত, ইহা নিতান্ত কল্পনা নহে। তবে এস্থলে এই কথা উঠিতে পারে যে, যদি ভারতের আদিমবাসী রাক্ষস ও বানরবৎ হয়, তবে আর্য্যকুলের আদিপুরুষগণ দেবতা হইলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইতি-পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃতির নব প্রয়োগহেতু মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি বা সৃষ্টির পর প্রকৃতি-দেবী কিছুকাল স্থিরভাবাপন্না ছিলেন; কিন্তু বহুকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারেন নাই। ভারতের আদিমবাসী যে অধিককাল পশুভাবে ছিল বা এখনও পর্য্যন্ত গারো, কুকি প্রভৃতিরা প্রায় সেই ভাবে আছে, ভারতের প্রকৃতিই তাহার একমাত্র কারণ। যেমন মানব-শিশু জন্মিবা-মাত্র যদি মানব-সংসর্গ না পায় ও অপর্য্যাপ্ত স্বভাবোৎপন্ন ফল, মূল ও পশুপক্ষ্যাদি ভক্ষণদ্বারা উদরপোষণ করিতে পারে, তবে ঐ শিশুতে মানব-স্বভাব থাকিলেও, শিক্ষা-গুরু অভাবে মানসিকচিন্তা ও মনোবৃত্তির পরিচালনা না হওয়ায় নিতান্ত পশুবৎ হইয়া উঠে। মানব-মস্তিষ্ক যে উপাদানে নির্ম্মিতই হউক, উহা যে জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশোপযোগী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনুশীলন ব্যতীত জ্ঞান-বৃদ্ধির কথনই বিকাশ হয় না। ঐ অনুশীলন শিক্ষা-সাপেক্ষ। শিক্ষা দুই জাতীয়; অন্তর ও বাহ্য। বাহ্য-শিক্ষা অন্যের দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ও গুরু-উপদেশদ্বারা সম্পন্ন হয়; অন্তঃশিক্ষা স্বভাবজাত অভাব ও আবশ্যকতা হইতে লব্ধ হয়। অভাব ও আবশ্যকতা ব্যতীত স্বভাব হইতে শিক্ষালাভ হয় না। যে পরিমাণ অভাব ও আবশ্যকতা, স্বভাবের শিক্ষাও সেই পরিমাণে হয়। এই শিক্ষাতেও অনুকরণ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অনুকরণ ও দৃষ্টান্ত।

আদিম মানবকুলের শিক্ষাগুরু আকাশ হইতে হস্তপদবিশিষ্ট কোন দেবতা নামিয়া আসেন নাই; অন্ততঃ দার্শনিকগণ ঐরূপ অমানুষিক ব্যাপার স্বীকার করেন না। প্রকৃতিদেবী ক্রমোন্নতির নিয়ম (Evolution theory) অনুসারে নববল প্রয়োগদ্বারা মানবকুল সৃষ্টি করিয়া, মানবের জ্ঞান-বৃদ্ধি বিকাশের উপযোগী স্বভাবরূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েন; † এবং স্বভাবানুযায়ী তাহাদের অভাব ও আবশ্যকতারূপ

* উপরোক্ত মতটি বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ এবং পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত Evolution theory.

† "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা॥" ইত্যাদি (চণ্ডী দ্রষ্টব্য)

শিক্ষাগুরু সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের দ্বারা ঐ আদিম মানবকুলকে শিক্ষা দেন। ঐ অভাব ও আবশ্যকতা হইতে প্রকৃতি-মাতার যে সকল পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত হয়, তাঁহারাই মানবকুলের জ্যেষ্ঠভ্রাতাস্বরূপে কনিষ্ঠগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন; * তদ্ভিন্ন আবশ্যকানুসারে প্রকৃতিমাতা কখন কখন পুত্রবিশেষের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃ বা আংশিক জ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হইয়া, মানবকুলকে সাময়িক শিক্ষা দিয়াও অন্তর্ধান হন। এই প্রকৃতিই আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বন্যায় ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ম বা আইন; অথবা উহাই স্বয়ং সর্ব্বন্যায় ও মাঙ্গলিক আইন। অভাব ও আবশ্যকতাই মনুষ্যের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও উন্নতির মূলমন্ত্র। আদিম মানবকুল যখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, তখন ঐ অভাব ও আবশ্যকতা বিদ্যুতের চকিত-আলোকের ন্যায় তাহাদিগকে পথ-প্রদর্শন করাইত। সেই আলোকে তাহারা গন্তব্য পথে বিচরণ করিত। ঐ স্বভাবের বিদ্যুৎ-আলোক হইতে তাহারা নানাবিধ জ্ঞানালোকের উপাদান প্রস্তুত ও তদ্দ্বারা আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া, তমোময় মোহান্ধকার নাশ করিয়াছিল। সেই জ্ঞানসূর্য্য কালরূপ মেঘাবরণে বারম্বার আবৃত, মুক্ত ও পুনঃ আবরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ভারতবর্ষ মানবের অভাবরূপ শিক্ষাগুরু নহেন, কিন্তু অভাবরূপ শিক্ষাগুরু কর্ত্তৃক সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা হইলে, ভারতে আবশ্যকতারূপ দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রথম শিক্ষাগুরুর সহিত দ্বিতীয় শিক্ষাগুরুর এতাধিক সম্বন্ধ যে, প্রথম শিক্ষাগুরু কর্ত্তৃক বর্ণমালা শিক্ষা হইলেই দ্বিতীয় গুরুর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী, এইজন্যই ঐ উভয় শিক্ষক এক ও অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্ভিন্ন উচ্চতম শিক্ষার সমস্ত উপাদান ভারতের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত থাকায়, প্রথম শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত উপাদান-রত্ন সকলের সহজেই বিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু ভারতমাতা মানবের প্রথমঅভাবরূপ শিক্ষা-গুরু না হওয়ায়, আর্য্যগণের সংস্রব ব্যতীত ভারতের আদিমবাসী অনার্য্যগণের বহুকালেও সভ্যতার একটী বর্ণের পূর্ণাবয়ব শিক্ষা হয় নাই; যেহেতু পূর্ব্ববর্ণিত মত মানবের শারীর বৃত্তির পরিতৃপ্তির কোন অভাবই ভারতে না থাকায়, আদিম ভারতবাসীগণ ভারতে প্রথম শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ আদিম ভারতবাসীগণই অসভ্য বর্ব্বর। কিন্তু এসিয়ার মধ্য ভূ-খণ্ড

* পূর্ব্ব কল্পের মহাত্মাগণের উন্নত আত্মা প্রকৃতির নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কল্পে মানবদেহধারণ করিয়া, মানবের জ্যেষ্ঠভ্রাতাস্বরূপে মানবকুলকে শিক্ষা দিয়া অন্তর্ধান হন। ঐ সকল মহাত্মাগণই ব্রহ্মার মানসপুত্র। উহারা পূর্ব্ব কল্পে মুক্তাত্মাস্বরূপে ব্রহ্মে সংযোজিত রহেন এবং পরকল্পে ব্রহ্মের মহা মন হইতে স্খলিত অণুস্বরূপ মানবদেহে প্রবিষ্ট হন। তদ্ভিন্ন আবশ্যকানুসারে প্রকৃতিমাতা বা সর্ব্বজ্ঞানময় পিতা, পূর্ব্বোক্ত পুত্রবিশেষের মধ্যে যে সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হন, ঐ জ্ঞান জ্যোতিঃই অবতার, ক্রমে ইহা বিশদ হইবে।

পাশ্চাত্যমতে কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্ব-দক্ষিণ তীর হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ কিন্তু প্রাচ্যমতে সুমেরুপর্ব্বত হইতেছে। ঐস্থানেই আর্য্যগণের আদিম বাস-ভূমি; উহা ভারতের ন্যায় উৎপাদিকা-শক্তি-বিশিষ্ট নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতির অনমুকূল নহে। ঐ সুমেরুপর্ব্বত বিষুবরেখা হইতে উত্তর-কেন্দ্রের (North Pole) মধ্যভাগ বিধায়, উহা পৃথিবীর স্থানার্দ্ধের মধ্যস্থান বলিয়া গণনীয়।

সুমেরুপর্ব্বত হিন্দুদিগের কাল্পনিক পর্ব্বত নহে। পুরাণ-রচয়িতৃগণের মোহকরী কল্পনার কুটজাল ভেদ করিয়া দেখিলে অবশ্যই অনুমিত হইবে যে, ঐ পর্ব্বতটী উত্তর প্রদেশে স্থিত; * যেহেতু মৎস্যপুরাণে উহার সীমার বর্ণনা আছে, যথা—

উত্তর——পূর্ব্ব——দক্ষিণ——পশ্চিম——যথাক্রমে উত্তর কুরু, ভদ্রাশ্ববর্ষ, ভারতবর্ষ, কেতুমাল বর্ষ।

প্রকৃতপক্ষে ঐ সুমেরু পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। উত্তর কুরু এখনও পর্য্যন্ত কোন কোন ম্যাপে "Ottor koru" বলিয়া ব্যক্ত আছে। ঐ উত্তরকুরু পাশ্চাত্য-মতে রুসিয়ার দক্ষিণভাগকে বলে। পূর্ব্বকালে তিব্বত, স্বাধীন তাতার ও আফ্‌গানি-স্থানের কতকাংশ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল, তাহা মহাভারতাদি পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; বিশেষতঃ "কুমারসম্ভব" কাব্যে যে গোরূপা পৃথিবীর বৎস হিমালয় পর্ব্বত এবং দোহন-দক্ষ দোগ্ধা সুমেরু বলিয়া বর্ণিত আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সুমেরুবাসীগণই সুমেরু পর্ব্বত হইতে হিমালয়ে আগমন-পূর্ব্বক পৃথিবীকে দোহন আরম্ভ করিয়াছিলন। পূর্ব্বকালে হিমালয় হইতে আল্টাই পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমগ্র পার্ব্বতীয় প্রদেশকে অথবা আল্টাই পর্ব্বতকে সুমেরু পর্ব্বত বলিত। যাহাহউক, ঐ সুমেরু পর্ব্বত যে রুসিয়ার দক্ষিণে এবং হিমালয়ের উত্তর স্থিত আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর নাতিউষ্ণ-মণ্ডল, অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Temparate zone) অন্তর্গত। ঐ স্থানের প্রকৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতির সার-সংগ্রহ স্বরূপ। উক্ত সুমেরুপর্ব্বতই পূর্ব্বোক্ত

* উক্ত সুমেরুপর্ব্বত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত মৎস্যপুরাণের কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে সুমেরুপর্ব্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ; তাহার দাক্ষণে হেমকুট বর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। ভাগবতের মত সত্য হইলে, পৃথিবী সূর্য্য-সিদ্ধান্তানুসারে সমতল সাব্যস্ত হয় এবং উহার অবস্থান উত্তর-সমুদ্রের উত্তরে প্রমাণিত হয়; কিন্তু মৎস্যপুরাণানুসারে উক্ত সুমেরুপর্ব্বত এইক্ষণকার আল্টাইপর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। উভয় পুরাণে সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম সীমা একই প্রকার; কেবল দক্ষিণ সীমা ভিন্নরূপ। ঐ দক্ষিণসীমা ভিন্নরূপ হওয়াতে উত্তরকুরুদেশ লইয়াও বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ভাগবতানুসারে কুরুবর্ষ এমেরিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মৎস্যপুরাণানুসারে রুসিয়া সাব্যস্ত হয়। যাহাহউক, ঐ বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইলে, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও জ্যোতিষের মীমাংসা করিতে হয়, এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভূগোল ও জ্যোতিষের অপ্রমাণত্ব ব্যতীত ভাগবতের মত গ্রহণ করা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের দোষ-প্রমাণ ও আর্য্যদিগের ভূতত্ত্ব ও জ্যোতিষ নির্দ্দোষ, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে; তথাচ ঐ প্রমাণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, আমরা ঐ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, মৎস্য-পুরাণানুসারে সুমেরুপর্ব্বতকে আল্টাইপর্ব্বত সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

পঞ্চদশসূত্রের অন্তর্গত। জগতের সমগ্র প্রকৃতির সহিত সুমেরুবাসীদিগের প্রথম সংঘর্ষণ হয়, এবং সমগ্র প্রকৃতির সারসংগ্রহরূপ অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ আভাস ঐ সুমেরুবাসীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উঁহাদিগের অন্তরেই অভাব ও আবশ্যকতার বোধ প্রথম পরিস্ফুট হয়। অতএব ঐ সুমেরু পর্ব্বতই মানবের প্রথম শিক্ষাগুরু। আর্য্যগণ ঐ সুমেরু পর্ব্বতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানবাসীগণ পূর্ব্বোক্তমত জ্ঞান ও সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া যে দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই দেশের পশুবৎ অসভ্য মানবগণকে জয় করিয়া, সেই দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন। এই জাতিই আদিম আর্য্যজাতি। এই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, গ্রীক, রোমান এবং বর্ত্তমান ইউরোপবাসী উক্ত আদিম আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখা। ঐ সমস্ত জাতির আদিকুল সুমেরুবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতিই প্রকৃতির ঘোর কঠোরতা ও অনুকূলতা—উভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া, ঐ উভয় অবস্থার সংঘর্ষণে আদিম মানবকুলের মধ্যে এক পৈটা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ ঐ আর্য্যজাতি আদিম বাসস্থানেই সামান্যভাবে পারিবারিক বন্ধন, সমাজ সংস্থাপনের সূত্রপাত, পশুপালন, কুটীর-নির্ম্মাণ, সামান্য শিল্প, নৌ-গমনাগমন, হলচালনদ্বারা সামান্য কৃষিকার্য্য, খড়্গ, তীর, ধনুদ্বারা যুদ্ধ, উদ্ভিদের সামান্য গুণাগুণ দ্বারা ঔষধ-প্রস্তত-শিক্ষা করিয়াছিলেন। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে প্রাকৃতিক উপাসনা এই জাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক উপাসনা হইতে তৎপরবর্ত্তীকালে আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ ও প্রকৃত আত্মোপাসনার সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি-সহকারে স্বদেশে জীবিকানির্ব্বাহ না হওয়ায়, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া, উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক, রোম ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিনে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইহাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, পাশ্চাত্য গ্রীক-রোমের সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার কোন সংস্রব নাই; আমাদের এক সম্প্রদায় ভ্রাতৃবর্গকে আমরা পাশ্চাত্য দেশে পাঠাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পন্থানুসরণে কেবলমাত্র দেবাসুরের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সংস্রব এককালীন ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রকৃত জাতীয় পন্থানুসরণ করিতে বাধ্য হইব। ইহাদ্বারা স্থানে স্থানে অনেক স্বদেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত ভ্রাতার বিরাগভাজন হইতে পারি; তাহা বলিয়া আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না।

এইক্ষণে আপাততঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পন্থাবলম্বনে আমরা স্বীকার

করিতে বাধ্য হইলাম যে, আবস্তিকদিগের ও হিন্দুদিগের আদিপুরুষ একত্রে হিমালয় পর্য্যন্ত আগমন করেন। এইরূপে তথায় তাঁহাদিগের কিছুকাল অবস্থিতির পর, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়; ঐ বিবাদ যে সোমরস বা সোমযজ্ঞ লইয়াই প্রথম সূচিত হইয়াছিল, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। কিন্তু ঐ সোমরস অর্থে সামান্য উদ্ভিদ বা সামান্য মাদক নহে। ঐ সোমরসই যোগের প্রধান উপাদান ও আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশক। উহাই পুরাণোক্ত দেবাসুরের দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত সুধা, সুরা বা অমৃত। ঐ সোমরস পান বা সোমযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা আমাদিগের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষগণ 'সুর' পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; ঐ সোমরস বা সোমযজ্ঞের অভাবে মুসলমান ও পারসিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ আবস্তিকগণ 'অসুর' নামে আখ্যাত এবং সুরদিগের মহাশক্তির নিকট বিধ্বস্ত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞান, ক্ষুদ্র সুরসমাজে বামনরূপে বিকাশিত হইয়া, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালব্যাপী আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ ত্রিপাদ দ্বারা অসুররূপ জড়শক্তি বা জড়শক্তির নেতা আবস্তিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিরাজকে এককালীন বিতাড়িত করিয়া, দেবাসুর-যুদ্ধের উপসংহার করিয়া ও সুরলোকে পূর্ণজ্ঞান-জ্যোতি বিস্তারপূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলে, ঐ সুরগণের বংশধরগণ ধীরে ধীরে পঞ্জাবের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে আগমন করেন, এবং তথায় আর্য্যপিতামহগণ, শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, মোল্লার, এই ষড়রাগ; মালবশ্রী, বিভাস, ভৈরবী, মোল্লারী, কামদী, তড়ী, ইমন, পূরবী, হাম্বির, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও বাগেশ্রী প্রভৃতি ছত্রিশরাগিণী; এই সিদ্ধ রাগ-রাগিণী-সংযোগে বেদ-গান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। ঐ আর্য্যপিতৃগণ তাঁহাদিগের হিমালয়-বাসকালে মহাশক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি বিশ্বদেবতত্ত্ব এবং পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি হৃদয়ে উদ্দীপন ও বিনিয়োগ দ্বারা আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন।* তাঁহারা অন্তর্জ্জগতে প্রবেশপূর্ব্বক গায়ত্রীরূপিণী পরাশক্তিকে অন্তরের অন্তরতম গূঢ়প্রদেশ হইতে আহ্বান করিয়া, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণপূর্ব্বক "দেব"নাম ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন। যেমন জড়-

---

* ইন্দ্র (আকাশীয় তড়িন্ময় ইথার) সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিশ্বদেব (তৈজস, বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব মহাভূত) জড়শক্তি বটে, কিন্তু উহারাই মানবের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। উহারাই অন্তশ্চৈতন্য বা চিৎশক্তি-যোগে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে যে ঐশীশক্তি আছে, তাহার সমষ্টি সূক্ষ্ম অংশই হিরণ্যগর্ভ ও প্রত্যেক ব্যষ্টিভূতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ই দেবতা। বেদান্তদর্শন ২ অঃ ৪ পাঃ ১৪ হইতে ১৮ সূত্র দ্রষ্টব্য—ঐ বেদান্ত দর্শনের ২ অঃ ৪ পাদের ১৯ সূত্রে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, অন্তর ও বাহ্য জগতের সৎশক্তি ও প্রাণাদিই দেবতা এবং কুশক্তি-কুবৃত্তিই অসুর। এই কুবৃত্তি রূপ অসুর জয়ার্থে দেবময় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ-বর্ণনা শ্রুতিতেও আছে উপরোক্ত ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দেহের মধ্যে মন, বুদ্ধি ও সদ্বৃত্তি সকল আছে, সেইরূপ অনন্ত জড়-জগতের অভ্যন্তরেও সমষ্টি-মহৎ বা মহাপ্রজ্ঞা আছে। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি দৃশ্যতঃ জড়শক্তি হইলেও, অভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত মহাজ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে; ঐ জ্যোতিই "দিব' এবং ঐ জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিকশক্তিই দেবতা। আধ্যাত্মিকশক্তি সাধনদ্বারা ঐ দৈবীশক্তির সহিত মানব-শক্তির মিলন হইলে, মানবের দেব-সাক্ষাৎ বা সশরীরে স্বর্গভোগ হয়। চক্ষু তৈজস জড়পদার্থ, ঐ চক্ষুর সহিত বাহ্য জড়-জগতেরই সম্বন্ধ, কিন্তু সাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, ঐ আধ্যাত্মিকশক্তির মিলন হইতে পারে। দেবগণ যে জড়শক্তি নহে, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময়, তাহা বেদান্ত দর্শনের ৫২১ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শাঙ্কর ভাষ্যে পরিষ্কার মীমাংসিত আছে; বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদ, ৩৩ সূত্র ও ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৪ হইতে ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এইক্ষণ পাঠকমহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, জড়োপাসক হলধারী আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে প্রকৃতির বর্ণমালা মাত্র শিক্ষা করিয়া হিমালয়পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় হঠাৎ এরূপ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তি-সম্পন্ন কি প্রকারে হইলেন? আর তাঁহাদের সহযোগী ভ্রাতৃগণইবা ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পাঠক-মহাশয়গণের কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক।

১। হিমালয় সমগ্র রত্নের খনি। এই রত্ন অর্থে মণি-মাণিক্য-স্বর্ণাদি নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকশক্তি-বিকাশক বিবিধ ধাতু, লতা, গুল্ম প্রভৃতি; উদ্ভিদ, প্রস্রবণ, হ্রদ, নদী, তেজ, জ্যোতি, মেঘ, বায়ু ও হিমানী প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু ঐ রত্নমধ্যে পরিগণিত; তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সোমরস একটী রত্নবিশেষ। হিমালয় ঐ সকল রত্নের আকর বলিয়াই পরাশক্তির জনক। ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক, সর্ব্বপ্রকার তেজ এবং জ্যোতিঃ ঐ পরাশক্তির অন্তর্গত। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা, এই পঞ্চাদ্যাশক্তি উহার এক একটী অঙ্গ; তড়িৎ, ম্যাগ্নেট্ ও আকর্ষণ প্রভৃতি উহার এক একটী বিকাশ। ঐ পরাশক্তিই ভর্গ; ভর্গ হইতেই মানবের বুদ্ধি প্রেরিত হয়।

২। প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ প্রকৃতি-দেবী পূর্ণাবয়বের সহিত হিমালয় ও কৈলাসে * অবস্থান করেন। ঐ হিমালয় ও কৈলাস তাঁহার পিতৃ ও পতিগৃহ। সুরদিগের মধ্যে কোন মহাযোগী

* কৈলাসপর্ব্বত আমাদের মতে কিয়দ্দূর গিরি নহে; হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ধবলাগিরিই হরপার্ব্বতীর বিলাসভূমি কৈলাসপর্ব্বত।

পরাশক্তিকে আয়ত্তাধীন ও জীবত্ব শিবত্বে পরিণত করিয়া, কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। ধাতু ও উদ্ভিদ-বিশেষের সহিত মানবের শরীর ও মনের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ ও মানব-মনের উপর তাহাদের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভুত্ব আছে যে, যাহার ফল আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। উদ্ভিদ, ধাতু ও তৈজস পদার্থের গুণসমূহ প্রায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ অবগত নহেন। ঐ সম্বন্ধে আমরাও অসভ্য বনমানুষের ন্যায়; ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দুই একটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পাঠক! বুলারলিটন-প্রণীত 'জাননী' ও 'কমিংরেস্' (Zanony and Coming race) গ্রন্থদ্বয় যদি পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগের এই বাক্যের সত্যতা কথঞ্চিৎ বুঝিবেন। যদি ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ না করিয়া থাকেন বা পাঠের কষ্ট স্বীকার না করেন, তাহাহইলে মৎকৃত দার্শনিক মীমাংসা ১ম ভাগ (শিক্ষাতত্ত্ব) খানি পাঠ করিলেও উহার আভাস পাইবেন।

৪। হিমালয়ের অনেক প্রদেশ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য বীরগণের দুরধিগম্য। হিমালয়ের কয়েকটী শিখরদেশে বিশেষ বিশেষ মহাত্মা ও মহর্ষি ভিন্ন কাহারও উত্থানের ও প্রবেশের ক্ষমতা নাই।

৫। হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশবাসী মহাত্মাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সামান্য বৃক্ষ-পত্রের রস বা উদ্ভিদ-বিশেষদ্বারা কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্য রোগ-মুক্তির ও ঐ মহাত্মাদিগের অমানুষী শক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ঐ হিমালয়ের অপর প্রান্তবাসী তিব্বতের বিশেষ বিশেষ লামার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাগুরু ইংরাজের মুখেই অনেকে বোধ হয় শুনিয়াছেন।

৬। আমাদিগের প্রাচীন পিতামহগণ হিমালয়প্রদেশে অল্পকাল বাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত শক্তিবিশিষ্ট হন নাই, এবং সকলেই যে ঐ শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী দেবতার ন্যায় দেবতা আবস্তীক, গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; এমন কি, উহাদিগের নামেরও অনেক সাদৃশ্য আছে, এবং উভয় জাতির ঐ দেবতাদিগের নাম একই মূল-ধাতু হইতে উৎপন্ন; তদ্ভিন্ন অবেস্তা ও ঋগ্‌বেদের অতি প্রাচীনতম দুই একটী সূক্তে অসুর-পূজা ও অসুরের গুণানুবাদ বর্ণিত আছে! এমন কি, ঐ সূক্তে বরুণ দেবতাই প্রধান দেবতা মধ্যে পরিগণিত ও 'অসুর' নামে অভিহিত ছিলেন। 'দেব' শব্দ তৎকালে প্রচলিত ছিল না। ইহাদ্বারা হিন্দু ও আবস্তিকদিগের প্রাচীনতম পূর্ব্ব-পুরুষগণ অসুর-পূজক ছিলেন, অর্থাৎ অসুরই দেবতাস্থানীয় ছিল, প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তৎপর ঐ ঋগ্বেদের সূক্তে অসুরদিগের বহু নিন্দাবাদ এবং সুর বা দেবগণের উপাসনা ও প্রশংসা বহুল স্থানে আছে। আবার অবেস্তা গ্রন্থে সুর বা দেবগণের নিন্দাবাদ ও অসুর-পদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ণনা আমাদের উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ পোষক। যেহেতু,

অতি পূর্ব্বকালে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি নামধারী জড়শক্তির গুণানুবাদই প্রকৃত উপাসনা ছিল; তৎপরে ঐ হিমালয়বাসী পূর্ব্ব-পুরুষগণের দ্বারা হিমালয়ের কোন অগম্য শিখরপ্রদেশে সোমরস প্রমুখ মহারত্ন সমূহের আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগদ্বারা মানব শক্তি ক্রমে প্রস্ফুটিত ও অন্তর্জ্ঞান বিকাশিত হইলে, ঐ জড়শক্তির ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম গুণের সহিত মানবের অন্তঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্ব্বক তাঁহারাই ঐবাহ্য ও অন্তঃশক্তি আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই স্বীয় শরীরস্থ ও বাহ্যজগতস্থ পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম-পঞ্চতন্মাত্র, অন্তরস্থ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ-দ্বারা এক একটী আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ করিয়া * ঐ অসুর উপাধিধারী অলৌকিক মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি জড়শক্তির আসনে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বা তেজঃস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত দেবোপাধিধারী ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে উপবেশন করাইয়া, তাঁহাদের সাধনাদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সোমসুরা হইতে 'সুর' এবং জ্যোতিঃ বা দিব হইতে 'দেব' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ঐ সম্প্রদায়স্থ সকলেই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু যাঁহারা সুরদিগের মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগের দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা সুর-সম্প্রদায়ভুক্ত ও 'সুর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; আর যাঁহারা ঐ শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারিয়া, পূর্ব্বধর্ম্ম প্রবল রাখিয়া, সুরা বা সুর-বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাই স্বীয় দেবতার উপাধি অনুসারে 'অসুর' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবিষ্কৃত সোমরস অসুর-উপাধিধারী জড়শক্তির উপাসনার প্রতিকূলতা-ব্যঞ্জক বিধায়, উহা সুরা নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ সুরা বা অমৃত-আবিষ্কার হইতে অসুরগণের শেষ পরাভবের কাল পর্য্যন্ত দেবযুগ বা সত্যযুগ গণনীয়। ইহাই মানবকুলের জ্ঞান-জ্যোতির প্রথম বিকাশ বা প্রথম অবতার। কিন্তু পশুকুল হইতে মানবকুলের প্রথম উৎপত্তি (নরসিংহ মূর্ত্তি) প্রথম অবতার ধরিলে, পূর্ব্বোক্ত বামনাবতার মনুষ্যকুলে দ্বিতীয় অবতাররূপে পরিগণিত। আর প্রথম জীব-সৃষ্টিরূপ মৎস্য-অবতার ধরিলে, উহা পঞ্চমাবতারে পরিগণিত হয়। † যাহাহউক, এ পাশবাবতার আমাদের আলোচ্য-

---

* পাঠক একবার বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি, আসন, ন্যাস ও প্রাণায়ামের কার্য্য-পদ্ধতি দেখিলে, উপরোক্ত বর্ণনা যে কাল্পনিক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

† মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার আদৌ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে না; যেহেতু মানব-সৃষ্টির পূর্ব্বে কখনও ইতিহাস থাকিতে পারে না। তবে ঐ চারিটী অবতার দ্বারা বিবর্ত্তবাদের (Evolution theory র) আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তজ্জন্য উহা অবিজ্ঞান-মূলক নহে। বামন অবতার সম্পূর্ণ ইতিহাসমূলক না হইলেও এবং ঐ অবতারটী রূপক ধরিলেও, উহা সভ্যতার ইতিহাসের মূলভিত্তি। যদি সেই সর্ব্বজ্ঞানময়ের জ্ঞানজ্যোতি-বিকাশই অবতার হয়, তবে উহা বিশেষ কোন মানবে বিকাশিত হউক বা বিশেষ কোন মানব-সমাজে বিকাশিত হউক, মূল উদ্দেশ্য এক ও বৈজ্ঞানিকহেতুও এক। পৃথিবীর জলময় অবস্থায় মৎস্যের ন্যায় জলচর জীবেরর এবং কর্দ্দমাবস্থায় কূর্ম্মের ন্যায় জীবের ও কঠিন মৃত্তিকায় শূকরাদির ন্যায় পাশবদেহের বিকাশ সম্ভব। পশুর চরম উন্নতিই সিংহ; জলচর, কর্দ্দমচর ও

বিষয় নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। বামন অবতার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আলোচনার আরম্ভ। যাহাহউক, আমরা এ বামন অবতারের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, উপরোক্ত অবতার এবং দেবযুগ বা সত্যযুগ পরিত্যাগ করিতে ও সুরদিগের অসুর-নাশিনী-করালবদনী-কালী মূর্ত্তির নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অসুরগণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন না হইলেও, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ঘোর ঐন্দ্রজালিক (Black magician) ছিল। ইন্দ্রজাল আধ্যাত্মিকশক্তির নিতান্ত নিকৃষ্টাঙ্গ; ঐ ঐন্দ্রজালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল যে কৈলাসবাসী আর্য্য-গুরুর বশীভূত হইয়া, প্রকৃতি-মাতার এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পিতার প্রসাদে যে বহু ধন সঞ্চয়পূর্ব্বক অতীব সুখ-সমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা অযৌক্তিক নহে। আর যাঁহারা সুরগণের বশীভূত না হইয়া, সুরগণের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, আরব, পারস্য ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকার পর তাঁহাদের বংশধরগণ যে মধ্যে মধ্যে ভারতাক্রমণ করিতেন, পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; উহারাই তৎকালে 'দৈত্য' নামে অভিহিত হইত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, দোলার গতির ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নগমন বা উন্নতির পর অবনতি একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। * এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভারতে অধিক প্রযোজ্য,তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবের নিয়ম এই যে, প্রয়োজনাভাবে কোন ক্রিয়ারই যথাযথ অনুশীলন হয় না, এবং অনুশীলনাভাবে ক্রিয়াশক্তির ক্রমে হ্রাস হয়। আমাদের বর্ণিত দেবযুগের পর বা দেবাসুরের যুদ্ধের পর হিমালয়বাসী পূর্ব্বপিতামহগণের আর প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায়, উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা পরম-জ্ঞান ও পরমানন্দলাভের নিমিত্ত পার্থিব সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ধ্যান, ধারণা, সমাধি রূপ সেই পরম জ্ঞানানন্দ হইতে ক্ষণমাত্র বিচ্যুত

স্থলচর প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর জীবাকারে চৈতন্যের ক্রম-বিকাশই এক একটী অবতার-গণনীয়। প্রথমে যখন মানবদেহের বিকাশ হইয়াছিল, তখন অর্দ্ধ-পাশবাকার ও অর্দ্ধ-মানবাকারের বিকাশ অসম্ভব নহে; মানব-দেহের উত্তমাঙ্গরূপ মানব-মস্তিষ্কে যে প্রথম জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়াছিল, তদ্দ্বারা অজ্ঞান ও হিংস্র-ভাবাপন্ন আসুরভাব নষ্ট হইয়া মানব-চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। ঐ মানব-চৈতন্য ক্রমে পরিস্ফুট ও ক্ষুদ্র মানবদেহে সত্ত্বময় ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়া, রজস্তমোময় অসুররাজকে দমন করিয়া সাত্ত্বিক দেবভাবের বিস্তারই সম্ভব। ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতিঃ কোন ক্ষুদ্র মানব-বিশেষেই বিকাশিত হউক বা ক্ষুদ্র সুরসমাজেই বিকাশিত হউক, উহাই অবতার। পূর্ব্ববর্ণিতমত- ব্যক্তিবিশেষে বিকাশিত হইয়া, তখন সমাজের শিক্ষা ও সমাজে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হওয়াই সম্ভব।

* পূর্ব্ব বর্ণিতমত দোলা একই রেখায় অবস্থিত থাকিয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার বৃত্ত পরিভ্রমণ-কালে দোলা ক্রমে অধোভাগে আসিয়া, ঐ মণ্ডলাকার-বৃত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরূর্দ্ধে উত্থিত হয়, এবং যে স্থান হইতে নামিয়াছিল, তথায় পৌঁছিয়া তাহার মূল মেরুদণ্ডের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত দণ্ডসহ এক রেখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, দোলার গতি পুনঃ নিম্নদিকে হয়, উহাই দোলার অধ-ঊর্দ্ধ-গমন বা অবনতির পর উন্নতি। 'কল্প' পত্রিকায় উহার বিশদ বর্ণনা আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

হইতে ইচ্ছা করিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ ও অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বিকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারাই সমাজের নেতা ও তদবশিষ্ট সমস্ত জনগণ পূর্ব্বোক্ত মত শ্রমজীবীরূপে পরিগণিত ছিল। যদিও তৎকালের সমাজের নেতাগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সোমযাগ প্রভৃতি কঠোর ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুশীলনের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, তথাচ পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণের পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণের মধ্যে ঐ সকল কঠোর যাগাদি-ক্রিয়ানুষ্ঠান বা আধ্যাত্মিক-শক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত "ডিনামিক্ লয়ের" "প্রিন্‌সিপাল" যে সমাজ-গতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মটি পাঠকগণ ভুলিবেন না। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির বংশানুগত সাংক্রামিক নিয়ম (Hereditary law) এস্থলে প্রয়োজ্য। প্রকৃতির বিপরীতশক্তি-সংঘর্ষণে উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও এককালে নষ্ট হয় না।

যাহা হউক, উক্ত হিমালয়বাসী পূর্ব্বপিতামহগণ কিয়ৎকাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বসবাস ও প্রকৃতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াছিলেন; তদনন্তর তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি-রূপ স্রোতের অতীব প্রবলতাহেতু অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হিমালয়ের নিম্নে সমতল ভূমি সকল অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ স্থানেই তাঁহাদের আবার নূতন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়। এই শত্রুই ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী। ইহারা আর্য্যগণকর্ত্তৃক দস্যু, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারা ঘোর অসভ্য হইলেও শারীরিক বলে আর্য্যগণ হইতে ন্যূন ছিল না; যেহেতু ইহাদের হিংস্র পাশবোদ্যম ইতিপূর্ব্বে ক্ষয়প্রাপ্ত না হওয়ায়, ইহারা সিংহ-ব্যাঘ্রাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব ছিল। অবশ্যই হিমালয়ের যে সকল দুরধিগম্য অধিত্যকা, দেবভূমি বা সুরদিগের বাসভূমি ছিল, তথায় ইহাদের গতি-বিধির ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। এই জন্য দেবযুগে ইহাদিরের সহিত সুরগণের প্রায় সাক্ষাৎ হয় নাই। আর্য্য-পিতামহগণ পূর্ব্বোক্ত অধিত্যকা হইতে অবতরণ করিলে, পার্ব্বত্য নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশে ইহাদিগের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের ভীষণতম মূর্ত্তির বর্ণনা বেদ ও পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ বাল্মীকির অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনী-নির্গত রামায়ণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যদি শিক্ষিত পাঠকগণ এ সকল পুস্তক পড়িবার ক্লেশ স্বীকার করিতে না চাহেন, তবে মাননীয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমভাগের বৈদিককাল (Vadic age) পাঠ করিলেও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মনুষ্যোচিত ভাষা পর্য্যন্ত ছিল না! এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দমনীয় অসভ্যজাতিকে পরাজয়-পূর্ব্বক ভারতাধিকারের নিমিত্ত আর্য্য-পিতামহ-

গণের বল ও বীর্য্য পুনরুত্তেজিত ও ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছিল। একপক্ষে উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক দেশাধিকার, পক্ষান্তরে বনাকীর্ণ ভূমি সকল পরিষ্কার করিয়া কৃষিবাণিজ্যের বিস্তার একান্ত আবশুক হইয়াছিল। ঐ সকল আবশ্যকতা সত্বেও সমাজে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলন যে একান্ত আবশুক এবং ঐ সকল জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, ইহা আর্য্যপিতামহগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কার্য্য-বিভাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কার্য্য-বিভাগ হইতেই সমাজ-বিভাগ হয়। ঐ সমাজ-বিভাগই জাতি-বিভাগের প্রধান সূত্র; কিন্তু ঐ জাতি-বিভাগ তাঁহাদের ইচ্ছামত কাল্পনিক বিভাগ নহে। উহা বেদোক্তমত ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বা মহর্ষিগণ ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রিলোক ও ত্রিকালব্যাপী আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃদ্বারা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ মনের শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ নির্দ্দেশ ও তদনুসারে চারিশ্রেণীতে কার্য্য ভাগ করিয়াছিলেন। শুক্ল বিশুদ্ধ সত্ব, রক্ত বিশুদ্ধ রজঃ, * পীত রজস্তম-মিশ্রিত, † কৃষ্ণ তমোগুণ বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত চারিজাতির কার্য্য ও সমাজবিভাগ পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয়সূত্রে পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বলা আবশ্যক যে, এই বিভাগের পূর্ব্বে আর্য্যপিতামহগণের হিমালয়-বাসকালে প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে তাঁহারাও যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, তাহার আভাষ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অতএব সেই অসুরজেতা প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণের বংশধরগণ যে বংশানুগত সাংক্রামিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থাভেদে বিশুদ্ধ শুক্ল ও বিশুদ্ধ রক্তবর্ণের বা বিশুদ্ধ সত্ব রজ-গুণের অধিকারী ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয়সূত্র-লিখিত প্রথম দুই শ্রেণী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণী তৎকালে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন নাই; ঐ শেষোক্ত শ্রেণীই শ্রমজীবী বৈশ্য ছিলেন। যেহেতু তমোগুণার্থে জ্ঞানাবরণীশক্তি বা অজ্ঞানতা বুঝায়; কিন্তু তৎকালে আর্য্যসমাজে শ্রমজীবীগণও একবারে অজ্ঞান বা অসভ্য ছিল না। তদনন্তর আর্য্যদিগের নিকট আদিম অধিবাসী অধিকাংশ দস্যুগণ পরাজিত ও বশীভূত হইয়া, আর্য্যসমাজে শ্রমজীবীর অঙ্গীভূত হওয়ায়, তাহাদের অন্তরের প্রাকৃতিক বর্ণ বা গুণানুসারে কৃষ্ণবর্ণ বা তমোগুণ নির্ণীত হইয়াছিল; তদনুসারে তাহারা দাস বা শূদ্রজাতিতে পরিগণিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে, আর্য্যগণ পরাজিত জাতিকে নিতান্ত নিপীড়ন ও তাহাদিগকে ঘৃণাচক্ষে দৃষ্টি করিতেন; তাহাদিগের নিমিত্ত দণ্ড-

* কোন কোন মতে সত্বমিশ্রিত রজোগুণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

† পীতবর্ণ যে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সংমিশ্রিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

বিধি ও কার্য্যবিধি আইন অতীব কঠোর ও আর্য্যদিগের দণ্ড ও কার্য্যবিধি আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল; এমন কি, আর্য্যগণ তাহাদিগকে উচ্চ-শিক্ষার বা তত্ত্ব-জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার পর্য্যন্ত দেন নাই; পরন্তু তাহাদিগকে নিতান্ত দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; ইহা সভ্যজনোচিত কার্য্য নহে।

এইরূপ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যে একজন রুগ্ন ক্ষীণকায় ব্যক্তি এক ছটাক সাগু খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না, তাহাকে যদি অপরিমিত পলান্ন-কালিয়া ভোজন করান যায়, তবে তাহার কি দশা হয়, বলুন দেখি? যদি উপযুক্ত ঔষধাদি সেবনেও রুগ্ন কৃশদের প্রকৃতি অনুসারে কোনকালেও তাহাদের অত্যাহারে শক্তি না হয়, তথাপি তাহারা ঔষধ সেবন করিয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে পোলাও ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি? আপত্তিকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উপযুক্ত ঔষধ সেবন সত্ত্বেও তাহাদিগের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কেন? ইহার উত্তর—তাহাদের জাতীয় কর্ম্মফল ও ভারতের সমতল বনভূমির প্রকৃতি। তাহারা আর্য্যজাতির বশীভূত ও পদানত হই-য়াও সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকায়, তাহাদের কোন অভাব ও আবশ্যকতা-বোধের স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা চিরকালই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল; তবে আর্য্যজাতির সংস্রবে যতদূর সম্ভব, ততদূর উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংস্রবে এবং ভারতের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিজনিত কর্ম্মফলে ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যস্থ শ্রমজীবীগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; যেহেতু স্রোতের স্বাভাবিক গতি নিম্নগামী; এই জন্যই ভারতের ৳ অংশ বৈশ্যজাতি একেবারেই বিলুপ্ত ও শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক, আমরা আমা-দের বর্ণনীয় বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এইক্ষণ পুনর্ব্বার আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব। *

আর্য্য-পিতামহগণ পূর্ব্বোক্ত মত চারি জাতিতে বিভক্ত ও অনার্য্যগণকে উত্তর প্রদেশ হইতে কতকাংশে বিতাড়িত ও কতকাংশে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া, পুণ্যময়ী গঙ্গা—যমুনার স্রোতের ন্যায় তাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে সমাজের মূর্ত্তিমান বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও ক্ষমতা স্বরূপ বৈষয়িক জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের নেতাস্বরূপ কার্য্যকুশল ক্ষত্রিয়গণ কোশল,

* পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, প্রবন্ধ-লেখক অবতারের ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন; এপর্য্যন্ত অবতারের স্পষ্ট কোন প্রসঙ্গ দেখা যায়না। ইহা যাঁহারা মনে করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রবন্ধ-লেখক অতি বিনীতভাবে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন; ক্রমেই অবতারের ঐতিহাসিকতত্ত্ব যে প্রমাণিত হইবে, উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন; ক্রমে বিশদ হইবে

পাঞ্চাল, হস্তিনা, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি স্থানে এক একটি রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক এক একজন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় প্রধান নেতারূপে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত শাসন ও পালন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্লোকাষ্টক। *

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনের জয়-জয়কার। কেননা হরিসঙ্কীর্ত্তনে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, ইহা মুক্তিরূপ কুমুদে চন্দ্রিকা-বর্ষণ করে, বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) রূপা বধূর জীবন দান করে, আনন্দ-সাগর বর্দ্ধন করে, প্রতিপদোচ্চারণে অমৃতরসের পূর্ণ আস্বাদ প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি (সর্ব্বাত্মা) ইহাতে শীতল হয়।

বিশদীকরণ। স্বচ্ছ বস্তু সমল হইলে, তাহাতে কিছুই প্রকাশ পায় না। চিত্ত দর্পণবৎ স্বচ্ছ; বিষয় তাহার মল। হরিসঙ্কীর্ত্তনে সেই মল নির্ম্মল হইলে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ পায়; তাই বলিতেছেন—"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্"।

চতুর্দ্দিকে দাবাগ্নি জ্বলিলে যেমন বনচারীর নিস্তার নাই; কোথায় যাইবে? যে দিকে পলাইবে, সেই দিকেই দাবদাহ। দুঃখের আর সীমা নাই। সেইরূপ সংসার পাপীর চারিধারে জ্বলিতেছে। এক সংসার হইতে এ সংসারে আসিয়াছে, আবার মরিলেও আবার সংসার! জীব সংসার-দাবানলে পড়িয়া পূর্ব্বজন্মে দগ্ধ হইয়াছে, এ জন্মেও হইতেছে এবং পরজন্মেও হইবে। প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; কেবল হরি-সঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃতে সে দাবদাহ নির্ব্বাণ হয়। তাই বলিতেছেন,—"ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্"।

মুক্তি যেন কুমুদ। কুমুদ যেমন স্নিগ্ধকর-চন্দ্রিকায় বিকাশ পায়, সেইরূপ মনো-মুগ্ধকর হরিসংকীর্ত্তনে মুক্তি বিকাশ পায়, তাই "শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্"।

আমাদের কোণের বধূ বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান), তাহার এক মাত্র জীবন শ্রীহরি-সঙ্কীর্ত্তন; তাই "বিদ্যা-বধূজীবনম্"।

এ ত দূরের কথা, সঙ্কীর্ত্তন-প্রারম্ভেই আনন্দ-সাগরে যেন উচ্ছ্বাস (কোটাল) আসে। তাই "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্"। সঙ্কীর্ত্তনীয় প্রত্যেক পদের উচ্চারণে যেন অমৃতের

* এই শ্লোকাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখের বাণী।

সম্পূর্ণ আস্বাদন হয়, এবং ইন্দ্রিয়, মন; প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়; তাই বলিয়াছেন:—"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'—"সর্ব্বাত্মস্নপনম্"।

এহেন সঙ্কীর্ত্তনে অধিকারী কে?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ২॥

অনুবাদ। তৃণ হইতেও অতি নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও অভিমানবর্জ্জিত, অথচ (অন্যের) সম্মানকারী ব্যক্তিই হরিসঙ্কীর্ত্তনে অধিকারী।

বিশদীকরণ। তৃণ সকলেরই পদতলে; তদপেক্ষা নীচ মাটী; অতএব "মাটীর মানুষ" (অর্থাৎ সুবিনীত) হইয়া যে তৃণ অপেক্ষাও অতি নীচভাবে অবস্থান করে; আর শরীরে রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়া আশ্রিতের ক্লেশ দূর করে; অধিক কি, অনাতপদ্বারা ছেদকেরও শ্রান্তি হরণ করে! এহেন বৃক্ষের ন্যায় যে সহিষ্ণু, এবং যে বর্ণাশ্রমের বা ধন-সম্পদাদির অভিমান করেনা, কিন্তু অপরের বর্ণাশ্রমের ও ধন-সম্পদাদির সম্মান করে, সেই ব্যক্তি হরিসঙ্কীর্ত্তনে নিত্যাধিকারী।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥৩॥

অনুবাদ। ভগবন্! তুমি বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছ। সেই নাম-বিশেষে নিজের (রোগনাশক প্রভৃতি) শক্তি অর্পিত করিয়াছ; "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং" ইত্যাদি রূপে স্মরণের নিয়ম করিয়াছ। (মূঢ় মানবের প্রতি) তোমার এইরূপ কৃপা; কিন্তু হায়! আমার এমন দুর্দ্দৈব! তোমার নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না!

তাই প্রার্থনা করি—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪॥

অনুবাদ। হে জগদীশ! আমি ধন চাহিনা, জন চাহিনা, ভাল কবিত্বশক্তিও চাহিনা। যেন প্রতি জন্মে ঈশ্বরে (তোমাতে) নিষ্কাম-ভক্তি (অনুরাগ) হয়।

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫॥

অনুবাদ। অয়ি নন্দনন্দন হরি! আমি তোমার কিঙ্কর। (আজ ভবকর্ণধার প্রভুকে হারাইয়া) বিষম সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়াছি। অতএব আমাকে তোমার চরণের রেণুসদৃশ চিন্তা কর। (অর্থাৎ চরণের রেণু যেমন চরণ-ছাড়া হয় না, আমাকেও সেইরূপ চরণ-ছাড়া করিও না। দাস্য-ভক্তি প্রদান কর।)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬॥

অনুবাদ। (বল দেখি কৃষ্ণ!) কবে তোমার নামোচ্চারণে নেত্র হইতে অশ্রু

বিগলিত হইবে? বাক্য গদ্গদরূপে মুখেই রুদ্ধ থাকিবে? এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥৭॥

অনুবাদ। (সখি!) আজ গোবিন্দ-বিরহে নিমেষ কাল যুগবৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু যেন বর্ষার ধারা বর্ষণ করিতেছে; জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে!

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। (সখি!) কৃষ্ণ আমাকে প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক পাদরতা (চরণের দাসীই) করুন, অথবা দুঃখে পেষণ করুন, কিম্বা দর্শন না দিয়া মর্ম্ম-পীড়িতাই করুন, তিনি লম্পট যা' তা' করুন; আমার কিন্তু তিনিই প্রাণনাথ, অপর কেহ নয়।

অনুশীলন। পাঠক! একবার মার্জ্জিত রুচিতে রাধার আত্মসমর্পণ অনুধাবন করুন। রাধা সখিকে বলিতেছেন—সখিরে! দাসীর উপর প্রভুর ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী। একতঃ তিনি দাসী রাখিতেও পারেন, নাও পারেন, আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা! তিনি পুরস্কার প্রভৃতি কিছু দিউন বা না দিউন, আমি তাঁহার দাস্য করিবই করিব, ইহা স্থির; কাজেই অনুগ্রহ হয়, প্রেমালিঙ্গন দিতে পারেন; নিগ্রহ হয়, দুঃখের ভারে চূর্ণ করিতে পারেন। বেশী কিছু করিতে হয় না—দর্শন না দিলেই মর্ম্মাহতা হই! দ্বিতীয়তঃ তাঁহার দাসী, তাঁহার সেবার ভাবনা কি? তিনি যে লম্পট—ধৃষ্ট নায়ক; তাঁহার মনের মত কাজ করে, তাঁহাকে ভালরূপে শুশ্রূষা করে, ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করে, এমন অনেক আছে; কিন্তু তিনি ছাড়া রাধার প্রাণনাথ আর কেহ নাই। রাধা তাঁহার চরণে শরণ লইল। রাধাকে দুঃখ দিয়া তিনি সুখী হন, হউন। অন্যের সঙ্গে রঙ্গ-রসে সুখী হন, হউন; রাধা ভাবিবে, "আমার প্রাণনাথ সুখী" তাহাতেই রাধার অপার আনন্দ, রাধা আত্মসুখ চায়না, তাঁহার সুখেই রাধা সুখী। অথবা কৃষ্ণই রাধার আত্মা,—কৃষ্ণ-সুখই রাধার আত্মসুখ!

পাঠক! নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। এ চৈতন্যদেবের স্বকপোলকল্পিত শ্লোক। তিনি বিবাহিত হইয়াও চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে রুচির পরম পবিত্রতা উপলব্ধি হইবে। এহেন শ্রীগৌরচন্দ্র রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণকে 'লম্পট' বলিলেন। ইহার আবার গূঢ়তা আছে। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম অতুল! একবার কুসংস্কারের ভার রাখিয়া, সুরুচি কলস লইয়া ভক্তিসাগরে সন্তরণ কর, কূল পাইবে। সকলেরই একরূপ রুচি নয়, রুচিভেদে উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সংসারের ছায়া ভগবানে প্রতিফলিত করিয়া মনের আবেগ দূর করিতে হয়, নতুবা উপায় নাই। সংসারের পূজ্যগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ভগবানের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তাই কেহ মাতৃভাবে, কেহ পিতৃভাবে, স্নেহ

প্রভুভাবে বিভোর হইয়া ভাবোচিত বাক্যাদি ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ তিনি মাতা নন, পিতা নন, প্রভু নন, অথচ তিনিই সর্ব্বভাবময়। আমরা তাঁহার যে কোন ভাবাশ্রয় করিয়া পূজ্য-পূজকসম্বন্ধ রক্ষা করি। হিন্দু-রমণীর একজন পরম পূজ্য আছেন, তাঁহার নাম স্বামী। হিন্দু-স্ত্রীর নিকট স্বামীর আসন মাতা-পিতার আসনের অনেক উপরে। তাই পিতা নন, মাতা নন, গুরু নন, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র মহা-গুরু। গোপবালারা ভগবানকে এইরূপ স্বামীভাবে পূজা বিবেচনা করিয়া, স্বামীর আসনে বসাইয়া, তাঁহার পূজা করিয়া, সংসারের তাপ হইতে উত্তীর্ণা হইয়াছেন। স্থান-বিশেষে অমৃতও বিষ হয়, বিষও অমৃত হয়। পতি-পত্নীভাব অপব্যবহারে অন্যত্র দূষিত হইতে পারে, ভগবানের সম্বন্ধে দোষাবহ নয়। তিনি ভাবের সাগর, যে ভাব চাহিবে, সেই ভাব পাইবে। যদি বল, শৃঙ্গাররস ভক্তিরসের বিরোধী, পতি-পত্নীভাবে শৃঙ্গাররস মনে স্ফুরিত হয়। বিরোধী হওয়া দূরে থাক, বরং অনুকূল হইয়াছে; গুণ-প্রধানভাবে শৃঙ্গাররস ভক্তি-রসের পোষক হইয়াছে। তুমি শৃঙ্গার-রসের সাত্ত্বিক মর্ম্ম জাননা বলিয়া কুসংস্কারবশতঃ কুভাবে কুণ্ঠিত হও। বস্তুতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জ্ঞাতি, যে কোন সম্বন্ধ বল, সকল সম্বন্ধই মূলতঃ শৃঙ্গার-রসে অনু-প্রাণিত। যাহার মূলে শৃঙ্গাররস নাই, এমন সম্বন্ধই নাই। কৈ। সে সময় ত কুরুচিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয় না; এখন হয় কেন? সংস্কারই মূল। চৈতন্যচরিতা-মৃতে আছে,—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার। চারি ভাব চতুর্ব্বিধ ভক্তির আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে। নিজভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া যদি দেখয়ে বিচারি। সব রস হতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

অর্থাৎ আমাকে পিতৃভাবে, সখিভাবে অথবা প্রাণপতিভাবে, যে ভাবে যে ভক্তি-ভরে ভজনা করে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবে প্রকাশ পাই।

ইহা যেন মানিয়া লইলাম, কিন্তু গোপীগণ ভগবানের সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করিলেন কিরূপে? ইহাতে কি কুরুচি নাই? ইহা কি ভক্তির অঙ্গ? "অধ্যাত্মিক অর্থ" করিলে চলিবে না। বাহ্য অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে আগামীবারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

——•:o:•——

ভাষাপরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

বর্ণঃ শুক্লো রসস্পর্শৌ জলে মধুরশীতলৌ। স্নেহস্তত্র দ্রবত্বন্তু সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মধুরশীতলৌ রসস্পর্শৌ—মধুর রস (আস্বাদ) শীতল—স্পর্শ॥ ২। স্নেহঃ—গুণবিশেষ। পরে সুব্যক্ত হইবে।

৩। সাংসিদ্ধিকং—স্বাভাবিক।

অনুবাদ। জলে শুক্লবর্ণ, মধুর রস, শীতল স্পর্শ, স্নেহগুণ ও দ্রবতা আছে; কিন্তু সেই দ্রবতা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়াছে॥৩৯॥

বিশদীকরণ। যমুনার জল কালো, জাহ্নবীর জল ধবল, অজয়ের জল নীল এবং জলধির জল নীল,—এইরূপ জলের বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই; অতএব জলের শুক্ল-বর্ণ স্থির করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জলের নীলত্ব পীতত্বাদি নৈমিত্তিক। যেরূপ আধার (স্থান), সেইরূপ রঙ হইয়া থাকে। স্থানের বর্ণ জলে সংক্রান্ত হয়। উহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল। বর্ণ সম-বায়ের নাম শুক্লবর্ণ। তাই জলের শুক্লবর্ণ আশ্রয়ের বর্ণান্তরে অল্পেই বিকৃত হয়। অর্থাৎ জলগত শুক্লবর্ণ, আশ্রয়গত নীলাদি বর্ণের সহিত মিশিয়া সেই বর্ণ হয়; কেননা নীলাদিবর্ণের পরমাণু-সমবায়ই তখন তাহাতে বেশী হইয়া দাঁড়ায়। কোন উপায়ে আশ্রয়ের গুণ তিরোহিত করিতে পারিলে, উহার স্বাভাবিক শুক্লত্ব স্বতঃই প্রকাশ পায়। যমুনার কালো জলে প্রস্তুত বরফ অবশ্য শাদা হইবে। আকাশের জল ও করকা নিরাধার অবস্থায় শাদা। তখন তাহাতে আধারগুণ সংক্রান্ত হয় না, কিন্তু যমুনার জলে পতিত হইলে, স্থানের গুণে কালো হয়; যমুনার জল আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে ধবল হয়। দূরস্থ অতল জলধি-জল নীল বোধ হয়, দৃষ্টির লাঘবাদি তাহার প্রতি কারণ। অতএব জলের নীলত্বাদি বর্ণ অস্বাভাবিক; তাহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল।—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল।

এখন জলের মধুররস কিরূপে সঙ্গত হয়? দেশীয় কূপের জল বোদা (বিকৃতাস্বাদ), সমুদ্রের জল লোণা, কলের জল বিরস, নদীর জল সরস। এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরও পূর্ব্ববৎ।

* গত হিন্দু-পত্রিকার ভাষাপরিচ্ছেদ প্রবন্ধে অনেক ভুল আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টভুল। ১৭১ পৃষ্ঠের "আত্মা নিত্যদ্রব্য বৃত্তি-বিশেষগুণ-ইহ্যতে" এই কবিতায় বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে" এই সন্দর্ভটুকু ভুল। ১৮৫ পৃষ্ঠায় প্রবন্ধের শেষে "উপভোগের মধ্যে" ভুল। ঐ স্থলে উপভোগের সাধন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন স্থানে নৈয়ায়িক লিখিতে 'নৈ' হইয়াছে, ইত্যাদি। যাহা-হউক, অতঃপর বিশুদ্ধতার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

আশ্রয়ের গুণে জলের এইরূপ নানা রস হয়। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলের ভৌমিক সত্বাজনিত নৈমিত্তিকগুণ তিরোহিত করা যায়, তবে তাহার স্বভাবসুলভ মধুররস প্রকাশ পায়। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি স্বয়ং জলের মধুর রস অনুভব করিয়া থাকেন। হরীতকী বা কষায় বস্তু ভোজনান্তে জল বড়ই মধুর বোধ হয়। কষায় বস্তুর আকর্ষণে জলের আশ্রয়লব্ধ কষায়াদিরস বিশ্লিষ্ট হয়; তখন তাহার স্বাভাবিক মধুরত্ব প্রকাশ পায়। ঐ মধুরতা হরীতকীর গুণ নয়, তবে হরীতকী উহার নিমিত্ত। যদি বল, রাসায়নিক যোগে অন্য রস হয়, আমিও স্বীকার করি; কিন্তু মধুরতা-রস যৌগিক নহে। অতএব সে মধুরতাটুকু কাহার ধরিতে হইবে? হরীতকীর ধরিতে পারনা, কেননা হরীতকীর মুখ্য আস্বাদ কষায় রসই বটে; কিন্তু জলের মধুরতা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষীকৃত। অতএব এখানে তাহারই মধুরতা বলাই যুক্তিসঙ্গত। হরীতকী ভোজনের পর, জল বেশী মিষ্ট হয়; অন্যত্র জলের মধুরতাগুণ আশ্রয়লব্ধ গুণান্তরের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় ভাল প্রকাশ পায়না। এস্থলে রাসায়নিকযোগে তাহার তিরোধান হওয়ায়, মধুরতার তীব্রতা হয়। যদি সন্দেশের চিনি, ছানা হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহার মুখ্য আস্বাদ বড়ই মিষ্ট বোধ হইবে বৈকি।

জলের স্পর্শ স্বভাবতঃ শীতল, তবে তেজের সম্পর্কে উষ্ণ হয়।

পৃথিবী প্রভৃতির নৈমিত্তিক দ্রবত্ব হইতে পারে, কিন্তু জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক।৩৯।

নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্। ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদির্বিষয়ো মতঃ॥ ৪০॥

বিষমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ—প্রথমোক্ত পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্যতাদি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "নিত্যানিত্য চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥" ইত্যাদিবৎ জলও নিত্য প্রভৃতি হইবে। ২। রসনম্—রসনা—জিহ্বা। ৩। হিমাদিঃ—আদিপদে বিল, খাল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় এবং করকা (শিল) প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ। পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্যত্বাদি; কিন্তু জলীয়-দেহ অযোনিজ; ইন্দ্রিয় রসনা এবং বিষয় সমুদ্র-হিম প্রভৃতি॥ ৪০॥

বিশদীকরণ। পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্যতাদি। ইহার তাৎপর্য্য—জল-পৃথিবীর অনুভূতি হয়। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীয় বস্তুর গুণ পরিব্যক্ত করে, সে ইন্দ্রিয় সেই জাতীয় বস্তু। সজাতি বস্তু যেমন সজাতি বস্তুর পরিপূরক ও উত্তেজক হয়, সেইরূপ সজাতির গুণ প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—শরীরের জলাংশ ও স্থলাংশ ক্ষীণ হইলে, বাহিরের জলে ও স্থলে সেই ক্ষতির পূরণ হয়; তাই বলি—সজাতি সজাতির পরিপূরক। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে সাগরের জল উত্তেজিত হয়; আবার সাগরের জল উথলিয়া উঠিলে, আমাদের শরীরের জল উত্তেজিত হয়; তাই বলি, সজাতি সজাতির উত্তেজক; তেজঃপদার্থ প্রদীপ তেজের গুণ রূপকে প্রকাশ করে, সেইরূপ তৈজসিক

চক্ষু রূপের প্রকাশক; তাই বলি, যখন সজাতি-বস্তু সজাতি-বস্তুর গুণপ্রকাশক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তখন রসনা জলের গুণ রসকে আস্বাদ করে বিধায়, রসনা জল-প্রধান ইন্দ্রিয় হওয়াই স্বভাবসঙ্গত। ফলকথা, রসনায় রস আছে বলিয়াই রসের আস্বাদ হয়। রস জলেই থাকে, সুতরাং রসনা জলের বিকার।

জলীয় বিষয় সাগর, নদী, বিল, ঝীল প্রভৃতি জলাশয় এবং বরফ-করকাদি। উপভোগ সাধনের নাম বিষয়। জল উপভোগ করিতে হইলে, অর্থাৎ রসনাদ্বারা রস আস্বাদন করিতে হইলে, জলাশয় তাহার সাধন। অতএব জলীয় বিষয় জলাশয়। করকা কঠিন বিধায় পার্থিব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখন করকা প্রলয়-কালে জলে পরিণত হয়, তখন করকা জলীয় পদার্থ। কারণান্তরে উহার দ্রবত্ব প্রতি-রুদ্ধ থাকায়, জল করকা ও বরফ আকারে বিরাজ করে। সূর্য্য-কিরণ ও বাহ্য বায়ুর স্পর্শে যে জল—সেই জল হয় ॥ ৪০ ॥

স্পর্শ উষ্ণঃস্তেজসস্তু স্যাদ্রূপং শুক্লভাস্বরম্। নৈমিত্তিকদ্রবত্বন্তু নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১॥
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নিস্বর্ণাদির্বিষয়ো মতঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শুক্ল ভাস্বরম্—শুক্ল এবং ভাস্বর (দীপ্তিবিশিষ্ট)। ২। নৈমিত্তিক—নিমিত্তাধীন, অস্বাভাবিক। ৩। পূর্ব্ববৎ—জলের ন্যায়।

অনুবাদ—তেজের স্পর্শ উষ্ণ এবং রূপ উজ্জ্বল শাদা। ইহার দ্রবভাব নৈমিত্তিক। নিত্যতাদি প্রভৃতি পূর্ব্বের (জলের) ন্যায়। কেবল ইহার ইন্দ্রিয় নয়ন এবং বিষয় অগ্নি ও স্বর্ণ প্রভৃতি।

বিশদীকরণ। উষ্ণ স্পর্শের সমবায়ী কারণের নাম তেজ, অর্থাৎ যাহার স্পর্শ উষ্ণ, তাহার নাম তেজ। সুশীতল-চন্দ্র-কিরণেও এ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না; চন্দ্রগত জলীয় স্পর্শে উহার উষ্ণতা অভিভূত থাকে। ১৩০১ সালের হিন্দু-পত্রিকায় "বৈধকাল" শীর্ষকপ্রবন্ধে ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে আছে। এইপ্রকার রত্ন-কিরণের উষ্ণভাব পার্থিব পদার্থে তিরোহিত থাকে। চক্ষুও তৈজসিক পদার্থ, উহার উষ্ণতা অনুদ্ভূতরূপতা-বশতঃ অনুভূত হয় না। তেজের রূপ শুক্ল—অথচ উজ্জ্বল। জলের রূপ শুক্ল। পৃথিবীর রূপও শুক্ল হইতে পারে; কিন্তু ভাস্বর নয়—ইহাই তেজের সহিত বিশেষ। লৌকিক অগ্নি যে লাল দেখি, তাহার কারণ লৌকিক অগ্নি পার্থিবরূপে অভিভূত থাকে। মরকত প্রভৃতি রত্নও পার্থিবরূপে অভিভূত থাকায়, শুক্ল বলিয়া অনুভূত হয় না। চন্দ্রকিরণাদিতে আচ্ছাদকের অভাবপ্রযুক্ত শুক্ল-ভাস্বররূপ বেশ প্রতীত হয়।

তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। স্বর্ণাদি তেজঃপদার্থ বিশিষ্ট সংযোগে দ্রবীভূত হয়; অতএব তেজের নৈমিত্তিক দ্রবত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

তেজের নিত্যতা প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী জলের ন্যায়। জল যেমন দ্বিবিধ, তেজও সেই-রূপ দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে নিত্য, দ্ব্যণুকাদিরূপে অনিত্য। অনিত্য

দ্ব্যণুকাদি সাবয়ব। তাদৃশ অনিত্য তেজ ত্রিবিধ,—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। সে শরীর অযোনিজ; যেমন পার্থিব শরীর পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ এবং জলীয় শরীর বারুণলোকে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ তৈজস শরীর সূর্য্যলোকে বিখ্যাত। জলের সহিত বিশেষ এই,—জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা, কিন্তু তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং বিষয় অগ্নি, স্বর্ণ প্রভৃতি। নয়ন যখন পরকীয় গুণ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক না হইয়া, কেবল তৈজসিক গুণ রূপকে অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের ন্যায় তৈজস। প্রদীপ তৈজস পদার্থ, তাই পরকীয় রূপ অভিব্যক্ত করে, স্পর্শাদি অভিব্যক্ত করিতে পারেনা। তেজ ভিন্ন অন্য বস্তু রূপ প্রকাশ করিতে পারেনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সজাতি সজাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভিব্যঞ্জক হয়, ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, সুবর্ণকে তেজঃপদার্থ বলা কিরূপে সঙ্গত হয়। সুবর্ণ ক্ষিতি, অপ্ কেন না হয়? গন্ধের সমবায়ীকারণ পৃথিবী, রসের সমবায়ীকারণ জল। স্বর্ণে গন্ধ নাই, রস নাই, অতএব স্বর্ণ পৃথিবী ও জল নয়; বস্তুগত্যা স্বর্ণ তেজঃপদার্থ।

দ্বিতীয় যুক্তি—বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুর বিপ্রকর্ষক হয়, অর্থাৎ বিজাতি বিজাতির নিকট থাকিতে পারেনা; পরস্পর পরস্পরের হিংসা করে। অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ জাতি। উভয়ে যদি একস্থানে থাকে, তাহা হইলে জল যদি প্রবল হয়, তবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় এবং অগ্নি প্রবল হইলে জল শুষ্ক হয়। উভয়ে তুল্যবল হইলে, পরস্পরের বলক্ষয় হয়, ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষবিষয়।

অগ্নিতে কিছু প্রক্ষেপ করিলে, তাহার পার্থিব অংশ ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় এবং জলীয় অংশ ধূমাকারে মেঘে বিলীন হয়। আগুনে আগুন দিলে, পরস্পরের উপচয় বই অপচয় হয় না। তাই অবিশুদ্ধ (মরা) স্বর্ণ বিশিষ্ট-অগ্নি-সংযুক্ত করিলে, তাহার অবিশুদ্ধ (পার্থিব) অংশ উড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ (খাটি) অংশ পড়িয়া থাকে। সহস্র বহ্নি-সংযোগে বিশুদ্ধ স্বর্ণের তিলমাত্র পরিমাণও লঘু হয় না; কেননা স্বর্ণ যে বহ্নির সজাতি; সজাতিদ্রোহ অস্বাভাবিক। ইত্যাদি কারণে স্বর্ণকে তেজোময় পদার্থ বলা হইয়াছে।

বস্তুান্তরে প্রতিহত হওয়া প্রযুক্ত চন্দ্রকিরণের উষ্ণতা যেমন সাধারণের অনুভূত হয়না, সেইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণেও উষ্ণতা অনুভূত হয়না। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে আর বিস্তৃত করিলাম না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শৌচাচার।

'শৌচাচারপরো যস্তু স মুক্তো ঘোরকিল্বিষ'ৎ।"

আমাদের দেশে লোকে যাহাকে "শুচি-বায়ু" বলে, তাহা শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারের অমিত ব্যবহার ও অপব্যবহার মাত্র। যথা 'চাল-গোবর-দেওয়া'—'দুয়ার-কাচা' প্রভৃতি অনেক স্থলে অমিত ব্যবহার এবং অধিক জল বসাইয়া রোগ আনা ও অতিশৌচসেবাজনিত অনবকাশফলে কর্ম্ম-হানি প্রভৃতি অপব্যবহার। এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সংযত স্বাস্থ্যকর পবিত্রতার ভাব ও ক্রিয়া, তাহাই শৌচাচার। ইহাতে সন্দিগ্ধতা নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, প্রমাদ নাই; ভিন্নধর্ম্মী বা ভিন্নসামাজিকের প্রতি বিরক্তি-বিদ্বেষ নাই; আছে কেবল প্রশস্ততা, প্রসন্নতা, অন্তর্বাহ্য-স্বাস্থ্যকরতা—এক কথায় সাত্ত্বিকতা। শৌচাচার এরূপ পরমপদার্থ হইলেও, অধুনা আমরা তাহাতে শোচনীয়রূপে উদাসীন। একমাত্র ভৌতিক পরিচ্ছন্নতার কথঞ্চিৎ প্রিয়তা ব্যতীত আমরা শৌচাচারের আর বড় ধার ধারি না। সে পরিচ্ছন্নতাও সূক্ষ্ম রসায়ন-বিজ্ঞানাদির অনুমোদিত যত না হউক, স্থূল-দৃষ্টি-পূত হইলেই হইল। ধূল-বালি, ঝুল-কালী, ময়লা-মাটি প্রভৃতির স্থূল পরিহারেই আমাদের সে শৌচাচার-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত। এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মাত্রকেই পর্য্যাপ্ত বোধের ফলে এই টুকুতেই এক্ষণে আমাদের শৌচাচার পর্য্যবসিত!

যে শৌচাচারের অতুল্য উপকারিতা, অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপূর্ব্ব-গৌরব শাস্ত্রে তার-স্বরে কীর্ত্তিত, মাত্র শাস্ত্র-সেবার অভাবেই আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আরও কতকগুলি অবান্তর কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সে সব উহারই প্রসূত, প্রতীয়মান হইবে। কালের গতি, কলির ধর্ম্ম, পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফল, ইত্যাদি অনেক কথাই ঐ কারণেরই রূপান্তর—ভাবান্তর মাত্র। ফলে শাস্ত্রীয় শৌচাচারের অধিকারানুযায়ী যথাসম্ভব সেবা-সঙ্কোচেই আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় দুর্গতির সমগ্র রহস্য নিহিত। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাউক।

শাস্ত্র বলেন,—শৌচ দ্বিবিধ,—অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ; অর্থাৎ জল মৃত্তিকাদি দ্বারা ভৌতিক শুচিতা-সম্পাদন বাহ্যশৌচাচার ও চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধন অন্তঃশৌচাচার। আবার এতদুভয়ের মধ্যে জন্য-জনকতা সম্বন্ধ বা পরস্পর সাপেক্ষতা রহিয়াছে। বাহ্যশৌচের ফলে যে সত্ত্বগুণোদ্দীপন, তাহাও যেমন চিত্তশোধনের সহায়, আবার শুদ্ধচিত্ততার ফল যে সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তি বা রুচি, তাহাও তেমন বাহ্যশৌচের নিয়ন্ত্রা। অতএব অধিকার-ভেদ-জনিত প্রকারভেদে উভয়বিধ শৌচাচারই হিন্দুর অবশ্যসেব্য।

উচ্চাধিকারীগণের যদিও অন্তঃশৌচেই মুখ্য লক্ষ্য এবং বাহ্যশৌচে গৌণ লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি লোক-শিক্ষার্থে নিষ্কামভাবেও বাহ্যশৌচানুষ্ঠান, তাঁহাদেরও

অবশ্য কর্ত্তব্য ; নচেৎ মহদনুকরণ-প্রিয়তার নৈসর্গিক নিয়মে নিম্নাধিকারীগণ "ইতোনষ্ট-স্ততঃ ভ্রষ্টঃ" হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

মহত্তের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয় ॥

স্থানান্তরে কহিয়াছেন :—

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্"

কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ না করিবে। নিজে কর্ম্ম করি জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মে নিয়োজিবে ॥

অতএব উচ্চাধিকারী জ্ঞানীরাও লোক-শিক্ষার্থ অন্তরে নির্লিপ্ত—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য থাকিয়াও বাহিরে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম—আচার-ব্যবহার রক্ষা করিবেন; বিশেষতঃ সর্ব্বভূতসেবক গৃহস্থাশ্রমী এ শাস্ত্রানুশাসনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, গৃহীর পক্ষে এ উপদেশের উপেক্ষা পাশ্চাত্য দার্শনিকের "Utility"তত্ত্বেরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনাদিতে শিক্ষিত—অথচ আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তিমান ও তদালোচনাকারী মাত্রেই বুঝেন যে, পাশ্চাত্য সমাজের এত আদরের 'হিতবাদ' তত্ত্বের দুরধিগম্য অন্তস্তলেও আর্য্য-শাস্ত্রীয় শৌচাচার-বিধি প্রবেশ করিয়াছে। যে শিক্ষার অপব্যবহার আর্য্য-শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সত্যজ্যোতিঃ আচ্ছাদন করে, তাহারই সুব্যবহারের ফল আর্য্যশাস্ত্রসেবায় নিযুক্ত হইলে, আর "আলো-আঁধারি" লাগার ভয় থাকে না। অতএব ইহা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, আর্য্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইলে, তদ্বিহিত শৌচাচার সর্ব্ববিধ অধিকারীর পক্ষেই যথা-প্রয়োজনীয়রূপে সুখকর ও সুকর হয়।

শৌচাচারের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহা 'স্বয়ং-প্রমাণ'। অন্য শতসহস্র যুক্তি-তর্ক-পরীক্ষিত প্রমাণ থাকিলেও, অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা নাই। যে একবার যে কোন শৌচাচারে আনুষ্ঠানিক হইয়াছে, সে আর তাহা ছাড়িতে পারে না—ছাড়ে না। কিছু দিন পরে ছাড়ার কল্পনা মনে আনিলেও যেনকেমন—কেমন লাগে! দু-একটা স্থূল সাধারণ আচার-অভ্যাসের দৃষ্টান্তই কল্পনা করুন; যথা দশ দিন পর্য্যন্ত কেহ পায়খানায় যাওয়ার বস্ত্রাদি সহ অন্নাদি-গ্রহণ ত্যাগ করিলে বা প্রস্রাব-ত্যাগান্তে জল-শৌচাদি গ্রহণ করিলে, এগার দিনের দিন তদন্যথার কল্পনা-তেও কেমন-কেমন লাগিবে। শৌচাচার-জনিত পবিত্রতার অনুভূতিই মনুষ্যত্বের সারস্বরূপ সাত্ত্বিকভাব-সঞ্চার সূচনা করে। বাস্তবিক সাধারণ শৌচাচার মানবদেহীর পক্ষে—সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধর্ষি-সেবিত শৌচাচার হিন্দুর পক্ষে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—উভয়বিধ মঙ্গলের নিদান। শৌচাচারের স্বয়ংপ্রমাণত্ব এই কারণ-সম্ভূত। মাত্র পরীক্ষার্থ আচার-পরায়ণ হইলেও বাঁধা পড়িতে হয়! প্রয়োজনীয় বস্তু পাইলেই প্রকৃতি তাহা আত্মসাৎ করিয়া লয়। ইহাই প্রকৃতির প্রবৃত্তি—ইহাই সত্যের সর্ব্ব-বিজয়িনী শক্তি।

শৌচাচার সম্বন্ধীয় আর্য্য-শাস্ত্রের উক্তিগুলিতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইহারা সকলেই অবিসংবাদিতরূপে 'শৌচাচার' 'সদাচার' 'আচার' 'আচারধর্ম্ম' ইত্যাদি শব্দে ঐ তত্ত্বেরই মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, মানুষের যাহা কিছু আবশ্যক, মানুষের প্রাণের যে কিছু প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা, তৎসমস্তেই অধিকার ও প্রকার-ভেদে শৌচাচারের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের বাক্য-বাহুল্য বিস্তার না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্ররাজ মনুর একটি মাত্র উক্তি দেখিলেই ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
আচারেতে আয়ু আর সুযোগ্য সন্তান পায়। আচারে অক্ষয় ধন, অলক্ষণ দূরে যায়॥"

আচার সম্বন্ধে এবম্বিধ প্রমাণসমূহ আর্য্য-শাস্ত্রের যেখানে সেখানে বহুলভাবে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এমন যে অতি প্রয়োজনীয় আচারধর্ম্ম,—সর্ব্বপ্রয়োজনসাধনের মূলীভূত প্রয়োজনীয় আচারধর্ম্ম, তাহাতে আমাদের উপেক্ষা ও ঔদাস্য কমিয়া, যত শ্রদ্ধা ও আনুষ্ঠানিক দৃঢ়তা বাড়িবে, আমাদের জাতীয় অবস্থা ততই শনৈঃ শনৈঃ অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইবে। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" বেদসকল আচারহীনকে পবিত্র করেন না। অনাচারের দোষে যে শাস্ত্রানুশাসনের বহির্ভূত হয়, তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? "শৌচাচারবিহীনস্য প্রেত্যচেহ বিনশ্যতি" শৌচাচারহীনের ইহকাল-পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়। অকালমৃত্যুর হেতুনির্দ্দেশস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি।"
বেদশাস্ত্র-অনভ্যাস, আচার-বর্জ্জন। আলস্য ও অন্নদোষে মরে বিপ্রগণ।

মনুর মতে এই কয়টি অকালমৃত্যুর কারণ। এস্থলে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রহ্মণ্যগুণ-প্রয়াসী সাত্ত্বিকতাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে আচারধর্ম্মের দৃঢ়তা ও সতর্কতা বিধানার্থ 'বিপ্রান্' (বিপ্রগণকে) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব দেখুন, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বশাস্ত্রবিহিত আচার ব্যতীত সে জাতি জীবিত থাকিতে পারে না। যে জাতি অপর প্রবলতর জাতির আততায়িতায় থাকিয়া আপন আচার ছাড়িয়াছে, সেই জাতিই ক্রমে সেই প্রবলতরে মিশ্রিত—বিলীভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান মর্ত্ত্য-মানবসমাজও ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগত সত্যই সমষ্টিভাবে জাতিগত হয়। বিধির বিধানে এখন ত এজাতি মৃতবৎ; সজীবতার পরিচয় কতটুকু? প্রকৃতি যেন জাতিটাকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসন্নতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; শনৈঃ শনৈঃ জাতিটা যেন ধ্বংসপুরীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। মৃত্যুর কালিমচ্ছায়া যেন জাতিটাকে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে। ভগ্নগণ্ড, মগ্ননেত্র, মলিনমুখ, দুর্ব্বলদেহ হিন্দু-মূর্ত্তি, হিন্দু-ভূমির সর্ব্বত্রই—হিন্দুভূমিময় দৃষ্ট হয়। তবে একথ

সমাজবদ্ধ গৃহী-মানবমণ্ডলীর পক্ষে ঠিক বটে; কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী বিজনবাসী ঋষিদের পক্ষে নহে। কলিতে সিদ্ধি ধর্ম্ম আছেন, সুতরাং সিদ্ধি ঋষিও আছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকার-ভেদে—প্রস্থান-ভেদে যেরূপ শৌচাচার থাকুক না কেন, কিন্তু সমাজবদ্ধ বিরাট গৃহী-মানবমণ্ডলীর সমাজ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যথাশক্তি—যথাসম্ভব শৌচাচারপরায়ণ হওয়া উচিত; তদ্ভিন্ন মনু-বাক্যানুসারে মনুষ্য জীবনের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় না হইলে, আমরা আমাদের সত্ত্ব ও বিশেষত্ব-রক্ষক আচারধর্ম্মে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারি না। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্নধর্ম্ম-অবলম্বীদের আর্য্যশাস্ত্রীয় শৌচাচারের জন্য তত আসে যায়না বটে, তথাপি সমগ্র মানবসমাজই আর্য্যঋষিদের চরণে (প্রত্যক্ষভাবে যত না হউক) পরোক্ষ ও পরম্পরাভাবেও বিশেষ ঋণী; সুতরাং হিন্দুদের আর কথা কি? তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই আর্য্যঋষিদের শাস্ত্রে পাইবেন; উহা কল্পভাণ্ডার!

আর্য্যঋষিগণ যোগ-সিদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে এই বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; একথা এখন পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায়গণও অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন। আর্য্যঋষিগণ শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিকতত্ত্ব, ইত্যাদি সারতত্ত্বগুলির রাসায়নিক মন্থনোৎপন্ন নবনীতসদৃশ এক একটি আচার-বিধি আমাদিগকে কৃপা উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমরা অধিকার ও প্রকারভেদে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুরূপ শৌচাচারসেবার দ্বারাই সে নবনীতের অবিকৃত আস্বাদ ও উপকারিতা পাইতে পারি; নচেৎ অচারভ্রমে কুসংস্কারের সেবায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। এক-পক্ষে যেমন যুক্তি-প্রমাণ-পরীক্ষিত, আর্য্যঋষিগণের প্রকৃতঅভিপ্রায়-অনুস্যূত শাস্ত্রোক্ত সদাচারগুলি জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যসাধনের সাহায্যস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে, অপরপক্ষে তদ্রূপ কুব্যাখ্যা-কল্পিত—প্রমাদ-প্রচলিত শাস্ত্রোপেক্ষা-সম্ভূত আচারের ছদ্মবেশধারী কুসংস্কারসমূহ অনাচাররূপ—অমঙ্গলরূপ জানিয়া পরিহার করিতে হইবে। যাহা সদাচার—শৌচাচার, তাহাতেই সংস্কার; যাহা অনাচার—কুসংস্কার, তাহাতেই সংহার! শৌচাচারের জয় হউক; ভগবান্ আমাদিগকে সংহার হইতে রক্ষা করুন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

মূর্ত্তিপূজা। *

(সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা।)

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে "মূর্ত্তিপূজা" বিশেষ আপত্তি-জনক অনুষ্ঠান বলিয়া অনেকের নিকট বিবেচিত। যদিও কিছুদিন-পূর্ব্ব অপেক্ষা সে ভাবের অধুনা ক্রমে কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তথাপি নব্যশিক্ষিতসমাজে এখনও তাহার প্রবলতা রহিয়াছে। এজন্য মধ্যে মধ্যে এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনা আবশ্যক। 'মূর্ত্তিপূজার' স্বাভাবিকতা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝাইবার জন্য এযাবৎ অনেকে অনেক বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনা করিয়াছেন। যত হয়, ততই ভাল। এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করা যাইবে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সাকারোপাসনাকে নিরাকরণ করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম এতদ্দেশে প্রচার জন্য খ্রীষ্টান মিসনরীগণ সভার বক্তৃতামঞ্চে বা উন্মুক্ত রাজপথে বক্তৃতা করিয়া ও হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার বীভৎস নিন্দাপূর্ণ পুস্তিকাদি প্রচার পূর্ব্বক নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন। তদ্ব্যতীত হিন্দুকুলোৎপন্ন কয়েকটি প্রাণীরও তদ্বিষয়ে প্রাণপণ-যত্ন আছে। হিন্দুসমাজস্থ হিন্দুসন্তানও অনেকে সেই স্রোতের টানে পড়িয়া মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যবনাধিকারকালে মাত্র রাজশক্তির ভৌতিক পরাক্রম-সাহায্যে যবন কর্ত্তৃকই সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ও মূর্ত্তি-পূজার উপর আক্রমণ হইত; কিন্তু তখন হিন্দুবংশীয় প্রায় কেহই স্বেচ্ছায় স্বধর্ম্ম-বিদ্রোহী হইত না; এখন কিন্তু তদ্বিপরীত! এখন রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া, খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ যতটুকু কৃতকার্য্য হইতেছেন, হিন্দুসমাজ-ভ্রষ্ট ও হিন্দুসমাজস্থ অহিন্দুগণের চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক ফলবতী। তাঁহাদের আক্রমণ অধিক আপাত-সাংঘাতিক; ফলে কিছু নয়।

আজকাল কিয়দংশে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অনুষ্ঠানে তত না হইলেও, মতবাদে অনেকটা হইয়া উঠিতেছে। মূর্ত্তি-পূজার অনুকূল আলোচনাধিক্যই তাহার প্রমাণ। সত্য অগ্রে মন অধিকার করিয়া, পরে কার্য্যে প্রকাশ পায়। অতএব বর্ত্তমান সমাজের মন-প্রস্তুতির জন্য তদ্বিষয়ক আলোচনা এক্ষণে যত হয়, ততই মঙ্গলের কারণ।

খ্রীষ্টানমিসনরীগণ (সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইলেও) কোন বিচার-বিতর্ক না করিয়া, কেবল যেন স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধেই হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমানগণ যদি একটু প্রশান্ত ধৈর্য্যের সহিত চিন্তা করেন, তবে বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের যত আক্রমণ কেবল

* " National Magazine" নামক একখানি ইংরাজি সাময়িকপত্রে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের লিখিত "Idolworship" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারই ভাবানুসারে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিখিত।

মূর্ত্তি-পূজার ভৌতিক সত্তার উপরে, কিন্তু ভাবের বহুদূরে! যাহাহউক, আমরা খ্রীষ্টান ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্বে কোন দোষারোপ না করিয়া, মাত্র বিনীতভাবে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহাদের ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত নিম্নতম সোপানস্থ 'বাহ্য-পূজা' অপেক্ষাও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

কোন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান 'উপাসনা'-অর্থে কি বুঝেন? উপাসনা কি কেবল কতিপয় মন্ত্র-পাঠ বা প্রার্থনা-প্রকরণেই পর্য্যবসিত? ঈশ্বর আমাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ এবং আরো দিবেন, এই আশায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণে স্তুতিমাত্র করাই কি উপাসনা? অবশ্য তাহা নহে। "ঈশ্বরপুত্র" আখ্যায় অভিহিত খৃষ্টীয় জগতের আদর্শপুরুষ ও ধর্ম্মগুরু স্বয়ং যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, "ভক্তিমান্ দরিদ্রেরাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদিগেরই জন্য। তাহারাই ধন্য, যাহারা সাধুতার জন্যই ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারাই পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারাই ধন্য, যাহাদের চিত্তদর্পণ নির্ম্মল, কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। অতএব তোমরা পূর্ণতম স্বর্গীয় পিতার ন্যায় পূর্ণতা লাভ কর।" এই বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পূর্ণ আদর্শ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তৎস্বরূপতা লাভের চেষ্টাই উপাসনা। * যদি মনে মুখে ঐক্য না থাকে, তবে মাত্র মুখের বাঙ্ময়-প্রার্থনায় উপাসনার প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না। আদর্শানুরূপ হইতে যাওয়া কেবল মুখের কথার কর্ম্ম নয়। প্রকৃত উপাসক উপাস্যের আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তদনুরূপভাবে আত্মগঠন করিতে চেষ্টা করেন। কখনও তিনি প্রেম-ভক্তিতে উচ্ছলিত-চিত্ত হইয়া, উপাস্যের ভাবে বিভোর হন। প্রার্থনাদি আর কিছুই নহে; সাধকের ভাবোদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের উচ্ছলিত অংশই ভাষাদ্বারা বাহিরে আসিয়া পড়িলে, তাহাই কখনও স্তুতি, কখনও গীতি, কখনও প্রার্থনা—কখনও রূপবর্ণনা ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। উহাতে উপাস্যের আদর্শত্ব হৃদয়ে আয়ত্ত, ঘনীভূত ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে থাকে। উপাসনার যত কিছু অঙ্গ, সমস্তই কেবল ভগবৎভাবানুবন্ধের পোষক মাত্র। আভ্যন্তরিক ভাবসাধনই উপাসনার মুখ্য লক্ষ্য।

মনে করুন, কোনও খ্রীষ্টীয় সাধক উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! তুমি দয়াময়" অথচ দয়া-ভাবদ্যোতক কোন মূর্ত্তি তাঁহার ভৌতিক নেত্রের সম্মুখে নাই। কিন্তু তথাপি যদি তিনি অকৃত্রিম উপাসক হন, তবে তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাষার অতীত—চিত্রবিদ্যার অতীত এক অপূর্ব্ব দয়ার আদর্শ ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রকটিত হইবে! এবং সাধকও সেই আদর্শানুরূপ আত্মগঠন করিয়া, নিজে দয়াময় হইতে

* আর্য্যশাস্ত্র বলেন উপ—সমীপে, আসনা—বসা; অর্থাৎ "উপাসনা" অর্থে ঈশ্বরের কাছে বসা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ আর কি হইতে পারে?

ইচ্ছুক হইবেন। আর যদি কেহ মুখে মাত্র এই কথা বলিয়াই অবসর লন, তাঁহার উপাসনা ব্যর্থ হইবে; তিনি আদর্শ উপাস্যের দিকে তদ্দ্বারা এক অঙ্গুলিও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

সাধকগণের বিভিন্ন রুচি ও অধিকার অনুসারে উপাস্য-আদর্শের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়। নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারীর উপাস্য আদর্শতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া "বেনা বনে মুক্তা বোনা" মাত্র। "আত্মবৎ সেবা"ই স্বভাব-সংসিদ্ধ। যে যেমন প্রকৃতিধারী, তাহার উপাসনাও তদ্রূপ। অসভ্য, আমমাংসাশী দ্বীপনিবাসী ঘোর তামসিক মনুষ্যের আদর্শ-ঈশ্বরও বিকট—বীভৎস শক্তিসম্পন্ন ভূত-প্রেতমাত্র।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥"
সাত্ত্বিকেরা পূজে দেব, যক্ষ-রক্ষ রাজসেরা।
ভূত-প্রেত প্রভৃতিরে পূজা করে তামসেরা॥

কোন জ্ঞানী কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছেন যে,—

মহিষের যদি ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত, তবে সে ভাবিত, ঈশ্বর একটা প্রকাণ্ড মহিষ! তিনি প্রকাণ্ড শৃঙ্গ আন্দোলন করিয়া, স্বর্গের মাঠে ঘাস খাইতেছেন। ফলে অধিকারভেদানুসারে বহুবিধ ঈশ্বরাদর্শ বহুবিধ প্রণালীতে উপাসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ফলপ্রদ। এক "হরি বৈদ্যের হরীতকী ও সোণামুখী-বাটা" সকল রোগে খাটে না। সেই নিরাকার—নির্গুণ—নিরুপাধিক বৈদান্তিক ব্রহ্মের ভাব অধুনা কয়জনে বুঝিতে পারে? যাহার কিছুই মর্ম্মগ্রহ—কিছুই রসাস্বাদ হইল না, মন-প্রাণ দিয়া তাহার ভজনে মজিয়া যাওয়া কদাচ সম্ভব কি? নিরাকার উপাসনার অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া, প্রায়ই "ইতোনষ্টস্ততঃভ্রষ্টঃ" হইতে হয়। এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ জগতে সসীমত্ব বা সাকারত্বের হাত এড়াইতে না পারিলে আর নিরাকার ভজনের আশা নাই।

বিধাতা যেমন অদন্ত শিশুর জন্য দুগ্ধ দিয়া, সদন্ত মানবের পক্ষে অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ জ্ঞান-জগতে শিশুবৎ নিম্নাধিকারীগণের জন্য স্থূল "বাহ্যপূজার" বিধান করিয়া, অধ্যাত্মজ্ঞানী উচ্চ সাধুর জন্য "মানস-পূজা"র বিধি দিয়াছেন। ফলে মানসপূজাও নিরাকারের পূজা নহে। মনোমন্দিরে আদর্শ উপাস্যমূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক মনোজগতের উপকরণে তাঁহার সেবা করাই মানসপূজা। প্রত্যেক বাহ্য-পূজানুষ্ঠানেই সর্ব্বাগ্রে যে মানস-পূজার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তদালোচনাতেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিশুর আদর্শ বৃদ্ধের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, বৃদ্ধের আদর্শ শিশুর কাছে নিরর্থক। মূর্খের আদর্শ জ্ঞানীর কাছে অকিঞ্চিৎকর, জ্ঞানীর আদর্শ তদ্রূপ মূর্খের কাছে নিরর্থক।

অধিকারাতীত উচ্চ আদর্শ আলম্বন-চেষ্টায় কোন ফল নাই। লম্ফ দিয়া বৃক্ষাগ্রে উঠিতে গেলে, পা ভাঙ্গিবারই সম্ভাবনা। অন্তরে স্বাভাবিক উপযোগিতা না থাকিলে, কেবল বাহিরের অনধিকার চর্চ্চায় "হিতে বিপরীত" হয়! ইট্‌ মারিলে, পাটকেলে প্রত্যুত্তর দেওয়া যাহার প্রবৃত্তি, "বাঁ গালে চড় মারিলে, ডাইন গাল বাড়াইয়া দেও" উপদেশটি কি তাহার পক্ষে উপহাসের নহে? যে ব্যক্তি স্বপরিবার ও স্বজাতির প্রতি দয়া করিতেও পরাঙ্মুখ, তাহাকে নিকৃষ্ট প্রাণীগণকে দয়া করিতে শিক্ষা দেওয়া কি বিড়ম্বনা নহে? অতএব সর্ব্বঅধিকারাতীত নিরাকারতত্ত্ব সাকার-সর্ব্বস্ব সাধকের কোন কাজে আসে না। যদিও কেহ ভ্রমে, কল্পনায়, হুজুকে বা অনুকরণে পড়িয়া আপনাকে নিরাকারোপাসক জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শে মাটি, ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা রক্ত-মাংস না থাকিলেও, সাকারত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

দৈবপ্রকাশ, আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশ ইত্যাদি বিশ্বাস না করিলেও, কোন না কোনরূপে ঐশ আদর্শ হৃদয়ে স্থাপনের সবল চেষ্টা ব্যতীত উপাসনা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয় মানব সাধনের প্রথমাবস্থায় সে অনন্তস্বরূপের কতটুকু অংশ আপন সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে? সুতরাং তাহার উপাস্য-আদর্শ পরিমিত—সান্ত হইলেই, তাহা উপাসনার প্রথম সোপানস্থল মূর্ত্তিপূজারূপে পরিণত হয়। তবে কিনা, সে মূর্ত্তিপূজা ভৌতিক উপাদানময় মূর্ত্তিপূজা না হইয়া, শব্দময় বা ভাবময় মূর্ত্তিপূজা হইতে পারে; কিন্তু তাহাহইলেও, সেই অন্তঃসাকার বহির্নিরাকার উপাসনার আদর্শ-আয়ত্তীকরণ সহজ হয় না। এই জন্যই অকৃত্রিম উপাসকের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত মূর্ত্তিপূজা তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফলবতী।

ভক্তির স্বাভাবিক শক্তিতেই ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুকরণপ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ত্রিবিধ ভক্তির ফলে ত্রিবিধ উপাসনা গীতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য আদর্শের আয়ত্তীকরণ তত্তৎ প্রণালী অনুসারেই হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যই পরস্পর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায়, প্রত্যেকের আদর্শ কিছু না কিছু ভিন্নত্বযুক্ত হইবেই; সুতরাং কাহারও উপাস্য আদর্শ অপরের অবিকল অনুরূপ না হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত মূর্ত্তি পূজায় "প্রতিমায়াং ঘটে পটে" স্থূল-মূর্ত্তি-ধ্যানের বিধান থাকায়, অনেক উপাসকেরই পরস্পর ভাব-সহানুভূতির ফলে উপাস্য-আদর্শের অভিন্নত্ব স্থূলতঃ সম্পাদিত হইয়াছে। হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা আর অধিক কি, বরং এ উপায়ের অভাব নিবন্ধন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী উপাসকগণের অন্তরে অন্তরে অনন্তকোটি দেবতার অস্ফুট ও বিশৃঙ্খল আগম-নিগম কল্পিত হইতে পারে! তাহাহইলে এক একটি মানুষের এক একটি স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়! আবার

সেই একটিও সর্ব্বদা একরূপ নহেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-গুণ ধারণ করেন। অবশ্য বাহিরে (মতবাদে) এক নিরাকার, কিন্তু অন্তরে অনন্ত সাকার! অন্তর্ব্বাহ্যে একীকরণ ভিন্ন কোন বিষয়েরই স্থিরত্ব সম্পাদিত হয় না; আবার স্থিরত্ব ভিন্ন ভাবের গাঢ়ত্ব ও ভক্তির দৃঢ়ত্বও সম্ভাবিত নহে। ভরসা করি, চিন্তাশীল ধীমান্‌ মাত্রেই বুঝিবেন যে, এই কারণে আর্য্যশাস্ত্রে স্থূলমূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার বিধান। ভগবান স্বীয় জগদ্বীজরূপিণী প্রকৃতির এই নিয়ম রক্ষার্থ সাকারভাবেই সাধককে কৃপা করেন; শাস্ত্র তাহার ভূরি বর্ণনা করিয়াছে, এবং এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

যাহা এক, তাহা নিরাকার হইতে পারে; যাহা বহু, তাহা সাকার না হইয়া পারে না। একে অসীমত্ব সম্ভবে, কিন্তু সসীমত্ব ভিন্ন "বহু" সৃষ্টি অসম্ভব। স্থূল-দর্শন-স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া ভিন্ন সাকারত্ব অলীক, ইহা অদার্শনিকের উক্তি মাত্র। বস্তুতঃ সসীমত্ব ও সাবয়বত্ব এক কথা। সসীমত্ব ব্যতীত যেস্থলে বহুত্ব অসম্ভব, সেস্থলে "বহু" মাত্রই সাবয়ব বা সাকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব "একোহহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে এক ঈশ্বর বহু হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। মায়াদ্বারাই ব্রহ্মের বহুত্ব কল্পিত হইয়া সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। বহুত্বই মায়া ও মিথ্যা, একত্বই ব্রহ্ম ও সত্য, ইহাই বেদান্ত বা উপনিষদের সার-রহস্য। এক্ষণে দেখুন, আমরা মায়া-ভ্রান্ত জীব হইয়া বহুত্ব বা সাকারত্বের হাত এড়াইব কিরূপে? উপাস্য-উপাসকের দ্বৈতভাব স্বাভাবিক। দ্বৈত হইতেই বহু বা অনেক উৎপন্ন এবং অদ্বৈতই এক। অতএব উপাসনা করিতে হইলে, দ্বৈতত্ব, বহুত্ব, সসীমত্ব, সাকারত্ব পরস্পর অভিন্ন হইয়াই উপাসকের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করে। বিষয় বড় জটিল, কিন্তু দার্শনিক ধীষণা সহযোগে আর্য্যশাস্ত্র আলোচনা করিলে, নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, মূর্ত্তি-পূজা বা সাকারোপাসনা ব্যতীত উপাসকের পিপাসার পূর্ণপরিতৃপ্তি কদাচ সম্ভাবিত নহে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যে উপাসনা করেন, তাহাও প্রকারান্তরিত মূর্ত্তি-পূজা, সন্দেহ নাই। যেখানে উপাসনা, সেইখানেই উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতভাব, যেখানে দ্বৈত, সেখানেই বহুত্ব বা অনেকত্ব; যেখানে অনেকত্ব, সেখানেই সসীমত্ব; যেখানে সসীমত্ব সেইখানেই সাকারত্ব।

খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি উপাসকের সম্মুখে কোন ভৌতিক-মূর্ত্তি সংস্থাপিত না থাকিলেও, আত্মাদর্শের সসীমত্ব জনিত মনোময় বা ভাবময় মূর্ত্তি কোথায় যাইবে? যদি কেহ তাহা অস্বীকার করেন, তাঁহাকে বাস্তবিক নিরাকার-উপাসক বা শূন্যোপাসক বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 'বাতাস-খাওয়া' 'আছাড়-খাওয়া' বা 'খড়িকা-খাওয়া, ইত্যাদি খাওয়ায় যদি কাহারও পেট ভরে, তবে আর তাহার আহার্য্য-সংগ্রহের আবশ্যকতা কি?

এক্ষণে দেখা যাউক, ভৌতিক-মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনায় কৃতকার্য্যতা অধিকতর সম্ভাবিত কি না? খ্রীষ্টান মিসনরীরা সোজা সিদ্ধান্তদ্বারা বলেন যে, "হিন্দুরা স্বহস্তে মূর্ত্তি গড়িয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা হয়! আবার তাহারই পূজা করে! কি নির্ব্বুদ্ধিতা!" কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতাটা কোন্ দিকে? বুদ্ধিমান্ বুঝেন যে, ভাব না বোঝাই নির্ব্বুদ্ধিতা। যে সমস্ত ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব স্তব, স্তুতি, মন্ত্রাদি, মৃন্ময়াদি মূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা কি তত্তৎ মূর্ত্তির জড়ীয় উপাদানকে উদ্দেশ করে মাত্র? এত বড় স্থূল কথাটাও যে আবার বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য ও কালমাহাত্ম্যের ফল মাত্র। বুদ্ধিলেশশূন্য নিতান্ত পাগল ভিন্ন কোন অসভ্য বন্য মানবও বোধহয় আপন আয়ত্তাধীন কোন জড়সত্তা মাত্রে ঈশ্বর-বুদ্ধি কবিতে পারে না। অবলম্বন যে কোন জড়সত্তা হউক, কোন না কোনরূপে তৎসংসৃষ্ট কোন না কোন চিৎ-সত্তা তাহার উপাসনার লক্ষ্যস্থল হইবেই। জড়-প্রতিমাবলম্বী হিন্দু পূজকের লক্ষ্য যে কিরূপ পূর্ণ জ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা-স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান চিৎসত্তায় সন্নিবিষ্ট, তাহা তাঁহার শাস্ত্র, ব্যবহার ও পূজা-প্রণালী আলোচনা দ্বারা ই জ্ঞাতব্য।

আর একটি কথা বিশেষ বিবেচ্য। শব্দ কি সাকার নহে? উহাও ভৌতিক ও সসীম, সুতরাং একভাবে সাবয়ব বা সাকার। উহাদ্বারা যখন ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে, তখন উহা ঈশ্বরের শাব্দিক-মূর্ত্তি সন্দেহ নাই। "হরি" নাম ভজনে কি হ-অ-র-ই এই বর্ণচতুষ্টয়ের ভজন হয়, না ঐ চতুর্ব্বর্ণ সংস্কার-সম্বদ্ধ কোন চিৎসত্তার ভজন হয়? অবশ্য শেষেরটিই সত্য। তবে "হরি" এই শব্দটি ঈশ্বরের একটি মূর্ত্তিস্বরূপ সন্দেহ নাই। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" "অভেদ নাম-নামিনঃ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যও এই সত্য-নিহিত। উচ্চারিতভাবেও যেমন, লিখিতভাবেও তদ্রূপ। হরির মৃন্ময়াদি মূর্ত্তি দর্শনেও ভক্তের যে ভাবের স্ফুরণ হয়, "হরি" শব্দটি গ্রন্থাদিতে দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ। খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি উপাসকের ঈশ্বরের বর্ণময়ী মূর্ত্তিতে আপত্তি নাই; কারণ তাহাও যদি তাঁহারা ত্যাগ করেন, তবে আর কি লইয়া থাকিবেন? হিন্দুর কেমন পাকা বন্দোবস্ত দেখুন; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত মূর্ত্তিতে তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার উপায় রহিয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য, হিন্দুর সাকারোপাসনার সমগ্র ব্যাপারটা আলোচনা করিলে, সকলেই ইহা বুঝিয়া চমৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত; কেবল বৈদান্তিক অদ্বৈত-জ্ঞানের বিষয়ীভূত। যখন সসীমত্ব বা সাকারত্বের বীজস্বরূপ দ্বৈতভাব বা উপাস্য-উপাসক-ভাব বিলুপ্ত হয়, যখন "সোঽহং" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের সত্য-সম্বোধ জন্মে, যখন শঙ্করাচার্য্যের সেই "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং" অবস্থা উদিত হয়, যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধকের সাকারেই নিরাকারত্ব-পরিণতি হয়, তখনই নির্গুণ-

নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান। উপাসনা সগুণ-ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। "উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়-মানসব্যাপারাণি" শ্রুতি স্পষ্টই একথা বলিয়া দিয়াছেন। সমষ্টিভাবে যিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনিই ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসমন্বিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন। এই প্রণালীতেই তেত্রিশকোটি দেবতার উদ্ভব। নির্গুণ এক ব্রহ্মই প্রকৃতি বা মায়াযোগে সগুণ দুই হইয়া, ক্রমে সগুণ ব্রহ্মা—বিষ্ণু—মহেশ্বর—তিন; ক্রমে পঞ্চোপাসকের পঞ্চ ইষ্টদেব; মুক্তিদাতৃস্বস্বরূপে ঐ পঞ্চই আবার ঐ একস্বরূপ; ক্রমে ক্রমে তেত্রিশকোটিতে সগুণব্রহ্মের ব্যষ্টিভাবগত গুণাবতার দেবত্ব-পরিণতি।

একে তিন, তিনে পাঁচ, পাঁচে পুনঃ এক;
একেতে তেত্রিশকোটি—একেতে অনেক!

হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধির প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তির অভাবেই খ্রীষ্টান মিশনরী প্রভৃতিরা ও পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিভ্রাট-বিকৃত হিন্দুসন্তানেরা হিন্দুকে "পৌত্তলিক" "জড়োপাসক" "বহু-ঈশ্বর-পূজক" ইত্যাদি বিশেষণে নিন্দা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ হিন্দুর উহা 'নিন্দা' বিবেচনা করিয়া অসন্তুষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের ঐ কয়েকটি বিশেষণ সত্য বলিয়া মানিয়া নিতেও কোন আপত্তি নাই—কোন অগৌরবের বিষয় নাই। শব্দে কিছু আসে যায় না; তাৎপর্য্য যিনি যাহা বুঝেন, তাহা লইয়াই বিচার। তবে কি না, নিন্দাকারীদের ভ্রমপ্রদর্শন না করা কর্ত্তব্যের ত্রুটি বটে।

সাকারের সাহায্য ভিন্ন নিরাকারের অভিব্যক্তি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সাংসারিক বহু বিষয়েও ইহার সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত কল্পিত হইতে পারে। মনে করুন, চিন্তাকে যদি নিরাকার বলেন, (সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে তাহাও নিরাকার নহে) তবে একের চিন্তা অপরের গোচর করিতে হইলে, সাকার শব্দ বা লিপি (অক্ষর) ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর আছে কি? যিনি স্থূল আকার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা ফটোগ্রাফ্ বা জীবন-চরিত-পুস্তকাদি সাকার উপায় দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন মিসরের চিত্রাক্ষরের একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। "দ্রুতত্তা" এই শব্দটি বুঝাইতে একটি তীর অঙ্কিত করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল! একটি তীরের মূর্ত্তিমান অঙ্কনেই "দ্রুততার" একটা নিরাকার ভাব পরিষ্কার প্রকাশিত হইল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, ইঁহারা সকলেই নিরন্তর নিরাকার ভাবকে সাকারে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপিতা ইত্যাদি গুণের কোন ব্যাঘাত সম্ভাবিত নহে। একই সময়ে শত-সহস্র স্থানে একই পূজা হইতেছে, অথচ প্রত্যেক পূজকই ঈশ্বরের তত্তৎস্থানগত বিদ্যমানতা যুগপৎ অনুভব করিতেছেন। কেহ ভাবেন না যে, "আমার বাড়ী দুর্গা এসেছেন, সুতরাং ও বাড়ীতে আর যাবেন কিরূপে?

এক দুর্গা একই সময়ে শতসহস্র স্থানে পূজা নিতেছেন, শতসহস্র সাধকের আবেদন শুনিতেছেন, বর দিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিন্দুক বলে "তুমি মাটির দশভুজা পূজিতেছ" হিন্দু জানেন, এই মাটির দশভুজাতেই তিনি অনন্তভুজা ব্রহ্মময়ীকে পূজিতেছেন। শুধু অন্ধ-বিশ্বাসে' জানা নহে, ভক্তি থাকিলে, এই পূজার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। হিন্দুর সাকারোপাসনা আবহমানকাল হইতে—সেই ইতিহাসাতীত সুদূর বৈদিককাল হইতে ভগবানের সনাতন বিধানে সংস্থাপিত চির-পরীক্ষিত পূত সত্য।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাহ্য-প্রতিমাপূজাই যে হিন্দু-উপাসনার সর্ব্বস্ব, তাহা নহে; ইহা সর্ব্বপ্রথম সোপান মাত্র। মানসপূজা উচ্চাধিকারীর জন্য। পুরাণাদি শাস্ত্রে শতসহস্র মানস-পূজক উচ্চাধিকারী ঋষির বর্ণনা রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, মানসপূজা হইলেও, তাহা আধুনিক নিরাকার-উপাসনা নহে, তাহা সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা বা সাকারোপাসনাই বটে। তাঁহাদের বাহিরে জড়মূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়োজন নাই; তাঁহারা চিত্তপটেই গুরুদত্ত মন্ত্রের ধ্যানানুযায়ী ভগবানের অপার্থিব চিদ্ঘনরূপের দর্শন পাইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র উপাসনার চারিটি শ্রেণী বা সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।
উত্তমা মানসীপূজা, সোঽহংপূজোত্তমোত্তমা॥"

হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয় তুল্য। ইহাতে সর্ব্বাধিকারীরই শ্রেণী স্থান রহিয়াছে। ভৌতিক মূর্ত্তিপূজক হইতে আধ্যাত্মিক সোঽহংপূজক পর্য্যন্ত এখানে বিদ্যমান। কাহারই নিরাশ হইবার কথা নাই। ফলতঃ সোঽহংপূজায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত সাকারোপাসনা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও (তাঁহাদের শাস্ত্রের অধিকারানুযায়ী পরিষ্কাররূপ মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থাভাবজনিত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও) প্রকৃতির অনতিক্রম্য নিয়মের ফলে ঈশ্বরের সাকারস্বভাব কোন না কোনরূপে অনুভব না করিয়া পারেন না। খ্রীষ্টানের স্বর্গের সিংহাসন, জগৎপিতা তাহাতে সমাসীন, দক্ষিণে পুত্র যীশুখৃষ্ট, বামে পবিত্রাত্মা, আবার ঈশ্বরাত্মার কপোতমূর্ত্তিতে অবতরণ; অপিচ ঈশ্বরের নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ মানব-সৃজন, এ সব কথায় কি সাকারত্ব আসিতেছে না? মুসলমান শাস্ত্রেও স্বর্গের চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে। মহম্মদ আল্লার দর্শন পাইতেন, তাঁহার সহিত আল্লার কথাবার্ত্তা হইত। কোরাণের প্রথম পুঁথীখানি স্বর্গের লিখিত, খোদা স্বয়ং তাহা পর্ব্বত-গুহায় মহম্মদকে দান করেন, ইত্যাদি বিবরণে মুসলমানের ঈশ্বরের শূন্য-নিরাকারত্ব আর কোথায় থাকে? কেবল 'ব্রাহ্ম' আখ্যাধারী কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অদ্বৈতজ্ঞান-বিষয়ীভূত স্বরূপলক্ষণস্থ খাঁটি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে গরজের দায়ে উপাসনার সগুণক্ষেত্রে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন! সগুণ—নিরাকার,

ইহা দার্শনিক বিচারে "সোণার পাথরের বাটি" বিশেষ। কাজেই অগত্যা "রাতুল চরণ" "প্রসন্নমুখ" "প্রেমঘন রূপ" ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আবার প্রাচীন সাকারোপাসক ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে আধুনিক ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সকলেরই শরণ নিতে হইতেছে। তদ্ভিন্ন উপায় কি? ব্রাহ্মদের মধ্যেও যাঁহারা ধার্ম্মিক, ভাবুক ও ভক্ত হইতেছেন, তাঁহারাও স্ব স্ব সাধনা কোন না কোনরূপে সাকারোপাসনার ভাবে পরিণত করিয়া, একরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সমস্ত বিষয় আলোচনাকারী ব্যক্তি মাত্রেই উহা জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। কোন না কোনরূপ সাকারোপাসনার ভাব ভিন্ন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় টিঁকিতে পারে না। ধর্ম্ম-জগতের পুরাতন ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া "ব্রাহ্ম" আখ্যাধারীদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

উপাসকের জীবনেই উপাসনার সফলতার লক্ষণ লক্ষিত হয়। উপাসনাটি ভগবান গ্রহণ করিলে,—সে আত্মোদ্ধারের আবেদনপত্রে তাঁহার 'সহী-মোহর' পড়িলে, সে উপাসককে আর চিনিতে বাকি থাকে না। তিনি লোকালয়ের লোক হইলে, শীঘ্রই ধরা পড়েন। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার কথা, তাঁহার ভাবভঙ্গি, চাল-চলন, এমন কি—চক্ষের চাহনীটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। প্রেম ভক্তি, পবিত্রতা, ঔদার্য্য, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, দক্ষতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহাতে সান্ধ্য গগনে নক্ষত্ররাজির ন্যায় দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠে! এই ঘোর তামস কলিযুগে—ধর্ম্মের এই অধঃপতন সময়েও সাকারোপাসক হিন্দু-সমাজে এরূপ সাধকের অভাব নাই। ভিন্নদেশী ভিন্ন-ধর্ম্মীরা যাহাই বলুন, কিন্তু দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া, বুঝিয়াও হিন্দুবংশজাত অনেকের মুখে ও লেখনীতে হিন্দুধর্ম্মের—তথা সাকারোপাসনার নিন্দা দুঃখজনক ও বিস্ময়জনক বটে। হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, আর পরাধীন, পরনির্জ্জিত, দুর্ব্বল জাতির কোন বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্ভাবিত নহে, এই বিশ্বাসজনিত অন্ধ-তাচ্ছিল্য বশতঃই বিদেশীয়েরা আমাদের সাকারোপাসনাকে এক কোপে কাটিতে চাহেন। মোট কথা, সকলই বুঝিবার ভুল। আমাদের সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী অন্তরে বাহিরে সাকারত্বময় "অসভ্য-পুতুলপূজা" নহে। নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না; হিন্দুর শাস্ত্র হিন্দুকে তাহা শিখাইয়াছেন; তাই হিন্দুর উপাসনার অপরিহার্য্য আধার বা অবলম্বন সাকার-ভৌতিকত্ব। যাহারা সাকার বাদ দিয়া নিরাকার ধরিতে যান, তাঁহাদের নিরাকার নিরাকারই হইয়া যায়; সুতরাং কিরূপে ধরা যাইবে?

মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়াছেন; আমরাও এবার এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না। উপসংহারে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণের বিশ্বাসানুযায়ী এইটুকুমাত্র নিবেদন যে, বৃথা-তর্ক-তরঙ্গ এড়াইয়া, ভগবানের দিকে একটু রতি-গতি-মতি লাগাইয়া, গুরুমন্ত্র গ্রহণকরতঃ, সাকারোপাসনার পদ্ধতি অনুসারে আপন অধিকার অনুযায়ী সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে, দয়াময় ভগবান্ আপনি দয়া করিয়া সর্ব্বসন্দেহ ভঞ্জন ও সর্ব্বমনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন। তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রাণায়াম।)

(*) দেবাসুরাহবৈ যত্র সংযতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভি ভবিষ্যাম॥

দেবাসুরের সংগ্রাম মাত্র পৌরাণিক আখ্যান নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রতি নিমিষে এই বিশ্বে দেবাসুরের সংগ্রাম উপলব্ধি করিতে পারেন।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ধাতু, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থেই দেবাসুর-সংগ্রাম পরলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, দেবাসুর-সংগ্রামই ব্যবহারিক জগতের কারণ। দেবাসুর-সংগ্রাম না থাকিলে, আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিচ্ছিন্ন সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

উদ্ভিদ্-জগৎ গ্রহণ করুন। ইহাদিগের মধ্যেও এই দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিতে পাইবেন। উদ্ভিদ্-জগতে যেমন কতকগুলি বৃক্ষ-লতা আমরা বিশ্বের মঙ্গলে নিয়োজিত দেখিতে পাই, তেমনই আর কতকগুলি ইহার ধ্বংস-সাধনের জন্যই যেন ব্যাপৃত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির মধ্যে যেরূপ অমৃত-বৃক্ষ আছে, সেইরূপ বিষবৃক্ষও পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি বৃক্ষ যেরূপ সুশীতল ছায়া ও সুমিষ্ট ফল প্রদানে জগতের মঙ্গল সাধন করে, আর কতকগুলি বৃক্ষের ছায়া ও ফলদ্বারা সেইরূপ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্বের ছায়া যেরূপ রোগোপশমকারী, তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়া তদ্রূপ রোগবর্দ্ধনকারী। পর্য্যালোচনা করিলে, এইরূপ বৃক্ষ-লতার মধ্যে দুই শ্রেণীই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহার এক শ্রেণীকে উদ্ভিদ্-জগতে 'দেবতা' ও অপর শ্রেণীকে 'অসুর' বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ্-জগতের এই দেবতাশ্রেণীই মানবের আরাধ্য ও সেব্য বলিয়া আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তুলসী, বিল্ব, বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী প্রভৃতি আর্য্য-প্রদেশে এত আদরণীয়।

উদ্ভিদ্-জগৎ ছাড়িয়া দিয়া পশু-জগতের বিষয় চিন্তা করুন। তাহাকেও এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাইবেন। গোজাতি যে আর্য্যসমাজে এত আরাধ্য, সে কেবল গোজাতি পশু-জগতে দেবতা বলিয়া। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নগণ্য পশুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে পশু-জগতের দেবত্ব ও অসুরত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি যেমন মানবের ধ্বংসসাধনে নিরত, সেইরূপ হস্তী-ঘোটকাদি পশু তাহাদের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সমগ্র জগতেই এই দুই ভাব আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই ভাব সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উভয় ভাবের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজসিক ভাবের ক্রিয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে। (কস্যচিৎপরিব্রাজকস্য) (ক্রমশঃ)

(*) দেবাঃ—শাস্ত্রোদ্ভাষিতাঃ সাত্ত্বিকইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাঃ—তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। দেবাঃ স্বাভাবিক তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইত্যন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোহনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। শাঙ্করভাষ্য। প্রজাপতিঃ—কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃত, পুরুষঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | আষাঢ় ও শ্রাবণ।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রাণায়াম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কোন বস্তুতে সত্ত্বাধিক্য থাকিলেই তাহাকে "সাত্ত্বিক" বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে তম আদি নাই, এরূপ নহে। সাত্ত্বিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে তমোগুণাদি দৃষ্ট হয় এবং তামসিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে সত্ত্ব দৃষ্ট হয়।

দ্বন্দ্বাত্মক জগতে ভাল ও মন্দ, এই যে দুই সাধারণ আপেক্ষিক ভাব রহিয়াছে, তাহারই ভাল বিভাগকে সাত্ত্বিক বা "সুর" সংজ্ঞা ও মন্দ বিভাগকে তামসিক বা "অসুর" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। রজঃ এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী সংযোজক অবস্থা মাত্র। উহা তম হইতে সত্ত্বে আরোহণের বা সত্ত্ব হইতে তমে অবতরণের সোপান মাত্র; সুতরাং উহার স্বতন্ত্রোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; আমরা মাত্র সাত্ত্বিক দেবভাব ও তামসিক দৈত্যভাব লইয়াই দেবাসুর-সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করিব।

ইতর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যজগতে আসিলে, যেরূপ ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে স্থূলতঃ ভাল ও মন্দ দুই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মনুষ্যেই এই দুইটী অবস্থা ন্যূনাধিকরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক মনুষ্যেই কখনও সৎ কখনও অসৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। আহার, বিহার, চিন্তা, কার্য্য ইত্যাদিতে কখনও দেবভাব, কখনও অসুরভাব প্রবল হয় এবং উহাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে দেবভাব দ্বারা অসুরভাবকে পরাভব করিবার ইচ্ছা করিলে, ওঙ্কারেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাই পরিস্ফুট করা প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতি বলেন,—প্রজাপতিবংশীয় দেবতা এবং অসুরেরা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দেবতারা অসুরদিগকে পরাভব করিবেন বলিয়া "উদগীথ" অর্থাৎ ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই "দেবতা" শব্দের অর্থে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অসুর শব্দার্থে তামসিক ইন্দ্রিয়বৃত্তি। চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন, এই একাদশটী ইন্দ্রিয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীতেই এই দেবভাব ও অসুরভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার ও কুব্যবহার দুইই করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা পবিত্র ও রমণীয় বস্তু দর্শনে যেরূপ সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কুৎসিৎ বা অপবিত্র বস্তু দর্শনে তামসিকভাবের বৃদ্ধি হয়। তবে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে, কুদর্শনেও যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণজনিত রমণীয়তা, তাহাই তোমার গ্রহণীয় হইবে। বারবণিতাদিগের মুখ-সন্দর্শনে সাধু মহাপুরুষদিগের ভগবৎপ্রেম জাগরূক হয়! যাহাতে যে ভাব প্রবল থাকে, সকল বস্তু হইতেই সে সেই ভাববর্দ্ধক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। মানুষ সুদর্শনে যেরূপ প্রীতি পায়, অবস্থা-ভেদে কুদর্শনেও তদ্রূপ প্রীতি পাইয়া থাকে। জগতে সাত্ত্বিক দৃশ্য কাহারও প্রিয়, কাহারও বা তামসিক দৃশ্য প্রিয়। মানুষে যেমন সুশ্রাব্য শব্দ শুনিতে ভাল বাসে, সেইরূপ কুশ্রাব্য শুনিতেও তাহার প্রীতি দেখা যায়। আমরা সময়ে সময়ে পরগুণানুবাদ শুনিতে যেমন ভালবাসি, আবার পরনিন্দাও সেইরূপ সময় সময় আমাদের শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের মহিমাব্যঞ্জক সামগানাদি যেরূপ আমাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়, বারবণিতাদিগের বিলাসোদ্দীপক তরল সঙ্গীতাদিতেও আমরা তদ্রূপ সময় সময় আকৃষ্ট হই। এ কেবল আমাদিগের অন্তর্নিহিত 'দেব' ও 'অসুর'ভাবের সংগ্রাম-ফলমাত্র। মানুষ যেরূপ সুগন্ধে আসক্ত, তদ্রূপ দুর্গন্ধেও সময় সময় আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘৃতের পবিত্র সৌরভে ব্রহ্মদেশবাসীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু পশ্বাদির পূতিগন্ধপূর্ণ গলিত শব তাঁহাদের প্রিয় আহার্য্য! একই মানুষের সময়বিশেষে সত্ত্বাদি গুণভেদের অবস্থাবিশেষে কথনও সুগন্ধে কখনও দুর্গন্ধে রতি দেখা যায়। আমাদের দেশেও মৎস্যভোজীদের মধ্যে কখন কাহারও সদ্যঃ রোহিতমৎস্যের ঝোল অপেক্ষা পচা দুর্গন্ধ ইলিস চর্চ্চড়ী যে প্রিয় বোধ হয়, তাহার কারণ তামসিকতার আধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবস্থাভেদে মধুরাদি সাত্ত্বিকরস যেরূপ প্রিয় হয়, আবার কট্বম্লাদি অসাত্ত্বিকরসও তদ্রূপ প্রিয় হয়। সাধ্বী সহধর্ম্মিনীর পবিত্র স্পর্শে সুখানুভব না করিয়াও মানুষ বারাঙ্গনার আলিঙ্গনে স্বর্গ-সুখ অনুভব করে! পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীব-জীবনের পতন হয়। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"অলি-পতঙ্গ- মৃগ- মীন-
ইস্‌কো একহি আঁচ ;
তুলসী উস্‌কো ক্যা গত্‌,
যিস্‌কো পিছে পাঁচ ?"

অলি ঘ্রাণেন্দ্রিয়-লোভে পুষ্পমধু পান করিতে গিয়াই কেতকী-কণ্টক-বেধনাদি বিবিধ বিপদে পতিত বা মৃত হয়, পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়-আকর্ষণে বহ্নির রূপ-সম্ভোগ করিতে গিয়া জীবন হারায়, মৃগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাধের সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাশবদ্ধ বা বাণবিদ্ধ হয়, মীন রসনেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বড়িস-বিদ্ধ-খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মীনলীলা সম্বরণ করে এবং হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিসেবনার্থ শিক্ষিতা হস্তিনীর অঙ্গসঙ্গ-লোভে মুগ্ধ হইয়া ধৃত বা মৃত হয়। পশ্বাদি ইতর প্রাণীতে তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ তাহাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ের তামসিক সেবাতেই প্রায় এবম্বিধ অনর্থ ঘটে, আর সত্ত্বগুণাধিক্য পাইয়াও মানুষ যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই তামসিকসেবায় আসক্ত হয়, তবে তাহার কি

গতি হইবে? ফলে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই মানুষের দেবভাব ও তামসিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই অসুরভাব অভিব্যক্ত হয়।

যেরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতেও দেবভাব-অসুরভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহারজনিত যে দেবভাব, তাহাতে যেমন অশেষপ্রকার আত্মহিত ও পরহিত সংসাধিত হইতে পারে, তেমনি উহাদের অপব্যবহারজনিত আসুরভাবের ফলে আত্মানিষ্ট ও পরানিষ্ট সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও ঐরূপ দ্বিবিধভাব আছে এবং তদুপযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ ভাবদ্বয় বর্দ্ধিত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব আছে বলিয়াই আমরা উহার তামসিক ব্যবহার করিতে পারি। শ্রুতিও এইজন্য বলিতেছেন যে "দেবগণ উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণবসাধনের জন্য নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, অসুরগণও সেইখানে প্রবেশ করিল; এই জন্য নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুয়েরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে প্রবেশ করিলে, অসুরগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিল; তজ্জন্যই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে সু—কু দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ইন্দ্রিয়াশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দেবগণ, অসুরদিগকে পরাভব করিতে না পারিয়া, অবশেষে প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওঙ্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসুরগণ কেবল সেইস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবগণকর্তৃক পরাভূত হইল।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছা করিলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করা যায় না। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কোন অদর্শনীয় বস্তু দর্শন করিব না; কিন্তু চক্ষুর মধ্যে নিহিত তামসিকশক্তি আছে বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-ভাবময় মনেও সেই অদর্শনীয় বস্তু দেখিবার ঔৎসুক্য রহিয়া গেল। মন এবং অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির কার্য্য পরস্পর সাপেক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই মনের সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারদ্বারাই মন নিয়মিত হয়; অথচ আবার মনের দ্বারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত ও নিয়মিত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যও এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেবল এই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। মনে করিলাম যে আর দুশ্চিন্তা করিব না, কিন্তু যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে দুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িল; মন আর সংযত রহিল না। এই ভাবেই গীতায় "বলাদিব নিয়োজিতঃ" বলা হইয়াছে।

প্রাণই জীবের জীবত্বের কারণ। শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকিলে, জীবের জীবত্ব থাকে না।

বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে উক্ত আছে, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, তাহারা সকলে প্রজাপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যেকে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিল। প্রজাপতি তদুত্তরে বলিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব না থাকিলে অন্য সকলের অস্তিত্বের অভাব হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের ও প্রাণের ক্রিয়া অব্যাহত রহিল। অবশেষে প্রাণ দেহ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে সকল ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়ত্ব লোপের উপক্রম হইল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণের অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের কাহারও অস্তিত্ব

থাকিতে পারে না এবং তদনুসারে প্রাণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাণেই জীবের জীবত্ব এবং তাবৎ ইন্দ্রিয়ই প্রাণের অধীন; এই প্রাণেরই সংযম করিতে পারিলে, তাবৎ ইন্দ্রিয় সংযমিত হয়। এই প্রাণেরই সংযম সাধনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রাণের সংযমকেই "প্রাণায়াম" বলে। "প্রাণান্ যময়তীতি প্রাণায়ামঃ।" অতএব এই প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রণব সাধন করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব অর্থাৎ আসুরিকভাব কখনও প্রবল হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিবার জন্য অবশেষে প্রাণ আশ্রয় করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি যথা—

"তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা পাপ্মনা বিবিধুঃ তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষবিদ্ধঃ॥ ২॥

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা॥ ৩॥

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৪॥

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৫॥

অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পতে সঙ্কল্পনীয়মসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৬॥

অথ হ যএবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিদ্ধংসেত।

অর্থাৎ দেবগণ প্রণব-সাধনার্থ যথাক্রমে নাসিকা, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিলে, অসুরেরাও তত্তৎস্থানে গেল; সুতরাং সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সত্য, মিথ্যা, সুরূপ, কুরূপ, সুশ্রাব্য, অশ্রাব্য এবং সঙ্কল্পনীয়তা ও অসঙ্কল্পনীয়তা, এইরূপ দ্বিবিধভাব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইল। অবশেষে দেবগণ প্রাণে আশ্রয় নিয়া প্রণবসাধনে সফলকাম হইলেন। কঠিন প্রস্তর খুঁড়িতে গিয়া কুদ্দালাদিই যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ অধিকার করিতে গিয়া অসুরগণও তদ্বৎ দশা প্রাপ্ত হইল।

অতএব এই প্রাণাশ্রয়রূপ প্রাণায়াম-যোগই দেবাসুরের সংগ্রাম-নিষ্পত্তি ও অসুরের পরাভবের অনন্য উপায়। প্রবন্ধ-শীর্ষোক্ত শ্রুতিতে দেবতা অর্থে সৎপ্রবৃত্তি, অসুর অর্থে অসৎপ্রবৃত্তি এবং প্রজাপতি অর্থে মানবাত্মা বুঝাইয়াছে। মানবের আসুরভাব দমনপূর্ব্বক দেবভাব আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রাণায়ামই তাহার প্রধান উপায়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

শমন-দমন।

যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সকলেই সশঙ্কিত; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌরজগৎ,—এমন কি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড যাহার বিশ্বগ্রাসী করালকবলের দিকে অজগর-দৃষ্টি-শক্তি-সমাকৃষ্ট অবশ পক্ষীটির ন্যায় আকৃষ্ট, তাহারই নাম শমন বা মরণ। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক; জাত হইলেই মৃত হইতে হইবে। সৃজন-মরণ একই বস্তুর যেন দুই পৃষ্ঠ; তাই সৃষ্টবস্তুমাত্রই শমনের অধীন। 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ' মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। একদিন না একদিন তার খর্পরে পড়িতেই হইবে; তাই তারে এত ভয়! যদি কোনরূপে তাকে এড়াইবার যো থাকিত, তবে কি আর তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত? কিন্তু এড়াইবার কি উপায় নাই? তবে 'শমন-দমন' কথাটি কোথা হইতে আসিল এবং উহার অর্থইবা কি? এই যে নানাশাস্ত্রে, নানাগ্রন্থে, সভার মাঝে, সাধুর কাছে, উপদেষ্টার উপদেশ-দানে, ভক্তগায়কের ভজন-গানে ঐ কথাটি চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক কি এমন প্রতিষেধ সম্ভবে, যাহাতে শমন-দমন সম্পাদন করা যায়?—অর্থাৎ না মরিয়া পারা যায়? শাস্ত্রে শুনিতে পাই, অশ্বত্থামাদি সাতজন "চিরজীবী"; দেবগণ অমৃত পান করিয়া 'অমর' হইয়াছেন, ইত্যাদি; আবার শাস্ত্রই বলেন, মহাপ্রলয়ে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না! হরি হরি! তাহাহইলে চিরজীবীত্ব ও অমরত্ব বিরাটকালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র! অতএব শমনের শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে আর সংশয় নাই। 'জগৎ' শব্দের অর্থই যাহা গত হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নয়। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি; এই গতিতেই জগচ্চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্যকালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা-বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেগুলিকে থলীর মধ্যে পূরে, বিশ্ব-বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলনা অতীতের থলিয়ায় পুরিতেছে। কালেই সমস্ত লয়, এই জন্ম লয় বা মরণের আর এক নামই কাল। কাল-প্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার; ইহাই একমাত্র জানার ও আলোচনার বিষয়, ইহাই একমাত্র সমাচার।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কা চ বার্ত্তা," অর্থাৎ সমাচার কি? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও এই উত্তরই দিয়াছিলেন,—

"মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন,
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

"ঘোঁটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
রাত্রি-দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা॥
এই মহামোহের কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥"

(কাশীদাস।)

মোট তাৎপর্য্য এই যে, কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর। ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ জগতের অনিত্যতাই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

ইহা জানিলেই সংসার-পাশ ছেদ হয়; দুস্ত্যজ্য অনিত্যাসক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মন নিত্যে—অর্থাৎ আত্মায় আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী মায়া-শক্তির কি অনির্ব্বচনীয় অসামান্য ইন্দ্রজাল যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আমরা প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত্তে এই বার্ত্তা পাইয়াও পাইতেছি না—জানিয়াও না-জানার ফল অতিক্রম করিতে পারিতেছি না! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যুধিষ্ঠির 'কিমাশ্চর্য্যম্' প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিয়াছিলেন, যথা—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"
দিন দিন জীবজন্তু যাইতেছে যম-ঘর।
শেষেরা স্থিরত্ব চায়, কি আশ্চর্য্য এর পর!

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই জাগতিক আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহের নিয়ন্ত্রী; অতএব এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটিও মায়াজাত মহা-মোহেরই মোহিনীশক্তির ফল। এ বিস্ময়-বার্ত্তা বা মরণের কথা যখনই আমরা একটু অভিনিবিষ্ট ভাবে ভাবনা করি, যখনই শ্মশান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উদ্দীপক কারণে এই মৃত্যু-চিন্তা উদ্দীপ্ত হয়, তখনই শমন-দমনের কথাটা অধিকারী-ভেদে অস্পষ্ট বা উজ্জ্বলভাবে মনে আসে; কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণিক। আসল কথাটা কেহই ভাল করিয়া ভাবে না। যাহা ভিন্ন সমস্তই অকৃতার্থতা, যে শমন-দমনের কোনরূপ উপায় অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্য-জীবনের মুখ্য লক্ষ্যটুকু ভস্ম-বিক্ষিপ্তবারিবিন্দুবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হয়, তাহার বিষয়েই আমরা শোচনীয়ভাবে উদাসীন! জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-মান, রূপ-গুণ, যশ-সৌরভ ও পদ-গৌরব ইত্যাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, শমন-দমনের বা মরণ-হরণের উপায় না করিতে পারিলে, সব বৃথা—সব বিড়ম্বনা।

এ সংসারখানা কেবল "কসাইখানা" মাত্র। আমরা নিতান্ত দীনহীন ছাগ-মেষাদির ন্যায় কর্ম্মডোরে বদ্ধ হইয়া মূঢ়তা-জনিত নিশ্চিন্ততায় নিদ্রিত রহিয়াছি। শমন কখন কাহারে ধরেন, কখন কাহারে 'জবাই' করেন, কিছুই স্থিরতা নাই; হায়! সময়কালে একটু ছট্‌ফটানি ভিন্ন কোন ক্ষমতাই নাই! কি শোচনীয় অবস্থা! এই ভাবের 'রামপ্রসাদী' সুরে একটী গান আছে;—

আর খাবনা পাতা নেঙ্গুড় নেড়ে।
আমার ছোরার কথা মনে পড়ে॥
এ সংসারখান কসাইর দোকান, (কসাই) শমন-উদ্দীন্ আস্‌ছে তেড়ে।
(হাতে হাস্‌ছে ছোরা) ঐ শমন উদ্দীন্ আস্‌ছে তেড়ে॥
বি-এ এম্-এ জজ্ মেজেষ্টার নির্ভাবনায় নেঙ্গুড় নাড়ে।
(যেন) যো নাই জানার, কসাইখানার ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে।
নিত্য নূতন ঘাষ-পাতা-খড় খাচ্চি আর ঘুমাচ্চি পড়ে।
(কচ্চি) শিং-ল্যাজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা সবাই ছেড়ে॥
ছোরা-মারা জান্‌লে যারা, জাগ্‌লে তারা দড়া ছিঁড়ে।
আমি রোগা ভ্যাড়া, পাকা দড়া, টান্‌লে আরো এঁটে পড়ে॥
(এই) নিরুপায় (অমুকের) উপায় আছে সদায় ওপায় পড়ে।
(তবে) কসাইর বাপের সাধ্য কি আর গোঁসাই যদি দেয়গো ছেড়ে॥

গানটী কৌতুকের ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও হা হুতাশ বর্ত্তমান! বাস্তবিক শমন-দমনের উপায় ভিন্ন দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের কোন সার্থকতাই সম্ভাবিত নহে। এ সংসারে অনেকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শমনের 'শমন-জারী' হইলে, সব বুদ্ধি ফুরাইয়া যায়! যাঁহার বুদ্ধি তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; নচেৎ উপরোক্ত গানটির ভাবে শৃঙ্গ-

লাঙ্গুল বৃদ্ধির বুদ্ধি প্রকৃতপক্ষে উপহাসের বিষয়ীভূত মাত্র।

এখন কথা হইতেছে, শমন দমন বাস্তবিক সম্ভব কি না? পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, মরণের হাত কাহারও এড়াইবার যো নাই। দেহত্যাগ অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই নিয়তির নিয়ত অধীন। তবে শমন-দমনের সার্থকতা কিরূপ?

ভগবানের নাম নিলে নাকি শমন দমন হয়। "নামে শমনভয় দূরে যাবে বোল হরিবোল" ইত্যাদি নামকীর্ত্তন ভক্তগণ গান করিয়া থাকেন। বিসূচিকা-মারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে "পালা পালারে শমন! এদেশে চাঁদ গৌর এল। ঐ যে হরিনাম চৌকিদার তোরে গেরেপ্তার কর্ত্তে এল॥" ইত্যাদি সঙ্কীর্ত্তন গাওয়া হয় এবং ৺কালীপূজা করা হয়।

কালিকাপূজনং কিম্বা শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনম্।
ভয়স্য ভয়-সংতুল্যং কৃতান্তস্য কৃতান্তবৎ॥
যেনৈব বার্য্যতে নিত্যং ভবরোগঃ সুদারুণঃ।
তেন সামান্যরোগস্য নিবারণে তু কা কথা॥
কালিকা-পূজন কিম্বা কীর্ত্তন শ্রীহরি-নাম।
ভয়েরো ভয়স্বরূপ, যমেরো যম-সমান॥
যাহাতে নিবারে ঘোর ভবরোগ অনিবার,
নাশিতে সামান্যরোগ কথা কি তাহার আর?

বাস্তবিক একথা পরীক্ষিত সত্য। হরিসঙ্কীর্ত্তন, কালীপূজা ইত্যাদি দৈবানুষ্ঠানে সর্ব্বোত্তম পুরুষকার হয়; কারণ আপৎকালে এবং সর্ব্বকালেই "নচদৈবাৎ পরং বলম্।" তবে কথা এই যে, উপাসকের ইচ্ছা-শক্তি (Will-force) যত প্রবলা হইবে, উপাসনার ফল তত ফলিবে—উপাসনা তত উপাস্যের গৃহীত হইবে। গীতাতে চতুর্ব্বিধ উপাসকের উল্লেখ আছে, যথা,—

'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।'

মারীভয়ে শমন দমন-সঙ্কল্পে যখন পূর্ব্বোক্ত দৈব ক্রিয়াদি করা হয়, তখন সেই ভীত-সংত্রস্ত-ব্যাকুল উপাসকগণ 'আর্ত্ত' ভক্তের আসন গ্রহণ করতঃ প্রবল চিত্তবেগসহকারে উপাসনা করে; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি-সমুত্তেজিতা প্রার্থনা সদ্যঃ ফলবতী হয়। ইহা ত যেন বুঝিলাম, কিন্তু একেবারে শমন-দমনের উপায় কি? এই বর্ত্তমান ভৌতিক দেহটা লইয়া অনন্তকাল অমর হইয়া থাকাই যদি 'একেবারে শমন দমন' হয়, তবে তাহা শাস্ত্রমতে ব্রহ্মারও অসাধ্য বিধায় মর্ত্ত্য-উপাসকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্ততঃ মহাপ্রলয়ে দেহ-লয় অবশ্যম্ভাবী। অনিত্যের 'নিত্যবস্তাতি' অবস্থা মহাপ্রলয়ে আর থাকে না। কালে ভূতের উপর কালের অধিকার হইবেই। বলিয়াছি ত, এই জন্যই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, জগতের ইহাই একমাত্র খবর। মায়িক দেহ হইলেই মরিতে হইবে। স্বয়ং ভগবানই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ' লীলায় মায়িক দেহধারণ করিয়া আবার মরণাভিনয়ে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন! এহেন ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ, তিনিও নামের গুণে—দৈববলের গুণে বহুবার মরণের মুখে রক্ষা পাইয়াও চিররক্ষিত হইলেন না। তাঁহার দেহরক্ষায় যত দিন ভগবানের প্রয়োজন ছিল, ততদিন বহু দেহান্তকর বিপদে রক্ষা করিয়া, কালে তাঁহাকেও অনিত্য দেহ ছাড়াইয়া নিত্য ধামে লইয়া গেলেন। দৈব-বলে রাবণের কাটামাথা পুনঃ পুনঃ যোড়া লাগিয়াও চিরদিন সে মাথা রহিল না; অচিরাৎ নিয়তি-নিয়মিত যথাসময়ে লঙ্কার বারিধি-বেলার বালুকাশয্যায় তাহা লোটাইল! অধিক বলা বাহুল্য, ফলে দৈববলে শতসহস্রবার আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন অনিত্য মায়িক ও ভৌতিক দেহের উপরে

(কালপূর্ণ হইলে) কালের অধিকার আসিবেই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"
অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে!

এতাবতা ভরসা করি, এই টুকু বুঝা গেল যে, "শমন-দমন" যদি ঠিক কথা হয়, তবে সে এরূপ স্থূল দমন নয়; সে দমনের অন্যরূপ সূক্ষ্ম রহস্যময় অর্থ আছে। অতএব সে অর্থ কি—সে রহস্য কি, যথাসম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্ত সাধকগণ কখনও অনিত্য ভৌতিক দেহের মোহে মজিয়া এই মলভাণ্ড অন্ন-পরিণাম-পিণ্ডটির চিরস্থায়িত্ব বিধানই কৃতার্থতার কারণ মনে করেন না; অথচ তাঁহারা শমন-ভয়ে ভীত হইয়াই যে 'অভয় চরণে' শরণ লইয়াছেন, একথা অনেকের মন্ত্রে, প্রার্থনায়, স্তবে, গানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবের 'শমন ভয়' ও 'ভবভয়' যেন একই বস্তু বোধ হয়; কারণ উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এতদুভয়ের যে কোন কথাটিই সমঅভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাণ-ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় অনেক ভক্ত সম্ভবতঃ এ যাবৎ ভব-ভয়-মুক্ত হইয়াছেন, ভবসিন্ধুর পারে গিয়াছেন, যম-যাতনা এড়াইয়াছেন, শমনভয় দমন করিয়া আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন। এসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, অথচ দেহাত্মবুদ্ধিবিহীনতাবশতঃ সকলেই কিন্তু অন্নপিণ্ড স্থূল দেহের স্থিতি-ক্ষতি সমজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন দার্শনিক কবি ঠিক বলিয়াছেন,—

"সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।"

সাধুর লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"ন প্রীয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি॥"
বন্দনায় নহে তুষ্ট, নিন্দায় অরুষ্ট রয়।
মরণেও অনুদ্বিগ্ন জীবনেও প্রীত নয়॥

অতএব দেখা গেল, অনিত্য দেহের মায়ায় ভক্তগণ শমন দমনার্থ লালায়িত নহেন, অথচ তাঁহারা যে জন্য লালায়িত, শমন-দমন ভিন্ন তল্লাভ সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এক্ষণে বোধ হয় এটুকু বুঝা গেল যে, যদি দেহে শমনের অধিকার অবারিত—অব্যাহত রহিলেও শমন-দমনের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেইরূপ শমন-দমনই ভক্ত সাধকের অভিপ্রেত। দেখা যাউক, তাহা কিরূপ।

শ্রীভগবান গীতায় এ গুরুতর রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ গীতার প্রথমাংশেই এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি॥"
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত।
অতএব অনিবার্য্যে শোক তব অনুচিত॥"

অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা মূঢ়তা মাত্র। অতএব দেহী হইলেই দেহত্যাগ একান্ত অপরিহার্য্য বিধায় তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া বা জীবনের মায়ায় শোক-কাতর হওয়া নিতান্তই মোহের কার্য্য। উপাসনার সুস্নিগ্ধ সুধাপানে অনিত্যাসক্তির নেশা বা মোহ-মদিরার ঘোর কাটিয়া গেলেই দেহ-সর্ব্বস্বতা দূর হয়। এই তত্ত্বেই শমনের প্রথম পরাজয়—শমন-দমন-রহস্যের প্রথম স্তর-ভেদ। দেহের প্রতি যদি আমার স্বার্থ, সহানুভূতি, মমতাবুদ্ধি না থাকিল, তবে শমনকে "কদলী-প্রদর্শন" কঠিন নহে। ভক্ত-জগতে অনেকেই 'কালকে কলা দেখাইয়া' "কালের মুখে কালী দিয়া" "ডঙ্কা মারিয়া" চলিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ হাসিতে হাসিতে দেহ ত্যাগ করেন, পাপীরা অশ্রুজলে

ভাসিতে ভাসিতে জীবন ত্যাগ করে। সাধু-শিরোরত্ন তুলসীদাস ঠিক বলিয়াছেন,—

"তুলসি! যব্ জগমে আয়ো জগ হসে তোম্ রোয়।
অ্যাসা কর্ণিকর্ চলো কি তোম্ হসে জগ রোয়।"

তুল্সি! যবে এলে ভবে, কাঁদ্‌লে তুমি, হাস্‌লে লোক।
যাবার বেলা এম্নি যাবে, হাস্‌বে তুমি, কাঁদবে লোক॥

বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে হেসে যেতে পারিলেই শমনের শাসন শিথিল হয়। তাহলে মৃত্যু-যাতনাও হয় না এবং শমনপুরে বা শমন-বিহিত-বিধানে "নরক" নামক কোন পারলৌকিক দুর্ভোগও ঘটে না। আমাকে যদি তুমি প্রহার কর, অথচ আমার ব্যথা না লাগে, তবে তোমার প্রহার সার্থক হয় কি? বরং তুমিই প্রকারান্তরে প্রহারিত হও; তোমারই হাতে হয়ত ব্যথা লাগে! গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষায় এই এক ভাবে শমন-দমন হয়; এতদ্ব্যতীত শমন-দমন-রহস্যে আর একটী অন্তঃস্তর আছে; তদালোচনায় ভরসা করি বুঝা যাইবে যে, সম্পূর্ণ-শমন-দমন কিরূপ।

মরণ হয় কাহার? শমনের অধিকার কিসের উপর? দেহী ত মরে না, মরে দেহ; তবে আর শমনকে দেহীর ভয় কি? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, মৃত্যু জীবাত্মার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন মাত্র।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

যথা জীর্ণ-বস্ত্রভার, করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর,
তথাবৎ জীর্ণকায়, দেহী পরিত্যজি যায়,
পুনঃ পায় নব কলেবর।

অতএব মৃত্যু যদি জীবাত্মার (আসল মানুষের) পোষাক-বদল মাত্র হইল, তবে আর তাহা এমন ভয়াবহ, এমন নিদারুণ, এমন সর্ব্বনাশক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি ও তদানুষঙ্গিক মায়ামোহ এবং মৃত্যু-যাতনার ভয়। 'দেহ আমার' মাত্র না ভাবিয়া, দেহই যেন 'আমি' বলিয়া যে ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহাই দেহাত্ম-বুদ্ধি; সুতরাং দেহের নাশেই 'আমি নষ্ট হইলাম' এই মোহজ দৃঢ় সংস্কারই মৃত্যুকে এত অপ্রিয়, এত আপত্তিজনক, এত অমাঙ্গলিক ও এত বিকটবিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে! পরন্তু মৃত্যুতেই আমি একেবারে ফুরাইয়া যাইব না, এ বিশ্বাস সাধারণের একরকম থাকিলেও, তাহা বড় সংশয়ান্দোলিত, অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল। এহেন সোণার সংসার, এহেন প্রেমের পুতুল স্ত্রীপুত্রাদি, এহেন পার্থিব ভোগ-বৈচিত্র্য-ব্যাপার, এ সবের অসহ্য বিরহ ত অনিবার্য্য; তারপর আবার মৃত্যু-যাতনা!—ইহার কল্পনাও লোমাঞ্চকর! এখানেই আপত্তির শেষ নহে,—আরও আছে। মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু-যাতনার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও নাজানি কোথায় কি ভাবে থাকিতে হইবে! সুখে থাকি, দুঃখে থাকি, এ পৃথিবীর সঙ্গে একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া নিয়াছিলাম, কিন্তু সে অজ্ঞাত-তত্ত্ব অদ্ভুত রহস্যময় পরলোকে না জানি কেমনে কাটাইব? কবিবর ৺ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছিলেন,—

'মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়,
তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয়।'

বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য জীবন-যবনিকার চির অন্তরালে অবস্থিত। সে দুর্ভেদ্য দুরপসার্য্য যবণিকা যাঁহার অন্তশ্চক্ষুতে স্বচ্ছ প্রতীয়মান হয়, তাঁহারই ধর্ম্মসাধন সার্থক—মানবজন্ম সফল। তাঁহারই দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত,

'শমন-দমন' তাঁহারই আয়ত্তীভূত। কিন্তু এ তামস কলিযুগে সেরূপ সৌভাগ্যভাজন সাধক কয়জন আছেন? যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকালয়ে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তবে বনে, বিজনে, কন্দরে, গহ্বরে কিয়ৎ-সংখ্যক থাকিতে পারেন। আবার তাই বলিয়া গৃহাশ্রমী সাধকের যে সে অধিকারই নাই, তাহা নহে। অধিকার বিলক্ষণ আছে; রাজর্ষি-জনকও গৃহী ছিলেন, অথচ গীতায় তিনিই' আদর্শ-সাধকরূপে উক্ত হইয়াছেন। অতএব আমাদের নিরাশ হইবার কথা নাই। ঐ আদর্শ সম্মুখে কল্পনা করিয়া, যথাশক্তি যথা-সম্ভব অগ্রসর হইতেই হইবে। যেখানে সাধনের জন্য সুদুর্লভ মানব জন্ম ভাগ্যবলে লাভ হই য়াছে, সেখানে এমন জন্মটী যাহা তে 'মাঠে মারা' না যায়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে। যে না করে, সে আর সহস্র বিষয়ে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বোধের চূড়ামণি!

'নলিনী-দলগত-জলবত্তরলম্' এই মানব-জীবনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকায় সময় নাই। কখন শমন সন্নিহিত হন, কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব প্রতিমুহূর্ত্তেই মরণ-সম্ভাবনা জানিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অপ্রস্তুতেরই শমন-সঙ্কট সুনিশ্চিত, শমন দমন সুদূরপরাহত। নীতি-শাস্ত্রকারেরা ঠিক বলিয়া-ছেন,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

অজর অমর হয়ে বুদ্ধিমান
বিদ্যা অর্থ উপার্জ্জিবে।
শমন দিয়েছে কেশে এসে টান,
ভেবে ধর্ম্ম আচরিবে।

যিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তিনিই 'মৃত্যুঞ্জয়' হইতে পারেন। মৃত্যুর সম্ভাবনা যেখানে প্রতি-ক্ষণই রহিয়াছে, সেখানে অপ্রস্তুত থাকা কেবল মূর্খতা মাত্র।

মরণকে মরণ-বোধ না করিতে পারিলেই তাহাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা যায়, তাহার দর্প চূর্ণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সে যে আমাকে স্পর্শ করিতেও অক্ষম, মাত্র আমার এই রক্ত-মাংসের খোলসটা লইয়াই তাহার যত আস্ফা-লন, এই টুকু বুঝিতে পারিলেই তাহার শূন্য-গর্ভ 'চোকরাঙ্গাণীতে' আর ভয় থাকে না। শমনের পাঞ্চভৌতিক অস্ত্র বা "পঞ্চত্ব" আমার পোষাকটী মাত্র কাড়িয়া লইতে পারে, আমার চিন্ময় অঙ্গে আঁচড়টিও দিতে পারে না। গীতা বলেন,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতিপাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"
শস্ত্র নাহি ছিঁড়ে, নাহি দহে হুতাশন।
জল না ভিজায়, নাহি শোষে সমীরণ॥

দেহ অনিত্য পঞ্চভূত-রচিত, এই জন্য তাহার বিনশ্বরত্ব পঞ্চভূতেরই সাধ্য, তাহারই নাম পঞ্চত্ব। দেহী নিত্য, সুতরাং চির অবিনশ্বর। যাহা ছিল, তাহা আছে ও থাকিবে; যাহা অনিত্য, তাহা ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, কেবল মায়ার দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যমানতা অনুভূত হয় মাত্র, সুতরাং তাহা ভবিষ্যতেও থাকিবার নহে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"(গীতা)
নাহি অনিত্যের সত্ত্বা, অসত্ত্বা নিত্যের।
দেখেছেন তত্ত্বজ্ঞানী অন্ত উভয়ের॥

ভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, দেহী হত্যা ও হনন উভয়েরই অতীত।

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীত নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

যে ইহারে হন্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ;
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত।

কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু এসব তত্ত্ব কেবল গ্রন্থে পাঠ করিলে ফল নাই। পূর্ণোদরে ঔষধ সেবনে যেমন তাহার ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, বিষয়াসক্তি, দেহাত্মবুদ্ধি প্রভৃতিতে চিত্ত পূর্ণ থাকিলে, কোন তত্ত্ব-কথাই কার্য্যকরী হয় না। চিকিৎসকগণ কুপিতমলপূর্ণ উদর বিরেচন-চিকিৎসার দ্বারা নির্ম্মল করিয়া ঔষধ দিলে, তবে তাহা উপযুক্ত ক্রিয়াবান হয়। আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও সেই প্রণালী। বৈরাগ্য-বিরেচনে চিত্ত লঘু ও নির্ম্মল হইলে, তবে তত্ত্বোপদেশ মহৌষধে ভব-ব্যাধি বিনাশের সম্ভাবনা হয়।

যদি বল গৃহীর বৈরাগ্য কিরূপে সম্ভবে? আর্য্যর্ষি বলেন,—গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। না পেয়ে উপবাস, বায়ু বদলে তীর্থবাস, বেগারে গঙ্গাস্নান, অক্ষমতায় ক্ষমা-দান, এ সব যেমন বিশেষত্ব-শূন্য, গৃহাশ্রম-শূন্য সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যও প্রায় তদ্বৎ। যাহার আয়োজন নাই, তাহার আর বিয়োজন কি? যাহার উপকরণ নাই, তাহার আর নিরাকরণ কি? অতএব গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসিতয়েব ধীরাঃ॥
বিকারের হেতু সত্বেও যে জন
অবিকৃত চিত, সেই মহাজন॥

গৃহীর পক্ষে এই মহাজনত্ব লাভের স্বাভাবিক উপায় রহিয়াছে। জনকরাজা গৃহী ছিলেন, ধ্রুব-প্রহ্লাদ গৃহী ছিলেন, বিদুর-উদ্ধব অর্জ্জুনাদি গৃহী ছিলেন, দ্রোণ-সুরথ-অম্বরীশ প্রভৃতি গৃহী ছিলেন, ইদানীন্তন সর্ব্বানন্দ, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি গৃহী ছিলেন। ঋষিগণ অনেকেই তপোবনে গৃহাশ্রমী ছিলেন। এখনই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যে আমাদের বিষয়-সেবা বজায় রাখিয়া ধর্ম্ম-সেবা কিরূপে সম্ভবে। কেবল স্ত্রী সাজাইয়া, ছেলে পড়াইয়া, টাকা করিয়া ও পোষাক পরিয়া যদি ভব-সিন্ধু পাড়ি-দেওয়া যাইত, তবে আর ভাবনা কি ছিল? আমরা কিন্তু যেন তাই ভাবিয়াই বসিয়া আছি!

ভব-সিন্ধুপারে যেতে এখন আমাদের আর বিশেষ কিছু লাগে না, কিন্তু যখন প্রকৃত ভবসিন্ধুর গভীর গর্জ্জন 'শেষের সে দিনে' শুনা যায়, যখন শমন-সঙ্কটের বিকট বিভীষিকা ত্রিভুবন অন্ধকার করিয়া গ্রাস করিতে আসে, তখন নিরুপায়! তবে কি না 'ও পায়ে' শরণ নিতে পারিলে উপায়ের আর অভাব থাকে না; ভবসিন্ধুর দুস্তরতা বা শমন-দমনের দুষ্করতা আর উপলব্ধি হয় না। তাহলে রামপ্রসাদের সহিত সমস্বরে বলা যায়,—

"শমন! কি ভয় দেখাস্ মোরে॥
তোরে ভয় করিনে ভয়ের ভয় ঐ অভয়ার
চরণের জোরে।"

অথবা

"ছুঁওনারে শমন! আমার জাত গিয়েছে॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী, (আমায়)
সন্ন্যাসী করেছে।"

রামপ্রসাদ কিন্তু বস্তুতঃ কখনও গৃহবাস ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তথাপি "কেলে সর্ব্বনাশী" তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল; তাই তিনি বীরদর্পে শমন-সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন।

ভগবদুপাসনা ব্যতীত অনিত্যাসক্তি ত্যাগ কদাচ সম্ভাবিত নহে; অনিত্যাসক্তি ত্যাগ ভিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয় না এবং তাহা না হইলে, শমনের অধিকারও এড়ান যায় না

শমনের অধিকার দেহটী লইয়া; এখন আমি যদি দেহটীতে লাগিয়া থাকি, তবে আমিও তৎসহ শমনাধিকৃত হইব, সন্দেহ নাই; অতএব দেহটীতে নির্লিপ্ত থাকিয়া, মাত্র ভগবানের অভয়চরণে সংলিপ্ত থাকিতে হইবে; তবে আর শমনের ভয় থাকিবে না।

মৃত্যু যে কিছুই নয়, উহা মানুষের কিছুই করিতে পারে না, 'মৃত্যু' বলিয়া যথার্থ একটা 'সৎ' বস্তুরই সম্ভাভাব, উহা কাল্পনিক পদার্থ-মাত্র—একরূপ পরিবর্ত্তনের নামান্তর মাত্র, কেবল অনিত্যের অনিত্যতা-সূচক মাত্র; যাহা নাই, তাহারই না থাকা মাত্র! মৃত্যু মরাকেই মারে, জীবিতের কাছে আসিলে, মৃত্যুরই মৃত্যু উপস্থিত হয়! অতএব জীবন চাই। জগজ্জীবন শ্রীভগবানের শ্রীচরণামৃতপানেই জীবন লাভ হইবে; শমন-শঙ্কা-শোষিত সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ, আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত হইবে।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

পদ্যানুবাদ-মালা!

ভগবদিচ্ছায় আর্য্যশাস্ত্র-সাহিত্য-সিন্ধুর অমৃতময় গর্ভে অগণিত অমরজ্যোতিঃ রত্নরাজি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। যথেচ্ছা-সংগৃহীত তাহারই কতিপয় রত্ন পদ্যানুবাদ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া, মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মপিপাসুগণকে উপহার প্রদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

অবিকল পদ্যানুবাদের অতীব প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঠিক শাস্ত্রের কথাগুলি কি, ঠিক ঋষিবাক্যগুলি কি, ইহা জানা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই অত্যাবশ্যকীয়। অতএব যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য অবিকল অনুবাদ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; কিন্তু ঐ অনুবাদ পদ্যে হইলেই ঠিক প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে; কারণ মূল প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। তত্ত্বগুলি পরিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয়, শিক্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যই পদ্যের সৃষ্টি ও ব্যবহার। পরন্তু উহারই বিশদীকরণ ও বোধপরিপাক-যোগ্যতা-সাধন জন্যই গদ্য ব্যবহৃত হয়। পদ্য-গ্রথিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই গদ্যের স্বাভাবিক উপযোগিতা।

পদ্যের গদ্যানুবাদগুলি বাঙ্গলাভাষায় সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাকে "বঙ্গানুবাদ" না বলিয়া বরং "বাঙ্গালা ভাষ্য" বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। অনুবাদক প্রায়ই (গদ্যের কতকটা স্বাভাবিক শক্তিতেও বাধ্য হইয়া) গদ্যানুবাদে অল্পাধিক স্বকৃত ব্যাখ্যার প্রক্ষেপ মিশাইয়া, মূলবিষয়টি বিবৃত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই কারণেই ঠিক ঋষিবাক্য—ঠিক আর্য্যগ্রন্থকার-লেখনী-নির্গত কথাগুলি কি, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ জিজ্ঞাসুজনের জানিতে হইলে, অবিকল পদ্যানুবাদই উহার অনন্যউপায়। ইহাতেই ঠিক বিমুক্ত-বল্কল সদ্য ফলটির ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-বিভক্ত্যাদি-রচিত একখানি সূক্ষ্মান্তরমাত্র মুক্ত হইয়াই বিষয়টি প্রকাশ পায়। ইহাই পদ্যানুবাদের প্রধান প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন ভাষার সার-সম্পাদন—পুষ্টিসাধনেরও ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। শাস্ত্রীয় তত্ত্বার্থী সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের সারস্বতসাধনায় ইহাই স্বাভাবিক সাহায্যকারী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অপিচ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেও ইহা উপকারী ও আনন্দজনক।

"পদ্যানুবাদ-মালা" গ্রন্থনের উদ্দেশ্য

সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইহাতে ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য-রত্ন-ভাণ্ডারের বিবিধ স্তব, স্তুতি, ধ্যান, বর্ণনা, বিধি, ব্যবস্থা এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সার, সিদ্ধান্ত, উপদেশ ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যক-বিষয়েরই যথাসাধ্য অনুরূপ পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, কবি, পণ্ডিত ও শাস্ত্ররসজ্ঞগণের সাহায্যে এই "পদ্যানুবাদমালায়" গ্রন্থন-গতি অব্যাহত থাকিতে পারিবে। এবিষয়ে আমাদের প্রধান গৌরব ও ভরসাস্থল পণ্ডিত-মণ্ডলীর কৃপাশীর্ব্বাদ ও সানুগ্রহ-সাহায্য বিশেষ প্রার্থনীয়।

আমরা প্রথমেই দেবদেব ভূতপতি শিবের প্রতি শৈবকুল-শিরোরত্ন শ্রীমৎ পুষ্পদন্তকৃত স্তোত্ররাজ "মহিম্নস্তোত্রের" পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই স্তোত্রের অনুরূপ পদ্যানুবাদ-কার্য্যটি আমাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইয়াছে; তথাপি, এতদ্দ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তজন এমন বস্তুটির প্রকৃত সত্ত্বার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও রসাস্বাদন করিতে পারেন, এই আশায়, শিব-কৃপা-ভরসায় এ চেষ্টা করিয়াছি।

মহিম্নস্তোত্র।

(পদ্যানুবাদ)

অপার তোমার মহিমার পার,
নাহি পায় স্তুতি অজ্ঞান জনার।
ব্রহ্মা আদি দেব করে যেই স্তব,
তাহাও তোমাতে পায় পরাভব।
সকলেই স্বীয় বুদ্ধি-সাধ্যমত,
স্তব করি তব নহে নিন্দাস্পদ।
অতএব হর! স্তবনে তোমার,
অপবাদ-হীন এ চেষ্টা আমার॥ ১॥
বাক্য ও মনের প্রাপ্তি-পথ-সীমা,
করে অতিক্রম তোমার মহিমা!
ভয়ে ভয়ে বেদ কহে কথা যাঁর,
কে হবে সমর্থ ভবে স্তবে তাঁর?
কতই যে গুণ তাঁহাতে সম্ভব,
কাহার জ্ঞানের বিষয় সে সব?
দেখি লীলা-রূপে সগুণ-মূরতি,
কে না মজে মনে—কে না করে স্তুতি॥২॥
হে ব্রহ্মন্! সুরচিত সুধাসার
বাক্যের স্বয়ম্ তুমিই আধার!

সুর-গুরু-কৃত স্তবেতেও তাই,
বিস্ময়-বিষয় কিছুই যে নাই।
করি তব গুণ-কীর্ত্তন-কথন,
লভি পুণ্য তাহে হে পুর-মথন!
সে পুণ্যে পাইতে বাক্য-পবিত্রতা,
তব এ স্তবনে বুদ্ধি মম রতা॥ ৩॥
হে বরদ! তব ত্রিগুণ-সম্ভব-
ত্রিমূর্ত্তি-গ্রহণ-ফলে,
জগতের হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
তোমারি ঐশ্বর্য্য-বলে।
বেদ-ব্যক্ত সেই ঐশীশক্তিকেই
নিন্দে মূঢ়মতিগণ;
অসাধুরা তায় আনন্দই পায়,
নিরানন্দ সাধুজন॥ ৪॥
কিসে কি চেষ্টায়, ধরি কি উপায়,
অবলম্বি কি আধার,
কি দেহ ধারণে, কি উপকরণে,
ঈশ-সৃষ্ট এ সংসার?

মূঢ়মতি মূর্খ, করে এ কুতর্ক,
জগৎ মজাতে মোহে ;
হেন তর্ক ছার, মাহাত্ম্যে তোমার,
অতি উপেক্ষিত রহে ॥ ৫ ॥

এই সাবয়ব ভূলোকাদি সব
অসৃষ্ট কি হতে পারে ?
বিনা সৃষ্টিকর, সৃষ্ট চরাচর,
সম্ভাবিত কিপ্রকারে ?
বিনা ভব-ধব, এ ভব-উদ্ভব
কদাচ সম্ভব নয় ;
হে অমরবর ! নির্ব্বোধ নিকর
তোমাতে সন্দিগ্ধ রয়। ৬ ॥

বেদ, সাংখ্য, যোগ, তথা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি
নানা মতে "এই সত্য—এই পথ্য" ইতি বাদী-
রুচি-ভেদে ঋজু বক্র-নানাপথ-পথিকের
এক তুমি গম্যস্থান, সিন্ধু যথা নদীদের ॥ ৭ ॥

হে বরদ ! ফণি, মুণ্ড, খট্টাঙ্গ, ভস্ম, বৃষভ,
অজিন, পরশু মাত্র ব্যবহার্য্য বস্তু তব ;
কিন্তু সুর-সম্পদাদি তোমারি ভ্রূভঙ্গিমায় !
অবিমুগ্ধ আত্মারাম বিষয়-মৃগতৃষায় ॥ ৮ ॥

কেহ কন বিশ্ব 'নিত্য', কেহবা কন 'অনিত্য',
'নিত্যানিত্যে মিশ্র' কেহ কন ;
এ সকল মত-ভেদে বিমোহিত বিস্ময়েতে
হই আমি, হে পুর-মথন !
তবু তব স্তবে মম লজ্জা নাহি হয় ;
ধৃষ্টা মুখরতা মম অনুভূতা নয় ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা-বিষ্ণু দুইজন জানিতে অক্ষম হন
আদি-অন্ত মহিমার তব।
তুমি জ্যোতির্মূর্ত্তিমান ! হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান,
বিধি-বিষ্ণু করিলা যে স্তব,
তাহে তুমি তাঁহাদিগে দিলা দরশন ;
নিষ্ফল তোমার সেবা না হয় কখন ॥ ১০ ॥

হেলায় ত্রিলোক জিনিল রাবণ,
স্থাপিল অশত্রু-একাধিপত্য ;
করিল যে বাহু বিংশতি ধারণ,
রণোৎসুক—শত্রু-মথন-মত্ত !
হে ত্রিপুর হর ! শির-পদ্মদলে
পাদপদ্ম তব পূজিল রাবণ ;
তোমাতে অচলা ভকতির বলে
এহেন প্রভাব করিল ধারণ ॥ ১১ ॥

তোমারি সাধন-সুসিদ্ধবিক্রমে
তোমারি কৈলাসে বাড়া' ল হাত !
তোমারি অলস-অঙ্গুষ্ঠ-তাড়নে
সশরীরে হ'ল পাতাল-সাত্ !
তাতেও তিষ্ঠিতে নারিল রাবণ ;
দুর্জ্জনের হয় বিবুদ্ধি যদি,
পায় পরিণামে দুর্গতি এমন,
মোহ-মদ-মত্ত হইয়া অতি ॥ ১২ ॥

হে বরদ ! বাণ করিল অধীন
স্বীয় পরিবার সম ত্রিসংসার !
উচ্চ ইন্দ্র-পদ করিল সে হীন
কিছুই বিচিত্র নহেত ইহার।
যেহেতু তোমার পদযুগে সদা
পূজা-পরায়ণ ছিল সে বাণ ;
তব ও শ্রীপদে নোঙাইলে মাথা,
কেবা নাহি হয় উন্নতিমান ? ॥ ১৩ ॥

অকাল-ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়- ভীত-সুরাসুর চয়
তাসবে হইয়ে কৃপাবান,
জগৎ রক্ষিতে মন— ওহে দেব ত্রিলোচন
কালকূট করেছিলে পান !
অহো ! তব কণ্ঠে কিবা তাহারি নীলিমা-বিভা
তাহে কিবা শোভার সঞ্চার !
ভুবন-ভয়-ভঞ্জন করিছেন যেই জন
বিকারেও গৌরব তাঁহার ! ১৪ ॥

সুরাসুর-নর-প্রতি অব্যর্থ বিজয়ী অতি
ভবে যার শর-সঞ্চালন,
সেইত মদন হায় ! ভাবিয়াছিল তোমায়
ইতর-দেবতা-সাধারণ !

তাই তার মনোময় তনু মাত্র হ'ল সার!
জিতেন্দ্রিয়ে তুচ্ছিলে না অমঙ্গল হয় কার?॥১৫॥

জগৎ রক্ষার্থ তব তাণ্ডব-নৃত্য কেবল;
তব ও চরণাঘাতে টলমল ভূমণ্ডল!
ভীমভুজ-সন্তাড়ন! ঊর্দ্ধ-জটা আস্ফালন!
আকাশের প্রান্তে লাগে আঘাত সে দাপে!
আহত ব্যাহত হয়ে গ্রহগণ কাঁপে!
প্রভো! তব জগতে যে প্রভুত্ব প্রকটে,
হয় তাহা এইরূপ বিপরীত বটে!॥ ১৬ ॥

দিগন্তব্যাপী সে প্রবাহ গঙ্গার,
তারাপুঞ্জ-জ্যোতি-ফেণ-পুঞ্জ যার;
বারিধি-বেষ্টিত দ্বীপ এ জগৎ—
স্পষ্ট তব শিরে—দৃষ্ট বিন্দুবৎ!
এ হতেই আহা হয় হে নিশ্চয়,
তব দিব্যবপু-মহিমা-নির্ণয়।॥ ১৭ ॥
পৃথ্বী রথরূপা, বিরিঞ্চি সারথী;
চন্দ্র-সূর্য্য তাহে দুইচক্র-গতি,
সুমেরু ধনুক, স্বয়ং বিষ্ণু বাণ,
ত্রিপুর-তৃণের দহন-বিধান!
এত আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন?
প্রভু-ইচ্ছাতেই সর্ব্ব-সংসাধন!॥ ১৮ ॥

সহস্র কমলে ও পদ-কমলে
রত হরি অর্চ্চনায়;
কমিল তাহার একটি কমল,
অমনি আপন নয়ন-কমল
উৎপাটন করি আপনি শ্রীহরি
উৎসর্গিলা তব পায়!
সে ভক্তির ফলে তিনি সুদর্শনচক্র পান,
যে চক্র জাগ্রত সদা ত্রিলোক করিতে ত্রাণ॥১৯॥

সমাপিত যজ্ঞ করিতে ফলিত,
হে পুরুষ! তুমি আছ জাগরিত।
অর্চ্চনা তোমার বিনা কোথা কা'র
হত যজ্ঞে ফল ধরে?
ফল প্রদানেতে প্রতিভূ তোমাকে
এই জন্য ঠিক জানিয়াই লোকে
বেদে ভক্তিমান, বৈধক্রিয়াবান,
দৃঢ়বদ্ধ পরিকরে॥ ২০ ॥
ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষ যজমান যথা,
যজ্ঞেশ্বর যথা আপনি বিধাতা,
যাহে ঋষি যত পৌরহিত্যে রত,
সদস্য সুর নিচয়;
যজ্ঞ ফল-দানে তুমিই নিরত,
তাই হেন যজ্ঞ তোমাহতে হত!
অশ্রদ্ধায় কৃত যজ্ঞ সুনিশ্চিত
"অভিচার"-রূপী হয়।॥ ২১ ॥
মোহে মৃগরূপা-কন্যা-অনুগতি
করেছিলা মৃগরূপে প্রজাপতি;
তুমি ব্যাধ প্রায় তাড়াইলে তাঁয়,
ধনুর্ব্বাণ ধরি হাতে;
তব শরাঘাতে হয়ে সম্পীড়িত,
হইলেন স্বর্গপুরে পলায়িত;
তিনি যে তথাপি অমুক্ত অদ্যাপি
মৃগ-ব্যাধ-ভাবনাতে!॥ ২২ ॥
স্বলাবণ্য-বলে জিনিতে তোমারে,
হে বরদ! সেই পুষ্পায়ুধ-মারে,
আপন সম্মুখে দগ্ধ হতে দেখে
তখনি তৃণের ন্যায়,
হয়ে দেবী যম-নিয়ম-ধারিণী,
(তপস্যায়) তব দেহার্দ্ধ ভাগিনী!
হে পুরমথন! মুগ্ধা নারীগণ
"স্ত্রীজিত" বলে তোমায়!॥ ২৩ ॥
শ্মশানেতে তব ক্রীড়া স্মরহর!
সহচর তব পিশাচ নিকর;
চিতাভস্ম তব অঙ্গ-আলেপন,
নৃমুণ্ডাস্থিমালা কণ্ঠেতে ধারণ!
হোক্ অমঙ্গল্য তব ব্যবহার,
স্মরে যারা (শিব) নামটি তোমার,

তাদের পরমমঙ্গল-বিধাতা
তুমিই ত হও, ওহে বরদাতা! ॥ ২৪ ॥
বৈধ প্রাণায়ামে প্রাণ নিরোধিয়া,
আত্মায় মনের সমাধি সাধিয়া,
আনন্দ-আবেগে অঙ্গ লোমাঞ্চিত,
আনন্দাশ্রু-ধারা নয়নে নিঃসৃত,
অমৃতের হ্রদে মগ্ন যোগীগণ
যে তত্ত্ব অন্তরে করি নিরীক্ষণ,
অনন্ত আহ্লাদে আপ্লুত-হৃদয়,
সে পরমতত্ত্ব তুমিই নিশ্চয় ॥ ২৫ ॥
তুমি হও সূর্য্য, তুমি শশধর,
তুমি হে পবন, তুমি বৈশ্বানর,
তুমি হও জল, তুমি হও ভূমি,
তুমি হে আকাশ, আত্মারূপী তুমি;
এইরূপে বাক্যে করি সীমাবদ্ধ,
প্রাচীন ঋষিরা কন তব তত্ত্ব;
কিন্তু এ বিশ্বের কি যে তুমি নয়,
তাহাই আমরা বুঝিনা নিশ্চয় ॥ ২৬ ॥
ঋক্ আদি তিন বেদ, তিনটি বৃত্তির ভেদ,
তিন লোক, তিন দেব আর—
অকারাদি বর্ণ তিন— স্বরূপে বিকারহীন,
একে তিন বিকাশ তোমার।
চতুর্থ সত্ত্বার তব সূক্ষ্মরূপ-অনুভব
নাদ-যোগে সাধিত সর্ব্বথা;
সমষ্টি ও ব্যষ্টি মতে, তুমিই প্রণব-পদে
প্রকাশিত হে আশ্রয়দাতা! ॥ ২৭ ॥
ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র,
মহাদেব, ভীমেশান,
তব অভিধান, এই অষ্ট নাম,
বেদেও আছে প্রমাণ।
বাঞ্ছিতার্থ ফল লভিতে কেবল,
সাধনা করিয়া সার,
তেজরূপী সেই এই তোমাকেই
করি দেব! নমস্কার ॥ ২৮ ॥

নমো নিকটস্থ! নমো হে দূরস্থ!
বন-প্রিয়! নমোনমঃ।
ত্রিলোচন! নমঃ, নমো বৃদ্ধতম!
নমোনমঃ যুবতম!
নমো ক্ষুদ্রতম! নমো বৃহত্তম!
নমস্তে স্মর-সংহার!
নমঃ সর্ব্বস্থিত! নমঃ সর্ব্বাতীত!
নমস্কার! নমস্কার! ॥ ২৯ ॥
রজোগুণাধিক্যে তুমি বিশ্বসৃষ্টিকার,
হে ভব! উদ্দেশে তব করি নমস্কার।
জন-সুখ-সঞ্চারণ-সত্ত্বগুণ ধরি,
হে মৃড়! পালিছ সৃষ্টি, নমস্কার করি।
তীব্রতমোগুণ-সঙ্গে করিছ সংহার;
হর হে! ধর হে মম পুনঃ নমস্কার।
ত্রিগুণ-অতীত-মহজ্জ্যোতির আধার-
পরব্রহ্ম শিব! নমস্কার! নমস্কার! ॥ ৩০ ॥
কোথায় বা ক্ষীণ-সত্ত্ব দীন চিত্ত এই,
কোথা তব গুণাতীত নিত্য সত্ত্ব সেই?
এই ভয়ে ভীত হিয়া, তবু মোরে প্রবর্ত্তিয়া,
হে বরদ! ভকতি আমার—
গাঁথি বাক্য-পুষ্পহার, প্রদানিল উপহার,
শ্রীচরণ-যুগলে তোমার। ॥ ৩১ ॥
হে ঈশ্বর!
নীলগিরি মসী হয়, সিন্ধু মসী-পাত্র,
লেখনী সুরতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা তত্র;
পত্র হয় পৃথ্বী যদি, আপনি শ্রীসরস্বতী
লেখিকা হইয়া সর্ব্বকাল লিখে যান,
তথাপি তব গুণের অন্ত নাহি পান! ॥ ৩২ ॥

—

'পুষ্পদন্ত' নামা সর্ব্বগন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
দেবদেব-শিশুশশিশেখর-কিঙ্কর,
শিবেরে করিয়া রুষ্ট, তাহে হয়ে রাজ্যভ্রষ্ট,
বর্ণিবারে পরে শিব-মহিমা-বৈভব,
করিলেন স্ততিদিব্য এ "মহিম্নস্তব"।

স্বর্গ-মোক্ষ-হেতু সেই সুর-গুরু হরে
পূজি করযোড়ে যেবা একান্ত অন্তরে
পড়ে এ অমোঘ স্তব—পুষ্পদন্ত-কৃত,
হয় সে কিন্নর-স্তুত—রয় শিবাশ্রিত।

শ্রীপুষ্পদন্তের মুখ-পঙ্কজ-নিঃসৃত
এই স্তবে হরে পাপ, হর হন প্রীত।
হলে কণ্ঠে ধৃত, গৃহে স্থিত বা পঠিত,
ভূতেশ মহেশ তাহে হন মহাপ্রীত॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

(সমাপ্ত)

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

জ্যোতিষ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology)। গণিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং প্রমাণসিদ্ধ, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না। প্রকৃতপক্ষে দেহতত্ত্বের (Physiology) সহিত মনস্তত্ত্বের (Psycology) যেরূপ সম্বন্ধ, গণিত-জ্যোতিষের সহিত ফলিত-জ্যোতিষের সেইরূপ সম্বন্ধ।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার কথিত হইয়াছে যে, সৌরজগতস্থ গ্রহগণে যে যে বস্তু বা শক্তি আছে, মানবে তাহা সমস্তই আছে। মানব সৌরজগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। হিন্দুশাস্ত্রমতে গ্রহ নয়টী বা নবগ্রহ, কিন্তু নাক্ষত্রিক দশা গণনাকালে বঙ্গদেশে আটটী গ্রহ ধরা হয়। ঐ আটটী গ্রহের মধ্যে সূর্য্য গ্রহগণের কেন্দ্রস্বরূপ, সূর্য্য ভিন্ন সাতটী গ্রহ গণনীয়। ঐ সাতটী গ্রহের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত মানবের মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটী চক্রের সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক, এক্ষণে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তির সহিত ঐ গ্রহগণের সম্বন্ধ নির্ণয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যেমন প্রকৃতির অন্তর-রাজ্যে মূলশক্তি দুই জাতীয়,—চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি, সেইরূপ বাহ্য-জগতেও সম ও বিষম (Possative & Negative) দুই জাতীয় তড়িৎশক্তি আছে। ঐ শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার যথা—আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ (Attraction & Repulsion)। ঐ শক্তিদ্বয় ও তাহার আকর্ষণ, বিক্ষেপণ এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যম হইতে যেমন মানবের অন্তর্বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উহা হইতে সমস্ত বাহ্যবস্তুও উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্গার (Carbon), যবক্ষার জান (Nitrogen), জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), লবণ (Salt), গন্ধক (Sulphur), প্রভৃতি অনেক গুলি উপাদান শারীরিক ও মানসিকশক্তি বা বৃত্তিবিশেষের পোষক বা হ্রাসক। যবক্ষারজানদ্বারা ক্রোধবৃত্তিসংযতা, লবণদ্বারা কামক্রোধের উদ্দীপন হয়, এইজন্য যোগীগণ যবক্ষারজান ব্যবহার করেন ও লবণ স্পর্শ করেন না। আবার অম্লজান ও গন্ধকদ্বারা যে জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এমন কি—অম্লজান ব্যতীত কোন জীব অল্প সময় মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না। গন্ধক ও অম্লজান যে উত্তেজক গুণবিশিষ্ট, তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড়জগৎ বা জড়বস্তুর মধ্যে উদ্যম ও প্রবৃত্তি

দেখিতে পাই, তাহাই অনুভূতি (Feeling) সম্মিলনে, জীবজগতের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও ক্রিয়া-শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব অম্লজান ও গন্ধক কেবল শারীরিকশক্তি ও তেজবর্দ্ধক নহে, বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, প্রভৃতি বৃত্তির পোষক, জলজান ও যবক্ষারজান উহার বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা শারীরিক অনিষ্টকারক নহে। উহাদ্বারা বাসনা ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি খর্ব্ব হওয়ায়, তদ্‌বিপরীত গুণবিশিষ্ট ধৃতি, ক্ষমা, শম, দম প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশিত হয়। যাহা হউক, ঐ সকল উপাদানের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ-বিয়োগ হইতে শরীরের এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংঘটিত ও সদসৎ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। শরীরের সহিত মনের এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে; পুনর্বর্ণন অনাবশ্যক। বিশেষ বিশেষ খাদ্য ভক্ষণ ও ঘ্রাণ প্রভৃতিদ্বারা যে বৃত্তিবিশেষ উত্তেজিত হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের তারতম্যে রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি প্রাণায়ামদ্বারা যোগিগণ যে অনাসক্ত ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হন, তাহাও ঐ যবক্ষারজান প্রভৃতি গ্রহণ, উপভোগ ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ। সৌরজগতস্থ গ্রহগণে সম ও বিষম জাতীয় তড়িৎ, আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এবং উদ্যম, প্রবৃত্তি সমস্তই আছে; সুতরাং অম্লজান, যবক্ষারজান ও জলজান প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুবিধ উপাদান ঐ সকল গ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছে; তবে এক এক গ্রহে এক এক শক্তি বিশেষের ন্যূনাধিক্য আছে, যেহেতু সকল গ্রহ একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহে। যেমন বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, বার, তিথি, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা জন্য সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি, গতি, স্থান, দূরত্ব, সময়, পরিমাণ নির্ণয়ার্থে জ্যোতির্ব্বিদগণ গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষুব-রেখা (Equator) উষ্ণপ্রধান দেশ (Torrid Zone) দুইটী নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশ (Two Temperate Zones) দুইটী শীত-প্রধান দেশ (Two Frigid Zones) রাশিচক্রের মধ্য-রেখার ক্রান্তিপাত (Ecliptic) প্রভৃতি বহু-বিধ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় গণিত-জ্যোতিষের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ আর্য্যঋষিগণ গ্রহতত্ত্ব ও গ্রহশক্তির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ ফল নির্ণয় জন্য সৌর জগতের সীমান্ত-স্থান (Space) (ক) দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশটী রাশি অবধারণ এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ফল নির্ণয় জন্য প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক রাশি ও তাহার প্রত্যেক অংশে গ্রহগণের গতি, স্থিতি ও সময়-নির্ণয় এবং গ্রহস্ফুট গণনা প্রভৃতি দ্বারা ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মতে সূর্য্যের, কোন কোন মতে পৃথিবীর দ্বাদশটী রাশি ভ্রমণপূর্ব্বক এক-বার সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টনের নাম বার্ষিক গতি বা এক বর্ষ এবং এক এক রাশি অতিক্রমে এক এক মাস ও এক এক কলা বা অংশ অতিক্রমে এক দিবারাত্র হয়। পৃথিবী কোন নির্দ্দিষ্ট রাশির নির্দ্দিষ্ট কলা বা অংশে অবস্থান করিয়া একবার স্বীয় দেহ আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ বা কলা অতিক্রম করে, উহারই নাম দিবারাত্র। যদিও পৃথিবী এক দিবারাত্রে

(ক) যত দূর সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি বিস্তৃত, তাহাই সৌরজগতের সীমান্তস্থান।

রাশির একাংশের মধ্যে অবস্থান করে বটে, কিন্তু ঐ একাংশে অবস্থান করিয়া স্বীয় দেহ আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দুই ঘণ্টায় এক এক রাশির সমসূত্রবর্ত্তী হয়; এইরূপে ক্রমে পরপর ১২টী রাশির সমসূত্রবর্ত্তী বা দৃষ্টিগোচরীভূত হইয়া আহ্নিক গতি বা এক দিবারাত্র অন্তে তৎপর দিন প্রত্যূষে তৎপরবর্ত্তী কলা বা অংশে গমন ও অবস্থান করিয়া, পূর্ব্ববৎ ২৪ ঘণ্টায় ক্রমিক ১২টী রাশির দৃষ্টি অতিক্রম করে। পৃথিবী যে রাশির সমসূত্র—অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে সেই রাশি এবং সেই রাশিতে যে যে গ্রহ অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের লগ্ন প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মস্থ রাশিই তাহার প্রথম লগ্নস্থান। সেই রাশি হইতে ক্রমিক পরবর্ত্তী রাশি সকল গণনা আরম্ভ হয়, যথা—প্রথম জন্মস্থ রাশি লগ্ন, তৎপর দ্বিতীয় রাশিতে ধন, তৃতীয়ে ভ্রাতা, চতুর্থে বন্ধু, পঞ্চমে পুত্র, বিদ্যা, ষষ্ঠে শত্রু, সপ্তমে জায়া, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে ধর্ম্ম, দশমে কর্ম্ম, একাদশে আয় ও দ্বাদশে ব্যয়। অতএব জন্মকালীন লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি স্থানে যে গ্রহ বা যে যে গ্রহ অবস্থান করিবেক, সেই সেই গ্রহের শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে মানবের সাধারণতঃ ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, জায়া প্রভৃতি সম্বন্ধে শুভাশুভ নির্ণীত হইবেক; কিন্তু সূক্ষ্ম বা স্ফুট গণনায় কেবল এক এক রাশিতে গ্রহের অবস্থান নির্ণয়দ্বারা ঐ গণনার ইপ্সিত ফল লাভ হয় না। কোন্ রাশির কত অংশে বা কলায় কোন্ সময় কোন্ গ্রহ অবস্থান করে, তাহাই নির্ণয়দ্বারা সূক্ষ্ম বা স্ফুট গণনা সম্পন্ন হয়।

(নাক্ষত্রিক, স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতির বিবরণ)

এক এক রাশি ২¼ অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ এক এক রাশির সীমান্তর্গত ঊর্দ্ধভাগে ২¼ নক্ষত্রের অবস্থান; এইরূপে ১২টী রাশির ঊর্দ্ধভাগে ২৭টী নক্ষত্রের অবস্থান, ঐ এক এক নক্ষত্রের সীমান্ত স্থানে ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে চন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্দ্বারা অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র গণনা করা হয়। অতএব চন্দ্র ২¼ দিনে এক রাশি অতিক্রম করেন। এই নক্ষত্র গণনা হইতে মানবের স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা ও তাহার শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পূর্ব্বোক্ত মত ২৭টী নক্ষত্রের অস্তিত্ব ও তৎসহ চন্দ্র ও পৃথিবীর সংস্রব ও সম্বন্ধ আদৌ স্বীকার করেন না, সুতরাং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ ভিন্ন আদৌ নক্ষত্র গণনা নাই। হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের সীমার মধ্যে চন্দ্রের অবস্থানকালে (যাহা সচরাচর ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগ বলে) জন্মগ্রহণ হইতে মানবের পূর্ব্বোক্ত দশা গণনারম্ভ হয়। যেমন কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে রবির দশায় জন্ম হয়। বঙ্গদেশে রবি হইতে শুক্রপর্য্যন্ত ৮টী দশায় ১০৮ বৎসর পরমায়ুর ঊর্দ্ধসংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে, যথা রবি ৬ বৎসর, চন্দ্র ১৫ বৎসর, ইত্যাদি। এইরূপে কোন ব্যক্তি চন্দ্রের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে, চন্দ্র হইতে রবিপর্য্যন্ত ১০৮ বৎসর গণনার পূর্ণসীমা; কিন্তু মানবের লগ্ন, দশা, গ্রহদৃষ্টি প্রভৃতি সামঞ্জস্য করিয়া পরমায়ু নির্ণীত হয়। সে মতে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রায় ৮টী দশা অতিক্রম করিতে পারে

না, এজন্য ষড়দশার অতিরিক্ত পরমায়ু গণনা প্রায় করা হয় না; ষড়দশার মধ্যেই প্রায় মৃত্যুকাল নির্ণীত হয়। দশা গণনার নিমিত্তই চন্দ্রকর্ত্তৃক নক্ষত্রের যত অংশ ভুক্ত হওয়ার পর জন্ম হয়, জন্মকালে সেই গ্রহের দশার তত ভুক্তাংশের কাল বাদ দিতে হয়, যথা ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা ১২ বৎসর, কিন্তু ধনিষ্ঠা, শতভিষা নক্ষত্র সম্পূর্ণ ও পূর্ব্বভাদ্রপদের ½ অংশ গতে জন্ম হইলে, ঐ ১২ বৎসরের ভুক্তকাল ১০ বৎসর বাদ দিয়া তাহার জন্মকাল হইতে রাহুর দশা ২ বৎসর গণনা করা হইবে। ৩ বৎসর বয়সে শুক্রের দশায় পড়িবে, ইহারই নাম স্থূলদশা। ঐ স্থূলদশার অন্তর্দ্দশা অন্তঃ এবং প্রত্যন্তর্দশা গণনা করা হয়। ঐ স্থূলদশাকে পুনর্ব্বার (অষ্টম দশার কাল ১০৮ বৎসর) ১০৮ ভাগ দিয়া প্রত্যেক দশার অন্তর্দশার কাল নির্ণীত হয়, যথা রাহুর দশা ১২ বৎসরকে ১০৮ ভাগ করিয়া একাংশে যত সময় হয়, তাহার নিজরাহু ১২ চন্দ্রের ১৫ ইত্যাদি যে গ্রহের যত অংশ সেই পরিমাণকাল সেই সেই গ্রহের অন্তর্দ্দশা। আবার ঐ একগ্রহের অন্তর্দ্দশা যত বৎসর বা মাস হয়, তাহাকে আবার ঐরূপ ১০৮ অংশে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মত প্রত্যেক গ্রহের যে পরিমাণ অংশ, তাহাই লইয়া প্রত্যন্তর্দশা নির্ণীত হয়। এইরূপ ক্রমে বিভক্ত ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লইয়া, প্রত্যেক সূক্ষ্ম প্রত্যন্তর্দশা দিন, দণ্ড, পল পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষফল, কেতু, চক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গণনা আছে। যাহাহউক ফলিতজ্যোতিষের লগ্ন, দৃষ্টি প্রভৃতির কারণ নির্ণয়াপেক্ষা নাক্ষত্রিক দশার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ঐ দশা গণনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কি, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালে ঐরূপ এক একটী দশা (যথা কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, রবির দশা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদে রাহুর দশা ইত্যাদি) হওয়ার কারণ কি? ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালে রবি বা রাহুর কি সম্বন্ধ, ইহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। উৎকৃষ্ট খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। * প্রকৃতপক্ষে এই ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র যে মহাত্মা বা মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তিনি বা তাঁহারা সৌরজগতের সমস্ত শক্তিতত্ত্ব এবং গ্রহদিগের ও মানবের উপাদানশক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহগণের, স্থিতি, গতি, দূরত্বের সহিত মানবের জন্মকালে সংস্রব ও শক্তি নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া কেবল তাহার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মানবের কর, পদ, ললাট, মুখাবয়ব, মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি শারীরিক চিহ্ন এবং মানসিকভাব ও ক্রিয়ার লক্ষণদ্বারা ফলাফল নির্ণয়ের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ সঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সাঙ্কেতিকবিদ্যাই আমাদের ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র ও সামুদ্রিক গণনা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ আবিষ্কারকালে আবিষ্কৃত বিষয়ের গূঢ়কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করেন নাই। যেন মানবজগতে ঐ গূঢ়কারণ ব্যক্ত না করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কেবল জ্যোতিষ-

* ভাটপাড়া নিবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বহু চিন্তায় স্থির করিতে না পারিয়া অন্যান্য প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সহিত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আমাকে তাহার মর্ম্ম বলিবেন, বলেন; তৎপর বর্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা, বহু ও অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সহিত তর্কদ্বারাও নাক্ষত্রিক দশার প্রকৃত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র নহে, সমস্ত শাস্ত্রের অভ্যন্তরে যে গূঢ়তত্ব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা গাঢ় আবরণে আবরিত রাখা প্রাচীন ঋষিগণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার কারণ নির্ণয় আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; ফলিত-জ্যোতিষের সার মর্ম্মালোচনার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

ফলিতজ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তাহার পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা অতীব কঠিন—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রত্যেক গ্রহ ও তাহার উপাদান এবং শক্তি নির্ণয়ান্তে পরস্পরের মধ্যে সম ও বিষমজাতীয় শক্তি, পরস্পরের দূরত্ব ও গতি, স্থিতি অনুযায়ী অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির তারতম্য এবং মানবের শারীরিক ও মানসিক উপাদান ও শক্তি ও শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বৃত্তি ও তাহার উদ্যম ও ক্রিয়ার সহিত গ্রহগণের প্রত্যেক ব্যাপারের সংস্রব ও সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বাহ্য মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ সকল আবিষ্কার ও অবধারণ ব্যতীত ফলিত-জ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যাইতে পারে না; উহা সিদ্ধ মহাত্মাগণ ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃক সম্ভবে না। তবে ঐ ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র অমূলক কিম্বা সমূলক ও তাহার সার মর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ গ্রহশক্তি ও মানব-শক্তির মধ্যে অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষণই মানবজীবন। ঐ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির ন্যূনাতিরেক ও তারতম্যানুসারে মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি ও সমস্ত শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। জীবনীশক্তি যে উহার সম্পূর্ণ অধীন, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে ঐ সকল শক্তিতত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ গ্রহ কয়েকটীর লক্ষণ নির্ণয় ও তাহার সহিত পৌরাণিক রহস্যভেদ আবশ্যক। জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু পাপগ্রহ বলিয়া গণনীয়; কিন্তু উহাদের স্থিতি, গতি, দূরত্ব প্রভৃতি পরস্পরের অবস্থা ভেদে শক্তির ন্যূনাতিরেক ও অনুকূল-প্রতিকূলতার তারতম্যানুসারে কখন কখন উভয় শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের মধ্যেও পরস্পরের প্রতিকূল শক্তির উদ্রেক হেতু শক্রভাব স্থিরীকৃত হয়। যথা শতভিষানক্ষত্রে, কুম্ভ রাশিতে ও রাহুর দশায় জন্মকালীন লগ্নে চন্দ্র থাকিলে, চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহ শনি রাহুর সমভাব, বুধ শুক্রের সহিত রাহুর মিত্রভাব হয়। আবার যে শুভগ্রহ পুত্র স্থানে ও ধ্বংস স্থানে শুভ, সেই গ্রহ হয়ত ভ্রাতৃস্থানে অশুভ হয়; কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রায় শুভগ্রহ স্থল বিশেষে অশুভ হইলেও ঠিক্ স্বয়ং অশুভ বলা যায় না। অন্যান্য স্থানে অন্য পাপগ্রহের সংস্রবহেতু তাহার সংঘর্ষণে অশুভত্বে পরিণত হয়। সাধারণতঃ জ্যোতিষের মতে চন্দ্র মনের অধিপতি, বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি ইত্যাদি; আবার শারীরিক সম্বন্ধে চন্দ্র জীবনীশক্তির বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি, রাহু ধ্বংসাধিপতি ইত্যাদি; কিন্তু স্থলবিশেষে উহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারেও হয়। এই স্থানে কিঞ্চিৎ পৌরাণিক বিষয় বর্ণনা করিয়া, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত চন্দ্র এবং বৃহস্পতির গুণ এবং শক্তি-তত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। পৌরাণিক মতে বৃহস্পতি দেবগুরু এবং দেবতাদিগের উপদেষ্টা; চলিত কথায় বলে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি"। শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের গুরু এবং উপদেষ্টা; চন্দ্রে আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। কোন কোন

পুরাণের মতে মৃত্যান্তে মানবাত্মা পরলোক গমন ও তথায় দণ্ড বা পুরস্কারান্তে কর্ম্মফলানুসারে এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করে; তথা হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ শক্তি পৃথিবীতে প্রায় উদ্ভিদাদি কি ফলাদির সহিত সংমিশ্রিত হয়। ঐ উদ্ভিদ ও ফলাদি মাতা পিতা ভক্ষণ করায়, ঐ শক্তি মাতা পিতার শোণিত-শুক্রের সহিত সংমিশ্রিত হইলে, মাতা পিতার ঐ শোণিত ও শুক্রসংযোগে জীবের জন্ম হয়। এদিকে চন্দ্র ওষধিপতি; উদ্ভিদাদি চন্দ্র হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার পিতৃলোক চন্দ্রের জ্যোতিতে বাস করেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। তাত্ত্বিক মণ্ডলীর মতে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার (Store of life)। একজন ইংলিসম্যান্ মিঃ সিনেট্‌কে তাহার কারণ নির্দ্দেশ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তদুত্তরে তাত্ত্বিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপদেষ্টা মহাত্মা এক্ষণে উপরোক্ত বিষয়টীর মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, (ক) যাহা হউক, তদ্বিষয়ে আলোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চন্দ্র জীবন এবং মনের অধিপতি, রাহু ধ্বংসাধিপতি; পৌরাণিক মতে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকেন; যদিও উহা চন্দ্রগ্রহণ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার মধ্যেও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে। এক মৌলিকশক্তি হইতে যে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি এবং শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইলে মানসিক বলের হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত ও সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব চন্দ্র, মন ও জীবনের অধিপতি হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। মানবের একাধারে জীবনীশক্তি ও মানসিকবল উভয়ই আছে; চন্দ্র ঐ উভয় শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে

দেবগুরু বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি; মানবীয় সদ্বৃত্তি যে অধিকাংশ চৈতন্যের তৈজসশক্তি বা সত্ত্বগুণসম্ভূত ও দেবজাতীয় এবং অসদ্বৃত্তি যে রাজসিক ও তামসিকশক্তিজাত ও অসুরজাতীয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অসদ্বৃত্তি দমন ও সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্য-রক্ষাকর্ত্তা বৃহস্পতি, উহাই সদ্বুদ্ধি বা মহত্ত্ব। সদ্‌বুদ্ধি সৃষ্টিকারি-শক্তির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না; অতএব বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত গ্রহগণের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আদান প্রদান ও গ্রহদিগের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আকর্ষণ, বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরস্পরের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি লইয়াই ফলিতজ্যোতিষ। এক সময়ে অল্পাংশ শুভগ্রহ অধিকাংশ পাপগ্রহ মানবশক্তির উপর প্রবল হইলে, পাপগ্রহের মধ্যে নিধন-শক্তি, জীবনীশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। নিধন-শক্তি জীবনীশক্তির বিষম জাতীয় সন্দেহ নাই। ঐ আকর্ষণে জীবনীশক্তি হ্রাস ও উপাদানের সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানব ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তির অনুকূল শুভগ্রহ ঐ ধ্বংসশক্তি আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি বিক্ষেপণ করায়, ঐ আকর্ষণ-বিক্ষেপণ ক্রিয়াহেতু ধ্বংসশক্তি কর্তৃক মানবের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ গ্রাসিত হইবার পূর্ব্বে আর একটী জীবনীশক্তির অনুকূল শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া ঐ ধ্বংসশক্তিকে পূর্ণবেগে আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি, ধ্বংস-

(ক) See Five essays on Theosophy.

শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, মানব সে যাত্রা রক্ষা পায়। তদ্ভিন্ন মানবের একটী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। যদিও ঐ স্বাধীন শক্তি মানসিকবৃত্তি ও গ্রহশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, তথাচ মানব স্বীয় যুক্তি ও সদসদ্‌বিবেচনাদ্বারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে; উহাই পুরুষকার। পুরুষকারে প্রবৃত্তি হইলে সদ্‌বৃত্তি ও শুভগ্রহ সকল তাহার অনুকূল হয়; অতএব পুরুষকারদ্বারা অনুকূলশক্তির তেজ বর্দ্ধিত হওয়ায় পাপগ্রহের প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ও প্রতিকূল শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়। আবার নিজকার্য্যদোষে অনুকূলশক্তি ধ্বংস হওয়ায়, গ্রহদিগের মধ্যে প্রতিকূল গ্রহশক্তিঅধিক কার্য্যকরী হয়; এজন্য কোষ্ঠীর নির্ণীত মৃত্যুকালের পূর্ব্বে বা পরেও মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহকালের কর্ম্মফলদ্বারা নির্ণীত গ্রহফলের ব্যতিক্রম ও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। সাবিত্রীকর্ত্তৃক সত্যবানের জীবন রক্ষা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের মূলে সত্য নিহিত আছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের সহিত গ্রহাদির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাই অদৃষ্ট; তদ্ভিন্ন মানবের স্বাধীন শক্তিবলে (অবশ্যই গ্রহাদির উত্তেজনায় মনোবৃত্তি উত্তেজিত ও বুদ্ধিও তদনুরূপ হয় ও স্বাধীন শক্তি পরিচালনেও প্রতিবন্ধক হয়) ইহ জীবনের কার্য্যদ্বারা (পুরুষকারদ্বারা) যে অদৃষ্ট বা গ্রহশক্তি কথঞ্চিৎ দমিত ও প্রশমিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন পাপগ্রহকর্ত্তৃক জীবনীশক্তি আকর্ষণকালে কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি থাকিতে শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া পাপগ্রহকে কার্য্য হইতে বিরত করায়, যেরূপ পার্থিব ঔষধাদি ব্যবহারদ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধিহেতু অবস্থাভেদে পাপগ্রহের আকর্ষণ হইতেও মানব কচিৎ অব্যাহতি পাইতে পারে * সেইরূপ সৎক্রিয়াদ্বারা শারীরিক ও মানসিক তেজ বর্দ্ধিত ও অদৃষ্ট বা কুগ্রহ দমিত ও প্রশমিত হয়, ঐ সৎক্রিয়াই পুরুষকার; অতএব ইহ জীবনের কর্ম্মফলের সহিতও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* নিধনশক্তি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যে সময় মধ্যে ষোল-আনা জীবনীশক্তি গ্রাসিত হইবে, সেই সময় জীবনীশক্তিপূরক ঔষধাদি দ্বারা এক আনা জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইলে ঐ এক আনা জীবনীশক্তি থাকিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায়, অথবা অনুকূল গ্রহশক্তি কর্ত্তৃক নিধনশক্তি বিতাড়িত বা সৎক্রিয়াদ্বারা নিধনশক্তি দমিত হইলে, ক্রমে জীবনীশক্তি পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি?

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি?

শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা ঘ্রাণাখ্যানি (১)

শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়।

---

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। শ্রোত্রত্বক্ চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণাখ্যানি। এতান্যাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যন্তে।

বেদান্তসারে।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।

"তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেব বৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্‌যথা—শ্রোত্রত্বক্ চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণবাগ্‌ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি।"

সুশ্রুতঃ শারীরস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ে।

তৈজস সহায়ে অহঙ্কারের বিকার হইতে সেই লক্ষণযুক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা এই শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ ও মন।

"তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ইতরাণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। উভয়াত্মকং মনঃ।"

ঐ ঐ

ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্য পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয়াত্মক।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশম্।"

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায়ে ১৯।

প্রবচনভাষ্যং। একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণি পাদপায়ূপস্থানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুশ্রোত্রত্বগ্রসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ। এতৈর্দ্দশভিঃ সহান্তরং মন একাদশকমেকাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ।

একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, রসন, ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্থান গোলক নহে, তাহাই কহিতেছেন।

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।"

সাংখ্যদর্শনে ২ অঃ ২৩।

প্রবচনভাষ্যং। গোলকজাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিকমতমপাকরোতি। ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বমতীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যক্ষং ভ্রান্তানামেব ত্বধিষ্ঠানে গোলকে তাদাত্ম্যেনেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ।

নাস্তিকেরা কহিয়া থাকেন যে ইন্দ্রিয় সকল গোলকজাত, এই সূত্রে সেই মত নিরাস করিতেছেন। সকল ইন্দ্রিয়ই অতীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষ নহে। কেবল ভ্রান্ত মনুষ্যগণই গোলকের অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু মন যে ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইল, তাহা উভয়াত্মক। ইহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন ও মহর্ষি কপিলও কহিয়াছেন, যথা—

"উভয়াত্মকং মনঃ।

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায় ২৬।

প্রবচনভাষ্যং। একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোঽনেদশশক্তিভেদা ইত্যাহ। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকং মনঃ ইত্যর্থ

এক মনই মুখ্য ইন্দ্রিয়; অন্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ই. সেই মুখ্য ইন্দ্রিয়রূপী মনের বিশেষ শক্তি। এক মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক।

এক্ষণ দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কহিতেছেন,—

"রূপাদি রসমলান্ত উভয়োঃ।"

ঐ ২ অধ্যায়ে ২৮।

প্রবচনভাষ্যং। অন্নরসানাং মলঃ পুরীষাদিঃ। তথ রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাবক্তব্যাদাতব্যগন্তব্যানন্দয়িতব্যোৎস্রষ্টব্যাশ্চোভয়োর্জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্দ্দশবিষয়া ইত্যর্থঃ। আনন্দয়িতব্যং চোপস্থস্যোপস্থান্তরং বিষয় ইতি।

অন্নরসের মল পুরীষাদি। রূপগ্রহণাদি মল নিঃসারণপর্য্যন্ত সমুদায়ই উভয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্য গ্রহণীয়, গন্তব্য, আনন্দনীয়, উৎস্রষ্টব্য,

এই কার্য্যগুলি উভয় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দশটি বিষয়।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অঃ ৫১।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ত্বক্ চক্ষুর্নাসিকাজিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ২ অ, ৪৪।

শ্রোত্রং ত্বকচক্ষুষীজিহ্বাঘ্রাণঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্মাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়োধাবেৎ বহির্মুখম্॥৪

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে।

শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চেন্দ্রিয় গোলকস্থ কর্ণাদি ক্রমান্বয়ে শব্দাদি গ্রহণ করে। এই সকল ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়। তাহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয় গ্রহণে ধাবমান হয়।

"ঘ্রাণরসনা চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ॥

ন্যায়দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ আহ্নিকে ১২।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "গোলকেভ্যোঽতিরিক্তানীন্দ্রিয়াণি।"

সাংখ্যদর্শনে ৫ম অধ্যায়ে ১০৪ সূত্রভাষ্যে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুঃ

ইন্দ্রিয় সকল গোলক হইতে অতিরিক্ত।

"ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্ ভাবাদ্ বুদ্ধিবিক্রিয়তে হ্যতঃ।
শৃণ্বতী ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে॥ ৪॥
পশ্যতী ভবতে দৃষ্টী রসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধির্বিক্রিয়তে পৃথক্।
ইন্দ্রিয়াণি ভূতান্যাহুস্তেষদৃশ্যোঽধিতিষ্ঠতি॥ ৫॥"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২৪৭ অধ্যায়ে।

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ ভাববশতঃ বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে, তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে, তখন স্পর্শ, যখন দৃষ্টি করে, তখন দর্শন, যখন আস্বাদন করে, তখন রসনা, যখন আঘ্রাণ করে, তখন ঘ্রাণ বলিয়া কথিত হয়; তজ্জন্য বুদ্ধি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে; বুদ্ধির সেই বিকার সকলকে ইন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি তাহাতে অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে॥ ৫॥

যদি কেবল মাংসাস্থি-নির্ম্মিত শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণদ্বারা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হয় ও বুদ্ধির কার্য্য না থাকে, তাহাহইলে দেহের আভ্যন্তরিক শব্দাদি কি প্রকারে উপলব্ধি হয়? তজ্জন্য পঞ্চদশী কহিয়াছেন।—

"কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যাক্ষণোমান্তরগ্রহঃ॥ ৫॥"

ইহার অর্থ এই যে কদাচিৎ কর্ণ বন্ধ করিলে, প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নিতে বিদ্যমান যে আন্তরিক শব্দ, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপানে ও অন্নভক্ষণে আভ্যন্তরিক স্পর্শ অনুভব করা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করা যায়। উদ্গার হইলে, রস ও গন্ধ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আন্তরিক শব্দ স্পর্শাদি অনুভবশক্তি জানিতে পারা যায়।

[পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপত্রিকাতে পঞ্চদশীর সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন]

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুমেঢ্রূ তথৈব চ॥ ২৭॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সম্ভূতানীহযুগপন্মনসা সহ পার্থিব॥ ২৮॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩০২ অধ্যায়ে।

(বশিষ্ঠ মুনি করাল নামে রাজাকে কহিয়াছিলেন) রাজন্! শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎসম্ভূত হইয়াছে।

"তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনশ্চাত্র কীর্ত্তিতং তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাত্র পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥ ১৯॥
তানি বক্ষ্যামি তেষাঞ্চ কর্ম্মাণি কুলপাবনাঃ।
শ্রবণং ত্বকচক্ষুর্জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী॥ ২০।
শব্দাদি জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি পঞ্চ বৈ।
পায়ূপস্থং হস্তপাদৌ কীর্ত্তিতা বাক্ চ পঞ্চমী॥
বিসর্গানন্দসিদ্ধিশ্চ গত্যুক্তি কর্ম্ম তৎ স্মৃতম্॥ ২১॥"

পদ্মপুরাণে আদি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে।

"শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্ত কর্ণ শষ্কুলাবচ্ছিন্ন নভোদেশাশ্রয়ং (২) শব্দগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি (৩)

শ্রবণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে?

ত্বক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণছিদ্রমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তি-বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয়।

(সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; এক্ষণ রাজসিক মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য বর্ণন করিতেছেন)। তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ কহিয়াছেন যে, দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহার মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; তাহাদিগের কর্ম্ম সকল বলিব। সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে কুলপাবনগণ! শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি জ্ঞান লাভ করে ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদিগের কর্ম্ম ত্যাগ, আনন্দ, সিদ্ধি, গতি ও উক্তি।

"ইন্দ্রিয়াণি দশশ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে॥

শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অ, ১৩।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসাবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
পাণি পাদৌ গুদবাক্ চ গুহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥

গরুড়পুরাণে উত্তরার্দ্ধে ৩২ অ, ৪১।

"শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিষয়াঃ পঞ্চবুদ্ধি-
তদর্থানি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি।"

বেদান্তদর্শনে ২অ, পাদে ৬ সূত্র, শারীরক ভাষ্যে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চ বুদ্ধি, তদর্থ পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়।

"শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষীঘ্রাণং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যথ।"

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২১০ অ, ৩০।

(২) শষ্কুল—কর্ণছিদ্র।

(৩) "শ্রোত্রং বৈগ্রহঃ...শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি।"

শ্রবণই জ্ঞান, শ্রবণের দ্বারা শব্দ সকল শুনিতে পাওয়া যায়।

ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়-মাপাদতল মস্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তি-মদিন্দ্রিয়গ্রহণং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। (৪)

ত্বক্ ভিন্ন—অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক-পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত উষ্মাদি স্পর্শগ্রহণশক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তং গোল-কাশ্রয়ংকৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তিরূপগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি) (৫)

গোলকাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন—অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণতারকার অগ্রবর্ত্তী রূপ-গ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়।

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্ত জিহ্বা-শ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বে-ন্দ্রিয়মিতি। (৬)

"শ্রোত্রং শৃণ্বৎ সর্ব্বে প্রাণা অনু শৃণ্বন্তি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩০২।

শ্রোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সকল প্রাণও শ্রবণ করে।

"শ্রোত্রে শব্দোপলব্ধৌ।"

গর্ভোপনিষৎ ১।

শ্রোত্রদ্বয় শব্দজ্ঞান লাভের জন্য।

(৪) "ত্বগ্ বৈগ্রহঃ ত্বচাহি স্পর্শান্ বেদয়তে॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ, ৯।

ত্বক্‌ই জ্ঞান, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়।

(৫) "প্রজ্ঞয়াচক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষাসর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩/৬।

জ্ঞানদ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সকল রূপ দর্শন করে।

"চক্ষুর্বৈগ্রহঃ...চক্ষুষাহিরূপাণি পশ্যতি।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩অ, ২,৫,

চক্ষুই জ্ঞান, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) "প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া
সর্ব্বানন্নরসানাপ্নোতি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩/৬।

জিহ্বা ভিন্ন—অথচ জিহ্বাশ্রয়, জিহ্বার অগ্রবর্ত্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকা ব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তিগন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। (৭)

নাসিকাব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকার আশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তী গন্ধগ্রহণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি।

কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কি?

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি। (৮)

বাক্য, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ, ইহাদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়।

জ্ঞানদ্বারা জিহ্বাতে সমারূঢ় হইয়াই জিহ্বাদ্বারা সকল অন্ন রস প্রাপ্ত হয়।

"জিহ্বাবৈগ্রহঃ...জিহ্বায়া হি রসান্ বিজানাতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ। ৪

(৭) "ঘ্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি।"

কৌষিতকী ৩।৪।

(৮) রজোংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥"

পঞ্চদশী-তত্ত্ববিবেকে ২১।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথাক্রমে বাক্য, পাণি, পাদ, গুহ্যদেশ ও উপস্থ নামে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণি পাদপায়ূপস্থানি। এতানি পুনরাকাশাদীনাং রজোংশেভ্যোব্যস্তেভ্য পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যন্তে।"

বেদান্তসারে।

বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ, এই সকল আকাশাদির রজ-অংশ হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে।

"পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্কর্ম্মণী অপি।"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২১০ অ, ৩০।

পদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্ এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়।

"রাজস্যাশ্চ ক্রিয়া শক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষমে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনা চক্ষুর্ঘ্রাণঞ্চৈব চ পঞ্চমম্॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যস্থানি চ পঞ্চ বৈ॥"

শ্রীদেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৬১।৬২॥

(শৈলেশনন্দিনী হিমালয়কে কহিয়াছিলেন, হে পিতঃ!) রজোগুণের ক্রিয়াশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও গুহ্যস্থ (উপস্থ) এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

মাংসাস্থি নির্ম্মিত হস্ত পদাদিও কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থান কেবল হস্ত পদাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ ঐ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন হয়, যথা—

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি॥ ৬॥
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদি গোলকেম্বান্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকম্॥ ৭॥

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে।

কথন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদি অন্যান্য ক্রিয়া সকল ঐ সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য, কথনাদি পঞ্চ ক্রিয়ার অন্তর্গত। ঐ সকল পঞ্চেন্দ্রিয় মুখাদি স্থানে অবস্থিতি করে। কিন্তু ঐ সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ-
কর্ম্মভেদাস্তদর্থানি চ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি।"

বেদান্তদর্শনে ২ অ, ৪ পাদে ৬ সূত্রে শারীরকভাষ্যে।

বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, এতদর্থ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।

"পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ।
গতিবিসর্গোহ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্মতৎ॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অধ্যায়ে ৫২।

"পায়ুপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী।
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্মতেষাঞ্চ কথ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ২ অধ্যায়ে ৪৫।

বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়-মষ্টস্থানবর্ত্তিশব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। (৯)

বাক্যব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যের আশ্রয় অষ্টস্থানবর্ত্তী শব্দোচ্চারণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে।

অষ্টস্থানং নাম হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উর্দ্ধৌষ্ঠাধরোষ্ঠ তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি।

হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, উর্দ্ধোষ্ঠ, অধরোষ্ঠ, তালুদ্বয় ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান।

পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। (১০)

কর হইতে ভিন্ন—অথচ করতলের আশ্রয়, দান-আদান-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে পাণীন্দ্রিয় বলে।

পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তিগমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। (১১)

চরণ ভিন্ন—অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্ত্তী গমনাগমনশালী ইন্দ্রিয়কে পাদেন্দ্রিয় বলে।

পায়্বিন্দ্রিয়ং নাম গুহ্যব্যতিরিক্তং গুহ্যাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়্বিন্দ্রিয়মিতি। (১২)

অপান হইতে ভিন্ন—অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম পায়ু-ইন্দ্রিয়।

উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। (১৩)

উপস্থব্যতিরিক্ত—অথচ উপস্থাশ্রয়, মূত্র-শুক্রত্যাগ-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে উপস্থেন্দ্রিয় বলে।

এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে।

ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে।

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ ও বাক্য, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, তাহাদের কর্ম্ম সকল কহিতেছি যে—ত্যাগ, শিল্প, গতি ও উক্তি।

(৯) "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।"

কৌষীতকী উপনিষৎ ৩৬।

"বাগ্‌বৈগ্রহঃ...বাচাহিনামান্যভি বদতি॥"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩ অ ২ ব্রাহ্মণ ৩।

বাক্যই জ্ঞান...বাক্যদ্বারা সকল নাম কহা যায়।

(১০) "প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যাপ্নোতি।"

কৌষীতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

"হস্তৌ বৈগ্রহঃ...হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩ ১৮।

হস্তই জ্ঞান...হস্তদ্বারা কার্য্য করা যায়।

(১১) "প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্ব্বাইত্যা আপ্নোতি।"

কৌষীতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

জ্ঞানদ্বারা পদ অবলম্বন করিয়া, পদদ্বয় দ্বারা সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

(১২) "সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নম্।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১।

ও ঐ পুস্তককে ৪ অধ্যায়ে ৫ ব্রাহ্মণে ১২॥

শরীর হইতে সমুদায় ত্যাগ করিবার পায়ুই একমাত্র আশ্রয়।

(১৩) "প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহ্যোপস্থেনানন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি।"

কৌষীতকী ৩।৬।

জ্ঞানদ্বারা উপস্থতে সমারূঢ় হইয়া আনন্দ ও সন্তান প্রাপ্ত হয়।

"সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১

ও ঐ পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে ৫। ১২।

সমুদায় আনন্দের উপস্থই একমাত্র আশ্রয়।

(১৪) অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মা।"

রামতাপনী উত্তরভাগে ৫ খণ্ডে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মক। মন আদিশ্চ——————।"

সর্ব্বোপনিষৎসারে ৭।

অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। (১৪)

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ বলে।

"ভাষ্যং। মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চ।"

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।"

বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথমপরিচ্ছেদে।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারাই অন্তঃকরণ।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চ।"

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৬ সূত্র শারীরকভাষ্যে।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি।"

মাণ্ডুক্যোপনিষদি ৩ মন্ত্র ভাষ্যে।

"তথাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনোবুদ্ধির্বিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। কচিচ্চ বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদিবৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তথৈবম্ভূতমন্তঃকরণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম্।"

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩২ সূত্র শারীরকভাষ্যে

আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত, এইরূপ অনেক নামে কথিত হয়। কোন কোন স্থলে বৃত্তি বিভাগ অনুসারে সংশয়াদি বৃত্তিককে মন কহে ও নিশ্চয়াদি বৃত্তিককে বুদ্ধি কহে। এরূপ অন্তঃকরণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু এবিষয়ে পঞ্চদশীর মত অন্য। পঞ্চদশীতে মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং তাহার স্থান হৃদয়ে কহিয়াছেন, যথা—

মনোদশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্ বিনেন্দ্রিয়ৈঃ।

ভূতবিবেক ৮।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন, উহা হৃদয়ে থাকে। ঐ মনকে অন্তঃকরণ কহে। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ অধীন; কারণ বাহ্য বিষয়ে কোন কার্য্য করিতে হইলে, মনের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

বেদান্তসারে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কারের লক্ষণ দিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারকে বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।
মনোনাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।
অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ।
অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তং।
অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ।"

অস্যার্থঃ।

নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে।

সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন কহে।

চিত্ত ও অহঙ্কার, এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে চিত্ত কহে।

অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলে।

মহাভারতেও অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি, এ কথা কোথাও উল্লেখ নাই, কেবল মন ও বুদ্ধির লক্ষণ আছে মাত্র।

"চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষীবৎ স্থিতঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি ১৯৪ অধ্যায়ে।

চক্ষুদ্বারা আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে, বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া থাকে; ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীর ন্যায় থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে অন্তঃকরণ চারি ভাগে বিভক্ত আছে।

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্ধালক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যালক্ষণরূপয়া॥",

তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণ একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় বটে, কিন্তু বৃত্তিভেদে ঐ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণের তিন বৃত্তি কহিয়াছেন—

"ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্"।

দ্বিতীয়োধ্যায়ে ৩০।

উহার ভাবার্থ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা অন্তঃকরণের বৃত্তি। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান, মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প। কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে সঙ্কল্প ও সংশয়কে বিকল্প কহে।

মনঃস্থানং গলান্তং। (১৫)

কণ্ঠমধ্যে মনের স্থান।

বুদ্ধের্ব্বদনম্।

বুদ্ধির স্থান বদন।

চিত্তস্য নাভিঃ।

চিত্তের স্থান নাভি।

অহঙ্কারস্য হৃদয়ং।

অহঙ্কারের স্থান হৃদয়।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয় নিশ্চয় ধারণাভিমানাঃ। (১৬)

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় এই—সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা ও অভিমান।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১৫) "মনঃস্থানং গলান্তং বুদ্ধের্ব্বদনমহঙ্কারস্য হৃদয়ং চিত্তস্য নাভিরিতি।" শারীরকোপনিষৎ।

(১৬) "সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" বেদান্ত পরিভাষায়াং ১ পরিচ্ছেদে।

সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ, এই গুলি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের বিষয়; কিন্তু বুদ্ধির ধর্ম্ম এই—

"সংশয়োথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ।"

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৬ অ, ৩১।

(কপিলদেব দেবহূতিকে কহিয়াছিলেন—মা!) সংশয়, মিথ্যা জ্ঞান, নিশ্চয় ও স্মৃতি, এই সকল বুদ্ধির ধর্ম্ম।

যজুর্ব্বেদ।

অশ্বমেধপ্রকরণ।

২২শ অধ্যায়।

৯—১৪ কণ্ডিকা।

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥৯॥

বঙ্গার্থ। যিনি সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব-জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বজন-পূজনীয় পাপনাশ-কারী তেজ ধ্যান করি।

(এইটি গায়ত্রী মন্ত্র; পূর্ব্ব পূর্ব্বসংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় অনেকবার ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩য় বর্ষ, হিন্দুপত্রিকা, "সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা" ১৫১ ও ২৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপ-হ্বয়ে। সচেত্তা দেবতাপদম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। অহং উতয়ে অবনায় পালনের জন্য হিরণ্যপাণি সবিতারমুহ্বয়ে অহ্বয়ামি আহ্বান করি। সঃ সবিতা চেত্তা চেতয়িতা, দেবতা পদং জ্ঞানিনাম স্থানং।

বঙ্গার্থ। আমি পালনের জন্য হিরণ্যপাণি সবিতাকে আহ্বান করি; তিনি চেতয়িতা, দেবতা ও জ্ঞানিদিগের আশ্রয় স্থান।

দেবস্য চেততো মহীম্প্রসবিতু-র্হবামহে! সুমতিং সত্যরাধসম্ ॥১১॥

পদপাঠঃ। দেবস্য। চেততঃ। মহীম্। প্রসবিতুঃ। হবামহে। সুমতিং। সত্যরাধসম্।

ব্যাখ্যা। বয়ং চেততঃ জানতঃ সবিতুঃ দেবস্য মহীম্ মহতীং সত্যরাধসং সুমতিং

শোভনাং বুদ্ধিং প্রহ্বামহে প্রার্থয়ামহে। সত্যনশ্বরং রাধো ধনং যস্যাস্তাম যদ্বা সত্যং রাধয়তি সাধয়তি সা সত্যরাধাস্তাম্।

বঙ্গার্থ। আমরা সেই সর্ব্বজ্ঞ সবিতৃ দেবতার নিকট সত্যরক্ষিণী মহতী সুমতি প্রার্থনা করি।

সুষ্টুতিং সুমতী বৃধো রাতিং সবিতুরীমহে। প্রদেবায় মতীবিদে ॥১২

পদপাঠঃ। সুষ্টুতিং। সুমতী বৃধঃ। রাতিং। সবিতুঃ। ঈমহে। প্র। দেবায়। মতীবিদে।

ব্যাখ্যা। বয়ং সবিতুর্দ্দেবায় সবিতুর্দ্দেবস্য (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) সুষ্টুতিং (সু স্তুতিং) শোভনাং স্তুতিং রাতিং দানং প্র ইমহে প্রকর্ষেণ যাচামহে কীদৃশস্য সবিতুঃ সুমতীবৃধঃ শোভনাং মতিং বর্দ্ধয়তি সুমতিবৃৎ তস্য তথা মতীবিদে সর্ব্বেষাং মতিং বেত্তি! (মতি ও সুমতি সংহিতানুরোধে দীর্ঘ)

বঙ্গার্থ। আমরা সুমতি বর্দ্ধক ও মতিবিৎ সবিতৃদেবের নিকট শোভনা স্তুতিরূপ ধন প্রকর্ষভাবে যাচ্ঞা করি।

রাতিং সৎপতিম্মহে সবিতারমুপহ্বয়ে। আসবন্দেব বীতয়ে ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। রাতিং। সৎপতিং। মহে। সবিতারম্। উপহ্বয়ে। আসবং। দেববীতয়ে।

ব্যাখ্যা। দেববীতয়ে দেবানাং তর্পনায় রাতিং দদাতি রাতিঃ তম্ সৎপতিং সতাং পালকম্ আসবম্ আভিমুখ্যেন সৌতি কর্ম্মণ্যনুজানাতি আসবস্তম সবিতারম্ অহং উপহ্বয়ে আহ্বয়ামি মহে পূজয়ামি।

বঙ্গার্থ। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সর্ব্বকর্ম্মকুশল সজ্জন-পালক ও দাতা সবিতৃদেবকে আমি আহ্বান করি ও পূজা করি।

দেবস্য সবিতুর্ম্মতিমাসবং বিশ্বদেব্যম। ধিয়া ভগম্মনামহে ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। দেবস্য। সবিতুঃ। মতিম্। আসবম্। বিশ্বদেব্যম্। ধিয়া। ভগম্। মানামহে।

ব্যাখ্যা। সবিতুর্দেবস্য মতিং প্রতি বয়ং ধিয়া আসবম আসৌতি কর্ম্মণ্যনুজানাতি আসবস্তম বিশ্বদেব্যমদেবেভ্যো হিতম্ভগং ঐশ্বর্য্যং মনামহে যাচামহে।

বঙ্গার্থ। সবিতৃদেবের মতির নিকট সর্ব্বকর্ম্মকুশল এবং দেবহিত ঐশ্বর্য্য আমরা বুদ্ধির দ্বারা প্রার্থনা করি।

২২ কণ্ডিকা।

আব্রহ্মণব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী-জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরইষব্যোতিব্যাধীমহারথো জায়তান্দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢ়ানড়্বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্য্যোষাজিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তান্নিকামে নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। আ। ব্রহ্মণ। ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মবর্চ্চসী। জায়তাম। আ। রাষ্ট্রে। রাজন্য। শূরঃ। ইষব্যা। অতিব্যাধী। মহারথঃ। জায়তাম্। দোগ্ধ্রী। ধেনুঃ। বোঢ়া। অনড্বান্। আশুঃ। সপ্তিঃ। পুরন্ধিঃ। যোষা। জিষ্ণুঃ। রথেষ্ঠাঃ। সভেয়ঃ। যুবা। অস্য। যজমানস্য। বীরঃ। আয়তাম। নিকামে। নঃ। পর্জ্জন্যঃ। বর্ষতু। ফলবত্যঃ। নঃ। ওষধয়ঃ। পচ্যন্তাং। যোগক্ষেমো। নঃ। কল্পতাম্।

ব্যাখ্যা। হে ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রে অস্মদ্দেশে ব্রহ্মবর্চ্চসী যজ্ঞাধবনশীলো ব্রহ্মণঃ আজায়তাম্। শূরঃ পরাক্রমী, ইষব্যঃ ইষৌ কুশলঃ, অতিব্যাধী অত্যন্তং বিধ্যতীত্যতিব্যাধী শত্রু ভেদনশীলঃ মহারথঃ একঃ সহস্রং জয়তি স মহারথঃ রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ আজয়তাম্। দোগ্ধ্রী দুগ্ধ পূরয়িত্রী আজয়তাম্। অনড়ান্ বৃষভো বোঢ়া বহনশীলো জায়তাম্। সপ্তিরশ্ব আশুঃ শীঘ্রগামী—যোষা স্ত্রী পুরন্ধিঃ পুরং শরীরং সর্ব্বগুণসম্পন্নং দধাতি পুরন্ধিঃ। রথে তিষ্ঠতি, রথেষ্ঠাঃ রথে স্থিতো যুযুৎসুর্নরোঃ জিষ্ণু জয়শীলো জায়তাম্। অস্য যজমানস্য যুবা সমর্থঃ সভেয়ঃ সভায়াং যোগ্যো বীরঃ পুত্রো জায়তাম্। পর্জ্জন্যো নিকামে নিকামে নিতরাং বর্ষতু। নোঽস্মাকমোষধয়ঃ যবাদ্যাঃ ফলবত্যঃ ফলযুক্তাঃ পচ্যন্তাং স্বয়মেব পক্বা ভবন্তু। নোঽস্মাকং যোগক্ষেমঃ অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য পরিপালনং ক্ষেম কল্পতাং কৃপ্তো ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে ব্রহ্মণ! আমাদিগের রাষ্ট্রে ব্রহ্মবর্চ্চসম্পন্ন (যজ্ঞাধ্যয়নশীল) ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করুন, অস্ত্রবিদ্যা-নিপুণ, শত্রু-দমনকারী, মহারথ (এক সহস্র রথীকে যিনি জয় করেন, তিনি মহারথ) পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করুন্, ধেনু সকল দুগ্ধবতী হউক, বৃষভেরা ভারবহনশীল হউক, অশ্ব সকল বেগগামী হউক, স্ত্রীগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন শরীর ধারণ করুন, রথিগণ জয়শীল হউন্, যজমানের সমর্থ (যুবা) সুসভ্য ও বীর পুত্র জাত হউক, পর্জ্জন্য যথেষ্ট বারি বর্ষণ করুন্, ওষধিগণ ফলবতী হউক্ ও উত্তম পক্কদশা প্রাপ্ত হউক এবং আমাদের যোগ-ক্ষেম (অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ) সুসম্পন্ন হউক।

আমিত্বের-প্রসার।

(ক্ষত্রিয়।)

যদি জীবন কুসুমকে পূর্ণরূপে বিকসিত করিতেও না পার, যদি বিশ্বজীবনের সহিত তোমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরোধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেও সমর্থ না হও, যদি ব্রাহ্মণ না হইতেও পার, তাহাহইলে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়ত্ব অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ভারতের দুর্গতি অপনয়নের জন্য ব্রাহ্মণেরও যেরূপ প্রয়োজন, ক্ষত্রিয়েরও তদ্রূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল; কিন্তু ভারতে সাত্বিকজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা রাজসিক কর্ম্মিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ইহাদিগের কেহই নাই; 'জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসী তমোগুণসম্পন্ন 'আলস্য ও প্রমাদপূর্ণ শূদ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসী যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শমদমাদি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ শৌর্য্য-বীর্য্য, উৎসাহ উদ্যমাদি হইতেও ভ্রষ্ট হইয়াছেন। নামে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই শূদ্র। কি আর্য্যাবর্ত্ত, কি দাক্ষিণাত্য, তমোগুণ সর্ব্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ধনী বা দরিদ্র, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, সকলেই ধ্বংসশক্তির করালকবলে পতিত হইয়াছে। নব নব ব্যাধির রূপ ধারণ করিয়া তমঃশক্তি

লোকালয়সমূহ নিবিড় কাননে পরিণত করিতেছে, কিন্তু নিরুদ্যম শূদ্র ভারতবাসী তাহাতে কটাক্ষপাতও করিতেছে না! অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তমঃশক্তি শস্যাদির ধ্বংস সাধন করিতেছে; কিন্তু শূদ্র ভারতবাসী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও নিক্রিয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তখন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তমঃশক্তির বিবিধ উপদ্রব নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং কর্ম্মী ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ঔষধাদি আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উহার বহুল বিস্তার করাইতেন ক্ষত্রিয়; সরোবর কূপাদি খননের প্রকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ না করিলে, ঐ সমুদায় জলাশয় খনন করাইতেন ক্ষত্রিয়; আবার পর্জ্জন্যদেব অধিক বারিবর্ষণ করিলে, জলনির্গমের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতেন ক্ষত্রিয়। নূতন নূতন অস্ত্র বিজ্ঞানবলে আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ঐ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিতেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ছিলেন জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবেই ভারত উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, উহাদের অভাবেই ভারত অবনতির অধস্তলপ্রদেশে পতিত হইয়াছে। সুতরাং পতিত ভারতকে পুনরুন্নত করিতে হইলে যেমন ব্রাহ্মণ চাই, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও চাই। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পরস্পর সাপেক্ষ; ব্রাহ্মণ না থাকিলে ক্ষত্রিয় থাকিতে পারে না, ক্ষত্রিয় না থাকিলে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। যখন ভারতে কর্ম্মের অবহেলা আরম্ভ হইল, যখন কর্ম্মের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, জ্ঞানই সমস্ত ভার স্বীয় স্কন্ধে লইলেন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই কর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কেবল বাগ্বিতণ্ডায় পরিণত হইল; তখনই ভারতের অবনতি আরম্ভ হইল। ভারতের উন্নতিসাধন করিতে যেমন জ্ঞানের আবশ্যক, তেমনই কর্ম্মের আবশ্যক, যেমন ব্রাহ্মণের আবশ্যক, তেমনই ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে।

রাজসিকভাবই উন্নতিশীল সাধনে ক্রমে সাত্ত্বিকভাবে পরিণত হয়। ক্রিয়াশীল রজঃশক্তিই সত্ত্বশক্তিতে পরিণত হয়। তামসিকশক্তি ইহাদের বিরোধিশক্তি; এই শক্তি রজঃ ও সত্ত্বের ধ্বংস সাধন করে। ফুল্ল ফুল ফুলের সাত্ত্বিক অবস্থা, কিন্তু ক্রিয়াশীলা রজঃশক্তি তমঃশক্তিকে পরাভব করিতে না পারিলে, ফুল এই সাত্ত্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ফুলে তমঃশক্তি অধিক, সে ফুল বিকশিত হয় না,—সে মুকুলেই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। জড়জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন; তাহাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিকশক্তির ক্ষয়বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু মানবের ইচ্ছাশক্তি থাকায়, মানব ইচ্ছানুসারে শক্তিবিশেষের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি তমঃশক্তি পরাভব করিয়া রজ ও সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তম-শক্তি সত্ত্বশক্তির ধ্বংস ভিন্ন কখন উহার বৃদ্ধি করে না। কোন কার্য্য না করিলে, কিম্বা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, কিম্বা বৃক্ষতলে অলসভাবে জীবন যাপন করিলে, সাত্ত্বিকতা লাভ করা যায় না। উহা সমুদায়ই তামসিক। মনু বলেন:"যাচিষ্ণুতা" "তামসং গুণলক্ষণম্"। গীতায় দেখিবেন "অলসঃ" "বিষাদী" "দীর্ঘসূত্রী" কর্ত্তা তামস। বস্তুর ধ্বংস করিয়া বস্তুর বিকাশ করা যায় না। কার্য্য না করিয়া কখনও সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রজও যেরূপ ক্রিয়াশীল,

সত্ত্বও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল; প্রভেদ এই যে—রজশক্তি অধিক থাকিলে কার্য্যের অসামঞ্জস্য ("কর্ম্মণামশমঃ"—গীতা) উপস্থিত হয়, সত্ত্বশক্তি উহার সামঞ্জস্য স্থাপনা করে। বালক ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দিবা রাত্রি—সময় অসময় নাই, সকল সময়েই ব্যায়াম করিতেছে। এটি কার্য্যের অসমতা। পিতা মাতা তাহার ব্যায়ামকাল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সত্ত্ব রজকে এইরূপে নিয়মিত করে। রজ সত্ত্বদ্বারা নিয়মিত হইলেই উত্তম ফল-প্রাপ্তি হয়। এই জন্যই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণানুগত ছিলেন। নবীনের ক্রিয়াশক্তি এবং প্রবীণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলন যেরূপ সুফলপ্রদ, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলনও সুফলপ্রদ। কিন্তু যৌবনে যে ব্যক্তি কোন কার্য্য না করে, সে কখনও বার্দ্ধক্যে জ্ঞানের অধিকারী হয় না। কার্য্যদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়, রজদ্বারাই সাধনোৎকর্ষে সত্ত্বের লাভ হয়; ক্ষত্রিয় হইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া সুসাধ্য হয়। একেবারে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, জ্ঞান (নিষ্কামতা—বৈরাগ্য) লাভ করিতে পারে না। "নৈষ্কর্ম্ম্যং" অর্থে "জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা"। "নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থিতিম্॥"

জ্ঞানযোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা, নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলা যায়। ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হইলে, মানবের কর্ম্ম থাকে না; কিন্তু উপাধিবিশিষ্ট জগতে মানব কর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই গীতায় বহু স্থানে বহুবিধভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মসর্ব্বঃ প্রকৃতৈজৈগু ণৈঃ॥" গীতা।৩।৫

কেহ কখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না; ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতিজাত গুণসমুদায়ই সকলকে কর্ম্মে বাধ্য করে। অতএব তামসিক আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই কর্ম্ম কর; হে ভারতবাসি! তুমি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেই, মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা থাকিবে না।

"নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তেন ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" গীতা ৩।৮

তুমি নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর; কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; আর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে তোমার জীবন-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

আলস্যই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল। তমঃশক্তিই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব হে ভারতবাসি! তুমি সত্ত্ব-শাসিত রজশক্তির দ্বারা তমঃশক্তির নাশ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যদি এই উপাধিগ্রস্ত ক্ষুদ্র "আমি" কে প্রসারিত করিতে চাও, যদি এই মায়া-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, যদি দুঃখজনক সীমাবিশিষ্ট "অল্প" পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ অসীম "ভূমা" অধিকার করিতে চাও, এক কথায়—যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, ভগবান্ কৃষ্ণের উপদেশ

স্মরণ করিয়া নিয়ত কর্ম্ম করিতে থাক। যদি জীবনমুক্ত হইতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, নিয়ত কর্ম্ম-যোগে প্রবৃত্ত থাক।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৩

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা, বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ। কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ। জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৩৬) বিদ্যা কাহাকে কহে? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাদ্বারা জীব "ব্রহ্মগতি" বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে। এই বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং" (অহং) বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা। (গীতা)

শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জানিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়? তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিয়াছিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে"—বিদ্যা দুই প্রকার জানিবে। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প (সূত্রগ্রন্থ) ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, বেদের ছয়টি অঙ্গ; ইহারা সমস্তই অপরা, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তৎফল বিষয়ক (মায়িক) বিদ্যা (অবিদ্যান্তর্ব্বর্ত্তিনী অশ্রেষ্ঠ-বিদ্যা) আর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।" (পাতঞ্জলদর্শন)

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মরূপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা প্রকৃতস্বরূপ নহে, তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। পরাবিদ্যাই উক্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। মনুষ্য যাবৎ এই পরাবিদ্যা লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহাকে অবিদ্যার বশবর্ত্তী থাকিয়া মৃত্যুময় সংসারে কেবল যাতায়াত করিতে হয়। (১) অপরা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও উহা পরাবিদ্যা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন,—

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে—প্রথম শব্দ-ব্রহ্ম (বেদ), দ্বিতীয় পরব্রহ্ম; শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আবার ভাগবতে বলিতেছেন,—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি অধ্যয়নাদি দ্বারা শব্দ-ব্রহ্মের পারগামী হয়, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি না করে, শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানী সেই পুরুষের শাস্ত্রে যে শ্রম, তাহা কেবল বন্ধ্যা-গোরক্ষণের ন্যায় শ্রম-ফল মাত্র। সে শ্রম পুরুষার্থ-পর্য্যবসায়ী নহে। সুকৃতী মানব সদ্‌গুরুর সন্নিধানে "নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক" "ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ" "শমদম-উপরতি-তিতিক্ষাশ্রদ্ধা-সমাধান" ও "মুমুক্ষুত্ব" এই "সাধন চতুষ্টয়" সম্পন্ন হইয়া বাস করিলে, কালে তাঁহার প্রসাদে পরাবিদ্যা লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারেন।

বিদ্যার স্বরূপ।

১। বিদ্যাত্মনিভিদাবাধঃ। (ভাগবত)

আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা—অর্থাৎ যত জীবদেহ, তত আত্মা নহে; আত্মা এক মাত্র। জগতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা ভাবের পদার্থ সমূহে একমাত্র পরমাত্মাকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে নানাভাবে অবস্থিত বোধ না করিয়া, অবিভক্ত সর্ব্বময়রূপে অবস্থিত বোধ করাই বিদ্যা।

২। "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতসম্ভব বিকারী পরিণামী এই স্থূল শরীর "আমি" নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-সচ্চিদানন্দ আত্মাই "আমি" এই প্রকার বুদ্ধিকে বিদ্যা কহে (১)।

৩। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্তু যদা নশ্যতি সত্তমাঃ।
সর্ব্বৈকভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে॥

(নারদীয়পুরাণ)

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ উপাধি বা ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞেয় এক অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম সাধকের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকেন। যাহা হইতে মানব এই প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কার লাভ করে, সেই "সর্ব্বৈক-ভাবনা" বুদ্ধিকে (২) বিদ্যা কহে।

ব্রহ্মবিদ্যা সমাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সমাক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যা সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥

(তন্ত্র)

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—"ইহা স্থির জানিও যে ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বি দ্যা নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই-নাই-নাই"। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া নিরালম্বোপনিষদে উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে।
বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি॥
(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

(১) অহং দেবো ন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোহহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥
(আহ্নিকতত্ত্ব)

আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থের বোধক।

(২) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোহবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অভেদ-প্রত্যয়ো যস্তু জগতাং পরমাত্মনা।
সৈবতত্ত্বমতির্জ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্ল্লভা॥
(বেদান্ত)

"সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্"।

"সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিত সৎস্বরূপ ও চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্"। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, প্রাপ্ত হইলে বা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জীব কর্ম্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে।

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্নজন্মভাক্ ॥
(পঞ্চদশী)

তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা পায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে; মুক্তিল াভের অন্য পথ আর নাই। সেই দেবকে জানিলেই সংসার-বন্ধন শিথিল হয়, সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হয় এবং পুনর্জন্ম নিবারিত হয়। বিদ্যাদ্বারাই সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হওয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। (৩৭) বোধ (জ্ঞান) কি ? যাহা বিমুক্তির কারণ তাহাকেই জ্ঞান কহে।

মুক্তি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" (ভাগবত)

"স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তদ্ভ্রংশোঽহনত্ববেদনম্ ॥"
(যোগবাশিষ্ঠ)

আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, এই স্বরূপাবস্থিতির নাম মুক্তি; আর অহংজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া যে বহুত্বভাবের মনন করে, অর্থাৎ অহং-মমাদিজ্ঞানদ্বারা আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার দেহ, ইত্যাদিরূপ যে চিন্তা করে, তাহারই নাম বন্ধন। আত্মার নিরাকার ও নিঃসঙ্গভাবে এবং অখণ্ডরূপে অবস্থানের নাম স্বরূপাবস্থিতি বা ব্রহ্মভাব এবং প্রকৃতির সংসর্গহেতু অন্যথা-রূপে অর্থাৎ সাকার ও সসঙ্গভাবে এবং খণ্ড-রূপে অনন্তমূর্ত্তিতে অবস্থানের নাম জীবভাব।

রজ্জু সর্পজ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্ব-ময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্য্যক্ সুরনরস্ত্রীপুরুষবর্ণা-শ্রমবন্ধমোক্ষাদি নানাকল্পনাজ্ঞানমজ্ঞানম্।
(নিরালম্বোপনিষদ্)

"রজ্জুতে যে প্রকার সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ এই বিশ্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে পশুপক্ষী—সুরনরাদি এবং স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণাশ্রম ও বন্ধমোক্ষাদি সমুদায় বিষয়কে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা।"

"পরমাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞানদ্বারা কলঙ্কিত হইয়া ভ্রমবশতঃ জীবাত্মা নাম গ্রহণ করিয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।" বিদ্যা বা জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা অজ্ঞানমূলক এই বন্ধন ছেদন করিয়া, আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
(পূর্ব্বনপাড়া)

আর্ত্তত্রাণনারায়ণস্তোত্রম্।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বলে, রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃ পূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ। যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা, নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১২॥

যিনি ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপতি, যিনি মনুষ্য সকলের ভরণকর্ত্তা, যিনি শ্রীরাধার সকলপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি সুরেন্দ্রানুজ, পাণ্ডুপুত্রগণ ভীত হইয়া "নাথ" এই বলিয়া যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১২॥

যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং, চানীয়প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমানার্ত্তয়ে। সন্তোষং জনয়ন্নমেয় মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ (১)॥ ১৩॥

যিনি (স্বীয় গুরু) সান্দীপনী মুনির আদেশে মৃত্যুলোক হইতে তাঁহার পুত্রকে আনয়ন করিয়া পুত্রের মৃত্যুবশতঃ কাতর পিতার সন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অমেয় মহিমাসম্পন্ন আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১৩॥

যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ প্রাণান্মুক্তিমশেষিতা মনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ত্তিযুক্। সদ্যো॰ ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধশ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১৪॥

[বিপ্র অজামীল জীবদ্দশায় অত্যন্ত পাপাসক্ত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণ নাম করিয়া দেহত্যাগ করেন। নামের গুণে তাঁহাকে আর পাপ ভোগ করিতে হয় নাই; অপিতু তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য এত! এই নাম হেলাবশতঃ উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট করে যথা—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে।

"নামৈকং যস্য বাচিশরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং॥

"পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

অন্যত্র। "নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিবর্দ্ধনঃ। কৃত্বাস্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিলাসে ২১৯ শ্লোক লিঙ্গপুরাণ ধৃতবচনং।

[এক্ষণ সেই অজামীলোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] পূর্ব্বকালে অজামিল নামে পাপাত্মা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে (স্বীয় পুত্র) "নারায়ণের" নাম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়; পরে সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীষ নামে পরম ভাগবত হইয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাহাতে নারায়ণ তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১৪॥

যো রক্ষদ্ রসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং দীনাদ্দীনশ্চকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ। তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্র পৃথুকনাদায় ভুক্ত্বা-

(১) গুরুপুত্রানয়ন উপাখ্যান দশমস্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে আছে।

ক্ষণ াদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥ *

এক্ষণ সুদামের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন। যিনি দীনহইতে দীনব্যক্তিরূপচকোরের পালনকর্ত্তা, সেই শঙ্খচক্রধারী উজ্জ্বলমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্যবসনাদিবিহীন কুচৈলনামে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীর্ণবস্ত্র হইতে মুষ্টিমাত্র চিঁড়া গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি।

যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে যৎ সংশেতি পতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ। যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃপ্রধ্বংসবিদ্ভানুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহার কল্যাণে মনোরম নির্ম্মল গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাহইতে মন্ত্র সকল শিক্ষা করা যায়, আগম যাঁহাহইতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন; যিনি যোগীন্দ্রগণের মনঃ পদ্মের অন্ধকারনাশক ভানুস্বরূপ। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহ্রদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে। শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার মধ্যবর্ত্তী মনোহর জগন্মঙ্গল পুণ্য-পুলিনে চন্দ্র ও পদ্মদ্বারা শোভিত যে বিস্তীর্ণ স্থানে ব্রহ্মা যাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীরঙ্গে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণাদৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিত শ্রেয়ঃ পদপ্রাপণাৎ। সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হিতৎ সাক্ষিণঃ, প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবাঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণপরায়ণনারায়ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যবশতঃ, অভয়প্রদান প্রতিজ্ঞাবশতঃ, আর্ত্তব্যক্তির দুঃখদূরীকরণবশতঃ ঔদার্য্যবশতঃ, পাপনাশকরণবশতঃ ও অসংখ্য মঙ্গলপদ দানবশতঃ সকলের পূজনীয়। এই সকল তাহার সাক্ষী,—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজেন্দ্র, পাঞ্চালী, অহল্যা ও ধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

অনুবাদ সম্পূর্ণ।

* শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে "চিপীটক উপাখ্যানম্"।

গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্।

ভগবতিভবলীলা-মৌলিমালে তবাম্ভঃ
কণমনুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমর-নগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি॥ ১॥

হে ভগবতি! তুমি মহাদেবের মস্তকের লীলার মালার স্বরূপ; তোমার জলের কণা-পরিমাণ যে প্রাণী স্পর্শ করেন, তিনি বিগত-পাপ হইয়া চামরব্যজনকারিণী অমর নগরের নারীগণের অঙ্কে বাস করেন। (আর তাঁহাকে এ ভবকারাগারে আসিতে হয় না)॥ ১॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসিজটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী, স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী। ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী, পাথোধিং পূরয়ন্তী সুর-নগর-সরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু॥ ২॥

তুমি ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া, মহাদেবের মস্তকের জটাসমূহকে উল্লাস প্রদান করিয়া, স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া, সুবর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতের গুহার গণ্ডশৈল হইতে নির্গত হইয়া, ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া, সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া, সমুদ্র পূর্ণ করিয়া, সুরনগরকে পবিত্র করিতেছ; তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর॥ ২॥

মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুত-মদমদিরামোদমত্তালি-জালং, স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিলসৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গং। সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুশ-কুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থ নীরং, পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরং হস্তরঙ্গম্॥ ৩॥

তোমার জলে হস্তীগণ স্নানকালীন কুম্ভ হইতে মদ ক্ষরণ করে, তাহাতে মধুকরগণ উন্মত্ত হয়; তোমার জল সিদ্ধাঙ্গনাগণের কুচযুগল হইতে বিগলিত কুঙ্কুমের সঙ্গবশতঃ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে; সায়ংকালে ও প্রাতঃ-কালে মুনিগণের কুশ ও কুসুমসমূহে ব্যাপ্ত তীরস্থ গঙ্গাজল আমাদিগকে রক্ষা করুন। সেই গঙ্গার তরঙ্গে হস্তী, হস্তীশাবকের শুণ্ডদ্বারা আস্ফালিত হইতেছে॥ ৩॥

আদাবাদি পিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্। ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জহ্নোর্মহর্ষে-রিয়ং কন্যাকল্মষনাশিনী ভগবতী-ভাগীরথী-ভূতলে॥ ৪॥

তুমি প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলে নিয়মিত ব্যাপারে ছিলে, পরে ভগবান্ অনন্তের পবিত্র পাদোদকরূপে ছিলে; পুনরায় শম্ভুর জটা বিভূষণ হইয়াছিলে, পশ্চাৎ মহর্ষি জহ্নুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে; পরে ভগীরথ তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তোমাকে পাপনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী কহিয়া থাকে॥ ৪॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণীনিজজলে মজ্জজ্জনো-ত্তারিণী, পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎ-সারিণী। শেষাঙ্গৈরনুকারিণী হরশিরো বল্লী-দলাকারিণী, কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা-মনোহারিণী॥ ৫॥

তুমি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিজ জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, তাহাকে ত্রাণ কর; তুমি সাগরবিহারিণী, সংসারের সমস্ত ভয় নাশ কর, তুমি সর্পের ন্যায় বক্রগামিনী, মহাদেবের মস্তকে পত্রদলের ন্যায় অবস্থিতি কর; তুমি কাশী-প্রান্ত-বিহারিণী সেই মনোহারিণী গঙ্গা জয়যুক্তা হও॥ ৫॥

কুতোবীচির্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং ত্বমা পীতাপীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি। ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং, তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোপ্যতি লঘুঃ॥ ৬॥

যদি কোন লোক তোমার তরঙ্গ দর্শন করে, কিম্বা তোমার জল পান করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিবাসে (বৈকুণ্ঠে) বাস বিতরণ কর। হে গঙ্গে! যদি জীবের দেহ তোমার উৎসঙ্গে পতিত হয়, তাহাহইলে ইন্দ্রত্বপদ-লাভও তাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়॥ ৬॥

ভগবতি-তবতীরে নীরমাত্রাশনোহং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকুলষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে-
তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ॥ ৭॥

হে ভগবতি! তোমার তীরে কেবলমাত্র জল পান করিয়া ও বিষয়-তৃষ্ণা দূর করিয়া কৃষ্ণকে আরাধনা করিতেছি। তুমি সমুদায় পাপ নাশ কর, তুমি স্বর্গের সোপানস্বরূপ, হে তরলতরঙ্গে দেবি গঙ্গে! আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ৭॥

মাতঃ! শাম্ভবিশম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং, ত্বত্তীরে বপুষোবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্। সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে, ভুয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥ ৮॥

মাতঃ! শাম্ভবি! তুমি শম্ভুসঙ্গ-মিলিতা হইয়াছ। মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দেহাবসান সময়ে তোমার তীরে থাকিয়া যেন নারায়ণের পদদ্বয় স্মরণ করিতে পারি; আমার প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে আনন্দ সহকারে যেন নারায়ণ স্মরণ করিতে পারি ও যেন অদ্বৈতাত্মিক হরিহরে আমার অবিচ্যুতা শাশ্বতী ভক্তি লাভ হয়॥ ৮॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন॥ ৯॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

কেনোপনিষৎ।

ওঁ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১॥

অন্বিতব্যাখ্যা। ঈষিতং (ইচ্ছাময়ং) মনঃ কেন প্রেষিতং (প্রেরিতং সৎ) পততি (স্ববিষয়ং ধাবতি) প্রাণঃ কেন যুক্তঃ সন্ প্রথমং প্রতি (ব্যাপ্রিয়স্তে) কেন ঈষিতাং ইমাং বাচং বদন্তি। বাচমিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। উ (ভোঃ) কো দেবঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুনক্তি (প্রেরয়তি) চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্।

অনুবাদ। আত্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্য আচার্য্য-সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—গুরুদেব! ইচ্ছাময় মন কাহার প্রেরণায় বিষয়ে ধাবিত হয়? প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার চালনায় প্রথমে চলিত হয়? বাগিন্দ্রিয় কাহার নিয়োগে

এই বাক্য বলিয়া থাকে? কোন্ দেব চক্ষু-শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয়গ্রহণে প্রেরণ করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২॥

অন্বিতব্যাখ্যা। যৎ (যস্মাৎ) উ (ভোঃ) স আত্মা শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (শব্দব্যঞ্জকং) মনসঃ মনঃ বাচঃ বাচং (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী) প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (অর্থাৎ আত্মানং শ্রোত্রাদিবিলক্ষণত্বেন বিদিত্বা) অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদৌ আত্মভাবং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) অস্মাৎ লোকাৎ (মমতারূপাৎ) প্রেত্য (ব্যাবৃত্য) অমৃতাঃ (অমরণধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি॥ ২॥

অনুবাদ। আচার্য্য বলিলেন,—বৎস! আত্মাই মনঃ প্রভৃতির নিয়ন্তা, সেই প্রসিদ্ধ আত্মা কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু। পণ্ডিতেরা কর্ণাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক মমতা পরিহারপূর্ব্বক অমরতা লাভ করেন॥ ২॥

বিষদীকরণ। আমি শুনি, আমি মানি, আমি শ্বাস ফেলি, আমি দেখি—ইত্যাদিপ্রকারে প্রায়শঃ সকলে কর্ণাদিতে আমিত্ব (আত্মত্ব) আরোপ করিয়া থাকে; এক আমিকে বহুরূপী করে। তাহার স্বরূপ চেনা ভার হইয়া উঠে। তদনুসারে সাধারণে সমস্ত ক্রিয়া আত্মার উপর অর্পণ করে। বস্তুতঃ আমি (আত্মা) শুনি না, মনন করি না, দেখি না, এক কথায়—কিছুই করি না। কর্ণাদি সব করিয়া থাকে, কিন্তু আমার অসহায়তায় কর্ণাদিও কিছু করিতে পারে না। আমার (আত্মার) অধিষ্ঠানে মন ইচ্ছাময় হইয়া মনন করে, প্রাণ প্রবাহিত হয়, বাগিন্দ্রিয় কথা বলে, শ্রোত্রাদি স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। তাই আচার্য্য বলিতেছেন, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ইত্যাদি। প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অপরকে প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশমান আত্মাও শ্রোত্রাদির প্রকাশক। চক্ষু-শ্রোত্রাদি তাঁহারই সাহায্যে বিষয় গ্রহণ করে।

আত্মাকে পৃথক্‌রূপে যখন অনুভব করিতে পারি না, তখন চক্ষুশ্রোত্রাদির অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন, অগ্নি আর কাষ্ঠ এক বস্তু নয়। উভয়ে বিলক্ষণধর্ম্মা, বিভিন্ন বস্তু; কেননা অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, দাহ্য কাষ্ঠের তাহা নাই। অথচ লৌকিক অগ্নি কখনও কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু ব্যতীত থাকে না; তাই বলিয়া বলিব কি অগ্নি ও কাষ্ঠ এক বস্তু? ইহা বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না। সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অবস্থায় চৈতন্যের (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের সহিত উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় ব্যতীত উপলব্ধি হয় না বলিয়া কি ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক বস্তু বলা উচিত? যেমন কাষ্ঠ অগ্নিরহিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ও আত্মারহিত হয়; কিন্তু যেমন অগ্নি কাষ্ঠরহিত হয় না, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়রহিত হয় না। আবার যেমন বিদ্যুৎ ও সূর্য্যে বহ্নি দাহ্য ব্যতীত থাকে, সেইরূপ সুষুপ্ত্যবস্থায় ও তুরীয়াবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয় ব্যতীত থাকে। ইত্যাদি যুক্তিবলে আত্মাকে অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র বস্তু বলাই যুক্তিসঙ্গত। যোগীরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, সে তত্ত্ব যুক্তি-গম্য নয়—গুরূপদেশলভ্য।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্ম ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব।

তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম
পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

অন্বিতব্যাখ্যা। চক্ষুঃ তত্র (ব্রহ্মণি) ন
ছতি, বাগ্ ন গচ্ছতি, মনো ন গচ্ছতি;
তএব ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি ন বিদ্মঃ, ন চ বিজা-
মঃ; যথা এতৎ ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ তৎ (ব্রহ্ম)
দিতাৎ (ব্যাকৃতাৎ জগতঃ) অবিদিতাৎ
অব্যাকৃতাদ্ বিদ্যালক্ষণবীজভূতাৎ চ) অধি
অন্যৎ) ইতি পূর্ব্বেষাং (আচার্য্যাণাং সকাশাৎ)
নুশুশ্রুম যে তৎ (ব্রহ্ম) নঃ (অস্মান্) ব্যাচক্ষিরে
ব্যাখ্যাতবন্তঃ)।

অনুবাদ। সেই ব্রহ্ম চক্ষুর গোচর নন।
ক্য এবং মনের বিষয় নন। (গুণক্রিয়া-
শেষণে) তাঁহাকে বুঝিতে পারি না। কি
বে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না।
নি ব্যাকৃত জগৎ এবং অব্যাকৃত (বীজ-
ত প্রকৃতি) হইতে পৃথক্—এইমাত্র গুরুর
কট শুনিয়াছি, যে সকল গুরু আমার
কাশে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

াভাষ। এই কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—
াচানভ্যুদিতং যেন বাগ্ অভ্যুদ্যতে।
দেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

অন্বিতব্যাখ্যা। যৎ ব্রহ্মবাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ)
নভ্যুদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন ব্রহ্মণা বাগ্
ভ্যুদ্যতে (উচ্চার্য্যতে) ত্বং তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি
জানীহি) ইদং ন। যৎ ইদং (আত্মবুদ্ধ্যা)
পাসতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বাগিন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে
রে না, বরং বাগিন্দ্রিয় যাঁহার কৃপায় প্রকাশ
য়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।
াগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম নয়, লোক যাহাকে (আত্ম-
দ্ধিতে) উপাসনা করে। অর্থাৎ লোক ভ্রান্তি-
শতঃ "আমি বলি" এই উপলব্ধিবলে বাগি-
ন্দ্রিয় আত্মা ভাবিয়া কাজ করে ॥ ৪ ॥

বিষদীকরণ। যাঁহার রূপ বা গুণ বা ক্রিয়া
আছে, বাগিন্দ্রিয় তাহারই পরিচয় দিতে পারে।
কিন্তু যিনি নীরূপ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, বাক্য
তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? অথবা
ভগবানের রূপ, গুণ ও ক্রিয়া অলৌকিক,
লৌকিক বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অস-
ম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "যদ্বাচানভ্যু-
দিতম্"। শ্রুত্যন্তরেও আছে—"যতো বাচো
নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইতি। এহেন
ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে বাক্ উচ্চারিত হয়। সেই
ব্রহ্মই আত্মা; বাগিন্দ্রিয় বা অন্য ইন্দ্রিয় আত্মা
নয়। আমরা বলি, আমরা দেখি, ইত্যাদি
প্রয়োগ লাক্ষণিক। নতুবা ইন্দ্রিয়কে আত্মা
বলিলে ইন্দ্রিয়ের বিনাশে আত্মার বিনাশ স্বীকার
করিতে হয়, অথচ ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও অনেকে
জীবিত থাকে ॥ ৪ ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

অনুবাদ। মনের দ্বারা যাঁহার মনন (জ্ঞান)
হয় না; প্রত্যুত যাঁহার অধিষ্ঠানে মন মননে
সমর্থ হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম
বলিয়া জানিবে। মন ব্রহ্ম নয়, লোকে যাহাকে
(মনকে) (আত্মভাবে) উপাসনা করে।

বিষদীকরণ। মনও আত্মা হইতে পারে না,
ইহার বিস্তৃত সমালোচনা ভাষাপরিচ্ছেদের
"মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ—
এই কারিকার স্থলে দেখিবে। সঙ্ক্ষেপে এই
মাত্র বলি—আত্মা কর্ত্তা-করণ নয়। চৈতন্য-
হীন মন জ্ঞানের করণ, কর্ত্তা হইতে পারে না।
কর্ত্তা ও করণ এক বস্তু হয় না ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। চক্ষুদ্বারা যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়
না, চক্ষু যাঁহার অধিষ্ঠানে দেখিয়া থাকে, তাঁহা-

কেই তুমি ব্রহ্ম জানিবে। চক্ষু ব্রহ্ম নয়, লোকে যাহাকে (চক্ষুকে) আত্মভাবে উপাসনা করে॥ ৬॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে.॥ ৭॥

অনুবাদ। কর্ণের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না; প্রত্যুত যাঁহার অধিষ্ঠানে কর্ণ শ্রবণ করে, তুমি তাঁহাকে আত্মা (ব্রহ্ম) জানিবে। এ শ্রোত্র ব্রহ্ম নয়; কিন্তু লোকে শ্রোত্রকেও আত্মভাবে উপাসনা করে॥ ৭॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮॥

অনুবাদ। প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া হয় না; যাঁহার অধিষ্ঠানে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তুমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে; প্রাণ আত্মা নন; কিন্তু লোকে প্রাণকেও আত্মভাবে উপাসনা করে। (পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যদেব প্রাণশব্দের অর্থ 'প্রাণেন্দ্রিয়' করিয়াছেন)॥ ৮॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

জগতে সকল পদার্থই ভীতি-সমন্বিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়। মৃত্যুভয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভয় মানবের মনে সাধারণতঃ সদাই জাগরুক। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষ কোন না কোন প্রকার ভয়ে কম্পিত রহিয়াছে। যাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পরিবারাদি লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাও ভয়ের হস্ত এড়াইতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে পিতামাতার মনে সন্তান সম্বন্ধীয় বিবিধ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিলে। পুত্রের একটু সামান্য কোন পীড়াদি হইলেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে কি মহন্তয় না উপস্থিত হয়! এইরূপ পুত্রাদির অমঙ্গলাশঙ্কা কোন পিতামাতাই সমগ্র জীবনের কোন অংশেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মানব যাহাতে যত বৃহতী আশা পোষণ করে, তাহাতে তাহার তত ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি অনেক আশায় পুত্র লাভার্থ ব্যগ্র হন। পুত্র তাঁহার কুল-গৌরব রক্ষা করিবে, পুত্রদ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এইরূপ বিবিধ আশায় উৎফুল্ল হইয়া, ভগবদিচ্ছায় পুত্র লাভ করিলে, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পান! কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে যে বিষয়ে যত আশা স্থাপন করেন, সেই বিষয়ে আবার তত ভয়েরও অনুভূতি ভোগ করেন। পুত্রের আয়ু—আরোগ্য—বল, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান, ধন—যশ—প্রভুত্ব, ইত্যাদি সম্বন্ধে যত আশা স্থাপন করেন, আবার তত্তৎসম্বন্ধীয় বিঘ্ন-সম্ভাবনায় তত আশঙ্কাও অনুভব করেন।

গৃহস্থ হৃদয়ে বৃহতী আশা পোষণ করিয়া ঘর বাঁধিলেন, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াই অমনি অগ্নি, ঝঞ্ঝাবাত ও ভূকম্পনাদির ভয়ে ভীত হইলেন! ধনী বহু ক্লেশে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, দস্যু-চৌরাদি হইতে সর্ব্বদাই সেই ধনের জন্য ভীত হইতেছেন। কেবল দস্যু-চৌরাদি নহে, স্বজনগণ হইতেও সে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়; এই জন্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।"

ধনী বা নির্ধন কেহই ভয় হইতে মুক্ত নহেন। রোগীর মৃত্যু-ভয়, নিরোগীর রোগ-ভয়। যৌবনে জরার ভয়, জরায় মরার ভয় সর্ব্বদাই মানুষকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। মানুষ সর্ব্বদাই সভয়। স্বপনে—জাগরণে কোন অবস্থাতেই ভয় তাহাকে পরিত্যাগ করে না। দিবস—যামিনী সর্ব্বদাই ভয়াকুল। কখন কি হয়, কি জানি কি হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক ঐহিক বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহার মন বিক্ষেপগ্রস্ত হয়। এই জন্যই আর্য্য কবি বলিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং। মানে দৈন্যভয়ং গুণে খলভয়ং রূপে তরুণ্যাভয়ং। শাস্ত্রে বাদীভয়ং বলে রিপু-ভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং। সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।"

অর্থাৎ ভোগবিলাসের মধ্যেও রোগের আশঙ্কা উপস্থিত, কুলগৌরব থাকিলে গৌরব-হানির আশঙ্কা আছে, লুব্ধ নৃপতি সর্ব্বদাই বিত্তবানের আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকেন; সম্ভ্রান্তের সর্ব্বদাই সম্ভ্রমহানির আশঙ্কা আছে, গুণী ব্যক্তি সর্ব্বদাই খল কর্ত্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত থাকেন, রূপ-বানের রূপেও যুবতীজন কর্ত্তৃক ভয়ের কারণ থাকে, শাস্ত্র-বিচার বিষয়ে শাস্ত্রীর বাদী কর্ত্তৃক পরাভবের আশঙ্কা আছে, বল বিষয়ে বলবানের শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব-ভীতি রহিয়াছে, শরীর ধারণ করিলেই মরণের ভয় রহিয়াছে। এই জগতে সর্ব্ব পদার্থেই মানবগণের ভয়ের কারণ বিদ্যমান।

জগতে সর্ব্ব পদার্থই যদি "ভয়ান্বিত" হইল, তবে মানুষের নির্ভীক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? ভয়ের কারণ সমুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যেখানে কামনা—যেখানে আসক্তি, সেই খানেই ভয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে ভয়ও নাই। অদ্য একটী বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলাম; রোপণ করিয়াই যদি উহাকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা-হইলেই আমার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যত বীজ অঙ্কুরিত—পরি-বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-নিহিত ভয়-বীজও পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই বৃক্ষের ফল আমি বা আমরা সম্ভোগ করিব, ইত্যাকার আশা থাকিলে, ইহার বিনাশজনিত ফলভোগ-নৈরাশ্যাশঙ্কাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। আর এইরূপ আশা না থাকিলে আশঙ্কাও থাকে না। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, আশা ও আশঙ্কা পরস্পরের নিত্যসহচরী হইয়া মানবের চিত্তক্ষেত্রে নির-ন্তর বিচরণ করে। যেখানে আশা নাই, সেখানে আশঙ্কাও নাই। অতএব আশাবিহীনতাই আনন্দ ও অভয়প্রদ; এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আশা হি পরমং দুঃখং।
নৈরাশ্যং পরমং সুখং॥"

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া-ছেন,—"সুখদা নিরাশা"। আশান্বিত ব্যক্তি জগতের কাছে দীন ভিখারী! যে আশার দাস, সে জগতের দাস; কিন্তু আশা যার দাসী, জগৎ তার দাস!

"আশাদাসী কৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ।"
আশাকে যে করিয়াছে দাসী আপনার,
তাহার দাসত্ব করে সমগ্র সংসার।

কথাটী সম্পূর্ণ ঠিক্। সামান্য সামান্য সাংসা-রিক বিষয়েও আমরা একটু নিঃস্বার্থতা—

'নিষ্কামতা সাধন' করিতে পারিলে, এ সত্যের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিতে পারি।

"সতু ভবতি দরিদ্রঃ যস্য তৃষ্ণা বিশালা।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥"
বিশাল-বাসনা যার, তাকেই দরিদ্র গণি।
তৃপ্তি-পরিতুষ্ট মনে কে দরিদ্র কেবা ধনী?

দরিদ্র কে? যে অভাবগ্রস্ত। বাসনা জন্মে কি জন্য? অভাব পূরণের জন্য। স্বভাবতঃ অভাব হইতেই বাসনার সৃষ্টি। যাহার বাসনা যত অধিক, তাহার অভাব-বোধ তত অধিক; সুতরাং যাহার অভাব যত, তাহার দারিদ্র্য তত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাসনাধীনই দরিদ্র। বাসনার বিশালতায় মহারাজাধিরাজের রত্ন-রচিত বেশ-ভূষার অন্তরালেও মূর্ত্তিমান দরিদ্রতা লুক্কায়িত থাকে! এই বিষয়-বাসনা বা অনিত্যাসক্তিই মানবকে দীন—দুর্ব্বল—সুতরাং সর্ব্বদা ভয়াতুর করিয়া রাখিয়াছে। এহেন সর্ব্বলোক-সংপীড়ক ভয়ের এক মাত্র প্রতিবিধান বৈরাগ্য—অর্থাৎ বিষয়-বিরাগ বা বাসনা-ত্যাগ।

প্রিয়-নাশের সম্ভাবনাই ভয়ের জনয়িত্রী। যাহার প্রিয়াপ্রিয় দুইই সমান, তাহার আর ভয় কি? অনিত্যেরই ত নাশ হয়; অনিত্যে যাহার স্বার্থ-বুদ্ধি নিবদ্ধ নহে, তাহার আর ভয় কি? বিনশ্বরে যে বদ্ধ নহে, সেই বিনাশের ভয় জয় করিতে পারিয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র এ জগতের সমস্ত বাসনার বিষয়কে 'ভয়ান্বিত' বর্ণনা করিয়া অবশেষে তারস্বরে বলিয়াছেন "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

বৈরাগ্যই নিশ্চয় ভয়-শূন্য। বৈরাগ্যই ইহ-জগতে অভয় লাভের অনন্য-উপায়। অভয়ই মোক্ষ, সুতরাং বৈরাগ্যেই মোক্ষ। অভয় ভগবানের অভয়-পদে, সুতরাং সে পদ লাভ হয় বৈরাগ্যেরই পথে।

এই বৈরাগ্য বাহিরের বস্তু নয়। বিষয়ের বিরাগ বাহির দেখিয়া বুঝা যায় না। যাহার কৌপীন-করঙ্গ ভিন্ন জগতে 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই, সে উহা লইয়াই ঘোর বিষয়ী হইতে পারে; আবার সসাগরা-ধরাপতি অশেষবিষয়াধিশ্বর জনকরাজাও বলিতে পারেন, "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং নমে দহ্যতে কিঞ্চন।"

বৈরাগ্য লাভে "বৈরাগী" আখ্যাধারী গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীরই কেবল মাত্র অধিকার নহে;—সাধিতে পারিলে, গৃহীও সেই একমাত্র অভয়প্রদ বৈরাগ্য-বৈভব-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সতত ভয়-সঙ্কুল অনিত্য বিষয় রাশির মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াও, নিত্যধন ভগবানের অভয়চরণে একটু চিত্ত রাখিতে পারিলে, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া আদরে তাঁহার অভয়-ক্রোড়ে সাধককে তুলিয়া লন। সংসারীর পক্ষে সংসারের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহিত থাকিয়া, কর্ম্ম-যোগ অব্যাহত রাখিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও অনুশীলন আবশ্যক। বৈরাগ্য অন্তরের ত্যাগ, সুতরাং বাহিরের ত্যাগেই তৎ সাধন সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্রও ভয়-ভঞ্জন-বিষয়ে মহাশক্তিসম্পন্ন। বৈরাগ্য-দুর্গের প্রান্তসীমা আশ্রয় করিতে পারিলেও এ মহা-ভয়াবহ সংসার-সংগ্রামে নিরাপদ বা নির্ভয় হওয়া যায়। এই জন্যই (উপসংহারে আবার বলি) কৃপাময় আর্য্যশাস্ত্র ভব-ভয়-ভীত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

কর্ম্মফল বা পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; ইহা কেবল জড়বাদিদিগের সহিত বিরোধ নহে। আত্মবাদিদিগের মধ্যেও হিন্দুব্যতীত প্রায় অন্য অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বর—পরলোক স্বীকার করিলেও জন্মান্তর স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সর্ব্বাগ্রে জড়বাদিদিগের সহিত উক্ত বিরোধের মীমাংসা প্রয়োজন; তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে, তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত মীমাংসা সহজ হইবে। ইতিপূর্ব্বে 'তড়িৎ-শক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে * শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে শক্তি হইতে বস্তুর উৎপত্তি ও শক্তিই আদি, প্রমাণিত হইয়াছে। জড়শক্তির সহিত চিচ্ছক্তির যে পার্থক্য, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে † জড়শক্তির মধ্যে চৈতন্য অন্তর্নিহিত থাকিলেও, চিচ্ছক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; কিন্তু জড়বাদিগণ তর্ক করিবেন যে, "জড়ের বিকৃতি এবং অনাবিষ্কৃত কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন জড়শক্তির সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্য বা চিচ্ছক্তি বিকাশিত হয়; তদ্ভিন্ন চিৎ বা চৈতন্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, ইত্যাদি। জড়বাদীদিগের কথিত মত ঐরূপ অনাবিষ্কৃত নিয়মাধীনরূপে সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে চৈতন্যের বিকাশ হয়, ইহা স্বীকার করিলেও * চৈতন্য ও জড়শক্তি এক হইতে পারে না। চৈতন্য বা চিচ্ছক্তি জ্ঞাতা (কর্ত্তা) এবং জড়শক্তি জ্ঞাত (কর্ম্ম)। অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, চৈতন্যশক্তি ঐ দাহিকাশক্তি অনুভব করিতেছে; ঐ অনুভূত বিষয় ও অনুভব-কর্ত্তা এক নহে; তবে জড়বাদীগণ এই তর্ক করিতে পারেন যে, জড়ের মধ্যে অবিকাশিত শুদ্ধচিচ্ছক্তি যখন সংযোগ, বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে বিকাশিত হয়, তখন উহা জড় হইতে পৃথক্ নহে এবং পৃথক্ হইলেও জড়শক্তি আদি, চিচ্ছক্তি তাহার ফলস্বরূপ। ইহার সংক্ষেপ-উত্তর এই যে, জড়শক্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে চিচ্ছক্তির বিকাশ হয় না; চিচ্ছক্তি হইতে জড়শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কারণ। প্রথমতঃ অগ্নির যে দাহিকা-শক্তি আছে, কে বলিল? বা কি প্রকারে প্রকাশিত হইল? জ্ঞান ও অনুভূতির সৃষ্টি না হইলে, জ্ঞাত ও অনুভূত বিষয়ের কখনই অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে; যাহা হউক, উভয়ে উভয়ের কারণ-স্বরূপ, এইজন্য হিন্দুদিগের কোনমতে চৈতন্য, কোনমতে অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি আদি। কিন্তু উভয়ই একমেবাদ্বিতীয় অব্যক্তের অব্যক্ত কারণের কারণ অনাদি পরব্রহ্ম হইতে আদিতে বিকাশিত হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে আদি

* ১৩০১ সালে "অনুসন্ধান" নামক পত্রিকায় আমার রচিত "তড়িৎশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল; উক্ত পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

† শক্তি এক ভিন্ন দুই নহে। শক্তিই ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া; উহা ত্রিগুণান্বিতা। এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব-প্রধানাশক্তিই চিচ্ছক্তি; যেহেতু সত্ত্বগুণ হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয়; তমোগুণপ্রধানাশক্তিই জড়শক্তি; যেহেতু তমোগুণ হইতে চৈতন্য আবরিত হয় বা চৈতন্যের অবিকাশ হয়। তজ্জন্য চিৎ ও জড়শক্তির পার্থক্য কথিত হইয়াছে।

* হিন্দু-পত্রিকার ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ হইতে চৈত্র সংখ্যা পত্রিকায় আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

† উক্ত পত্রিকার ঐ সনের বৈশাখ সংখ্যার পত্রিকায় ঐ পঞ্চদশীর প্রথম ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রধানা মূল-প্রকৃতি। কিন্তু বেদান্তের মতে যে মহাচৈতন্য আদি, তাহা তড়িংতত্ত্বে দর্শান হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাকৃতিকশক্তি কি চিচ্ছক্তি আদি, উহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অতীব কঠিন; যেহেতু জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞাতবস্তুর বিকাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে, জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে, জ্ঞাতা পুরুষ কি অনুভব করিবেন? উহা নিশ্চিত হউক বা নাই হউক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বা অনুভবকর্ত্তা ও অনুভূত বিষয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইতেছে।

মৎকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে দর্শান হইয়াছে যে, প্রাকৃতিকশক্তি ও চিচ্ছক্তির সামঞ্জস্যের ফলই মানবাত্মা। মানবের প্রত্যেক কার্য্য মন ও বুদ্ধি-মূলক; সুতরাং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া প্রাকৃতিক শক্তিজাত; কিন্তু ঐ মন ও বুদ্ধি চৈতন্য হইতে বিকশিত হয়। আপনার জ্ঞান ও অনুভবশক্তি না থাকিলে, আপনার নিকট আপনার কোন ক্রিয়ার বিকাশ সম্ভবে না ও আপনার কোন ক্রিয়ার উপর কোন আধিপত্য থাকিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বটে, কিন্তু অগ্নির কোন স্বাধীনতা নাই, অগ্নি স্বভাবের অধীন; কিন্তু মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে; মানব নিজের জ্ঞান—অনুভূতি হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। অবশ্যই ক্রিয়ার প্রবৃত্তি প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু তাহার বিচারকর্ত্তা স্বয়ং প্রকৃতি নহে, জ্ঞাতা অনুভবকর্ত্তাই নিঃস্বার্থ-বিচারকর্ত্তা; কিন্তু প্রবৃত্তি-সংযোগহেতু বিচার নিঃস্বার্থ হয় না। প্রবৃত্তি ও উদ্যম প্রকৃতি-মূলক। জড়শক্তির মধ্যেও উদ্যম ও প্রবৃত্তি আছে, তবে তাহা স্বভাবের অনুগামী; কিন্তু মানবে চিচ্ছক্তির সহিত প্রাকৃতিকশক্তির সামঞ্জস্যহেতু প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি ঠিক্ স্বভাবের অনুগামী নহে, উহা বিবেক-মূলক, কিন্তু বিবেক প্রবৃত্তির অনুগামী এবং প্রবৃত্তিও বিবেকের অনুগামী। ফলে চিচ্ছক্তির সাহায্যে মানবের প্রাকৃতিকশক্তি উন্নীত ও অবিদ্যার হ্রাস হইলে স্বাধীন ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। মহাচৈতন্য অনন্ত-জ্ঞানময়, প্রকৃতি শক্তিময়ী, অবিদ্যা অজ্ঞান-রূপিণী। প্রবৃত্তি ও জড়ীয় উদ্যম, জ্ঞানকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, আবার জড়ীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমকে চিচ্ছক্তি তাঁহার জ্ঞানাভিমুখী করিতে থাকেন। ঐ উভয়শক্তির সংঘর্ষণ-ফলে ষড়-শক্তি * কথঞ্চিৎ বিকাশিত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে বিচারশক্তি উৎপন্ন হয়; সুতরাং ঐ বিচারশক্তির ক্রিয়াও প্রকৃতিজাত। চিচ্ছক্তি প্রকৃতির উত্তেজক মাত্র। ভগবদ্গীতায় কার্য্যের মুখ্যকর্ত্তা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে। এই স্থানে ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটী দ্রষ্টব্য। এতদ্দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টী অপেক্ষাকৃত স্পষ্টীকৃত হইবে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

৩ অ, ২৭ শ্লোক।

(ক) বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি॥২৭

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

৫ অ, ১৪ শ্লোক।

জগৎপ্রভু, লোকের দেহাদির কর্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপন্ন করেন না অথবা কর্ম্মফল-সম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞানরূপা মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

(ক্রমশঃ—)

* জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কুণ্ডলিনীশক্তি, মাতৃকাশক্তি এবং মূলা-পরাশক্তি, এই ষড়শক্তির অঙ্কুর মানবে আছে; ক্রমে উহা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা,	১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা,	ভাদ্র ও আশ্বিন।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

গ্রহ-ফলের সহিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং স্ত্রীপুত্রাদির শুভাশুভের কারণ নির্ণয়।

এক্ষণে একটী গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, গ্রহগণের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ থাকায়, তদ্দ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ নির্ভর করে, কিন্তু ভ্রাতা, পত্নী, মাতা, পিতা প্রভৃতি ও (সন্তানের জন্মের পর) সন্তান সন্ততির শুভাশুভের সহিত কি সম্বন্ধ ও সংস্রব? অবশ্যই ধন, আয়, ব্যয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমস্তেরই শরীর, মন, বুদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব আছে, কিন্তু নিজের শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সহিত পত্নী, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, আত্মীয়-বন্ধু ও পূর্ব্বজাত সন্তান সন্ততির শুভাশুভের কি গূঢ় সংস্রব? উক্ত সংস্রব ও সম্বন্ধ-বিচার-নির্ণয়ের পূর্ব্বে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলানুসারে লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, পত্নী, বংস, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়-স্থানীয় গ্রহ সকল নির্ণীত—অর্থাৎ কর্ম্মফলানুসারে গ্রহ সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট ও কার্য্যানুবর্ত্তী হয়। প্রথমতঃ সন্তান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও পিতা, পিতামহের পাপপুণ্য (কর্ম্মফল) যে পুত্রপৌত্রাদিতে অর্শে, ইহা স্বীকার করেন।

"The Buddhist believes, as well as the modern philosophers that each generation is the heir to the consequences of the virtues and sins of the preceeding generation" অমিতাহারী, মদ্যপায়ী, ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কুপ্রবৃত্তিশালী যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যদোষে জীবনীশক্তি ও মানসিক বল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্তান সচরাচর তৎপিতৃগুণাবলম্বী হইবে এবং পিতৃকার্য্য ও স্বীয় কার্য্যদোষে অচিরাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিবে কিম্বা পীড়াগ্রস্ত অথবা অন্যরূপে বিপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। চোরের পুত্র কদাচিৎ সাধু হয়। মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক আচরণ

সন্তানগণ প্রায় অনুসরণ করে। মাতাপিতার সৎ বা অসদৃষ্টান্ত অনুসারে সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কতকগুলি সংক্রামকরোগ যে বংশপরম্পরাগত ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তর স্বীকার করিলে, মানুষ স্বীয় স্বীয় কার্য্যহেতু সদৃশ বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করে, বলিতে হইবে।

মানব স্বীয় কর্ম্মফলের অধীন বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্মফলানুসারে সমস্ত মানব একটী অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত। মানববুদ্ধি অজ্ঞানমিশ্রিত (অনন্তজ্ঞানের ছায়া মাত্র) হইলেও যখন সেই মানববুদ্ধি দ্বারা সভ্য গভর্ণমেণ্টের বিশাল সাম্রাজ্য একটী ন্যায়সূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্দ্বারা বিশাল ভূভাগ শাসিত হয়। যখন মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত সভ্য-রাজনীতিদ্বারা শাসনযন্ত্রের এই প্রকার গঠন, এইপ্রকার বৈচিত্র্যহীনতা ও বিপুল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অলৌকিক একতা; যখন একই যন্ত্রস্থ সুরসংযোগে সর্ব্বত্র নিনাদিত; বিশাল সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রে আকর্ষিত ও সেই কেন্দ্রস্থিত সমগ্র পরমাণু একত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন মাধ্যাকর্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, (ইহা নিতান্ত কাল্পনিক নহে; বর্ত্তমান বৃটিষ-শাসন এই অপূর্ব্ব গভীর নীতি-নৈপুণ্যের উদাহরণস্থল), তখন সেই অনন্তবিশ্ব যে অব্যক্ত শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত ও ন্যায়সূত্রদ্বারা গ্রথিত আছে, সেই শক্তি ও ন্যায়সূত্রের যে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহলোক ও পরলোকব্যাপী সেই অব্যক্ত অনন্ত ন্যায়ের সুসামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ঐশিক আইন যে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বথা সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যখন বাহ্যপ্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশস্থলে পিতা-পুত্র সমগুণ ও সমধর্ম্মাবলম্বী হয় ও আকৃতি-প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তখন উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরীণ কার্য্যফলের যে সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; উভয় বস্তু এক গুণবিশিষ্ট হইলে পরস্পরের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নীর পরস্পরের মধ্যে ইহজীবনে স্ব স্ব কর্ম্মফলের সামঞ্জস্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা অবশ্যই একটী অব্যক্ত কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত, ঐ কর্ম্ম-সূত্র ইহ-পরলোকব্যাপী। অবশ্যই প্রত্যেক মানবের স্বাধীন কার্য্যের ফল পৃথক্ পৃথক্। পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, পরস্পর কর্ম্মসূত্রে সংস্পৃষ্ট থাকিলেও ইহাদের পরস্পরের স্বাধীন কার্য্যফলে পৃথক্ পৃথক্ সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেকের ভিন্নপ্রকার উন্নতি বা অবনতি দ্বারা উহারা ভিন্ন পথাবলম্বী হয় বটে, তবে কোন্ কালে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্র আকর্ষিত হইবে, তাহা সেই সূত্র-প্রণেতা সর্ব্বনিয়ন্তা ব্যতীত কেহই অবধারণ করিতে পারে না।

যে অবস্থায় উভয়ের কর্ম্মফলের সৌসাদৃশ্যহেতু এক মানবাত্মা অন্য মানবশক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত ও সেই মানবশক্তির বা মানবীয় শুক্র-শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহজগতে পুনঃ মানবরূপে অবতীর্ণ হয়, সেই অবস্থা সঙ্গত ও কর্ম্মফলানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গ্রহাদির সহিত সংস্পৃষ্ট ও তদনুসারে মাতাপিতার শারীরিক মানসিক অবস্থা ও নবোৎপন্ন শক্তি সংমিশ্রণে ঐ মাতাপিতার জীবনীশক্তি, জননশক্তি ও মানসিকবৃত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য-কারণ সংযোজিত হয়। তাহাহইতেই ফলিতজ্যোতিষপ্রণেতাগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে গ্রহাদির সংস্রব ও সম্বন্ধ স্থির

করিয়া, সহজ সঙ্কেতস্বরূপ ঐ লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করতঃ ঐ ঐ ঘরে গ্রহগণের স্থিতি-গতি অনুসারে কতকগুলি ফল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। দুই কারণে ভ্রাতৃস্থান মন্দ হইতে পারে; এক পিতৃমাতৃ-বিয়োগহেতু বা পিতা-মাতার জননশক্তি হ্রাস বা অভাবহেতু। জননশক্তি হ্রাস বা অভাবেরও দুইপ্রকার ফল, যথা জননশক্তি হ্রাসহেতু সন্তান জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও জননশক্তিহ্রাসের সহিত উৎপন্ন সন্তানের জীবনীশক্তির বিশেষ সংস্রব থাকায় ঐ সন্তান অল্পকালেই নষ্ট হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি যে গ্রহাদির স্থিতি, গতি ও দূরত্বের সহিত সংস্রবযুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরাচর লোক বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যমজ সন্তান একই সময়ে গর্ভস্থ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটী অল্পজীবী এবং অপরটী দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ কি? মাতা-পিতার সহিত নবাগত সন্তানদ্বয়ের সংস্রব—অথচ উহাদের পৃথক্ কর্ম্মফলানুরূপ গর্ভস্থ হওয়ার কালে মাতা-পিতার জননশক্তি ও গর্ভস্থ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে স্থায়িত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব ইত্যাদি কারণ-মূলে বীজ বিভক্ত হয়; উভয়ের জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংস্রব তদনুগামী অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। গড়ে এক এক লগ্ন ২ ঘণ্টা (প্রায় ৫ দণ্ড)। প্রথম প্রসূত সন্তান পূর্ব্ব শুভ লগ্নের ৫ মিনিট বাকী থাকিতে ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার লগ্নানুসারে তাহার লগ্নস্থানীয় ও নিধনস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল ও ৫ মিনিট পরে তৎপর লগ্নের প্রথমে যে যমজ ২য় সন্তান জন্মিবে, তাহার লগ্নস্থ ও ধ্বংসস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য শুভগ্রহাদি উক্ত ৫ মিনিট্ কালে ঠিক যথাবস্থায় থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে এবং শেষোক্ত সন্তানের আরও অনুকূল হইতে পারে। ঐ দুই যমজ সন্তান সমভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। এস্থলে জ্যোতির্ব্বিদ্ ভিন্ন কে বলিতে পারে, যে তাহার একটী যৌবনে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার মনে ক্লেশ দিয়া এবং বিবাহ হইলে, সেই নবীনা পত্নীকে চিরজীবনের জন্য অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতে পারেন, নাক্ষত্রিক দশানুসারে উহার তনু ও নিধন ভাবের গ্রহ ও বর্ষাধিপ এবং কেতুচক্র অনুসারে ত্রিপাপবর্ষ ও বর্ষগণনা এবং দৃষ্টিস্ফুটগণনা অনুসারে নিধন-ভাবে গ্রহসকলেই নিধনস্থানে বিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় পরমায়ু শেষ হইবে। যমজ সম্বন্ধে লগ্ন-বিভিন্নতাস্থলে একটী সুন্দর গণনা আছে, বাহুল্যভয়ে বিবৃত করিলাম না। ঐ গণনা অনুসারে একটীর ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা। ভ্রাতা ও সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। পত্নী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট যে, গ্রহের বলাবল ও সংস্থান অনুসারে শরীরস্থ পদার্থ বিশেষ দূষিত ও বিষাক্ত হইতে পারে এবং পত্নীর সহিত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিবিশেষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধ হইতে একের কার্য্যকালে অন্যের দৈহিক অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, এই মীমাংসা প্রকৃতি-সঙ্গত, কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বিবাহ, রাজ্যলাভ বা সম্পত্তিলাভ, গৃহলাভ, বস্ত্রলাভ, জলাশয় ও তীর্থলাভ, অপঘাতমৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় জ্যোতিষগণনার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যদিও আপাততঃ উহার বিজ্ঞানসম্মত সাক্ষাৎ কারণ নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু কর্ম্মফলের সহিত মানব এবং সৌরজগতস্থ গ্রহদিগের সম্বন্ধ যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ও পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিতমত

ভূত-ভবিষ্যৎ যাঁহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষবৎ, ঐশী আইনের প্রতিপৃষ্ঠার প্রতিঅক্ষর যাঁহাদিগের নিকট পরিচিত, তাঁহাদের নিকট মানবজীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কার্য্য নখদর্পণের ন্যায় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মানবজীবন কর্ম্মফলানুসারে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়-সূত্ররূপ ঐশী নিয়ম বা আইনের অধীন। ব্যবস্থাপকের আইনের কূট অর্থ যেরূপ উচ্চতম বিচারালয়ে অবস্থার অসামঞ্জস্যহেতু অর্থান্তরিত ও ব্যাখ্যাত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে ব্যবস্থাপকগণ পূর্ব্বব্যবস্থা রূপান্তরিত করিয়া অবস্থাসঙ্গত নূতন বিধি প্রণয়ন করেন, সেইরূপ ঐশী নিয়ম বা আইন ইহজীবনে পুরুষকারদ্বারা সংশোধিত হইলে, তৎসঙ্গত কার্য্যানুরূপ নূতন ফল সংযোজিত হয়। মহাত্মাগণ অন্তঃশক্তিবলে ঐ আইনের প্রতি অক্ষর অবগত আছেন ও তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী কার্য্যকারণ-সম্ভূত-ফলও তাঁহাদের নিকট অস্পষ্টীকৃত নহে।

গ্রহগণের গতির সহজ দৃষ্টান্ত, দৈহিক ও মানসিক মহামারী।

উপরোক্ত বর্ণনানুসারে ফলিতজ্যোতিষ কাল্পনিক নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তিগণের বুঝিবার নিমিত্ত আরও দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, চন্দ্র-উদয়ে কুমুদ, সূর্য্য-উদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়; একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রস্থ জলের ন্যায় শরীরের রসও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্যই একাদশীর উপবাস অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালনের ব্যবস্থা আছে। আবার প্রত্যেক তিথি অনুসারে খাদ্যের নিষেধ-বিধি যাহা আছে, তাহাও এইক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত। ইহাদ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ মানবের শারীরিক-মানসিক সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে, তাহা এক্ষণে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্বীকার করেন যে, অনাচ্ছাদিত স্থানে দীর্ঘকাল চন্দ্ররশ্মি উপভোগদ্বারা মানবের মনের বিকৃতি হয় ও উন্মাদ-রোগের সূত্র হয়। তদ্ভিন্ন বাসন্তিক চন্দ্র বা শরচ্চন্দ্র হইতে যে কোন কোন মনোবৃত্তির উত্তেজনা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এবং সমস্ত কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত মানবের এই সকল ব্যাপারের সম্বন্ধ ও সংস্রব থাকে, তবে ঐ চন্দ্রসূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের সহিত মানবের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সম্বন্ধ ও সংস্রব যে নাই, কে বলিতে পারে? যখন ফলিতজ্যোতিষের গণনার ফল অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ খাটে এবং পূর্ব্ববর্ণিত মত উহা যুক্তি-বহির্ভূতও নহে, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অবিশ্বাস করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

তদ্ভিন্ন অন্য আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ঐ দৃষ্টান্তটী আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতির ন্যায় আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুতর উপাদান (Elements) অবস্থিত আছে।

কোন কোন সময়ে বিসূচিকা, বসন্ত ও অন্যান্য পীড়ার মহামারী (Epidemic) দেশব্যাপী হইয়া উঠে, উহা যে আকাশস্থ বায়বীয় অদৃশ্য কুপদার্থ বা মানবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্ত্যাধিক্যের ফল, তাহা বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া থাকেন; বাস্তবিক ঐ সকল দেশব্যাপী মহামারী প্রধানতঃ বায়বীয় দূষিত পদার্থের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন বায়বীয় দূষিত পদার্থ দ্বারা ঐ সকল দেশব্যাপী পীড়া সম্ভব, সেইরূপ এক এক সময় ঐ সকল আকাশস্থ ঔপাদানিক শক্তির আধিক্যহেতু সাধারণতঃ মানব-সমাজের এক মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেশব্যাপী ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব বা সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। একই সময়ে সমাজস্থ একরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? ইহারই নাম মানসিক মহামারী (Mental epidemic,) ইতিহাসে ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সকল প্রতিকূল ঔপাদানিক শক্তির আধিক্য ও প্রবলতার হেতু কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন? উহাও গ্রহ-বিশেষের গতির ফল; মানববৃত্তির সহিত গ্রহ-শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। কোন কোন গ্রহ পৃথিবীর নিকট দিয়া গমনের সময় তজ্জাতীয় উপাদান ও আকাশস্থ উপাদানের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায় ঐ সংঘর্ষণ হেতু তাহার প্রবল প্রবাহ পার্থিব বায়ুমণ্ডলাভিমুখী হয়। ঐ প্রবাহ ঐ বায়ুমণ্ডলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বায়ু-মণ্ডলের একটী প্রবাহ পৃথিব্যাভিমুখী হয়; তদ্দ্বারা শারীরিক বা মানসিক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহার একটী সরল দৃষ্টান্ত এই, সকলই অবগত আছেন যে, বৃহৎ ষ্টীমার প্রবল-বেগে চলিয়া গেলে নদীতে একটী প্রবাহ বা তুফান উপস্থিত হইয়া তরঙ্গাঘাত হইতে থাকে। ঘূর্ণবায়ুর বিষয় সকলেই অবগত আছেন; এই সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, ফলিত-জ্যোতিষ অমূলক নহে। আর্য্যদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে (নিদানে) উন্মাদ-রোগ কয়েক ভাগে বিভক্ত আছে ও তাহার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। ঐ রোগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ১ শরীরজ, ২ গ্রহাক্রান্ত; শরীরজ অর্থে—শরীর দূষিত হইয়া ঐ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহার অনেক কারণ আছে, ঐ সকল কার্য্যকারণ নির্ণয় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহাক্রান্ত উন্মাদরোগের মধ্যে অনেক অবান্তর ভাগ আছে, যথা—দেবগ্রহাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত ইত্যাদি, সাধারণ লোকে ঐ সকল পীড়াকে "ভূতে পাওয়া" বলে। নিদানে ঐ দেবাদি গ্রহাক্রান্ত কেবল লক্ষণানুসারে নির্ণীত হয়, যে সকল উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত রোগী কেবল পূজা-অর্চ্চনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে দেবগ্রহাক্রান্ত, আর উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী (অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতিতে ঘৃণা রহিত) ইত্যাদি রোগীকে পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত, সর্ব্বদা বেশ-বিন্যাসে রত, ইন্দ্রিয়াসক্ত ইত্যাদিকে গন্ধর্ব্ব-গ্রহাবিষ্ট কহে। ঐ গ্রহাবিষ্ট বা গ্রহাক্রান্ত উন্মত্ততার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রহগণের গতি, স্থিতি, নৈকট্য ও অন্যান্য কারণে পার্থিব বায়ুর সহিত শরীরের প্রতিকূল বাষ্পীভূত পদার্থ সংমিশ্রিত হইয়া বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেশ-ব্যাপী হইয়া উঠে; কিন্তু ঐ মহামারী দেশব্যাপী হইলেও সকলেই যে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এরূপ নহে; যাহাদের শারীরিক পদার্থ কিঞ্চিৎ দূষিত হয়, পূর্ব্বোক্ত কুবাষ্প ঐ দূষিত পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শরীরের অন্যান্য পদার্থ দূষিত করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত রোগাকারে পরিণত

হয়। শারীরিক পদার্থের সহিত যেরূপ পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকা প্রভৃতির কারণীভূত কুবাষ্পের সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে, সেইরূপ মানসিক উপাদানের সহিত সূক্ষ্মতর তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল তত্ত্ব বা শক্তির সম্বন্ধ আছে। মানসক্ষেত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্বই দেবাদি গ্রহাংশ, ঐ সকল তত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিতমত গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতির সংস্রব হইতে পার্থিব সূক্ষ্মতর বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের মন আক্রমণ করে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত মানসিক উপাদান কিঞ্চিৎ দূষিত না হইলে, ঐ সকল তত্ত্ব মনের উপর হঠাৎ আধিপত্য করিতে পারে না। শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ আছে,; শারীরিক পদার্থ কোন কারণবশতঃ দূষিত হইলে, মানসিক উপাদানও কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে; এই দূষিত উপাদান অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্ব আশ্রয় করে। নলরাজার দেহে কলি-প্রবেশ ও শ্রীবৎস রাজার দেহে শনি-প্রবেশের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন; উহা অমূলক নহে, উহার বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মফল বা পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

৫ অ, ১৫ শ্লোক।

পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥"

১৩ অ, ৫ শ্লোক (ক)।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, শ্রোত্রাদির পঞ্চ বিষয়॥ ৫॥

"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

১৩ অ, ৬ শ্লোক।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি, সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থই ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ৬॥

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধিপ্রকৃতি সম্ভবান্॥"

১৩ অ, ১৯ শ্লোক।

প্রকৃতি-পুরুষ, এ উভয়ই অনাদি; বিকারসমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা তুমি বিদিত হও॥ ১৯॥

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

১৩ অ, ২০ শ্লোক।

প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ সুখদুঃখের ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ২০॥

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনি জন্মসু॥"

১৩ অ, ২১ শ্লোক।

এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃ-

তির সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ জন্যই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয় ॥ ২১ ॥

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥"
১৩ অ, ২২ শ্লোক।

এই দেহে বিদ্যমান্ থাকিয়াও পরমপুরুষ সর্ব্বথা স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন ॥২২॥

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥"
১৩ অ, ২৯ শ্লোক। (ক)

মায়া-প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্-দর্শী ॥ ২৯ ॥

কর্ম্মফল দুইপ্রকার, যথা—স্বাভাবিক ও মনুষ্যের স্বাধীন ক্রিয়াজাত। স্বাভাবিক ক্রিয়া-ফলে স্বভাবের উন্নতি-অবনতি হয়। যেমন ভূমির উৎপাদিকাশক্তি ও বৃষ্টির জলপ্রপাত ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্ম্মফলে ধান্যপ্রভৃতি উদ্ভি-দের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে; ঐ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উদ্যমের অঙ্কুর থাকিলেও ঐ অঙ্কুর সম্পূর্ণ তমোগুণাবৃত উহাতে জ্ঞানশক্তি না থাকায় স্বাধীন ক্ষমতা নাই; উহারা সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের অধীন। পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবের ক্রিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাধীন-ক্ষমতামূলক বলিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহা-দের সেরূপ স্বাধীন-ক্ষমতামূলক নহে; তাহাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য হয়। তাহাদের জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অঙ্কুর আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশ অতি অল্প, এজন্য স্বভাবের প্রতিকূলে কার্য্য করিবার কিম্বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উদ্যম-স্রোত-নিবৃত্তি করিবার শক্তি নাই। উদ্ভিদ্ বা অন্য জীব-জন্তু (উত্তেজকস্বরূপ কূটস্থ চৈত-ন্যের পরোক্ষ জ্যোতিঃসংযোগে) সাক্ষাৎ প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উহাদের উদ্যম (Energy) শেষ হইলে, ঐ বস্তু বা জৈবী-শক্তি * পুনঃ প্রকৃতি-মাতার গর্ভস্থ বা প্রকৃ-তিতে লীন হয়। অবশ্যই স্বাভাবিক কর্ম্মফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক উন্নতি হইতে থাকে বটে, কিন্তু বস্তু বা জৈবীশক্তির স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের উদ্যম শেষ হইলে (মৃত্যু হইলে) কোন কোন মতে উহাদের আত্মার † আর পৃথক্ অস্তিত্ব (Identity) থাকে না। স্বভাবের প্রবৃত্তি ও উদ্যম স্বভা-বেই লীন হয়, তবে উত্তেজক চিৎশক্তির সাহায্যে বা সংঘর্ষণে মূলপ্রাকৃতিকশক্তির ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। প্রকৃতির ঐ উন্নতির এক এক সোপান অতিক্রম দ্বারা এক এক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্ ও জীবের উৎপত্তি হয়।

চৈতন্য ও জড়শক্তি পরস্পরের ক্রমিক সংঘর্ষণে পৃথিবীতে জৈবতত্ত্বের বিকাশ হয় এবং জীবের অন্তরানুভূতির উৎপত্তি হয়।

---

* এই জৈবীশক্তি অর্থে আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য নহে, জীবনীশক্তি Lifo principal বুঝাইবে। কূটস্থ চৈতন্য সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে আছে, তবে সকল বস্তুতে তাহার বিকাশ নাই। মৃৎ-পর্ব্বতাদিতে আদৌ বিকাশ নাই; ইতর জীব-জন্তুতে অল্প বিকাশ আছে মাত্র। মানব-বুদ্ধিই উহার চিম্নি বা দর্পণস্বরূপ; ঐ দর্পণে যে উহার প্রতিবিম্বের বিকাশ হয়, ঐ প্রতিবিম্বই মানবাত্মা।

† এস্থলে 'আত্মা' অর্থে কূটস্থ চৈতন্য নহে, জান্তব-শক্তি (Animal force) বুঝিতে হইবে। ইহাই মনুর ভূতাত্মা। বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার শেষসংখ্যায় পঞ্চ-দশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ চিৎশক্তির সাহায্যে ঐ অনুভূতি ক্রমে উন্নত ও বিশদ হইতে থাকে এবং তৎসহ সদসদ্বৃত্তির বিকাশ হয় *। ঐ সদসদ্বৃত্তির সহিত পুনঃ চিৎ-জ্যোতিঃসম্মিলনে ও সংমিশ্রণে যুক্তি ও বিবেকের বিকাশ হয়, অর্থাৎ স্বভাবজাত সদসদ্বৃত্তি এবং চৈতন্যজাত জ্ঞানের সম্মিলনের ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ মানব-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে 'বিজ্ঞানময় কোষ' কহে; প্রকৃতপক্ষে ঐ বুদ্ধি-তত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষই মানবতত্ত্ব। ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব বিকাশের পূর্ব্বে চিৎ বা জ্ঞানজ্যোতির প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ হয় না। পশুজগতে উহা উত্তেজক স্বরূপে প্রকৃতির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ প্রাকৃতিক উদ্যম ও প্রবৃত্তির বিকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উদ্যম এবং প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে ক্রমে অস্পষ্ট জ্ঞান ও অনুভূতিরূপ চিদগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহারই ফলস্বরূপ পশু-জগৎ। ঐ প্রধূমিত চিদগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলেই অবিদ্যার গভীর অন্ধকার মধ্যে তাহার জ্যোতি ক্রমে ভাসমান হয়, কিন্তু ঐ জ্যোতি অন্ধকার-সংমিশ্রিত আলোকের ন্যায় ("মেটে জ্যোৎস্না"র ন্যায়) প্রতীয়মান হয়; উহা নির্ম্মল আলোকের সহিত সংমিশ্রিত বা সম্মিলিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণময়ী চিৎশক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি ও তমোগুণময়ীশক্তিই জড়শক্তি এবং ঐ সত্ত্ব-তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধানাশক্তিই জৈবীশক্তি। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানময়, বুদ্ধিতত্ত্বের রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তিময়, জীবতত্ত্বের তমোগুণ হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকাশ হয়। উক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে যতদিন সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় না, কিন্তু উক্ত জড়দেহাশ্রিত সত্ত্বগুণ, রজস্তমমিশ্রিত মলিন বিধায় ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ মানব-বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ জড়দেহের গুণ, উদ্যম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বুদ্ধিরও তারতম্য হয়; প্রবৃত্তি ও ঐ বুদ্ধির তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিবেকশক্তির উৎপত্তি হয়। ঐ অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য ও বিবেকই অহংতত্ত্ব বা আমিত্ব। সমগ্র জগৎ যাঁহার বিরাট দেহ, সমগ্র ক্রিয়াশক্তি, প্রবৃত্তি এবং উদ্যম যাঁহার প্রাণ বা জীবন এবং বুদ্ধি-তত্ত্ব-সমষ্টি যাঁহার মহা আমিত্ব, সেই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র অংশই ব্যষ্টি-পুরুষরূপ মানব। তদ্ধেতু ইহলোকে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে, স্বভাবসংমিশ্রিত বিবেক-শক্তির অধীন। তবে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব বিধায় তিনি পূর্ণ স্বাধীন, স্বভাব তাঁহার সম্পূর্ণ অ ন; কিন্তু মানব-বুদ্ধি জড়দেহাশ্রিত এবং রজস্তমমিশ্রিত বিধায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, স্বভাবেরও অধীন। উক্ত মহাপুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধায় স্বভাব-জাত কর্ম্মফল তাঁহাতে সংযোজিত হয় না, কিন্তু মানব স্বাধীন হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিজাত কর্ম্মের অধীন বিধায় তাহাতে কর্ম্মফল সংযোজিত হয়; অতএব প্রত্যেক মানবের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-সংমিশ্রিত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীন কার্য্য ও তাহার ফল স্বতন্ত্র হওয়ায়, ঐ কর্ম্মফলে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি বিশেষের

---

* পূর্ব্বোক্ত অনুভূতি এবং সদসদ্বৃত্তি মনোময় কোষান্তর্গত। পশুদিগের ঐ মনোময় কোষের অঙ্কুর আছে; ঐ অঙ্কুর ক্রমে চিৎ-জ্যোতির আভাসে বিশদ ও পরিস্ফুট হইলে, বিজ্ঞানময়কোষের বিকাশ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত কূটস্থ চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপে বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত হয়; ঐ বিজ্ঞানময় কোষই ক্ষেত্রজ্ঞের সহচর; ঐ কোষসহ ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তরে ভ্রমণ করেন; ক্রমে ঐ কোষ পরিস্ফুট হইলে, আনন্দময়ের বিকাশ হয় ও জীব মুক্ত হয়েন।

কর্ম্মফল মানব-সাধারণ্যে অর্থাৎ সমাজে কিয়ৎ-পরিমাণ সংযোজিত হইলেও * মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতত্ত্ব—তদ্ধেতু পৃথক্‌ব্যক্তিনিষ্ঠত্ব (Individuality) থাকায় প্রত্যেক মানব স্বীয় স্বীয় পাপ-পুণ্যের দায়ী হয়।

সমষ্টি-শক্তিসমন্বিত বিরাট পরমাত্মা ও মন-বুদ্ধি-সমন্বিত ব্যষ্টি মানবাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র কর্ম্ম আছে। মানবের কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও মানবের কর্ম্মে কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বরের কর্ম্মই প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঐশিক আইন; অতএব ব্যষ্টি-মানবাত্মা স্বীয় কর্ম্মদ্বারা ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের বা ঐশিক আইনের পোষকতা বা তাহা ব্যতিক্রম করিতে শক্ত। মানব স্বীয় চেষ্টা (পুরুষকার) দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে পারে ও স্বাভাবিক কাল-পরিমিতির পূর্ব্বেও সুফল ফলাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা পশ্চাৎপদ হইয়া—এমন কি, স্বীয় মানবাত্মার ধ্বংস—অর্থাৎ স্বীয় আত্মার † সাত্ত্বিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে পারে।

উপরোক্ত মীমাংসা কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহে। সর্ব্বধর্ম্মেই মানবের কর্ম্মফলে আত্মার উন্নতি-অবনতি স্বীকৃত আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্বে ঐ উন্নতি-অবনতির ক্রম ও প্রণালীসকল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ন্যায়-বিচারমূলক বলিয়া বোধ হয় না। শক্ত্যুপহিত মহাচৈতন্য বা অনন্ত ঈশ্বর নির্ম্মলজ্ঞান ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন। এই বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই মূর্ত্তিমান্ জ্বলন্ত ন্যায় ও বিচার বিরাজিত। তারপর মনুষ্যের এই বিচারশক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই যে মানব-সমাজে ব্যবস্থাপ্রণেতা "লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল" ন্যায় ও যুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করিতেছেন, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইন ও ন্যায়-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ন্যায়ের গভীর ও সূক্ষ্মতম ভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রাচীনকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, পরাশর প্রভৃতি ন্যায়মূলক ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, গ্রীক ও রোমের প্রাচীন মৌলিক আইনের সারস্বরূপ "জুরিজ্‌প্রুডেন্স" পাশ্চাত্য-জাতির আইনের ভিত্তিস্বরূপ অবস্থান করিতেছে, ঐ সকল ন্যায় ও যুক্তিপূর্ণ আইন মনুষ্য-বুদ্ধি ও বিচার-প্রসূত; ঐ মনুষ্যবুদ্ধি ও বিচার অজ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃবিকাশ মাত্র। যখন অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞানের সামান্য জ্যোতিঃ হইতে মানব-কৃত ন্যায় ও বিচার চতুর্দ্দিকে জাজ্বল্যমান, তখন সেই নির্ম্মল অনন্ত-জ্ঞানমূলক ন্যায়-বিচারের কি কোন অঙ্গহানি হইতে বা কোন অংশে অভাব থাকিতে পারে?

মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতিও পরলোক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর মানবাত্মা বিচারকাল পর্য্যন্ত স্তম্ভিত থাকে, সৃষ্টির শেষে বিচারান্তে পরলোকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হয়। উপরোক্ত মতটী আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ন্যায়-মূলক বলিয়া বোধ হয় না; প্রথমতঃ একটী

---

* আইনের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট দায়িত্বের (Joint and several liablity) ন্যায় ব্যক্তিগত কর্ম্মফল সমাজে কিয়ৎ পরিমাণ অর্শিলেও কর্ম্মকর্ত্তা যে তাঁহার কৃত-কার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং পৃথক্ দায়ী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

† এস্থলে আত্মা অর্থে বিজ্ঞানময় কোষ-সংযুক্ত আত্মা॥ ঐ বিজ্ঞানময় কোষই উচ্চমনাঙ্গ বুদ্ধি—অর্থাৎ আত্মার ধ্বংস অর্থে বুদ্ধির ধ্বংস বুঝিতে হইবে।

মানবের ইহ জীবনের উর্দ্ধসংখ্যা ১০০ বৎসরের কর্ম্মফল অনন্তকাল ভোগ করা বিচার-সঙ্গত নহে। কাহারও অতি শৈশবে, কাহারও যৌবনকালে মৃত্যু হয়; তাহাদের অতি অল্প-কালের কার্য্যহেতু অসীম অনন্তকাল তাহার ফলভোগ হওয়া অতীব ন্যায়বিগর্হিত। ইহার মধ্যে শিশু, অশিক্ষিত ও বিচারবিহীনলোক আছে, ইহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই বলিলেই হয়; ইহাদের কার্য্যের ফলাফল বোধই নাই। ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই শক্তি দেন নাই, অথচ সেই সেই বুদ্ধিহীন নিরীহ লোক বুঝিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহার জন্য পর-লোকে দণ্ডের তারতম্য হইলেও অনন্তকাল তাহার ফলভোগ করা কি ভয়ঙ্কর কঠিন কথা দ্বিতীয়তঃ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিলে, পুন-র্জ্জন্মের কর্ম্মফলে ইহজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি কি ফলাফল সম্ভব নহে। মনে করুন, একজন নিরীহ ভদ্রলোক, কিন্তু অর্থ-সামর্থ্যহীন, অন্য লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী করিল, রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করাইল, তাঁহার নির্দ্দোষী পরিবারবর্গকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করায়, তাহারা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা ঐ অন্নাভাবে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ কারাগারস্থ ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিল; কিন্তু ঐ অত্যাচারকারী ক্রমে পরস্বাপহরণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল; অতএব ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে বিনা কারণে ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তি বিনাপরাধে ঘোর বিপন্ন হওয়া ও অত্যাচারী সহস্র পাপকার্য্য করিয়া পরম সুখ-সম্ভোগ করা কি বিচার ও ন্যায়সঙ্গত? ইহার সঙ্গতহেতু কেহ বলিতে পারেন? যদি কেহ বলেন যে, বিপন্ন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত বিপন্ন হইয়াছে এবং অত্যাচারী তাহার কূটবুদ্ধি ও চতুরতাহেতু সুখসমৃদ্ধি ভোগ করি-তেছে; উহাই ইহজীবনের কর্ম্মফল। আমরা তদুত্তরে এই বলিতে পারি যে, ঐ বুদ্ধিহীনতা কি তাহার নিজ অপরাধ? ঈশ্বর তাহাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন, সে তাহার অপব্যবহার করে নাই, অথচ সে বিপন্ন এবং প্রকৃতি বা ঈশ্বরদত্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বুদ্ধির অপ-ব্যবহার ও দুষ্কর্ম্ম করিয়া জনসমাজে ধনী, মানী ও খ্যাত্যাপন্ন, ইহা কি ন্যায়-বিচার-মূলক? বলিতে পারেন যে, অত্যাচারীর ফল-ভোগ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার পুত্র-পৌত্রাদি অবশ্যই করিবে ও নির্দ্দোষী বিপন্ন ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিও তাহার পিতৃপুণ্যবলে তাহার ফলভোগ করিবে। ইহজগতের কর্ম্ম-সূত্র সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কর্ম্মফল বংশানুক্রমিক সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য; অনেকস্থলে ঐরূপ ফল সংযোজিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বস্থলে ঠিক্ ঐরূপ ঘটে না। যাহা হউক, সর্ব্বস্থানে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য স্বীকার করিলেও উহা ন্যায়মূলক বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের পুত্রপৌত্র উহা-দিগের পাপপুণ্যের ফলভোগ করিলেও ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তি নিরপরাধে ঘোর বিপন্ন ও অত্যাচারগ্রস্ত হওয়াও ঘোর পাপী অত্যাচারী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সুখসম্ভোগ করা কখন ন্যায়-বিচারমূলক নহে। উপযুক্ত শিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যত্ন ও চেষ্টাসত্ত্বেও চিরকাল কষ্টে কালাতিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; অন্য অশিক্ষিত অধার্ম্মিক ব্যক্তি সামান্য যত্ন ও চেষ্টা-দ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া ইহজীবনে সুখসম্ভোগ করিয়া, দম্ভের সহিত ইহজীবন

অতিবাহিত করিল ; ঐ উভয় ব্যক্তির ইহজীবনের কর্ম্মফলের কারণ এস্থলে নির্ণয় করা কঠিন। কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ অশিক্ষিত অধার্ম্মিক ব্যক্তি অল্প যত্ন-চেষ্টায় প্রকৃতি-সঙ্গত উন্নতির পথটী প্রাপ্ত হইয়াছিল, শিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যত্ন-চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসঙ্গত উপায় নির্ণয় করিতে পারেন নাই ; প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করিতে না পারিলে সে তাহার ফলভোগ করিবে ; ঈশ্বর তাহার জন্য দায়ী নহেন। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতিদত্ত কূটবুদ্ধি পরিচালনে সামান্য আয়াস ও যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করা এবং শিক্ষিত ধার্ম্মিক ভদ্রলোকের সরলবুদ্ধি পরিচালনে প্রকৃতিসঙ্গত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া চিরজীবন কষ্টভোগ করা ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্যের বিচারসঙ্গত নহে। একটী বালক জন্মাবধি নীরোগ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, সুচতুর, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন; তাহার নিজের কোন কার্য্যফল ব্যতীত হঠাৎ বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহাতে তাহার মাতাপিতার বা তাহার নিজের কোন কর্ম্মফল দেখা যায় না। যদি বলেন যে কারণে দেশে বিসূচিকা পীড়ার উদ্ভব হয়, তাহার স্বদেশীয়গণ সেই কারণ আবিষ্কার ও দূর করিতে না পারায় তাহাদের স্বীয় কর্ম্মফলে স্বদেশের মধ্যে যাহার প্রকৃতির সহিত ঐ পীড়ার প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইবে, সেই আক্রান্ত ও কালগ্রাসে পতিত হইবে, ইহা স্বীকার করিলেও যখন ইহজীবনের কার্য্যের ফল ইহজীবনেই শেষ হইবে, বলা হয়, সেস্থলে প্রকৃতির ঐরূপ বৈষম্য কখনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহজীবনের কার্য্যফল যে ইহজীবনেই কতক ভোগ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি। ইহলোক এবং পরলোক যে একই নিয়মাধীন, উহা আমরা প্রমাণ করিতে বা দর্শাইতে ত্রুটী করি নাই ; যাহা-হউক পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিলে সকলস্থানে মানবের কর্ম্মানুযায়ী ফলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ; তদ্ধেতু অনন্ত-ন্যায়-বিচারকের ন্যায়বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। অবশেষে বিপক্ষবাদীরা এই একটী গুরুতর তর্ক তুলিতে পারেন যে, অন্যান্য জীবজন্তু যখন সম্পূর্ণরূপ প্রকৃতির অধীন, তখন তাহারা পাপপুণ্যের দায়ী নহে। মানবের বিচারশক্তি ও কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীনতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান থাকায় কর্ম্মানুযায়ী ফল, পাপপুণ্যের দায়িত্ব, পরলোকে কর্ম্মফলের বীজ-প্রস্তুতি ও পরজন্মে তাহার ফলোৎপত্তি ইত্যাদি কেবল মানবেই প্রযোজ্য, অন্যান্য জীবে প্রযোজ্য নহে। তবে বলবান্ ব্যাঘ্র, নির্দ্দোষী অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতির অকারণে যে প্রাণ ধ্বংস করে, ইহা স্বাভাবিক ; কাহারো কর্ম্মফল নহে। এস্থলে ন্যায়বিচার কোথায় রহিল ? প্রকৃতির এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি ? ইহার উত্তর কিছু কঠিন, ইহা সম্যক্‌রূপে আধ্যাত্মিক দর্শনশাস্ত্রোক্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ পশুজগতে কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্ম নাই, ইহা বিবেচনা করা অতীব ভ্রমজনক ; যদিও থিয়সফিষ্টগণের মতে মানবের ন্যায় পশুজগতে ব্যক্তিনিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য নহে ; স্বভাবতঃ জাতিনিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ জাতিনিষ্ঠ-কর্ম্মফল ব্যক্তিনিষ্ঠত্বের সমষ্টি স্বরূপ ; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্ম্মফলানুযায়ী উন্নতি-অবনতি আছে ; তবে উহা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকব্যাপী প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ও ক্রমোন্নতিসাধক জগৎস্রষ্টার মৌলিক নিয়ম। পশুজগৎ—এমন কি—পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-রাজ্য পর্য্যন্ত ঐ মৌলিক নিয়মের বহির্ভূত নহে।

এস্থলে ঐ অজ, মেষ, মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক, নচেৎ উপরোক্ত তর্কের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর মীমাংসা হইতে পারে না।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যষ্টি মানব অনন্ত সৃষ্টিকরীশক্তির অনুকরণে সৃষ্ট। ঐ সৃষ্টিকরীশক্তি হইতে অবনমন (Descending cycle). ও উন্নয়ন (Ascending cycle) ও তাহার প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত "জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে-পরিস্ফুটরূপে বর্ণনা করিয়াছি; উহাই প্রকৃতির কার্য্য। সেই কার্য্যের গতি মানব-বুদ্ধিতে নিতান্ত বক্র বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই অনন্তজগৎ অনন্ত ন্যায়-ভিত্তির উপর একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে শাসন করিতে হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ার গতি কিঞ্চিৎ বক্র ব্যতীত কখনই সরলভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। একভাবে চৈতন্য ও প্রকৃতি * পরস্পর বিরোধী, এই বিরোধীশক্তির সংঘর্ষণেই এই বিস্তৃত অনন্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। ঐ বিরোধী শক্তি শত শত যুগ যুগান্তে স্ব স্ব ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্ভব। ইহার মধ্যে এক এক শ্রেণীর বস্তু-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবনতি ও উন্নতির সম্ভাবনা। মানবকুলের অস্তিত্ব হইতে মানবকুলের শেষ বা মুক্তিকাল অনন্ত সৃষ্টির একটী আবর্ত্তন। প্রকৃতির উদ্যম ও তাহার অত্যুচ্ছ্বাস ও হ্রাস ও পুনরুচ্ছ্বাস হইতে ক্রমে সামঞ্জস্যের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

ঐ প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি জ্ঞান—ও অনুভূতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রবৃত্তি ও তদনুভূতি হইতে আসক্তির উৎপত্তি হয়; ঐ আসক্তির প্রথম বিকাশ বাসনা এবং বাসনার বিকাশ লোভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, হিংসা, সুখ, দুঃখ, ভয়, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি; ঐ বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি-বিশেষের উদ্যম ও উচ্ছ্বাস ও তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির ফল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি; কিন্তু মনুষ্যের পূর্ব্বে পশু-জগতে ঐ সকল বৃত্তির যথাযথ স্ফুরণ, অনুশীলন ও সামঞ্জস্য যে নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস নিবারণের শক্তি পশুদিগের না থাকায়, এক এক বৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাসবশতঃ ক্রমে তাহার উদ্যম (Energy) হ্রাস হয়, তদ্ধেতু অনন্তাকাশে ঐ জীবশক্তি অন্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবশক্তির সহিত সংমিশ্রিত ও সততই ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। মনে করুন, সৃষ্টিপরম্পরা-ক্রমে একাধারে লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, হিংসাবৃত্তির উচ্ছ্বাস ও অত্যুচ্ছ্বাস হইতে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হইল। ঐ ব্যাঘ্র অতি দুরন্ত, সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বধ করিয়া তাহার লোভ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিসকলের চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিল, তৎপ্রযুক্ত অন্তর্জগৎ ঐ প্রবৃত্তির উদ্যম(Energy)ক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল বৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্যাঘ্র, অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্যাঘ্র বা সিংহ-যোনিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উপরোক্ত বৃত্তির স্ফুরণের সহিত অন্তর্জগতের নিয়মানুসারে বুদ্ধির অঙ্কুর উৎপন্ন ও তদাভাস কিঞ্চিৎ বিকাশিত হয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তির চরিতার্থতাহেতু উহার বেগের অপেক্ষাকৃত হ্রাস না হইলে, ঐ বুদ্ধি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না। জন্মজন্মান্তরে উপরোক্ত বেগের হ্রাস

* প্রকৃতি মূলশক্তি হইলেও উহার বিকাশ অবিদ্যা-মিশ্রিত; অতএব চৈতন্য এবং অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী; ঐ অবিদ্যা নাশ হইলে, প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তির সহিত চৈতন্যের সংমিশ্রণই জাগতিক একতা বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি।

হইলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বিকাশিত ও তদনুরূপ বৃত্তির সহিত সংমিশ্রিত ও অন্য জীববিশেষে পরিণত হয়। অবশ্যই সকল ব্যাঘ্রের সমাবস্থা হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, গম্ভীরতা, চঞ্চলতা ইত্যাদি অনুসারে প্রবৃত্তি ও উদ্যম-শক্তির বৃদ্ধি এবং উন্নতি অবনতি হয়, আবার নির্দ্দোষী অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতির হিংসাবৃত্তির বিকাশ অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। তাহাদের অন্যান্য স্বাভাবিক বৃত্তিরও পূর্ণ উচ্ছ্বাস না হওয়ার ক্রমে তাহার বিকাশ হওয়াই সম্ভব। ঐ সকল পশু ক্রমে স্বকীয় বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-হেতু জন্মজন্মান্তরে মহিষ, অশ্ব, হস্তীতে পরিণতির সম্ভাবনা। উপরোক্ত বর্ণনাগুলিই যে ঠিক্, তাহা নহে, তবে এক একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদত্ত হইল, ইহাই পশুজাতির কর্ম্মফল; কিন্তু পশুজাতির স্বকীয় কর্ম্মফল নহে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐ প্রকার ফল সংঘটিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক নিয়মও সেই অনন্ত ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের অধীন। এই পশুজগতে বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে ক্রমে সংযোগ-বিয়োগ ও বৃত্তি সকল পরিপুষ্ট ও উত্তেজক চিচ্ছক্তি-সাহায্যে সামঞ্জস্যাভিমুখী হয়। অবশেষে স্বয়ং চিচ্ছক্তির বিকাশহেতু জ্ঞান স্বাধীন-ভাবে বিকাশিত হয়। পশুজগতের চরমোন্নতি হইতে যে মানবের সৃষ্টি, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। হিন্দুমতে মানবের নিম্নেই পশুশ্রেষ্ঠ বা পশুরাজ সিংহের স্থান। নৃসিংহ অবতারেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু রামায়ণে মানবের নিম্নেই বানরজাতি বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডারুইনের মতেও মানবের নিম্নে বানরের অবস্থান। এক্ষণে বানর হইতে কি সিংহ হইতে মানবকুলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মীমাংসা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে এবং ঐ মীমাংসাও সহজ নহে। সিংহের মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা ও বানরের বোধাধিকার ও কার্য্যকুশলতা দৃষ্টি করিলে সিংহ কি বানর যে মানবকুলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন; তবে বনমানুষ, উল্লুক প্রভৃতি যে বানরের উন্নতাবস্থা, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বনমানুষ ও উল্লুকের শক্তি ও অন্তর্বৃত্তির সহিত সিংহশক্তির সম্মিলন হইতে প্রথম অসভ্য মানব বা রাক্ষসকুলের সৃষ্টি অসম্ভব নহে * উহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য নহে এবং উহার মীমাংসা আমাদের ক্ষমতার অতীত; আমরা কেবল কর্ম্মফল নির্ণয় জন্য কতকগুলি অনুমান ও উপমানের উপর নির্ভর করিয়া পশুজগতের উন্নতি-অবনতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। ফলে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলির স্পষ্ট প্রমাণাভাব; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ-সংশ্লেষণ দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রিয়ান্তে ঐ শক্তি অবশ্যই আকাশস্থ শক্তির সহিত সংমিশ্রিত হয় * শক্তির কখনই ধ্বংস নাই, তবে ক্রিয়াজনিত হ্রাস-বৃদ্ধি ও ভিন্নাকারে পরিণতির সম্ভাবনা বটে। যাহা হউক, কর্ম্মফলই পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে, জগতের অবনতি ও উন্নতি-সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শক্তির ও সমস্ত

---

* থিয়সফিষ্টগণের মতে স্থূলদেহ ও উহার আদর্শ সূক্ষ্মদেহ, প্রাণ এবং ইচ্ছাপ্রমুখ কামনা প্রভৃতি বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানবমস্তিষ্কের উপাদান প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে মানসপুত্রের (মানবতত্ত্বের) বিকাশ হয়, অর্থাৎ মানবজাতি উৎপন্ন হয়।

* মিঃ টিণ্ডাল এবং ক্রূমের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে ডাক্তার স্যালজারের উদ্ধৃত বিষয়—যাহা বিগত বর্ষের বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর সাম্বাৎসরিক অধিবেশনের বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়, তাহা দ্রষ্টব্য।

জাগতিক ব্যাপারের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপিতার ন্যায়-শক্তির লেশ ও মানবের ধর্ম্মবন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। পক্ষান্তরে জন্মান্তর স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মৌলিক শক্তি ও জাগতিক সমস্ত ব্যাপার ও ক্রিয়া এবং অনন্তজ্ঞানময় জগদীশ্বরের ন্যায়-বিচারের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। জন্মান্তর ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী উন্নতি ও অবনতিসম্বন্ধে ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটী অতি সারপূর্ণ ও প্রকৃতিসঙ্গত, আমাদের উপরোক্ত মীমাংসার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক।

"অযতিঃশ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥"

৬ অ, ৩৭ শ্লোক।

হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগসাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই অথবা যোগ সাধন করিতে করিতে চিত্ত-চাঞ্চল্যদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধিলাভ না করিয়া কিপ্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন॥ ৩৭॥

"প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"

৬ অ, ৪১ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্যলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪১॥

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং॥"

৬ অ, ৪২ শ্লোক।

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ জন্ম জগতে দুর্ল্লভ॥ ৪২॥

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"

৬ অ, ৪৩ শ্লোক

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥ ৪৩॥

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥"

৬ অ, ৪৪ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলে, বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকে॥৪৪॥

"প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥"

৬ অ, ৪৫ শ্লোক।

যে যোগীপুরুষ পূর্ব্বযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে এইরূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধন পরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥৪৫॥

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মান্তর ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল; ঐ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে, আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনদিগের ঐ বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল ছিল যে, প্রাচীন কবিগণ কাব্যাদির মধ্যেও উহা সন্নিবিষ্ট করিতে ক্রুটী করেন নাই।

যথা—তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥

কুমারসম্ভব ১ স্বর্গ ৩০ শ্লোক (ক)

(ক) অনুবাদ। পূর্ব্বজন্মে তিনি যে উপ-

দেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে স্থির হইয়াছিল, কোনমতেই বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে উপদেশ পাইবামাত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাসমূহ শরৎকালে হংসমালা যেমন গঙ্গাকে এবং রাত্রিতে স্বকীয় দীপ্তি যেমন মহৌষধিকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তিনি উমাকে প্রাপ্ত হইলেন।

আবার দার্শনিকগণ—এমন কি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও জন্মান্তর ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের স্বজাতি বিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর 'মহামাননীয় মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় গৌতম বুদ্ধের ঐ মতটী অনুমোদন করেন নাই। অবশ্য পুনর্জ্জন্ম ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আনুমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রাহ্য ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন্থাম প্রভৃতির প্রমাণবিষয়ক মৌলিক তত্ত্ব দ্রষ্টব্য। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল যে আনুমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তি-পূর্ণ, তাহা আমরা দর্শাইয়াছি, তবে উহা আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে আদৃত হইবে কিনা, জানিনা। যাহাহউক, আমরা জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। (১)

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে পঞ্চ বায়ু।

তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

তাহাদের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যে অপান, সমান নাভিদেশে, কণ্ঠদেশে উদান ও ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে থাকে।

তেষাং বিষয়াঃ।

তাহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

---

(১) "তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌচ তে পুনঃ॥"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২২।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রাণ কার্য্যভেদে পাঁচ প্রকার যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

"প্রাণোপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ।"

শ্রীদেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৩৩।

"প্রাণোপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
* * * *
প্রয়ানং কুরুতে তস্মাদ্ বায়ুঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ।
অপানয়ত্যপানস্তু আহারাদীন্ ক্রমেণ চ॥
ব্যানো ব্যানাময়ত্যঙ্গং ব্যাধ্যাদীনাং প্রকোপকঃ।
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানোয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানঃ পঞ্চবায়বঃ।
উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে তু সঃ॥
কৃকরঃ ক্ষুতকারৈব দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো মহাঘোষঃ সর্ব্বগঃ সমৃতেঽপি হি॥"

লিঙ্গপুরাণে ৮ অধ্যায়ে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করেন,

প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্‌।

প্রাণবায়ু পূর্ব্বদিকে গমন করেন।

অপানোঽবাগ্‌গমনবান্‌।

অপানবায়ু অধোদিকে গমন করেন।

উদান ঊর্দ্ধগমনবান্‌।

উদান বায়ু উর্দ্ধদিকে গমন করেন।

সমানঃ সমীকরণবান্‌।

সমানবায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে একত্র অবস্থান করান।

ব্যানো বিশ্বগ্‌গমনবান্‌।

ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে গমন করেন।

এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।

তাহাকে প্রাণ বলে, ভুক্ত আহারাদিকে ক্রমে নীচে আনয়ন করেন, তজ্জন্য অপান, অঙ্গকে সঙ্কোচ করেন, তজ্জন্য ব্যান কথিত হন, ইনি রোগাদিকে বৃদ্ধি করেন। মর্ম্ম ক্লেশদায়ক বায়ুকে উদান কহে। সমুদায় গাত্রকে সমভাবে রাখেন, তজ্জন্য সমান। উদ্গারের বায়ুর শক্তিকে নাগ কহে, চক্ষুরাদি উন্মীলনকারী বায়ুকে কূর্ম্ম, ক্ষুত (হাঁচ)-কারী বায়ুকে কৃকর, হাইতোলা কার্য্যে বায়ুর শক্তিকে দেবদত্ত, মহাশব্দকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় বলে, ঐ বায়ু মৃতকালেও সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া থাকে।

প্রাণো প্রাণো সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥

গরুড়পুরাণে উত্তরার্দ্ধে ৩২ অ, ৪৪।

বেদান্তসারে এইরূপ———

বায়বঃ। প্রাণাপানব্যানোদান সমানাঃ।

বায়ু পঞ্চ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

প্রাণো নাম—প্রাগ্‌গমনবান্‌ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী।

উর্দ্ধে গমনশীল নাসিকার অগ্রস্থানবর্ত্তী বায়ুকে প্রাণ বলে।

নিম্নে গমনশীল পায়ু আদি স্থান স্থায়ী বায়ুকে অপান বলে।

ব্যানো নাম বিশ্বগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী।

সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল সমুদায় শরীরস্থিত বায়ুকে ব্যান বলে।

ইহাদিগের পঞ্চ উপবায়ু।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

এতেষাং বিষয়াঃ।

ইহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা।

ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণম্‌॥

কৃকরাচ্চ ক্ষতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ

নাগ উদ্গীরণকরং।

নাগবায়ুরদ্বারা উদ্গীরণ হয়।

কূর্ম্ম উন্মীলনকরং।

কূর্ম্ম বায়ুর শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।

ধনঞ্জয়ের শক্তিতে পোষণ করে।

দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ।

দেবদত্ত বায়ুতে হাই তোলে।

উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণ বায়ুঃ।

উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান বলে

সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদি সমীকরণকরঃ

শরীর মধ্যগত ভুক্ত—পীত অন্ন-জলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বলে।

সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং

পরিপাককরণকে অর্থাৎ রস, রুধির, শুক্র, পুরীষাদি করণকে সমীকরণ কহে।

শ্রীভগবদ্‌গীতার ৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের শ্রীধর স্বামী-পাদের টীকাতে দশ বায়ুর বিষয় বর্ণিত আছে।

কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ।

সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যগণ কহেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চবায়ু আছে।

তত্র নাগঃ উদ্গীরণকরঃ।

উদ্গীরণকারী বায়ুকে নাগ কহে।

কূর্ম্মবিমীলনাদিকরঃ।

চক্ষু উন্মীলনাদি কারী বায়ুকে কূর্ম্ম কহে।

কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ।

কৃকর বায়ুতে হাঁচি হয়।

কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ।

ক্ষুধাকারী বায়ুকে কৃকর বলে।

দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ।

জৃম্ভণকারী বায়ুকে দেবদত্ত কহে।

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।

পোষণকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় কহে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৮৫ অধ্যায়ে দশ বায়ুর বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ে বায়ু সম্বন্ধে শেষ শ্লোক এই—

প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্ব্বে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।

বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ॥

নাড়ী সকল এই কথিত দশবিধ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া তির্য্যক্, উর্দ্ধ ও অধোভাগে হৃদয় হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নরস সকলকে বহন করিয়া থাকে। "হৃদয় হইতে" কারণ হৃদয়ে প্রাণ সকল থাকে, যথা,——

"হৃদিপ্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ"

শিব-উপনিষৎ ৩।

"যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণঃ"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১ম প্রপাঠকে ৩ খণ্ডে ৩।

উহার ভাষ্য এই—

যদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং বহির্নিঃসারয়তি স প্রাণাখ্যো বায়োর্বৃত্তিবিশেষঃ।

লোক মুখ-নাসিকাদ্বারা যে বায়ু বহির্গত করে, সেই বায়ুকে প্রাণ বলে।

"প্রজ্ঞয়াপ্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি।"

কৌষীতকী ৩।৬।

"বহিরন্তং গতে প্রাণে"।

মুক্তিকোপনিষৎ।

"উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।"

কঠোপনিষৎ পঞ্চমীবল্লী ৩।

ভাষ্য। উর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং উন্নয়তি উর্দ্ধং গময়তি তথাপানং প্রত্যগধোঽস্যতি ক্ষিপতি।

"যোঽয়মবাঙ্ সংক্রামত্যেষ বাবসোঽপানঃ।"

মৈত্রী উপনিষৎ ২।৬।

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এতদ্ধ্যেতদ্ধুতমন্নং সমন্নয়তি।"

প্রশ্নোপনিষৎ, তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ৫।

পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু। প্রাণ বায়ু চক্ষুঃ ও কর্ণে থাকিয়া মুখ ও নাসিকাদ্বারা বহির্গমন করিয়া থাকে। প্রাণ ও অপানের মধ্যে সমান বায়ু এই বায়ু ভুক্ত পীত অন্ন জলাদিকে সমতায় আনয়ন করে।

"অপানমুৎসর্গে।"

গর্ভোপনিষৎ ১।

মল মূত্র পরিত্যাগের জন্য অপানবায়ুর শক্তি আবশ্যক করে।

"———অপানস্তু পুনর্গুদে"

অমৃতবিন্দূপনিষৎ ৩৪॥

গুহ্যে অপান বায়ু থাকে।

ব্যানঃ সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু সদা ব্যাবৃত্যতিষ্ঠতি॥

অমৃতবিন্দূপনিষৎ ৩৫।

ব্যান বায়ু সর্ব্বদা সকল অঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে।

"যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণঃ।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে ১।

হৃদয়ের প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদ্বার ছিদ্র দিয়া গমন করেন, তজ্জন্য প্রাণ কহে।

"যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানঃ।" ঐ ঐ ঐ ২।

হৃদয়ের দক্ষিণদিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া নানারূপ গমন করেন, তজ্জন্য ব্যান।

"যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ।" ঐ ঐ ঐ ৩।

হৃদয়ের পশ্চিমদিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া গমন করেন, তজ্জন্য অপান বায়ু। ইহার ভাষ্য, পরে বলিয়াছেন।

সমূত্রপুরীষাদিকে অধোদিকে অপনয়ন করে, তজ্জন্য এই বায়ুকে অপান কহে।

"যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানঃ।"

হৃদয়ের উত্তর দিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া যে বায়ু গমন করেন, তাহাকে সমান কহে। ইহার ভাষ্য এই—

"সোঽশিত পীতে সমং নয়তীতি সমানঃ।"

সেই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমতা সাধন করে, তজ্জন্য "সমান" বলিয়া উক্ত হয়।

এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো দিগাদয়ঃ।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিপতি দিগাদি। তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন।

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।
তথা চন্দ্রশ্চতুর্ব্বক্ত্রো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথা ক্রমাৎ॥ (২)

শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু, গুহ্যের মৃত্যু, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, অহঙ্কারের রুদ্র, বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি অযোনি অর্থাৎ অনাদি। শ্রোত্রাদির যথাক্রমে দেবতা সকল উক্ত হইল।

"অথ যোহস্তোদ্ধঃ স্বাষঃ স উদানঃ।" ঐ ঐ ঐ ৪। হৃদয়ের উর্দ্ধদিকের দ্বার-ছিদ্র দিয়া গমন করেন তজ্জন্য উদান নামে অভিহিত হন।

(২) "অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবীঘ্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্বিষ্ণুঃ। পায়োর্মিত্রম্। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি।"

শুশ্রুতে শারীরস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ে।

শুশ্রুত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, শ্রবণের দিক্ সকল, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, ঘ্রাণের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু পায়ুর মিত্র ও উপস্থের প্রজাপতি।

এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩১৩ অধ্যায়ে বহু বিস্তার-বর্ণন আছে।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ॥৩৬॥
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ।
ইত্যন্তঃকরণাখ্যস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্॥
চত্বার্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ॥ ৩৭॥

শ্রীমদ্দেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে।

দিক্, বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইঁহারা অন্তঃকরণাখ্য বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালো বিশৎপদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১২॥
নির্ভিন্নং তালুবরুণো লোকপালো বিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বযাংশেন চ রসং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৩॥
নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৪॥
নির্ভিন্নে অক্ষিণীত্বষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৫।
নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোনিলো বিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শ যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৬॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে॥ ১৭॥
+ + + + + + ॥
মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে॥ ১৯॥
গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥ ২০॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বর্পতিরাবিশৎ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়াবৃত্তিং প্রপদ্যতে॥ ২১॥
পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে॥ ২২॥
+ + + + ॥
হৃদয়ং চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমাধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে॥ ২৪॥
আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোবিশৎ পদম্।
কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে॥ ২৫॥
সত্ত্বং চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৬॥

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে।

সেই বিরাটপুরুষের মুখ জন্মাইলে, লোকপাল অগ্নি নিজ শক্তি বাক্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

জীব বাক্যদ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে॥ ১২॥ তাঁহার তালু আবির্ভূত হইলে, লোকপাল বরুণ নিজ শক্তি জিহ্বার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব জিহ্বাদ্বারা রস গ্রহণ করে॥ ১৩॥ তাঁহার নাসিকাদ্বয় উদ্ভূত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় শক্তি ঘ্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে॥১৪॥ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপন্ন হইলে, লোকপাল আদিত্য স্বীয় শক্তি দর্শন সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, জীব চক্ষুদ্বার রূপ গ্রহণ করেন॥ ১৫॥ তাঁহার চর্ম্ম প্রকটিত হইলে, লোকপাল বায়ু স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব প্রাণদ্বারা স্পর্শানুভব করে॥ ১৬॥ তাঁহার কর্ণ জন্মাইলে, দিক্ সকল স্বীয় শক্তি শ্রোত্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল; শ্রোত্রদ্বারা শব্দজ্ঞান হয়॥ ১৭॥ + — + — ॥ তাঁহার মেঢ্র আবিষ্কৃত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় শক্তি শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; মেঢ্রদ্বারা আনন্দানুভব হয়॥ ১৯॥ তাঁহার গুহ্য প্রকটিত হইলে, লোকেশ মিত্র নিজ শক্তি পায়ুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, যদ্দ্বারা জীব মলত্যাগ করে॥ ২০॥ তাঁহার হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় ক্রয়বিক্রয়াদি-শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব হস্তদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে॥ ২১॥ তাঁহার পদ উৎপন্ন হইলে, লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় শক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; গতিদ্বারা প্রাপ্যবস্তু লাভ করা যায়॥ ২২॥ × × -- × ॥ তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইলে, চন্দ্র নিজ শক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, মনদ্বারা সঙ্কল্প করা যায়॥ ২৪॥ তাঁহার অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে, রুদ্র নিজ শক্তি কর্ম্মের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তব্যের জ্ঞানলাভ করে॥ ২৫॥ তাঁহার বুদ্ধি প্রকটিত হইলে, ব্রহ্মা নিজ শক্তি চিত্তের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব চিত্তদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করে॥ ২৬॥ কিন্তু এই মতের সহিত ঐতরেয়োপনিষদের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুপ্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নৌষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচং প্রবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যু-রপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ॥ প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়খণ্ডে ৪।

অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিক্ শ্রবণ হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ওষধি ও বনস্পতি সকল লোম হইয়া চর্ম্মে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, জল রেত হইয়া উপস্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঐ মন্ত্রগুলি ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়েও আছে।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত—
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত"॥ ১৩॥
ঋগ্বেদসংহিতাযাং অষ্টমোষ্টকে ৪ অ, ১৯ বর্গে ১০ মণ্ডলে।

শ্রীসায়নভাষ্যং। প্রজাপতের্ম্মনসঃ সকাশাৎ চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষোশ্চক্ষুষঃ সূর্য্যোপ্যজায়ত অস্য মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ দেবাবুৎপন্নৌ অস্য প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।

প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন; ইহার মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন; ইহার প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছিলেন।

"———দিশঃ শ্রোত্রাৎ———০॥৪॥ ঐ ঐ ঐ

প্রজাপতির শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু যজুর্ব্বেদে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, যথা—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত॥
শুক্লযজুর্ব্বেদস্য বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ৩১ অধ্যায়ে ১২॥

পদপাঠঃ।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত॥ ১২॥

মহীধরের ভাষ্যার্থ। প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন, শ্রোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ ও মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল।

ইহার পর মন্ত্রে——"দিশঃ শ্রোত্রাৎ——" আছে। আর কিছু অঙ্গদেবতা বর্ণন নাই। অন্য কোন উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লেখ পাই নাই;

এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। (৩)

এই সকল মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

তথাচোক্তং।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

পঞ্চপ্রাণোমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥ (৪)

পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয় ও যাহা পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, এরূপ ভোগের সাধনকে সূক্ষ্মশরীর কহে।

লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে।(৫)

ব্রহ্মাত্মৈক্যকত্বরূপ যে লয়বিশিষ্ট অর্থ, তাহাকে প্রাপ্ত করান, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা লিঙ্গশব্দ কথিত হয়।

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। (৬)

শীর্ণ হন, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীরশব্দ বাচ্য হয়।

কথং শীর্য্যতে ইতি চেৎ।

যদি বল, কিপ্রকারে শীর্ণ হয়?

অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। (৭)

আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয়॥

কেবল মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ২১০ অধ্যায়ে এই পাওয় যায় যে—

বিদ্যাৎ তু ষোড়শৈতানি দৈবতানি বিভাগশঃ।
দেহেষু জ্ঞানকর্ত্তারমুপাসীনমুপাসতে॥ ৩৩॥
তদ্বৎ সোমগুণাজ্জিহ্বা গন্ধস্তু পৃথিবীগুণঃ।
শ্রোত্রং নভোগুণশ্চৈব চক্ষুরগ্নেগুর্ণস্তথা॥ ৩৪॥
স্পর্শং বায়ুগুণং বিদ্যাৎ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা॥ ৩৫॥

দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত, এই ষোড়শ পদার্থকে বিভাগক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে; দেহ-মধ্যে অধ্যাসীন জ্ঞানকর্ত্তাকে মনুষ্যগণ উপাসনা করিয়া থাকে। জলের কার্য্য জিহ্বা, পৃথিবীর কার্য্য নাসিকা, আকাশের কার্য্য শ্রোত্র, তেজের কার্য্য চক্ষু এবং বায়ুর কার্য্য ত্বক্, ইহা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছে জানিবে।

"মনঃ শব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে।"
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ২৯ অ, ৩ শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণী।

মনঃ শব্দে (জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরং) মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উক্ত হইয়াছে।

"নসঃ প্রাণো দিশঃ শ্রোত্রাৎ স্পর্শাদ্ বায়ুর্মুখাচ্ছিখী।
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ ৩ অধ্যায়ে।

নাসিকা হইতে প্রাণ, শ্রোত্র হইতে দিক্, স্পর্শ হইতে বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন।

(৩) বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে ২৪।

(৪) "বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২৩।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর হয়; তাহাকেই লিঙ্গ শরীর কহে।

"এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎসূক্ষ্মশরীরমিত্যুচ্যতে।"
বেদান্তসারে।

পূর্ব্বোক্ত মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়কোষকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

(৫) লিঙ্গং—[লিগি (গতিঃ) — অচ্]

(৬) শরীরং—[শৃ (ছেদনং)—ঈরণ্] — রোগাদিনা শীর্য্যতে ইতি শরীরং।

(৭) "গুরুণা বোধিতো জীবোঽহং ব্রহ্মাস্মি বাহ্যতঃ।
মুচ্যতেঽসারসংসারাদ্ ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মতদ্ ভবেৎ॥"
অগ্নিপুরাণে ৩৭৬ অধ্যায়ে ২৪।

জীব বাহ্যতঃ গুরুর দ্বারা "আমি ব্রহ্ম হই" এইরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া, অসার সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে ও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ ২ মুণ্ডকে ২ খণ্ডে ৮।

'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই জ্ঞান হইলে অবিদ্যা-জনিত হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ পায়, সর্ব্বসংশয় দূর হয়; তাহাহইলে সেই আত্মজ্ঞানীর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সকলও ক্ষয় হয়।

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা লিঙ্গদেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়।

কথং?

কিজন্য?

বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ। (৮)

বাক্যাদি আকারদ্বারা লিঙ্গশরীরের বৃদ্ধি

তৎ সঙ্কোচো নাম জীর্ণতা।

বাক্যাদির সঙ্কোচ হইলে লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয়।

কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান নিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। (৯)

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বাচ্য সাভাস ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে একত্ব-জ্ঞান, তাহারদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, তাহাকে কারণশরীর কহে।

তথাচোক্তং —

অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধি ত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের তিন উপাধি এই, অনাদি, অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও অনির্ব্বচনীয়, এই তিনটী কারণ শরীরের উপাধি। এই উপাধিত্রয় হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে।

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ।(১০)

শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর কিপ্রকারে হয়, যদি এই আশঙ্কা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—

ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে।

ব্রহ্মেতে আত্মার একত্বজ্ঞানদ্বারা শীর্ণ হয়।

দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা কারণশরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়, ইহা উক্ত হইতেছে।

অনৃত জড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তং।

মিথ্যা জড় এবং দুঃখাত্মক, ইহা উক্ত হইল।

কালত্রয়েষ্ববিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যুচ্যতে।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালে যে বস্তু বিদ্যমান থাকে না, তাহাকে অনৃত বলে।

জড়ং নাম স্ববিষয়-পরবিষয়-জ্ঞান-রহিতং বস্তুজড়মিত্যুচ্যতে। (১১)

স্ববিষয়ে ও পরবিষয়ে জ্ঞানরহিত বস্তুকে জড় কহে।

---

(৮) ইহার বৃহৎ উপাখ্যান মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩২০ অধ্যায়ে সুলভা ও জনক সংবাদে আছে।

(৯) "অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ১৭।

অবিদ্যার বশবর্ত্তী অন্য (অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত অন্য) অর্থাৎ জীব। সেই জীব অবিদ্যাভূত বৈচিত্র্যবশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যবশতঃ দেব ও তির্য্যগাদি অনেক প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অবিদ্যাকেই কারণ-শরীর কহে; সেই কারণশরীরে অভিমানী জীবকে প্রাজ্ঞ কহে।

নৃসিংহতাপনী উত্তরভাগে প্রথম খণ্ডে ৩ শ্লোকে "ত্রিশরীর" শব্দের ভাষ্যে যথা,—
"ঈক্ষণাবস্থং প্রলয়াবস্থঞ্চ বহির্মুখং
সদাত্মকং কারণং কারণশরীরমুচ্যতে।"
ঈক্ষণাবস্থ, প্রলয়াবস্থ ও সদাত্মক বহির্মুখ কারণকে কারণ-শরীর কহে।

(১০) শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং স্যাৎ।
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ১৭ শ্লোক টীকা।

(১১) বেদান্তসারে "অবস্তুর" লক্ষণে অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু বলিয়াছেন।
"অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহঃ অবস্তু।
সদসৎজ্ঞানশূন্যতাকে অজ্ঞান কহিয়াছেন।

দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তুদুঃখমিত্যুচ্যতে।(১২)

প্রীতি-শূন্য যে পদার্থ, তাহার নাম দুঃখ।

সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ। (১৩)

সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কি সমষ্টি ও কি ব্যষ্টি, তাহার বিষয় কহিতেছেন—

যথা বনস্য সমষ্টির্যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টির্জলসমূহস্য সমষ্টির্জলস্য ব্যষ্টিস্তদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেক শরীরস্য ব্যষ্টিঃ।

যেরূপ বৃক্ষ সকলের সংক্ষেপ-কথনকে বৃক্ষ-সমষ্টি কহে ও এক বৃক্ষকে বহু বৃক্ষের বিস্তর-কথনকে বৃক্ষ-ব্যষ্টি কহে ও জলসমূহের সংক্ষেপ-কথনকে জলসমূহের সমষ্টি ও এক জলাশয়ের বহুরূপ-কথনকে জলের ব্যষ্টি কহে, তদ্রূপ অনেক শরীরের সংক্ষেপ-কথনকে শরীরের সমষ্টি ও এক শরীরের বিস্তার-কথনকে শরীরের ব্যষ্টি কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১২) যদ্ যদ্ প্রিয়ং যস্য সুখং যদাহু
স্তদেব দুঃখং প্রবদন্ত্যনিষ্টম্।"
শান্তিপর্ব্বণি ২০১ অ, ১০।

যাহার যে যে দ্রব্য প্রিয়, তাহাতেই সুখ ও যাহার যাহা অপ্রিয়, তাহাতেই তাহার দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

(১৩) সমষ্টি ও ব্যষ্টির লক্ষণ পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকা-প্রকাশিত বিষয়ে দিয়াছি।

"বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিঃ।"
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৩ ব্রা, ২।

বায়ুই ব্যষ্টি ও বায়ুই সমষ্টি।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্য বেদনাৎ।
তদভাবাৎ ততোহন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৫।

হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর সকল লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সমষ্টি বলে; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের (জীবের) ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই জন্য ঐ তৈজসজীবকে ব্যষ্টি বলে।

ভক্তি-প্রসঙ্গ।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-প্রবাহের নাম ভক্তি। অন্তহীন সে প্রবাহ অনন্ত ভাব-সাগরে মিশিয়াছে। ভক্তি অন্তরের বস্তু, হৃদয়-মন্দিরের অমূল্য কহিনুররত্ন। এ রত্ন চোরে চুরি করিতে পারে না, বিতরণেও বিতরিত—বিলুপ্ত হয় না। অনেকে বলিতে পারেন, আমরা সান্ধ্যাহ্নিক করি, যথাশক্তি বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি, মানি ও ভালবাসি; অতএব আমরা ঈশ্বর-ভক্ত। একটু দুরভিমান পরিহার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ শ্রদ্ধার, এ মানার ও এ ভালবাসার গভীরতা সসীম; কিন্তু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা, মানা ও ভালবাসা অসীম। মুখে পিতাকে পিতৃসম্ভাষণ করিলে এবং চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—উপাদেয় বস্তু ভোজন করাইলেই পিতৃভক্তি হয় না। যে পুত্র পিতার আদেশ অতএব সানুরাগে শিরোধার্য্য করে, পিতার সুখের তরে আত্মবিসর্জ্জন করে, পিতার ভালবাসার সহিত সমস্ত ভালবাসার সামঞ্জস্য সম্পাদন করে, পিতৃমতের অবিরোধে বিষয়-সেবা না করে, পিতার মননে আত্ম-

মনন ডুবাইয়া দেয়, সেই পুত্র শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান। সেইরূপ যে সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম-সুধার স্বর্গীয় নেশায় বিভোর থাকে, যাহার চক্ষু ঈশ্বরের রূপ দেখিতে ব্যগ্র হয়, যাহার কর্ণ ঈশ্বর-কীর্ত্তির কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার নাসিকা ঈশ্বরের অর্চ্চনায় উপহৃত পুষ্প-চন্দন ধূপাদির সৌরভে আমোদ লাভ করে, যাহার ত্বক্ ঈশ্বর-ভক্তের চরণ-রেণু স্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে, যাহার রসনা ঈশ্বরে নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদে চরিতার্থ ও তাঁহার কথা-কীর্ত্তনে কৃতার্থ হয় এবং যাহার মন ঈশ্বরের মননে—নিদিধ্যাসনে থাকিতেই ভালবাসে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, মানে ও ভালবাসে। ঈশ্বর-ভক্ত হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও ঈশ্বর-সন্তোষ-উদ্দেশে পরিচালিত করেন। ভাসা—ভাসা বাহ্যক্রিয়ায় ঈশ্বরে ভক্তি করা হয় না; "তস্মিন্ প্রীতি, তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই মহাবাক্যই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র।

এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাঁহার কার্য্য কি? এবং তাঁহার কিসে সন্তোষ? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্যই ঈশ্বরের আদেশ। খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের আদেশ। এইরূপ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুশাসন-শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা ঘোর মূর্খ, কাহার কথায় বিশ্বাস করি? কিন্তু হায়! বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কের আশ্রয় লইতে হয় না। আপনার সরল হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায়। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ" স্থান ও সমাজভেদে অধিকার ও শাস্ত্র ভিন্ন হইলেও গীতার এই মহাবাক্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সাধারণ সত্য।

তুমি ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু, কেবল প্রভু-কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। ভূত-পতির কার্য্যে খাটিতে আসিয়া কেবল "ভূতের বেগার" খাটিয়া যাইও না। আহার-বিহারাদি ভৌতিক কার্য্যও প্রভুর উপর সমর্পণ করিতে হয়। প্রভুকার্য্য সাধিতে প্রভুর প্রসাদে উদর পূর্ণ কর, যদি বিবাহাদি স্বতঃসাংসারিক কার্য্য প্রভু-কার্য্যের বিরোধী মনে কর, তবে সেটি তোমার ভ্রম। আত্ম-কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি-বিরহে ভক্তের সকল কার্য্যই প্রভুর কার্য্যে পরিণত হয়। অপিচ, প্রবৃত্তি-মার্গ-গত ভাবেও বুঝা যায় যে, বিনা পরীক্ষায় পুরস্কারের আশা বৃথা। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যে অবিচলিত থাকে, সেই প্রকৃত ধীর ভক্ত; অতএব কালিদাস বলিয়াছেন—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং নচেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।"

বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই ধীর। আর এক কথা,—স্বামী, স্ত্রী, উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তায় কঠিন ও কোমল গুণ যোগ-পূর্ণতায় প্রভু কার্য্যই ভাল হইবে বিবেচনায় দার-পরিগ্রহ করিতে পার। দম্পতির প্রেমের পুতলি পুত্রের দ্বারা প্রভুকার্য্য সাধনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের জন্য স্ত্রী-প্রসঙ্গ করিতে পার; যাঁহাদের প্রসাদে প্রভুকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, ঈশ্বর-গত-সত্ত্ব সেই পিতৃলোকের ঋণমুক্তির উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও প্রভু-কার্য্য। অপত্যোৎপাদন ভিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ থাকে কৈ? ফল কথা, কি অন্তর্জগতের, কি বাহ্যজগতের, কি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, আমাদের সর্ব্বগত ভোগ-ব্যাপারই ভগবানে নিবেদিত করিয়া প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিলেই কৃতার্থতা লাভ হয়। ঈশ্বরোপাসনার সার রহস্যই এই তত্ত্বে নিহিত। সন্ধ্যাদি অথবা নমাজ প্রভৃতি জাতি ও

সমাজ-ভেদে তত্তৎ অধিকারীর যে কোন উপাসনা ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান! ভক্তির ভিত্তি যেন অন্তর্নিহিত বিষয়-বালুকাময়-প্রদেশে কাঁচা-গাঁথনীতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ভোগবাসনা-ভূকম্পনে তোমার সাধের সাধন-প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে! তুমি নিরাশ্রয় হইবে।

যদি বল আমি সংসারী হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী কার্য্যকলাপ খুঁটিয়া করিতে হইলে, পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি সাংসারিক আত্মকার্য্য কিছুই করা হয় না। ঐ তো ভুল। ঐ খানেই ধাঁধাঁ! এটী আমার কার্য্য, ওটী প্রভুর কার্য্য, এইরূপে কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর কেন? প্রভুর অন্নে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর, প্রভুর বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ কর, প্রভুর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়া, প্রভুর বস্ত্র পরিয়া, অবিপন্নাবস্থায় আপন সাংসারিক কার্য্য প্রভুকার্য্য হইতে ভিন্ন মনে কর? তুমি যদি চতুর হও বা প্রকৃত প্রভুভক্ত ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্য্যে আপন কার্য্য ঢালিয়া মিশাইয়া দাও। প্রভুর গার্হস্থ্য উপাসনায় শ্রী-সুলক্ষণ জন্য অনন্ত, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি ধারণ কর, নূতন বস্ত্র পরিধান কর এবং চন্দন-চর্চ্চিত শরীরে সাত্ত্বিকবিলাসিতা বিকাশ কর। "প্রভুর সংসার" সেবার তরে অর্থোপার্জ্জন কর, প্রভুর অনন্ত শক্তি বুঝিবার জন্য বাল্যে বিদ্যাভ্যাস কর। প্রভু-সৃষ্টি রক্ষার জন্য যৌবনে স্ত্রী-গ্রহণ কর। চরমে প্রভুতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

প্রভুকার্য্য বহুল; সমস্ত খুঁটিয়া করিতে পারিবনা ভাবিয়া ক্ষান্ত হইও না; পক্ষপাতশূন্য প্রভু প্রসন্ন হইয়া কার্য্যভার কমাইয়া বা তোমার উপযোগী করিয়া দিবেন; প্রভুভক্ত ভৃত্যের চিরকাল চা-বাগানের কুলির ন্যায় ভৌতিক খাটনি খাটিতে হয় না। তাই উত্তমাধিকারী অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচারশাস্ত্র-যন্ত্রেণ যন্ত্রিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥"

কেশরী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তুমিও সেইরূপ এক্ষণে বর্ণাশ্রমোচিত বৈধক্রিয়া হইতে নির্গত হইলে।

প্রভুর আদেশ-অপেক্ষায় যে সাধক নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে, সে ঘোর মূর্খ। শাস্ত্রই প্রভুর আদেশ। যে অধিকারীর যে জাতীয় কর্ত্তব্য শাস্ত্র-বিহিত, তাহাই তাহার পক্ষে প্রভু-কার্য্য। অধিকার-ভেদে বিধি-নিষেধ বিস্তর রহিয়াছে। স্বকর্ত্তৃত্ব-বোধ-রাহিত্যই সেই অসংখ্য বিধি-নিষেধ-বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির সৎকার্য্যই হউক, আর স্থূলদৃষ্টির অসৎকার্য্যই হউক, যদি আপনার আমিত্বময় দুরভিমান পরিহার করিয়া প্রাণপণে প্রভুকার্য্য-বুদ্ধিতে করিতে পার, তাহাহইলে নিশ্চিতই ভৃত্যগত-প্রাণ প্রভু প্রীত হইবেন। ভক্ত গোপনে ভক্তবৎসল ভগবানকে পাইয়া মনের কথা বলিয়াছিলেন।—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে ইন্দ্রিয়-চালক! অন্তর্যামিন্! ধর্ম্ম কি, জানি; কিন্তু ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্ম কি, তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইতে পারি না। এরূপ কেন হয়, আমি কিছুই জানি না। তুমি হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া যেরূপ আদেশ করিতেছ, সেইরূপই করিতেছি। যে ভৃত্য প্রভুকে হৃদয়ে বসাইয়া

এরূপ আব্দার করিতে পারে, বুঝিতে হইবে সে ভৃত্য প্রভুর বড়ই "পেয়ারা"! আর সে ভক্তের হৃদয় যে স্বভাবতঃ অধর্ম্মের দিকে আকৃষ্টই হইতে পারে না, ইহাই এস্থলে অন্তর্নিহিত রহস্য।

যদি প্রেমময় পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাও, তবে প্রাণের কবাট খুলিয়া একবার বল দেখি,—

"প্রাতরুত্থায়সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

মা! তুমি জগতের মা, আমিও জগৎ-ছাড়া নই; আমারও মা; তাই বলি, হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল, এই চব্বিশ ঘণ্টায় যা কিছু করি, সে সব তোমারই পূজা! কি মনোহর! কি মোহহর! ধন্য হিন্দুশাস্ত্র! এই এক তত্ত্বেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ সাধিত—নবধা-ভক্তির শেষ লক্ষণ আত্মনিবেদন সম্পাদিত।

আত্মনিবেদনের ভাব-ভরে ভক্ত গাইল, "হরি বল্‌রে মন আমার! সুখের নিধি পেইছি বুকে দুখের ধার ধারিনে আর" হৃদয় খুলিয়া গেল! তাহার হৃদয়ে উদয় হইবার জন্য ভক্তবৎসল লোলুপ হইলেন! আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার আসন টলিল, বুঝি বা বৈকুণ্ঠের বাস উঠিল! সর্ব্বভক্তি-নিকষ-রূপী নারদঋষি গতিক দেখিয়া যেন বিস্মিত-স্মিত মুখে বলিলেন, সে কি ঠাকুর! তুমি যোগীর ধন, যোগদুর্লভ। কত শত-সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া অনেকে অনেক জন্মেও তোমায় লাভ করিতে পারে না, আজ কিনা একজন যে সে লোকের একটা "খাম্ খেয়ালী" কথায় আর স্থির থাকিতে পারিতেছ না!" ভগবানও বিশ্ববিমোহন হাসি হাসিয়া শাস্ত্র-সুধা-কণ্ঠে বলিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না; আমার ভক্ত তন্ময়ভাবে যখন যেখানে আমাকে গায়—যেখানে যে ভাবে আমাকে চায়, আমি সেখানে সেই ভাবেই থাকি। যে সর্ব্বকার্য্যে আমারই পূজা করে, আমি সর্ব্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্ত-শরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বর গ্রহণ কর। ভক্ত বলিলেন, ভক্তাধীন! তুমি কি বর দিবে? আমি বণিক নই যে তোমার বরের সহিত ভক্তির বিনিময় করিব? ভক্তির মূল্যের তুল্য তোমার ঐহিক জগতে কি বস্তু আছে? ভক্তির তুল্য-মূল্য তুমি স্বয়ং! অতএব দিলে আপনাকে দিতে পার—কোলে স্থান দিতে পার; আমি কি তাই চাই? তবে মনের কথা বলি—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্॥"
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
তৎপাদাম্ভোরুহগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল যা হয়, হউক; এক্ষণে আর আমার সকাম-ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থা নাই। সকাম-ধর্ম্মের ফল অতুল সম্পদাদিতেও আস্থা নাই। সম্পত্তির ফল কাম্যবস্তুর উপভোগেও আস্থা নাই। আস্থা কেবল নিষ্কামধর্ম্মজা অহৈতুকী ভক্তিতে। অতএব প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার ঐ পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যে জ্ঞানদ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান; বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥

যাহাদ্বারা নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ নির্ম্মল একরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান; তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান পদবাচ্য। বাহ্যিকভাবে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িকজ্ঞান অবিদ্যান্তর্গত অশ্রেষ্ঠজ্ঞান।

জ্ঞানের স্বরূপ।

অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কারএব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চসমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥
গীতা ১৩। ৭—১১

অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধিরূপ দুঃখসমূহের পুনঃ পুনঃ দোষপর্য্যালোচনা, পুত্র-কলত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ (পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা) ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (পরমেশ্বরে) অনন্য-যোগদ্বারা একান্তভক্তি, নিভৃতে অবস্থান বিষয়ীলোকের সভায় অপ্রীতি, আত্মবিষয়ক-জ্ঞানে (আত্মানাত্ম-বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভে) একান্ত নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন—মোক্ষ অর্থাৎ সংসারোপরতি, এই মোক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব আলোচনা) এই সমস্তই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞাননামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৩৮) পরম লাভ কি? আত্মাবগম, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই (১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কারণ—

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥
(মনুসংহিতা)

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

সর্ব্বজ্ঞানাপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। উহা সকল বিদ্যার অগ্রগণ্য। এই আত্মজ্ঞান হইতেই জীব অমৃত—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। হে দেবি! আত্মজ্ঞানমোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

"অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভাবাৎ" "আমি অজ্ঞ, অর্থাৎ আমি কে, তাহা আমি জানি না; এই-

(১) অভেদ [illegible] যস্তু জীবস্য পরমাত্মনা।
বতত্ত্বধেঃ সবিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভির্ম্মতঃ॥ (স্মৃতি)

রূপ অনুভবের নাম অজ্ঞান।” আর “আমি সত্যস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম” এই প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান।

আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্ব।

প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোঽস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বতএব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

আত্মাই সকলের প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু নাই; হে শিবে! ইহলোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই অপরলোকে প্রেমাস্পদ হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়, কিন্তু তাহারা স্বয়ং প্রিয় নহে; আত্মা যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবগুণেই সকলের প্রিয়তম হয়েন। আত্মা ভিন্ন কিছুই সৎপদার্থ নাই; ধন, ধান্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল অভ্যুদয়ই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত, অনিত্য ও অসৎ; সুতরাং তাহাদের লাভ আত্মলাভের তুল্য নহে; তাই আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—

“আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ”

আত্মলাভের তুল্য শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

“করোতু ভবনে রাজ্যং বিশত্বম্ভোদমম্বু বা।
নাত্মলাভাদৃতে জন্তুর্ব্বিশ্রান্তিমধিগচ্ছতি॥”

(পঞ্চদশী)

মনুষ্য ভুবনে রাজত্বই করুক, মেঘমধ্যে বা জলেই প্রবেশ করুক, আত্মলাভ ব্যতিরেকে কুত্রাপি বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হয় না। আত্মাকে ভুলিয়া ও আত্মহারা হইয়াই মনুষ্য ত্রিতাপের নির্যাতনে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করে। অতএব আত্মলাভরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত শুভার্থী মানবগণের যত্ন করা কর্ত্তব্য। জীব আত্মজ্ঞানদ্বারাই আত্মাকে লাভ করিতে পারে বলিয়া আত্মজ্ঞান-লাভকেই আচার্য্য শ্রেষ্ঠলাভ বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥”

গীতা ৪।৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর পদার্থ আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগদ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, মুমুক্ষু মানব কালে আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

যাঁহারা বিদ্বান্, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিষ্পাপ, আত্মতত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাদেরই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞান যে কি দুর্ল্লভ পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার জন্য কিরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা ভগবদ্বাক্যে বুঝা গেল।

(৩৯) কোন্ ব্যক্তি জগৎ জয় করিয়াছেন? যিনি আপনার মনকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী। ত্রিলোক জয় করিয়াও যদি কেহ মনকে জয় করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহার সেই বিজয়লক্ষ্মী অচলভাবে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন না। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রাজনীতি উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

একস্যৈব হি যোঽশক্তো মনসঃ সন্নিবর্হণে।
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সকথং হ্যবজেষ্যতি॥

যে রাজা একমাত্র মনকে বশীভূত করিতে না পারেন, তিনি কিরূপে এই সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইবেন? যিনি একমাত্র মনকে জয় করিতে পারেন, জগৎ তাঁহারই

বশীভূত হয়; মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, সুতরাং মনকে জয় না করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় দুর্নিবার্য্য ঘোর শত্রু আর নাই। মনু বলেন,—যেমন জলপাত্রে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তদ্দ্বারাও ক্রমে পাত্রস্থ সমস্ত জল নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অবশীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনুষ্যের সমস্ত প্রজ্ঞা ক্রমে হরণ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত দীন ও দুর্ব্বল জীব জগতে আর নাই। কি বিজয়-শ্রী, কি সুখ, কি শান্তি, কি আত্মজ্ঞান, অজিতেন্দ্রিয় বলহীন পুরুষের কিছুই লভ্য নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"
"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"
(গীতা)

যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার (আত্মবিষয়া) বুদ্ধি নাই ও ভাবনা (আত্মধ্যান) নাই। ভাবনা-শূন্য ব্যক্তির শান্তি (আত্মাতে চিত্তের উপরতি) নাই এবং শান্তিবিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায়? যাঁহাদের মন (সর্ব্বভূতে ও ব্রহ্মে) সমভাবে স্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার (জন্ম-মৃত্যু) জয় করিয়াছেন! মনকে জয় করিতে না পারিলে, মনুষ্য কোন প্রকার অভ্যুদয়ই লাভ করিতে পারে না। যিনি আত্মজয়ী, তিনিই বিশ্বজয়ী। মনকে জয় করিবার উপায়—

"বিষয়ান্ প্রতি ভোঃপুত্র! সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা হৈষা সা যুক্তির্মনসো জয়ে॥"
(যোগবাশিষ্ঠ)

হে পুত্র! বিষয় সকলের প্রতি সর্ব্বপ্রকারেই যে অনাসক্তি, তাহাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি জানিবে (ক)। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
(পূর্ব্বনপাড়া।)

(ক) "পূর্ব্বকালে মহারাজ বলি স্বীয় পিতা মহাত্মা বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহামতে। আধি-ব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত দেশ কোথায়? এবং কি প্রকারেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিরোচন বলিলেন, হে পুত্র। সেই দেশের নাম সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন মোক্ষ। তথাকার রাজা সর্ব্বপদাতীত ভগবান্ আত্মা, আর তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রীর নাম মন। সেই মনেই এই জগৎ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই মনকে জয় করিতে পারিলে, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই মন্ত্রী জিত (বশীভূত) হইলে, এই অজেয় লোক সকলকেও জয় করিতে পারা যায়। অতি বলশালী সেই মন্ত্রী সুরাসুর-নাগ-যক্ষ-মহোরগ-কিন্নর ও নর সমেত এই ত্রিজগৎ অবলীলাক্রমে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয় রূপ সিদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে কষ্ট-চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে জয় করিতে যত্নশীল হও। তুমি সেই মন্ত্রিকে অতিশয় দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে; কিন্তু একমাত্র যুক্তি দ্বারা উহা ক্ষণ মধ্যে পরাজিত হয়।" (যোগবাশিষ্ঠ)

সনাতন-ধর্ম্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

(আত্মতত্ত্ব—গুরুশিষ্য-সংবাদ)

শিষ্য। গুরুদেব! প্রণিপাত করি।

গুরু। ধর্ম্মে মতি হউক।

শিষ্য। দেব! অনেক দিন অবধি আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কৃপা ব্যতিরেকে তাহার অপনোদনের আর উপায় দেখি না।

গুরু। বৎস! কি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে পার।

শিষ্য। আর্য্য! ভারতবর্ষ আজ ধর্ম্মবিপ্লবে বিপ্লুত। অধুনা ভারতবর্ষ নানাধর্ম্মে পরিপূর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এমন কি, বোধ হয় প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দর অন্বেষণ করিলে, প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পরিলক্ষিত হয়! আবার সম্প্রদায়ভেদে সকলেই নিজের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে। সকলেই নিজের ধর্ম্মে অন্যকে দীক্ষিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা প্ররোচিত করে; দুগ্ধপোষ্য বালকেও হয়ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুই একটী উপদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হয় না! সকলেই অপরের মুখে নিজের ধর্ম্মের নিন্দা শুনিলে খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে বিষম সঙ্কট উপস্থিত, কারণ কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কোন্ ধর্ম্ম প্রশস্ত, তাহা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। এই বিপ্লবের শান্তি-নিষ্পত্তি-তত্ত্ব জানিবার আশায় ভবদীয় চরণতলে উপনীত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই চিন্তান্দোলন নিবারণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম-উপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! মানবের ধর্ম্ম কখনও নানাপ্রকার হইতে পারে না। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, যদিও প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এমন এক গূঢ় সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, উহাদের ধর্ম্ম কখনওবিভিন্ন হইতে পারে না। মানবের ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সকলেরই এক; তবে অধিকারভেদে প্রকারভেদ স্বাভাবিক।

শিষ্য। মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম যদি মূলতঃ এক হয়, তবে স্থূলতঃ জগতে এত অধিক ধর্ম্ম-বিতর্ক কেন? এত মতভেদ, এত সম্প্রদায়-ভেদই বা লক্ষিত হয় কেন?

গুরু। বৎস! ভ্রমর যেমন মধু অন্বেষণ করিবার সময় গুণ্ গুণ্ শব্দদ্বারা সকলকে মোহিত করে এবং যতক্ষণপর্য্যন্ত মধুপান করিতে না পায়, ততক্ষণ কেবল শব্দই করিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন ফুলে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার কোন শব্দই থাকে না, সেইরূপ মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত তত্ত্ব লাভ না করিতে পারে, ততদিনই কেবল অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যখন প্রকৃত-তত্ত্ব লাভ হয়, তখন আর তাহার সে সকল কিছুই থাকে না। সে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ধর্ম্ম-সংগ্রাম নাই, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ বা সমাজাতীত সম্প্রদায়ভেদ নাই; মোহজ ভেদা-ভেদবোধ তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত।

শিষ্য। তবে কি আমার ধর্ম্ম ও একজন খৃষ্টানের ধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক?

---

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ইতঃপূর্ব্বে "বেদব্যাস" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত কলেবরে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল।

গুরু। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, অগ্রে তাহার উত্তর তোমার দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তুমি যে বলিতেছ, "আমার ধর্ম্ম" সেই "আমি"টা কে, তাহা কি আমাকে বলিতে পার? কেননা যেমন মস্তকহীনের মস্তক-বেদনা অসম্ভব, সেইরূপ "তুমি" কে, তাহা না জানিলে, সেই "তোমার" ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিবে?

শিষ্য। দেব! আমি যদি বলি, আমি নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহ'লে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বটে, তাহা বুঝি; কিন্তু আমি আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছি, এটুকু অবশ্য জানিতেছি।

গুরু। তুমি নরহরিই বটে, কিন্তু বোঝা সোঝা নহে। দেখ, আমার সম্মুখে তোমার দেহ খানি ভিন্ন আর কিছুই ত দেখা যাইতেছে না। এই দেহখানি ত "তুমি" নও; তাহা হইলে দেহ থাকিতে লোকের মৃত্যু হয় কেন? তাহা হইলে ত আগুণে না পুড়িলে বা বাঘে-কুম্ভীরে না খাইলে মৃত্যুই ঘটিতে পারে না! দেহই যদি "তুমি" হইতে, তাহা হইলে যত দিন বা যতক্ষণ দেহ থাকিত, ততদিন বা ততক্ষণ "তুমি" থাকিতে। অতএব ইহাদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "তুমি" একটী দেহাতিরিক্ত বস্তু। দেহে যাহা বর্ত্তমান থাকিলে দেহ স্থায়ী থাকে ও যাহার অভাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ও দেহ কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি যে, "তুমি" দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু; দেহ খানি "তুমি" নও। এসব প্রাচীন কথা হইলেও এক্ষণকার নবীনদের নব-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই। দেহাত্মবুদ্ধির আধিক্যেই নব্য-সমাজের অবনতি-আশঙ্কা।

শিষ্য। তবে আমার এই দেহের অভ্যন্তরে যে মন আছে, তাহাই "আমি" বলা যায় কি?

গুরু। তাহাও হইতে পারে না; কেননা "তুমি" যে সময় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত কতবার তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার মন অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে; অথবা যখন কোন মন্দ বিষয় ভুলিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত তোমার মন পুনঃপুনঃ সেই সকল তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে! কিন্তু "তুমি" ও মন যদি এক বস্তু হইতে, তাহা-হইলে কখনও তোমার আত্ম ইচ্ছা ও মনের কার্য্য পৃথক্ হইতে পারিত না। ইহাদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, "তুমি" ও মন কখনও এক বস্তু নহে। আর "তুমি" বলিতেছ, "তোমার" দেহ, "তোমার" মন; সুতরাং "তুমি" ও দেহ, বা "তুমি" ও মন কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। যেহেতু "তুমি" ও "তোমার" এই দুইটি শব্দ 'কারক'-ভেদে পৃথক্ বস্তুর বাচক।

শিষ্য। (স্মিতাস্যে) তবে কি আমি এখানে নাই? ইহাও অবশ্য হইতে পারে না।

গুরু। "তুমি" এখানে নাই, ইহা যেরূপ অসম্ভব, আর যদি একজন বলে যে, 'আমার জিহ্বা আছে কি না জানি না, তাহাও সেইরূপ অসম্ভব ও অদ্ভুত হয়! লোকে যেমন কণ্ঠস্থ কনকহারের অন্যস্থানে অন্বেষণ করিয়া থাকে, অথবা কস্তুরিকা-মৃগ যেমন স্বীয় নাভিদেশস্থ পদার্থের সুগন্ধে মোহিত হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ নানাস্থানে সেই পদার্থের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এসংশয়ে তোমারও সেই দশা উপস্থিত, বলা যায়।

শিষ্য। আপনার কথার অর্থ-রহস্য-ভেদ করিয়া এখনও আত্মতত্ত্বাভাস বুঝিতে সক্ষম

হইতেছি না। (স্মিতাস্যে) বলুন, "আমি" কোথায়?

গুরু। "তুমি" অবশ্যই এখানে আছে; সেই "তুমি"ই আমার সহিত কথা কহিতেছ; আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতেছ ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ।

শিষ্য। চেষ্টা মাত্র; আমি ত কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, "আমি" কে? আপনার কৃপায় বুঝিব, আশা করি।

গুরু। "তুমি" কে, তাহা যদি স্থির না থাকে, তবে "তোমার" ধর্ম্ম কোথায় পাইবে? কর্ত্তার অস্থিরতায় সম্বন্ধের স্থিরতা অসম্ভব।

শিষ্য। তবে অগ্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক "আমি" কে, তাহা বুঝাইয়া, পরে "আমার" ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আমার সম্মুখে তোমার যে দৃশ্যমান দেহ খানি বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তোমার স্থূল শরীর। এই শরীর ভিন্ন তোমার আরও দুইটী শরীর আছে। যথা, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীর। যেমন লোকে বহুমূল্য ধন-রত্নাদি একটী ছোট বাক্সে রাখিয়া, সেই বাক্সটী একটী লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করে, তৎপরে সেই লৌহ-সিন্দুকটীও একটী দুর্ভেদ্য গৃহের মধ্য রাখে, সেইরূপ তোমার স্থূলদেহটী গৃহের ন্যায়, সূক্ষ্ম-শরীরটী লৌহ-সিন্দুকের ন্যায় ও কারণ-শরীরটী মহামূল্য-রত্নাধার ছোট বাক্সের ন্যায়। আর "তুমি" সেই ধন-রত্ন-সদৃশ!

শিষ্য। প্রভো! এই একটী শরীর ভিন্ন আর কোনও শরীরত প্রত্যক্ষে পাইতেছি না।

গুরু। স্থূল প্রত্যক্ষে পাইতেছ না বলিয়া যে তাহা নাই, ইহা মনে করিও না। জগতের সকল পদার্থই কি তুমি দেখিতে পাইয়া থাক?

শিষ্য। দেখিতে যাহা না পাই, তাহা শুনিতে বা স্পর্শ করিতে কিম্বা আঘ্রাণ বা আস্বাদন করিতে পারি; পদার্থ মাত্রেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, এমন জড়সত্ব পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীর ত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

গুরু। আচ্ছা, তোমার মনকে কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক?

শিষ্য। আজ্ঞা না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; অথচ মনের অস্তিত্ব বুঝিতেছি।

গুরু। তবে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এমন বস্তুর অস্তিত্বও জগতে জানা যায়।

শিষ্য। মন সম্বন্ধে তাহাই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীরের সত্ত্বাবোধ কিরূপে হইবে?

গুরু। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর, ক্রমশঃ সমস্তই বুঝিতে পারিবে। অগ্রে স্থূলশরীরের বিষয় শ্রবণ কর। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই পাঁচটী মহাভূতের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে এই স্থূল শরীরটী নির্ম্মিত।

শিষ্য। 'ভূততত্ত্ব' ঠিক বুঝিতে পারি না।

গুরু। রূঢ় অর্থাৎ মূল বস্তুকে ভূত কহা যায়।

শিষ্য। আধুনিক বিজ্ঞান-গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, মূলপদার্থ প্রায় চতুঃষষ্ঠি প্রকার; আর্য্যশাস্ত্রানুসারে আপনি বলিলেন পাঁচটী।

গুরু। যখন স্থান ও জাতিবিশেষে মনুষ্য একেবারে অজ্ঞান ছিল, তখন মনে করিত যে, জগতের প্রত্যেক নৈসর্গিক বস্তুই এক একটী

মূলপদার্থ। যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে আধুনিক ঐ বিজ্ঞানের মধ্যেই শতাধিক মূল পদার্থের উল্লেখ ছিল, এখন ক্রমশঃ কমিয়া চৌষট্টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যতই বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইয়া ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ঐ পঞ্চভূতে (পঞ্চতন্মাত্রায়) দাঁড়াইবে। পূজনীয় পরমর্ষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ভুল অদ্যাপি কেহ ধরিতে পারে নাই। যদিও কোন বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে ভুল বলিয়া বোধ হয়, বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাই আবার পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন—

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥

অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার এই স্থূল দেহ চারি প্রকার; যথা— অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ।

শিষ্য। তবে কি ভবদীয় মতে উদ্ভিদ্‌ও এক প্রকার জীব?

গুরু। আমার মতে কেন? পণ্ডিত সমাজে সকলেই উদ্ভিদ্‌কে জীব-বিশেষ আখ্যা দেন।

শিষ্য। উদ্ভিদ জীব কিসে, উদ্ভিদের কি দর্শন-শ্রবণ-প্রভৃতি-বিষয়িণী চৈতন্য-শক্তি আছে?

গুরু। অবশ্য আছে। কোন প্রকার উষ্ণতা বা শৈত্য-স্পর্শ হইলে উদ্ভিদ সকল ম্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হয়; অতএব তাহাদের একরূপ স্পর্শশক্তি আছে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। বজ্র-নির্ঘোষাদি দ্বারা উদ্ভিদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হয়; সুতরাং তাহাদের একরূপ শ্রবণশক্তি আছে। লতাসকল বৃক্ষগণকে বেষ্টন করে ও সর্ব্বদিকেই গমন করিয়া থাকে; উদ্ভিদের আলোকাভিমুখী অঙ্গবিস্তার স্বাভাবিক, একারণে তাহাদিগকে একরূপ দর্শনশক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; কেননা দর্শনশক্তিবিহীন হইলে কোনরূপ গমন একরূপ অসম্ভব হয়। পবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা উদ্ভিদগণ রোগহীন ও পুষ্পিত হইয়া থাকে, কাজেই উহাদের একরূপ আঘ্রাণশক্তি কল্পনা না করিবার কারণ নাই। আর যখন উহারা মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তখন একরূপ রসন-শক্তিও আছে বলিতে হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উদ্ভিদ জীব মধ্যে গণ্য কি না? উদ্ভিদ্ জগৎ বহুতমোগুণাবৃত বলিয়া চৈতন্যের বিশদ-বাহ্য-বিকাশ-বঞ্চিত, কিন্তু অন্তঃসজ্ঞায় সুখ দুঃখ সমন্বিত, মন্বাদি আর্য্যশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

শিষ্য। আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, স্থূলশরীর চারিপ্রকার।

গুরু। আহার দ্বারা এই স্থূলশরীরের উৎপত্তি, আহার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং আহারের অভাবে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে; এই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে 'অন্নময়-কোষ' বলিয়া থাকেন। আর, এই শরীর কেবল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত; এ কারণে ইহাকে ভোগায়তন শরীরও বলে। এক্ষণে সূক্ষ্মশরীরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে শক্তিদ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ ও স্পর্শজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, সেই শক্তিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। আর যে শক্তি দ্বারা বাক্যকথন, বস্তু-গ্রহণ, গমন, মল-মূত্র ও শুক্রোৎসর্গ, এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী—

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এখন বল দেখি, ইন্দ্রিয়গুলি দেখা যায় কি না?

শিষ্য। দেব! কেন দেখা যাইবে না?

গুরু। বৎস! বিবেচনা করিয়া বলিও; যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিও না। আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দর্শনশক্তির নাম চক্ষু। ঐ যে তোমার ললাটের নিম্নদেশে পদ্মপর্ণাকার শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ তারকাসমন্বিত দুইটী পদার্থ দেখা যাইতেছে, উহাই তোমার দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু নহে। তবে ঐ স্থান হইতে দর্শনশক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তজ্জন্য লোকে উহাকে চক্ষু বলে। প্রকৃতপক্ষে, "দর্শনশক্তির নাম চক্ষু; "শ্রবণশক্তির" নাম কর্ণ। এইরূপ [illegible]বিধ শক্তির নাম দশটী ইন্দ্রিয়। ফলতঃ [illegible]ন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; অর্থাৎ কোন [illegible]ন্দ্রিয়ের দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করা [illegible]য় না।

এই দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক [illegible]কাশাদি ভূত-পঞ্চকের সত্ত্বাংশ হইতে এবং [illegible]র্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক উহাদের রজোগুণের অংশ [illegible]ইতে উৎপন্ন এবং এই স্থূল ইন্দ্রিয়-যন্ত্র-নিবহ [illegible]হাদের তমোগুণাংশে গঠিত। এতদ্ভিন্ন এই [illegible]হের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও [illegible]াননামক পঞ্চবায়ু * অবস্থানপূর্ব্বক শারীরিক [illegible]র্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে।

শিষ্য। প্রভো! বায়ু-পঞ্চকের মধ্যে কোন্ [illegible]য়ুদ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা শুনিবার [illegible]ন্য আমার আগ্রহ হইতেছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক [illegible]াহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। প্রাণবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত [illegible]রে; অপানবায়ু অধোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক মূত্র-পুরীষ-নির্গমাদি কার্য্য সম্পন্ন করে; সমান বায়ু উদরে থাকিয়া পরিপাকাদি সাধন করে; উদানবায়ু কণ্ঠদেশে বাস করতঃ জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে এবং ব্যানবায়ু জীবগণের সমস্ত শরীরে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য নিয়মিত করে; সুতরাং এই পঞ্চ বায়ুই জীবের শরীরে জীবনস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীব-লোক পরিচালনা করিতেছে।

আর পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে সূক্ষ্মচিদাভাস-সত্ত্বায় অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তঃকরণ যখন সংশয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম মন; আর যখন অন্তঃকরণ নিশ্চয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম বুদ্ধি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়ের মতে মন ও বুদ্ধি একরূপ সূক্ষ্ম জড়ীয় চিদাভাস-শক্তিমাত্র?

গুরু। ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা কি? সামান্যতঃ বুঝ, মন ও বুদ্ধি যদি জড়ীয় শক্তিসম্বন্ধী না হইবে, তবে শরীর ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইলে, মন ও বুদ্ধি ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কেন? বিষয় কঠিন, অথচ কথা পুরাতন; আশা করি, ক্রমে বুঝিবে। তারপর শুন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বলিত সূক্ষ্ম-বায়ু-পঞ্চক-ব্যাপারই "প্রাণময় কোষ।" পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বলিত সংশয়াত্মক মনকে "মনোময় কোষ" বলে। আর উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সূক্ষ্মসত্ত্বাসহ বর্ত্তমানা যে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তর্বৃত্তি বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি ও কর্ত্তৃস্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা "বিজ্ঞানময় কোষ" নামে অভিহিত। এই কোষত্রয়ের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ-শরীর। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের জ্ঞান থাকে না; কিন্তু এই সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান সুস্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীর ও তদন্তর্গত 'আনন্দময়কোষ' বা কারণ-

* নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত নামক আরও পাঁচটী বায়ু আছে; উদ্গার ও জৃম্ভনাদি কার্য্য সকল [illegible]াদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শরীর সকল জীবের সমভিব্যাহারী হইয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

শিষ্য। পরলোক-সত্ত্বার প্রকৃষ্ট প্রতীয়মানতা কিরূপে লাভ করা যায় ?

গুরু। অগ্রে যে বিষয়ের কথা হইতেছে, তাহা শেষ হউক, তৎপরে অন্য কথার প্রসঙ্গ করিও ; নচেৎ গণ্ডগোল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না ; আর হয়ত উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে হইতে, তোমার সন্দেহও অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে কারণ-শরীরের বিষয় শ্রবণ কর।

গাঢ়তর সুষুপ্তিকালে আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম, এতদুভয় শরীরের মধ্যে কোন শরীরেরই জ্ঞান থাকে না ; এবিষয় তুমি কিরূপ বুঝ ?

শিষ্য। আজ্ঞা ! স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাই ত সুষুপ্তি, তখন আর জ্ঞান থাকিবে কিরূপে ?

গুরু। কারণ-শরীরের বিষয় বলিতে হইলে একটু বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক ; কেননা ইহার ন্যায় দুরূহ বিষয় আধ্যাত্মিকশাস্ত্রের মধ্যে অতি অল্পই আছে। কারণ-শরীরের বিষয় শুনিতে শুনিতে এখনই এমন স্থানে পৌঁছিবে, যেথান হইতে বাক্য ও মন উভয়েই পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তিষ্ক আর তাহা ধারণা করিতে পারে না।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আমার যুগপৎ আনন্দ ও কৌতূহলের উদয় হইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহসর্ব্বস্ব-আমাকে অধ্যাত্মোপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। তুমি বলিলে যে পূর্ণ সুষুপ্তিকালে আদৌ জ্ঞান থাকে না ; কিন্তু বল দেখি, নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রা হইয়াছে ও সে সময় আমি শান্তিতে ছিলাম" ?

শিষ্য। বলিতে পারি না।

গুরু। পূর্ণ সুষুপ্তিকালে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান থাকে না বটে ; কিন্তু কারণশরীরের জ্ঞান থাকে। শুদ্ধ কারণ-শরীরের জ্ঞান আনন্দময় ; সেই জন্য আমরা সুষুপ্তিভঙ্গের পর বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রানন্দ হইয়াছিল"। এই আনন্দ একটী স্বতন্ত্র বস্তু ; ইহা পরস্পর সাপেক্ষ সুখও নহে, দুঃখও নহে ; সুখদুঃখের অতীত নিত্য নিরপেক্ষ অবস্থা।

শিষ্য। সুখও নহে, দুঃখও নহে, এরূপ অবস্থা কিরূপ, তাহা আমার প্রতীতির অবিষয়ীভূত।

গুরু। একেবারে নহে ; আচ্ছা গাঢ় নিদ্রার সময়ে তুমি কি সুখ-দুঃখ কিছু ভোগ করিয়া থাক ?

শিষ্য। না ; কিন্তু সুখদুঃখের অতীত অবস্থা যে আনন্দ, তাহা যে ভোগ করি, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

গুরু। তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রাভঙ্গের পর ভুক্তপূর্ব্ব-নিদ্রানন্দ-জনিত তৃপ্তি-প্রবাহ আমরা স্পষ্ট অনুভব করি।

শিষ্য। বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে দেখ, ঐ যে সর্ব্বান্তর্গত আনন্দভাবে বা আনন্দময়কোষে আত্মা বিরাজিত, উহারই অন্য নাম কারণ-শরীর।

শিষ্য। এক্ষণে তিনপ্রকার শরীর ও পঞ্চকোষের বিষয় বুঝিলাম ; ইহার মধ্যে কোন্ "আমি" ?

গুরু। ঐ আত্মাই আমি। আত্মা নিরুপাধিক পরমাত্মারই সোপাধিক অংশ ; সুতরাং আত্মা-আমিই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তু পঞ্চবায়ুঃ।
ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ॥

গুরু। অনুদ্যোগ, অর্থাৎ উদ্যোগশূন্যতা।

কস্মাদ্ভয়মিহ মরণা (১৩) দন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী (১৪)। কঃ শূরো যো ললনা-লোচনবাণৈর্ন ব্যথিতঃ (১৫) ঃ ৭ ॥

শিষ্য। এ সংসারে কাহা হইতে ভয় পাওয়া যায়?

গুরু। মরণ হইতে।

শিষ্য। অন্ধ হইতে বিশেষ কে?

গুরু। রোগী।

শিষ্য। শূর কে?

গুরু। যে ললনা-লোচন-বাণে না ব্যথিত হয়।

পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সদুপদেশঃ (১৬)। কিং গুরুতায়া মূলং যদে-তদ্ প্রার্থনং নাম (১৭) ॥ ৮ ॥

শিষ্য। কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা অমৃতের ন্যায় কি পান করার যোগ্য?

গুরু। সদুপদেশ।

শিষ্য। গুরুতার মূল কি?

গুরু। অপ্রার্থনা।

কিং গহনং স্ত্রীচরিতং (১৮) কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন (১৯)। কিং দারিদ্র্যমতোষঃ (২০) কিং লাঘবমঙ্গধনপরা যাচ্ঞা (২১) ॥ ৯ ॥

উদ্যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়্ বিধো যস্য উৎসাহ-স্তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে ॥
গরুড়পুরাণে ১১১ অধ্যায়ে ৩২ ॥

(১৩) সুদুঃখাচ্চ সুমৃত্যোশ্চত্রসন্তে প্রাণিনঃ সদা।
শান্তিপর্ব্বণি ২৮৬ অধ্যায়ে।

প্রাণিগণ সর্ব্বদা দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভয় পায়।

(১৪) আরোগ্যাচ্চ শরীরস্য স পুনর্বিন্দতে শ্রিয়ম্।
শান্তিপর্ব্বণি ২২৭ অধ্যায়ে ৪ ॥

শরীর রোগহীন হইলে মনুষ্য লক্ষ্মী লাভ করে।

"রোগীচিরপ্রবাসী-পরান্নভোজী পরবাসশায়ী চ।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ॥"

(১৫) কান্তাকটাক্ষ বিশিখা ন খনন্তি যস্য
চিত্তং ন নির্দহতি কোপকৃশানুতাপঃ।
কর্ষন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোভ-পাশা
লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎস্নমিদং স বীরঃ ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৭৬ ॥

স্ত্রীর কটাক্ষবাণ যাহার চিত্ত না খনন করে, কোপ-রূপ অগ্নি-তাপ যাহার চিত্তকে না দাহ করে, অত্যন্ত বিষয় ও লোভ-পাশ যাহার চিত্ত না আকর্ষণ করে, সেই বীর সমস্ত ত্রিলোক জয় করে।

(১৬) সদা সন্তোঽভি গন্তব্যা যদ্যপ্যপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈর কথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তাঃ ॥
যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ-প্রকরণে।

সর্ব্বদা সাধুর নিকট গমন করিবে, যদ্যপি তাঁহারা উপদেশ না দেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের যে স্বাভাবিক কথা, তাহাই আমাদের উপদেশ স্বরূপ হয়।

পরিচরিতব্যাঃ সন্তো যদ্যপি কথয়ন্তি ন সদুপদেশম্।
যা স্তেষাং স্বৈরং কথাস্তা এব ভবন্তি শাস্ত্রাণি ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ১০৭।

(১৭) স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ভাগিরঃ?
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনৈর্ব্বসতিঃ? কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা? প্রাপ্তেষ্টঃ কবিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্প-ভূমিরুহৈঃ? "———প্রার্থনা বিষম্"।
বনপর্ব্বণি ৩১২ অধ্যায়ে ৮৪। সপ্তরত্নং।

প্রভবো নাধিগন্তব্যাঃ স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ ॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ১৪ অ, ১৩ ॥

(১৮) নাসাং কশ্চিদ্ গম্যোঽস্তি নাসাং বয়সি নিশ্চয়ঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥
অনুশাসন পর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ১৭।

এইরূপ স্ত্রী-চরিত্র ঐ অধ্যায়ে অনেক বর্ণিত আছে— তদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে 'স্ত্রীজুগুপ্সা' নামে ২ অধ্যায়ে ও ভর্তৃহরি প্রণীত 'স্ত্রীগর্হন' নামের প্রবন্ধে স্ত্রীচরিত্র বিশেষ বর্ণিত আছে।

(১৯) "স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবিমনঃ———"।
গরুড়পুরাণে ১০৯ অধ্যায় ১৮ ॥

(২০) বৈরথৈঃ পরিসন্তুষ্টাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি, ১৪৪ অধ্যায়ে ৩৫ ॥

শিষ্য। গহন কি?

গুরু। স্ত্রীচরিত্র।

শিষ্য। চতুর কে?

গুরু। যে স্ত্রীচরিত্রদ্বারা খণ্ডিত না হয়।

শিষ্য। দারিদ্র্য কি?

গুরু। অসন্তোষ।

শিষ্য; লাঘব কি?

গুরু। অন্যধনাশায় যাচ্ঞা।

কিং জীবিতমনবদ্যং (২২) কিং জাড্যং পাটবেপ্যনভ্যাসঃ (২৩)। কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ॥ ১০॥ (২৪)

শিষ্য। কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ?

গুরু। অনিন্দ্য।

শিষ্য। জড়তা কি?

গুরু। কার্য্যে অপটুতা।

শিষ্য। কে জাগে?

গুরু। বিবেকী।

শিষ্য। কি নিদ্রা?

গুরু। জীবের মূঢ়তা।

নলিনীদলগতজলবৎতরলং কিং যৌবন ধনং চায়ুঃ। (২৫) কে শশধরকরনিকরানুকারিণ সজ্জনা এব॥ ১১॥ (২৬)

তস্মাৎ সন্তোষমেবেহধনং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
শান্তিপর্ব্বণি ৩৩০ অধ্যায়ে ২১।

নাভিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমম্।
যঃ স সৌম্য সদাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে॥
যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে।

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩২ অধ্যায়ে ৮৯।

২১) মুখভঙ্গ স্বরোদীনো গাত্রস্বেদো মহদ্ভয়ম্।
মরণে যানিচিহ্নানি তানিচিহ্নানি যাচতঃ।
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৭৭।

জগৎ পতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোন্যোধিকতরস্তস্য যোর্থী যাতি ন লাঘবম্॥
ঐ ঐ, ৭৯।

(২২) "———অপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা॥"
ষড়রত্নং।

মা জীবন্ য়ঃ পরাবজ্ঞা দুঃখদগ্ধোপি জীবতি।
তস্যা জননিরেবাস্তু জননী ক্লেশকারিণঃ॥
মাঘঃ ২ সর্গে ৪৫।

সাধ্বী স্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
ব্যোত্রেকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাম্॥
বররুচিঃ নীতিরত্নে।

অকীর্ত্তি জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ॥
বনপর্ব্বণি ২৯৯ অধ্যায়ে ২২।

(২৩) ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং সংযমোবুদ্ধিরাত্মা ধৈর্য্যং শৌর্য্য দেশকালা প্রমাদঃ। অল্পস্য বা বহুশো বা বিবৃদ্ধৌ ধন ষ্টৈতন্যষ্ট সমিন্ধনানি॥
শান্তিপর্ব্বণি ১২০ অধ্যায়ে ৩৭।

নিরামর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্য্যমরিনন্দনম্।
মাস্ম সিমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ১৩২ অ, ৩১।

(২৪) যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতিভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়াং ২ অ, ৬৯।

(২৫) অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্ন-সঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয় সম্বাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ॥
বনপর্ব্বণি ২ অ ৪৬।

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধন-যৌবনম্॥
গরুড়ে ২১৫ অধ্যায়ে ২৬।

শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ॥
বনপর্ব্বণি ২০০ অধ্যায়ে ২৪।

অহোহনিত্যং-মানুষ্যং জলবুদ্‌বুদচঞ্চলম্॥
দ্রোণপর্ব্বণি ৭৮ অধ্যায়ে।

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্য-সঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয় সম্বাসো গৃধ্যেদেষু ন পণ্ডিতঃ॥
স্ত্রীপর্ব্বণি ২ অ, ২৫।

শিষ্য। নলিনীদলগত জলের ন্যায় তরল কি ?

গুরু। যৌবন, ধন ও আয়ু।

শিষ্য। চন্দ্রের কিরণসমূহের অনুকারী কাহারা ?

গুরু। সজ্জনগণ।

কোনরকঃ পরবশতা (২৭) কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিবর্তিতা। (২৮) কিং সাধ্যং ভূতহিতং (২৯) কিম্প্রিয়ং প্রাণিনামসবঃ॥ ১২॥ (৩০)

শিষ্য। নরক কি ?

গুরু। পরবশতা।

শিষ্য। সুখ কি ?

গুরু। সর্ব্বাসক্তি-বিরতি।

শিষ্য। সাধ্য (কর্ত্তব্য) কি ?

গুরু। প্রাণীর হিত।

শিষ্য। প্রিয় কি ?

গুরু। জীবের প্রাণ।

কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং (৩১) কিং মিত্র যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ॥ ১৩॥ (৩২)

২৫। শান্তিপর্ব্বণি ২০৫ অ ৪। ঐ ৩৩০ অ ১৪।

সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশং যৌবন কুসুমোপমম্।
তড়িচ্চপল মায়ুশ্চ কস্য স্যাৎ জানতো ধৃতিঃ॥
কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। গারুড়ে প্রেতখণ্ডে ৪।৫ অ ৭৩

অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৫ সর্গে ২০।

চলপত্রান্তলগ্নাম্বুবিন্দুবৎ ক্ষণ ভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্য বেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব॥
অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ সর্গে ১০২।

(২৬) উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহ দেহিনঃ।
ধরাতলেন্দবঃ সঙ্গাচ্ছংশং শীতলয়ন্তি তে॥
যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে ৭ সর্গে ৬৯।

(২৭) সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্॥
গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৬১। মনুঃ ৪ অ ১৬০।

পরেদায়ত্ততা কৃচ্ছ্রং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ॥
বনপর্ব্বণি ১৯৩ অধ্যায়ে ১৮।

দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সদৈবাত্মবশঃ সুখী॥
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ৩৫ অ, ২৯।

"———জীবনং যন্ন পরস্য সেবা।"
গরুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে ৫।

"সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতাধিয়ঃ স্থানেশ্ববৃত্তিং বিদুঃ।
মুদ্রারাক্ষস নাটকে ৩ অঙ্কে।

(২৮) বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারী শঙ্খবৎ।
সাংখ্যদর্শনে ৪ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনাত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৩৭ অধ্যায়ে ২৩।

তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ॥
ঐ ৩৯ অধ্যায়ে ৩।

বাসে বহুনাং কলহো ভবেৎ বার্ত্তাদ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্॥
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০।

বহুনাং কলহো নিত্যং দ্বয়োঃ সং কথনং ধ্রুবং।
একাকীবিচরিষ্যামি কুমারী সংখ্যকো যথা॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৮ অ, ১৩।

(২৯) পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি
চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরব চক্রবালম্।
নাভ্যর্থিতোপি জলদঃ সলিলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাভিযোগা॥
ভর্তৃহরি নীতিশতকে।

এতাবৎ জন্মসাফল্যং দেহীনামিহ দেহেষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা শ্রেয় এব চরেৎ সদা॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৫।

সন্মার্গনিরতং মর্ত্ত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি বিবুধা উৎকৃষ্ট গুণ লোলুপাঃ॥
বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ১৩ অ, ১৭।

(৩০) ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চনবিদ্যতে।
অনুশাসনিকে পর্ব্বণি ১১৬ অ, ১২।

সর্ব্বেষামপিভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেহপত্য বিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি॥
দশম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে।

ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ শর্ব্ব! সর্ব্বেষু বস্তুষু॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯ অধ্যায়ে ৮৫।

শিষ্য। দান কি?

গুরু। আকাঙ্ক্ষাশূন্য (নিঃস্বার্থ) দান।

শিষ্য। মিত্র কে?

গুরু। যে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে।

কোলঙ্কারঃ শীলং (৩৩) কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্। (৩৪) কিমনর্ঘফলং মানং (৩৫) সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী॥ ১৪ (৩৬)

শিষ্য। অলঙ্কার কি?

গুরু। শীল (চরিত্রবত্তা)।

শিষ্য। বাক্যের ভূষণ কি?

গুরু। সত্য।

শিষ্য। অমূল্য ফল কি?

গুরু। মান।

শিষ্য। সুসঙ্গতি কি?

গুরু। সুখকরী মিত্রতা।

সর্ব্বব্যসনবিনাশে কোদক্ষঃ সর্ব্বথা পরি ত্যাগী। (৩৭) কোহন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ (৩৮ কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥১৫॥ (৩৯

শিষ্য। সকল দুঃখ নাশে কে দক্ষ?

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৪ অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে মনুষ্যের আত্মাই প্রিয়, বিশেষ বর্ণিত আছে, পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম বর্ষের ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠা)

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মাহতি প্রিয়ঃ।

পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ২৭।

(৩১) দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে ২০—২১।

(৩২) "স বন্ধুর্যোহিতে যুক্তঃ————"

গরুড়ে ১০০ অধ্যায়ে ১৫।

"————মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন।"

ঐ ১০৯ অধ্যায়ে ৬।

(৩৩) "————শীলং সর্ব্বস্য ভূষণম্॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১৩।

জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতাজিতা।
অধ্বাজিতো যা ন বতা সর্ব্বং শীলবতাজিতম্॥

উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৩ অ, ৪৬॥

বহ্নিস্তস্য জলায়তে জলনিধিঃ কূপায়তে তৎক্ষণাৎ
মেরুঃ স্বল্পশিলায়তে মৃগপতিঃ সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে।
ব্যালো মাল্যগুণায়তে বিষরসঃ পীযূষবর্ষায়তে
যস্যাঙ্গেঽখিল লোকবল্লভতমং শীলং সমুন্মীলতি॥

ভর্ত্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৮৬।

(৩৪) অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে॥

আদি পর্ব্বণি ৭৪ অ, ১৩২॥

যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ।
সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাৎ বিশিষ্যতে॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৩৯॥

তজ্জন্য আদেশ করিয়াছেন যে—
"সত্যং বদ" × × "সত্যান্ন প্রমোদিতব্যম্।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদি একাদশোঽনুবাকঃ

এ ভিন্ন শান্তিপর্ব্বে ১৯৯ অধ্যায়ে ৬১—৭০ শ্লো পর্য্যন্ত সত্য-প্রশংসা বর্ণিত আছে।

(৩৫) ন হি মানপ্রদগ্ধানাং কশ্চিদস্তি সমঃ কচিৎ॥

উদ্‌যোগপর্ব্বণি ১২২ অ, ১০

অধমাধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্॥

গারুড়ে ১১৫ অ, ১৩

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

গারুড়ে ১০৯—২০।

জীবিতং মানমূলং হি মানে ম্লানে কুতঃ সুখম্॥

গারুড়ে ১১৫—৪০।

(৩৬) শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতি-বিশ্বাসভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্॥

গারুড়ে ১১৪ অধ্যায়ে ২

(৩৭) সর্ব্বত্যাগে চ যততে দৃষ্ট্বা লোকং ক্ষয়াত্মকম্।
ততো মোক্ষে প্রযততে নানুপায়াদুপায়তো॥

বনপর্ব্বণি ২০৮ অ, ৫১।

নাস্তিবিদ্যা সমং চক্ষুর্নাস্তি বিদ্যা সমং বলম্।
নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্॥

শান্তিপর্ব্বণি ২৭৬ অ, ৩৫॥

গুরু। সর্ব্বত্যাগী।

শিষ্য। অন্ধ কে?

গুরু। যে অকার্য্যে রত।

শিষ্য। বধির কে?

গুরু। যে হিত বাক্য না শুনে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব

রাঁচি।

ন ধনেন ভবেম্মোক্ষো কর্ম্মণা প্রজয়া ন বা।
ত্যাগমাত্রেণ কিন্ত্বেকে যতয়োঽশ্নুন্তি চামৃতম্॥
যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রকরণে ১ সর্গে ১৫।

(৩৮) "——স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপম্।
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৫১।

সে বুদ্ধিমান, যে পাপ না করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাগরিত (অথবা চক্ষু যুক্ত) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৩৯) শ্রোতব্যং হিতকামানাং সুহৃদাং হিতমিচ্ছতা।
ন কর্ত্তব্যো হি নির্ব্বন্ধো নির্ব্বন্ধো হি ক্ষয়োদয়ঃ॥
উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ১২২ অ, ২০।

"————পরেতকালে হি গতায়ুষোনরাঃ।
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৬ (লঙ্কাকাণ্ডে)।

রাম-রাবণের যুদ্ধ।

শ্রীরামের জন্মের পূর্ব্বেই মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। নব্য সম্প্রদায় এ কথা সম্পূর্ণ অলীক বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে, রামায়ণ যেরূপ অবতার-বিশেষের কার্য্যকলাপ বর্ণনায় রচিত হইয়াছে, তেমনি উহাতে নিত্য আধ্যাত্মিক সত্যও নিবদ্ধ আছে। আমাদের প্রত্যেক অবতারের এই একটি বিশেষত্ব পরিদর্শিত হয় যে, ব্যক্তিগত ভাবের অন্তরালেই সার্ব্বজনিক ভাব বিরাজিত রহিয়াছে।

পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, জীব মাত্রেই দশানন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, এই দশ বদন ব্যাদন করিয়া জীব বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছে। জীব মাত্রেরই যে কেবল দশটি মুখ, তাহা নহে, তাহার বিংশতি হস্তও আছে। কাম, ক্রোধাদির সৎ ও অসৎ, এই উভয় ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম জগতের মঙ্গলদায়ক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অশেষ অমঙ্গলের আকর। ক্রোধাদিও ঐরূপ ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারানুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। এই কাম-ক্রোধাদির প্রত্যেকের ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত।

অজ্ঞ জীবের ভ্রাতা তমোরূপী কুম্ভকর্ণ। তমপ্রাধান্যে জীবের অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার অধিক হয়। অহঙ্কার বৃহদাকার, এইজন্য কুম্ভকর্ণও বৃহদাকার। অহঙ্কার সর্ব্বদাই বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট, এইজন্য দেব-নরাদি গ্রাস করিয়া উদর পূর্ণ করাই কুম্ভকর্ণের প্রধান কার্য্য ছিল। নিদ্রা আলস্যাদিই তমোগুণের কার্য্য, এইজন্য কুম্ভকর্ণও অধিকাংশ সময় নিদ্রিত থাকিত।

জীবদেহে পরমাত্মাবিরোধিনী একটি শক্তি আছে। ঐ শক্তিই কলহকারিণী নিকৃতিরূপিণী সূর্পনখা। ইনিই রাম ও রাবণে, জীব ও পরব্রহ্মে কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন।

নিকৃতি যেরূপ জীব ও ব্রহ্মে বিবাদের

কারণ, জীবদেহে বিবেক সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। বিভীষণই বিবেক। যখনই রাবণ কোন অন্যায় কার্য্যের সঙ্কল্প করিতেন, বিবেক বিভীষণ তাহাতে বাধা দিতেন। জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিপদে পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল। অবশেষে বিবেক মোহান্ধ জীব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই শোভন বর্ণ সুবর্ণকান্তি দেহই সুবর্ণ লঙ্কা। জীব-শরীরই লঙ্কা। জীব মাত্রেতেই দেব ও রাক্ষস ভাব, এই দুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়া হইতে জীবের উৎপত্তি। মায়াই রাক্ষসী স্বরূপা। আমরা সাধারণ কথায়ও বলি "মায়া-রাক্ষসী"। নিকষাই মায়ারূপিনী; বিশ্বশ্রবা বা বিশ্ববসই পরমাত্মা।

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন। পবন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, বরুণ দেহ মার্জ্জন করেন। মনই দেহের চন্দ্র স্বরূপ। মস্তকে 'দ্বিদল' মধ্যে মনের বাস; চন্দ্রও রাবণের মস্তকে ছত্র-ধারণ করিতেন। চক্ষুই দেহে সূর্য্য স্বরূপ, দর্শন কার্য্য চক্ষুর দ্বারাই হয়, এইজন্য লঙ্কার পুরীদর্শক দ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য। জীব সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার নিকট হইতেই বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লঙ্কার গুরুমহাশয়ও ব্রহ্মা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত বৃত্তান্তে আধ্যাত্মিক-রহস্য নিহিত আছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। কৃষ্ণ-অবতারে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য তুরীয় আত্মা, রামাবতারেও শ্রীরাম তদ্রূপ তুরীয় আত্মা। ঐরূপ জাগ্রদবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষণ, স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন এবং সুষুপ্তাবস্থায় অনুরুদ্ধাখ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী যেরূপ মূল-প্রকৃতি, রামাবতারে সীতাও সেইরূপ মূল-প্রকৃতি।

ইহা যে কেবল আমাদের কল্পনা, তাহা নহে, রামোত্তর-তাপনীয় শ্রুতি বলেন ঃ—

অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ।
উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
প্রজ্ঞাতকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
শ্রীরামসান্নিধ্যবসাজ্জগদানন্দদায়িনী।
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥

রামোত্তর-তাপনীয়।

ভাষ্যকার নারায়ণ উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন যে, প্রণব ষড়াক্ষর সম্ভূত, যথা অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু ও নাদ। এই ষড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর অ জাগ্রৎ-অভিমানী সঙ্কর্ষণ লক্ষণ দ্বিতীয়াক্ষর উ তৈজসাত্মক স্বপ্নাভিমানী প্রদ্যু শত্রুঘ্ন। তৃতীয়াক্ষর মকার প্রজ্ঞাত্মক সুষুপ্তা-ভিমানী অনুরুদ্ধাখ্য ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্র কৃষ্ণাখ্য রাম। বিন্দু ও নাদই মূল প্রকৃ সীতা রুক্মিণী। এই মূল প্রকৃতিই পর বিদ্যা।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উত্থিত হন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী সমস্ত ধর্ম্মের আধার স্বরূপা। চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে বিদ্যা লাভ হয় না এবং শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে, চিত্ত-শুদ্ধিও হয় না, এজন্যই যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী জনক রাজর্ষি যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান

করিয়া সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যেই পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলেন। যামল-বচনে দৃষ্ট হয় যে, নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট, অশ্বথ, এই পঞ্চবট যোগী-দিগের যোগসিদ্ধি প্রদান করে। যে স্থানে যোগীগণ নিয়ত যোগভ্যাস করেন, সেই স্থানেই যোগীর ধন ভগবান বিরাজমান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেই সীতা তত্ত্ববিরোধী মোহরূপ রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যোগী যোগমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মার সহিত তাঁহার সামান্য বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটিলেই জ্ঞান অপহৃত হয়। রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন, উহার তাৎ-পর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রবল, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাত্র।

যোগের প্রধানতঃ ছয়টি অঙ্গ, যথা—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহারাই জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সুগ্রীবাদি প্রধান ছয় কপি এই ষড়ঙ্গ যোগ। ইহারাই জ্ঞানরূপা সীতার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছিলেন। সুগ্রীব রামের মিত্র, তাহাতে ও রামে অভেদাত্মা ছিল; সমাধি অবস্থায়ও জীব ও ব্রহ্মে অভেদাবস্থা হয়। সুগ্রীবই সমাধি-যোগ। আসন আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কেহ যোগসাধনে মনঃ স্থির করিতে পারে না; মনঃস্থৈর্য্য-সাধকত্বহেতু উহাই যোগীর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু স্বরূপ। নলই আসন স্থানীয়; তিনিই সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যাহার দ্বারা মোহাদি দমন করা যায়, এইজন্য প্রত্যাহারস্থানীয় নীল দশাননের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি দশ শিরে পদাঘাত করিয়াছিলেন। হনুমান প্রাণায়াম স্থানীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মানব জ্ঞান-পদবী দর্শন করিতে পারেন। হনুমানও শত-যোজন-পরিমাণ সমুদ্র পার হইয়া জ্ঞানরূপা সীতার দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রণবের আকার অঙ্গুরীয়কের ন্যায়। প্রণবই পরমাত্মার নিজস্ব বস্তু। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা প্রণব-জপ সাধন করিতে পারেন, তিনি ভগবানের নিজ জন হন। এই জন্য সীতাদেবী হনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে তাহাকে রামের নিজ জন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই প্রাণায়ামতত্ত্ব, তাই হনুমানও পবন-নন্দন! অঙ্গদ ধারণাস্থানীয়। যে ব্যক্তির ধারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদি তাহার নিকট সতত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে, এই জন্য অঙ্গদ কর্তৃক রাবণ মুকুটচ্যুত ও তির-স্কৃত হইয়াছিলেন।

সুষেণ ধ্যান স্বরূপ। ধ্যান-পরায়ণ যোগী কখনও কোন রোগাক্রান্ত হন না। এই জন্য সুষেণই রামায়ণে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যান-যোগ মহৌষধেই ভবরোগ নিবারিত হয়।

চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, রামায়ণে সর্ব্বত্রই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভীষণ বিবেক-স্থানীয়। জীবের লঙ্কারূপ-দেহে যেমন মোহ বাস করে, সেইরূপ বিবেকও বাস করেন। তাহারা এক স্থানে বাস করিয়াও সর্ব্বদা শত্রুভাবাপন্ন। মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়, বিবেকের লক্ষ্য পরমাত্মা। বিবেক সর্ব্বদাই পীড়িত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেক দ্বারা

জীব পরমাত্মার আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল, বিভীষণ তাহাকে সর্ব্বদাই সৎ পরামর্শ দিতেন, রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত না। অবশেষে বিভীষণ রাবণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমাত্মা রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান।

সুমতি বিবেকের পত্নী, বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা সুমতি জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ-পত্নী সুমতি সরমাও অশোকবনে সীতার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সুমতি যেরূপ জ্ঞানের পরিচর্য্যা করেন, কুমতি ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথাভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। অশোকবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইরূপ রাবণের বশে আনিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল।

যোগসাধনদ্বারাই মোহাদি নষ্ট হয়। বানরগণই রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করে।

জীব সর্ব্বদাই মোহাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণও রাবণের শক্তিশেলদ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মোহাদির সংস্রবে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে; কিন্তু যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, ঐ মলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সীতা জ্ঞানস্বরূপা হইলেও মোহরূপ রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর অগ্নি-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেহরূপ লঙ্কায় মোহাদি প্রবল-পরাক্রান্ত হইলেও জীব বিবেকবুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করিলে, মোহাদির ধ্বংসসাধন করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে। বিভীষণ রাবণাদির বিনাশের পর লঙ্কায় শান্তিতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। জীব যতই লোভমোহাদিদ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন, তাহার বিবেকবুদ্ধি একেবারে কখনও বিনষ্ট হয় না; কোন না কোন সময়ে বিবেকবুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্য রাবণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আপাত-দুর্ব্বল বিভীষণ অমর।

জীব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাবতারে বসুদেবই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীব। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রাদিষ্ট ধর্ম্মাদি কার্য্য করিলেই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হওয়া যায়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক ব্যক্তি। যাঁহারা এই দশবিধ ধর্ম্মের পদে গমন করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হয়েন এবং সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। দশরথ দশবিধ ধর্ম্ম আচরণদ্বারা পরমাত্মাকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশধর্ম্ম-রথারূঢ় হইয়া কখনও সত্বপথ হইতে স্খলিত হন নাই, এজন্য তিনি রামচন্দ্রকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামায়ণে যেরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ-গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রুতির দেবাসুরসংগ্রামও যাহা, রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধও তাহাই। প্রতিদেহে প্রতিমুহূর্ত্তেই রামরাবণের যুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ভবসমুদ্রে ভাসমান দেহই লঙ্কাদ্বীপ। কাম-ক্রোধাদি অসৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সবলে বাধ্য

রাখিয়া জীবকে পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিতেছে; কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসৎপ্রবৃত্তি দমন করিয়া, পরমাত্মা-মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণবধ ভিন্ন সীতার উদ্ধার হয় না; মোহবিনাশ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানোদ্ধার অসম্ভব। ইহাই রামায়ণের ঐতিহাসিকতার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

আত্মবোধ বা মায়াবাদ।

সূচনা।

অহো! কি বিষম মরীচিকাময়ী ভ্রান্তি! কি দুঃসহ পরিতাপ! নির্ব্বোধ বালক যেমন রত্নগর্ভ সাগরের উপকূলে বসিয়া মনের আনন্দে রত্নজ্ঞান করিয়া শম্বুক সংগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনই এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া জ্ঞানাভিমানে আমি এতকাল জ্ঞানরত্ন ছাড়িয়া কেবল অজ্ঞান-ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছি, আর পরমানন্দে তাহাই আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছি; বিশ্ব-উদ্ভাসক আলোকে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছি! অর্থলোভে অন্ধ হইয়া অকৃত্রিম রৌপ্যচক্র জ্ঞান করিয়া অনর্থকর পারদাবৃত তাম্রচক্র আগ্রহপূর্ব্বক অঞ্চলে বান্ধিয়াছি! অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, যখন স্থির হইয়া বসিয়া আমার শ্রমলব্ধ রৌপ্যমুদ্রাকে পরীক্ষা-প্রস্তরে বাজাইতে যাইব, তখন তাহার সেই সুমধুর শব্দ বাহির হইবে না এবং দুই চারিবার ঘষামাজা করিলেই তাহার উপরের উজ্জ্বল পারদাবরণ উঠিয়া যাইবে, আর নীচে তাম্র দেখা যাইবে!

এ সকল অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বুঝাও তো সহজ নহে। এই বিশ্বসংসার ঠিক একটী আদ্যন্তহীন যাদুগৃহ। ইহার কেন্দ্রস্থান সর্ব্বত্রই, কিন্তু পরিধি কোথাও দেখি না! এই যাদুগৃহে অসংখ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকার মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কোন দ্রব্যকেই তো ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এই ঘরের প্রত্যেক পদার্থেরই অসংখ্য গুণ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র পাঁচটী গুণ আলো-আঁধারিতে অমনি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণরূপে যেন দেখিতে পাইতেছি, আর তাহাতেই কখনও অসীম আনন্দে পুলকিত, কখনও দুঃসহ দুঃখে সন্তাপিত হইতেছি। এদিকে এই যাদুঘরের কর্ত্তা যাদুকর যিনি, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। সে মহাপুরুষ যে কোথায় কোন্ কেন্দ্রস্থানে বসিয়া "রাহুচণ্ডালের হাড়" ঘুরাইয়া আমার চোখে মুখে ভেল্কি লাগাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। অহঙ্কারবশে ভেল্কি বুঝি বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, কিন্তু শতবার শত চেষ্টা করিয়াও ভব-ভেল্কীদারকে ধরিতে পারি নাই। অব্যক্তব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান সেই যাদুকর আমার সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া—আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া—সমগ্র যাদুঘর জুড়িয়াই বসিয়া আছেন; আমি সমগ্র চেষ্টা করিয়াও সেই জগৎ-যাদুকরকে দেখা দূরে থাকুক, যাদুঘরের কোনও পদার্থকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না এবং যাহা কিছু অস্পষ্ট-ভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না যে, পদার্থগুলির কোনও বাস্তবিক সত্তা আছে, না সবই ফাঁকি!

"স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।"

আমার চক্ষে যদি ভেল্কি লাগিয়া থাকে, তবে এ রহস্য-ভেদ করিয়া যাদুঘরের প্রত্যেক পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিবার সকল চেষ্টাই আমার বিফল হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থ সকলের পরিচয় দিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় নামধারী যে পাঁচজন আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে এবং যাহাদের অকৃত্রিম সাহায্যের ভরসায় আমি এই দুরপনেয় মায়ার উচ্ছেদ সাধন করা অল্পায়াসসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারা এক দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র করিয়া যেন আমাকে ধারাবাহিকক্রমে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে; অথচ আমি এতদিন তাহাদের প্রতারণা বুঝিয়া উঠিতে অথবা বুঝিয়াও সেই প্রতারণা-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে পাঁচজন আমার প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে পদে পদে স্খলিতপদ করিতেছে, তাহারা আমার পরমাত্মীয়; এমন কি, তাহারা না থাকিলে আমি নিজেও থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেই পরমপ্রিয় পাঁচটী কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঈশ্বরত্বও কামনা করি না! মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আততায়ী প্রতারক স্বজনদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য হইলেও আমি মায়াবশতঃই তাহা করিতে পারি না। কেন না—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ-যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।"

কৃষ্ণ হে! প্রতারণাপরায়ণ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধেচ্ছু দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, মুখ শুকাইয়া যায়! কেন না—

"যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥"

ইহারা সেই সকল লোক, ধন-প্রাণের আশ ত্যাগ করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হই য়াছে, যাহাদের জন্যই আমার সমুদায় সুখভোগ এবং রাজ্যকামনা। অতএব—

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন!
অপি ত্রৈলোক্য-রাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে

হে মধুসূদন! ইহাদিগকে বধ করিলে, পৃথ্ দূরের কথা, যদি ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভেরও সম্ভা বনা থাকে, তথাপিও আমি ইহাদিগকে মারিত চাই না। বরং ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক তাহাও স্বীকার্য্য। ফলতঃ কুটম্বমহাশয়দিগকে ত্যাগ করিলে আমার মোক্ষলাভ ঘটিতে পারে কিন্তু আমি পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে চাই না। এই কুটম্বমহাশয়ে সকলে সহজাত ভ্রাতা; ভাইসকলে একম হইয়া আমাকে ক্রমাগত ঠকাইতেছে, আ আমার দুর্দ্দশা দেখিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না ধূর্ত্তলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে এক প দেখাইতে অন্যপথ দেখাইয়া আমোদপ্রাপ্ত হ তদ্রূপ ইহারা সুখকে দুঃখ, আলোককে অ কার, সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এ অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার বিদ মানতা আমি এতকাল বুঝিতে পারি না অথবা কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও তাহা নিব রণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ
[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা,	১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা,	কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

আত্মবোধ বা মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কপট ইন্দ্রিয়-পাঁচটীর সাহায্যে আমি বাহ্য-জগতের যে অত্যল্লাংশ বুঝিতে পারি, তাহা যে নিরপেক্ষ সত্য নহে, ইহা জানিতে পারিলে কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব একবার ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব যে, আমার ঐ সকল অন্তরঙ্গ মহাশয়েরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন,—কেমন "অশ্বত্থমা হতঃ—ইতি গজঃ" করিয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া ভাঁড়াইয়া থাকেন; কপট তোষামোদকের মত কেমন কৌশলে আপনাদের অন্নদাতা মনকে তাহার সম্পদের সময় অবিরত খাম-খেয়ালী খোসগল্পে ভুলাইয়া দিয়া, বিপদের সূত্রপাতেই ক্ষিপ্রপদে সরিয়া পড়েন!

বাহ্যজগৎ।

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ, উপরে সুবিস্তীর্ণ সুনীল চন্দ্রাতপতলে সমুজ্জ্বল দীপালোকে সমুদ্দীপিত অসংখ্য হীরক; সম্মুখে অভ্রভেদী স্তম্ভাশ্রয়ে বিজলী-বিলসিত বিচিত্র বারিদপুঞ্জ; পদতলে জীবসঙ্কুল-বায়ুসাগরের মধ্যবর্ত্তিনী স্থাবরজঙ্গম-জননী বিপুলসৌন্দর্য্যময়ী রত্নাকরাম্বরা ধরণী; [illegible]রদিকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব—এ সকল সম্বন্ধে আমার যাবতীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। অতএব বাহ্য-জগৎ যদি বাস্তবিকই থাকে, আমি তাহাকে কেবলমাত্র সেই কয়প্রকারে জানিতে পারিতেছি, যেকয়প্রকারে জানিবার উপযোগিতা—অর্থাৎ উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বত্তা আমার আছে। বাহ্য-জগতের অনন্ত গুণ থাকিলেও আমি কেবল মাত্র ইহার ততটী গুণ জানিতে পারি, যতটী গুণ-গ্রহণক্ষম যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয় আমার আছে। কতটী ইন্দ্রিয় আমার আছে, তাহা এখনও স্থির বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ স্পষ্ট-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীমাত্র আছে বলিয়া বুঝি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটী মাত্র অবস্থা জানিতে পারি বলিয়া মনে করি। স্থূলতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ্য-জগতের এই পাঁচটী অবস্থা আমি জানিতে পারি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের এই পাঁচটীমাত্র গুণ স্বীকার করি। ইহার অতিরিক্ত আর যতই গুণ বাহ্য-জগতের থাকুক না কেন, আমি সহজে তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার

অস্তিত্বও স্বীকার করি না। কিন্তু ইহা অতিমাত্র সম্ভাবিত যে, জগতের অসংখ্য গুণ রহিয়াছে, আর সেই অসংখ্য গুণ গ্রহণের উপযোগী অসংখ্য ইন্দ্রিয়ও আছে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় আমার নগণ্যযোগসাধন-শূন্য স্থূল ঐহিক-পরমাণুকালের মধ্যে আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের এবং বাহ্যবস্তুর প্রত্যেক গুণের সহিত তদ্গ্রাহক আমার ইন্দ্রিয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া আমি এপর্য্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়ের এবং জগতের গুণের অসংখ্যত্ব বুঝিতে পারি নাই।

যাহাহউক, সাধারণ নির্দ্ধারণানুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থের পঞ্চ গুণের একবার আলোচনা করিব। আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, জিহ্বা। যাহা দ্বারা আমি যাবতীয় বস্তুর রূপজ্ঞান লাভ করি, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়; চক্ষু যাহার অধিষ্ঠানভূমি এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা রূপ; যাহাদ্বারা আমার শব্দজ্ঞান জন্মে, তাহা কর্ণাধিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা শব্দ; যাহাদ্বারা আমার গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা নাসিকাধিষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা গন্ধ। যাহাদ্বারা আমি স্পর্শানুভব করি, তাহা ত্বগধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্পর্শ; যাহাদ্বারা রসানুভব করি, তাহা জিহ্বাধিষ্ঠিত রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহা রস। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক। রূপের পরিচায়ক চক্ষু এবং চক্ষুর পরিচায়ক রূপ; রসের পরিচায়ক রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের পরিচায়ক রস, ইত্যাদি; সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এতদুভয়ের একের জ্ঞানাভাবে অপরের জ্ঞান হয় না; ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে যে পাঁচটী মাত্র অবস্থা আমি জানিতে পারি, তাহা সুখ-দুঃখাত্মক দুইভাবে অনুভব করি। সুরূপ দর্শনে মন যেমন প্রসন্ন হয়, কুরূপ দর্শনে মন তেমনই বিষণ্ণ হয়; সুরস যেমন প্রীতিপ্রদ, কুরস তেমনই বিরক্তিকর; চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভে হৃদয় ও মন যেমন শীতল হয়, পুরীষের পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র তেমনই জ্বলিয়া যায়—মন যেন অস্থির হয়। মলয়মারুতের মৃদু প্রবাহ-সঞ্চালিত সুমধুর সঙ্গীতে শরীর ও শ্রবণ যেমন জুড়াইয়া যায়, বর্ষার করকাঘাতে ও বজ্রনিনাদে তাহারা তেমনি বিদীর্ণ প্রায় হয়; সুতরাং আমার সুখ-দুঃখ অনেকটা আমার অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই নির্ভর করে। যদি আমার কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়-লভ্য সুখ-দুঃখেরও অভাব হয়। যখন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হই, তখন যেমন সুরূপ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই, তেমনি কুরূপ-দর্শনজনিত দুঃখ হইতেও মুক্ত থাকি। আবার যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরও দুই-দশটী ইন্দ্রিয় লাভ করি, তাহাহইলে আরো ততটী সুখ-দুঃখাত্মক ভাবে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, আমার সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানই পরস্পর-বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুখ কি, তাহা না বুঝিলে, দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ছোট কি, তাহা না বুঝিলে, বড় কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে শীত বলি, নিরবচ্ছিন্ন তাহাই যদি জন্মাবধি ভোগ করিয়া আসিতাম, তাহাহইলে আর তাহাকে শীত বলিয়া বিশেষানুভব করিতে পারিতাম না। এই যে বায়ু অবিচ্ছেদে আমার স্কন্ধে মহা ভার

চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কি আমি টের পাই? পৃথিবী যে আমাকে তাহার আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে মহাবেগে অবিরাম ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই কি আমি অনুভব করিতে পারি? নিবিড় নীরদাবৃত অমা-রজনীতে যখন "তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল" তখন কোনই রূপ দর্শন করি না; কেবল পূর্ব্বানুভূত আলোকের বিপরীত একমাত্র অন্ধকারের ভাব মনে পড়ে; কিন্তু যদি জন্মান্ধ হইতাম, তাহা-হইলে আলোকেরও জ্ঞান না থাকায়, আমার মনে উহার স্বতঃ-সাপেক্ষ অন্ধকারেরও কোন ভাব প্রতিভাত হইত না। এইরূপে বুঝিতে পারি যে, আমার প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরস্পর বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন, "অসতঃ সজ্জায়ত ইতি, সতো সজ্জায়ত ইতি বা।" সৎ হইতে অসতের জন্ম এবং অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়। সদসৎ দুয়ের জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার কোনটীরই জ্ঞান হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও এই ভাবকে "Co-relative idea" বলেন।

ইন্দ্রিয় পরিচয়—চক্ষুরিন্দ্রিয়।

এখন ইন্দ্রিয় সকলের একবার পরিচয় করিয়া লই এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়কে ধরিয়া আলোচনা-প্রবৃত্ত হই। আমি চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারারূপ জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তাহাতে বহু অন্তরায় দেখি—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।

কি না,—যে দ্রব্য দেখিব, তাহা যদি সে চক্ষু (১) হইতে অত্যন্ত দূরে (২) অথবা চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে থাকে, তবে তাহার রূপ দেখা যায় না। (৩) চক্ষুর কোন প্রকার বিকার হইলে (৪) অথবা মন, অন্য বিষয়ে ডুবিয়া গেলে আমি চক্ষুতে কিছু দেখি না। যে দ্রব্যটী দেখিব, তাহা যদি (৫) অতি ক্ষুদ্র হয় কিম্বা দ্রব্যান্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহাহইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। আবার (৭) সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের ন্যায় প্রবল রূপের ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণালোক ডুবিয়া গেলে অথবা (৮) একই রকমের দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলে, আমি দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ দেখিতে পাই না। ইহা ছাড়া (৯) দ্রষ্টব্য পদার্থটী আদ্যন্তহীন হইলে অথবা (১০) দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলে, তাহার রূপ দেখা যায় না। আমি যখন শান্ত হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুরত্নের এই সকল অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, কেমন অপদার্থ শম্বুক দুটীকে আমি কেমন অযথারূপে অমূল্য রত্নজ্ঞান করিয়া থাকি! আহা কি কর্ম্মঠ সহকারী! ইনি দূরের সম্বাদ আনিবেন না; নিকটের কথাও কহিবেন না। বড়কে দেখিলে দিশাহারা হইবেন, আবার ছোট ইহাঁর নজরে ধরে না। সত্তর-আশী বৎসরের অধিক কার্য্য করেন না, তাহার মধ্যেও কতবার পীড়ায় বিদায় লইয়া থাকেন। আর যখন প্রভু মনকে অনবস্থিত দেখেন, তখন নিজে অমনি ঘুমাইয়া পড়েন। কাজের সময় একটা সামান্য (হাঁচি টিকটিকীর শব্দকে) ব্যবধান দেখিলে, ইহার বেদ পাঠ বন্ধ হয় এবং একটা বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইলে, ইনি ছোট খাটো কার্য্যগুলির কোন খোঁজই রাখেন না। আবার এদিকে এমনি 'নিশানসহী' যে, আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশান থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন না; অধিকাংশ-সময়েই আপনার বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া কত অযথা বিবাদের সূত্রপাত করেন। কখনও রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পান, কখনও

সর্পকে রজ্জুভ্রমে গলায় জড়ান; দৈ বলিয়া চূণ খাইয়া মুখ পোড়ান, অন্য সময়ে চূর্ণ ভ্রমে দধি পরিত্যাগ করেন। ইঁহার এত দোষ, তবুও যে আমি ইঁহাকে এত আদর করি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইনি আমার একজন পরমাত্মীয়—আমার এই দেহাত্মবুদ্ধি-সর্ব্বস্বজীবনে মোহ-মগ্ন লোকযাত্রার সহজাত পরিচারক।

যে সকল স্থলে চক্ষু মহাশয় আমার কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা দেখা হইল। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে সকল স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় আমার রূপাদির জ্ঞান লাভের সাহায্য করেন বলিয়া মনে করি, সেই সকল স্থলে তিনি বাস্তবিকই আমার সাহায্য করেন, না আমাকে ভুলাইয়া থাকেন—একরূপ দেখাইতে অন্যরূপ দেখাইয়া দেন। চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আমরা রূপ বলি। রূপ, বর্ণ বা আলোক ইত্যাদি শব্দ একই পদার্থের অবস্থান্তর বুঝাইবার জন্য আমরা ব্যবহার করি। এই বর্ণ, রূপ বা আলোক সামান্যতঃ দুই প্রকারের; যথা স্বকীয় রূপ বা স্বরূপ এবং প্রাপ্তরূপ বা বিরূপ। যাহা আপনার রূপেই আপনি ভাসে, তাহা স্বরূপ; আর যাহার নিজের কোন রূপ নাই, স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থের নিকট হইতে রূপ ধার করিয়া তাহারই কতকটা রাখিয়া কতকটা বিলাইয়া নিজের রূপবত্তার পরিচয় দেয়, তাহা বিরূপ। সূর্য্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। কেন না, সূর্য্য বা অগ্নি এবং চক্ষু, ইহাদের মধ্যে প্রতিকূল পদার্থান্তরের ব্যবধান না থাকিলে সূর্য্য বা অগ্নির বর্ণ, রূপ বা আলোক আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু এই বিবিধ বর্ণাম্বরা বহু ভূষিতা কুসুমকুন্তলা মহীর রূপ বিরূপ; ইহার কোন রূপই আপনার নহে, সকলই ধার-করা। তাই যখন রজনীতে সূর্য্যদেব আপনার বিশ্ববিকাশক কর প্রসারণে মহীর বিশাল বক্ষদেশ বিভাসিত করিতে বিরত থাকেন, তখন মহীর এত যে হাসিভরা মুখ, তাহা কেমন ম্লান হইয়া যায়। পুনশ্চ, যদি ঘটনাক্রমে রজনীনাথ তাহার ধার-করা করগুলি মহীর ব্যথিত বক্ষে বুলাইতে না পারেন এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন গগণের একটী নক্ষত্রও যদি তাহার ক্ষীণ আলোকাধরে ধরণীর ললাট চুম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে মহীর এই চমৎকারিণী মোহিণীরূপচ্ছটা কিরূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়! সুসজ্জিত গৃহ দীপহীন হইলে তাহার সজ্জিত সৌন্দর্য্য কেমন এক গাঢ় তমসাবরণে ঢাকা পড়ে! আবার সুধাধবলিত গৃহ লোহিতালোকস্পর্শে যেমন লোহিত দেখায়, নীলালোক-সমাগমে তেমনি নীলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আলোকের ইতর বিশেষে বিরূপ পদার্থের এমনই আশ্চর্য্য রূপান্তর হয়!!

আলোক এক প্রকার নহে; নীল, লোহিত পীত ভেদে অমিশ্র আলোক সম্ভবতঃ তি প্রকার হইলেও এই তিনের ন্যূনাধিক পরি মাণে মিশ্রণে রূপ অসংখ্য প্রকার। আলো বা রূপ যদি বহু প্রকার না হইয়া এক প্রকা হইত, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে রূপ থাক আর না থাকা সমান হইত। যেহেতু সে অবস্থায় আমরা রূপের কোন ভাবই স্পষ্টরূপে মনে ধারণা করিতে পারিতাম না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি অবিরত কাল অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণের এমন একখানি পট ঝুলান থাকিত, যাহার আদ্যন্ত নির্দ্দেশক বর্ণান্তর নেত্র গোচর হয় না, তাহা হইলে আমরা লোহিত বর্ণের কোন ভাবই মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতাম। সীমাবদ্ধ রূপ ভিন্ন আদ্যন্ত রূপ-ধারণা করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। কো

রূপ দেখিতে হইলে সেই রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; তা সেই সীমা হয় রূপান্তরের দ্বারাই করি, না হয় রূপাভাব দ্বারাই করি, একই কথা। রূপাভাবও এক প্রকার রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়! কারণ, রূপাভাবও দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য এবং যাহা দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য, তাহাই রূপ। ফলতঃ যখনই আমাদের কোন রূপের জ্ঞান হয়, তখনই সেই রূপকে একটী বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং সমধরাতল ক্ষেত্রাকারে দর্শন করিয়া থাকি। চক্ষু নিজে ইহার অধিক আর কোন আকারের রূপ আমাদিগকে দেখাইতে পারে না; তবে যে আমরা অনেক সময় চক্ষু দ্বারা ঘনক্ষেত্রাদির বা মসৃণ-বন্ধুরত্বাদির জ্ঞান লাভ করি, তাহা শুদ্ধ চাক্ষুষ জ্ঞানে নহে; চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত স্পর্শজ্ঞান ভূয়ঃ সম্মিলিত হইয়া কখন কখন এক জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে অন্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়া থাকে; কিন্তু নানা কারণে স্পর্শজ্ঞান ও রূপজ্ঞান অনেক সময় পরস্পর অযাচিত ভাবে পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া মহানিষ্ট ঘটাইয়া ফেলে। মনুষ্যের পূর্ণ আকৃতি বুঝিতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় উভয়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সমতল ক্ষেত্রাকারে মানুষের আকৃতি দর্শন করিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার চারি দিকের স্পর্শানুভব করিয়া, চাক্ষুষ জ্ঞানকে কতকটা পাকা করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনেক সময় পটস্থ চিত্রিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। জন্মাবধি যাহার চক্ষে ছানি পড়া—সুতরাং যে জন্মান্ধ, হঠাৎ অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার ছানি অপনীত হইলে, সে দৃষ্টি লাভ করিয়া সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ অনুভব করে, তাহা সমুদয়ই সমতল ক্ষেত্রের, ঘনক্ষেত্রের নহে। সে ব্যক্তি যে সকল পদার্থকে অগ্রে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানিত, এখন সেই সকল পদার্থকে তাহার সম্মুখে দূর-নিকট করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, সুধু চক্ষুর দ্বারা সে তৎসমুদয়কে সমদূরবর্ত্তী এবং সমতল ক্ষেত্রাঙ্কিত জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলতঃ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন ঘনক্ষেত্রের বা কোন পদার্থের দূরাদূরত্বের জ্ঞান চক্ষু নিজে জন্মাইতে পারে না। অনন্ত আকাশের দূরাদূর প্রদেশ ব্যপিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত উজ্জ্বল গোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা আমি সে সকলকে যেন দূরবর্ত্তী উজ্জ্বল থালের সমতল ক্ষেত্রবৎ দর্শন করিয়া থাকি।

চক্ষু দ্বারা আমি বর্ণ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও দোষ আছে। কি স্বপ্রকাশ, কি উপপ্রকাশ, সকল পদার্থ হইতেই তাহাদের রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই রূপ-তরঙ্গ পদার্থান্তরে সঞ্চারিত হইয়া কতক তাহাতে শোষিত, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া নিতান্ত জটিল এক তরঙ্গাকারে আমাদের চক্ষে প্রতিহত হয়; সুতরাং কোন্ পদার্থের কোন্ টুকু নিজস্ব, আর কোন টুকু পরস্ব, তাহার নির্ণয় হইয়া উঠে না। অপিচ সহজ দৃষ্টিতে বা দূর-দৃষ্টিতে যে বর্ণকে অবিচ্ছিন্ন একই বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়, যন্ত্রযোগে বা নিকটে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে একাধিক বর্ণের সংঘাত বলিয়া বুঝা যায়। অনুবীক্ষণ দ্বারা শোণিত দর্শন করিলে, আর তাহাকে পূর্ব্বের মত অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণ দেখায় না, জলীয় পদার্থ মধ্যে লোহিত ও শ্বেত কণাসমূহ ভাসমান থাকা দৃষ্ট হয়। স্যাণ্টোনাইন (Santonine) প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বা "কামলা" প্রভৃতি অন্যান্য কারণে এমন কখন কখন হইয়া থাকে যে, এত দিন যে সকল বস্তুকে

ধবল দেখাইয়াছিল, সেই সকল পদার্থকে তখন হরিদ্রাবর্ণাভ দেখায়। দৃষ্টপদার্থের এই বর্ণ-পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ আমার চক্ষুরই এমন এক প্রকার পরিবর্ত্ত, যাহার জন্য আমি বাহ্যরূপ মাত্রকে হরিদ্রাবর্ণাভ দেখিতে বাধ্য হই। আমার চক্ষুর এই পরিণতিকে আমি একপ্রকার রোগ বলি; কিন্তু তাহা রোগ হইলেও প্রকৃতির নিয়মাধীন একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা এবং পীতনেত্র আমার জীবনের সহচর হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যদি সকল মনুষ্যেরই জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত এই প্রকার চক্ষু হইত, তাহাহইলে, এখনকার প্রত্যেক ধবলপদার্থকে সকলেই হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, স্বপ্রকাশ পদার্থের বর্ণের ইতর-বিশেষে অপ্রকাশ-পদার্থের বর্ণান্তর ঘটে; এখন দেখা গেল যে, কি স্বপ্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর হওয়া আমাদের চক্ষুরই পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর ভাবান্তরে সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর ঘটে।

পদার্থসকলের বর্ণান্তর হওয়ার প্রস্তাব উপলক্ষে আর একটী কথা বলিয়া রাখিব। নানাবর্ণরঞ্জিত একখানি পট অত্যন্তবেগে ঘুরাইলে পটখানিকে আর বিবিধ বর্ণাঙ্কিত বলিয়া বোধ হয় না, একই বর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং অবস্থাবিশেষে অতবেগসঞ্চরমান পটকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। ফলতঃ বাহ্যবস্তুর যদি প্রকৃত কোন রূপ থাকে, সে রূপ আমরা জানিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র বিকৃত রূপ দেখিতে পাই এবং তাহাকেই প্রকৃতস্বরূপ বিশ্বাস করিয়া তুষ্ট হই। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ রূপ আমাদের জ্ঞানাতীত; কেবল সাপেক্ষ-রূপই আমাদের জ্ঞেয় এবং তাহা জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই।

আমরা সকল পদার্থের রূপের সত্তা স্বীকার করি, কিন্তু চক্ষু মহাশয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তেজ-তন্মাত্ররূপের পরগত স্পর্শতন্মাত্র-বায়ুর প্রভা বা রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এটী অবশ্য আমাদের একটী স্থূল ভ্রম নহে। যদি অন্যান্য জড়সত্তার রূপ থাকে, তবে বায়ুরও অবশ্য প্রভাতীত একরূপ রূপ আছে। তবে যে অপরাপর বস্তুর প্রভাগতরূপের ন্যায় আমরা সাধারণতঃ বায়ুর কোন রূপ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ পরিষ্কার। কোন পদার্থের রূপ দেখিতে হইলে, সেই পদার্থকে চক্ষুর সহিত একবারে সংলগ্ন না রাখিয়া একটু দূরে রাখিতে হয়; কিন্তু বায়ুকে আমরা চক্ষু হইতে দূরে রাখিতে পারি না এবং সেই জন্য তাহার রূপ দেখিতে পাই না। যে অবস্থায় অপরাপর পদার্থের রূপ দেখি, সেই অবস্থায় স্বনেত্র-প্রতিহত তেজঃ বায়ুতে আরোপিত করিয়া বায়ুরও রূপ দেখা যায়। যে অবস্থায় বায়ুর রূপ দেখিতে পাই না, সে অবস্থায় অন্য কোন বস্তুরও রূপ দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুর পাতা বা চক্ষুর কি রূপ, তাহা স্বচক্ষে আমরা দেখিতে পাই না; কেন না তাহারা দৃষ্টিকেন্দ্রাপেক্ষা চক্ষুর অধিকতর নিকটে থাকে। পুনশ্চ, আমরা যে বায়ুর রূপ একেবারে দেখিতে পাই না, তাই বা কি করিয়া বলি? দিবসে সূর্য্যের আলোক এবং রাত্রিতে চন্দ্রের আলোক বায়ুর অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বাঙ্গে কিয়দংশ আশোষিত এবং কিয়দংশ তাহাহইতে প্রক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশই বায়ুভেদ করিয়া বাহির হওয়ায়, তাহাতে এক অনির্ব্বচনীয় স্বচ্ছরূপ উৎপাদন করে, যাহা আমরা অনুভব করিয়াও প্রকাশ করিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারি না এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রযুক্তই তেজ-তত্ত্বাতীত বায়ুর রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করি না। অবশ্য, রূপতন্মাত্র তেজতত্ত্বা-

তীত বায়ুর নিজের কোন রূপ নাই, কিন্তু এক পক্ষে ধরিতে গেলে পৃথিবীর কোন্ পদার্থইবা নিজের রূপে রূপবান ? দিবসে সৌরকর স্পর্শে যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সূর্য্যালোক ধার করিয়া বাস্তবতঃ এক এক নির্দ্দিষ্টরূপ ধারণ করে, যাহার সহিত আর সকলের রূপের প্রভেদ বুঝিতে পারি, তেমন অন্ধকার রজনীতে যখন আলোকাভাবে বিশ্বচরাচরের রূপ ফুটিতে পারে না, তখন বায়ুও হৃতরূপ বা স্বস্বরূপাবস্থিত হয়। যদি বায়ুর আলোকসমাগমে রূপময় হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহাহইলে দিবারাত্রভেদে বায়ু-প্রতিফলিত প্রভাব বায়ুর এইরূপ ভেদ সম্ভব হইত না। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বায়ুও আলোকসংসর্গে সেই এক অপরূপ স্বচ্ছরূপে রূপবান্ হইয়া থাকে, যাহা আমরা বুঝিয়াও সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না। বায়ুর স্বচ্ছরূপ না থাকিলে আমরা কি স্বপ্রকাশ, কি পরপ্রকাশ, কোন বস্তুরই রূপ দেখিতে পাইতাম না—সকলেরই রূপের তরঙ্গ বায়ুর বাহ্যাঙ্গে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তাহা কখনই আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধের অন্তর্গত হইতে পারিত না। কাচ, জল এবং আরও কতকগুলি জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছ; অনেক সময় আমরা বায়ুর রূপের ন্যায় ইহাদেরও রূপ দেখিতে পাই না। আবার যেমন অবস্থানভেদে এই সকল স্বচ্ছপদার্থের রূপ দেখিতে পাই, তেমনই অবস্থানভেদে বায়ুরও রূপ দেখিতে পাই। জলমধ্যে যখন খণ্ডিতবায়ু বুদ্বুদ আকারে উঠিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিকস্থ জলের রূপের দ্বারা সীমাবচ্ছিন্ন হওয়ায় সেই বায়ুগোলকের রূপ জলপ্রভানুবন্ধীভাবে কেমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই !

চক্ষুদ্বারা সচরাচর গতি-জ্ঞানও আমাদের হয়। কিন্তু ইহাতেও আমরা অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়া থাকি। গতিশীল তরণী বা অন্য কোন যানে বসিয়া থাকিয়া অনেক সময় আমরা যান এবং আমাদিগকে গতিহীন এবং চতুর্দ্দিকস্থ গতিহীন পদার্থসকলকে গতিশীল জ্ঞান করিয়া থাকি। মেঘাচ্ছাদিত আকাশের গতিশীল মেঘকে গতিহীন মনে করিয়া, গতিহীন চন্দ্রকে গতিশীল জ্ঞান করি। নিত্য তীব্র গতিশীলা পৃথিবীকে অচলা মনে করিয়া, অচলপ্রায় সূর্য্যকে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে দেখি। কোন চক্র যখন ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই, কিন্তু যখন চক্রটী অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সেই ঘূর্ণন দেখিতে পাই না। একখানি যষ্টির দুই প্রান্তে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া যদি কেহ সেই যষ্টিকে বেগে ঘুরাইতে থাকে, সেই ঘূর্ণিত আলোকদ্বয়কে একটি গতিহীন আলোক-চক্রের আকার ধারণ করিতে দেখি। বস্তুতঃ শুধু চক্ষুদ্বারা আমরা গতি নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রায়ই গতিশীলকে গতিহীন এবং গতিহীনকে গতিশীল মনে করি। কতকগুলি পদার্থ—যাহাদিগকে আমরা স্থির মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপেক্ষিক ভাবে স্থির ভিন্ন নিরপেক্ষ স্থির নহে; পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতে কোন পদার্থই নিরপেক্ষভাবে স্থির নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা স্থির মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অস্থির বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে কোনরূপ গতি অনুভব করিতে না পারিয়া, যে পৃথিবীর নাম রাখা হইয়াছে অচলা, সেও অবিশ্রামে মহাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অন্যে পরে কাকথা! পৃথিবী স্থির নহে, সুতরাং পৃথিবীর পৃষ্ঠে যত কিছু

আছে, কেহই স্থির নহে। তবে যে আমরা কাহাকেও স্থির—কাহাকেও অস্থির বলি, তাহা কেবল অস্থিরতার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকি। গতিশীলা পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া এবং পৃথিবীর গতিতে সমান গতিশীল পার্থিব পদার্থ সকলের সাধারণ গতি গণনায় না আনিয়া, তাহাদের বিশেষ গতি-স্থিতির তারতম্য করিয়া কাহাকেও গতিশীল—কাহাকেও গতিহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ গতিহীন নহে।

চক্ষুদ্বারা আমারা বাহ্যবস্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করি, কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ সংখ্যার জ্ঞান নহে। চক্ষুর গঠনের ইতর-বিশেষে রূপজ সংখ্যা-জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। আমাদের চক্ষু যদি বর্ত্তুল না হইয়া চক্রাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচ খণ্ডবৎ হইত, তাহাহইলে একই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রত্যেক খণ্ডে পতিত হইয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যানুসারে বিশ্বপদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান হইত এবং আমরা কোন একটী বস্তুকে এখনকার মত একাকৃতিগত না দেখিয়া বহ্বাকৃতিগত দেখিতাম। পুনশ্চ আমাদের দুইটী চক্ষু এবং সাধারণতঃ দুইচক্ষুদ্বারা একমাত্র রূপ দর্শন করি, কিন্তু চক্ষু দুইটী যে আকারে গঠিত ও বিন্যস্ত, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের অবস্থানভেদ জন্মাইয়া সকল বস্তুকেই যুগলমূর্ত্তিতে দেখিতে পারি। যদি চক্ষু দুইটীকে সহজভাবে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে দূর বা নিকটের কোন দ্রব্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দ্রষ্টব্যকে দেখিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে যুগলমূর্ত্তিতে দেখা যায়। আবার এই যুগলমূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তুটীকে যদি ক্রমে নিবদ্ধ লক্ষ্য পদার্থের দিকে সরাইয়া আনা যায়, তাহাহইলে যুগলেরূ মধ্যের অন্তর ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে লক্ষ্যস্থানে যুগলত্ব একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং যুগলমূর্ত্তি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। অপর, নাসিকামূলের দুই পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী রাখিয়া অঙ্গুলীদ্বয়কে দেখিতে গেলে দুটী অঙ্গুলী মিলিত হইয়া একটী স্থূল অঙ্গুলীর মত দেখায় এবং একত্বভাবাপন্ন সেই অঙ্গুলী দুইটীকে নাসিকামূল হইতে দূরে লইলে, আবার তাহাদের একত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বিত্ব প্রকাশিত হয়। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ চসমার কাচ দুই খানিকে একখানি বৃহৎ কাচ বলিয়া জ্ঞান হয়। মানব চক্ষু এইরূপ গঠিত ও বিন্যস্ত না হইয়া যদি এমন একভাবে গঠিত ও বিন্যস্ত হইত যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমরা সম্মুখস্থ প্রত্যেক মূর্ত্তিকে বহ্বাকৃতিগত দেখিতে বাধ্য হইতাম, তাহাহইলে আমাদের তদবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থার চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হইত!

চক্ষুদ্বারা আমরা সকল পদার্থের আয়তনও স্থির করিতে যাই এবং তাহাতেও বিস্তর ভ্রমে পড়ি। চক্ষুর বর্ত্তুলত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে একই দৃষ্টবস্তুর আয়তনের এবং দূরাদূরত্বের ইতর বিশেষ হয়। আবার একই পদার্থ দূরাদূর-ভেদে একবার ছোট একবার বড় দেখায়। অতএ[illegible] চক্ষুদ্বারা কোন বস্তুর নিরপেক্ষ আয়তন স্থি[illegible] হইবার সম্ভাবনা নাই। সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য কত ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃ[illegible] পক্ষে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়! একটি টাকাকে চক্ষুর সঙ্গে লাগাইয়া ধরিলে, তাহাকে একবারেই দেখা যায় না; ক্রমে চক্ষু হইতে দূরে লইতে থাকিলে, কোন এক স্থানে তাহাকে দেখা যায় এবং সেই স্থান হইতে যতই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, টাকাটীর আয়তন ততই ক্ষুদ্র হইতে থাকে; অবশেষে এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেখা যায় না।

একই বস্তু যখন নিকটে আসিলে বড় দেখায় এবং দূরে যাইলে ছোট দেখায়, তখন সুধু চক্ষুর সাহায্যে কোন পদার্থের প্রকৃত আয়তন জানিবার উপায় নাই। ফলতঃ চক্ষু মহাশয় তাঁহার সহজাত ভ্রাতাদের সহিত যুক্তি না করিয়া কাহারও আয়তনসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না এবং সকলের সহিত যুক্তি করিয়াও যাহা বলেন, তাহা যে প্রবঞ্চনাময়, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না।

চক্ষুদ্বারা দূরত্বজ্ঞানও আমাদের হয়, কিন্তু সে জ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। দূরত্বের তারতম্যে দ্রব্যের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখায়, আবার বস্তুর আয়তনের ইতর-বিশেষে দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি বোধ হয়। যে দুইটী পদার্থকে আয়তনে সমান বলিয়া জানা থাকে, সেই দুইটী বস্তুর যাহাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে দূরস্থ মনে করি এবং যাহাকে বড় দেখায়, তাহাকে নিকটস্থ জ্ঞান করি। আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে, ইহাদের কে নিকটে, কে দূরে অবস্থিত, আর কেই বা বড়, কেই বা ছোট, তাহার মীমাংসা চাক্ষুষ জ্ঞানসাধ্য নহে। তবে সকলকে সমান দূরস্থ মনে করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের এবং সকলকে সমানায়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের আপেক্ষিক দূরাদূরত্বের এক অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি; মূলে কিন্তু দূরাদূরত্বের বা আয়তনের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের নিশ্চিতাবধারণা না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কে ছোট, কে বড়, আর কে দূরে, কে নিকটে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একটা চিত্রের সমালোচন করিতে যাইয়াও আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করি। এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে একটা নগর কল্পনা করিতে পারি, তিল প্রমাণ একটী প্রতিকৃতি তাল প্রমাণ দেখিতে পাই। একই সমতলক্ষেত্রগত বিবিধ বর্ণসংঘাতকে দূরান্তরসন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করি। এ সকল আমাদের দৃষ্টিভ্রমেরই কার্য্য।

দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থকে আমরা যে স্থানে দর্শন করি, তাহাও নিরপেক্ষ স্থান নহে। দুই চক্ষুদ্বারা যে পদার্থকে যে স্থানে দেখা যায়, এক চক্ষুদ্বারা তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না; হয় এ পাশে না হয় ওপাশে সরিয়া থাকা বোধ হয়। আবার জলতলস্থ কোন পদার্থকে যেমন তাহার প্রকৃত স্থান হইতে চতুর্থাংশমিত উপরিস্থ জ্ঞান হয়, তেমনই স্বচ্ছ বায়ু জগতের বায়ুস্তরের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রূপ দেখায়। সেই জন্য প্রৌঢ় সূর্য্যাপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধারুণ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং সাধারণতঃ দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়াও অস্ত ও উদয়কালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

চক্ষুর সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রূপ দেখিতে পাই। সেই রূপ গুলিকে আমার এবং আমার পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু যে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে অনুভব করিতে পারি না, সে স্থলে প্রতিবিম্ব সকলকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভ্রমের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া যাদুকর সকল আমাদিগকে কাটামুণ্ডের কথা শুনাইয়া থাকে এবং আরও কত প্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখায়। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞানটী পাওয়া যায়, তাহাতে যে কোন অলীকতা আছে, চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না। তবে যখন হাত বাড়াইয়া আমরা দর্পণের ক্রোড়স্থ

প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট বস্তু সকলকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না এবং দর্পণের পৃষ্ঠের দিকেও অনুসন্ধান করিয়া যখন কিছু দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, প্রত্যুত যখন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তু সকলকে সরাইলে তাহার ক্রোড়স্থ বস্তু সকলও অদৃশ্য হয়, আর বিম্ব সকলকে স্পর্শ করিলে, প্রতিবিম্ব সকলকেও স্পর্শ করার মত দেখায়, তখন আমরা অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ বস্তুর রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে। দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে, তথাচ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না! যে সকল যুক্তিমুখে অন্যান্য বাহ্য বস্তুর রূপানুভব করি; রূপাধার বস্তুর অনুমান করি, প্রতিবিম্বের বাস্তবিকতা সম্বন্ধেও সে সকল যুক্তি না খাটে, এমন নহে। প্রতিবিম্বকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, বিম্বকে স্পর্শ করিয়া প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বকেও স্পর্শ করিতে পারি। বিম্বের রস, গন্ধ যেমন অনুভব করি, প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বের রস-গন্ধও তেমনি অনুভব করিতে পারি। বিম্ব বর্ত্তমান থাকিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি, কিন্তু বিম্ব সরাইলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায়; কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবিম্বকে অলীক অবাস্তবিক বিবেচনা করিবার কি আছে? আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাহারও রূপ ভিন্ন রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি কিছুই অনুভব করিতে পারি না, সেই রূপও নানাকারণে নানা সময় দেখিতে পাই না, তবুও তাহাদের সুদূরে বাস্তবিকতা অস্বীকার করি না, কিন্তু অত্রমধ্যে, তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার বাস্তবিকতা অস্বীকার করি।

চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। যাবতীয় পদার্থের প্রতিবিম্ব চক্ষুরূপ দুই খানি দর্পণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পতিত হয়। বিম্বনিঃসৃত যে সকল রূপ-রেখা এক চক্ষুতে পড়ে, সে সকল রূপ-রেখা অপর চক্ষুতে পড়ে না। বিম্ব হইতে অসংখ্য রূপ-রেখা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারই কতকগুলি এক চক্ষুতে এবং কতকগুলি অন্য চক্ষুতে পড়িতেছে। চক্ষুর সম্মুখে দূরাদূরাবস্থিত অনেক পদার্থ রহিয়াছে এবং সেই সকলের প্রত্যেকটী হইতেই ঐরূপ দুইটী স্বতন্ত্র আলোকধারা চক্ষুতে পড়িতেছে। সেই সকল বহুরূপিণী আলোকধারা চক্ষুতে পড়িবার পূর্ব্বে পথে পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে এবং চক্ষুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্রায়তন একটী সমতলক্ষেত্রে সংগৃহীত হইতেছে। চক্ষুমধ্যে সংগৃহীত হইতেছে, তাই কি সোজাভাবে? তাহাও নহে; বিপর্য্যস্ত ভাবে সংগৃহীত হইতেছে; এরূপ অবস্থায় উভয় চক্ষুতে, অতি ক্ষুদ্রায়তন স্থানে সমতলক্ষেত্রে, বিপর্য্যস্তভাবে, যে সকল বর্ণময় ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা হইতে বৃহদায়তন, দূরাদূরস্থ অবিপর্য্যস্ত এবং ঘনক্ষেত্রাকার বিম্বের রূপ দেখিয়া থাকি। চক্ষুতে পড়ে দুইটী প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি একটী বিম্ব! চক্ষুতে পড়ে সর্ষপায়তন প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি তালপ্রমাণ বিম্ব!! চক্ষুতে যে প্রতিবিম্বের মাথা নীচে থাকে, তাহারই বিম্বের মাথা দেখি উপরে। চক্ষুতে সকল প্রতিবিম্ব এক সমতলে থাকে, বাহিরে তাহাদিগের বিম্ব সকলকে অসমতলে দূরাদূরস্থ বলিয়া মনে করি! প্রতিবিম্ব সকল থাকে সমতলক্ষেত্রাকারে, আমরা বিম্ব সকলকে দেখি ঘনক্ষেত্রাকারে! প্রতিবিম্ব পড়ে এক বর্ণের, বিম্বকে দেখি আর এক বর্ণের! বামচক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি এক স্থানে, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি অন্য স্থানে, উভয় চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি মধ্যস্থানে! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং!

রূপের জ্ঞান কেবল দর্শনেন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় রূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। রূপ-সম্বন্ধে চক্ষু যে টুকু বলিতে পারে, তাহা তাহার বাহ্যাস্তিত্বের জ্ঞাপক নহে। চক্ষুরন্তর্গত প্রতিবিম্ব এবং বহিঃস্থ বিম্বে আকৃতি গত, অবস্থানগত, বর্ণগত, সংখ্যাগত বিভিন্নতা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বকে আমি কোন-রূপে অনুভব করিতে পারি না, অথচ সেই অননুভূত অসত্য প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত বহিঃস্থ বিম্বরূপের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি!! বস্তুতঃ রূপ-জ্ঞানটী ঐন্দ্রিয়িক, কিন্তু রূপের বাহ্যাবস্থানগত জ্ঞান সমস্তই আনুমানিক— সম্পূর্ণই কাল্পনিক। (ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হোম, জপ প্রভৃতির দ্বারা গ্রহ-শান্তির মর্ম্মোদ্ঘাটন ও মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক রহস্য।

আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া এই জ্যোতিষতত্ত্বাধ্যায় সমাপ্ত করিব। মানবের গ্রহবৈগুণ্য হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নবগ্রহ-পূজা ও হোম, জপ, সস্ত্যয়ন প্রভৃতি এবং ধাতু-দ্রব্যাদিদ্বারা গ্রহশান্তি করেন। ঐ প্রকার গ্রহশান্তির ব্যবস্থা জ্যোতিষ-শাস্ত্রমূলক বটে। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পূজা, হোম ও জপ প্রভৃতির মূলে কোন সত্য আছে কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের স্বার্থ-সম্ভূত কল্পনা হইতে ঐ হোম, জপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে? ফলিতার্থে কোন কার্য্যের মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও কালক্রমে তাহার অপভ্রংশ হইয়া যে কতকটা সেই ভাবে পরিণত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তদনুসারে কেবল জ্যোতিষ বলিয়া নহে, সমস্ত শাস্ত্র এবং মত, কালক্রমে স্বার্থাভিসন্ধি ও অমূলক বিশ্বাসে যে পরিণত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, ঐ প্রকার বিকৃতিতেও প্রকৃত সত্যের কখনই অপলাপ হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে; ঐ সত্যের সহিত সহস্র সহস্র ভণ্ডামি বা অসত্য মিশ্রিত হইলেও সত্যের কখনও ধ্বংস নাই। কষ্টিপাথরে স্বর্ণ নিশ্চয়ই কসিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "হেম্নঃ-সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধি সামিকাপিব"। এক্ষণে ধাতুধারণ ও জপ, হোম প্রভৃতির মূলে প্রকৃত সত্য কি? প্রথমতঃ ধাতু-দ্রব্য ধারণ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বাহ্যধাতু ও শরীরস্থ ধাতুর উপাদান ও শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য ঘটনায় শারীরিক শুভাশুভ যে নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত এবং মানসিকশক্তির সহিত উহার যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। হোম সম্বন্ধেও বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে না। এক এক গ্রহ শক্তির প্রকৃতি অনুসারে এক বা দুই তিনটী দ্রব্য একত্রে শত শত বার ঘৃতের সহিত প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্বর-সংযোগে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হয়; ঐ

দ্রব্যগুলি অধিকাংশ উদ্ভিদ্ ও সুগন্ধময়, উহার মধ্যে দুই একটী ধাতব দ্রব্যও আছে; আবার বেল বা যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। হোতার স্নানানন্তর শুচি ভাবে সুগন্ধ পুষ্প-চন্দনাদি সহ ভক্তির সহিত ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্য আহুতি প্রদান করিতে হয়। ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য-সংযোগে যে রাসায়ণিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সকল দ্রব্যের ঘৃত ও অগ্নিসংযোগে ধূম উত্থিত হইয়া সুগন্ধের সহিত ঐ ধূম হোতার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার শরীরে ঐ রাসায়ণিক ক্রিয়া হইতে থাকে; হোতা যে ঐ রাসায়ণিকক্রিয়া-সম্ভূত ফলভোগী হন, ইহাও নিশ্চিত। ঐ সকল বস্তুর রাসায়ণিকসংযোগে অবস্থাভেদে অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক প্রভৃতি উত্তেজক, নিবর্ত্তক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, গ্রহশক্তির আকর্ষণে শরীরের যে সকল উপাদানের অভাব ঘটে, তাহার পূরণ হয়। ঐ সকল উপাদানের সহিত যে মানসিকসম্বন্ধ আছে ও উহা যে মানসিকবৃত্তি ও শক্তিবিশেষের উত্তেজক ও নিবর্ত্তক, তাহা পূর্ব্বে যথেষ্ট বিবৃত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল উপাদান ও রাসায়ণিকক্রিয়াহেতু শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তির অবস্থাভেদে অভাব পূরণ বা অসামঞ্জস্য অপনয়ন হইয়া আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়; অতএব উহা যে গ্রহশান্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু এস্থলে ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্রতা ধারণাশক্তিমূলক, ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত ধারণাশক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। ধারণাশক্তি দৈবীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ধারণাশক্তি ও দৈবীশক্তির প্রতিকূল, মানসিকবৃত্তি ও শক্তি-সামঞ্জস্য ও তাহাদের ক্রিয়া, গুণ ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বিশদরূপে দর্শাইব, আশা করি; তবে এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঐ ধারণাশক্তি হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়। ঐ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগের ন্যূনাতিরেকানুসারে বায়ুমণ্ডলস্থ ও শরীরস্থ অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি অধিক গৃহীত বা নিঃসৃত হয়। তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তমত অভাব পূরণ বা আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। ঐ সকল কার্য্যে যজমান স্বয়ং হোতা হইলে অধিক ফলের সম্ভাবনা, কিন্তু যজমান স্বয়ং হোতা না হইলেও হোতার সহিত শুচি ও স্থিরভাবে ভক্তি, বিশ্বাস ও একাগ্রতা-সহ ঐ সকল কার্য্যকালে হোতার পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মন্ত্র শ্রবণ ও ধূম ও ঘ্রাণাদি উপভোগ আবশ্যক, তদ্ভিন্ন কিছুই উপকার হয় না; অধিকন্তু ঐ সকল কার্য্যে অধিকাংশস্থানে যজমান স্বয়ং হোতা না হইলে হোতার অপকারের সম্ভাবনা। ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা যজমানের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হোতার শারীরিক ও মানসিকশক্তির অসামঞ্জস্য হইতে পারে। বিনা জ্বরে কুইনাইন সেবন যে অত্যন্ত অপকারক, তাহার আর সন্দেহ নাই। হোতার পক্ষে উহা প্রায় বিনা জ্বরে কুইনাইন সেবন সদৃশ। তবে কিনা হোতার অধ্যাত্মশক্তির আধিক্যস্থলে আশঙ্কা নাই। যজমানের পক্ষেও অনেকস্থলে ঐরূপ ঘটিয়া উঠে। শ্লেষ্মাজ্বরে মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মাশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা আছে। অবস্থানুসারে ঔষধ ও তাহার পরিমাণ ঠিকমত ব্যবহার না হইলে, হয় কিছুই ফল হয় না, নচেৎ হিতে বিপরীত হয়। এক্ষণকার অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্গণ ফলিতজ্যোতিষের প্রকৃত তত্ত্ব প্রায়

কিছুই জানেন না। ঐ শাস্ত্রটীও তিনশতাধিক সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কালের সহিত গ্রহগণের স্থিতি-গতি-সম্বন্ধও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা গণনার পূর্ব্ব আদেশ, স্থলবিশেষে এক্ষণে দুই একটী অপ্রযোজ্যও হইতে পারে। শান্তি-সম্বন্ধে দ্রব্যাদি ও তাহার ক্রিয়াপদ্ধতিরও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ কার্য্যও অনেক সময় ঠিক্ হয় না; তদ্ভিন্ন ঋষিগণকর্ত্তৃক আদিমকালে যে সকল ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, তাহার অবস্থা এক্ষণে ঠিক্ নাই; আধুনিক জ্যোতিষব্যবসায়ীগণ স্বার্থের অনুরোধে তাহা অনেকটা রূপান্তর করিয়াছেন, ঐ রূপান্তরিত ব্যবস্থাই এক্ষণকার শাস্ত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্তমত গ্রহশান্তির মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও তাহা এক্ষণে অধিকাংশ স্থানেই প্রয়োজ্য নহে, তবে যজমানের প্রকৃতি ও ক্রিয়ানুসারে ফল হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত হোমাদির ন্যায় জপও বিজ্ঞানানুমোদিত। জপের দুইটী ফল একাগ্রতা ও চিন্তাজনিত এবং অন্তরে প্রকৃত শব্দের উচ্চারণজনিত। ঋষিগণ মানবের জৈবীশক্তির ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তির অনুকূল শব্দ উচ্চারণ দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ পরিমাপক কতকগুলি বীজ-মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা ওঁ, হ্রাং, হ্রীং, ক্লীং, ক্রুং, হুং প্রভৃতি; ঐ সকল বীজের উচ্চারণের তারতম্যানুসারে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ নির্ণয় করিয়া, কোন্ বীজের জপ দ্বারা কি পরিমাণ অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্থির করতঃ এক এক গ্রহ-শক্তির অনুকূল বা প্রতিকূল বীজ-মন্ত্র সকল অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বীজ-মন্ত্র জপ দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া ও উপাদানিক শক্তির আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্দ্বারা এই সকল প্রতিকূল গ্রহ-শক্তি নিবারিত হইতে পারে ও এক একটী বীজের সহিত এক একটী শক্তির চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ফল হয়; কিন্তু ঐ সকল শক্তি চিন্তার পূর্ব্বে সেই সকল শক্তির ধারণা আবশ্যক; প্রকৃত পক্ষে শক্তির ধারণা ও চিন্তা বা ধ্যান কি উপায় দ্বারা আয়ত্তাধীন করা যায়, তাহার উপদেশ অতি বিরল; তবে ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত জপে পূর্ব্বোক্ত মতে কথঞ্চিৎ ফল হইতে পারে; কিন্তু ঐ জপ দ্বারা যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অনেক স্থলে জপকারী তাহা সহ্য করিতে না পারায়, বিপরীত ফল হয়। কোন ব্যক্তির শরীরের অতি দৌর্ব্বল্য-অবস্থায় উহার বলাধানের নিমিত্ত অধিক উত্তেজক ঔষধি সেবন বা অধিক বলকারী খাদ্য পথ্য দিলে নিশ্চয়ই রোগীর অপকার হয়। চিরকাল "বেচারা কৃষ্ণের জীবের" ন্যায় অর্দ্ধ পোয়া চাউলের অন্ন ও ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল যে ব্যবহার করে, তাহাকে হঠাৎ বলাধান করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন 'পোলাও কালিয়া' ভক্ষণ করিতে দিলে, নিশ্চয়ই তাহার উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হইয়া শীঘ্রই তাহার মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবেক। সেইরূপ পুরুষানুক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তি পরিচালনাভাবে ঐ শক্তিহীন অনভ্যাসী ব্যক্তি হঠাৎ মনোবৃত্তি দমন করিয়া (মনের বেগ বশতঃ) নিবৃত্তি-শিক্ষার নিমিত্ত উত্তেজক খাদ্যাদিপরিত্যাগ করিয়া কঠোর জপে মন নিবেশ করিলে, জীব শক্তি অভাবে নিশ্চয়ই মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও শারীরিক মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রকৃতিতে হইবে, সন্দেহ নাই। (আমরা যোগ-তত্ত্ব বর্ণন কালে কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি ব্যতীত ধ্যান-যোগ-সাধনা যে অসম্ভব, বুঝিয়, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি)। এক্ষণে অধিক বাহাড়ম্বর

বশ্যকতা নাই; তবে মন্ত্র-শক্তি যে বিজ্ঞানানু-দিত, তাহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হল। যাহা হউক, আমাদের প্রস্তাবিত গ্রহ-শক্তি সম্বন্ধে উত্থিত প্রশ্নের যথাসম্ভব মীমাংসা হওয়ায়, আমরা জ্যোতিষ-তত্ত্ব এই স্থানে সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তন্ত্রশাস্ত্র।

আজকাল নব্যশিক্ষিত অনেকেই তন্ত্র-শাস্ত্রকে গুরু-ব্যবসায়ীদিগের কৃত অর্থ-উপা-র্জনের উপায় জন্য কল্পিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করেন না। ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে কালক্রমে তদ্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জন্য য মূলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি-যোগে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয় আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিলে, অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বহুপর তন্ত্র-শাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ দর্শনে স্রষ্টা—অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রতিপাদন ও তাহার উপা-সনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে হিন্দু জাতির বুদ্ধির প্রখরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল, তখন পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রসর হইয়া বুদ্ধির সাহায্যে কালক্রমে দর্শন ও উপনিষৎ, এবং তন্ত্রশাস্ত্র সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, উহা বেদেরই রূপান্তর—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদের সার। উহাতে মুক্তির সহজ উপায় নির্দ্ধারিত ও বিচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাক্‌সর্ব্ব-স্বতা ও ক্রিয়াশূন্যতা-দোষে ভারতসমাজে তন্ত্রশাস্ত্রের যেরূপ ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হই-য়াছে, তাহাতে তন্ত্রের নাম শুনিলেও অনেকে উপহাস করিবেন, বিচিত্র কি? ফলতঃ যেরূপ বহুচ্ছভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভিনী কল্পিত ব্যবস্থা তন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে অল্পজ্ঞগণের উপহাসকরাও নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। মুসলমান-রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না; ঐ সময়েই তন্ত্রশাস্ত্রেরও দুর্দ্দশা উপস্থিত হই-য়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে হিন্দুসমাজে সদ্‌গুরুর বিরলতাবশতঃ শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র অনেক স্থলে এরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ি-য়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করা অল্পাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব। বেদ ও সদা-চার-বিরুদ্ধ কত তন্ত্রগ্রন্থ নূতন রচিতও হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য সাধারণ লোক ভ্রমে পড়িলেও তন্ত্র-তত্ত্বজ্ঞের তাহা চিনিতে বাকী থাকে না। আধু-নিক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, প্রবৃত্তিমার্গে মন একবার ধাবিত হইলে, তাহা হইতে সহসা নিবৃত্তিমার্গে মনকে ফিরান সুকঠিন। হঠাৎ কোনমতে নিবৃত্তি সাধন করিলেও সে অপরিপক্ক সিদ্ধি স্থির থাকে না; তজ্জন্য সুকৌশলে সকাম তার মধ্য দিয়াই সৎপথে মন ধাবিত করার উপায় জন্য নানারূপ আপাত-বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের এরূপ ব্যাখ্যাও প্রায় মূল-হীন বোধ হয়। সত্ব, রজঃ, তমো, ত্রিগুণভেদে উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যব স্থিত; সুতরাং মহাযোগ-লীলাবতার মহাদেব প্রণীত মূল তন্ত্রশাস্ত্রও অবশ্য সে তত্ত্ব ছাড়া নহে

শুধু শাস্ত্র-পণ্ডিত তাহা না বুঝুন, সাধন-পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকে না; না বুঝিয়া তজ্জন্য যে শাস্ত্র-নিন্দা, তাহা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। তবে কিনা আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের অনেক স্থলেই মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত বা অকিঞ্চিৎকর বিধি-বিধান ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়; আবার অবিকৃত প্রকৃত শিব-বাক্য-তন্ত্রেও হয়ত আপাত-দৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্ম্ম-রহস্য-মূঢ়, 'রুচি'-রোগগ্রস্ত স্থূলনীতি-সর্ব্বস্ব অনেক স্থূলাধিকারীর মতে মহাদেব ও পার্ব্বতীর নামেও তাহার কিছু মাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই! ফল কথা, সকল-সাধন-ক্রিয়ান্বিত সদ্‌গুরুর কৃপানুকূল্যের অভাবে অনেকেই আজকাল তন্ত্র-মথিত নবনীত না চিনিয়া কেবল ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন!

শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ।
কবালভৈরবঞ্চাপি যামলঞ্চাপি সংকৃতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি বৈ॥
কূর্ম্মপুরাণ।

লোক সকলকে মোহাভিভূত করার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র মহাদেবের বলিবার কি কারণ ছিল? তান্ত্রিক রহস্যের মর্ম্মগ্রন্থি এই স্থানেই ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু বক্ষ্যমান প্রবন্ধে, ইহার বিস্তার-বিবৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে; মাত্র তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি আলোচনাদ্বারা ইহার প্রয়োজন প্রতিপাদন করাই আমাদের লক্ষ্য। এ দুর্দ্দিনে দেবদেবই তাঁহার অপার কৃপার যন্ত্র তন্ত্রকে বিকৃতি-বিপ্লব হইতে রক্ষা করুন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র-মধ্যে বেদ-বিরুদ্ধ ব্যবহার অতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্।
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং।"

তন্ত্রশাস্ত্র সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সাংখ্য এবং উপনিষদের উপর স্থাপিত। হিন্দুসমাজে কাল-ধর্ম্মে পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রের সাত্ত্বিক সাধন তিরোহিত হইয়া কেবল রাজসিক ও তামসিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই প্রায়শঃ প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাই অধিকার-তত্ত্ববোধাভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের অনাদরের কারণ। বস্তুতঃ তন্ত্রকে যোগধর্ম্মের কল্পভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে মানসিক ও বাহ্য পূজা এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেদ যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড, দুই ভাগে বিভক্ত, যোগশাস্ত্রও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপই ইহার কর্ম্মকাণ্ড। তন্ত্রের উপাসনার প্রণালী অতি পবিত্র; ইহাতে প্রাণায়াম এবং সাধন-পদ্ধ অতি উৎকৃষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোগ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা প্রণালীর উদ্ভব এক উপকরণ হইতেই হইয়াছে; ঐ সকল বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে অনেক দেবদেবীর উল্লেখ থাকা অনেকে অর্থ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি নামের দেবদেবীর কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, শব্দান্তরে প্রকৃতপক্ষে অর্থান্তর ঘটে নাই। তন্ত্র-প্রতিপাদ্য সাধনার অন্যতম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিল কৃত সাংখ্য। একথা সত্য যে, মহাত্মা কপিল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মূর্ত্তি-উপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করেন নাই; কিন্তু সাংখ্যে যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তন্ত্রেও

তন্ত্রশাস্ত্রে দেবদেবীর উপাসনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কপিল মুনির পুরুষই পরিশেষে হিন্দু উপাসনাতে নানারূপে বিকাশিত হইয়া রুচি ও অধিকার অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্য হইতেছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব,—তিনিই কালীদেবী।

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥

চণ্ডী—দেব্যাদূত সম্বাদ, ৮৮ শ্লোক।

"প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখাদিশূন্য; ইনি অকর্ত্তা, কোন কার্য্যই করেন না, সমুদায় বিশ্বব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক সমীপস্থ হইলে সেই দিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সন্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।" প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত; তজ্জন্য পুরুষই দেবীর ক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীদেবীর মূর্ত্তি মহাদেবের উপর স্থাপিত।

মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্যের সহিত তন্ত্র এবং উপনিষদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উপরোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিষয় চিন্তা করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই সাংখ্যশাস্ত্র কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয় অতি সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা সঙ্গত। কপিলই যে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কপিল কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কপিলকে ব্রহ্মার পুত্র, কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার, কেহ বা তাঁহাকে কর্দ্দমের পুত্র, কেহ বা হিংসা এবং ধর্ম্মের পুত্র, কেহ বা ছদ্মবেশধারী অগ্নি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতি প্রাচীন সময়াবধি কপিলের মত বিশেষ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়ও কপিলের সবিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।"

কপিল যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা পুরাণাদি রচনার দীর্ঘকাল পর কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, কপিল ঈশ্বর-উপাসনার সম্বন্ধে স্থূল প্রণালীবদ্ধভাবে কিছুই বলেন নাই। তিনি সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিবরণ নিম্নোদ্ধৃত ভীষ্মবাক্যে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কপিলকৃত সাংখ্যকে সাধারণতঃ "নিরীশ্বরসাংখ্য" এবং পাতঞ্জলমুনিকৃত যোগশাস্ত্রকে "সেশ্বরসাংখ্য" বলিয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নানুসারে মহাত্মা ভীষ্ম কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

"ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যের ও যোগীগণ যোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই বলিয়া আপনাদের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে (বাহ্যপূজার পন্থায়) ভক্তি করিবার প্রয়োজন (সবলাধিকারীর) নাই। যিনি সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হন। * * * * এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত।"

শান্তিপর্ব্ব, ৩০৩ অধ্যায়।

মহাত্মা কপিলই প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব প্রকা

এবং যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত স্থাপন করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব, এ কথা বেদবিরোধী কি না। কপিলদেব শ্রুতির অবিরোধিনী বিবিধ উপপত্তির উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতির তত্ত্ব বেদেও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিতেও প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে; সুতরাং কপিল যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব-বিচার করিয়াছেন, তাহার মূল বেদ। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কপিল বর্ত্তমান সময়ের উপাসনার প্রণালীর ন্যায় ক্রিয়াযোগানুবন্ধীভাবে কিছুই বলেন নাই। কালক্রমে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সিদ্ধর্ষিগণকর্ত্তৃক সাধকগণের অধিকার-সম্মত সাকারমূর্ত্তি-উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কপিলকৃত সাংখ্যও যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাঁহাকে সমুদায় পুরাণকর্ত্তারা 'যোগধর্ম্মবিৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"অন্যনামতবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্ম্মবিৎ।"

ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৭ অঃ।

সত্যযুগেই কপিলকৃত সাংখ্যবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাহা কতক উপনিষদের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। উপনিষদেও কপিলের নাম-উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি।"

ইত্যাদি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫ অঃ, ২ শ্লোক।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও জানা যায় যে, সত্যযুগে সাংখ্যবিজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়)।

কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে সর্ব্বাধিকারী-নির্ব্বিশেষে বুঝাইবার জন্যই পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের সাকাররূপ পুরাণে ও তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ হইতে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনা ও অন্যান্য বৈদিককর্ম্মের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ সাংখ্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যোগের সর্ব্বসম্পদসম্পন্ন অতি বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র। কপিল ও পতঞ্জলিমুনি যোগানুষ্ঠানের ভাবতত্ত্ব যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহারই কর্ম্মজ্ঞানানুষ্ঠানপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্র। উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তন্ত্রেও প্রায় তদ্রূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বীজমন্ত্র এবং যন্ত্র উপনিষৎ ও তন্ত্র, উভয় শাস্ত্রেই আছে; সুতরাং তন্ত্র যে কোন আধুনিক কল্পিত শাস্ত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্ত্তনে মনুষ্যের চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যে রুচির ও অধিকারেরও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং মুনি-ঋষিগণও সময়ে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য। কোন সময়ে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা আরম্ভ হইলে, পারত্রিক সুখ অপেক্ষা ইহসংসারের সুখ অধিক প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল, তখন ক্রমেই বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কার্য্যসকল শিথিল হইতে লাগিল; তৎকালে সহজ উপায়ে ঈশ্বর-আরাধনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর অনুরাগ হইল। যিনি বেদ ও তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম অবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতের আপাত-পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদের প্রাণায়াম সংক্ষিপ্ত এবং সুসাধ্য।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ ২৭॥"

"তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্" ॥ ২৮॥

পাতঞ্জলদর্শন, যোগপাদঃ। ৮ম অধ্যায়।

অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে, ক্লীং শব্দে "শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে গোপীজনবল্লভায় নমঃ" প্রতিপাদন করে; ফলে সাধারণতঃ ওঁম্ শব্দে সগুণ ব্রহ্মের সর্ব্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণব-চিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি —অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একেবারে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে; এইজন্য তন্ত্রে অধিকারীভেদে দেব ও দেবীর এক একটী মূর্ত্তি চিন্তার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ওঁম্ শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘ প্রণব ও অন্যান্য বীজ প্রভৃতি) অতি সহজেই উচ্চারিত হয়। সর্ব্বসাধারণের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত লোকেও সহজে (স্বাধিকার-প্রয়োজনানুরূপ) সেবা করিতে পারে। অধিকারী-ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক্ পৃথক্রূপে হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধু প্রভৃতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা হয় নাই,—তাহাদিগের জন্যও তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাঁহারাও কালক্রমে বেদ-পথ-অতিক্রান্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক আদর হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিণাম,—অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আদি কারণের নামই কপিল ঋষি 'প্রকৃতি' রাখিয়াছেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব যে বেদ-মূলক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগাবধি প্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী, তাহাতেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং" ॥৬৪॥

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, (জগতের আদিকারণ) এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহাহইতেই এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। ৬৪ ॥

(মধুকৈটভ বধ, চণ্ডী।)

"নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃস্মতাং ॥

তুমি প্রকৃতি মূল কারণ, ভদ্রকারিণীও তুমি। ইত্যাদি।

ত্রেতাযুগে রাম-সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে; সেই উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় মহাত্মা বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রাম-সীতাও উপনিষদে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

"শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী ॥
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাং ॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎপ্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ" ॥ ৪ ॥

(রামতাপনী, উত্তরভাগ।)

শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূলপ্রকৃতিরূপে জানিবে, যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবত-প্রণেতা তাহা রাসলীলায় অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"ভগবানপিতারাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ॥ ১ ॥

সেই শারদোৎফুল্লমল্লিকা-শোভিত রাত্রি

দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ ক্রীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিস্সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে" ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত গীতাবাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রসব করিয়াছেন জানা যায়। সেই প্রকৃতিদেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা উপনিষদ্ এবং পুরাণাদির অনুমোদিত। তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল প্রকৃতিদেবীর উপাসক, তাহারাও তন্ত্রোক্ত উপাসনার ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত। যেরূপ ভগবান্ গীতাতে যোগশাস্ত্রকে কর্ম্মের কৌশল বলিয়াছেন, যথা—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"

তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও অতি সুকৌশলে দেবদেবীর উপাসনা-প্রণালী যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কপিলমুনির প্রকৃতি-পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-উপাসনায় নানারূপে বিকাশিত হইয়া, মনুষ্যের অধিকার-ভেদ-অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্য হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী অধিকাংশ লোকেই শিবপূজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিবপূজার গূঢ় রহস্য সহজে বোধগম্য নয় বলিয়াই ঐরূপ নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; প্রকৃতার্থে সৃষ্টি-রহস্য-প্রকাশই শিবপূজার মূল। প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ-স্থাপনই শিবমূর্ত্তি, তাহাই মহাত্মা কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

মহাত্মা অমর সিংহ তাঁহার কৃত অভিধানে তন্ত্রকে কোনও শাস্ত্র মধ্যে উল্লেখ করেন নাই।

"তন্ত্রে প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে।"

(অমরকোষ)

এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইহা বেদ-বেদান্তেরই রূপান্তর স্বরূপ; সাংখ্যের সারোদ্ধার ও তৎক্রিয়াগত সাধন-বিস্তার-শাস্ত্র। ইহাতে ঠিক কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনার সারভাগ অথবা সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রকে সিদ্ধান্তও বলা যাইতে পারে। সর্ব্বাধিকারী-সেবিত মহাপ্রামাণ্য মহাভারতেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহর্ষিরা ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাসসকল তপঃপ্রভাবে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভূ বেদ, বৃহস্পতি বেদাঙ্গ, শুক্রাচার্য্য জগৎ-হিতকর নীতি ও তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।"

[শান্তিপর্ব্ব, ২১০ অধ্যায়]

(প্রতাপচন্দ্র রায়।)

মহাভারতের দীর্ঘকাল পর অমরকোষ অভিধান যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অমরকোষ-মধ্যে তন্ত্র 'শাস্ত্ররূপ' লিখিত না হওয়া বিবেচনা হইলেও তাহা অমরসিংহের ভ্রম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। তন্ত্র শব্দের অর্থ 'শ্রুতি-শাখা-বিশেষ' বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ অতি প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ সুকৌশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি

কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ-ভাবের আবির্ভাব হয়; সে পবিত্র আনন্দ অন্যকে বুঝাইবার উপায় নাই। যিনি সেই সাত্ত্বিকানন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকেই ঐ সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায়, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যের অভিপ্রায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

নিগম বেদ, আগম তন্ত্র। "কলাবাগমসম্মতা" কলিকালে আগম-সম্মতা উপাসনাই ফলপ্রদা; কারণ ইহাতে কলির দুর্ব্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত সুকর সাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট; সুতরাং তন্ত্রই কলির বেদ। "আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ"। তন্ত্রের প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি অতিক্রম করিয়া, গুরূপদেশানুসারে প্রকৃত সাধনপরায়ণ হইতে পারিলেই এই কলিকালে সিদ্ধি বা কৃতার্থতা সুলভ হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈশ্য।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কি লইয়া? আহার-বিহারাদিক্রিয়া ইতর প্রাণীরাও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীরা তাহাদিগের "আমিত্বের প্রসার" করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা বিধির নির্ব্বন্ধানুসারে পূর্ব্বকর্ম্মহেতু ভোগদেহ ধারণ করে মাত্র, স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই; সুতরাং তাহারা তাহাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মনুষ্যদেহ কেবল ভোগদেহ নহে, উহা কর্ম্মদেহও বটে। মনুষ্য ইহ-জীবনে যেমন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তদ্রূপ স্বাধীনেচ্ছাজনিত কার্য্যদ্বারা জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধন করিতে পারে। মানব স্বীয় কার্য্যদ্বারা যে আপনাকে পশু বা দেবরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনায়াসে স্বীয় স্বীয় জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। স্বাধীন কার্য্য করিবার শক্তি থাকাতেই মনুষ্য মনুষ্য। স্বাধীনকার্য্য যদি আত্ম-বিকাশের প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ক্রমে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে, সে সময় মানব আর মানব থাকিতে পারে না, ইতর প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সে সময় আর স্বাধীনকার্য্য করিবার শক্তিই থাকে না। আত্মবিকাশ, আত্ম-প্রসার বা "আমিত্বের প্রসার" বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করা যায়, কিন্তু এই বহুবিধ উপায়সমূহের সকলের মূলেই একটি বস্তু চাই। তুমি যে কার্য্যই কর, তাহার ফল কেবল "আমিতে" সঙ্কীর্ণ না করিয়া উহা যদি "আমি" ভিন্ন "আমি"সমূহে প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, তাহাহইলে "আমি"তে "আমি"তে যে ভেদজ্ঞান, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে; সর্ব্বত্রই মেঘ-মুক্ত-দিবাকরসদৃশ উপাধি-

বর্জ্জিত নির্ম্মল "আমি" পরিদৃশ্যমান হইবে! "আমিত্বের" সম্পূর্ণ প্রসার হইলেই জীব মুক্তা-বস্থা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ আমিত্বের প্রসারই প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃক্ষের নিম্নপ্রদেশ অবলম্বন না করিলে যেরূপ উহার শিরঃপ্রদেশে যাওয়া যায় না, তদ্রূপ যে কার্য্যের পর যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে "আমিত্বের প্রসার" হইতে পারে না। বালক যেরূপ যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থা অতিক্রম না করিয়া বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইতে পারে না, তদ্রূপ শূদ্র-গুণধারী কোন ব্যক্তিই একে-বারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বরূপ পান্থশালা অলক্ষ্যে অতিক্রম করিয়া শূদ্র কখনও গন্তব্য ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে গমন করিতে পারে না। অবনতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন বহুল হইলেও, উন্নতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন অতি বিরল। কার্য্যতঃ পণ্ডিত সহসা মূর্খ হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ সহসা শূদ্র হইতে পারেন, কিন্তু মূর্খ সহসা পণ্ডিত হইতে পারে না, শূদ্রও সহসা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণত্বই গন্তব্যস্থান, কিন্তু শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে যাইতে হইলে বৈশ্যত্ব-প্রদেশ দিয়া যাওয়া চাই।

আমি সামাজিক শূদ্রের কথা বলিতেছি না; শাস্ত্রোক্ত শূদ্রের অবস্থা কি?

শাস্ত্র বলেন :—

"সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥"

যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকা-নির্ব্বাহার্থে ব্যবসায়ের বিচার নাই, যাহার দেহ ও মন অশুচি, যে বেদ পরিত্যাগ করি-য়াছে এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই শূদ্র।

এইক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখুন যে, মনুষ্য যখন পূর্ব্বোক্ত দশাপন্ন হয়, তখন তাহার অবস্থা কতদূর নিকৃষ্ট। যথেচ্ছ আহার-বিহার, যথেচ্ছ কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ যে ব্যক্তি করে, তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে উন্নতি-পথে অগ্রসর করাইতে হইলে তাহাদিগকে উত্তম সংসর্গে রাখার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহের নিকটে যদি কোন চর্ম্মকার বাস করে, তাহাহইলে সে ইতর চর্ম্মকারদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে শিক্ষাবিধান-দ্বারা ভাল করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর-দিগকে পুস্তকাদি পড়াইয়া শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় পাশ্চাত্য জাতিরা অধিকাংশস্থলে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঠকের ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পুস্তকাদির অধ্যাপনাই যে লোককে সুশিক্ষিত করার একমাত্র উপায়, তাহা নহে। পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে পুস্ত-কাদি অধ্যয়নদ্বারা যত না শিখিতেন, গুরুগৃহে বাস করিয়া, গুরুর সংসর্গে থাকিয়া, তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করিতেন। গুরুসেবাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। মহাত্মাদিগের সংসর্গে মাত্র থাকিলেই অনেকস্থলে জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জন্যই শূদ্রের পক্ষে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। "সেবা স্বামিত্ব-ময়য়া"। শূদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের উন্নত জীবনের আদর্শ স্বীয় জীবনে অধিকার করিতে শিক্ষা করে। উন্নতির ক্রম ধরিলে, বৈশ্যত্বই শূদ্রত্বের অব্যবহিত উচ্চপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই জগতে সাধারণ মানব কোন্ শক্তি-দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে? এমন কোন্

কেন্দ্র আছে, যাহার চতুর্দ্দিগে মানব ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে? ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সেই কেন্দ্র। পশ্বাদির কার্য্যেরও প্রেরণা-শক্তি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির একটি সীমা আছে, ঐ সীমা তাহারা কখনও অতিক্রম করিতে পারেনা বা করিতে তাহাদের ইচ্ছাও হয় না। মানবের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করিবার ইচ্ছা সীমাবদ্ধ নহে। মানবের বাসনার সীমা নাই। যাহাদের হৃদয়ে বাসনা বলবতী, তাহাদের বাসনা-পরিতৃপ্তির উৎকৃষ্ট উপায় দেখাইয়াই তাহাদিগকে উন্নতিপথে লইয়া যাইতে হয়। যে অসভ্য সম্প্রদায় অনিশ্চিত মৃগয়ার উপর জীবিকা ন্যস্ত করে, তাহাদিগকে পশুপালনের উপায় শিক্ষা দিলে, তাহারা কষ্টসাধ্য মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার এক স্তর উচ্চে উন্নীত হইবে, সন্দেহ নাই। যে অসভ্য জাতি স্বভাবজাত বনফল-মূলাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলে, উহা তাহারা যে সাদরে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ মানব অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা নিশ্চিত উপায়েরই চিরকাল পক্ষপাতী হইয়া থাকে। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক বা বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক স্বীয় আয়ত্তাধীন রাখা যত সুবিধাজনক, প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন স্ত্রীলোক সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক নহে—পরন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। পশ্বাদির ন্যায় অসভ্যজাতিরাও আহার্য্য দ্রব্য এবং স্ত্রী লইয়া সর্ব্বদাই আপনাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ করিয়া থাকে। পশুপালন-ব্যবস্থাদ্বারা মৃগয়ার যে বিবাদ, কৃষিকার্য্যদ্বারা বনফল-মূলাদি লইয়া যে বিবাদ এবং বিবাহ-নিয়মদ্বারা স্ত্রীলোক লইয়া যে বিবাদ, তাহার আশঙ্কা তিরোহিত হয়। মানব ক্রমশঃ স্বীয়াধিকৃত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কায় পরাধিকৃত বস্তুর প্রতি লোভ পরিত্যাগ করে। মানব-হৃদয়ের বাসনা অসীম থাকায়, অসভ্য মানবও ক্রমশঃ আত্মসুখকর বহুবিধ নূতন নূতন খাদ্য, নূতন নূতন পরিধেয়, নূতন নূতন গৃহ উদ্ভাবন করিতে প্রযত্নবান হয় এবং তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্যাদির বিস্তার হইতে থাকে। ধনই আত্মসুখকর বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এই জন্য, অসভ্য শূদ্রকে বৈশ্যত্বে পরিণত করিলেই ধনের লোভ দেখাইতে হয়। ধনদ্বারা স্ত্রী, ভৃত্য, গো, অশ্ব, যান, গৃহ, উদ্যান, অলঙ্কার প্রভৃতি সকলই সুলভ। মৃগয়োপজীবী স্বচ্ছন্দবিহারী অলস শূদ্র ধনের পক্ষপাতী হইল। তমোশক্তি-সুলভ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যাদিদ্বারা ধন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার রজোশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শূদ্র বৈশ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি দ্বারা কেবল ধনোপার্জ্জন করিলেই বৈশ্য হওয়া যায় না। যথার্থ বৈশ্যত্বলাভ করিতে হইলে যেমন ধনোপার্জ্জন চাই, তেমনই ধনব্যয় চাই। সভ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আছে। স্বদারে রমণাধিকারের সঙ্গে পুত্র-কন্যার প্রতিপালন-দায়িত্ব রহিয়াছে। ভৃত্যের সেবালাভে যে অধিকার, তাহার সহিত ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রহিয়াছে; তাহার পীড়াদি হইলে, চিকিৎসাদিদ্বারা স্বাস্থ্যবিধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। পুত্রাদিদ্বারা বিনা তর্কে আদেশ-প্রতিপালনাধিকারের সহিত পুত্রাদির সর্ব্ববিষয়ক মঙ্গলসংসাধন-দায়িত্ব রহিয়াছে। রাজার করগ্রহণাধিকারের সহিত পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের দায়িত্ব রহিয়াছে। দায়িত্বপরিশূন্য অধিকার অসভ্য-সমাজের পরিচায়ক। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দায়িত্ব-

বাধ না থাকিলে অধিকার পরিচালন করা যায় না। প্রজারা যদি দেখে যে রাজা কেবলই করগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই করদ্বারা তাহাদের হিতকল্পে কোন কার্য্য করেন না, কেবলই আত্ম-সুখে নিরত থাকেন, তাহাহইলে তাহারা রাজ-বিদ্রোহী হইয়া রাজার রাজত্বাধিকার ধ্বংস করে। পুত্রেরা যদি দেখে যে পিতা তাহাদের মঙ্গলকামনা করেন না, তাহাহইলে তাহারা পিতার অধিকার পরিচালনে বাধা দেয়। ভগবানের রাজ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এতই পরস্পর সংসৃষ্ট যে, পরার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়! যথার্থ স্বার্থ পরার্থ-পোষিত। পরার্থব্যতীত যে স্বার্থ, তাহা স্বার্থ নহে,—সে অনর্থমাত্র। কোনও ব্যক্তি কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া জগতে জীবিত থাকিতে পারে না, অন্যের আশ্রয় তাহার গ্রহণ করিতেই হইবে। এই জগতে একাকী কে জীবিত থাকিতে পারে? স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে পরার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেই হইবে, কারণ পরার্থও স্বার্থ। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, 'পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, পতি প্রভৃতিকে যে মানুষ ভালবাসে, তাহার কারণ সর্ব্বত্রই আত্মা বিরাজিত।' এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে যে কেবল পারত্রিক মঙ্গল, তাহা নহে, ঐহিক মঙ্গলও হয়। ঐহিক মঙ্গল ও পারত্রিক মঙ্গলে যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। সত্য কথন, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতির দ্বারা যেরূপ ঐহিক মঙ্গল হয়, তদ্রূপ পারত্রিক মঙ্গলও হয়—বিরোধমাত্র নাই।

ধর্ম্মোপায়ে ধনোপার্জ্জন দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধনই বৈশ্যধর্ম্ম। মানব স্বীয় স্বীয় অধিকারানুযায়ী উপায় দ্বারাই আমিত্বের প্রসার সাধন করিবে। তুমি যদি অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া থাক, তুমি যদি বিষয়-বাসনা নির্ম্মূল না করিতে পারিয়া থাক, তুমি যদি ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রতাদি অবলম্বন না করিতে পার, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু কর্পূর-বিন্দু দ্বারা যেমন পানীয় জল সুবাসিত কর, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ পরোপকার-বৃত্তি দ্বারা তোমার জাগতিক সুখ স্বর্গ-সুখে পরিণত কর। ধন উপার্জ্জন কর, স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদিকে প্রতিপালন কর, নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, কিন্তু তোমার হতভাগ্য দরিদ্র ভ্রাতাদিগকেও বিস্মৃত হইও না; তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিও, তাহা হইলে তুমি বৈশ্য হইতে পারিবে। সমাজে ধনোপার্জ্জন এবং ঐ ধন দ্বারা জগতের হিত করাই বৈশ্যের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবেন, ক্ষত্রিয় সুশাসনে রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিবেন, বৈশ্য ধন সংগ্রহ করিবেন। ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে উভয়েতেই রজোশক্তি আছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রজোশক্তি দ্বারা প্রজারক্ষণ, রাজ্যে শান্তি ও সর্ব্ববিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; বৈশ্য তাহার নিম্নশ্রেণীর রজোশক্তি দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন। যেমন চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই অন্যান্য আশ্রমের অন্নদাতা, তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে বৈশ্যই অন্যান্য বর্ণের অন্নদাতা বা পোষক।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণের হস্ত স্বরূপ। ব্রাহ্মণের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি এবং বৈশ্যের ধন-শক্তিই জগতের হিতে নিয়োজিত হইত। ব্রাহ্মণেরা যে নিশ্চিন্তভাবে শাস্ত্রাধ্যায়ন এবং জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন, সে যে কেবল ক্ষত্রিয়ের সুশাসনের জন্য, তাহা নহে,

বশ্যের ধনের জন্যও বটে। ধনোপার্জ্জন করিয়া, ধনের সদ্ব্যয়ের দ্বারাও আমিত্বের প্রসার হয়। আত্মপর-ভেদ কমাইতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার হয় এবং যে উপায় দ্বারাই করনা কেন, তাহাতেই ফল হয়। তুমি যদি নিজে জ্ঞানী হও, জগতে জ্ঞান বিস্তার কর; যদি নিজে জ্ঞানী না হও, যদি ধনী হও, ধনের দ্বারাই জগতের উপকার কর। বহুস্থলে ধনের দ্বারা যে উপকার করা যায়, জ্ঞানের দ্বারা তাহা করা যায় না। দুর্ভিক্ষের সময় যখন চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, দেশে ধন না থাকিলে জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা কি করিতে পারেন? ধনের দ্বারাই অনাথশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, দেবমন্দিরাদি সংস্থাপিত হয়। মানব-সমাজে ধন না থাকিলে, মানব-সমাজ পশু-সমাজের সমান হইত। সমাজে ধনই আমিত্বের প্রসার লাভ করিবার প্রথম সোপান।

কিন্তু ধনের সদ্ব্যবহারের জন্য জ্ঞানেরও আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে ধনের সদ্ব্যবহার করা যায় না। এই জন্য ধনোপার্জ্জনের সহিত বৈশ্যের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নও আবশ্যক।

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈ বৈশ্য ইতি স্মৃতঃ॥"

হে মানব! যদি তুমি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্য হও, যদি বৈশ্য হইতে চাও, তাহাহইলে ন্যায্যোপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া উহা জগতের মঙ্গলে নিয়োজিত কর।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

হিন্দু-আচার।

(প্রথমবিধি)

যাহা (চিরকাল অবিচলিতভাবে) থাকে, তাহা সত্য; যাহা (লোককে সম্যক্‌রূপে) রাখে, তাহা ধর্ম্ম।

সদাচারকে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ সদাচারের অনুবর্ত্তী হইলে, সম্যক্‌রূপে জীবনধারণ করা যায় এবং সদাচার-বর্জ্জনে অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। * বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র। হিন্দু-আচার বহুদর্শনের ফলোদ্ভূত বিধি, সুতরাং বহুদর্শন বা বিজ্ঞানসম্মত। একথা হিন্দু-পত্রিকার ৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। হার্বার্ট স্পেন্সার বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন। (First Principles 5th Edition, page 107)

জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ এইরূপ বিধি-নিবদ্ধ আছে। কিন্তু গূঢ়মর্ম্ম না জানায়, অনেকে তৎপ্রতি আস্থা-শূন্য। শিক্ষিত লোকে উহাদিগের অন্তর্নিহিত সত্য জানিলে সদাচারে অনুরাগবান্ হইতে পারেন।

মানব মাতৃগর্ভ-অজ্ঞাতবাস হইতে এই জাগ্রত জগতে—কর্ম্মভূমিতে উদিত হওয়া মাত্রই

* অনভ্যাসেন শাস্ত্রাণামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি (মনু)
শাস্ত্রের অনভ্যাস, সদাচারত্যাগ, আলস্য ও খাদ্য-দোষেই মৃত্যু বিপ্রগণকে হনন করে। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতই শাস্ত্রের এই সব অপার করুণা-প্রসূত তত্ত্বোক্তিগুলিতে আমাদের শোচনীয় ঔদাসীন্য। "অনভ্যাসেন শাস্ত্রাণাম্" এইখানেই ত প্রকাশিত।

আর্য্য-শাস্ত্রের নিকট ঋণী হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রথম বিধি এই,—

"প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্মবিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্ ॥"

(মনু ২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।)

বালক জন্মিবামাত্র, নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার (গৃহ্যসূত্রোক্ত) 'জাতকর্ম্ম' নামক সংস্কার করিবে এবং তৎকালে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে স্বুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবে। সদ্যজাত বালককে স্বুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবার বিধি আজকাল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

সংস্কার ও মন্ত্রাদি অজ্ঞ লোকের দ্বারায় সম্পাদনে অর্থবিহীন বাক্যোচ্চারণ মাত্রে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-জাত দ্রব্যের গুণ অপরিবর্ত্তনীয়। ভেষজাদি যথাযথ দেশ-কাল-পাত্রে প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফল রাসায়নিক ক্রিয়ার ন্যায় অবশ্যম্ভাবী।

স্বুবর্ণকে ঔষধস্বরূপ এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ব্যবহার করেন না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উহার (Aurnm metallicum) গুণ বিদিত আছেন। আয়ুর্ব্বেদে স্বর্ণের বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। স্নায়ু ও অস্থি মজ্জাদির রোগে নানাবিধ জটিল ও পুরাতন রোগে, ক্ষয় ও উন্মাদরোগে, শিশুদিগের উৎকাশিতে; তালু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির রোগে, প্রবল ক্রন্দনেচ্ছা বা মৃত্যুকামনা প্রভৃতি চিত্তবিকারে ঔষধরূপে স্বর্ণের বহুপ্রয়োগ জানা যায়। স্বর্ণ-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"স্বুবর্ণং তিক্তমধুরং কষায়ং গুরুলেখনম্।
হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি ॥
আয়ুর্মেধাবয়ঃস্থৈর্য্যবাগ্‌বিশুদ্ধি-দ্যুতিপ্রদং।
ক্ষয়োন্মাদগদার্ত্তানাং শমনং পরমুচ্যতে ॥"

(রাজবল্লভঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় বহুগ্রন্থে স্বর্ণের এইরূপ বহুগুণ বর্ণিত আছে।

মধু। বলবীর্য্যবৃদ্ধিকর, জীবিত্বকর, প্রীতিজনক, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, ত্রিদোষনাশক ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"মধু তু মধুরং কষায়ানুরসং রুক্ষং সীতমগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘুলেখনং বাজীকরণং সংগ্রাহী চক্ষুঃপ্রসাদনং ত্রিদোষঘ্নং" ইত্যাদি। মধুর ভূরি ভূরি গুণানুবাদ আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে সবিস্তার বর্ণিত আছে; সে সমস্ত উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র; ফলে মধু মানবজীবনের সর্ব্ব উপাদানেরই উপকারক, সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদে ত প্রায় প্রতি ঔষধসহই মধুর ব্যবহার।

ঘৃত।—বলবর্দ্ধক, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্রকর, স্বরশোধক; বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও মেধাবর্দ্ধক, প্রতিভা-পোষক, মাঙ্গল্য, মহাতেজস্কর, মহাপাপনাশক ইত্যাদি। আর্য্য-শাস্ত্র সহস্রমুখে ঘৃতের গুণগান করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ঘৃতকে স্পষ্ট "আয়ুঃ, অমৃতম্, তৈজসম্" ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়াছেন। ঘৃত-মাহাত্ম্য-ঘোষক শত-সহস্র বচন বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ফলে স্বর্ণ, ঘৃত ও মধু, এই তিন দ্রব্যই জীবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পোষক।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিকাহারের লক্ষণ-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—

'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥'

(গীতা ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।)

ঘৃত, মধু, স্বুবর্ণ, তিনিই সাত্ত্বিক বস্তু।

"আয়ুর্বৈঘৃতং" আয়ুর্হবিঃ ইত্যাদি বাক্যে ঘৃত শ্রেষ্ঠ আয়ুষ্কর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন (Physiology & Chemistry) হইতে আমরা এক্ষণে জানিতেছি যে, মধু, ইক্ষু-বিটপালম-

মূল ও খর্জ্জুর প্রভৃতির ন্যায় শর্করা-প্রধান দ্রব্য (Surcose) শর্করার পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, উহাতে অঙ্গার-পরমাণু ১২, জলজান-পরমাণু ২২ এবং অম্লজান-পরমাণু ১১ ($C^{12} H^{22} 0^{11}$)। ঘৃতও ঐরূপ উদগম্লাঙ্গারজ দ্রব্য। নবনীতে অঙ্গার-পরমাণু ৪, জলজানের ৮, অম্লজানের ২, (Butyric Acid) এবং (glycerol) অন্যান্য উদগম্লাঙ্গারজ পদার্থ আছে। মাতৃস্তন্যেও শর্করা (Lactose or milk-suger) আছে। শর্করা ও মেদজনক পদার্থ (Carbo-hydrates) শরীরে যেন ইন্ধনবৎ দগ্ধ হয় (oxidised in the body); উহারা নিশ্বাসের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। মানবদেহ বস্তুতঃ একটী বৃহৎ চুল্লী অথবা বাষ্পযন্ত্রের ন্যায়; আমাদের খাদ্য কাষ্ঠ বা কয়লার কার্য্য করিয়া থাকে। তাপজননের উপযোগী হইবার পূর্ব্বে অনেক দ্রব্যই যকৃতের ক্রিয়াদ্বারা শর্করারূপে পরিণত হয়। সমুচিত পরিশ্রমাদি দ্বারা যথেষ্ট অম্লজান গ্রহণ করিতে পারিলে, ঐ শর্করা ভস্মীভূত হইয়া তাপোৎপাদন করে, নতুবা স্বভাব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। শিশুর চঞ্চল অঙ্গসঞ্চালন ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক। মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া-জনিত ক্ষয় নিবারণ ভিন্ন শিশুর পেশী ও অস্থি প্রভৃতির সংবর্দ্ধন ও নির্ম্মাণ জন্য অধিকতর পোষক শর্করাসার-খাদ্যের (Surcose) প্রয়োজন; শিশুও স্বভাবতঃ মিষ্ট ভালবাসে! প্রকৃতির বিধানে ভ্রান্তি নাই। মানুষ সে বিধান পাঠ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোকের দেহে নূতন অস্থি প্রভৃতির নির্ম্মাণ হয় না, সুতরাং সমুচিত পরিশ্রম না করিয়া আলস্যপরায়ণ হইলে, মধুমেহ, ইক্ষুমেহ, বসামেহ ইত্যাদি (Diabbtes) রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। আর কিছু না পাইলে, যকৃৎ ডাউল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যমাংসাদি প্রাণিজ নাইট্রোজেন-প্রধান দ্রব্য হইতে শর্করা প্রস্তুত করণোপযোগী উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। [Herbert Spencer on Education Physical training.]

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই বিকীরণ (Radiation) জন্য তাপের হ্রাস হয়; অতি সত্বর পুনরায় সেই পরিমাণ তাপ নবজাত শিশু-দেহে উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত ঘৃত, মধু ও স্বর্ণ ভোজনে উহা সহজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * ভূমিষ্ঠ হইবার পর নাড়ীচ্ছেদকালে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয়; তৎপক্ষেও এই বিধি বিশেষ উপকারক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও ধাত্বাদির আয়ুর্ব্বেদমতে জারণ-শোধনাদির বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। স্বর্ণ-ঘৃত-মধু-সংমিশ্রণে যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় এবং উহা দেহাভ্যন্তরে কি কি অবস্থান্তর উৎপাদন করে, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাহার পক্ষে এখনও সুদূরপরাহত।

যাহাহউক, যতদূর জানা গেল, তাহাতে

* শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অধুনা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি মানসিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অল্পাধিক ব্যত্যয় হয় এবং সমস্ত দেহও সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাবে যে ভিন্নভিন্নরূপ কার্য্য করে, তাহা অনেকেই জানেন। সুখকর বা দুঃখকর স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে নিশ্বাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হয়, তাহা বেশ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয় ও তাহাতে যে শ্বাসক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে (First Principles p. 213).

বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিন্দু-আচার-শাস্ত্রের প্রথম বিধিবিজ্ঞান-ভিত্তিতে অবস্থিত। উহা একটী বিশেষ খাদ্য (Special food) বা ভেষজ-খাদ্য (Medicated food) উহার ফল মানব-জীবনে হয়ত সর্ব্বতোমুখী হইতে পারে [Herbert Spencer. First Principles—Multiplication of effects—page 442] অঙ্কুরের সার পাইলে বৃক্ষ সতেজই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত।

নাসদীয়সূক্ত। (১)

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्। किमावरीवः कुहकस्य शर्म्मन्नम्भः किमासीद्गहनं गभीरम् ॥ १ ॥

পদপাঠঃ। ন। অসৎ। আসীৎ। নো। সৎ। আসীৎ। তদানীং। ন। আসীৎ। রজঃ। নো। ব্যোম। পরঃ। যৎ। কিম্। আ। অবরীবঃ। কুহ। কস্য। শর্ম্মন্। অম্ভঃ। কিম্। আসীৎ। গহনম্। গভীরম্॥ ১॥

ব্যাখ্যা। তদানীং ন অসৎ আসীৎ—সৎ শব্দের অর্থ যাহা আছে, "অসৎ" যাহা নাই; সুতরাং তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে যাহা নাই, তাহা ছিল না, এইরূপ অনাবশ্যক উক্তি ঋষিদিগের উক্তি হইতে পারে না। রমেশ বাবু তাঁহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে এই স্থানের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু এই অর্থ যে প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না, তাহা তিনি ভগবদ্গীতা

(১) এই সূক্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে পাঠককে অবগত করান উচিত যে, এই সূক্তই বেদান্তদর্শনের মায়াবাদের ভিত্তিস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই, উহা পশ্চাদাগত দার্শনিকদিগের স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহাদের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা "নাসদীয় সূক্ত" পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। বেদান্তদর্শনমতে মায়া ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। মায়া শক্তিরূপে অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতা; এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়া আশ্রয় করিলে ব্রহ্মকে 'ঈশ্বর' বলা হয়। এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; কিন্তু মায়াশক্তি উদ্ভাবন না করিলে সৃষ্টি হয় না, এই জন্য মায়াকেও জগতের উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে। মায়া "সৎ" ও নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র "সৎ" বা নিত্য পদার্থ; "অসৎ"ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। 'মায়া' "সৎ"ও নহে, "অসৎ"ও নহে, অথচ "সৎ" এবং "অসৎ" এই উভয়ই। ব্যবহারিক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মায়া "সৎ", ব্যবহারিক জগৎ পরিত্যাগ করিলে, মায়া "অসৎ"। মায়া হেতু এই বিশ্বকে "সদসদাত্মক" বলা যায়। মায়া আশ্রয় করিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কারণ ব্রহ্মই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় পরিণত হন।

উপরোক্ত বেদান্তমত অতি সংক্ষেপে নাসদীয়সূক্তে ব্যক্ত হইয়াছে। সূক্তে বলা হইয়াছে, "সৎ"ও ছিল না, "অসৎ"ও ছিল না, অর্থাৎ "সদসদাত্মক" বা মায়াত্মক জগৎ ছিল না; উহা অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য বলা হইতেছে, পৃথিব্যাদি লোক ছিল না, আকাশ ছিল না, আকাশের উপরিস্থিত লোকসমূহ ছিল না। তখন জগতের কোন আবরণও ছিল না, ইত্যাদি। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। তখন অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল। তখন একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, প্রলয়াবস্থায় একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, "নাসদীয়সূক্ত" হইতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

স্মরণ করিলেও বুঝিতে পারিতেন। সতের কখনও অভাব হয় না, অসতের কখনও ভাব হয় না, গীতা ইহাই বলেন। যে বস্তু নাই, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, ইহা বলা ঋষির উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাদ্বারা যেন এইরূপ অনুমান হয় যে, যাহা নাই, তাহা বুঝি পরে হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে, যাহা "সৎ" অর্থাৎ যাহা আছে, তাহাও ছিল না। রমেশ বাবু এইরূপ অর্থই করেন। কিন্তু ইহাতেও এই দোষ স্পর্শে যে, যে সতের কখনও অভাব হইতে পারে না, এই স্থলে সেই সতের অভাব সূচিত হইতেছে! ইহা কখনও ঋষির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই স্থলের প্রকৃত অর্থ এই যে, সদসদাত্মিকা মায়া তখন ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়া ছিল না। মায়াদ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়; সুতরাং মায়াও ছিল না, সৃষ্টিও ছিল না। তখন রজঃ—অর্থাৎ পৃথিব্যাদিলোক ছিল না। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' ইতি যাস্কঃ।

ন ব্যোম—তখন অন্তরীক্ষও ছিল না। পর ব্যোম—অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহও ছিল না। কিমাবরীবঃ— তখন আবরণ করে, এমন কি ছিল? অর্থাৎ আবরণীয় কোন বস্তু না থাকায় আবরকও ছিল না। বৃণোতের্যঙ-লুগন্তাচ্ছান্দসে লঙিতিতি রূপমেতৎ। কুহ—কুত্র দেশে, কিং শব্দাৎ সপ্তম্যর্থে হ প্রত্যয়ঃ। সেই আবরকের কোন আধারভূত দেশ কি ছিল? অর্থাৎ তাহাও ছিল না। কস্য শর্ম্মন্—কস্য বা ভোক্তুঃ জীবস্য শর্ম্মণি সুখে। জীবানা-মুপভোগার্থা হি সৃষ্টিঃ—জীবের উপভোগের জন্যই সৃষ্টি। তৎকালে সৃষ্টি যেরূপ ছিল না, তদ্রূপ ভোক্তা জীবও ছিল না। শর্ম্ম অর্থে সুখ—কাহার সুখের জন্য? অর্থাৎ কাহারও নহে। অম্ভ কিমাসীৎ গহনম্ গভীরম—তখন দুর্গম ও গম্ভীর জল ছিল না। (২)

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ অবান্তর প্রলয়কালে সদসদাত্মিকা মায়া ছিল না। পৃথিব্যাদিলোক, অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহ (যাহা মায়া হইতে উদ্ভূত হয়) ছিল না। তখন এই সমুদায় লোকের কোন আবরক ছিল না এবং উহার কোন আধার ছিল না। তখন ভোক্তা জীব, যাহার সুখের জন্য এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ, সে জীবও ছিল না। তখন দুর্গম ও গম্ভীর জল ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। ন। মৃত্যুঃ। আসীৎ। অমৃতম্। ন। তর্হি। ন। রাত্র্যাঃ। অহ্নঃ। আসীৎ। প্রকেতঃ। আনীৎ। অবাতম্। স্বধয়া। তৎ। একম্। তস্মাৎ। হ। অন্যৎ। ন। পরঃ। কিম্। চন। আস ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। ন মৃত্যুঃ আসীৎ—তখন মৃত্যু বা মরণ ছিল না। অমৃতং ন তর্হি—তখন অমরণও ছিল না। যে সময় মৃত্যু নাই, সে সময় অম-

(২) এই ঋকের যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইবে, পাঠক তাহার সহিত রমেশ বাবুর অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। এই ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর-বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল" এই অনুবাদে যে কি কি দোষ আছে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ অনেক স্থলে বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না, অনেক স্থলে বরং বিপরীত অর্থ করে। এই ঋকে "কস্য শর্ম্মন্" ইহার আদৌ অনুবাদ হয় নাই।

রণেরও কোন জ্ঞান নাই। যেমন দুঃখজ্ঞান না থাকিলে, সুখজ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ মরণ না থাকিলে, অমরণ থাকিতে পারে না। ন রাত্র্যাঃ অহ্নঃ প্রকেতঃ আসীৎ। প্রকেতঃ—প্রজ্ঞানং। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ-জ্ঞান ছিল না। সূর্য্য-চন্দ্রের অভাবে দিন-রাত্রি-মাস-ঋতু প্রভৃতি কাল ছিল না, তাহাই বলা হইতেছে। 'তৎ আনীত—প্রাণিতবৎ।' তৎ শব্দে—ব্রহ্ম। তখন কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। সংশয় হইতে পারে যে, তিনি বুঝি জীবের ন্যায় বায়ুর সাহায্যে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন, তাহাতেই বলা হইতেছে—অবাতম্—বায়ুর সাহায্য ব্যতীত। তবে তিনি কিরূপে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন বা জীবিত ছিলেন?—"স্বধয়া"। স্বধাদ্বারা। স্বধা শব্দের বহু অর্থ, সাধারণতঃ জল ও অন্ন বুঝায়। এস্থলে স্বধা শব্দে মায়া। সায়ন বলেন, "স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্তত ইতি স্বধামায়া।" তিনি মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিবিশেষ। মায়া ব্রহ্মে অপ্রকট-ভাবে আছে। মায়া প্রকট হইলেই জগৎ সৃষ্ট হয়। এস্থলে মায়া প্রকট হওয়ার পূর্ব্ব অবস্থার কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়া ছিল না, এইক্ষণ বলা হইতেছে তিনি মায়াসহকারে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। পাছে মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সূচিত হয়, এই জন্য বলা হইতেছে—'একম্' অর্থাৎ অবিভক্ত-ভাবে। অর্থাৎ তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না এবং মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইলে যে জগতের উদ্ভব, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে জগৎ ছিল না। 'তস্মাৎ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস।' পূর্ব্বোক্ত মায়া সহিত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পরঃ—অর্থাৎ পরস্তাৎ সৃষ্টেঃ ঊর্দ্ধং বর্ত্তমানং ইদং জগৎ ন বভূব। আর সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার যে জগৎ হইয়াছে, তাহাও ছিল না।

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে মরণ বা অমরণ ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না। তৎকালে ব্রহ্ম বায়ুর সাহায্যব্যতীত মায়া আশ্রয় করিয়া প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন; কিন্তু তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; তিনি মায়ার সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তখন এই জগৎ ছিল না। (৩)

তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা অজায়তৈকম্ ॥৩॥

পদপাঠ। তমঃ। আসীৎ। তমসা। গূড়্হম্। অগ্রে। অপ্রকেতম্। সলিলম্। সর্ব্বম্। আঃ। ইদম্। তুচ্ছোন। আভু। অপিহিতম্।

(৩) রমেশবাবু এই ঋকের এই প্রকার অনুবাদ করেন,—"তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক-মাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।"—এই অনুবাদে 'স্বধয়া" শব্দের অনুবাদ "আত্মা মাত্র অবলম্বনে" ধরিয়া লইতে হয়। রমেশবাবু তাঁহার বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি সায়ণের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, যদি কোনও স্থানে কোন শব্দের অর্থ সায়ণের অর্থানুরূপ অনু-বাদিত না হইয়া থাকে, তাহাহইলেও সেই স্থানে সায়ণের অর্থ টীকায় দিয়াছেন। সায়ণের মতে এস্থলে স্বধা অর্থে মায়া, সুতরাং রমেশবাবু কিরূপে এই অনুবাদ করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতার মূলেও এই "স্বধা" পাঠ আছে। পরঃ শব্দের অনুবাদ আদৌ হয় নাই। একম্ অর্থে "এক-মাত্র বস্তু" করিয়াছেন, এটিও ভ্রম।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদে বেদান্তের মায়া-

স্বধ। আসীৎ। স্তপসঃ। তৎ। মহিনা। অজা-
য়ত। একম্॥ ৩॥

ব্যাখ্যা। 'অগ্রে—তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্' সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল। এই হইল শব্দার্থ। কিন্তু যখন রাত্রি নাই, দিবা নাই, তখন আবার অন্ধকার কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে গাঢ় অন্ধকার ছিল, ইহাই বলা কি ঋষির উদ্দেশ্য? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গাঢ় অন্ধকারের উত্তম বর্ণনা বলিয়া ঋষিকে প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইহাকে "সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার বর্ণনা অতিশয় গম্ভীর ও ভাবাবহ" বলিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বামী বিবেকানন্দও কলিকাতার কোন বক্তৃতায় এই অংশ টুকুর অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন ডান্টি-মিল্টন প্রভৃতি কবিগণও অন্ধকারের এমন সুন্দর বর্ণনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্ধকার বর্ণনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে। আলোক-সাপেক্ষ অন্ধকারই আমরা বুঝি, কিন্তু এই স্থলে নিত্য-নিরপেক্ষ অন্ধকার বলা হইতেছে এবং উহার প্রকৃত অর্থ এই প্রকাশ পায় যে, তখন কার্য্য-কারণের কোন ভেদ ছিল না, আবরক ও আবার্য্যের কোন ভেদ ছিল না; এই কার্য্যাত্মক জগৎ তখন মায়ায় অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। নৈশ অন্ধকারে যেমন বস্তু হইতে বস্ত্বন্তর পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ সৃষ্টির প্রাক্কালে কারণাচ্ছাদিত কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারিত না। যদি কেহ তর্ক করেন যে, একটি "আবরক" কর্ত্তা আর একটি "আবার্য্য" কর্ম্মস্বরূপ হইলে উহাদিগকে পৃথক্ করা যাইবে না কেন? তজ্জন্য বলা হইতেছে, প্রকেতঃ—অপ্রজ্ঞায়মানং—কারণ দ্বারা কার্য্য আবৃত ছিল অপ্রজ্ঞায়মানভাবে। ব্যবহারিক অবস্থায় নামরূপদ্বারা কারণ যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তখন তদ্রূপ হয় নাই। এই স্থলে মনু স্মরণ করুন—"আসীদিদং তমোভূতম-প্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্কমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বত ইতি।" তৎপরে বলা হইতেছে, ইদম্ সর্ব্বমসলিলং—সলগতো ঔণাদিকঃ একম্। ইদং সর্ব্বং জগৎ সলিলং কারণেন সঙ্গতং অবিভাবাপন্নং। আঃ—আসীৎ। অর্থাৎ এই জগৎ তখন কারণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবিভক্তভাবে ছিল। সায়ণ অন্যরূপ অর্থও করেন। নীরের মধ্যে ক্ষীর দিলে যেমন নীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, ক্ষীরই দেখা যায়, এই জগৎ তদ্রূপ লুপ্তোপম সলিলের ন্যায় ছিল। নীর যদি এইরূপ দুর্ব্বল হয় যে ক্ষীরের সহিত সংসৃষ্ট থাকিলেই উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, তাহাহইলে নীররূপ জগৎ ক্ষীররূপ মায়াকারণ হইতে কিরূপ স্বতন্ত্র হইল? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা অজায়তৈকম্। একং একীভূতং, অর্থাৎ জগৎ মায়ায় লীন থাকা সত্বেও। তুচ্ছ্যোনাভ্বপি-

বাদের ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করেন না। জর্ম্মাণ ও ফরাশিদেশীয় মুদ্রিত বেদে "স্বধা" স্থলে কি পাঠ আছে, জানি না, কিম্বা তাঁহারা উহার কি অর্থ করিয়াছেন, তাহাও অবগত নই। সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রমেশবাবু কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া সায়ণের "মায়া" পরিত্যাগ করিয়াছেন? রমেশবাবুর বেদানুবাদের ভ্রম আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি, এবারও কিছু দেখাইলাম। ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, আমরা রমেশবাবুর গুণের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু রমেশ বাবু একটু দেখিয়া শুনিয়া বেদের অনুবাদ করিলেই আমরা সুখী হইতাম। রমেশবাবুর বেদানুবাদ হইতে বেদের অর্থ যে কেহ বুঝিতে পারে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। অনেকেই আমাদিগকে ঐরূপ বলেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি "বেদত ঐ, যাহা রমেশবাবু অনুবাদ করিয়াছেন, উহা পড়ার প্রয়োজন নাই" বস্তুতঃ রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে বেদের প্রতি সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের ভক্তি না হইয়া বরং অভক্তিই জন্মিয়াছে।

হিতং আসমন্তাৎ ভবতীত্যাভু তুচ্ছ্যেন (ছান্দসো য কারোপজনঃ) তুচ্ছ্যেন তুচ্ছ কল্পনেন সদসদ্বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেন নিহিতং ছাদিতম্ আসীৎ যৎ তৎ তপসঃ মহিনা অজায়ত জগৎ তুচ্ছকল্প সদসদাত্মিকা মায়াদ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছাদিত হইলেও এবং তদ্ধেতু একীভূত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহার তপের মাহাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তপসঃ—দ্রষ্টব্য বিষয় পর্য্যালোচনাই তপ।

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তাহার কারণরূপ মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অন্ধকারে যেরূপ কোন বস্তু হইতে বস্তুন্তর নির্দ্দেশ করা যায় না, জগৎকেও তখন স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত না, উহা মায়ার সহিত সংগত থাকায় অপ্রজ্ঞায়মান ছিল। তুচ্ছকল্প মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া একীভূত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সৃষ্টি-পর্য্যালোচনারূপ তপস্যা হইতে জগৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়॥ ৪॥

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

পদপাঠঃ। কামঃ। তৎ। অগ্রে। সম। অবর্ত্তত। অধি। মনসঃ। রেতঃ। প্রথমম্। যৎ। আসীৎ। সতঃ। বন্ধুম্। অসতি। নিঃ। অবিন্দন। হৃদি। প্রতীষ্যা। কবয়ঃ। মনীষা॥ ৪॥

ব্যাখ্যা। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে। কাম মনস অধি সমবর্ত্তত—ঈশ্বরের অন্তঃকরণে কাম-অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উপনিষদের "সো কাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিংচেতি" স্মরণ করুন্। তাঁহার এই সৃষ্টির ইচ্ছা হইল কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—রেতঃ প্রথমম্ যৎ আসীৎ তৎ। প্রথমম্ অর্থাৎ অতীতকল্পে—রেতঃ শব্দে—প্রাণিদিগের কৃতকর্ম্ম, যাহা ভাবী-সৃষ্টির বীজস্বরূপ হইয়াছিল। যেহেতু সৃষ্টিসময়ে প্রাণীদিগের পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম ছিল, সেইহেতু তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। যৎ শব্দে যেহেতু, তৎ শব্দে সেইহেতু। তাঁহার মনে কাম উদয় হইলে, তিনি দ্রষ্টব্য পর্য্যালোচনারূপ তপ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। কবয়ঃ হৃদি মনীষা প্রতীষ্যা সতঃ বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্ সতঃ বন্ধুম্—এস্থলে সৎ অর্থে ব্যবহারাত্মক জগৎ। বন্ধুম্—বন্ধকং হেতুভূতং অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম। কবয়ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ। হৃদি—হৃদয়ে। মনীষা—বুদ্ধিরদ্বারা। প্রতীষ্য—বিচার করিয়া। অসতি—নিরবিন্দন মায়াতে জানিয়াছিলেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতুভূত পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

বঙ্গানুবাদ। জীবের পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম রেত বা বীজস্বরূপ থাকায়, পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির

---

(৪) রমেশবাবু এই ঋকের অনুবাদ এইরূপ করেন;—সর্ব্বপ্রথম অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। "অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, ইহা মূলের কথায় কথায় অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিল না। "চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল" এবড় আশ্চর্য্য! কারণ তখন জল আদৌ ছিল না। "অবিদ্যমান বস্তু" কি, কেহ তাহা বুঝিল না। সেই সর্ব্বব্যাপী "অবিদ্যমান বস্তু" দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, ইহা মূলে নাই। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। "এক বস্তু" কি? ব্রহ্ম কি নিজে তপস্যা করিয়া নিজেই জন্মিলেন? এই অনুবাদের অধিক সমালোচনা অনাবশ্যক।

ইচ্ছা হইয়াছিল। কবিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতুভূত পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (৫)

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्। रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात् प्रयतिः परस्तात्॥ ५॥

পদপাঠঃ। তিরশ্চীনঃ। বিততঃ। রশ্মিঃ। এষাম্। অধঃ। স্বিৎ। আসীৎ। উপরি। স্বিৎ। আসীৎ। রেতো। ধা। আসন্। মহিমানঃ। আসন্। স্বধা। অবস্তাৎ। প্রযতিঃ। পরস্তাৎ ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা-কামকর্ম্মই সৃষ্টির হেতু। এষাম্‌রশ্মি—অবিদ্যা-কামকর্ম্মসমূহেররশ্মি। তিরশ্চীনঃ অধঃ উপরি বিতত আসীৎ। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ সূর্য্যের উদয়াস্তর নিমেষমধ্যে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-কামকর্ম্মের রশ্মি ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইল, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি আরম্ভ করিল। স্বিৎ—বিতর্কে। তখন "রেতোধা" অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্ম সম্পাদনকারী কর্ত্তা, ভোক্তা জীব এবং "মহিমানঃ" অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চভূত "আসন্" উৎপন্ন হইয়াছিল। মায়াসহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি-ভোক্তৃ ভোগ্যরূপে বিভাগ করিলেন। এই জন্য স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ "স্বধা" অন্ন বা ভোগ্য-প্রপঞ্চ, স্বধা ভোগ্যপ্রপঞ্চের উপলক্ষণমাত্র। "প্রযতিঃ" ভোক্তা। অবস্তাৎ—নিকৃষ্ট আসীৎ। পরস্তাৎ—উৎকৃষ্ট আসীৎ। ভোক্তা প্রধান হইয়াছিল এবং ভোগ্য নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অবিদ্যা-কামকর্ম্মের রশ্মি নিমেষমধ্যে ঊর্দ্ধে, নিম্নে এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিল, তখন ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য ভূতপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল। ভোক্তা জীব প্রধান এবং ভোগ্যপ্রপঞ্চ নিকৃষ্ট গণ্য হইল। (৬)

को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। अर्व्वाग् देवा अस्य विसर्ज्जनेनाथ को वेद यत आबभूव॥ ६॥

পদপাঠঃ। কঃ। অদ্ধা। বেদ। কঃ। ইহ প্রবোচৎ। কুতঃ। অজাতা। কুতঃ। ইয়ম্। বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাক্। দেবাঃ। অস্য। বিসর্জ্জনেন। অর্থ। কঃ। বেদ। যতঃ। আবভূব॥ ৬॥

(৫) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই জীবের জন্মের কারণ। প্রলয়কালে যাহারা মুক্ত না হয়, তাহাদের কর্ম্ম রহিয়া যায়, উহাই ভগবানের রেতঃ স্বরূপ এবং উহাই নূতন সৃষ্টির কারণ। অনাদিকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে। কেহ বলিতে পারে না জীবের কর্ম্ম কোন্ সময় আরম্ভ হইল, যেমন কেহই বলিতে পারে না বীজ অগ্রে না অঙ্কুর অগ্রে। কিন্তু এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ যে মায়া (ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সীশক্তি) হেতু হইয়াছে, ঋষিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(৬) রমেশবাবু এই ঋকের অনুবাদ এইরূপ করেন ;—"রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন, উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে স্বধা রহিল প্রযতি ঊর্দ্ধদিকে রহিল" অনুবাদে উহাদিগের রশ্মি "রেতোধা পুরুষ এবং মহিমা সকলের রশ্মি" বুঝাইতেছে। কিন্তু মূলে "এষাং" শব্দে সায়ণ অর্থ করেন 'এষামবিদ্যাকামকর্ম্মণাং।' যে ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে মূলের ভাব ব্যক্ত হওয়া দূরে থাকুক্, বিপরীত অর্থ হইয়া গিয়াছে। রমেশবাবু তাঁহার টীকায় "মহিমা" অর্থে পঞ্চভূত, "স্বধা" অর্থে অন্ন এবং "অন্ন" নিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা, সেই ভোক্তা উপরে—অর্থাৎ প্রধান এইরূপ বলা সত্ত্বেও তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলে মূলের মর্ম্মবোধ হয় না।

ব্যাখ্যা। কঃ অদ্ধা বেদ—কোন্ পুরুষ "অদ্ধা" রমার্থ্যেন যথার্থভাবে জানে? কঃ ইহ প্রবোচ—কেইবা উহার বর্ণনা করিবে? কুতঃ জাতা—কি উপাদানকারণ হইতে সৃষ্টি ল? কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ—কোন্ নিমিত্তরণ হইতে বিবিধ সৃষ্টি হইল? অস্য বিসনেন দেবাঃ অর্ব্বাক্—দেবাঃ জগতো বিসনেন অর্ব্বাচীনাঃ কৃতাঃ ভূতসৃষ্টিঃ পশ্চাজ্জাতাঃ। বতারা ভূতসৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও জানেন না, অথ কো বেদ যত আবর—যে কারণ হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা ন্ মনুষ্য জানে?

বঙ্গানুবাদ। কোন্ উপাদান এবং কোন্ মিত্তকারণ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইল, তাহা র্থভাবে কে জানে—কেই বা বর্ণনা করিবে? বতারা ভূত-সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহারাও না জানেন না। যে কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন য়াছে, তাহা কোন্ মনুষ্য জানে?

য়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে দি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে োমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন দ॥ ৭॥

পদপাঠঃ। ইয়ম্। বিসৃষ্টিঃ। যতঃ। আব। যদি। বা। দধে। যদি। বা। ন। যঃ। স্য। অধ্যক্ষঃ। পরমে। ব্যোমন্। সঃ। অঙ্গ। দ। যদি। বা। ন। বেদ॥ ৭॥

ব্যাখ্যা। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব। এই বিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে য়াছে। যদি বা দধে যদি বা ন দধে—সেই াদানভূত পরমাত্মা আবার নিমিত্তকারণ য়া এই বিবিধ সৃষ্টি যে সৃষ্টি করেন কি না রেন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। যিনি কাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশে বা স্বরূপে—জগতের অধ্যক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন। সো অঙ্গ—সোঽপি—তিনিই। বেদ যদি বা ন বেদ। তিনিই জানেন বা নাইবা জানেন। এই শ্লোকে দুই স্থানে সংশয়াত্মক বাক্য রহিয়াছে। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইল, তিনিই উহার নিমিত্তকারণ হইয়া উহাকে সৃষ্টি করেন বা না করেন, তাহা আকাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশে প্রতিষ্ঠিত জগতের অধ্যক্ষস্বরূপ পরমাত্মাই জানেন বা তিনি নাই বা জানেন। উহার মধ্যে—যদি বা দধে যদি বা ন,—এই সন্দেহবচন যে রহিয়াছে, উহা বস্তুতঃ সন্দেহ নহে। সায়ণ বলেন "অসংদিগ্ধে সংদিগ্ধবচনমেতৎ" অসন্দেহসত্বেও সন্দেহবচন রহিয়াছে। আমরা সাধারণ ভাষায় যেরূপ বলি, অমুকই এই কার্য্য করিবে; করে ত সেই করিবে, না করে ত সেই না করিবে" ইহার অর্থ এই যে, অন্যের এই কার্য্য করার সাধ্য নাই। ঐপ্রকার "স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" তিনিই জানেন, বা না জানেন, ইহার ভাব এই "জানেন ত তিনি, না জানেন ত তিনি, অন্য কেহ জানে না"—সায়ণও তাহাই বলেন—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এব তাং সৃষ্টিং জানীয়াৎ, নান্য ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সৃষ্টির বিষয় জানেন, অন্যে জানে না। (৭)

বঙ্গার্থ। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে এবং যে উপাদানভূত পরমাত্মা নিমিত্তকারণ হইয়া ইহা সৃজন করিয়াছেন, আকাশবৎ নির্ম্মল স্বপ্রকাশ বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সৃষ্টির অধ্যক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন, তিনিই উহা অবগত আছেন, অন্য কেহ নহে। (৭)

(৭) সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তিনিই জানেন বা তিনি নাও জানিতে পারেন, ইহার বিশদরূপ ব্যাখ্যা না থাকায় রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার

সৃষ্টিকার্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বজ্ঞতার উপর সন্দেহ আসিতে পারে। রমেশবাবুর অনুবাদ;—"এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা তিনিই জানে যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথ তিনিও নাও জানিতে পারেন।"

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি (৪০)। কিং মরণং মূর্খত্বং (৪১) কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ (৪২) ॥ ১৬ ॥

শিষ্য। মূক কে?

গুরু। যে সময়ে প্রিয় বলিতে পারে না।

শিষ্য। মরণ কি?

গুরু। মূর্খতা।

শিষ্য। অমূল্য কি?

গুরু। যাহা সময়ে দেওয়া যায়।

আমরণাৎ কিং শৈল্যং প্রচ্ছন্নং যৎ কৃত পাপম্ (৪৩)। কুত্রবিধেয়ো যত্নো বিদ্যা ভ্যাসে সদৌষধে দানে (৪৪) ॥ ১৭ ॥

শিষ্য। আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্য কি?

গুরু। গুপ্তপাপ।

শিষ্য। কোন্ কার্য্যে যত্ন করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে, ঔষধে ও দানে।

অবধীরণা ক কার্য্যা খল পর যোষিৎ পর

---

(৪০) সুলভা পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৬ অ, ১৫।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৩ (লঙ্কাকাণ্ডে)

(৪১) বিদ্যানাম কুরূপরূপমধিকং বিদ্যাতি গুপ্তং ধনং।
বিদ্যাসাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশকরী বিদ্যা পরং দেবতা।
বিদ্যা রাজসু পুজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥
গরুড়পুরাণে, পূর্ব্বখণ্ডে ১১৫ অধ্যায়ে ৮১।

বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ নৈবাভিগমনং
বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্।
বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতিঃ
ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণ গুণযুক্তোঽপি তনয়ঃ॥
ভবভূতিঃ গুণরত্নে।

(৪২) দানশ্চ যাচতে চান্নমল্পেনাপি হি তুষ্যতি।
ইতি দদ্যাৎ দরিদ্রায় কারুণ্যাদিতি সর্ব্বথা॥
অনুশাসনিকে ১৩৮ অ, ১০।

দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥
(মহাভারতে।)

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৭ অ, ২২।

(৪৩) তস্মাৎ পাপং ন গূহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
কৃত্বা তু সাধুষ্বাখ্যেয়ং তে তৎ প্রশময়ন্ত্যত॥
অনুশাসনিকে পর্ব্বণি ১৬২ অ, ৫৯

তজ্জন্য পাপ গোপন করিবে না, গোপন করি বৃদ্ধি হয়। পাপ করিয়া সাধু ব্যক্তির নিকট প্রক করিলে সেই পাপ নষ্ট হয়।

জ্ঞানপূর্ব্বং কৃতং পাপং ছাদয়ন্ত্যবহুশ্রুতাঃ।
নৈনং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি পশ্যন্তি হি দিবৌকসঃ।
শান্তিপর্ব্বণি ১৯৩ অ, ২৭

অথ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ।
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৪ অ, ৭২।

(৪৪) দানে তপসি সত্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ১৩২ অ, ২৩।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি নয়ঃ সত্যং ক্ষমাঘৃণা।
অলোভ ইতি মার্গোয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥
ঐ ৩৪ অ, ৫৭।

নমু (৪৫)। কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা নতু প্রমদা (৪৬)॥ ১৮॥

শিষ্য। কোন্ কার্য্যে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য?

গুরু। খল, পরস্ত্রী ও পরধনে।

শিষ্য। কি সর্ব্বদা চিন্তা করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সংসারের, অসারতা পরস্ত্রী নহে।

কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণাদীনেষু (৪৭) সজ্জনে মৈত্রী (৪৮)। কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্ (৪৯)॥ ১৯॥

(৪৫) অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ।
পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ২৫।
বিপত্তিঃ সন্ততং তস্য পরবস্তুষু যন্মনঃ।
বিশেষতঃ পরস্ত্রীষু সুবর্ণেষু চ ভূমিষু॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৩৫ অ, ৯২।

(৪৬) শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ভবাটবী বর্ণনে সংসারাসারতা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। পুরাণে ধর্ম্মসংহিতায় ৪২ অধ্যায়ে ও সংসারাসারতাও বর্ণিত আছে।

(৪৭) যোবাত্মনীহ ন গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে
দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্য্যে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে
কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৩৫।

সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষ্যতে।
নচাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥
বনপর্ব্বণি ২৯৬ অ, ২৯।

সাধুনাং বাপ্যসাধুনাং সন্তএব সদা গতিঃ।
মৎস্যপুরাণে ২১০ অধ্যায়ে ২।

) সুলভো দুর্জ্জনা স্নেহো দুর্লভঃ সৎ সমাগমঃ।
যোগবাশিষ্টে বৈরাগ্যপ্রকরণে।
মহতামেব সংসর্গাৎ পুনর্দুঃখং ন বাধতে। ঐ ঐ

) দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি।
প্রসন্নং জলমিত্যাহুঃ কর্দ্দমৈঃ কলুষীকৃতম্॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অ ৪০।

শিষ্য। কোন্ কার্য্য প্রিয় ও কর্ত্তব্য?

গুরু। দীনে দয়া ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা।

শিষ্য। পূজ্য কে?

গুরু। সজ্জন।

শিষ্য। কাহাকে অধম বলে?

গুরু। অসচ্চরিত্রকে।

কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি। মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য (৫০)॥ ২০॥

শিষ্য। প্রাণ কণ্ঠগত হইলে কাহার আত্মা না বশ হয়?

গুরু। মূর্খ, বিষাদী, গর্ব্বযুক্ত ও কৃতঘ্নের।

কেন জিতং জগদেতৎ সত্য তিতিক্ষাবতা পুংসা (৫১)। কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্ (৫২)॥ ২১॥

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো যদি।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥
গরুড়পুরাণে ১১২ অ, ১৫।

সন্তঃ প্রাণানপি ত্যক্ত্বা পরার্থং কুর্ব্বতে যথা।
তথা সন্তোঽপি সন্তজ্য পরপীড়াসু তৎপরাঃ॥
মৎস্যপুরাণে ২২০ অ, ৪।

গুণায়স্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণাদোষায়ন্তে কিমিতি জগতাং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্ব্বারিমধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্॥
ভবভূতিঃ গুণরত্নে।

মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপিভগ্নোদ্যমঃ॥
পঞ্চরত্নে।

(৫০) গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।
পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ॥
গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১।

——সিংহব্রতং চরত গচ্ছতমা বিষাদং।
ঐ ১১৫-৩৪।

অবলিপ্তেষু মূর্খেষু রৌদ্রসাহসিকেষু চ।
তথৈবাপেত ধর্ম্মেষু ন মৈত্রীমাচরেদ্বুধঃ॥
উদযোগপর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায় ৫০।

শিষ্য। এই জগৎকে কে জয় করিয়াছে?

গুরু। সত্যবান্ ও সহিষ্ণু লোক।

শিষ্য। কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সজ্জননিকটে অথবা কাশীতে।

কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবানামপি দয়াপ্রধানস্য (৫৩)। কস্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া (৫৪) ॥ ২২ ॥

শিষ্য। দেবতাসকল অপেক্ষা কাহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য?

গুরু। দয়ালুকে।

শিষ্য। সুবুদ্ধি কাহাকে ভয় করিবে?

গুরু। সংসাররূপ অরণ্যকে।

কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য (৫৫)। ক্ব স্থাতব্যং ন্যায্যে পথি দৃষ্টাদৃষ্টলাভায় (৫৬) ॥ ২৩ ॥

শিষ্য। প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়?

গুরু। সত্য ও প্রিয়ভাষী এবং বিনীত ব্যক্তির।

শিষ্য। কোন্ বিষয়ে থাকা কর্ত্তব্য?

গুরু। দৃষ্টাদৃষ্টলাভের জন্য ন্যায্যপথে।

বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতি যুবতয়শ্চ (৫৭)। কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ (৫৮) ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানীলোক গর্ব্বিত, মূর্খ, উগ্র, অবিমৃষ্যকারী ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত মিত্রতাচরণ করিবেন না।

দুর্ব্বুদ্ধিমকৃতপ্রজ্ঞং ছন্নং কূপং তৃণৈরিব।
বিবর্জ্জয়ীত মেধাবী তস্মিন্ মৈত্রী প্রণশ্যতি॥
ঐ ঐ ৪৯।

অপ্রশ্লেষঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৩ অ, ১৯।

(৫১) সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬৫।

আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষিতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৫ অ, ৫।

(৫২) সজ্জনমাহাত্ম্য শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে।

কাশীপ্রাপ্যা ভবেৎ জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি।
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ৩৬ অধ্যায়ে ৮০।

এতদ্ভিন্ন ঐ পুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে ও ৩৫ অধ্যায়ে কাশীমাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে।

(৫৩) এতত্ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি॥
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৫ অ, ২ব্রাহ্মণে ৩ মন্ত্রঃ।

দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্। ২।

* * * *

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৬ অধ্যায়ে।

(৫৪) তস্মাৎ সংসারদাবাগ্নিতাপার্ত্তো দ্বিজসত্তমাঃ।
অভ্যসেৎ পরমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মুক্তো ভবিষ্যতি।
বৃহন্নারদীয়পুরাণে ৩০ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সংসার ক্লেশ সমুদায় বর্ণিত আছে।

এবং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি সংসারবিজিগীষবঃ।
বনপর্ব্বণি ২ অধ্যায়ে ৭২

ন বিষং কালকূটাখ্যং সংসারো বিষমুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংহরেত সুদারুণম্॥
লিঙ্গপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৮৬ অধ্যায়ে ২।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সমুদায় বর্ণিত আছে।

(৫৫) সত্যং মৃদুপ্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জ
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬

(৫৬) নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥
ভর্ত্তৃহরিঃ নীতিশতকে।

(৫৭) যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমভিগচ্ছন্তি তথানার্য্যেষু সৌহৃদম্॥
বিদ্যতে গোষু সম্পন্নং বিদ্যতে জ্ঞাতিতো ভয়ম্
বিদ্যতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যতে ব্রাহ্মণে তপঃ।
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৬ সর্গে

শিষ্য। বিদ্যুতের ক্রীড়ার ন্যায় চপল কি ?

গুরু। দুর্জ্জন-সঙ্গতি ও যুবতীগণ।

শিষ্য। কাহারা কুলশীলযুক্ত হইয়াও অচঞ্চল ?

গুরু। কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ।

কিংশোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে (৫৯) কিং প্রশস্তমৌদার্য্যম্ (৬০)। তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং সৎ সহিষ্ণুত্বম্ (৬১) ॥ ২৫ ॥

শিষ্য। কি সঙ্কোচ করিবে ?

গুরু। ঐশ্বর্য্য থাকিলে কার্পণ্য।

শিষ্য। প্রশংসনীয় কি ?

গুরু। ঔদার্য্য।

শিষ্য। অল্পবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালীদিগের কর্ত্তব্য কি ?

গুরু। সহিষ্ণুতা।

চিন্তামণিরিব দুর্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্রম্। কিং তদ্বদেতি ভূয়ো বিধুততমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥

শিষ্য। চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কাহাকে বলিব ?

গুরু। চতুর্ভদ্র।

শিষ্য। তাহা কি, পুনরায় বিশেষ করিয়া বলুন।

দানং প্রিয়বাক্ সহিতং (৬২) জ্ঞানমগর্ব্বং (৬৩) শৌর্য্যম্ (৬৪)। বিত্তং ত্যাগসমেতং (৬৫) দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥

গুরু। প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্য্য, দানসহিত ধন, এই চারিটি দুর্লভ দ্রব্যকে 'চতুর্ভদ্র' বলে।

স্ত্রীয়োমূলং হি দোষণাং লঘুচিত্তাঃ সদা মুনে ॥
শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ৪৩ অধ্যায়ে ২।

ঐ অধ্যায়ে স্ত্রীনিন্দা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ৪ অধ্যায়ে স্ত্রীচিত্তদুষ্টতাসম্বন্ধে বর্ণিত আছে।

(৫৮) বিদ্যাতপো বিত্তবপুর্ব্বয়ঃ কুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড় ভিরসত্তমেতরৈঃ।
"—————......————॥
শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৫।

(৫৯) বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ———— "
"————হাভাস্পদং ভুতলে ॥" নবরত্নং।

আশাধৃতিং হন্তি সমৃদ্ধিমন্তকঃ
ক্রোধঃ শ্রিয়ঃ হন্তি যশঃ কদর্য্যতাং।
অপালনং হন্তি পশুংশ্চ রাজ-
ন্নেকঃ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণো হন্তিরাষ্ট্রম্ ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩৯ অধ্যায়ে ৮।

আশা ধৈর্য্য নাশ করে, যম সমৃদ্ধিকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে কৃপণতা যশকে; অপালন পশুকে ও এক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ্য নষ্ট করে।

"অর্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং——"
গরুড়ে ১০৯ অ, ৬।

(৬০) "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥"

(৬১) ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমাশ্রুতম্।
যস্ত এতদেবং জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥
বনপর্ব্বণি ২৯ অধ্যায়ে ৩৬।

ঐ অধ্যায়ে ক্ষমাবানের প্রশংসা ৩৬ হইতে ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত।

একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে।
যদেনং ক্ষময়াযুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ ॥
গরুড়ে ১১৪ অ, ৩২।

(৬২) অর্থানামুচিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
দানমিত্যাভিনির্দ্দিষ্টং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্ ॥
কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে ২৬ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়টী সম্পূর্ণ দান বিষয়ে সম্পূর্ণ উক্ত হইয়াছে।

(৬৩) শ্রেয়াংস্তু ষড়্‌বিধস্ত্যাগঃ প্রিয়ঃ প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৩২ অধ্যায়ে ২৮।

(৬৫)

ষড়্‌বিধ শ্রেষ্ঠত্যাগের বিবরণ এই যে ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ নিজস্ব ধনাদি দান করিয়া সর্ব্বত্যাগ করিবে।

ঐ স্থানে প্রমাদ দোষ সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; উহার শেষে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কহিয়াছেন যে

ইতি কণ্ঠগতা বিমলপ্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা যেষাম্। তে মুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎ সমাজেষু॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা সমাপ্তা॥

এই বিমল প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা যিনি কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি অন্য কোন আভরণযুক্ত না হইলেও বিদ্বৎ সমাজে শোভা পান।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

দোষৈরেতৈর্ব্বিমুক্তস্তু গুণৈরেতৈঃ সমন্বিতঃ।
এতৎ সমৃদ্ধমত্যর্থং তপো ভবতি কেবলম্॥ ৩৮॥

এই সমুদায় দোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া এই সমুদায় গুণযুক্ত হইবে। তাহা হইলেই (কৈবল্যসাধন) অত্যর্থ-সমৃদ্ধ তপশ্চরণ করা হইবে।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥ ৭॥

ভবভূতিঃ গুণরত্নে।

আত্মানাত্মবিবেক।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তয়ঃ। (১)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা।

জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং।

ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদিবিষয়ের যে অনুভব, তাহাকে জাগরণ বলে।

স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্য প্রত্যয়ঃ সবিষয় স্বপ্নঃ।

জাগরণাবস্থার যে সংস্কার, তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা, তাহার নাম স্বপ্ন।

সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয় জ্ঞানাভাবঃ।

সর্ব্ববিষয়-জ্ঞান-অভাবের যে অবস্থা, তাহার নাম সুষুপ্তি।

এক্ষণে উক্ত অবস্থাত্রয় পুরুষের নাম কহিতেছেন।

১) মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্।

তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনা ময়ান্ শব্দাদীন্ যদোপলভতে তদাত্মনঃ স্বপ্নম্। চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্বিষয়বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা তদা আত্মনঃ সুষুপ্তম্। অবস্থাত্রয়াভাবাদ্ তাবসাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যাং চৈতন্যং যদা তদা তৎ তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে।

সর্ব্বোপনিষৎ সারে ২।৩।

ভাষ্যানুবাদ। আত্মা যখন চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্মুখ, দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা কর্তৃক অনুগৃহীত, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা নাসিকা, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই সকল বহিরাধিভূত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলদ্বারা সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বক্তৃ, ব্যাদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ, এই সকল বহির্ভূত স্থূলবিষয় উপলাভ করে, তখন আত্মার জাগ্রদবস্থা হয়॥ ২॥

যখন আত্মা বাসনারহিত হইয়া শব্দাদির অভাবেও মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়দ্বারা বাসনাময় শব্দাদি উপলাভ করে, তখনই আত্মার স্বপ্নাবস্থা। দেবতা নিমিত্ত ও অদৃষ্ট নিমিত্ত স্বপ্ন হইয়া থাকে, এই চিন্তা স্বপ্নে বাসনাই নিমিত্ত হয় তজ্জন্য 'বাসনাময়' শব্দ উক্ত হইয়াছে। দেবতা ও অদৃষ্ট নিমিত্ত বাসনাবয়ে 'বাসনা' শব্দে দেবেচ্ছাও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাখ্যেয়। স্বপ্নাবস্থায় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের কর্ম্ম

জাগ্রৎ স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। (২)

জাগ্রতাবস্থায় স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষকে বিশ্ব কহে।

স্বপ্ন সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। (৩)

স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরাভিমানী পুরুষকে তৈজস বলে।

সুষুপ্তিঃ কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ। (৪)

সুষুপ্তি-অবস্থাবিশিষ্ট কারণশরীরাভিমানী পুরুষকে প্রাজ্ঞ কহে।

কোষপঞ্চকং নামান্নময়-মনোময়-বিজ্ঞান-ময়ানন্দময়াখ্যাঃ। (৫)

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ।

অন্নময়োন্ন বিকারঃ।

অন্নের বিকার অন্নময়।

প্রাণময়ঃ প্রাণ বিকারঃ।

প্রাণের বিকার প্রাণময়।

মনোময়ো মনোবিকারঃ।

মনের বিকার মনোময়।

বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ।

বিজ্ঞানবিকার বিজ্ঞানময়।

থাকে না, কেবল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চারি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে। স্বপ্নে দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য উপরত হয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপার থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দাদি বিষয় সকলের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। আত্মার যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। যখন আত্মা উপরোক্ত অবস্থাত্রয়রহিত, ভাব পদার্থের সাক্ষী অথবা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং নির্লেপত্ববশতঃ ভাবরহিত ও ব্যবধায়ক বাহ্যান্তর-রহিত হইয়া চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তখন আত্মার তুরীয়াবস্থা ॥ ৩ ॥

অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ২ আরণ্যকে ৪ অধ্যায়ে ১ খণ্ডে ১ মন্ত্র ভাষ্যে——"জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তশ্চেতি——আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

(২) "হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৮।

ভাষ্যঃ। এবং স্থূল শরীরোৎপত্তিমভিধায় তেষু স্থূল শরীরেষ্বভিমানবতো হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিরূপস্য বৈশ্বানর-সংজ্ঞকত্বং একৈক স্থূলশরীরাভিমানবতাং ব্যষ্টিরূপাণাং তৈজসানাং বিশ্বসংজ্ঞকত্বং ভবতি।

এই প্রকারে স্থূলশরীরোৎপত্তি কথিত হইল; সেই স্থূলশরীরাভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞা হয় ও পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীরাভিমানী ব্যষ্টিরূপী তৈজসের 'বিশ্ব' সংজ্ঞা হয়।

(৩) "প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ মলিনসত্ত্ব প্রধান অবিদ্যোপাধিক জীব তেজঃ শব্দ বাচ্য অন্তঃকরণোপলক্ষিত লিঙ্গশরীরাভিমানদ্বারা অর্থাৎ তাদাত্ম্য অভিমান দ্বারা তৈজস নাম প্রাপ্ত হয়।

(৪) প্রাজ্ঞের লক্ষণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৫) "অন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোষাণাং সমূহোঽন্নময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদি চতুর্দ্দশ বায়ুভেদা অন্নময়ে কোষে যদা বর্ত্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষদ্বয়সংযুক্তো মন আদিভিশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ রাত্মশব্দাদি বিষয়ান্ সঙ্কল্পাদি ধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষত্রয়সংযুক্ত-তদ্‌গতবিশেষাবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষচতুষ্টয়ং স্বকারণবিজ্ঞানে বটকণিকায়ামিব বৃক্ষো যদা বর্ত্ততে তদা আনন্দময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে।"

সর্ব্বোপনিষৎসারে ৪।

নারায়ণীদীপিকানুবাদ। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও শোণিত, এই ষট্‌কোষই অন্নের কার্য্য উহা সকল দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকে। এই ষট্‌কোষই অন্নময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, এই দশ ও বৈরম্ভণ, স্থানমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত, এই চারি, সমুদায়ে চতুর্দ্দশ বায়ু যখন দেহে বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণময়

আনন্দময় আনন্দবিকারঃ।

আনন্দবিকার আনন্দময়।

অন্নময়কোষো নাম স্থূলশরীরং।

স্থূলশরীরের নাম অন্নময়কোষ।

কথং?

কি জন্য?

মাতৃপিতৃভ্যামন্নং ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্যতে। (৭)

মাতা-পিতাকর্ত্তৃক অন্নভুক্ত হইলে শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হয়, পরে মাতা-পিতার সংযোগহেতু সেই শুক্রশোণিত দেহরূপে পরিণত হইয়া তরবারি-কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয়। এই জন্য, স্থূলশরীর অন্নময়-কোষ।

ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্নবিকারত্বে সতি আত্মানমাচ্ছাদয়তি।

পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিদ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে, আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

এই দুই কোষ সংযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই কারণচতুষ্টয়দ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয়কে গ্রহণ করে, তখন তাহাকে মনোময় কোষ বলে। আত্মা পূর্ব্বোক্ত কোষত্রয়ে সংযুক্ত হইয়া সঙ্কল্পাদিগত ব্রাহ্মণত্বাদিবিশেষজ্ঞ ও মনুষ্যত্বাদি অবিশেষজ্ঞ হইলে, তাহাকে বিজ্ঞানময় বলা যায়। যখন আত্মা স্বকারণ বিজ্ঞানবিষয়ে বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষ বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়যুক্ত হইয়া স্বীয় কারণীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহাকে আনন্দময় কোষ কহিয়া থাকে।

(৭) "পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়োঽনাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে ৩।

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নজাত বীর্য্য হইতে যে দেহ জন্মে ও যে দেহ জন্মের পর ক্ষুধাদি অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই দেহ অন্নময়, উহা আত্মা নহে, কারণ জন্মের পূর্ব্বে ও মরণের পরে ঐ দেহের বিদ্যমানতা থাকে না।

কথমপরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদি-ষড়্ বিকাররহিতমাত্মানং। (৮) জন্মাদিষড়্-ভাববস্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বস্তমিবাচ্ছাদয়তি।

কিপ্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, জন্মাদিষড়্বিকাররহিত আত্মাকে জন্মাদিষড়্বিকারভাববন্তের ন্যায়, তাপত্রয়-রহিত আত্মাকে তাপত্রয়বন্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে।

যথা কোষঃ খড়্গামাচ্ছাদয়তি, যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি, যথা গর্ভঃ সন্তানমাবরয়তি, তথাত্মানমাবরয়তি। (৯)

যেমন কোষ খড়্গাকে, তুষ তণ্ডুলকে ও গর্ভ সন্তানকে আচ্ছাদন করে, তেমনি স্থূলশরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

(৮) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৫॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ২ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন হে অর্জ্জুন! আত্মার কখন জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া অস্তিত্ব ভজনা করেন না, ইনি অজ, নিত্য (ক্ষয়োদয়রহিত), শাশ্বত (বিকারশূন্য), পুরাণ (পুরাপি নব এব অর্থাৎ পূর্ব্বেও নূতন ছিলেন অথবা পরিণামে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না) শরীর বিনষ্ট হইলে তিনি নষ্ট হন না॥ ২০

তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি॥ ২৪॥

তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত হন॥ ২৫॥

(৯) "অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ৩৩।

প্রাণময়কোষো নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১০)

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, এই সকল মিলিয়া প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

প্রাণ বিকারে সতি, বক্তৃত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব, দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব, গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব, ক্ষুৎপিপাসাদি-রহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবরয়ন্তি।

প্রাণের বিকার হইলে, বক্তৃত্বাদিরহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দাতৃত্বাদিরহিত আত্মাকে দাতার ন্যায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমন-কর্ত্তার ন্যায়, ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে।

মনোময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ-মনশ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১১)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই সকল মিলিয়া মনোময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

কথং?

কি জন্য?

মনোবিকারে সতি, সংশয়রহিতমাত্মানং সংশয়বন্তমিব, শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব, দর্শনাদিরহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবরয়ন্তি।

মনের বিকার হইলে, সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্তের ন্যায়, শোকমোহাদিরহিত আত্মাকে শোকমোহাদিবিশিষ্টের ন্যায়, দর্শনাদিরহিত আত্মাকে দর্শনকর্ত্তার ন্যায় আচ্ছাদন করে।

বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১২)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, এই সকল মিলিয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়।

অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষদ্বারা আত্মা আবৃত থাকেন। আত্মা স্বস্বরূপ, বিস্মরণদ্বারা জননাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করেন। ভাষ্যার্থ। যেরূপ কোষকার (গুটি-পোকা) কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করে, সেইরূপ আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বস্বরূপ-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। কীট যতদিন সেই কোষ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে না পারে, ততদিন তাহার ইতস্ততঃ গমনাগমন ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ আত্মা যতদিন পঞ্চকোষের মধ্যে থাকেন, ততদিন তিনি পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

(১০) "পূর্ণদেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ" ॥৫॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরে পাদাদি মস্তকপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ব্যানরূপে বলপ্রদান করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। উহাও আত্মা নহে, কারণ উহা জড়পদার্থ।

(১১) "অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ।
ঐ ঐ

দেহে অহংভাব ও গৃহাদিতে যিনি মমতা করেন, উহাকে মনোময় কোষ বলে। ঐ কোষ কামক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহা আত্মা নহে। কারণ আত্মার কখনও ভ্রান্তি হয় না ও বিকার হয় না।

(১২) "লীনাসুপ্তৌ বপুর্ব্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥" ৭॥

চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও জাগরণকালে নখাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্ব-শরীর ব্যাপিয়া থাকে, ঐ বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। উহাকে আত্মা বলা যায় না, কারণ ঘটাদিবৎ ঐ বুদ্ধির উৎপত্তি ও লয় হয়।

কথং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে?(১৩)

কিজন্য কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ অভিমানদ্বারা ইহলোক ও পরলোকগমনশীল ব্যবহারিক জীব, এই শব্দবাচ্য হয়?

বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্তারমাত্মানং কর্তারমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব নিশ্চয়রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্য-রহিতমাত্মানং জাড্যাদিবন্তমিবাবারয়তি।

বিজ্ঞানের বিকার হইলে, অকর্তারূপ আত্মাকে কর্তার ন্যায়, অবিজ্ঞানকর্তা আত্মাকে বিজ্ঞানকর্তার ন্যায়, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়বিশিষ্টের ন্যায়, মন্দত্ব-জড়ত্বাদিরহিত আত্মাকে জড়ত্বাদিবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে, এই জন্য।

আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-বৃত্তিমজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১৪)

প্রীতি, আমোদ, প্রমোদরূপবৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ।

কথং?

কি জন্য?

প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদ-প্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব অপরিচ্ছিন্ন সুখরহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্ন সুখমিবাচ্ছাদয়তি। (১৫)

প্রীতি-হর্ষ-বিহাররহিত আত্মাকে প্রীতি-হর্ষ-বিহারবিশিষ্টের ন্যায়, অভোক্তো আত্মাকে ভোক্তার ন্যায়, পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্নসুখের ন্যায় আচ্ছাদন করে, এই জন্য।

শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুচ্যতে।

আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয়।

কথং?

কি জন্য?

সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি।

সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীরবিশিষ্ট হন না।

অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি।

অসত্যস্বরূপ শরীর সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না।

জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ শরীর হন না

---

(১৩) "পুণ্য-পাপ-কর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সম্বন্ধ বিয়োগমপ্রাপ্ত শরীর সংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বাজ্জীব ইত্যুচ্যতে॥" ৬॥ সর্ব্বোপনিষৎসারে।

আত্মা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অনুসারী হইয়া প্রাপ্ত-শরীর সম্বন্ধের বিয়োগকে অপ্রাপ্ত শরীরের সংযোগন্যায় করেন, ইহা যখন দেখা যায়, তখন নানা শরীরের উপাধি অভিমানবশতঃ তাঁহাকে জীব কহা যায়।

(১৪) "কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে" ॥ঌ॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

পুণ্যকর্ম্ম ফলানুভবকালে যে বুদ্ধি আত্মার অন্তর্গত হইয়া আত্মস্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় ও ভোগাবসানকালে নিদ্রারূপে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে আনন্দময় কোষ বলে। ঐ আনন্দময়কোষ আত্মা নহে, ইহা দেখাইতেছেন।

"কদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদাস্থিতেঃ॥"
ঐ ঐ ১০।

আনন্দময়কোষ অন্নাদির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, উহা আত্মা নহে। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বদ্বারা অবস্থান কারণ প্রিয়াদি শব্দবাচ্য আনন্দময়ের কারণভূত যে আনন্দ, উহাই আত্মা। আত্মা দেহাদির ন্যায় অনিত্য নহে,—উহা নিত্য।

(১৫) "ত্বং পদার্থাদৌপাধিকাৎ তৎপদার্থাদৌপাধিকাদ্ বিলক্ষণঃ আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তামাত্রস্বভাবঃ পরমাত্মেত্যুচ্যতে॥ ১০॥ সর্ব্বোপনিষৎসারে।

জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি।

জড়স্বরূপ শরীর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হয় না।

সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি।

সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ শরীর হন না।

দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি।

দুঃখস্বরূপ শরীর সুখস্বরূপ আত্মা হন না।

এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয় সাক্ষী উচ্যতে।

এইরূপে শরীরত্রয় বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী আত্মা, ইহা কথিত হইতেছে।

কথং ?

কিজন্য ?

জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিত্তয়া জানাতি।

জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে, জাগ্রদবস্থা হইবে। স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, স্বপ্নাবস্থা হইবে। সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, এইরূপে অবস্থাত্রয়কে অধিকারিস্বরূপে জানিতেছেন।

অথাত্মনঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমুচ্যতে।

অনন্তর আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা কথিত হইতেছে।

পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং।

পঞ্চকোষ হইতে আত্মা ভিন্ন কেন ?

দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি।

দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

মমেয়ং গৌঃ।

আমার এই গরু।

মমায়ং বৎসঃ।

আমার এই বৎস।

মমায়ং কুমারঃ।

আমার এই কুমার।

মমেয়ং কুমারী।

আমার এই কুমারী।

মমেয়ং স্ত্রী।

আমার এই স্ত্রী।

এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি।

এইরূপ পদার্থবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হন না।

তথা মমান্নময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষঃ মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ মমানন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মানভবতি।

সেইরূপ এই অন্নময়কোষ আমার, এই প্রাণময়কোষ আমার, এই মনোময়কোষ আমার, এই বিজ্ঞানময়কোষ আমার, এই আনন্দময়কোষ আমার, এইরূপ পঞ্চকোষবান্ আত্মা হন না।

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী।

তাহাদিগের হইতে ভিন্ন সাক্ষীস্বরূপ।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি শ্রুতেঃ। (১৬)

ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রসহীন, নিত্য, গন্ধশূন্য, অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও কূটস্থ; সেই ব্রহ্মকে এইরূপ জানিলে আত্মা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ঔপাধিক ত্বং পদার্থ ও ঔপাধিক তৎ পদার্থ হইতে ভিন্ন, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম কেবল তৎপদার্থের সত্তামাত্র যাকে আত্মা কথিত হয়।

(১৬) এই শ্রুতিকঠোপনিষদের তৃতীয়াবল্লী ১৫। এই শ্রুতির পূর্ব্বার্দ্ধ মুক্তিকোপনিষ শ্রীয় ২ অধ্যায়ের ১০। নৃসিংহতাপনী উত্তরে ৯।

তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং।

তজ্জন্য আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইল।

সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে।

কাহারও কর্তৃক বাধিত না হইয়া বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালে একরূপে থাকাকে সদ্রূপ কহে।

বিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিত সর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং বিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৭)

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম, তাহাকে বিদ্রূপত্ব কহে।

আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৮)

নিত্য, নিরতিশয় পরমপ্রেমাস্পদকে আনন্দস্বরূপত্ব কহে।

(১৭) "——যথাদাহং দগ্ধা অগ্নিরবিকল্পোহয়মাত্মা অবাঙ্ মনোগোচরত্বাচ্চিদ্রূপঃ"। নৃসিংহতাপনী উত্তরভাগে ২ খণ্ডে ৮।

যেরূপ দাহ্যবস্তুকে দগ্ধ করিয়া আগ্নি অবিকল্প থাকেন, তদ্রূপ এই আত্মা বাক্য ও মনের অগোচরবশতঃ চিদ্রূপ।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মরাতে দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। (১৯)

ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও দানদাতার পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা শ্রুতি কহেন।

এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি সজীবন্মুক্তো ভবতি। (২০)

এইপ্রকারে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ আমি, এই সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারহিত হইয়া যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন।

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতাত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১৮) "আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রঃ অবশিষ্ট সুখস্বরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে।

যিনি সুখ ও চৈতন্যস্বরূপ ও অপরিমিত আনন্দসাগর এবং অবশিষ্ট সুখস্বরূপ, তাঁহাকে আনন্দ বলা যায়।

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে আত্মার বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

(১৯) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৯ ব্রাহ্মণে ২৮।

(২০) জীবন্মুক্তের লক্ষণ পূর্ব্বে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে দেওয়া গিয়াছে।

অধ্যাত্মরাজ্য।

নিদ্রা-আঁধারে আবরিত সমস্ত ভুবন,
চিন্তা-কুজ্ঝটিকায় মর্ত্ত্য-মানব-নয়ন,
জাগ্রতে দেখে স্বপন,—
ক্ষিতি, জল, গিরি, বন
আলোকিত হ'ল যেন কিসের প্রভায়!
সৃষ্টির বিভূতি-বিভা ভাতিল তাহায়।

২

'মন' নামে নৃপবর
সে রাজ্যের অধীশ্বর,
অন্তর নামেতে রাজ্য খ্যাত চরাচর;
চাঞ্চল্য-বিদ্যুতালোকে পূরিত নগর!

* হিন্দুপত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গীয়া বালিকা কন্যার রচিত।

তথায় প্রকৃতি সতী স্বাধীনা সুন্দরী,
মায়াময়ী সোদরারে আলিঙ্গন করি,
অবাধ্যা দেবীর মত,
রহেন গৃহে সতত,
ভ্রমান্ধ রাজেশ মন নাহি চিনে তাঁরে,
দেবী-রূপে পূজে তাই নানা উপচারে!

৪

বুদ্ধিরূপ-রাজ্য এক আছে কাছে তার,
'বিবেক' তাহার রাজা ভুবনে প্রচার;
নিবৃত্তি তাঁহার কন্যা,
গুণেতে জগৎ-ধন্যা,
বিবেক সে কন্যা করে মন-করে দান,
সরলা সুশীলা সতী পতিগত-প্রাণ।

৫

বালিকা বলিয়া কন্যা বিবেক-রাজন্,
স্বগৃহে পালনে শিক্ষা দিতে অনুক্ষণ।
তাই মন-নৃপবর,
পরিগ্রহে দারান্তর,
কামরূপ রাজ্যমাঝে হরষেতে যেয়ে,
স্বেচ্ছাচারীরাজ্যেশ্বরী বাসনার মেয়ে।

৬

'প্রবৃত্তি' তাহার নাম সুচঞ্চল-প্রাণ,
'ইচ্ছা' তার সহোদরা স্বভাবে সমান!
'সুমতি-কুমতি' তারি
'দুয়া-সুয়া' সহচরী,
তাহাদের সহ গেল পতির ভবনে;
নব ভার্য্যা পেয়ে মন বড় সুখী মনে!

৭

বিলাসেতে নৃপবর ভাসালেন প্রাণ,
রাজ্যেতে উঠিল ভাসি প্রমোদ-তুফান।
প্রবৃত্তি মনের সাধে,
বাহুতে মনেরে বাঁধে,
নিজের বাসনা কাণে ঢালে অবিরত,
আজ্ঞাকারী পতি পালে আদরে সতত।

৮

বিজ্ঞান * আলোক রায় করি আবিষ্কৃত,
সে প্রভায় পত্নীসহ প্রমোদে মিলিত!
স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতিঃ
হীন প্রভা ক্রমে অতি,
জড়জ্ঞানে পূর্ণ মন, ইন্দ্রিয়-সেবায়
পরম পিরীতি লাভ করে নররায়।

৯

ক্রমশঃ জন্মিল তার ছয়টী নন্দন,
আকৃতি আপাত-মিষ্ট প্রকৃতি ভীষণ!
মাতার সমান মতি,
অশান্ত দুর্দ্দান্ত অতি,
সর্ব্বং সহার ভার করিল অসহ
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য।

১০

বিলাস-সুখের স্রোতে ভাসিত যে গৃহ,
তাহাতে উঠিল ক্রমে অসুখ-প্রবাহ,
সামান্য কারণ হ'লে,
পুত্রগণ উঠে জ্বলে,
জীব-মন্ত্রী মন্ত্রীদলে দলে হায় পায় পায়;
স্বরগ নরক হ'ল, নন্দন মরুর প্রায়!

১১

ব্যতিব্যস্ত মন-নৃপ তাদের জ্বালায়,
মাতার প্রশ্রয়ে তারা আরো স্পর্দ্ধা পায়,
আদুরে তনয় ব'লে,
রাজা কিছু নাহি বলে,
কুমতি তাদের 'ধাত্রী' সমানে-সমান।
দুয়া-দাসী সুমতি,—সে দুখে ম্রিয়মাণ!

* এস্থলে জড়-বিজ্ঞানই লক্ষ্য।

১২

কি জানি কিসের বলে কুমতি প্রধানা,
প্রবৃত্তি তাহার কাছে যেন আছে কেনা!
সুমতিকে পায়-পায়
কুমতি দলিয়া যায়,
প্রবৃত্তি উপেক্ষা করে কুমতির কাজ,
নীরব নিশ্চেষ্ট স্ত্রৈণ মন-মহারাজ!

১৩

দুর্দ্দান্ত তনয়গণ বয়সের সহ,
বাড়াইল কুকার্য্যের কদর্য্য প্রবাহ!
রজস্তম সর্ব্বনেশে
ইয়ার যুটিল এসে;
ঈর্ষা-ঘৃণা-প্রতারণা পূরে অন্তঃপুরী,
প্রীতি-ভক্তি-ধৃতি রহে মরমেতে মরি!

১৪

অবিচারে অত্যাচারে ক্ষুব্ধ প্রজাগণ,
জানায় রাজেশ-পদে দুখ-বিবরণ।
প্রবৃত্তি-বশেতে মন,
কিছুতে না দেন মন,
বিষয়-কামনা-বশে ভাসাইয়া প্রাণ,
প্রবৃত্তি সহিত ক্রমে রসাতলে যান!

১৫

বিশৃঙ্খল হল রাজ্য, গেল ধন-মান,
মোহে মতিচ্ছন্ন রাজা জরাজীর্ণ-প্রাণ!
দুর্দ্দান্ত তনয়গণ,
আরো হয়বিতমন,
অবাধে অবৈধ বিধি সাধে নিরন্তর,
পুত্রের কুকার্য্যে সুখী মাতার অন্তর!

১৬

কুমতি সুখিনী অতি হেরিয়া সকল,
প্রবৃত্তি-তনয়ে তোষে দিয়া স্নেহজল।
রোগগ্রস্ত পতি হায়!
প্রবৃত্তি না মানে তায়,
আনন্দ-উৎসাহ আরো—বিজয়উল্লাস!
অন্তরে রৌরব, মুখে গৌরবের হাস!

১৭

কোন চিন্তা নাহি মনে, কুমতির সহ,
ভোগের সুযোগ সুধু খুঁজে অহরহ।
ঘোর অশান্তির ঘর,
তার কাছে সুখকর!
বিষাদে প্রসাদ-ভাব তাই নিরন্তর;
বিষাদে সুমতি কিন্তু একাই কাতর।

১৮

এ সব সম্বাদ পেয়ে বিবেক-রাজন্,
পাঠালে জামাতৃগৃহে তনয়া তখন।
বিবেচনা-সহচরী
লয়ে এল করে ধরি,
সে শ্মশান-পুরীমাঝে নিবৃত্তি-রাণীরে;
পতি-দশা দেখি সতী ভাসে আঁখি-নীরে।

১৯

নিবৃত্তি আসিয়া গৃহে মোহিনী প্রভায়
মোহিত করিল সবে, বিষাদ পালায়!
নিবৃত্তির আচরণে
কুমতি প্রমাদ গণে,
নিবৃত্তি-সেবায় নাহি পায় অধিকার!
সুমতি সেবিকাবেশে এল পাশে তার।

২০

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ স্থান পেলে মন-সিংহাসনে,
থামাইল নীতি-ভাবে ভীমপুত্রগণে।
কনিষ্ঠাভগিনী-ভাবে,
প্রবৃত্তিরে তুষি তবে,
রাখিল আপন হাতে হরে, পাপ, বল,
মনের চাঞ্চল্য-তাপ করিল শীতল।

২১

কুমতিরে তাড়াইল, সুমতি উপর
পুত্রের পালন-ভার দিল অন্তঃপর।

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিসহ,
সুখে রহে অহরহ,
কভু রাজ্যেশ্বরী রূপে কহে নীতিবাণি,
কভু দাসী ভাবে পুজে পতি-পা-দুখানি।

২২

এ রূপেতে কত দিন হইল অতীত,
মনের চাপল্য-তাপ ক্রমে তিরোহিত;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-সাথে
চলিল সরল পথে,—
পুত্রগণ হ'ল ক্রমে সুমতি-শাসিত,
পুরবাসীগণ হ'ল হরষিত-চিত।

২৩

নিবৃত্তির অহৈতুক-প্রেমের বন্ধন!
শুভক্ষণে দম্পতির শুভ-সম্মিলন!
সুনীতির 'ধ্রুব' প্রায়,
তাহ'তে আত্মজ পায়,
যাহ'তে মুক্তির পথ হবে পরিষ্কার,
'ত্যাগ' নামে পুত্র সেই ভুবনে প্রচার।

২৪

ধরা-ধন্যা 'ভক্তি'-কন্যা অযোনি-সম্ভবা,
শুভক্ষণে ত্যাগ সনে হ'ল তার বিভা।
'মাণিক-কাঞ্চন' প্রায়,
দুটী আত্মা শোভা পায়!
'জ্ঞান' নামে তাঁহাদের তনয় হইল,
স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতি গৃহ আলোকিল!

২৫

দেখাইল পিতামহে সেই মুক্তি-পথ,
(সাগর-বংশের তরে যথা ভগীরথ)
মুক্তি-পথে মনবর,
হইলেন অগ্রসর,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই ভার্য্যাসহকরি,
লভিলেন ভবার্ণবে হরি-পদ-তরী।

২৬

জ্ঞান রাজা হল, রাজ্য হ'ল জ্ঞানময়,
ভবের পাতক সব বিদূরিত হয়।
মুক্ত হল মনবর,
মিশিলা অনন্ত পর,
প্রবৃত্তি স্বভাবে র'ল, নিবৃত্তি-সাধিত—
অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরাজ্য হইল স্থাপিত।

৺প্রভাবতী দেবী।

দক্ষ-যজ্ঞ।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ আর্য্য-ঋষিগণের াদরের ধন ও অন্তরের বস্তু। লোক-শিক্ষার ন্য দৃষ্টান্তসহ নীতিশাস্ত্রের উপদেশসমূহ যেমন ধিক ফলোপদায়ী ও উপকারী, সাধারণ াকের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত শ্রুতি ও স্মৃতির ক্ষিপ্ত উপদেশাবলী তেমনই পৌরাণিক পাখ্যানে সুচারুরূপে পরিণত হওয়ায় বড়ই দ্ধয় ও হিতকর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ায়ে নব্যশিক্ষিত, ইংরাজীমন্ত্রে দীক্ষিত "ইয়ং ঙ্গল"-দল যেরূপে ও যেভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র ঝতে এবং বুঝাইতে চান এবং যতক্ষণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষয়ের অপরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে বা শুনিতে সুবিধা না পান, ততক্ষণ তৃপ্ত, শান্ত বা নিবৃত্ত হন না। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যান-রহস্যগুলি সেরূপে ও সে-ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি না। সুতরাং ত্রিকাল-দর্শী আর্য্য-ঋষির মতামত যখন বুঝিতে না পারি, তখন অসম্ভব 'গাঁজাখুরী' গল্প বলিয়া সে সকল উপহাসছলে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি না। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া সেই আশু-অবোধ্য বিষয়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সংশয়-নির-

সনে যত্নবান্ হইয়া থাকে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি স্বরূপ—আচার্য্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলে এবং জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা তিনি নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দিলে, বাহ্যপদার্থের দর্শন দূরে থাকুক, অন্তঃস্থ দ্রব্যনিচয়ও সহজে সুদৃশ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পাঠকগণকে 'গীতা'র দশম ও একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যে অপরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আচার্য্যের অপার শক্তি ও অতুল মহিমার পরিচয় পাইবেন। আমরা গুরু-কৃপায় যেরূপে ও যে ভাবে শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি ও তাহার রহস্য জ্ঞাত হইয়া অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ভগবানের মহিমা ও গরিমার প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটী পৌরাণিক উপাখ্যান আজ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করিলাম। বলা বাহুল্য, অনুকূল যুক্তির সহিত শাস্ত্রমর্ম্মাবধারণ ও গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

যে পৌরাণিক উপাখ্যান আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তাহার নাম সর্ব্বজন-শ্রুত ও সর্ব্বজন-জ্ঞাত "দক্ষযজ্ঞ"। সাদা কথায় প্রথমতঃ দক্ষযজ্ঞের গল্পটী বলিয়া রাখা ভাল। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতির সতী নাম্নী কন্যার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পর শিব-সতী কৈলাসে বাস করেন। দক্ষ নিজে রাজা, বড় লোক, কিন্তু তাঁহার জামাই শিব ভিক্ষুক ও শ্মশানবাসী। দক্ষ এজন্য তাঁহার প্রতি নিয়ত বিরক্ত, আবার শিবও এ অবস্থায় শ্বশুরের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। এক দিন ভৃগুর যজ্ঞস্থলে সকলেই অভ্যুত্থানাদির দ্বারা দক্ষের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিলেন, কিন্তু শিব কোনরূপে তাঁহার প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না। একে শ্বশুর বড়লোক, আবার অভিমানী, এ অপমান তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল; তিনি নিজালয়ে আসিয়াই এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিভুবনের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, কেবল বাদ রহিলেন, জামাই শিব আর কন্যা সতী। শিবকে বাদ দিয়া এ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করাই দক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নিমন্ত্রণ করিবার ভার ছিল দেবর্ষি নারদের উপর। নারদ কলহ ব্যাপারে মহানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখা তাঁহার একটী প্রিয়কার্য্য। তিনি দক্ষের মনোভাব বেশ বুঝিয়াছিলেন। শিবের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে শিব ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া, তিনি ছলে কৌশলে কৈলাসধামে গিয়া শিবের নিকট—বিশেষতঃ সতীর নিকট দক্ষের যজ্ঞ বিবরণ, শিব সতীর নিমন্ত্রণ বন্ধ উত্তমরূপে জানাইলেন। পিতা হইয়া কন্যার প্রতি এত মায়ামমতাহীন কেন, এসকল কথাও পাড়িলেন এবং এ সমারোহ-ব্যাপার সতী না গেলে শোভা পাবে না এবং এ অদ্ভুত যজ্ঞ-ব্যাপার অতীব দর্শনীয়, তাহাও নানারূপে বুঝাইলেন। আবার পিতৃগৃহে কন্যা অনিমন্ত্রণে গেলেও কোন দোষ হয় না, এ ভাবও আকার-ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন। নারদের গমনের পর সতী 'দক্ষযজ্ঞ' দর্শনে উৎসুক হইয়া, শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, বরং এ যজ্ঞে না যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। 'আমার অপমান করা—সর্ব্বজনসমক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ না করা যখন তোমার পিতার উদ্দেশ্য, তখন এ যজ্ঞে তোমার যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়।'

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | পৌষ ও মাঘ।

দক্ষ-যজ্ঞ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তুমি এ যজ্ঞে গেলে আমার অপমান আরও বাড়িবে। আবার তোমাকে দেখিয়া পিতার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিবে, তখন তিনি আমাকে নানারূপে নিন্দা ও অপমান করিয়া তোমাকেও হয়ত তিরস্কার লাঞ্ছনা করিবেন। তুমি সহজেই অভিমানিনী, সে সকল অনুযোগ অভিযোগ সহজে সহ্য করিতে পারিবে না, শেষে কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা—তাই বলি, এ যজ্ঞে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।” শিব যতই বুঝাইলেন, সতী কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছলে, কৌশলে, অনুনয়, বিনয়ে, যখন শিবকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন স্ত্রীজাতিসুলভ নানা মায়া ও বিবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কোনরূপে পতির আংশিক সম্মতিলাভ করিলেন এবং তাহাকেই অনুমতিজ্ঞানে প্রিয় পরিচর নন্দীর সহিত 'শিববিহীন দক্ষযজ্ঞ' দর্শনে প্রস্থান করিলেন। গমন সময়ে নন্দীকে মহাদেব নানারূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে মহাসমারোহ—এ যজ্ঞের ধূমধাম বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। এখনও কোন বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইলে লোকে উপমা দিয়া থাকে “এ কি দক্ষযজ্ঞ” ? এই দৃষ্টান্তস্থানীয় দক্ষযজ্ঞের জাঁকজমক বর্ণনাতীত। যজ্ঞক্ষেত্রে সর্ব্বভূতের নিমন্ত্রণ ও অধিষ্ঠান,—নাই কেবল ভূতনাথ! দক্ষ মহাযত্নে মহোৎসাহে যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান। শিবকে নিমন্ত্রণে বাদ দিয়া কি এক আশ্চর্য্য পৌরুষের কার্য্য করিয়াছেন, তাই ভাবিতেছেন; এমন সময় শিবপত্নী তাঁহার কন্যা সতী তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। সতীর দর্শনে দক্ষের ক্রোধানল শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া শিবের নিন্দা ও অপমান করিলেন এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনে আসার জন্য কন্যা সতীকেও অত্যন্ত ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা করিলেন। পিতৃমুখে পতিনিন্দা সতীর অসহ্য হইল। তিনি নন্দীকে সকল কথা বলিয়া, দক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া, পিতৃজাত দেহ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে ত্যাগ করিলেন। নন্দী অবিলম্বে কৈলাসে যাইয়া শিবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাদেব আশুতোষমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক মহা-

রুদ্ররূপে বীরভদ্র প্রভৃতি বীর ভূতগণের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শোকে, রোষে মহারুদ্র মহাভয়ঙ্কর! তাঁহার প্রমত্ত প্রমথগণ নানাবিধ উৎপাত করিয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিল। আবালবৃদ্ধবনিতার, নিমন্ত্রিতব্যক্তিমাত্রেরই অপমান ও লাঞ্ছনা করিল, এমন কি—অনেককে অনেক অত্যাচার ও প্রচুর প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। বীরভদ্র অতি ক্রোধভরে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানলে আহুতিপ্রদান করিল। মোটকথা যজ্ঞ পণ্ড ও নষ্ট হইল। যখন যজ্ঞক্ষেত্রের এই ভীষণ ব্যাপার শেষ হইল, শিববিহীন যজ্ঞের চরম পরিণাম যখন সকলের সবিশেষ অনুভূত হইল, তখন দক্ষের পত্নী প্রসূতি ভয়ভক্তিসহকারে শিবের নিকট কাতরতা জানাইয়া তাঁহার শরণাপন্না হইয়া নিজপতি দক্ষের জীবনদান প্রার্থনা করিলেন। অনেক বিচার বিতর্ক গোলযোগের পর মহাদেব সম্মত হইলেন। শ্বশুরের উপর রাগ থাকিলেও শাশুড়ীর কাতরবাক্যে কতক নরম হইলেন এবং দক্ষের প্রাণ প্রদান জন্য নন্দীর প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু মহা বিভ্রাট্—দক্ষের মাথা নাই। মুণ্ডশূন্যকায় পতিত রহিয়াছে। পরে নন্দীর পরামর্শমত একটী ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোড়া দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। দক্ষযজ্ঞের পরিণামে দক্ষের ছাগমস্তক লাভ হইল! পরে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। বিষ্ণু-চক্রে ঐ দেহ ছিন্ন হইলে একান্ন পীঠের উৎপত্তি হয়। সে সকল নানা কথা। আমাদের এ প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপরে সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণে গল্পমাত্র লেখা হইল। এখন এই ব্যাপারগত রহস্য কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যজ্ঞ আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য প্রয়োজনীয় কার্য্য।

ঋগ্বেদ বলেন—

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যা সন্তি দেবাঃ॥ পুরুষসূক্ত।

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের (যজ্ঞেশ্বরের) পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই মহিমাশালী পুরুষগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন, যেস্থানে বিরাট্পুরুষের উপাসক দেবগণ আছেন। এখন বুঝা উচিত যে, যজ্ঞানুষ্ঠান আমাদের প্রথম ও পরম ধর্ম্ম। ভগবান্ মনু 'পঞ্চসূনাদোষ' নিবারণ জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ (শাস্ত্রাধ্যয়ন), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (বলি) ও নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবন) এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে ইহা নিত্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিধি করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, তিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অকরণে অত্যন্ত দোষ প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মনু আরও বলেন—

অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥
৩৭, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছাকারী পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নরকে গমন করেন।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদবশতঃ যজ্ঞের প্রকারভেদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি নানারূপ হইলেও যজ্ঞের নিত্যকরণীয়তা সর্ব্বত্রই মনুর মতে রক্ষণীয়।

আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণিক গ্রন্থ 'গীতা' যজ্ঞসম্বন্ধে কি বলেন, একবার দেখা যাউক।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥ ৩
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥৩

+ + + +

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪ ॥ ৩
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫।

অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম করণীয়, অন্য বিষয়ক কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মে বদ্ধ হন; অতএব হে কৌন্তেয়! যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের সর্ব্বাভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০।

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপীগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। ১৩।

ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়। ১৪।

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সঞ্জাত, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫।

ঋগ্বেদের, মনুসংহিতার এবং সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ 'গীতা'র কয়েকটী শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়া আমরা যজ্ঞের নিত্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। পুরাণ ও দর্শনে এ বিষয়ের অনেক যুক্তি প্রমাণ আছে, বাহুল্যভয়ে সে সকল সঙ্কলনে নিরস্ত হইলাম। যজ্ঞের ফলে ও বলে লোকে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। যজ্ঞের পরিণাম যাজকের পক্ষে নিত্য মঙ্গলকর। এখন ইহা আশ্চর্য্যের ও কৌতুকের বিষয় যে, এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় মহোপকারী ও ফলপ্রদ যজ্ঞ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দক্ষপ্রজাপতির দুর্দ্দশা ও যজ্ঞনাশ কেন ঘটিল? ইহার একমাত্র উত্তর 'শিববিহীন যজ্ঞ' বলিয়া দক্ষ যজ্ঞের সুফল পাইলেন না, বরং বিপরীত ফল লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল। এবিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে শিবগতপ্রাণ শান্তমতি ভক্ত পুষ্পদন্ত স্বকৃত 'মহিম্নস্তোত্রে' যাহা বলিয়াছেন, বিশদ হইবে ভাবিয়া আমরা তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম।—

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥২০॥
ক্রিয়াদক্ষোদক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥২১॥

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ যজ্ঞের কার্য্য শেষ ও অগ্নিনির্ব্বাণ হইলে যজ্ঞকর্ম্ম যখন নষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন যজ্ঞকারীর পক্ষে ফলযোগবিষয়ে কেবল তুমিই অপ্রমাদশীল। যজ্ঞপুরুষ তুমি, তোমার আরাধনা-ব্যতীত কোন্ স্থানে বিনষ্টকর্ম্ম ফলপ্রদ হইয়া থাকে? অতএব লোকসকল তোমাকে যজ্ঞফল প্রদানে প্রতিভূ (জামিন) স্বরূপ দেখিয়া, শ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে দৃঢ়পরিকর হইয়া থাকেন। ২০।

হে শরণদ! শরীরীদিগের অধিপতি (প্রজাপতি) ক্রিয়াপটু দক্ষ স্বয়ং যে যজ্ঞের অধিষ্ঠান

কর্ত্তা, ভৃগু-বশিষ্ঠ প্রভৃতি তেজস্বী ঋষিগণ যে যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি-দেবগণ যে যজ্ঞের সদস্য (বিধিদর্শী) হইয়াছিলেন, ঈদৃশ যজ্ঞও তোমাহইতে বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রভো! তুমি যজ্ঞফলদানে সমুৎসুক, (তবে এ ঘটনা কেন?) কারণ এই যে, শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ নিশ্চয়ই যজ্ঞকর্ত্তার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ২১।

যজ্ঞমাত্রেই প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। যজ্ঞ-ফলদাতা যজ্ঞেশ্বর যজমানের যজ্ঞফলবিধানে নিয়ত উৎসুক। কিন্তু সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান করিয়াও আমরা মনোমত অভীষ্টফললাভে অনেক স্থলে বঞ্চিত হই কেন? এই বিষম সমস্যার সদুত্তর দক্ষযজ্ঞের মত মহাব্যাপারে পাওয়া যাইতেছে। উপরিলিখিত স্তবে ভক্ত পুষ্পদন্ত স্পষ্টই বলিতেছেন, শ্রদ্ধাবিধুর মখ যজ্ঞকর্ত্তার অভিচারের কারণ হইয়া থাকে।

জ্ঞানকর্ম্ম লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি; সময় সময় তাহাদিগকেই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সেবাতেই মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্ত হই। কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মকে অজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের সমতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানের প্রাবল্য প্রকাশিত হইলে যে কর্ম্মদল আপনি হীন ও মলিন হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাই। বাস্তবিক জ্ঞানানল প্রজ্বলিত হইলে কর্ম্মকাষ্ঠ স্বতঃ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পরমার্থ ইহ জগতে আর নাই।

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।'

অর্থাৎ জ্ঞানানল সর্ব্বকর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের প্রখর প্রতাপ ও প্রভূত প্রভাব সন্দর্শন করিয়া সাধক পণ্ডিতগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন; তখন আর তাঁহাদের বক্তব্যাবক্তব্যবিষয়ে কোন স্থিরতা লক্ষিত হয় না; এমন কি—একজন জ্ঞানপ্রয়াসী সাধক জ্ঞানোপাসনার ঘোষণা করিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং
জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং
জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥

স্থূলকথা জ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান পরব্রহ্ম, মহানন্দরসময়, রহস্যময় জ্ঞান অনন্ত জয়শীল, বহুকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা হয় না। জ্ঞানানল প্রবল, তাহাতে হৃদয় আলোকিত হয়, মলিনতা, পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় সত্য, কিন্তু অগ্নিসন্তাপজনিত জ্বালার অনুভূতিত দূর হয় না। ত্রিতাপসন্তাপিত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রতাপ জানিতে পারা যায়। জ্ঞান-প্রভাকরের অপেক্ষা ভক্তি-সুধাকরের নিকট আমরা সেইজন্য স্বতঃ ধাবিত হইয়া থাকি এবং ভক্তি-শশধরের বিমলচন্দ্রিকায় মনঃপ্রাণ সমস্তই স্নিগ্ধ, শান্ত ও সুখময় হইয়া পড়ে। ভক্তির জ্যোৎস্নায় যাঁহার হৃদয় আলোকিত, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, সেই কৃতার্থ ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবের নিকট অজ্ঞান ও কর্ম্ম দূরে থাকুক, জ্ঞানও তখন মলিন ও তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে!

ভক্তি-প্রাণ একজন ভক্ত ভক্তির প্রবাহে পড়িয়া প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই খানে উদ্ধৃত হইল :—

জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হয়ে আগোয়ান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥

আবার—

অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সাধু মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা করে অশেষ ভাবনা॥

শ্রীনরোত্তম দাসের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ভক্ত বলিতেছেন—ভক্তিহীন অভিমানী ব্যক্তি জগন্মধ্যে অতিশয় দীন; অশেষ ভাবনায় তাহার কোন ফল ফলে না। এই অখণ্ডনীয় যুক্তির দৃষ্টান্ত দক্ষপ্রজাপতি। পুষ্পদন্ত দক্ষের দক্ষতা, মহিমাপ্রভৃতি স্বীকার করিয়াও একমাত্র শ্রদ্ধাভক্তির অভাব তাঁহার যজ্ঞবিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরে বিশ্বাসভক্তির উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেছেন, বালকেরা যেমন খুঁটি ধরিয়া নানাভাবে ঘোরে, কিন্তু পড়ে না, আবার সেই খুঁটি ছাড়িবামাত্র অমনি পড়িয়া যায়। সেইরূপ মানব যতক্ষণ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবিধব্যাপারে বিচরণ করে ততক্ষণ তাহার পতন নাই, কিন্তু ঐ সুদৃঢ় অবলম্বন পরিহারের ফল অবশ্যই পতন। সাক্ষী দক্ষপ্রজাপতি।

এখন একবার দেখা উচিত, যে মহাদেবের অবমাননার ফলে দক্ষরাজার যজ্ঞনাশ ও মহতীদুর্দ্দশা সংঘটিত হইল, তিনি কে?— শাস্ত্রে নানাস্থানে তাঁহার নানারূপ নানাবিভূতি নানাভাবে বর্ণিত আছে, আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার নিমিত্ত শিবগীতা হইতে তাঁহার নিরাকার সাকার স্বরূপের বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতং শিবং।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্মকারণম্॥
একং বিভুং চিদানন্দমরূপমজমদ্ভুতম্।
শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধ ধারিণম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্।
পরাভ্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগং।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহম।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎপশ্যন্তিমাং জনঃ॥

অর্থাৎ ঃ—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অমর, শিবস্বরূপ আদি-অন্ত-মধ্যরহিত, প্রশান্ত, কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, একমাত্র, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানানন্দস্বরূপ, অরূপ, অজ, অদ্ভুত, শুদ্ধস্ফটিকপ্রভ, উমার দেহার্দ্ধভাগী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটাধর, চন্দ্রমৌলি, নাগযজ্ঞোপবীতধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-উত্তরীয়ধারী, পূজনীয়, অভয়প্রদ, ঊর্দ্ধ দুইকরে পরশু ও মৃগধারী, চন্দ্রসূর্য্যানল-নয়ন, সহাস্যমুখপদ্মবিশিষ্ট, ভূতিভূষিত, সর্ব্বাভরণযুক্ত, এইরূপে আমাকে (আত্মাকে) অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞানমন্থনপূর্ব্বক লোকে যোগবলে আমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়।

শিবের ব্রহ্মত্ব বা শিবত্বসূচক যে সকল পদ শিবগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক দেখিবেন; তৎসমুদায় নানাভাববোধক ও নানার্থপ্রকাশক; আমরা কেবল অনুবাদমাত্র প্রদান করিলাম।

এক্ষণে পরমহংস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিবস্তোত্র হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য যেভাবে ও যেরূপে আর্য্যমত প্রচার ও শিবারাধনা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শৈবমত প্রবলরূপে ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকে তাঁহাকে শঙ্করের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাঁহার শৈবমত

পৌরাণিক নয়, তিনি বেদপ্রতিপাদ্য শিব লইয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শ্লোক দুইটী এই :———

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥

ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্ ॥

অনুবাদ। হে বিশ্বমূর্ত্তে! বিভো! তোমার পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে চিদানন্দস্বরূপ! তোমায় বার বার নমস্কার। হে তপোযোগ-দ্বারা সাধনীয়, তোমাকে বার বার প্রণাম। হে বেদপ্রতিপাদ্যব্রহ্ম! তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥

হে কামনাশক দেবভব! তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। হে বিশ্বনাথ মৃড়! তোমা-তেই জগৎ স্থিত রহিয়াছে এবং হে ঈশ্বর হর! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লীন হয়, কারণ তুমি চরাচর বিশ্বরূপী।

শিবের গুণগরিমা ও তত্ত্বমহিমাসম্বন্ধে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই। নিখিল-ভয়হারী বিশ্বাদ্য ও বিশ্ববীজ মহাদেবসম্বন্ধে ভক্তপ্রবর পুষ্পদন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার তিনটী শ্লোকমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥

ত্রয়ীং তিস্রোবৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীণপি সুরা
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ বিকৃতিঃ।
তুরীয়ন্তে ধামধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতিপদম্ ॥

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবর শাখালেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদাসর্ব্বকালং।
তদপি তবগুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

মহিম্নঃ স্তব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের পরিচিত ও পরিজ্ঞাত। সমস্ত স্তবটীর অর্থ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পূর্ব্বে সবিশেষ আলোচি[ত] হইয়াছে, সুতরাং উদ্ধৃত শ্লোকটীর অনুবা[দ] প্রদত্ত হইল না। পাঠকগণ সহজেই বুঝি[তে] পারিবেন, পরমব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের প্র[তি] অবমাননা ও অভক্তি যে কার্য্যব্যাপা[রে] অনুষ্ঠিত বা সংসূচিত, তাহার পরিণাম বিষ[ম] বিলয় এবং কর্ত্তার অধঃপতন। লোকশিক্ষা নিমিত্ত ও লোকাচারের পবিত্রতা সংরক্ষণ নিমি[ত্ত] সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তিজ্ঞাপ[ন] নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র, সতী ভগবতীর পিত[া] মহাদেবের ও অন্যান্য দেবের শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি মহাশয়ের অধঃপতন আমাদিগ[কে] সুস্পষ্টরূপে ঐ সকল ব্যাপারের নিমিত্ত সত[র্ক] ও সাবধান করিয়া দিতেছে। এস্থলে আ[র] একটী রহস্য পাঠকগণের অবগতির জ[ন্য] সংগ্রহ করিলাম।

দক্ষপ্রজাপতি শিবের প্রতি রুষ্ট, বিরক্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিন্দা, গ্লানি ও অপমা[ন] সূচক কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন সোজাসুজি বুঝিতে গেলে সে কথাগুলি নিন্দা বোধক মনে হয়, কিন্তু অর্থান্তর ও ভাবান্ত[র] গ্রহণ করিলে তৎসমুদায় মহাদেবের শ্রেষ্ঠত[্ব] প্রাধান্য ও অপরূপ ব্রহ্মভাবের জ্ঞাপক হই[য়া] থাকে। পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণনাই আছে টীকাকারগণ তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা করণাবস[রে] তাহার দুই বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান করি[য়া] সংস্কৃতভাষার অদ্ভুত কৌশল ও ভাব পারি[পাট্য]

াট্য এবং আপনাদের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অসীম মহিমাশালী, সর্ব্বশক্তিমান্ মহাদেবের নিন্দা করে কার সাধ্য? ক্ষণিক রোষের আবেগে, অজ্ঞানের প্রাবল্যে, কামের তাড়নায়, অভিমানের বলে দক্ষ কিংবক্তব্যবিহীন হইলেও বাগ্দেবী সরস্বতী কেমন করিয়া মহাদেবের নিন্দাসূচক বাণীরূপে কণ্ঠনিঃসৃতা হইবেন? যে সাবদা সর্ব্বদা মহাদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনি কোন্ সাহসে কিসের জন্য তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব নিন্দাই এস্থলে তাঁহার স্তুতি। আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থলে 'ব্যাজস্তুতি' নাম প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুইটী স্থল হইতে 'দক্ষের শিবনিন্দা' উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটী শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের এবং দ্বিতীয়টী অন্নদামঙ্গলের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইল।

(১)

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ॥
অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ॥
এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ॥
গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃতনোচিতং॥
লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্॥
প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ন্রস্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তোমত্তজনপ্রিয়ঃ॥
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাং॥
তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশোচায় দুর্হৃদে॥
দত্তাবত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা॥

ভাগবত ৪ স্কন্ধ। ২ অধ্যায়।

(২)

সভাজন শুন, জামতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান, কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি মানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কেজানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচার ময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।

ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহা পাপ হয় ॥
অন্নদা মঙ্গল দক্ষযজ্ঞ।

উদ্ধৃতাংশ কিছু বেশি হইল। আমরা সংস্কৃত ভাগের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গলা অংশের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও করিলাম না। সংস্কৃত কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকবর্গ এবং বাঙ্গলা কাব্যপাঠকগণ উভয় স্থলের অর্থযোজনা এবং যুগপৎ শিবের নিন্দা-স্তুতির ভাব গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, এই আমাদের কামনা।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল কেন? কোথায় মহাতেজস্বী দক্ষ প্রজাপতি, আর কোথায় অধম ছাগপশু? এ উভয়ের অসম-সম্মিলন কেন ঘটিল? দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব—এই সকল বিদ্যমান থাকিতে ছাগের মুণ্ড দক্ষস্কন্ধে প্রদত্ত হইল কেন? সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পশু সকল থাকিতেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছাগের মুণ্ডই বা কেন দক্ষের পক্ষে পুনর্জ্জীবনের জন্য যোগ্য বোধ হইল? এস্থলে দেব, মানব ও পশু, এই তিন শ্রেণীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণের আধিক্য ও ন্যূনতানিবন্ধন আমাদের উন্নতি-অবনতি অথবা ঊর্দ্ধগতি-অধোগতি সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু এই তিন গুণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীণ্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্। যৈর্ব্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ ॥ ২৪ ॥
যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে। স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্ ॥২৫
সত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ ॥২৬॥

* * * *

দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥
১২ অধ্যায়।

অনুবাদ। সত্ব, রজঃ, তম, এই তিন আত্মার গুণ, যে তিন গুণে ব্যাপ্ত মহত্তত্ত্ব স্থাবরজঙ্গম-রূপ সকল পদার্থ ব্যাপিয়া থাকেন। ২৪।

যদ্যপি সকল দেহী এই তিন গুণযুক্ত হয়, তথাপি এই তিনের মধ্যে যে গুণের আধিক্য যে দেহে থাকে, ঐ গুণ ঐ দেহীকে লক্ষণাক্রান্ত করে ॥ ২৫ ॥

সত্বগুণের জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান এবং রজোগুণের রাগদ্বেষ লক্ষণস্বরূপ জানিবে। সর্ব্বভূতাশ্রিত বপু এই এই গুণ সকলে পরিব্যাপ্ত ॥

যে ব্যক্তি সত্বগুণবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যে রজোগুণবৃত্তিতে অবস্থিত, সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যে তমোগুণবৃত্তিতে থাকে, সে পশু-পক্ষীপ্রভৃতি নিকৃষ্ট-যোনিত্ব লাভ করে ॥ ৩০ ॥

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় এবং গীতার ১৪শ, ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায় পাঠে এই তিন গুণের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে কেবল ২।১টী শ্লোক তুলিয়া দিলাম; যাঁহারা সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ স্থান পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গীতাতে আছে—
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ ॥
অনুবাদ—

সত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ প্রধান লোকমধ্যে থাকে, নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসপ্রকৃতি ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮।

দেবভাব ও পশুভাবের মধ্যে মানুষভাব। আমাদের কোন বন্ধু ইহা একটী সুন্দর সমীকরণ Equation দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটী বেশ পরিষ্কার হইবে বলিয়া আমরা নিম্নে তাহা দেখাইলাম।

দে = দেবত্ব, মা = মানবত্ব, প = পশুত্ব।

দে + প = মা দে = মা − প প = মা − দে দে + প − মা = 0	সত্ত্বগুণে দেবত্ব, রজোগুণে নরত্ব, তমোগুণে পশুত্ব। ত্রিগুণাতীত তুরীয়ভাব বা ব্রহ্মত্ব।

মানবপ্রকৃতি দেবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতির সম্মিলনে গঠিত। দোষগুণের আকর, আহার, নিদ্রা, ভয়, রোগ, শোক, মোহ, কামাদি রিপুর প্রাবল্যহেতু মানব প্রকৃতি পশুবৎ। রিপুবিশেষের প্রাবল্যে মানব যখন বিবেক বাক্য অবহেলা করিয়া কদাচার পরায়ণ হইয়া জঘন্য হেয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমরা তখন নরাকার পশু বলিয়া তাহাকে বুঝিয়া থাকি। দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা স্নেহ প্রভৃতি সদ্‌গুণে মানব যখন বিভূষিত এবং ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রণোদিত হইয়া যখন দেবোপম সাধু হৃদয়ে ও শান্তচিত্তে পুণ্যকার্য্যের ব্যবস্থায় অবহিত হয়, তখন আমরা তাহাকে নরলোকে দেবতা বলিয়া প্রশংসা ও পূজা করিয়া থাকি।

এতাবতা আমরা গুণত্রয়ের আলোচনায় মানব প্রকৃতি লইয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের কার্য্যগুণে আমরা সময়বিশেষে দেবত্ব বা পশুত্ব লাভ করি এবং মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলি। এখন দক্ষের কাজ দক্ষের অভিমান ও দক্ষের কামনা মনন করিয়া দেখুন। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর মহাদেবকে ভুলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার অংশ বাদ দিয়া যে যজ্ঞ করিতে যায়, তাহার দেবভাব কোথায়? তাহার পশুত্ব অনিবার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই জন্যই দক্ষের পশুমুখ হইল। এক্ষণে ছাগমুণ্ড কেন হইল তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত। মহাদেব যখন দক্ষপত্নী প্রসূতির স্তবে প্রসন্ন হইয়া দক্ষের পুনর্জীবন আদেশ প্রদান করেন, তৎপূর্ব্বে নন্দী যাহা বলিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন দক্ষের ছাগমুণ্ড দেওয়ায় ব্যবস্থা নন্দী কেমন যুক্তিসহকারে জানাইতেছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ নন্দীর শাপই দক্ষের ছাগমুণ্ডের কারণ, সুতরাং নন্দীর উক্তি এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। দক্ষযজ্ঞ বিবরণ নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতে নন্দীর অভিশাপ উদ্ধৃত করিলাম। নন্দীর শাপেও অনেক কথা আছে, যে অংশটুক আমাদের প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিলাম।

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত নিতরাং দক্ষোবস্তমুখোঽচিরাৎ॥
৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

অনুবাদ—

দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান ও বিশ্বাস করে। সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছে। সে পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকাম হউক এবং অচিরে ইহার ছাগমুখ হউক। যে অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া বোধ করে, সে বস্তুতঃই ছাগতুল্য, অতএব তাহার ছাগবদন হওয়াই উচিত।

কোন কোন পুরাণের মতে সতীর শাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। যাহা হউক কামপরায়ণ দক্ষের কামরূপী ছাগের মুণ্ডই প্রশস্ত। পূজার অঙ্গ বলিয়া বলিদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ। লৌকিক আচারে অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা ছাগ ও মহিষ প্রভৃতি কাটিয়া থাকি। বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে জীবন্ত ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান করিয়া থাকি।

কিন্তু বাহ্যপূজার পূর্ব্বে শাস্ত্রানুমোদিত পূজা পরায়ণ সাধকের অভ্যস্ত মানসপূজার ব্যবস্থা। এই পূজাতে মানসোপচারে পাদ্য, অর্ঘ্যপ্রভৃতি দেওয়ার বিধি। যথা হৃৎপদ্মে আসন, সহস্রার চ্যুতামৃতে পাদ্য ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চমোল্লাসে ইহার সবিশেষ বিচরণ লিখিত আছে। পূজার পর "কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্বা জপং চরেৎ ॥

কাম ও ক্রোধকে ছাগ মহিষরূপে বলিদান দিয়া জপাচরণ করিবে। পুরাণ ও তন্ত্রের মতে যে সকল স্থলে বলিদানের ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থানেই ছাগের সহিত কামের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ছাগের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কামমূলক এবং এই জন্যই অনন্ততত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানসপূজার বলিদানে কামকে ছাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কামাদি ছয়টী রিপুকেই জন্তুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সে সকল বলিদানের কথা। আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সকলের উল্লেখ ও সমালোচনা অনাবশ্যক।

এখন কামাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ও নিষ্ঠা ভক্তিবিহীন দক্ষের প্রধান অঙ্গ (মস্তক) লইয়াই যত গোল। মাথাটার দোষেই বেচারার এত বিড়ম্বনা। হস্ত, পদ, বক্ষঃ, কক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ সকলই বাহাল থাকিল বীরভদ্র আসিয়া তাঁহার মাথাটাই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নন্দী ও পুনর্জ্জীবনের সময় যোগ্যবিবেচনায় অজমস্তক দক্ষস্কন্ধে সংযোজিত করিয়া দিব্য দৃষ্টিতে তাঁহার দোষরাশি বিকাশিত করিয়া তাঁহার পশুত্ব ও কামাত্মতা বিষয়ে জগতের সকলের নিকট জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদান করিলেন। দেহকে যে আত্মা বুঝে, তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা যে জানে না, পরম পুরুষের অস্তিত্বে যার বিশ্বাস নাই, সে পশু নয় ত কি? তার মস্তক পশুর মস্তক। তার দেহমাত্র নরদেহ। এই মহাতত্ত্ব জ্ঞাপন জন্যই দক্ষের অধঃপতন।

কামের অদ্ভুতশক্তি—কামের সর্ব্বানর্থকরী ক্ষমতা দেব, নর ও তির্য্যক্ সকল সমক্ষেই নিত্য পরিচিত ও নিত্য পরীক্ষিত। আমরা কেবল ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়া কামসম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩

গীতা—২য় অধ্যায় আবার ৩য় অধ্যায়ের ৪৩ ব' শেষ শ্লোক।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদ ॥

এই ত শ্রীভগবানের জ্ঞানময় উপদেশ শুনিলেন। আবার মনু বলেন,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥

জ্বলন্ত আগুনে ঘৃত দেওয়া আর ভোগ্যবস্তু দ্বারা কামদমনে চেষ্টা সমান। তাই তিনি বলেন 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

এখন একজন ভক্তের কথা শুনুন,—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকের
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

আমরাও এখন সর্ব্বকালবিধায়ক, কাল-কামিনীসাধক কামান্তক শ্রীবামদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া দক্ষযজ্ঞ হইতে অবসর লইলাম।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

সামবেদসংহিতা।

সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ অতি প্রাচীন (১) ও অত্যন্ত সারবান্। বেদের অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদের উৎপত্তি (২) সুতরাং ইহা অলৌকিক ইহা যে কিরূপ মূল্যবান তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। যাঁহার যত বুদ্ধির তেজ তিনি তত রূপ অর্থ করেন। কেহ আধিদৈবিক, কেহ আধিভৌতিক ও কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া থাকেন। বেদের ভাব অতি গভীর। (৩) এই বেদকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তজ্জন্য মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম জানিতে হইলে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ (৪)। সুতরাং বেদ আমাদিগের আরাধ্য বস্তু। ইহা সামান্য শ্লোক-বদ্ধ পুস্তক অথবা "চাষার গান" বলিয়া অবজ্ঞা করিলে আমাদিগকে পাপভাক্ হইতে হয়। যদি আমরা বেদকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করি তাহা হইলে আমরা মূর্খ, কারণ মহতের মহত্ত্ব না জানিয়া নিন্দা করা মূর্খের ধর্ম্ম। (৫) যেরূপ ব্রহ্মার গুণগান করিয়া

---

(১) বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

মনুঃ ১অ, ২১।

(২) অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।

আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

বেদান্তদর্শনে ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ২৮ সূত্র শঙ্কর-ভাষ্যে স্মৃতিবচনং।

ব্রহ্মা প্রথমে উৎপত্তিবিনাশবর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যে বাণী হইতে এ সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রের সমুদায় ভাষ্য পাঠ করিলে জানা যায় যে বেদ কোন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্থির নাই। প্রলয়কালেও সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় বেদ অবস্থান করেন "প্রলয়কালেঽপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিত."। কল্লূকভট্টঃ।

"নৈব বেদাঃ প্রলীয়ন্তে মহাপ্রলয়েঽপি মেধাতিথিশ্চ মনুসংহিতায়াং ১ অ, ২১ শ্লোকে মহাপ্রলয়েও বেদ নষ্ট হয় না। ব্রহ্মা যখন প্রলয়ান্তে সৃষ্টি করেন তখনই বেদ হইতে শব্দ লইয়া যাহার যেরূপ ছিল তাহাকে সেরূপ প্রদান করেন।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদ."।

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২, ৪, ১০।

ঐ ৪, ৫, ১১।

মৈত্রী উপনিষৎ ৬, ৩২।

যাহা ঋগ্বেদ তাহা সেই মহদ্ভূত ব্রহ্ম হইতে নিশ্বসিতের ন্যায় বিনা ক্লেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) "অতি গম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং" ইত্যাদি।

ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায়াং সায়নাচার্য্যঃ।

(৪) শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।

বেদান্তদর্শনে ১অ, ১ পাদে, ৩ সূত্রং।

শাস্ত্রমেব যোনিঃ কারণম্ উপায়োঽস্য (স্বরূপাবগতৌ) যাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার জন্য শাস্ত্রই একমাত্র কারণ।

(৫) বুদ্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্।

শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অ, ১৫।

ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্তব্যক্তি মহতের তেজ দেখিতে পায় না।

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং

দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥

কুমারসম্ভবে ৫ সর্গে ৭৫।

মূঢ় লোক মহতের চরিত্রকে বুঝিতে না পারিয়া ইতর সাধারণ বোধে নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ইতর সাধারণের বোধগম্য নহে।

শেষ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বেদের মাহাত্মাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই বেদ অভ্যস্থ রাখিয়া নারদ ঋষি জাতিস্মর হইয়াছিলেন। আর্য্য-ঋষিগণ ইহার গৌরব বুঝিতেন তজ্জন্য তাঁহারা বাল্যকাল হইতে পরম যতনে ইহাকে হৃদয়ের ধন বিবেচনা করিয়া অভ্যস্থ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে ইহাই তাঁহাদের স্বর্গ (৬) ও ইহাই তাঁহাদের মোক্ষ, সুতরাং বাল্যকাল হইতে গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ পাঠ করিতেন। আমার গুরু পশ্চিম প্রদেশস্থ জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীমরাম মহাশয় ও বাল্যকালেই বেদ পাঠ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদের দেশের লোকে যে নিয়মে বেদ পাঠ করেন তাহা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাঁহাদের দেশে যে বেদের আদর এইক্ষণও আছে তাহা শুনিয়া চিত্ত আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়।

আমার বেদের অন্যতম গুরু ব্যাঙ্কট বদরাচার্য্য মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে "প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোটা কয়েক মন্ত্র অভ্যাস করিবে।" তিনি বেদের এত আদর করেন যে, এ বৃদ্ধ বয়সে ও প্রতিদিন পাঠ করিতে ক্ষান্ত হন না। তাঁহার পৈত্রিক ভূমি দ্রাবিড় দেশে এক্ষণেও বেদের যথেষ্ট আদর আছে।

বেদের মধ্যে সামবেদের ভাষা অতি শ্রুতিমধুর, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন যে "বেদের মধ্যে আমি সামবেদ"(৭)। আমি প্রথমতঃ উহা আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয়ের হস্তলিখিত পুঁথি লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করি। আমি কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে হিন্দুপত্রিকার পাঠকদিগের জন্য সামবেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেবস্থ।

(৬) "তথা তেন জ্ঞানেন পাপক্ষয়ে সতি মৃতঃ স্বর্গং প্রাপ্নোতি। ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায়াং ভগবান্ সায়নাচার্য্যঃ

(৭) "বেদানাং সামবেদোঽস্মি———।" শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অ, ২২।

সামবেদসংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

হরিঃ ওম্। (১)

অগ্ন আয়াহীত্যেষা ভরদ্বাজেন (২) দৃষ্টা (৩) গায়ত্রী (৪) আগ্নেয়ী (৫)।

অর্থাৎ ভরদ্বাজ ঋষি এই ঋক্ প্রয়োগফল দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

(১) বেদ পাঠের আদি ও অন্তে "ওম্" শব্দ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য এতদ্বিষয়ে প্রমাণঃ—

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোংকৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি॥

মনুঃ ২ অ, ৭৪

(২) ভরদ্বাজশব্দ যোগরূঢ়ঃ; বাজস্য অন্নস্য ভরণাৎ ভরদ্বাজঃ।

(৪) গীয়ন্তে স্তূয়ন্তে দেবতা অনয়েতি গায়ত্রী—যাহা দ্বারা দেবতাদিগকে স্তব করা যায় তাহাকে গায়ত্রী কহে। নিরুক্ত ৭, ৩, ৬ যথা গায়ত্রী গীয়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ইতি। উহা অষ্টাক্ষরাত্মক তিন পাদ নিবদ্ধ ছন্দোবিশেষ।

(৫) অনয়া ঋচা অগ্নির্দ্দেবোপাস্য ইত্যর্থ—এই ঋক্ দ্বারা অগ্নিদেবকে উপাসনা করা যায়।

সৈষা প্রথমা।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসিবর্হিষি॥ ১॥

হে অগ্নে!=অঙ্গনাদি গুণবিশিষ্ট!

আয়াহি=অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ=আমাদের যজ্ঞে আইস।

বীতয়ে=হবিষাং চরু পুরোডাশাদীনাং ভক্ষণায়=ঘৃত ও চরু আদি ভক্ষণ জন্য।

গৃণানঃ—অস্মাভিঃ স্তূয়মান আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া।

হব্যদাতয়ে—দেবেভ্যোহবিঃ প্রদানায়—দেবতা সকলকে ঘৃত প্রদান জন্য।

হোতা—দেবানামাহ্বাতা সন্—দেবতা সকলের আহ্বানকর্ত্তা হইয়া।

বর্হিষি—আস্তীর্ণে দর্ভে—পাতিত কুশাসনে।

নিষৎসি—নিষীদ—উপবেসন কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া যজ্ঞ সম্বন্ধীয় চরু পুরোডাশাদি ভক্ষণ জন্য ও অন্যান্য দেবতাগণকে দিবার জন্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। আসিয়া দেবতা সকলের আহ্বানকর্ত্তা হইয়া এই পাতিত কুশাসনে উপবেসন কর॥ ১॥

ত্বমগ্নে ইত্যস্যা ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ।

"ত্বমগ্নে" এই ঋকের ঋষি আদি পূর্ব্ববৎ।

সৈষা দ্বিতীয়া।

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।
দেবেভির্মানুষে জনে॥ ২॥

হে অগ্নে! হে অগ্নি!

ত্বং—তুমি

বিশ্বেষাং যজ্ঞানাং—অগ্নিষ্টোমদীনাং—অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলের।

হোতা—হোমনিষ্পাদনশীলঃ—হোমনিষ্পন্নকারী।

মানুষে—মনোরপত্যভূতে যজমান লক্ষণে—যজমান লক্ষণ মানব সকলে।

দেবেভিঃ—দৈ :—দবনশীলৈ ঋত্বিভিঃ—দীপ্তিশালী ঋত্বিকগণদ্বারা।

হিতঃ—নিহিতঃ গার্হপত্যাদিরূপে সংস্থাপিতো ভবসি—গার্হপত্যাদিরূপে স্থাপিত হও।

হে অগ্নি! অগ্নিষ্টোমাদি সমুদায় যজ্ঞের হোতা কারণ তুমি মানবগণের জন্য দীপ্তিশীল ঋত্বিক্‌গণ (১) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছ॥ ২॥

অগ্নিন্দূতমিত্যেষা কন্বপুত্রেণ মেধাতিথিনাদৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা তৃতীয়া।

অগ্নিন্দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ৩॥

দূতম্—দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং—দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত।

অগ্নিং—অগ্নিদেবকে।

বৃণীমহে—স্তুতিভির্হবির্ভিঃ সম্ভজামহে—স্তুতিদ্বারা ও ঘৃতদ্বারা আরাধনা করি।

হোতারং—সাধুদেবানামাহ্বাতারং—সাধু ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী।

---

(১) ঋত্বিক—পুরোহিত।

যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত চারিজন। হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্গাতা। এই চারিজন পুরোহিতের অধিনে তিনটি তিনটি আরও দ্বাদশটি ঋত্বিক্ আছেন।

হোতার অধিনে তিনটী যথা	—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবক ও গ্রাবস্তুৎ।
অধ্বর্য্যুর " " "	—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা।
ব্রহ্মার " " "	—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র ও পোতা।
উদ্গাতার " " "	প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য।

বিশ্ববেদসং—বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ তং—বিশ্ববেত্তাকে।

অস্য—প্রবর্তমানস্য যজ্ঞস্য—এই প্রবর্তমান যজ্ঞের।

সুক্রতুম্—নিষ্পাদকত্বেন শোভনকর্ম্মাণং—নিষ্পাদনজন্য শোভনকর্ম্মাকে।

এই প্রবর্তমান যজ্ঞের নিষ্পাদনকারী দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেবতাদিগের হোতা বিশ্ববেত্তা অগ্নিদেবকে স্তুতি ও ঘৃতদ্বারা আরাধনা করিতেছি।

অগ্নির্বৃত্রাণীত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা চতুর্থী।

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া।
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ ॥ ৪ ॥

দ্রবিণস্যুঃ—দ্রবিণং ধনং স্তোতৃণামিচ্ছন্—স্তোতাদিগের ধন ইচ্ছা করিয়া অথবা হবির্লক্ষণং ধনং তদাত্মন ইচ্ছন্নগ্নিঃ—অগ্নি হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া।

বিপন্যয়া—অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণয়া স্তুত্যা—আমাদিগের ক্রিয়মাণ স্তুতিদ্বারা (স্তূয়মান হইয়া)।

বৃত্রাণি—(বলেন) জগতামাবরকাণি রক্ষপ্রভৃতীনি তমাংসি বা (বলদ্বারা) জগতের আবরক রক্ষপ্রভৃতি অথবা তম।

জঙ্ঘনৎ—ভৃশং হন্তু—একবারে নষ্ট কর।

সমিদ্ধঃ—সমিদাদিভির্হবির্ভিঃ সম্যগ্দীপিতঃ—সমিৎ কাষ্ঠদ্বারা অথবা হবিদ্বারা সম্যক্রূপে দীপিত।

শুক্রঃ দীপ্যমানঃ—দীপ্তিশালী।

আহুতঃ—হবির্দ্বারা আহুত।

যিনি সমিৎ কাষ্ঠদ্বারা সম্যগ্দীপ্ত ও হবির্দ্বারা আহুত অতএব অত্যন্ত দীপ্তিশালী সেই অগ্নিদেব হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া বৃত্র (১) সকলকে একবারেই নাশ করুন ॥ ৪ ॥

প্রেষ্ঠং ব ইত্যেষা উশনসা দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা পঞ্চমী।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্ ॥ ৫ ॥

হে অগ্নে!

বঃ (২)—আপনাকে।

স্তুষে—স্তৌমি—স্তব করি। [আমি উসনা]

প্রেষ্ঠং—স্তোতৃণামস্মাকং ধনদানেন প্রিয়তমম্—স্তোতাদিগের ধনদ্বারা প্রিয়তম।

অতিথিং—সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং—সকলের দ্বারা অতিথির ন্যায় পূজ্য।

প্রিয়ং—স্তোতুঃ প্রীণনকরং—স্তোতার প্রীণনকর।

রথং ন—রথমিব—রথের ন্যায়। [যথা রথেন ধনং লভতে তদ্বৎ স্তোতারো অনেন ধনং লভন্তে তাদৃশ ধনলাভকারণং—যেরূপ রথের দ্বারা ধনলাভ করা যায় সেইরূপ স্তোতাগণ অগ্নিদ্বারা ধনলাভ করে তাদৃশ ধনলাভ কারণ]

বেদ্যং—বেদোধনং ধনহিতং লাভহেতুং—ধনলাভহেতু।

হে অগ্নি! আপনি আমাদিগের অতিথির

(১) বৃত্র শব্দে বৃত্রাসুর অথবা যাহারা বলপূর্ব্বক জগতের অর্থাৎ জীবগণের আবরণ করে অর্থাৎ কামক্রোধাদি জ্ঞানাবরণকারী রাজসিক ও তামসিক গুণবৃত্তি আছে তাহাদিগকে বৃত্র কহে এরূপ অর্থ ও করিতে পাওয়া যায়।

(২) বঃ শব্দ গৌরবে বহুবচন যথা—
"একবচনং ন যুঞ্জীত গুরাবাত্মনি চেশ্বরে"।
গুরু, আত্মা ও ঈশ্বরে একবচন প্রয়োগ করিবে না।

ন্যায় পূজ্য, বন্ধুর ন্যায় প্রিয় ও রথের ন্যায় (২) ধনলাভের হেতু, আপনাকে স্তব করিতেছি।

ত্বং ন ইত্যেষা সুদীতি পুরুমীঢ়াভ্যাং তয়োরন্যতরেণ বা দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা ষষ্ঠী।

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ।
উত দ্বিষো মর্ত্তাস্য ॥ ৬ ॥

হে অগ্নে!

ত্বং—তুমি

নঃ—অস্মান্—আমাদিবকে।

মহোভিঃ—পূজাভিঃ মহদ্ভির্ধনৈর্ব্বা—পূজা দ্বারা অথবা অনেক ধনদ্বারা।

পাতি—রক্ষ—রক্ষা কর।

বিশ্বস্যাঃ—বহুবিধাৎ—বহুবিধ।

অরাতেঃ—অদাতু সকাশাৎ অদানাৎ পাহি—অদাতার নিকট হইতে অথবা অদানের নিকট হইতে রক্ষা কর।

উত—অপিচ—আরও।

দ্বিষঃ—দ্বেষ্টুঃ—দ্বেষ্টার।

মর্ত্তাস্য—মর্ত্তা সকাশাৎ পাহি (অস্মভ্যং বলং দত্বা)—(আমাদিগকে বল দিয়া) মনুষ্য সকলের নিকট হইতে রক্ষা কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিয়া বহুবিধ অদাতার নিকট হইতে রক্ষা কর ও মর্ত্তলোকের বিদ্বেষভাব হইতেও রক্ষা কর (৩)।

এহ্যূষিত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা সপ্তমী।

এহ্যূষু ব্রবাণি তেগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।
এভির্ব্বর্দ্ধাসি ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে!

এহি—আগচ্ছ—এস।

তে—ত্বত্যং ত্বদর্থং—তোমাকে অথবা তোমার জন্য।

গিরঃ—স্তুতীঃ—স্তুতি।

ইত্থা—ইত্থমনেন প্রকারেণ—এই প্রকারে।

সু—সুষ্টু—উত্তম।

ব্রবাণি—ইত্যাশস্যতে—এই আশা করিতেছি [তাঃ স্তুতিঃ শৃণ্বিত্যর্থ—সেই সকল স্তুতি শ্রবণ কর]

উ—ইত্যেতাঃ—এই সকল।

ইতরাঃ—অসুরৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ—অসুর সকলদ্বারা কৃত (স্তুতি ও শ্রবণ কর) অথবা অন্যান্য স্তুতি শ্রবণ কর।

এভিঃ—এতৈঃ—এইগুলি।

ইন্দুভিঃ—সোমৈঃ—সোমদ্বারা।

বর্দ্ধসি—বর্দ্ধস্ব—বর্দ্ধিত হও।

হে অগ্নি! তোমার জন্য আমরা স্তুতিগুলি এইপ্রকারে উত্তমরূপে বলিব এরূপ আশা করি তজ্জন্য আইস ও সেই স্তুতি সকল শ্রবণ কর ও

---

(২) যেরূপ রথ আমাদিগকে ধন আনিয়া দেয় ও পরিবর্ত্তে আমাদিগের নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করে না তদ্রূপ অগ্নিও আমাদিগের নিকট কোন প্রত্যুপকার যাচ্ঞা করে না বরং হুতশেষে নির্ব্বাণ হইয়া থাকে।

ধন এখানে মুক্তিধনও বুঝাইতে পারে। অগ্নি-বিবেকাত্মক সাত্ত্বিক জ্ঞানাগ্নি। জ্ঞানাগ্নি ও রথের ন্যায় আমাদিগকে মুক্তিধন দান করিয়া নিবৃত্ত হয়।

(২) মর্ত্তবাসীগণের স্বভাবসিদ্ধগুণ এই যে অন্যের উন্নতি দেখিলে মনে বিদ্বেষভাব জন্মে। তজ্জন্য যেমন আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিবে তেমনি আমাদিগকে বিদ্বেষভাব হইতে পৃথক করিয়া দিবে। নচেৎ আমরা স্তোতারাই বিপুল ধনশালী হইয়া বিদ্বেষজন্য পরস্পর শত্রু হইয়া উঠিব।

অন্যান্য স্তবও শ্রবণ কর ও অস্মদ্দত্ত সোমগুলি দ্বারা বর্দ্ধিত হও।

আতে বৎস ইত্যেষা কণ্বগোত্রেণ বৎসেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা অষ্টমী।

আ তে বৎসো মনোয়মৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
অগ্নে ত্বাং কাময়ে গিরা॥ ৮॥

বৎসঃ—এতন্নাম্না ঋষিঃ—এই নামে ঋষি কারণ এই ঋকের প্রয়োগ ফল কণ্বগোত্রসম্ভূত বৎসনামে ঋষি দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহা এই ঋক্ প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে।

তে—তব—তোমার।

মনঃ—মনকে।

পরমাচ্চিৎ—উৎকৃষ্টাদপি—উৎকৃষ্ট হইতে (এখানে উৎকৃষ্ট)।

সধস্থাৎ—সহস্থানাৎ (১)—দ্যুলোকাৎ—স্বর্গ হইতে।

আযমৎ—আযময়তি—আকর্ষণ করিতেছ।

গিরা—স্তত্যা—স্তুতিদ্বারা।

শিষ্টং—প্রত্যক্ষকৃতং—প্রত্যক্ষকৃত [ঋক্ ত্রিবিধ যথা প্রত্যক্ষকৃত, পরোক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক]

হে অগ্নে!

ত্বাং—তোমাকে।

কাময়ে—ত্বদীয় মনোমষ্যেব নিযচ্ছামীতি প্রার্থয়ে—তোমার মন আমাতে যেন নিবদ্ধ হয় এই প্রার্থনা করি।

বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট স্বর্গ হইতে তোমার মন আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্য হে অগ্নি! আমি কামনা করি যে তোমার মন যেন আমাতে প্রত্যক্ষরূপে নিবদ্ধ হয়।

ত্বামগ্ন ইত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা নবমী।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বানিরমন্থত।
মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥ ৯॥

হে অগ্নে!

অথর্ব্বা—এতৎ সংজ্ঞ ঋষিঃ—এই নামে ঋষি।

ত্বাং—তোমাকে।

পুষ্করাদধি—পুষ্করে (১)—পুষ্করপর্ণে—পুষ্করপর্ণপ্রদেশে।

নিরমন্থত—অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ৎ—কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন করিয়া ছিলেন।

মূর্দ্ধ্নঃ—মূর্দ্ধাবদ্ধারকাৎ—মস্তকের ন্যা সকলের ধারণ কর্ত্তা।

বিশ্বস্য—সর্ব্বস্য জগতঃ—সমুদায় জগতে

বাঘতঃ—বাহকাৎ—বাহক হইতে (অর্থা বাহক।

যেরূপ মস্তক সমুদায় শরীরের আধার স্বরু তদ্রূপ পুষ্করপর্ণ প্রদেশও সমুদায় জগতে আধার ও বাহনস্বরূপ। হে অগ্নি! অথর্ব ঋষিও তোমাকে সেই পুষ্করপর্ণ প্রদেশে কা সংঘর্ষণে আবির্ভূত করিয়াছিলেন॥ ৯॥

অগ্ন ইত্যেষা বামদেবেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা দশমী।

অগ্নে বিবস্বদাভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে।
দেবোহ্যসিনোদৃশে॥ ১০॥

হে অগ্নে!—হে অগ্নি!

(১) সহতিষ্ঠন্তি যত্র দেবাঃ সঃ সধস্থঃ সর্গঃ — যে স্থানে দেবতা সকল একত্রে থাকেন তাহাকে স্বর্গ বলে।

(১) পুষ্করপর্ণে হি প্রজাপতি ভূমিপ্রাথয়ৎ তৎ পুষ্করপ প্রথয়ৎ ইতি শ্রুতেঃ।

অস্মভ্যং—অস্মাকং—আমাদিগকে।

মহে উতয়ে—মহতে রক্ষণায়—উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য।

বিস্ববৎ—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষেণ নিবাসস্য হেতু ভূতমিদং কর্ম্ম—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষরূপে বাসের হেতুভূত এই কর্ম্ম।

আভর—সম্পাদয়—সম্পন্ন কর।

হি—যস্মাৎ—যেহেতু।

নঃ—অস্মাকং—আমাদিগের।

দৃশে—দর্শনার্থং—দর্শন জন্য।

দেবঃ—দ্যোতমানঃ—উজ্জ্বল।

অসি—হও।

[ইন্দ্রাদয়ো নামাভির্দৃশ্যন্তে ত্বং তু গার্হপত্যাদি দেশে অতি দ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যসে তস্মাৎ ত্বাং বিশেষেণ প্রার্থয়ামহে ইত্যাভিপ্রায়ঃ—ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু তুমি গার্হপত্যাদি দেশে অত্যন্ত দীপ্তিশালী হইয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দাও তজ্জন্য তোমকে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি এই অভিপ্রায়।]

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য স্বর্গাদি বাসের হেতু ভূত যে এই কর্ম্ম তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও যেহেতু তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য দীপ্তিশালী রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ক্রমশঃ—

ইতি শ্রীসামবেদসংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৪।

মুহাশূরান্ শূরতমোঽস্তি কো বা,
মনোজবাণৈর্ব্যথিতো ন যস্তু।
প্রাজ্ঞোঽতিধীরশ্চ সমশ্চ কো বা,
প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (৪০) কোন ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শূর (বীর)? গুরু উত্তর করিলেন যিনি কন্দর্পশরে ব্যথিত হন না· তাঁহাকেই শূরবরাগ্রগণ্য বলিয়া জানিবে। কামোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে:—

আবির্ব্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
মানসাচ্চ পুমানেকস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
মনোমথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বাণাংশ্চিক্ষেপ সর্ব্বাংশ্চ কামো বাণপরীক্ষয়া।
সদ্যঃ সর্ব্বে সকামাশ্চ বভূবুরীশ্বরেচ্ছয়া॥

তাহার পর পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ পরম সুন্দর এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন (শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাঁর নাম মনসিজ বা মনোজ) ইনি পঞ্চশরদ্বারা কামিগণের মনকে মথিত করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাঁর "মন্মথ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছানুসারে কাম স্বীয় শরসমূহের প্রভাব পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন তৎপ্রভাবে সকলেই তৎক্ষণাৎ সকাম হইয়াছিল

কামের পঞ্চবাণ।

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥
অথবা—"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ"॥

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন কামের এই পঞ্চশর এবং অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা এবং রক্তোৎপল এই পঞ্চপুষ্প ও কামদেবের পঞ্চবাণ বলিয়া আখ্যাত হয়।

কামবাণের প্রভাব।

বৃত্রহন্তা দেবেন্দ্র বাসবের প্রতি কন্দর্পের উক্তিঃ—
বজ্রং তব সুরাধীশ যৎকার্য্যং ন করিষ্যতি।
তৎ করিষ্যামি পুষ্পাস্ত্রৈঃ সর্ব্বাসুর বিমোহনম্॥
(শিবপুরাণ)

হে সুরেশ্বর! আপনার বজ্র যে কার্য্য সাধন করিতে না পারিবে আমি আমার এই পুষ্পাস্ত্রদ্বারা অসুরগণের মোহজনক সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব।

রতির প্রতি কামদেবের উক্তি :—
"শ্রমোমদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাদবিধিষু"।
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক)

ত্রিভুবনের উন্মত্ততা জনন ব্যাপারে আমার বাণ সকলের শ্রম কি? ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মনোজবাণের প্রতাপ অতুল এবং গতি অপ্রতিহত। উহা অতি সহজেই ত্রিভুবনের প্রাণিবৃন্দকে বিমোহিত, বিচলিত এবং উন্মত্ত করিতে পারে। পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মরশরপ্রভাবে কত দেবতার, কত মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী বীরের এবং দীর্ঘ-কালব্যাপি কঠোর সাধন নিরত কত তপস্বীর ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যপদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য মনে যে তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় সেই ইচ্ছার নাম কাম। কামপূরণের জন্য কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইলে মনে যে শান্তিনাশিনী উত্তেজনা হয় তাহাকেই ক্রোধ কহে। এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য ও জ্ঞানলাভের প্রতিকূল। ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি এই দুর্নিবার্য্য ও বিবেকবিধ্বংসী বেগ সম্বরণ করিতে পারেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন" আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ সেই মহাপুরুষই ধন্য এবং তিনিই প্রকৃত শূরপদবাচ্য। যিনি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন তিনিই উক্ত প্রকার শূরত্বলাভ করেন।

শূরের লক্ষণ।

"উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ।"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সমিতৌ স্বাত্মকার্য্যে বা স্বামিকার্য্যে তথৈব চ।
ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং যুধ্যেৎ স শূরস্ত্ববিশঙ্কিতঃ॥
(শুক্রনীতি)

যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তিই শূর। যে ব্যক্তি সভাতে, যুদ্ধে, আত্মকার্য্যে এবং প্রভুর কার্য্যে প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সংগ্রাম করেন তিনিই শূর। মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন :—

বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্নন্ শূরস্তু নোচ্যতে।
জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥
(দক্ষসংহিতা)

বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই যথার্থ বীর বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন :—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
(গীতা)

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকারী বেগকে তাহার উৎপত্তি মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই সমাহিত এবং তিনিই সুখী। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত শ্রবত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, শাশ্বতী শান্তিভোগের বাসনা যিনি হৃদয়ে পোষণ করেন এবং চিত্তের চঞ্চলাশূন্য, ক্ষোভশূন্য ও বিকারশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন তিনি যমনিয়মাদি বিধিবৎ পালনপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চয় এবং সেই সঞ্চিতশক্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রযত্নপরায়ণ হইবেন। আধ্যাত্মিক শক্তিশালী বীরপুরুষকে কামবাণ বা কামাদির বেগ কদাপি ব্যথিত ও বিচলিত করিতে পারে না।

(৪১) প্রকৃষ্টজ্ঞানী, অতিধীর এবং সমদর্শী কাহাকে কহা যায়? যে ব্যক্তি কামিনীকটাক্ষে মোহপ্রাপ্ত না হন তিনিই পণ্ডিত, ধীর ও সমদর্শী।

(ক) প্রাজ্ঞ—বশেহি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (গীতা)

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

(খ) ধীর—বিকারহেতাবপি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসিত এব ধীরাঃ। (কবিবাক্য)

চিত্তবিকারের হেতু ভূতপদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদিগের চিত্তবিকার প্রাপ্ত না হয় তাঁহারাই ধীর।

(গ) সম—রাগদ্বেষ (১) বিমুক্তো যঃ সমঃ পণ্ডিতোবুধৈঃ। (ভক্তিরসামৃত সিন্ধু)

"যিনি রাগ দ্বেষশূন্য, পণ্ডিতগণ তাহাকেই" সম কহিয়া থাকেন।

জগতে মানবগণের মনকে বিকৃত করিবার জন্য যত্প্রকার সামগ্রী আছে তন্মধ্যে রমণী-কটাক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কটাক্ষপ্রভাবে কত মহা মহা বীরের অত্যুগ্র তেজোবীর্য্য নিষ্প্রভ হইয়াছে, কত সংযমীর সংযম টুটিয়াছে, কত যোগী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য ও যোগ নষ্ট হইয়াছে, কত মহা ধৈর্য্যশালী বিবেকবান্ মহাত্মাগণের ধৈর্য্যনাশ ও বিবেকভ্রংশ ঘটিয়াছে তাহার ইওত্তা নাই। (১) সমুদ্রমন্থনকালে মোহিনীসন্দর্শনে মহেশেরও মোহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ললনা কটাক্ষের প্রভাব।

মদনদেব হরধ্যান ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

অসম্মতঃ কস্তবেন্দ্র মুক্তিমার্গমপেক্ষতে।
তং সুন্দরীকটাক্ষৈস্ত বধ্নাম্যাজ্ঞাপয়স্বমে॥
(শিবপুরাণ)

এবং রতিকে বলিয়াছিলেন :—

প্রভবতিমনসি বিবেকোবিদুষামপি শাস্ত্রসম্ভবস্তাবৎ। নিপতন্তি দৃষ্টিবিশিখাযাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাম্॥ (প্রবোধ চন্দ্রোদয়)

যোগবাশিষ্ঠে—অনুরক্তাঙ্গনালোললোচনালোকিতাকৃতেঃ। স্বস্থীকর্ত্তুং মনঃশক্তো ন বিবেকো মহানপি॥

হে দেবরাজ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

(১) সুখানুশয়ী রাগঃ,—দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ—সুখভোগের ইচ্ছার নাম রাগ এবং দুঃখের প্রতি অনিচ্ছার নাম দ্বেষ।

(১) বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা স্তেঽপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বাহি মোহংগতাঃ। শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা, স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বঙ্কস্তরেৎ সাগরম্॥ কবিবাক্য

কোন্ ব্যক্তি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়াছে? যদ্যপি কেহ করিয়াই থাকে তবে আমাকে আদেশ করুন এখনই আমি তাহাকে সুন্দরীরমণীর কটাক্ষপাশদ্বারা বন্ধন করি। শাস্ত্রানুশীলনজনিত বিবেক তাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতব্যক্তিগণের চিত্তে আধিপত্য করে যাবৎ-কালপর্য্যন্ত নীলোৎপলনয়না ললনাদের নয়নবাণ তাহাতে নিপতিত না হয়। অনুরাগবতী বরাঙ্গনা চঞ্চলনেত্রে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহাবিবেকবান্ হইলেও সেই ব্যক্তির বিকার প্রাপ্ত মনকে তাঁহার বিবেক প্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। শান্তিশতককার এই নিমিত্ত শ্রেয়োলাভার্থী মানবকে রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"শৃণু হৃদয়রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাং ন খলু ন খলু যোষিৎ সন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ। হরতিহি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈঃ পিশিতশতনুত্রং চিত্তমপ্যুত্তমানাম্॥ (শান্তিশতক)

মুনিগণের অভিপ্রায় শ্রবণ কর তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের সন্নিধানে অবস্থান করা কথনই কর্ত্তব্য নহে; কারণ মৃগনয়না অঙ্গনা সম্মোহন নয়নবাণদ্বারা অতি শীঘ্র প্রচুর মাংস রূপ আবরণে আবৃত সাধুগণের চিত্তকেও বিদ্ধ করিয়া থাকে। তাই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী রমণীর অশেষ দোষাকর কটাক্ষপাতেও যিনি স্বস্থ ও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন তাঁহাকেই জ্ঞানী, ধীর ও সমদর্শী বলিয়া আচার্য্য উল্লেখ করিলেন। ইন্দ্রলোকে অর্জ্জুন সর্ব্বলোকললামভূতা সকামা উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনার প্রাজ্ঞত্ব, ধীরত্ব ও সমদর্শিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়)

মূল—১৫।

বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তাঃ দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী। ধন্যোঽস্তি কো যস্ত পরোপকারী কঃ পূজনীয়ো ননুতত্ত্বনিষ্ঠঃ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৪২) সর্পবিষ অপেক্ষাও তীব্রতর বিষ কি? গুরু উত্তর করিলেন বিষয় সকল। কারণঃ—

দোষেণ তীব্রোবিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥
(বিবেকচূড়ামণি)

বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষম্॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

বিষয় কৃষ্ণসর্পের বিষ অপেক্ষাও অতিশয় তীব্র, কারণ সর্পবিষ যে ভক্ষণ করে তাহার মৃত্যু হয় কিন্তু বিষয়বিষ যে দর্শন করে তাহারই মৃত্যু ঘটে। জ্ঞানিগণ বিষকে বিষ বলেন না তাঁহারা বিষয়ের বিষম অনর্থকারিতা দর্শনে তাহাকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ জীবের একজন্মমাত্র হরণ করে কিন্তু বিষয়বিষ জন্ম-জন্মান্তর হরণ করিয়া থাকে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

বিষয়—

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
একৈকস্তলমেতেষাং বিনাশপ্রতিপত্তয়ে॥

শব্দ—

শুচির্দ্দর্ভাঙ্কুরাহারো বিদূরভ্রমণে ক্ষমঃ।
লুব্ধকোদ্গীতমোহেন মৃগো মৃগয়তে বধম্॥

স্পর্শ—

গিরীন্দ্রশিখরাকারো লীলয়োন্মূলিতদ্রুমঃ।
করিণীস্পর্শসংমোহাৎ বন্ধনং যাতিবারণঃ॥

রূপ—

স্নিগ্ধ-দীপ-শিখা-লোক-বিলোলিতবিলোচনঃ
মৃত্যুমৃচ্ছতিসংমোহাৎ পতঙ্গঃ সহসাপতন্।

রস—

অগাধসলিলে মগ্নো দূরেঽপি বসতো বসন্

মীনস্তু সামিষং লোহমাস্বাদয়তি মৃত্যবে ॥
গন্ধ—
উৎকর্ত্তিতুং সমর্থোঽপি গন্তুঞ্চৈব স পক্ষকঃ।
দ্বিরেফো গন্ধলোভেন কমলে যাতি বন্ধনম্ ॥
একৈকশো বিনিঘ্নন্তি বিষয়া বিষসন্নিভাঃ।
কিং পুনঃ পঞ্চমিলিতা ন কথং নাশয়ন্তি হি
(শুক্রনীতি)

বিষয় পাঁচটিঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ; এই পাঁচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটি বিনাশের কারণ। কুশাঙ্কুরভোজী, হিংসাদি দোষ শূন্য, অতি দূর গমনে সমর্থ হরিণ ব্যাধের মধুরগীত শব্দে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শৈলশৃঙ্গতুল্য মহাকায়, অবলীলাক্রমে বৃক্ষ-সমূহকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ মহাবলশালী হস্তী হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শজনিত মোহে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধদীপ-শিখার আলোক সন্দর্শনে বিমোহিত দৃষ্টি পতঙ্গ মোহবশতঃ অধীর হইয়া সেই দীপশিখায় পতিত হয় এবং পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে। ধীবরের অতি দুরস্থিত অতলস্পর্শ জলে বাস করিয়াও মৎস্য বড়িশ বিদ্ধ আমিষ রসে আকৃষ্ট হইয়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্ত তাহা আস্বাদন করে। দশনদ্বারা কমলদল কর্ত্তন করিতে এবং উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইয়াও ভ্রমর গন্ধ লোভে পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়। বিষ তুল্য এই শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয়ের এক একটীই জীবের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। যদি একাধারে এই পাঁচটি মিলিত হয় তাহা হইলে যে বিষম সর্ব্বনাশ ঘটাইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ভগবদ্ভক্ত শ্রীধরস্বামী ও ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন—

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী সকথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ এবং মীন এই পাঁচপ্রকার প্রাণী যথাক্রমে রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ এবং রস এই পাঁচপ্রকার বিষয়ে নিধন-প্রাপ্ত হয়। এক একটি বিষয় যদ্যপি বিনাশের কারণ হইতে পারে তাহা হইলে যে অনবহিত অবোধ ব্যক্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি পাঁচটি বিষয়ই উপভোগ করে সে কেন না বিনষ্টহইবে? সে ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আচার্য্য অন্যত্রও মুমুক্ষু শিষ্যের প্রতি, উপদেশ দিয়াছেন।—

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাৎ বিষয়ান্ বিষং যথা।
(বিবেকচূড়ামণি)

যদ্যপি তোমার মোক্ষপদ লাভের বাসনা থাকে তাহাহইলে দূর হইতে বিষয় সকলকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর। অতএব মুমুক্ষু মানব "সঙ্গীতাদির সুমধুর শব্দে, বিলাসিনীগণের মোহনস্পর্শে, রমণীর রূপে, সুস্বাদুরসে ও সুগন্ধি দ্রব্যে এবং কামিনীকাঞ্চনাদি পদার্থে কথনই আসক্ত হইবেন না"। বিষয় অনিত্য, অসার ও বিষম অনর্থের মূল জানিয়া সারাৎসার নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনায় সর্ব্বদা অনু-রক্ত হইবেন। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন।—

বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযুষাদধিকাং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্ ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পীযুষ (অমৃত) পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দাস্যসখ্যাদিদ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে জীব সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং অমৃত হইতেও অধিক-তর প্রিয় যে কৃষ্ণসেবা তাহা পরিত্যাগ করিয়া

কোন অবিবেকী পুরুষ বিষয় নামক বিষম বিষপান করিবে?

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন।—

বিষয়াশী বিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জবচেতসাম্।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্॥

বিষয়রূপ কালসর্প সংসর্গদ্বারা নিত্যজর্জ্জরিত চিত্ত এবং আত্মবিবেচনাশূন্য ব্যক্তির আয়ু কেবল শ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভে অসমর্থ হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে। তাই ভাগবতে বলিয়াছেন।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ,
নিঃশ্রেয়াসায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

বহুজন্মের পর সুদুর্লভ, অনিত্য, অথচ পুরুষার্থ প্রাপক (১) মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিলম্বে মৃত্যুর প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভের জন্য) সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিবেন। বিষয়ভোগে কদাচ প্রসক্ত হইবেন না, কারণ পশ্বাদিযোনিতেও বিভবভোগ যথেষ্ট হইয়া থাকে। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন।—"আর ভুলালে ভুল্‌বোনাগো, বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো নাগো, রামপ্রসাদ বলে দুধখেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বো নাগো।

(৪৩) এসংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা দুঃখী? যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী।

সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন।—

সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতং স্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাগ্রেঽস্তিসুখমিত্যসৌ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
(গীতা)

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন।—

যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্করঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

বৈষয়িক সুখ সহস্র প্রকার দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখ ও দুঃখ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র বস্তুমাত্রে (বিষয়ে) সুখের লেশমাত্রও নাই। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা ইহপারলৌকিক দুঃখের কারণভূত এবং অল্পকালস্থায়ী। পরমার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না। জীব যে পরিমাণে মনের প্রিয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে অর্থাৎ আপাত রমণীয় ও সুখপ্রদ বাহ্যবিষয় ভালবাসে সেই পরিমাণে শোকরূপ শঙ্কু (কীলক) তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে অর্থাৎ সেই পরিমাণে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়।

মনের তৃপ্তিতে বা সন্তোষে সুখ এবং মনের অতৃপ্তিতে দুঃখ। বিষয়ভোগে বিষয়াশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোনরূপে প্রশমিত হয় না, সুতরাং মনও অপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

"বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশানুগম্।"
(যোগবাশিষ্ঠ)

মন, বৈরাগ্যদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার অনুগামীথাকিলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং বিষয়াসক্ত ও আশার অনুগামী মন অতৃপ্ত বা অসন্তোষ নিবন্ধন চিরকাল দুঃখভোগ করে। শাশ্বত সুখভোগের অধিকারী কে তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ঃ—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

---

(১) চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণঃ।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি প্রাপ্তশব্দাদিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্তবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া, এবং নির্ম্মম (ইহা আমার এইরূপ অভিনিবেশ বর্জ্জিত) ও নিরহঙ্কার (অনাত্মদেহে আত্মভিমান রহিত) হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনিই (সংসারদুঃখোপরমলক্ষণা) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত পুরুষ নিজের অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্বিকসুখ লাভ করেন ; তৎপরে তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মাভ্যাসযুক্তমনা বা ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মানুভবস্বরূপ অক্ষয়সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাতে জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। বিষয়ানুরাগ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বীজস্বরূপ এবং পুরুষার্থ প্রতিবন্ধক। একারণ নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা যাঁহার বিবেক জন্মিয়াছে সেই অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বিবেকীপুরুষ বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর মূঢ়ব্যাক্তি পশ্বাদির ন্যায় বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আত্মোদ্ধারে অসমর্থ হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তাপিত হইয়া চিরদুঃখে কালহরণ করে। সুতারং বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া ধীর ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ করেন তাহা বলিয়াছেন ঃ—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েষনুতৎপরোঽপি
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীত নৃত্যকতিতানবশংগতাঽপি
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণ ধীর্ণটীব ॥
(ভাগবতের টীকা)

যেমন কোন সুনিপুণা নটী সঙ্গীত নৃত্য ও অশেষবিধ তানের বশবর্ত্তিনী হইয়াও তাহার মস্তকস্থিত কুম্ভ যাহাতে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মন রাখে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও সুখমোক্ষদাতা মুকুন্দের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে ভগবানের পরমপদ চিন্তা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্যসুখপ্রয়াসী তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" যাহা ক্ষুদ্র, পরিমিত, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই, যিনি ভূমা তাঁহাতেই সুখ। অতএব বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অনুরাগী হওয়াই নিত্য সুখার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ঃ—"যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সে কি ভুলে পেয়ে কাচ।" "রামপ্রসাদ বলে (তারা) তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।"

(৪৪) এ জগতে ধন্য (সার্থকজন্ম) কে ?
যিনি পরের উপকার করেন তিনিই ধন্য।

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন,
দানেন পাণির্ন ন কঙ্কণেন।
আভাতিকায়ঃ করুণাপরাণাং
পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥
(নীতিশতক)

বেদাদিশাস্ত্র শ্রবণেই কর্ণ শোভা পায়, কুণ্ডলদ্বারা নহে; হস্তদানের দ্বারাই সুশোভিত হয়, কঙ্কণদ্বারা নহে এবং দয়াশীল মানবগণের দেহ পরোপকাররূপ মনোজ্ঞ ভূষণেই শোভা ধারণ করে, চন্দন বিলেপনদ্বারা নহে। সুতরাং যিনি পরোপকারী অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগ বা আত্মদান করেন সেই করুণার্দ্রহৃদয় মহাপুরুষই জগতে মহিমান্বিত হয়েন এবং দেহাত্যয়ে পরমোৎকৃষ্ট দিব্যলোকের অধিকারী হন।

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে॥"

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করণান্তর এই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই পুণ্যকর্ম্ম এবং পরপীড়নেই পাপ। পরোপকার পরায়ণ পুরুষই পুণ্যবান্; পুণ্যবান্ ব্যক্তিই সার্থকজন্মা।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন।—

লোকঃ পুণ্যবতাং নূনং সর্ব্বপুণ্যবতাং সুহৃৎ।
জীবন্তি পুণ্যবন্তশ্চ পরলোকং গতা অপি॥
পুণ্যৈনৈকেন যান্ লোকান্ যান্তি পুণ্যব্রতা নরাঃ
কোগন্তুং তানলং জন্তুঃ সর্ব্বতঃ পরিচেষ্টয়া॥
(সংসারচক্র)

সমস্ত লোকই পুণ্যবান্ মনুষ্যগণের অধিকৃত; সকলই তাঁহাদের সহৃৎ। তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে ধরাতলে চিরকাল জীবিত থাকেন। পুণ্যব্রত মহাত্মাগণ একমাত্র পুণ্যপ্রভাবে যে সমস্ত স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট লোকের অধিকারী হন, অপর মনুষ্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাদৃশলোকে গমন করিতে পারে না। বৃত্রভীত, ইন্দ্রপ্রমুখ, দেববৃন্দ, আথর্ব্বণ দধীচিমুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলে মুনিবর তাঁহাদিগকে কহিলেন "আমার এই দেহ প্রিয় হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আপনারা এ দেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি"।

যোঽধ্রুবেনাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেতভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥
(ভাগবত)

হে নাথগণ! এই দেহ অধ্রুব, ইহাদ্বারা প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। যিনি প্রাণি সকলের শোকে শোকান্বিত এবং হর্ষে আনন্দিত হন্ সেই মহাত্মার এই অব্যয়-ধর্ম্মকেই পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। ধন, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়জন এবং দেহ সকলই ক্ষণভঙ্গুর এবং শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য। এ সকল পদার্থে স্বার্থের উপযোগিতামাত্র নাই। অহো! তথাপি মনুষ্য যে এতদ্দ্বারা পরের উপকার করে না ইহা অতি কৃপণতার কর্ম্ম ও দুঃখের বিষয়! (১)

অহো মহত্ত্বং মহতামপূর্ব্বং বিপত্তিকালেঽপি পরোপকারম্। যথাস্যমধ্যে পতিতোঽপি রাহো কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি॥

অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহত্ব অপূর্ব্ব, বিপৎকালেও তাঁহারা পরোপকার করিয়া থাকেন। চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হইয়াও পুণ্যপুঞ্জ প্রদান করেন (গ্রহণ সময়ে স্নানদানাদিদ্বারা মনুষ্য অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।)

পরোপকারী মনুষ্যের স্বভাব।

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈর্নবাম্বুভির্ভূমিবিলম্বিনো ঘনাঃ। অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ (২) সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥
(নীতিশতক)

(১) মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৩০ অধ্যায়ে শ্যেন কপোতীয় বৃত্তান্তে উশীনর নরপতিরও উক্ত প্রকার পরোপচিকীর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) "এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থ—ঘটকাঃ স্বার্থং বাধেন যে" (নীতিশতক) যাঁহারা স্বকীয় অর্থব্যয়াদি দ্বারা পরোপকার সাধন করেন তাঁহারা সৎপুরুষ।

ফলবান্ তরু সকল ফলভারে অবনত হয়, মেঘসমূহ নববারিরূপ সম্পত্তিসংযোগে পৃথিবীর অভিমুখে লম্বমান হইয়া আপনাদের নম্রতা প্রদর্শন করে। এইরূপ সাধু পুরুষেরা ঐশ্বর্য্যশালী হইলে বিনয়নম্র হইয়া থাকেন; কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। পরোপকারী সৎপুরুষগণের (১) স্বভাবই এইপ্রকার। পরোপকারের মাহাত্ম্য বুঝিয়াই শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন :—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥
(হিতোপদেশ)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরোপকারের নিমিত্ত ধন এবং জীবন উৎসর্গ করিবেন। অর্থক্ষয় এবং মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন পরোপকাররূপ সদনুষ্ঠানে ধন এবং জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

যাঁহারা সংসারে আপনাকে ক্ষুদ্র ও অসমর্থ ভাবিয়া পরোপকাররূপ মহাপুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন তাঁহারা দৃষ্টান্তশতককারের এই কথাটি স্মরণ করিবেন।

উপকর্ত্তুং যথা স্বল্পঃ সমর্থো ন তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি সততং ন তু বারিধিঃ॥
(দৃষ্টান্তশতক)

ক্ষুদ্রব্যক্তি যাদৃশ উপকার করিতে সমর্থ হয়, মহৎ ব্যক্তি সেরূপ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র কূপ প্রায়ই মনুষ্যের তৃষ্ণা নাশ করে, কিন্তু মহাসাগর তাহা পারে, না। অতএব যাঁহার যেমন শক্তি সেই অনুসারে পরোপকার করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

কোন্ ব্যক্তি পূজনীয়? যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ তিনিই সকলের পূজ্য।

তত্ত্ব—বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতিশব্দ্যতে॥
(ভাগবত)

তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতেরা অভেদজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। উপাসকভেদে এই তত্ত্বের বহুবিধ নামভেদ হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা ভগবান্ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। অতএব যিনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরমাত্মনিষ্ঠ অথবা ভগবন্নিষ্ঠ তাহাকেই তত্ত্বনিষ্ঠ বলা যায়। কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, কি পুরাণেতিহাসে সর্ব্বস্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা তত্ত্বনিষ্ঠ তাঁহারাই জগতে চিরকাল সকলেরই পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সংসার মুমুক্ষু, ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ব্যক্তিগণ জ্ঞানরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানরত্নাকর তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন।

তত্ত্বনিষ্ঠের পূজা—

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথা ন্যায়মিদং বচনমব্রবীৎ॥
(মনুসংহিতা)

ভগবান্ মনু একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আসনে সুখোপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী মহর্ষিগণ নিকটস্থ হইয়া যথাবিধানে অর্চ্চনাকরতঃ তাঁহাকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরণাং নো ব্রুহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

মুনিগণ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া কহিলেন (ভগবন্!) চারিবর্ণ, চারি আশ্রম, অনুলোম প্রতিলোমজাত অপরাপর জাতি সকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন

(১) "এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থস্ত বাধেন যে" (নীতিশতক) যাঁহারা স্বকীয় অর্থব্যয়াদিদ্বারা পরোপকার সাধন করেন, তাঁহারা সৎপুরুষ।

করুন। 'আবহমানকাল সর্ব্বত্রই তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের এইরূপ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়) তত্ত্বনিষ্ঠ হওয়াই মনুষ্যত্ব (১) এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ভগবান্ শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়াদ্বারা কল্পিত, অতএব অনিত্য ও অসৎ; কেবল ব্রহ্মই সত্য তিনি ভিন্ন সৎপদার্থ আর কিছুই নাই ইহা বিদিত হইলে জীব সুখী হইতে পারে। যিনি সংসারের মায়াকল্পিত নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মপদার্থে তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন তিনি শুভ শুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

সদ্‌গুরুর শাসনে অবস্থান, চিত্তবিশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রুতিস্মৃত্যুদিত যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, মন প্রভৃতি প্রমাথী ইন্দ্রিয়বর্গকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া স্ববশে আনয়নের চেষ্টা ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা মনুষ্য ক্রমে ক্রমে তত্ত্বনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মে, পরমাত্মায় অথবা ভগবানে স্থিরা স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ঈদৃশী নিশ্চলা স্থিতি প্রাপ্ত হইলে কি হয় তাহা ভগবান্ গীতার সাংখ্যযোগে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; গুরুর উপদেশে ইহা লাভ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহার্থে নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জ্ঞানোপদেশরূপ আলোকদ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন এবং ধর্ম্মোপদেশরূপ মহৌষধি প্রয়োগদ্বারা আধ্যাত্মিক-ব্যাধির শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সহবাসরূপ মহা পবিত্র-তীর্থ-নিষেবনদ্বারা মহাপাপীও সদ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অশেষ দুঃখাস্পদ সংসারের অসারতা, বিষয়ৈশ্বর্য্যের দোষ ও অনর্থকারিতা এবং ভোগসুখের অনিত্যতা পর্য্যালোচনা করিয়া সারাৎসার সচ্চিদানন্দ নিত্য-নিরাময় ব্রহ্মে আসক্ত হয়েন, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই ভূয়সী প্রশংসা, অচলা প্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় (১)।

(১) নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তঃ জ্ঞানহীনঃ পশুঃপ্রিয়ে॥

(১) গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বীকে উপকুর্ব্বাণব্রহ্মচারী কহে। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ"—গৃহী "ব্রহ্মনিষ্ঠ" হইবেন, শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছেন। সংসারে মনুষ্য আরও যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে পূজনীয় হন, তাহা নীতিশতক বলিয়াছেন।

বাঞ্ছা সজ্জন-সঙ্গমে, গুণিগণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতিরতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিঃ শূলিনিশক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥
(নীতিশতক)

সাধুজনসহবাসে অভিলাষ, গুণিগণে প্রীতি, গুরুজনের নিকট নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বদারে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, শূলপাণি শঙ্করের প্রতি ভক্তি, আত্মসংযমে শক্তি, দুর্জ্জন খলের সংসর্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি নির্ম্মলগুণরাশি যে সকল মহাত্মার শরীরে বিরাজ করে আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন ঃ—

কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপার-সম্বিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

অপার সুখ বোধ সমুদ্রস্বরূপ পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত সেই সাধু পুরুষ যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল পবিত্র, ঈদৃশ পুত্রবত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহার জননী ধন্যা এবং পৃথিবী ও সেই মহাত্মাকে ধারণ করিয়া পুণ্যবতী বা পবিত্রা হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

চিত্তানুশাসনম্।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাজাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥
চতুর্ব্বিধশরীরাণি ধৃত্বামুক্ত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
ন মানুষং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি কোটিভিঃ।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্যদুর্লভং।
যস্তারয়তিনাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্রকঃ॥
নরঃ প্রাপ্যোত্তরজন্ম লব্ধা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদ্‌ব্রহ্মঘাতকঃ॥
বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে।
তস্মাদ্দেহং ধনং রক্ষেৎ পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
রক্ষয়েৎ সর্ব্বদাত্মানমাত্মা সর্ব্বস্য ভাজনম্।
রক্ষণে যত্নমাতিষ্ঠেৎ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি॥
পুনর্গ্রাম পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্ব্বিত্তং পুনর্গৃহম্।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ॥
শরীররক্ষণোপায়ঃ ক্রিয়ন্তে সর্ব্বদা বুধৈঃ।
নেচ্ছন্তি ন পুনস্ত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ॥
যদ্ গোপিতং স্যাদ্ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোজ্ঞানার্থমেব চ।
জ্ঞানন্তু ধ্যানযোগার্থমচিরাৎ প্রবিমুচ্যতে॥
আত্মৈব যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যোহিতকরস্তস্মাদাত্মানং কারযিষ্যতি॥ (১)
ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি॥
ব্যাঘ্রীবাস্তে জরাচায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমভ্যসেৎ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমভ্যসেৎ॥
যাবৎ তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবৎ তত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
সন্দীপ্তকোণভবনে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখং দুঃখং জনো হন্ত নবেত্তিহিতমাত্মনঃ॥

---

(১) এই শ্লোকগুলি কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথমোল্লাসেও আছে। এই শ্লোকগুলি প্রথমতঃ সোনামুখীনিবাসী শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ নীলমাধব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় ভাগবতপাঠান্তে আমাদিগকে উপদেশ দিবার ছলে ঐ শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন তদবধি আমি ঐ শ্লোকগুলি সমুদায় পাইতে ইচ্ছুক ছিলাম তাঁহার নিকট কতকগুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমুদায় শ্লোকগুলি গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডে ৪৫ অধ্যায়ে পাইয়া প্রকাশ করিয়া সুখী হইলাম।

জাতানার্ত্তান্ মৃতানাপদভ্রষ্টান্ দৃষ্ট্বা চ দুঃখিতান্।
লোকোমোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন॥
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চপলমায়ুষ্যং কস্য স্যাজ্জানতোধৃতিঃ॥
শতং জীবিতমত্যল্পং নিদ্রালস্যৈস্তদর্দ্ধকম্।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরল্পং তদপি নিষ্ফলং॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদযোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যো ভয়স্থানে হা নরঃ কোনহন্যতে॥
তোয়ফেন সমে দেহে জীবেনাক্রম্যসংস্থিতে।
অনিত্যপ্রিয়সম্বাসে কথং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ॥
অহিতে হিতসংজ্ঞঃ স্যাদধ্রুবে ধ্রুবসংজ্ঞকঃ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানঃ স্বমর্থং যো বেত্তি সঃ॥
পশ্যন্নপি প্রস্খলতি শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি দেবমায়া বিমোহিতঃ॥
তন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগজরাগ্রাহৈর্ন কশ্চিদপি বুধ্যতে॥
প্রতিক্ষণময়ং কালঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
অথ কুম্ভইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণো ন বিভাব্যতে॥
যুজ্যতে বেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনম্।
গ্রথনঞ্চ তরঙ্গানামাস্থানায়ুর্বিযুজ্যতে॥
পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে।
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরস্য চ কা কথা॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।
জল্পন্তমিতি মর্ত্ত্যাজং হন্তি কালবৃকো বলাৎ॥
ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
একমীহাসমাযুক্তং কৃতান্তঃ কুরুতে বশম্॥
শ্বকার্য্যমদ্যকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি মৃত্যুঃ প্রতীক্ষেত কৃতং বাপ্যথবা কৃতম্॥
জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্।
মৃত্যুশত্রুমধিষ্ঠোসি ত্রাতারং কিং ন পশ্যতি॥
তৃষ্ণা সূচী বিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতিমানবম্॥
বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবম্ভূতমিদং জগৎ॥
স্বদেহমপি জীবোয়মুক্ত্বা যাতি যমালয়ম্।
স্ত্রীমাতৃ-পিতৃ-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা॥
দুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাস্তি সদুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন সঃ সুখী নাপরঃ ক্বচিৎ॥
প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামালয়ং সকলাপদাম্।
আশ্রয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ ক্ষণাৎ॥
লোহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো বিমুচ্যতে।
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈর্মুচ্যতে ন কদাচন॥
যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥
বঞ্চিতাশেষবিত্তৈস্তৈনিত্যং লোকো বিনাশিতঃ।
হা হন্ত বিষয়াহারৈর্দেহস্থেন্দ্রিয়তস্করৈঃ॥
মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লোহশঙ্কুং ন পশ্যতি।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি॥
হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ।
কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তে নরা নারকীঃ খগাঃ॥
নিদ্রাদি মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্মৃতঃ
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং ক্ষুৎতৃড্ভ্যাং মধ্যগে রবৌ
রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মূঢ়মানবাঃ॥
স্বদেহধনদারাদি নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হন্তা জ্ঞানমোহিতাঃ॥
তস্মাৎ সঙ্গঃ সদা ত্যাজ্যঃ সর্ব্বস্ত্যাক্তুং ন শক্যতে।
মহদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সন্তঃ সঙ্গস্য ভেষজম্॥

স্থাবর, কৃমি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, ধার্ম্মিক, দেবতাও মোক্ষপ্রাপ্ত এইরূপ যথাক্রমে সহস্রবার (স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি) চতুর্ব্বিধ শরীর ধারণ ও ত্যাগ করিয়া সুকৃতিবশতঃ মনুষ্য হইয়া যদি জ্ঞানী হয় তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। চুরাশী লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। এই সংসারে সহস্র ও কোটিজন্ম পরে জন্তু পুণ্যসঞ্চয়বশতঃ মনুষ্য জন্মলাভ করে॥

মোক্ষের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হইয়া যিনি আত্মাকে না ত্রাণ করেন তাঁহা-হইতে এ সংসারে আর কে পাপী আছে?

মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ও সমুদায় ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে আত্মহিত না জানিতে পারে সে ব্রহ্মঘাতী হয়॥

দেহব্যতিরেকে কাহারও পুরুষার্থ থাকে না তজ্জন্য দেহ ও ধনরক্ষা করিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিবে॥ সমুদায় পুণ্যকর্ম্মের আধার আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে কারণ বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গললাভ করা যায়॥ পুনরায় গ্রাম, পুনরায় ক্ষেত্র, পুনরায় ধন, পুনরায় গৃহ, পুনরায় শুভাশুভ কর্ম্ম লাভ করা যায় কিন্তু পুনঃ পুনঃ শরীর (মনুষ্য দেহ) লাভ করা যায় না॥ জ্ঞানী-লোক সর্ব্বদা শরীরের রক্ষণোপায় বিধান করেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও শরীর ত্যাগ ইচ্ছা করে না॥ ধর্ম্মের জন্য শরীর রক্ষা করিবে, জ্ঞানের জন্য ধর্ম্মরক্ষা করিবে, ধ্যানযোগের জন্য জ্ঞানলাভ করিবে এইরূপ করিলে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে॥

যদি আত্মা আত্মাকে অমঙ্গল হইতে নিবারণ করিতে না পারে তাহাহইলে অন্য কোন্ হিতকারী নিবারণ করিবে?

এই সংসারে যদি নরক ব্যাধির চিকিৎসা না করে তাহাহইলে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি ঔষধশূন্য প্রদেশে গিয়া কি করিবে? ব্যাঘ্রীর ন্যায় জরা সম্মুখে বর্ত্তমান; আয়ু ও ভগ্ন ঘট হইতে জলের ন্যায় ক্ষয় পাইতেছে, শত্রুর ন্যায় রোগসকলও নষ্ট করিতেছে তজ্জন্য নিজ মঙ্গল অভ্যাস করিবে॥ যতক্ষণ দুঃখ আশ্রয় না করে, যতক্ষণ আপৎ না আইসে, যাবৎ ইন্দ্রিয় বৈকল্য না হয় তাবৎ নিজ মঙ্গলজন্য যত্ন করিবে॥

যতক্ষণ দেহ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। নচেৎ গৃহ প্রজ্জ্বলিত হইলে দুর্ম্মতি কূপ খনন করিয়া কি করিবে? সংসার সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মনুষ্য কাল জানিতে পারে না। হায়! মনুষ্য সুখ, দুঃখ ও নিজের হিত জানিতে পারে না। মনুষ্যকে জাত, পীড়িত, মৃত, আপদ্দ্বারা ভ্রষ্ট ও দুঃখিত দেখিয়া মনুষ্য মোহ সুরাপান করিয়া কদাচ ভীত হয় না॥

স্বপ্নের ন্যায় সম্পদ্ কুসুমের ন্যায় যৌবন ও বিদ্যুতের ন্যায় আয়ুর চাঞ্চল্য দেখিয়া কাহার্ ধৈর্য্য থাকিতে পারে?

মনুষ্যের শতবৎসর পরমায়ু; নিদ্রা ও আলস্যে তাহার অর্দ্ধেক গত হয় আরও বাল্য-কাল রোগ, জরা ও দুঃখদ্বারা অর্দ্ধেক নিষ্ফলগত হয়॥

প্রারব্ধব্য বিষয়ে উদ্যোগশূন্যতা, জাগর্ত্তব্য বিষয়ে প্রসুপ্ততা ও ভয়স্থানে বিশ্বস্ততা এরূপ হইলে হায়! কোন মনুষ্য নষ্ট না হইবে? জলের ফেণসমান (অনিত্য) দেহে জীবন ধারণ করিয়া আত্মীয় লোকের ক্ষণকাল মিলনে মনুষ্য কি প্রকারে নির্ভয় হইয়া থাকিবে? যে ব্যক্তি নিজ হিত জানে না সে অমঙ্গল কার্য্যকে মঙ্গল বিবেচনা করে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ও অনর্থকে অর্থযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে॥ সে দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া দেখিয়া ও স্খলিত পদ হয়, শুনিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ও পাঠ করিয়াও জানিতে পারে না। মৃত্যুরোগ জরারূপ জলজন্তু ব্যাপ্ত গম্ভীরকাল-সাগরে যে এই জগৎ মগ্ন হইয়া আছে ইহা কেহ বুঝিতে পারে না॥

অপক কুম্ভস্থ জল যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ এই কাল যে প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে না।

বায়ুকেও বেষ্টন করা যায় আকাশকেও খণ্ডন করা যায়, তরঙ্গকেও গণিতে পারা যায় কিন্তু আয়ুতে আস্থা রাখা যায় না॥

যখন পৃথিবীও দাহ হয়, মেরুও বিশ্লিষ্ট হয়, সাগর জলও শুষ্ক হয় তখন শরীর যে ধ্বংশ হইবে তাহার বিচিত্র কি?

"আমার পুত্র" "আমার স্ত্রী," "আমার ধন" "আমার বন্ধুবান্ধব" এইরূপ কথনশীল মানবকে কালব্যাঘ্র বলে হরণ করে॥

"এই কার্য্য করিয়াছি" "এই কার্য্য করি নাই" এইরূপ বাদী এবং ক্রিয়াযুক্ত লোককে কৃতান্তবশে আনয়ন করে॥

কল্যকার কার্য্য অদ্যই করিবে, অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই করিবে কারণ মৃত্যু কৃত ও অকৃত কার্য্যের প্রতিলক্ষ্য রাখে না।

তুমি মৃত্যু শক্রর মধ্যে বাস করিতেছ উহার পথ জরা প্রদর্শন করিতেছে ও প্রচণ্ড ব্যাধি রূপসৈন্যদ্বারা বেষ্টিত রক্ষাকর্ত্তাকে দেখিতেছ না কেন?

তৃষ্ণারূপ সূচীদ্বারা বিদারিত, বিষয়রূপ ঘৃতদ্বারা সিক্ত, রাগ ও দ্বেষরূপ অনলে পক্ক মানবকে মৃত্যু ভক্ষণ করে।

বালক, যৌবনাবস্থ, বৃদ্ধ, গর্ভস্থ প্রভৃতি সকলকে মৃত্যু কবলীকৃত করে। সংসারের ত গতি এই!

যখন জীব স্বদেহ ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করে তখন স্ত্রী, মাতৃপিতৃ পুত্রাদি সম্বন্ধ কিজন্য?

যাহার দুঃখমূল সংসার আছে সেই দুঃখিত, উহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনি সুখী অন্য কেহ নহে।

সকল দুঃখের আকর, সকল আপদের আলয় ও সকল পাপের আশ্রয় সংসারকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে।

লৌহ ও দারুময়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু পুত্রদ্বারা মায়াপাশে বদ্ধ হইলে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

মনুষ্য যত সম্বন্ধকে মনের প্রিয় বলিয়া মনে করে তত তাহার হৃদয়ে শোকশৈল্য বিদ্ধ করে॥

আহারাদিবিষয় হরণকারী দেহস্থ ইন্দ্রিয়রূপ তস্করদ্বারা অশেষ ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যেরূপ মাংসলুব্ধ মৎস্য লৌহকণ্টক দেখিতে পায় না সেইরূপ সুখলুব্ধদেহী যমযন্ত্রণা দেখিতে পায় না।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) হে গরুড়! যাহারা হিতাহিত জানে না ও উন্মার্গগামী ও যাহারা কেবলমাত্র উদর পূরণে নিষ্ঠ তাহারা নারকী।

নিদ্রা, মৈথুন ও আহার সকল প্রাণীর সমান তন্মধ্যে যাহারা জ্ঞানী (অর্থাৎ এই সকলে আসক্তি নাই) তাহারা মনুষ্য ও যাহারা জ্ঞানহীন তাহারা পশু॥

প্রভাতে মলমূত্রাদিদ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ও রাত্রে মদন ও নিদ্রাদ্বারা মূঢ়ব্যক্তি সকল বাধ্য হয়।

সকলপ্রাণী স্বদেহ যে ধনদারাদি রক্ষণে নিরত হয়, তাহারা অজ্ঞানদ্বারা মোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও মরিয়া যায়॥

তজ্জন্য সর্ব্বদা সঙ্গত্যাগ করিবে যদি সমুদায় সঙ্গত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে মহতের সহিত সঙ্গ করিবে কারণ সাধুসঙ্গ সমুদায় সঙ্গের ঔষধ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যমুনাষ্টকম্।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং।
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাং।
বিয়জ্জালামুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্ ॥১॥

মধুবন চারিনি! ভাস্করবাহিনি জাহ্নবী-সঙ্গিনী সিন্ধুসুতে মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতি বিনাশকৃতে। জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশব কেলিনিদানগতে জয়যমুনে জয়ভীতি নিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ২ ॥

অয়িমধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগভরে পরিজনপালিনী দুষ্টনিসূদনি বাঞ্ছিত কামবিলাসধরে। ব্রজপুরবাসিজনার্জ্জিত পাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে জয়যমুনে জয়ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৩॥

কৃপাসমুদ্রস্বরূপা তপনতনয়া, তাপনাশকারিণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, ভবভয়দাবাগ্নিস্বরূপা, ভক্তজনের বরদাত্রী, আকাশেও যাঁহার প্রভা বিস্তৃত আছে, যিনি সুখপ্রাপ্তির নিত্য কারণ ধীর ব্যক্তি সর্ব্বদা নিত্য ফলদা যমুনাকে ভজনা করেন॥ ১॥

হে মধুবনচারিণি! হে ভাস্করবাহিনি! হে জাহ্নবীসঙ্গিনি! হে সিন্ধুকন্যে! হে মধুদৈত্যবিনাশিনি! হে মাধবতোষিনি! হে গোকুল ভয়নাশিনি! হে জগতের পাপনাশিনি! হে মানসদায়িনি! হে কেশবের কেলির কারণ! হে ভয়নিবারিণি! হে সঙ্কট নাশিনি যমুনে আমাকে পবিত্র কর॥ ২॥

অতি বিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগতপাদসরোজযুগম্। ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতককোটিশতাযুতপুঞ্জতরং জয়যমুনে জয়ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৪॥

নবজলদদ্যুতিকোটিলসৎ তনু হেমময়াভরণাঞ্চিতকে তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চলশোভিত পীতসুচেলধরে। মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনরঞ্জিত গঞ্জিতভানুকরে জয়যমুনে. জয়ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৫॥

শুভপুলিনে মধুমত্ত যদূদ্ভবরাসমহোৎসব কেলিভরে উচ্চ কুলাচল রাজিত মৌক্তিকহার ময়া ভররোধাসিকে। নবমণি কোটিভাস্কর কঞ্চুকি শোভিত তারকহারযুতে জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণী শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৬॥

হে মধুরে! হে বসন্তকালের আমোদবিলাসিনি। হে শৈলবিদারিণি! হে বেগভরে! হে পরিজন পালিনি! হে দুষ্ট নাশিনি! হে অভিলষিত কাম ও বিলাসধারিণি! হে ব্রজবাসিজনের অর্জিতপাতক হারিণি! হে বিশ্বজনের উদ্ধার কারিণি! হে যমুনে তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৩॥

আমি অতি বিপদসমুদ্রে মগ্ন আছি, সংসারে শত শত তাপদ্বারা আমার মানস আকুল হইয়াছে, আমি গতিমতিহীন, অশেষ ভয়দ্বারা আকুল আমি তোমার পাদপদ্ম যুগলে আগত হইয়াছি; আমি ঋণভয়ে ভীত, যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই এরূপ কোটি কোটি পাপযুক্ত। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবারিণি! শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৪॥

তোমার শরীর কোটী নবজলদশোভাদ্বারা শোভিত ও স্বর্ণময় আভরণদ্বারা শোভিত; তুমি যে পীত চঞ্চলবস্ত্রদ্বারা শোভিত হও তাহা

বিদ্যুতের শোভাকেও তুচ্ছ করে; তোমার মণিময় ভূষণ বিচিত্র রঞ্জিত পট্টবস্ত্র সূর্য্যকিরণকেও গঞ্জনা করে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৫॥

তোমার পুলিন মনোহর, শ্রীকৃষ্ণ মধুমত্ত হইয়া তাহাতে রাসমহোৎসব কেলি করিয়াছিলেন। তোমার তীরে উচ্চ কুলাচল শ্রেণী আছে তাহা তোমার মুক্তাহারের ন্যায় হইয়াছে। তোমার যে কোটি কোটি নবমণি আছে তাহা সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া তোমার তারকার হারের কার্য্য করিতেছে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৬॥

করিবরমৌক্তিক নাসিকভূষণ বাতচমৎকৃত চঞ্চলকে, মুখকমলামলসৌরভ চঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে। মণিগণকুণ্ডল লোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে, জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৭॥

কলরবনূপুর হেমময়াচিত পাদসরোরুহসারুণিকে, ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে। তবপদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্ত সদাখিলতাপহরে, জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৮॥

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া। হয়া হ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতাং যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

তোমার নাসিকাতে করিবরের মুক্তা ভূষণ আছে তাহা বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া অতি চমৎকারভাব ধারণ করিতেছে; তোমার মুখপদ্মের সৌরভে চঞ্চল হইয়া মধুকরগণ মত্ত হইয়াছে উহারাই তোমার চক্ষুস্বরূপ। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি তাহা দুলিতেছে ও তাহা শোভাদ্বারা তোমার গণ্ডযুগল নির্ম্মল হইয়াছে হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি তুমি আমাকে পবিত্র কর॥ ৭॥

গমনকালে তোমার অরুণবর্ণ চরণপদ্মে হেমময় নূপুরের "ধিমি ধিমি" তালে শব্দ হইতেছে তাহাতে মন মুগ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমুদায় তাপ দূর করে। হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৮॥

সংসাররূপ উত্তাপসমুদ্রে পতিত হইয়া মনুষ্য দুর্গতিযুক্ত হইয়া যদি প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যমনে তোমার স্তব করে ও হস্তস্থিত কুসুমসমূহদ্বারা রবিসুতাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহকালে বিবিধ সুখভোগ করিয়া মৃত্যুকালে হরিপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৯॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যমুনাষ্টকস্তোত্রম্।

মুরারিকায়কালিমা ললামবারিধারিণী তৃনীকৃত ত্রিবিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী। মনোনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্ম্মদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ১॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরিমণ্ডিতামৃতা ভৃশং প্রপাতক প্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতা নিশা। সুনন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গ রাগরঞ্জিতা হিতা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ২॥

লসৎ তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাত চাতকা। তটান্তবাসদাসহংসসংস্থতাঙ্ঘ্রি কামদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৩॥

যাঁহার শরীব শ্রীকৃষ্ণের শরীরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মনোহর বারিধারিণী, যিনি স্বর্গকেও তুচ্ছ করেন, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরের কুঞ্জ সকলের মলা ধৌত করেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ১॥

যাঁহার জল মলাপহারী, যিনি প্রচুর জলপরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি অত্যন্ত পাতক নাশ করেন, যিনি পাতকের নিশাস্বরূপ, যিনি গোপরমণীগণের অঙ্গরাগে রঞ্জিতা হন্ সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ২॥

যাঁহার তরঙ্গ সঙ্গে জীবগণ পাপ হইতে মুক্ত হন, যাঁহার নবীন জলমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া চাতকগণও সেবা করে, যাঁহার তীরে হংসগণ ভৃত্যের ন্যায় বাস করে যিনি হংস সকলের কামনাপূর্ণ করেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৩॥

বিহাররাসখেদভেদ-ধীর-তীর-মারুতা গতা গিরামগোচরে যদীয় নীর চারুতা। প্রবাহ সাহচর্য্যপূত মেদিনী নদী নদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৪॥

তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্বিতং সদা সিতা, শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরী সভাজিতা। ভবার্চ্চনা প্রচারনাম্বুনাধুনা নিশারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৫॥

জলান্তকেলিকারি চারু রাধিকাঙ্গরাগিণী, স্বভর্ত্তুরন্য দুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী। স্বদত্ত সুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতি কোবিদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৬॥

যাঁহার তীরের মনোহর পবন রাসক্রীড়ার ক্লেশ নাশ করে, যাঁহার জলের গুণ বাক্যদ্বারা শেষ করা যায় না, যাঁহার প্রবাহ সাহায্যে পৃথিবী, নদী ও নদসকল পবিত্র হইতেছে, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৪॥

যিনি তরঙ্গসঙ্গে স্থিত সৈকত প্রদেশস্থ বালুকাদ্বারা সর্ব্বদা শুভ্রবর্ণা, যিনি শরচ্চন্দ্রের কিরণসমূহদ্বারা শোভিতা, যাঁহার জলে মহাদেবের পুজা করিলে মন নির্ম্মল হয়, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৫॥

যাঁহার জলমধ্যে ক্রীড়া করিয়া শ্রীরাধার অঙ্গের চারুতাবৃদ্ধি করে, যিনি স্বীয় পতি ব্যতিরেকে অন্যের দুর্লভ ও যিনি স্বামীর অর্দ্ধাংশভাগিনী, যিনি সপ্তসিন্ধুকে জলদানে পরিজ্ঞাতা, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৬॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী, বিলোল রাধিকা কচান্তচম্পকালিমালিনী। সদাবগাহনাবতীর্ণভর্ত্তৃভৃত্য নারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৭॥

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালি কুঞ্জমঞ্জুলা তটোথ-

ফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসূজ্জ্বলা। জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৮ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তং।

যাঁহার জলে পরিত্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শালিনী হইয়াছিলেন; শ্রীরাধিকার কেশকলাপ হইতে চম্পকমালা পতিত হইলে যদ্দ্বারা শোভিতা হইতেন, সর্ব্বদা অবগাহন করিলে যাঁহার জল ভর্ত্তৃভৃত্যভাব দূর করেন, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৭ ॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, যিনি কুঞ্জশোভা বৃদ্ধি করেন যাঁহার তীরে প্রস্ফুটিত মল্লিকা ও কদম্বরেণু দ্বারা যিনি শোভিতা হন, তাঁহার জলে যাঁহারা সর্ব্বদা অবগাহন করেন তাঁহারা ভবসাগরের পারে গমন করিতে পারেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥১৫
তথা সদ্বস্তুনোঃ ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥১৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমাত্মা পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকে দৃষ্টান্তত্রয় প্রদর্শন করিয়া সেই ভেদত্রয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। যেমন একটী বৃক্ষ স্বীয় পত্র, পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক্, তাহার পত্র, পুষ্প অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা যায় না, ঐইপ্রকার ভেদজ্ঞানকে স্বগত ভেদ বলে ॥ ঐরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষমধ্যে বিভিন্ন একটী বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না, এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। পরন্তু প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ইহাকে (এইরূপ ভেদজ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে। সেইপ্রকার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদত্রয় দৃষ্ট হয় না। "একং, এব ও অদ্বিতীয়" এই তিন বিশেষণদ্বারা পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা "একং" অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ; এই বিশেষণ থাকা প্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ "এব" তিনিই এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়তঃ নিত্য ও সত্য, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি "অদ্বিতীয়" এই জন্য পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না ॥ ১৫-১৬ ॥

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যা নিরূপণাৎ।
নামরূপেণ তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥১৭॥

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব, যেহেতু জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সদ্বস্তুর কোন অবয়বের

নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মের কোন প্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম বা রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাৎপর পরংব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ ॥১৮॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকে সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের সত্ত্বার কথনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে সেইপ্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতোভিদা ॥১৯॥

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোনপ্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই এবং নামরূপাদি উপাধি ব্যতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধিদ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে; এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম ও রূপের ভেদে কদাচ প্রকৃত পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিজাতীয়মসৎ তৎ তু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ ॥২০

এইক্ষণে সেই সৎরূপ পরম পুরুষ পরম ব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে। সেই পুরুষোত্তম অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অন্য কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সৎ পদার্থ, তিনিই অনন্তকাল বিদ্যমান থাকেন। অন্য কোন পদার্থের অনন্তকাল বিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ভিন্ন সকল পদার্থকেই অসৎ বলা যায় এবং তাহারা অসৎরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে অসৎ বলা যায়, তাহার আর সৎস্বরূপ কোথায়? অতএব অসৎ বস্তুদ্বারা সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

উপরোক্ত পঞ্চদশ শ্লোক হইতে বিংশতি শ্লোকপর্য্যন্ত সরল ব্যাখ্যা—

একমেব দ্বিতীয় সতের স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই, এস্থানে এই তিন প্রকার ভেদ নাই বলার তাৎপর্য্য এই যে বস্তুর তিনপ্রকার ভেদ ব্যতীত আর কোন প্রকার ভেদ বুঝাইতে পারে না, যথা (১) বস্তুর স্বগত ভেদ অর্থাৎ নিজের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে স্বগত ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শাখা কাণ্ড ফল ইত্যাদি, মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি। (২) স্বজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের সমশ্রেণীস্থ কোন বস্তুর সহিত নিজের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে যেমন দুইটী বৃক্ষের মধ্যে বা দুইটী মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ। (৩) বিজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের অসমশ্রেণীর মধ্যে

পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের মনুষ্যের সহিত গবাদি পশুর ভেদ। সৎ অর্থাৎ পরব্রহ্মের এই তিন প্রকারের কোন প্রকার ভেদ না থাকার কারণ এই যে সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে, অস্তিত্বের প্রতিযোগী কোন বস্তু নাই। বস্তু স্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে অতএব অস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতিযোগী কি বিজাতীয় নহে? ঐ অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের ভেদ হইতে পারে না, যাহা নাই তাহার সহিত আর ভেদ হইবে কিসের? অতএব নাস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতিযোগী নহে বা নাস্তিত্ব কোন বস্তু নহে, সুতরাং নাস্তিত্বের সহিত অস্তিত্বের বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব। ঐ সৎই একমাত্র অস্তিত্ব ঐ একমেবাদ্বিতীয় সদ্‌ব্রহ্মের সমশ্রেণীস্থ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সুতরাং স্বজাতীয় ভেদও হইতে পারে না। ঐ সৎ বা অস্তিত্ব নিরংশ, যেমন দেহের মধ্যে মস্তক, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু আছে; বৃক্ষের মধ্যে কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পত্র, ফল ও পুষ্প ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আছে, সেইরূপ সদ্‌ব্রহ্মের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই; কে কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্পের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ অংশ আছে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই, অসীম অনন্ত নিরাকার ও নির্গুণ তাহার মধ্যে অংশাংশি ভাব থাকিতে পারে না। কোন বস্তুর অংশ করিতে হইলে ঐ উভয় অংশের মধ্যে কোন সীমা, চিহ্ন বা রেখা কি অবকাশ ব্যতীত বস্তুর পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু যাহার সীমা আকার বা গুণ নাই, তাহার অংশ কি প্রকারে হইবে? যেমন আকাশের অংশ হইতে পারে না। আকাশ নিরাকার তাহার কোন স্বগত বা অন্তর্গত ভেদ নাই, সতের ও স্বগতভেদ অসম্ভব। আকাশ শূন্য কিন্তু সৎ শূন্য নহে, সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে। এইক্ষণ বিপক্ষ বাদীরা এই বলিয়া তর্ক কথিতে পারেন যে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই, চিহ্ন নাই, বা কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, তাহা জ্ঞানানুভবের অতীত অতএব যাহা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিদ্বারা কোন প্রকারে ধারণা বা অনুভব করা যায় না, তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ অনুভব করে কে? তুমি উত্তরে বলিবে আমি অনুভব করি তদুত্তরে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি যে তুমি বলিতেছ যে আমি অনুভব করি, তোমার সে আমি কে? বা কি পদার্থ? ইহার উত্তর তুমি সহজে দিতে পারিবে না। উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে তোমার বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে আমার জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, অবশ্য ঐ জ্ঞানের আকার তুমি দেখিতে পাওনা বা গুণও অনুভব করিতে পার না, কারণ স্বয়ং জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, জ্ঞান অন্য কোন বিষয় দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। তোমার যে জ্ঞান আছে ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য, যেহেতু তুমি জ্ঞানদ্বারা অনুভব করিতেছ যে তুমি আছ, অতএব যখন তুমি আছ তখন তোমার জ্ঞানও আছে স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যে বলিতে ছিলে যে যাহার আকার নাই, গুণ নাই তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ঐ স্বীকার করিব না ভাবটি কে প্রকাশ করিতেছে? অবশ্যই ঐ ভাবটি জ্ঞানকর্তৃক উপলব্ধ হইয়া ঐ জ্ঞানই ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করিতেছে অতএব তোমার জ্ঞান আছে ইহা নিশ্চিত। জ্ঞান না থাকিলে তুমিও থাকিতে পার না, কিন্তু তুমি না থাকিলেও জগতে

জ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না যেহেতু জগতে জ্ঞান না থাকিলে জগৎ অপ্রকাশ হয় অর্থাৎ জগৎ বা জগতের কোন বিষয় প্রকাশ থাকে না। কারণ জ্ঞানের অভাব হইলে জগৎ বা জগতের বিষয় কে অনুভব করিবে? অতএব জ্ঞানের উপরিভাগে জগৎ বা জাগতিক বিষয় সকল ভাসমান আছে। বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকিতে পারে, যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই অনুভব হয়। ঐ শূন্য বা নাস্তি কে অনুভব করে? অবশ্য জ্ঞানই শূন্য বা কিছু নাই অনুভব করে, ভাষান্তরে বলিতে হইলে যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই এই অনুভূতি মাত্র জ্ঞানের উপর ভাসমান হয়। অতএব জ্ঞানে বা চৈতন্যই নিত্য সৎ ব্রহ্ম। যখন জ্ঞানে বা চৈতন্যে কিছুই ভাসমান না হয় তখন বিষয়াভাবে ঐ জ্ঞান কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অব্যক্ত হয়, কেবল জ্ঞানেই জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র থাকে। অতএব তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ—সচ্চিদানন্দ। এখন তুমি বলিতে পার যে জ্ঞানই যদি সৎ হন তবে তাহার বিকাশাবস্থায় নামরূপও ব্যক্ত হয়। সমষ্টি জ্ঞানের বিকাশই ঈশ্বর এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ব্যষ্টিজ্ঞানের আধার জীব হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতির মধ্যে ভেদ ও নামরূপ ব্যক্ত আছে। তাহাহইলে ঐ নাম ও রূপদ্বারা তাঁহার স্বগতভেদ না হইবে কেন? যেমন তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা তোমার দেহের স্বগত ভেদ আছে, যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, শাখাপ্রভৃতিদ্বারা বৃক্ষের স্বগত ভেদ আছে সেই রূপসমষ্টি ঈশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা অংশস্বরূপ ব্যষ্টি জীবসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হইবে *

আবার জীবন যখন আংশিক জ্ঞানের আধার তখন পরস্পর জীবের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ আছে। তোমার উপরোক্ত তর্ক নিতান্ত অমূলক, যেহেতু নামরূপ ও উপাধি কল্পিত পদার্থ যদি এক ব্যক্তির দশটী উপাধি বা দশটী নাম থাকে এবং সেই ব্যক্তি ইন্দ্রজালিকের ন্যায় দশপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তাহাহইলে ঐ এক ব্যক্তির দশটী নাম বা রূপের দ্বারা তাহার মধ্যে কখন স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় ভেদ হইতে পারে না। * তুমি বলিয়াছ সমষ্টিই ঈশ্বর, জীব তাহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু স্বরূপতঃ ঈশ্বর বা জীব প্রকৃত বস্তু নহে। ঈশ্বর শক্তি উপাধিমাত্র, জীবও তদন্তর্গত বহু নামরূপধারি কোষোপাধি মাত্র। যেমন রামচন্দ্র, রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ডেপুটী মাজেষ্টেরী, ডেপুটী কালেক্টরী, মুনসেফী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, মানেজারি প্রভৃতি বহুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত হইয়া সেই সেই উপাধি পাইলেন, তাঁহার ঐ সমস্ত উপাধির সমষ্টিই তাঁহার রায়বাহাদুর উপাধি, অথবা অন্য আর একভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে রামচন্দ্র সবডিভিজনাল অফিসার হইয়া তদন্তর্গত ডেপুটীমাজেষ্ট্রেট্, ডেপুটীকালেক্টর ট্রেজেরার জেল-সুপারিনটেণ্ডাণ্ট, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান্ ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইলেন, ঐ সমস্ত পদ বা উপাধিগুলি রামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে,

* তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যেন বৃক্ষ জীবাদি তাহার পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতিস্বরূপ ইহা বিপক্ষের তর্ক।

* এক ব্যক্তির বহু উপাধিসম্বন্ধীয় উদাহরণটী এক দেশ সাদৃশ্য মাত্র তদ্ভিন্ন অনন্ত কখন সান্ত বা উপাধিবিশিষ্ট হইতে পারে না। জগৎ তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র এ প্রতিবিম্বের উপধি বা নামরূপ ব্যক্ত হয়। তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বলিয়া তাঁহার উপধি কল্পিত হয়। স্বরূপত তিনি নিরূপাধিক।

সবডিভিজনাল অফিসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতএব ঐ সকল পদ বা উপাধিদ্বারা প্রকৃত রামচন্দ্রকে স্বগত বা স্বজাতীয় বিজাতীয় প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ঐ সমস্ত উপাধিই একা রামচন্দ্রের, ঐ সকল উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে যে রামচন্দ্র ছিলেন ঐ উপাধি গ্রহণের পরেও সেই রামচন্দ্র আছেন, উপাধিদ্বারা রামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদ হয় নাই। রামচন্দ্রের ঐ পদ বা উপাধি পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবে না, কিন্তু প্রকৃত রামচন্দ্র (আত্মা) চির অমর, তাঁহার (আত্মার) কোনও উপাধি বা পদ কিছুই নাই, কেবল রামচন্দ্রের মাটীর দেহ ঐ সকল উপাধি বা পদের অভিমানী। ঐ মাটীর দেহ মাটীতেই মিশিবে, দেহ মুক্ত হইলে তাঁহার ঐ সকল পদের অভিমান থাকিবে না, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি-রূপ শক্তিময় দেহ ঈশ্বরোপাধির অভিমানী, আবার প্রকৃতির বিকাররূপ পঞ্চকোষময় দেহ * জীবোপাধির অভিমানী। ঐ জীবই দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষীরূপে প্রকাশিত এবং ঐ সকল দেব মানবাদি নামে অভিহিত হন। ঐ সকল নামরূপ জীবের হইতেছে, জীব উপাধি মাত্র, অতএব শক্তি এবং কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন প্রকৃত সদ্বস্তুর কোন উপাধি বা নাম রূপ থাকিতে পারে না। এতাবতায় অব-ধারিত হইল যে উপাধি ও নাম রূপদ্বারা সদ্ব্রহ্মের স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ত্রিগুণময়ী শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে † আবার ঐ শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মও নহে যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে উহা অগ্নির ক্রিয়াশক্তি বা স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও স্বভাব বা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়। ঐ শক্তি বা স্বভাব চিন্ময় ব্রহ্মের চিজ্জ্যোতি-দ্বারা চেতনবৎ হইয়া মহত্তত্ত্বে (সমষ্টি বুদ্ধিতত্বে) পরিণত হয়। যেমন দাহিকাশক্তিদ্বারা অগ্নির অগ্নিত্ব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধিকর্ত্তৃক জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশিত হয় ঐ মহদ্বুদ্ধিই চিৎ বা জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশের মহদ্দর্পণস্বরূপ। ঐ মহৎ বুদ্ধিরূপ দর্পনস্থ চিদ্বিম্ব (ঈশ্বর) ঐ দর্পণে সৃষ্টি কল্পনা কারি মহামানসাকার প্রক-টন করিয়া ও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমি সৃষ্টিকর্ত্তা (হিরণ্যগর্ভ) এই অভিমানী হন এবং মহামনের গর্ভ (অন্তর) হইতে বহুবিধ ভাব প্রকটন করিয়া সেই বহুবিধভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরাট বা বৈশ্বানর নামে অভিহিত হন এবং সেই সকল পৃথক পৃথক্ ভাব পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ ও তদাকার ধারণ করিয়া আমি দেব, আমি মানব ইত্যাদি অভি-মানী হইয়া বহুতর নাম ও রূপে ব্যক্ত হন *

---

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকায় (পঞ্চদশীর তত্ত্ব-বিবেক) ২০৮।২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য তাহাতে পঞ্চকোষের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

† ১৩০৩ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকার ২১০।২১১ পৃষ্ঠা এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের শেষ সংখ্যার ১২৯।১৩০।১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক ব্রহ্ম কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাধিভেদে ঈশ্বর হিরণ্য-গর্ভ ও বিরাট নামে যে অভিহিত হন তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

* পাঠককে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেই যে অনন্ত কখন সান্ত বা সীমাবিশিষ্ট হয় না বা তাঁহার নাম রূপও নাই উহা তাঁহার সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে যে ভাব প্রকটিত হয় সেই ভাবের প্রতিবিম্ব ইংরাজিতে উহাকে objective self বলা যাইতে পারে। আমার ইহা বারম্বার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সম্প্রতি বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ভাষার উপাধ্যায় ব্রহ্ম-বন্ধুর বক্তৃতায় বেদান্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে (যাহা সতন্ত্র প্রবন্ধে খণ্ডন করিব) উহা যে বাস্তবিক দোষ নহে তাহাই সংক্ষেপে

যেমন গুটিপোকা আপন লাল হইতে সূত্র বাহির করিয়া ও ঐ সূত্রদ্বারা গুটি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বদ্ধ হয় সেইপ্রকারে ঐ ভাবময় চিদাভাস (অর্থাৎ চৈতন্যের আভাসরূপ-জীব) স্বীয়ভাব বা স্বভাব হইতে ত্রিগুণসূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা গুটীর ন্যায় পঞ্চকোষ অর্থাৎ আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময়কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ কোষোপাধি অর্থাৎ আনন্দ, বুদ্ধিমন, প্রাণ ও দেহবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় * এইজন্য জীবাত্মার অপর নাম সূত্রাত্মা। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে ঐ সকল নামরূপ উপাধি (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবোপাধি) মায়া বা কল্পনাশক্তি ও কল্পিতভাব ব্যতীত তাঁহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে। অতএব সদ্‌ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। আমরা যে সকল বাহ্যবস্তুর রূপ বা আকার চক্ষুদ্বারা দর্শন করি তাহা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থস্থ সৌরকিরণ বা জ্যোতির প্রতিবিম্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দর্শাইয়াছি, পদার্থের সহিত আলোক-জ্যোতি এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির তারতম্যানুসারে বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় তদ্ভিন্ন প্রকৃত বস্তু আমরা দেখিতে পাই না বা অনুভব করিতে পারি না, তাহা যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যকিরণ বা আলোক যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা সেই পদার্থের রূপ বা আকার দর্শন করি * সেই মত জ্ঞানজ্যোতি এক একটী ভাবস্থ হইয়া তদাকারে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নাম ও রূপ অনুভব করি। অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষে পতিত হওয়ায় বৃক্ষের আকার, পর্ব্বতে পতিত হওয়ায় পর্ব্বতাকার, দেহে পতিত হওয়ায় দেহ বা শরীরাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্ধেতু বৃক্ষ পর্ব্বত ও জীবজন্তুর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৃক্ষ পর্ব্বত ও জীবজন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ আমরা ভিন্ন ভিন্ন জীবও জড়দেহ অনুভব করি। যেমন সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণ এক হইয়াও যে যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই সেই পদার্থের ও চক্ষের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা ও গুণানুসারে সেই সেইরূপে প্রতিবিম্বিত ও তদাকারে ব্যক্ত হয় যথা বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি, সেইরূপ জ্ঞান বা জ্ঞানজ্যোতি অদ্বৈত হইয়াও যে যে ভাবস্থ হয় সেই সেই ভাব ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে অর্থাৎ তাহাদিগের (স্বত্ত্ব-রজ-তম) গুণানুসারে জীব নানারূপে ব্যক্ত হয় যথা দেব, † মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে

দর্শান উদ্দেশ্য। ১৮৯৭।১৪ ডিসেম্বর তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশ আছে।

* পূর্ব্বোক্ত কল্পিতভাবসমূহ কি প্রকারে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিতত্ত্বে বিবর্ত্তিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব জড় ও জীবজন্তুর দেহ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতত্ত্বে যে পরিণত হয় তাহার বিবরণ এই পত্রিকায় আমার রচিত · পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব প্রবন্ধে বিষদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* আমার রচিত হিন্দুপত্রিকায় "পুনর্জ্জন্ম" প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য উহাতে প্রতিবিম্বে যে তৈজস অণু আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা বিজ্ঞানসম্মত।

† দেবতা ও জীব তবে পার্থিব জীবের ন্যায় স্থূল-ভাবাপন্ন নহে। এই জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার জীব আছে যেমন স্থূলজীব মানব বা পশু প্রভৃতি সেই-রূপ সূক্ষ্মজীব দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ প্রভৃতি। ইহার বিশদব্যাখ্যা পুনর্জ্জন্মতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন বৃক্ষপর্ব্বতপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইলে ও সূর্য্যের আলোকের মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত (বোধ বা উপলব্ধি) হইলেও স্বরূপত জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই সাব্যস্ত হইল।

মায়াবাদ।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

চক্ষু মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার পর শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মহাশয়ের কিছু পরিচয় দিব। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা নিরপেক্ষরূপ দর্শন করিতে পারি না; কর্ণদ্বারা নিরপেক্ষ শব্দই কি আমরা শুনিতে পাই? কখনই না। একটা হাটে শত শত লোক কথা বলিতেছে:—কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ দর জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ দর বলিতেছে, কোথাও মারামারি, কোথাও কাড়াকাড়ি, কোন স্থানে ছাগগণের ক্ষীণরব, স্থানান্তরে বলীবর্দ্দের গভীর নিনাদ, আমি প্রায় তিন ক্রোশ দূর হইতে এ সকলের কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ক্রমে যতই সেই হাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, ততই ক্রমে কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছি:—প্রথমতঃ অতি অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ, তাহার পর কিঞ্চিৎ স্ফুট একটা হৈ চৈ শব্দ, তাহার পর আরো কিছু অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একই প্রকার রব শব্দ কেবল দূরত্বভেদে আমার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিঘাত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আকাশ সমুদ্রে অসংখ্য শব্দ-তরঙ্গ ছুটিতেছে তাহাদের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে কোন তরঙ্গ লুপ্ত, কোন তরঙ্গ স্ফুট হইতেছে এবং তাহার পরিণামে যে এক মিশ্রিত তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে তাহাই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে। কোলাহলময়ী এই পৃথুলবক্ষা পৃথিবী প্রবলবেগে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এ কি নিঃশব্দে? আমার শরীরের অভ্যন্তরে রসরক্তাদি অসংখ্যপথে খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, এ কি নিঃশব্দে? ভক্ষিত পদার্থ সকল আমার জঠরাগ্নিতে অহর্নিশ ভস্মীভূত হইতেছে, ইহাও কি নিঃশব্দে? না তাহা নহে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশব্দ, শোণিতের সঞ্চালন শব্দ, পরিপাক-যন্ত্রের সর্ব্বপরিপাচক প্রখরাগ্নির টগবগ শব্দ, সকলেই অবিশ্রামে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে, কিন্তু আমরা বিন্দু-বিসর্গও শুনিতে পাইতেছি না!!

যে কয় অবস্থায় চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারি না, সেই কয় অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধারণা করা যায় না সুতরাং দূরত্বাদি প্রযুক্ত কর্ণদ্বারাও কিছু শুনা যায় না। ইংলণ্ডে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে তাহা আমরা শুনিতে পাই না, আবার কর্ণের মধ্যেই যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাই না। কর্ণের বিকার হইলে আমি বধির হই এবং

মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলেও আমি কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই না। অতি মৃদু অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে ধরে না, পাশাপাশি দুইটী কামরায় একটীতে বসিয়া অন্যে যে কথা কহে দেয়ালের ব্যবধানে আমি তাহা শুনিতে পাই না। পুনশ্চ, দশটা ঢাক যে সময়ে বাজে সে সময়ে অল্পাপুত্রের ক্ষীণরব কর্ণে প্রবেশ করে না এবং বহুজন এক কালে একই শব্দ করিলে ক কোন শব্দ করিল তাহাও আমি নির্ণয় রিতে পারি না।

শব্দ শুনিয়া আমরা সচরাচর শব্দের উৎ-ত্তির দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করি, কিন্তু প্রকৃত-ক্ষে শব্দ শুনিয়া আমরা তাহার দিক ও রত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। দূরত্বভেদে ব্দের ঘাত প্রতিঘাতের ন্যূনাধিক্য হয়, এই য়ো দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অস্ফুট নীচ শব্দকে দূরাগত এবং উচ্চ শব্দকে নিকটাগত মনে করি। এই প্রকার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ কর্ণে শুনিয়া শব্দের উৎপত্তি স্থানে দূরত্ব ও দিক নির্দ্দেশ করিতে াইয়া আমরা স্থলবিশেষে উপহাসযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের এই অস-তর্কতা বা অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রেত সাধকেরা আমাদের পার্শ্বে বসিয়াই আমা-দিগকে কত ভূতের শব্দ শুনাইয়া থাকে। দি সাধকপুরুষ আমার সম্মুখে বসিয়াই কথা বলিতেছে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইতেছে য সে নীরবেই রহিয়াছে এবং দূরস্থ অন্য কোন স্থান হইতে অন্য কেহ কথা কহিতেছে!

দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে আমরা শব্দের উচ্চ-নীচতা অনুমান করি, আবার কর্ণ পটহের সূক্ষ্মাস্থূলত্ব জন্যও শব্দের উচ্চনীচতা অনুভূত হয়। আজ যতদূরের শব্দকে যত উচ্চ বোধ হইতেছে বৃদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোন কারণে কর্ণ পটহের স্থূলত্ব উপস্থিত হইলে তত দূরের তত উচ্চ শব্দকে আর তেমন উচ্চ শুনা যাইবে না। সুতরাং শব্দের নিরপেক্ষ কোন মান থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞেয় শ্রুত শব্দের বাহ্য অস্তিত্বও জ্ঞেয় নহে। শব্দের রূপাদি কিছু নাই, সুতরাং চক্ষুঃ নাসাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। কেবল কর্ণ-দ্বারাই শব্দের যা কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু কর্ণের সাক্ষ্যও অস্পষ্ট। শব্দ অনুভব করিবার পূর্ব্বে তাহা বাহিরে ছিল কি না এবং বাহিরে থাকিলে কি আকারে ছিল এবং আমার কর্ণে কি আকার ধারণ করিল ইহা বুঝা যায় না। তবে শব্দের অপরিচিত রূপ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বুঝিয়া থাকি। দূরে একটী মনুষ্যরূপীকে ওষ্ঠ প্রকম্পন করিতে দেখিলাম। আর তাহার একটু পরেই একটা শব্দ শুনিলাম। সেই প্রকার ওষ্ঠ কম্পন যখনই দেখি তখনই একটু পরে সেই প্রকার শব্দ শুনি। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে ঐ দূরস্থ ওষ্ঠ কম্পন হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ণে সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠ কম্পন হইল দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; আর শব্দ হইল শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; এরূপ অবস্থায় ওষ্ঠ কম্পনের সহিত শব্দানুভূতির কার্য্যকারণসম্বন্ধ কাল্পনিক ব্যাপার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গন্ধ অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান নহে অনুমান সিদ্ধ কাল্পনিক জ্ঞান মাত্র।

পুনশ্চ, যদি মনে করাও যায় যে ওষ্ঠ কম্পন জন্য বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইয়া শব্দের জ্ঞান জন্মায়; তাহা হইলেও শব্দকে বাহ্যবস্তু বা বাহ্যবস্তু-নিষ্ঠ কোন গুণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; কেন না শব্দ যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ

আর তাহার শব্দত্ব জন্মে না; পূর্ব্বে যাহা কি রকম কি একটা আন্দোলনরূপে থাকে, তাহা কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইলে শব্দরূপে পরিণত হয়। বাহিরে যাহা ওষ্ঠ কম্পন, পরে বায়ু সমুদ্রে তথা কথিত শাব্দিকাকাশের অনুমান সিদ্ধ আন্দোলন, তাহাই জীবন্ত অ-বধির মনুষ্য কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে; আমাদের দুইটি কর্ণ। যে কোন ও শব্দের তরঙ্গাকৃতি উভয় কর্ণেই প্রতিঘাত হয়। একটী কর্ণে যে তরঙ্গগুলি প্রতিঘাত হয়, অপর কর্ণে তদিতর অপর কতকগুলি তরঙ্গ প্রতিঘাত হয়। সুতরাং দুইটী কর্ণে দুইটী তরঙ্গ প্রতিঘাত হইয়া যে কালে দুইটী শব্দের জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে কালে একটী মাত্র শব্দের জ্ঞান হয়। অপর একটী পদার্থে অন্য একটী পদার্থের আঘাত হইলে ঘাত ঘাতক উভয় পদার্থই গতিশীল হইয়া উঠে। উভয়ের গতি একই দিকে হয় না। ঘাত পদার্থের গতি যে দিকে হয় ঘাতক পদার্থের গতি তাহার অপর দিকে হয় এবং আঘাত স্থান হইতে ঘাত ও ঘাতক উভয়ই দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু আঘাত স্থানে বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঘাত ঘাতকের দিকে নহে, চারি দিকেই অসংখ্য সরলপথে সঞ্চালিত হয়। চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত অসংখ্য তরঙ্গের কোনও তরঙ্গ পথে বাধা পাইলে আবার তাহার কিয়দংশ সেই বাধক পদার্থে বিলুপ্ত হয়, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া বিপরীত পথে গমন করে এবং অসংখ্য তরঙ্গের কোন একটির পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইরূপে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবাধিত শব্দ তরঙ্গটী অগ্রে পথে সরল পথে এবং প্রত্যাবর্ত্তিত তরঙ্গটী পরে বক্র কর্ণ পটহে প্রবেশ করে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মূল কারণ এক হইলেও তরঙ্গের সরল ও বক্রপথে আগমন এবং সেই পথের দূরতার ইতরবিশেষে ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির শব্দগত অনেক বিভিন্নতা ঘটে। এখন যদি মনে করা যায় যে চারিদিকে নানাবিধ পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত জন্য একই কালে চারি দিকে অসংখ্য বিধ তরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে এক-বিধ তরঙ্গ অন্যবিধ তরঙ্গের সহিত অসংখ্য অপরিজ্ঞাত স্থানে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া কেমন এক জটিল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এই জটিল তরঙ্গজাত শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গের বাহ্য অবস্থান অনুভব করা কেমন অসম্ভব।

শব্দ সঞ্চালক পদার্থের শব্দ-পরিচালনী-শক্তির তারতম্যানুসারে শব্দের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বায়ুমধ্য দিয়া শব্দতরঙ্গ এক সেকেণ্ডে ১১২৮ ফিট যায়। বায়ুর শীতলতায় সুতরাং গাঢ়তায় শব্দতরঙ্গের গতি হ্রাস হয়। অপরাপর বায়বীয় পদার্থের গাঢ়তার ইতর বিশেষেও শব্দগতির ইতর বিশেষ হয়। কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাসে সেকেণ্ডে ৮৪৬ ফিট, অক্সিজেন গ্যাসে ১০৪০ ফিট, হাইড্রোজেন গ্যাসে সেকেণ্ডে ৪১৬৩ ফিট গতি হয়। তৈল-জল ইত্যাদি তরল পদার্থে এবং কাষ্ঠ লৌহাদি কঠিন পদার্থে শব্দের গতি বৃদ্ধি হয়। জলে সেকেণ্ডে ৪৭০৮ ফিট গতি হয়। লৌহে ১৬৮০০ফিট, তাম্রে ১১৬০০, ওককাষ্ঠে ১০৯০০ এবং পাইন কাষ্ঠে ১৫২২০ ফিট গতি হয়। আবার এদিকে শূন্যস্থান দিয়া শব্দ অনুভূত হয় না।

কোন একটী শাব্দিকতরঙ্গমালাকে যদি পৃথকভাবে শূন্যপ্রদেশ, বায়ু, জল বা তাম্রতারের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে যে তরঙ্গটী শূন্যস্থান পথে যাইবে তাহার কোন শব্দই কেহ শুনিতে পাইবে না, বায়ুপথে যে

তরঙ্গটী সঞ্চালিত হইবে তাহা শ হাতের বেশী দূরে শুনা যাইবে না, লৌহপথে সঞ্চালিত হইলে তদপেক্ষা অধিক দূরে শুনা যাইবে এবং তাড়িত তারে প্রবাহিত হইলে সাতসমুদ্র পারেও শুনা যাইবে। সুতরাং শব্দবাহক পদার্থের ইতর বিশেষে এবং দূরত্বের তারতম্যানুসারে একই শব্দকে কখন বিলম্বে কখন অবিলম্বে শুনা যায় এবং কখন শুনা যায় কখনও শুনা যায়ও না। ইহাতে এমন হয় যে নিকটের লোক শব্দ শুনিল পরে, দূরের লোক শব্দ শুনিল অগ্রে। নিকটের লোক হয়তো যে কালে কিছুই শুনিতে পাইল না, সে কালে দূরের লোক সুন্দররূপে শুনিতে পাইল।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যে শব্দের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পদার্থের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতির হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থের সকল দেহও আবার সমান স্পন্দিত হয় না। ক্ষুদ্রায়তন স্থূল তাম্র থালিতে আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থান যেমন স্পন্দিত হয় তাহার পরিধি স্থান তেমন স্পন্দিত হয় না; আবার বৃহদায়তন সূক্ষ্ম তাম্রথালিতেও সে আঘাতে তেমন স্পন্দিত হয় না। একটী তাম্র থালীকে ধরণীর সমান্তরালভাবে কোন লৌহস্তম্ভপার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া যদি তাহার উপর বালুকা ছড়াইয়া দিয়া থালীর এক পার্শ্বে বেহালার ছড় ঘর্ষণ করা যায়, তাহাহইলে থালীর স্পন্দন জন্য উপরিস্থ বালুকাগুলি নাচিতে নাচিতে একটী বিশেষ জ্যামিতিক আকারে বিন্যস্ত হয়। সুতরাং ঘর্ষিত থালীর সকল প্রদেশ সমান স্পন্দিত হয় এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন জন্যই শব্দ জ্ঞান জন্মে এবং একই শব্দায়মান পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্পন্দন যদি ভিন্ন ভিন্নরূপের হইল, তাহাহইলে শব্দায়মান পদার্থ হইতে সকলদিকে সমান প্রকৃতির শাব্দিক-স্পন্দন সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না, সুতরাং শ্রোতৃগণের দেশ-কাল-পাত্রভেদে তথা কথিত একই শব্দতরঙ্গদ্বারা একই শব্দ জ্ঞান হইবার কথা নহে। অথচ সচরাচর শব্দায়-মান পদার্থের একত্বে আমাদের দর্শজনের কর্ণ-গত শব্দের একত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি!!

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

রূপ ও শব্দের এবং তাহাদের অনুবোধক ইন্দ্রিয় মহাশয়দিগের পরিচয় দিলাম এখন গন্ধ-এবং তদনুভাবক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিব। গন্ধ এক প্রকার অনুভূতি যাহা আমরা নাসিকাধি-ষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করি। গন্ধের পরিচায়ক ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিচয় দেয় গন্ধ। সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং তাহা-দের বিষয়ের মত ইহাদেরও একটীর অভা-ভাবে অন্যটীর জ্ঞান হয় না। আবার ইহাদের একের পরিচয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় তাহাও অনাপেক্ষিক নহে। আমি দূরস্থ গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, আবার নাসিকার অন্তর্গত শ্লেষ্মার গন্ধও পাই না। অনবরত এক গন্ধ দীর্ঘকাল অনুভব করিতে গেলে ক্রমেই সে গন্ধ ক্ষীণ হইয়া একবারে অন্তর্হিত হয়। উগ্র গন্ধের উপস্থিতকালে মৃদুগন্ধ অনুভবে আসে না, দুইটি আম্রের মিলিত গন্ধকেও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথকরূপে অনুভব করা অসাধ্য। ফলতঃ আমরা প্রায়ই প্রকৃত গন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি এবং প্রতিনিয়ত যাহা নাসাপথে আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করিতেছি তাহার কি গন্ধ তাহা জানিতে পারি না। এবং নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বায়ুর গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু যদি অন্যান্য পদারে গন্ধ থাকে তবে বায়ুর যে কেন গন্ধ থাকিবে না

ইহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে বায়ুর রূপ থাকা অস্বীকার করা হয় সেইরূপ কারণে বায়ুর গন্ধও অস্বীকার করা হয়। বায়ু সর্ব্বদাই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যাঙ্গের সহিত সংযুক্ত থাকে বলিয়া আমি বায়ুর গন্ধ অনুভব করি না। পুনশ্চ অন্যপ্রকার গন্ধ অনুভব করি, সকলই বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে। এরূপ অবস্থায় বিবিধ গন্ধসংযুক্ত বায়ু ভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ কখনই ঘটে না। সুতরাং প্রতিকুল ধর্ম্মবিশিষ্ট অসংখ্য গন্ধাণু মিলিত হইয়া পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন গন্ধাণু জড়িত হইয়া যে এক যৌগিক গন্ধাণু সংঘটিত হয় তাহাই আমার অনুভবে আসে। এই মিশ্রিতগন্ধ অনুভব করিয়া বলা যাইতে পারে না যে আমি যে গন্ধ অনুভব করিতেছি ইহাতে বায়ুর গন্ধাংশ অথবা সম্মুখস্থ অন্যান্য কোন পদার্থের গন্ধাংশ নাই।

আমি গন্ধ অনুভব করি কিন্তু গন্ধাণুর কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুভব করি কি? গন্ধাণুর না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ। দশ হস্ত দূরে একটী পক্বাম্র রহিয়াছে এবং সেই আম্র হইতে কি না কি একটী আসিয়া আমার নাসাপথে যায়, আর তাহাতে আমি সেই আম্রের গন্ধানুভ করি!! সেই যে কি একটা কি যাহাকে গন্ধাণু বলি তাহাকে দেখিতে শুনিতে চিবাইতে বা ছুঁইতে পারি না। তাহার পর সেই অপরিচিত গন্ধাণুকে আমার এক এক অবস্থায় এক একরূপ অনুভব করি। আমার সর্দ্দি লাগিলে সে আম্রের গন্ধ পাই না অথবা অন্যরূপ গন্ধ পাই। পুনশ্চ আমি পলাণ্ডু রশুনের গন্ধকে এক সময়ে নিতান্ত অপ্রীতিকর জ্ঞান করিলেও অন্য সময়ে তাহাকে অতি উপাদেয় জ্ঞান করি এবং হয় ত এলাচী কর্পূরাদি সম্মিলিত তাম্বুলচর্ব্বণে কোন সময়ে আমার মুখের যে দুর্ব্বাস হয় তাহা সেই পলাণ্ডু রশুনের সুগন্ধে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাই!!

বস্তুতঃ গন্ধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় কি[ন্তু] গন্ধের বাহ্যাধারের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে অনুমানসিদ্ধ। এবং সেই অনুমানও ঘ্রা[ণ] দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। [যে] ব্যক্তি জন্মান্ধ সুতরাং বাহ্যবস্তুর রূপানুভ[ব] করে না এবং স্পর্শের দ্বারাও বাহ্যবস্তুকে ছুইতে না পারে, তাহার সম্মুখে গন্ধবান্ কো[ন] পদার্থ রাখিলে সে গন্ধানুভব করিয়াও গন্ধ[া]ধারের বাহ্যাস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে না আবার আমার অবস্থা বিশেষে বাহ্য কোন গ[ন্ধ]বান্ পদার্থ না থাকিলে গন্ধ অনুভব কর[িয়া] থাকি। বৈদ্যুতিক ক্রিয়াযোগে অথবা স্ব[প্ন]কালে আমি বহুবিধ গন্ধ অনুভব করি[তে] পারি। এই সকল কারণে একটু স্থিরচি[ত্তে] বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি যে গন্ধা[ধারের] বাহ্যাস্তিত্ব সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং সেই অনুমা[ন] গন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সুতরাং অবিশ্বাস্য রূপ[া]দির অনুভবের উপর নির্ভর করে!!

রস ও রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় সমালোচ[না] করিতে যাইয়াও আমরা রসের বাহ্যাস্তিত্ববিষ[য়ে] ভূলসিদ্ধান্ত করিয়া বসি। নিজের অবস্[থা] ইতরবিশেষে একই রসাণুকে আমি এক এ[ক] সময়ে এক একরূপ অনুমান করি। যখ[ন] কোন বস্তুর রস অনুভব করি তখনই [সে] রসাত্মক অণু সকলকে মুখ গহ্বরান্তর্গত লা[লা] মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত রসকে বিকৃ[ত] করিয়া অনুভব করি। অবিকৃত রস অনু[ভব] করিতে পারি না; রসাণু বলিয়া কোন বাহ্য ব[স্তু] যদি থাকে তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপগন্ধাদি হই[তে]

স্বতন্ত্র এবং তাহাদের পরিচায়ক ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ সেই অপরিচিত রূপস্পর্শের সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রসাণুর বাহ্যাস্তিত্ব অনুমান করি। রস অনুভব করি কিন্তু রসাণু অনুভব করিতে পারি না! ফলতঃ রসাণু একটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। রস অনন্ত প্রকার হইলেও সাধারণতঃ আমরা রসকে কটু অম্ল লবণ তিক্ত কষায় মধুর ভেদে ছয় প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার রসনায় তিক্ত তাহা হয়তো বালক বা বৃদ্ধ কিম্বা অন্য জীবের রসনায় মিষ্ট বা কষায় জ্ঞান হইতে পারে। যাহা আমার নিকট কটু তাহা গবাদির নিকট মধুর হইতে পারে। সুতরাং প্রাণী সকলের অবস্থা বিশেষে আমার অনুভূত রসাণুর ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয়।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের কথা বলা হইল এখন ত্বগাধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা বলিব। ত্বক্‌ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ, ত্বক্‌ তেমন সীমাবদ্ধ নহে দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ত্বক্‌ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে কিন্তু সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া নাই। স্থানভেদে ত্বকের অবস্থাভেদে সামান্যতঃ অনুভূত একই একই স্পর্শকে ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞান হয়। আমরা ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করি। কিন্তু স্পর্শ কি? ত্বকের দ্বারা যাহা অনুভব করি—কোন একটী পদার্থ আমাদের গাত্রস্পৃষ্ট হইলে আমরা যাহা অনুভব করি তাহা স্পর্শ। কোন পদার্থ ত্বকের সহিত সংলগ্ন হইলে আমাদের যে সকল অনুভূতি জন্মে তাহাদিগকে আমরা শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, বন্ধুরতা ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। চিন্তা করিয়া দেখিলে, মসৃণাসৃণত্ব, লঘুগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতা ইত্যাদি জ্ঞান ঠিক স্পর্শজ জ্ঞান বলিয়া বোধ হয় না, ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অধিক স্বীকার করিতেন না এবং সেই জন্য পঞ্চাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কতকগুলি অনুভূতিকে পঞ্চমেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শরূপে ধরিয়া লইতেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আরো কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মসৃণামসৃণত্ব, লঘুত্বগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতাদির জ্ঞান ত্বকের দ্বারা না হইয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদির অন্যতম পৈশিক কুঞ্চনা-কুঞ্চনাদিদ্বারা হওয়া বলেন। মনে কর, এই যে মস্যাধার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার উপরে হস্তস্থাপন করিয়াই কি ইহার গুরুত্বাদি অনুভব করা যায়? এই যে চেয়ারে বসিয়া আছি সুতরাং যাহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাহার গুরুত্ব কি চেয়ার তুলিতে চেষ্টা না করিয়া বুঝিতে পারি? তাহা পারি না এবং সেইজন্য গুরুত্বাদিকে ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক শীতাতপের ন্যায় বন্ধুরাবন্ধুরত্ব গুরুলঘুত্বাদিকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া সমালোচনা করা যাউক। রূপাদির জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিঘ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে স্পর্শজ্ঞানসম্বন্ধেও সেই সকল বাধা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হইতে স্পর্শনীয় পদার্থ ও ত্বক্‌ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইয়া যদি একটী অন্যটী হইতে অধিক দূরে থাকে অথবা পরস্পর অত্যন্ত চাপাচাপি করিয়া থাকে তবে প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হয় না। দূরত্বে স্পর্শজ্ঞানের অভাব অতি চাপে স্পর্শজ্ঞান ঢাকিয়া বেদনা জ্ঞান জন্মে। পক্ষাঘাত রোগে ত্বক্‌ বিকৃত হইলে বা মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। গাত্রে একটী কার্পাসতন্তুকণা

পড়িলে তাহা অনুভবে আসে না আবার গাত্র বস্ত্রাবৃত থাকিলে মক্ষিকা পতনানুভবও করা যায় না। পুনশ্চ ঈষদুষ্ণ এবং অত্যুষ্ণ দুই খানি লৌহফলক যুগপৎ গাত্রে স্পর্শ করাইলে প্রচণ্ড উত্তাপের অন্তর্দ্দাহক স্পর্শে কদুষ্ণের মৃদুস্পর্শ কেমন ডুবিয়া যায়। আবার আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশাইয়া দিলে স্পর্শ-দ্বারা তাহাকে চিনিয়া বাহির করা কেমন অসম্ভব।

কি প্রকার অবস্থায় স্পর্শজ্ঞান অসম্ভব তাহা বলার পর একবার দেখা যাউক স্পর্শজ্ঞান কতদূর সত্য। স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বাহ্য-বস্তুর স্পর্শানুভব করি, কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকের ভূবায়ু যে অবিচ্ছেদে আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানুষের অসম্ভব; অবিচ্ছিন্ন রূপ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ, অবিচ্ছিন্ন গন্ধ, অবিচ্ছিন্ন রস, অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ সমুদায়ই মানুষ-জ্ঞানের অতীত। ভূবায়ু যখন শরীরের চারিদিকে সমানভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন তাহার স্পর্শই আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন কেহ তালবৃন্ত হস্তে বায়ুসাগর বিতাড়িত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন সেই বায়ুতরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া একটীর পর অপরটী শরীরে ন্যূনাধিক বলে আঘাত করে আর আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমার শরীরের চারিদিকে বায়ু যে বলে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা একবার বাড়াইয়া একবার কমাইয়া না দিয়া একভাবে রাখিলে সেই অবিচ্ছিন্ন চাপ আমরা অনুভব করিতে পারি না। যেমন রূপ জ্ঞান হইতে রূপ ও রূপাভাবের সীমানির্ণয় করিয়া লইতে হয় তেমনি স্পর্শ অনুভব করিতেও এক স্পর্শকে স্পর্শান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। উষ্ণ স্পর্শকে শীতস্পর্শদ্বারা বা শীতস্পর্শকে উষ্ণ-স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, মসৃণ স্পর্শকে বন্ধুর-স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, লঘুস্পর্শকে গুরুস্পর্শ-দ্বারা অথবা গুরুস্পর্শকে লঘুস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর; তবে শীতাতপ অনুভব করিতে পারিবে, মসৃণ বন্ধুর বুঝিতে পারিবে, লঘুগুরু জানিতে পারিবে। কিন্তু শীতোষ্ণ, লঘুগুরু, বলিয়া কোন নিরপেক্ষ গুণ আছে কি? যাহা আমার সম্বন্ধে শীত তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই শীত? বাস্তবিক নিরপেক্ষ শীত বা উষ্ণতা; নিরপেক্ষ লঘুত্ব বা গুরুত্ব নিরপেক্ষ কঠিনতা বা কোমলতা, আমাদের জ্ঞানের অতীত। নিরপেক্ষ জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধিনাই—তারতম্য নাই। অল্প শীত বা অধিক শীত, অল্প লঘু বা অধিক লঘু, এ সকল কথা আমরা সর্ব্বদাই প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। সেই জন্য স্পর্শজ একটী গুণকে দেশ-কাল পাত্রভেদে তদ্বিপরীত গুণের সহিত অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যাহা আমার সম্বন্ধে শীত, তাহা অন্যের সম্বন্ধে উষ্ণ, যাহা আমার সম্বন্ধে লঘু তাহা অন্যের সম্বন্ধে গুরু হইতে পারে। যাহা আমার এক অবস্থায় উষ্ণ ও লঘু তাহা আমার অন্য-বস্থায় শীতল ও গুরু বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। একখানি হস্ত অর্দ্ধফুটন্তজলে এবং আর একখানি হস্ত বরফ শীতল জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া যুগপৎ হস্তদ্বয় সাধারণ জলে প্রবেশ করাইলে বুঝিতে পারা যায় সেই একই জলের শীতোষ্ণতর সম্বন্ধে হস্ত দুটী কেমন বিসদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। একই জল এক হস্তের সম্বন্ধে শীতল এবং অপর হস্তের সম্বন্ধে উষ্ণ জ্ঞান হয়!! সহজ শরীরে যে পদার্থকে যত শীতল বোধ হয় জ্বরাদি জন্য শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই পদার্থকে তদপেক্ষা অধিক

শীতল জ্ঞান হয়!! সুতরাং বাহ্যবস্তুর শীতাতপের ইতর বিশেষেই যে আমাদের শীতাতপ জ্ঞানের ইতরবিশেষ হয় তাহা নহে, আমাদের শরীরের অবস্থাভেদেও বাহ্যবস্তুর শীতাতপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব শীতাতপকে কোন বাহ্যবস্তু নিষ্ঠ গুণ বলিয়া না বুঝিয়া আমাদের দৈহিক অবস্থা বিশেষ বলিয়াই বুঝা উচিত।

স্পর্শদ্বারা আমরা সচরাচর গতির জ্ঞানও লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভ্রমসঙ্কুল নহে ইহা বলা যায় না। স্পর্শদ্বারা গতির জ্ঞান হইতে প্রকৃতপক্ষে গতির জ্ঞান হয় না, হয় কেবল স্পর্শজ্ঞান শীতোষ্ণতার জ্ঞান কিন্তু আমরা ভ্রমবশতঃ তদতিরিক্ত গতির জ্ঞানও হইয়াছে অনুমান করিয়া থাকি। তাহাতে কত সময়ে কেবল স্পর্শ করিয়া স্থিরপদার্থকে গতিশীল এবং গতিশীল পদার্থকে স্থির মনে করি। আমাদের পদস্পৃষ্টা ধরণী যে এত বেগে ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না। অন্ধকার রজনীতে সমবেগ চালিতা অনান্দোলিতা তরণীতে বসিয়া কি তাহার গতি অনুভব করি? বরং গতিশীলা তরণীকে গতিহীনা মনে করিয়া আপনাকেও গতিহীন মনে করি; এবং সেই সময়ে পার্শ্বস্থ কোন স্থিরা তরণীর কোন অংশে আপনার গাত্র সংঘৃষ্ট হইলে সেই ঘৃষ্টা তরণীকে চলিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করি। ষ্টেশনে দুইখানি গাড়ী পার্শ্বাপার্শ্বি থাকিলে কখন আপনার চলিষ্ণু গাড়ীকে অচল মনে করিয়া পার্শ্বস্থ স্থির গাড়ীকে গতিশীল জ্ঞান করি। এই সকল স্থলে আমাদের চক্ষু এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দুইই যেন যুক্তি করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া থাকে।

ঐন্দ্রিকজ্ঞান সমালোচন।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের বিষয়ের একরূপ পরিচয় দেওয়া হইল। এখন তাহারা কিরূপে পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহার সমালোচনা করিব। সম্মুখে একটী পক্কাম্র রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; আমি তাহার রূপ দেখিতেছি, সেই রূপ যেন হরিদ্বর্ণ; তাহার একটী রস অনুভব করিতেছি, তাহা অম্লমধুর একটী গন্ধ অনুভব করিতেছি, তাহা সুরভি একটী স্পর্শ নুভব করিতেছি, তাহা নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল; এবং ঘাত প্রতিঘাত করিয়া তাহার একটী শব্দ শুনিলাম তাহা ধপ্ করিয়া উঠিল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে আমি একটী হরিদ্বর্ণ, একটী অম্লমধুর রস, একটী সুরভিগন্ধ, একটী নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শ এবং ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্রই অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই সকল অনুভবেই আমার বিশ্বাসকে আবদ্ধ না রাখিয়া এই সকল অনুভূতির প্রত্যেকের এক একটী আধারের বাহ্যাস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেছি, অথচ সেই আধার গুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছি না। পুনশ্চ হরিদ্বর্ণই কি একটা অমিশ্র বর্ণ, অম্লমধুর রসই কি একটা অমিশ্র রস, মৃদুসুরভি গন্ধই কি একটা অমিশ্র গন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ-মসৃণ-কোমলতাই কি একটা অমিশ্র স্পর্শ, ধপ্ করিয়া যে শব্দ হইল তাহাই কি অমিশ্র একটী শব্দ? যাহাকে হরিদ্বর্ণ বলি তাহাতে না জানি কতই বর্ণের সমাবেশ আছে, অম্লমধুর রসেও না জানি কতই রস মিলিত আছে। মৃদুসুরভি আম্র গন্ধটীও অমিশ্র গন্ধ নহে। নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমলতাও বহুস্পর্শের যোগফল এবং ধপ্ করিয়া যে শব্দটী হইল তাহাও বহুবিধ শাব্দিককম্পনপ্রকম্পনের সমষ্টি। অতএব বলিতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

অনেক রূপাণুমিলিত হইয়া হরিদ্বর্ণাণু গঠিত হইয়াছে, অনেক বিপরীত ধর্ম্মান্বিত রসাণু মিলিত হইয়া অম্লমধুর রসাণু জন্মিয়াছে, অনেক বিরুদ্ধধর্ম্মী গন্ধাণু একত্র হইয়া মৃদুসুরভি গন্ধাণু হইয়াছে. বহুবিধ স্পর্শানুসংযোগে একটি নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শাণু রচিত হইয়াছে এবং একাধিক শব্দাণু সংমিশ্রিত হইয়া একটি ধপ্ শব্দাণু সংগঠিত হইয়াছে এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে আম্রটী কি? আম্রকে সাধারণতঃ একটি বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেইও তাহার প্রধান পাঁচটী অঙ্গ দেখা যাইতেছে, হইতে পারে তাহার অসংখ্য অঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পাঁচটীমাত্র অঙ্গ দেখিতেছি বা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং আম্রের যখন ন্যূনকল্পে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ থাকা স্বীকার করা যাইতেছে এবং সেই রূপাদি বিনা আধারে থাকিতে পারে না ভাবিয়া রূপাণু, রসাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করিতেছি তখন রূপাদি পাঁচ জাতীয় অণুর সংঘাতেই আম্র প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আম্র এমন একটী পদার্থ যাহার একাংশ বহুবিধ রূপাণু, দ্বিতীয়াংশ বহুবিধ রসাণু, তৃতীয়াংশ বহুবিধ গন্ধাণু, চতুর্থাংশ বহুবিধ স্পর্শাণু এবং পঞ্চমাংশ বহুবিধ শব্দাণুদ্বারা রচিত। এই হিসাবে আম্র একটি পঞ্চক পদার্থ যাহাতে রূপাণু প্রভৃতি পাঁচ জাতীয় অণু একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়িয়াছে এবং এই বন্ধনই কি আম্র নহে? সেই অপরিচিত রূপাণু, রসাণু, গন্ধাণু স্পর্শাণু শব্দাণু সকলে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আম্র নহে, এতৎ সকলের সেই নির্দ্দিষ্ট বন্ধনই আম্র। আম্রকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ফেলিলে তাহার অপরিজ্ঞেয় রূপরসাণু সকল পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল তাহাদের বন্ধনটী তখন ছিন্ন হওয়ায় তাহার রূপরসাদিও অন্যরূপ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর তখন আম্র বলিয়া বুঝি না। কিন্তু সেই বন্ধনটী যে কি তাহা আমি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। সেই বন্ধনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই; তাহা একটি মানসিক অনুমান একটী কল্পনা স্তবক মাত্র। ফলতঃ আম্রটীর অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে কাল্পনিক। এই সেই কল্পনার বিশ্লেষণ করিয়া আম্রের রূপ, আম্রের রস, আম্রের গন্ধ, আম্রের স্পর্শ, আম্রের শব্দ বলিয়া থাকি।

আম্রের বাস্তবিকতায় অলীকত্ব অন্য প্রকারেও বুঝা যায়। আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি ঈষৎ পীতাভ সবুজ;—আম্র নানাবর্ণের হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্পর্শই কি আছে? কোনটি নমনীয়, কোনটী স্থিতিস্থাপক, কোনটী কোমল কোনটী কঠিন, কোনটী শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন বর্ত্তুল, কোনটী দীর্ঘাকৃতি, কোনটী চেপ্টা, তাই বলিতেছি যে আম্রের দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট কোন রূপ বা স্পর্শ নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটী মধুটুকী, কোনটী গোপালভোগ, কোন চিড়াভিজানী, কোনটী অম্লমধুর, কোনটী শূকর চেঁচানী। গন্ধও সকল আম্রের একমত নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি রস, কতকগুলি গন্ধ, কতকগুলি স্পর্শকে নানাভাগে সংমিশ্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছামত একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ কি না? একটী হইতে অপরটী রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অন্যরূপ হইলেও তাহাদিগকে একই আম্র নামে অভিহিত করিতেছ। পুনশ্চ আজ যে আম্রটীকে দেখিলে এক মাস পর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ!! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে এত বিভিন্নতা বুঝিয়াও দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি পাইলে বলদেখি?

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। | ১৩০৪ সাল। ১৮১৯ শকাব্দা। | ফাল্গুন ও চৈত্র।

আমিত্বের প্রসার।

শূদ্র।

মানব সমাজে যিনি যতই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন, তাঁহাতে শূদ্রত্বের বীজ রহিয়াছে। নূনাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই শূদ্র। পক্ষান্তরে, মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বীজ রহিয়াছে; উহাকে অঙ্কুরিত—পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই তাহার নীচত্বের বীজ ক্রমে নিস্তেজ—নিরঙ্কুরিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অসভ্য বর্ব্বর চণ্ডালেতেও ব্রাহ্মণত্বের বীজ রহিয়াছে এবং সুসভ্য ধীমান ব্রাহ্মণেতেও চণ্ডালত্বের বীজ রহিয়াছে। প্রভেদ এই, চণ্ডালে চণ্ডালত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত, ব্রাহ্মণত্বের বীজ অনঙ্কুরিত এবং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং চণ্ডালত্বের বীজ অনঙ্কুরিত। ফলে কিন্তু সকলেই মুক্তি তীর্থের যাত্রী, সন্দেহ নাই।

মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহার এক অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে। ইতরপ্রাণীদিগের উহা নাই, তজ্জন্য তাহারা চিরকাল একই অবস্থায় রহিয়া যায়। কিন্তু মানবের অসাধারণ শক্তি থাকায়, সে তৎসাধনায় পশুসদৃশ অবস্থা হইতে দেবসদৃশ অবস্থায় উন্নত হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে, যাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী অবগত না থাকায়, পর্ব্বত-গুহা বা বৃক্ষ-কোটরে বাস করিত, আজ তাহারা সুরম্য হর্ম্ম্যে বিরাজ করিতেছে। যাহারা বস্ত্রবয়ন-প্রণালী অবগত না থাকায়, বৃক্ষ-বল্কল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত, তাহারা নানাবিধ মনোহর বস্ত্রে সুশোভিত হইতেছে। যাহারা অগ্নি-উৎপাদন-প্রণালী অবগত না থাকায়, দাবানলাদি দৈবলব্ধ অগ্নি সযত্নে রক্ষা করিত, তাহারা ক্রমশঃ অরণি, পরে লৌহ-প্রস্তর, তৎপরে ক্রমে রাসায়ণিক জ্ঞানলব্ধ দীপশলাকাদ্বারা পলকে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান অনেক সুসভ্য জাতি কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বেই অত্যন্ত অসভ্য ছিল। পশু সদৃশ মানবও চিরকাল পশুসদৃশ থাকিতে পারে না। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি তাহাকে উত্তেজিত—উন্নমিত করিয়া তুলে। কোন সমাজেই সকল ব্যক্তিরই তুল্য শক্তি থাকে না; কিন্তু যাহার যে বিষয়ে শক্তির আধিক্য থাকে, তাহার বিকাশ হইলেই সেই শক্তি লব্ধ-ফল সাধারণের সম্পত্তি হইয়া

যায়। অদ্য কোন এক ব্যক্তি তড়িৎ সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সেই তত্ত্ব-লব্ধ-ফলের অধিকারী হইল। যে সমাজেই যে বাস করুক না কেন, সেই সমাজেই জ্ঞানের ইতরবিশেষ আছে। অতি সুসভ্য সমাজেও যেরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ দৃষ্ট হয়, অতি অসভ্য সমাজেও তাহারই প্রাকৃতিক অনুপাত অনুসারে সেইরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ দৃষ্ট হয়; প্রভেদ এই যে, অসভ্য সমাজের জ্ঞানীরও হয়ত অনেক সুসভ্য সমাজের মূর্খের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞান কম। অনেক পাঠশালার বালকেরাও এইক্ষণে জানে যে, সূর্য্যমণ্ডলে চন্দ্রমণ্ডলের ছায়া নিপতিত হওয়ায় সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু হয়ত অনেক সমাজের প্রাচীন অবস্থায় তাহার সুসভ্য পণ্ডিতেরাও গ্রহণ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-বিধি প্রকৃষ্ট নহে বলিয়া আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন কালে যখন অগ্নি-উৎপাদন-বিধি একেবারে পরিজ্ঞাত ছিল না, তখন যে ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদনের এই আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি বাষ্পযানাদি-আবিষ্কর্ত্তাদিগের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান বলিতে হইবে? মনে কর, আজ যদি মানবমাত্রেই কোন দৈবকারণে অগ্নি-উৎপাদনবিধি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-তথ্য আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে? কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে, এ তত্ত্ব এখনইবা সুসভ্য সমাজের কয় জনে ঠিক্ জানে? মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে আমরা রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত্তিকা হইতে এইরূপ পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শতমুখে করিয়া তৃপ্ত হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনাশ্রমে তাহা লাভ করিয়া আমরা আমাদিগকে জ্ঞানী মনে করি। কিন্তু যদি আমাদের এক্ষণে নিজেব সব করিয়া লইতে হয়, যদি আমরা কোন বিষয়ে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্য না পাই, তাহাহইলে আমাদের দশা কি হয়? আজ যদি পৃথিবীর তাবৎ গৃহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আমরা সকলেই দৈববিড়ম্বনাবশতঃ গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনের মস্তিষ্ক হঠাৎ ঘর বাঁধিয়া উঠিতে পারে? প্রত্যেক সমাজে হয়ত দুই একজন লোক ক্রমে স্বীয় বুদ্ধির কৌশলে পুনর্ব্বার গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন। ক্রমে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের আবিষ্কার-লব্ধ-ফল ভোগে আপনাদিগকেও জ্ঞানী বা সভ্য বিবেচনা করে! আজ দশবৎসরের বালিকাও রন্ধনপ্রণালী অবগত আছে, কিন্তু যিনি রন্ধন-প্রণালী প্রথম আবিষ্কার করিয়া পশুর ও মনুষ্যের আহারপ্রণালীর বিভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণকার ঐ বালিকা হইতে অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার বুদ্ধির সহিত ঐ বালিকার বুদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে না। পৈত্রিক ধনবত্তায় স্বীয় ধন-পুরুষকারের গৌরব কোথায়?

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, অতি সুসভ্য সমাজেও মানবের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, অতি অসভ্যসমাজেও সেই শক্তি আছে। প্রভেদ এই, অসভ্যসমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা কম এবং সুসভ্যসমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা অধিক। অসভ্য সমাজে আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, সুসভ্যসমাজে তাহা হয়ত দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার ঐ অসভ্যসমাজ যদি ঈশ্বরেচ্ছায় বাহ্য উপযোগিতার সাহায্য পায়, তাহাহইলে হয়ত দশবৎসরের মধ্যেই সুসভ্য সমাজের দশ সহস্র বৎসরের চেষ্টার ফল অধিকার করিয়া লইতে পারে। জানিনা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভারত হইতে না গেলে, কতদিনে স্বাধীনভাবে ইউরোপে উহা আবিষ্কৃত হইত; কিন্তু কোন সময়ে না কোন সময়ে যে উহার তদ্দেশে আবিষ্কার হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত পাশ্চাত্যেরা নিজে যাহা বহুকাল পরে আবিষ্কার করিতে পারিত, প্রাচ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া তাহারা বিনাশ্রমে তাহা অধিকার করিয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও ঐরূপ। প্রত্যেক বালকের যদি গণিত শাস্ত্রাদির প্রত্যেক তত্ত্ব নিজের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহাহইলে লক্ষ লক্ষ বালকের হয়ত গণিতশাস্ত্র আদৌ শিক্ষা করা হইবে না; দুই'চারি জনের হয়ত আংশিক শিক্ষা হইবে। জ্ঞানীদিগের জ্ঞানলব্ধ ফল গ্রহণ করিতে পারিলেই, স্বাভাবিক অল্পসত্ত্ব অজ্ঞানীরা সহজে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কেবল অজ্ঞানীদিগের যদি একটি সমাজ কল্পনা করা যায়, তাহাহইলে সেই সমাজ জ্ঞানীর জ্ঞানলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত হইলেও শত শত বৎসর পরে উহা ক্রমে সুসভ্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, তাহাদের বংশ-পরম্পরা যে ক্রমে জ্ঞানমার্গে অধিরোহণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কারণ কর্ম্মদেহ-মানবজীবনে জ্ঞানোন্নতির বীজ নিহিতই আছে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, সভ্যজাতিরা অসভ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া বিনা আয়াসে সভ্যজাতিদের বহুযত্ন ও বহুশ্রমের ফলগুলি নিজস্ব করিয়া লইতেছে। সভ্য জাতিরাও সযত্নে অসভ্য জাতিদিগকে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নত সুসভ্যঅবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছে। জগৎ যেন নিত্য-বিবর্ত্ত-বিলাসময়ী প্রকৃতির গতিতে উন্নতির দিকেই ধাবমান।

একজন ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় যে ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য যে বৈশ্য, সে কি কেবল তাহাদের স্বকীয় পরিশ্রম-লব্ধ ফল, না সহস্র সহস্র বৎসরের পর-লব্ধজ্ঞানের ফল? পরের সাহায্য ব্যতীত যদি প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাহইলে এক এক সমাজে তাহা কয় জনের সাধ্যায়ত্ত হইবে? আজ একজন ব্রাহ্মণ যে 'ব্রাহ্মণ' সে কেবল তাঁহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে নহে, তিনি সহস্র সহস্র পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া। তোমাতে যতই অসাধারণ-শক্তি থাকুক্ না কেন, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিষয়ক উন্নতিতেই যদি নিজের উপর তোমার নির্ভর করিতে হয়, তাহাহইলে তোমার কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয়! সুতরাং স্বীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তোমার অনুন্নত ভ্রাতাদিগকে অজ্ঞানী, মূর্খ ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা করিও না। তোমাকে এবং তোমার অনুন্নত ভ্রাতাকে বাল্যকাল হইতে একই অবস্থায় রাখিলে, হয়ত তোমার ও তোমার অনুন্নত ভ্রাতার মধ্যে আজ কোন প্রভেদ থাকিত না। তুমি যে উন্নত, সে কেবল তুমি পর-সাধিত জ্ঞানের সুবিধা পাইয়াছ বলিয়া। আর তোমার ঐ ভ্রাতা যে অনুন্নত, সে সেই সুবিধা পায় না বলিয়া; এইমাত্র প্রভেদ। আমি মাত্র সামাজিক শূদ্র বা সামাজিক ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছিনা। সামাজিক ব্রাহ্মণের মধ্যেও অনেক যথার্থ শূদ্র ও যথার্থ ব্রাহ্মণ রহিয়া-

ছেন এবং সামাজিক শূদ্রের মধ্যেও অনেক যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূদ্র আছেন। আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূদ্রের কথা বলিতেছি। যাঁহার আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হইয়াছে, যিনি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন ও আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করেন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি-বিভূষিত, যাঁহার হৃদয়তন্ত্রীর সুর বিশ্ব-তন্ত্রীর সুরের সহিত একতান হইয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বদা বিশ্বের হিতচিন্তায় মগ্ন হইলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ, আর যাহার প্রকৃতি অসংযত রহিয়াছে, যাহার সর্ব্বত্র ভেদ-দৃষ্টি হয়, যাহার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান-দার্ঢ্য নাই, যাহার খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান নাই, যে অনক্ষর মূর্খ, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শূদ্র। ব্রাহ্মণত্ব আদর্শ, তবে শূদ্রত্বও বিশ্বের বিধানে অপরিহার্য্য। আদর্শ থাকিলেই গঠিতব্য আছে। উপযোগী বাহ্যসাহায্য ব্যতিরেকেও যে শূদ্র ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে প্রকৃতির ক্রমবিকাশধর্ম্মের নিরপেক্ষ নিয়তিতে কোনদিন না কোনদিন উপনীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে কিনা বাহ্যসাহায্য পাইলে, উহা সুলভ হইবে।

পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, উন্নতির ক্রম অতিক্রম করা যায় না। শূদ্র একেবারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব ক্রমে অধিকার করিয়া, পরে ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে উপস্থিত হইতে হইবে। তম-রজ পার হইয়া, পরে সত্ত্বে স্বত্ববান্ হইতে হইবে।

উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় আজ্ঞাপ্রতিপালন। পুত্র যদি পিতার আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, তাহাহইলে সমাজে শৃঙ্খলতা থাকে না। আজ্ঞাপ্রতিপালন যেমন সামাজিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, তদ্রূপ ব্যক্তিগত উন্নতিরও অপরিহার্য্য উপাদান। যে বালক পিতা-মাতা-শিক্ষকের অবাধ্য হইল, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয়। যাহার যে বিষয়ে অধিকার, সে বিষয়ে অনধিকারী ব্যক্তির তাহার নিকট আজ্ঞাধীন হইতেই হইবে। রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞাধীন না হইলে, কখনও রোগমুক্ত হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানীর আজ্ঞাধীন না হইলে কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে আজ্ঞাপ্রতিপালন-শিক্ষা নাই বলিয়াই আমরা অধুনা এত অনুন্নত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। কি ধর্ম্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার, কি রাজনৈতিকসংস্কার, সর্ব্ববিষয়েই আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত। অধিকারীর তারতম্য নাই; যে ব্যক্তি যে বিষয় কখনও যথাযথ আলোচনা করে নাই, সে ব্যক্তিও নিজে তাহাতে স্বতন্ত্র মত সংস্থাপনে যত্নবান! আজ পাঁচ জনে মিলিয়া একটী কার্য্যারম্ভ করিল, আগামী কল্য পাঁচজনের পাঁচটী মত হইল এবং আরব্ধ কার্য্য ধ্বংস হইয়া গেল। অনধিকারী-পক্ষে অধিকারীর আজ্ঞা প্রতিপালন সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির মূল। যে পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত তত্ত্ব-বিষয়ক অধিকারী ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে হয়। অজ্ঞানী এবং বালকে কোন প্রভেদ নাই; বালক পিতা বা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, সমাজ তাঁহাদের হস্তে আজ্ঞা প্রতিপালন করাইবার জন্য দণ্ডের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই দণ্ড-পরিচালনে পিতা বা গুরু স্বীয় স্বীয় পুত্রাদিকে আজ্ঞাধীন করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি আজ্ঞাধীন না করা যায়

এবং তাহাকে আজ্ঞাধীন করিবারও কোন উপায় না থাকে, তাহাহইলে তাহার অনধিকৃত বিষয়ে কখনও অধিকার সুসম্ভাবিত হইতে পারে না। যথার্থ শূদ্রও যথার্থ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজাতির নিকট বালক স্বরূপ। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে, কখনও উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিবে না। মানবীয় উন্নতির সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী ব্যক্তিই শূদ্র; অধিকারীর সাহায্য ব্যতীত কিরূপে সে অনধিকৃত বিষয়সমূহ অধিকার করিবে? যথার্থ শূদ্রেরও যেরূপ যথার্থ বৈশ্যাদি-পরম্পরায় উচ্চাধিকারীদিগের আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি, দ্বিজাতি ব্রহ্মচারীদিগেরও তদ্রূপ গুরুর আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচারীদিগের পূর্ব্বজাত সংস্কারহেতু তাহাদিগকে যত শীঘ্র উচ্চ অধিকারের বিষয় অবগত করান বিধি, শূদ্রের পূর্ব্বসংস্কারাভাবহেতু তাহা করান বিধি নহে। কোন অধিকারের স্ফুরণ দেখিলেই তৎশিক্ষা-সাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই। যথার্থ শূদ্রের যেরূপ অকপটে যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিরও তদ্রূপ অকপটে যথার্থ শূদ্রকে উচ্চ অধিকারে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে যেরূপ উন্নতিপথে উঠিতে পারিবে না, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিও যথার্থ শূদ্রেরমঙ্গল কামনা না করিলে, তাঁহাদের আমিত্বের প্রসার অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং তদ্ধেতু তাঁহাদের গুণগতবর্ণ-প্রাধান্যও অব্যাহত রহিবে না। আর শূদ্রের পক্ষে আজ্ঞা-প্রতিপালনই আমিত্বের প্রসারের প্রধান উপায়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সংস্রবে থাকিয়া, তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদের আদিষ্ট কার্য্য করিলেই শূদ্র শূদ্রত্ব পরিহার পূর্ব্বক উচ্চাধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি শূদ্র স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহাহইলে সে কত শত বৎসর পরে যে নিজের উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? অতএব হে শূদ্র! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাহ, তবে ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাহ, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাহ, বৈশ্য হও; যদি বৈশ্য হইতে চাহ, তাহাহইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ শূদ্র হও। ভক্তিদ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিত্বের প্রসার হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিত্বের প্রসার সাধিত ও তাহারই ফলে অভিপ্সিত ধর্ম্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।)

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগতের অবাস্তবিকতা।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে বাহ্যজগতের প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থা আমরা জানিতে পারি না; পরন্তু বাহ্যজগতের দ্রব্য-ধাতুগত আপেক্ষিক অস্তিত্বই কি আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি? বাহ্যজগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের বস্তুগত কোন প্রকার পরিচয় নাই। আমরা কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দপ্রভৃতি কতকগুলি ভাব অনুভব করি এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সেই সকল ভাবকে মদিতর বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া মানিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপাদি কোন বাহ্যবস্তুর বিশেষ গুণ নহে; সে সকল আমাদের দেহেরই এক প্রকার অবস্থা মাত্র, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভবে না। সত্য বটে, রূপাদি অনুভব করিতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বাহ্যবস্তুর গুণ নহে, আমাদেরই দৈহিক এক অবস্থাবিশেষ। সেই জন্য কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দেখিতে পাই না, আবার কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দর্শন করিতে পারি। বাহ্যবস্তু আমাদের এমন কোন জ্ঞানই জন্মাইয়া দিতে পারে না, যাহা আভ্যন্তরীণ কারণে, বাহ্যবস্তুর অবর্ত্তমানে আমরা অনুভব করিতে পারি না। স্বপ্নে আমরা কত কি অবর্ত্তমান বস্তুর রূপাদি দর্শন করি, জাগ্রত সময়েও কত কি অদ্ভুত-ভৌতিকক্রিয়া দেখিতে পাই। সান্নিপাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা সুরাতঙ্কিত ব্যক্তি বাহ্যবস্তুর সংসর্গ-নিরপেক্ষ আভ্যন্তরীণ কারণে কত কি বিভীষিকা দেখে, আবার যখন আমরা ঘুমাইয়া থাকি, তখন সম্মুখে বাহ্যজগৎ যদিও বাস্তবিকতার জলন্ত দীপ্তিতে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না। জাগ্রত সময়েও যখন মন কোন চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তখন বাহ্যবস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করিতে পারি না। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছিলেন, তখন তিনি দুর্ব্বাসার ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রের বিজলী-জ্যোতিও দেখিতে পান নাই, তাঁহার সেই শ্রবণবিদারক অভিসম্পাতের তীব্র বজ্রধ্বনিও শুনিতে পান নাই!

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা সকলের মধ্যে অনেকেই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া এপর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের চক্ষে ভেল্কি লাগিয়াছে এবং সেই ভেল্কি না ভাঙ্গিলে ভব-ভেল্কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা বৃথা। ইহাঁরা বলেন যে, রূপাদির জ্ঞান হইতে বাহ্যবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব এত প্রয়োজনীয় নহে। রাশি রাশি রূপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকুক, তোমার যদি দর্শেন্দ্রিয় না থাকে, দর্শনশক্তি না থাকে, তবে সে রূপ দেখে কে? পক্ষান্তরে, যদি আমার দর্শনশক্তি থাকে, তবে বাহ্যরূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি রূপের হাট বসাইতে পারি! অন্ধকার গৃহ, চক্ষুও মুদিত, ঘরের কোথাও কোন রূপ দেখা যাইতেছে না, একবার আমার চক্ষুগোলকেরর একটী পার্শ্ব যদি টিপিয়া ধরি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব, অদৃষ্টপূর্ব্ব কেমন উজ্জ্বল আলোকচক্র আমার চক্ষুর অনতিদূরে অপূর্ব্ব-শোভা সঞ্চার করিতেছে। পুনশ্চ, আমি হয়ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে

অন্ধকার গৃহে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, ঘরে কত কত সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই দেখিতেছি না, তবু কিন্তু যে সকল বস্তু পূর্ব্বে সে ঘরে দেখি নাই এবং ঘুম ভাঙ্গিলেও যাহা দেখিতে পাইব না, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছি!! আমার এই অবস্থা—যাহাকে আমি স্বপ্ন বলি, তাহা যদি এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত যে, আমি জাগরিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপরিচিত পদার্থ সকল আমার সম্মুখ হইতে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়াছে, আমার মানসপট হইতে তাহাদের স্মৃতি-রেখাপর্য্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে, তাহাহইলে কি আমি আমার সেই সুদীর্ঘ সুপরিচিত স্বপ্নরাজ্যের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী অপরিচিত জাগ্রত-রাজ্যের কামনা করিতাম? যে ব্যক্তি উন্মত্ত অবস্থায় কল্পনা-বলে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বাহ্য-জগৎকে ভুলিয়া, তাহার স্থানে নূতন জগৎ গড়াইয়া, তাহাকেই আপনার সাম্রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, সে কি সেই মত্ততার বিনিময়ে এমন অপ্রমত্তাবস্থা কামনা করে, যাহাতে সে তাহার সুখের রাজ্য হারাইয়া, বিকট বিভীষিকাময় দারিদ্র্যের জলন্ত আলিঙ্গনে জীবন্তই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে যাইবে? ধ্যানমগ্ন যোগী যে এই সর্ব্বদুঃখালয় জগৎকে তাঁহার মনঃপ্রদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার স্থানে সর্ব্বসুখালয় শান্তি-প্রদ অধ্যাত্মজগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহারই শান্তিময়ক্রোড়ে বসিয়া ভূমানন্দ-সুধা পান করিতেছেন, তিনি কি আবার সাধ করিয়া পার্থিব-গরল পানের জন্য ব্যস্ত হইবেন?

স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার করিয়াও আমরা সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর অলীকতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা শৈশব হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের—পঞ্চ অন্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া শিখিয়াছি যে, আমি স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা, আর জাগ্রতে যাহা দেখি, তাহা সত্য; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমি সহজ অবস্থায়—জাগ্রতঅবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে সত্য, আর স্বপ্নোন্মত্ততাদি অবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে মিথ্যা? স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা যে মিথ্যা, একথা কি আমি স্বপ্নসময়ে মনে করিতে পারি? যে উন্মত্ত, সে তাহার উন্মত্ত অবস্থা অনুন্মত্তের মত জানিতে পারে না; আমিও যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় বিষয়ই অলীক। জাগ্রতসময়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় যেমন মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট বাহ্যজগতের পরিচয় দিয়া থাকে, আমার স্বপ্নসময়েও তাহারা ঠিক তেমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট স্বপ্ন-কল্পিত জগতের পরিচয় দিয়া থাকে! যতক্ষণ আমি জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ আমি যেমন মনে করি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক, তেমনি যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণও আমি ভাবি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক। যাহার জাগরণের বিরাম নাই, তাহার নিকট তাহার জাগ্রৎজগৎ যেমন সত্য, যাহার স্বপ্ন ভাঙ্গে না, তাহার নিকট তাহার স্বপ্নজগৎও তেমনই সত্য। স্বপ্ন ভাবিলে, জাগরণে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনার তুলনায় স্বপ্নে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনাকে মিথ্যা বলিলে, জাগরণের অভাব কালের স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার তুলনায় জাগ্রৎকালের ঘটনাকেও মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন নহে—স্বপ্নও জাগরণ; জাগরণ কালের জাগরণ যেমন ঠিক, তেমনই জাগরণ। আর যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, জন্মের পূর্ব্ব ও মৃত্যুর পরের

মহাসুষুপ্তির অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাকে একটী ক্ষুদ্র স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইটীই আমারই অবস্থা এবং এই দুইটী অবস্থাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যার আলো-আঁধারিতে যতই বিসদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি, ফলে পারমার্থিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই এক প্রকৃতির। উভয় অবস্থাতেই মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকে না। জাগ্রত-কালে মন যেমন তাহার পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও মন তেমনই তাহার সেই সময়ের পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। প্রভেদ এইটুকু যে, স্বপ্নকালের সেই সকল কল্পনা জাগরণকালে এবং জাগরণকালের কল্পনা স্বপ্নকালে পুনরাবর্ত্তন করে না এবং সেই জন্য স্বপ্ন জগতের কল্পিত বস্তু জাগরণকালের কল্পিত বস্তুর সহিত মিলে না; কিন্তু এক অবস্থার অনুভূতি অন্য অবস্থার অনুভূতির সহিত না মিলিলেও, তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটীকে বস্তুগত সত্য মনে করিয়া, নির্দ্দিষ্ট অন্যটীকে বস্তুগত মিথ্যা বলিবার কি কারণ আছে? কেন, স্বপ্নজগতকেই বস্তুগত সত্য ধরিয়া লইয়া, জাগরণ-জগতকেই কেন মিথ্যা বলি না? * ঘুমের ঘোরে যখন সঞ্চরণ করিয়া থাকি, তখন ত প্রায়ই জাগরণকালের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইয়া সময়ে সময়ে এমন সকল জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকি যে, স্বপ্নের পর জাগরণকালে তাহার বিন্দুমাত্রও মনে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়াও, তাহার সত্যতা অস্বীকার করিবার সাহস পাই না। পুনশ্চ, যদি এইরূপ স্বপ্ন-সঞ্চরণকালে প্রত্যহ একই ধরণের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করি এবং তৎকালে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বপ্নকালের কার্য্য স্মরণে আনিতে পারি, আর জাগরণকালে যদি নিত্য নূতন নূতন কার্য্য করি এবং কোন এক সময়ের কার্য্য যদি অন্য সময়ে মনে করিতে না পারি, তাহাহইলে বরং স্বপ্নজগৎকেই সত্য জ্ঞান করিয়া আমার জাগরণ-জগৎকেই মিথ্যা বলিতে চাহিব! আবার দেখ, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব জাগ্রতে অস্বীকার করিতে পারি না। জাগরণের পূর্ব্বে যে স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, তাহা জাগরণকালে বেশ মনে পড়ে, কিন্তু জাগরণকালের কোন অনুভূতিরই জ্ঞান স্বপ্ন-কালে থাকে না। জাগরণকালের সর্ব্বপ্রকার শোক, সন্তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, স্বপ্নের যাদু-দণ্ড-স্পর্শে কোথায় চলিয়া যায়! তাহার স্মৃতিমাত্রও হয়ত স্বপ্ন সময়ে থাকে না; কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নের শোক-সন্তাপ বা আনন্দ উল্লাস সকলই আমি ভুলিয়া যাই না; সুতরাং জাগরণের সাক্ষ্য-প্রমাণে স্বপ্নাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণে জাগরণাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে না। আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, তাহার মধ্যে সুষুপ্তি ও স্বপ্ন-অবস্থাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, সকল অবস্থারই অভিনয় করিতে পারি! স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ত স্বপ্নই আমার জাগ্রদবস্থা; তাহারপর স্বপ্নে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়েও স্বপ্ন দেখা যায়! সুতরাং লক্ষ্মণের ন্যায় যে চৌদ্দ বৎসর একাধিক্রমে জাগরিত থাকে এবং তাহাই যাহার চূড়ান্ত আয়ুষ্কাল, তাহার সুষুপ্তি

* যদি সম্ভব হইত, তবে সেটা স্বপ্নাবস্থাতেই চলিত; এ বিচারণা, এ প্রবন্ধ লেখা বা চিন্তা, এসব যে জাগরণাবস্থার। কাজেই ইহাকে (আপাততঃ) প্রাধান্য দিতেই হইবে।

ও স্বপ্নের জ্ঞান আদৌ হইবার নহে; পরন্তু কুম্ভকর্ণের মত যে ছয় মাস একাধিক্রমে স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্নের মধ্যেও জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, কোনটীই আমার নিষ্ক্রিয়াবস্থা নহে। সুনিদ্রাকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি বলিয়া যে মনে করি, তাহা ভ্রম মাত্র। উপনিষৎ-শাস্ত্র জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনাবস্থার অতীত চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাকেই সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থা বলিয়াছেন। উহাই ব্রহ্মস্বরূপ লক্ষণের অবস্থা; সাধক সুষুপ্তি বা সমাধি-সাধনেই সে তত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন। সাধারণ মানব সুষুপ্তি বা স্বপ্ন-তত্ত্বও বুঝে না। ঘুমের ঘোরে যে আমি নিশ্চেষ্ট থাকি না, স্বপ্নসঞ্চরণই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। তদ্ভিন্ন স্বপ্নসঞ্চরণ-অবস্থার বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তৎকালে সচেষ্ট থাকে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যদিও সজাগ থাকেন, তথাপি চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট থাকে। বাস্তবিক স্বপ্নসঞ্চরণকারী একরূপ—

"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

সে নিমীলিতনেত্রেও উন্মীলিতনেত্রের ন্যায় দেখিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহার বাহ্যকর্ণের নিকট বন্দুকের আওয়াজ করিলেও সে তাহা না শুনিতে পারে, অত্যুগ্র গন্ধও তাহার বাহ্য নাসিকাকে উদ্বিগ্ন না করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে নানাপ্রকার ব্যথা দিলেও সে তাহা সহজে অনুভবে না আনিতে পারে, অথচ কিন্তু অভৌতিক সত্তা সমূহ তাহার তাৎকালিক অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়-নিচয়ে ভৌতিকবৎ প্রতীয়মান হয়! আধুনিক "মেস্‌মেরিজম্" "ক্লার্ভয়েন্স্" প্রভৃতি তত্ত্বেও এই সত্য প্রমাণিত।

স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি যেমন নিষ্ক্রিয় থাকি না, সাধারণ স্বপ্নকালেও আমি তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকি না। জীবের সক্রিয়ত্ব দৈহিক সচলত্বেরই একান্ত অধীন নহে। তখন নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হইলে, স্বপ্নকার্য্যটীই মিথ্যা হইত; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকুক্ আর নাই থাকুক্, স্বপ্নব্যাপারটী অস্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না জাগ্রতকালে যেমন ইন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি সজ্ঞানে কার্য্য করি, স্বপ্নকালেও তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি তেমনি সজ্ঞানে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। স্বপ্ন জগৎকে আমি সাধারণতঃ হেয় মনে করি সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে, স্বপ্ন-জগৎ একেবারেই অলীক; পরন্তু স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী এবং জাগরণ-অবস্থার ন্যায় ইহার কোন এক অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি প্রায় হয় না; এই কারণে স্বপ্ন-জগতের কোন একটী কল্পনায় আমি অভ্যস্ত বা সংস্কারবদ্ধ হইতে না পারিয়া তাহাকে অলীক মনে করি; কিন্তু যদি কখনও নিদ্রাকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ একই ধরণের স্বপ্ন দেখি এবং জাগরণকালে যদি কখনও একই ধরণের কার্য্য না দেখি, তাহাহইলে আমি জাগরণ-দৃষ্ট জগৎকেই অলীক এবং স্বপ্ন দৃষ্ট জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। প্রকৃতপক্ষে মন কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কোনকালেই নিষ্ক্রিয় হয় না। মৃত্যু-তত্ত্ব বুঝাইতে গীতা বলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
—ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

ফলে মরণের পর যেমন স্থূলদেহ ছাড়া আর সবই থাকে, স্বপ্নকালেও প্রায় তদ্বৎ।

স্বপ্নকালে জাগরণকালের জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গত্যাগ করে ও নূতনবিধ জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গ লইয়া থাকে।

স্বপ্ন বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি না, ইহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু সুষুপ্তিকালে আমি কি অবস্থায় থাকি? তখন কি আমি কাষ্ঠ-নিষ্ক্রিয় হইয়াও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকি? প্রচলিত মত বা সংস্কার তাহাই বটে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, সুষুপ্তিকালে আমরা সর্ব্বপ্রকার মানসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি এবং তৎকালের সজ্ঞান অবস্থার কোনরূপ স্মৃতিই কি সুষুপ্তিকালে, কি জাগরণকালে, কোনকালেই থাকে না; কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় সজ্ঞানে থাকার কোন স্মৃতি-প্রমাণ পাই না বলিয়া কি সত্যসত্যই আমি সে সময়ে অজ্ঞানে ছিলাম, বিবেচনা করা উচিত? একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিদ্রাকালে আমি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি ভিন্ন একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান থাকি না। জাগরণকালে আমি যেমন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তিতায় কার্য্য করি, কিম্বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে যেমন পূর্ব্বকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া নবকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় কার্য্য করি, অথবা স্বপ্নকালে যেমন স্বপ্নকল্পিত নূতন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় কার্য্য করি, সুষুপ্তিকালে তেমন না করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাহ্যজ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা ত্যাগ করিয়া কেবল মানসিক সক্রিয়-সত্ত্বায় বিদ্যমান থাকি। অতএব,

"তদা স্বরূপেঽবস্থানম্"

নিদ্রা সময়ে আমি চিন্ময়স্বরূপেই অবস্থান করি। সেই জন্য কদাচিৎ কল্পিত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়াও,—

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম"

এই ব্রহ্মরূপে আমার তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার অন্যবিধ পরিচয়ে সেই অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলিয়াই বুঝা উচিত।

নিদ্রাবস্থায় যে আমি অজ্ঞানে থাকি না, একটু ভাবনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিদ্রার পূর্ব্বে যদি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা যাই, তাহা হইলে প্রায়ই সেই সময়ে জাগরিত হইতে সক্ষম হই। আবার যখন কোন কোলাহলময়ী নগরীতে যাই, তখন চতুর্দ্দিকের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া, প্রথম প্রথম হয়ত ঘুমাইতে পারি না, পরে কোলাহলের মধ্যেই ঘুমাইতে পারি। উভয় অবস্থাতেই কোলাহল তুল্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও এবং উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গ্রাম তুল্যরূপে ঘাতপ্রাপ্ত হইলেও, কেবল মনের তিতিক্ষা-শক্তির সচেতন অবস্থার জন্য নিদ্রাকালে সেই বিরক্তি অনুভব করি না। পুনশ্চ, যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার লইয়া তৎপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়ি, তখন রোগীর অসম্পর্কিত কোন উচ্চ শব্দেও উত্যক্ত না হইয়া, রোগীর শুভাশুভ জ্ঞাপক প্রত্যেক সামান্য পরিবর্ত্তনেও জাগিয়া উঠি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর পতিত প্রবলতর ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা ক্ষীণতর ক্রিয়ার প্রতি মন এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারে কেন? এ সকলই কি মনের সার্ব্বকালিক সক্রিয়াবস্থার—আত্মার সর্ব্বদা সজ্ঞানে থাকিবার পরিচায়ক নহে? স্বীকার করি যে, নিদ্রাকালে যে আমি সজ্ঞানে থাকি, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু জাগরণকালের সজ্ঞানঅবস্থাই কি আমি সহজে বুঝিতে পারি? জাগরণকালের অনেক জ্ঞানকেই বিস্মৃতির বিবরে লুক্কায়িত দেখি।

আবার স্মৃতি-বিস্মৃতি উভয়ই পরস্পরের অনুগত। সেই জন্য প্রত্যেক স্মৃতির কার্য্যে বিস্মৃতি এবং প্রত্যেক বিস্মৃতির কার্য্যে স্মৃতিকে জড়িত দেখি। আমরা যখনই কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করিতে যাই, তখনই বর্ত্তমানের ঘটনাকে অন্তরালে ফেলি, অথচ বর্ত্তমানকাল আদ্যন্তহীন কালচক্রের সর্ব্বত্রই কেন্দ্ররূপে দেদীপ্যমান। যাহাকে আমি ভূত বা অতীত বলি, তাহা এই বর্ত্তমানেরই শিশুভাব এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা বর্ত্তমানেরই অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধভাব। যুবা যেমন তাহার যৌবন বজায় রাখিয়া বাল্যাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিতে পারে না, তেমনি বর্ত্তমানের জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তার সজ্ঞানাবস্থা ভোগ করিতে পারি না। আমি যখনই অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করি; তখনই বর্ত্তমানের ঐন্দ্রিয়িক বিশেষ অনুভূতি বা চিন্তা অদৃশ্য হয় এবং সময়ান্তরে এই সকল অবিশেষ এবং নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-কার্য্যগুলি স্মরণ করিতে যাইয়া যখন আমি তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাধ্য কোন কার্য্য দেখিতে পাই না, তখন নিরৈন্দ্রিয়িক ভূমাজ্ঞানকে বিশেষরূপে অবধারণ করিতে না পারিয়া, অসতর্কিতভাবে তদবস্থাকে আপনার নিষ্ক্রিয়াবস্থা বলিয়া মনে করি; কিন্তু পরমার্থতঃ আমি—অর্থাৎ আত্মা কখনও সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়- জ্ঞানশূন্য হইতে পারে না। জীবাত্মা নিত্য-সগুণত্বে সদা সক্রিয় ও নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপত্বে সদা সজ্ঞান।

নিদ্রার সময়ে আমি সজ্ঞানে থাকিয়াও যেমন সে সময়কার সজ্ঞান অবস্থার বিশেষাবধারণা করিতে পারি না, তেমনই আমার অতীত শিশুজীবনের যে প্রথম দিনে জননী-জঠরের ঘোর অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময়ী পৃথিবীর আলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই দিনের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে যাইয়া আমি তাৎকালিক সজ্ঞানাবস্থার কোন বিশেষ অবধারণা করিতে পারি না; অথচ সে সময়ে যে একেবারে অজ্ঞানে ছিলাম, একথা বলিতে সাহস পাই না, কিন্তু কিপ্রকার জ্ঞানের অবস্থায় ছিলাম, তাহারও ঠিক প্রতীতি করিতে পারি না। ফলতঃ আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রারম্ভাভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই যেন কুহেলিকায় মধ্যে পড়ি এবং সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার একটী ক্ষীণ আলোকরেখাও আমার স্মৃতিপটে সুপ্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু কুহেলিকাবৃত বালারুণ-জ্যোতিবৎ শৈশব-জ্ঞানের শান্তমূর্ত্তির আভাস পাইয়া থাকি। ভ্রূণাবস্থারও যে আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান ছিলাম, এমনটা ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমার জ্ঞান-প্রবাহ যেন একটী অবিচ্ছিন্ন ধারায় অতীতের অনধিগম্য কন্দর হইতে নিঃসৃত হইয়া, ভবিষ্যতের দুর্গম প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে এবং কেবল দূরত্বজন্যই মধ্যস্থ বর্ত্তমানের ন্যায় সেই দুইটী প্রান্ত দেখা যাইতেছে না। এজগতে—

> "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
> অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"
>
> (গীতা)

যত কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের সাংসারিক জ্ঞান, কল্পনা বা সত্তা, সকলেরই আদি এবং অন্ত অব্যক্তাবস্থাপন্ন; কেবল মধ্যমাংশই ব্যক্ত দেখা যায়। জীব-জ্ঞানপ্রবাহ এনিয়মের বহির্ভূত নহে। আদ্যন্তহীন জ্ঞানপ্রবাহের গতি-দিক্ পরিবর্ত্তন জন্য তাহার উভয় প্রান্ত সরল দৃষ্টিপথের বাহিরে এবং দূরে পড়ে বলিয়া

তত্তৎপ্রদেশের কোন বিশেষ অবধারণা হয় না; কিন্তু চেষ্টা করিলে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া যোগাভ্যাস-বলে যত্ন করিলে, জ্ঞান-প্রবাহের—কল্পনা-প্রবাহের সবলাংশের উভয় প্রান্তস্থ লীলাবর্ত্তকে মধ্যস্থানে সংযুক্ত ও নিশ্চল করিতে পারা যায় এবং যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা 'জাতিস্মর' হন এবং সুষুপ্তি-মধ্যে চৈতন্যানুভব করা ত সামান্য কথা, একজন্মের অন্তকালীন মানসিক অবসন্নতার মধ্যেও পরজন্মের আরম্ভের সম্প্রকাশ দেখিতে পান এবং উভয় জন্মকেই একই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমনশীল অংশরূপে বুঝিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ নিদ্রা আমার নিশ্চিন্ততার সময় নহে, পরন্তু চিন্ময় আত্মার নিরপেক্ষ চিন্তারই সময় বটে; প্রভেদ এইটুকু যে, তৎকালে পূর্ব্বাভ্যস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমি অন্যবিধ চিন্তা করি এবং উভয় চিন্তার সংযোগ-সূত্রটী পৃথক্ পৃথক্ স্রোতে ভাসিতে থাকায়, আধ্যাত্মিক অনবধানতা বশতঃ আমি একের সহিত অপরের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একটীকে মিথ্যা, অন্যটীকে সত্য বলি! পরমার্থতঃ জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ, সকলই সেই একমাত্র চিন্ময় আত্মার ধারাবাহিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আমরা এক অবস্থার সহিত অন্যাবস্থার জ্ঞান-ধারার গতি-বৈষম্য বিচার করিয়া, বোধসৌকর্য্যার্থে এক এক অবস্থার এক এক নাম দিয়া থাকি। মূলে জন্ম ও মৃত্যু, একই ভূমা চৈতন্য-প্রবাহের অন্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক ও নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান নামে নির্দ্দেশ্য দুইটী ধারা এবং সুষুপ্তি ও জাগরণ, আয়ুষ্কালাবচ্ছিন্ন জন্মোপলক্ষিত জ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দুইটী আবর্ত্তন, আর স্মৃতি ও বিস্মৃতি পুনঃ জাগরণাখ্য খণ্ডপ্রবাহের খণ্ড ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বিস্মৃতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থাকেও আমি সময়ে অব্যক্ত বলিয়া ভ্রম করি। এরূপ ভ্রম হইবার কারণ আছে; মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া কার্য্য করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন কার্য্যগুলির বিসদৃশ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক কার্য্যগুলি যেমন সবিশেষে বুঝা যায়, মন যখন ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করে,—নিরিন্দ্রিয় হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভূমা-বিষয় চিন্তা করে, তখন বিচ্ছিন্নভাব-বিশ্লেষণাভাবে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যাদির নিবোধ দর্শনে মানসিক কার্য্যেরও নিবোধ হয় বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ঠিক্ সেই মত, যেমন—

"ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ।
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥"

বিত্ত নাশ হইলে লোকে আপনাকে বিনষ্ট মনে করে, তেমনি বিশ্ব-বিকল্পনার বিনাশরূপিণী নিদ্রার বশে যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ অসতে লীন হয়, তখন সদাজাগরিত আত্মা আপনাকে সেই বিশ্বের বিরচন-বুদ্ধি-বিরহিত দেখিয়া মিছামিছি আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করেন! ফলতঃ পার্শ্বে নৈমিত্তিক খণ্ড রূপাদি বর্ত্তমান না থাকিলে, নিত্য ভোগ্য ভূমারূপাদির বিশেষত্ব যেমন অনুভবে আসে না, তেমনি নিদ্রেতর অবস্থায় নৈমিত্তিক সংসারাসক্তিজ সুখ দুঃখের ঐন্দ্রিয়িকী কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মা যখন আপনার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সেই এক ভূমানন্দ ভোগে থাকেন; তাহার বিশেষক অন্য কোন খণ্ডানুভূতি তৎকালে উপস্থিত না থাকায়, আত্ম তাহাকে জাগরণাবস্থার শতধাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সাদৃশ্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। অথব

এমনও হইতে পারে যে, আত্মা নিদ্রাকালে অন্যবিধ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের কল্পনার কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন, কিন্তু উভয়কালীন কল্পনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, একাবস্থার কার্য্য অন্যাবস্থার চেষ্টায় প্রকাশ করিতে যে অক্ষমতা থাকে, তাহাই সুষুপ্তির রূপ ধারণ করে এবং সেই জন্য সুষুপ্তিকালের সজ্ঞান অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, ঘুমের ঘোরে যে আমি নিষ্ক্রিয় ও অবুদ্ধ থাকি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার সাক্ষীও ত আমিই। আমি নিদ্রাকালেই বুঝিতেছিলাম যে, তৎকালে জাগ্রদনুভূত কিছু অনুভব করিতে ছিলাম না। আমি যদি স্বরূপতঃ নিদ্রাকালে সজ্ঞানে নাই থাকিব, তবে তদবস্থার অজ্ঞানতা কি করিয়া বুঝিব? স্বরূপতঃ আমি কখনই আমার সদা-জাগরিত অবস্থা অস্বীকার করিতে পারি না; তবে যে কখনও আপনাকে নিদ্রিত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা জাগরণেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রাকালে আমি জাগ্রদধিগম্য ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে অনাসক্ত থাকি ভিন্ন স্বরূপতঃ আমি নিরৈন্দ্রিয়ক জ্ঞানে অজ্ঞান থাকি না। সেরূপ অজ্ঞানে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বরূপতঃ নিদ্রা আত্মারই এমন একটী অবস্থা, যাহার আদ্যন্ত মধ্য, সর্ব্বত্রই আত্মাই তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ও সাক্ষী। সুষুপ্তি আত্মার স্বরূপ অবস্থা। সে সময়ে—

'দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'

আত্মা সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করেন; ইন্দ্রিয়াধিগম্য সংসারের কোন অনুভূতির সাদৃশ্যেই তাহার অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। জাগরণকালে ও স্বপ্নসময়ে আত্মা আত্মশক্তি হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত কার্য্যের সুখ-দুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হন। জাগরণ ও স্বপ্ন দুইই আত্মার বিরূপ অবস্থা এবং এই দুই অবস্থা ঐন্দ্রিয়ক দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ জ্ঞান করা হউক, ইহারা মূলে একই প্রকৃতির। কখনও কখনও মনে করি বটে যে, জাগরণ-অবস্থাটী আসল এবং স্বপ্ন তাহারই নকল; জাগরণকালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই চিত্র যাহা মনসপটে ক্ষয়িতবর্ণে অলক্ষিত থাকে, নিদ্রাকালে তাহাই উজ্জ্বল বর্ণে পুনঃপ্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। জাগ্রতে যেমনটী দেখি, স্বপ্নে তেমনটী নাও দেখিতে পারি এবং জগতে যেমনটী দেখি নাই, স্বপ্নে তেমনটীও দেখিতে পারি! ইহা কিছু স্বপ্নরাজ্যের বিরল ঘটনা নহে যে, একদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এমন একটী জীব দেখিলাম, যাহার মস্তক হস্তীর মস্তকের মত এবং দেহ সিংহের দেহের মত। এখন এই যে নূতন প্রাণী দেখিলাম, ইহা পূর্ব্বে কখনও আমার দেখা না থাকিলেও আজ স্বপ্নে তাহা দেখিলাম—নূতন দেখিলাম। সুতরাং স্বপ্নে যে নূতন কিছু দেখি না, যাহা কিছু দেখি, তাহা জাগ্রতে দৃষ্টেরই নকল, একথা কি করিয়া বলি? সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, গজ-সিংহ-মূর্ত্তিটী হয়তো আমার নূতন দেখা হইল না—পূর্ব্বে যাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা ছিল, তাহাই আজ একত্রে দেখা গেল মাত্র; কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। অমূলক এই জন্য বলি যে, পূর্ব্বে হস্তী ও সিংহ পৃথক্ পৃথক্ দেখা থাকিলেও তাহাদের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী তো আর দেখা ছিল না; এখনই কেবল দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে যে সংযোগটী আমার দেখা ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও ছিল না, আজ স্বপ্নের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐন্দ্রজালিকী-শক্তির বলে সেই অভাবনীয়

সংযোগটী দর্শন করিলাম। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী কি নূতন হইল না? বস্তুতঃ আমার অসম্ভাবিত যাবতীয় অনুভবই—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক সম্বন্ধাবদ্ধ এবং সেইজন্য সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মূলক। যখনই আমার কোন পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহাকে আমার পূর্ব্বানুভূত কোন পদার্থের সদৃশ বা অসদৃশ বলিয়া বুঝি; তদ্ভিন্ন অন্যরূপে বুঝিতে পারি না। সেইজন্য কোন পদার্থকে স্বপ্নেই দেখি বা জাগ্রতেই দেখি, সকলসময়েই তাহাকে আমি দৃষ্টপূর্ব্ব কোন না কোন পদার্থের সহিত কোন অংশে সমান এবং কোন অংশে অসমান না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া কথাটা পরিষ্কার করি। আমি জাগ্রদবস্থায় একখান নৌকা দেখিলাম, আর কোন দিন নৌকা দেখি নাই, যেন আজই নূতন দেখিলাম; কিন্তু যে অর্থে স্বপ্নে নূতন কিছুই দেখা যায় না বলি, সেই অর্থে এই জাগ্রতে দৃষ্ট নৌকাই যে নূতন দেখিলাম, তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? নৌকা দেখিতে আমি একটী সীমাবদ্ধ বস্তু দেখিলাম, কিন্তু সীমাবদ্ধ রূপ নৌকা দেখার পূর্ব্বেও আমি দেখিয়াছি; নৌকা দেখিতে আমি যে বর্ণ দেখিলাম, তাহাও নৌকা দেখার পূর্ব্বে আমি অনেক-বার দেখিয়াছি; তাহার পর সীমাবদ্ধ নৌকার রূপ দেখিতে সীমা নির্দ্দেশক যে সকল সরল ও বক্র রেখা দেখিলাম, তাহাও আমি কতবার কত স্থানে দেখিয়াছি; নৌকার রূপ-নির্দ্দেশক রেখার বিন্যাসের মত বিন্যাসও আমি পূর্ব্বে একত্রে বা পৃথক্‌রূপে ভূয়োভূয়ঃ দর্শন করিয়াছি। নৌকার উপাদানভূত কাষ্ঠ ও লৌহের মত কাষ্ঠ ও লৌহও আমি পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি; সুতরাং যে নৌকাকে আমি আজ নূতন দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিভাবে নূতন দেখা হইলেও তাহার উপাদানগত ব্যষ্টিভাবে নূতন দেখা হইল না। পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি কাষ্ঠ ও লৌহকে পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি আকারে বা ক্রমে বিন্যাস করিয়া আমি নৌকা গড়াইয়া দেখিতেছি। পূর্ব্বদৃষ্ট কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থকে স্বপ্নে একত্র করিয়া যেমন একটী অভূতপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টি করি বলিয়া মনে করি, ঠিক্ তেমনি আমার জাগরণকালেও কতকগুলি পূর্ব্বপরিচিত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে একত্র করিয়া নূতন একটী পদার্থ গড়াইয়া থাকি বলিয়া মনে করা উচিত। ফলতঃ যদি স্বপ্নকালে অননুভূতপূর্ব্ব নূতন রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমান ন্যায়ে জাগ্রতকালেও আমার অননুভূতপূর্ব্ব রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক, আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে অননুভূতপূর্ব্ব কোন রূপাদি অনুভব করিতে পারি না। প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে যখনই বিশ্লেষণ করিতে যাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহা কতকগুলি অনুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের সংঘাত-ফল মাত্র। কিন্তু যদিও এইরূপ প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংঘাত বলিয়া স্মরণ হয়, তথাপি সেই সকল পূর্ব্বানুভূতির পূর্ব্বানুভূতিকে—অতিপূর্ব্ব-পূর্ব্বানুভূতিকে স্মরণে আনিতে পারি না। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই আদি অব্যক্ত এবং সেই সকল বিষয়ের অনুভূতির আদিও অব্যক্ত। ইহজন্মে যে মুহূর্ত্তে জননীর গর্ভগত ক্ষীর-সাগর-শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি ধরণীর কঠিন পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞানের কি পরিমাণ সঙ্গে লইয়া আমি আসিয়াছিলাম এবং তাহার

পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই মূলধনের কিরূপ উপচয়-অপচয়ে বর্ত্তমান জ্ঞানের অধিস্বামী হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। নির্দ্দিষ্ট কোন্ সময়ে এই সংসারের সহিত কিরূপে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অবধারিত কথা যে, এই সংসারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় যে কালে যতই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকুক্, সেই পরিচয় গন্ধ আদি জ্ঞানগুলিকেই ঘষিয়া মাজিয়া লইতে লইতেই আমার জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমানের বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সকল অনুভূতির মধ্যেই যেমন তাহাদের প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারি, তেমনই সকল অনুভূতিই যে পূর্ব্ব অনুভূতির অবিকৃত প্রতিরূপ, তাহাও বলিতে পারি না। প্রত্যেক অনুভূতি যেমন কিয়দংশে পূর্ব্বানুভূতের প্রতিরূপ, তেমনই কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বানুভূতি হইতে বিরূপ এবং এই বিভিন্নতা যতই অধিক হয় এবং পূর্ব্বানুভূতি গুলিকে যতই বিস্মৃত হই, ততই বর্ত্তমান অনুভূতিকে নূতন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। প্রত্যেক অনুভূতিই পুনঃপুন আবর্ত্তিত হইলে, স্মৃতি-বিস্মৃতির ন্যূনাধিক্যে কালে তাহা কখনও পরিস্ফুট, কখনও অস্ফুট হইয়া পড়ে এবং একই অনুভূতির মধ্যে বিভিন্নতা বোধ জন্মে। নীল ও লোহিত বর্ণ এত যে বিভিন্ন, তথাপি উভয়ের রূপত্বের একতা আছে। তিক্তাস্বাদ এবং মিষ্টাস্বাদ, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও রসত্বমাত্র বিষয়ে উভয়ের একতা বুঝিতে পারি। আবার রূপের ও রসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ের একতা বুঝিয়াই উভয়কেই অনুভূতি বলিয়া বুঝি। ফলতঃ আমাদের সাংসারিক জ্ঞানোদয়ের—সংসার-সৃষ্টি-কল্পনার আদি ও মধ্যে দুই প্রান্ত অব্যক্তের গাঢ় অন্ধকারে বিলীন, তাহা বাদ দিয়া মধ্যাংশের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কোন অনুভূতিই একেবারে অননুভূতপূর্ব্ব নহে, অনুভূতপূর্ব্বও নহে, তা সে অনুভূতি স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক। ফলতঃ তদানীন্তন অনুভূতির প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা স্বপ্নের সহিত জাগরণের প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা বুঝা যায় না।

পরমার্থতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ, উভয়ই এক। চিন্ময় আত্মার সৃষ্টি-শক্তির দুইটী লীলাবর্ত্তনের মধ্যে মায়িক প্রভেদ সামান্য একটু যাহা আছে, তাহা এই যে, জাগৎকালে পূর্ব্বানুভূতি সকলকে একত্র সংযত করিতে রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধযুক্ত একটী বস্তু চিন্তা করিতে পারি; কিন্তু যেমন একটী বাহ্যবস্তু গড়াইয়া, তাহার জীবন্ত রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, স্বপ্নে তাহা পারি। জাগ্রতে অবিদ্যমান গজ-সিংহমূর্ত্তি চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, জাগরণের জ্ঞান-বিশ্বাসগতেই স্বপ্নকালে অবিদ্যমান গজ-সিংহ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই প্রত্যক্ষীভূত গজসিংহকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিতে পারি না। ফলতঃ জাগরণের অনুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা যেমন জাগরণকালে বিশ্বাস করি, তেমনই স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা বিশ্বাস করি। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে; উভয় অবস্থাতেই আমরা রূপ-রসাদি অনুভব করি; উভয় কালেই অনুভূতির অনুভাবনায় সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি না; সন্দেহ করি কেবল অনুভূতির বাহ্য বস্তুনিষ্ঠতায়; অর্থাৎ জাগ্রতকালে রূপ-রসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে যেমন কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠগুণ বলিয়া বিশ্বাস করি,

স্বপ্নে রূপ-রসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে তেমন কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এখন বিচার্য্যবিষয় এই যে, জাগ্রতানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতা কেন স্বীকার করিব, আর স্বপ্নানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতাইবা কেন অস্বীকার করিব। মনে রাখা উচিত, জাগ্রৎকালে যেমন জাগ্রদনুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা স্বীকার করি, স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা তেমনই স্বীকার করি; জাগ্রতকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, স্বপ্নকালেও তেমনই জাগ্রত-দৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা মনে করি না। জাগ্রতের নিকট জাগ্রৎজগৎ যেমন বাস্তবিক সত্য, স্বপ্ন-অবস্থায় অবস্থিতের নিকট স্বপ্নজগৎও তেমনই বাস্তবিক সত্য। জাগ্রতের নিকট স্বপ্নজগৎ মিথ্যা, সুপ্তের নিকটও জাগ্রৎ-জগৎ অননুভূত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, উভয় জগতের বাস্তবিকতা বা অবাস্তবিকতার মীমাংসা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারি যে, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য দুইটীর মধ্যে দুইটীই কখনও সত্য হইতে পারে না; হয় দুইয়ের একটী মিথ্যা, না হয় দুইটীই মিথ্যা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অনুভূত বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, উভয়ের সাক্ষ্যই মিথ্যা। আমরা সচরাচর জাগ্রতের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি; সুতরাং জাগ্রতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক যে, তাহার সাক্ষ্যকে কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। জাগ্রতঅবস্থায় আমরা স্বপ্নজগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, কিন্তু অবাস্তবিক স্বপ্নজগৎকে অস্বীকার করি না; অতএব জাগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণেই বুঝা যাইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে আমরা অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ কেন হয়? সম্মুখে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির আধার কোন বাহ্যবস্তু না থাকিলেও স্বপ্নদ্রষ্টা কি করিয়া রূপ-রসাদি অনুভব করিল? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার এমন একটী শক্তি আছে, যাহার বলে অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারে; সম্মুখে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির বিষয়ীভূত কোন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে আমি আত্মশক্তি-প্রভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি অনুভব করিতে এবং সম্মুখে তদাধারের বিদ্যমানতা বিশ্বাস করিতে পারি; এক কথায়—অসত্যকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা যদি হইল, স্বপ্নসময়ে আত্মা অসত্যকে সত্যবৎ কল্পনা করিতে পারে, ইহা যদি বুঝিতে পারিলাম, তাহাহইলে স্বপ্নেতর সময়ে আত্মা যে কেন অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারিবে না, ইহা বুঝা যায় না। স্বপ্নজগৎ যদি অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জাগ্রত-জগৎও অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে বাধা কি? কোন বাধাই ত দেখা যায় না। স্বপ্নজগৎ যেমন প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইয়াও স্বপ্নকালে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই জাগ্রত-জগৎও প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইলেও জাগ্রতকালে বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে পরমার্থতঃ উভয় জগৎই অবাস্তবিক; কিন্তু লৌকিকতঃ অবিদ্যার দৃষ্টিতে কোন জগৎই একেবারে মিথ্যা নহে। কেননা উভয় কালের বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব থাকিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের কার্য্যও কাল্পনিক নিয়মদ্বারা অনুশাসিত হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা একটী বস্তু, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা একটী কল্পনা-স্তবক। যে কল্পন

গুলি সংযত করিয়া একটী কল্পনা-স্তবক হইয়াছে, সেই কল্পনাগুলির একটীর সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আপনিই আসিয়া যুটে। চিনি একটী কল্পনা-স্তবক, জিহ্বা একটী কল্পনা-স্তবক; চিনি জিহ্বায় সংযুক্ত হইল, এই কল্পনার সঙ্গেসঙ্গেই মিষ্ট-রসানুভূতি উৎপন্ন হইল; কেন না—

যস্ত কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
তদেব স স্বয়ম্ভেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

আদিতে যে কল্পনার পর যে কল্পনার সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে, পর পর কালে, সেই সেই কল্পনার একটীর প্রসঙ্গে পরভাবী কল্পনাটী আপনিই আসিয়া পড়ে। তাহাতেই বলা হইতেছে যে, বাহ্যজগৎ যেমন আমার কল্পনা-প্রসূত, বাহ্যজগতের নিয়ম সমুদায়ও তেমনি আমার কল্পনা।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একমেবা দ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
বিহ্বলা অসদেবেদং প্রাসীদিত্যবর্ণয়ন্॥২১॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাৎপর পরমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এইরূপ ভ্রম-প্রমাদ দ্বারা বিনষ্ট-বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিতেছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, "এই অনন্ত-জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎ মাত্র ছিল, তৎকালে কোন সৎপদার্থ বিদ্যমান ছিল না।"

মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্যধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিস্প্রচারা বিভেত্যতঃ॥২২॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিভূত হইলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না, সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ নির্দ্ধারণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে॥ ২২॥

গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্য যোগিনাম্।
সাকার ধ্যাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে॥ ২৩॥

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সাকার ব্রহ্ম-চিন্তনতৎপর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগীগণের সাতিশয় ভয়প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্ত্তিক-শ্লোক নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছেন॥ ২৩॥

অস্পর্শ যোগো নামৈষ দুর্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥২৪॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকাররূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের অধিকারে নির্ব্বিকল্প সমাধি কখনও ঘটিয়া উঠে না। বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্ব্বিকল্প-সমাধির নাম 'অস্পর্শ যোগ'; কারণ তাহারা অভয় স্বরূপ এই যোগে ভয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২৪॥

ভগবৎ পূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্ক পটূনমূন্। আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানাচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি॥ ২৫॥ অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ। আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈক চক্ষুষঃ॥ ২৬॥

পূর্ব্ব শ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্ত্তিকের মত প্রদর্শিত করিয়াছেন; এই শ্লোকে আচার্য্যচূড়ামণি ভগবান শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন। সাকারবাদী বৌদ্ধযোগিগণ কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক-শ্লোকের যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পসমাধি অচেতন জড়বিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সেই সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ স্বীয় অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর করিয়া, কেবলমাত্র অলীক অনুমানের বলে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন জগৎকর্ত্তা পরমাত্মার অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন॥ ২৫-২৬॥

শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্‌যোগং বা সদাত্মতাম্। শূন্যস্য ন তু তদ্‌যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥ ২৭॥

এই শ্লোকে সাকার-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধতপস্বীগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ করিয়া, তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করিতেছেন।—হে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ! তোমরা ইহাই প্রগল্‌ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না; কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত, যেহেতু "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব এবং "ছিল" এই শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং "শূন্য ছিল" এই বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব, এইরূপ হইল। পরন্ত, উক্ত "শূন্যের" ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা ভাব অভাব স্বরূপ, ইহার কোন অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে অভাব, সে কখনও ভাব হইতে পারে না এবং যে, ভাব, সে কখনও অভাবস্বরূপ হয় না॥ ২৭॥

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপিচাসৌ তমোময়ঃ। সচ্ছূন্যয়োর্ব্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথং বদ॥ ২৮

যেমন জগৎ-প্রকাশক সূর্য্য উদিত হইয়া জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন, সুতরাং তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব), বলা যায় না এবং সেই দিবাকরকে তমোময় (অভাব) ইহাও বলা যাইতে পারে না; অতএব ভাব ও অভাব, এই দুইই এক পদার্থ হইতে পারে না। এই ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু "শূন্য ছিল" এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; সুতরাং তোমরা নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে॥ ২৮॥

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে। শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাং চিরম্॥ ২৯

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধতপস্বিগণ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বেদান্তমতে অবিদ্যা দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মেতে আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে, সেইপ্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্যের নাম-রূপাদিও কল্পিত হইয়াছে; যদ্যপি তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া, অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাহা হইলে তোমরা চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ তোমরাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া, অনন্ত অসীম আনন্দ অনুভব করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে। তোমাদিগের যদ্যপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিদ্বারা নিত্য সুখলাভের আশা থাকে, তাহাহইলে কদাপি

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" এই কথা বলিও না ॥ ২৯ ॥

সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেৎ তদাবদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্ষতে ॥৩০॥

হে অনিশ্বরবাদী বৌদ্ধযোগিবৃন্দ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মতে নাম-রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানান্ধ, জগতের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূর্ব্বক নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছে। এইক্ষণ বল দেখি, কোন সদ্বস্তুতে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না? কল্পনাশব্দের ভাব ভ্রম-রচনা, তাহা কোন না কোন সদ্বস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে যদি ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্ভব হয়, তাহা-হইলে আধারশূন্য স্থানে কি প্রকারে ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে? যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার প্রতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহাহইলে অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

উপরোক্ত একবিংশতি শ্লোক হইতে ত্রিংশৎ শ্লোকপর্য্যন্তের সরল তাৎপর্য্য আলোচনা করিব।

গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তি বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ যাঁহারা আদিতে শূন্য ছিল, অর্থাৎ কিছুই ছিল না, এই মত সমর্থন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন (অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রম) হওয়ায়, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হন।

১। প্রথমতঃ—আদিতে শূন্য ছিল, এ নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। শূন্য অর্থে কিছুই নহে; যাহা কিছুই নহে, তাহা ছিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে? আছে বা ছিল বলিলে অস্তিত্ব বুঝায়; কিন্তু নাস্তিত্ব, ছিল—অর্থাৎ 'ছিলনা' ছিল, ইহা কখনও হইতে পারে না।

২। দ্বিতীয়তঃ—নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিছুই-ছিল না হইতে বস্তুর উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে? বৌদ্ধ ঋষিগণ দৃশ্যজগতের আদি ভূত বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি হইতে (এইক্ষণ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক-ব্যক্ত হাইড্রজন প্রভৃতি পঞ্চষষ্ঠি ভূত হইতে) গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব-জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পর্ব্বত, নদ, নদী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলেন, কিন্তু প্রথমে সৃষ্টির আদিভূত বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব (এইক্ষণকার পঞ্চষষ্ঠি এলিমেণ্ট্) কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিস্তব্ধ। নাস্তিত্ব (অর্থাৎ কিছুই-ছিল-না) হইতে অস্তিত্বের—অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তি অসম্ভব।

৩। যদি আদিতে চৈতন্যের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি, এইসব জড়পদার্থ হইতে চৈতন্যের বা চেতন পদার্থের (যাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না) উৎপত্তি কিপ্রকারে হইবে? রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তুর রূপান্তর হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা মূলে আদৌ নাই, এমত বস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তুর যতই রূপান্তর করনা কেন, ঐ রূপান্তরিত বস্তুর মধ্যে তোমার পাশ্চাত্য পঞ্চষষ্টি মূলউপাদানের অতিরিক্ত নূতন কোন উপাদান উৎপন্ন হইবে না। ঐ রূপান্তরিত বস্তু বিশ্লেষ (decompose) করিলে, তাহাতে মূলে যে সকল উপাদান ছিল, তাহাই পাইবে, তদতিরিক্ত নূতন কোন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে না; অতএব যখন চৈতন্য আদৌ ছিল না, তখন

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না।

৪। যদি বল যে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না ও এখনও নাই, জড়পদার্থের পরস্পর সংযোগে চেতনগুণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ গুণই 'চৈতন্য'সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; আবার জড়ের ক্রিয়া হইতে ঐ গুণটী নষ্ট হইলে, জড়-দেহ চৈতন্যশূন্য হয়, ইহাই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য; তোমার মতানুসারে যদি জড়-চৈতন্য-গুণ ব্যতীত 'চৈতন্য' বলিয়া স্বতন্ত্র প্রকৃত কোন পদার্থ না থাকে, তবে জড়পদার্থের পরস্পর সংযোগের কর্ত্তা কে? সংযোগ একটী কার্য্য, কিন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য অসম্ভব। জড়ের কোন কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কর্ত্তৃত্ব শব্দটী জ্ঞাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্বসূচক, অর্থাৎ যে কর্ত্তা, সে যে সংযোগ করিবে, সেই বস্তু ও তাহার সংযোগ-ক্রিয়া-ফল জ্ঞাত না হইলে, যথানিয়মে তাহা সম্পাদন—বিশিষ্টবুদ্ধিমত্তার সহিত বিবিধ জীব-জন্তুসমন্বিত এই বিচিত্রজগৎ—যেথানে যেরূপ আবশ্যক, তদনুরূপ সৃষ্টি করিতে পারে না। মনেকর, একটী ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিতে হইবে, সুতরাং তাহার আকার কল্পনা এবং যে যে বস্তুর দ্বারা যে যে কৌশলে সেই আকার নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে চেতনগুণ নিহিত হইবে, তাহা অন্তরে আলোচনাপূর্ব্বক স্থিরীকৃত না হইলে, কিপ্রকারে ঐ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও তাহা চেতনগুণবিশিষ্ট হইবে? তোমার মতে যখন সংযোগের পূর্ব্বে জড়পদার্থের চেতনগুণ উৎপন্ন হয় না, তখন পদার্থের সংযোগক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কে করে? যদি বল যে, জড়পদার্থের স্বভাবতই ঐ প্রকার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি আছে, তাহাহইলে তোমার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কর্ত্তৃত্বের মধ্যে যেথানে যদ্রূপ আবশ্যক ও সঙ্গত হয়, সেখানে তদ্রূপ সর্ব্বসামঞ্জস্য-সাধিনী-শক্তি এবং তদঙ্গীভূতা জ্ঞাতৃত্বসূচিকাশক্তিও লুক্কায়িত আছে। যদি জড়ের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ও সামঞ্জস্য এবং জ্ঞাতৃত্ব-সূচিকাশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে স্বভাবের মধ্যে চৈতন্যের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

৫। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়; কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহার বিকাশ অসম্ভব। দুগ্ধ হইতে ঘৃতের উৎপত্তি ও ইক্ষু হইতে শর্করার উৎপত্তি হয়, কিন্তু জল হইতে ঘৃত বা বাঁশ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব স্বভাবের মধ্যে চৈতন্য না থাকিলে, চেতনজীবের কখনই উদ্ভব হইত না।

৬। আদিতে যদি চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু তেজ, অপ, ক্ষিতির অস্তিত্ব কাহার নিকট প্রকাশিত বা প্রমাণিত হইবে? জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি থাকিতে পারে না; যেহেতু ঐ ভূতপদার্থ অনুভূত বিষয়, এমন কি—তোমার শূন্যবাদ বা কিছুই-নাই-মত, ইহাও একটী অনুভব; কিন্তু অনুভূতিকে তাড়াইয়া দিলে, অনুভূত বিষয় বা শূন্য-অনুভূতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব জ্ঞানানুভূতির অস্তিত্ব ব্যতীত অনুভূত বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিকজগৎ ভাসমান হয় বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

৭। যদি বল যে পদার্থের সংযোগহেতু তাহাতে চৈতন্য-গুণের বিকাশ হইলে, ঐ চেতন জীবের যুক্তিদ্বারা (চৈতন্য বা জ্ঞান বিকাশের) পূর্ব্বেও ভূত বা ভৌতিকজগৎ ছিল, প্রমাণিত হইতে পারে; অপিচ, যখন অন্ন (খাদ্য) হইতে শুক্র ও শোণিত উৎপন্ন হয় ও সেই শুক্র-শোণিতের সংযোগ হইতে গর্ভে চেতনজীবের সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আদিতে চৈতন্য-বিকাশের পূর্ব্বে পঞ্চভূত বা

ভৌতিক-জগৎ ছিল এবং ঐ ভূতপদার্থের সংযোগে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। তোমার উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী দার্ষ্টান্তিকবিষয়ের সহিত কোন অংশেই সাদৃশ্যসম্পন্ন হইতে পারে না। অন্ন হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু চেতনপদার্থের অসংস্রবে অন্ন কখনও শুক্র-শোণিতে পরিণত হইতে পারে না; আবার চেতন স্ত্রী-পুরুষের অসংসৃষ্ট ঐ শুক্র-শোণিতের সংযোগে জীবসঞ্চার বা চেতনপদার্থের বিকাশও হইতে পারে না। অন্ন জীবদেহের উপাদানকারণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তৃকারণ নহে। উক্ত অন্নভক্ষণরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা চেতন জীব এবং ঐ অন্ন বীর্য্যে পরিণত হওয়ার ক্রিয়া এবং সংযোগক্রিয়ার কর্ত্তাও চেতন জীব হইতেছে; অতএব যখন চেতনপদার্থের অসংস্রবে অচেতন জড় হইতে চেতন বস্তুর বিকাশ হইতে পারেনা, তখন আদিতে চৈতন্যের অসংস্রবে জড়পদার্থের সংযোগ ও তদ্দ্বারা চৈতন্য-গুণের বিকাশ অসম্ভব।

তুমি বলিবে, গোময় হইতে বৃশ্চিক, বিষ্ঠা হইতে কীট ইত্যাদি চেতনজীব চৈতন্যের অসংস্রবে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহার উত্তর উপরের ৩।৪।৫ দফায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, চৈতন্য নিরাকার, প্রকৃতিই তাঁহার স্বভাব। সেই ভাব (Idea) হইতে তোমার ভূতপদার্থ বিকাশিত হয়। চেতন-ভাবই কারণ, ভূত বা ভৌতিকজগৎ তাহার কার্য্য; সুতরাং কার্য্যমাত্রেই কারণের আভাস থাকায়, সেই ভূতাচ্ছন্ন গুহ্য চিদাভাস হইতে তোমার বৃশ্চিক ও কীটের জীবত্বের বিকাশ হয়।* প্রথমতঃ নিরাকার চৈতন্য সাকার জীবে পরিণত হইতে হইলে তাহার স্বভাবের মধ্য দিয়া বিকাশ আবশ্যক, তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে একটী জীব আকাশ হইতে লম্ফ দিয়া এই পৃথিবীতে পড়িতে পারে না;* এই জন্য জীবরাজ্যের প্রথমে স্বেদজ কীটাদির উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, স্থূল ক্ষিতি-জল প্রভৃতি ভূতের মধ্যে অসংখ্য জীবাণু আছে। জগৎ জীবাণুময়।

৮। 'স্বভাব' অর্থে আপনার ভাব বুঝায়, সুতরাং ঐ ভাব কাহার? ভাবের আশ্রয় ব্যতীত নিরধিষ্ঠানভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমার কথিত চৈতন্যগুণ প্রকাশের পূর্ব্বে স্বভাবে ছিল; যদি ঐ স্বভাবকে তুমি শূন্য বল এবং উহা কল্পিতপদার্থমাত্র বল, তবে

---

* চেতন ভাব (Idea) হইতে কি প্রকারে ভূত ও ভৌতিক জগতের বিকাশ হয় এবং কার্য্যেতে কারণের আভাস কি প্রকারে থাকে, কি প্রকারেইবা নিরাকার চেতন ভাব সাকার জীবে পরিণত হয়, অর্থাৎ ভূতাচ্ছন্ন চিদাভাস হইতে কিপ্রকারে কীটাদিতে জীবত্বের বিকাশ হয়, তাহার বিশদ্ ব্যাখ্যা আমার কৃত 'পুনর্জন্ম-তত্ত্ব' প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চদশীর জীব-তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময়ে তদপেক্ষা আরও বিশদ্ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

* কেহ বলিতে পারেন যে, মনুষ্যের ঔরসে মানবীর গর্ভে মানবের উৎপত্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু জগতে যখন মানব আদৌ ছিল না, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথম মানব কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক মনোময় জীবই মনু; ঐ মনু ব্রহ্মের মানসপুত্র, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিতমত মনোময় ভাবের প্রতিমূর্ত্তি (Image of intelectual idea) পার্থিব জীবে ঐ মনোময় ভাব প্রতিবিম্বিত হইলে, মানবদেহে পরিণত হয়; ঐ স্থানে স্বভাবের মধ্যে ব্যতিক্রমীনিয়ম (ইংরাজিতে যাহাকে Missinglink কহে) প্রযোজ্য হয়; নৃসিংহ অবতারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। উহারই নাম বিবর্ত্তবাদ (ডারউইনের Evolution theory দ্রষ্টব্য)

আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্যই কল্পনা হইতে স্বভাব (আপনার ভাব—self idea) প্রকটিত হয়, তাহাহইলে ঐ কল্পনা-ক্রিয়ার কর্ত্তা কেহ আছেন, তিনিই সদ্‌ব্রহ্ম নির্ণীত হইতেছেন।

৯। যদি তুমি স্বভাবকেই উভয়তঃ সৎ (চির অস্তিত্ববান) এবং কল্পিতপদার্থ বল, অর্থাৎ স্বভাব অনাদি, চিরকালই আছে, ছিল ও থাকিবে, এই ভাবটী চিরকল্পিত বল, তাহাহইলে তোমার এই দুইটী কথা পরস্পর বিসদৃশ হয়; যেমন সূর্য্যই অন্ধকার বা অন্ধকারই সূর্য্য, এরূপ কখনও হইতে পারে না, সেইরূপ সৎ পদার্থ (যাহার অস্তিত্ব আছে) কখনও কল্পিত হইতে পারে না এবং সৎকে কল্পিত বলিলে, কল্পনা-ক্রিয়ার কর্ত্তার অভাব হয়। নিরধিষ্ঠান-কল্পনা বা ভ্রম কেহ দেখিয়াছেন কি? অর্থাৎ কল্পনার আধার নাই বা কল্পনাকারীর অস্তিত্ব নাই, অথচ কল্পনার অস্তিত্ব অতি অসম্ভব ও হাস্যজনক। শূন্য বা কিছুই নাই, এই কল্পনারও আধার আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে?

এই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য গৌড়াচার্য্যের বার্ত্তিক শ্লোক ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ ঋষিগণের উপরোক্ত ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাহাই উত্থাপন করিয়া উপরোক্ত অসদ্‌বাদীদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধমতের 'মাধ্যমিক' বলিয়া এক সম্প্রদায় ছিলেন ও এখনও আছেন, তাঁহারা সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, তাহার ধ্যান বা উপাসনা হইতে পারে না, এই জন্য তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। ঐ সাকার ধ্যাননিষ্ঠদিগকে গৌড়াচার্য্য নামকজ নৈক বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবিৎ বার্ত্তিক শ্লোকদ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগের আদর্শযোগ দর্শাইয়া এইরূপে নিরস্ত করিয়াছিলেন যে, তোমার সাকার-ধ্যান তোমার মানস-কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি মনে ঈশ্বরের একটী কোন আকার স্থাপনা করিয়া, মানসচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া, ঐ রূপের প্রতি একাগ্রতার সহিত যে ধ্যান-মগ্ন হও, তাহাই সাকারধ্যানজাত সবিকল্পসমাধি *; কিন্তু যে সমাধিতে কল্পনা নাই, অর্থাৎ যে সমাধিতে সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপ ও তৎসহ জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান পরমজ্ঞানে বা অনন্ত চৈতন্যে পরিণত হইয়া, ঐ অনন্ত চৈতন্য সদানন্দস্বরূপ—কেবল সৎস্বরূপ (অর্থাৎ আত্মা) মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, উহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি বা অস্পর্শযোগ। ঐ যোগ সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগীদিগের দুর্লভ। তাহারা ঐ অস্পর্শযোগ (অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি) শুনিয়া কম্পিত হয় এবং ঐ নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বারা সদ্‌ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত হওয়ায়, উহারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐরূপ নির্ব্বিকল্পসমাধি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় কি না? এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার প্রথমে সুষুপ্তি ও নির্ব্বিকল্পসমাধির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন সুষুপ্তিকালে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি তমসাচ্ছন্ন (অর্থাৎ প্রকৃতির তমোগুণে আচ্ছন্ন) হওয়ায়, নিজের ও জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত

* উক্ত সবিকল্প-সমাধি অবস্থাভেদে ছয় প্রকার—যথা সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার, আনন্দ ও অস্মিত। ঐ সবিকল্প সমাধির বিস্তারিত বিবরণ এই পঞ্চদশীব্যাখ্যায় তত্ত্ব বিবেকের মধ্যে বিশদভাবে আছে। (হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয়, সেইরূপ সমাধিকালে মন-বুদ্ধি প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিলীন হয়; জীব-বুদ্ধি মলিন সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন, এই জন্য মলিন (ভ্রান্ত) অর্থাৎ শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তস্বভাব, তদ্ধেতু ঈশ্বরের কল্পিত জগৎ মানববুদ্ধিতে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়; ঐ বুদ্ধি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে বিলীন হইলে, জগৎ ভ্রান্ত এবং উহা ঈশ্বরের কল্পনা মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ নির্ম্মল-প্রকাশ-স্বভাব; ঐ সত্ত্বগুণে পরম জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ হয় এবং ঐ জ্ঞান জ্যোতিতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ-স্বভাবও বিলীন হইয়া যায়, যেমন অন্ধকারে কোন বস্তু দর্শনের জন্য প্রদীপের আলোক আবশ্যক হয়, কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে, প্রদীপের আলোক সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে অভিভূত হয়, সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে, সত্ত্বগুণের প্রকাশস্বভাব ঐ সূর্য্যে বিলীন হইয়া যায়। ঐ প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে, ঐ ভ্রান্তি বা অভ্রান্তি—জগতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব কিছুই থাকে না। * কেবল পূর্ব্ববর্ণিতমত সদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; অতএব সুষুপ্তি-কালে দৃশ্য জগৎ অজ্ঞানে বিলুপ্ত হয়, সমাধি-কালে পরম জ্ঞান জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। তুমি সাকার বস্তুতে মনঃ-সংযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ তন্ময় করিয়া, তাহাতে আনন্দ অনুভব করিতে পার, তবে বিনাবলম্বনে অন্তঃকরণ সদানন্দে পর্য্যবসিত হইতে না পারিবে কেন? যদি কোন বিষয়াবলম্বনে আনন্দের বিকাশ হইতে পারে, তবে আনন্দের অস্তিত্ব তুমি অস্বীকার করিতে পারনা। অতএব নির্ব্বিকল্পসমাধি অসম্ভব নহে; তবে যাহারা ক-খ না জানে, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞান যেরূপ, আমাদের পক্ষে সমাধি-তত্ত্ব সেইরূপ! যাহাহউক, নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বারা সদ্ব্রহ্ম যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, অসৎ বা শূন্য আদি নহে, সদ্ব্রহ্মই অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়।

* জগতের অস্তিত্বজ্ঞান না থাকিলে, নাস্তিত্বজ্ঞানও অসম্ভব; যেমন শীতের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে গ্রীষ্ম-অনুভূতি অসম্ভব; সেইরূপ জগতের অস্তিত্বাভাবে নাস্তিত্ব বুদ্ধিও অসম্ভব।

পুনর্জন্ম-তত্ত্ব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পুনর্জন্ম হয় কাহার? বেদান্তদর্শনে দেখিতে পাই, আত্মা অক্ষর, নিত্য, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও জন্ম-রহিত• ইত্যাদি; জীবাত্মাও স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নহে। বুদ্ধি-তত্ত্বে সেই অনাদি নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল জন্ম-মৃত্যু-রহিত আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই বুদ্ধিতত্ত্বস্থ প্রতিবিম্বকে জীব বা জীবাত্মা কহে। ইহাই বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ব-বাদ। শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ স্বামী ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নানা গ্রন্থে বিশদভাবে এই মায়াবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই এক স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠক দেখিবেন যে, জীবাত্মা কি পদার্থ, অর্থাৎ জীব বাস্তবিক পৃথক্ কোন্ পদার্থ নহে; কেবল সেই অপরি-

বর্ত্তনশীল জন্মরহিত আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকোধীষু জীবেঽপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা।
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং
তথা ধী-বিয়োগে নিরাভাসকোঽয়ঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।

বঙ্গানুবাদ। যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ জীবাত্মা বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) প্রতিফলিত চৈতন্যের আভাস (প্রতিবিম্ব) মাত্র, পৃথক্ বস্তু নহে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। যখন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে। সেইরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগে আত্মা প্রতিবিম্ব-শূন্য (জীবোপাধিশূন্য) হন। আমি সেই নিত্য-জ্ঞানময় আত্মা।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশো স্বরূপোঽপি নানেবধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।
যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যম্
অনেক ধিয়ো যস্তথৈকঃ প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আত্মা জন্মরহিত, অপরিবর্ত্তনশীল এবং উপরোক্ত বর্ণানুসারেও দেখা যাইতেছে যে, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নিত্যজ্ঞানময়-অনন্ত-চৈতন্যই আত্মা বা পরমাত্মা, সুতরাং আত্মা ব্যষ্টি জীব নহে এবং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদিও সম্ভব নহে। আবার যখন বুদ্ধিস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীবাত্মা, ঐ প্রতিবিম্ব পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, তখন ঐ প্রতিবিম্বেরই বা বন্ধ, মুক্তি, জন্ম, উন্নতি, অবনতি কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

এখন বড় কঠিন সমস্যা, জন্ম-জন্মান্তর কাহার? উপনিষৎ এবং বেদান্তোক্ত এক বৃক্ষে দুইটী পক্ষীর বিষয় এই পত্রিকায় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে; উহার একটী পক্ষী ফলভোগ করেন, আর একটী পক্ষী সাক্ষী-স্বরূপ কেবল দর্শনমাত্র করেন; কিছুতেই লিপ্ত হন না। বৃক্ষটী দেহ, পক্ষী দুইটীর মধ্যে ফলভোগকারী পক্ষী জীবাত্মা এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষী পরমাত্মা। বেদেও পরমাত্মা নির্লিপ্ত-সাক্ষী-চৈতন্য বলিয়া উক্ত আছে; সুতরাং অনন্তচৈতন্য নির্লিপ্ত-জ্ঞানময় সর্ব্বদ্রষ্টা বা সাক্ষী ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঐ দুইটী পক্ষীর আভাস ভগবৎগীতায়ও পাওয়া যায়। তাহার ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, উহার মীমাংসা দূরে থাকুক, আরও ভয়ানক সংশয়ের মধ্যে পড়িতে হয় এবং রহস্যটী অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়া দাঁড়ায়। গীতাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিছেন যে, আত্মার কখনও জন্ম হয় না; তিনি মরেন না; কখনও তিনি উৎপন্ন হন নাই বা হইবেনও না; তিনি অনাদি-অক্ষর-অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল ইত্যাদি। যেমন লোকে পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করেন। যখন আত্মা নিত্য-জ্ঞানময়-সর্ব্বদ্রষ্টা ও অনন্ত-চৈতন্য হইলেন, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির—অর্থাৎ গীতোক্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট আত্মা কে?

অর্থাৎ ভীষ্মাদিরূপে আমি কে? ঐ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে নিত্য-শাশ্বত-পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া আবার পরক্ষণেই বলিলেন,—নিজের ও অর্জ্জুনের বহুজন্ম গত হইয়াছে; তাহাতে তাঁহার নিজের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ আছে, কিন্তু অর্জ্জুনের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ নাই; অর্থাৎ তিনি জাতিস্মর, অর্জ্জুন জাতিস্মর-নহে। এই জাতিস্মর কে? অবশ্যই দেহ নহে। যদি শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জাতিস্মর হন এবং অর্জ্জুনের আত্মা জাতিস্মর না হন, তবে একের আত্মা উন্নত ও অন্যের আত্মা অনুন্নত সাব্যস্ত হইতেছে; অর্থাৎ আত্মার ও গুণের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ শত শত শাস্ত্রে "আত্মা বদ্ধ-মুক্ত কিছুই নহে; আত্মা সৎ, নিত্য, কর্ম্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সর্ব্ব-জ্ঞানময় ও নির্লিপ্ত" ইত্যাদি; পক্ষান্তরে—শত শত শাস্ত্রে "আত্মা প্রকৃতিজাত-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি সংযুক্ত হইয়া সংসারে বদ্ধ হন,—কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং সৎকর্ম্ম পরিপাকাদিদ্বারা মুক্তিলাভও করেন" ব্যাঘাত আছে। উপরোক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, পরমাত্মা বদ্ধ, মুক্ত বা ফলভোগী নহেন; জীবাত্মাই বদ্ধ এবং কর্ম্মফলভোগী; ঐ জীবাত্মাই কর্ম্ম-পরিপাকদ্বারা মুক্ত হন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, জীবাত্মা পৃথক্ বস্তু নহে, পরমাত্মারই (বুদ্ধিস্থ) প্রতিবিম্ব মাত্র। এক্ষণে বিপক্ষবাদীরা এই তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে, ঐ প্রতিবিম্ব বস্তু নহে, সুতরাং প্রতিবিম্বের উন্নতি-অবনতি, বদ্ধ-মুক্তি এবং পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় দেহান্তর-প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গীতাকার, যে আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, তাঁহারই নূতন বস্ত্র পরিধানরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০।২১। ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) গীতাকার আত্মাসম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনার পর স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

বঙ্গানুবাদ। আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দৃষ্ট করে এবং অন্যে আত্মাসম্বন্ধে যাহা বলে, তাহাও আশ্চর্য্যবৎ বলে; যে শুনে, সেও আশ্চর্য্যবৎ শুনে,—শুনিয়াও কেহ বুঝিতে পারে না।

গীতাকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, আত্মার প্রকৃততত্ত্ব কেহই ধারণা করিতে পারে না, এইজন্যই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মচৈতন্য সম্বন্ধে আর একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য মহাকাশ-স্বরূপ এবং কূটস্থ চৈতন্য (অর্থাৎ নির্লিপ্ত সাক্ষী-চৈতন্য,—যাহার প্রতিবিম্ব জীব) ঘটাকাশস্বরূপ এবং ঐ ঘটস্থ জলে যে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্য-স্বরূপ হইতেছে; সুতরাং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশ হইতে পৃথক্ নহে। এস্থলেও বিপক্ষবাদীরা তর্ক করিবেন যে, ঘট ভগ্ন হইলে, ঘটস্থ আকাশ মহাকাশেই লীন হয় এবং ঘটস্থ জল মৃত্তিকায় মিশিয়াযায়; সুতরাং ঘট ভগ্ন এবং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হওয়ায়, ঘটস্থ জলে আকাশের যে প্রতিবিম্ব ছিল, তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হয়। এতাবতা দেহনাশে জীবের অস্তিত্ব ও জন্মান্তর অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এই গুরুতর কঠিন আপত্তির মীমাংসার পূর্ব্বে অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের মত কি, জানা আবশ্যক। এক্ষণে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে আত্মা বা পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা স্বয়ং পরমাত্মা

বলিয়া উক্ত হয় নাই; সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ কল্পিত হইয়াছে।* কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ স্বাধীন নহে এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বা ক্রিয়া-শক্তি নাই।—প্রকৃতিই কার্য্যের মুখ্যকর্ত্রী, পুরুষ তাঁহার চৈতন্যাধার মাত্র; কিন্তু পুরুষ-সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি জড়বৎ থাকেন, তাঁহার কোন কার্য্য করিবার (জগৎপ্রসব করিবার) শক্তি থাকে না। সাংখ্যকার ইহার একটী দৃষ্টান্ত এই ভাবে দেন যে—প্রকৃতি অন্ধ এবং পুরুষ খঞ্জস্বরূপ। অন্ধের দৃষ্টিশক্তির অভাব এবং খঞ্জের গতি-শক্তির অভাব; কিন্তু উভয়ে একত্রিত হইলে, উভয়ের অভাব পূরণ হয়; যেমন অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জ উঠিলে, খঞ্জের ইঙ্গিতে অন্ধ গন্তব্যপথে চলিতে পারে, অর্থাৎ খঞ্জ অন্ধের পথ-প্রদর্শক হয় এবং অন্ধও খঞ্জের বাহক হয়, সেইরূপ অন্ধ-প্রকৃতি খঞ্জপুরুষের ইঙ্গিতে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। সাংখ্যকার ব্যষ্টি—অর্থাৎ পৃথক্ পুরুষ ব্যতীত সমষ্টি-ঈশ্বর বা 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করেন না। পাতঞ্জল এবং ন্যায়দর্শনকার সাংখ্যের ন্যায় ব্যষ্টি—অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের (যাহাকে আত্মা বলিয়াছেন) অতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বা পরমাত্মা স্বীকার করেন। উপরোক্ত কয়েকটী দর্শনশাস্ত্রে আত্মার জন্মজন্মান্তর, উন্নতি-অবনতি ও বন্ধ মুক্তি সমস্তই স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যমতে জ্ঞান ও সদসদ্বস্তুবিবেকদ্বারা এবং ন্যায়শাস্ত্রমতে সদসদ্-বিচার ও চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা স্বরূপজ্ঞানোদয় ও মুক্তি হয়। পাতঞ্জলমতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত মিলন ও মুক্তি হয় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রথমতঃ সাংখ্যের পুরুষ জ্ঞানী, দ্রষ্টা ও প্রকৃতির পথ-প্রদর্শক। যদিও সাংখ্যকার পুরুষের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না প্রকৃতিকেই কার্য্যের মুখ্যকর্ত্রী বলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা মতে প্রকৃতিকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনা বলা যাইতে পারে না; যেহেতু চেতন পুরুষের সাহায্য ব্যতীত জড়প্রকৃতির কখনও জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা মতেও সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের গৌণকারণই পুরুষ সাব্যস্ত হইতেছেন। এস্থলে পুরুষকে পূর্ণজ্ঞানী না বলিলে, এই বিচিত্র অনন্ত সৃষ্টির কৌশল অজ্ঞানী বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। এতাবতা পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ বা আত্মা জড়প্রকৃতির উপদেষ্টা, অনুমন্তা এবং পথ-প্রদর্শক হইয়া, আবার ঐ প্রকৃতির আবরণে অজ্ঞানীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করা,—তদনন্তর বহুসাধনার পর পুনঃ বিবেকের উদয় হওয়া এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ করা সঙ্গত হয় কি? এবং উহার উদ্দেশ্যই বা কি হইতে পারে? যদি পুরুষ জড়-প্রকৃতির আবরণে অজ্ঞানী হন, তবে অজ্ঞানী পুরুষের ইঙ্গিতে জড়-প্রকৃতির এই জ্ঞানময় সুকৌশল-পূর্ণ বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? আবার জড়প্রকৃতি কর্ত্তৃক পুরুষ অজ্ঞানাবরণে আবরিত থাকিলে, ঐ অজ্ঞানাবরণ-মুক্তি এবং বিবেক ও স্বরূপজ্ঞানের বিকাশ কি শক্তিদ্বারা হইবে? যেহেতু প্রকৃতি জড়, পুরুষও তদাবরণে আবরিত, এস্থলে পুরুষের সাধনাদ্বারা ক্রমিক জ্ঞান, বিচারশক্তি ও সদসদ্বস্তুবিবেকের বিকাশ কাহার শক্তিদ্বারা হইবে? এতদ্ভিন্ন সাংখ্য মতের আর একটী গুরুতর আপত্তি এই যে, এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী এবং পার্থিব

* সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, যথা—প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চতন্মাত্র, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ,—পঞ্চ-মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্।

জড়, উদ্ভিদ, নানাপ্রকার জীবজন্তু সমন্বিত বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ-সংযোগে জড়প্রকৃতি কর্ত্তৃক কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন মানবাত্মা সাংখ্যের এক একটি পুরুষ হইতেছে, তাহাহইলে পৃথক্ পৃথক্ উদ্ভিদ, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর আত্মা কি? উহা কি সাংখ্যের এক একটী পুরুষ? যেহেতু ঐ পুরুষ লইয়াই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। পুরুষ বাদ দিলে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক একটী তৃণে যে সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব আছে, (অবশ্যই ঐ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ উদ্ভিদ্ জগতে হয় নাই) তদতিরিক্ত এক একটী পুরুষও কি গুহ্যভাবে আছে? সেই সেই পুরুষ কি চিরকাল তদবস্থায় থাকিবে? অথবা ক্রমোন্নতির প্রণালী অনুসারে কোটী কোটী জন্মের পর উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গে, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীতে পরিণত ও পশু-পক্ষী মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া সাধনা দ্বারা কি মুক্ত হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই তৃণ বা উদ্ভিদের স্থানে যে নূতন তৃণ বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে, তাহাতেও নূতন পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। অতএব অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ চেতন জ্ঞানময় পুরুষের জড়ত্বে ও উদ্ভিদে পরিণতি—তদনন্তর কীট-পতঙ্গ হইতে সমস্ত জীব-যাত্রা ভ্রমণপূর্ব্বক মানবযোনি প্রাপ্তি এবং তৎপরে বহুসাধনা দ্বারা পুনর্ব্বার স্বপদপ্রাপ্তি (অর্থাৎ যাহা ছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাই হওয়া) রহস্যের বিষয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ বেদান্তোক্ত সমষ্টি-ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার না করিলে, সৃষ্টি-সামঞ্জস্য কখনই সংরক্ষিত হইতে পারে না। এক্ষণে পাতঞ্জলযোগদর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। ঐ দর্শনে যদিও ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, তথাচ অসংখ্য ব্যষ্টি আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, অনেকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। যদি ঈশ্বর পূর্ব্বোক্তমত উদ্ভিদ্-কীট-পতঙ্গ, নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও মানবসমূহের অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আত্মা সৃষ্টপদার্থ হইল; সৃষ্টবস্তুমাত্রেই অসৎ—অর্থাৎ ধ্বংসশীল; যাহা ধ্বংসশীল, তাহার মুক্তি বা চির-অমরত্ব কখনই হইতে পারে না; যথা—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে, তাহার কখনও ধ্বংস হয় না ও যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার কখনও চির-অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই ধ্বংসশীল, এস্থলে আত্মা নিত্যজাত ও নিত্যধ্বংসশীল সাব্যস্ত হওয়ায় আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয়। সুতরাং পাতঞ্জলোক্ত সমাধিদ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত চিরমিলনের সার্থকতা থাকে না। যদি অসংখ্য আত্মা ঈশ্বরের অসংখ্য সৃষ্টবস্তু না হইয়া—অর্থাৎ নিত্যজাত না হইয়া, অনাদিকাল হইতেই উহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহাহইলে সাংখ্যের পুরুষের যে দশা, ইহাদেরও তাহাই হয়,—অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিতমত নিত্য বস্তুর বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত আর একটী মত আছে ঐ মতকে 'বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ' কহে। বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদীরা নিরাকার-নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব মানেন না; তাঁহারা বেদান্তের মতানুযায়ী (কিঞ্চিৎ রূপান্তরভাবে) ঈশ্বরের শক্তিকেই প্রকৃতি বলেন। তাঁহারা যদিও ঈশ্বর ও জীবাত্মা এক বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাচ উহা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কোন পদার্থও বলেন না; তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমষ্টি-চিদ্ঘন-

বিগ্রহ ভগবান্। জীব তাঁহারই চিদংশ বা চিদণুস্বরূপ এবং সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। তাঁহারা বেদান্তবাদী হইলেও বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব ঈশ্বরের অংশ বা অণুস্বরূপ হইলেও, যেমন সমুদ্রস্থ এক বিন্দু বারি কখনও স্বয়ং সমুদ্র হইতে পারে না, সেইরূপ জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। তাঁহার চিৎসমুদ্রের নির্ম্মল বারিবিন্দু জড়দেহরূপ কর্দ্দম মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার নির্ম্মলত্ব থাকে না এবং কর্দ্দমরূপ দেহ নষ্ট হইলেও ঐ কর্দ্দমের অণুসকল ঐ বারিবিন্দুর সহিত সংমিশ্রিত থাকায়, ঐ বারিবিন্দু চিৎসমুদ্রের নির্ম্মল বারি হইতে পৃথক্ থাকিয়া (চিদণুরূপ জীব) ইহ-পরলোকে যাতায়াত করে; ক্রমে ভক্তি-প্রেমরূপ সাধন-ভজনদ্বারা কর্দ্দমাণু হইতে বারি বিমুক্ত হইলে পুনর্ব্বার চিৎসমুদ্রে পৌঁছে; কিন্তু সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় না,—পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব চিরকাল থাকে। যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দমরূপ জড়জগৎ যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য স্বরূপ, তাহা বলা বাহুল্য। এই বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার হয়। এই মতটী সহজেই মনোরম বোধ হয়; প্রকৃত-পক্ষেও বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি মধুর এবং প্রেম ও ভক্তির উৎসস্বরূপ। এই মতটীর উপর যাঁহাদের নিসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের ভগবানের উপর নির্ভর ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় এবং ঐ প্রেম ও ভক্তি হইতে মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া জীবের পার্থিব-বন্ধন যে শিথিল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক বেদান্তের মায়াবাদের পক্ষপাতী হইলেও এবং বেদান্তের মায়াবাদের সহিত এই মতের আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধ থাকিলেও—উভয় মতের সামঞ্জস্যের নিতান্ত প্রয়াসী। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের সহিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য ব্যতীত উপস্থিত কঠিন প্রশ্নের কখনই সুমীমাংসা হইবে না সত্য, তৎসত্ত্বেও এই মতটীর প্রতি যে আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, তাহা না দর্শাইলে, উভয় মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন হইতে পারে না; যাহাহউক জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ বা অণুস্বরূপ হয়েন, তাহাহইলে জীবাত্মা নিত্য-শাশ্বত-অপরি-বর্ত্তনশীল ও ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত হইতেছেন, সুতরাং ঐ নিত্য বস্তুর বন্ধ-মুক্ত এবং উন্নত অসম্ভব। বিশেষতঃ চিদণুস্বরূপ আত্মা পার্থিব দেহধারণের পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, মুক্ত হইয়াও যদি তাহাই থাকিলেন, তবে সাংখ্যের পুরুষের ও পতঞ্জলির আত্মার যে দশা, এই আত্মারও সেই দশা হইল; ফলতঃ ঐ অবস্থায় বন্ধ মুক্তির কোন অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ পরমাত্মা পূর্ণ-অনাদি অনন্ত-জ্ঞান-ময় বিধায় অনন্তের পৃথক্ পৃথক্ অংশ বলা নিতান্ত অদার্শনিক ও অযৌক্তিক হয়; যেহেতু অনন্তের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, অসীম, তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে, মধ্যে একটী সীমা বা রেখা আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব্ব-ব্যাপীর মধ্যে সীমা বা রেখার স্থান কোথায়? যে স্থানে সীমা বা রেখা পড়িবে, সে স্থানেও সর্ব্বব্যাপীর অস্তিত্ব থাকায় সীমা বা রেখা অসম্ভব; বিশেষতঃ অনন্ত কখনও সাকার হইতে পারে না; আকৃতি থাকিলেই সীমাবদ্ধ হইল। যদি বলা হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, মৃত্তিকা এবং জীবজন্তু-সমন্বিত অনন্ত বিশ্বই তাঁহার স্থূলদেহ, তাহা হইলে বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের সহিত অসামঞ্জস্য হয় না; বস্তুতঃ বিষ্ণু-পুরাণোক্ত প্রহ্লাদকৃত ভগবানের স্তোত্রটী পাঠ করিলে এই মতটী সমর্থিত হয়। ঐ বিষ্ণুপুরাণ বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের একখানি উৎকৃষ্ট

পৌরাণিকগ্রন্থ। ঐ স্তোত্রে বর্ণিত আছে, যথা—

"রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগতেদদীশ। রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূত ভেদা স্তেষ্বান্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মং॥ তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি বিশেষণানামগোচরং যৎ পরমাত্মরূপং। কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়।"

বঙ্গার্থ। বিশ্বই তোমার মহৎরূপ, এই জগৎ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভূত তোমারই এক একটী রূপ (অর্থাৎ স্থূলরূপ) তাহাদিগের অন্তঃকরণ তোমার সূক্ষ্মরূপ; ঐ সূক্ষ্মাদিরূপের অবিষয়ীভূত যে পরমাত্মরূপ আছে, তাহা অচিন্তনীয়; অতএব হে পুরুষোত্তম। তোমাকে নমস্কার করি।

অতএব সূক্ষ্মাদি বিষয়ের অবিষয়ীভূত অচিন্ত্য পরমাত্মরূপের বিষয় যে কথিত হইয়াছে, ঐ চিন্তার অতীত রূপকে প্রকৃতপক্ষে রূপ বা বিশেষ আকৃতি বলা যায় না। এই ভাবে সর্ব্বব্যাপীর চৈতন্য-ঘনবিগ্রহ বা চতুর্ভুজ কি দ্বিভুজ মূর্ত্তি অসম্ভব।* ব্রহ্ম নিরাকার—অনন্ত, অতএব সমস্তই তিনি, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ অবস্থায় এক অণু হইতে অন্য অণুর মধ্যে অবকাশ বা ছেদের উপায় নাই। দুইটী অণুর মধ্যে সামান্য অবকাশ ব্যতীত পৃথক্ দুইটী অণুর অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু তিনি পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় তাঁহার মধ্যে কোন অবকাশ (ফাক্) নাই; অতএব পৃথক্ পৃথক্ অণু-পরমাণুরও অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি নিত্য অনন্ত জ্ঞানময়; ঐ নিত্য জ্ঞানের বিভাগ হইতে পারে না। যখন সমস্তই জ্ঞানময়, তখন অনন্ত নিত্য-জ্ঞানের অংশ বা অণুস্বরূপ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং তাহার বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি এবং পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি অসম্ভব হয়। এই স্থানে পুনর্ব্বার ভগবদ্গীতার সেই শ্লোকটী স্মরণ করাইয়া দিই—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥

বাস্তবিকই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি মত আছে, তাহাতে উহার পরিষ্কার মীমাংসা দূরে থাকুক, বরং ঐ সকল মত অধিকতর জটিল বোধ হয়। এমন কি, গৌতম বুদ্ধ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও, কর্ম্ম এবং পঞ্চস্কন্ধ (যথা রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ) ব্যতীত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের মতানুসারে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তবে কর্ম্মফল ভোগ কে করিবে? তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ পঞ্চভূতের বিকার বা পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংশ্লিষ্টগুণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; অতএব জড়ের কর্ম্মফল ভোগ অসম্ভব। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, অথচ কর্ম্মফল ভোগ এবং পঞ্চস্কন্ধ স্বীকার করায়, তাঁহার মতটী যে সম্পূর্ণ সদোষ, তাহা বেদান্ত দর্শনে শাঙ্কর ভাষ্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত আছে।* (বেদান্তদর্শন শাঙ্কর

---

* সাধকের সাধনার নিমিত্ত ঐ প্রকার জ্যোতির্ম্ময় দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পনা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন নিরাকার উপাসনা অতীব কঠিন, (গীতার ১২শ অঃ, ১—৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) এইজন্য ভক্তের নিকট সর্ব্বব্যাপীর সাকারত্ব নিতান্ত প্রয়োজন। স্বরূপলক্ষণে অনন্ত দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ নহেন, অথচ তটস্থভাবে ভক্তের মনোময়রূপে তিনি দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে ধ্যানাধিগম্য ও সাধকাভীষ্টফলদাতা। সাকারোপাসনার কৃতার্থতা এই জন্য সুলভ, স্বাভাবিক ও সুপরীক্ষিত।

* লৌকিক বৌদ্ধধর্ম্মে শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদ প্রভৃতি মত আছে। ঐ সকল মত

ভাষ্য ২য় পাদ ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা যে কি পদার্থ, ইহা দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্রে নিঃসংশয়িতরূপে স্বীকৃত বা মীমাংসিত কি হয় নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উহার প্রকৃত মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের অন্তরতম স্তরে অতি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে; সাধনা ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে, এমতভাবে উহার ব্যাখ্যা নাই বা হইতেও পারে না; তাহার কারণ এই যে, একপক্ষে জগতে এরূপ ভাষা নাই, যাহা দ্বারা ঐ গূঢ়তমতত্ত্ব সাধারণ জনগণকে নখদর্পণের ন্যায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; পক্ষান্তরে কোন মহাত্মা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের এরূপ আধ্যাত্মিক নির্ম্মল জ্ঞান বা বুদ্ধি নাই, যদ্দ্বারা আমরা অন্তর্জগৎ পরিদর্শন ও ভেদপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইতে পারি। আসল কথা বলিতে হইলে, আমাদের ন্যায় বিষয়ীব্যক্তি মাত্রেই বেদান্তের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জন্যই বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে স্পষ্টরূপ কথিত হইয়াছে যে, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক ও বৈরাগ্য সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত বেদান্তশ্রবণের অধিকারী অপরে হয় না। ঐ নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, এক জন মূর্খ চাষা যদি কোন তাড়িৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে "মহাশয়! এই যে তারে সংবাদ আসে, উহা কি প্রকারে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন"? ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঐ তারের সংবাদের মর্ম্ম—অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক রহস্য যদি কোন তত্ত্বজ্ঞ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে ঐ চাষা তাহা কখনই সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হয় না। পরন্তু যদি ঐ প্রশ্নকারক নিতান্ত 'চাষা' না হইয়া বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ আমাদের দেশের কিস্বা বিষয়ী কূটতার্কিক হন, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঐ অনভিজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী প্রকৃতপ্রস্তাবে তাড়িৎতত্ত্বের ও তাহার পরিচালক যন্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এমতভাবে অন্যায় কূটতর্ক করিতে থাকে যে, সেই অজ্ঞব্যক্তির অন্যায় তর্ক খণ্ডন করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে পারে, এমন তত্ত্বজ্ঞ জগতে নাই। * আমাদের পক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ববাদের উপর পূর্ব্ববর্ণিত আপত্তি বা তর্ক সেই প্রকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্য-জগতে এমত ভাষা নাই, যদ্দ্বারা অন্তর্জগতের ঐ গুরুতর ব্যাপার স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। 'প্রতিবিম্ব' শব্দ বাহ্যজগতের ভাষা; অন্তর্জগতের ঐ ভাবের ভাষার অভাবে কতকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া 'প্রতিবিম্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐরূপ মহাকাশ, ঘটাকাশ, ঘটস্থজলাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রকৃত ব্যাপারের একদেশ-সাদৃশ্য মাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য—ঐ ব্রহ্ম বা আত্মা ব্যতীত জগতে অন্য কিছুতেই নাই, সুতরাং ঐ একদেশ-সাদৃশ্য-

---

সদোষ ও বেদান্তদর্শনে ঐ সমস্ত মত খণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সপ্তকোষিক আত্মা স্বীকৃত আছে। মিঃ সিনেট কৃত "Esoteric Budhism" দ্রষ্টব্য।

* একদিন ইংরাজি-অনভিজ্ঞ একটী প্রাচীন নায়েব পৃথিবী গোলাকার এবং আমেরিকা বিপরীত গোলার্দ্ধে অবস্থিত শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে "তবে তাঁহাদের মস্তক নিম্নদিকে থাকে, তাহা হইলে আকাশের দিকে পড়িয়া যায় না কেন?" তাঁহার এই প্রশ্নে "উপর নীচ কিছুই নহে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ" ইত্যাদি তাঁহাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ঐ ভ্রম-সংস্কার কিছুতেই গেল না।

হেতু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ শিষ্যবর্গকে কেবল মাত্র গন্তব্যপথ ধরাইবার জন্য অন্তর্জগতের কেবল বর্ণ-পরিচয়ের ন্যায় ঐ সকল একদেশ-ব্যাপী দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমিত্বের প্রসার।

গৃহস্থাশ্রম।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যান্তে আর্য্যদিগের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই শাস্ত্রের বিধি। ব্রহ্মচারী কঠোর জ্ঞান-তপস্যান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কঠোরতর কর্ম্ম-তপস্যায় ব্রতী হয়েন। গুরুগৃহই বা বিদ্যা-মন্দিরই ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশ্বসংসার। এই সময়ে জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতীব সসীম। যোদ্ধারপক্ষে মল্লভূমি যেরূপ শিক্ষা-স্থল, গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচারী-আশ্রম তদ্রূপ শিক্ষার স্থল। কিন্তু কেবল সমরক্ষেত্রেই যেরূপ যোদ্ধার শৌর্য্য-বীর্য্য ও নৈপুণ্যের পূর্ণবিকাশ হয়, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমেই মানবের অন্তর্নিহিত তাবৎ শিক্ষার বিকাশ হয়। রসায়নাদি শিক্ষার জন্য যেরূপ উপদেশ-গৃহে (lecture room) উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও উপদেশ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পরীক্ষা-গৃহ (laboratory) যন্ত্রাদি সাহায্যে ক্রিয়ার আবশ্যক, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যকালে মানবজীবনের তাবৎ কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় উপদেশের দার্ঢ্য ও পরিণতি সম্পাদন জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা প্রয়োজন। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানের পরিপাক হয়। ক্রিয়ার সাহায্য ভিন্ন মস্তিষ্কে জ্ঞানের লাঞ্ছন সুস্পষ্টরূপে পতিত হয় না। এই জন্য মানবজীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতীব প্রয়োজনীয় হইলেও এবং শাস্ত্রে উহার ভূয়সী প্রশংসা থাকিলেও, গৃহস্থাশ্রম ততোধিক প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য শাস্ত্রেও অধিকতর রূপে প্রশংসিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত ব্রহ্মচারী-আশ্রম নিরর্থক হইয়া যায়। যে জ্ঞান কার্য্যে পরিণত না হয়, সে জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যার্জ্জন করিয়া যে সেই বিদ্যাদ্বারা জগতের ও নিজের উপকার সাধন না করে, তাহার সে বিদ্যা বৃথা। বলবান্ হইয়া যে দুর্ব্বলের সাহায্য না করে, তাহার বল নিরর্থক। সংক্ষেপে—যাহার যাহা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার না হইলে, তাহা থাকা না থাকা সমান। ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-শিক্ষা যদি কোনও কার্য্যে না আসিল, তাহা-হইলে সে শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। গৃহস্থাশ্রমই সেই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাভাবিক ও সুপ্রাপ্য স্থল। এই জন্যই সাধারণ অধিকারী-দিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমের বিধান। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সাংসারিক বহুবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া মানব ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-জ্ঞানের সারবত্তা ক্রমে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

সংসারে প্রবেশ করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নানাবিধ জটিল সমস্যা মানবের সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখন যদি মানব "আমিত্বের প্রসার"কে ইষ্টদেবদত্ত মূলমন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহা-দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে পরিচালিত হয়, তাহাহইলে তাহার কখনও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই যদি আমিত্বের প্রসার করিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই যদি "আমাকে" "পরের" স্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা-

হইলে কর্ত্তব্য-মীমাংসা তত সুকঠিন হয় না। পিতা যখন পুত্রের প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐরূপ পুত্র যখন পিতার প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পিতা কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিবেন। এইরূপ স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশ ও বিদেশবাসী, সকলের স্থানেই "আমাকে" কল্পনা করিয়া তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইবে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, যজমান-পুরোহিত, প্রভু-ভৃত্য, রোগী-চিকিৎসক ইত্যাদি সকলেই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যাবধারণের সময়ে কর্ত্তব্যবিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে আপনাকে কল্পনা করিলে জগতে কোন অশান্তি থাকিতে পারে না। মানব পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময়ে আপনাকে আপনার স্থানে ফেলিতে পারে না বলিয়াই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। গৃহস্থের তাবৎ কর্ত্তব্য "আমিত্বের প্রসার"রূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই উহা সুকর ও সুখদ হয় এবং যখনই অন্য কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তখনই মানব মানবের প্রতিকূল হইয়া পরস্পরের অশান্তি উৎপাদন করে।

ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, "আমিত্বের প্রসার" তত দুঃসাধ্য হয় না; কিন্তু কালবশে সেই ব্রহ্মচর্য্যের লোপ হওয়ায়, গৃহস্থাশ্রমে "আমিত্বের প্রসার"রূপ মূলমন্ত্রদ্বারা প্রণোদিত হওয়া এক্ষণে বড় সহজ নহে। তথাপি আমিত্বের প্রসারই মানবজীবনে সাধনার মূলতত্ত্ব হওয়ায়, মানব যতই বিকৃত হউক না কেন, ঐ মূলতত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না এবং তজ্জন্য মানব তাহার নানাবিধ কার্য্যে অজ্ঞাতসারেই যেন আমিত্বের প্রসার অধিকার করে। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্যই সাধারণ গৃহস্থ দারপরিগ্রহ করে, কিন্তু দারপরিগ্রহ করিবামাত্র অজ্ঞাতসারে তাহার "আমিত্বের প্রসার" হইতে থাকে। পুত্র-কন্যাদি হইলে, তাহার "আমিত্বের প্রসার" আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বপরিবারের প্রতি আমিত্বের প্রসার হেতু, ক্রমে অন্য পরিবারের প্রতিও সহানুভূতির স্বাভাবিকতায় "আমিত্বের প্রসার" জন্মে। ঐরূপে উহা বর্দ্ধিত হইয়া মানবমাত্রেতেই স্পৃষ্ট হয়। কার্য্যক্ষেত্র যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, মানব যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সংস্রবে আসে, ততই সে আপনাকে তাহাদের স্থানে স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। আমি যদি বিদেশে ভ্রমণ করি, তাহাহইলেই বিদেশে ভ্রমণ করিবার কষ্ট অনুভব করিতে পারি এবং তাহাহইলেই কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমার দেশে আসিলে, তাহার প্রতি সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার করিতে ব্যাকুল হই। তীর্থভ্রমণের ইহা এক সুমহৎ ফল।

এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমে বহুবিধ কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা। বহুবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদনে বহুবিধ বিষয়ে আমিত্বের প্রসার স্বতঃই উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম কি? চিন্তা করিয়া দেখ, কতকগুলি কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিবে, অতিথিসেবা করিবে, দীন-দুঃখীকে দান করিবে, অজ্ঞানীকে জ্ঞান-উপদেশ দিবে, সাধুর সম্মান করিবে, অসাধুকে যথাযোগ্যভাবে দণ্ড বা উপদেশদ্বারা সৎপথে আনিবে, ঈশ্বরে ভক্তিমান হইবে, ইত্যাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহারই শিক্ষা-সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যায় এবং ব্যষ্টিভাবে উহারা প্রত্যেকেই ধর্ম্মও বটে কর্ম্মও বটে। যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহাতে

আস্তিত্বের প্রসার, তাহাই কর্ত্তব্য; অন্য পক্ষে যাহা কিছু অকর্ত্তব্য, তাহাই অধর্ম্ম এবং যাহাতে আস্তিত্বের সঙ্কোচ, তাহাই অকর্ত্তব্য। আস্তিত্বের প্রসারই নীতি ও ধর্ম্মের ভিত্তি। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকেই যদি ধর্ম্ম বল, তাহাহইলেও দেখিতে পাইবে যে, ঈশ্বর-উপাসনার মধ্যেই তোমার তাবৎ কর্ত্তব্য নিহিত রহিয়াছে। ঈশ্বরোপাসনা করিতে গেলেই ঈশ্বরকে আদর্শ-পুরুষ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতে হয় এবং ঐ আদর্শ-পুরুষে সম্পূর্ণ আস্তিত্বের প্রসার সাধন বা আত্মসমর্পণ করিতে হয় এবং তদ্রূপ পুরুষের উপাসনা করিতে গেলেই, তাঁহার আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে ঐ আদর্শের অনুগামী হইতে হয়। বিচক্ষণ পাঠক জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আস্তিত্বের প্রসারের উপরে স্থাপিত এবং ঐ ভিত্তি অপসৃত করিলেই উহা অকর্ত্তব্যে পরিণত হইবে।

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়া মানবের চিত্ত সর্ব্বদা দোলায়মান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" অর্থাৎ কোন্‌টী কর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবিষয় এবং কোন্‌টী অকর্ম্ম বা অকর্ত্তব্যবিষয়, ইহা নির্দ্ধারণে পণ্ডিতগণও সন্দিগ্ধচিত্ত বা 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া থাকেন; সুতরাং জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ নিতান্ত সহজ নহে। জীবনের বহু-বিধ গুরুতর ব্যাপারের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, আমরা দিন দিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় আলোচনায় বিষম সমস্যায় পতিত হই। অনেক সময় দিশাহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে যখন পণ্ডিতগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আবার ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আসিয়া আমাদিগকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোমাদি সকলই করিতেছি, কিন্তু চিত্তের সংশয় যায় না। মন্ত্রজপ, সন্ধ্যা, বন্দনা, প্রাণায়ামাদি করিতেছি, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে উত্তর পাইব—আমার চিত্তের সংশয় বিনষ্ট হয় নাই। দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র না থাকায়, ভবার্ণবে আমাদের জীবনতরীকে এদিক—ওদিক—চারিদিক পরিচালিত করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়া মানব কোন একদিক লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী সেই দিকেই লইতে থাকে এবং ভাগ্যবশে হয়ত গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বা না পৌঁছে। কিন্তু দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র থাকিলে তাহার এরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইতে হয় না। মানব যখন স্বর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতু ক্রয় করে, তখন যেমন নিকষ-পাষাণের দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া লয়, তেমনই মানব-জীবনের কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষার জন্য এরূপ কোন নিকষ-পাষাণ কি নাই? এই ভবার্ণবে আমাদের জীবনতরী পরিচালন করিবার কোন দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র কি নাই? সুবিজ্ঞ পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের কর্ত্তব্য-পরীক্ষার নিকষ-পাষাণ কি? জীবনতরী পরিচালনের জন্য দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র কি?

কতকগুলি কর্ত্তব্যের বর্ণনা করিয়া, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিলে, সাধারণ কর্ত্তব্যাবধারণ হয় না, কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে সাধারণ কর্ত্তব্যের অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। একটী শিশুকে দুইটী দ্রব্য দুইভাগ করিতে বলিলে, উহা সে অনায়াসে দুইভাগ করিয়া দিবে, কিন্তু ভাগের মূলতত্ত্ব অবগত না থাকায়, বহুসংখ্যক দ্রব্যকে দুইভাগ করিতে বলিলে, সে উহা

পারিবে না। যদি কোন শিক্ষক ভাগের মূলতত্ত্ব বালককে শিক্ষা না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাদ্বারা বিভাগ করিলে যাহা যাহা হয়, তাহাই তাহার দ্বারা কণ্ঠস্থ করান, তাহাহইলে সে উপদেশ অনর্থক হইবে। যে নীতিশাস্ত্রে ঐরূপ মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মূলমন্ত্র ব্যাখ্যা না করিয়া, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যের বর্ণনা মাত্র করেন, সে নীতিশাস্ত্রও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

আর্য্য-ঋষিরা কেবল মানবের কতকগুলি কর্ত্তব্য বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা মানবজীবনের কর্ত্তব্যের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমিত্বের প্রসারই সর্ব্বকর্ত্তব্যাবধারণে সেই ঋষিহৃদয়-প্রসূত মূলমন্ত্র। যখন আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হয়, তখন আত্মায় সর্ব্বভূত-দর্শন এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং তখনই মানব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। নিকৃষ্ট চণ্ডাল হইতে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত, নবীন ব্রহ্মচারী হইতে স্থবির ভিক্ষুপর্য্যন্ত, সকলের জীবনের সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্যের মূলতত্ত্ব আমিত্বের প্রসার। ভাগের সাধারণ নিয়ম যেরূপ সর্ব্বপ্রকার ভাগেই প্রযোজ্য, কর্ত্তব্যের এই মূলতত্ত্বও সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যেই প্রযোজ্য। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে এই মূলতত্ত্বের দ্বারা কর্ত্তব্যাবধারণ করিলে, কাহারও জীবন দুঃখময় হইবে না, কর্ত্তব্যাবধারণে কাহারও সংশয়-চিত্ত হইতে হইবে না। এ তত্ত্ব অতি সহজ ও সুগম। এ নিকষ-পাষাণে কর্ত্তব্যের রেখা অতি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। এ দিগ্‌-নির্ণয়-যন্ত্র কখনও তোমাকে বিদিকে লইয়া যাইবে না। তোমার জ্ঞানানুসারে সকল কার্য্যেই তোমাকে কর্ত্তব্যের বিষয়ীভূত কর, তোমার আমিত্ব তোমারি কর্ত্তব্যের বিষয়ীভূত আমিত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত কর, তাহাহইলেই তোমার কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি তোমার সর্ব্ব-অবস্থাতেই নিজের "আমির" প্রতি সত্য সত্য যেরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর, তদ্রূপ ব্যবহার অপরের "আমির" প্রতিও কর, তাহাহইলেই তোমার কোন গণ্ডগোলে পতিত হইতে হইবে না।

জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্ব্বিশেষে জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য অবধারণের পথে আমিত্বের প্রসারই সাধারণ আলোক-বর্ত্তিকা; কিন্তু এই আমিত্বের প্রসারজনিত কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্ত অবশ্য কর্ত্তার জ্ঞানাধিকারের অনুপাত-ভেদে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; তবে কি না, সাধনার একজাতীয়তায় স্বার্থ-ত্যাগ ও পরার্থ-অনুরাগ দ্বারা আত্মপ্রসার বা আত্মোন্নতির অবশ্য-অলঙ্ঘনীয় পথ সকলেরই ন্যূনাধিকরূপে পবিত্র হইবে। অধিকার-ভেদে কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্তে বিশুদ্ধতা পক্ষে আকাশ-পাতাল ভেদ হইলেও একমাত্র আমিত্বের প্রসারই সর্ব্বাধিকারী ধর্ম্মলাভের সাধারণ সাধন বটে।

এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই আপনাকে কর্ত্তব্যে বিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে স্থাপিত করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সুবিস্তৃত সুযোগ পাওয়া যায়, এইজন্যই ঋষিগণ মানবজীবনে বিকাশের জন্য ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আশ্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলপ্রকার অধিকারী ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদনদ্বারা আমিত্বের প্রসার করিতে পারে। এই আশ্রমেই নিম্ন-অধিকারী উচ্চ-অধিকারীদিগের সংস্রবে আসিয়া, আপনাদের "আমিত্বের প্রসারের" সহিত তাহাদের "আমিত্বের প্রসার" তুলনা করিয়া, আপনাদিগকে ঊর্দ্ধদিকে লইতে সমর্থ হয়।

স্থানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রভু-ভৃত্য, মিত্র-মিত্র প্রভৃতি পরস্পরের সংস্রবে আসিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগের আমিত্বের প্রসার করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে মানব! তুমি যদি তোমার নিজের ও জগতের মঙ্গলকামনা কর, তাহাহইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আমিত্বেরপ্রসার-শিক্ষায় জ্ঞান-তপস্যা সাধন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমেও আমিত্বের প্রসাররূপ মূলমন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম-তপস্যা দ্বারা ঐ জ্ঞানের পরিপাক বা পরিণতি-লাভে জীবন কৃতার্থ কর।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

চিত্তানুশাসনম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৌমারাদাচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥ ১॥

(প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন, হে দৈত্যবালকগণ!) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুমার-অবস্থাতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে,

---

"কৌমার" অর্থাৎ কুমারাবস্থা, কারণ কুমারাবস্থাতেই যে মৃত্যু হয়, কে বলিতে পারে? তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে—

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুবেব ভবিষ্যতি॥"

মনুষ্যের দৈহিক অসারতা চিরপ্রসিদ্ধ—

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥"

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনপ্রণীত স্মৃতৌ শুদ্ধিতত্ত্বে শোকাপনোদনাদি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিধৃতবচনং

এইরূপ কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার দেহের পরিণাম [illegible]ন করিয়া যদি মনুষ্য কুমারাবস্থায়ই ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাহইলে তিনি প্রাজ্ঞ; সুতরাং "প্রাজ্ঞ"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ভাগবত ধর্ম্ম" অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি,—যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অ, ১৯)

প্রহ্লাদ কহিয়াছিলেন, পিতঃ! বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নববিধ ভক্তি যদি বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, (তাহাহইলে তাহাই উত্তম পাঠ)।

এই নববিধ ভক্তিতে কে কোন্ বিষয়ে অনুরক্ত, তাহাই উক্ত হইতেছে।—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥

শ্রীরূপগোস্বামি-সংগৃহীত পদ্যাবল্যাং।

শ্রীবিষ্ণুর লীলাশ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পদভজনায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু, বন্দনায় অক্রূর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন ও সর্ব্বস্ব-নিবেদনে বলি (সিদ্ধ) হইয়াছিলেন। এই নববিধ ভক্তির একমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"দুর্লভ" কারণ চতুরশীতিলক্ষ জন্মলাভের পর মনুষ্য-জন্মলাভ হইয়া থাকে, যথা—

"প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥
অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং॥"

ক্রমসন্দর্ভধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবচনং

যেহেতু মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, উহা অর্থদ, কিন্তু অনিশ্চিত ॥ ১ ॥

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণং ।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ২ ॥

এই জন্মে পুরুষের বিষ্ণুর পাদসেবাই কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি সর্ব্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ ॥ ২ ॥

"বিবুধেপ্সিত" দুর্লভতর মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি গোবিন্দ আশ্রয় না করে, সে আত্মাকে বঞ্চিত করে। জীবজাতিতে ৮৪ লক্ষবার ভ্রমণ করিয়া জন্ম-পর্য্যায় ক্রমে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। যে মূর্খ আত্মাভিমানী হইয়া গোবিন্দ-পদদ্বয় আশ্রয় না করে, তাহার সেই দুর্লভ জন্ম বিফলে যায়।

দুর্লভের আরও কারণ—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহধীরঃ।
তূর্ণং যতেতনপতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
১১ স্কন্ধে ৯ অ, ২৯।

[ইহার বঙ্গানুবাদ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের শেষ-সংখ্যার ১৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে, আরও শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে]

লব্ধ্বা জনোদুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি
গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥

মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন হে অনঘ! মনুষ্য বিনাযত্নে অবিকলাঙ্গ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও অসন্মতি (অসৎ—অর্থাৎ বিষয়-সুখে মতি) হইয়া যদি তোমার পদারবিন্দ না ভজনা করে, তাহাহইলে সে পশুর ন্যায় গৃহান্ধকূপে পতিত থাকে।

"অধ্রুবং" কারণ অদ্য বর্ত্তমানত্বেঽপি তস্য শ্বঃ স্থিতৌ নিশ্চয়াভাবাৎ—অদ্য বর্ত্তমান থাকিলেও কল্য থাকিবার নিশ্চয়তা নাই।

"অর্থদ" কারণ ভক্তিমান ব্যক্তি মুহূর্ত্তমাত্রও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে—

সাহানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সাচান্ধ্যজড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ২৩৪ অধ্যায়ে ও স্কন্দ পুরাণীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যধৃতবচনং।

যে মুহূর্ত্তে বা যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা না করা যায়, তাহা হানি, তাহা মহচ্ছিদ্র, তাহা অন্ধতা, তাহা জড়তা, তাহা মূকতা।

"পাদোপসর্পণং" = পাদয়োরুপসমীপে সর্পণং প্রাপ্তি,—পদের নিকট গমন—অর্থাৎ পাদসেবা। শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা কর্ত্তব্য। নন্দাদি গোপগণ উদ্ধব-সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে কহিয়াছিলেন,—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥
শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অঃ ৬৬।

আমাদের মনের বৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হয়; আমাদের বাক্য যেন তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও আমাদের শরীর যেন তাঁহার প্রণামাদিতে রত হয়।

এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন যে—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥
মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রের সমান ॥
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম ॥
কৃষ্ণ কর-পদতল কোটীচন্দ্র সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউ সেই ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥

"প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ" অর্থাৎ কান্তভাব, শান্তিভাব, দাস্যভাব, সখ্যভাব প্রভৃতি যে যেভাব

পাইতে ইচ্ছা করে, তিনি তার সেই ভাবেই প্রাপ্য; এ বিষয়ে গীতাতেও বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

৪ অধ্যায়ে ১১ ॥

যে যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করি। এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১অ ২৯ শ্লোকে—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—হে বিভো। কাম হইতে গোপাঙ্গনাগণ, ভয় হইতে কংস, বিদ্বেষ হইতে শিশুপালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধবশতঃ বৃষ্ণিগণ, স্নেহবশতঃ তোমরা ও ভক্তিবশতঃ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্ত্রীলোকের সহিত এ লীলা কেন করিয়াছিলেন? এ লীলা সমীচীন নহে। তাঁহাদিগের সন্দেহ জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা কৃষ্ণলীলাকে গল্প বিবেচনা করিনা, কেবল তজ্জন্য আধ্যাত্মিক ক্লিষ্টার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিব না। আমরা মানি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণঅবতার ছিলেন। কংসাদি পীড়িত-ভূভার-হরণে দেবতাদিগের প্রার্থনায় বসুদেব-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।

জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুমরস্ত্রিয়ঃ॥

শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধ, ১ অ, ১৭।

ব্রহ্মা দেবতাগণকে কহিয়াছিলেন—হে অমরগণ। বসুদেবগৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার প্রিয়ার্থ অমরস্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই অমরস্ত্রীগণ ব্রজের গোপিনী যথা—

নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ।

তাসাং গোপীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে॥

উজ্জ্বল নীলমণেঃ কৃষ্ণবল্লভ প্রকরণে।

নিত্য প্রিয়জনের অংশ—যাঁহারা দেবযোনি হইয়া ছিলেন, তাঁহাদের অংশ সকল ব্রজে প্রিয়সখীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ নিত্য সিদ্ধপুরুষ ও স্ত্রী কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না; সুতরাং ঐরূপ লীলাকে রূপক বলিলে আমরা মর্ম্মাহত হই। তাহাহইলে যেন পৃথিবীর সমুদয় সুখ-হারা হই, ঐরূপ বিবেচনা হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস, বর্ণনা করিব। ভগবান্ ব্যাসদেবের বাক্য বিশ্বাস না করা আয়ত্তাধীন বটে।

"অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।

বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর॥"

ব্রজলীলার তুল্য উৎকৃষ্ট লীলা আর নাই। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রস আর নাই।

ব্রজলীলায়——

"পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।

মধুররস শৃঙ্গার নাম সবাতে প্রাবল্য॥"

ঐ ২৩ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশতঃ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ ত্বগসৃক্‌মাংসমেদাস্থিমজ্জা-শুক্র-নির্ম্মিত সপ্তধাতুময় নহে; উহা চিন্ময়।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।

আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অঃ ১১।

ইহার শ্রীধরস্বামী এইরূপ টীকা করেন—

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধঃ।"

বিশ্বাত্মা ভক্তদিগের অভয়প্রদ ভগবান্ অংশের সহিত—অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ভাগের সহিত—অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন; জীবগণের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ছিল না।

এই দেহ যে কি, যখন আমরা ধারণা করিতে পারি না, তখন তাঁহার লীলার বিষয়ে বৃথা তর্ক করা কি আমাদের মূর্খতা নহে?

মহর্ষি দ্বৈপায়ন—যিনি বেদবিভাগ, বেদান্তদর্শন, মহাভারত, অষ্টাদশপুরাণপ্রভৃতি রচনা করিলেন, যিনি সপ্তদশ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ-পর্ব্বে—৪ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যাবতার, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের বিষয় ও অন্যান্য ভবিষ্যৎবর্ণনা করিয়াছেন, যিনি কলিকালে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবে, বর্ণন করিলেন—

ততশ্চানু দিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমাদয়া।

কালেন বলিনা রাজন্নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ॥

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচার গুণোদয়ঃ।
ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেবহি॥

+ × × ×

শ্রীভাগবতে ১২ স্কন্ধে ২ অ,

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অনন্তর বলবান্ কালদ্বারা প্রতিদিন ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি হ্রাস হইবে।

কলিকালে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার, গুণাদি সমস্তই কেবল ধনের উপর নির্ভর করিবে ও ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে কেবল বলমাত্র কারণ হইবে; ইত্যাদি।

অন্যত্র—

অনাবৃষ্টি ভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগণাশক্তদৃষ্টয়ঃ॥ ২১॥

× + +

বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্ম বৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি॥ ৩৯॥

× + +

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ১ অ,

পরাশর মৈত্রেয়কে কহিলেন—কলিকালে প্রজা সকল অনাবৃষ্টি-ভয়যুক্ত ও ক্ষুধার ভয়ে কাতর হইবে ও সেই সময়ে গগণের প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইবে।

বেদমার্গ লোপ হইলে, লোক সকল পাষণ্ড হইবে ও লোকের অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে ও স্বল্পআয়ু হইবে।

অন্যত্র,—

একাদশী বিহীনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতাঃ।
হরিপ্রসঙ্গবিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং॥ ১৭॥

+ ÷ ÷

ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণিবিহায় চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে।

সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং।
অভক্ষ্য ভক্ষ্যা লোকাশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ॥
সর্ব্বে স্বচ্ছন্দনিরতাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
দেবাবতার-হীনঞ্চ জগৎ সর্ব্বং ভয়াকুলং॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে।

সকলে একাদশী বিহীন ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইবে ও হরিপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইবে।

নিজ শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠ করিবে। সকলের সঙ্গে নিয়মচ্যুত-ভোজন হইবে। সমুদায় লোক অভক্ষ্য-ভক্ষক হইবে ও চতুর্ব্বর্ণ লম্পট হইবে। সকলে স্বেচ্ছাচারী ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে সমুদায় জগৎ ভয়াকুল ও দেবাবতারহীন হইবে ইত্যাদি কলিকালের অনেক ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাঁহার সামান্য বুদ্ধিতে কি এভাব প্রবেশ করে নাই যে, এরূপ বর্ণনা করিলে, লোকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অশ্রদ্ধা করিবে? তিনি জানিতেন, তজ্জন্য পরীক্ষিতের মুখে কহিয়াছেন যে,—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ ২৭॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধিসুব্রত॥ ২৮॥

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অঃ।

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্ম-শান্তির জন্য ভগবান্ জগদীশ্বর অংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা হইয়া, কি প্রকারে পরদারাভিমর্ষণরূপ বিপরীত কার্য্য করিলেন? যদুপতি আপ্তকামী হইয়া কিপ্রকারে এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করিলেন? ইহার অভিপ্রায় কি? হে সুব্রত! আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব উত্তর দিয়াছিলেন,—

তিনি আপ্তকাম ছিলেন, গোপাঙ্গনাগণের সহিত লীলাতে তাঁহার কোন কামের লেশ ছিল না, কারণ—

"সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ।"

১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়, ২৬।

ইহাতে শ্রীধরস্বামী কহেন—

"এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ"।

আত্মাতে অবরুদ্ধ সৌরত—অর্থাৎ চরম ধাতু স্খলিত না হইয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রমণ করিতেন, ইহাতে কামজয়োক্তি হইল। বৃন্দাবন কৃষ্ণময় ছিল। বৎস, গাভী, গোপ ইত্যাদি যাহা ছিল, সমুদায়ই কৃষ্ণময়, কারণ যখন ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ—

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্য্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরং।

যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপোবভৌ ॥১৬॥
১০ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।

বৎস পালক ও বৎসগণের যেরূপ ক্ষুদ্র প্রমাণ শরীর, যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি, যেরূপ, যষ্টি, যেরূপ শৃঙ্গ (শিঙ্গা বাদ্য) বেণুদল-শিক্য, যেরূপ ভূষণ ও বস্ত্র, যেরূপ ভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, যেরূপ বিহারাদি, সেরূপ হইয়া, সমুদয় জগৎ বিষ্ণুময়, এইযে প্রসিদ্ধ বাক্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, সে সময়ে উঁহাদের মাতৃগণের নিজ পুত্রাপেক্ষা কৃত্রিম পুত্রে অধিক স্নেহ হইয়াছিল।

গো-গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরে স্তোকতা মায়য়া বিনা ॥
ঐ ঐ ২২।

গো-গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপতি মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু এক্ষণ স্নেহাধিক্য হইয়াছিল ও গো গোপীতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববৎ বাল্যভাব ছিল, কিন্তু মায়া ব্যতিরেকে ছিল "অর্থাৎ আমার এই মাতা" "আমি ইহার পুত্র" এক্ষণে এইরূপ অধিক মায়া হইল।

যদি শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, তাহাহইলে তিনি কি গোপ ও গোপাঙ্গনা হইতে পারিতেন না? এই কল্পিত গোপাঙ্গনাকে গোপগণ নিজস্ত্রী মনে করিতেন। গোপগণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহার বিরত হইয়া সেই আপনাপন স্ত্রীগণকে নিজপার্শ্বস্থাই দৃষ্টি করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করেন নাই, কারণ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭॥
ঐ ঐ ৩৩ অ,

যোগমায়া নিজমায়া বিস্তার করিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে গোপগণের নিকট থাকিতে দিতেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য জন্য যে ব্রজাঙ্গনারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে—

"ন যাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ"
উজ্জ্বল নীলমণৌ-কৃষ্ণবল্লভ প্রকরণে।

ব্রজদেবীদিগের পতির সহিত সঙ্গম হয় নাই। ইহাই মূল উদ্দেশ্য, তবে বাহ্যিক যে পরপুরুষ ও পরস্ত্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ত্রিলোককে মায়ারূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অকার্য্য কি কিছু আছে? যাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিতেছি, সে জীব সহিত কি তিনি রমণ করেন না? তিনিত আত্মারাম, তিনি কোন্ জীবে বর্ত্তমান নাই, বুঝিতে পারি না। সেই মায়াময় হরির কার্য্য কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলে, মন যে কি অসীম বিস্ময়-নীরে নিমগ্ন হয়, তাহা স্থির করা দুর্ঘট। সে সময় যেন আমরা সৃষ্টির বহির্ভূত জীব—সে সময় আমরা যেন আমাদের অস্তিত্ব-হারা হই।

গোপাঙ্গনাদিগের পরাভক্তি ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা সাক্ষাৎ চিন্ময়দেহকে কান্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিত! যাহাকে ব্রহ্মাদি দেবতগণও ধ্যানে অনুধাবন করিতে পারেন না, সেই দেবদেবকে যদি ব্রজাঙ্গনাগণ সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করেন, তাহাহইলে তাহা অপেক্ষা আর জীবনের সার্থকতা সাধনের অবশিষ্ট কি থাকিল? বরং রুক্মিণ্যাদি অপেক্ষা গোপাঙ্গনাদিগের ভক্তি অধিক, কারণ রুক্মিণী প্রভৃতির অন্যান্য স্থানে বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ কুমারী অবস্থা হইতেই কেবল কৃষ্ণকে পাইবার জন্য বিশেষ তপস্যা করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥
১০ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে, তখন লজ্জাদি পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, তাঁহাকে কখনই পাওয়া যাইবে না,—কারণ,—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমং।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

তজ্জন্য তাঁহাদিগের ভক্তি জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রা হইতে কহিয়াছিলেন। অন্য কামোদ্দেশ্যে নহে, কারণ তিনি কহিয়া ছিলেন,—

নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতাধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥ ২০ ॥
১০ স্ক, ২২ অ,

হে সুন্দরীগণ। যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত ন্যস্ত করে, তাহার কামনা বিষয়ভোগ জন্য কল্পিত হয় না, কারণ ধান্য ভর্জ্জিত ও কথিত হইলে, তাহাইতে আর অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না; সুতরাং যিনি অখিল সত্ত্বের অধীশ্বর, তাঁহার অকার্য্য কি হইল?

কুশলাচরিতৈরেষামিহ চার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণবানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥ ৩২॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্ মর্ত্ত্য দিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥ ৩৩॥

১০ স্ক, ৩৩ অ,

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে প্রভো! নিরহঙ্কারী ব্যক্তির সৎকার্য্যদ্বারা কোন অর্থ হয় না ও অসৎ কর্ম্মদ্বারাও কোন অনর্থ সম্ভাবনা নাই।

যদি তাহা হইল, তবে যিনি অখিল জীবের ও তির্য্যক্ মনুষ্য-দেবতাদিগের ও অন্যান্য ঈশিতব্যের ঈশ্বর, তাঁহার আর কুশল-অকুশল সম্ভব কোথায়?

তিনি গোপীদিগের ও তৎপতিদিগের ও সকল দেহীর অন্তরে বিচরণ করেন; তিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী তিনি আমাদের ন্যায় শরীরধারী নহেন,—তিনি লীলার জন্য শরীর ধারণ করিয়াছিলেন।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্॥

১০ স্ক, ৩৫ অ,

ইহাতেও যদি দোষানুসন্ধান করি, তাহাইলে আমরা পাপভাক্,—তজ্জন্য নিষেধও করিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥

১০ স্ক, ৩৫ অ,

অনীশ্বর—অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র মনেও এরূপ আচরণ করিবেন না। যদি মূঢ়তাবশতঃ আচরণ করে, তাহাইলে নাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ মহাদেব বিষ পান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

ব্রজাঙ্গনাদিগের মহাভাব দর্শন করিয়া উদ্ধবও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণরেণু-সেবী গুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহংস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥

১০ স্ক, ৪৭ অ, ৬১।

এই ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের কোন গুল্ম লতা-ওষধির মধ্যে হই, যেহেতু ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণের পদবী ভজনা করেন।

তজ্জন্য গোপীদিগের জীবনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথা-রসস্য॥

১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৮।

এই গোপবধূদিগের জন্মই সফল, যেহেতু ইঁহারা অখিলাত্মা গোবিন্দে পরমপ্রেমবতী হইয়াছেন; যে প্রেমকে সংসারভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও বাঞ্ছা করেন ও আমরা ভক্ত হইয়াও বাঞ্ছা করি। যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ কথারসে অনুরাগ আছে, তাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্মের আবশ্যক কি?

ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে রতির লাভ এই যে, তাঁহাদের অশেষ কর্ম্মক্ষয় হইয়া, তাঁহারা পাপপুণ্যরহিত হইয়াছিলেন—

দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

১৯ স্কন্ধ ২৯ অ,

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে রাজন্! দুঃসহ প্রিয় বিরহজন্য তীব্রতাপে গোপাঙ্গনাগণের সমুদায় অশুভ বিগত হইয়া গেল এবং ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সমুদায় পুণ্যও ক্ষয় হইয়াগেল। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও গোপললনাকুল উপপতি ভাবিতেন, তথাপি ধ্যানযোগে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালের সুখ-দুঃখের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মক্ষয় হওয়াতে, কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া গুণময়—অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। (কিন্তু চিন্ময়দেহে বর্ত্তমান থাকিলেন)।

ইহাতে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়ামুনে।
গুণপ্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং॥

মুনে! গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ কান্ত বলিয়া জানিত,—ব্রহ্মজ্ঞান করিত না। গুণের প্রতি

াঁহাদের চিত্ত আসক্ত ছিল, তাহাহইলে কি প্রকারে াঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপরতি হইয়া, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ইল?

ইহাতে শুকদেব উত্তর দেন—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

ঐ ২৯ অধ্যায়ে।

হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল যেরূপে মুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যদি শত্রুরাও মুক্তিলাভ করে, তাহাহইলে যে তাঁহার প্রিয়জনও মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীকৃষ্ণে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ কিম্বা ভক্তি, যে কোন ভাবের আবেশেই তন্ময়তাপ্রাপ্তি হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহা বিস্ময় জ্ঞান করিবেন না,—কারণ তিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্থাবরাদিও মুক্তিলাভ করে।

বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল মুক্তিলাভ করিল!
বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিংপুনস্তৎপরায়ণঃ॥

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৫ অধ্যায় ১৯।

তাহাহইলে গোপাঙ্গনাগণ কামাসক্তা হইয়া কেন মুক্তিলাভ করিবেন না?

এই লীলা ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহজন্য মাত্র।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাং শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥'

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৩৩ অ,

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহজন্য মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন ও তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য তৎপর হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি— হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১২ অধ্যায়ে

ধ্রুব কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! তুমি সকলের আধার; তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ, এই তিন প্রকার শক্তি আছে।

হ্লাদিনী অর্থ আহ্লাদকরী, সন্ধিনী অর্থ উপকরী ও সম্বিৎ অর্থে বিদ্যাশক্তি। অর্থাৎ হ্লাদিনী অর্থে আনন্দ, সন্ধিনী অর্থে সৎ ও সম্বিৎ অর্থে চিৎ—সচ্চিদানন্দ।

এই হ্লাদিনীশক্তিই রাধা। ব্রজলীলায় এই হ্লাদিনীশক্তিই কার্য্যকর্ত্রী। ইহার ভাব অতি গূঢ়। ভক্ত ব্যতিরেকে অন্যে ইহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য— অনুদিন ঐ লীলা হইয়া থাকে—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ ৪॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনা সুরবিঘাতনং॥ ৫॥
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ ৬॥

÷ ÷ ÷ ÷ +

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—৮৩ অধ্যায়ে।

ভক্ত হইলেই এই লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পদ্যানুবাদ-মালা।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মনীতি। *

ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহী হবে ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ।
করিবে স্বকৃতকর্ম্ম সব ব্রহ্মে সমর্পণ॥ ১॥
না কহিবে মিথ্যা কথা, না লইবে শঠ-ব্রত।
দেবাতিথি-সেবাদিতে সদা গৃহী হবে রত॥ ২॥
পিতা-মাতা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ-দেবতা জেনে,
সেবিবে সর্ব্বতোভাবে সদা গৃহী সযতনে॥ ৩॥
হে শিবে! পার্ব্বতি! যদি পিতা মাতা প্রীত রন,
তুমি তাহে প্রীতা দেবি! প্রীত ব্রহ্মসনাতন॥৪॥
তুমি আদ্যে! জগন্মাতা, পিতা পরব্রহ্ম হন,
গৃহীর তপস্যা মাত্র তোমাদের সন্তোষণ॥ ৪॥
আসন-শয়ন-বস্ত্র, ভোজ্য ও পানীয় আর,
যোগাবে সময়মত সেবার্থে পিতা-মাতার॥ ৬॥
মৃদুবাক্য কবে সদা, করিবে প্রিয় সাধন,
পিতৃ-আজ্ঞাকারী হবে সৎপুত্র কুলপাবন॥ ৭॥
ঔদ্ধত্য ও পরিহাস, তর্জ্জন, পরিভাষণ,
না করিবে পিতৃঅগ্রে আত্মহিতকামীজন॥ ৮॥
মাতা-পিতা দেখি, নমি, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইবে;
পিতৃশাসনেতে থেকে আজ্ঞা বিনা না বসিবে॥৯॥
বিদ্যা-ধন-মদে মাতি পিতৃ হেলা যেবা করে,
সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত সে যায় নরক-ঘোরে॥ ১০॥

ত্যজি পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আদি,
না ভুঞ্জিবে গৃহী কভু, কণ্ঠাগত-প্রাণ যদি॥ ১১॥
গুরু-বন্ধু বঞ্চি যেবা স্বোদর-পূরণকামী,
ইহলোকে নিন্দিত সে, পরত্রে নরকগামী॥১২॥
ভার্য্যাকে রক্ষিবে গৃহী, পুত্রে দিবে বিদ্যাধন,
পালিবে আত্মীয়-বন্ধু, এই ধর্ম্ম সনাতন॥ ১৩॥

উৎপত্তি পিতায়, বিবৃদ্ধি মাতায়,
স্বজনে শিখায় স্নেহে;
এ সবে যে জন না পালে, সে জন
নরাধম নরদেহে॥ ১৪॥
ওহে মহেশ্বরি! শত কষ্ট করি
এঁদের তরে গ্রহণ,
যথাশক্তি মত তোষিবে সতত,
এই ধর্ম্ম সনাতন॥ ১৫॥
সত্যপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জন
হন এ জগতে যিনি,
তিনি ধন্য অতি, তিনি লোকে কৃতী,
পরমার্থবিৎ তিনি॥ ১৬॥
ভার্য্যাকে তাড়না, কভু করিবেনা,
মাতৃবৎ (১) পালিবে সদা;
ঘোর কষ্টেতেও ত্যাগ নহে শ্রেয়;
যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥ ১৭॥
স্বদার-নিরত হবে বিদ্যাব্রত;
বিকার-চঞ্চল-চিতে—
কভু পরাঙ্গনা স্পর্শ করিবে না,
নারকী হইবে তাতে॥ ১৮॥
বাস-শয়নাদি না করিবে সুধী
বিরলে পরস্ত্রী সনে।

---

* মহাদেব পার্ব্বতীকে এই সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও সুসম্পন্ন অপূর্ব্ব গৃহ-ধর্ম্ম-নীতি শুনাইয়াছেন। গৃহস্থের গৃহাশ্রমের অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন শিক্ষারই ইহাতে অভাব নাই। গৃহী মাত্রেরই ইহা স্মৃতিস্থ ও ধৃতিস্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুপত্রিকায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই অত্যুপকারী অংশটি মূল ও বঙ্গব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছিল; এবার কণ্ঠস্থ রাখার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পদ্যানুবাদ-মালায় সেই মূলেরই যথাসাধ্য-কৃত অবিকল বঙ্গ-পদ্যানুবাদ গ্রথিত হইল। বঙ্গীয় গৃহীপাঠক দেবদেবের এই প্রসাদ গ্রহণে উপকৃত হউন, দেবদেব-চরণে ইহাই প্রার্থনা।

(১) "মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" (মূল) হিঃ সঃ

অযুক্ত ভাষণ, শৌর্য্য-প্রদর্শন,
না করিবে নারীজনে ॥ ১৯ ॥
শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রিয়বাক্য-ধন-বস্ত্র অলঙ্কারে,
তোষিবে ভার্য্যাকে গৃহী সদা প্রিয় ব্যবহারে ॥২॥
উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, পর নিকেতনে।
পত্নী না পাঠাবে প্রাজ্ঞ পুত্রামাত্য-সঙ্গী বিনে ॥২১॥
যে মানবে মহেশানি! পতিব্রতা প্রীতা রয়,
সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধ তার, নিশ্চিত সে প্রিয় হয় ॥ ২২ ॥
পিতা চারিবর্ষ পুত্রে লালিবে পালিবে;
ষোড়শ পর্য্যন্ত গুণ-বিদ্যা শিখাইবে ॥ ২৩ ॥
বিংশবর্ষ-প্রাপ্ত-পুত্রে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিবে।
পরে তারে সমযোগ্য জেনে স্নেহ প্রদর্শিবে ॥২৪॥
কন্যাও সুপালনীয়া—শিক্ষণীয়া সুযতনে,
অর্পণীয়া সুবিদ্বানে ধনবস্ত্র আদি সনে ॥ ২৫ ॥
এইরূপে গৃহী ভ্রাতা-ভগ্নী-ভ্রাতৃসন্ততিরে,
পালিবে তোষিবে তথা জ্ঞাতি-মিত্র-ভৃত্যাদিরে ॥২৬
অপিচ--স্বধর্ম্মী আর স্বদেশ-নিবাসী জনে,
পালিবে গৃহস্থ তথা অভ্যাগতে—উদাসীনে ॥ ২৭।
বিভব সত্ত্বেও গৃহী হেন না আচরে যদি,
হে দেবি! সে পশুগণ্য, পাপিষ্ঠ, নিন্দিত অতি ॥২৮
নিদ্রালস্য, দেহ-যত্ন, কেশের বিন্যাস আদি,
অশন-বসনে তথা না হবে আসক্ত অতি ॥২৯॥
মিতাহার-নিদ্র হবে, মিতবাক্- মিতমৈথুন,
স্বচ্ছ-নম্র-শুচি দক্ষ-সর্ব্বকর্ম্মসুনিপণ ॥ ৩০ ॥
[illegible]তে হইবে শূর, নম্র বন্ধু গুরুজনে,
না দিবে ঘৃণিতে মান, অপমান মানীগণে ॥ ৩১ ॥
[illegible]রের প্রকৃতি, রীতি, প্রবৃত্তি ও ব্যবহারে,
[illegible]ঙ্গ-তর্কে জেনে, পরে বিশ্বাস করিবে তারে ॥৩২
[illegible]দ্ধিমান্ যথাকালে ক্ষুদ্র অরিকেও ডরি,
দেখাইবে স্বপ্রভাব, ধর্ম্মে না লঙ্ঘন করি ॥ ৩৩ ॥
[illegible]জ্ঞ না প্রকাশিবে স্বযশ-পৌরষ, আর—
[illegible]ত-পর গুপ্তকথা, কৃত পর-উপকার ॥ ৩৪ ॥
[illegible]ন্মী কুবুদ্ধি-বশে ধ্রুবপরাজয় জেনে,
[illegible] করিবে তর্ক বাদ লঘু কিম্বা গুরু সনে ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম, সযতনে উপার্জ্জিবে,
ব্যসন, অসাধু-সঙ্গ, মিথ্যা-দ্রোহ বিবর্জ্জিবে ॥৩ ॥
অবস্থা-অধীন চেষ্টা, কালাধীন ক্রিয়া যত,
কাল ও অবস্থা বুঝে, তাই কর্ম্মে হবে রত ॥৩৭॥
হবে যোগ-ক্ষেম-রত, প্রিয়বন্ধু-ধর্ম্মব্রত;
মিতবাক্য-হাস হবে—মান্যজনে বিশেষতঃ ॥৩৮॥
বিজিত-ইন্দ্রিয়গ্রাম, সুপ্রসন্ন-আত্মবান্,
সুচিন্ত ও দৃঢ়ব্রত হবে;
দূরদর্শী অপ্রমত্ত হইয়া, বিষয়-তত্ত্ব
ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিচারিবে ॥ ৩৯ ॥
সত্য মৃদু প্রিয়-ধীর-হিতকর বাক্য কবে।
আপন প্রশংসা আর পরনিন্দা তেয়াগিবে ॥৪০॥
জলাশয়, বৃক্ষ, পথ, সেতু ও বিশ্রামাগার।
যেবা করে প্রতিষ্ঠিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪১॥
পিতা-মাতা প্রীত—আর বন্ধু বশীভূত যার,
লোকে যার যশ গায়, লোকত্রয় জিত তার ॥৪২॥
সত্যই যাহার ব্রত, দীনে যেবা দয়াধার,
কাম-ক্রোধ বশে যার, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৩
পরস্ত্রী বিরাগ—পরবস্তুতে নিস্পৃহ যার,
দম্ভ-হিংসাহীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৪॥
না ডরে সমরে—রণ-বিমুখতা নাহি যার,
ধর্ম্ম-যুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৫ ॥
অসন্দিগ্ধ-শ্রদ্ধাবান্ যেবা শান্ত-সদাচার,
যে মম শাসনে স্থিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৬॥
যে জ্ঞানী সর্ব্বত্র রাখি সমদৃষ্টি আপনার,
লোকযাত্রা-কর্ম্ম করে, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৭
বাহ্যান্তর-ভেদে দেবি! দ্বিবিধ শৌচ-সাধন,
আন্তরিক শৌচ হয় ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ ॥ ৪৮ ॥
জলাদি-ভস্মাদি দ্বারা মলাদি করিয়া ক্ষয়,
দেহের যে শুদ্ধি হয়, বহিঃশৌচ তারে কয় ॥৪৯॥
গঙ্গা-নদী-হ্রদ-বাপী-কূপ-ক্ষুদ্রজলাশয়,
গঙ্গাদি-ক্রমেতে প্রিয়ে! শুদ্ধিকর সমুদয় ॥ ৫০ ॥
হে সুব্রতে! যজ্ঞ-ভস্ম,নির্ম্মলমৃত্তিকা, আর—
বাসাজিন, তৃণ জেন শুদ্ধিকর সে প্রকার ॥ ৫১ ॥

কিম্বা শৌচাশৌচ-বিধি বেশি বলা বৃথা শিবে!
মনঃপূত যাতে হয়, তাই গৃহী আচরিবে ॥ ৫২ ॥
নিদ্রান্তে ও মৈথুনান্তে—আর মল-মূত্র ত্যজি,
ভোজনান্তে, মল-স্পর্শে, বহিঃশৌচে হবে শুচি ॥৫৩
ত্রিকালিক সন্ধ্যাহ্নিক বৈদিক-তান্ত্রিকমত,
উপাসনা-ভেদে পূজা করিবেক যথাযথ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৬।

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিং ন কার্য্যং কিং বা বিধেয়ং বিদুষাং প্রযত্নাৎ। স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মঃ সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৬)—সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের কি অকর্ত্তব্য? এবং (৪৭)—কি কর্ত্তব্য?

গুরুর উত্তর—স্নেহ এবং পাপ অকর্ত্তব্য। পাঠ ও ধর্ম্ম কর্ত্তব্য।

অকর্ত্তব্য—স্নেহ।

"সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমাস্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাৎ বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা" ॥

প্রেম (ভালবাসা) গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে, তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না। অতএব—

যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং ॥
(গরুড়পুরাণ)

যেখানে স্নেহ (প্রগাঢ় ভালবাসা) সেইখানে ভয়, স্নেহ দুঃখের আধার এবং স্নেহ সমস্ত ক্লেশের কারণ। মনুষ্য স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে মহৎ সুখ লাভ করিতে পারে। অতএব স্নেহ অকর্ত্তব্য।

স্নেহের মোক্ষ-প্রতিবন্ধকতা।

স্নেহেন যুক্তস্য নচাস্তি মুক্তিরিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ। (যুধিষ্ঠির বাক্য)

ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, স্নেহযুক্ত ব্যক্তি—অর্থাৎ যাহার চিত্ত দারাপত্যাদি বিষয়ে স্নেহপ্রবণ, সেই ব্যক্তি কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।

"অনিত্যেষু পদার্থেষু যস্তু রাগী চরেন্নরঃ।
তস্য সংসার ব্যুচ্ছিত্তিঃ কদাচিন্নৈব জায়তে" ॥
(নারদীয় পুরাণ)

"জীবন্মুক্তো গতস্নেহঃ সস্নেহো বদ্ধউচ্যতে" ॥

যে ব্যক্তি অনিত্যবস্তুতে অনুরক্ত হইয়া—অর্থাৎ অনিত্যবস্তু সকলকে ভালবাসিয়া সংসারে বিচরণ করে, কোনকালে তাহার ভববন্ধন মোচন হয় না। একারণ যিনি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ; আর যিনি স্নেহযুক্ত, তিনিই বদ্ধ—অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—রাজর্ষি ভরত ভগবান্ হরির আরাধনার (১) নিমিত্ত অঙ্কগত সুহৃ-

---

(১) "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥"
(গীতা, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥" (গীতা)

"অসারভূতে সংসারে সারমেকং বিনির্দ্দিশেৎ।
অসারাশেষ লোকস্য সারমারাধনং হরেঃ ॥"
(গরুড় পুরাণ)

ত্যাজ সুরেপ্সিত রাজালক্ষ্মীকে উপেক্ষা করয় এবং আপনার পুত্র-কলত্রাদি প্রিয়পরিজন-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল কল্যাণের নিকেতন নিজ ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গমনকরতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অনন্যচিত্তে ভক্ত-বৎসল ভগবানের অরুণ চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া উত্তমা ভক্তি এবং তদনুগত পরমানন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন; আবার সেই মহাত্মাকেই একটী মৃতমাতৃক মৃগশিশুর প্রতি স্নেহাতিশয্যনিবন্ধন সাধনভ্রষ্ট হইয়া মরণোত্তর হরিণত্ব (১) প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল!

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে স্নেহের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে একটী কপোতের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ ক্বাপি কেনচিৎ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ॥

(ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায়)

কোথাও কাহারও সহিত অতিশয় স্নেহ (প্রীতি) বা প্রসঙ্গ (অতি প্রসক্তি) করিবে না। যদি কেহ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে মূঢ়চিত্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপিত হইতে হয়। স্নেহবদ্ধ-হৃদয় কপোত কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অনিত্য বিষয়ের প্রতি এই স্নেহই নিত্যবস্তু ভগবানে প্রযুক্ত হইলে, উহা "পরানুরাগ" বা ভক্তিতে পরিণত হইয়া জীবের সংসারপাশ ছেদনের কারণ হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মনরে ভালবাস তাঁরে, যে জন নেযায় ভব-সিন্ধু পারে"।

"পুণ্যকর্ম্মণি বৈ স্বর্গো নরকং পাপকর্ম্মণি।

(১) "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"

(গীতা)

পুণ্যানুষ্ঠান করিলে স্বর্গভোগ এবং পাপাচরণদ্বারা নরকভোগ হইয়া থাকে।

পুণ্য—

হরিপ্রীতিকরং যচ্চ সদ্ভিশ্চ পরিবর্জ্জিতং।
আত্মনঃ প্রীতিজনকং তৎ পুণ্যং পরিকীর্ত্তিতং॥

(নারদীয় পুরাণ)

যে কর্ম্ম ভগবান্ হরির প্রীতিকর, সাধুগণ যাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যাহা আত্ম-প্রসাদজনক, তাহাই পুণ্য; সুতরাং তদ্বিপরীত—অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রীতিকর নহে, সাধু-গণের নিকট যাহা হেয় এবং যাহা আত্মগ্লানি উৎপন্ন করে, সেই কর্ম্মই পাপ।

"পুণ্যমেকং পরং ত্রাণং পুণ্যমেকা পরা গতিঃ।
স্বর্গঃ পুণ্যবতাং নূনং ক্ষমা পুণ্যং তপস্বিনাং॥
তদ্বিসৃজ্য পরো যত্নঃ যেষাং পাপমহানসে।
পতিত্বা নরকে ঘোরে দহ্যন্তে তে দিবানিশং"॥

(সংসারচক্র)

"পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবং।
পাপং ব্যাধি জরাবীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতং"॥
পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা।
পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখং শোকো ভয়ঙ্করঃ॥
তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলং।
ভারতে সন্ততং সন্তো নাচরন্তি ভয়াতুরাঃ"॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পুণ্যই একমাত্র পরিত্রাণ ও উৎকৃষ্ট গতি, পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই স্বর্গে গমন করেন, পুণ্যই তপস্বিগণের ক্ষমা। যাহারা ঈদৃশ সুখাবহ পুণ্যকে পরিত্যাগ করিয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা ঘোর নরকে পতিত হইয়া দিবা-নিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ব্যাধির সহিত পাপের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা। পাপ সকল বিঘ্নেরই মূল এবং পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দারিদ্র্য, দুঃখ ও ভয়ঙ্কর শোক উৎপন্ন হয়। এ নিমিত্ত ভারতে ভবভয়ার্ত্ত সাধুগণ সর্ব্বদোষবীজ, অমঙ্গলস্বরূপ

মহাশক্র পাপের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকেন।

"নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং"।

"নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি, ব্রহ্মহননাদীনি"।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ জন্মে, ব্রহ্মহননাদি (১) যে সমস্ত কর্ম্মদ্বারা নরকাদি অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ।
তৎপ্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥
হিংসাস্তেয়ান্যথা কাম পৈশুন্যং পরুষ'নৃতং।
সংভিন্নালাপব্যাপাদমমিথ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ং॥
পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাগ্মানসৈস্ত্যজেৎ॥

(শুক্রনীতি)

মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও মনুষ্য তৎপাপের ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হিংসা (জীব হনন বা বা প্রাণীগণের ক্লেশজনক কার্য্য) স্তেয় (পরস্বাপহরণ), অন্যথাকাম (অবৈধরতি) পৈশুন্য (খলতা), পরুষ (নিষ্ঠুরতা), অনৃত (অসত্যকথন বা মিথ্যা ব্যবহার), সংভিন্নালাপব্যাপ (অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ), অদম (অবিনয়) মিথ্যাদৃক্ (নাস্তিকতা), এবং বিপর্য্যয় (অবৈধ আচরণ) এই দশবিধ পাপকর্ম্ম কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য (২)

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্ কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥"
"যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥"
"পাপকর্ম্মবশাৎ দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং।
তস্মাৎ সুখার্থীবিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং॥"

মন-বুদ্ধি-বাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা পাপ কার্য্য না করেন, সেই মহাত্মাগণই প্রকৃতরূপে তপস্যা করিয়া থাকেন, কেবল মাত্র শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। যিনি দেহ, মন এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বপ্রাণীতে পাপাচরণ পরিত্যাগ করেন, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। পাপকর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী এবং পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখভোগ সুনিশ্চিত। অতএব সুখেচ্ছু মানব সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ভূরি পরিমাণে নানারূপ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কর্ত্তব্য—পাঠ (সচ্ছাস্ত্রের (১) অধ্যয়ন ও আলোচনা) "পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং"—যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার মূর্খতা (২) থাকে না—অর্থাৎ সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং অভ্যাসঃ সর্ব্বদা হিতঃ।
স্যাদ্বহ্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারীমহানতঃ।

---

(১) * "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
তৎসংসর্গে চ নিষ্ঠাবৈ মহাপাতক পঞ্চকং॥"

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরধনহরণ, গুরুপত্নিগমন এবং এইসকল পাপানুষ্ঠানকারীগণের সহবাস 'পঞ্চমহাপাতক' বলিয়া অভিহিত হয়।

(২) কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পুয়তে হিসঃ॥ (মনু)

পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে এবং ভবিষ্যতে আর কখনই পাপ করিব না, এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিবৃত্ত হইলে, মনুষ্য স্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

(১) অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

(হিতোপদেশ)

(২) পঠপুত্র কিমালস্যং অপঠো ভারবাহকঃ।
পঠন্ সংপূজ্যতে রাজ্ঞা পঠপুত্র দিনে দিনে॥

(বোধিচাণক্য)

শল্যং পরং কিং—নিজমূর্খতৈব। শল্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক বস্তু কি? নিজের মূর্খতা।

বুদ্ধিমানভ্যাসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥
(শুক্রনীতি)

ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নাং অথর্ব্বাঙ্গিরসামপি।
ইতিহাস-পুরাণানাং বেদোহপনিষদাং দ্বিজঃ ॥
শক্ত্যাসম্যক্ পঠেন্নিত্যং অল্পমপ্যাসমাপনাৎ।
স যজ্ঞদান-তপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
(ব্যাস-সংহিতা)

সর্ব্বদা বেদ-বেদান্ত, মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের অভ্যাস হিতজনক। নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্শন করিলে মনুষ্য যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইতে পারে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন করিবেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন বেদ, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র, উপনিষদ্, ইতিহাস ও পুরাণ—সমর্থ হইলে, সম্যক্‌রূপে এবং অসমর্থ হইলে, অল্প অল্প পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ নিত্য নিয়মিতরূপে এইরূপ কার্য্য করেন, তিনি যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন।

বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।
পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ।
বেদান্তেষু নিষণ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতাঃ ॥
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যৈঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥
(পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা বেদাভ্যাসে রত এবং শাস্ত্রার্থবিচার করেন, যাঁহারা পুরাণ-সংহিতাদি পাঠ করেন এবং শ্রবণ করান, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দেন এবং যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাঁহারাই এই জগৎকে ধারণ করেন এবং শাস্ত্রাভ্যাস-মাহাত্ম্যে নিষ্পাপ হইয়া মোহপরিশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, কার্য্যকুশলতা জন্মে; আপনার অজ্ঞানজনিত বৈষম্য নিরাকৃত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাব দর্শনহেতু অপরিসীম আনন্দলাভ হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানলাভ করতঃ সন্মার্গাবলম্বী ও সৎক্রিয়াবান্ (১) হইয়া মনুষ্য পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

কোন্ শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে, শাস্ত্রকারেরা তাহা বলিয়াছেন ঃ—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥"(২)

আত্মজ্ঞান লাভ বা ভজনীয়রূপে ভগবানের অনুসন্ধান করাই শাস্ত্র পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দৃষ্ট হয় না, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও শ্রবণ করা বা চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ হরিভক্তিশূন্য শাস্ত্রাদির শ্রবণ ও আলোচনাদি দ্বারা হৃদয় কুসন্দেহ-জালে সমাচ্ছন্ন হয় এবং শুভদায়িনী শ্রদ্ধা তিরোহিত হয়; সুতরাং তাহা হইতে অধঃপতন ঘটে।

কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি। (শ্রুতিঃ)

ধর্ম্মই জগতের প্রতিষ্ঠা, জগতে প্রজাসকল ধার্ম্মিকেরই অনুসরণ করে, ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূরীভূত হয়, ধর্ম্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত ধর্ম্মকেই পরম (শ্রেষ্ঠপদার্থ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

(১) "ক্রিয়াযুক্তঃ সসিদ্ধঃ স্যাৎ অক্রিয়ো যঃ কথং ভবেৎ।
শাস্ত্রস্য পাঠমাত্রেণ কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥"

(২) "বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"

"অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ॥"
(নারদীয়পুরাণ)

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি॥
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতির্দ্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং একএব চ দুষ্কৃতং॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥" (মনু)

দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, ঐশ্বর্য্যও চির-স্থায়ী নহে এবং মৃত্যু নিত্য সন্নিহিত, অতএব ধর্ম্মসংগ্রহ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই কেবল মানবের একমাত্র সুহৃৎ, কেননা ধর্ম্ম মৃত-ব্যক্তির অনুগমন করে, আর অন্য সমুদয় বস্তুই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুত্তিকা (উই) যেরূপ বল্মীক (মৃত্তিকাস্তূপ) সঞ্চয় করে, সেইরূপ কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকের সাহায্যার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, ইহারা কেহই পরলোকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। তখন ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইবেন। প্রাণীমাত্রেই একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, একাকী স্বকৃত পাপ-পুণ্যের ফলভোগ করে। প্রাণসম বান্ধবেরা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ ভূমিতলে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করে, কিন্তু তখন ধর্ম্মই কেবল মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব দুস্তর তম—অর্থাৎ নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়; অতএব প্রতিদিন অল্পে অল্পে পরলোকের সহায় স্বরূপ ধর্ম্মের সং গ্রহ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরং॥
(স্মৃতি)

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়া সাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্মউচ্যতে॥
"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং (১) ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্যচানুত্তমং সুখং॥"

বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম জীবের ইহ-পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য পুরুষের যে গুণ (সংস্কারবিশেষ) জন্মে, তাহাই ধর্ম্ম এবং হিংসাপ্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে গুণ—অর্থাৎ দোষ জন্মে তাহা অধর্ম্ম। "ধারণ করেন" এই অর্থে ধর্ম্ম নাম হইয়াছে, ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল প্রজা বিধৃত হইয়া থাকে, কারণ ধর্ম্মই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোককে ধারণ করিয়া থাকেন। যে মানব বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই ইহজগতে সাধুরূপে অক্ষয় যশঃ এবং পরলোকে পরম সুখলাভ করেন।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেঽহলং।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবা স্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥
(মনু) (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

(১) "অপ্রমাণ্যঞ্চ বেদানাং মার্যাণাঞ্চৈব দর্শনং।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥"
(বশিষ্ঠ সংহিতা)

১৩[illegible] সালের [illegible] সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।	লেখক।
১। মঙ্গলাচরণ	১	
২। সম্পাদকের নিবেদন	১	
৩। প্রণব	২	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।
৪। ভাষাপরিচ্ছেদ	৬	শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।
৫। মায়াবাদ	৯,২৫,২৮,১৫১,১৮২,২১৪,২৫৬,	শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
৬। রাজধর্ম্ম	১২	শ্রীশরদিন্দু মিত্র।
৭। আত্মরক্ষা	১৪	(পরিব্রাজক।)
৮। হিরণ্ময় পুরুষ।	১৯	ঐ
৯। উপনিষৎ	২১	শ্রীবিধুভূষণ দেব।
১০। চিত্তানুশাসন	৩১,১৩৭,১৪৯	(পরিব্রাজক।)
১১। পারিব্রাজক সূক্তমালা	৩৯,১০৬,১৫৮,১৭১,২৩৬	শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বেদান্তভূষণ।
১২। বেদান্ত দর্শন	৪৮,৭৩,১২১	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
১৩। মণিরত্নমালা	৫১,৯৬,২১০,২৪৮,৩৫৬	শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।
১৪। বিষয়ীর অনুতাপ	৫৫,৫৯	(পরিব্রাজক।)
১৫। আমিত্বের প্রসার	৬১,২৯৯	সম্পাদক।
১৬। হিন্দু ও আর্য্য	৬৭	(পরিব্রাজক।)
১৭। ঋগ্বেদ	৭০,৮৭,১২৯,২৬৩,	শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ,।
১৮। গীতাভাস	৭৫,১৩০,১৮৪,২০৪,২৫২,৩১৪	শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।
১৯। স্বারাজ্য সিদ্ধিঃ	৮৩,১০১	(পরিব্রাজক।)
২০। উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ	৯২	ঐ
২১। কহোল যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ	৯৪	সম্পাদক।
২২। অধিকারভেদে শিক্ষা ও ব্রহ্মচারি-আশ্রম	১১৫	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৩। পুনর্জ্জন্ম-তত্ত্ব	১২৫,১৮৮	সম্পাদক।
২৪। ব্রহ্মচারি-আশ্রম	১৩৪	
২৫। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ	১৪৩,১৭৫,২২৫,২৪৩,২৮১,৩০৯,৩৪০	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। সম্পাদক।
২৬। সাংখ্য-দর্শন	১৫৩,১৯৯,২৩২,২৯১	(পরিব্রাজক।)
২৭। বঙ্গে দুর্গোৎসব	১৮৭	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২৮। অবতার-তত্ত্ব	১৯০,২২১	শ্রীবিধুভূষণ দেব।
২৯। কৃষ্ণতাণ্ডবস্তোত্র	২৩১	পঞ্চানন [illegible]।
৩০। ভক্তিসাধন	২৬৯	শ্রীবিধুভূষণ দেব।
৩১। নীতিসার	২৭৬,৩৩৫	শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩২। পঞ্চদশী	২৮৫,৩২৭	শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩৩। গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন	২৮৮,৩২৩,৩৩৪	সম্পাদক।
৩৪। সম্পাদকীয় লাঞ্ছনা	২৯৫	অনৈক পাঠক।
৩৫। জীবনী শক্তি	৩০৫	শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।
৩৬। আমি [illegible]	৩৫৩	(সম্পাদকীয়।)
৩৭। [illegible] সমালোচনা	২৫,৫৭,১৫০,২৬১,৩২৬	

হিন্দুপত্রিকা সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত।

বঙ্গবাসী, ২৬শে চৈত্র, ১৩০৫——

হিন্দুপত্রিকা। হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে মাসিক পত্রিকা; অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যদুনাথ বাবু স্বনামধন্য পুরুষ। ভারতের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া, নানা উৎকৃষ্ট পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, তিনি বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। হিন্দুপত্রিকার সহিত মূলে আমাদের মতভেদ থাকিলেও, আমরা উহাকে ভালবাসি। ফাল্গুন মাসের হিন্দুপত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আছে;—(১) সম্পাদকীয় লাঞ্ছনা; (২) আমিত্বের প্রসার; (৩) জীবনীশক্তি; (৪) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ; (৫) গীতাভাস; (৬) গোলকে সর্ব্বদেবদর্শন; (৭) সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। যদু বাবুর ন্যায় পরিশ্রমী, অধ্যবসায়শীল এবং বুদ্ধিমান পুরুষ বিরল। এই গুণত্রয়ের ফল—হিন্দুপত্রিকা। আজ পাঁচ বৎসর কাল হিন্দুপত্রিকা সুচারুচ্ছন্দে চলিয়া আসিতেছে। শুনিয়াছি, গ্রাহক সংখ্যা তিন হাজারের কম নহে।

বেঙ্গল-গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক—বঙ্গসাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত স্বনাম-খ্যাত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "হিন্দু-পত্রিকা" সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"হিন্দু-পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয়-গৌরবে বৃহৎ। আমি উহা যত্ন সহকারে পড়িয়া থাকি। উহাতে অনেক গূঢ় কথা ও সদুপদেশ থাকে। দুঃখের বিষয়, উহার যেরূপ প্রচার বাঞ্ছনীয়, সেরূপ প্রচার নাই।"

ঢাকার সুবিখ্যাত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন—"হিন্দু-পত্রিকা প্রকৃত হিন্দুর প্রাণ-প্রিয় হইবে। হিন্দু-পত্রিকার চারিপাশে সাধু-মহাজনের হাট বসিবে" ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি আই, ই, লিখিয়াছেন—"হিন্দু-পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। ইহা উপযুক্ত সময়েই বাহির হইয়াছে" ইত্যাদি।

শাণ্ডিল্য-সূত্র
বা
ভক্তি-মীমাংসা

ভক্ত-সাধক-সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তি-সূত্র হিন্দু-পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম্, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনীসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া সুলভ মূল্যে (কাপড়ে বাঁধাই ১৷৷০ দেড় টাকা ও কাগজে বাঁধাই ১৲ এক টাকা মূল্যে) যশোহর, হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকগুলি প্রকৃষ্ট প্রশংসাপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল; এবারও দুইটি প্রকাশিত হইল।

Prabudha Bharata, Almora, বলেন :—

"The Sandilya Sutras is a Very ancient work on Bhakti: both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a running commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaining difficult Passages and references in foot-notes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introduction by the translator. It is Prettily got up.

Luzac's Oriental Series, London বলেন :—

Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from tho Sanskrit Hundred Aphorisms of sandilya or Religion of Love. Until recenty this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sutras have lately thrown a flood of light on Bhakti Marga or the Path of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahamsa, he becomes a Bhakta, a devoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narada is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the Dvaitavadi is for Saguna Isvara. that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not, Mr Mozoomdar deserves our best thanks for this interesting contribution to the

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা, | বৈশাখ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে নমঃ। ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যিনি মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি বিশ্ব সংসার আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সখার ন্যায় ভক্তদিগের নিকট আগমন করিয়া থাকেন, যিনি পরম ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি অনন্ত জ্ঞানের অধিপতি, যিনি সর্ব্বব্যাপী এবং যাঁহার পাদন্যাস অতি বিস্তীর্ণ; যিনি মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বিষ্ণু, এবং উরুক্রম ইত্যাদি বহুবিধ নামে খ্যাত, সেই পরমাত্মা আমাদের কল্যাণরূপ হউন।

সম্পাদকের নিবেদন।

বর্ষচক্রের নূতন আবর্ত্তনের সহিত হিন্দু-পত্রিকারও নূতন আবর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই সুযোগে আমরা হিন্দুপত্রিকার লেখক, পাঠক, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, সকলকেই সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং সর্ব্বমঙ্গলালয় ভগবানের চরণে তাঁহাদের সর্ব্বমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। গত চারি-বৎসর কাল যদি হিন্দুপত্রিকা দ্বারা হিন্দু-শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ সেবা ও হিন্দুসমাজের কথঞ্চিৎ উপকারসাধন হইয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফল। অপর পক্ষে, যদি হিন্দুপত্রিকার পরিচালনায় কোন কর্ত্তব্যের অবহেলা হইয়া থাকে, তাহা আমাদেরই ত্রুটির পরিচয়।

অপর, হিন্দুপত্রিকার সহিত মাসে মাসে সাক্ষাৎলাভের জন্য গ্রাহকবর্গের বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হওয়ায়, বর্ত্তমান বর্ষ হইতে হিন্দুপত্রিকা মাসে মাসেই প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইল; অধিকন্তু ইহার কলেবরও কিয়দংশে বর্দ্ধিত হইল। গত বৎসর প্রত্যেক দ্বৈমাসিক-প্রকাশে পত্রিকার ৪৮ পৃষ্ঠা থাকিত, এবার প্রতি মাসে ২৮ পৃষ্ঠা থাকিবে; বর্ষ শেষে ৩৩৬ পৃষ্ঠা হইবে; সুতরাং গত বর্ষ হইতে বর্ত্তমান বর্ষে ৪৮ পৃষ্ঠা কলেবর বৃদ্ধি হইবে। এই সমস্ত কারণ বশতঃ আমরা নূতন গ্রাহকবর্গের পক্ষে বার্ষিক মূল্য ১৲ স্থলে ১॥৹ নির্দ্ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু পুরাতন গ্রাহকগণের জন্য মাত্র ৵ অধিক—অর্থাৎ ১।৵ মাত্র ধার্য্য হইল।

উপসংহারে নিবেদন, আমাদের পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত ব্রহ্মচারী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে যদিও অদ্যাপি বিশেষ কিছু পরিচয় দিবার যোগ্য অনুষ্ঠান হইয়া উঠে নাই, তথাপি হিন্দুপত্রিকার উন্নতির সঙ্গে ২ তদর্থে যথাসম্ভব চেষ্টা চলিতেছে ও চলিবে। এ বৎসরে যেটুকু আশাঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে, আগামী বর্ষ মধ্যে তাহা পল্লবিত, পুষ্পিত ও অন্ততঃ কিঞ্চিৎ ফলিত হইবার বিশেষ আশা আছে; এখন সমাজহিতৈষীগণের সহানুভূতি, সুহৃদ্‌গণের সাহায্য, সাধুজনের আশীর্ব্বাদ ও ভগবানের কৃপা ভরসা।

প্রণব।

ঘরে অগ্নি লাগিলে, ক্রমে তাহা প্রধূমিত হইয়া প্রজ্বলিত হয়। যদি তাহার উপর প্রবল পবন প্রবহমান হয়, তবে কাহার সাধ্য সে অগ্নি নির্ব্বাণ করে? প্রত্যুত সেই অগ্নিতে সমস্ত ভস্মসাৎ হয়। আমাদেরও ধর্ম্মরত্নের আশ্রয়ভূত শাস্ত্র-গৃহে বিষম বিপ্লব-বহ্নি পড়িয়াছে। জলিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অনেকের অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু যেরূপ জলিতেছে, যেরূপ বায়ু বহিতেছে, যেরূপ কৌশল ও লোকবলের অভাব হইয়াছে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই। তবে যাহার যেটুকু সাধ্য, তিনি ঘর-পোড়া-বাঁশের মত কিঞ্চিৎ ২ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। বহু দিন হইতে এ অগ্নির সংযোগ-সঞ্চার হইয়াছে। যখন সরল পথের প্রদর্শক পুরাণাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পর হইতেই আরম্ভ। তৎকালে বড় ২ ঋষিরা ছিলেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষুতে এই অবনতির স্রোত অনিবার্য্য বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন—

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং।
তদা তদা কলের্বৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥

অর্থাৎ যখন বেদবিৎ পণ্ডিতের অভাব হইবে, তখন বিচক্ষণেরা বুঝিতে পারিবেন—কলির (কলিকালের এবং পাপের প্রভাব) বৃদ্ধি হইতেছে।

ভবভূতি উত্তরচরিতে আত্রেয়ীর মুখে অবনতি ব্যক্ত করিয়াছেন। আত্রেয়ী ব্রহ্মচারিণী। ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম শ্রুতিপাঠ। বাল্মীকি উদ্‌গীথাদি শ্রুতিরহস্যবিৎ; কিন্তু তথায় পাঠের বড় বিঘ্ন; অগত্যা—

"অশ্মিন্নগন্ত্য প্রমুখে প্রদেশে ভূয়াংস উদ্গীথ
বিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তং নিগমান্তবিগ্মাং বাল্মীকি-
পার্শ্বাদিহপর্য্যটামি॥"

অর্থাৎ এ দেশে বহু উদগীথবিৎ পণ্ডিত আছেন, বাল্মীকি মুনির সকাশ হইতে তাঁহাদের নিকট বেদান্তশাস্ত্র পাঠ করিতে চলিয়াছি। ইহার দ্বারাও ব্যক্ত হইয়াছে, যথা তথা যে সে অধ্যাপকের নিকট উদগীথ সমন্বিত বেদান্ত-পাঠ হইত না। পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোকও উদগীথবিৎ ছিলেন। এখন পুরুষে তাহার নাম পর্য্যন্ত জানে না বলিলেও অত্যুক্তি হয়না।

যখন লোক উদগীথ-গানে বিভোর ছিল, তখন "পাণিনি" প্রভৃতি ব্যাকরণ পাঠের রীতি ছিল। কালক্রমে অবনতির সহিত পুস্তকের পরিবর্ত্তন হইল। তদবধি বঙ্গদেশে উদাত্তাদি স্বর-ক্রম রহিত ব্যাকরণ পাঠের আরম্ভ হইল। উদাত্তাদি স্বরে উদ্গীত ওঙ্কারের উপাসনাও তিরোহিত হইল। স্বর-ক্রম-রহিত হরি, দুর্গা প্রভৃতি নামের জপের ব্যবহার হইল। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ" বলিয়া মনকে প্রবোধ প্রদত্ত হইতে লাগিল। আমি যথাবিধি উচ্চারণ করিতে পারি বা না পারি, জনার্দ্দন ত ভাবগ্রাহী, তিনি ত আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছেন ইত্যাদি। জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, কিন্তু স্বর যে সে ভাবের উদ্বোধক, তাই স্বর-সংযোগ প্রয়োজন। 'হরি' নাম না লইয়া "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলে হয় কি? তবে বল, হরিনাম জপ ব্যতীত ভাব উদ্বুদ্ধ হয় না। উচ্চারণে সে হরিতে ভক্তিব্যঞ্জক স্বর না থাকিলে হরি-ভক্তি স্ফুরিত হয় না। স্বরের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন জন্য বেদে "ইন্দ্রশক্র-যাগের" অবতারণা করা হইয়াছে। ফল কথা, মনের ফটো স্বরে স্পষ্ট। অদ্য সেই স্বর সমন্বিত উদ্গীথরূপ ওঙ্কারের উপাসনার কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এখন দেখা যাউক, প্রাচীন ও পরাচীন উভয়ে ওঙ্কারকে কি ভাবে দেখেন। আমরা যেমন দুর্গা২ বলিয়া মনের আবেগ দূর করি, প্রাচীনেরা স্বর-পরিপাটীতে ওঙ্কার উচ্চারণ করতঃ সে অভাব পূরণ করিতেন। আমরা যেমন কিছু লিখিতে গিয়া দুর্গানাম লিখি, তাঁহারা ওঙ্কার লিখিতেন। আমাদের যেমন ধ্যানে, জ্ঞানে ও জপে দুর্গানাম ভরসা, ওঙ্কার তাঁহাদের সেই স্থান অধিকার করিতেন। আধুনিক সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা যেমন দুর্গাদি, প্রাচীন সগুণোপাসক সম্প্রদায়ের দেবতা সেইরূপ ওঙ্কার ছিলেন। সাবলম্বন-উপাসনার নাম সগুণোপাসনা। সগুণোপাসনার বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে, যথা—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথমুপাসীত"।

ইহারই ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"ওমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত। ওমিত্যেতদক্ষরং পরমাত্মনোঽভিধানংনেদিষ্ঠং। তস্মিন্ প্রযুজ্যমানে স প্রসীদতি। প্রিয়নাম গ্রহণ ইব লোক তদিহেতি পরং প্রযুক্তং অভিধায়কত্বাদ্ব্যাবর্ত্তিতং শব্দস্বরূপমাত্রে প্রতীয়তে। তথাচার্চ্চাদিবৎ পরস্যাত্মনঃ প্রতীকং সম্পদ্যতে।"

অর্থাৎ ওঁ ইতি (এই) অক্ষর উপাসনা করিবে। ওঙ্কার পরমাত্মার নাম। অন্য নাম অপেক্ষা এই নাম তাঁহার অতিপ্রিয়। লোক যেমন প্রিয় নামে ডাকিলে সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বমন্ত্রময় ওঁ শব্দে ভগবান্‌কে ডাকিলে ভগবান্ সুপ্রসন্ন হন। "ওমিতি"—

এই স্থানে 'ইতি' শব্দ থাকায় ওঁ যে শব্দ রূপ, শব্দাভিধেয় নহে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; অতএব প্রতিমাদি মূর্ত্তির ন্যায় ওঁ পরমাত্মার শরীর।

ওঁ সামবেদের অন্তর্গত উদ্গীথ; অতএব উচ্চারণ সাধন করিতে হইলে স্বর প্রয়োজন। যোগীগণ উদাত্তাদি স্বরে প্রণব-সঙ্কীর্ত্তন করেন। যিনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ-কুহর পবিত্র হইয়াছে। তিনিই ইহার মধুরিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং এই ওঙ্কারের মধ্যে কটী বর্ণের উচ্চারণ হয়, তাহাও বুঝিতে পারেন। প্লুত—অনুদাত্তস্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্লুত-উদাত্ত, পরে প্লুত-স্বরিতস্বরে আরোহাবরোহক্রমে উচ্চারণ সম্পাদন করিলে, উহাতে তিনটী বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমে অকার, মধ্যমে উকার এবং অন্তিমে মকার; অতএব মনু বলিয়াছেন—

"অকারঞ্চ উকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়াৎ নিরদুহৎ—" ইতি।

অর্থাৎ প্রজাপতি বেদত্রয় হইতে অকার, উকার ও মকাররূপ (ওঁ) সার দোহন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে—ওঙ্কার পরমাত্মার অঙ্গ। তাহার প্রত্যঙ্গ—অকার, উকার ও মকার। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে পরমাত্মার দুই স্বরূপ। ওঙ্কার সগুণ ব্রহ্মের শরীর; কেননা সগুণ-ব্রহ্মই উপাসকের উপাস্য। একই ব্রহ্ম সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহায়তায় সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তৃত্ব-রূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। তাই অবয়বত্রয়যুক্ত ওঙ্কারেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। অকারে বিষ্ণু, উকারে মহেশ্বর এবং মকারে ব্রহ্মা; অতএব উক্ত হইয়াছে—

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥"

এই হইল পৌরাণিক দৃষ্টি।

পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

তাঁহার (ঈশ্বরের) বাচক প্রণব (ওঙ্কার) 'প্রণূয়তেঽনেন' এই ব্যুৎপত্তিতে প্রণব শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যাহা দ্বারা স্তব করা যায়, তাহার নাম প্রণব।

"তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।"

যোগিগণ সেই প্রণব-মন্ত্র জপ করিবেন। আর ঐ প্রণব 'চৈতন্য' করিয়া, তাহার অর্থ ভাবনা করিবেন। তাহাহইলে চিত্ত একাগ্র হইবে। চিত্ত একাগ্র হইলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ দূর হইবে। অনন্তর আত্মতত্ত্ব স্বয়ং প্রকাশমান হইবে, এই হইল যোগদৃষ্টি—

সর্ব্ব-প্রামাণ্য গীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
* * * * *
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ দান তপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ॥"

অর্থাৎ ওঁ, তৎ এবং সৎ, এই তিনটী ব্রহ্মের বাচক, ইহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সেইহেতু ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীরা যথাবিধি যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিতেও ওঙ্কার উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। আদিসমাজের ব্রাহ্ম-ভ্রাতারা উপাসনার সময় ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পত্রাদির শিরোভাগে 'ওঁ তৎ সৎ' নির্দ্দেশ করেন।

সুদূরবর্ত্তী ইউরোপের পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতিও ওঙ্কারের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এস্থলে বিশ্বকোষের উক্তি যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম—

"কত কালের পুরাতন কথা লিখিলাম বলিয়া হয়ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু আর হাসিবার দিন নাই। পূর্ব্বে আমাদের দেখিয়া যাঁহারা হাসিতেন, এখন তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিয়াছেন। সংস্কৃতপ্রিয় মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন "ওঙ্কার জপ করিয়া দেখ; প্রথমে ইহা অসার বোধ হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। পুনঃ২ প্রণব উচ্চারণ করিলে ওঙ্কার জপ করা হয়। মনের একাগ্রতা সাধন এবং ব্রহ্মরূপ মহাকেন্দ্রে চিত্ত সন্নিবেশ করা উহার উদ্দেশ্য। হিন্দুরা যাহাকে মনের একাগ্রতা-সাধন বলেন, আমরা উহার মর্ম্ম জানি না।" *

যাহা সত্য, সকলেরই নিকট সত্য, তাহার অন্যথার সম্ভাবনা নাই। দুই-দ্বিগুণে চারি, তিন-দ্বিগুণে ছয়, ইহা সকল দেশের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন। কেহই বলিবেন না—দুই-দ্বিগুণে পাঁচ। এ সত্যতা যেমন অঙ্ক বিষয়ক, সেইরূপ সকল বিষয়েই বলা যাইতে পারে। তবে সত্য-মিথ্যার অনুসন্ধান চাই। অনুসন্ধান না করিয়া, একতরফা ডিক্রি বা ডিস্‌মিস্ করা স্থির বুদ্ধির কার্য্য নয়। বিশেষতঃ "মানিনা" কথাটী বড় সহজ— "মানি" কথাটী বড় কঠিন। মানিতে হইলে বা মানাইতে হইলে, যুক্তি-তর্ক চাই, কিন্তু ওঙ্কারে একাগ্রতা-সম্পাদন ও ওঙ্কারোপাসনা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ, ইহার যুক্তি নাই; আছে কেবল সাধন। তুমি সাধনা কর, ওঙ্কারে যদি হাতে২ ফল না পাও, তখন তুমি মানিওনা। কিন্তু সে আশাভঙ্গ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবেনা। যেমন গোলকধাঁধাঁয় প্রবেশ করিলে, সহসা বাহির হওয়া যায় না, সেইরূপ প্রণবে প্রবেশ করিলেও আর বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকেনা; মোক্ষমূলার কতকটা এই ধাঁধাঁয় বাঁধা পড়িয়া ইহার সত্যতার উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যেও যদি অনুসন্ধান করেন, সফলকাম হইতে পারেন।

যেমন পৃথিবীর সার শস্য, আকাশের সার চন্দ্র-সূর্য্য ও পুরুষের সার পুরুষকার, সেইরূপ বেদের সার ওঙ্কার। শাস্ত্রমতে প্রণবহীন ব্যক্তি গর্দ্দভ তুল্য।

"আদ্যং যত্রাক্ষরং ব্রহ্ম ত্রয়ো যত্র প্রতিষ্ঠিতাঃ
স গুহ্যোঽন্যস্ত্রিবৃদ্ বেদো যো বেদৈনং স বেদবিৎ॥
এক এবতু বিজ্ঞেয়ঃ প্রণবো যোগসাধনং।
গৃহীতঃ সর্ব্বসিদ্ধান্তৈরিতরৈর ঋষাদিভিঃ॥

* যে স্থলে সকলের শিরোধার্য্য শ্রুতি ও শঙ্করাচার্য্যাদির উল্লেখ করা হইল, সে স্থলে ম্লেচ্ছ মোক্ষমূলরের নির্দ্দেশে অনেকে উপহাস করিতে পারেন। অতএব এখানে একটু কৈফিয়ৎ দিতে হইল। শঙ্করাচার্য্যাদি হিন্দু, সুতরাং হিন্দু সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়া তদনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু অন্য-সমাজধর্ম্মী মোক্ষমূলরের সে পক্ষপাত স্বতঃই অসম্ভব। তিনি যখন মন্ত্র শক্তি স্বীকার করিতেছেন, তখন তাঁহার বাক্য প্রবল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা উপহাসের বিষয় নহে। আজ কাল ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞের কথা দূরে থাক্, সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরাও জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় আস্থাবান্ হইতেছেন, ইহাই আমার ধারণা। মোক্ষমূলর যখন মন্ত্রশক্তি স্বীকার করিলেন, তখন আপন ২ ইষ্টমন্ত্রের উপাসনাতেও যে ফল আছে, ইহা বিশ্বাসে আর আপত্তি কি?

বেদভারভরার্ত্তো যঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ।”
যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ—যে বেদের আদ্য অক্ষর (ওঙ্কার) ব্রহ্ম, যে ওঙ্কারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অবিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঙ্কার-রূপ বেদ অতি গুহ্য। যে ইহলোকে ওঙ্কারকে জানে, সে সর্ব্ববিৎ। যোগের সাধন সারাৎসার প্রণব সকলেরই জানা উচিত; ইহা সকল ব্রহ্মবাদীরা স্বীকার করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ ঝুড়ি২ বেদ পাঠ করিয়া বেদ-ভারে অভিভূত হয়, সে গাধা।

“যথামৃতেন তৃপ্তস্য পয়সা কিম্প্রয়োজনং।
তথোঙ্কারবিবিজ্ঞস্য জ্ঞানতৃপ্তির্নবিদ্যতে॥
সর্ব্বমন্ত্রপ্রয়োগেষু ওমিত্যাদৌ প্রযুজ্যতে।
তেন সংপরিপূর্ণানি যথোক্তানি ভবন্তি হি।
যন্মন্ত্রেণাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং॥
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন মন্ত্রেণাবিকলং ভবেৎ॥”

অর্থাৎ যেমন অমৃতে তৃপ্ত ব্যক্তির (পিপাসা দূর করিবার জন্য) জল প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যে যথাবিধি ওঙ্কার জানে, তাহার আর অন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না। যেখানে ২ মন্ত্রপাঠ, সেখানেই আদিতে ওঙ্কার-প্রয়োগ করিবে। ওঙ্কার যুক্ত হইলে যথোক্ত ফল হয়। মন্ত্রে যদি অক্ষর-চ্যুতি কিম্বা বৃদ্ধি হয় অথবা অনুস্বার-বিসর্গাদি পড়িয়া যায়, অপিচ অন্য প্রকারে অযজ্ঞীয় হয় বা অপবিত্র, অশুদ্ধ ও যাত-যাম হয়, মন্ত্রে এক ওঙ্কার-প্রয়োগেই সর্ব্ব-দোষ-পরিহার হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ স্মৃতিতীর্থ-
বিদ্যাবিনোদ।

ভাষা-পরিচ্ছেদ।

—o—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অপাকজোঽনুষ্ণাশীতঃ স্পর্শস্তু পবনেমতঃ।৪২
তির্য্যগ্‌গমনবানেষ জ্ঞেয়ঃ স্পর্শাদি লিঙ্গকঃ॥

টীকা—১। অপাকজঃ—পাকাজ্জায়তে ইতি পাকজঃ নপাকজঃ—অপাকজঃ—পাকজভিন্ন।

২। অনুষ্ণাশীতঃ—উষ্ণও নয়, শীতলও নয়।

৩। তীর্য্যগ্‌গমনবান্—বক্রগতি।

৪। স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ—লিঙ্গশব্দের অর্থ হেতু। আদি পদে শব্দ, ধৃতি ও কম্পের পরিগ্রহ।

অনুবাদ——বায়ুতে যে স্পর্শগুণ আছে, তাহা পাকজ ভিন্ন অতি উষ্ণও নয়, অতি শীতলও নয়। ইহাই নৈয়ায়িকের মত, বায়ুর গতি বক্র। স্পর্শাদি (বায়ুর সত্ত্বাবোধের অনুমানের) হেতু জানিবে।

বিষদীকরণ—বায়ুর স্পর্শগুণ অপাকজ—অনুষ্ণাশীত। স্পর্শস্তস্যাস্তু বিজ্ঞেয়োঽনুষ্ণাশীত পাকজঃ—এই পূর্ব্বোক্ত কারিকার দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে—পৃথিবীর গুণ অনুষ্ণাশীত পাকজ। অতএব পৃথিবীর স্পর্শ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য ‘অপাকজ’ পদ প্রদত্ত হইয়াছে। অপাকজ স্পর্শ জলাদিতে আছে, এই ‘অনুষ্ণাশীত’ পদের দ্বারা তাহার ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা

দেখান হইল—বায়বীয় স্পর্শ পার্থিব ও জলীয় স্পর্শ হইতে বিজাতীয়; অতএব যে দ্রব্য অপাকজ—অনুষ্ণাশীত স্পর্শের সমবায়ী কারণ, তাহার নাম বায়ু।

আমরা বায়ুকে কখন গরম—কখনবা শীতল বিবেচনা করি, তাহার কারণ জলীয় ও আগ্নেয় পরমাণুর সংসর্গ। যখন বায়ু জলীয় পরমাণু-সংহতির সহিত সহবাস করে, তখন শীতল হয়; আর যখন বায়ু আগ্নেয় পরমাণুর সহিত সংসর্গ করে, তখন উষ্ণ হয়; বস্তুতঃ বায়ু শীতলও নয়, উষ্ণও নয়। বায়ুর স্বাভাবিক গুণ অনুষ্ণাশীত।

বায়ুর গুণের উল্লেখ করায় বায়ু যে দ্রব্য-পদার্থ, তাহা প্রমাণসিদ্ধ হইল। কেন না পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—গুণের আশ্রয়ের নাম দ্রব্য; পরে প্রমাণ করা হইবে, বায়ু ঠিক প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব বায়ু মানার পক্ষে অনুমানই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কখন২ স্পর্শে বায়ুত্ব অনুমিত হয়, কখনবা শূন্যে তৃণাদির উড্ডয়ন দেখিয়া বায়ুর অনুমান হয়, কোথাওবা বোঁ২ সোঁ২ শব্দশ্রবণে বায়ুর অনুমান হয়; আবার শাখা-পল্লবাদির কম্পনেও বায়ুর অনুমান হয়; এই জন্যই বলিয়াছেন—

"স্পর্শাদিলিঙ্গকঃ।"

পূর্ব্ববন্নিত্যতাদ্যুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিয়ং।
প্রাণাদিস্তু মহাবায়ুপর্য্যন্তো বিষয়ো মতঃ॥

টীকা—১। পূর্ব্ববৎ—তেজের ন্যায়।

২। দেহব্যাপি—শরীর ব্যাপক।

৩। নিত্যতাদি—

৪। প্রাণাদি—আদি পদে অপান, উদান, সমান ও ব্যানের পরিগ্রহ।

অনুবাদ—পার্ব্বের ন্যায় বায়ুর নিত্যতাদি কথিত হইয়াছে (বিশেষ এই) ত্বগিন্দ্রিয় শরীর ব্যাপক। (অন্তর্ব্বর্ত্তী) প্রাণাদি বায়ু (বাহ্য) মহাবায়ু পর্য্যন্ত বিষয়; ইহাই মত।

বিষদীকরণ—তেজ যেমন নিত্য ও অনিত্য, সেইরূপ বায়ুও নিত্য ও অনিত্য ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদি স্থূল বায়ু অনিত্য। সেই অনিত্য বায়ু আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। যেমন জলীয় দেহ বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ, তৈজস দেহ সৌরলোকে অবস্থিত, সেইরূপ বায়বীয় দেহও বায়ুলোকে বিখ্যাত আছে। আতিবাহিক ও পৈশাচ শরীরও বায়ু-উপাদানে গঠিত; বায়বীয় দেহও একেবারে পার্থিবাদি-পরমাণুবিরহিত হয় না; কিন্তু বায়বীয় পরমাণু বেশি থাকায় "অধিকেন ব্যপদেশা ভবন্তি"—এই ন্যায়বলে বায়বীয় নামে ব্যপদিষ্ট হয়। পার্থিবাদি ব্যপদেশেরও এই যুক্তি।

বায়বীয় ইন্দ্রিয় ত্বক্। অতএব ত্বগিন্দ্রিয় বায়ুর গুণ স্পর্শের গ্রাহক। ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্ব-শরীর-ব্যাপক। যেমন চক্ষু তেজের গুণ রূপকে গ্রহণ করে বলিয়া তৈজস, ঘ্রাণ পৃথিবীর গুণ গন্ধকে গ্রহণ করে বলিয়া পার্থিব (ইহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে) সেইরূপ ত্বক্ বায়ুর গুণ স্পর্শ-জ্ঞান জন্মায় বলিয়া বায়বীয় বলাই যুক্তিসঙ্গত।

শরীরস্থ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চবায়ু 'প্রাণ' শব্দ বাচ্য। তবে স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, যথা—

"হৃদিপ্রাণোগুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।"

অর্থাৎ মুখ-নাসিকা দ্বারা যে বায়ু অন্তর্গত ও বহির্গত হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। যে বায়ু মল-মূত্রাদি অপনয়ন করে, তাহার নাম অপান। যে বায়ু নাভিগত হইয়া বহ্নি উদ্দীপন করতঃ ভুক্ত বস্তুর পাকার্থ সমীকরণ করে, তাহার নাম সমান। যে বায়ু কণ্ঠস্থ হইয়া উৎক্রমণ যুক্ত হয়, তাহাকে উদান বায়ু বলে এবং যে বায়ু সর্ব্বশরীরময় সংব্যাপ্ত থাকে, তাহার নাম ব্যান। বাহিরে যে বায়ু উপভোগ করি, তাহার নাম মহাবায়ু। এই সমস্ত বায়ু-বিষয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, উপভোগ-সাধনের নাম বিষয়। এই সকল বায়ু দ্বারা বায়ুর উপভোগ সাধন হয়।

"আকাশস্যতু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।
ইন্দ্রিয়ন্তুভবেৎ শ্রোত্রমেকঃ সন্নপ্যুপাধিতঃ॥"

অনুবাদ—শব্দ আকাশের বৈবেশিক গুণ জানিবে, শ্রবণ (আকাশাত্মক) ইন্দ্রিয় হয়। আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও উপাধিভেদে ভিন্ন।

বিষদীকরণ—ক্ষিতিত্বাদির ন্যায় আকাশত্ব জাতি হয় না, কেননা আকাশ এক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধক-সংগ্রহঃ" এই কারিকায় যুক্তিসহকারে বুঝান হইয়াছে, ব্যক্তির অভেদ—অর্থাৎ একত্ব হইলে, জাতি স্বীকার করা যায় না। নানা ব্যক্তি না হইলে জাতি হয় না। অতএব শব্দ-সমবায়িকারণতারূপে অথবা শব্দাশ্রয়স্বরূপে আকাশের উপস্থিতি হইয়া থাকে। "বুদ্ধ্যাদিষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকা গুণাঃ।" ইতি কারিকোক্ত গুণনিচয়ের সাধারণ সংজ্ঞা বৈশেষিক। বৈশেষিক গুণনিচয়ের মধ্যে কেবল শব্দই আকাশের গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কেননা শব্দ আকাশে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থান করে। আকাশীয় শরীর ও বিষয়ের সম্ভাবনা নাই, একারণ কেবল ইন্দ্রিয়ের কথা লিখিলেন "ইন্দ্রিয়ন্তু ভবেৎ শ্রোত্রং" ইতি। শ্রবণ আকাশের ইন্দ্রিয়—অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ-বস্তু; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল আকাশের গুণ শব্দকে গ্রহণ করে। পূর্ব্বে যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, যে যেজাতীয় বস্তু, সে সেইজাতীয় গুণ গ্রহণ করে। কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিলে, কর্ণ-শঙ্কুলীমধ্যে যে অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হয়, তাহার অবান্তর কারণ কর্ণ আকাশ, তাই স্বীয় গুণ তাহাতে স্বতঃ প্রকাশ পায়। অতএব কর্ণ শঙ্কুল্যবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়; অর্থাৎ কর্ণ-পটহে যে আকাশ আছে, তাহার নাম শ্রবণ, শ্রোত্র বা কর্ণ ইত্যাদি। মনুষ্যভেদে শ্রবণ ভিন্ন ২, অথচ আকাশ এক, ইহার কিরূপে সঙ্গতি হয়? এই আশঙ্কা লিখিতেছেন—'একঃসন্নপ্যুপাধিতঃ'॥ আকাশ এক হইলেও উপাধি (বিশেষণ) ভেদে ভিন্ন ২ বলিয়া বোধ হয়। যেমন ঘটরূপ উপাধিভেদে ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন করা হয়, সেইরূপ অনেক কর্ণাবয়বরূপ উপাধিভেদে এক আকাশ নানা হয়—নানা শ্রোত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরমার্থতঃ উপাধিভেদে বস্তুর ভেদ হয় না। ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য ভেদ-ব্যপদেশ করিতে হয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ-
বিদ্যাবিনোদ।

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অন্যের সাক্ষ্য প্রামাণ্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের যদি বাস্তবিকতা নাই-ই থাকে, বাহ্যজগৎ যদি আমারই কল্পিত হয়, তাহা-হইলে বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমি যে কল্পনা করি, আমি ভিন্ন আর দশজনও কেন ঠিক তেমনই কল্পনা করে? আমি যে সময়ে যে অবস্থায় যে বস্তু দেখিয়াছি—কল্পনা করি, আর সকলেও সেই সময়ে সেই অবস্থায় সেই দ্রব্য দেখে কি করিয়া? এতগুলি লোক যেসকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করিতেছে না, আমি সেই সকল অনুভূতির বাস্তবিকতায় সন্দেহ করি কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমি ও আর দশজনে একই পদার্থকে দেখিয়া, একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই যে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইবে, এমন নহে। কত সময়ে আমরা দশজনে একত্রে ভেল্কি দেখিয়া থাকি এবং সেই ভেল্কি-দৃষ্ট বস্তু বা ঘটনা সকলেই সত্য-সত্য বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু তাই বলিয়া কিছু ভেল্কির অলীকত্ব ঘুচে না। পুনশ্চ, আমি ভিন্ন যখন অন্য বস্তর সত্তাই সন্দেহের বিষয়, তখন একটী বস্তুকে আমি আর দশজনের সঙ্গে সমান ভাবে দেখিতেছি, ইহা কি করিয়া হইতে পারে? আমি ভিন্ন অন্য বস্তুই যখন আমার অজ্ঞেয়, তখন আমার সম্বন্ধে, আমার কল্পনার বাহিরে, আর দশজন কোথা হইতে আসিবে? দেখিবেই বা কি, আর তাহাদের সাক্ষ্যের একতাই বা কোথায়? সাক্ষ্যের একতা সম্ভবপরও নহে। যাহাকে আমি সাক্ষ্যের একতা বলি, তাহা বাস্তবিক নহে, সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক; কেন কাল্পনিক বলি, তাহা একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। সাক্ষী যদি মদিতর বাহ্য বস্তু হয়, তবে তাহার সত্তা আমার অজ্ঞেয়; কেননা যাহা আমা হইতে পৃথক্, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাহাকে আমি জানিব কি করিয়া? ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতে চাও? কিন্তু মনে রাখিও যে, ইন্দ্রিয় বিশ্বাস-ভাজন নহে। একে ত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত বাহ্য কিছু জানিবার কথা নহে, জানিতে পারিবার কথা থাকিলেও অবিশ্বাস্য ব্যক্তির কথা কি করিয়া সত্য বলিয়া মনে করিবে? আর যদিবা মৎসদৃশ—অথচ মদিতর আর দশজন ব্যক্তি থাকে এবং তাহারা বাহ্যজগৎ-সত্তার সাক্ষ্য দেয়, ইহা স্বীকার করা যায়, তাহাহইলেও তাহাদের অনুভূতি আমার অনুভব করিবার কি সম্ভাবনা আছে? তাহারা যেরূপ অনুভব করে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পারে না এবং পারিলেও তাহাদের অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতির নিরপেক্ষ একতা কিকরিয়া বুঝিব? তাহারা

তেমন নই। বাল্যে আম্রের রূপ-রসাদি যেমন অনুভব করিতাম, এখন তাহা হইতে অন্যরূপ অনুভব করিতেছি। এখনও আবার প্রথম আস্বাদনে আম্রের রসকে যেরূপ তৃপ্তির সহিত অনুভব করি, শেষ আস্বাদনে তৎপরিবর্ত্তে তৃপ্তি পূর্ণতা জনিত বিরক্তির সহিত তাহাকে অন্যরূপ অনুভব করিয়া থাকি। একটী কার্য্য প্রথম প্রথম করিতে যে প্রকার সুখাসুখ অনুভব করি, কিছু কাল ধরিয়া সেই কার্য্যে অভ্যস্ত হইলে, আর তাহাতে তেমন সুখাসুখ অনুভব করিতে পারি না। বস্তুতঃ লৌকিক আমিই সকল সময়ে একই পদার্থকে একইমত অনুভব করিতে পারি না। তাহার পর তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ আছে, তাহা বিবেচনা কর। নামে আমি এবং তুমি উভয়েই 'মনুষ' হইলেও, তোমাতে আমাতে রূপে-গুণে বিস্তর প্রভেদ আছে এবং প্রভেদ আছে বলিয়াই আমি আমি, আর তুমি তুমি এবং সেই জন্যই তোমাকে ও আমাকে পৃথক্ করিয়া চিনিতে কাহারও কষ্ট হয় না। তোমার গঠন, তোমার রূপ, তোমার দেহায়তন, তোমার বল-বীর্য্য, তোমার জ্ঞানাজ্ঞানাশ্রয়, মানসিক পরিপাক, তোমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠন ও শক্তি, আমার সেই সকল হইতে কত ভিন্ন! সুতরাং তুমি ও আমি একই বস্তুকে ঠিক একইরূপ দর্শন-স্পর্শনাদি করিব, ইহা সম্ভবপর নহে। যেজন্য তুমি এবং গো, নামে একই 'জীব'পদবাচ্য হইলেও, তোমাতে ও গোরুতে বিস্তর প্রভেদ; তুমি এবং এই কুষ্মাণ্ডটী নামে একই 'বস্তু' পদবাচ্য হইলেও, উভয়ে সংপূর্ণ প্রভেদ, সেইজন্য তোমাতে ও আমাতে উভয়ে নামে 'মানুষ' হইলেও কথনও এক নহে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, আম্রটীও পরিবর্ত্তনশীল পদার্থ; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার অবস্থান্তর ঘটিতেছে। এক মাস পূর্ব্বে মুকুলাবস্থায় তাহার যে রূপ-রসাদি ছিল, আজ পক্বাবস্থায় আর তাহা নাই; প্রতি মুহূর্ত্তে তিল তিল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে আজ সেই পরিবর্ত্তন তাল-প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যে এই ক্রম-পরিবর্ত্তন সূক্ষ্ম গণনায় ধরিবে, সে কিছুতেই এই সুপক্ক আম্রটিকে সেই মুকুলেরই পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবে না।

(ক্রমশঃ)

রাজধর্ম্ম।

"আর্য্য জাতি আধ্যাত্মিক জগতে অশেষ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া ছিলেন; লৌকিক ক্ষেত্রে তাঁহারা বিশেষ কোন কৃতীত্ব করেন নাই" এইরূপ উক্তি কতিপয় যুক্তি ও বচন-বীরগণের বদন হইতে বারংবার বহির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যাচার্য্যগণের রাজ্য-শাসন-বিধান দর্শন করিলে, অনায়াসে সেই ভ্রান্তির অপনোদন হইবে। অন্যান্য বিষয় আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিব।

সৃষ্টির পর মানবজাতি সমাজবদ্ধ হইলে, মহাপুরুষগণ তাহার শাসন ও উন্নতি বর্দ্ধনের জন্য স্বর্গীয় নিয়ন্তার ন্যায় একজন পার্থিব নিয়ন্তার প্রতিষ্ঠা কল্পনা করিতে লাগিলেন। বিবিধ চিন্তার পর প্রথমতঃ শস্ত্র ও শাস্ত্র-বিশারদ

ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল (১)। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা দেখিলেন যে, উপযুক্ত ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে, ব্রাহ্মণাদি অন্য বর্ণত্রয়ের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যোগ্যতানুসারে শাসনদণ্ড হস্তে লওয়ার অধিকারী না হইলে চলেনা। তাহাতে বৃত্তি-বিপ্লব হইলেও, তাহা আপদ্ধর্মের মধ্যে গণ্য করিবার বিধান করিলেন (২)। যাহাহউক্, সেই লৌকিক নিয়ন্তাই এখন রাজা' বলিয়া অভিহিত। তাঁহার শাসনাধীন ব্যক্তিমাত্রই প্রজা-পদ-প্রতিপাদ্য হইলেন। শিষ্ট-সমষ্টি বা সাধারণ-তন্ত্র-শাসনপদ্ধতি আর্য্য-চিত্ত-ভিত্তিতে বসিতে স্থান পায় নাই; কারণ, মুষ্টিমেয় লৌকিক-শিষ্ট অসংখ্য জনের উপর সুবিধার সহিত প্রভুত্ব করিতে পারে না। যদি করে, তাহা নানা কারণে আশানুরূপ সুফলপ্রসূ হয় না। যে রাজপদ বাচ্য একমাত্র ব্যক্তি প্রথমে যে শক্তিবলে কোটি কোটি লোকের উপর দণ্ডপ্রক্ষেপ করিয়া ছিলেন, সেই শক্তি সাধারণ সমিতির শাসন-ভুক্ত-সদস্তগণের প্রতি সেরূপ প্রযুক্ত হইতে পারে না; তাহার প্রকার পরে দেখাইব।

আর্য্যগণ রাজাকে আর মানুষ বলিতে চাহেন না; তিনি ভূলোকবাসী হইলেও দ্যুলোকের অবতীর্ণ দেব! রুষিয়ার 'নিহিলিষ্ট' প্রকৃতির ন্যায় আর্য্যরাজ্যে রাজদ্রোহী প্রজা-সম্প্রদায় বা Regicide (রাজহন্তা) কখনও দেখা দেয় নাই। প্রজার হস্তে রাজার নিধন ভারতবর্ষে একরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা।

(১) মনুসংহিতা—
ব্রাহ্মং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েণ যথাবিধি।
সর্ব্বস্যাস্য যথান্যায়ং কর্ত্তব্যং পরিরক্ষণম্ ॥১।
(২) নারদ সংহিতা—
উৎকৃষ্টঞ্চাপকৃষ্টঞ্চ তয়োঃ কর্ম্ম নবিদ্যতে।
মধ্যমে কর্ম্মণী হিত্বা সর্ব্বসাধারণেহিতে ॥১।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ রাজশরীর ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবেরের অংশ-উপাদানে সৃষ্ট বলিয়াছেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রাণি-পরিভাবিনী সঞ্জীবনী শক্তি চালনায় শক্ত করিয়াছেন। (১)। রাজাকে ভগবান্ লোক রক্ষার জন্য অলৌকিক শক্তি দিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন (২)। ভগবানই রাজারূপে অবতীর্ণ। গীতায় পরিষ্কার বলিয়াছেন "নরাণাঞ্চ নরাধিপম্"।

শাস্ত্রের স্থলান্তরে বর্ণিত—রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের ভক্তির পাত্র হইলেন; তিনি বালক বা অপর জাতীয় হইলেও গুরুর ন্যায় পূজ্য (১) এবং সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্মরূপী হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনগণের পক্ষে ব্রহ্মের তেজোময় দণ্ডস্বরূপ (২)। অগ্নি সন্নিহিত ব্যক্তিকেই দগ্ধ করে; কিন্তু রাজাগ্নি ক্রুদ্ধ হইলে, দূরবর্ত্তী জনকে সঞ্চিত সম্পত্তির সহিত ভস্মসাৎ করে (৩) যে ব্যক্তি রাজাকে মনে মনে বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে দেখিবে, সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে (৪)। যে দণ্ডের ভয়ে দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি ভীত, সেই দণ্ড আজ্ রাজার হস্তে পরমেশ-প্রদত্ত। (৫)। এই

মনুঃ—(১) ইন্দ্রানিল যমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥১।
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥২।
(২) অরাজকেহি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতোবিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥১।
(১) মনু—বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্যাইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥১।
(২) তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ ॥১।
(৩) একমেবদহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্ ॥১।
(৪) তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ সবিনশ্যত্যসংশয়ম্ ॥১॥
(৫) দেব দানব গন্ধর্ব্বা রক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ ॥১।
শ্রুতিঃ— "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥১।

রাজ-সৃষ্টি ঋষিগণের গভীর-বুদ্ধি-বারিধির রত্নস্বরূপ। সেখানে—সিদ্ধাশ্রমে শান্ত ও শ্বাপদ পশুর ন্যায়ভক্তি ও ভয় সমভাবে সামঞ্জস্য পায়। যেখানে এই জাতীয় শিল্প-বিধান, সেইস্থানে প্রজা-ধর্ম্ম অক্ষয় ও অব্যয়; সেই স্থানেই রাজধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যরাজগণ অনতি-শীতোষ্ণ-বসন্তবায়ুর ন্যায় প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়হারী হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণশীল। ধন্য আর্য্যঋষির রাজ-নির্ম্মাণ-উপকরণ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।

আত্মরক্ষা।

"আত্মানং সততং রক্ষেৎ।"

সর্ব্বদাই আত্মরক্ষায় অবহিত থাকা বিধেয়। দেহাতিরিক্ত আত্মাকে রক্ষা করাই আত্মরক্ষা। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মোহান্ধ মানব সাধারণতঃ আপনার দেহ-রক্ষাকেই আত্মরক্ষা মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। রাজার দণ্ড, সমাজের দণ্ড, শত্রুর হিংসন, সর্পের দংশন, ব্যাঘ্রের নখর, কুম্ভীরের কবল, দস্যুর অসি বা শত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এড়াইয়া বেড়াইতে পারিলে যে আত্মরক্ষা করা হইল, তাহা নহে। বিপদ আমাদের পদে পদে, শত্রু সঙ্গে সঙ্গে, সর্প-বৃশ্চিক বক্ষ-বিবরে, ব্যাঘ্র-ভল্লুক মনের বনে! আমরা আপনিই আপনার বন্ধু, আবার আপনিই আপনার শত্রু। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,——

"আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ"

আত্মাই আত্মার বন্ধুর আত্মাই আত্মার রিপু।

"সাবধানের বিনাশ নাই" এ পুরাতন প্রবাদ সংম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু বুঝিবার ত্রুটিতে আমরা এমন পরমোপকারী উপদেশটিকে কেবল বাহিরে রাখিয়াছি; ঘরে যাইতে দিই না। রাজকীয় চৌকিদার যেমন বাহির-রাস্তায় হাঁকার দিয়া যায়, চোরে ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে চুরি করে, আমাদের অবস্থাও এ সম্বন্ধে তদ্রূপ। আমাদের আত্মরক্ষার সমস্ত চেষ্টা বাহিরে। আমাদের চৌকিদারের সাবধানতায় হয়ত বাহিরে একগাছি চালের তৃণ বা একটি শাকের পাতাও অপহৃত হয় না, কিন্তু ঘর হইতে লোহার সিন্দুক হীরা-মুক্তা-স্বর্ণ-রৌপ্য কানাচের গুপ্ত সিঁধ পথে বেশ বাহির হইয়া যায়! সে চোরকে দেখিলেও যেন তাহার ধরার যো নাই চোরের সম্মুখে সে যেন মোহাভিভূত (mesmerised)। ঐ যে এক সিদ্ধিখোর নেশায় বিভোর ভোজপুরী দ্বারওয়ান বলিয়াছিল "হাম্‌ত চোর পাকড়নে গিয়া লেকেন্ হামারা দোনো হাত আট্‌কা থা; এক হাতমে ঢাল থা, দোসরমে তল্‌ওয়ার থা, ক্যায়্‌সে পাকড়েঙ্গে?" বস্তুতঃ আমরাও এমনই মোহ-মাদক-বিহ্বল যে

প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের হৃদয় সর্ব্বস্ব চুরি যাইতেছে, আমরা দুর্লভ মানব-জন্মের সুলভ ধর্ম্মাধিকাররূপ সুশস্যে সুসজ্জিত থাকিয়াও হা করিয়া চাহিয়া আছি! এইরূপ যাহার অবস্থা, তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

একজন হয়ত বাহিরে বড় সাবধান; আলোটি না নিয়া রাত্রে দু-পাও বাহির হন না, 'দিন' না দেখিয়া দু-ক্রোশ দূরেও যান না; একটা কথা কহিতে দশটা ভাবেন, দুছত্র লিখিতে দশ শব্দ কাটেন; দুটা হাঁচি হইলে নাওয়া বন্ধ করেন, দুটা ঢেকুর উঠিলে খাওয়া বন্ধ করেন! ডোবার ভয়ে ডোবায় নামেন না;—পাছে পড়েন, ভেবে গাছে চড়েন না! আত্মরক্ষাটা তিনি এইরূপই বোঝেন। ওদিকে হয়ত মিথ্যাকথায় পঞ্চানন, মদ্য-মাংসে দশানন, জাল-জুয়াচুরিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কামিনী-কাঞ্চনে আত্ম-পর-ভেদ-শূন্য! হয়ত দানে জগন্নাথ, কিন্তু হরণে চতুর্ভুজ! দেবালয়ে যাইতে খোঁড়া, বেশ্যা-লয়ে ধাইতে ঘোঁড়া! এ হেন 'মানব' আখ্যাধারীর বাহিরে বিলক্ষণ আত্মরক্ষা, কিন্তু অন্তরে অদ্ভুত আত্মহত্যা। অন্তরের এরূপ বিনাশ অপেক্ষা বরং বাহিরের বিনাশও বাঞ্ছনীয়। নির্লজ্জ দুষ্কার্য্যকা-রীকে যে লোকে "দড়ী-কলসীর" ব্যবস্থা দিয়া থাকে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আন্তরিক আত্মহত্যার কেলেঙ্কারি অপেক্ষা বরং বাহ্যিক আত্মহত্যাও মন্দের ভাল। বাহিরের আত্ম-হত্যাতে যদি মহানরক হয়, তবে অন্তরের আত্মহত্যায়—অর্থাৎ যথার্থ আত্মহত্যায় যে কিরূপ নরকের ব্যবস্থা, তাহা সহজেই অনুমেয়।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো নশোষয়তি মারুতঃ॥"

অস্ত্রেতে ছিঁড়েনা, আগুনে পোড়েনা, জলেতে গলেনা, বাতাসে শোষেনা। ভৌতিক উপায়ে 'ভৌতিক মানুষ (মানুষের দেহ) মাত্র মরে, আসল মানুষ মরে না।

আসল মানুষ জীবাত্মা, দেহ তাঁহার পরিচ্ছদ বা আসনস্বরূপ মাত্র; অতএব দেহের বিনাশে মনুষ্যের প্রকৃত বিনাশ হয় না, অর্থাৎ মনুষ্যত্ব যায় না, কেবল 'পোষাকবদল' বা আধার-পরিবর্ত্তন হয় মাত্র; কিন্তু আন্তরিক বিনাশই মনুষ্যত্বের লোপ; সুতরাং তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত মৃত্যু। যদি প্রকৃত আত্মরক্ষা আবশ্যক হয়, তবে মনুষ্যত্ব-রক্ষা ভিন্ন মাত্র দেহ-রক্ষায় তাহা কদাচ সংসিদ্ধ হইতে পারে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ-সমানাঃ।" ধর্ম্মহীন যে, পশুতুল্য সে। পশু হইতে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব ধর্ম্ম লইয়া। ভগবান মাত্র মনুষ্যকেই ধর্ম্মসাধনের অধিকারী করিয়াছেন; এই জন্যই মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম। পশ্বাদি ইতর প্রাণী কেবল স্বভাবের জীব, একরূপ সচল ও 'সচেতন-জড়' বিশেষ। অতএব ধর্ম্মাধিকারী মানব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেই মনুষ্যত্ব-ভ্রষ্ট হইল; কেননা ধর্ম্মই মনুষ্যত্ব, সুতরাং সেই মনুষ্যত্বের বিনাশেই মনুষ্যের যথার্থ বিনাশ; অতএব ধর্ম্মরক্ষাই যথার্থ আত্মরক্ষা।

আমরা বাহিরের আত্মহত্যার কল্পনা-তেও লোমাঞ্চিত হই, কিন্তু আন্তরিক আত্মহত্যা—প্রকৃত আত্মহত্যা ঘটাইতে আমরা অনেক সময় একটু ইতস্ততঃও করিনা! নাপিতের ক্ষৌরি করিবার সময় ঠিক কণ্ঠ-নালীর উপরে ক্ষুরখানি আসিলে, আমরা কত সতর্ক—সমাহিত—নিস্পন্দ হইয়া থাকি. কিন্তু হায়! আমরা আপনারাই

আমাদের আত্মার গলায় অবলীলাক্রমে অধর্ম্ম-ক্ষুর বসাইতেছি! কেহ মনের দুঃখে কাঁদিতে ২ দেহের গলায় ফাঁসি দিয়া মরিলে হয়ত আমি মহা বিস্মিত ও দুঃখিত হই, কিন্তু সেই আমিই হয়ত আমার মনের সুখে হাসিতে ২ আত্মার গলায় পাপের ফাঁসি পরাইয়া প্রকৃত-মরণে মরিতেছি। হায়! মানব-সমাজে এ কি মর্ম্মঘাতী প্রহসন! দেহরক্ষা-রূপ যে আত্মরক্ষা, তাহার জন্য সব করা যায়। শাস্ত্রেই ব্যবস্থা রহিয়াছে—

"জিঘাংসন্তং জিঘাংসিয়ান্নতেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।"

এই ভৌতিক দেহের যথার্থ আততায়ী ব্রাহ্মণ-শত্রুকেও বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না; তবে আত্মার আততায়ী শত্রু কাম ক্রোধের বধ বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা নহে? বাল্য কালে "পদ্যপাঠে" পড়িয়াছিলাম———

"গহনকানন কিম্বা পর্ব্বত কন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক-সিংহ-ব্যাঘ্র বাস করে,
গভীর কানন কিম্বা নদীর ভিতর,
মকর হাঙ্গর-নক্র আদি জলচর,
ভূগর্ভে বিবরমাঝে কুণ্ডলিত ফণী,
মেঘের তাড়িতে রয় আকাশে অশনি;
এরা শত্রু বটে, কিন্তু দেহের ভিতরে,
মহাশত্রু রিপুকুল সদা বাস করে।"

আমরা এই সব বাহিরের সামান্য শত্রুর ভয়েই ভীত, অন্তরের মহাশত্রু-নিপাতের জন্য কয় জনের চেষ্টা হয়? নিপাতের চেষ্টা দূরে থাক্, ইহাদের ছদ্মবেশে মুগ্ধ হইয়া. 'শত্রু' বলিয়াইবা কয়জনে চিনিতে পারে? এই ষড়-শত্রুর ষড়যন্ত্রে আমাদের আত্ম-অবস্থা দিন ২ কি হইতেছে, তাহা আত্ম-দৃষ্টির অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। আমরা কামে বীভৎস, ক্রোধে - দুর্দ্ধর্ষ, লোভে দীন, মোহে মলিন, মদে উত্তেজিত, মাৎসর্য্যে অবসাদিত! অতি সাঙ্ঘাতিক অবস্থা! আমরা বাহিরের আত্মরক্ষা নিয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যে সর্ব্বনাশ হইয়া গেল. সে দিকে লক্ষ্য নাই। শুধু নিশ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখিতে পারিলে কি হইবে? আর তাই বা কত দিন? নিশ্বাসে কি বিশ্বাস আছে? এ জাঁতা কর্ম্মকার মহাশয় কখন বন্ধ করেন, কখন আগুন নিবাইয়া দেন, তিনিই জানেন। তবে উপায় কি? উপায় ওপায়! নতুবা নিতান্ত অনুপায়! ভক্ত বৈষ্ণব-কবি ঠিক গাহিয়াছেন—

"শুনিলে 'গোবিন্দ' রব. আপনি পালাবে সব,
সিংহনাদে যথা করিগণ।"

হৃদয়-কন্দরোত্থিত 'গোবিন্দ' নামের সিংহ-ধ্বনি শুনিলেই কামাদি করিগণ আপনিই কে কোথায় পালাইয়া যাইবে! বাস্তবিক রিপু-দমন পূর্ব্বক প্রকৃত আত্মরক্ষা সাধন করিতে হইলে, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। যে নির্ম্মাতা, সেই সংস্কর্ত্তা। তোমার ফুটা-ঘটী সারাইতে হইলে, কাঁশারীর কাছেই যাইতে হয়। আত্মহত্যা করিয়া ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হইয়াছি, আবার তাঁহারই শরণ গ্রহণে পুনর্জ্জীবিত হইয়া, তাঁহারই কৃপাশ্রয়ে আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে।

"ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥"

যাহারা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, ভূমিই তাহাদের পুনরুত্থানের অবলম্বন। হে প্রভো! তোমাতে অপরাধী জনগণের তুমিই অনন্য-শরণ।

পুরাণেতিহাস-পর্য্যালোচনায় জানা যায়, জগতের অনেক সুপ্রসিদ্ধ জন ব্যবহারিক

আত্মহত্যার অভিনয়ে বা অনুকূলতা-সাধনে প্রকৃতপক্ষে আত্মরক্ষাই করিয়াছেন; আবার কেহ কেহবা বাহিক আত্মরক্ষার উদ্দেশে আন্তরিক আত্মহত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন। দৃষ্টান্ত জন্য দূরে যাইতে হইবেনা। ভারতীয় হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কৌরব-গৌরব-রবি মহাপুরুষ ভীষ্মদেব আপনারই হত্যার উপায় আপনি বিপক্ষ-পক্ষকে শিখাইয়া দিয়া অপূর্ব্ব আত্মরক্ষার তত্ত্ব জগৎকে শিখাইলেন! পক্ষান্তরে, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র 'ধর্ম্মরাজ' যুধিষ্ঠির আত্মপক্ষরক্ষণ বা আত্মরক্ষণ কল্পেই "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজঃ" বাক্যে (বলিতে কি) একটু আত্মহনন করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য কৃষ্ণ-প্রাণ যুধিষ্ঠিরের এ সত্যজ্ঞান-পদ-স্খলন কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল এবং ব্যাসদেবও যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন-বর্ণনাতেই এ তত্ত্ব-রহস্য ভেদ করিয়াছেন। বিরাট-পুরে অজ্ঞাত-বাসের ধর্ম্মানুরোধে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাবাদে আত্মহনন হয় নাই, কিন্তু দ্রোণ-হননার্থেই ঐরূপ আত্ম-হনন হইয়াছিল; সুতরাং যুধিষ্ঠির চির আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষার ফলে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়াও ঐটুকু আত্মহত্যার দণ্ডস্বরূপই নরকদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাভারতের এই মহাশিক্ষা আত্মরক্ষা-সাধকের সযত্ন-শিক্ষণীয়, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মরক্ষার্থ (যথার্থ আত্মরক্ষার্থ) আত্ম-ত্যাগ-(আত্মজীবন-ত্যাগ) দৃষ্টান্ত এ জগতে অনেক মহাত্মাই দেখাইয়াছেন। পুরাণ-বর্ণিত রাজা শিবী, রাজা বিপশ্চিত্, মুনি দধিচি প্রভৃতি ইহার প্রাচীন উদাহরণ। দান-বীর কর্ণের আত্মরক্ষক কবচ দান, আত্মস্বরূপ পুত্রের ("আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ") মস্তকদান, তাহাও এই আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষারই দীপ্যমান দৃষ্টান্ত। প্রাচীন ভারতের তুষানল-প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়োপবেশন, ত্রিবেণী-নিমজ্জন প্রভৃতি আত্মহত্যাও এই জাতীয় আত্মরক্ষা-উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ফল বিষয়ে সে সব তর্ক-বিষয়ীভূত হইলেও উদ্দেশ্য-বিষয়ে অবিতর্কিত, সন্দেহ নাই। আর ভগবদ্ভক্তি-মত্ত মহাত্মাদিগের ত কথাই নাই। প্রহ্লাদ হাসিতে২ মরণের গ্রাসে পুনঃ২ ঝাঁপ দিলেন, উদ্দেশ্য প্রকৃত আত্মরক্ষা। বলিলেন—

"(যদি) সাধিলে মরণ, সে শ্যামবরণ—
সে চারু চরণ পাই,
(তবে) মরণ(ই) আমার জীবনের সার,
মরা-প্রাণে কাজ নাই।
হরি-হারা-প্রাণে কাজ নাই।"

প্রহ্লাদের দেহরক্ষায় ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হইল, কিন্তু ভক্ত প্রহ্লাদের ইচ্ছা শুদ্ধ 'ভাগবতধর্ম্ম' রক্ষায় বা যথার্থ আত্মরক্ষায়। কলির প্রহ্লাদ যবন হরিদাসও যথার্থ আত্মরক্ষার্থেই রামচরণ খানকে বলিয়াছিলেন,——

"খণ্ড খণ্ড এই দেহ—যায় যদি প্রাণ,
তথাপি না বদনে ছাড়িব হরিনাম।"

শিখভক্ত-শেখর তেগবাহাদুর মরিয়াই অমর হইলেন। "শির দিয়া—শের নেহি দিয়া" তাঁহার এই বিখ্যাত বাক্য শিখ-জাতিকে অমৃতের জন্য মরিতে শিখাইল।

আজ আমরা দুর্ব্বল দেহ-সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী, যোগেযাগে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা হইলেই আত্মরক্ষার চূড়ান্ত হইল, মনে করি, কিন্তু সেদিনও আমাদের অবলা কুল-পিঞ্জর-বিহঙ্গিনী সতীরা হাসিতে২ অনন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ ঢালিয়া, আত্মসর্ব্বস্ব পতির সহগমনে আত্মরক্ষার অলোক-সাধারণ অনুপম উদাহরণে জগৎকে চমকিত—

মোহিত—স্তম্ভিত করিয়াছেন! স্বয়ং শিব-গেহিনী সতীকুলেশ্বরী সতী পতির নিন্দা মাত্র শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া সত্যযুগেই এ মহা শিক্ষার বীজবপন করিয়াছিলেন। সতী নারীর জীবন প্রকৃত অধ্যাত্মজীবন; তাহা অব্যাহত রাখিতে, প্রয়োজনস্থলে দৈহিক বা ভৌতিক জীবন নখাগ্রবৎ তুচ্ছ ও ত্যজ্য! 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ' চাণক্যের এই মহাউপদেশের প্রকৃত মহার্ঘ অর্থ-রহস্য আমরা এক্ষণে অনেকেই বুঝিনা, নানা জনে নানা অর্থ করি; কিন্তু চাণক্যের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আত্মতত্ত্ব-রসজ্ঞগণ স্বতএব বুঝিয়াছিলেন। যাহাহউক, ভারতের ত কথাই নাই, কিন্তু এইরূপে আত্মার্থে বা ধর্ম্মার্থে পৃথিবী-ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্যভূমেও নিতান্ত বিরল নহে। সেই মহাত্মা যীসুখ্রীষ্টের ঘাতক-হস্তে আত্মসমর্পণ হইতে এযাবত্ এজাতীয় আত্মত্যাগে আত্ম-রক্ষার ঘটনা পাশ্চাত্য-জগতেও অনেক ঘটিয়াছে। ইতিহাস-পাঠক আধুনিক বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণের নিকটেও তাহার অনেক ঘটনা পরিজ্ঞাত। স্বদেশে—বিদেশে দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি। প্রবন্ধ-প্রবৃদ্ধি-ভয়ে তাহার বিবরণ-বাহুল্যে বিরত রহিলাম। ভারতের প্রাচীন পুরাণ ও জগতের প্রাচীন-নবীন-ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নাই।

আত্মরক্ষার্থ আত্মহত্যার সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ত এখন বুঝিতে পারিনা; কিন্তু আমরা আত্মহত্যার্থ-আত্মহত্যায় খুব পটু হইতেছি। আমরা এখন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আফিং খাই, পিতার গালি খাইয়া পিস্তলের গুলি খাই, একজামিনে পাস্ না হইলে গলায় ফাঁস লাগাই! (হা ভগবান্!) আত্ম-হত্যায় আমরা এখন অন্তরে—বাহিরে সমান তৎপর! তবে ইহা নিশ্চয় যে, বাহিরের আত্মহন্তার সংখ্যা সহস্রজনেও একজন কিনা সন্দেহ, আর অন্তরের আত্মহন্তা সহস্রে ৯৯৯ জন! এ বিরাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবিধান কি? আজ্ ঘোর কলিতে আমরা—স্ত্রী-পুরুষ—সকলেই যে ছিন্নমস্তা ও ছিন্নমস্ত! "আত্মানং সততং রক্ষেৎ"-কে জানি বটে, কিন্তু মানি না; পুস্তকে পাই বটে, কিন্তু মস্তকে পাইনা। উহা এখন আমাদের মুখের কথা—বুকের কথা নহে। উহার অর্থ আমরা আর বুঝিনা, কেবল অনর্থে অনর্থ ঘটাই! এ অনর্থের উপায় কি? উর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আবার সাধুগুরু সেই কথাই বলিবেন—উপায় কেবল ওপায়!

নিরাপদ স্থানে যে ধনরক্ষা করে, তাহার কখনও ধন-হানি ঘটেনা। ভগবচ্চরণে যে চতুর-চূড়ামণি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার আত্মরক্ষার জন্য আর ভাবিতে হয়না। হায়! অবোধ আমরা, ভাঙ্গা ঘরে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব রাখিয়া মারা গিয়াছি। আপন দোষে যে মারা যায়, সে আত্মহত্যা-কারী বৈ কি। যে শারীরিক হত, সে ত লোকান্তর-গত; সশরীরে থাকিয়া আমরাই জীবন্মৃত, "হা হতোঽস্মি" ঠিক আমাদেরই যথার্থ উক্তি। উপনিষদের ঋষিদিগের সেই "মৃত্যোর্মামমৃতং গময়" এই মহাপ্রার্থনার মর্ম্ম আমরা কি বুঝিব? আমরা দেহের মৃত্যুতেই মৃত্যু বুঝি; দেহের রক্ষাতেই আত্মরক্ষা বুঝি। ঋষি-হৃদয়-প্রসূত আত্মরক্ষার প্রার্থনা আমাদের বোধাধিকারের দুর্লক্ষ্য দূরে অব-স্থিত। আমরা দেহ-সর্ব্বস্ব, তাই মানবজন্মের এই সাধন-যন্ত্র কর্ম্ম-দেহটা যতক্ষণ আছে, আমাদের আশা অন্ততঃ ততক্ষণ আছে; মৃত-সঞ্জীবন পতিতপাবনের পদাশ্রয়-লাভার্থ

অন্ততঃ ততক্ষণ একটু অবকাশ আছে। কবি-লেখনী আমাদিগকে এ "হা হতোঽস্মি"-অবস্থার অধিকারানুযায়ী ব্যবস্থা-প্রার্থনা শিখাইতেছে; শিখাইতেছে, এখনও দিন থাকিতে—এ উৎকট আত্মসংহার-সঙ্কটে—সরল-ব্যাকুল—কাতর প্রাণে দয়াময়ের দ্বারে পড়িয়া বলিতে হইবে,———

আত্মহত্যা করিয়াছি—হইয়াছি মৃত,
কৃপা-বারি সিঞ্চি হরি! কর সঞ্জীবিত।
ও পদ-আশ্রয়ে যেন আত্মরক্ষা করি,
আত্মনিবেদনানন্দে বলি হরি হরি।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

——•:০:•——

হিরণ্ময় পুরুষ।

——•:০:•——

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুযো দৃশ্যতে হিরণ্য-শ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎসর্ব্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীক-মেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্য পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।"

ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ।
[১।৬।৬]

যে হিরণ্ময় পুরুষ আদিত্যের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হন, যাঁহার শ্মশ্রু ও কেশ হিরণ্যবর্ণ; এমনকি, যাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত হিরণ্যবর্ণ, যাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নীলপদ্মের ন্যায়, তাঁহার নাম উৎ; কারণ তিনি সকল পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন। যিনি এই তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিও পাপের উর্দ্ধে আরোহণ করেন।

এই হিরণ্ময় পুরুষ কে? এই হিরণ্ময় পুরুষ দ্বারা কি নিত্য-সিদ্ধ-পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে, না সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত কোন দেব-পুরুষ-বিশেষকে বুঝাইতেছে?

কেহ কেহ এইরূপ বলেন—পরমেশ্বরের রূপ নাই; শ্রুতি বলেন "অশব্দমস্পর্শ-মরূপমব্যয়ম্" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ পরমেশ্বর হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাতে রূপ আরোপিত হইয়াছে। পরমেশ্বরের কোন আধারও সম্ভবেনা; ছান্দোগ্য-উপনিষদেই বলা হইয়াছে, "কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত কতি স্বে মহিম্নি" অর্থাৎ তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত? স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত। পরমেশ্বর আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী; "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" সুতরাং ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ যখন

সূর্য্যমণ্ডলরূপ আধারে অবস্থিত রূপে বর্ণিত হইতেছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর হইতে পারেন না।

এইরূপ বিচার যুক্তি-সঙ্গত নহে। ছান্দোগ্য-উপনিষদুক্ত পুরুষ দ্বারা পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে। নিরাকার সর্ব্বব্যাপী অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার অবিষয়; সুতরাং উপনিষদুক্ত ঐ সাকাররূপে পরমৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

প্রথমে সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের নাম বলা হইতেছে "উৎ"—তৎপরে তাঁহার বর্ণনা করা হইতেছে—তিনি পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন—অর্থাৎ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। ঐ ছান্দোগ্য-উপনিষদই পরমেশ্বরকে "অপহত পাপ্মা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কারণ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ পাপের ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, এইরূপ বর্ণনা অন্যে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তারপর "তাঁহার কেশ ও শ্মশ্রু হিরণ্যবর্ণ" এরূপ বলা হইল কেন? এরূপ রূপ-বর্ণনাও পরমেশ্বরে প্রযোজ্য হইতে পারে না, এই তর্কের উত্তরে বলা যাইতে পারে—উপাসকের সাহায্যের জন্য ভগবানের এইরূপ নানাবিধ রূপ ও আধার কল্পনা শাস্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিব্যক্ত। বেদ-বেদান্ত-গীতা ভাগবত ও তন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রই সগুণ-ব্রহ্মের এই সাকারত্ব স্বরূপে ঈশ্বরত্ব-ঘোষণা করিতেছেন এবং এস্থলেও তাহাই করা হইয়াছে। যেস্থলে পরমেশ্বরের স্বরূপ-লক্ষণে ব্রহ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করা হয়, সেই স্থলেই তাঁহাকে "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণনা করা হয়; কিন্তু যেস্থলে তাঁহাকে উপাসকের উপাস্যভাবে বর্ণনা করা হয়, সেস্থলে তাঁহাতে "সর্ব্ব কর্ম্ম, সর্ব্ব কামঃ—সর্ব্ব গন্ধঃ—সর্ব্ব রসঃ" ইত্যাদি বহুবিধ গুণ আরোপিত হয়। ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রাগুক্ত বর্ণনা শেষোক্ত বর্ণনার সমজাতীয়; উহাতে উপাসকের মনোরম্য ধ্যানগম্য রূপ আরোপিত ও উহার আধার কল্পিত হওয়ায়, উহা দ্বারা উপাস্য পরমেশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

এক এক ঐশরূপ-ব্যঞ্জক শ্রুতি-মূলে ধ্যান রচিত হইয়া, এক এক মন্ত্রের, মতের ও পথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই 'হিরণ্ময় পুরুষের' ধ্যান সৌর-উপাসনার মূলতত্ত্ব স্বরূপ।

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, সৌর, এই পঞ্চোপাসনার মধ্যে সৌরোপাসনা সাবিত্রী-সাধনারূপে সর্ব্বসাধক-সম্প্রদায়েই সাধারণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার ধ্যান বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে ছান্দোগ্যোপনিষদের হিরণ্ময়পুরুষের ধ্যানানুরূপ না হওয়ায়, এই হিরণ্ময়পুরুষরূপ ঐশতত্ত্ব মূলে অপর চারিটী হইতে স্বতন্ত্রীকৃত সৌরোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব উপনিষদের এই বহুগৌরব-বর্ণিত 'হিরণ্ময় পুরুষ' সেই জগৎপ্রসবিতা সবিতার অধিষ্ঠাতা পরমদেব বা পরমেশ্বর এবং ইনিই সৌর-উপাসক-মণ্ডলে উপাস্য ইষ্টদেব, সুতরাং 'হিরণ্ময়-পুরুষ' স্বরূপ লক্ষণে নির্গুণ—নিরাকার—নিরাধার ব্রহ্ম এবং তটস্থ লক্ষণে সগুণ—সাকার—সাধার পরমেশ্বর।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

———:০:———

উপনিষৎ।

[হিন্দু-পত্রিকা, ২য় বর্ষ (৬৪-৭৩) পৃষ্ঠার পর হইতে।].

— ০:০:০ —

ব্রহ্মকে জানা যায় না, কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াশক্তি আশ্রয় করিলে, সগুণ 'ঈশ্বর' বাচ্য হয়েন এবং তখন তাঁহাকে জানা যায়। এই ঈশ্বরই মানবের আরাধ্য। মায়া বা প্রকৃতির সাহায্যে ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা। ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। বিশুদ্ধ সত্ত্ব আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'ঈশ্বর' নামে বাচ্য হয়েন, কিন্তু অবিশুদ্ধ সত্ত্ব—অর্থাৎ রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত. সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম 'প্রাজ্ঞ' বা 'জীবাত্মা' নামে বাচ্য হয়েন এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যে দেব, দানব. মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রভৃতি বিবিধ উপাধি বিশিষ্ট জীবাত্মা হইয়া দেবাত্মা, মানবাত্মা, প্রাণবাত্মা প্রভৃতি নানা নামে বাচ্য হয়েন। ব্রহ্ম তমঃপ্রাধান্যে মায়া বা প্রকৃতি আশ্রয় করিলে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ. এই পঞ্চভূতের উদ্ভব হয়; সুতরাং উপনিষদের মতে সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন বিশ্ব আর কিছুই নহে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে; মায়া ব্যতীত যখন বিশ্বের উদ্ভব হয় না, তখন মায়াকে কেন ব্রহ্মেতর একটি বস্তু বলিয়া স্বীকার করি না? কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনার শক্তি কি আপনার বাহিরে? আমাতে যে কোন শক্তি আছে. সে আমারই। যখন উহার বিকাশ করি, তখন শক্তির সত্তা প্রকাশ হয়, যখন উহার বিকাশ না করি, তখন উহা আমাতে বিলীন থাকে। যতক্ষণ ব্রহ্ম মায়াশক্তির বিকাশ না করেন, ততক্ষণ মায়ার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, উহা ব্রহ্মে লীনাবস্থায় থাকে; বিকাশ করিলেই উহার স্বতন্ত্র সত্তা কল্পিত হয়। এই জন্যই মায়াকে 'সৎ"ও"অসৎ" এই উভয় আখ্যাই দেওয়া যায়। (১) মায়া "সৎ" নহে, কারণ ব্রহ্মই এক মাত্র নিত্য বা সৎ পদার্থ. মায়া "অসৎ"ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। মায়া আশ্রয় করিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কারণ-ব্রহ্ম, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বৃক্ষ-পর্ব্বত-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মই এক মাত্র "সৎ" বস্তু, কিন্তু ব্যবহারিক জগতের সকল পদার্থকেই "সৎ" ও "অসৎ" এই উভয় আখ্যা দেওয়া যায়। যাহা আছে, তাহাই সৎ, যাহা নাই, তাহা অসৎ; এই উভয় শব্দই আপেক্ষিক ভাবে

---

(১) হিন্দুপত্রিকা ৪র্থ বর্ষ (আমিত্বের প্রসার, ব্রাহ্মণ, পৃষ্ঠা (২—১২) ও হিন্দুপত্রিকা, ২য় বর্ষ, অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ, (পৃষ্ঠা ১৩৬-১৪২) দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠক ২য় বর্ষের হিন্দুপত্রিকার 'উপনিষৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি আর একবার পাঠ করিয়া লইবেন।

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্য লইলে,কারণকে "সৎ" কার্য্যকে "অসৎ" বলা যায়। মৃত্তিকা ও ঘট, এই দুইটি বস্তু পর্য্যালোচনা কর। পূর্ব্বে বলিয়াছি "সৎ" অর্থ যাহা আছে; একটু বিশদ করিয়া বলিতে হইলে বলা উচিত, যাহা চিরকালই আছে ও থাকিবে, তাহাই "সৎ"; আর যাহা নাই, বা এখন আছে, পূর্ব্বে ছিলনা; বা পূর্ব্বে ছিল, এখন নাই; কিম্বা এখন আছে, ভবিষ্যতে থাকিবে না, তাহা অসৎ। দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয় না, তাহাই "সৎ"। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে যাহার বাধ হয়, তাহাই "অসৎ"। এখন দেখ, মৃত্তিকা ঘটের কারণ; মৃত্তিকা (আপাততঃ) সৎ, কিন্তু ঘট অসৎ। যখন মৃত্তিকা দ্বারা ঘট প্রস্তুত করি নাই, তখন ঘট ছিল না। এই যে আমার সম্মুখে ঘট রহিয়াছে, ইহা যতই পুরাতন হউক না কেন, এমন কোন সময় ছিল, যখন উহা ছিল না। তবেই অতীত কালে উহা ছিল না। ভবিষ্যতে উহা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—চিরদিন থাকিবে না; সুতরাং ঘট ছিল না, ঘট থাকিবে না,—উহা কেবল বর্ত্তমানে আছে মাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতে উহার অস্তিত্বের বাধ হওয়ায়, ঘট "অসৎ" হইল, কিন্তু উহার কারণ মৃত্তিকা ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বেও মৃত্তিকা, ঘট-ধ্বংসের পরেও মৃত্তিকা এবং ঘটের সমকালেও মৃত্তিকা। সুতরাং উহার অস্তিত্ব ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, (আপাততঃ) কোন কালেই বাধিত হইল না; অতএব কার্য্য-ঘট অসৎ, কারণ-মৃত্তিকা (ঘট-তুলনায়) সৎ। পাঠকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত, যে এই মৃত্তিকা পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূত "ক্ষিতি" নহে। (২) কোন বস্তু যেমন কাল-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তেমনি উহা দেশ ও বস্তু-পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। ঘটে যেমন কালের পরিচ্ছেদ থাকায় উহাকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমনি উহা বস্তু-পরিচ্ছিন্নও হইতে পারে। ঘট যেমন সর্ব্বকালে থাকে না, সেইরূপ সর্ব্বদেশেও থাকে না। আমার সম্মুখস্থ এই ঘট আমার সম্মুখস্থ দেশ বা স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, অন্যান্য স্থানে নাই। ঘট যে দেশে থাকে, সেই দেশই তাহার অধিকরণ, সুতরাং ঘটকে যেমন দেশ-পরিচ্ছিন্ন বলা যায়, তেমন বস্তু-পরিচ্ছিন্নও বলা যায়। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদকে বস্তু-পরিচ্ছেদ বলে। ঘটের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যে ভেদ, সেই উহার স্বগত-ভেদ,

(২) হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ, "নারদ সনৎকুমার-সংবাদ" ১৫৩ পৃষ্ঠা (৭) টীকা দ্রষ্টব্য। পঞ্চগুণ বিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মৌলিক কঠিন (Solid) ক্ষিতি বা পৃথিবী, চতুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য চতুর্গুণবিশিষ্ট মৌলিক দ্রব-পদার্থ (liquid) অপ্, ত্রীন্দ্রিয় গ্রাহ্য ত্রিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক আগ্নেয় পদার্থ (Igneous) অগ্নি বা তেজ, ইন্দ্রিয়দ্বয়-গ্রাহ্য দ্বিগুণ বিশিষ্ট মৌলিক বায়বীয় পদার্থ (Gaseous) বায়ু এবং ইন্দ্রিয়ৈক-গ্রাহ্য এক গুণ বিশিষ্ট সর্ব্বাবকাশব্যাপী মৌলিক পদার্থকে আকাশ (ether) বলে। আধুনিক বিজ্ঞানও আকাশকেই জগতের ভৌতিক কারণ বলিতে অগ্রসর হইতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অতি অল্পদিন হইতেই এই আকাশের (ether) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা পূর্ব্বে পদার্থকে (matter) তিন ভাগে বিভাগ করিতেন—(Solid, liquid and gas) কঠিন, দ্রব এবং বায়বীয়; আগ্নেয় পদার্থ সমূহ অর্থাৎ আলোক, তাপ, তড়িৎ প্রভৃতিকে পদার্থ না বলিয়া উহাকে শক্তি (force) মাত্র বলিতেন এবং আকাশের (ether) অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার

অন্যান্য ঘটের সহিত যে ভেদ, সে উহার স্বজাতীয় ভেদ এবং ঘটেতর বস্তুর সহিত যে ভেদ, সে বিজাতীয় ভেদ। সহজ কথায় বলিতে গেলে, মৃত্তিকা-কারণ কার্য্য-ঘট অপেক্ষা অধিক স্থায়ী বলিয়া ঘট-তুলনায় সৎ। কার্য্যাপেক্ষা কারণ সৎ। ঘট অপেক্ষা মৃত্তিকা সৎ, মৃত্তিকা অপেক্ষা মৃত্তিকার কারণ সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত-সত্তা (তন্মাত্র) সৎ। ঐ পঞ্চভূতের মধ্যে (উত্তরোত্তর আপেক্ষিকরূপে) ক্ষিতি অপেক্ষা অপ্, অপ্ অপেক্ষা তেজ, তেজ অপেক্ষা বায়ু, বায়ু অপেক্ষা অকাশ সৎ। কারণে কার্য্য লীন হইলে, কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না; অতএব কার্য্য কারণ অপেক্ষা অসৎ এবং কারণ কার্য্যাপেক্ষা সৎ। এইরূপ কারণ হইতে কারণান্তরে যাইয়া, আমরা ব্রহ্মের "শক্তি" বা মায়াতে উপনীত হই। এই মায়া-শক্তি জগতের কারণ স্বরূপ বলিয়া সৎ এবং ব্রহ্মের কার্য্য স্বরূপ বলিয়া অসৎ।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে "মায়াবাদ" আধুনিক বৈদান্তিকদিগের কল্পনোদ্ভূত, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই। তাঁহাদের এ সংস্কার যে ভ্রমাত্মক, তাহা ঋগ্বেদীয় "নাসদীয় সূক্ত" দ্বারাই স্পষ্ট

করিতেন না, কিন্তু সংপ্রতি পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা Light, heat, electricity এবং ether প্রভৃতিকে 'imponderable matter' অর্থাৎ সূক্ষ্ম (স্থূলের বিপরীত) পদার্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইহাও স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, উহারা সকলেই আকাশ (ether) সম্ভূত। বস্তুতঃ Matter and Forceএর মধ্যে পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে প্রভেদ করিতেন, তাহা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Matterও Forceএ পরিণত, Forceও Matterএ পরিণত হয়। প্রভেদ কেবল দৃশ্যতঃ। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; তাহাই পদার্থ— আর্য্য দার্শনিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। আকাশই ভৌতিক জগতের মূল কারণ। বায়ু আকাশ হইতে, অগ্নি বায়ু হইতে, অপ্ অগ্নি হইতে এবং ক্ষিতি অপ্ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ মূল উপাদানের সংযোগেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত এবং তাহাদের পঞ্চ গুণের পরস্পর সম্বন্ধ নিম্নে দেওয়া হইল।—

ইন্দ্রিয় ...... ভূত ...... গুণ—
কর্ণ .... আকাশ .... শব্দ।
ত্বক্ .... বায়ু .... শব্দ, স্পর্শ।
চক্ষু .... অগ্নি .... শব্দ, স্পর্শ, রূপ।
জিহ্বা .... অপ্ ...... শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।
নাসিকা ...... ক্ষিতি, ... শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

ক্ষিতি পঞ্চগুণ বিশিষ্ট, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অপ্ চারিগুণ বিশিষ্ট এবং চারি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, অগ্নি তিন গুণ বিশিষ্ট এবং তিন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; বায়ু দুইগুণ বিশিষ্ট এবং দুই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আকাশ এক গুণ বিশিষ্ট এবং এক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। আকাশ-তত্ত্বে পাশ্চাত্য দার্শনিক কেবল প্রবৃত্ত, কিন্তু ইহার মধ্যেই কেবল আকাশের সাহায্যে যে শব্দ পরিচালন করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং বঙ্গের সুসন্তান অধ্যাপক শ্রীল জগদীশ চন্দ্র বসু একটি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, উহা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় ২বৎসর পূর্ব্বে দেখাইয়াছিলেন এবং গত বৎসর Padre Lafont ও ঐ যন্ত্রের সাহায্যে উহা দেখাইয়াছেন। কঠিন ও দ্রবাদি পদার্থ যে বায়বীয় আকার ধারণ করে, তাহা অনেকেই জানেন, পাশ্চাত্যগণ স্বর্ণাদি কতকগুলি পদার্থকে বায়বীয় আকার ধারণ করাইতে পারেন নাই বলিয়া যে কোনকালে উহা হইবে না, তাহা নহে। পাশ্চাত্যেরা এইক্ষণ যে ৬৭টি মৌলিক পদার্থ নির্দ্ধারণ করেন, উহা কালে নিশ্চয়ই থাকিবে না। কালে আকাশই জগতের এক মাত্র মৌলিক পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত হইবে। আর্য্য-দার্শনিক আকাশ পরিত্যাগ করিয়া, আকাশের কারণ ব্রহ্মে উপনীত হয়েন এবং ব্রহ্মকেই বিশ্বের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রতীয়মান হইবে। "নাসদীয় সূক্ত"ই মায়াবাদের ভিত্তি। প্রলয় কালে পরস্পর আপেক্ষিক "সদসৎ" কিছুই ছিল না, তখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম মাত্র ছিলেন, "নাসদীয় সূক্ত" (১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের হিন্দু-পত্রিকায় ১৭১পৃঃ দ্রষ্টব্য) দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে। এই মায়াময় জগতের মধ্য দিয়া কিরূপে ব্রহ্ম-পদার্থে উপনীত হওয়া যায় বা মানব ব্রহ্মত্ব অধিকার করিতে পারে বা ব্রহ্মই হইতে পারে, উপনিষৎ তাহাই শিক্ষা দেন।

জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই অস্থায়ী। ধন-জন-যৌবনাদি কিছুই স্থায়ী নহে। রাজা-প্রজা সকলকেই মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হইতে হয়। গ্রহ নক্ষত্রাদিও কালের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। যাহা অস্থায়ী বা সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে কোন ক্রমেই সুখ হইতে পারে না। সুখ ইচ্ছা করিলে, স্থায়ী অসীম পদার্থ চাই। আর্য্য-ঋষিগণ এই অস্থায়ী সসীম জগৎ পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী এবং অসীম ভূমার অন্বেষণেই আত্মসমর্পণ করিতেন। উপনিষৎ সেই নিত্যান্বেষী ঋষিদিগের অক্ষয় জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ।

নিত্য বস্তু অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঋষিরা দেখিলেন যে, বিষয় এবং বিষয়ী ভিন্ন আর কিছুই নাই। "আমি"ই "বিষয়ী" আর আমি ভিন্ন সকল বস্তুই "বিষয়"। আমার নিজের শরীর-মনও বিষয়। "বিষয়" হইতে বিরত হইয়া "বিষয়ীর" দিকে মনোনিবেশ করিলে, আমার "আমি"—তোমার "আমি"—তাহার "আমি"—সকল "আমি"-কেই এক "আমি" বলিয়া জ্ঞান হইবে। তুমি আমি সোপাধিক "আমি"; তোমার ও আমার "আমি"র উপাধি বা মায়া নষ্ট হইলেই, তোমাতে-আমাতে কোন ভেদ থাকিল না।—আমরা উভয়েই নিরুপাধিক আমি হইলাম। যেমন অসীম আকাশ ঘটরূপ-উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া "ঘটাকাশ" হয়, সেইরূপ পরমাত্মা মায়াবিশিষ্ট হইয়া জীবাত্মা হন। আমরা সকলেই এই জীবাত্মার সত্তা অনুভব করিয়া থাকি। "আমি আছি" ইহা সকলেই উপলব্ধি করেন; "আমি নাই" ইহা কেহ উপলব্ধি করেন না। এই আমিই আত্মা বা জীবাত্মা এবং ইনি যখন মায়া রহিত হন, তখন ইনিই পরমাত্মা।

পূর্ব্বে "বিষয়" ও "বিষয়ীর" কথা বলিয়াছি। বিষয়ী জ্ঞাতা এবং বিষয় জ্ঞাত। এই বিষয় বা জ্ঞাত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু বিষয়ী বা জ্ঞাতা অপরিবর্ত্তনশীল। পাঠকের ইহাও জানা উচিত যে, যখন সকল জ্ঞাত বস্তুর অভাব হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞানের কোন প্রভেদ থাকে না, তখন জ্ঞাতাও জ্ঞান, জ্ঞানও জ্ঞাতা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে, জ্ঞান চিরকালই এক, জ্ঞাতই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের মনুষ্য-জ্ঞান, পশু-জ্ঞান, ঘট-জ্ঞান, পট জ্ঞান, ইত্যাদি বস্তু বা বিষয় ভেদে বিবিধ প্রকার জ্ঞান আছে বটে, কিন্তু মূল জ্ঞান চিরকালই এক। ঘট দেখিবামাত্র, তোমার ঘট-জ্ঞান হইল, কিন্তু একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারিবে যে, উহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত,—সুতরাং উহা মৃত্তিকা-জ্ঞান মাত্র আর একটু সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে জানিতে

পারিবে যে, উহা পঞ্চ ভূতের বিকার। এইরূপ বস্তু ভেদে তোমার জ্ঞানের ভেদ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু জ্ঞান একই। দেশ, কাল ও বস্তু ভেদে ঐ জ্ঞান বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু ঐ সমুদয় ছাড়িয়া দিলে, জ্ঞান একই পদার্থ। যদি বল বিষয় ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান থাকে না, সে কথা ঠিক নয়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটি অবস্থা চিন্তা কর। জাগ্রত অবস্থায় নানাবিধ বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতেছে সত্য এবং ঐ সমুদয় বিষয় আমার ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হওয়ায়, তাহাদিগের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হইতেছে; কিন্তু স্বপ্ন কালে আমর ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয় থাকে না, মানস-প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে মাত্র। সুষুপ্তি কালে মন-বুদ্ধির লয় হইলেও, জ্ঞান থাকে; কারণ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি সুষুপ্তিকালে যে অজ্ঞান অবস্থায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিল, তাহার এই জ্ঞান থাকে। সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান-বোধক জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকে এবং বিষয় বা জ্ঞাত না থাকিলে, জ্ঞাতা (বিষয়ী) বা"আমি" ভিন্ন আর কিছু নাই; কারণ কাহারও কখন অস্মৎ-অপ্রত্যয় হয় না, অর্থাৎ 'আমি নাই' এরূপ বোধ হয় না। বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞান থাকে, বিষয় ছাড়িয়া দিলেও জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। বিষয় না থাকাতে, জ্ঞাতা বিষয়ীর অন্য কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না এবং পূর্ব্বে—অর্থাৎ প্রথম প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, তাহাই বিষয়; বিষয়ী কখনও জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। বিষয়ী জ্ঞানের বিষয় হইলে, সে বিষয় হইল—বিষয়ী থাকিল না। বিষয় ছাড়িয়া দেখিলে দেখা যায় যে জ্ঞান থাকে, আর এক দিকে দেখা যায় যে জ্ঞাতা (বিষয়ী) থাকে। এই জ্ঞান ও বিষয়ী বা জ্ঞাতা এক; উপাধি-ভেদে উহা পৃথক্ কল্পিত বা অনুভূত হয় মাত্র। (ক্রমশঃ)

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমালোচনা অর্থ সম্যকৃরূপে আলোচনা, দোষ-গুণের যথাসম্ভব—যথাযথ-বিচার; অতএব সম্যকৃরূপে বস্তুর দোষ-গুণের যথাযথ বিচার করিতে হইলে 'সংক্ষিপ্ত' শব্দটি সমালোচনার বিশেষণরূপে বসাইতে সুসঙ্গতি বোধ হয় না। এইজন্যই গত চারি বৎসর বহু পুস্তক-পত্র-পত্রিকাদি হিন্দুপত্রিকার উদ্দেশে উপহার পাইয়াও তাহাদের কোন সমালোচনা হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুর ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের বিরাট কল্পভাণ্ডারের সেবা করিতে ক্ষুদ্রকায়া হিন্দুপত্রিকার অধিকার কত ক্ষুদ্র, কত অকিঞ্চিৎকর, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। যাহাহউক, এ অবস্থায় মুখ্যতঃ তদঙ্গীভূত ভাবের গ্রন্থাদি ও গৌণতঃ সাধারণ গ্রন্থাদির যথাসম্ভব ও যথাশক্তি কিঞ্চিৎ আলোচনাই হিন্দুপত্রিকায়

"সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" হইবে। এই ১৩০৫ বঙ্গাব্দের নববর্ষ হইতেই উক্ত প্রকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আরম্ভ করা হইল।

আর একটি কথা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রধানতঃ দোষ না খুঁজিয়া, সমালোচ্য গ্রন্থাদির গুণাংশ দেখাইতেই চেষ্টা করিব। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য গুণ কিছু না থাকিলে, তাহার প্রাপ্তি-স্বীকার মাত্র করিব বা তৎসম্বন্ধে সামান্য দু-চারি কথা মাত্র বলিব। কোন বিশেষ গ্রন্থাদির একটু বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করার অবকাশ পাইলে, তাহার গুণাংশ আলোচনার সঙ্গে ২ দোষাংশও যথাসম্ভব আলোচনা করিব। যেসব দোষ না ধরাই দোষ, তাহা অবশ্য আলোচ্য।

হিন্দুপত্রিকায় গ্রন্থাদির সমালোচনা সাহিত্য-সেবারূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্যের উপরেই স্থাপিত রহিবে; ভরসা করি, কখনও বণিগ্‌বৃত্তি (পেশাদারি) ইহার ভিত্তিরূপে পরিণত হইবে না।

উপাসক।

নবদ্বীপ-হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি, এ-প্রণীত।

ভগবাদিচ্ছায় সমালোচনা প্রকাশের উদ্যোগ-প্রারম্ভেই আমরা ভগবদুপাসনার দার্শনিকতত্ব-রসাশ্রিত এই সুন্দর অভিনব খণ্ড-কাব্যখানি সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথমতঃ পুস্তকখানি হাতে পাইয়াই মন প্রফুল্ল হইল। নামটী সুন্দর, ছাপা সুন্দর, কাগজ—বাঁধাই সুন্দর। তার পর রচনা, তাহাও আমাদের কাছে সুন্দর লাগিয়াছে। কবি সেই উপাস্যদেবের কৃপায় তাঁহার "উপাসক" রচনায় বেশ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রথমেই তিনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া কাব্যরঙ্গ-ভূমে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কাব্যের প্রারম্ভেই—

"কে তুমি জগৎ-সখা,
বিশ্ব-পটে দেও দেখা"

ইত্যাদি বলিতে বলিতে যেন পা বাড়াইয়াছেন। ভরসা করি, জগৎ-সখার কৃপায় কাব্য-জগতে তিনি যশস্বী হইবেন। প্রথমেই বেশ ভাবটি লাগিয়াছে, পরে ক্রমে ভাবের জমাট বাঁধিয়াছে।

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। আবার রসের মধ্যে শান্তরসই সাত্বিক ও সাধু-জন-সেব্য। কাব্যখানি সেই সুবিমল শান্তরসের উৎস স্বরূপ। অপিচ, ইহাতে অধ্যাত্ম-জগতের কঠিন দার্শনিক তত্ত্ব সমূহ কাব্য-রসে মাখিয়া, অতি কোমল ও উপাদেয় করা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত-গীতা প্রভৃতির স্বর্গীয় সৌরভ ইহার প্রতি কবিতা-কুসুম হইতেই নির্গত হইতেছে। পুস্তকখানিতে একাধারে দর্শন ও কাব্যের অপূর্ব্ব রাসায়নিক মিশ্রণ হইয়াছে।

কয়েকটি স্থান যথেচ্ছভাবেই উদ্ধৃত করিলাম—

"নিতি বাঁচি নিতি মরি,
তবু না শিখিতে পারি
জীবন কাহারে কয়,
কি হয় মরণ,
এ গূঢ় রহস্য মনে
ঢাকা মায়া-আবরণে;
বুঝায়ে দিতেছে নিত্য
নিদ্রা-জাগরণ।

"যাহারে ভাবিয়া 'আমি',
কি বিষম পাগ্‌লামি!
সেবিছে যতনে নিত্য
মুগ্ধ নরগণ,

সে দেহ সে আমি নয়,
দেহাধারে 'আমি' রয়,
আধারে আধেয়-ভ্রান্তি
অজ্ঞান কারণ।
দেহের ভিতরে দেহ,
এ দেহ বিচিত্র গেহ,
তাহাতে বসতি করে
আত্মা চিন্ময়।"
ইত্যাদি।

—— ০:::০ ——

'আমার' 'আমার' বলি,
মমতার সুর তুলি,
সংযোগে হাসিছে জীব,
বিয়োগে কাঁদিছে।
খেলিতে ভবের খেলা,
হাসি কান্না দুইবেলা;
জীবন-মরণ দোঁহে
আসিছে যাইছে।"

—— ০:::০ ——

বর্ণন-কবিত্বে পক্ষেও বিশ্বেশ্বর বাবু বেশ সফলতা দেখাইয়াছেন। "উষাগমে" কবিতার প্রথমেই পড়িলাম——

"নিশি অবসান, পাখী মধুর গাইছে,
অনুরাগে ভরি;
শান্তির অমিয়ধারা শীতল আঁধারে
পড়িতেছে ঝরি।
উষার আলোক ভাতি
নিশার আঁধারে মিশি,
বেড়িয়াছে চরাচর
অপূর্ব্ব ছায়ায়;
অস্ফুট মূরতি কত
পুনঃ বুঝি বিশ্বপটে
লাঞ্ছিত হতেছে ক্রমে
মায়া-তুলিকায়!"

ইত্যাদি বেশ লাগিল। "হরিদ্বারে" "সাধনা" "ভক্তি" "মৃত্যু" প্রভৃতি কবিতা বেশ মিষ্ট ও ইষ্টসাধন-শিক্ষার সাহায্যকারী।

উপাসকের কবিতাগুলি যেন ভাগবতানন্দের মধুর একতান সুরে বাঁধা। কবি সকল কবিতাতেই যেন জগতের সর্ব্বত্র ভগবানের মঙ্গলমূর্ত্তি, সর্ব্ব কার্য্যেই তাঁহার মঙ্গল-হস্ত ও জন্ম-মরণাদি সকল ব্যাপারই মঙ্গলানন্দময়, এই ভাব ঘোষণা করিয়াছেন। ফলে "উপাসক" পাঠে বঙ্গীয় পাঠক কবিত্বে প্রীত ও ধর্ম্ম-শিক্ষায় উপকৃত, উভয়ই হইবেন, আশা করি। ভগবান বিশ্বেশ্বরবাবুকে দীর্ঘজীবী ও এইরূপে বঙ্গ-সাহিত্যসেবী করিয়া রাখুন, ইহাই প্রার্থনীয়।

—— ০:::০ ——

হোরা-বিজ্ঞান-রহস্যম্।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র
জ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য-
কৃত।

প্রথম কাণ্ড।

আমরা জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়ের "হোরা-বিজ্ঞান-রহস্য" প্রথম কাণ্ড অতি সমাদরে পাঠ করিলাম। গ্রন্থকারের উদ্যম মহৎ, অধ্যবসায় অসীম, অনুশীলন বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্য বিশাল, প্রথম কাণ্ডেই তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। তবে গ্রন্থকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বিষয় সুদুস্তর, শেষ রক্ষা হইলে হয়।

প্রথম খণ্ড দুই শাখায় বিভক্ত। প্রথম শাখা—জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবতারণা। দ্বিতীয় শাখায় প্রারম্ভে রাশি-নির্ণয়। ক্রমে নক্ষত্র

নির্ণয়, রাশি-রূপ, নক্ষত্র-রূপ ইত্যাদি বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় শাখা গণিত-জ্যোতির্বিদ্যার উপক্রমণিকা। গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা ৩ ভাগে বিভক্ত। ১ম—গ্রহ-নক্ষত্র আদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর সৃষ্টি ও সংখ্যা নির্ণয়। ২য়—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর আকর্ষণ, গতি, আকার ও প্রকার-নির্ণয়। ৩য়—বাহ্য প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি ও আকর্ষণাদির ফলাফল নির্ণয়। গণিত জ্যোতিষ মূল শাস্ত্র; ফলিত-জ্যোতিষ গণিত জ্যোতিষের তাৎপর্য্য। মানব-প্রকৃতির প্রতি গ্রহ-নক্ষত্রাদির ক্রিয়ার ফলাফল ফলিতজ্যোতিষের বিষয়ীভূত। শাখা-স্কন্ধ ফলিত জ্যোতিষের অঙ্গান্তর মাত্র। জ্যোতিষ হিন্দুজাতির আদি সম্পত্তি। পুনঃপুনঃ রাজবিপ্লবে ভারতে গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্যা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে; ফলিত-জ্যোতিষও মুমূর্ষু দশাপন্ন। আমাদের এক্ষণে যথাপ্রাপ্ত হিন্দু গণিত জ্যোতিষ অপেক্ষা পাশ্চাত্য গণিত জ্যোতিষ বহু বিবৃত, লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ আদিম অবস্থাপন্নই আছে।

ভারতীয় গণিত জ্যোতিষ বিলুপ্ত প্রায়, সুতরাং গ্রন্থকার ২য় শাখায় ভ্রম প্রমাদে পতিত হইবেননা, ইহা আমরা আশা করিনা। ভ—চক্র পরীক্ষা করিলে, রাশি-স্বরূপ ও নক্ষত্র-স্বরূপ যেরূপ লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভ—চক্রস্থ নক্ষত্র, এক বা ততোধিক তারকাত্মক। এক স্থানীয় নক্ষত্র সমষ্টির নাম রাশি।

১ম—রাশি-স্বরূপ।

অধিকাংশ রাশি গণের রূপ কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেবল বিশাখা, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা, এই নক্ষত্রত্রয় যোগে প্রকৃত বৃশ্চিকের আকৃতি লক্ষিত এবং কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্র গণ মধ্যে অশ্লেষা নক্ষত্রকে তাহার উভয় নক্ষত্রের সহিত মিলিত-ভাবে দেখিলে, কর্কটাকৃতি দেখায় এবং মীন রাশিস্থ রেবতী মৎস্যাকৃতি বটে। অশ্লেষা হইতে কর্কট রাশির এবং রেবতী হইতে মীনরাশির নামকরণ হইয়াছে।

২য়—নক্ষত্র-স্বরূপ।

জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে ভ—চক্রের নক্ষত্র গণের প্রতিমূর্ত্তি দিয়াছেন (৩৯। ৪০ ৪১পৃষ্ঠা) প্রতিমূর্ত্তিগুলি চিত্র বিচিত্র ও মনোহর বটে এবং রহস্যময় হইলেও জ্যো বিজ্ঞান-রহস্যের উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রতিমূর্ত্তিগুলির আকারগত অসম্পন্নতা আলোচিত হইল। প্রতিমূর্ত্তি গুলি অবিকল হইলেই ভাল হইত। হয়ত জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় অনাবশ্যক বোধে প্রতিমূর্ত্তি গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, কিন্তু এরূপ উচ্চ দরের গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গ-সুসম্পন্ন হওয়া একান্ত বাঞ্ছনী বোধে এবং "দোষাবাচ্যা গুরোরপি" বচন বলে অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রতিমূর্ত্তির দোষ গুলি নির্দ্দেশ করিতে আমরা সাহসী হইলাম।

ভ—চক্রস্থ নক্ষত্র নিচয়ের প্রকৃত রূপ বা আকৃতি, যাহা নভো-মণ্ডলে দেদীপ্যমা দৃষ্ট হয়, ঐ আকৃতিগুলির সহিত গ্রন্থস্থ প্রতি মূর্ত্তির অনেক স্থলে সৌসাদৃশ্য নাই তুলনা করিলে, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়

ভ—চক্রের নক্ষত্রগণ অশ্বিনী হইতে ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ৩ দেশে স্থাপিত হইবে। অশ্বি নক্ষত্রের তারকত্রয় পশ্চিমাভিমুখে অ মুখাকৃতি। উত্তরস্থ তারকাটী কর্ণদ্ব মধ্য দেশে, মধ্যগত তারক নাসা রন্ধ্রদ্ব মধ্য দেশে এবং দক্ষিণস্থ তারক চি

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা,

চিত্তানুশাসনম্।

—•:০:•—

(পূর্ব্বপ্রকাশাৎ পরং।)

সুখমৈন্দ্রিয়িকং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাং।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথাদুঃখমযত্নতঃ ॥ ৩ ॥

হে দৈত্য-বালকগণ! দেহীদিগের দেহ-যোগে ইন্দ্রিয় জনিত সুখ, দুঃখের ন্যায় পূর্ব্ব অদৃষ্ট বশতঃ সর্ব্বত্র লাভ হইয়া থাকে। ৩ ॥

দেহযোগেন—কারণ সুখদুঃখ দেহধর্ম্ম মাত্র। সর্ব্বত্র—পশ্বাদাবপি—পশ্বাদি দেহেও।

দৈবাৎ—পূর্ব্বাদৃষ্টাদেব—পূর্ব্ব জন্মের অদৃষ্ট বশতঃ—অর্থাৎ যেরূপ দুঃখ লাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হয় না, তদ্রূপ সুখলাভ করিবার জন্যও যত্ন করিতে হয় না, কারণ সুখদুঃখ দেহীর ধর্ম্ম, তজ্জন্য ১১স্কন্ধে কহিয়াছেন—

(লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায়) বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ ॥
৯ অধ্যায়ে ২৯।

ইহার অনুবাদ তৃতীয় বর্ষের ১৯৮পৃষ্ঠা ১স্তম্ভে আছে। যখন শূকরাদির জন্ম-গ্রহণেও বিষয় ভোগ—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত সুখ-অনুভব হইয়া থাকে, তাহার জন্য বৃথা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্ব জন্মে যাহা কৃত হইয়া থাকে, তাহাই এই জন্মে ভোগ হইয়া থাকে। সুনীতি ধ্রুবকে কহিয়াছিলেন—

নোদ্বেগস্তাত কর্ত্তব্যঃ কৃতং যদ্ভবতা পুরা॥
তৎকোঽপিহর্ত্তুং শক্নোতি দাতুংকশ্চা-
কৃতংত্বয়া ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১অংশে ১১ অধ্যায়ে

হে পুত্র! উদ্বেগ করিওনা; পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপহরণ করিতে পারিবে? এবং যাহা কর নাই, তাহা কে দিতে পারিবে? এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, পূর্ব্ব জন্ম আছে কি না? ইহার মীমাংসা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬প্রপাঠকে ১১খণ্ডে ৩ মন্ত্রে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন, যথা—

"জাতমাত্রাণাঞ্চ জন্তুনাং স্তন্যাভিলাষভয়াদি দর্শনাচ্চাতীত জন্মান্তরানুভূতস্তনপানদুঃখা-নুভবস্মৃতির্গম্যতে ॥"

জাতমাত্র জন্তুর স্তনপানে অভিলাষ ও ভয়াদি দেখিতে পাওয়া যায়, উহাতে পূর্ব্ব

জন্মে যে স্তনপান করিয়াছিল ও দুঃখানুভব করিয়াছিল, ইহা স্মরণ হওয়াতে সেইরূপ স্তনপানে অভিলাষ ও দুঃখ-ভয়ে ভীত হইয়া থাকে।

যখন পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার বশতঃ মনুষ্য কর্ম্ম করে ও সেই সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, তখন সুখের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্ব-জন্মকৃত ফল মনুষ্য অবশ্য ভোগ করে।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মনৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
১০ স্কন্ধে ২৪ অ ১৩॥

কর্ম্মদ্বারা জন্তু জন্ম গ্রহণ করে, কর্ম্মদ্বারা লয় প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন পূর্ব্ব জন্মে কি করিয়াছি, জানিনা ও যখন সেই কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী, তখন তাহার জন্য চেষ্টা করা বৃথা। তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

ভবিতব্যং ভবত্যেব তচ্চ লোকেন বুধ্যতে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবত্যেব যদভাব্যং নতদ্ভবেৎ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

যাহা হইবার, তাহা হইবে, মনুষ্য তাহা জানিতে পারেনা। যাহা হইবার, তাহা হইবে ও যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবেনা।

তৎপ্রয়াসো নকর্ত্তব্যো যতআয়ুর্ব্যয়ঃপরং।
নতথাবিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজং॥ ৪॥

সুতরাং তজ্জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ঐ প্রয়াসে কেবল আয়ুর ব্যয় মাত্র। মুকুন্দ-চরণ-সেবা দ্বারা যতদূর মঙ্গললাভ করা যায়, ঐ প্রয়াসে তদ্রূপ মঙ্গললাভ করা যায়না। ৪॥

ক্ষেমং—মঙ্গলং। মুকুন্দের চরণ সেবাই প্রধানে মঙ্গল।

আয়ুর্ব্যয়ঃ—জীবনের ব্যয়। মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, সুতরাং সেই জীবন বৃথা অতিবাহিত না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা-মৃতাস্বাদন বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে ১১স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে শৌনক সূতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ং।
অথবাস্যপদাম্ভোজ মকরন্দলিহাংসতাং॥
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষোযদসদ্ব্যয়ঃ॥ ৭॥

হে মহাভাগ! যদি কৃষ্ণাশ্রয় কথা হয়, সেইরূপ কথা বলুন, অথবা কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপানকারী সাধুদিগের জীবনচরিত বর্ণনা করুন, কারণ অন্য অসদালাপে প্রয়োজন কি—যাহা জীবনের অসদ্ব্যয় মাত্র?

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাযুক্ত কথাব্যতিরেকে অন্য কথা বৃথা।

নযদ্বচশ্চিত্র পদংহরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীতকর্হিচিৎ।
তদ্বায়সংতীর্থমুশন্তিমানসানযত্রহংসানিরমন্ত্য-শিকৃক্ষয়াঃ॥
প্রথম স্কন্ধে ৫ অ, ১০।

মনোহর পদযুক্ত বাক্যও যদি শ্রীহরির জগৎ-পবিত্রকারী যশঃ বর্ণনা না করে, তাহা বাক্যই নহে। সেরূপ বাক্যকে কাকতীর্থ কহে,—উহাতে জ্ঞানী পরমহংস সকল আনন্দানুভব করেননা; অর্থাৎ যেরূপ মানস-সরোবরের হংস মনোহর পদ্মযুক্ত মানস-সরোবর ত্যাগ করিয়া বিচিত্র অন্নাদিযুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে—কাকের ক্রীড়া স্থানে আনন্দলাভ করেনা, তদ্রূপ ব্রহ্ম নিবাসভূত পরমহংস সকল শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রয় বাক্য ত্যাগ করিয়া সামান্য কথায় আনন্দানুভব করেন না।

ততোবত্তেত্ কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলং॥ ৫॥

তজ্জন্য কুশলীব্যক্তি সংসার প্রা

হইয়া যতদিন শরীর সবল থাকে ও নষ্ট না হয়, ততদিন শীঘ্র মঙ্গলজন্য যত্ন করিবে। ৫॥

ভবমাশ্রিতঃ—সংসারঃ প্রাপ্ত হইয়া।।

শরীরং পুরুষং—পুরুষরূপ শরীর।

ন বিপদ্যেত—অক্ষমং নভবেৎ—অক্ষম না হয়।

পুষ্কলং—জরা রোগাদি অভাবে পুষ্ট অথবা যত্নসমর্থ।

এইরূপ একাদশ স্কন্ধে ৯ম অধ্যায়েও কহিয়াছেন—

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণংযতেতনপতেদনুমৃত্যুযাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় (বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ)॥ ২৯॥

অনেক জন্মের পর দুর্লভ, অনিত্য, কিন্তু মনোরথপ্রদ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যতক্ষণ মৃত্যু না হয়, ততক্ষণ নিজমঙ্গল জন্য ধীরব্যক্তি শীঘ্র যত্ন করিবে (কারণ বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াই হইয়া থাকে)।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরও তজ্জন্য খেদ করিয়াছিলেন যে—

হরিহরি বড়দুঃখ রৈল মোর মনে।
পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণভজন বিনু,
হেন জন্ম গেল অকারণে॥

এই বিষয়ে আরও বৈরাগ্য শতকে ও গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ১৪ অধ্যায়ে কহিয়াছেন,—

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবর্জ্জরাদূরতো
যাবচ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিরপ্রতিহতাযাবৎ
ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেববিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো
মহান্ সন্দীপ্তে ভবনেতু কূপখননং
প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

যতদিন এই শরীর রোগশূন্য ও যাবজ্জরা দূরে থাকে, যাবৎ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ু ক্ষীণ না হয়, ততক্ষণ জ্ঞানীলোক নিজ মঙ্গল জন্য যত্ন করিবে, কারণ গৃহ প্রজ্বলিত হইলে, কূপ-খননে যত্ন আবশ্যক কি?

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

এবিষয়ে বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩০অধ্যায়ে যথা—

দুর্লভং জন্ম মানুষ্যং প্রার্থ্যতে ত্রিদশৈরপি।
তল্লব্ধ্বা পরলোকার্থং যত্নং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥১০॥

দুর্লভ মনুষ্যজন্মকে দেবতারাও প্রার্থনা করেন; সেই জন্ম লাভ করিয়া পরলোক জন্য জ্ঞানী লোক যত্ন করিবেন।

অন্যত্র এবিষয়ে যথা—

দুর্লভং প্রাপ্য মানুষ্যং নার্চ্চয়ন্তিচ যে হরিং।
তেষামতীবমূর্খানাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি॥
৩২ অধ্যায়ে ৩৭।

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে হরিকে অর্চ্চনা না করে, সেই অতিমূর্খের বিবেক কোথায় থাকে?

মহতা পুণ্যপণ্যেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া।
পারংদুঃখোদধের্গন্তুংত্বর যাবন্নভিদ্যতে।
শান্তিশতকে।

পুংসোবর্ষশতংহ্যায়ুস্তদর্দ্ধঞ্চাজিতাত্মনঃ।
নিষ্ফলংযদসৌরাত্র্যাং শেতেন্ধং
প্রাপিতস্তমঃ। ৬।
মুগ্ধস্য বাল্যেকৈশোরে ক্রীড়তো যাতি
বিংশতিঃ।
জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য
বিংশতিঃ॥৭॥
দুরাপূরেণ কামেন মোহেনচ বলীয়সা।
শেষংগৃহেষু শক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতিহি॥৮॥

মনুষ্যের একশত বৎসর আয়ু। অজিতাত্মার

উহা অর্দ্ধেক, কারণ সে রাত্রিকালে অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়া অকারণ শয়ন করিয়া থাকে। (যদি বল যে—কেন, আরও ত পঞ্চাশ বৎসর বাকি। তদুত্তরে কহিতেছেন) মুগ্ধব্যক্তির বাল্য ও কৈশোরাবস্থায় বিংশতি বৎসর ক্রীড়ায় যায়। (কেন, তা হইলেও আরও ত ত্রিশ বৎসর বাকি; তাহার উত্তরে কহিতেছেন) জরাগ্রস্তব্যক্তির অসমর্থতা বশতঃ আরও বিংশ বৎসর অতীত হইয়া থাকে।

আর দশবৎসর অবশিষ্ট; তাহাতেই যে শ্রীহরি-স্মরণ হইবে, তাহারও আশা নাই, কারণ, সকল হইতে দুঃখে পরিপূর্ণ কাম ও বলবান মোহদ্বারা গৃহাসক্ত হইয়া প্রমত্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট আয়ু অতিবাহিত হইয়া থাকে।

এবিষয়ে ভবিষ্য পুরাণে উত্তর পর্ব্বে ৪অধ্যায়েও এইরূপ আছে, যথা—

হেজনাঃকিংনপশ্যধ্বং সহস্রস্যাপিমধ্যতঃ।
জনাঃশতায়ুসঃপঞ্চ ভবন্তি ন ভবন্তিচ॥৯৩॥
অশীতিকাবিপদ্যন্তে কেচিৎ সপ্ততিকানরাঃ।
পরমায়ুঃস্থিতং ষষ্টিস্তচ্চৈবানিশ্চিতংপুনঃ॥৯৪॥
যস্যযাবদ্ভবেদায়ু র্দেহিনাংপূর্ব্বকর্ম্মভিঃ।
তস্যার্দ্ধোমায়ুষো রাত্রির্হরতেমৃত্যুরূপিণী ॥৯৫॥
বালভাবেন মোহেন বার্দ্ধক্যেজরয়াতথা।
বর্ষাণাংবিংশতির্যাতি ধর্ম্মকামার্থবর্জ্জিতা॥৯৬॥
আগন্তুকৈর্ভয়ৈঃপুংসাং ব্যাধি-শোকৈরনেকধা
ভক্ষ্যতেৰ্দ্ধংচতত্রাপি যচ্ছেষংতচ্চজীবতি ॥৯৭॥
জীবিতান্তেচ মরণং মহাঘোরমবাপ্নুয়াৎ ॥৯৮॥

হে মনুষ্যগণ! তোমরা কি দেখিতেছনা যে সহস্রের মধ্যে পঞ্চব্যক্তিও শতায়ু হয় কি না হয়? ৯৩।

কেহবা অশীতি বৎসরের—কেহবা সপ্ততি বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরমায়ুর কাল ষষ্টিবৎসরও অনিশ্চিত। ৯৪।

পূর্ব্বকর্ম্ম বশতঃ মনুষ্যের যত আয়ু, তাহার অর্দ্ধেক মৃত্যুরূপিণী রাত্রি হরণ করে। ৯৫।

বাল্যভাবে, মোহে, বার্দ্ধক্যে ও জরায় ধর্ম্মকামার্থ বর্জ্জিত হইয়া বিংশতি বৎসর অতীত হয়। ৯৬।

আগন্তুক ভয় ও অনেক প্রকার রোগ ও শোকে মনুষ্যের তাহার অর্দ্ধেক পরমায়ু হরণ করে। ৯৭॥

জীবদ্দশার অন্তে মহাঘোর মরণ প্রাপ্ত হয়। ৯৮।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে ৩২ অধ্যায়ে—

হেজনাঃকিং ন পশ্যধ্বমায়ুর্যোর্দ্ধন্ত নিদ্রয়া।
হৃতঞ্চ ভোজনাদ্যৈশ্চ কিয়দায়ুঃ সমাহৃতম্।২৬॥
কিয়দায়ুর্বালভাবাৎ বৃদ্ধভাবাৎ কিয়দ্ধৃতম্।
কিয়দ্বিষয় ভোগৈশ্চ কদাধর্ম্মান্ করিষ্যথ ॥২৬॥
বালভাবেচ বার্দ্ধক্যে নঘেটতাচ্যুতার্চ্চনম্।
বয়স্যেবচ ধর্ম্মান্‌বৈ কুরুদ্ধমনহঙ্কতাঃ ॥২৮॥

হেমনুষ্যগণ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে নিদ্রায় আমাদের অর্দ্ধেক জীবন হৃত হইতেছে ও কিয়ৎ পরিমাণ ভোগবিলাসে হৃত হইতেছে? ২৬।

আয়ুর কিয়ৎপরিমাণ বাল্যভাবে, কিয়ৎ পরিমাণ বৃদ্ধভাবে ও কিয়ৎ বিষয় ভোগে হৃত হইতেছে; যদি এরূপভাবে জীবন অতিবাহিত হইতেছে, তাহা হইলে কখন ধর্ম্ম করিবে? ২৭

সাধারণতঃ বাল্য ও বৃদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা সম্ভব হয়না, তজ্জন্য বয়স হইলে অহঙ্কার শূন্য হইয়া ধর্ম্মআচরণ করিবে। ২৮

এ বিষয়ে গরুড় পুরাণে—যথা—

শতংজীবিতমত্যাল্পং নিদ্রালস্যৈস্তদৰ্দ্ধকম্।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরল্পং তদপি নিষ্ফলং॥

উত্তর ভাগে ৪৫ অধ্যায়ে।

মনুষ্যের অত্যল্প এই শতবৎসর জীবন; নিদ্রা ও আলস্যে তাহার অর্দ্ধেক গত হয়; যে অল্প অবশিষ্ট থাকে, তাহাও বাল্যকাল, রোগ, জরা ও দুঃখে নিষ্ফলে গত হয়।

এবিষয়ে ভক্তপ্রধান বিদ্যাপতিও কহিয়াছেন,—

মাধব হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীনদয়াময়
অন্তরে তোহারি শোয়াসা।
আধ জনম হাম নিঁদে গোঁয়ায়নু
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতনু
তোহে ভজব কোন্ বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত
সাগর লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথক হোয়সি
(অব্) তারণ ভার তোহারা॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ।

—o::o—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন একবার, ভাবিয়া দেখ যে বিভিন্ন রূপগুণসম্পন্ন নিয়ত অসমপরিবর্ত্তনশীল তুমি এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন কালে একটী আম্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশ প্রত্যক্ষ করিয়া কখনই বাস্তবিক একই অনুভবে পৌছিতে পারিব না, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত; অথচ আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেই মিথ্যাময় বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া লইতেছি যে, আমরা দুইজনে একই বস্তুকে একই রকমে জানিতে পারিতেছি! আমার ভুল কোথায়, একবার দেখা যাউক। আমার প্রথম ভুল এই যে, আমাদের উভয়ের দেশ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন বিভিন্নতা আমি গণনায় ধরি নাই। দ্বিতীয় ভুল এই যে, সেই আম্রটীর ভিন্নভিন্ন অংশ অনুভব করা ভিন্ন যে একই অংশের রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারি নাই, ইহা বুঝিতে চাই নাই। তৃতীয় ভুল এই যে, ভোক্তা ও ভোজ্যের বিভিন্নতায় ভোগের বিভিন্নতার অবশ্যম্ভাবিতা হিসাবে না আনিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনুভূতিকে কেবল তাহাদের নাম-করণের একতার দোষে একই অনুভূতি বলিয়া বুঝিয়া লইতেছি। আমি এক পিঠের বর্ণ দেখিয়া তাহার নাম রাখিলাম ধবল, পীত-নেত্র তুমি অন্যপৃষ্ঠের বর্ণকে হরিদ্রাক্ত দেখিয়াও কেবল আমার দেখাদেখি ধবল বর্ণ বলিতেছ। আমি আম্রের একাংশের

রসাস্বাদন করিয়া তদনুভূতির নাম রাখিলাম মধুর, আর তুমি তাহার অপর অংশের রস অন্যরূপ অনুভব করিয়াও তাহার নাম রাখিলে মধুর। আম্র হইতে যে সকল গন্ধাণু আমার নাসা-পথে প্রবেশ করিল, আমি তাহাদিগকে মৃদু গন্ধ বলিলাম, আর তদিতর অন্য কতকগুলি গন্ধাণু তোমার নাসা-মার্গে প্রবেশ করিয়া তোমাতে উগ্রগন্ধানুভূতি জন্মাইলেও তুমি আমার দেখাদেখি মৃদুগন্ধানুভূতি বলিয়া তাহাকে বুঝিলে। উষ্ণ-দেহ আমি আম্র স্পর্শ করিয়া যাহা অনুভব করিলাম, তাহাকে স্নিগ্ধ-দেহ তুমি অন্যরূপে অনুভব করিয়াও আমার অনুভূতির সহিত একই বলিয়া বিবেচনা করিলে। ফলতঃ আমরা দুই জনেই একই নামের দ্বারা আমাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পরিচয় দিতেছি এবং অজ্ঞতা বশতঃ অনুভবের বিভিন্নতার সম্ভাবনা মনে না করিয়া কেবল নামকরণের একতায় উভয়ের অনুভূতির একতা বিশ্বাস করিতেছি। ঠিকই যেন সেই চক্ষুষ্মান পণ্ডিত এবং কাণাকলুর সাঙ্কেতিক বিচার, যাহাতে কলুতে আরোপিত পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত ও কলুতে বিচার—সাঙ্কেতিক বিচার;—অর্থাৎ কেহ মুখে কোন কথা না বলিয়া ইসারা-ইঙ্গিতে প্রশ্ন ও উত্তর করিবেন। কবিকুলরত্ন কালিদাস এই বিচারে মধ্যস্থ এবং রাজা বিক্রমাদিত্য পাত্রমিত্র সহ এই সভায় সভ্য। বিচার আরম্ভ হইল; পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইলেন; প্রত্যুত্তরে কলু তর্জ্জনী ও মধ্যমা দেখাইল। পণ্ডিতজী তর্জ্জনী ঘুরাইলেন, কলু হস্তকে সাপের ফণারমত করিয়া দেখাইল। পণ্ডিতজী তাঁহার সাঙ্কেতিক প্রশ্নের কলুকৃত সাঙ্কেতিক উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। সভ্যেরা বিচারের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তাই সঙ্কেত ভাঙ্গিয়া সমুদয় বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য রাজা কালিদাসকে অনুরোধ করিলেন। কালিদাস আবার কলুকেই সমুদয় বুঝাইয়া বলিতে কহিলেন এবং কলু বুঝাইয়া দিল যে, পণ্ডিতজী তর্জ্জনী দেখাইয়া তাহার ভালচক্ষুটীও কাণা করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, তাই সে দুইঅঙ্গুলি দেখাইয়া পণ্ডিতের দুই চক্ষু কাণা করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছিল; পুনশ্চ, সে ঘানি টানে কি না, পণ্ডিতজী অঙ্গুলি ঘুরাইয়া তাহাই জিজ্ঞাসা করায়, সে তৈল-যন্ত্রের মত হাত করিয়া দেখাইয়া দিয়া ছিল যে, সে স্বয়ং ঘানি ঘুরায় না—কেবল ঘানিগাছের উপরে শুইয়া থাকে।

আশ্চর্য্য বিচারের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনিয়া কাহারও মুখে আর হাসি ধরেনা; তখন কাব্যকুশল কালিদাস তাঁহার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন; তাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত মত প্রতিপাদন করিলেন এবং ঘূর্ণায়মানা ধরণীকে অনন্তের মস্তকে বসাইয়া রাখিলেন।

ফলতঃ আমি যে সঙ্কেতের সহিত আমার যে মানসিক অবস্থার যেরূপ সম্বন্ধ ঘটাই, অন্যে তাহা বুঝিতে পারে না এবং অন্যে যে সঙ্কেতের সহিত তাহার মানসিক যে অবস্থায় যেরূপ প্রকাশ্যাপ্রকাশ্য সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা আমার বুঝিবার উপায় নাই। যে বাক্যদ্বারা আমরা পরস্পর পরস্পরকে মনের ভাব জানাইতে

পারি বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার শব্দাংশ উভয়ের কর্ণে একইরূপ বাজিবার কথা নয়; আর একইরূপ না বাজিলেও—সুতরাং তাহার অর্থাংশ দুই জনের নিকট একই রূপ প্রতিভাত না হইলেও আমরা অজ্ঞতা প্রযুক্তই শব্দাংশের কাল্পনিক একতায় অর্থাংশেরও একতা ধরিয়া লই।

শব্দের উৎপত্তি-স্থানের ইতর-বিশেষে সামান্যতঃ স্বীকৃত একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন-রূপে উচ্চারিত হইবার কথা—হইয়াও থাকে তাই। তারপর শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের পরিপাকের ইতর-বিশেষে একই শব্দকে দুইজনে ঠিক একইরূপে গ্রহণ করিতে পারাও সম্ভবপর নহে। সকলের মুখে সকল কথা সমান আসেনা, আবার সকলের কর্ণে সকল কথা সমান বাজেনা। তাই পূর্ব্ববঙ্গবাসী 'ঘোড়া' উচ্চারণে আপনার অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বলে যে "ঘোরাকে ঘোরাই বলি, তবে অন্যে শুনিবার দোষে 'ঘোরা' শুনে।"

শব্দের 'স্বরাংশ' বলিয়া আর একটা অংশ আছে, যাহার ইতর-বিশেষে অর্থেরও অনেক ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। একই শব্দে নিশ্চয়তার স্বর একরূপ, সন্দেহের স্বর অন্যরূপ; ভয়সূচক স্বর একরূপ, বিদ্রূপ-সূচক স্বর অন্যরূপ; প্রশ্নের স্বর যেমন, উত্তরের স্বর তেমন নয়। ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বর একবিধ, বিস্ময়-ব্যঞ্জক স্বর অন্যবিধ। এইরূপ এক এক মানসিক অবস্থায়, একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্বরে উচ্চারিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করা উচিত নয় যে, মানসিক ভাবের সহিত স্বরের একটা অভ্রান্ত নিত্য সম্বন্ধ আছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায়ই মানসিক ভাবের সহিত স্বরের সম্বন্ধের অনিত্যতা দেখা গিয়া থাকে এবং সেইজন্য স্বর ধরিয়া একজনের মনের ভাব বুঝিতে যাইয়া আমরা কত সময় ঠকিয়া থাকি। নাটকাভিনয়ে কোন অভিনেতার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার নিজের দুঃখ ভোগ অনুমান করা সঙ্গত নহে। পুনশ্চ, তাহাকে হাসিতে দেখিলেও তাহাতে তাহাকে সুখী জ্ঞান করায় তুমি ভুল বুঝিবে। বিচারক সকল সময় আসামীর কাঁদাকাটী শুনিয়া বা তাহার নির্ভীকতা দেখিয়া তাহাকে নির্দ্দোষী স্থির করিতে পারেন না।

এখন শব্দের অর্থাংশের বিষয় একবার চিন্তা কর। শব্দের অর্থাংশ দ্বারাই আমরা আমাদের মনের ভাব বা বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি। আমাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, শব্দের অর্থ বুঝিয়া এক জন অপরের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমাদের এ বিশ্বাসটীও ভ্রান্তি-মূলক। শব্দের অর্থাংশ সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনঃকল্পিত মাত্র; সুতরাং একের মনঃ কল্পিত অর্থের সহিত অন্যের মনঃ কল্পিত অর্থের ঐক্য হইবার কথা নহে। তবে আমরা অজ্ঞতা বশতঃ কতকগুলি ভুল সিদ্ধান্তের মধ্যবর্ত্তিতায় শব্দের একতায় বিশ্বাস করিয়া থাকি। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কল্পনা করায়, দুইজনে একই শব্দের দুই ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া যে প্রতিদিন কত বাদ-বিসম্বাদ করিতেছে, আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি না; কেননা শব্দের অর্থান্তর-বোধে যে জগতে ভয়ানক অনর্থ ঘটিতেছে, বেদ, বেদান্ত,

দর্শন, বিজ্ঞান; সমুদয় শব্দময় পদার্থই তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। এখন আমি কেবল সর্ব্ববাদী-সম্মত একই শব্দের ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত একই অর্থের ভিন্নার্থ সম্ভাবনার স্থল দেখাইব।

আমাদের যাবতীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়-সাক্ষেপ। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেই জ্ঞানটী প্রকাশ করিতে আমরা যে শব্দ ব্যবহার করিব, সেই শব্দের অর্থাংশ সেই জ্ঞানের প্রতিরূপ। কিন্তু কোন বস্তু সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান হয়, সেই বস্তু সম্বন্ধে তোমারও ঠিক সেই জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা তোমার ও আমার ইন্দ্রিয় নামে এক হইলেও তাহারা বস্তুতঃ এক নহে এবং তাহাদের কার্য্যও ঠিক একরূপ নহে। তদুপরি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা মনে কর। সুরাপান করিয়া আমার মনের যে ভাব হইল, আমি তাহার নাম রাখিলাম নেশা। কিন্তু হয় ত সুরাপানে আমার যেরূপ মনের সুখাসুখ হয়, তাহা তোমার সুখাসুখ হইতে অনেক বিভিন্ন। আমি সুরাপান করিয়া একটা দিন হাসিয়া কাটাইলাম, তুমি সুরাপান করিয়া একটা দিন কাঁদিয়া কাটাইলে। আমি সুরাপান করিয়া সৃষ্টি-রহস্যের ধ্যানে রহিলাম, আর তুমি রমণীর অধর-সুধাপানে উন্মত্ত হইলে; সুতরাং সুরা সম্বন্ধে আমরা দুই জনে দুই প্রকার অনুভব করিয়াও উভয় অনুভূতিকেই 'নেশা' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়া উভয়ের একতা বুঝিয়া থাকি! পলাণ্ডুর গন্ধে আমার ঘৃণা জন্মিল, আর তোমার জিহ্বা লালায়িত হইল; অথচ এই দুই নিতান্ত বিসদৃশ অনুভূতিকে পলাণ্ডু শব্দ বা নাম দ্বারা একইরূপ বুঝিলাম। দুগ্ধ ও ঘৃতের গন্ধ আমার নিকট যেমন প্রীতিপ্রদ, ব্রহ্মবাসীদের নিকট তেমনি বা ততোধিক অপ্রীতিকর, তবুও এই নিতান্ত বিসদৃশ-অনুভূতি-উৎপাদক গন্ধ একই দুগ্ধ বা ঘৃত-গন্ধ নামে অভিহিত হয়। যে বিলাতী পনীরকে (cheese) সাহেবেরা অতি উপাদেয় জ্ঞান করেন, কত বাঙ্গালীর নিকট তাহা বিস্বাদ, দুর্গন্ধ এক আজগবী পদার্থ। কিন্তু সেই খাদ্যের রসাস্বাদ সম্বন্ধে সাহেব ও বাঙ্গালীর বিস্তর মত-ভেদ থাকিলেও উভয়ে তাহার রসাস্বাদ বা আঘ্রাণ দ্বারা একই নাম প্রদান করিতেছে। বিড়ালাক্ষ সাহেব একই গোলাপের বর্ণ সম্বন্ধে কৃষ্ণতার বাঙ্গালীর সঙ্গে একইরূপ অনুভূতিতে পৌছিতে না পারিলেও, দুই বিসদৃশ বর্ণানুভূতিকে একই 'গোলাপী' বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট করিতেছে।

বীরের বীরত্বে নাচে বীরের হৃদয়,
ভয় ভীরুর অন্তরে।
মেঘের গর্জ্জনে নাচে কেশরী দুর্জ্জয়;
মৃগ প্রবেশে বিবরে।

অতএব একই শব্দকে ভীরু ও বীর দুই স্বতন্ত্র প্রকারে অনুভব করিলেও, একই রণবাদ্য বলিয়া তাহার নাম দিতেছে। তরুণীর স্তন স্পর্শে তার পুত্র যে প্রকারের সুখ পায়, ঐ পুত্রের পিতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের সুখানুভব করিলেও উহার নাম বা সংজ্ঞা বিষয়ে স্তনস্থ তুল্যরূপই বটে।

বালক তাহার মাতৃবক্ষ দর্শনে ও স্পর্শনে যে আনন্দ অনুভব করে, তাহা পিতাকে সে তাহা বুঝাইতে পারিবা[র] কথা নয় এবং পিতাও তৎ পুত্রের জননীর

দর্শন ও স্পর্শনে যে সুখানুভব করেন, তাহা বালককে বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ ভাষা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-প্রকাশক সঙ্কেত-বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান বাস্তবিক সত্য নহে এবং যাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য নহে, তাহারই উপর ভাষার গোড়াপত্তন; কাজেই মূলের অসত্যতা জন্য তদারূঢ় অট্টালিকার বুনিয়াদও আল্‌গা হইয়াছে, তাই সামান্য সন্দেহের ঝড়েই তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকে।

আমরা অনেক পদার্থের অনেক বিষয় বুঝিতে পারি না; আবার যে পদার্থের যে টুকু বুঝি, তাহা নিরপেক্ষ-সত্য নহে। তারপর সেই যে টুকু বুঝি, তাহাও প্রকাশ করিতে পারি না, সুতরাং অন্যকে বুঝাইতে পারি না। যদি সকলে সকল বিষয় বুঝিত এবং বুঝাইতে পারিত, তবে সাধারণের স্বীকৃত একই বিষয় লইয়া এত গোলযোগ—এত মত-ভেদই বা কেন হইবে? বস্তুতঃ সকল ব্যক্তি যে একই বিষয়ের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে, তাহা বাস্তবিক নহে,—সুধু কাল্পনিক এবং সেই কল্পনা আমার কল্পনা-সাগরের একটী তরঙ্গ মাত্র।

(ক্রমশঃ)

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

সুখ-সূক্ত।

—:০:—

শিষ্য—১। কস্মাৎ সুখম্?

অর্থ—কি হইতে সুখ হয়? অর্থাৎ এ জগতে এমন কি আছে, যাহা হইতে সুখ লাভ করা যায়? "সুখং মে ভূয়াৎ দুঃখং মাভূত্" আমার সুখ হউক, যেন দুঃখ হয় না, এই আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী শিষ্যদিগকে স্ব স্ব গন্তব্য পথ নির্ণয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আচার্য্য, কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে সুখ হইতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছেন;—

২।—ভগবতি আত্ম-নিবেদনাৎ।

অর্থ—ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদন করিলেই প্রকৃষ্ট সুখের সম্ভাব হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এই অবনীমণ্ডলে যিনি যতই প্রধান হউন না কেন, যাঁহার যতই সামর্থ্য থাকুক না কেন, কিন্তু সকলকেই এক দিন না এক দিন সেই সর্ব্বসামর্থ্য-শালীর চরণে শরণাপন্ন হইতে হয়। যিনি সসাগরা-সদ্বীপা-পৃথিবীর অধি-পতি, যাঁহার বাহু-বলে ত্রিজগৎ কম্পায়-মান, যাঁহার ঐশ্বর্য্য-গরিমায় ধনেশ্বর পর্য্যন্তও বিড়ম্বিত, তাঁহাকেও একদিন না একদিন ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া দুর্ব্বিসহ যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হয়। মানুষের অজ্ঞাতসারে এমন এক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, বীরের বীরত্ব, ধীরের ধীরত্ব, সকলই শক্তিহীন হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া যায়! শত আর্ত্তনাদ

করিলেও এই আজন্ম-পরিচিত মিত্রগণ ফিরিয়াও তাকায় না। তখন জীব অনন্যোপায় হইয়া, ভাবিয়া আকাশ, পাতাল কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সেই পরাৎপরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতে থাকে "হে নাথ! হে সর্ব্বজ্ঞ! হে অনাথশরণ! তুমি যাহা জান, তাহাই কর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক্" এবং এই বলিয়াই তাহার বিপন্ন হৃদয়ে আশার আলোকে সুখের উৎস প্রকাশিত করে; ভগবৎ চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া অশান্তিময় অন্তঃকরণে শান্তি-ধারা প্রবাহিত করিয়া দেয় এবং তদবধিই সুখের প্রকৃত কারণ চিনিয়া লয়। বস্তুতঃ আমরা প্রবৃত্তির প্ররোচনায় সুখের প্রকৃত নিদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মোহান্ধতা প্রযুক্ত স্ব-স্ব-পুরুষকার-প্রভাবেই যাবতীয় কার্য্য-কলাপ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হই; কিন্তু কৈ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ততঃ মনে মনে তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে না পারি, ততক্ষণ ত কোন কার্য্যেরই সুখোপলব্ধি করিতে পারি না। যখন বুঝিতে পারিতেছি যে, আজ কিম্বা কাল, এক সময়ে নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলময়ের চরণে ভিক্ষা চাহিতে হইবে, নতুবা নিজের সামর্থ্য-বলে, নিজের মাৎসর্য্য-মূলা বুদ্ধির বলে, কিছুই করিতে পারিব না, তখন সময় থাকিতে কেন তাঁহার শান্তিময় সুখপ্রদ পদতলে এ জীবন উৎসর্গ করি না? কিন্তু কেমনই মোহ-বিকলা মতি! ভাবি যাহা, কার্য্য-কালে করি তাহার বিপরীত!! বুঝি না যে, এ জগতে তিনিই একমাত্র সুখ-স্বরূপ, তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদনই সুখের এক মাত্র নিদান। একবার মনেও করি না যে, ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন——

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়"।

২—জ্ঞানাচ্চ——।

অর্থ— জ্ঞান হইতেও সুখ হইয়া থাকে; অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী। (এ স্থলে জ্ঞান শব্দ সামান্য-বাচী)

ব্যাখ্যা— অজ্ঞানই এক মাত্র দুঃখের মূল—— সুখের অন্তরায়। আমরা যে স্নেহাস্পদের বিয়োগবার্ত্তা স্মরণ করিয়া মৃতপ্রায় হই, জগতের স্তরে স্তরে রুক্ষ শ্মশান-মূর্ত্তির করাল ছায়া দর্শন করিয়া জীবনে হতাশ হই, এক মাত্র অজ্ঞানই ইহার মূল। আমরা রোগ গ্রস্ত হইয়া অহরহঃ মৃত্যুর পাদক্রম উৎপ্রেক্ষা করিয়া যে অনন্ত বিষাদরূপ অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছি, এক মাত্র শারীর বিজ্ঞানে জ্ঞানবিরহই এই দুঃখের মূল। যে বিষয়ে যাহার যত জ্ঞানাভাব, সেই বিষয়ই তাহার তত দুঃখের হেতু, একদিকে যেমন অনাত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি অধ্যাত্মজগতের অনুপম আনন্দের সম্পূর্ণ অনধিকারী, অতএব অত্যন্ত দুঃখী, পক্ষান্তরে——তেমনই তত্ত্ব-দর্শী মহানুভব চির মধুর নন্দন-স্নিগ্ধ মানসোদ্যানের সুপরিমল কুসুম-সৌরভে পরম পরিতৃপ্ত, অতএব অত্যন্ত সুখী। বস্তুতঃ যিনি যে বিষয়ে যত জ্ঞানী, তিনি সেই বিষয়ে তত সুখী, যিনি যে বিষয়ে যত অজ্ঞান, তিনি সেই বিষয়ে তত দুঃখী, তাই মহাপ্রাণ পরিব্রাজকপাদ বলিতেছেন যে, এই দুঃখ-বহুল সংসার-রূপ অন্ধতমসে জ্ঞানই একমাত্র সূর্য্যোদয়-স্বরূপ। শাস্ত্রান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়—"নিবিড় ... ... বিনির্দ্দিশির

হারিণী" অর্থাৎ জ্ঞানই নিত্য সুখদায়ক এবং মলিনতা-সংহারক।

৩—সজ্জন-সঙ্গতেঃ——।

অর্থ—সজ্জন-সংসর্গ হইতেও সুখলাভ হইতে পারে।

ব্যাখ্যা—শাস্ত্রে আছে—"অনাত্ম-পরচিন্তা যে পরোপকরণে রতাঃ। সত্য-প্রিয়া মিতাচারাঃ সজ্জনাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ" যাঁহাদের আত্মপর ভেদ নাই,—অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যাঁহারা সমদর্শী, যাঁহারা অবিরত পরহিত-ব্রতী' এবং অতিশয় সত্যপ্রিয় ও পরিমিতাচারী—অর্থাৎ শাস্ত্র-বিগর্হিত আচারের অপক্ষপাতী, তাঁহারাই সজ্জন-পদ-বাচ্য। এতাদৃশ সজ্জন-সঙ্গতিই সুখের অবিতথ হেতু। এই সংসাররূপ উত্তরঙ্গ দুঃখ-জলধির মধ্যে সাধুসঙ্গই একমাত্র তরণী; তাই ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"।

৪—যম-নিয়মাভ্যাঞ্চ—।

অর্থ—যম এবং নিয়ম হইতেও সুখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ঈশ্বর-প্রণিধান, সত্য, ঋজুতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য প্রভৃতির নাম যম এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ভাগবতী চিন্তা প্রভৃতির নাম নিয়ম। এতাদৃশ শারীরিক এবং মানসিক নিয়মপরতা হইতে সুখ-লাভ অবশ্যম্ভাবী। যম ও নিয়ম প্রভাবেই মানব, ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তিরূপ অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। যম ও নিয়ম প্রভাবেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। যথা—যম-শর্ম্মিলোপাখ্যানে যম উবাচ—

যমো যম ইতি শ্রুত্বা বৃথা হ্যুদ্বিজতে জনঃ।
আত্মা চ যমিতো যেন ন তস্যৈব যমঃ স্মৃতঃ॥
আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দানমার্জ্জবম্।
ধ্যানং প্রসাদো মাধুর্য্যং সন্তোষশ্চ যমা দশ॥
যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব যঃ করোত্যাত্মসংযমম্।
স চাদৃষ্ট্বা তু মাং যাতি পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।

যম বলিয়াছেন——লোক 'যম—যম' এই কথা শুনিয়াই বৃথা মৃত্যুভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হয়, নতুবা যে নিজের আত্মাকে যমিত—অর্থাৎ সুসংযত করিতে পারিয়াছে, তাহার আর যমে কিছু করিতে পারে না। অনৃশংসতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, ঈশ্বর-প্রণিধান, চিত্তের-প্রসন্নতা, মধুরতা ও সন্তোষ, এই দশবিধ যম এবং প্রাগুক্ত নিয়ম দ্বারা যে আত্ম-সংযম করিতে পারে, সে আমাকে (মৃত্যুকে) না দেখিয়া—অর্থাৎ আমার কবলিত না হইয়া, সনাতন ব্রহ্ম-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়॥

৫——গুরুশুশ্রূষায়াশ্চ—।

অর্থ—গুরুজনের শুশ্রূষা হইতেও সুখ লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—মাতা, পিতা, পিতৃব্য, অগ্রজ, শিক্ষক, উপদেশক, দীক্ষাদায়ক প্রভৃতি পূজনীয়গণ—এবং যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি প্রভৃতি যে কোন অংশে গুণাধিক—অতএব বরীয়ান্, তাঁহাদিগের সেবায়ও সুখাবির্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা আত্মার শ্রেয়ঃ কামনা করেন, গুরুশুশ্রূষা তাঁহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য—কেন না—'প্রতি বধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্য পূজাব্যতিক্রমঃ।' পূজনীয়ের পূজার ত্রুটি হইলে, শ্রেয় ব্যাহত হয়। অতএব গুণবান্ মাত্রেরই সমুচিত সমাদর ও অর্চ্চনা করা বিধেয়, কেন না—গুণি-গণ তাঁহাদিগের গুণ-গরিমায়—গুরু তুল্য

পূজার্হ। কাজেকাজেই "গুণাঃ পূজা-স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" (গুণই পূজার স্থল, নতুবা গুণীর জাতি-কুল-গৌরব বা বয়ক্রম পূজার্হ নয়) এবং "স্ত্রী পুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তংহি মহিতং সতাং" (স্ত্রী-পুরুষ বিচার না করিয়া—অবিচার্য্যভাবে সজ্জনের সাধুব্যবহার পূজা করা উচিত) ইহা মনে করিয়া—প্রাগুক্ত গুরুগণ এবং গুণাধিক গুরুস্থানীয়গণের পূজা করিলে, তাহা হইতে সুখ-আবির্ভাব অনিবার্য্য।

৬—পোষ্যপ্রতিপালনাচ্চ—।

অর্থ—পোষ্যবর্গের প্রতিপালন হইতেও সুখ উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—নিজের সুখে নিস্পৃহ ও নিজের দুঃখে সহিষ্ণু হইয়া যদি মুখাপেক্ষী পরিবার বৃন্দের ভরণ-পোষণ করা যায়, তবে তাহাহইতেও বিমল সুখের সদ্ভাব হয়। নিজে না খাইয়া, নিজে না পরিয়া, যে সমুদয় মহাত্মবৃন্দ অবিরক্তভাবে নিজ মুখাপেক্ষী পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত নহেন, সেই সকল উদার-মনা নেতৃবর্গই জানেন যে, পোষ্য-পালন সম্ভূত সুখ কি অপার্থিব! কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অনাসক্তভাবে যে সকল ধর্ম্মভীরু মনীষিগণ অধীন জন-সমূহের অভাব দূরীকরণে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারাই জানেন যে, দশজনের অভাব নিরাসে বা দশজনের প্রার্থনা-পূরণে কি অনৈসর্গিক আনন্দ!

৭—পরোপকরণাৎ—।

অর্থ—পরের উপকার সুখপ্রাপ্তির অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—শত্রু, মিত্র, প্রিয়াপ্রিয়, দ্বেষ্য-সম্বন্ধ বিচার না করিয়া, যে সমুদয় দেবভাবাপন্ন মনীষিগণ পরের উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, তাঁহারাই সেই পরোপকার জনিত দিব্য সুখের একমাত্র অধিকারী। যেমন পরের উপকার হইতে নির্ম্মল সুখের সদ্ভাব হয়, পরের অপকার হইতেও তেমনি দুঃসহ দুঃখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা, মনের দ্বারা বা কার্য্যের দ্বারা যিনি যে ভাবে যতটুকু পারেন, পরের অপকার হইতে বিরত হইয়া, পরোপকারে চিত্ত নিহিত করুন, ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। উপকারের পরিমাণ নাই, সামান্য উপকারও উপকার, মহা উপকারও উপকার, উভয়ই দুঃস্থের সুখবিধায়ক। তুমি যাহা করিতেছ, তাহা তোমার নিকট সামান্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু যে বিপন্ন, যে কাতরনয়নে তোমার উপকার প্রার্থনা করিতেছে, তাহার নিকট ইহা অতি মহান্—অপ্রতিম, অতএব উপকারের অল্পানল্পত্ব বিবেচনা না করিয়া, কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করাই একমাত্র ধর্ম্ম—এবং এই ধর্ম্মই দুস্তর দুঃখ-জলধির একমাত্র ত্রাণকারক সুদৃঢ় অর্ণবযান; তাই প্রাক্তন-সুধীগণ বলিয়াছেন—

পরিনির্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতামিদমেবহি,
নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মো নাপকারাৎ অঘং পরম্॥

নিখিল বাগ্‌জাল নির্ম্মথন পূর্ব্বক ইহাই নির্ণীত হইয়াছে যে, উপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই, আর অপকার অপেক্ষাও উৎকট পাপ নাই, অতএব ধর্ম্মামৃত-সিক্ত নির্ম্মল সুখের একমাত্র নিদানই পরোপকার।

৮—দানাচ্চ—।

অর্থ—দান হইতেও সুখাবির্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা—এ স্থলে দান শব্দের অর্থ কেবল ধন বা অন্ন-বস্ত্রাদি দান নহে, অর্থাৎ এস্থলে দান শব্দ বিশেষ-বাচী নহে, দান-সামান্য বাচী। যাহার যে বিষয়ে অভাব লক্ষিত হইবে, তাহার সেই অভাব পরিপূরণেরই অন্যতম আখ্যা দান। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ধান্য, শিক্ষা, দীক্ষা, ঔষধ, জল, এ সমস্তই এই দা-ধাতুর কর্ম্মীভূত;—অর্থাৎ মূর্খকে বিদ্যা, নির্ব্বুদ্ধিকে বুদ্ধি, দরিদ্রকে ধন, রুগ্নকে ঔষধ, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, অদীক্ষিতকে দীক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষা, এই সমস্তই পূর্ব্ব-কথিত দান শব্দের প্রক্রান্ত অভিধেয়।

এতাদৃশ বিশ্বতোমুখ 'দান' হইতে বিমল সুখের সমাগম হইয়া থাকে। অধুনা যদিও প্রতিকূল বাত্যায় সুগঠিত স্বর্ণপ্রভ আর্য্যসমাজ বিকলাঙ্গ ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি এক্ষণপর্য্যন্তও ভারতের নানা স্থানে যে ধর্ম্ম-শালা, অতিথি-শালা, দাতব্য চিকিৎসালয়, জলছত্র প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়, তাহা শুধু এই সমুদয় আর্য্য-ঋষি-গণেরই উপদেশের কর্ম্মপরিণতি। স্থল-বিশেষে ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান শতাশ্বমেধ হইতেও বরীয়ান্, এই মহোপদেশ-গীতি এক দিন ভারতবাসিগণের প্রতিকণ্ঠে ধ্বনিত হইত, তাই এখনও নিমগ্নপ্রায় ভারতীয়গণ (সম্যক্ ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে না হইলেও) সেই পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের মুখের গ্রাস অকাতরে পরকরে সমর্পণ করিয়া পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সঙ্কল্পরহিত হইয়া অভাবগ্রস্তের অভাব-পূরণে অগ্রসর মহামনা দয়ার্দ্রগণই এই বর্ণিত দানজনিত অলৌকিক সুখের সন্দর্শন পাইয়া থাকেন।

৯—অনুকম্পনাচ্চ——

অর্থ—অনুকম্পা—(দয়া) হইতেও সুখ-সমাগম হয়।

ব্যাখ্যা—মঙ্গলময় পরমেশ্বর করুণা করিয়া মানব-হৃদয়ে যে সকল সদ্বৃত্তি প্রদান করিয়া পশুজাতি হইতে মানব-মণ্ডলীকে উৎকৃষ্টতর করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে দয়াই একমাত্র গরীয়সী। একমাত্র স্নিগ্ধজ্যোতিঃ সুধাকর ব্যতীত যেমন সহস্র সহস্র নক্ষত্র বা জ্যোতিরিঙ্গণে উর্ব্বীতল আলোকিত করিতে পারে না, তদ্রূপ একমাত্র কোমল-কলেবরা স্নিগ্ধ-প্রসাদা দয়া ব্যতীত অন্যান্য শত শত সদ্বৃত্তি থাকিলেও তদ্দ্বারা মানব-হৃদয় পেলবতা বা কমনীয়তা অবলম্বন করিতে পারে না। দয়াময়ের দয়ার রাজ্যে বাস করিয়া যাহারা দয়াশূন্য, তাহাদিগকে যে কি আখ্যায় আখ্যাত করিতে হয়, তাহা ভগবানই জানেন, ফলতঃ মনস্বি-বৃন্দের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গবেষণার ফলে ইহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মানব-গণের হৃদয়-নিহিত সদ্বৃত্তিরূপ নন্দনকাননে দয়াই একমাত্র পারিজাতকল্প। দয়াচ্ছলেই সুবিমল সুখ-সন্ততি এই সংসার-দাবদগ্ধ মানব-হৃদয়ে শান্তির বিধান করিয়া থাকে। এই দুঃখবহুল সংসার-শাহারায় দয়াই একমাত্র ললিত লহরীময়ী আনন্দ-তরঙ্গিণী।

১০—অহিংসায়াশ্চ——।

অর্থ—অহিংসা হইতেও সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

অর্থ—দ্বেষ—পরানিষ্ট-চিন্তা প্রভৃতি পরোপতাপক সমস্তই এই হিংসার অন্তর্ভূত। অতএব সে সমুদয়ের অনুষ্ঠানেই দুঃখ এবং তদিতরেই সুখ। ব্যবহারেও স্পষ্ট

প্রতীয়মান হয় যে, পরশ্রী-কাতরতা. পরনির্য্যাতন-বশবর্ত্তিতা প্রভৃতিতে অন্যের কোন ক্ষতি হউক্ বা না হউক্, নিজের ক্ষতি, নিজের অশান্তি, নিজের দুঃখ অনিবার্য্য, তাই আচার্য্য হিংসা-বিরহকেই সুখ-শান্তির অন্যতম হেতু নির্দ্দেশ করিয়া ছেন।

১১—সত্যাৎ——।

অর্থ—সত্যও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাহা সত্য, তাহাতেই সুখ; যাহা অসত্য, তাহাতেই দুঃখ; সুখ এবং দুঃখের যথাক্রমে সত্য, এবং অসত্য এই নামান্তর-কল্পনা করিলে বোধ হয় অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হইতে হয় না। যাহাতে—যে ক্রিয়াতে কোন প্রকারে অসত্যের লেশ লুক্কায়িত আছে, তাহা আপাততঃ সহস্র প্রকারে হিতকরী ও মনোরমা বলিয়া বিবেচিত হইলেও, নয়নরঞ্জিনী প্রাণঘাতিনী ফণিনীর মণির ন্যায় পরিহর্ত্তব্যা—অপবিত্রা শ্মশান-লতিকার ন্যায় অস্পৃশ্যা ও অনাচরণীয়া। যাহা সত্য, তাহা চির-দিনই সত্য, সুতরাং তাদৃশ সত্য-সম্ভূত সুখও চিরস্থায়ী—এজন্মে ও জন্মান্তরেও ভোগ্য। পক্ষান্তরে, যাহা অসত্য, তাহা চিরদিনই অসত্য, তুমি যতই রূপান্তর কর না কেন, তাহার স্বরূপের কিছুতেই ব্যত্যয় হইবে না। অতএব তাদৃশ অসত্য-সঞ্জাত সুখও ক্ষণস্থায়ী—ভঙ্গুর। জল-বুদ্বুদেরও স্থায়িত্ব কল্পনা করা যাইতে পারে, তবুও সেই মিথ্যোদ্ভূত সুখের স্থিরতা কামনা করা যায় না—অতএব এই সত্যস্বরূপের সত্য-মূল সাম্রাজ্যে যাহারা চিরতরে সুখের সাগরে নিমগ্ন হইতে চাহেন, তাঁহারা নিরলস ভাবে সত্যের সেবা করুন। নয়নে—মনে—বাক্যে সত্য-প্রিয়তা স্থাপিত করুন। সত্যেরই নামান্তর ধর্ম্ম,—তাই ব্যাস বলিয়াছেন,—"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ"

১২—প্রিয়াৎ——।

অর্থ—প্রিয়ব্যবহার হইতেও সুখোৎ-পাদন হয়।

ব্যাখ্যা—যাহা লোকের বা সমাজের অননুতাপনীয়, অনুদ্বেজক, তাহাই প্রিয়, যাহার মূলে মিথ্যার পূতি-গন্ধময় পঙ্কিল প্রবাহ নাই, যাহা নিরন্তর সত্যের প্রভায় প্রভান্বিত, তাহাই প্রিয়। তাদৃশ প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারাই সুখের উৎপত্তি হইতে পারে। অতএব সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রিয় ব্যবহার করাই সুখ-লিপ্সুর একান্ত কর্ত্তব্য। লোকে যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সমাজে যাহাতে বিদ্রোহ উপস্থিত না হয়, ধর্ম্মে যাহাতে আঘাত না লাগে, তাদৃশ সত্য-মূলক প্রিয় কর্ম্ম-যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতেই সুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

১৩ আর্জ্জবাৎ——।

অর্থ—আর্জ্জব (সরলতা) হইতেও সুখের উৎপত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—মর্ত্ত্যে অমর-প্রকৃতি বালক-বৃন্দের চিত্তমুকুরে যত দিন পর্য্যন্ত স্বারল্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, তত দিন পর্য্যন্তই লোকে মুগ্ধ হইয়া কীটপূর্ণ কুসুম-স্তবক উপেক্ষা পূর্ব্বক সেই কুসুম-নিন্দিত শিশুকে বুকের উপর তুলিয়া লয় এবং সেই সরলতার প্রতিমূর্ত্তির সুধাময় স্পর্শে চির এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে-মোহিত হইয়া, পুনঃ পুনঃ তাহার সরলতা-নিষিক্ত বদন চুম্বন করিয়া অতৃপ্ত-বাসনা-বহ্নিতে [illegible] আহুতি

প্রদান করে। বালকের এত আদরের—এত সোহাগের কারণ শুধু সরলতা। যে মুহূর্ত্ত হইতে শিশুর শিশুত্ব দূরীভূত হয় এবং সেই সঙ্গে২ সারল্যও অন্তর্হিত হইতে থাকে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার আদর, সোহাগ, সকলই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয়। এই সমস্ত আদর অনাদরের হ্রাস বৃদ্ধির একমাত্র হেতু সারল্য। জগতে যিনি সরল, জগৎ তাঁহার আপনার। জগতে সরলতার ন্যায় উত্তুঙ্গ-সুখ-সদন-প্রবেশের সোপান আর দ্বিতীয় নাই। এ জগতে যাহারা সরলতাশূন্য, তাহারা জ্ঞানীজনের করুণার পাত্র। তাহাদের মলিন মুখটি নিরীক্ষণ করিলে মহতের মহান্ হৃদয় কাতর হইয়া উঠে। এক্ষণ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি——এই নশ্বর ধরাতলে দু'দিনের জন্য আসিয়া, বিনশ্বর দেহ ধারণ করিয়া, যাহারা—যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহানুভব মহনীয় চরিত্র মনস্বিগণ সারল্যের সাত্বিকীশক্তি-সহায়তায় দশ জনের প্রিয় পাত্র, দশ জনের শ্রদ্ধার পাত্র, দশ জনের সহানুভূতির পাত্র হইতে পারেন, তাঁহারা কত সুখী! তাঁহাদের অন্তঃকরণ কি অপূর্ব্ব আনন্দরসে নিয়ত অমৃতায়মান! শত অর্থ-প্রয়োগে—শত বল-প্রয়োগে যে কার্য্য সাধন করা যায় না, একমাত্র সারল্য-সম্বলে সে কার্য্য অতি সুসাধ্য——তৃণোত্তলনবৎ লঘুক্রিয় বলিয়া প্রতীত হয়। তাই পরিব্রাজক বলিয়াছেন—সরলতা সুখের নিদান।

১৪—অনাময়াৎ——।

অর্থ—রোগ-শূন্যতাও সুখের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—মনের সহিত শরীরের যত নিকট সম্বন্ধ, আর কাহারও সহিত তত নহে। আমার অজ্ঞাতসারে পৃষ্ঠের উপর যদি একটি মশক পতিত হয়, আমি তৎক্ষণাৎই অপ্রবুদ্ধ-ভাবে সে দিকে হস্ত-চালনা করিব। শরীর এবং মনের নৈকট্যই এই পরিচালন-ক্রিয়ার মুখ্য হেতু; এতাদৃশ মনঃসাপেক্ষ শরীরে যদি রোগ থাকে,——রোগ জনিত যাতনা থাকে, তবে আর সুখের আশা কোথায়? সেই জন্য উক্ত হইয়াছে যে,—মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, যাহাতে রোগ বা অন্য কোন প্রকার শরীর-বিকার না জন্মে, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া নিরতিশয় কর্ত্তব্য, এক জন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

বিদ্যা-বুদ্ধি-ধন-জন যত কিছু বল,
শরীর নীরোগ হ'লে সকলি সফল।
নতুবা যাহার দেহ রোগে জর জর,
জগতে কিছুই তার নহে রুচিকর।

১৫—কর্ত্তব্য-শীলত্বাৎ—।

অর্থ—কর্ত্তব্যশীলতাও সুখ-লাভের অন্যতম কারণ।

ব্যাখ্যা—যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য—অর্থাৎ বিধেয়, তিনি যদি সেই বিষয়েই মনোভিনিবেশ করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার সুখাবির্ভাব হইতে পারে। শিক্ষকের কর্ত্তব্য অধ্যাপনা, তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, চিকিৎসকের কর্ত্তব্য রোগ নির্ণয় পুরঃসর সুচিকিৎসা; তিনি যদি তাহাতেই অভিনিবিষ্ট হয়েন, ব্যবহারাজীবের কর্ত্তব্য সুবিচার—অপক্ষপাতিত্ব, তিনি যদি তাহাতেই যত্নপর হয়েন, অর্থাৎ যিনি যে বিষয়ের দায়িত্ব অনন্য-সাপেক্ষভাবে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি যদি সেই স্বগৃহীত গুরুভারের প্রতি সম্যক্-দৃষ্টি স্থাপিত করেন, তবে তাহা হইতেই তাঁহার পরম সুখ লাভ হইতে পারে। এই কর্ম্মভূমিতে যাঁহার

যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি যদি প্রসন্ন মনে তাহারই অনুশীলনে যত্নপর হয়েন, তবে এই সিরক্কোর-সন্তপ্ত সংসার-মরু কি সুখের স্থানেই পরিণত হয়! এই সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণ যত অভিনয়ই করুন না কেন, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের মনের ভিতর ধর্ম্মবুদ্ধি-মূলা কর্ত্তব্যশীলতারূপিণী অভিনয়-রস-রাজি উদ্বুদ্ধা থাকে, ততক্ষণই সেই অভিনয় দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়; পরন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানস সেই রসহীন হইয়া পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই অভিনয়ের রসভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহা দর্শক ও শ্রাবকবৃন্দের অরুচিকর হইয়া উঠে। ফলতঃ—কর্ত্তব্য-শীলতা যাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র, তিনি মানব হইলেও দেবতা। পক্ষান্তরে, যাঁহার হৃদয় কর্ত্তব্যর কঠোর রজ্জুতে অনা-বদ্ধ, অতএব সর্ব্বকার্য্যেই বিশৃঙ্খল, তিনি মানুষ হইলেও পশু-পদবাচ্য এবং ইহ পরত্র উভয় স্থলেই প্রত্যবায়ভাগী। কর্ত্তব্য-শীলতার অন্য একটি গুণ এই যে, অধ্যবসায় ইহার সহচর। অধ্যবসায়ের ন্যায় অসাধ্য-সাধন-সমর্থ অন্য কোন শক্তি জগতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই আর্য্য-ভূমি যে এক দিন জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু ঐ শক্তির প্রভাবে। আবার এক্ষণে যে এতাদৃশ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাই ঐ ঐশী শক্তিরই অভাবে। অতএব অধ্যবসায়-মূলা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা হইতে সুখ-লাভ এবং উন্নতি-লাভ যত সহজ ও সুসাধ্য, অন্য কোন প্রকারেই তত সহজ বা সুসাধ্য নহে।

১৬—অনাসক্তেশ্চ—।

অর্থ—অনাসক্তিও সুখের অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—এই সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ববহুল বিনাশময় সংসার-ক্ষেত্রে যিনি যত আসক্ত, তিনি তত দুঃখী; যাঁহার আসক্তির সীমা যত দূর বিস্তৃত, তাঁহার দুঃখও তত দূরব্যাপী। অধিক কি, এক কথায় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসক্তিই দুঃখের জননী। দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্তরের অন্বেষণ অপেক্ষা তৎ-প্রসূতির তি ধান-সাধনই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ এই কর্ম্মভূমি সংসারে দুঃখ-পরিহারের এক মাত্র উপায় অনাসক্তি। "আমি গৃহী, আমার কর্ত্তব্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পরিপালন; আমি সন্ন্যাসী, আমার কর্ত্তব্য সন্ন্যাস-ধর্ম্মের অনুশীলন"—এই প্রকার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে সমুদয় লোকোত্তর মহাত্মবৃন্দ অনা-সক্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধন-প্রতি জীবন উৎসর্গ করিতে পারগ হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। দুঃখাকৃতি আশা-ভুজঙ্গিনীর অরুন্তুদ দংশনে তাঁহাদের স্বর্গোপম মানসতীর্থ জর জর হয় না। তাঁহাদের সুরম্য সুস্নিগ্ধ হৃদয়-কাননে অশান্তিময় নিদাঘ-বায়ু প্রবাহিত হয় না। যাঁহারা—যে সমুদয় ঋষিকল্প মহানু-ভবেরা কর্ত্তব্য কার্য্যে নিজের কারকতা না রাখিয়া, প্রযোজ ভাবে—নিজের আধি-পত্য না রাখিয়া, ভৃত্যভাবে—কর্ত্তব্যের দাস-ভাবে এই কঙ্করময় বন্ধুরতাপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই অক্ষত চরণে নির্ম্মল-সুখ-সংবেদন পূর্ব্বক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চরমে অমরতা প্রাপ্ত হয়েন। বস্তুতঃ কর্ম্মফলে আসক্তিমান্ না হইয়া, যাঁহারা উদাসীনভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখের অধিকারী। আমরা যে প্রতিনিয়ত নানা প্রকার দুঃখ-বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিভীষণ চিত্র দেখিয়া ভীত হইতেছি, এক মাত্র আসক্তিই ইহার কারণ। সেই জন্য প্রাচীন

মহাত্মাদিগের সুখোপভোগিতা প্রতিপাদন করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—— "অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ" তাই বলিতেছিলাম—যাঁহারা কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ হইয়া নিজকে ঈশ্বর-প্রেরিত কর্ম্মকর মাত্র মনে করিয়া ভৃত্যের ন্যায় সমস্ত করণীয় কার্য্যের ফলাফল তাঁহার চরণে সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী। যাঁহারা আত্মাভিমানরূপ দুর্দ্দম রিপুর সংহার সাধন করিয়া "ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" বলিয়া ভগবচ্চরণ সেবকরূপে যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাই চরিতার্থ-চিত্ত সফল-জীবন দেবতা। যাঁহারা নিজের নিজত্ব—নিজের প্রভুত্ব সেই বিশ্বপ্রভুর চরণ-কমলে অঞ্জলি দিয়া জীবনকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী—প্রকৃত মানব পদবাচ্য; মর্ত্ত হইয়াও তাঁহারা স্বর্গ-সুখভোগী।

১৭-সংবেদনাৎ সম্প্রসারণাচ্চাত্মনঃ—

অর্থ—আত্ম-সংবেদন এবং আত্মসংপ্রসারণও সুখ-প্রাপ্তির অন্যতম হেতু।

ব্যাখ্যা—আত্মজ্ঞান এবং আত্মপ্রসার—অর্থাৎ সর্ব্বভূতে আত্মার বিস্তার (সকলকে নিজের মত দেখা) ব্যতীত স্থায়ী সুখ—বিমল আনন্দ লাভের আশা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভবনীয়। যিনি আত্মাকে যত আত্ম-চিন্তাপর—আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরসাপেক্ষ—পরসুখ-দুঃখ-সমবেদন করিতে পারিবেন, তাঁহার সুখের সীমা, ঐ আত্ম-চিন্তা, আত্ম-জ্ঞান এবং আত্মবিবৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশঃ তত পরিবর্দ্ধিত হইবে। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু বিষয়ে সসীমস্পৃহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি-বিশেষে সসীমস্নেহ হইয়া, নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রেত বিষয়ে সমর্পিত-প্রাণ হইয়া বা নির্দ্দিষ্ট প্রিয়জন-বিশেষে তন্ময়চিত্ত হইয়া, হৃদয়ের কমনীয়—বিশ্বোতোমুখী স্নেহ—দয়া—মমতা প্রভৃতি প্রবৃত্তি-রাজিকে সংশোধিত করিয়া রাখেন, তাঁহারা আপাততঃ বাঞ্ছিতের সদ্ভাব-জনিত অতুল আনন্দ উপভোগ করেন বটে, কিন্তু তদভাবে অসহ্য যাতনানলে দগ্ধীভূত হয়েন। পক্ষান্তরে—যাঁহারা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা দ্রব্য-বিশেষে স্নেহপ্রবণ না হইয়া—জগতের সমগ্র জাতিকে—অথবা আপাততঃ ততদূর না হউক—জাতি-বিশেষকে নিজের স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন, তাঁহারা ঐ পূর্ব্ববর্ণিত সসীম-প্রাণ-ব্যক্তি সমূহের ন্যায় একটী প্রিয়ের বিয়োগে তত বিধুরতা প্রাপ্ত হয়েন না বা অবসন্ন হইয়া পড়েন না। ফলতঃ জগতের হিতসাধনই—জগতের পরতে পরতে আত্ম-প্রসার দর্শনই আত্ম-সুখ লাভের এক মাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। এই সর্ব্বভূতে আত্ম-দৃষ্টিরই নামান্তর "আমিত্বের প্রসার"। যিনি সমদর্শী নহেন, তাঁহার দুঃখের অবধি নাই, তিনি পদেপদে বিষণ্ণ—বিকল হইয়া পড়েন। আবার যিনি সর্ব্বভূতে তুল্যদৃষ্টি, আত্মপর-ভেদ-রহিত, তাঁহার সুখের ইয়ত্তা নাই। তিনি নিয়ত অতুল আনন্দে আনন্দ-বান্! কোন একনেত্র ব্যক্তির—যে চক্ষুটি বিদ্যমান আছে, সেটি গেলে যত দুঃখের বিষয় হয়, দ্বিনেত্র-ব্যক্তির একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলে তত দুঃখের বিষয় হয় না। এসম্বন্ধে এস্থলে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত "আমিত্বের প্রসার" প্রবন্ধে ইহার প্রতিপাদ্য বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আত্ম-সংবেদন—অধ্যাত্মজ্ঞান এবং আত্ম-সংপ্রসারণ—আমিত্বের প্রসার,

এতদুভয়ই যে সুখ-সংবেদনে কতদূর প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা মনস্বীমহোদয়গণের সহজেই অনুমিত হইবে।

ইতি পারিব্রাজক সূক্তমালায়াং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ—।

বেদান্ত দর্শন।

অধ্যাসভাষ্যের আভাস।

—০:০:০—

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়, যে বিষয়ে কোন মনুষ্যের কোন সময়ে কোন অবস্থাতেই সন্দেহ উপস্থিত হয় না এবং যে বস্তু দ্বারা কোন জীবের কোন অবস্থাতেই প্রয়োজন নিষ্পন্ন হয় না, তাহা প্রেক্ষাবান্ মনুষ্য অবধারণ করিতে বা জানিতে কোন সময়েই প্রবৃত্ত হন না। সাধারণের নিশ্চিত অবধৃত নয়ন-পথবর্ত্তী দ্রব্য সমূহ, 'এই কি না?' এতদ্রূপে নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কর্ম্ম। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আরভ্যমান্ এই বেদান্ত-দর্শনের নির্ণেয় আত্মজ্ঞান অসন্দিগ্ধ। কেন না, প্রথমতঃ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, কীট, পতঙ্গ, গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, ঋষি প্রভৃতি বাহ্য প্রাণী সমূহ হইতে এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইদংপ্রত্যয়গম্য আভ্যন্তরীণ বিষয় জাত হইতে অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার পৃথক্রূপেই নিঃসন্দিগ্ধ অবিপর্য্যস্ত প্রতীতি হইয়া থাকে। 'আমি আমি কি না?' এইরূপ সন্দেহ জগতে কোন কালে কেহই করে না এবং 'আমি, আমি না' এইরূপ বিপর্য্যয়ও কাহারও উপস্থিত হয় না। যদিও অবিবেক বশতঃ কদাচিৎ আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি যাইতেছি, আমি গ্রহণ করিতেছি ইত্যাদি বাক্যে দেহ-ধর্ম্মের সহিত অহঙ্কারাস্পদতার সামানাধিকরণ্য উপলব্ধি হয়, তথাপি অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় দেহ, এরূপ নিশ্চয় করা উপযুক্ত হয় না; কেন না, 'বাল্যে যে আমি মাতা-পিতাকে অনুভব করিয়াছি, বৃদ্ধাবস্থায় সেই আমিই পুত্র-প্রপৌত্র দিগকে অনুভব করিতেছি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু, বাল্যাবস্থার শরীর হইতে বৃদ্ধাবস্থার শরীর সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব যাহার ব্যাবৃত্তি-নিবৃত্তি বা অতীতাবস্থায় যাহার অনুবৃত্তি-প্রবৃত্তি বা বর্ত্তমানাবস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বাল্যাবস্থার শরীরের নিবৃত্তি হইলেও অহংপ্রত্যয়াস্পদের অনুবৃত্তিহেতু কস্মিন্কালেও অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় শরীর নহে, ইহা নিঃসংশয়িত সিদ্ধান্ত। এইরূপ বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, ইন্দ্রিয়গণও অহংপ্রত্যয়াবলম্ব্য হইতে পারে না। কেন না, 'আমি কিছুকাল পূর্ব্বে এই বস্তু দর্শন করিয়াছিলাম, সংপ্রতি ইহাকেই আমি স্পর্শ করিতেছি' এতাদৃশ প্রত্যভিজ্ঞান নিবন্ধন দর্শনেন্দ্রিয় ব্যাবৃত্তিতে ও ত্বগিন্দ্রিয় সহ অহংপ্রত্যয়াবলম্ব্যের স্বতন্ত্র অনুভূতি বশতঃ আমরা, 'যাহার অনুবৃত্তি-নিবৃত্তি বা অতীতাবস্থায় যাহার অনুবৃত্তি-প্রবৃত্তি বা বর্ত্তমানাবস্থা থাকে, সে তাহা হইতে ভিন্ন' এই যুক্তিযুক্ত অব্যভিচারী নিয়ম দ্বারা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা ইন্দ্রিয়-নিবহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারি। পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চীকৃত

স্থূল পঞ্চমহাভূত হইতে এবং ঘট, সরাব, গৃহ প্রভৃতি পার্থিবাদি পদার্থ জাত হইতে অহংপ্রত্যয়াবলম্ব্য আত্মার বিবিক্ততা নির্দ্ধারণ করিতে পাংশুল-পাদুক হালিকও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম; সুতরাং তদ্বিষয়ে যুক্তির উপন্যাস নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক, আমাদের বুদ্ধি ও মন, এই অন্তঃকরণদ্বয় হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অনুভূতি হয় কি না? 'করণ' এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় 'কৃ' ধাতুর করণবাচ্যে 'ঘুট্' প্রত্যয় দ্বারা 'করণ' এই পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই জানা গেল 'ক্রিয়তে অনেন'—অর্থাৎ যাহা দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা হয়, কার্য্যের যেটী প্রধান কারণ, কর্ত্তার যেটী সাধকতম, তাহাকেই শাস্ত্রকারগণ 'করণ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বুদ্ধি ও মন, ইহাদের পর্য্যায় শব্দ বা নামান্তর হইয়াছে অন্তঃকরণ। অন্তরেতে করণ—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত-মধ্যবর্ত্তী যে পদার্থ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করা যায়, অন্তরবস্থিত সুখ দুঃখাদির অনুভব প্রভৃতি কার্য্য সমূহের যেটী প্রধান কারণ, দেহেন্দ্রিয়াধ্যক্ষ অহংপ্রত্যয়াধিগম্য প্রত্যক্-চেতনের যেটী সাধকতম বা প্রধান, তাহাকেই 'অন্তঃকরণ' শব্দ দ্বারা লক্ষিত করা হয়। তবেই বুঝা গেল, অন্তঃকরণ—বুদ্ধি ও মন, এই পদার্থদ্বয় অন্তরের করণ—অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কার্য্য-নিবহের প্রধান কারণ ব্যতীত কর্ত্তা নহে। অতএব আমি করিতেছি, আমি ভাবিতেছি, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অনুভবকর্ত্তা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মা, বুদ্ধি ও মন নহে,—এতদুভয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। যদি বল, আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ ইত্যাদি বাক্য লৌকিক ব্যবহার, তাহা হইলে—অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে আত্মা বিবিক্ত, ইহা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তি এবিষয়ে উপযুক্ত হয় না; কেন না, এতাদৃশ ঔপচারিক বহু-প্রয়োগ লোকেতে প্রসিদ্ধই আছে, যথা 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' অর্থাৎ মঞ্চ শব্দ করিতেছে—ইত্যাদি প্রয়োগ যেমন অচেতন মঞ্চের শব্দ করায় অসম্ভাবনা বশতঃ মঞ্চস্থিত পুরুষকে লক্ষিত করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তেমন আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি খঞ্জ, আমি কুব্জ, আমি অন্ধ, আমি বধির, ইত্যাদি লৌকিক বাক্যাবলীও—অহংকারাস্পদ আত্মার দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ সহ বাস্তবিক অভেদ না থাকিলেও উপচার দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে, ইহা বলিলে কোন বিপ্রতিপত্তিই দেখা যায় না। অতএব ইদংকারাস্পদ—অর্থাৎ ইহা, তাহা, সেই ইত্যাদি পদপ্রতিপাদ্য দেহ, ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি, পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু প্রভৃতি ভূত ও ভৌতিক বিষয় সমূহ হইতে অহং-প্রত্যয়াধিগম্য আত্মা যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্পষ্টই অনুভব-গম্য। এতাদৃশ আত্মা বিষয়ক সংশয় কাহারও হওয়া উপযুক্ত বা সম্ভব নহে। সুতরাং নিঃসংশয়িত আত্ম-বিষয়ক জিজ্ঞাসা প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যের হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ এই আত্মজ্ঞান দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হইতে পারে না; সুতরাং প্রেক্ষাবান্ মনুষ্যের ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া উচিত নহে; কেন না, যদিও বিচারস্থলে এই নিরূপণীয় আত্মজ্ঞানের—সংসার-নিবৃত্তি পুরঃসর অপবর্গ—অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিকে প্রয়োজন বলা যায়, তাহা হইলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, পরিদৃশ্যমান সংসারের প্রকৃত কারণ কি? এবং নিরূপিত আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে কি না? আমাদের শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা

পরিচিন্তন করায় উপলব্ধি হয়, অনাদি অবিদ্যা-জন্য আত্মার যাথার্থ্যানুভব—অর্থাৎ আত্মার স্বরূপাবগতিই অনুভবাভাবই সংসারের বাস্তবিক কারণ এবং আত্মার যাথার্থ্যজ্ঞান দ্বারাই সংসারের নিবৃত্তি পুরঃসর মুক্তি হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মস্বরূপের অনুপলব্ধি (বেদান্তবিদ্‌গণের মতে) অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত আছে।

এখন বিবেচনা করিতে হইবে, সংসার-নিবৃত্তির নিদানভূত এই আত্মযাথার্থ্যানুভূতি আমাদের আছে? না তাহার নিমিত্ত বহুতর আয়াস-সাধ্য প্রযত্নান্তরের আবশ্যক? আমরা "আত্মযাথার্থ্যানুভব বা আত্মার স্বরূপোপলব্ধি, এই শব্দার্থের পরিচিন্তন করিলে বুঝিতে পারি, 'অহং' বা 'আমি' এই অনুভব ব্যতীত আত্মযাথার্থ্যানুভব বা আত্মস্বরূপোপলব্ধি নামক জ্ঞানান্তর নাই বা হইতে পারেনা। কিন্তু এই 'অহং' বা 'আমি' এতদ্রূপ আত্মার অনুভব প্রাকৃত মনুষ্য হইতে তত্ত্বদর্শী বিদ্বজ্জনগণ পর্য্যন্ত সকলেরই স্বাভাবিক বিদ্যমান আছে। তবেই বুঝিলাম, আত্মযাথার্থ্যানুভব নিমিত্ত আমাদের প্রযত্নান্তরের আবশ্যকতা নাই এবং আমাদের সংসারানুস্থিতির আদি কল্পনা না করিতে পারিলে, আত্মযাথার্থ্যানুভূতিও অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত আছে, স্বীকার্য্য। যদি সংসার অনাদি-অবিদ্যা-পরিকল্পিত হইল, অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে আত্মস্বরূপানুভব নিমিত্ত হইল এবং অনাদিকাল হইতেই জীব সমূহের আত্মযাথার্থ্যানুভূতি বিদ্যমান আছে, প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে কাযেকাযেই স্বীকার করিতে হইবে, এই অনাদি-সিদ্ধ অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত আত্মযাথার্থ্যানুভূতি নিমিত্ত সংসার এবং অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত 'অহং' বা 'আমি' ইত্যাকার আত্মস্বরূপোপলব্ধির পরস্পর অভিভাব্যাভিভাবকভাব বা বিরোধ্য-বিরোধকভাব কল্পনা করা যায়না। তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, আত্মযাথার্থ্যানুভব দ্বারা অনাদি-অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ মায়াবিলাস-পরিকল্পিত সংসারের নিবৃত্তিপুরসরঃ অপবর্গ বা নির্ব্বাণমুক্তি হইতে পারেনা বা সম্ভাবিত নহে। সার্ব্বজনীন স্ফুটতর অনুভব দ্বারা সমর্থিত—অর্থাৎ নিশ্চিত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থ জাত হইতে ব্যতিরিক্ত 'অহং' বা 'আমি' এবম্প্রকার প্রত্যয়াধিগম্য আত্মাকে উপনিষৎ বা বেদান্তের সহস্রবাক্য দ্বারাও কেহ অন্যথারূপে প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম নহে। সহস্র শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারাও ঘটকে পট—অর্থাৎ বস্ত্র বলিয়া প্রতিপাদন করিতে কেহই সমর্থ হয়না। শাস্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিমাত্র সাহসেরই কর্ম্ম। অতএব আত্মজ্ঞান বিষয়ক সংশয় ও প্রয়োজনের অভাব বশতঃ বহুতর আয়াস-সাধ্য বেদান্ত-জিজ্ঞাসা—অর্থাৎ উপনিষদ্বাক্য দ্বারা আত্মজ্ঞানবিচারের প্রবর্ত্তনা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হয়না, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। উক্ত আশয়েই অলৌকিক প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় দার্শনিক তত্ত্বদর্শী জ্ঞান-গুরু শঙ্করাবতার ভগবান শঙ্করাচার্য্য 'যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয় গোচরয়োঃ' ইত্যাদি অধ্যাসভাষ্যের অবতারণা করিয়া প্রথমতঃ আশঙ্কা করিয়াছেন, পরে যুক্তিদ্বারা আশঙ্কার পরিহার করিয়া, অহংজ্ঞানের অধ্যস্ততা প্রতিপাদন করিয়া আত্মনির্ণায়ক বেদান্ত-বিচারাত্মক বেদান্ত-দর্শনের প্রবর্ত্তনার অত্যাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বেদান্ত-ভূষণ,
কাব্যতীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, সাংখ্যরত্ন।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——०:०:०——

মূল—১৭।

বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কোবা,
নার্য্যা পিশাচ্যা নহি বঞ্চিতো যঃ।
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাঞ্চ নারী,
দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্তদৈন্যং॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৯) বিজ্ঞ হইতেও মহা-বিজ্ঞতম কোন্ ব্যক্তি? গুরুর উত্তর——যিনি পিশাচী রমণী (১) দ্বারা প্রতারিত না হন, অর্থাৎ যিনি পুংশ্চলীর সর্ব্বানর্থ-সংঘটন-পটীয়সী অপ্রতিহতা মোহিনী শক্তি দ্বারা অভিভূত, ধর্ম্ম-মার্গ হইতে অপসৃত, পুরুষার্থ লাভে বঞ্চিত এবং অধঃপাতিত না হয়েন, সেই ব্যক্তিকেই বিজ্ঞ হইতে মহাবিজ্ঞ-তম—অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া জানিবে। কারণ এই নারীপিশাচীর অসাধ্য কিছুই নাই।

"যোষিদ্রূপাচ যা মায়া সর্ব্বেষাং মোহকারিণী।
লীলয়া কুরুতে মোহমাত্মারামস্ত সন্ততং"॥
(ব্রঃ বৈঃ ৪।৩৬।৮৫)

নারীরূপা মায়া সকলেরই মোহকারিণী, ঐ মায়া অবলীলাক্রমে আত্মারাম (ব্রহ্মনিষ্ঠ) পুরুষগণেরও মোহ উৎপাদন করে—অর্থাৎ বিবেক বিজ্ঞান সম্যগ্রূপে নষ্ট করিয়া ফেলে।

বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশের ১৫অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কণ্ডু নামে বেদ-বিদাম্বর একজন মুনি প্রম্লোচা নাম্নী একটী অপ্সরা দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

কণ্ডুর্নাম মুনিঃপূর্ব্বমাসীদ্ বেদবিদাংবরঃ।
সুরম্যে গোমতী তীরে স তেপে পরমংতপঃ॥
তৎক্ষোভায় সুরেন্দ্রেণ প্রম্লোচাখ্যা বরাপ্সরা।
প্রযুক্তাক্ষোভয়ামাস তমৃষিং সা শুচিস্মিতা॥
ক্ষোভিতঃ স তয়া সার্দ্ধং বর্ষাণামধিকং শতং।
অতিষ্ঠন্মন্দরদ্রোণ্যাং বিষয়াসক্তমানসঃ॥

পূর্ব্বকালে কণ্ডুনামে বেদবিদাম্বর এক মুনি ছিলেন। তিনি পরম রমণীয় গোমতী-তীরে উৎকৃষ্ট তপঃ সাধন করিতে ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার চিত্তবিকার উৎপা-দন দ্বারা তপস্যা নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে প্রম্লোচা নাম্নী শুচিস্মিতা একটী বরাঙ্গ-নাকে নিযুক্ত করেন। সেই অপ্সরা ঋষি-বরকে ক্ষোভিত করিয়াছিল। তিনি বিকার প্রাপ্ত ও বিষয়াসক্তচিত্ত হইয়া শত বর্ষের

---

(১) সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ানুসারে নারীজাতি যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

"সর্ব্বাঃপ্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমা মধ্যমাধমাঃ।
সত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চপতিব্রতাঃ।
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃপ্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সুখসম্ভোগবত্যাশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা॥
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাত কুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতিখণ্ড)

এইজগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদয় স্ত্রীলোকই—প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা—উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্ব-গুণের অংশ হইতে সমুৎপন্না হইয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা স্বকার্য্যসাধনে তৎপরা ও সুখ সম্ভোগরতা, তাহারা মধ্যমা—অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না এবং তাহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর যাহারা দুর্ম্মুখা, কুলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং অজ্ঞাতকুলজাতা, তাহারাই অধমা এবং তাহারা তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্না। পৃথিবীতে যাহারা বেশ্যা এবং স্বর্গে যাহারা অপ্সরা নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা পুংশ্চলী নামে অভিহিত হয়। দুশ্চারিণী মায়াবিনী পুংশ্চলী দিগেরই প্রকৃতি পিশাচীর মত [illegible]।

অধিককাল মন্দরপর্ব্বতের দ্রোণী মধ্যে তাহার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

তদনন্তর সেই কামিনীর মুখে আপনার মোহের বিষয় অবগত হইয়া ধিকার দিয়াছিলেন—

নিশম্যতদ্বচঃ সত্যং সমুনির্নৃপনন্দনাঃ।
ধিঙ্মাংধিঙ্মামতীবেত্থং নিন্দিতাত্মানমাত্মনা॥
তপাংসি মম নষ্টানি হৃতং ব্রহ্মবিদাং ধনং।
ইতো বিবেকঃ কেনাপি যোষিন্মোহায় নির্ম্মিতা॥

তাহারপর মুনিবর প্রম্লোচার সত্যবাক্য (তিনি যে বহুবর্ষ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তাহার প্রতিই আসক্ত হইয়া আছেন) শ্রবণ করিয়া "আমাকে ধিক্" "আমাকে ধিক্" এই বলিয়া আপনি আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন "হায়! আমার তপস্যা নষ্ট হইল, বিবেক এবং বেদজ্ঞ গণের ধনও অপহৃত হইল। কোন্ ব্যক্তি পুরুষগণের মোহের নিমিত্ত স্ত্রীজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন?"

এস্থলে তপঃসাধন-নিরত বেদবিৎ ব্রহ্ম-পরায়ণ মুনি পুংশ্চলী কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন।

রাজচক্রবর্ত্তী ঐল (পুরুরবা) উর্ব্বশী কর্ত্তৃক মোহপ্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার বিলাপ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১স্কন্ধের ২৬ অধ্যায় পাঠ করিলে জানিতে পারাযায়।

ঐল উবাচ।

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ।
দেব্যাগৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুখণ্ডাইমে স্মৃতাঃ॥
নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্য্যোবাভ্যুদিতোঽমুয়া।
মুষিতো বর্ষ পুপানাং বতাহানিগতান্যুত॥
অহোমেআত্মসংমোহো যেনাত্মা যোষিতাংকৃতঃ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্ত্তী নরদেবশিখামণিঃ॥
সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বাতৃণমিবেশ্বরং।
যান্তীংস্ত্রিয়ঞ্চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্॥
কুতস্তস্যানুভাবঃস্যাৎ তেজ ঈশত্বমেববা।
যোঽন্বগচ্ছংস্ত্রিয়ং যান্তীংখরবৎপদতাড়িতঃ॥
কিংবিদ্যয়া কিংতপসা কিংত্যাগেনশ্রুতেনবা।
কিংবিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্যমনোহৃতং॥
স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্মাংমূর্খংপণ্ডিতমানিনং।
যোঽহমীশ্বরতাংপ্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ॥
পুংশ্চল্যাপহৃতংচিত্তং কোন্বন্যো মোচিতুংপ্রভুঃ।
আত্মারামেশ্বর মৃতে ভগবন্তমধোক্ষজং॥

(ঐলরাজঅনিত্যকামনা-পরবশ হইয়া, তাহাতে অতৃপ্তি বশতঃ উর্ব্বশী কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতন হইয়া, এক বৎসরকাল দিবা-রাত্রির গতাগতি জানিতে পারেন নাই!) ঐল কহিলেন "আহা! আমার কি মোহ-বিস্তারই হইয়াছিল, উর্ব্বশী কর্ত্তৃক গৃহীত-কণ্ঠ ও কামে মুগ্ধচিত্ত হইয়া আমার আয়ুর যে কিয়ৎখণ্ড অতিবাহিত হইল, তাহা আমি স্মরণও করি নাই। এতকাল আমি উর্ব্বশী কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যের অস্তগতি ও অভ্যুদয় জানিতে পারি নাই। আহা! আরও কি খেদের বিষয়, এত বৎসর বৃথা গত হইয়াছে, তাহা আমি এক দিবসও জানিতে পারি নাই। আহা! আমার কি আত্মমোহ, যেহেতু আমি নরদেবশিরোমণি চক্রবর্ত্তী হইয়াও এতকাল একটা স্ত্রীর ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ অধীন হইয়া ছিলাম! আমি এই ঐশ্বর্য্যাদির পরিচ্ছদ সহিত আপনার চক্রবর্ত্তীত্ব তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, নগ্ন হইয়া উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে গমনশীলা স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম! যে ব্যক্তি গর্দ্দভের ন্যায় পদতাড়িত হইয়াও গমনশীলা স্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে, তাহার প্রভাব, তেজ ও ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকে? স্ত্রীকর্ত্তৃক যাহার

মন অপহৃত হয়, তাহার আর বিদ্যা, তপস্যা, দান, অধ্যয়ন, নির্জ্জনবাস বা মৌনাবলম্বন দ্বারা কি হইতে পারে? যে আমি প্রভু হইয়াও গো-গর্দ্দভবৎ স্ত্রীকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছি, মূর্খ ও পণ্ডিতাভিমানী এবং স্বার্থানভিজ্ঞ সেই আমাকে ধিক্ থাকুক্! আত্মারাম ঈশ্বর ভগবান্ অধোক্ষজ হরি ব্যতীত পুংশ্চলী (১) কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত পুরুষকে আর কে মুক্ত করিতে সমর্থ হয়?" (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদ) কিন্তু যে সুচতুর বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মারাম ভগবানের অভয়চরণারবিন্দে আপনার চিত্তকে সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, ভগবৎপ্রসাদে তাঁহাকে যোষিদ্রূপা মায়া দ্বারা অভিভূত বা প্রতারিত হইতে হয়না।

ভগবানের নাম-মাহাত্ম্যাসক্ত পরম ভক্ত হরিদাসের চরিত্রে মহাবিজ্ঞত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হরিদাস কোন সময়ে যেস্থানে সাধন ভজন করিতেন, রামচন্দ্র খাঁ নামে কোন ক্ষমতাশালী দুর্জ্জন তাঁহার প্রতি অকারণ দ্বেষী হইয়া, একটী রূপসী বেশ্যা দ্বারা তাঁহার বৈরাগ্যব্রত ভঙ্গ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ—

"সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্রখান।
বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান॥
হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে॥
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসে ছিদ্র নাপায়।
বেশ্যাগণে আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর উহার বৈরাগ্যধর্ম্মনাশ॥
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে তিনদিনে হরিব তার মতি॥
খান কহে মোরপাইক্ যাউক্ তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেনআনে॥
বেশ্যা কহে মোর সঙ্গ হউক্ একবার।
দ্বিতীয়বারে পাইক লইব তোমার॥
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসে গেল উল্লাসিত হৈয়া॥
তুলসীনমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উথাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর স্বরে॥
ঠাকুর তুমি পরম সুন্দর প্রথমযৌবন।
তোমা দেখি কোননারী ধরিতে নারে মন॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন।
তোমা নাপাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানামসঙ্কীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসংকীর্ত্তন।
নামসমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥

(১) অহো কোবেদ ভুবনে দুর্জ্জেয়ংপুংশ্চলীমনঃ।
পুংশ্চল্যাযোহিবিশ্বস্তো বিধিনা স বিড়ম্বিতঃ॥
বহিষ্কৃতশ্চযশসা ধনেন স্বকুলেনচ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি পুংশ্চলীষেব ভারতে।
তিষ্ঠন্তি পাপিনস্তাভ্যো ন পরাঃ সন্তি কেচন॥
পুংশ্চলীহিংস্রজন্তুভ্যো নরঘাতিভ্য এবচ।
দুষ্টা শশ্বদ্দয়াহীনা দুরন্তা প্রতিজন্মনি॥
অহো সর্ব্বৈঃ পরিত্যাজ্যা পুংশ্চলী চ বিশেষতঃ।
ধনায়ুপ্রাণযশসাং নাশিনী দুঃখদায়িনী॥
নিত্যংনবপরা শশ্বৎপরকার্য্যবিঘাতিনী॥
নিষ্ঠুরা নরঘাতিভ্যঃ সর্ব্বাপবীজরূপিণী॥
বিদ্যুদ্দীপ্তির্জলেরেখা লোভান্মৈত্রী যথা ভবেৎ।
শরদ্রোহাদ্ যথাসম্পৎ কুলটাপ্রেম তৎসমং॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে)

এতশুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥
কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥

এইরূপে তৃতীয় দিবসের রাত্রিশেষে হরিনামের মহিমায়—হরিদাসের মহিমায় বেশ্যার উদ্ধার হইল।

ঈদৃশ সাধু ভক্তগণই—জ্ঞানিগণের শীর্ষ-স্থানীয় এবং বিশ্বমান্য।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫০) জীবের দুশ্ছেদ্য বন্ধন কি? গুরুর উত্তর—"নারী"

"মন্দুরঞ্চতুরঙ্গানাং আলানমিব দন্তিনাং।
পুংসাং মন্ত্রইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা"॥
যোগবাশিষ্ঠ—১।২১।২১

বামলোচনা অঙ্গনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দুরা, হস্তিগণের আলান এবং ভুজঙ্গমগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষগণের বন্ধন (১) স্বরূপ; কারণ—

"স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাংসুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথাবীজাঙ্কুরাদ্ বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥"

বীজের অঙ্কুর হইতে যেরূপ ফলপত্র-সমন্বিত বৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ হইতে পুত্র-গৃহাদি বিষয়ের সহিত পুরুষের সংযোগ ঘটিয়া থাকে।

পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত কামীদিগের তামস গতির বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান কপিলদেবকর্ত্তৃক তদীয় জননী দেবহুতির নিকট সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তকবি তুলসীদাস কহিয়াছেন—

"বেহা বেহা সব্‌কোই কহে, মেরা মনমে এহি ভায়ে।
চড়্ খাটোলি ধো ধো লগ্‌ড়া, জেহেল্ পর্ লে যাওয়ে॥

আহ্লাদের সহিত সকলেই "বিবাহ" "বিবাহ" এই কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু যখন বরকে চতুর্দ্দোলে বসাইয়া আনন্দ-কোলাহলের সহিত বাজনা বাজাইতে বাজাইতে লইয়া যায়, তখন আমার মনে এই ভাবের উদয় হয়, যেন সেই ব্যক্তিকে আজীবন বন্দীভাবে আবদ্ধ রাখিবার জন্য কারাগৃহে লইয়া যাইতেছে। (১) (ক্রমশঃ)

---

(১) "স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায়কামিনাংমনঃ।
অন্যথানভবেৎসৃষ্টিঃ স্রষ্ট্রাতেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥
সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ঃ পরঃ॥
কর্ম্মবন্ধনিবন্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুত।
প্রদীপরূপংকীটানাং মীনানাংবড়িশংযথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখং আরম্ভে মধুরোপমং॥
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানংনরকস্যচ॥
ঋষয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ নোদ্বাহং চক্রুরীপ্সিতং"॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডে শ্রীশঙ্করোক্তিঃ—
"অধুনাহং নগৃহ্নামি প্রকৃতিং প্রাকৃতো যথা।
তপস্বস্যৈকব্যবহিতাং দাস্যমার্গবিরোধিনীং॥
তত্ত্বজ্ঞানসমাচ্ছন্নাং যোগদ্বারকপাটিকাং।
মুক্তীচ্ছাধ্বংসরূপাঞ্চ সকামাং কামবর্দ্ধিনীং॥
তপস্যাচ্ছন্নরূপাঞ্চ মহামোহকরণ্ডিকাং।
ভবকারাগৃহেঘোরে দৃঢ়াংনিগড়রূপিণীং॥
শশ্বদ্বিবুদ্ধিজননীং মম ছিদ্রচ্ছেদকারিণীং।
শশ্বদ্ভোগরূপাঞ্চ বিষয়েচ্ছাবিবর্দ্ধিনীং।"
নেচ্ছামি গৃহিনীং নাথ বরং দেহি যদীপ্সিতং॥

(১) নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী সংসার-বিরাগী যতি-ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রমোচিত ধর্ম্মবিধি অনুসারে রমণীর সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখা তাঁহাদের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু 'উপকুর্ব্বাণ্ ব্রহ্মচারী' যে গৃহী, তাঁহাকে (সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ) অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী সহ-ধর্ম্মিণী পত্নীর সহিত অনাসক্ত হইয়া——কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করিয়া, পুরুষার্থ সাধক গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। অনাসক্ত গৃহীর পক্ষে সুশীলা সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী বন্ধনের কারণ না হইয়া বরং পুরুষার্থ-সাধনের প্রধান সহায়ই হয়েন।

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং" অর্থাৎ পুরুষের গৃহাশ্রমের মূলই পত্নী।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমর্শ্যতে॥"

"পণ্ডিতগণ গৃহকে গৃহ বলেন না, গৃহিণীকেই গৃহ বলিয়া থাকেন। গৃহিণীর সহিত অখিলপুরুষার্থ—(অর্থাৎ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ) সাধন করা যায়।" অতএব কুলকামিনীগণও সুশীলা, সাধ্বী, পতিব্রতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া, যথাবিধি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন বিষয়ে নিজ নিজ পতির সহায়স্বরূপিণী হইবেন, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

সতীর মাহাত্ম্য—

"পৃথিব্যাংযানিতীর্থানি সতীপাদেষুতান্যপি।
তেজশ্চ সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ সতীষু চ॥
তপস্বীনাং তপঃসর্ব্বং ব্রতীনাংযৎফলংব্রজ।
দানেফলং যদ্দাতৄণাং তৎসর্ব্বং তাসু সন্ততং॥
স্বয়ংনারায়ণঃ শম্ভুর্বিধাতা জগতামপি।
সুরাঃসর্ব্বেচ মুনয়ো ভীতাস্তাভ্যশ্চ সন্ততং॥
সতীনাংপাদরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
পতিব্রতাং নমস্কৃত্য মুচ্যতেপাতকান্নরঃ॥
ত্রৈলোক্যংভস্মসাৎকর্ত্তুং ক্ষণেনৈব পতিব্রতা।
স্বতেজসা সমর্থা সা মহাপুণ্যবতী সদা॥
সতীনাঞ্চপতিঃসাধ্বী-পুত্রো নিঃশঙ্ক এবচ।
নহি তস্য ভয়ংকিঞ্চিৎ দেবেভ্যশ্চ যমাদপি॥
শতজন্মপুণ্যবতাং গেহে জাতা পতিব্রতা"।
পতিব্রতাপ্রসূঃ পূতা জীবন্মুক্তঃপিতা তথা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তে)

(ক্রমশঃ)

বিষয়ীর অনুতাপ।

(শান্তিশতকধৃত কতিপয় শ্লোক অবলম্বনে বিরচিত।)

১

বিষয়ে মজিয়া কেন আপনা খাইনুরে!
ভব-ভোগ-বাসনায় বিকল হইয়া হায়!
মানব-জনম কেন বিফল করিনু রে!
হায়! কি ধরিল শনি, বেচিলাম চিন্তামণি
বিনিময়ে কাচমূল্য কেবল লভিনু রে।
ভাল মন্দ না বিচারি বিষয়ে মজিনু রে।

২

জানেনা দাহের জ্বালা, তাই সে শলভ-মালা
দীপের দহন মাঝে দলে দলে যায় রে।
জানে না পিশিত-চয় বড়িশেতে গাঁথা রয়,
তাই সে মীনের দল গিয়া তাহা খায় রে।
জানি মোরা ভালেভাল ভজি যে বিষয় জাল,
কি ঘোর বিপদ রাশি ঘিরে রয় তায় রে,
তবুত ব্যাকুল প্রাণে ধাই বিষয়ের পানে,
মোহের মহিমা মরি কি গহন হায় রে!

৩

সে বিষয়-সমুদয় ঘৃণিত যে অতিশয়,
এহেন ধারণা কিরে মনে কভু হয় না?
কেন না হইবে হায়! স্পৃহা তবু নাহি যায়,
স্পৃহার আয়ুর ক্ষয় ধরায় কি রয় না?
কোন বা না কোন দিন হইব যে প্রাণহীন,
এমন ভাবনা কার মনে ঠাঁই পায় না?
তবু ত গৃহের প্রতি গাঢ়তর রহে রতি,
অনুরাগ মানবেরে ত্যজিবারে চায় না!
কভু যদি করি মনে ভজি আজি নারায়ণে,
বাসনা সে দিকে তবু কভু যেতে চায় না।
হায়রে ধরণীতলে বুদ্ধিজীবী নরদলে
কেন এ যাতনা সহে, কিছু বুঝা যায়না!

৪

রমণীয় হর্ম্ম্যতল কি সুখের বাসস্থল,
বসতি করিতে তথি কার মন ধায় না?
শ্রবণের প্রীতিকর নিতরাং মনোহর—
শুনিতে সঙ্গীত কার মন-প্রাণ চায় না?
সুখ-শান্তি-প্রদায়িনী প্রাণসমা প্রণয়িনী,
তার সমাগম-সুখ লভিতে কে চায় না?

যে সুখের কাছে হায়! সঙ্গীত না ঠাঁই পায়,
গৃহ, বাস, ধন, জন, কিছুই দাঁড়ায় না!

৫

তবে কেন সাধুগণ ত্যজি গৃহ-ধন-জন
বনের মাঝারে গিয়া বিরলে লুকায় রে?
তারা কি মানব নয়? কামনা কি নাহি রয়?
সুখের সামগ্রী তাই কিছুই না চায় রে!
জানে সেই সমুদয় চিরদিন তরে নয়, —
ক্ষণেকের তরে আছে—ক্ষণে নাই হায় রে?
সুবিবেকে নিরমল বুদ্ধি যার অচঞ্চল,—
তার মন সে সকলে কখনো কি ধায় রে?
দীপাঙ্কুর যবে জ্বলে, পতঙ্গেরা কুতূহলে
—অন্ধ হয়ে দলে দলে শিখাপাশে ধায় রে,
পক্ষ-পুট-সঞ্চালন-সঞ্চারিত-সমীরণ
থর-থরে চারিধারে শিখারে কাঁপায় রে;
সে শিখার ছায়া প্রায় যে ভোগ চঞ্চল হায়!
সে ভোগ সাধুর মন কখনো না চায় রে,
যে ভোগ অনন্তকাল সমভাব—নিজ্জঞ্জাল,
সে ভোগের লোভে সাধু সব ত্যজি যায় রে!

৬

আত্মবোধ-সমুদয়ে বিবেকের সমাশ্রয়ে
বুদ্ধি আহা! যাহাদের বিমলতা পায় রে,
দেখ সেই সাধুগণে প্রশান্ত প্রসন্ন মনে
দুষ্কর সাধন কত সাধে এ ধরায় রে!
করতলে ধনরাশি, তাহারে না প্রিয় বাসি,
ছার ভাবি অবহেলে ছাড়িয়া পলায় রে,
ধনে দেয় যত ভোগ, না চায় করিতে ভোগ,
স্পৃহার ধারে না ধার—কিছুই না চায় রে!
ধন্যি! তারা কত ধন্য! ত্যজিয়া বিষয় অন্ধ,
গিরির কন্দরোদরে সুখে চলি যায় রে;
পর-জ্যোতি ধ্যান করে পরম-আনন্দ ভরে,
প্রেম-ধার দুনয়নে গলয়ে ধারায় রে;
পরানন্দে মাতে প্রাণ, নাহি রহে বাহ্যজ্ঞান,
[illegible] প্রায় দেখো তাই যায় রে।

বিহঙ্গ আতঙ্কহীন—অঙ্কে সুখে সমাসীন—
সেই প্রেম-বারি পানে পরিতোষ পায় রে।
দেখ পুনঃ আমাদের কি ঘোর গ্রহের ফের,
কিরূপেতে পরমায়ু ক্রমে ক্ষয় পায় রে;
কিরূপেতে যায় কাল করি ভোগ কি জঞ্জাল,
কেমনে কামনা-স্রোত হৃদয় ভাসায় রে!
করেছিনু প্রাণপণ, আগেও পাইনি ধন,
এখনো ত ধনলাভ হইল না হায় রে!
পরেও যে পাব ধন, হেন নাহি লয় মন,
ধন-সমাগম হায়! শুধু বাসনায় রে।
লভি ধন মনোরথে, ভুঞ্জি ভোগ বিধিমতে,
কত-না কামনা মরি! মনে উঠে তায় রে;
মনে মনে স্ত্রী-বিলাস, মনে মনে বারমাস
বিশাল প্রাসাদ জাগে—বসতি তথায় রে;
মনে মনে মনোহর সাজিতেছে সরোবর,
মরাল-মীনের কুল সলিলে খেলায় রে!
তীরে তার থরেথর তরু রাজি মনোহর,
বিচিত্র কেলির কুঞ্জ বিরচিত তায় রে!
কেলি-কুঞ্জ পুনরায় পুঞ্জে পুঞ্জে সাজে হায়!
ফল-ফুল-লতা-পাতা কতই শোভায় রে;
কত পাখী থরেথর—শুনায় মধুর স্বর,
শরীর-শোভায় কেহ নয়ন ভুলায় রে।
কত দিকে কত ঠাঁই মনেই দেখিতে পাই
রমণীয় কেলিগৃহ রঞ্জিত শোভায় রে,
সুগঠন মনোহর মূল্যবান্ থরেথর
সখের সামগ্রী কত সজ্জিত তথায় রে;
কখনো ষোড়শী বালা রূপে গৃহ করি আলা,
বিলাসে নাচায় অঙ্গ বিভ্রম খেলায় রে;
গৃহ ভরি নিরন্তর কণ্ঠ-ভক্তি-মনোহর
সঙ্গীতের ধ্বনি উঠি লহরে খেলায় রে।
বাঞ্ছামাত্র বারমাস ভুঞ্জি হেন যে বিলাস,
তাহাও ত্যজিতে কভু চিত্ত নাহি চায় রে!
হেনরূপে যায় কাল, বাড়ায়ে বাসনা-জাল,
হেনরূপে পরমায়ু ক্ষয় পেয়ে যায় রে।

বাসনার বশে হায় কত ভ্রমে পড়া যায়,
ভাবিয়া দেখিলে তার সীমা নাহি পাইরে।
কেমনে কামনা পূরে তার তরে ফিরে ঘুরে
ভূপতির দ্বারদেশে ভয়ে ভয়ে যাই রে।
দুচারি গ্রামের পতি কোন নর হীনমতি,
কোনমতে তার যদি পদাশ্রয় পাইরে,
বহুল আয়াসে তার তুষি মন অনিবার,
কিছু ধন পাই যদি ধন্য হ'য়ে যাই রে।
যিনি জগতের গতি, ত্রিলোকের অধিপতি,
যাহারে সেবিতে কোন আয়াস না চাই রে,
সেবা যাঁর মনে মনে হয় বিনা আয়োজনে,
স্বপদ সেবকে দিতে ত্রুটি যাঁর নাই রে,
ক্ষণের তরেও হায়! ভাবিনা ভ্রমেও তাঁয়,
সামান্য ধনের জন্য ধনি-গৃহে যাই রে!
বাসনার বশে তাই ভ্রমের অবধি নাই—
যে ভ্রমের ঘোরে ধরা ঘুরিয়া বেড়াই রে!
(ক্রমশঃ)
শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

হিন্দু-জ্যোতিষ। (১)

আমরা সংপ্রতি ভাওয়াল-অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়বাহাদুর এবং তদীয় সুযোগ্য মন্ত্রী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে, ঢাকাকলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ব্রেণ্নাণ্ড সাহেব মহোদয়-প্রণীত সচিত্র হিন্দু-গণিত-জ্যোতিষ (Hindu Astronomy) নামক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। শুভক্ষণে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ কালীপ্রসন্নবাবুকে মন্ত্রীস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌভাগ্য বশতঃই যেন লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর এই শুভ সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য সমালোচনী সভা" কতিপয় বৎসর যাবৎ অশেষপ্রকারে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্য তজ্জন্য চিরদিন রাজাবাহাদুর এবং রায়-বাহাদুরের নিকট ঋণী থাকিবে। এতকাল পর্য্যন্ত কালীপ্রসন্নবাবু নিজে তাঁহার চিন্তা-ময়ী লেখনী দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্য নানাপ্রকারে রঞ্জিত করিয়া, এবং সভা-প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পরোক্ষভাবে ধীরে ধীরে সাহিত্য-কাননে অশেষবিধ নিরবদ্য কুসুম বিকাশ করিয়াও তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়েন নাই; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কালিদাস বলিয়াছেন—"উৎসর্পিণী খলু মহতাং প্রার্থনা"—তাই আজ আমরা কালী-প্রসন্ন বাবুর আন্তরিক যত্নে লুপ্তপ্রায় হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রের এই বিচিত্র গ্রন্থ নয়ন-গোচর করিতে সমর্থ হইলাম।

বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী লুপ্ত-প্রায় আর্য্য-শাস্ত্রসমূহের উদ্ধারের এবং সংরক্ষণের জন্য যাদৃশ যত্ন, শ্রম ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করেন, এবং আমরা সে বিষয়ে যেপ্রকার শোচনীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকি, তাহা চিন্তা করিতে গেলেও যুগপৎ ঘৃণা এবং লজ্জায় অভিভূত হই; সুতরাং মহাত্মা ব্রেণ্নাণ্ড সাহেব-প্রণীত জ্যোতিষশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া একপক্ষে যেমন পুলকিত হইলাম, পক্ষান্তরে— আমাদের অকর্ম্মণ্যতা স্মরণ করিয়া তেমনই বিষণ্ণ হইলাম।

যদিও আমরা অনেকস্থলে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মত বা ব্যাখ্যা সম্যক্ সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিতে পারি না, তথাপিও যখন তাঁহাদের

অক্লান্ত অধ্যবসায় ও গভীর গবেষণার বিষয় চিন্তা করি, তখন তাঁহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। আর ইহা না বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, পাশ্চাত্য বিদ্বদ্বৃন্দের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা-রূপিণী আলোক-বর্ত্তিকার সাহায্য ব্যতিরেকে হয়ত আমরা অনেক সময়ে দুর্গম আর্য্যশাস্ত্র-নিহিত রত্নান্বেষণে বিফলমনোরথ হইতাম। অস্মদ্দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে শাস্ত্র-চর্চ্চা নাই, তাহা নহে; কিন্তু আমরা সর্ব্বত্রই পল্লব-গ্রাহিতা এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসার অভাব অবলোকন করিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হই।

অধুনা কি বঙ্গদেশ, কি অন্য কোন ভারতীয় প্রদেশ, যেখানে যে পরিমিত বিদ্যাচর্চ্চা পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য। জ্ঞানানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া অতি অল্প লোকেই বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য জাতীয়েরা যে আমাদিগের বর্ত্তমানাবস্থা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানানুরাগে জ্ঞান চর্চ্চা হইয়া থাকে; তাঁহাদের জ্ঞানানুশীলন প্রায়শই জীবিকার্জ্জন-প্রয়োজন-নিরপেক্ষ।

বহুকাল পূর্ব্বে ব্রেণ্‌নাণ্ড সাহেব ঢাকা-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি আমাদের গণিত-শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও সেই অধীত শাস্ত্রসমূহের যে অনুশীলন করিয়াছেন, অদ্য তাহারই ফল-স্বরূপ, আমরা তৎপ্রণীত "হিন্দু-গণিতজ্যোতিষশাস্ত্র" প্রাপ্ত হইলাম। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি। হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অতি অনায়াসে হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রের মূলতথ্য অবগত হইতে পারিবেন। ইহাতে আর্য্য-জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতি অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং অস্মদ্দেশ-প্রসূত এই জ্যোতিষশাস্ত্র কিপ্রকারে ক্রমে পৃথিবীতে অপরাপর দেশে ও জাতিতে অধিগত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে অস্মদ্দেশে যে সমুদয় মহাত্মারা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদিগের গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, কালনির্ণয় এবং তাঁহাদের মধ্যে কে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কোন্ অংশের আবিষ্কারক, তাহাও ইহাতে অতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা এই গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। ভগবান, ব্রেণ্‌নাণ্ড মহোদয়ের এবং তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ, রায় বাহাদুর কালী প্রসন্ন, রায়সাহেব দীননাথ এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য আর্য্যশাস্ত্রানুরাগী মহোদয়দিগকে দীর্ঘজীবী করুন। উপসংহারে—রাজাবাহাদুর প্রভৃতির নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা ইংরাজীভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থে "সাহিত্য-সমালোচনী সভা" হইতে ইহার একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া, বঙ্গভাষার সমৃদ্ধি-সাধন, স্বদেশের উপকার সম্পাদন, এবং আপনাদিগের পুণ্য-প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধন করুন।

১) Hindu Astronomy, by W. Brennand.

London—Published by Chas. Straker and Sons, Ld.

Bishops Gate Avenue, E. C.

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

বিষয়ীর অনুতাপ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

——•:০:•——

৮

দিবানিশি প্রাণপণে সেবা করি সেই জনে,
করায়ে সে কত ক্লেশ শেষে ধন দিবে রে!
বনে গিয়া রহি যদি, অনায়াসে নিরবধি
আমার অভাব যত আপনি পুরিবে রে।
ক্ষুধা নাশে ফল-মূল, নদী-নীর ক্ষীর-তুল
দারুণ তৃষার নাশে প্রচুর রহিবে রে;
গিরির কন্দরস্থল অথবা তরুর তল
করিবার তরে বাস সতত মিলিবে রে।
নিজ তনুজের মত হরিণ-হরিণী যত
নাচি নাচি কাছে আসি আদরে খেলিবে রে।
গাহিয়া আনন্দ-গান তুষিবারে মন-প্রাণ
বনের বিহঙ্গকুল বান্ধব মিলিবে রে।
পরিধানে-বল্কল যোগাইবে তরুদল,
নব কিশলয় দিয়া শয়ন রচিবে রে;
শাখা দিয়া রাশি রাশি শীতের তরাস নাশি,
নিদাঘে দারুণ তাপে বীজন করিবে রে।
অনায়াসে এ বিভব বনে যদি মিলে সব,
গৃহে তবে গৃহিগণ বেশি কি লভিবে রে?

৯

গৃহেতে করিয়া বাস দেখিয়াছি—বার মাস
দুখ বিনা বেশি আর কিছু না মিলিবে রে।
বিষয় বাসনা করি, অকারণে কাল হরি,
ফলোদয় তায় কিবা, ভাবিয়া না পাই রে।
বনে মুনি স'ন যাহা, গৃহে মোরা সহি তাহা,
মুনি পান যেই ফল, না পাই তাহাই রে।
কেহ যদি করে দোষ, তাহে না করিয়া রোষ,
ক্ষমা-গুণে মুনিগণ ক্ষমেন সদাই রে।
অহিত করিলে অরি, আমরাও ক্ষমা করি,
প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা যে নাই রে!
মুনিরা পরম জ্ঞানী, গৃহ-সুখ বৃথা মানি,
সন্তোষে ত্যজেন সব—ক্ষোভ কিছু নাই রে।
গৃহে মোরা যত জনা না পাই সুখের কণা,
সুখেরে চাহিয়া তবু চারিধারে ধাই রে।
মুনিরা করিতে তপ শিরে স'ন শীতাতপ,
ঝঞ্ঝাবাতে বৃষ্টিপাতে নাহিক বালাই রে;
আমরা না করি তপ, তবু সহি শীতাতপ,
ঝড় জল না মানিয়া ঘুরিয়া বেড়াই রে।
মুনিরা মজায়ে প্রাণ নিরত করেন ধ্যান
হরির পরম পদ, অন্তে মন নাই রে;
আমরাও প্রাণপণে ধ্যান শুধু করি ধনে,
সেই ধ্যানে যত কিছু সব ভুলে যাই রে।

তাই বলি হায় হায়! অকারণে কাল যায়,
গৃহে রহি গৃহোচিত সুখ নাহি পাই রে;
সহি বনে যে সকল মুনি পান যেই ফল,
সেই সব(ই) সহি গৃহে, সেই ফল নাই রে!

১০

কেন তবে গৃহে রহি অকারণে জ্বালা সহি?
পর-উপাসনা করি পাই কিবা ফল রে?
কেন বা না বনে যাই, অনায়াসে যথা পাই
জীবনের উপযোগী ফল-মূল-জল রে?
ধরি সুমধুর ফল বনে রহে তরুদল,
শীতল-ঝরণা-জল অতি নিরমল রে।
গিরির কন্দর ঘর, শয়ন পাতার স্তর,
পরিধান তরে বাস তরুর বাকল রে।
সমীরে দুলায় ফুল, গায় বিহঙ্গের কুল,
সুরঙ্গে খেলিয়া ফিরে কুরঙ্গের দল রে;
আসিলে নিশার কাল, কলানিধি তারা-জাল
আলোক দিবারে কর ঢালে অবিরল রে।
বনমাঝে নিরবধি এ বিভব মিলে যদি,
বাসনায় কেন তবে হইয়া বিকল রে,
সেবিবারে নরপতি ধাই সদা দ্রুতগতি,
স্বাধীন বিভব ত্যজি সেবায় কি ফল রে?

১১

বনেতে যাইলে হায়! জ্বালা যদি ঘুচে যায়,
বনে যেতে কেন তবে চিত মোর চায় না?
কেমনে যাইব বন? মুখে বলি যে বচন,
হৃদয়ে যে সেই সব স্থান কভু পায় না!
শিখে মানুষের মুখে নানা বুলি বলে শুকে,
অথচ যা' মুখে বলে, মনে তাহা যায় না;
আমরাও তথা হায়! সদাই শুকের প্রায়
মুখে বলি নানা বুলি—মন যাহা চায় না!

১২

শুনি সদা কুতূহলে সকলেই মুখে বলে—
"ভোগের বিষয় যত, ঘৃণিত তা হয় রে,
এত আদরের কায়, যতনে পুষিছ যা'র,
ঘৃণিত তাহার তুল্য কিছুই না রয় রে।
আত্মীয়-স্বজন—আর পুত্র-মিত্র-পরিবার—
নিজের জীবন(ও) ছার চিরতরে নয় রে;
অসার সংসার-ধাম, বিষময় পরিণাম
সংসারে মজিয়া থাকা উচিত না হয় রে।"
মোদের এ বাক্যগুলি শুধুই মুখের বুলি!
পুণ্যবান্ বিনা কারো হৃদয়ে না রয় রে;
ত্যজিয়া ভোগের আশ কাননে করিতে বাস
তাই আমাদের চিত সদা ভীত হয় রে।

১৩

অথচ বুঝিনা হায়! কেন মন গৃহ চায়,
চির-স্থির সুখ যদি গৃহে নাহি পাই রে;
মেঘেতে চপলা যথা, গৃহ-ভোগ-সুখ তথা,
ক্ষণেক ঝলসি উঠে—ক্ষণে পুন নাই রে!
প্রতিক্ষণে চপলার অপগমে বারম্বার
দ্বিগুণ আঁধার বাড়ে—দেখে ভয় পাই রে;
মিলে যদি সুখ-লেশ, অপগমে বাড়ে ক্লেশ,
দ্বিগুণ দুখের তেজ দেখিতে ডরাই রে।
প্রাণেরে করিয়া পণ যোগাই যাহার মন,
সে নলিনী-নয়নার মন ত না পাই রে!
বিষময়ী ছলনায় হৃদয় জ্বালায় হায়!
সাপিনীই শুধু তার তুলনার ঠাঁই রে।
প্রীতিপাত্র পরিজনে প্রেম করি প্রাণপণে
যেই সুখ পাই, তার স্থিরতা ত নাই রে;
স্বীয় পরাক্রমে স্বৈরী শমন দারুণ বৈরী—
কখন কাহারে হরে, ঠিকানা না পাই রে।
দারুণ কুটিল রোগ দেহে দেয় কি দুর্ভোগ!
বিষয়ের ভোগে যদি মানস মজাই রে।
লক্ষ্মী সদা সুচঞ্চল, তাঁর তুল্য নাহি খল,
খলে সেবি কোনকালে কোন ফল নাই রে!
যার যত গৃহাবেশ, তার তত বাড়ে ক্লেশ,
গৃহ গৃহ করি তবে কেনবা বেড়াই রে?
যোগিজন প্রাণপণে পালয়ে যে পরিজনে,
পালিতে সে পরিজনে কেনবা না চাই রে?

১৪

যোগীর যে পরিবার, তুলনা কি দিব তার?
সুখের আগার বুঝি তাহাই ধরায় রে!
আছে তার পিতামাতা, আছেরে ভগিনী-ভ্রাতা,
গৃহিণী-তনয় সব সুখের মেলায় রে!
'ধৈর্য্য' হন পিতা তার, 'ক্ষমা' সে জননী আর,
'শান্তি' সে গৃহিণী—তার নিরত সেবায় রে;
'শম' 'দম' সহোদর সদা তার সহচর,
'সত্য' তার প্রিয় সুত—হৃদয়ে খেলায় রে!
সেবে তারে অনিবার সহোদরা 'দয়া' তার,
তুলনা মিলেনা যার গুণ-গরিমায় রে,
হেন পরিজন যার, কিসের ভাবনা তার?
কি জ্বালা জ্বালাতে তারে পারে এ ধরায় রে!
হেন পরিজনগণে পালয়ে যে প্রাণপণে,
জ্ঞানামৃত আনি তারা তাহারে পিয়ায় রে;
গৃহে বা তরুর তলে পালঙ্কে বা ভূমিতলে
অমরা-অতীত সুখে রাখয়ে তাহায় রে!
আমাদের পরিজনে পালি যদি প্রাণপণে,
বিধিমতে আমাদিগে তথাপি জ্বালায় রে।
বুঝি হেন মনে মনে, তবুত সে পরিজনে
ত্যজিবারে ক্ষণতরে বুদ্ধি না জুয়ায় রে!
আমি কার—কে আমার? মনে মনে এ বিচার
এখনো ক্ষণের তরে উঠিল না হায় রে!

১৫

রবি আসে রবি যায়, বল কবে ভাবি হায়!
পরমায়ু প্রতিদিন ক্ষীণ হয় তায় রে,
মোহে রহি অবিরত বহুল ব্যাপারে রত,
কোথা দিয়া কাল যায়, জানা নাহি যায় রে!
হেরেছি জনম-জরা হেরেছি অকালে মরা,
হৃদয়ে ত ভয় তবু ঠাঁই নাহি পায় রে;
ভেবে ব্যথা পাই প্রাণে, প্রমোদ-মদিরা-পানে
এহেন পাগল কেন হইনু ধরায় রে?

১৬

ব্যাধিতে বিধুর হায়! বিকল হইল কায়,
জরা ক্রমে দেহে আসি লইল আশ্রয় রে;
বল-বুদ্ধি আগেকার, বিপুল উদ্যম আর,
ক্রমে ক্রমে সমুদয় পাইল বিলয় রে।
পালিতে স্বজনগণ প্রাণ করেছিনু পণ,
সে পালন আমাহ'তে এখন না হয় রে!
যেই তত্ত্ব মানবের ভাবনীয় একালের,
সে তত্ত্ব এখনো হৃদে সমুদিত নয় রে!
বিষয়ে মজিলে হেন পরিণাম হয় রে!

শ্রীঅম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়।

আমিত্বের প্রসার।

বনী ও ভিক্ষু।

—০:০:০—

শৈশবেহভ্যস্ত বিদ্যানাং
যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্দ্ধক্যে মুনি-বৃত্তীনাং
যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

এই শ্লোকে মহাকবি কালিদাস আর্য্য-জীবনের চতুর্ব্বিধ বিভাগের চতুর্ব্বিধ কর্ত্তব্য অতি সংক্ষেপে ও সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়; তদনন্তর আশ্রমোচিত নানাবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া, কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক সাধন পূর্ব্বক বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। অনন্তর ভিক্ষু-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে হয়। এই প্রাচীন প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর স্থাপিত এবং আত্মপ্রসারের অনুকূল। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদিগের দেহ ও মনের

বহুবিধ পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াও বিভিন্ন হইয়া থাকে। বাল্যের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যে নূতন নূতন আকার ধারণ করে। যে সমুদয় বস্তু, কার্য্য বা চিন্তা এক অবস্থায় অতুল আনন্দের বা নিরতিশয় দুঃখের কারণ হয়, অবস্থান্তরে তাহাদের সে শক্তি থাকেনা। বালিকা তাহার পুত্তলী-পুত্র-কন্যার লালন পালনে কতই আনন্দ-বিহ্বলা, কিন্তু যুবতী তাহাতে পরিতৃপ্তা নহে,—তাহার যথার্থ পুত্রকন্যার প্রয়োজন। আত্মবিকাশের সহিত আত্মতৃপ্তিকর পদার্থনিচয়ের সীমা পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া, বৃদ্ধা যৌবনাবস্থায় যে পুত্রকন্যারূপ পুত্তলী লইয়া মত্ত ছিলেন, হয়তো এখন আর তাহাতে মুগ্ধ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চিত্তের সুখশান্তির জন্য অধিকতর নিত্য বস্তুর প্রয়োজন হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মানব এইরূপ আত্মবিকাশের সহিত অনিত্য পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক অধিকতর নিত্যান্বেষণে নিরত থাকিয়া চিরনিত্যাভিমুখে অগ্রসর হয়। মনের প্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত না হইলে, উহার ইহাই স্বাভাবিক পরিণতি। তত্ত্বজ্ঞ দূরদর্শী ঋষিগণ, বিশ্ব-কল্যাণব্রত-সাধনোদ্দেশে মানবজীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ক্রম-বিকাশোপযোগী কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে জ্ঞানের যে অর্জ্জন হয়, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ-আশ্রমে তাহার উন্নতি,—পরিণতি এবং ভিক্ষ্বাশ্রমে তাহার পূর্ণ পরিণতি সাধন করিতে হয়। মুক্তিই জীবনের উদ্দেশ্য ও পরিণতি; আত্মার প্রসার বা বিকাশের পূর্ণতার সহিত মুক্তির কোনও প্রভেদ নাই। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, যে পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি না হয়, সমগ্র সংসার যে পর্য্যন্ত একসূত্রে গ্রথিত দৃষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত মানব শোক-মোহ পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি উপভোগে অধিকারী হয় না। আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান নষ্ট হইলে, সর্ব্বত্র একত্বের উপলব্ধি হইলে, শোক-মোহের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? একত্বের উপলব্ধিই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান এবং এই তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। জগতে সকলেই সুখের জন্য লালায়িত; কিন্তু যে সুখ দুঃখ-বিমিশ্রিত, সে সুখ সুখই নহে। যদি দুঃখবিবর্জ্জিত বা দুঃখ-নিরপেক্ষ কোন সুখ থাকে, সেই সুখই যথার্থ সুখ বা শান্তি; সুদুর্লভ হইলেও তাহা লাভ করিতে কে না প্রয়াসী? চিন্তা করিয়া দেখিলে, কোন সসীম বস্তুতে সুখ নাই বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সীমায় উপনীত হইলেই অনন্ত-বিকাশ-শীল মানবাত্মা যেন কৃতাঞ্জলি হইয়া অসীম-সকাশে ক্ষুব্ধচিত্তে—সকরুণ স্বরে—সতৃষ্ণনয়নে অসীমত্ব-পরিণতি প্রার্থনায় পুনঃপ্রবৃত্ত হয়। যখন মানবাত্মা সসীম প্রদেশ হইতে সসীম-প্রদেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া, অসীম সাম্রাজ্যে অসীমাত্মার প্রসাদে অসীমত্ব অধিকার করে, তখনই সে যথার্থ সুখ বা শান্তি সম্ভোগ করে! সসীম প্রদেশেই অনায়ত্ত বস্তুর প্রাপ্তি-কামনা এবং আয়ত্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কা রহিয়াছে এবং তদ্ধেতু নিরবচ্ছিন্ন অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অসীম সাম্রাজ্যে অপ্রাপ্ত কিছুই নাই এবং প্রাপ্ত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কাও নাই; সুতরাং সেই স্থলেই চিরসুখ ও চিরশান্তি বিরাজ করে।

ব্রহ্মচারীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ; আত্মোন্নতি

সাধনই তাহার প্রধান কর্ত্তব্য; বিদ্যালয় বা গুরুগৃহই তাহার তাবদ্বিশ্ব। এই সংকীর্ণ রঙ্গমঞ্চে তাহার জীবনের প্রথম অংশ অভিনীত হইবার ব্যবস্থা। এখানে তিনি সম্পূর্ণ পরাধীন; যাহা কিছু করিতে হইবে, গুরুর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। বিনা তর্কে গুরুর উপদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। প্রথমে মৃদু—ক্রমে কঠোর সংযম দ্বারা শরীর ও মনকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে। জীবনের দ্বিতীয় বিভাগের তাবৎ কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্য ব্রহ্মচারীর দেহ-মন যেরূপ সংগঠিত করা আবশ্যক, সেইরূপ সংগঠিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ তাহাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার দিতেন। কর্ম্মক্ষেত্রে গৃহস্থের যে তুমুল সংগ্রাম করিতে হইবে, সে স্থলে যে কত শত অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, কত শত প্রলোভনকে পদতলে দলিত করিতে হইবে, কত শত ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে, সাধুদিগের সেবার জন্য, দুষ্কৃতদিগের সংস্কারের জন্য এবং ধর্ম্ম-সংরক্ষণ ও অধর্ম্ম-বিনাশের জন্য তাহাকে যে কত শত বার মহা মহা বিপদে পতিত হইতে হইবে, তাহা চিন্তা করিয়া, শিষ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রাজ্ঞ ও সুদূরদর্শী গুরু তাহাকে ধর্ম্ম-বর্ম্মে আচ্ছাদিত ও কর্ম্ম-বীরোপযোগী নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, শত্রুশত্রু-সংক্ষোভিত সংসার-সমরাঙ্গণে প্রেরণ করিতেন। ব্রহ্মচারী সংকীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া এখন বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার আমিত্বেরও প্রসার হইতে লাগিল। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, কুটুম্ব, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দুঃখী, রোগী, বিকলাঙ্গ, ইত্যাদি বহু পোষ্য-পরিবেষ্টিত গৃহস্থের আমিত্ব দিন দিন প্রসারিত হইতে লাগিল। অসংখ্য কর্ত্তব্য আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উদিত হইতে লাগিল এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য তিনি মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, দেহের কোন এক অঙ্গের অমঙ্গল হইলে, তাবৎ অঙ্গ অমঙ্গলগ্রস্ত হয়, মনের কোন এক বৃত্তি বিকৃত হইলে, তাবদ্বৃত্তিই তৎসংক্রামকতায় অল্পাধিক বিকৃত হয়; পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তির অকল্যাণ হইলে, তাবৎ পরিবারের সাধারণ অকল্যাণ হয়; কোন এক পরিবারের অকল্যাণ হইলে, সমগ্র সমাজ অভ্যুদয়-বিচ্যুত হয় এবং সমাজ-বিশেষের অমঙ্গল সমগ্র মানব-সমাজকে অমঙ্গলভাগী করে; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, মানব-জীবন বিশ্বজীবনেরই একাংশ মাত্র এবং বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সকলের মঙ্গলের সহিত মানবজাতির মঙ্গল অতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ; তিনি উপলব্ধি করিতে লাগিলেন যে, কি সজীব, কি নির্জীব, তাবদ্বিশ্বই মানবজীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের যতই পরিপাক হইতে লাগিল, ততই তিনি ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত এক সূত্রে গ্রথিত দেখিতে লাগিলেন; ততই তিনি সর্ব্বত্র একত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! যদ্রূপ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমা-রজনীতে

ক্ষণ-প্রভা ক্ষণকালমাত্র অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পরক্ষণেই অসীম আকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ব-বিরোধিনী মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের চিত্তে অদ্বৈত-বিবেক ক্ষণকালের জন্ত উদিত হইয়া, তাহার মোহ বিনাশ করিয়া, পরক্ষণেই হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়! কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারের সহিত আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু মানবের হৃদয় হইতে "আমার" "আমার" ভাব একেবারে যায় না। মানুষ যতই কর্ত্তব্যপরায়ণ হউক, মানুষ যতই দ্বৈতকে নিম্ন প্রদেশে রাখিয়া, তদুপরে অদ্বৈতকে স্থাপিত করার চেষ্টা করুক, অদ্বৈত ভেদ করিয়া দ্বৈত স্বীয় মস্তকোত্তলন করে! আমিত্বের প্রসারের মধ্যে আমিত্বের সঙ্কোচ আসিয়া দেখা দেয়; স্বার্থশূন্যতা "আমির" নিকট পরাজিত হয়। "আমি" যে অমঙ্গলের মূল, তাহা বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু "আমি"কে এড়াইতে পারিতেছি না। যাহা করিতে চাই, যাহা ভাবিতে যাই, যাহা বলিতে যাই, তাহারই মধ্যে "আমি" আসিয়া যুটে! সোনা যে মাটী, মাটী যে সোনা, তাহা বুঝিতে পারি, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাহা বুঝিয়া কাজ করিতে পারি কৈ? আমার পুত্রে তোমার পুত্রে যে ভেদ নাই, তাহা বুঝিতে পারি বটে, কিন্তু তাহা বুঝিয়া এই সংসারে থাকিয়া কায করিতে পারি কৈ? এক পক্ষে সংসার যেরূপ অদ্বৈতের উপলব্ধি করায়, অপর পক্ষে সংসার সেইরূপ উহার প্রতিবন্ধকতাও জন্মায়। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া "আমি কে" যেরূপ জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট দেখি, তদ্রূপ একেবারে ঐ "আমিকে" পরিত্যাগ করিতে পারি না। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিতে গেলেই "আমার দেহ" "আমার গৃহ" "আমার পুত্র" "আমার প্রজা" "আমার ধর্ম্ম" "আমার কর্ম্ম" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই "আমার" "আমার" আসিয়া পড়ে। "আমি"কে সর্ব্বত্র প্রসারিত করা চাই; কিন্তু উহা যতই প্রসারিত কর, "আমাতে" "আমি" রাখিয়া দিলে, সে আবার সকলই "আমার" "আমার" করিয়া ফেলে! এই "আমার" টুকু নষ্ট করিবার জন্যই বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-আশ্রমের প্রয়োজন। গৃহস্থাশ্রমে "আমার গৃহও আমার গৃহ এবং সকলের গৃহও আমার গৃহ," এই সাধনায় কিন্তু, "আমার গৃহ" "আমার গৃহ" বোধ রূপ দ্বৈত ভাব টুকু থাকাতে, অনেক সময় "সকলের গৃহ আমার গৃহ" এই অদ্বৈত ভাব টুকুর সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রকৃষ্ট গৃহস্থ-জীবন এই দ্বৈতাদ্বৈত-ভাব-বিমিশ্রিত; কিন্তু অনেক সময়ে দ্বৈতভাব অদ্বৈত ভাবকে স্ফূরিত হইতে দেয় না। এই জন্য, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানের পারিপাক সাধিত হইয়া যখন অদ্বৈত ভাব ক্ষণপ্রভার ন্যায় হৃদয়াভ্যন্তরে মধ্যে মধ্যে সমুদিত হইতে লাগিল, তখনই ঐ ভাবকে কিসে স্থায়ী করা যায়, গৃহস্থ তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, 'আমার গৃহ' এই দ্বৈত ভাব "সকলের গৃহ আমার গৃহ," এই অদ্বৈত ভাবের বিরোধী; অতএব, "আমার আর গৃহ থাকিবে না। গৃহ সংক্রান্ত "আমার" বলিতে আমার স্বতন্ত্র আর কিছুই থাকিবে না—সকলের গৃহাদিই আমার গৃহাদি হইবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-মন আমার শিথিল হইতে চলিল, আমার কেশ পলিত, দন্ত-স্খলিত ও চর্ম্ম লোল হইল, কিন্তু বিশ্বকে

আমার করিতে পারিলাম কৈ? এই সংসারই আমাকে আমিত্বের প্রসারাভিমুখে অনেক দূর আনিয়াছে; ইহা দ্বারা যতদূর হইতে পারে, তাহা হইল; ইহার শক্তি শেষ হইয়াছে। ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে অদ্বৈত-বিবেক আমার হৃদয়ে কখন কখন উদিত হয়, এই সংসারে আরও থাকিলে, বুঝি তাহাও আর উদিত হইবে না। অতএব আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-প্রবেশ করিব। "আমার" বলিতে আমার আর কিছুই রাখিব না, অথবা সমগ্র বিশ্বই আমার করিব। দিব্যচক্ষুঃসম্পন্ন পরমর্ষিগণ এই সমুদয় জানিতে পারিয়াই আমার এই বয়সে অরণ্যাশ্রয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। (১)

বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিলেই বনী জগতে 'আমার' বলিতে কিছুই রাখিবেন না। বিষয়-সম্পত্তি সমুদই পরিত্যাগ করিবেন; স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সকলের সহিতই পার্থিব সম্বন্ধ পরিবর্জ্জন করিবেন; তবে স্বীয় ভার্য্যা যদি বানপ্রস্থ-আশ্রমের উপযোগিনী-সন্ন্যাস-সহধর্ম্মিণী হন, তবে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইতে পারেন। তিনি জনপদের বিলাস বিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিভৃত নির্জনে বাস করিবেন; সর্ব্বদা বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তায় নিরত থাকিবেন; সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন, উপনিষদাদি আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাঠে নিরত থাকিবেন এবং পর-ব্রহ্মের পরম চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

স্বাধ্যায়েনিত্যযুক্তঃ স্যাদ্
দান্তোমৈত্রঃ-সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা
সর্ব্বভূতানু-কম্পকঃ॥
এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত
দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদী-
রাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ।

মনুঃ।

তিনি সর্ব্বদা বেদাভ্যাসে নিযুক্ত থাকিবেন; শীতাতপাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, সকলের উপকারক, সংযতমনা, দাতা, অপ্রতিগ্রাহী এবং সর্ব্বভূতে কৃপালু হইবেন।

এইরূপ এবং অন্যরূপ আচরণ করিবেন এবং বনবাসী বিপ্র পরব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিবিধ ঔপনিষদী শ্রুতি পাঠ করিবেন।

সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা-বিমুক্ত হইয়া, বনী জ্ঞানালোচনায় নিরত থাকিতেন এবং মানবসমাজের নানাবিধ মঙ্গলকর কার্য্যে স্বীয় কর্ম্ম-বিশোধিত পরিপক্ব জ্ঞান নিয়োজিত করিতেন। কার্য্যক্ষেত্রে থাকিলে, কার্য্যক্ষেত্রোচিত উত্তেজনা অনেক সময়ে প্রকৃষ্ট বিবেক-বিকাশের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎদূর হইতে সেই সমুদয় কার্য্যকলাপ চিন্তা করিলে, অনেকসময় আমরা সদ্-দ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াও কত অমঙ্গল জনক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। সুতরাং স্থূলতঃ দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, কর্ম্মান্ধ গৃহস্থকে বিপথ হইতে রক্ষা করার জন্য কর্ম্ম-পরীক্ষিত বনীর অরঞ্জিত ও বিশুদ্ধ

(১) গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈবচাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ।

মনুঃ।

গৃহস্থ যখন ত্বকের শৈথিল্য এবং কেশের পক্বতা ও পুত্রের পুত্র দর্শন করিবেন, তখন অরণ্য আশ্রয় করিবেন।

জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জন্যই আর্য্যঋষিগণ জগতের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বানপ্রস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

জীবনের তৃতীয়াংশে, এইরূপে দেহ মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত রাখিয়া, সর্ব্বভূতে হিংসা-বিবর্জ্জিত হইয়া, জ্ঞানালোচনা এবং জ্ঞান-বিতরণ দ্বারা জগতের মঙ্গল সংসাধন করিয়া, বনী লোকালয়ের নিকট—অথচ কোন নির্দ্দিষ্ট নিভৃত স্থানে জীবন যাপন পূর্ব্বক জীবনের চতুর্থাংশে সন্ন্যাস বা ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিবেন। একস্থানে বাস-স্থান জন্য যে একটু মমতা থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি এই চতুর্থ আশ্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস করিবেন না এবং জগতের চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পর-ব্রহ্মের চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন।

এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধ্যর্থমসহায়বান্।
সিদ্ধিমেকস্য সংপশ্যন্নজহাতি ন হীয়তে॥
মনুঃ, ৬।৪২

মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিনি একাকী সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিবেন। যিনি ত্যাগ করিবার ও ত্যক্ত হইবার জন্য দুঃখানুভব না করেন, তিনিই মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্‌গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽশংকুসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ॥
মনুঃ, ৬।৪৩

অগ্নি এবং গৃহবিবর্জ্জিত হইয়া তিনি আহারের জন্য গ্রামে যাইতে পারেন; তিনি সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইবেন, স্থিরমতি থাকিবেন এবং ব্রহ্মে চিত্ত সমাহিত করিয়া মুনিভাব অবলম্বন করিবেন।

এককালং চরেদ্ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষে প্রসক্তোহি যতির্বিষয়েষপি সজ্জতি॥
মনুঃ, ৬।৫৫

তিনি দিনের মধ্যে একবার মাত্র ভিক্ষা করিবেন; অধিক ভিক্ষা প্রাপ্তির জন্য ব্যগ্র হইবেন না। যিনি অতি ভিক্ষাতে আসক্ত, তিনি বিষয়েও আসক্ত হইবেন।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥
মনুঃ, ৬।৪৫

তিনি মরণেরও কামনা করিবেন না, জীবনেরও কামনা করিবেন না। ভৃত্য যেমন নির্দ্দিষ্ট বেতনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তিনিও তদ্রূপ তাঁহার কালের প্রতীক্ষা করিবেন।

দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতাং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ॥
মনুঃ, ৬।৪৬

ভিক্ষু জীবহিংসা পরিত্যাগ জন্য দৃষ্টি পূর্ব্বক পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জলপান করিবেন, সত্যপূত বাক্য বলিবেন এবং মন বিশুদ্ধ রাখিয়া সমস্ত আচরণ করিবেন।

অতি বাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কংচন।
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।
মনুঃ, ৬।৪৭

কেহ রূঢ় ভাষা বলিলে, তাহা তিনি সহ্য করিবেন; কাহারও অপমান করিবেন না। এই নশ্বর দেহের জন্য তিনি কাহারও বৈরী হইবেন না।

ক্রুদ্ধন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেদাক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ।
সপ্তদ্বারাবকীর্ণাং চ ন বাচমনৃতং বদেৎ॥ ৬।৪৮

তাঁহার উপর কেহ ক্রুদ্ধ হইলেও তিনি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন না;

কেহ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেও তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সপ্তদ্বার-বিকীর্ণ বাক্য বৃথায় বলিবেন না। চক্ষু-রাদি পঞ্চ বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি, এই দুই অন্তঃকরণেন্দ্রিয়, এই সপ্ত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুবিষয়ক কোন বাক্য বলিবেন না; কেবল ব্রহ্ম বিষয়ক বাক্য বলিবেন।

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ।
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ॥

মনুঃ, ৬।৪৯॥

আত্মানন্দ হইয়া এবং যোগাসন গ্রহণ করিয়া, অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ এবং বিষয়-বিলাস-বিরহিত হইয়া, আত্মাকে একমাত্র সহায় করিয়া, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য তিনি এই সংসারে বাস করিবেন।

অনেন বিধিনা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা সংগান্ শনৈঃ শনৈঃ।
সর্ব্বদ্বন্দ্ববিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে॥

মনুঃ।৬।৮১

যিনি এই প্রকারে শনৈঃ শনৈঃ সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থসমূহের অনুভূতি-বিমুক্ত—অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিতে সুখ-দুঃখাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপে হিন্দু নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ত্যাগ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সংকল্প-বর্জ্জিত হইয়া, পরব্রহ্মে লীন হইবেন। হে মানব! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার চাও, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সংযম-সাধন-তপস্যা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মন পরিশুদ্ধ করিয়া, গৃহস্থাশ্রমে নানাবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপা-দনানন্তর বানপ্রস্থাশ্রমে স্বীয় জ্ঞানের পরিপক্কতাসাধন করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ কর; তাহাহইলে তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিয়া, আমিত্বের প্রসার সংসাধন পূর্ব্বক পরব্রহ্মে লীন হইয়া চিরা-দ্বৈতানন্দ সম্ভোগ করিতে পারিবে।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

হিন্দু ও আর্য্য।

——•:০:•——

হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে "হিন্দু" শব্দ স্থানে "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। "হিন্দু" শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগের আপত্তি এই যে—"হিন্দু" শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না; প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কখনও "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই; "হিন্দু" শব্দ সংস্কৃত শব্দ নহে; ভাষান্তরে "হিন্দু" শব্দ কদর্থ-ব্যঞ্জক, ইত্যাদি। এ কথা সত্য যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে "হিন্দু" শব্দ কোথাও দেখা যায় না এবং প্রাচীন আর্য্যেরা আপনাদিগকে কুত্রাপি "হিন্দু" নামে অভিহিত করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে এবং তাঁহা-দিগের দেশকে "আর্য্যাবর্ত্ত" নামে অভিহিত করিতেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা এক্ষণে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, হিন্দুদিগের ও পারসীক দিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একই বংশ সম্ভূত; পারসীকেরাও আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে অভিহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের দেশের নাম "ইরাণ" বা "আর্য্যস্থান" ছিল। প্রাচীন পারস্ত ভাষায় "হপ্ত হেন্দু" কথা

পাওয়া যায়। এই "হপ্ত হেন্দু" বেদোক্ত "সপ্তসিন্ধু" ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। প্রাচীন পারসীকেরা "দন্ত্য স" উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এই জন্য তাঁহারা "সোম" স্থলে "হোম" "সিন্ধু" স্থলে "হেন্দু", বা হিন্দু, সপ্ত স্থানে "হপ্ত", "স্বর্" (স্বর্গ) স্থলে "হ্বর্" "স্ব" (নিজ) স্থলে "হ্ব" এবং "সা" (তিনি) স্থলে "হা" বলিতেন এবং এই কারণ বশতই তাঁহারা "সপ্ত সিন্ধু" স্থলে "হপ্ত হিন্দু" শব্দ ব্যবহার করিতেন। আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া প্রথমে সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী স্থানে বাস করেন; তৎপরে ক্রমে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন। আমাদিগের ভাষার দিক্‌সমূহের যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, সেই নামগুলি পর্য্যালোচনা করিলেই, আর্য্যরা যে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে। "পশ্চিম" শব্দের অর্থ "পশ্চাৎ," "পূর্ব্ব" শব্দের অর্থ "সম্মুখ" এবং "দক্ষিণ" শব্দের অর্থ "ডাহিন"; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে লাগিলে, তাহার "ডাহিন" ভাগে যে দিক্ থাকে, তাহাই দক্ষিণ। এই সমুদয় দিক্ ব্যতীত যে দিক্ থাকিল, তাহা "ইতর" দিক্ এবং ভারতবর্ষে এই "ইতর" দিকে অবস্থিত ভূমি অন্যান্য দিকের ভূমি অপেক্ষা "উচ্চ" বা "উর্দ্ধতর" হওয়ায়, ঐ দিক্ "উত্তর" নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে আর্য্যদিগের মধ্যে সাতটী নদী বিখ্যাত হইয়া উঠে। ঐ সাতটী নদী যে কোন্ কোন্ নদী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৭৫ সূক্তে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু বা সুষমা, পরুষ্ণি বা ইরাবতী, (রাবি), আর্জীকীয়া বা বিপাশা, বিতস্তা, মরুদ্বৃধা, শতদ্রু ও অসিক্নী, এই দশটী নদীর নাম পাওয়া যায়; সপ্তসিন্ধু ঐ দশটী নদীর মধ্যে কোন সাতটী হইবে। সপ্তসংখ্যা ঠিক রাখিয়া আমরা আজিও জলশুদ্ধি-মন্ত্রে সপ্ত নদীর নাম উল্লেখ করিয়া থাকি; ঐ মন্ত্রে উল্লিখিত নদী-গুলির মধ্যে "নর্ম্মদা," "গোদাবরী" এবং "কাবেরী"র নাম ঋগ্বেদোক্ত দশটী নদীর নামের মধ্যে পাওয়া যায় না; কেবল গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও সিন্ধুর নাম পাওয়া যায়। অতএব বোধ হয়, আর্য্যেরা দাক্ষি-ণাত্যে উপনিবিষ্ট হইলে পর, ঐ তিনটী নদীর নাম উক্ত মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। যাহা-হউক, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশার্থ "সপ্তসিন্ধু" শব্দই অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং "ভেন্দিদাদ" নামক প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে ভারত-বর্ষীয় আর্য্যদিগের বাসস্থান "হপ্তহেন্দু" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পারসীকগণের "হেন্দ্" ইংরেজাদি পাশ্চাত্য জাতি সমূহের "ইণ্ডিয়া" হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এখন আমাদিগকে "ইণ্ডিয়ান" নামেই অভিহিত করেন। অনেক সময়ে, বিদে-শীয়েরা আমাদিগকে "নেটীভ্" বলিলে, আমরা তাহাতে অবমানিত বোধ করি, এবং "ইণ্ডিয়ান্" নামে অভিহিত হইবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করি।

"হপ্ত হিন্দু"র "হপ্ত" পরিত্যাগ করিলে "হিন্দু" থাকে এবং প্রাচীন পারসীকেরা আমা-দিগকে "হিন্দু" বলিয়াই অভিহিত করিতেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে, অন্যান্য বিদেশীয় জাতিরাও আমাদিগকে "হেন্দু" বা 'হিন্দু' নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমরাও আমাদিগকে "হিন্দু"

নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছি। পারসীক ভাষায় "হিন্দু" শব্দের কোন দোষাবহ কদর্থ নাই। তবে যদি একটী জাতির বর্ণনা করিবার সময়ে, সেই জাতির কতকগুলি দোষের উল্লেখ করা হয়, তাহাতে সেই জাতির নামের কোন কদর্থ প্রকাশ পায় না। মেকলে সাহেব বাঙ্গালীজাতির নানাবিধ নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে "বাঙ্গালী" নাম দূষিত হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মের আবির্ভাবের পরে, পারস্যভাষায় কোন গ্রন্থে, যদি হিন্দুদিগের প্রতি কটূক্তি বা নিন্দাবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদ্বারা "হিন্দু" শব্দ দূষিত হইতে পারেনা। ইংলণ্ডের রক্ষণশীল "কন্‌সারভেটিভ্‌" এবং উন্নতিশীল "লিবারেল," এই দুই সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে যথাক্রমে "টোরী" ও "হুইগ্‌" ছিল এবং এখনও ঐ দুই শব্দে তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হয়। "টোরী" ও "হুইগ্‌" এই দুই শব্দই প্রথমে কদর্থব্যঞ্জক ছিল; কিন্তু এই দুই শব্দ স্ব স্ব ধাত্বর্থ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ইংলণ্ডের দুই প্রধান রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সূচনা করে। সুতরাং আদিতে শব্দ কদর্থ-সূচক হইলেও পরে সদর্থ-সূচক হইতে পারে। যে "আর্য্য" শব্দদ্বারা এক্ষণে আমরা সম্মানিত মনে করি, এই "আর্য্য" শব্দের ধাত্বর্থ "কৃষিব্যবসায়ী" বা "কৃষক"; কিন্তু কালে এই আর্য্য শব্দ "মাননীয়," "পূজ্য", "সদ্বংশজাত" ইত্যাদি বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং শব্দের প্রাচীন অর্থ যাহাই হউকনা কেন, তাহার বর্ত্তমান অর্থ মন্দ না হইলেই হইল। বিশেষতঃ ভাষায় শব্দের ব্যবহার ভাবার্থেরই অনুযায়ী—ব্যুৎপত্ত্যর্থের নহে।

"হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ যাহাই হউকনা কেন, বর্ত্তমান সময়ে উহা "আর্য্য" শব্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এবং উহাতে কোন প্রকার কদর্থ নাই। "হিন্দু" শব্দ এক্ষণে যত অধিক প্রচলিত, "আর্য্য" শব্দ তত নহে। বর্ত্তমান সময়ে, ২৫।৩০ কোটী হিন্দুর মধ্যে সকলেই "হিন্দু" শব্দ জানে এবং "হিন্দু" নামে আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করে। কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র "আর্য্য" শব্দ ব্যবহার করেন। "হিন্দু" শব্দের ধাত্বর্থ দোষমূলক, তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিলেও, আমরা কি এক্ষণে ঐ "হিন্দু" শব্দ ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারি? কি উত্তর ভারতবর্ষ, কি দক্ষিণ ভারতবর্ষ, উভয়ত্রই "হিন্দু" শব্দ প্রচলিত এবং ভারতবর্ষের তাবত্‌ ভাষাতেই "হিন্দু" শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বিচার-আদালতে, দলিলাদিতে, জাতি-পরিচয় ও ধর্ম্মপরিচয়-প্রদান-স্থলে, সর্ব্বত্রই আমরা "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছি। অতএব এক্ষণে "হিন্দু" শব্দ পরিত্যাগ করিবার আর উপায় নাই—প্রয়োজনও নাই। উহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে।

"আর্য্য" শব্দে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব না থাকিলেও, ৺দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম "আর্য্যসমাজ" রাখায়, উহার এক সাম্প্রদায়িক ভাব উপস্থিত হইয়াছে; কারণ স্বামীজী-প্রতিষ্ঠিত উক্ত "আর্য্যসমাজ" হিন্দুশাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল বেদই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং বেদের সহিত অবিরোধী হইলেও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের অধিকার স্বীকার করেন না। "তোমার কোন্‌ ধর্ম্ম?" জিজ্ঞাসিত হইলে, যদি কেহ "আর্য্যধর্ম্ম" উল্লেখ করেন, তাহাহইলে এখন তিনি দয়ানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত, "আর্য্য" শব্দ দ্বারা এক্ষণে ভারতবর্ষের দেশীয়

আর্য্যকেও, অর্থাৎ ইংরাজ-ফরাসী-জর্ম্মণ প্রভৃতিও বুঝায়; কিন্তু ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম এবং ঐ সকল বিদেশীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং "হিন্দু" শব্দ উঠাইয়া "আর্য্য" শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

উপসংহারে বক্তব্য, যাঁহারা "হিন্দু" শব্দের উৎকৃষ্ট ধাত্বর্থ দেখিতে বাসনা করেন, তাঁহারা "মেরুতন্ত্রে" উহা দেখিতে পারেন। তাহাতে "হীনঞ্চ দূষয়েত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে," "হিন্দু" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে। "হীনং দূষয়তীতি হিন্দুঃ;—দুষ্—ডুঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।" সুতরাং যাঁহারা বস্তুর উপাসনা না করিয়া কেবল শব্দের উপাসনা করেন, "হিন্দু" শব্দের ব্যবহারে তাঁহাদিগেরও ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে 'হিন্দু' শব্দের দ্বারা যাহা কিছু বুঝি, 'আর্য্য' শব্দের দ্বারা তাহা বুঝিনা। হিন্দু, বলিতে কেবল যে, 'আর্য্য' তাহা নহে, উহার সহিত আরও কিছু বুঝি। অতএব পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইল, তজ্জন্য আমরা "হিন্দু-পত্রিকা" নামের পরিবর্ত্তে "আর্য্য-পত্রিকা" নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন দেখি না।

ঋগ্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

—o::o—

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্পতিং সপ্তপুত্রং। ১।

পদপাঠঃ—অস্য। বামস্য। পলিতস্য। হোতুঃ। তস্য। ভ্রাতা। মধ্যমঃ। অস্তি। অশ্নঃ। তৃতীয়ঃ। ভ্রাতা। ঘৃতপৃষ্ঠঃ। অস্য। অত্র। অপশ্যম্। বিশ্পতিম্। সপ্তপুত্রম্।

ব্যাখ্যা—অস্য—ইহার। বামস্য—ভজনীয়স্য, ভজনীয়ের। পলিতস্য—পালয়িতুঃ। হোতুঃ আহ্বানার্হস্য। তস্য—তাহার। ভ্রাতা ভর্ত্তব্যো ভবতি ইতি ভ্রাতা; যাহাকে ভরণ করা যায়, তিনি ভ্রাতা। মধ্যমো—মধ্যে ভব বায়ু, পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যস্থানীয় বায়ু। অস্তি—হন। অশ্নঃ—সর্ব্বব্যাপী। তৃতীয়ঃ ভ্রাতা। ঘৃতপৃষ্ঠঃ—ঘৃত—অর্থাৎ আহুতি যাহার পৃষ্ঠ—অর্থাৎ যিনি আহুতি ধার করেন। অস্য—ইহার। অত্র—এষু ভ্রাতৃষু মধ্যে—এই তিন ভ্রাতার মধ্যে। অপশ্যং—দেখিলাম। বিশ্পতিং—বিশাং—প্রজানাং পালয়িতারং—প্রজাপালককে। সপ্তপুত্রং—সপ্তরশ্মি পুত্রোপেতং, সপ্তরশ্মিরূপ পুত্রযুক্ত আদিত্যকে।

বঙ্গার্থ—ভজনীয়, প্রতিপালক এবং আহ্বানযোগ্য আদিত্যের মধ্যম ভ্রাতা বায়ু সর্ব্বব্যাপী; তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা অগ্নি আহুতি ধারণ করেন। এই ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তরশ্মিস্বরূপ সপ্তপুত্রবিশিষ্ট প্রজাপ্রতিপালক আদিত্যকে দেখিলাম।

বিশেষ ব্যাখ্যা। নিরুক্ত মতে দেবতা তিনটি—অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানঃ, বায়ুর্ব্বেন্দ্রবান্তরীক্ষস্থানঃ, সূর্য্যোদ্যুস্থানঃ। অর্থাৎ অগ্নি পৃথিবীস্থানীয় দেবতা, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরীক্ষস্থানীয় দেবতা এবং সূর্য্য দ্যুস্থানীয় দেবতা। বৈদিক সমুদায় দেবতাই এই তিন দেবতার অংশবিশেষ মাত্র। এস্থলে অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরস্পরের ভ্রাতাস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। ভ্রাতারা যেরূপ—পৈতৃক সম্পত্তি আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ

করিয়া লয়, তদ্রূপ ইহারাও যেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভাব রহিয়াছে। জগৎ ব্রহ্মময়, এস্থলে আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মের চিন্তা করা হইতেছে। অপশ্যং—দেখিলাম—ভাবনায়াত্মতেন সাক্ষাৎ করোমি—অর্থাৎ ভাবনা দ্বারা তাঁহাকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎ করিলাম। শ্রুতিবলেন—"তদ্যোত্রং সোহসৌ যোহসৌ সোহহম্—অর্থাৎ আমি যাহা—তিনি তাহা, তিনি যাহা—আমি তাহা। ইহা ব্যতীত ইহাতে আরও সূক্ষ্ম ভাব আছে, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইতেছে। স্থূলতঃ দেখিলে, বৈদিক মন্ত্রে জড়জগতের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু সূক্ষ্মতঃ দেখিলে, উহা সমুদয়ই পরমেশ্বরের বর্ণনা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—অস্য বামস্য বিশ্বস্য উদ্ভবিতুঃ—স্রষ্টুরিতার্থঃ। এই বিশ্ব স্রষ্টার। পলিতস্য—স্বসৃষ্টজগৎপালনশীলস্য—স্বসৃষ্ট জগতের পালকের। হোতুর্বাদাতুঃ সম্মিন্‌সংহর্ত্তুরিত্যর্থঃ; সংহর্ত্তার—অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিসংহার-কর্ত্তা ঈশ্বরের। এতাদৃশ ঈশ্বরের ভ্রাতা—অর্থাৎ তদংশ বায়ু—ইনি মধ্যস্থানে স্থিত এবং সর্ব্বব্যাপী—অর্থাৎ বিরাট পুরুষের সূক্ষ্ম অংশ স্বরূপ। ইহার তৃতীয় ভ্রাতা বা অংশ—ঘৃতপৃষ্ঠ। ঘৃত শব্দে প্রদীপ্ত বা প্রকাশিত, পৃষ্ঠ শব্দে শরীর—অর্থাৎ ইহার তৃতীয় অংশ স্থূলশরীরধারী। এতাবতা বিরাট পুরুষের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের কথা বলা হইতেছে। মায়া-বিবর্জ্জিত হইলে পরমেশ্বর এক, কিন্তু মায়ার সহিত সংযুক্ত হইলে; পরমেশ্বর হইতে স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানী জগৎ সৃষ্ট হয়; কিন্তু এই উভয়ের চিন্তাতেও মোক্ষ হয়না; এই জন্য সৃষ্টির আদি কারণ পরমেশ্বরকে শ্রবণ-মনননিদিধ্যাসনাদি সাধন দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা আবশ্যক। এই জন্যই বলা হইতেছে—বিশ্‌পতিম্ সপ্তপুত্রমপশ্যম্। বিশ্‌পতিং—অর্থাৎ প্রজানাং পতিং—সর্ব্বস্য পতিমিত্যর্থঃ। সপ্তপুত্রং—সপ্তলোক যাহার পুত্রস্বরূপ এবং যিনি সকলের পতি, তাঁহাকে দেখিলাম—অর্থাৎ—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সাক্ষাৎকার করিলাম।

(২)

সপ্ত যুঞ্জন্তি-রথমেকোচক্র-
মেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বং
যত্রেমা বিশ্বাভুবনাধিতস্থুঃ ॥

পদপাঠঃ— সপ্ত। যুঞ্জন্তি। রথম্। একচক্রম্। একঃ। অশ্বঃ। বহতি। সপ্তনামা। ত্রিনাভি। চক্রম্। অজরম্। অনর্বম্। যত্র। ইমা। বিশ্বা। ভুবনা। অধি। তস্থুঃ।

ব্যাখ্যা— সপ্তযুঞ্জন্তিরথমেকোচক্রম্—একচক্র রথকে সপ্ত অশ্ব বহন করিতেছে। একো অশ্বো বহতি সপ্তনামা—যদিচ অশ্ব এক, তথাপি উহার সপ্তনাম, উহারাই বহন করিতেছে। ত্রিনাভি চক্রম্— ঐ চক্রের নাভি তিনটি। অজরম্—অনর্বম্, উহা কখনও জীর্ণ হয় না এবং কখনও শিথিল হয় না। যত্রেমা বিশ্বা ভুবনা—যাহাতে এই সমস্ত ভুবন। অধিতস্থুঃ—আশ্রয় করিয়া আছে। রথং বহনমাদিত্যম্ রথ শব্দে আদিত্য। এক চক্রম্—এক এব হ্যসাবন্তরীক্ষে চরতি, স্বীয় তেজ দ্বারা অন্যান্য জ্যোতিষ্কের প্রকাশ নষ্ট করিয়া উনি একাকীই

অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন। একোঽশ্বঃ এক এবাশ্বঃ অশনো ব্যাপনঃ সর্ব্বভূতানাম্। সপ্তনামা—সপ্তরশ্মি বা সপ্ত সংখ্যক স্তুতি "সপ্তৈনমৃষয়ঃ স্তুবন্তি" ত্রিনাভিচক্রম্ কালচক্রম্ (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বা গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত।)

বঙ্গার্থ— অন্তরীক্ষচারী আদিত্যকে সপ্তরশ্মি রূপ সপ্তঅশ্ব বহন করিতেছে। ঐ রশ্মি এক হইলেও উহাদের সপ্তনাম। কালচক্রের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, বা গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত, এই তিনটি নাভি। বিশ্বভুবন এই কালচক্র আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

(৩)

ইমংরথমধিযেসপ্ততস্থুঃ
সপ্ত চক্রং সপ্তবহন্ত্যশ্বাঃ।
সপ্ত স্বসারো অভিসংনবন্তে
যত্র গবাং নিহিতা সপ্তনাম॥

পদপাঠ:— ইমম্। রথম্। অধি। যে। সপ্ত। তস্থুঃ। সপ্ত চক্রম্। সপ্ত। বহন্তি। অশ্বাঃ। সপ্ত। স্বসার। অভি। সম্। নবন্তে। যত্র। গবাম্। নিহিতা। সপ্ত। নাম।

ব্যাখ্যা—ইমং—উক্ত আদিত্যকে। রথং—মণ্ডলাখ্য বা সংবৎসরাখ্য রথে। যে সপ্ত অধিতস্থু:—যে সপ্ত রশ্মি বা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিবস, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, এই সপ্তাবয়ব অধিষ্ঠান করে, সপ্ত চক্রং—রথ কি রূপ? সপ্তচক্র। তে সপ্ত বহন্তি অশ্বাঃ—সপ্ত অশ্ব বহন করে; সপ্ত স্বসার অভিসংনবন্তি—সপ্ত ভগিনী এই রথাভিমুখে আগমন করেন—অর্থাৎ সপ্তরশ্মি—বা সপ্ত ঋতু (বারমাসে বৎসর হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে ৩৬০দিনে বৎসর ধরায়, সময়ে সময়ে ১৩মাসেও বৎসর হইত; বার মাসের ছয় ঋতু এবং ত্রয়োদশ মাসাত্মক আর এক ঋতু) যত্র গবাং নিহিতা সপ্ত নাম, যে স্থানে সপ্তস্বরবিশিষ্ট সামগান নিহিত আছে।

বঙ্গার্থ— যে সপ্তঅশ্ব—অর্থাৎ রশ্মি—বা অয়ন, ঋতু-মাসাদি কালের সপ্তাবয়ব, সপ্তচক্ররথে অধিষ্ঠান করে, তাহারাই উহা বহন করে। সপ্তরশ্মি বা সপ্তঋতু সপ্তভগিনীর ন্যায় এই রথাভিমুখে আগমন করে এবং ইহাতে সপ্তস্বর নিহিত আছে।

(৪)

কো দদর্শ প্রথমং জায়মান-
মস্থন্বন্তং যদনস্থাবিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরস্থকাত্মা কস্বিৎ-
কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ॥

পদ পাঠ:— কঃ। দদর্শ। প্রথমম্। জায়মানম্। অস্থন্বন্তম্। যৎ। অনস্থা। বিভর্ত্তি। ভূম্যাঃ। অসুঃ। অসৃক্। আত্মা। ক। স্বিৎ। কঃ। বিদ্বাংসম্। উপ। গাৎ। প্রষ্টুম্। এতৎ।

ব্যাখ্যা— কঃ দদর্শ প্রথমং জায়মানং—প্রথম-জায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অর্থাৎ যখন জগৎ-প্রপঞ্চ ছিলনা এবং ব্রহ্ম মায়াশক্তি দ্বারা যখন প্রথম সৃষ্টি করেন, তখন উহা কে দেখিয়াছিল,—অর্থাৎ কেহ দেখে নাই। অস্থন্বন্তম্—অস্থিমন্তম্-শরীরং উপলক্ষণমেতৎ; অস্থিযুক্ত—অর্থাৎ দেহযুক্ত অবস্থা—অস্থিরহিতা—অর্থাৎ আদ্যাশক্তি

মায়া। বিভর্ত্তি—ধারণ করে। সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়া ব্রহ্মে অব্যক্ত ভাবে থাকে, সৃষ্টির সময়ই মায়া ব্যক্তভাব ধারণ করে। অব্যাকৃতা মায়া যখন শরীর ধারণ করিয়াছিল—অর্থাৎ ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভূম্যাঃ—ভূমি হইতে—অর্থাৎ জড়জগৎ হইতে। অসুঃ—প্রাণ, অসৃক্—শোণিত। আত্মা ক্বস্বিৎ—আত্মা কোথা হইতে? কো বিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ—ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে বিদ্বান বা জ্ঞানবানের নিকট যাইবে?

বঙ্গার্থ—প্রথমজায়মানকে কে দেখিয়াছিল? অব্যাকৃতা মায়া যখন ব্যক্তভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা কে দেখিয়াছিল? ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিত হয়, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে আইসে? বিদ্বানের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিতে কে যাইবে?

বেদান্তদর্শন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শারীরক ভ্যাষ্যারম্ভ।

——•:০:•——

যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়োর্ব্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌতদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতর ভাবানুপপত্তিরিত্যতোঽস্মত্ প্রত্যয় গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসস্তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চাধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তং। ১।

পদ পাঠঃ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয়গোচরয়োঃ। বিষয় বিষয়িণোঃ। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ। ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ। সিদ্ধায়াং। তদ্ধর্ম্মাণাং। অপি। সুতরাং। ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। ইতি। অতঃ। অস্মত্ প্রত্যয়গোচরে। বিষয়িণি। চিদাত্মকে। যুষ্মত্প্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য। তদ্ধর্ম্মাণাং। চ। অধ্যাসঃ। তদ্বিপর্য্যয়েণ। বিষয়িণ। তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ। অধ্যাসো মিথ্যা। ইতি। ভবিতুং। যুক্তং। ১।

প্রত্যেক পদের অর্থ। যুষ্মদস্মত্ প্রত্যয় গোচরয়োঃ—'যুষ্মদ্' অর্থাৎ 'ইদং' জ্ঞানের, 'অস্মদ্' অর্থাৎ—অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়বিষয়িণোঃ—জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা। তমঃ প্রকাশবদ্বিরুদ্ধ স্বভাবয়োঃ—অন্ধকার ও আলোকের সদৃশ বিরুদ্ধাবস্থাপন্ন পদার্থদ্বয়ের। ইতরেতর ভাবানুপপত্তৌ—তাদাত্ম্যাধ্যাসের অযৌক্তিকতা। সিদ্ধায়াং—নিশ্চিত হইলে। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। অপি—ও। সুতরাং—কাযেকাযেই। ইতরেতর ভাবানুপপত্তি :—তাদাত্ম্যাধ্যাস অযৌক্তিক। ইতি—এই। অতঃ—হেতুক। অস্মত্-প্রত্যয়-গোচরে অহংজ্ঞানের বিষয়। বিষয়িণি-জ্ঞাতা। চিদাত্মকে—জ্ঞানস্বরূপে। যুষ্মত্ প্রত্যয় গোচরস্য—ইদংকারাস্পদ। বিষয়স্য—জ্ঞেয়ের। তদ্ধর্ম্মাণাং—তদ্গত—অর্থাৎ জ্ঞেয়-গত ধর্ম্ম সমূহের। চ—ও। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। তদ্বিপর্য্যয়েণ—তাহার বিপরীতরূপে। বিষয়িণ :—জ্ঞাতার। তদ্ধর্ম্মাণাং—জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের। চ—ও। বিষয়ে—জ্ঞেয়পদার্থে। অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। মিথ্যা ভ্রমবশতঃ। ইতি—ইহা। ভবিতুং—হওয়াই। যুক্তং—সঙ্গত। ।১।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

'যুষ্মদ' অর্থাৎ 'ইদং' বা 'এই' জ্ঞানের বিষয় এবং 'অস্মদ্' বা 'আমি' এই জ্ঞানের

বিষয় অন্ধকার ও আলোক সদৃশ বিসদৃশ স্বভাবাপন্ন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপ পদার্থ-দ্বয়ের তাদাত্ম্যারোপের অযৌক্তিকতা প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃ-গত ধর্ম্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপও অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব অহং-কারাস্পদ জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতে ইদং-কারাস্পদ জড়-স্বভাব বিষয়ের ও বিষয়াশ্রিত ধর্ম্ম সমূহের অধ্যাস বা তাদাত্ম্যারোপ এবং ইহার বিপর্য্যয়রূপে—অর্থাৎ জড়স্বভাব-জ্ঞেয় পদার্থে চিত্স্বভাব জ্ঞাতা বা অত্মার এবং জ্ঞাতৃগত ধর্ম্মসমূহের তাদাত্ম্যারোপ মিথ্যা হওয়াই উপযুক্ত। ।১।

তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্ন ন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্য ধর্ম্মাশ্চাধ্যস্যেতরেতরা বিবেকেনাত্যন্তবিবিক্তয়ো ধর্ম্ম ধর্ম্মিনো মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্যাহমিদং মমেদমিতিনৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। শাং ভাং। ২।

পদপাঠঃ। তথা। অপি। অন্যোন্য স্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাং। অন্যোন্যধর্ম্মান্। চ। অধ্যস্য। ইতরেতরাবিবেকেন। অত্যন্ত-বিবিক্তয়োঃ। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ। সত্যানৃতে। মিথুনীকৃত্য। অহং। ইদং। মম। ইদং। ইতি। নৈসর্গিকঃ। অয়ং। লোকব্যবহারঃ। ২।

প্রত্যেক পদের অর্থ। তথা—তাহা হইলে। অপি—ও। অন্যোন্যস্মিন্—পরস্পরে—অর্থাত্ চিৎ ও জড়, এই উভয়েতে। অন্যোন্যাত্মকতাং—পরস্পরের স্বরূপকে—অর্থাৎ চিৎস্বভাব জড়েতে, জড়স্বভাব চিতেতে। অন্যোন্য ধর্ম্মান্—পরস্পরগত ধর্ম্মসমূহকে—অর্থাৎ চিতেতে জড়গত ধর্ম্মসমূহকে এবং জড়েতে চিদ্গত ধর্ম্ম-সমূহকে। চ—এবং। অধ্যস্য—আরোপ করিয়া। ইতরেতরাবিবেকেন—পরস্পরেতে পরস্পরের তাদাত্ম্যজ্ঞান বশতঃ—অর্থাৎ চিত্ হইতে জড়ের ও জড় হইতে চিতের অবিবেক-নিবন্ধন। অত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ—অতিশয় পৃথগ্‌ভূত পদার্থ-দ্বয়ের। ধর্ম্মধর্ম্মিনোঃ—চিদ্গত ও জড়গতধর্ম্মের এবং চিত্ ও জড়, এই ধর্ম্মীর। মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্তঃ—অনাদি অবিদ্যাবশতঃ। সত্যানৃতে—সৎ ও অসতে। মিথুনীকৃত্য—এক করিয়া—অর্থাৎ সৎ ও অসৎ বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া। অহং—আমি, ইদং—এই। মম—আমার। ইদং—এই। ইতি এবম্প্রকারে। নৈসর্গিকঃ—স্বাভাবিক—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ। অয়ং - এই। লোকব্যবহারঃ—জীবসমূহের ব্যবহার। ২।

ভাষ্যের বিশদ বঙ্গানুবাদ।

তথাপি পরস্পরেতে—অর্থাত্ চিৎ ও জড়, এতদুভয়েতে পরস্পরের স্বভাবকে—অর্থাৎ চিতের স্বরূপ জড়েতে ও জড়ের স্বরূপ চিতেতে এবং উভয়গত ধর্ম্মজাতকে পরস্পরে—অর্থাৎ আন্ধ্য, মান্দ্য, অপটুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি জড়ের ধর্ম্ম সমূহকে পরমার্থতঃ নির্লিপ্ত নির্গুণ চিৎস্বভাব আত্মাতে এবং অস্তিত্ব, প্রকাশকত্ব, চৈতন্যবত্ত্ব প্রভৃতি চিতের ধর্ম্মনিকরকে অচেতন জড় বুদ্ধিতে আরোপ করিয়া, আলোক ও অন্ধকার সদৃশ অতিশয় বিবিক্ত চিদ্গত ধর্ম্মজাত ও জড়গত ধর্ম্মসমূহ এবং চিত্স্বরূপ ও জড়স্বভাবের অধ্যাস, নিবন্ধন পরস্পরেতে পরস্পরের অভেদজ্ঞানবশতঃ অর্থাৎ—চিৎ হইতে জড়ের এবং জড় হইতে চিতের অবিবেক নিবন্ধন সত্য ও মিথ্যাকে জড়িত করিয়া—অর্থাৎ জড়-স্বভাব ও চিত্-স্বভাব বস্তুতঃ বিসদৃশ হইলেও তাহাকে অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করিয়া,

মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত—অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ অনির্ব্বাচ্য-স্বভাব জ্ঞানবিরোধি-ঐশীশক্তিমায়া-কল্পা বা অবিদ্যাজনিত 'আমি এই' "আমার এই" এতাদৃশ অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত জাগতিক জীবসমূহের ব্যবহার বিদ্যমান আছে। ২।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, কাব্যতীর্থ, বেদান্তভূষণ, বিদ্যাবিনোদ, সাংখ্যরত্ন।

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

—০::০—

প্রথম অধ্যায়

কর্ত্তব্য-পালন।

অবনীতলে যাবতীয় জীব-জগতের শীর্ষস্থানে মানব-জাতি অবস্থিত। মানবের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে বলিয়াই মানব শ্রেষ্ঠ জীব। বিবেকাদি উচ্চতর-বৃত্তি-সম্পন্ন নর-জাতি সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই পার্থিব জীব-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। কর্ত্তব্য-পালনই নর-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি; কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাই ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য-বিমুখ, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই পাতকী; কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতাই পাপ। এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতা গ্রন্থের অবতারণা; এই কথা প্রসঙ্গেই জগৎ-প্রথিত কুরুক্ষেত্রে নররূপী ভগবান্ আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া, রণ-বিমুখ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে নর-জীবনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও অবশ্য-কর্ত্তব্য নিগূঢ় বিষয় সকল জ্ঞাপন করিয়াছেন। গীতার ন্যায় সুমার্জ্জিত অতি বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নর-জীবনের যে অত্যুচ্চ পবিত্র আদর্শ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র জ্ঞানীগণের সর্ব্বথা অনুকরণীয়। এইরূপ পবিত্র আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ একদা কি ধর্ম্মজ্ঞানে, কি সামাজিক উৎকর্ষ-বিধানে, সকল বিষয়েই আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিয়া সমগ্র সভ্য-জগতের আচার্য্যরূপে বরণীয় হইয়াছিলেন। এইরূপ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য না রাখাতেই ইদানীং ভারতের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা। যদি অস্ফুটরূপেও সেই আদর্শ শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের সমক্ষে আঁকিয়া দিতে পারি, সেই উদ্দেশ্যেই এই সন্দর্ভের অবতারণা করিতেছি; জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য প্রতিপালন করাই নর-জীবনের প্রধান বা একমাত্র ব্রত। এই মহাব্রতে প্রকৃতরূপে ব্রতী হইতে হইলে, যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ আচার, যেরূপ অভ্যাস ও উপাসনাদি আবশ্যক, প্রসঙ্গক্রমে গীতায় সেই সকল বিষয়েরই বিবৃতি করা হইয়াছে। কর্ত্তব্য-সাধনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; কিন্তু যথার্থ কর্ত্তব্যের অবধারণ ব্যতীত বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন কিরূপে সম্ভব হইবে? কর্ত্তব্য-অবধারণে জ্ঞানই প্রধান নেতা। যাহার যেরূপ জ্ঞান, তাহার তদ্রূপ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। আমার বুদ্ধিতে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তোমার বিবেচনায় হয়ত তাহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে তাহাই ঘটিয়াছে। পাণ্ডব-কুলতিলক অর্জ্জুন রণ-সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ সমর-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; সশস্ত্র শত্রুপক্ষ মহাস্ফালনে যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু বীর-পুঙ্গব অর্জ্জুনের

কৃত্রিম-হৃদয়ে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অতি কোমল ভাবের আবির্ভাব হইল! তিনি অরিদলের মধ্যে স্বীয় আচার্য্য, পিতামহ ও ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি স্বজনগণ সন্দর্শনে সহসা মায়ামোহে বিচলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়া উঠিলেন,—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥

"হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই সকল আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন ও মুখ শুষ্ক হইতেছে।" অর্জ্জুনের হৃদয়ে এইরূপে প্রবল স্নেহ-প্রবাহ বহিতে লাগিল; চিত্ত মমতাস্পর্শে আকুল হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন স্বহস্তে আত্মীয়-বধরূপ বিষম নিষ্ঠুর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না; অকিঞ্চিৎকর বিষয়-বিভবের জন্য তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি আক্রমণ করিল; তাই অর্জ্জুন বলিলেন—

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষমপীহ লোকে।
হত্বার্থ কামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধির-প্রদিগ্ধান্॥

"মহানুভব গুরুজনদিগকে বধ না করিয়া, ইহলোকে যদি ভিক্ষা করিয়াও খাইতে হয়, তাহাও শ্রেয়; কিন্তু তাঁহাদিগকে বধ করিলে, ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্য বিষয় সমূহ উপভোগ করিতে হইবে; (অতএব সেরূপ ভোগ-সুখের কোন প্রয়োজন নাই)।" অর্জ্জুন যথার্থ বলিয়াছেন; আপাততঃ অর্জ্জুনের কে নিন্দা করিবে? স্বজনবর্গকে বধ করিয়া রাজ্য-সুখ উপভোগ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও জীবন যাপন করা শ্রেয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? অর্জ্জুন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতেই এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ জ্ঞান, তদনুসারেই তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অর্জ্জুনের এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দোষশূন্য নহে।

অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি কি কি দোষ আশ্রয় করিয়াছে, এস্থলে একবার তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, অর্জ্জুন স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াছেন; এই সকল বৃত্তি অযথা ভাবে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে, সেইজন্য তিনি সূক্ষ্মভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কর্ত্তব্যানুরোধে করিতে হইবে; তাহার ফলাফল বিচার করিয়া অর্থাৎ তাহাতে আপনার সুখ-দুঃখ কত দূ সংসৃষ্ট আছে, তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে যথার্থ কর্ত্তব্য সাধন হয় না। আপনার সুখ-দুঃখ-বিচার দ্বারা যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি চালিত হয়, তাহা দোষাশ্রিত; স্বার্থপরতা যথার্থ কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরম অন্তরায়। অর্জ্জুনের যে স্বার্থপরতা ঘুচিয়াও ঘুচে নাই, তাঁহার আত্মসুখ-দুঃখের প্রতি এখনও লক্ষ্য আছে। তৃতীয়তঃ, এই সকল দোষের মূল যথার্থ জ্ঞানের অভাব; যথার্থ জ্ঞান বলিতে আত্মজ্ঞান বুঝিতে হইবে; আত্মতত্ত্ব—অর্থাৎ আত্মপরিচয় ব্যতিরেকে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না। অপরাপর বিষয়ের যে জ্ঞান, তাহা আত্মতত্ত্ব লাভের সহকারী বলিয়াই মানবের কল্যাণকর; সে সমস্ত জ্ঞান উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র, কিন্তু কদাচ উদ্দেশ্য নহে। অর্জ্জুনের হৃদয়ে অস্ফুটভাবে সেই জ্ঞানের উদয় হইয়াছে মাত্র, তাই তিনি রাজ্যলাভ-জনিত ভোগ-সুখের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া স্বজন-বধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন; কিন্তু

তাঁহার অন্তরে জ্ঞান এখনও পরিস্ফুট-ভাবে বিকাশিত হয় নাই, তাই তিনি স্বজন-বর্গকে কেমন করিয়া বধ করিব, এই আশঙ্কায় অভিভূত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্ত্তব্য অবধারণে জ্ঞানই নেতা। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে কর্ত্তব্য-বোধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার যতদূর জ্ঞান, তাহাতে কর্ত্তব্য-বুদ্ধিরও ততদূর প্রসার; অতএব শক্তি ও অবস্থা ভেদে কর্ত্তব্যের প্রকৃতি-ভেদ অবশ্যম্ভাবী। এই তত্ত্ব-মূলেই হিন্দুসমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের অনুসরণ করিয়াই অধিকারী-ভেদে পূজাবন্দনাদি নিত্য-কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম উপদিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের জন্য একরূপ নিয়ম হইতে পারে না। জগতে যখন কোন দুইটী বস্তু সমধর্ম্মী নহে, বিভিন্নতাই যখন প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, তখন যথার্থ হিতকামনায় কিরূপে সকলকে সমনিয়মাধীন করা যাইতে পারে? সেরূপ চেষ্টা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অতএব যাহার যেরূপ জ্ঞান, সে তদনুসারে আপন কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, তৎসাধনে ব্রতী হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য পালন করা সাধারণ বিধি হইতে পারে; সুতরাং যে এই বিধির অনুসরণ করিয়া না চলে, সে পাপভাক্; সে এই বিধি-লঙ্ঘন জন্য ঐহিক ও পারত্রিক নানাবিধ তাপে তাপিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম; এই নিয়মানুসারে স্ব স্ব জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি সাধ্যানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে যত্নবান্, তিনি ক্রমশঃ উন্নতি-পথে অগ্রসর হইবেন; তাঁহার বিবেক-শক্তি ক্রমশঃ মার্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইবে; তিনি উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হইয়া, ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাবে আপন কর্ত্তব্য বিচারে সক্ষম হইবেন।

ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য। যে ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার ক্ষাত্রধর্ম্মের অপলাপ করিয়া পরপীড়ন, পররাষ্ট্র-অপহরণ প্রভৃতি ন্যায়-বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ নহে, তাহাকে যথাবিধানে শাসন করা এবং শাসনাধীন না হইলে, তাহাকে ন্যায়-যুদ্ধে বিনাশ করা ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন এই কর্ত্তব্যপালনে আজ পরাঙ্মুখ। কেন পরাঙ্মুখ? ভীরুতা প্রযুক্ত প্রাণ-ভয়ে? তাহা নহে; অর্জ্জুনের ন্যায় রণ-বিশারদ সাহসী বীর কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গনে আর কেহই অস্ত্রধারণ করে নাই; সুতরাং তাঁহার সে ভয় কখনই উপস্থিত হইতে পারে না। তিনি রণ-কাতর নহেন; কিন্তু অসার কামাত্মক বিষয়-ভোগের জন্য কেন তিনি স্বহস্তে আত্মীয়-বিনাশ করিবেন; এইরূপ বুদ্ধি অদ্য অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য-পথে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে প্রতি-নিবৃত্ত করিতেছে। অর্জ্জুনের এ বুদ্ধি অনেক পরিমাণে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি বটে; কিন্তু ইহা পূর্ব্বপ্রদর্শিত দোষগুলি হইতে এখনও বিমুক্ত হইতে পারে নাই; তাই অর্জ্জুন কর্ত্তব্যানুরোধেও স্বজনবধে কাতরতা প্রযুক্ত বিরত হইতেছেন। শুদ্ধ কাতরতা প্রযুক্ত নহে, কুলস্ত্রীগণের দুশ্চারিত্র্য প্রভৃতি দোষগুলিও অর্জ্জুন এরূপ যুদ্ধের কুফল বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, অর্জ্জুনের জ্ঞান এখন উচ্চতর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে; অর্জ্জুন এখন যথার্থ আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের অধিকারী; তাই অর্জ্জুনের এই সাত্ত্বিক ভাব বাহ্য

জগতের অবস্থা ও সময় বিচার না করিয়া রণক্ষেত্রেই আবির্ভূত হইয়াছে। অর্জ্জুনের পূর্ব্বভাব অনুধাবন করিয়া দেখ; অর্জ্জুন যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত ও বীরমদে উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন; যে কৌরবগণ অধর্ম্মাচরণে তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত ও নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিয়াছে, একখানি গ্রাম মাত্র যাচ্ঞা করিলেও যাহারা সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিদানেও অস্বীকৃত, যাহারা রমণী-শিরোমণি পতিপ্রাণা দ্রৌপদীকে যৎপরোনাস্তি অপমানিতা ও তিরস্কৃতা করিয়াছে, সেই ক্ষত্রিয়াধম কৌরবগণ সমর-ঙ্গনে বিপক্ষ পক্ষ। পাষণ্ডদিগের সমুচিত শাস্তি-বিধানের জন্য হৃদয় স্বতঃই রোষানলে প্রদীপ্ত, শোণিত বিষম উত্তপ্ত, মনঃপ্রাণ বিষম বিক্ষোভে ব্যাকুলিত ও উত্তেজিত; কখন সেই পাষণ্ডদিগের শোণিত-দর্শন করিয়া বৈরনির্যাতন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন, অন্তরে এই মাত্র চিন্তাবেগ প্রবলরূপে প্রবাহিত। কিন্তু দেখ, সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত সেই মর্ম্মচ্ছেদী শত্রু-কুলকে দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের সেই মানব-প্রকৃতি-সুলভ প্রতিহিংসাবৃত্তি কোথায় তিরোহিত হইল! অর্জ্জুন যেন আর সে বীর-মদ-মত্ত অর্জ্জুনই নহেন! তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক আপনাদিগের প্রতি অশেষ লাঞ্ছনা, মর্ম্মভেদী অবমাননা ও অতি ধর্ম্মবিগর্হিত বঞ্চনার কথা যেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন! পৈত্রিক সাম্রাজ্যের অতুল বিভব আর তাঁর মনে স্থান পাইল না। সংসার ও সাংসারিক ভোগ-সুখ যে অসার, এ সকলই যে মায়াময়, ঈদৃশ উচ্চতর ভাবের ছায়া অর্জ্জুনের হৃদয়-ভূমি অধিকার করিল। অর্জ্জুন এখন সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; স্নেহ মমতা প্রভৃতি মায়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে সম্যক্ বিমুক্ত নহেন, অথচ সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, সচ্চিদানন্দের আভাস তাঁহার হৃদয়-দর্পণে বিম্বিত হইয়াছে; তাই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে 'যুদ্ধ করিয়া ফল কি? স্বজন বধ করা কি মহাপাতক নহে? অসার সাংসারিক সুখেই বা কি প্রয়োজন?' ইত্যাদি নানা সময়োচিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্বীয় সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তদবস্থাপন্ন অর্জ্জুনের সন্দেহ দূর করিবার মানসে তাঁহাকে যেরূপ জ্ঞানোপদেশ দিয়াছেন, তাহারই আভাস বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নিষ্কাম কর্ম্ম।

স্বীয় কর্ত্তব্যের যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে, কর্ত্তাকে কামনাহীন হইতে হইবে, অর্থাৎ স্বার্থের বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শুদ্ধ কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ত্তব্য পালন করিতে ব্রতী হয়েন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সক্ষম; তাঁহার কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্ম। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কার্য্য কিরূপে একেবারে কামনাহীন হইবে? কার্য্য করিলে, কার্য্যের উদ্দেশ্যও থাকে; উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম কখনও সম্ভবপর নহে; অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের সার্থকতা কোথায়? প্রশ্নটী আপাততঃ দুরূহ; সংক্ষেপে ইহার সদুত্তর প্রদান করা যায় না। এখানে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, দৈর্ঘ্য ও বিস্তার বিহীন অবস্থিতি যে অর্থে 'বিন্দু' শব্দবাচ্য, নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থও সেই ভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। একেবারে কামনাহীন কর্ম্ম

স্থূলতঃ হইতে পারেনা সত্য, কিন্তু কামনাকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে,—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতমে লইয়া যাইতে পারা যায়; এইরূপে কামনার ক্রমিক হ্রস্বতাতেই নিষ্কাম কর্ম্মের উদয় এবং পরিপাক। আসক্তি কামনার প্রসূতি; আসক্তির অপচয়ে কামনারও অপচয়। অতএব যতদূর সম্ভব, আসক্তিবিহীন হইয়া, স্বীয় সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আপনার সম্বন্ধে কোনরূপ ফলপ্রত্যাশী না হইয়া, যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই এস্থলে 'নিষ্কাম কর্ম্ম' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

নিষ্কাম না হইলে, বিহিত বিধানে কর্ত্তব্য-পালন হয়না; কারণ যেথানেই স্বার্থের প্ররোচনা, সেইখানেই অবিচার, সেইখানেই ন্যায়দৃষ্টি আপনাহইতে যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা না করিলে, কদাচ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারা যায় না। পরের জন্যই আমাদিগের জীবন (we live for others), এই মহা-বাক্যের মূলে নিষ্কাম কর্ম্ম। যিনি পরার্থে জীবন ধারণ করেন, তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্কাম; তিনিই মহাপুরুষ। এইরূপ মহাপুরুষই অবনীতলে আবির্ভূত হইয়া জগতের প্রকৃত হিতসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়েন। যিনি নিষ্কাম, তিনি স্নেহ-মমতার অযথা বশবর্ত্তী নহেন; এই সকল আকর্ষণ কদাচ তাঁহাকে কর্ত্তব্য-বিমুখ করিতে পারে না। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা-দেবীর মন্দিরে—এমনকি—তিনি স্নেহের প্রকৃষ্ট আধারস্থল স্বীয় পুত্রকেও বলি দিতে কিছুমাত্র কাতর নহেন! রাজ-স্থানের বীর-ধাত্রী পান্না এইরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মের একটী জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। যখন দুরাচার বনবীর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিবার দুরাশায় রাণা সঙ্গের একমাত্র শিশুপুত্র উদয় সিংহের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইল; তখন ধাত্রী পান্না রাজার বংশধরের জীবন রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিদ্রিত রাজকুমারকে একটী করণ্ডকে লুকাইয়া রাখিয়া, স্বীয় তনয়কে রাজকুমারের শয্যায় শায়িত করিলেন! নিশীথ সময়ে তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে উন্মত্ত বনবীর গৃহে প্রবেশ করিল; পান্না নিঃশব্দে অঙ্গুলি দ্বারা রাজ-কুমারের শয্যা দেখাইয়া দিলেন! বনবীর তখনই শাণিত অসি শিশুর হৃদয়ে বিদ্ধ করিল। একটী মাত্র আর্ত্তনাদ করিয়া শিশু চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল; জননী নিঃশব্দে শোক সম্বরণ করিয়া তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন! বীর-ধাত্রী পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া, মিবারের রাজবংশ রক্ষা করিয়া, জগতে পবিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উদাহরণ সকল উন্নত জাতির ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক বা জাতীয় জীবনের উন্নতিমূলে নিষ্কাম কর্ত্তব্যপরায়ণতা আবশ্যক। নিষ্কাম-মহাপুরুষদিগের আবির্ভাবেই সমাজ বা জাতির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয়; প্রাচীন ভারত এবং রোম ও গ্রীস্ দেশের ইতিহাস তাহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছে।

চলচ্চিত্ততা বিষম দোষ। চলচ্চিত্ততা অসুখ ও অশান্তির প্রসূতি, কর্ত্তব্য-সাধন-পথে ভীষণা রাক্ষসী। কামনাই আবার এই চলচ্চিত্ততার জনয়িত্রী। সকল কর্ম্মের ইহাই মহৎ দোষ। যিনি কামনাদ্বারা চালিত, কামনার বিষয়-বাহুল্যে তাঁহার চিত্ত ইতস্ততঃ ধাবিত হয়, কোন এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে না। ঈদৃশ চলচ্চিত্ত ব্যক্তি যথার্থ প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী নহেন; কেন না তাঁহার বুদ্ধি নানা-

বিষয়িণী। কিন্তু যিনি নিষ্কাম, যিনি কেবল কর্ত্তব্যানুরোধেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি স্থিরবুদ্ধি; কেননা কর্ত্তব্যই তাঁহার লক্ষ্য, কাম্য-বিষয়-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ স্থির ব্যক্তিই ব্রহ্মসাধনের উপযুক্ত পাত্র, ইনিই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

"হে কুরুনন্দন!" ব্যবসায়াত্মিকা—অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই হইয়া থাকে, কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের—অর্থাৎ কামীদিগের বুদ্ধি অনন্ত এবং বহুশাখা।" এখন স্থির হইল যে, নিষ্কামকর্ম্ম একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত, অতএব এইরূপ কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার যোগ্য; এবং স্থিরচিত্ততা নিষ্কাম কর্ম্মের একটী শুভময় ফল।

লোকে ভোগ-সুখেরই কামনা করে। কামনা বলিতে সুখেরই কামনা, কাহাকেও কখনও স্বীয় দুঃখের কামনা করিতে দেখা যায় না। কামনা যদি বিফল হয়, অর্থাৎ কাম্য সুখকে আনিয়া দিতে না পারে, তাহাহইলে বিষম দুঃখ ও নৈরাশ্য আসিয়া চিত্তকে অবসন্ন করে। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম কখনই এরূপ দুঃখের স্থল নহে; সাফল্য বা বৈফল্য ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; কারণ যেখানে কামনা নাই, সেখানে ফলাফলের জন্য সুখ বা দুঃখও নাই। অতএব নিষ্কামকর্ম্মই এক মাত্র শান্তিপ্রদ; নিষ্কাম কর্ম্মই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ধর্ম্মাচরণের মূল ভিত্তি। নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করিলে, কি সন্তোষ, কি শান্তি, কি সাধুতা, কি আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতত্ত্ববোধ, কিছুরই অধিকারী হইতে পারা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের হিতসাধন করা এই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করে। অতএব নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অধিকাংশ মনুষ্যই ভ্রান্ত, ইতরেন্দ্রিয়ের বশীভূত; ভোগ-সুখের জন্য লালায়িত। সেই জন্য বেদে সকাম-কর্ম্মের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অজ্ঞান শিশু যেমন আপনার হিতাহিত বুঝিতে না পারিয়া, রোগোপশমের নিমিত্ত ঔষধ সেবন করিতে চায় না, ঔষধের আপাত-বিস্বাদুতা গ্রহণে কদাচ সম্মত হয় না, সেইরূপ জ্ঞান-শিশু নরগণ প্রকৃতি-তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, অকিঞ্চিৎকর ভোগ-সুখের লালসা পরিত্যাগ করিতে—বৈরাগ্যের আপাত-বিরসতা গ্রহণ করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। শিশুকে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য যেমন তাহাকে মিষ্টান্নের প্রলোভন প্রদর্শন করা হয়, অজ্ঞান নরগণকে প্রবৃত্তিমার্গে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বেদেও তদ্রূপ স্বর্গাদি-ভোগ-সুখরূপ কর্ম্ম-ফলের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদিগকে সৎপথে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। ফলে এরূপ ব্যবস্থা উচ্চাধিকারী জ্ঞানীদিগের পক্ষে নহে; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

"হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয়ক, অর্থাৎ ত্রিগুণান্বিত সকাম-অধিকারীদিগের জন্যই বেদের কর্ম্মকাণ্ড ব্যবস্থিত; তুমি কিন্তু নিস্ত্রৈগুণ্য—অর্থাৎ নিষ্কাম হও। (তাহার উপায় প্রদর্শিত হইতেছে) তুমি নির্দ্বন্দ্ব—অর্থাৎ শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ

প্রভৃতি দ্বন্দ্ব রহিত, নিত্যসত্বস্থ—অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বী, যোগ—অর্থাৎ অলব্ধ বস্তু লাভ ও ক্ষেম—অর্থাৎ লব্ধ বস্তু রক্ষা, উভয়েই যত্নশূন্য এবং আত্মবান্—অর্থাৎ অপ্রমত্ত বা অনাসক্ত হও॥"

যথার্থরূপে নিষ্কাম হইতে হইলে যে যে গুণাবলম্বী হইতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা, ধীরতা, বিষয়-ভোগ-বিরতি ও অনাসক্তি ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম হইতে পারা যায় না। যাহার সহিষ্ণুতা ও ধীরতা নাই, সে কদাচ বিষয়ভোগে বিরত হইতে পারে না। আমার কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, আমি কি করিয়া ইতরেন্দ্রিয় সকলের তাড়না সহ্য করিব? কাজেই আমাকে সেই সকল ইন্দ্রিয়ার্থের দিকে প্রধাবিত হইতে হইবে। এইরূপে বিষয়-চিন্তনে রত থাকিলে, আপনা হইতেই বিষয়ে আসক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। যেখানে আসক্তি, সেইখানেই কামনা। কামনার উৎপত্তি আসক্তি হইতে। আসক্তি বশতঃই লোকের বিষয়-বাসনা জন্মিয়া থাকে; অতএব অনাসক্তভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম না হইলে কিরূপে নিষ্কাম হইতে পারা যায়? এজন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শিরোধার্য্য।

অনেকে এরূপ মনে করিতে পারেন যে, এতদূর আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া লাভ কি? আমি মনুষ্য, শোণিত-মাংসে আমার দেহ গঠিত; প্রকৃতি চারিদিকে নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর উপহার সাজাইয়া, তাহা উপভোগ করিবার জন্য আমাকে ইন্দ্রিয়াদি প্রদান করিয়াছেন; আমি যথাভিলষিত সেই সকল সুখ ভোগ করিব, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য; নতুবা এরূপ ব্যবস্থার সার্থকতা কি? এরূপ ক্ষেত্রে নিষ্কাম হইয়া আত্মবঞ্চনা কেন করিব? যত দিন দেহ ধারণ করিব, সাধ্যানুসারে জগতের সুখ ভোগ করিবার জন্য যত্নবান্ হইব; ইহাই যুক্তিযুক্ত; অতএব নিষ্কাম হইয়া জীবন যাপন করিবার উপদেশ বাতুলের প্রলাপ মাত্র। এরূপ চিন্তা অনেকেরই মনে উদিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। এখানে একটী গল্প মনে পড়িল। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার পুস্তকাগার সন্দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাদরে তাঁহাকে পুস্তকালয়ে লইয়া গিয়া, উজ্জ্বল চর্ম্ম-মণ্ডিত—স্বর্ণাক্ষরাঙ্কিত—সুসজ্জিত গ্রন্থরাশি দেখাইলেন। আগন্তুক তন্মধ্য হইতে একখানি বিশেষ চাকৃচিক্যশালী গ্রন্থ হস্তে করিয়া বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! এই পুস্তক খানির মূল্য কত?" বিদ্যাসাগর তদুত্তরে কহিলেন, "পুস্তক খানির মূল্য আট আনা মাত্র, কিন্তু বাঁধাইতে আমার প্রায় বিংশতি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে;" এই কথা শ্রবণ মাত্র ধনী কহিলেন, "বিদ্যাসাগরের যে একটা পাগ্‌লামির কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা অদ্য স্বচক্ষে দেখিলাম," বিদ্যাসাগর অতি সুরসিক লোক ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল আগন্তুক ধনীকে কোন কথা না বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! আপনার গাত্রে যে শীত-বস্ত্র খানি দেখিতেছি, উহার মূল্য কত?" ধনী বিদ্যাসাগরের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ধনগর্ব্বে বলিয়া উঠিলেন "এখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা, কাশ্মীর হইতে আদেশ মত প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছি।" বিদ্যাসাগর

গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, মহাশয়, একখানি সামান্য কম্বলের মূল্য কত?" উত্তর—"পাঁচ সিকা অথবা দেড় টাকা মাত্র।" বিদ্যাসাগর বলিলেন "সে কম্বলেও ত শীত নিবারণ হয়," এইরূপে শীত-বস্ত্র হইতে বিনামা পর্য্যন্ত ধনীর অঙ্গের সমস্ত সামগ্রী গুলির মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া ও তৎপরিবর্ত্তে অতি অল্প মূল্যের সামগ্রীতেও প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, দেখাইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত দেখিতেছি কেবল পাগ্‌লামিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু বিদ্যাসাগরের একটী পাগ্‌লামি সহ্য করিতে পারিলেন না! এখন জিজ্ঞাসা করি, পাগল আমি না অপনি?" তেমনই এ স্থলেও বলা যায়, পাগল সকাম ভোগী না নিষ্কাম যোগী?

প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত যতটুকু আবশ্যক, ততটুকু বিষয়াহরণ নিষ্কাম-ধর্ম্মাভ্যাসের বিরোধী নহে। কম্বলেও যখন শীত-নিবারণ হয়, তখন কম্বল পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীরী শালের আকাঙ্ক্ষা করা প্রাকৃতিক প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য নহে, ভোগ-বিলাসের কামনা বশতঃ। এইরূপ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্য বিষয় লাভের জন্য আমাদিগকে কত না আয়াস করিতে হয়; এমন কি, কামনা বলবতী হইলে, বিষয়াহরণে অনেক অসদুপায় অবলম্বনেও আমরা বিরত হই না। ভোগে কামনার নিবৃত্তি নাই, উহা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় উত্তরোত্তর ভোগ-সুখের লালসাই বৃদ্ধি করিতে থাকে, তদ্দ্বারা কদাচ উহার পরিসমাপ্তি হয় না। যাহার যত কামনা, তাহার তত অভাব, তত অশান্তি। গ্রীসদেশের মহাপুরুষ সক্রেটিস্ বলিয়াছেন যে, আমাদিগের অভাব যতই সঙ্কীর্ণ হইবে, আমরা ততই ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব। বাস্তবিকই ভোগ-বিলাসিতার ন্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতি-পথের অন্তরায় আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ সত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত সস্তেন দণ্ডমর্হতি॥

"যে পরিমাণ ভোগের দ্বারা জঠর পূর্ণ হয়, সেই পরিমাণ ভোগেই দেহীদিগের অধিকার; যে ব্যক্তি তদপেক্ষা অধিক আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি চোর, সে তজ্জন্য দণ্ডনীয় হয়।" ইদানীং এই শ্লোকার্থ আলোচনা করিয়া হয়ত অনেকেই হাস্য করিবেন, কিন্তু প্রাচীন-ভারতবাসিগণ—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ এই সূত্র দ্বারা চালিত হইয়া জগতের প্রকৃত উপকার সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষয়-বাসনার আধিক্যে যে অসুখের বৃদ্ধি হয়, সকাম ব্যক্তি যে প্রকৃত সুখাস্বাদনে অসমর্থ, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। মহামতি কার্লাইল্ বলিয়াছেন, যেমন গণিতে এককে শূন্য দিয়া ভাগ দিলে, ভাগফল অনন্ত হয়, সেইপ্রকার পার্থিব সুখ-সমষ্টিরূপ লবকে বাসনারূপ হর দ্বারা ভাগ করিবার কালে বাসনা যত কম হইবে, সুখের ভাগফল তত অধিক হইয়া উঠিবে; যদি বাসনাকে শূন্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলে ফল অনন্ত সুখ হইয়া থাকে! এখন অনুধাবন করিয়া দেখ, বিষয়-স্পৃহা সুখের না দুঃখের? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ক্রোধাৎ ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতি-
বিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

বিষয়-সকল-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে সঙ্গ—অর্থাৎ আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব হয়, কামনা হইতে (কামনা প্রতিহত হইল) ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। ক্রোধ হইতে সংমোহ—অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকাভাব উপস্থিত হয়; সংমোহ হইতে স্মৃতি-বিভ্রম—অর্থাৎ আত্ম-বিস্মৃতি, আত্মবিস্মৃতি হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইলেই বিনষ্ট হইতে হয়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ। (১)

—০:০:০—

সত্যং ভাবং ন বিত্তির্ব্যপনুদতি যতঃ
কর্ম্ম-নাশ্যো ঘটাদিঃ
মিথ্যাভূতঞ্চ কর্ম্ম ক্ষপয়তি ন তথা
বিত্তি-ঘাত্যং যতস্তৎ।
ইত্থং সিদ্ধে বিভাগে শ্রুতি-শিখর-গিরা
বিত্তি-ঘাত্যঃ প্রতীতঃ
বন্ধো মিথ্যেতি সিদ্ধে নতদপহতয়ে
কর্ম্ম-জাতং সমর্থম্॥ ৬

অন্বয়— "যতঃ" যে হেতু—, "ঘটাদিঃ" ঘট প্রভৃতি পদার্থ নিচয়, "কর্ম্ম-নাশ্যঃ" কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, (অতএব) "বিত্তিঃ" তত্ত্বজ্ঞান—বস্তুর যাথার্থ্য-জ্ঞান, "সত্যং" সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত নিত্য, "ভাবং" ভাব পদার্থ, "ন ব্যপনুদতি" নাশ করিতে পারে না। "তথা" সেই প্রকার—"কর্ম্ম" কল্পিত ক্রিয়া, "মিথ্যাভূতং" আরোপিত "শুক্তি-রজত"বৎ ভ্রম-কল্পনা "নক্ষপয়তি" বিনাশ করিতে পারেনা, "যতঃ" যেহেতু "তৎ" তাহা—সেই আরোপিত ক্রিয়া প্রভৃতি, "বিত্তিঘাত্যং" জ্ঞানের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। "ইত্থং" এই প্রকারে "বিভাগে" বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব, "সিদ্ধে সতি" নিয়মিত রহিয়াছে বলিয়া, "শ্রুতি-শিখর-গিরা" বেদান্ত-বাক্য দ্বারা, "বিত্তিঘাতঃসন্" জ্ঞানের দ্বারাই নাশার্হ রূপে, "প্রতীতঃ" নিশ্চিত; "বন্ধঃ" সংসার-বন্ধন, "মিথ্যা ইতি সিদ্ধে" মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও "তদপহতয়ে" তাহার—সেই মিথ্যাভূত সংসারবন্ধনের বিনাশের জন্য, "কর্ম্মজাতং" অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য-কর্ম্মসমূহ—, "ন সমর্থং" নিজের স্বভাব বশতঃই অপারগ।

ব্যাখ্যা— ঘট প্রভৃতি উৎপাদিত পদার্থ নিচয় আঘাতাদি ক্রিয়া দ্বারা অনায়াসেই বিনষ্ট হয়; উৎপাদিতা—অর্থাৎ জন্যতাই এই বিনাশের হেতু। "যাহা কৃত বা কল্পিত, তাহাই মিথ্যা—নশ্বর; এবং যাহা সত্য—অর্থাৎ অনারোপিত বা অনুৎপাদিত, তাহাই—নিত্য অবিনশ্বর," এতাদৃশ অনুভবই জ্ঞানের সাধারণ ও সার্ব্বকালিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ জ্ঞানবলে ইহা সহজেই প্রতীত হয় যে, যাহার আদি আছে, যাহা উৎপাদিত, তাহার অন্ত এবং বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে, যাহা অনাদি বা অনুৎপাদিত, তাহা অক্ষয়;

---

(১) ১৩০৩ সালের হিন্দুপত্রিকার ১৪৮ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই সন্দর্ভের পূর্ব্বাংশ (৫ শ্লোক পর্য্যন্ত) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুতরাং জ্ঞান যেমন সত্য পদার্থের বিনাশ কল্পনা করিতে পারে না, সেইপ্রকার মিথ্যা উৎপাদিত বা কল্পিত পদার্থেরও স্থায়িত্ব প্রতিপাদন করিতে অসমর্থ। পদার্থের যাথার্থ্য-জ্ঞান জন্মিলে, যাহা কল্পিত, তাহা আপনা হইতেই মিথ্যা বলিয়া এবং যাহা অজন্য বা অকল্পিত, তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই উপরোক্ত বেদান্ত-বাক্য দ্বারাই পদার্থের সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে; অর্থাৎ যাহা জনিত বা আদিমান্, তাহা মিথ্যা এবং যাহা অজন্য বা অনাদি, তাহা সত্য, এই প্রকার সংস্কার জন্মিতেছে। অতএব এই বৈদান্তিক প্রমাণ-বলেই সংসার-বন্ধন যে ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে; কেননা জ্ঞানের সাহায্যে মিথ্যার মিথ্যাত্ব অনুভব করিতে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না; সুতরাং এই মিথ্যাভূত বন্ধ বিনাশ করিতে কল্পিত ক্রিয়াকলাপ কদাচ সমর্থ নহে। যাহা অসত্য, তাহা আজ হউক্ বা কাল হউক, অচিরেই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, এই সংস্কার জ্ঞান-বলে মনোমধ্যে স্বতঃই জাগরিত হইতেছে; এস্থলে সেই মিথ্যা বলিয়া প্রতীত বন্ধ বিনাশের জন্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান পিষ্ট-পেষণ মাত্র। সংসারের বিনাশ বা অস্থায়িত্ব যখন জ্ঞান দ্বারাই উপলব্ধ হয়, তখন তাহার পরিহার মানসে ক্রিয়ানুষ্ঠান কেবল বিড়ম্বনা। (এই শ্লোকের দ্বারা—"জ্ঞানই মোক্ষের হেতু, কর্ম্ম মোক্ষের হেতু নয়" ইহাই প্রতিপাদিত হইল।)

সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র নিদান জ্ঞান; অতএব সেই জ্ঞান; ব্যতীত কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডানুষ্ঠান দ্বারা বন্ধ-বিনাশ অসম্ভব, ইহাই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

আবিদ্যো হ্যেষ বন্ধো বিরমতি ন বিনা
বেদনং কর্ম্মজালৈঃ
মালোদ্ভূতোঽহিরস্তং ব্রজতি কিমু নম-
স্কার মন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ।
এবং নিশ্চিত্য নাগস্ত্বচমিব বিধিনা
কর্ম্মবন্ধং বিধূয়—
জ্ঞানোপায়ে গুরু-শ্রীচরণমভিগতঃ
সেবমানো যতেত" ॥ ৭

অন্বয়—"হি" যে হেতু, "এষ" এই, "বন্ধ" সংসার-বন্ধন, "আবিদ্যঃ" অবিদ্যা-সম্ভূত; (অতএব ইহা) "বেদনং" অধিষ্ঠান জ্ঞান, "বিনা" ব্যতীত "কর্ম্মজালৈঃ" কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা "ন বিরমতি" বিরত হয় না; (দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন) "মালোদ্ভূতঃ" মালা-গ্রথিত "অহি" সর্প, "নমস্কারমন্ত্রৌষধাদ্যৈঃ" প্রণাম, স্তুতি এবং ঔষধ প্রভৃতিতে, "কিমু" কি, "অস্তং" নাশ, "ব্রজতি" প্রাপ্ত হয়? না—হয় না; (অতএব) "এবং" এই প্রকার, "নিশ্চিত্য" স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, "নাগঃ" বিষধর, "ত্বচমিব" জীর্ণকঞ্চুক যেমন ত্যাগ করে, সেই প্রকার, "বিধিনা" শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, "কর্ম্মবন্ধং" কর্ম্মরূপ বন্ধন, "বিধূয়" বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, "গুরু-শ্রীচরণং অভিগতঃ সন্" তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণসমীপে উপনীত হইয়া, "সেবমানঃ" তাঁহার চরণ-শুশ্রূষা করিতে ২ "জ্ঞানোপায়ে" জ্ঞানার্জ্জন-বিষয়ে "যতেত" যত্ন করা উচিত।

ব্যাখ্যা—এই অবিদ্যা-সম্ভূত অজ্ঞান-মূলক সংসার-বন্ধন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানময় কর্ম্মের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। কেননা, অজ্ঞান-মূলা ক্রিয়া দ্বারা অজ্ঞানান্ধতাই পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র—অতএব অন্ধকার-বিনাশক

আলোকের ন্যায় অবিদ্যা-বিনাশক জ্ঞানের সঙ্গতি-লাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। বিমল কৌমুদী-শিখা ব্যতীত নৈশ ধ্বান্তমালার সম্যক্ অপসারণ-সাধনে অন্য কিছু যেমন সমর্থ হয় না, তদ্রূপ সর্ব্বসংশয়চ্ছেদী জ্ঞানালোক ব্যতিরেকে অন্য কিছুতেই মানস-তিমির অপনোদিত হয়না,—বরঞ্চ পরিবর্দ্ধিতই হয়। যেমন মালা-নিহিত বিষধর, প্রণতি, স্তুতি বা ঔষধ প্রভৃতি কিছুতেই বশীভূত হয় না, প্রত্যুত দংশন করিতেই উদ্যত হয়, সেই প্রকার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত কর্ম্মানুশীলনে মোক্ষ-সাধন না হইয়া, তদ্বৈপরীত্যে সংসার-বন্ধন আরও দৃঢ়তর এবং ক্রমশঃ দৃঢ়তম হইতে থাকে। অতএব এই সমুদয় বিষয় মনোমধ্যে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া, সর্প যেমন জীর্ণ কঞ্চুক পরিহার করে, তদ্রূপ কর্ম্ম-বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, তত্ত্বনিষ্ঠ গুরুদেবের তমোবিনাশক মুক্তিপ্রদ শ্রীচরণ-সমীপে উপনীত হইয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় মনঃপ্রাণ সমাহিত করিয়া, অতুল্য অমূল্য জ্ঞান-রত্ন-লাভে যত্নপর হওয়া অতীব কর্ত্তব্য; কেননা জ্ঞানই মুক্তির নিদান।

অনন্তর মুক্তি-সাধন বিষয়ে অপরাপর পণ্ডিতগণের মত উল্লেখ করিয়া, তাহার দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—

৮ কেচিৎ কর্ম্মৈব কাম্যোজ্ঝিত মুদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ং প্রতীতাঃ
তচ্চোপাস্তিং চ মুক্তৌ মিলিতমথ পরে সাধনং সংগিরন্তে।
অন্যে তু জ্ঞানকর্ম্মোভয়মিতি মতিভিঃ স্বাভিরুৎপ্রেক্ষমাণা—।
জ্ঞানাদেবেতি বাক্যাদ্বয়মিহ সহসা নানুমন্যামহে তান্॥ ৮

অন্বয়—"কেচিৎ" কেহ কেহ, "কাম্যোজ্ঝিতং" ফলাকাঙ্খা-বিরহিত, "কর্ম্ম এব" কর্ম্মকেই, "উদিত পদ প্রাপ্ত্যুপায়ং" কথিত মুক্তি-প্রাপ্তির হেতু, "প্রতীতাঃ" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অথ" এবং "পরে" অপরাপর কোন কোন পণ্ডিতগণ, "তচ্চ" উক্ত আকাঙ্খারহিত কর্ম্ম, "উপাস্তিং চ" এবং উপাসনা, "মিলিতং" এই উভয়মিশ্রিত কর্ম্মকে, "মুক্তৌ" মুক্তি বিষয়ে, "সাধনং" প্রধান উপায়, "সংগিরন্তে" নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "অন্যেতু" প্রাগুক্ত পক্ষদ্বয় ব্যতীত অন্য কোন কোন আচার্য্যগণ, "জ্ঞান কর্ম্মোভয়ং" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এতদুভয়কে মোক্ষ-হেতু বলিয়া থাকেন। "ইতি" এই প্রকারে ঐ পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যগণ, "স্বাভিঃ" স্বকীয় কপোল-কল্পিত "মতিভিঃ" বুদ্ধি দ্বারা, "উৎপ্রেক্ষমাণাঃ" বেদার্থের কল্পনা করিয়া থাকেন। সুতরাং "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" "জ্ঞান হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে," "ইতি" এই "বাক্যাৎ" বাক্য হেতু, "বয়ং" আমরা, "ইহ" এই প্রস্তাবিত মুক্তি-সাধন-বিষয়ে, "তান্" সেই সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে, "সহসা" অকস্মাৎ, "ন অনুমন্যামহে" যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা—ভাট্টৈকদেশী ও প্রভাকর প্রভৃতি আচার্য্যগণ, ফলেচ্ছারহিত কর্ম্মকেই মুক্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে অনাকাঙ্খভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেই মোক্ষ-সাধন হইতে পারে। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ ও ভাস্কর প্রভৃতি অপরাপর আচার্য বৃন্দ ফলেচ্ছাশূন্য কর্ম্ম ও প্রাণাদির উপাসনা, এতদুভয়কে মুক্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

*এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ, জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই দুইটিকে মোক্ষ-বিধায়ক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই উল্লিখিত বিদ্বদ্বৃন্দ তাঁহাদিগের স্ব স্ব কপোল-কল্পিত আশুদর্শী কল্পনা-বলে বেদের অর্থকে অন্যথাভাবে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; সুতরাং "জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্" জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ইত্যাদি বেদ-বাক্যানুসারে আমরা অকস্মাৎ সম্যক্ প্রকারে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, এ সমুদয় যথেচ্ছবাদীদিগকে যথার্থবাদী বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না; অর্থাৎ তাঁহাদের স্বচিন্তা-প্রসূত অনিশ্চিত বিষয়ের অনুমোদন করিয়া, চিরবিশ্রুত বেদ-বাক্যের অবমাননা করিতে পারি না। (এই শ্লোকেরও "জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়" ইহাই তাৎপর্য্য।)

পৈত্রো লোকোঽধিগম্যঃ ক্রতুভিরধিগতো
বিদ্যয়া দেবলোকঃ
যদ্বা চেতঃ কষায় ক্ষপণমিহ তয়োঃ
স্মার্ত্তমেবাস্তু সাধ্যম্।—
যজ্ঞেনেত্যাদি বাক্যাৎ ভবতু বিবিদিষা
বেদনং তৎফলং বা—
জ্ঞানাদেবামৃতত্বং নহি শশক-বধূঃ
সিংহ-পোতং প্রসূতে। ৯

অন্বয়—"পৈত্রঃ লোকঃ" পিতৃলোক, "ক্রতুভিঃ" নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা, "অধিগম্যঃ" প্রাপ্য হইয়া থাকে। "বিদ্যয়া" উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যানুশীলন দ্বারা "দেব লোকঃ" স্বর্গরাজ্য, "অধিগতঃ" প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যদ্বা—" অথবা, "চেতঃ কষায়ক্ষপণং" চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি সংস্কাররূপ মলনাশনই, "ইহ" এই জগতে, "তয়োঃ" উক্ত ক্রতু প্রভৃতি কর্ম্ম এবং শ্রুতি প্রভৃতি বিদ্যার, "স্মার্ত্তং" স্মৃতি-সঙ্গত, "সাধ্যং" উদ্দেশ্য, "অস্তু" হউক; "বা" অথবা, "যজ্ঞেন ইত্যাদি বাক্যাৎ" যজ্ঞের দ্বারা—দানের দ্বারা—জ্ঞানেচ্ছা—জ্ঞান এবং ক্রমশঃ তৎফল মোক্ষ হউক, কিন্তু তথাপি "জ্ঞানাৎএব" জ্ঞান হইতেই, "অমৃতত্বং" কৈবল্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। "হি" যেহেতু, "শশক-বধূঃ" শশক-রমণী "সিংহপোতম্" সিংহশিশু "ন প্রসূতে" প্রসব করিতে পারে না। বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফল যখন উক্ত প্রকার, তখন তাদৃক্ ফলোত্তর ক্রিয়া হইতে মোক্ষসাধন অসম্ভব।

ব্যাখ্যা—ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক যাগাদি কর্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং বেদানুশীলন ও উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যা দ্বারা দেব-লোক লাভ হইয়া থাকে, অথবা নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রাগুক্ত শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যাচর্চ্চা, এই উভয় দ্বারাই চিত্তের রাগদ্বেষ প্রভৃতি সংস্কাররূপ মল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্মৃতির গ্রন্থবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং উক্ত বিদ্যানুশীলনে চিত্তের ক্লেশ-পঙ্কের বিনাশ হইয়া থাকে। অথবা "যজ্ঞেন—দানেন" "যজ্ঞ দ্বারা—দানদ্বারা" ইত্যাদি চির-সিদ্ধ বাক্য হেতুক, যজ্ঞ-দান প্রভৃতি কর্ত্তৃক জ্ঞানের ইচ্ছা, জ্ঞান বা পূর্ব্বোক্ত ক্রতু প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার ফল পিতৃলোক-প্রাপ্তি এবং শ্রুতি-উপাসনা প্রভৃতি বিদ্যার ফল দেবলোক-প্রাপ্তি ইত্যাদি সিদ্ধ হউক। এ সমস্তই স্বীকার করিলাম, এ সমস্তের দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি অধিগত হইতে পারে, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান। শশকীর সিংহ-প্রসব যেরূপ অসম্ভব, স্বর্গাদি-অনিত্যফলদ কর্ম্মকাণ্ড হইতেও মুক্তিলাভ তদ্বৎ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

১ম মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

——০:০:০——

পাকঃ পৃচ্ছামি মনসাবিজানন্দেবা-
নামেনানিহিতাপদানি।
বৎসেবষ্কয়েধিসপ্ততন্তূন্বিতত্নিরে-
কবয়ওতাবতি ॥৫॥১৪॥

পদপাঠঃ। পাকঃ। পৃচ্ছামি। মনসা। অবিজানন্। দেবানাম্। এনা। নিহিতা। পদানি। বৎসে। বষ্কয়ে। অধি। সপ্ত। তন্তূন্। বি। তত্নিরে। কবয়ঃ। ওতবৈ। উঁ। ইতি।

ব্যাখ্যা। পাক—অপক্কমতি, পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করি, মনসা—মনের দ্বারা, অবিজানন্—না জানিয়া; দেবানাম্—দেবতাদিগের, এনা—এই সমুদয়, নিহিতা—নিগূঢ়, পদানি সন্দিগ্ধ-বিষয়। বৎসে—সকলের আধারভূত। বষ্ট ইতি সত্য নাম তৎ কষতি ইতি বষ্কয় তস্মিন্—পরমেশ্বরে, সপ্ত—সাত, তন্তূন্—ছন্দঃ বা সোমযজ্ঞ, অধি—অধিক, বিতত্নিরে—বিস্তার করে। কবয়ঃ—মেধাবী, ওতবৈ—জগতের কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্পাদনের জন্য।

বঙ্গার্থ——আমি অপক্কমতি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে সমুদয় বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে, তাহা দেবতাগণের নিকটেও গূঢ়। সর্ব্বাধার পরমেশ্বরকে উদ্দেশ্য করিয়া মেধাবিগণ যে সপ্ত-সোম-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন বা সপ্ত ছন্দঃ আবৃত্তি করেন, তাহা কি এই জগৎরূপ তন্তুবিস্তারের জন্য—অর্থাৎ জগৎ রক্ষার নিমিত্ত ?

অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি
বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তংভষলিমা রজাংস্যজস্যরূপে কিমপি
স্বিদেকং ॥ ৬

পদপাঠঃ—অচিকিত্বান্। চিকিতুষঃ। চিত্। অত্র। কবীন্। পৃচ্ছামি। বিদ্মনে। ন। বিদ্বান্। বি। যঃ। তস্তম্ভ। ষট্। ইমা। রজাংসি। অজস্য। রূপে। কিম্। অপি। স্বিৎ। একম্।

ব্যাখ্যা—অচিকিত্বান্—অজ্ঞ আমি, চিকিতুষঃ—বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া, কবীন্—তত্ত্বজ্ঞদিগকে, অত্র—এই বিষয়ে, পৃচ্ছামি—জিজ্ঞাসা করিতেছি; বিদ্মনে—

জ্ঞানের জন্য, ন বিদ্বান্—আমি জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না, যঃ—যিনি, বিতস্তম্ভ—স্তম্ভিতবান্——নিয়মিতবানিত্যর্থঃ নিয়মিত করিয়াছেন, ষট্—ছয়, ইমা—এই, রজাংসি লোক (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ এই ষড়্লোক) "লোকা রজাংসি উচ্যন্তে" ইতি নিরুক্তং। যদিচ সপ্তলোক, তথাপি সত্য-লোকের কথা এখানে বলা হয় নাই; কারণ যাহারা সত্যলোকে গমন করেন, তাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদের এই সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না। (সপ্ত লোক সম্বন্ধে পাঠক যদি কিছু অবগত হইতে চান, তবে হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্বপ্রকাশিত "সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা" পাঠ করিবেন।) সত্য লোকে প্রবেশ করিলে, ব্রহ্মে জীবে কোন প্রভেদ থাকে না, সত্য-লোকই ব্রহ্মের স্বরূপ, অজস্য—জন্মরহিতের, রূপে—স্বরূপে, কিম্—কি, অপি স্বিদ্। প্রশ্নে, একম্—সত্যলোক।

বঙ্গার্থ—তত্ত্বানভিজ্ঞ আমি বিশেষ তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্যই তত্ত্বজ্ঞদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমি জানিয়া শুনিয়া শুধু তর্কে পরাস্ত্র করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি না। যিনি ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, জনঃ মহঃ তপঃ,এই ষড়্লোক নিয়মিত করিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি; সত্যলোক কি সেই অজন্মার স্বরূপে অবস্থান করিতেছে? আমি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ইহ ব্রবীতু য ঈমংগ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো অস্য বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ।

পদপাঠ—ইহ। ব্রবীতু। যঃ। ঈম্। অঙ্গ। বেদ। অস্য। বামস্য। নিহিতম্। পদম্। বেঃ। শীর্ষ্ণঃ। ক্ষীরম্। দুহ্রতে। গাবঃ। অস্য। বব্রিং। বসানাঃ। উদকম্। পদা। অপুঃ।

ব্যাখ্যা—ইহ—ইদানীং, ব্রবীতু—বলুন। যঃ—যিনি। ঈম্—এই। অঙ্গ—শীঘ্রই। বেদ—জানেন। অস্য—এই, বামস্য—ভজনীয়ের, বেঃ—গমনশীলের, নিহিতম্—গূঢ়, পদম্—স্বরূপ, অস্য—এই, শীর্ষ্ণঃ—শিরের ন্যায় উন্নতের, গাবঃ—রশ্মি, ক্ষীরং—উদক, দুহ্রতে—বর্ষণ করে, বব্রিম্ রূপ, বসানাঃ—অত্যন্ত বিস্তার করিয়া, উদকম্—জল। পদা—রশ্মির দ্বারা, অপুঃ—পান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে উন্নত আদিত্যের রশ্মি সমূহ জল বর্ষণ করে, এবং যিনি তাঁহার রূপ বিস্তার করিয়া রশ্মিদ্বারা উদক পান করেন, সেই আদিত্যের অন্তর্গত ভজনীয় পুরুষের স্বরূপ যিনি অবগত আছেন, তিনি তাহা শীঘ্র বলুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ইত্যাদি সকলেই দেবতা বা ঐশী শক্তি। অগ্নি, বায়ু, আদিত্যের মধ্যে চৈতন্য-শক্তি নিহিত আছে বলিয়াই; তাহাদের বিশেষ কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান আছে, জড়ের কোন ক্রিয়াকরী শক্তি নাই, চৈতন্যের অস্তিত্বেই জড়ের ক্রিয়াকরী শক্তি জন্মে, কিন্তু জগতে নিরবচ্ছিন্ন—অর্থাৎ জড়-অসংস্পৃষ্ট চৈতন্য দৃষ্ট হয় না, এই জন্যই জড় উপলক্ষ্য করিয়া, তদন্তরস্থ চৈতন্যের ধ্যান করিতে হয়, এবং যে সমুদয় জড়ে চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ, সেই সমুদয় আশ্রয় করিয়াই চৈতন্যের, ধ্যান বা মনন করা বিধেয়। সামান্যবুদ্ধি লোকেরাও

যাহা জানে, তাহা যে ঋষিরা জানিতেন না, তাহা নহে; তাঁহারা বায়ু, অগ্নি, আদিত্যাদির জড়ত্ব অবগত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সেই সঙ্গে২ তাঁহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্য-শক্তির সত্বাও হৃদয়ঙ্গম করিতেন। এই জন্যই বেদে সর্ব্বত্রই বায়ু, অগ্নি, আদিত্যাদিকে লক্ষ্য করিয়া অন্তর্যামী পুরুষের ধ্যান দৃষ্ট হয়; যথা বৃহদারণ্যকে—য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো নবেদ, যস্য আদিত্যঃ শরীরং, য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ। যিনি আদিত্যে বাস করিতেছেন, যিনি আদিত্যের অন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য যাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে আসিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী—তিনিই অমৃত। সুতরাং বায়ু প্রভৃতি চৈতন্যের শরীর মাত্র, এই সমুদয় আশ্রয় করিয়াই চৈতন্য-শক্তির-বিভিন্ন ক্রিয়া হয়, এই চৈতন্য শক্তি বিরহিত হইলে, অগ্নি-বায়ু-আদিত্যাদির কোনই ক্ষমতা থাকে না, এই বিষয়টি তলবকার উপনিষদে অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, যথা—এক সময়ে অগ্নি বায়ু আদিত্যাদির অত্যন্ত গর্ব্ব হয়; পরমেশ্বর তাহা জানিতে পারিলেন, এবং তিনি এক অদ্ভুত দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেববৃন্দের অনুরোধে, অগ্নি তাঁহার নিকটে যাইয়া, তিনি কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন অদ্ভুত রূপধারী ব্রহ্ম অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? এবং তুমি কি করিতে পার? তদুত্তরে অগ্নি বলিলেন যে—আমি বিখ্যাতনামা অগ্নি, অখিল বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারি; তখন পরমেশ্বর তাঁহার সম্মুখে এক গাছা তৃণ স্থাপন করিলেন; অগ্নি বহু চেষ্টায়ও তাহা দগ্ধ করিতে না পারিয়া, লজ্জাবনত মুখে দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইলেন! তৎপরে বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতিও ঐ প্রকারে স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়া আসিলেন; তাহার পর তত্ত্বজ্ঞানরূপিণী উমা দেবতাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বৃথা অহঙ্কার এবং চৈতন্য-শক্তি বিরহিত হইলে, তাঁহারা যে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, তাহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম যে তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা দেবতাদিগকে বলিলেন; তদবধি দেবতারা বৃথা অভিমান পরিহার করিলেন।

মূর্খেরাই কেবল অগ্নি-বায়ু-আদিত্যাদিতে জড়ত্ব দৃষ্টি করেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাঁহাদের অন্তরে চৈতন্য-সত্বা অনুভব করিতেন, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই বেদপাঠে তৃপ্তি হইবে; অন্যথা বিড়ম্বনা মাত্র।

মাতা পিতর মৃত আ বভাজ ধীত্যগ্রে মনসা সংহি জগ্মে।
সা বীভৎসুর্গর্ভরসা নিবিদ্ধা নমস্বন্ত ইদুপবাকমীয়ুঃ॥ ৮

পদপাঠঃ—মাতা। পিতরম্। ঋতে। আ। বভাজ। ধীতী। অগ্রে। মনসা। সম্। হি। জগ্মে। সা। বীভৎসুঃ। গর্ভরসা। নিবিদ্ধা। নমস্বন্তঃ। ইৎ। উপবাকম্। ঈয়ুঃ।

ব্যাখ্যা—মাতা পৃথিবী। পিতরম্—দ্যুলোকস্থ সূর্য্যকে। ঋতে—উদকের জন্য, আবভাজ—সম্যক্ প্রকারে ভজনা করেন, ধীতী—ধীত্যা—কার্য্যের দ্বারা, অগ্রে—তাহার পূর্ব্বে,

মনসা—মনের দ্বারা, সংজগ্মে—সঙ্গত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ বৃষ্টি করিয়াছিলেন। সা—মাতা-পৃথিবী, বীভৎসুঃ—গর্ভধারণে ইচ্ছুক হইয়া, গর্ভরসা (বৈদিক)—গর্ভরসেন—গর্ভরসের দ্বারা, নিবিদ্ধা—বিশেষরূপে বিদ্ধা হইয়াছিলেন; অথবা—গর্ভরসা—ওষধ্যুৎপাদক রসবিশিষ্টা পৃথিবী, নিবিদ্ধা হলের দ্বারা বিদারিতা হইয়াছিলেন; নমস্বন্ত—নিশ্চয়ই এই সংযোগে ভবিষ্যতে তাঁহাদের সন্তানরূপ ব্রীহি-যবাদি শস্যোৎপাদন বিষয়ে, উপবাকঃ পরস্পর নিকটে যাইয়া কথাবার্ত্তা, ঈয়ুঃ—বলিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ—মাতৃরূপা পৃথিবী, পিতৃরূপ আদিত্য দেবকে উদকের জন্য কর্ম্মের দ্বারা ভজনা করেন। ইহার পূর্ব্বেই পিতা মনের দ্বারা মাতার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন; মাতা গর্ভধারণেচ্ছায়, গর্ভ-রসের দ্বারা পরিপূর্ণা হইয়াছিলেন; তাঁহারা পরস্পরের নিকটে গমন করিয়া শস্যোৎপাদন বিষয়ক কথোপকথন করিয়াছিলেন।

বিশেষব্যাখ্যা—প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই বিশ্ব। মনুষ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে যে নিয়ম, এই জগদুৎপত্তি সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। প্রজাকাম প্রজাপতি সৃষ্টির নিমিত্ত মিথুন উৎপাদন করেন। শ্রুতিতে উহাদের নাম রয়ি ও প্রাণ; সূর্য্য প্রাণস্থানীয়, পৃথিবী—চন্দ্রাদি রয়িস্থানীয়। জগতে যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্ত্রী, পুরুষ বা ক্লীবজাতীয়। যাহাদের উৎপাদন করিবার ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ যে সমুদয়ে প্রাণশক্তি বলীয়সী, তাহারা পুংজাতীয়; ঐরূপ যাহাতে রয়ি-শক্তি বলীয়সী, তাহারা স্ত্রীজাতীয় এবং যাহাতে কোন শক্তিই বলবত্তরা নহে, তাহাই ক্লীবজাতীয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহ-বিভাগ-প্রস্তাবে সূর্য্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি পুংজাতীয়, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয়, এবং বুধ ও শনি ক্লীবজাতীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রয়ি এবং প্রাণকেই Mattor এবং Spirit বলা যায়। সূর্য্য প্রাণস্থানীয় এবং পৃথিবী রয়িস্থানীয়; এই উভয়ের সংযোগেই যাবতীয় পার্থিব পদার্থ সমুৎপন্ন হয়। এই সূর্য্য এবং পৃথিবীর সংযোগই বর্ত্তমান ঋকের বর্ণিত বিষয়। যেমন কোন যোষিৎ পুত্রার্থে পতিসন্নিধানে গমন করে, পতিও অনুরাগযুক্ত হইয়া তাহার নিকটে আগমন করেন, তদ্রূপ পৃথিবী যেন সূর্য্যের সহিত এবং সূর্য্যও পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইতে অভিলাষী হইয়াছেন। সূর্য্য রস আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীতে রেতোরূপে বর্ষণ করাতেই পুত্ররূপ শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রশ্নোপনিষদে ব্যাখ্যাত হইয়াছে "তস্মৈ স হোবাচ প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যে তৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি॥" মহর্ষি পিপ্‌পলাদ কবন্ধীকাত্যায়নকে বলিলেন, প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিয়াছিলেন। তপ অনুষ্ঠান করিয়া তিনি মিথুন উৎপাদন করিলেন। ঐ মিথুন রয়ি ও প্রাণ। তিনি বলিলেন, ইহারাই আমার বহুপ্রকার প্রজা উৎপাদন করিবে।

যুক্তামাতাসীদ্ধুরিদক্ষিণায়া অতিষ্ঠদ্
গর্ভোবৃজনীষন্তঃ।
অমীমেদ্বৎসোঽনুগামপশ্যদ্বিশ্বরূপ্যং ত্রিষু-
যোজনেষু॥ ৯

পদপাঠঃ। যুক্তা। মাতা। আসীৎ। ধুরি। দক্ষিণায়াঃ। অতিষ্ঠৎ। গর্ভঃ। বৃজনীষু। অন্তঃ। অমীমেৎ। বৎসঃ। অনু। গাম্। অপশ্যৎ। বিশ্বরূপ্যম্। ত্রিষু। যোজনেষু।৯

অন্বয়—মাতা দক্ষিণায়াঃ ধুরি যুক্তা আসীৎ। গর্ভঃ বৃজনীষু অন্তঃ অতিষ্ঠৎ। অনু ত্রিষু যোজনেষু সৎসু, বৎস অমীমেৎ। বিশ্বরূপ্যং গাম্ অপশ্যৎ।

ব্যাখ্যা—মাতা-নির্মীয়ন্তে অস্মিন্ ইতি মাতা—যাহাতে ভূত সমূহ নির্ম্মিত হয়—দ্যুলোক, দক্ষিণায়াঃ অভিলাষ সম্পাদন যোগ্যা পৃথিবীর, ধুরি—ভারে—অর্থাৎ ভার-বহনে, যুক্তা—বর্ষণ-সমর্থা—আসীৎ—ছিলেন। গর্ভঃ—গর্ভস্থানীয় উদক রাশি, বৃজনীষু—অন্তঃ—মেঘপংক্তির মধ্যে, অতিষ্ঠৎ—ছিল, অনু—তৎপরে, ত্রিষু যোজনেষু—সৎসু—মেঘরশ্মিবায়ুষু সংযুক্তেষু সৎসু, অর্থাৎ মেঘ-রশ্মি-বায়ু, এই তিন মিলিত হইলে, বৎসঃ—পুত্ররূপে পরিণত জল, অমীমেৎ—বর্ষণ সময়ে শব্দয়তি, বর্ষণকালে শব্দ করিয়াছিল। (অনন্তর) বিশ্বরূপ্যম্—বিচিত্র শস্যাদিদ্বারা নানারূপবতী, গাম্ পৃথিবীকে, অপশ্যৎ—দেখিয়াছিল।

বঙ্গার্থ—দ্যুলোক শস্যাদির উৎপাদন-রূপ অভিলাষ সম্পাদন সমর্থা পৃথিবীতে বর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন। উদক গর্ভ-রূপে মেঘের অভ্যন্তরে ছিল, এবং মেঘ, রশ্মি ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায়, সন্তান-বৎ পৃথিবীতে পতিত হইয়া, শব্দ করিয়াছিল এবং বিচিত্ররূপা পৃথিবীকে দর্শন করিয়াছিল, অর্থাৎ—দ্যুলোক যেন পৃথিবীর উপকার সাধনার্থ প্রস্তুত, এবং পৃথিবীও দ্যুলোকের সাহায্যে শস্যবতী হইবার উপযুক্তা। পৃথিবীকে এতাদৃশ অনুকূলা জানিয়াই দ্যুলোক তাহাতে বর্ষণ করেন। দ্যুলোক কিম্বিধ ভাবে পৃথিবীর উপকার করেন? তাহাই বর্ণিত হইতেছে যে,—গর্ভরূপে যে উদক মেঘাভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, তাহাই সন্তানরূপে পৃথি-বীতে পতিত হয়, এবং প্রসূত সন্তানের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়াই শব্দ করে, বৃষ্টিদ্বারাই পৃথিবী নানাবিধ শস্যালঙ্কৃতা হইয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করেন। তাই উক্ত হইয়াছে যে, সন্তান পৃথিবীতে পতিত হইল, এবং তাহাতে পৃথিবী বিচিত্ররূপা হইলেন।

তিস্রো মাতৄস্ত্রীন্ পিতৄন্ বিভ্রদেক উর্দ্ধস্তস্থৌ নেমবগ্লাপয়ংতি।
মংত্রয়ংতে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠে বিশ্ববিদং বাচ-মবিশ্বমিন্বাং॥ ১০

অন্বয়—একঃ তিস্রঃ মাতৄঃ ত্রীন্ পিতৄন্, বিভ্রৎ (সন্) উর্দ্ধঃ তস্থৌ। ঈম্ ন অব—গ্লাপয়ন্তি (কেঽপি ইতিশেষঃ), দিবঃ পৃষ্ঠে অমুষ্য বিশ্ববিদম্ অবিশ্বমিন্বাং বাচং মন্ত্রয়ন্তে—। দেবা ইতি শেষঃ।

ব্যাখ্যা—একঃ পরমেশ্বর, তিস্রঃ মাতৄঃ—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যুলোক, এই তিন মাতাকে, এবং ত্রীন্ পিতৄন্ অগ্নি, বায়ু, ও সূর্য্য, এই তিন পালয়িতাকে। বিভ্রৎ সন্ ধারণ করিয়া, উর্দ্ধঃ তস্থৌ এই তিনের উর্দ্ধদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈম্ (বৈদিক) এনং—ইঁহাকে ন অবগ্লাপয়ন্তি, কেহই গ্লানি যুক্ত করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ কিছুতেই ইনি ক্লান্ত হইতেছেন না; দেবাঃ দেবতাগণ, দিবঃপৃষ্ঠে স্বর্গোপরি, অমুষ্য—উঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববিদম্—সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধিনী, অবিশ্বমিন্বাং—দেবতাভিন্ন অন্যো-ন্যের অজ্ঞেয়, বাচং—বাক্য, মন্ত্রয়ন্তে—পরস্পর কথোপকথন করেন।

বঙ্গার্থঃ—পরমেশ্বর, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, এই তিন মাতা এবং অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এই তিন পিতাকে ধারণ করিয়া ইহাঁদের ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্লান্তি হইতেছে না। স্বর্গে দেবগণ পরস্পর পরমেশ্বর সম্বন্ধে অন্যের অজ্ঞেয় বিশ্বব্যাপী কথোপকথন করিতেছেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপসম্বন্ধে দেবগণ যে সমুদয় তথা অবগত আছেন, তাহা অন্য কেহ অবগত নহেন এবং তাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কথোপকথন করেন, তাহাতে বিশ্বস্থ তাবৎ সত্যই নিহিত আছে। (ক্রমশঃ।)

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

উষস্ত-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

—:০:—

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

অথ হৈনমুষস্তশ্চাক্রায়ণঃ পপ্রচ্ছ,—যাজ্ঞবল্ক্যেতি, হোবাচ, যৎ সাক্ষা দপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য, সর্ব্বান্তরো, যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যোঽপানেনাপানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো ব্যানেন ব্যানীতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরো, যো উদানেন উদানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তর, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ।—তৎপরে চক্র ঋষির পুত্র উষস্ত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! আমার নিকট সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যে ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয় সবিশেষ ব্যাখ্যা কর। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মাই সেই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যেই আছেন। উষস্ত পুনরায় বলিলেন, সকলের মধ্যে কোন্ আত্মা আছেন? যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, যিনি প্রাণ বায়ু দ্বারা প্রাণন-ক্রিয়া করেন, তিনিই তোমার আত্মা, এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন; তিনি অপান বায়ু দ্বারা (অধোগামী বায়ু দ্বারা) অপান-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যে আছেন; যিনি ব্যান বায়ু দ্বারা (সর্ব্বত্রগামী বায়ু দ্বারা) ব্যান ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন; যিনি উদান বায়ু দ্বারা (ঊর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা) উদান-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন।

স হোবাচোষস্তশ্চাক্রায়ণো, যথা বিব্রূয়াদসৌ গৌরসাবশ্ব ইত্যেব মে বৈতদ্ব্যপদিষ্টং ভবতি, যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ, কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরঃ। ন দৃষ্টে-র্দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্ন্নমতের্মন্তারং মন্বীথার্ন্ন বিজ্ঞাতে-র্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত

আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং ততো হোষস্তশ্চাক্রায়ণঃ উপররাম ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ।—চাক্রায়ণ উষস্ত বলিলেন, ঐ গো—ঐ অশ্ব যাইতেছে এবং দৌড়াইতেছে, এইরূপ ব্যপদেশ দ্বারা তুমি আমার নিকট ব্রহ্মের বিষয় ব্যাখ্যা করিলে; সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম যে আত্মা এবং যিনি সকলের মধ্যেই আছেন, তাঁহার বিষয়ই আমার নিকট বল। যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, তোমার আত্মা--যিনি সর্ব্বান্তরে আছেন, তিনিই সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ ব্রহ্ম। উষস্ত পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যাজ্ঞবল্ক্য! কোন্ আত্মা সকলের মধ্যে আছেন? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দর্শনের দর্শককে কেহ দেখিতে পারে না; শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ শুনিতে পারে না; মননের মন্তাকে কেহ মনন করিতে পারে না; জ্ঞানের জ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না।

এই-ই তোমার আত্মা সকলের মধ্যে আছেন; এতদ্ব্যতীত আর সকলই অনিত্য। এই কথা শুনিয়া চাক্রায়ণ উষস্ত বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা—চক্রের পুত্র উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য "আত্মাই ব্রহ্ম" এই কথা বলিলেন; এবং আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে বলিতেছেন যে, যিনি প্রাণনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তিনিই আত্মা। তাহাতে উষস্ত সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, তুমি প্রথমে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মের কথা বলিবে বলিলে, তৎপরে কতকগুলি লিঙ্গ দ্বারা তাঁহার ব্যাখ্যা করিতেছ; ইহা তোমার কিরূপ হইল? না, যেরূপ কেহ শিং ধরিয়া গোরু দেখাইবে বলিয়া, তৎপরে গোরু গমনাগমন করে ইত্যাদি কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা গোরুর বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করে। তোমাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে বলিলে—আত্মা; আত্মা কি, জিজ্ঞাসা করাতে কতকগুলি কার্য্যের উল্লেখ করিলে; অতএব তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বিষয় কিছুই বলিলে না। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে, দর্শনের দর্শককে দেখা যায় না; ইত্যাদি। দৃষ্টির দ্রষ্টা, (এস্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী) যিনি দৃষ্টিকার্য্য করেন, অর্থাৎ যিনি দেখেন, দ্রষ্টা কর্ত্তা; এবং দৃষ্টি কর্ম্ম, তাঁহার কার্য্য; সুতরাং যিনি দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দেখা যায় না। তাঁহাকে দেখা গেলে, তিনি দৃষ্ট হইলেন, দ্রষ্টা আর থাকিলেন না; কর্ম্ম হইলেন; কর্ত্তা আর থাকিলেন না। শ্রবণ, মনন ইত্যাদিতেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। ঘট-পটাদির লক্ষণের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতে সম্মত হইতেছেন না; কেন না, তাহা বলা যায় না; এইরূপ বর্ণনা ব্রহ্মের স্বভাবের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের স্বভাব কি? না, দর্শন, শ্রবণ, ইত্যাদি। এই দর্শনাদি দ্বিবিধ,—লৌকিক এবং পারমার্থিক। বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বস্তুর সহিত অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে, অন্তঃকরণে যে বৃত্তি হয়, তাহাই লৌকিক দর্শন, এবং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে; কিন্তু আত্মার যে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; তিনি দর্শনের দর্শক, শ্রবণের শ্রোতা, ইত্যাদি; এবং আত্মার এই দর্শনাদি ক্রিয়ার আদিও নাই, অন্তও নাই।

এই বিষয়টী একটু অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক। আমাদিগের লৌকিক

দর্শন কিরূপে হয়? একটী বস্তু চক্ষুর গোচর হইল, এবং চক্ষু ও স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের একটী ক্রিয়া হইল; এইরূপ মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেই আমরা উহাকে দর্শন বলি। শ্রবণাদিও ঐরূপ। কিন্তু এই দেখা শুনা করে কে? চক্ষু, কর্ণ, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক করে? না অন্য কেহ করে? দেখি শুনি আমি, মস্তিষ্ক-স্নায়ু চক্ষু-কর্ণের সাহায্যে। চক্ষু দেখে না বা মস্তিষ্ক উপলব্ধি করে না; আমি দেখি এবং আমি উপলব্ধি করি, চক্ষু ও মস্তিষ্কাদির সাহায্যে। এই "আমি"ই আত্মা। পদার্থ-বিশেষ চক্ষুকর্ণাদির সংস্রবে আসিলে, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়া হয়; কিন্তু এ সমুদয়ই বিনাশশীল; কিন্তু আমি যে এই দেখি শুনি ইত্যাদি, সে আমার দেখা শুনার একটা নিত্য-শক্তি আছে বলিয়া; সেই নিত্য-শক্তির সংস্রবে পার্থিব বস্তু আসে বলিয়া আমার লৌকিক দর্শনাদি হয়। এই অনিত্য-দর্শন ব্যতীত আমার একটী নিত্য-দর্শন আছে, যে নিত্য-দর্শনের আমিই কর্ত্তা এবং দর্শনই কর্ম্মরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদি ঐ নিত্য-দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে আমার অনিত্য-দর্শন হইতে পারিত না; অর্থাৎ যদি পারমার্থিক দর্শন না থাকিত, তাহা হইলে লৌকিক দর্শন হইতে পারিত না। ব্রহ্মের বিশেষ স্বভাব বশতঃ, গবাদির ন্যায় তাঁহাকে দেখান যায় না; কারণ, তিনি দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলেই আর ব্রহ্ম থাকিলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে ইহাই বুঝাইলেন যে, আত্মা বা আমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে এই সোঽহং জ্ঞান লাভ হয়, এবং ইহা হইলেই জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়।

কহোল-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি, তৃতীয় অধ্যায়; চতুর্থ ব্রাহ্মণ।

অথ হৈনং কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্বেতি, এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ। কতমো যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বান্তরো যোঽশনায়া পিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা, যা বিত্তৈষণা সা লোকৈষণোভে হ্যেতে এষণে এব ভবতঃ, তস্মাদ্ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোঽন্যদার্ত্তং ততোহ কহোলঃ কৌষীতকেয়ঃ উপররাম।

বঙ্গানুবাদ।—অনন্তর কুষীতকের পুত্র কহোল যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন—হে যাজ্ঞবল্ক্য! অপরোক্ষ এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, যিনি সকলের মধ্যে

আছেন, তাঁহার বিষয় আমাকে বল। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তোমার আত্মা, যে আত্মা সকলের মধ্যেই আছেন। হে যাজ্ঞবল্ক্য! যাহা সকলের মধ্যেই আছেন, সে আত্মা কে? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, এই সেই আত্মা যে আত্মা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা মৃত্যুকে জয় করেন। ব্রাহ্মণেরা ঐ আত্মাকে এইরূপ জানেন, এবং পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা, ধন প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা জয় করিয়া, তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন। যাহা পুত্রৈষণা, তাহাই বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা; যাহা বিত্ত-প্রাপ্তির ইচ্ছা, তাহাই স্বর্গাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা; কারণ উভয়ই ইচ্ছা। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্য অধিকার করিয়া, আত্মবিদ্যারূপ বল দ্বারা আপনাকে সজ্জিত করিবেন এবং পাণ্ডিত্য ও বলের বিষয় অবগত হইয়া, মৌন এবং অমৌন জানিয়া, আপনাদিগকে যথার্থ ব্রাহ্মণ করিবেন। কিরূপ আচরণে ব্রাহ্মণ থাকিবেন? এইরূপ ব্যক্তি যে আচরণই করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অবস্থা সমস্তই নশ্বর। কুষীতকের পুত্র কহোল বিরত হইলেন।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে, ব্রহ্মেতর বস্তু হইতে ব্রহ্মের পার্থক্য জ্ঞাত হইলে মুক্তি হয়, এই কথা সূচিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণে, সংসার-ত্যাগ মুক্তির হেতু বলিয়া সূচিত হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা শোক-দুঃখ ইত্যাদি থাকে; কিন্তু আত্মজ্ঞান হইলে, শোক-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ধন পুত্র ও স্বর্গ ইত্যাদি কিছুই থাকে না। ভেদ জ্ঞান হইতেই ধনৈষণা—পুত্রৈষণা ইত্যাদি জন্মে; কিন্তু ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলে, উহা আর থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে, সংসার-ধর্ম্ম আর থাকে না। বাসনা সকলের মূলেই এক; সেই মূল নষ্ট করিতে পারিলেই সকল বাসনা নষ্ট করিতে পারা যায়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বল দ্বারাই এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যাঁহারা এই বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করেন, তাঁহারাই যথার্থ ব্রাহ্মণ। এস্থলে আচার্য্য-পরিচর্য্যা-পূর্ব্বক বেদান্ত-তাৎপর্য্য-ধারণকে 'পাণ্ডিত্য' বলা হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানকে 'বল' বলা হইয়াছে। আর, আমিই পরব্রহ্ম, আমা-ভিন্ন আর কিছুই নাই, মনের মধ্যে এই-রূপ অনুসন্ধানকে 'মৌন' বলা হইয়াছে, এবং অনাত্ম-প্রত্যয়কে 'অমৌন' বলা হইয়াছে; সুতরাং যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি অনাত্মপ্রত্যয়কে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া, আত্মপ্রত্যয়েক দৃঢ়-ধারণ করিয়া, পাণ্ডিত্য এবং বলের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করিবেন। এইরূপ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তিনি ব্রাহ্মণই থাকিবেন। (কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

মণিরত্নমালা।

[১৬শশ্লোকের ব্যাখ্যার শেষাংশ।]*

(৪র্থবর্ষের ফাল্গুন ও চৈত্র-সংখ্যার ২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

———•:০:•———

বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেহ্যলং।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবাস্তস্মাদ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ॥ (মনু)

বাসনা পূর্ণ করেন বলিয়া ধর্ম্মের অপর একটি নাম "বৃষ"। তিনিই প্রত্যক্ষ ভগবান্। অতএব এমন ধর্ম্মরূপ বৃষকে যে ব্যক্তি নিবারণ করে, সেই ব্যক্তিই 'বৃষল' (নীচজাতি বা দুষ্কর্ম্মান্বিত পাপী); তদ্ভিন্ন বৃষল কোন জাতি নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মকে নষ্ট করা কোনমতে বিধেয় নহে।

"যে তু ধর্ম্মানসূয়ন্তে বুদ্ধি মোহান্বিতা নরাঃ।
অপথা গচ্ছতাং তেষামনুযাতাপি পীড্যতে॥"
"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ধর্ম্মোনহন্তব্যো মানোধর্ম্মো হতোহবধীৎ॥"

যে সমস্ত অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করে, তাহারা কুপথেই গমন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের অনুসরণকারী মনুষ্যগণও দুঃখ ভোগ করে। যে মানব ধর্ম্মকে হনন করে, ধর্ম্ম তাহাকে হনন করেন, এবং যে ব্যক্তি ধর্ম্মকে রক্ষা করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন। অতএব ধর্ম্মকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্ম যেন আহত হইয়া আমাদিগের বিনাশ সাধন না করেন।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

(১)

ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ংশৌচমিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥ (মনু)

ধৃতি—সন্তোষ, ক্ষমা—অপকারীর প্রত্যপকার না করা, দম—বিষয়-সংসর্গে মনের অবিকার, অস্তেয়—পরধন হরণ না করা, শৌচ—মৃত্তিকা-জলাদি দ্বারা দেহ-শোধন এবং চিত্ত-বিশুদ্ধিরূপ অভ্যন্তর-শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করা, ধী—শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞান—অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র সকলের অনুশীলন ও বিচার দ্বারা বস্তু-তত্ত্ব নির্ণয় করা, বিদ্যা—আত্মজ্ঞান—অর্থাৎ দেহাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ জানা এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করা, সত্য—যথার্থ জ্ঞাপন অক্রোধ—ক্রোধের কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করা, ধর্ম্মের এই দশবিধ লক্ষণ। (১)

---

*কলিকাতায় হিন্দু-পত্রিকার মুদ্রণকালে এই অংশটুকু হারাইয়া গিয়াছিল এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এই পূর্ব্বাপলুপ্ত অংশটি লেখক মহাশয়ের অনুগ্রহে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ায় এবার প্রকাশিত হইল। (হিঃ সঃ)

(১) অন্যান্য শাস্ত্রেও ধর্ম্মের লক্ষণ এই প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয়সংযমঃ।
অহিংসা গুরুশুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভশূন্যত্বং দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনং।
অনভ্যসূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে।" (বিষ্ণু সংহিতা)

"অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দয়া দমঃ ক্ষান্তিঃ সর্ব্বেষাং ধর্ম্ম-সাধনং॥
শ্রুতিঃস্মৃতিঃসদাচারঃ স্বস্যচপ্রিয়মাত্মনঃ।
সম্যক্ সঙ্কল্পজঃ কামোধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং"॥ (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

"পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনং।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্‌বিধং ধর্ম্মলক্ষণং" ॥
(পদ্মপুরাণ)

সৎপাত্রে দান, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে মতি, মাতা-পিতার সেবা-শুশ্রূষা, শ্রদ্ধা—শাস্ত্রে এবং গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, বলি—দেবোদ্দেশে পূজোপহার প্রদান এবং ভূতযজ্ঞ—অর্থাৎ প্রাণিগণকে খাদ্যাদি দান, এবং গোগ্রাস—গো-সেবা—গো-গ্রাসাদি দান, এই ছয়টি ধর্ম্মের লক্ষণ। বর্ত্তমান সময়ে গৃহস্থ মাত্রেই সামান্যরূপ যত্ন ও অভ্যাস করিলেই পদ্মপুরাণোক্ত এই অনুত্তম ধর্ম্মটী প্রতিপালন করিতে পারেন (১)

শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।

(১)

ইজ্যাচার দমাহিংসা দান স্বাধ্যায়কর্ম্মণাং।"
অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং ॥
(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)

যাগ-যজ্ঞ, সদাচার, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা, দান এবং বেদাভ্যাস, এই সকল কার্য্যের নাম ধর্ম্ম, কিন্তু এ সকল কর্ম্ম অপেক্ষা যোগ—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধ দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার করাই পরম ধর্ম্ম। ইহা যোগীর কথা।

২।

"সবৈপুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মাসুপ্রসীদতি" ॥
(ভাগবত)

যে ধর্ম্ম হইতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধি-রহিতা) অপ্রতিহতা (শুষ্কতর্কাদিরূপ বিঘ্ন দ্বারা অনভিভূতা) ভক্তি জন্মে, সেই ধর্ম্মই পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; এই ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই আত্মা প্রসন্ন হয়। ইহা ভক্তের কথা।

সুখং বাঞ্ছন্তি সর্ব্বেহি তচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্ণৈঃ প্রযত্নতঃ ॥
(দক্ষসংহিতা)

"ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্রৈব নাস্তিসংশয়ঃ" ॥
(শুক্রনীতি)

মনুষ্য মাত্রেই সুখের অভিলাষ করিয়া থাকে; সুখ ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; অতএব কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, সকলেরই সর্ব্বদা প্রযত্ন সহকারে সুখ মূল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যদ্যপি কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি অনুসারে চেষ্টা করিয়াও ধর্ম্ম-কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি তৎকর্ম্মের পুণ্যলাভ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৮)—সংসারের মূল কি? গুরুর উত্তর—চিন্তা (১)

চিন্তা দুই প্রকার,—এক—জড়-জগতের চিন্তা বা বিষয়-চিন্তা, আর—অধ্যাত্মচিন্তা বা ভগবানের চিন্তা। সাংসারিক চিন্তাই জীবের জনন-মরণরূপ সংসৃতির কারণ; আধ্যাত্মিক চিন্তা বা ঈশ্বর-চিন্তা সংসার-

"সত্যং দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবং।
জ্ঞানং শমো দয়া দানমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ" ॥
(গরুড় পুরাণ)

(১) সময়ান্তরে ধর্ম্মের এই ষড়্‌বিধ লক্ষণের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

(১) সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন,—
"মনে করি গৃহ ছাড়ি, থাকবো না আর এমন দেশে
(ভাতে) কুলালচক্রে ভ্রমাইল চিন্তারাম চাপরাসী এসে

নিবৃত্তির বা মুক্তির কারণ। কেননা—
"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃ কুতঃ।"

যে ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় মগ্ন থাকে, সে ব্যক্তি চিন্তামণির চিন্তা—অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদ ভগবানের চিন্তা কি প্রকারে করিবে? অবিরত যাহার মস্তক কম্পিত হয়, সে ব্যক্তি কি শিরোমণি ধারণ করিতে পারে?

অর্থেহবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমোযথা"॥
(ভাগবত)

কপিলদেব দেবহুতিকে বলিতেছেন—মা! সংসারের অর্থ সকল বস্তুতঃ মিথ্যা; এ প্রযুক্ত তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও সংসার নিবৃত্ত হয় না। স্বপ্নে যেমন বস্তু সকল বাস্তবিক অবিদ্যমান হইলেও বিদ্যমান বোধ হয়, সেইরূপ বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে (১) এই সংসার অবাস্তব হইয়াও বাস্তববৎ উপস্থিত থাকে; সুতরাং সাংসারিক বিষয়-চিন্তাপরায়ণ পুরুষের সংসারত্বপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী; কেন না—

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্ দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ স্বরূপতাং॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাংতেন প্রবেশিতঃ॥
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্"॥
(ভাগবত)

দেহী ব্যক্তি স্নেহ দ্বারাই হউক বা দ্বেষ বশতঃই হউক, আর ভয় জন্যই হউক, যে যে বস্তুতে সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির সহিত একাগ্ররূপে মন ধারণ করেন, তাহার তাদৃশরূপপ্রাপ্তি হয়। যেমন পেশস্কৃত কীট—অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্ত্তৃক তৈলপায়িকা (আরসুলা) ধৃত ও গর্ত্তমধ্যে নীত হইয়া ভয়ে তাহার রূপ ধ্যান করতঃ পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। (১)

তাই নিখিল মঙ্গলালয় করুণানিধান ভবকর্ণধার ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথং।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতং"॥
(ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

যে ব্যক্তি বিষয় চিন্তা করে, তাহার মন বিষয়েতেই সমাসক্ত হয়, আর যে ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করে, তাহার মন আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়; অতএব স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায় অসৎচিন্তা পরিহার করিয়া, আমার ভজনা দ্বারা শোধিত অন্তঃকরণকে আমাতেই সমাহিত কর। (২)

কস্তাংত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তাং,
ঋতে পশূনসতীং নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যঞ্জনং পতিতং বৈতরণ্যাং, (৩)
স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপাঞ্জুষাণং॥

(১) "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"॥
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)

(১) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্যচ।"
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

(২) "ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"
"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।"
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
(গীতা—শ্রীকৃষ্ণ বাক্য)

(৩) "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।"

মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—হে মহারাজ! মনুষ্য সকল যমপুরীর দ্বারস্থিতা ভীষণা বৈতরণী নদীর তুল্য এই ঘোর সংসারে পতিত হইয়া, নিজ কর্ম্ম জন্য নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, ইহা দেখিয়াও পশুর তুল্য কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি (অমৃতময়ী) ভগবচ্চিন্তাকে অনাদর করিয়া অত্যন্ত অসৎ বিষয়-চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়?

"অত এব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।"
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ—বিরক্ত্যা'চ নয়েদ্বশং॥"
(ভাগবত)

বিষয়-চিন্তাই সমস্ত অনর্থের হেতু; অতএব সংসার-নিস্তারার্থী মানব অসৎপথে প্রসক্ত—অর্থাৎ সাংসারিক বিষয়-চিন্তায় নিরত মনকে সুদৃঢ় ভক্তি-যোগ ও বৈরাগ্য দ্বারা আত্মবশে আনয়ন করিবেন। মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভগবানের অভয়-চরণারবিন্দে সমর্পণ করিবার চেষ্টা করাই সংসার-মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য (১)

(১) রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥
অন্যান্য ভক্তগণ বলিয়াছেন,—
"যা চিন্তা ভুবি পুত্র পৌত্র-ভরণ-ব্যাপার সম্ভাষণে,
যা চিন্তা ধন-ধান্য-ভোগ যশসাং লাভে সদা জায়তে।
সা চিন্তা যদি নন্দ-নন্দন-পদদ্বন্দ্বারবিন্দে ক্ষণং।
কা চিন্তা যমরাজ ভীম-সদন-দ্বার-প্রয়াণে প্রভো"।
"রে চিত্ত! চিন্তয় চিরং চরণৌ মুরারেঃ
পারং গমিষ্যতি যতো ভব-সাগরস্য।
পুত্রাঃকলত্রমিতরে নহি তে সহায়াঃ,
সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃগতৃষ্ণিকেব॥"

ঈশ্বর-চিন্তন।

"স্তুতিঃ স্মরণ পূজাদি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
সুনিশ্চলা হরৌ ভক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং"॥
(গরুড় পুরাণ)

স্তব, নাম স্মরণ, পূজাদি, এবং কায়-মনোবাক্যে ও কর্ম্মে হরিতে যে অচলা ভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বর-চিন্তন বলা যায়।

ঈশ্বর-চিন্তনের ফল।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥
(গীতা)

"যিনি অনন্যচিত্তে নিত্য আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য, সুতরাং তত্তৎলোকগত জীবের পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে, জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না"।

(শ্রীকৃষ্ণ-সম্বোধনে—)

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণী চ পদ্মা,
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীর-বামনয়না হৃতমানসায়,
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥

হে যদুপতি! রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসভবন, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং কমলা তোমার গৃহিণী, তুমি নিজে পুরুষোত্তম; অতএব তোমাকে দিবার উপযুক্ত কি আছে? তবে শুনিয়াছি, প্রেমময়ী গোপ-রামাগণ নাকি তোমার মনটীকে হরণ করিয়াছে; তাই এক্ষণে আমি হৃত-চিত্ত তোমাকে আমার চিত্তটি অর্পণ করিতেছি; হে প্রেমবশ্যগোপীজন-বল্লভ! কৃপা করিয়া তুমি ইহা গ্রহণ কর।

ঈশ্বরচিন্তকের পক্ষে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।

"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ।
যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে"॥
(ভক্ত-বাক্য)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং"॥
(গীতা)

ভগবানের সেবকগণ অন্ন-বস্ত্রের জন্য বৃথা চিন্তা করিয়া থাকেন। কারণ বিশ্বম্ভর হরি কিরূপে তাঁহার ভক্তগণকে উপেক্ষা করিবেন? ভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন—যে সকল ব্যক্তি মদেকপ্রয়োজন ও মচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া কেবল আমারই উপাসনা করে, প্রার্থনা না থাকিলেও সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠ সেই ভক্তগণের "যোগক্ষেম" (যোগ-ধনাদিলাভ বা অন্নাদির আহরণ এবং ক্ষেম—তৎপালন বা সংরক্ষণ) আমি নিজেই বহন করি। (১)

"লোকদ্বয়মখিলং দুঃখং চিন্তয়োজ্‌ঝিতয়োজ্‌ঝতি।
তৃষ্ণাবিসূচিকামন্ত্রশ্চিন্তাত্যাগোহি কথ্যতে"॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

যে বিষয়-তৃষ্ণা বশতঃ জীব দেহ ধারণ করিয়া সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ দ্বারা পীড্যমান হয়, চিন্তা পরিত্যাগই সেই বিষয়-বাসনারূপ বিসূচিকা রোগের মহৌষধ। অতএব চিন্তা পরিত্যাগ (১) করিলেই মনুষ্যের সর্ব্ব শান্তি লাভ হয়।

চিন্তা ত্যাগের উপায়।

"তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাং
আত্মনো ভাবয়েৎ তদ্বৎ মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশং॥"

নিরন্তর পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা দ্বারা অসৎ-চিন্তা দূরীকৃত হয়, এইজন্য বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই আত্মার দেহাতিরিক্ততা চিন্তা করিতে থাকিবেন এবং জগতের অনিত্যতা আলোচনা করিবেন।

"কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটি-সুকৃতৈর্নলভ্যতে॥"

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা-মতি অতীব দুর্ল্লভা। উহা কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতি দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একমাত্র লোলতা (সাকাঙ্ক্ষতা বা প্রাপ্তির নিমিত্ত ঔৎসুক্যই) উহার মূল্য। অতএব বিষয়-প্রাপ্তি-লালসা পরিত্যাগ করিয়া, ভগবানের পাদপদ্ম লাভের আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ে পোষণ করাই তাঁহার প্রতি চিত্ত স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায়। (২) (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(১) ভক্তমাল গ্রন্থে পুরুষোত্তম নিবাসী অর্জ্জুন মিশ্র নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর আখ্যান পাঠ করিলে, ভক্তের প্রতি ভক্ত-বৎসল ভগবানের ঈদৃশ অনুগ্রহের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১) "সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ. উচ্যতে।"

(২) তাবস্তবতু মে দুঃখং চিন্তা-সাগর-সঙ্গমে।
যাবৎকমলপত্রাক্ষং ন স্মরামি জনার্দ্দনং॥
(পাণ্ডবগীতা)

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

যাহার যে ধর্ম্ম, সে তদ্ধর্ম্মেতর কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ। "কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে" কার্য্য কারণ গুণের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃগুদ্দেশ্য-মূলক কর্ম্মের ফল সেই সেই অভীপ্সিত বিষয়ই হইতে পারে; মোক্ষ সাধন তাহাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। ৯

অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে; একদা এক ব্যক্তি উভয়ানুষ্ঠানে অশক্ত, ইহাই বক্ষ্যমাণ শ্লোকের বক্তব্য বিষয়।

১০—অর্থী দক্ষো দ্বিজোঽহংবুধ ইতিমতিমান্
কর্ম্মসূক্তাধিকারী।
শান্তোদান্তঃ পরিব্রাড়ুপরমপরমো
ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী।
ইত্থং ভেদে বিবক্ষন্ সমুদিতমুভয়ং
মুক্তিহেতুং সুশীতং
নীরং বৈশ্বানরং চোভয়মহহতৃষো-
চ্ছেদকামঃ পিবেৎ সঃ॥ ১০

অন্বয়—"অহম্" আমি, "অর্থী" ধনবান্, "দক্ষঃ", সমর্থ, "দ্বিজঃ" বিপ্র, "বুধঃ" পণ্ডিত, "ইতি" এবম্প্রকার, "মতিমান্" অভিমানী, "কর্ম্মসু" কর্ম্মকাণ্ডে, "উক্তাধিকারী" মীমাংসা-শাস্ত্রানুসারে অধিকারবান্। "শান্তঃ" রাগাদিহীন, "দান্তঃ" বশীকৃত বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়, "উপরমপরম" দেহধারণাতিরিক্ত-ব্যাপার-নিবৃত্তিশীল, "পরিব্রাট্" সন্ন্যাসী, "ব্রহ্মবিদ্যাধিকারী" বেদান্তানুসারে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে অধিকারবান্। "ইত্থং" এই প্রকারে "ভেদে সতি" কর্ম্ম এবং জ্ঞানের অধিকারিবৃন্দের ভেদ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি, "সমুদিতং" অধিকারিভেদে সম্যক্‌প্রকারে নির্ণীত, "উভয়ম্" জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়কেই, "মুক্তিহেতুম্" যুগপৎ মুক্তির হেতু বলিতে ইচ্ছা করেন, "সঃ" তিনি, "অহহ" আহা যেন, "তৃষোচ্ছেদ কামঃ" তৃষ্ণা-পরিহার-মানসে "সুশীতং" সুশীতল, "নীরম্" জল, "চ" এবং "বৈশ্বানরং" অগ্নি, এতদুভয়কেই "পিবেৎ"—অধঃকৃত করিতে উদ্যত হয়েন।

ব্যাখ্যা—অধিকারিভেদে জ্ঞান এবং কার্য্যের ব্যবস্থা আছে; এক ব্যক্তি কখনও এক সময়েই জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারেন না; কেন না, যিনি জ্ঞানের অধিকারী, তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে; প্রত্যুত যিনি কর্ম্মানুশীলনতৎপর, তাঁহার জ্ঞানপরিচর্য্যার অধিকার অতীব দূরবর্ত্তী; সুতরাং যুগপৎ একাধারে জ্ঞান এবং কর্ম্মের অধিকারিতা অসম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ জ্ঞান এবং কর্ম্ম (৮ম শ্লোক) উভয়কেই একদা অনুষ্ঠানীয় বলিয়াছেন, তাই পণ্ডিত সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহাদিগের মত নিরাস করিতেছেন। মীমাংসা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যে সমুদয় ব্যক্তির "আমি ধনাঢ্য, আমি কার্য্যক্ষম, আমি বিপ্র, আমি পণ্ডিত" এই প্রকার অভিমান আছে, তাহারাই কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারী; কেননা কর্ম্মানুষ্ঠানই অভিমানরূপ মত্ত ঐরাবতের একমাত্র অমোঘ অঙ্কুশ। জীব তাবৎকাল পর্য্যন্তই অহঙ্কৃত থাকে, যাবৎ না কর্ম্মক্ষেত্ররূপ নিকষোপলে তাহার অহঙ্কারের পরীক্ষা হয়। পুনশ্চ, কর্ম্মানুশীলনে উদ্দাম-প্রবৃত্তি ক্রমশঃ কোমল অপেক্ষাও কোমলতর হইয়া আইসে; হৃদয়ের দৃপ্তভাব দূরীভূত হয়, রুক্ষ শ্মশানে ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ উদ্যান-মাধুরী ক্রীড়া করিতে থাকে।

সুতরাং বিষয়াভিমানী ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয়; কিন্তু অন্যের পক্ষে, অর্থাৎ তাদৃগভিমানবিহীন জিতাত্মাদিগের পক্ষে নয়। আবার বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা রাগদ্বেষবিযুক্ত, জিতেন্দ্রিয়, নিয়ত যোগরত, নিবৃত্তিশীল এবং সন্ন্যাসী, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী; অর্থাৎ রাগাদিপরবশতা, ইন্দ্রিয়পরতা, সম্পৃহতা ও অত্যাগসহনশীলতা, এ সমস্তই ভগবচ্চিন্তার অন্তরায়; সুতরাং এ সকল দুশ্ছেদ্য বাগুরাবর্ত্ত হইতে যাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী; অতএব মীমাংসা এবং বেদান্ত, এই উভয় গ্রন্থানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এতদুভয় যুগপৎ একজনের দ্বারা কদাপিও সাধিত হইতে পারে না। কর্ম্মের অনুশীলনা করিতে২ জ্ঞান আপনিই আসিয়া দেখা দেয়; কর্ম্মপরিচর্য্যার পূর্ব্বে জ্ঞান-প্রাপ্তির আশা উদ্ভ্রান্ত চিত্তের আকাশ-কুসুম-কল্পনাবৎ! অতএব এতাদৃশ অধিকার-ভেদ থাকা সত্ত্বেও, যাঁহারা জ্ঞান এবং কর্ম্ম, এই উভয়ের যুগপদনুষ্ঠানকে মুক্তি-হেতু নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মী অধিকারীদ্বয়কে একাধিকারে সন্নিবিষ্ট করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদের পক্ষে, তৃষ্ণা দূর করিতে যাইয়া সুশীতল জল এবং জাজ্বল্যমান অনল, এতদুভয়কে যুগপৎ গ্রহণ করিতে উদ্যত হওয়া অসম্ভব নয়। কেন না— কর্ম্ম ও কর্ম্মের অধিকারী এবং জ্ঞান ও জ্ঞানের অধিকারী, এতদুভয়ের ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ কর্ম্মযোগীর যে সমুদয় বিষয় নিত্যানুষ্ঠেয়, জ্ঞান-যোগীর সে সকল অবশ্য প্রবিহর্ত্তব্য। সুতরাং একজনের পক্ষে একদা জ্ঞান এবং কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

জ্ঞানং চাপ্যদ্বিতীয়স্বরস-সুখ-ঘনা-
নন্তচিন্মাত্ররূপ-
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধঃ স ভবতি সুমতে-
স্তত্ত্বমস্যাদি বাক্যাৎ।
দেহাদ্যধ্যাস দার্ঢ্যাচ্ছ্রুতমপি সহসা
নৈব সংভাবনীয়ং
ব্রহ্মত্বং স্বস্য তস্মাৎ নয়-গুরুবচনৈঃ
সাধু মীমাংসনীয়ং॥ ১১

অন্বয়ঃ— জ্ঞানং চ অপি অদ্বিতীয় স্বরস-সুখ-ঘনানন্ত-চিন্মাত্র রূপ ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-বোধঃ। স সুমতেঃ তত্ত্বমসি আদি বাক্যাৎ ভবতি। শ্রুতং অপি স্বস্য ব্রহ্মত্বং দেহাদ্যধ্যাসদার্ঢ্যাৎ সহসা ন এব সম্ভাবনীয়ং। তস্মাৎ নয়গুরুবচনৈঃ সাধু যথাস্যাৎ তথা মীমাংসনীয়ং জ্ঞানানুসন্ধিৎসুভিরিতিশেষঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পূর্ব্বকথিতমোক্ষ-সাধনং জ্ঞানং কিংস্বরূপমিত্যত আহ—জ্ঞান চ সর্ব্বভেদরহিতং স্বয়ংসারভূতং নিরবচ্ছিন্ন সুখাত্মকং সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্যং চৈতন্যস্বরূপং তথা ব্রহ্মণঃ আত্মনশ্চ অভেদানুভাবকং ভবতি। এতাদৃশং উদার-গুণ-লক্ষণং জ্ঞানং, শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিনা পরিসংস্কৃতবুদ্ধেঃ মুখ্যাধিকারিণঃ পুরুষস্য॥ তৎ ত্বম্ অসি॥ ইত্যাদি বাক্যালোচনয়া এব উৎপদ্যতে। নতু উপায়ান্তরেণ। যেন প্রাক্তন-পুণ্যবশাৎ স্বয়মেব আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞায়তে; অলং তস্য শ্রবণ-মননাদিনা ইতি ন বক্তব্যং, যতঃ আত্মনঃ ব্রহ্মত্বং জ্ঞাতমপি—দেহপুত্রাদিষু অহন্তামমতারূপ তাদাত্ম্যাধ্যাসস্য অপরিহার্য্যত্বাৎ, জ্ঞানবদ্ভিরপি সর্ব্বৈরেব তৎ সম্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ঙ্গমীকর্ত্তুং ন শক্যতে। তস্মাৎ হেতোঃ যুক্তিভিঃ গুরূণাং উপদেশৈশ্চ

আত্মনঃ ব্রহ্মাত্মত্বম্ নিশ্চয়ং যাবৎ বিচারণীয়ং জ্ঞানলিপ্সুভিঃ।

ব্যাখ্যা— পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, অধুনা সেই জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন; যাহাতে কোন প্রকার ভেদ-কল্পনা নাই, অর্থাৎ কি দ্বেষ্য, কি সম্মত, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, সর্ব্বত্রই যাহা সমাবস্থ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা নিজে নিজেই পরিতৃপ্ত, শতশত প্রতিকূল যুক্তিতেও অবিচলিত, যাহা অসীম সুখের আকর এবং চিরকাল অভ্রান্ত, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহা সর্ব্বপরিচ্ছেদশূন্য এবং চৈতন্য-স্বরূপ, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যাহাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জানা যায়, অর্থাৎ যাহাতে ব্রহ্মের সহিত আত্মা মিলিত—একীভূত হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃতজ্ঞান। যাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মের সহিত আত্মার একীভাব চিন্তা করিতে করিতে পরিশুদ্ধমতি হইয়াছেন, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ অধিকারীগণই এতাদৃশ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন; আত্ম-চিন্তাবিহীনগণের পক্ষে এই জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ। যদিও একটু নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিলে, এই অনিত্য সংসার ও অনিত্য পদার্থনিচয় যে সেই নিত্য পদার্থ হইতে অভিন্ন, এই প্রকার প্রতীতি জন্মে, কিন্তু সেই প্রতীতি বুদ্‌বুদ্ অপেক্ষাও ক্ষণস্থায়িনী; কেননা এই বিনশ্বর দেহ এবং বিনশ্বর পুত্র-কলত্রাদিতে আমাদের মমতা-মোহে অবিনশ্বরতা-বুদ্ধি এতই প্রবল—এতই অপরিহার্য্য যে, আমরা যতই একত্ব চিন্তা করি না কেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে পারি না। মিথ্যাভূত সংসারের অনস্তিত্ব-বোধ কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না। অতএব জ্ঞানলিপ্সু-গণের পক্ষে এই প্রকার অযথা সংস্কার তিরোহিত করিবার জন্য শাস্ত্র এবং তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে মীমাংসা করা একান্ত বিধেয়।

দেহং কেঽপি বদন্তি স্বানি তু পরে
প্রাণান্ মনশ্চাপরে।
বুদ্ধিং চ ক্ষণিকাং স্থিরামথ পরে
কেচিৎ চিতং নিঃসুখাম্।
আত্মানং জড়চিৎস্বভাবমপরে
চিদ্বজ্জড়ং চেতরে।
সত্য-জ্ঞানসুখাদ্বিতীয়মপরে
তত্রাস্য কো নিশ্চয়ঃ? ১২

অন্বয়ঃ—কেঽপি চার্ব্বাকা দেহং স্বানি তু (চ) আত্মানং বদন্তি, পরে কেচন প্রাণান্ আত্মানং বদন্তি, অপরে কে কে পণ্ডিতাঃ মনঃ আত্মানং বদন্তি, বৈনাশিকাঃ ক্ষণিকাং বুদ্ধিং চ আত্মানং বদন্তি, অথ—অন্যে সাংখ্য-পাতঞ্জলাদয়ঃ—নিঃসুখাং চিতং আত্মানং বদন্তি, অপরে—ভাট্টাঃ জড়চিৎস্বভাবং আত্মানং বদন্তি, ইতরে নৈয়ায়িকাদয়ঃ চিদ্বজ্জড়ং আত্মানং বদন্তি, অপরে বেদান্তিনঃ সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং আত্মানং বদন্তি, তত্র অস্য জিজ্ঞাসোঃ কো নিশ্চয়ঃ?—নকোঽপি, ইত্যর্থঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—সুগমং।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—স্বানি—ইন্দ্রিয় সকল। ক্ষণিকাং—ক্ষণস্থায়িনী। জড়-চিৎস্বভাবং—জড় এবং চৈতন্যের স্বভাবকে। চিদ্বজ্জড়ম্—চৈতন্যযুক্ত গুণাদিবিশিষ্ট জড় দ্রব্যকে। সত্যজ্ঞানসুখাদ্বিতীয়ং—সচ্চিদানন্দরূপ এবং অদ্বিতীয়। অত্র—এই সকল মত-বিভেদ সত্ত্বে। অস্য—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির।

ব্যাখ্যা—চার্ব্বাকগণ দেহ এবং ইন্দ্রিয়

সমূহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া থাকেন। দেহাবসানে আত্মারও অবসান হয়, অতএব দেহের—অর্থাৎ দেহের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি বিধানই আত্মার পরিতৃপ্তি, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য মত, এবং এই জন্যই নশ্বর দেহাভিমানী চার্ব্বাক্‌গণ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" এই মত অবলম্বন করিয়া দৈহিক ব্যাপার সাধনেই আত্ম-তৃপ্তিলাভ মনে করিয়া থাকেন। অন্য কোন কোন পণ্ডিত প্রাণকে আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং কেহ২ সূক্ষ্ম মনকে আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। বিনাশবাদী পণ্ডিতসমূহের মতে ক্ষণস্থায়িনী বুদ্ধি এবং ভাস্করাদির মতে স্থিরা বুদ্ধিই আত্মা। সাংখ্য-পাতঞ্জলীয় পণ্ডিতবৃন্দ সুখ-দুঃখাদি-সঙ্গশূন্য চিন্মাত্রকে এবং ভাট্টমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ চৈতন্য ও জড়ের স্বভাবকে আত্মা বলিয়া থাকেন। প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণের মতে চিদ্‌যুক্ত অর্থাৎ চৈতন্যবিশিষ্ট জ্ঞান ও গুণাদিযুক্ত জড়দ্রব্যরূপই আত্মা; বৈদান্তিকবৃন্দ বলেন যে, আত্মা নির্ব্বিশেষ এবং নিত্য-জ্ঞানানন্দস্বরূপ। একই আত্মনিরূপণে এতাদৃশ মত-পার্থক্য থাকায়, আত্মতত্ত্ব-লিপ্সুর আত্মবিষয়ক কোন জ্ঞান লাভেরই সম্ভাবনা নাই; কেননা আত্মার স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কিছুই স্থিরীকৃত হয় নাই।

আহুঃ কেচিদণুং শরীরসদৃশং
কেচিদ্বিভুং তং পরে।
তে তং মানসগোচরং তদপরে
নিত্যানুমেয়ং জগুঃ।
অন্যে চিদ্বিষয়ং পরে তু পরম-
স্বজ্যোতিরাভ্যন্তরম্
সত্যেবম্ শ্রুতিযুক্তিভির্বিবিদিষো
র্যুক্তোবিচারো মুহুঃ॥ ১৩।

অন্বয়——কেচিৎ—পাশুপত পাঞ্চরাত্রাদ্যাগমজ্ঞাঃ, তম্ (আত্মানম্) অণুং আহুঃ। কেচিৎ আর্হন্তাদয়ঃ তম্ আত্মানং শরীরসদৃশং আহুঃ। পরে (নৈয়ায়িকাদয়ঃ) তম্ আত্মানং বিভুং আহুঃ। তে—(উক্তা ত্রয়ঃ বাদিনঃ) তম্ আত্মানং মানসগোচরং জগুঃ, তদপরে—(সাঙ্খ্যাদয়ঃ) নিত্যানুমেয়ং জগুঃ, অন্যে (বৈনাশিকাঃ) তম্ আত্মানং চিদ্বিষয়ং জগুঃ, অপরে (বেদান্তিনঃ) তম্ আত্মানং আভ্যন্তরং পরমস্বজ্যোতিঃ জগুঃ, এবম্ সতি বিবিদিষোঃ শ্রুতিযুক্তিভিঃ মুহুঃ বিচারঃ যুক্তঃ।

পদপরিবর্ত্তনং—পাশুপত পাঞ্চরাত্র প্রভৃতয়ঃ আগমবিশারদাঃ পূর্ব্ববর্ণিতং আত্মানং পরমাণু পরিমাণং, আর্হন্তাদয়ঃ দেহপরিমাণং, নৈয়ায়িকাদয়ঃ ব্যাপকং চ বদন্তি, অতস্তেষাং মতিত্রয়সম্পন্নানাং মতানুসারেণ আত্মনঃ মানসপ্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বং তৈরেব স্বীকৃতং, তেভ্যোঽপরে সাঙ্খ্যাদয়ঃ তমেব আত্মানং, বিষয়বিকাশাদিনা কেবলম্ অনুমান-সাধ্যং, বৈনাশিকাঃ বৃত্তি-জ্ঞান-প্রকাশ্যং, বৈদান্তিকাশ্চ পঞ্চকোষেভ্যোঽপি অন্তস্থম্ সর্ব্বপ্রকাশোৎকৃষ্ট-স্বয়ং-প্রকাশং চ কথয়ন্তিস্ম। এবম্প্রকারেণ মতভেদে সতি আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুনা সাক্ষাৎকারং যাবৎ বেদমার্গ-প্রহিতেন চেতসা যুক্ত্যাচ, আত্ম-বিষয়কং বিচারণং কর্ত্তব্যমেব। নতু জিগীষয়া।

ব্যাখ্যা—আত্মাকে, পাশুপত-পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি আগমজ্ঞ পণ্ডিতগণ পরমাণু-পরিমিত, আর্হন্তাদি দেহ-পরিমিত, এবং নৈয়ায়িকগণ ব্যাপক বলিয়া থাকেন।

তাঁহাদের মতে আত্মা মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত। আবার সাংখ্যাদির মতে, বিষয়-বিকাশাদি দ্বারা আত্মা কেবল অনুমানগম্য ও ক্ষণিক-বাদিবৃন্দের মতে আত্মা জ্ঞান-গম্য। ইঁহারা অনুমান এবং জ্ঞানের দ্বারাই আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন। পরন্তু বৈদান্তিকগণ বলেন যে, পঞ্চকোষ হইতেও অন্তরস্থ সর্ব্বপ্রকাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বপ্রকাশ জ্যোতিই আত্মা। অতএব এই প্রকার এক আত্মার সম্বন্ধেই যখন এত মতভেদ, তখন শ্রুতি যুক্তির অনুসরণ করিয়া, যত কাল আত্মজ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিচার করা আত্মজিজ্ঞাসুর অবশ্যকর্ত্তব্য।

এবং বিশ্বস্য হেতুং প্রকৃতিমভিদধুঃ
কেঽপি কেচিৎ পরাণূন্।
নীশেনাধিষ্ঠিতাংস্তান্ কতিচন কতিচিৎ
নশ্বর-জ্ঞানমেব।
অন্যে শূন্যং স্বভাবং কতিচন সময়ং
কেঽপি কেচিদ্যদৃচ্ছাং।
কর্ম্মান্যে ব্রহ্মমায়াশবলিতমপরে
সোঽপি তস্মাদ্বিমৃশ্যঃ॥ ১৪।

অন্বয়ঃ—আত্মবিষয়বৎ ঈশ্বরবিষয়েঽপি মতভেদান্ দর্শয়তি—এবমিতি—এবং কেঽপি (কাপিলাঃ) প্রকৃতিং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কেচিৎ—(বৈনাশিকা—আর্হন্তাশ্চ) পরাণূন্ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (পাতঞ্জলাঃ—কণাদ-গৌতমীয়াশ্চ) ঈশেন অধিষ্ঠিতান্ তান্ (প্রকৃতিং পরমাণূংশ্চ) বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচিৎ (বিজ্ঞানবাদিনঃ) নশ্বরজ্ঞানং এব বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, অন্যে (মাধ্যমিকাঃ) শূন্যং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, কতিচন (লোকায়তিকাঃ) স্বভাবং বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ। কেঽপি (মৌহূর্ত্তিকাঃ) সময়ং বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, কেচিৎ যদৃচ্ছাম্ বিশ্বস্য হেতুম্ অভিদধুঃ, অন্যে (মীমাংসকাঃ) কর্ম্ম, অপিচ অপরে (বেদান্তিনঃ) মায়াশবলিতং ব্রহ্ম চ বিশ্বস্য হেতুং অভিদধুঃ, তস্মাৎ সঃ বিশ্বহেতুরীশ্বরোঽপি বিমৃশ্যঃ জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ।

বিষমপদ ব্যখ্যা—ঈশেন অধিষ্ঠিতান্—ঈশ্বরেণ প্রেরিতান্—। ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত, অর্থাৎ ঐশী-শক্তি-পরিচালিত।

তান্—প্রকৃতিং—পরমাণূংশ্চ। "সা" প্রকৃতিশ্চ, "তে" পরমাণবশ্চ—ইতি তে, একশেষঃ। ঐশীশক্তি-পরিচালিত প্রকৃতি এবং পরমাণুনিবহকে।

মায়াশবলিতম্—মায়য়া বিচিত্রভাবমাপন্নমানং অতথাভূতে তথাভূত-প্রকল্পকং ইতি যাবৎ—। মায়াবশে বিবিধ ভাবাপন্ন।

ব্যাখ্যা—জীবাত্মা সম্বন্ধে যে প্রকার মতভেদ দর্শিত হইল, সেই প্রকার ঈশ্বর সম্বন্ধেও বহুবিধ মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা মহাত্মা কপিল বলেন যে, প্রধানা প্রকৃতিই বিশ্বের উপাদান-কারণ; প্রকৃতি ব্যতীত বিশ্বসৃষ্টি অসম্ভব। বৈনাশিক এবং আর্হন্তগণের মতে পরমাণুই জগতের হেতু, বিশ্বসৃষ্টির নিদান। পতঞ্জল, কণাদ ও গৌতমের মতানুসারে প্রকৃতি এবং পরমাণু-নিবহ হইতে জগতের উৎপত্তি। বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, ক্ষণিক জ্ঞানই বিশ্বোৎপাদনের হেতু। মাধ্যমিকগণের মতে শূন্যই জগতের মূলীভূত কারণ। মৌহূর্ত্তিকবৃন্দ বলেন—বিশ্বোৎপত্তির একমাত্র হেতু কাল। অন্য কোন কোন পণ্ডিতগণের মতানুসারে যদৃচ্ছা, অর্থাৎ—আকস্মিকত্ব জগদুৎপাদনের মূল কারণ। মীমাংসকগণ বলেন যে, কর্ম্মই বিশ্বের নিদান, বৈদান্তিকবৃন্দের মতে মায়া বশতঃ বিচিত্রভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্ম হইতেই

এই নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধেও যখন এতাদৃশ মতভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন তত্ত্বলিপ্সুর পক্ষে ন্যায়ানুসারে বিচার করিয়া সন্দেহ দূর করাই একান্ত বিধেয়।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

অশন-সূক্তম্।

শিষ্য—। কিমাশ্যম্?

অর্থ—হে গুরো! খাদ্য কি?

গুরু——

১। তদেবাশ্যং যদ্ দেহমনসোঃ সুপথ্যম্।

অর্থ—হে শিষ্য! যাহা দেহ এবং মনের হিতকর, অর্থাৎ যদ্দ্বারা শরীর বলিষ্ঠ এবং নীরোগ হয়, যাহা চিত্তের প্রসন্নতা বিধান করে, এবং যাহাতে শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি আন্তরিক সদ্গুণ ও ধর্ম্ম-বুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাদৃশ আহার্য্যই গ্রহণ করা উচিত; তাহাই একমাত্র হিতকর খাদ্য।

ব্যাখ্যা—মহাজনগণ বলিয়াছেন—

ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদং।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন, ক্ষীয়তে রোগ সন্ততিঃ।
সম্মতির্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র-সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্যম্ প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥

যাহা শরীরের বলপ্রদ, চিত্তের পরিতোষবিধায়ক এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে দেহ পরিপুষ্টি লাভ করে, রোগরাশি দূরীভূত হয় এবং সৎপ্রবৃত্তি ও সদ্বুদ্ধি উপচিত হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য।

যাহাতে ইহজীবন এবং পরজীবনে সুখ লাভ হয়, তাহাই যত্ন সহকারে ভোজন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত লোকদ্বয়ের অসুখকর অন্যান্য যাবতীয় খাদ্যই আয়ুষ্কাম ব্যক্তি হলাহলের ন্যায় পরিবর্জ্জন করিবেন।

সাধারণতঃ শরীর রক্ষার জন্যই আহার; সেই আহারে যদি শরীরের কোন হিতসাধনই না হইল, তবে আর তাহার প্রয়োজন কি? এই সংসার-রঙ্গভূমিতে কত প্রকার অভিনেতা নিঃস্তর নানাবিধ অভিনয় করিতেছেন, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহাদের দেহ অনাময়, চিত্ত সুপ্রসন্ন এবং জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি ঐশী প্রভায় প্রতিভাত, তাঁহাদের অভিনয়ই সমধিক চমৎকারজনক! তাঁহাদের প্রয়োগ-বিজ্ঞান-প্রভাবেই অভিনয়স্থল আলোকিত হয়। তাই শিষ্যকে কর্ত্তব্য-উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, যাহাতে শরীর বলিষ্ঠ, এবং সর্ব্বসুখহারী রোগরাশি তিরোহিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য। যাহাতে মানসিক প্রসাদ পরিবর্দ্ধিত হয়, বীরত্ব-ধীরত্ব-দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি মানব-জীবনের আদর্শ-গুণনিচয় উপচিত হয়, তাহাই ভোক্তব্য—তাহাই সুপথ্য।

২। পরিহার্য্যমেতদ্বিরুদ্ধম্।

অর্থ—এই সমুদয় খাদ্যের বিরুদ্ধ—অর্থাৎ যাহাতে শরীর, মন বা ধর্ম্ম সমুন্নত না হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ণ—সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তাদৃশ খাদ্য ত্যাগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—আহারের সহিত শরীরের, মনের,

এবং ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সুসংহত। আহার্য্য-গুণ-ভেদেই জাতিভেদ—ধর্ম্মভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মহীন জীবন ও স্বাস্থ্যহীন দেহ অনন্ত দুঃখের আকর। অতএব যে সমুদয় খাদ্য, ধর্ম্মের, মনের বা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারে না, প্রত্যুত অজ্ঞাতসারে অবনতিই ঘটাইয়া থাকে, তাদৃশ ধর্ম্মহারক স্বাস্থ্যঘাতক খাদ্য কদাচ গ্রহণীয় নহে।

৩। দেশভেদাদ্ ব্যতিক্রমঃ।

অর্থ—দেশভেদে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে, যাহা শরীরের, মনের বা ধর্ম্মের উন্নতি-সাধক, তাহাই সুখাদ্য; কিন্তু দেশভেদে ইহার তারতম্য বুঝিতে হইবে। একদেশে যে দ্রব্য ভোজন করিলে শরীর স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয়, আবার হয়ত অন্যদেশে তাহা গ্রহণ করিলে, বুদ্ধির ক্ষয়, দেহের নাশ, এবং মনের দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে। অতএব প্রথমতঃ স্থানের প্রাকৃতিক ধর্ম্মনিরূপণ করিয়া, পশ্চাৎ খাদ্যাদির বিষয় স্থির করাই উচিত। শীত-প্রধান দেশের যাহা জীবনরক্ষক পুষ্টি-সাধক খাদ্য, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে তাহা বহু রোগের আকর, বহু হানিজনক। জলবায়ু-ভেদে আহার্য্য ভেদের বৈচিত্র্য প্রায়শঃই পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্যই শীত-প্রধান-দেশের উষ্ণ খাদ্য পলাণ্ডু প্রভৃতি গ্রীষ্ম-প্রধান অস্মদ্দেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার যাবতীয় খাদ্যাদির বিষয়েই একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব, আমাদের দেশে খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় নিষেধ বা বিধান পরিলক্ষিত হয়, ঐ সকল বিধি-নিষেধের অভ্যন্তরে শারীর বিজ্ঞানের অতি গুহ্যতম কারণ (যাহা শরীর রক্ষার নিতান্ত উপযোগী) নিহিত রহিয়াছে। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, বহুলদেশাভিজ্ঞতা ও প্রভূত ভূয়োদর্শিতা বলে আমাদের আহার্য্য সম্বন্ধে যে সমুদয় নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাহার প্রকৃত রহস্যের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সেই সকল কল্যাণকরী রীতি নীতির নিরর্থকতা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়া পণ্ডিতম্মন্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করি!

৪। বয়োভেদাচ্চ।

অর্থ—বয়ঃক্রম-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—বালকের যাহাতে ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, যুবকের পক্ষে তাহা অকিঞ্চিৎকর লঘুতম খাদ্য; আবার যুবক যাহা ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে সমর্থ, স্থবিরের পক্ষে তাহা অতীব গুরুভোজ্য, অত্যন্ত দুষ্পাচ্য, অতএব অখাদ্য। সুতরাং বয়ঃক্রমের পরিণতি বা অপরিণতির সহিত আহারের মাত্রা ও আহারীয় বস্তুর প্রভেদ এবং লঘু-কাঠিন্য সুদৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্ব স্ব পরিপাকশক্তি অনুসারেই আহার করা উচিত, ইহাই এই সূত্রের মুখ্য অর্থ।

৫। বিধেয় ভেদাৎ।

অর্থ—বিধেয়—অর্থাৎ কার্য্য-ভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে। যিনি যে কার্য্য করেন, যাঁহার যাহা ব্যবসায়, তাঁহার পক্ষে তদনুকূল আহারই বিধেয় এবং তদিতর বর্জ্জনীয়। যাহাদের যুদ্ধাদি করিতে হয়, বীরত্ব, উৎসাহশীলতা, বসবত্তা প্রভৃতি রাজসিকগুণের বর্দ্ধক মাংসাদি তাঁহাদের আহার্য্য। অন্যথা রজোগুণের নিত্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের প্রতি সংক্র-

মিত হইবে কি প্রকারে? আবার যাঁহার কুসুম-কোমল পরহিতরত অন্তঃকরণ সংসারের জটিল চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক নিরন্তর পরাৎপরের চরণ চিন্তনে অভিনিবিষ্ট, যাঁহার পর-দুঃখ-কাতর হৃদয় সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে দয়া-মমতার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া স্বর্গ-সুখ উপলব্ধি করিতে তৎপর, যাঁহার মানস 'প্রশান্ত জলধির' ন্যায় স্থির-গম্ভীর; বাসন্তী সন্ধ্যার ন্যায় বিবিধ সদ্বৃত্তি-সৌরভে আমোদিত এবং রাকা-রজনীর ন্যায় নির্ম্মল মৈত্রী কৌমুদী-প্রভায় আলোকিত, তাদৃশ পূর্ণসত্ত্বগুণাশ্রয়ী মহাত্মার আদর্শাভিমুখী যাঁহাদের সাধনা, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণাত্মক মাংসাদি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি রজো-ধর্ম্মী বীর, তাঁহার বীরত্ব এবং বৈরনির্যাতন-প্রবৃত্তির উদ্রেক বিধানের নিমিত্ত যেমন মাংসাদি রজোগুণ বর্দ্ধক খাদ্য বিধেয়, তদ্রূপ যিনি শাস্ত্রানুশীলনতৎপর, সাত্ত্বিকাচারী, তাঁহার পক্ষেও বুদ্ধির সমতা, হৃদয়ের নিরীহতা ও প্রবৃত্তির কোমলতা সাধনের জন্য তাদৃশ রাজসিক আহার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য; প্রত্যুত সাত্ত্বিক আহারই সম্যক্ প্রয়োজনীয় ও প্রীতি-প্রদ। যিনি যেরূপ কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাঁহার তাদৃশ কার্য্যোপযোগী ভোজনই কর্ত্তব্য; নতুবা সত্ত্বগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক রজোগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া বা রজোগুণানুকূল আহার গ্রহণ পূর্ব্বক সত্ত্বগুণের কার্য্য করিতে যাওয়া নিতান্ত বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই সমরপ্রিয় নৃপতিগণের পক্ষে মৃগমাংসাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, শান্তিপ্রিয় নিরীহ বেদাদি-অধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সেইরূপ বর্জ্জনীয় হইয়াছে। ফলতঃ খাদ্যানুসারে হৃদয়-বৃত্তি সংগঠিত হয়, এবং হৃদয়-বৃত্তি অনুসারেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য-সাধনে পটুতা জন্মে। অতএব কর্ম্ম-জীবন মানবের কর্ত্তব্যকর্ম্মের সহিত আহারের সম্বন্ধ যে অতি প্রত্যক্ষভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৬। আশ্রম-ভেদাদ্বা।

অর্থ—আশ্রমভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখা—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু, এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ক্রমানুসারে আহারেরও ব্যতিক্রম বুঝিতে হইবে; কাজেই ব্রহ্মচারীর যে আহার যেরূপ বিধেয়, গৃহীর তাহা সেরূপ নহে। আবার গৃহীর যাহা গ্রহীতব্য, বনীর তাহা পরিত্যজ্য। এই প্রকার একাশ্রমে যে খাদ্য হিতকর এবং অনাময়, আশ্রমান্তরে কার্য্যভেদহেতুক, সেই খাদ্যই তাদৃশ অশুভজনক এবং রোগমূলক। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের অনুকূল সাত্ত্বিক আহার ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আহারই সুপরিগ্রাহ্য নহে; কিন্তু গৃহীর পক্ষে সাত্ত্বিক আহার ও রাজসিক আহার, এই উভয়েরই যথাধিকার প্রয়োজন। যাঁহার যে আশ্রমে আশ্রয়, তাঁহার পক্ষে তত্তদাশ্রমানুকূল আহারই বিধিসঙ্গত এবং অনুদ্বেগকর।

৭। শারীরগুণভেদাচ্চ।

অর্থ—শারীরিক গুণভেদেও আহারের প্রভেদ হইবে।

ব্যাখ্যা—যাঁহার শরীরে যে গুণের আধিক্য, তাঁহার তদ্‌গুণানুকূল আহারেই প্রিয়তা। সত্ত্ব-রজঃ-তম—এই গুণত্রয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনাধিকার অনুসারে আহার্য্য নিরূপণ করা উচিত। ঐ ত্রিবিধ গুণের অনুপাতানুসারে আহারেরও ত্রৈবিধ্য-বিধান আবশ্যক। যাঁহার শরীরে সত্ত্বগুণ প্রবল, তাঁহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই গ্রাহ্য, সেইপ্রকার যাঁহার দেহে রজোগুণ বা

তমোগুণ প্রবল ও যিনি তদনুযায়ী কর্ত্তব্যাদিকারী, তাঁহার পক্ষে রাজসিক বা তামসিক আহারই গ্রাহ্য। নতুবা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী রাজসিক আহার বা রজোগুণাশ্রয়ী তামসিক আহার গ্রহণ করিলে, অচিরেই তাঁহাদিগকে আহারের অধিকার-বিরুদ্ধ দোষে দুষিত হইয়া অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। রজোগুণ বা তমোগুণের অত্যধিক প্রাবল্য স্থলে সাত্ত্বিক আহার ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলে, ক্রমশঃ ঐ রজোভাব বা তমোভাব ক্ষীণ হইয়া সত্ত্বভাবের উদয় হয়, এবং সত্ত্বভাবের উদ্রেক হওয়ায়, শরীর-মন পবিত্র হইয়া দীর্ঘজীবন ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্য লাভ হয় এবং সত্ত্বগুণের পূর্ণতায় ক্রমে নিস্ত্রৈগুণ্যতা লাভ হইয়া, চিরশান্তি বা মুক্তি করগত-প্রায় হইয়া উঠে। কিন্তু রজোগুণাধিকের বা তমোগুণাধিকের অনিয়মিতরূপ স্বগুণ বিরুদ্ধ আহার গ্রহণে অশান্তি ভোগই করিতে হয় মাত্র। ক্ষেত্রানুসারে বীজ বপন করিলে যেমন সুফল লাভের সম্ভাবনা অধিক, সেইপ্রকার শারীরিক গুণানুসারে আহার্য্য গ্রহণ করিলেই সুখ লাভ সম্ভাবনা; অন্যথাচরণে সুখের বিনিময়ে দুঃখেরই উপচয় হয় মাত্র। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য গুণভেদে আহারের ভেদ বিধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

গীতায়ও আহার্য্য-নিরূপণ-প্রস্তাবে ভগবান্ সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক আহারের যোগ-বিভাগ করিয়াছেন। যাহার যাদৃশ আহার্য্যের প্রতি স্বগুণানুসারিণী অভিরুচি, তাহার পক্ষে তাদৃশ আহার-বিধানই স্বাভাবিক। গীতার ১৭শ অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্লোকে এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ নিবদ্ধ হইয়াছে, যথা—

"আয়ুঃসত্ত্ব-বলারোগ্য-সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

অর্থ—আয়ু, সাত্ত্বিক ভাব, শক্তিমত্তা, রোগশূন্যতা, চিত্ত-প্রসাদ এবং রুচির বর্দ্ধক, রসযুক্ত ও স্নিগ্ধভাবাপন্ন চিত্তপরিতোষকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়।

"কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥"
(গীতা)

অতিশয় কটু, অতিশয় অম্ল, অতিশয় লবণ, অতিশয় উষ্ণ, অতিশয় তীক্ষ্ণ, অতিশয় রুক্ষ, এবং অতিশয় বিদাহী,—(অর্থাৎ জ্বালাপ্রদ, যথা সর্ষপাদি) এই সকল দুঃখ, মনস্তাপ এবং রোগপ্রদ দ্রব্য রাজসিক ব্যক্তির প্রিয় আহার।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥
(গীতা)

শৈত্যাবস্থাপন্ন, রসহীন, দুর্গন্ধ, পূর্ব্বদিন-পক্ক ও অপরের ভুক্তাবশিষ্ট অখাদ্য আহারই তামসগণের প্রিয়।

৮। শিষ্য। নিরামিষামিষয়োঃ কিম্ পথ্যম্?

অর্থ—নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যের ভিতর হিতকর খাদ্য কি?

উঃ।—দ্বয়ংহি গৃহিণঃ পথ্যম্।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থাশ্রমে নিরামিষ এবং আমিষ, এই উভয়বিধ খাদ্যই বিহিত। কার্য্যভেদে আহার্য্যেরও বিভেদ বিধান সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, একথা পূর্ব্ব ২ অনুশাসনেই কথিত হইয়াছে; অতএব সেই স্বকার্য্যোপযোগী আহার্য্য-নির্দ্দেশের সময়ে মন্বাদি-শাস্ত্রীয় যুক্তির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নতুবা অনুশাসনের লক্ষ্য অর্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই, কেবল মাত্র অনুশাসনটির

আবৃত্তি এবং তাহাকে স্ব-ইচ্ছানুসারে বিকৃতার্থে পরিণত করিয়া, স্বকীয় উৎপথ-গামিনী প্রবৃত্তির অনুকূলতা প্রদর্শন করিতে যাওয়া মূর্খের কার্য্য।

সূত্রে আছে গৃহীর পক্ষে আমিষ-নিরামিষ উভয়ই অশনীয় হইতে পারে; অতএব গৃহী আমি, যথেচ্ছভাবে আমিষ ভক্ষণ করিতে পারি, তাহাতে আর বিচারের আবশ্যকতা নাই, এই রূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া দেখা উচিত যে, ঐ গ্রহীতব্য আমিষের—কোন প্রকার যোগ-বিভাগ আছে কি না; ঐ আমিষ ভক্ষণ করিলে, আমাকে শাস্ত্র-গর্হিত অবৈধ হিংসার পক্ষপাতিতা নিবন্ধন কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে কি না, ঐ আমিষ বিধিবিহিত আমিষ-খাদ্যের অন্যতম কি না। এইরূপে অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখিতে পাইব যে, অনুশাসনে কথিত আমিষ শাস্ত্রসঙ্গত বৈধ আমিষের বহির্ভূত নহে। বৈধ হিংসায় কোন দোষ নাই, অতএব বিধি-পূর্ব্বক ঐ আমিষ গৃহীত হইলে, কোন প্রকার দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর্য্যদিগের আহার, বিহার, গমন, ভ্রমণ, ইত্যাদি সমস্তেরই মূলে নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত ছিল, তাই তাঁহারা ধর্ম্মোদ্দেশে বিহিত যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত মাংসাদি আমিষ গ্রহণ ব্যতীত কদাপিও অযজ্ঞীয় হিংসা করিয়া নিরয়ভাগী হইতেন না। বেদ-বিহিত হিংসাই বৈধ হিংসা, এই হিংসায় জিঘাংসা-দোষজনিত দুরিতোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব সূক্ত-নির্দ্দিষ্ট আমিষগ্রহণ সময়ে, যাহাতে বেদ-বিধির অনুশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা অতীব কর্ত্তব্য। বেদ-বিগর্হিত হিংসায় প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র-বন্ধন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যিনি প্রবৃত্তিপরিচর্য্যার জন্য হিংসা করিতে উদ্যত হয়েন, তাঁহাকে পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করিতে এবং ইহজীবনে আত্মকৃত দুষ্কার্য্যের জন্য নানাদুর্ভোগে অনুতাপরূপ আশীবিষ-দংশনে জর্জ্জরীভূত হইতে হয়। মনু বলিয়াছেন—

"যা বেদ-বিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্বভৌ॥
(৫।৪৪)

এই চরাচরে বেদবিহিত যে হিংসা, তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবে, কেননা বেদ হইতেই ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে।

"যোঽহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্ম-সুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন কচিৎ সুখমেধতে॥

যে ব্যক্তি অহিংসকপ্রাণীদিগকে আত্ম-সুখের ইচ্ছায় হনন করে, সে জীবন্মৃত, সে কোনও অবস্থায় কখনও সুখ পায় না।

অতএব আমিষ গ্রহণ সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা উলঙ্ঘন না করিয়া, হিংসা করিলে, ঐ বৈধ হিংসায় কোন প্রকার দোষ জন্মে না। অশাস্ত্রীয়হিংসাই হিংসাজনিত দোষের আকর; সুতরাং গৃহীদিগের আমিষ গ্রহণ কালে অমিষের বৈধাবৈধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিলে, তাঁহাদিগকে কোন প্রকার প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয় না।

১০—যত্নাদরুচিরং ত্যজ্যম্।

অর্থ—অরুচিকর—অর্থাৎ অপ্রীতিকর খাদ্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবে।

ব্যাখ্যা—যাহা অরুচিকর, অর্থাৎ নিজের বা সমাজের অপ্রীতিকর খাদ্য, তাহা যত্ন-পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। রসযুক্ত, স্নেহময়, সার-বান্, প্রিয়দর্শন আহার্য্যই রুচিপ্রদ—অতএব গ্রহণীয়; এবং রসহীন, রুক্ষ, অসার ও

কদাকার খাদ্যই অপ্রীতিকর, সুতরাং পরিহর্ত্তব্য। যাহা দেখিতে কুৎসিত, যাহা পূতিগন্ধময় বা পর্য্যুষিত (বাসী), যাহার দর্শনে অশনলিপ্সার পরিবর্ত্তে আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। যে খাদ্য কোন বিকৃতভাবাপন্ন তামসাত্মার প্রীতিপ্রদ হইলেও সমাজের অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক, তাদৃশ খাদ্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। কোন খাদ্য ব্যক্তি-বিশেষের অরুচিকর না হইলেও, যদি তাহা সমাজের প্রীতিপ্রদ না হয়, তবে ঐ খাদ্য সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। সমাজ যাহার গ্রহণে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নিন্দনীয় খাদ্য কদাচ স্পৃহনীয় নহে।

কতিপয় মানব-সমষ্টি লইয়াই সমাজ। প্রত্যেক মানবের উন্নতি বা অবনতির সহিত সমাজের উন্নতি বা অবনতির সূত্র দৃঢ়সংবদ্ধ। আবার মানবের মানসিক বা দৈহিক উন্নতি অবনতির নিদান আহার। আহার-গুণেই ব্যাধ-বংশসম্ভূতের অন্তঃকরণ দেবভাবে এবং আহার-দোষেই দেববংশীয়ের হৃদয় ব্যাধভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সহিত মানবের যেমন সম্বন্ধ, সেই প্রকার মানবের সহিত আহারের সম্বন্ধও অনুস্যূত রহিয়াছে; সুতরাং আহারের উপর সমাজের উন্নতি এবং অবনতির ভিত্তি যে পরোক্ষভাবে অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত, একথা বোধ হয় আর প্রমাণান্তর দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। কাজেকাজেই যে আহার দেহের উদ্বেজক, যে আহারে প্রাণ পরিতৃপ্তি লাভ করে না, যে আহারে শরীরের উপচয় না হইয়া বরং ক্ষয়ই হইয়া থাকে, তাদৃশ আহারই—শুধু নিজের নয়, সমাজেরও ক্ষতিজনক ও অপ্রীতিকর বুঝিতে হইবে। তাই প্রাচীন ঋষিগণ, পুরাতন শাস্ত্র-প্রণেতাগণ, যাহা আত্মার অতৃপ্তিকর ও ক্ষতিজনক, তাদৃশ খাদ্যকেই "সমাজদ্রোহী খাদ্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব সমাজের মঙ্গল বিধানে সমুৎসুক মহামনা-দিগের প্রথমতঃ আহার বিষয়ে একটু নিবিষ্টদৃষ্টি হওয়াই যেন সমীচীন বলিয়া বোধ হয়; নতুবা আহার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, অপর সহস্র বিষয়ে সমাজ-সংস্কার পক্ষে অভিনিবেশ প্রদান, ছিন্নমূল তরুর শিরোদেশে জলসেচনের অনুকরণ মাত্র!

১১—তথা পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতম্।

অর্থ—পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিগর্হিত খাদ্যও পরিত্যাজ্য।

ব্যাখ্যা—পূর্ব্বপুরুষগণ যে খাদ্য বিগর্হিত বলিয়া নিষেধ করিয়াছেন, তাহাও যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করা উচিত। বহু দিন হইতে যে দেশে যে খাদ্যের বহুল-প্রচার হইয়া আসিতেছে, সেই খাদ্যের উপাদানের সহিত তদ্দেশবাসীদিগের শারীরিক, মানসিক যাবতীয় সম্বন্ধ অতি অচ্ছেদ্যভাবে সংহত রহিয়াছে। অকস্মাৎ কোন প্রকার নূতন খাদ্য পরিগৃহীত হইলে, সেই চিরনিবদ্ধ সুসংযত সম্বন্ধ-সূত্র বিস্রস্ত হইয়া শরীর-যন্ত্রের বিষম বিপ্লব উপস্থিত করে। অতএব বংশ-পরম্পরায় পরিগৃহীত আহার্য্যের পরিবর্ত্তন যেমন দূষণীয়, বংশ-পরম্পরায় বিবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণও তেমনই উদ্বেগজনক। আয়ুষ্কাম সুখাভিলিপ্সুর পক্ষে তাদৃশ চিরবর্জ্জিত খাদ্যের গ্রহণ বা চিরগৃহীত খাদ্যের বর্জ্জন নিতান্ত অনভিপ্রেত। শাস্ত্রান্তরেও আছে—"পূর্ব্বৈর্বিগর্হিতং খাদ্যং যত্নতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ"। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,

চির-গৃহীত খাদ্যাদির পরিবর্ত্তনে প্রায়শই আধি-ব্যাধি সংঘটিত হইয়া থাকে।

১২—ন রুচ্যম্ মূঢ়ধী-বশাৎ।

অর্থ—যে সমুদয় খাদ্য পূর্ব্বে ছিল না, হয়ত দেশান্তরে জন্মিত, এখন ক্রমশঃ এদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাদৃশ নূতন খাদ্য যদি প্রীতিকর, হিতপ্রদ এবং অশাস্ত্রগর্হিত বিবেচিত হয়, তবে মোহপ্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—অধুনা এমন অনেক সুখাদ্য দেশান্তর হইতে অস্মদ্দেশে আনীত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে তাহার নামও কেহ অবগত ছিল না। তাদৃশ নবাবিষ্কৃত খাদ্য যদি পরীক্ষাদির দ্বারা শরীরের এবং মনের উপকারক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে সমাজে তাহার প্রচলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নতুবা "পূর্ব্বে ইহা ছিল না, অতএব উপকারক হইলেও ইহা গ্রহণীয় নহে" এতাদৃশ মোহান্ধ-সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত সুপথ্য সুখকর খাদ্যের বর্জ্জন কদাচ বিধেয় নহে।

ক্রম-পরিবর্ত্তন সংসারের চিরন্তন নিয়ম। জগতের যাবতীয় বিষয়েই এই পরিবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে; অতএব খাদ্যাদি বিষয়েও যে তাহা হইবে না, ইহা কে বলিল? তবে সেই পরিবর্ত্তন সময়ে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার পূর্ব্বক হিতকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, নবনির্দ্দিষ্ট খাদ্যের গ্রহণে মতান্তর কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল না, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাদিতেও কোন প্রকার বিধি-নিষেধ পরিকল্পিত হয় নাই; যদি থাকিত, তবে হয়ত পৌরাণিক গ্রন্থাদিতেও তাহার বিষয়ে কোন না কোন প্রকার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইত; কিন্তু যখন ইহার কিছুই নাই, তখন নূতন হিতকর খাদ্যের গ্রহণ বা বর্জ্জনে তোমার আমার কতদূর অধিকার, তাহাই পূর্ব্বে দেখা উচিত। কোন অভিনব খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা উচিত যে, ইহা সাধারণতঃ কায়িক-মানসিক উপকারক কি অপকারক; যদি উপকারক হয়, তবে তখন নির্ণয় করা উচিত যে, ইহা শাস্ত্র-বিহিত খাদ্যাদির মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। যদি যতদূর সম্ভব, অনুসন্ধান করিয়াও তাহার অনুকূল বৈ প্রতিকূল কোন প্রকার অবস্থা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে তাহার গ্রহণে আর মতদ্বৈধ কি? অভিনব খাদ্যের সদৃশ কোন পুরাতন খাদ্যাদির সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে বিধান আছে, ঐ নূতন খাদ্যের সম্বন্ধেও যতদূর সম্ভব, ঐ শাস্ত্রীয় বিধানের অনুসরণ করা উচিত, এবং সেই ঔচিত্যের বশবর্ত্তী হইয়া, যাহাতে সেই উপকারক খাদ্য সমাজে প্রচলিত হয়, তৎপক্ষেও বিশেষ যত্ন বিধান আবশ্যক। নতুবা ভূম্যাদির শস্যজনিকা শক্তির রূপান্তর-সমুদ্ভূত অন্যরূপ শুভকর ও সুখকর অন্নের অগ্রহণে সমাজের অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। এতাদৃশ বিচার্য্য-স্থলে, নিজের মূঢ়তা প্রযুক্ত কোন প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া, যাহাতে ঐ প্রীতিপ্রদ পরম উপকারক খাদ্যের ভূরি-প্রচলন হয়, তৎপক্ষে প্রত্যেকেরই সমাহিত-দৃষ্টি হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে অনাবিষ্কৃত—অধুনা প্রকাশিত অনেক খাদ্য সমাজে অতি আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেছে। প্রথম প্রথম যে নবজাত বা নবানীত খাদ্যাদি সম্বন্ধে সমাজে যত মত-বিপর্য্যয় লক্ষিত হইত, এক্ষণ ক্রমশঃ তাহার বিপরীত—অর্থাৎ সেই খাদ্যাদি সম্বন্ধে তত অনুকূলতা প্রকাশিত হইতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে আলু, পেঁপে,

কপি বা মর্ত্তমানকলার প্রচলন ছিল না; দেশান্তর হইতে উহা আমাদের দেশে আনীত হইলে পর, প্রথম প্রথম ঐ সকল উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্য গ্রহণ সম্বন্ধে অনেকের অমত হইত; ক্রমশঃ যত ঐ সমুদয় খাদ্যের উপকারিতা এবং প্রীতিপ্রদতার উপলব্ধি হইতে লাগিল, তত ঐ খাদ্যসমূহেরও আদর বাড়িতে লাগিল; এমন কি, দেব-পূজার ভোগাদিতেও ক্রমশঃ ঐ সমুদয় খাদ্য ব্যবহার করিতে কেহ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাই আমরা অধুনা আলু পেঁপে প্রভৃতি পূজার নিবেদ্য পদার্থের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। দেবকার্য্যে মর্ত্তমানকলা এবং কপির তাদৃশ সর্ব্ববাদিসম্মত প্রচলন এখন পর্য্যাপ্ত না হইলেও, উহাদের প্রতি যত্নাতিশয্য দর্শনে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সম্ভবতঃ অচিরেই ঐ সকল দ্রব্য পূজোপকরণের অঙ্গীভূত বলিয়া স্বীকৃত হইবে।

শাস্ত্রে উদ্‌ভিজ্জ-খাদ্যই সমধিক সাত্ত্বিক-ভাব প্রণোদক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু "নূতন" বলিয়া কপি, আলু, মর্ত্তমান এবং পেঁপে প্রভৃতি খাদ্য পরম পরিতোষ সহকারে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; অথচ দেবাদির পূজোপকরণে দিতে সাহসী হন না। এ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল দ্রব্য না খাওয়াই সঙ্গত। যাহা তুমি নিজে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পার, তাহা দেব-উদ্দেশে দিতে কুণ্ঠিত হও কেন? যদি তাহাই হও, তবে ইহা নিশ্চয়, যে তুমি ঐ দ্রব্য সন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতেছ; অতএব তোমার পক্ষে উহা গ্রহণীয় নহে। তুমি যাহা কিছু ভোজন করিবে, তাহা সর্ব্বাগ্রে তোমার অভীষ্ট দেবের চরণে উৎসর্গ করিয়া 'প্রসাদ' লইবে। যদি তাহাই না পার, তবে খাইও না। তুমি নিজের রসনা পরিতোষণ করিবে, অথচ দেবতার বেলায় ভ্রমান্ধকারে কর্ত্তব্য-পথ দেখিবে না, এ কোন্ কথা? যদি প্রশস্তভাবে নিজে লইতে পার, তবে দেবতাকেও দিতে পার; আর যদি তাহা না পার, তবে না খাওয়াই উচিত। শাস্ত্রে "আত্মবৎ" সেবাই বিহিত হইয়াছে; তুমি যদি তাহাই না পারিলে, তবে শুধু স্বীয় বাহ্য-রসনার তৃপ্তি-সাধনে প্রয়োজন কি? যাহাহউক যে খাদ্য তোমার আত্মপ্রীতিপ্রদ, সমাজের প্রীতিপ্রদ, তাহা দেবতারও গ্রাহ্য, এই সংস্কার অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়া, নবানীত পেঁপে প্রভৃতির দেব-ভোজ্যতা-বুদ্ধি জন্মাইয়া দিতেছে; এবং সেই জন্যই উহা এখন দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্যান্য ঐজাতীয় খাদ্য সম্বন্ধেও ক্রমশঃ এইরূপ হওয়াই সম্ভব। অতএব নূতন বলিয়াই কোন খাদ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না; তাহার দোষ-গুণের বিশেষ আলোচনা হইয়া, তাহারই সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ সমাজ-সম্মত হওয়া আবশ্যক।

১৩—ন শস্তং গৃহ-পালিতম্।

অর্থ—গৃহপালিত পশ্বাদি অশন বিষয়ে অপ্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—মাংসাশীদিগের পক্ষে যাবতীয় মাংসের মধ্যে মৃগয়ালব্ধ মাংসই অত্যুৎকৃষ্ট। নিত্য রোগভূমি গৃহে পালিত পশ্বাদির দেহও দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ কোন না কোন রোগাদিতে আক্রান্ত—অপবিত্র হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ পশ্বাদির মাংস গ্রহণে রোগাদিরই প্রসার বৃদ্ধি হয় মাত্র। এই জন্যই প্রাচীনকালে মৃগয়ালব্ধ মাংসেরই অধিক আদর ছিল। এখনও কোন কোন স্থলে সেই প্রাচীন নিয়মের ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহপালিত পশ্বাদির মাংস ভোজনে যে কেবল রোগাদির আশঙ্কাই আছে, তাহা নহে; ইহাতে হৃদয়ের দয়া-মমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি গুলি ক্রমশঃ অধিকতর ক্ষীণীভূত হইয়া আইসে। মানবহৃদয়ের প্রধান গুণ আশ্রিত-বাৎসল্য সমূলে তিরোহিত হয়; হৃদয় ধীরে ধীরে আসুরভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভীষণ নরকাকারে পরিণত হয়। অতএব আশ্রিত, গৃহ-পালিত পশ্বাদির মাংস সুপ্রশস্ত নহে। এ স্থলে মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়িতেছে "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।"

১৪—নাশ্যমত্যধিকামিষ্যং রজোবর্দ্ধন-শঙ্কয়া।

অর্থ—যাঁহাদের মাংসাহার অনিষিদ্ধ, তাঁহা-

দের পক্ষেও অত্যধিক মাংস-ভোজন অনুচিত। কেননা তাহাতে রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে, সাত্ত্বিকভাব একেবারে তিরোহিত হইয়া মুক্তির পথ দুষ্প্রাপ্য হয়, সুতরাং মাংসাশীর পক্ষেও অত্যধিক মাংসাহার অবিধেয়। আর্য্যসন্ততিগণের আহার, বিহার ভ্রমণ, গমন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যের অভ্যন্তরেই নিগূঢ় ধর্ম্মভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যগণ যাহা কিছু করিতেন, যাহা কিছু দেখিতেন বা যাহা কিছু ভাবিতেন, তৎসমস্তের মূলেই সুদৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস নিহিত থাকিত; তাই তাঁহারা যাহা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাই আত্মার অনুকূল ভাবিয়া, আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিতেন, এবং যাহা ধর্ম্মপথের অন্তরায়—মুক্তিপথের কণ্টক, তাহা অবশ্য-পরিহার্য্যবোধে পরিত্যাগ করিতেন। সেই হেতু আচার্য্য শিষ্যকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন যে, অত্যধিক রজোগুণের বৃদ্ধি হইলে, সত্ত্বগুণ একেবারে তিরোহিত হয়; অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে অত্যধিক রাজসিকভাবে বিভোর হইয়া ক্রমশঃ নীচ অপেক্ষাও নীচতর হইতে থাকে; সুতরাং রজোগুণের অত্যধিক বৃদ্ধি কদাচ প্রার্থনীয় নহে। অতএব অপরিমিত মাংসাহার সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত; কেননা অধিক মাংস ভোজনে রজোগুণ নিরতিশয় পরিবৃদ্ধ হইয়া ধর্ম্মমার্গের ভ্রমণের অন্তরায়রূপে পরিণত হয়।

১৫—ন বাপদি নিষিদ্ধস্যানুষ্ঠান-মপি দোষভাক্‌।

অর্থ—আপৎকাল সমুপস্থিত হইলে, এই সমুদয় নিষিদ্ধ বিষয়ের অনুষ্ঠান বা বিহিত নিয়মের ব্যতিক্রম কোন প্রকার দোষাবহ হয় না।

ব্যাখ্যা—এতাবৎকাল পর্য্যন্ত খাদ্যাদি সম্বন্ধে যে সমুদয় বিধি-নিষেধ বিবেচিত হইল, আর্ত্ত বা পীড়িতদিগের পক্ষে তদ্বিপরীত আচরণ প্রত্যবায়জনক হইবে না। সাধারণের যাহা অকার্য্য বা অননুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রয়োজনবিশেষে আপদ্গ্রস্তের পক্ষে তাহার অনুষ্ঠান দূষণীয় নহে। এস্থলে আমরা একটি মহাকবির কবিতার উল্লেখ করিতেছি—

"নিষিদ্ধমপ্যাচরণীয় মাপদি,
ক্রিয়া সতী নাহবতি যত্র সর্ব্বথা—.
ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
কচিদ্বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে। (নৈষধ।)

অর্থ—যখন আপদের সময়ে সৎক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করা যায় না, তখন, যাহা চিরনিষিদ্ধ, তাহারও অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। কেন না—সরল সুপ্রশস্ত রাজপথ যখন জলদ-জলে পিচ্ছিল হয়, তখন পণ্ডিতগণও কুটিল ও বন্ধুর পথে গমন করিয়া থাকেন।

উপসংহারে আচার্য্য এই শ্লোকটি বলিয়াছেন,-

স্বাহারাৎ জায়তে সৌস্থ্যং সৌস্থ্যাৎ সংবর্দ্ধতে স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলাভে ভবেন্মুক্তিঃ তস্মাৎ তং বিধিনা চরেৎ।

অর্থ—সু-আহার হইতে সুস্থতা জন্মে; সুস্থতা হইতে স্মৃতি সংবর্দ্ধিত হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি হয়; অতএব শাস্ত্রানুসারে আহারের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা—উপসংহারে সদাহারের চরম উপকারিতা প্রদর্শনোদ্দেশে সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য বলিতেছেন যে, শাস্ত্রবিহিত নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আহারের অনুষ্ঠান করা অতীব কর্ত্তব্য; কেননা "সু" অর্থাৎ বৈধ আহার হইতেই স্বাস্থ্যসুখ এবং স্বাস্থ্য হইতেই স্মৃতি-শক্তি সংবর্দ্ধিত হয়; স্মৃতি বর্দ্ধিত হইলে মুক্তি অনায়াসলভ্য হইয়া আইসে; অতএব তৎপ্রতি সমাহিত থাকা মুমুক্ষুগণের নিতান্ত কর্ত্তব্য। ছান্দোগ্যোপনিষদে এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে-"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" অর্থাৎ আহার-শুদ্ধি হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি জন্মে, সত্ত্বশুদ্ধি হইলে নিশ্চিতা স্মৃতি লাভ হয়, এবং স্মৃতি লাভ হইলে মুক্তি অতীব সুলভ হইয়া আইসে; অতএব আহার-শুদ্ধিই মুক্তির প্রধান কারণ।

ইতি পারিব্রাজক সূক্তমালায়াং অশন-সূক্ত-নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

অধিকার-ভেদে শিক্ষা ও ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

অধিকার ভেদে যে শিক্ষার তারতম্য হওয়া উচিত, তাহা একটু চিন্তা করিলে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই সত্যটি এতই অনায়াস-বোধ্য যে, ইহা বোধগম্য করাইবার জন্য বহুল যুক্তি-তর্কাদি নিষ্প্রয়োজন। বাল্য–যৌবনাদি জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষা প্রদান যে বিধেয়, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? সুকুমারমতি বালককে যখন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন সে যতটুকু ধারণা করিতে পারে, তাহাকে ততটুকু শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং তাহা হইলেই শিক্ষার সুফল ফলে। কিন্তু তাহার ধারণা-শক্তির অতিরিক্ত কোন বিষয়ে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিলে, তাহার কোন ইষ্ট না হইয়া, তদ্বিনিময়ে সমধিক অনিষ্টই সংসাধিত হয় মাত্র। আবার সমবয়স্ক সকল বালককেই এক রকম শিক্ষা দেওয়া যায় না। স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক উপযোগিতা ও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে তাহাদের শিক্ষা বিধানের বিভিন্নতা হইয়া থাকে। যাহার যে বিষয়ে অন্তর্নিহিত শক্তি এতই অল্প যে, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাকে সে বিষয় শিক্ষা না দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, কোন বালক হয়ত সাহিত্যে, কোন বালক গণিতে, কোন বালক দর্শনে, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়ে অধিক আসক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং অল্পানুশীলনেই তত্তদ্বিষয়ে উত্তম অধিকার লাভ করিয়া থাকে; এবং তদিতর বিষয় বহু যত্ন ও শ্রম দ্বারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারক হয় না। প্রত্যেক মানবেরই কতকগুলি অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, এবং যাহার যে যে বিষয়ে ঐ অন্তর্নিহিত শক্তি বলবতী, অনুশীলন দ্বারা সেই সেই বিষয়ে তাহার ঐ শক্তি ক্রমশঃ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। এমন অনেক সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, হয়ত কোন বালক সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, কিন্তু গণিতাদি বিষয়ান্তরে বহু শ্রম যত্ন দ্বারাও তাহার প্রতিভা কার্য্যকরী হয় না। অনুশীলন দ্বারা যে একেবারে কিছুই হয় না, তাহা আমাদের

বক্তব্য নহে, কিন্তু পরিশ্রমানুরূপ ফললাভ হয় না। সঙ্গীত বিষয়ে যদি আমার অন্তর্নিহিত শক্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি শত চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই উত্তম গায়ক হইতে পারিব না। আমার শারীরিক ও মানসিক গঠন সঙ্গীতের সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলে, আমি যতই শ্রম করি না কেন, কদাপি শ্রমানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইব না। উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে লাভ এই হয় যে, যে বিষয়ে যাহার স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, অনেক সময়ে তাহার অনুশীলন না হইয়া, অনুপযোগী বিষয়ান্তরের আলোচনা হওয়ায়, ক্রমে ক্রমে ঐ স্বাভাবিক শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, এবং সকল শ্রমই পণ্ড হয়। কোন একটী বিষয়ে কাহারও উপযোগিতা না থাকিলে, সেই ব্যক্তিকে যে একেবারে মূর্খ বলিতে হইবে, তাহা নহে। অন্য অন্য বিষয়ে তাহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য জন্মিতে পারে। একজন প্রাজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ বহু চেষ্টা করিয়াও হয়ত একছত্র কবিতা লিখিতে পারেন না, এবং যদিও পারেন, তবে তাহা হয়ত "শুষ্ক কাষ্ঠের" ন্যায় নীরস হইয়া পড়ে; পক্ষান্তরে, একজন প্রকৃতি-সিদ্ধ-কবি হয়ত বহু চেষ্টা করিয়াও গণিত-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন না এবং অনেক সময়ে জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞাই তাঁহার নিকট দুর্গম সেতু রূপে প্রতীয়মান হয়! ফলকথা এই যে, সকল বিষয়ে সকলের অধিকার জন্মে না ও জন্মিতেও পারে না, এবং যাহার যে বিষয়ে শক্তি না থাকে, তাহাকে সেই বিষয়ে অধিকারী করিতে চেষ্টায় কোন ফল হয় না; অধিকন্তু তাহাকে তাহার প্রকৃতি-সিদ্ধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় মাত্র। ইদানীং অস্মদ্দেশে এক বিষম শিক্ষা-বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। স্কুল-কলেজে এক এক শ্রেণীতে বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হয় ত ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাহাদিগকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমুদায়ই এক জাতীয়; এবং একই শিক্ষক বহু ছাত্রকে শিক্ষা দেন বলিয়া, তাহাদের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয়ের বিভিন্নতা ও ন্যূনাধিক্য নির্ব্বাচন করিয়া উঠিতে পারেন না এবং করেন না; সুতরাং স্বাভাবিক উপযোগিতা এবং সেই উপযোগিতার তারতম্য অনুসারে শিক্ষিতব্য বিষয় এবং সেই বিষয়ের পরিমাণ আদৌ বিবেচিত হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে কোন বিষয়ে সার-গ্রাহিতা না জন্মিয়া পল্লবগ্রাহিতাই জন্মিয়া থাকে। গণিত-শাস্ত্রে আমার স্বাভাবিক উপযোগিতা আদৌ নাই, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, আমাকে গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবেই হইবে। ঐ গণিত-শাস্ত্র অধ্যয়নে ফল হইল এই যে, উহাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কতকগুলি বিষয় অবগত হইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ অধিকার জন্মিল না; অধিকন্তু উহা অধ্যয়ন করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিকূলে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হওয়ায়, যে সমুদয় বিষয়ে আমার অধিকার জন্মিবার সমধিক সম্ভাবনা ছিল, তাহাতেও পল্লবগ্রাহিতা জন্মিল! কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক উপাধিধারী কৃত-বিদ্য

যুবক তাঁহাদের অধীত শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যে অনেক শাস্ত্র একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। ইহার অন্যতম কারণ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অননুকূল শিক্ষা-বিধান। এইরূপ শিক্ষাতে বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না হইয়া, বরং মলিনতাপ্রাপ্তই হয়।

এই প্রকার তাবৎ শিক্ষাই অধিকার-সাপেক্ষ। শিক্ষা বলিলে যে কেবল জ্ঞানের শিক্ষা বুঝিতে হইবে, তাহা নহে, তাবৎ কার্য্য-শিক্ষাও বুঝিতে হইবে। ইহ সংসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের বহুবিধ বিষয়ের প্রয়োজন; গৃহ, শয্যা, অশন, বসন, ভূষণ, আসন, ইত্যাদি নানা প্রকার বিষয় এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেকানেক বিষয় ব্যতীত আমাদের আদৌ চলে না। এই সমুদয়ই আবার কার্য্য-সাপেক্ষ, এবং ঐ কার্য্য আবার শিক্ষা-সাপেক্ষ। ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে, কখনও সমাজের উন্নতি হইতে পারে না; অধিকার-নির্ব্বাচনই আবার ঐ শিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার মুখ্যতম উপায়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, যাহাকে শিক্ষা দেওয়া যাইবে, সে যদি তাহার অধিকারী না হয়, তাহা হইলে সমুদয় শ্রমই বিফল হইবে। আমাদের দেশে অধুনা কোন বিষয়ের শিক্ষাই এইরূপ অধিকার নির্ব্বাচন করিয়া প্রদত্ত হয় না। মনে কর, একজনকে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে; নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে দৃষ্টি করা উচিত যে, ঐ বিদ্যার্থী নৌ-বিদ্যা শিক্ষা করিবার উপযুক্ত কি না। উহা নির্ব্বাচন করিতে গেলে, নাবিক-জীবনের অত্যাবশ্যক গুণ কি কি, তাহা দেখা উচিত। যথা—অসম সাহসিকতা, বিপদে ধীরতা, শীতাতপ-সহিষ্ণুতা, শারীরিক সবলতা, সন্তরণ পটুতা চিত্ত-দৌর্ব্বল্য বিহীনতা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তির হৃদয়ের অন্তস্তল বাল্য-সহচরের প্রীতিপূর্ণ বিরহের ন্যায় সুনীল জলধির নীলাম্বু-রঞ্জিত বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গি প্রেমে ও বিরহে উদ্বেলিত করে নাই, তাহার পক্ষে সমুদ্র-বক্ষে পোতারোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কেবল দেশাচার—সামাজিক রীতি—বংশপারম্পর্য্য-অবস্থানুরোধ প্রভৃতি কারণে নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, তাহা দ্বারা কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত, কোন উপকারই সংসাধিত হইবে না। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে, কি কৃষি, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি উচ্চতর বিষয়-জ্ঞান, ইদানীং এ সমস্তই আমাদের দেশে যে এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাহার মুখ্য কারণ অনধিকার-চর্চ্চা।

বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যাদৃশ বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও অস্মদ্দেশে ততোধিক বিভ্রাট ঘটিতেছে। স্ত্রী-পুরুষ-স্বভাবের প্রকৃতগত বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, আমরা বালক-বালিকাদিগকে একই জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকি, এবং আমেরিকা—ইউরোপ প্রভৃতি দেশে ঐ প্রকার শিক্ষার বিষময় ফল প্রদর্শন করিয়াও তাহার প্রতিরোধ করিতে কোন প্রকার প্রয়াস পাই না। অনুকরণ-প্রিয় দুর্ব্বলচিত্ত বঙ্গবাসী স্ত্রীজাতিকে পুরুষজাতিতে পরিণত করিবার জন্য

কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন! স্ত্রী-স্বভাবের উপযোগিতা সম্যক্ আলোচনা না করিয়া, যথেচ্ছ শিক্ষা প্রদান করাতে, হিন্দু সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে; অতএব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই এই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ শিক্ষা-বিধানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জনষ্টুয়ার্টমিল স্ত্রী-পুরুষের মানসিক বৃত্তির একজাতীয়তা ও সমকক্ষতা সম্বন্ধে যে মতের অবতারণা করেন, এবং যাহা কিছু দিনের জন্য তদ্দেশে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রমাদপূর্ণ বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে স্থিরীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা সেই ভ্রান্ত মতেরই অনুবর্ত্তী হইয়া স্বদেশের সর্ব্বনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছি! স্ত্রীলোকদিগের কোন্ কোন্ বিষয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযোগিতা আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধান সহকারে আলোচনা করিয়াই তাহাদের শিক্ষা বিধান করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী-প্রকৃতিতে কতকগুলি পুং-প্রকৃতি এবং পুং-প্রকৃতিতে কতকগুলি স্ত্রী-প্রকৃতি থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ বৈষম্য নিহিত আছে; ঐ বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহাদের শিক্ষা বিধান করিলে, উহাতে যে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তৎপক্ষে আদৌ দৃষ্টি নাই। সে যাহা হউক, ফলকথা এই যে, অস্মদ্দেশে অধিকার-পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা-বিধানের রীতি বহুকাল হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ যে কোন বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, অধিকার-ভেদে শিক্ষাই তাহার মূলমন্ত্র ছিল। যে বিষয়ে যাহার অধিকার নাই, তাহাকে তাঁহারা সে বিষয়ে কখনও শিক্ষা দিতেন না।

অধিকার পর্য্যালোচনা করিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে যত অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে, এত আর কিছুতেই নয়, ইহা অবগত হইয়াই তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষা বিধানে অধিকার নির্ব্বাচন বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। যে সমুদয় ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মের অসংখ্য শাস্ত্রসমূহে অসামঞ্জস্য ও বিরোধ দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও কতকগুলি পাশ্চাত্য কুসংস্কার স্ব স্ব হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, একবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ সমুদয় অসামঞ্জস্য বা বিরোধ আপাত মাত্র; অধিকার-ভেদে শিক্ষা-প্রয়োগে উহাদের সকলেরই সুন্দর সমীকরণ হইয়া যায়! বেদ, দর্শন, তন্ত্র, পুরাণাদি অসংখ্য শাস্ত্ররাজিতে যে সমুদয় বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহারা আদৌ বিরোধ নহে; তবে অধিকার-ভেদে শিক্ষা-বিধানের নিয়ম-হেতু ঐ গুলি আপাততঃ বিরোধবৎ আভাসমান হইয়া থাকে। অন্য অন্য বিষয়ের শিক্ষা বিধানে যেরূপ ক্রমোন্নতি বা ক্রম-বিকাশ বিধেয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। চিত্রকর একেবারেই আলেখ্য-চিত্রণ শিক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহাকে প্রথমে সরল-রেখা অঙ্কিত করিতে হয়; প্রত্যেক ব্যাপারেই এইরূপ সুকর সাধন হইতে ক্রমশঃ দুষ্কর সাধনে যাইতে হয়; বর্ণ শিক্ষা করিয়াই ক্রমে বর্ণ-বিন্যাস ও বর্ণ-যোজনা শিক্ষা করিতে হয়; ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই ক্রমে কাব্যাদি অধ্যয়ন করিতে হয়; সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষার এইরূপ ক্রম-সাপেক্ষতা অপরিহার্য্য; কুত্রাপি ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ, ধর্ম্মবিষয়েও তদ্রূপ

ধর্ম্ম-বিষয়ের শিক্ষাও অধিকার ভেদে হওয়া উচিত। অধিকার ভেদে শিক্ষা না হইলে, কোন ফলোদয় হয় না; প্রত্যুত বিশেষ অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই অধিকার ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকাতেই হিন্দুশাস্ত্র এত বহুল ও বিস্তৃত। জগতে কোন মানবই সর্ব্ব বিষয়ে অন্য মানবের সমকক্ষ নহেন; তাঁহাতে অপর-নিরপেক্ষ কোন না কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবেই হইবে। আমি একটা বিষয় যেরূপ বুঝি, আর একজন সেই বিষয়টি আমার ন্যায় বুঝিলেও, আমাদের উভয়ের বোধ-বিষয়ে একটু না একটু পার্থক্য রহিয়া যাইবেই যাইবে। ধর্ম্মরাজ্যে বুঝাইবার ও বুঝিবার জিনিষ একটি মাত্র। কিন্তু সেই একটি মাত্র জিনিষ বুঝাইতে সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি যে উপায়ের দ্বারা সেই একটি মাত্র প্রতিপাদ্য বস্তু বুঝিতে অধিকারী, হিন্দুশাস্ত্র তাহাকে সেই উপায়ই অবলম্বন করিতে বলিবেন। হিন্দু-শাস্ত্র এ বিষয়ে যাদৃশ উদারতা দেখাইয়াছেন, তাদৃশ উদারতা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কেবল উদারতা নহে, ইহাতে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতাও পরিলক্ষিত হয়। একই বিষয়ে হিন্দু-শাস্ত্রে বিবিধ বিধি ও নিষেধ, উভয়ই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল অধিকারি-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। একই হিন্দু-শাস্ত্রে মাংসাহার-বিধি ও মাংসাহার-নিষেধ দেখিয়া হয়ত অনেকে শাস্ত্রের প্রতি বীতানুরাগ হয়েন, কিন্তু তাঁহাদের অনুধাবন করা উচিত যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। হিন্দু-শাস্ত্র পাঠ করিলে, অনায়াসেই উপলব্ধি হয় যে, যেখানে অধিকার উচ্চ, সেই খানেই শাসন কঠিন, এবং যেখানে অধিকার নিম্ন, সেখানে শাসনও শিথিল। মৎস্য-মাংস আহারের ব্যবস্থার সময়ে শাস্ত্র বলিতেছেন যে, এই এই মাংসাদি খাদ্য এবং এই এই মাংসাদি অখাদ্য, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই হয়ত বলিতেছেন যে, মৎস্য-মাংস আদৌ খাইবে না। এস্থলে শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি একই ব্যক্তিকে একবার মাংস-ভোজনে বিধি দিতেছেন, আবার পরক্ষণেই তাহা নিষেধ করিতেছেন—না অন্য কিছু? আমাদের শাস্ত্রকারগণ কি এতই মূর্খ ছিলেন যে, তাঁহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এইরূপ অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক উপদেশ ও অনুশাসন সন্নিবেশিত করিবেন? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহাদের মৎস্য-মাংস ভক্ষণের ইচ্ছা বলবতী, তাঁহাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে কতকগুলি মৎস্য-মাংস হইতে নিবৃত্ত করা আবশ্যক। তৎপরে তাঁহারা ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে অনেক দূর অগ্রসর হইলে, তাদৃশ নিবৃত্তিশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা একেবারে নিষিদ্ধ ব্যবস্থিত হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্রে বিধবা-বিবাহের পক্ষে বিধি ও নিষেধ উভয়ই পাওয়া যায়; এবং পণ্ডিতগণ নানাবিধ বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া, কেহ বা বিধির, কেহ বা নিষেধের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, ঐ বিধি ও নিষেধের প্রয়োগস্থল এক নহে। যাহারা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাদি পরিপালনে অসমর্থা, তাদৃশ দুর্ব্বলাধিকারিণী হীন-হিন্দু-জাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্যই বিধবা-বিবাহ-বিধির অবতারণা। পুরুষের পক্ষেও প্রথমাস্ত্রীর বিয়োগে দারান্তর-পরিগ্রহ শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ না হইলেও, উহা শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রশংসিতও হয় নাই; বরং দারান্তরের অপরিগ্রহই প্রশংসিত

হইয়াছে। বহু অপত্য-উৎপাদন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ না হইলেও, জ্যেষ্ঠেতর সন্ততি 'কামজ' বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, "যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥" (মনু)। ঐরূপ শাস্ত্রে যে প্রকার পরিবারের একান্ন-বাস ব্যবস্থিত হইয়াছে, তদ্রূপ পৃথক্‌বাসেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে; এই সমুদয় ব্যবস্থার প্রয়োগ-স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমাজ-নীতি এবং আচারাদি বিষয়ক বিধি-নিষেধে যেরূপ আপাত-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, ধর্ম্ম-বিষয়েও তদ্রূপ। মনে করুন, কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; আবার কোন স্থলে উপদেশ করা হইতেছে যে, আত্মার মননাদি করা যায় না, ইত্যাদি; এই যে উপ-দেশ-গত বিরোধ দৃষ্ট হয়, এ বিরোধ আদৌ বিরোধ নহে; এই উভয় উপদেশের প্রয়োগ-স্থল এক নহে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না—সত্য, তাঁহার মনন বা শ্রবণ হয় না—সত্য, কিন্তু জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উপাসনার প্রয়োজন, এবং সেই উপাসনা করিতে গেলেই, ব্রহ্ম যে সমুদয় সগুণ-অবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, উপা-সকের অধিকারানুসারে তন্মধ্যে কোন না কোন অবস্থা আদর্শরূপে মানস-মুকুরে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়। কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার নিন্দা করা হইয়াছে, আবার কোন স্থলে প্রতিমা-পূজার প্রশংসা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ নিন্দা বা স্তুতির প্রয়োগস্থল বিভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ অধিকার-ভেদে প্রতিমা-পূজা যেমন প্রশস্ত, তেমনি অধি-কারান্তরে উহা অপ্রশস্ত। এই প্রকার চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আমাদের শাস্ত্রে বিধি নিষেধের যে সমুদয় বৈষম্য বা বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৈষম্য বা বিরোধ নহে; অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। শূদ্রকে বেদা-ধ্যয়নের অধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া, অনেকেই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগকে অনুদার বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা অনুধাবন করিয়া দেখেন না যে, শূদ্র কি এবং তাহাকে বেদাধিকার দেওয়া সঙ্গত কি না এবং দেওয়া যায় কি না? শাস্ত্রা-নুসারে "সর্ব্ব-ভক্ষ্য-রতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরা-শুচিঃ, ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ" অর্থাৎ যাহার সর্ব্বপ্রকার আহারেই প্রীতি, যে কর্ম্মের গুণাগুণ-বিচার না করিয়া সর্ব্বকর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়, যে অশুচি, এবং বেদাদি-আলোচনা পরিহারপূর্ব্বকআচার-ভ্রষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে সেই প্রকৃত শূদ্র। এইরূপ ব্যক্তিকে বেদাধ্যয়ন করাইলে কোন ফলোদয় হয় না। তাহার অধিকার অনু-সারে শনৈঃ শনৈঃ তাহাকে উচ্চ দিকে লইয়া যাওয়াই প্রশস্ত, এবং তজ্জন্যই তন্ত্র-পুরাণাদির অবতারণা হইয়াছে। শাস্ত্রে উচ্চবর্ণস্থ ব্যক্তি-দিগের মধ্যেও যাহাকে তাহাকে বেদান্তাধ্যয়-নের অধিকার দেওয়া হয় নাই; যাহাদের শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা শ্রদ্ধা ও সমাধান, এই ষট্-সম্পত্তি লাভ হয় নাই, এবং যাহাদের নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ ও মুক্তির ইচ্ছা জন্মে নাই, তাদৃশ "সাধন চতুষ্টয়" হীন ব্যক্তিদের বেদান্ত-পাঠে অধিকার নাই; কারণ ঐরূপ ব্যক্তির বেদান্তপাঠে যথার্থ কোন ফলোদয় হয় না; কেবল কতকগুলি শব্দ লইয়া বাগ্ বিতণ্ডা করিবার প্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র; এবং উহাতে ধর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত কোন উন্নতি না

হইয়া বরং অবনতিই হইয়া থাকে; এই জন্যই জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ অধিকার-ভেদে ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক সময়ে আপাত-দৃষ্টিতে ঐ সমুদয় ব্যবস্থা উদার যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেই এই ভ্রান্তি অপনীত হয়।

অস্মদ্দেশে পুনর্বার অধিকার-ভেদে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত করা অতীব আবশ্যক এবং যতদূর পারা যায়, হিন্দু-পত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারি-আশ্রমে এই প্রাচীন এবং সমীচীন রীতি অবলম্বন পুরঃসর শিক্ষা বিধানের ব্যবস্থা করা যাইবে। এই আশ্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মচারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি এবং প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা প্রদান করা যাইবে। আচার্য্যেরা ব্রহ্মচারীদিগকে কিছু কাল স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে রাখিয়া, তাহাদের উপযোগিতা নির্ব্বাচন করিয়া, শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে উচ্চ অধিকারে উন্নীত করিবার চেষ্টা করিবেন। অবস্থা-ভেদে মৃদু, মধ্যম এবং কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-বিধান দ্বারা ব্রহ্মচারীদিগকে সুসংযত করিয়া, তাহাদের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে যত্নবান হইবেন।

কার্য্যেই কেবল মানবের অধিকার, ফল ভগবানের হস্তে। প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের দ্বারা যদি অন্ততঃ একজন ব্রহ্মচারীরও জীবন প্রাচীন ঋষিদিগের আদর্শানুসারে সুগঠিত হয়, তাহা হইলে, আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব; কারণ কে জানে যে, ভগবানের দুরতিক্রম্য বিধান অনুসারে একটিমাত্র জীবনের দ্বারা ভারতবর্ষে যুগান্তর উপস্থিত হইবে না।

বেদান্ত-দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—•:০:•—

আহ কোঽয়মধ্যাসো নামেতি? উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তংকেচিদন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস ইতি বদন্তি। কেচিত্তু যত্রযদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহ নিববন্ধনো ভ্রম ইতি। অন্যেতু যত্র যদধ্যাস স্তস্যৈব বিপরীত ধর্ম্মত্ব কল্পনামাচক্ষতে। সর্ব্বথাপিতু অন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথা চ লোকেঽনুভবঃ, শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি। কথং পুনঃ প্রত্যগাত্মন্যবিষয়েঽধ্যাসো বিষয় তদ্ধর্ম্মাণাং, সর্ব্বো হি পুরোঽবস্থিতে বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যস্যতি, যুষ্মত্প্রত্যয়াপেতস্য চ প্রত্যগাত্মনোঽবিষয়ত্বং ব্রবীষি। উচ্যতে। নতাবদয়মেকান্তেনাবিষয়ঃ, অস্মত্প্রত্যয়বিষয়ত্বাদপরোক্ষত্বাচ্চ প্রত্যগাত্ম প্রসিদ্ধেঃ। ন চায়মস্তি নিয়মঃপুরোবস্থিত এব বিষয়ে বিষয়ান্তরমধ্যসিতব্যমিতি। অপ্রত্যক্ষেঽপিহ্যাকাশে বালাস্তলমলিনতাদ্যধ্যস্যন্তি। এবমবিরুদ্ধঃ প্রত্যগাত্মন্যপ্যনাত্মাধ্যাসঃ। তমেতমেবং লক্ষণমধ্যাসং পণ্ডিতা অবিদ্যেতি মন্যন্তে, তদ্বিবেকেন চ বস্তু-স্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ। তত্রৈবং সতি যত্র যদধ্যাসস্তত্কৃতেন দোষেণ গুণেন বাণুমাত্রেণাপি স ন সংবধ্যতে। শাং ভাং। ৩।

পদপাঠঃ। আহ। কঃ। অয়ং। অধ্যাসঃ। নামা। ইতি। উচ্যতে। স্মৃতিরূপঃ। পরত্র। পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং। কেচিত্। অন্যত্র। অন্যধর্ম্মাধ্যাসঃ। ইতি। বদন্তি। কেচিত্। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ। ভ্রমঃ। ইতি। অন্যে। তু। যত্র। যদধ্যাসঃ। তস্য। এব।

বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং। আচক্ষতে। সর্ব্বথা। অপি। তু। অন্যস্য। অন্যধর্ম্মাবভাসতাং। ন। ব্যভিচরতি। তথা। চ। লোকে। অনুভবঃ। শুক্তিকা। হি। রজতবৎ। অবভাসতে। একঃ। চন্দ্রঃ। সদ্বিতীয়বৎ। ইতি। কথং। পুনঃ। প্রত্যগাত্মনি। অবিষয়ে। অধ্যাসঃ। বিষয় তদ্ধর্ম্মাণাং। সর্ব্বঃ। হি। পুরঃ। অবস্থিতে। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যস্যতি। যুষ্মত্‌প্রত্যয়াপেতস্য। চ। প্রত্যগাত্মনঃ। অবিষয়ত্বং। ব্রবীষি। উচ্যতে। ন। তাবৎ। অয়ং। একান্তেন। অবিষয়ঃ। অস্মত্‌প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ। অপরোক্ষত্বাৎ। চ। প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ। ন। চ। অয়ং। অস্তি। নিয়মঃ। পুরঃ। অবস্থিতে। এব। বিষয়ে। বিষয়ান্তরং। অধ্যসিতব্যং। ইতি। অপ্রত্যক্ষে। অপি। হি। আকাশে। বালাঃ। তলমলিনতাদি। অধ্যস্যন্তি। এবং। অবিরুদ্ধঃ। প্রত্যগাত্মনি। অপি। অনাত্মাধ্যাসঃ। তং। এতং। এবং লক্ষণং। অধ্যাসং। পণ্ডিতাঃ। অবিদ্যা। ইতি। মন্যন্তে। তদ্বিবেকেন। চ। বস্তুস্বরূপাবধারণং। বিদ্যাং। আহুঃ। তত্র। এবং। সতি। যত্র। যদধ্যাসঃ। তৎকৃতেন। দোষেণ। গুণেন। বা। অণুমাত্রেণ। অপি। ন। স। সংবধ্যতে। ৩।

প্রত্যেকপদের অর্থ।—আহ-বলিতেছে (প্রতিবাদী)। কঃ—কে?। অয়ং—এই। অধ্যাসঃ—আত্মা এবং অনাত্মার তাদাত্ম্যারোপ। নাম—নামক। ইতি—ইহা। উচ্যতে-বলাযাইতেছে (উত্তর)। স্মৃতিরূপঃ—স্মরণাত্মক জ্ঞান সদৃশ। পরত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ—অবভাসকালীন যে রৌপ্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি হয়, তাহা হইতে ভিন্ন রজতাদি পদার্থে। পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ—পূর্ব্বকালীন অনুভূত পদার্থের মিথ্যাজ্ঞান। (অধ্যাস) তং—সেই অধ্যাসকে। কেচিৎ কোন পণ্ডিতগণ (সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধগণ)। অন্যত্র—অপর পদার্থে—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থে। অন্য ধর্ম্মাধ্যাসঃ—অপর পদার্থগতধর্ম্মসমূহের আরোপ—অর্থাৎ জ্ঞানগত রজতত্ব সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-বৃাহের তাদাত্ম্য-প্রতীতি। ইতি—ইহাকে। বদন্তি—বলিয়া থাকেন। (অধ্যাস) কেচিত্‌—কোন কোন পণ্ডিতদল। তু—বা। যত্র-যাহাতে অর্থাৎ-শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতিতে। যদধ্যাসঃ যাহার-আরোপ—অর্থাৎ রজতসর্পাদির যে প্রতীতি। তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ—তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাবজনিত—অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি দ্রব্যের এবং রজত-সর্প প্রভৃতি প্রজ্ঞানের তাদাত্ম্য-প্রতীতি নিবন্ধন। ভ্রমঃ-ভুল। ইতি-ইহাকে—অর্থাৎ জ্ঞান এবং স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশপূর্ব্বক রজতাদি ব্যবহারকে অধ্যাস আখ্যায় অভিহিত করেন। অন্যে—অপর কোন পণ্ডিতগণ। তু—বা। যত্র—যাহাতে (শুক্তিকাদিতে)। যদধ্যাসঃ—যাহাতে (রজতাদির) আরোপ। তস্য—তাহার (শুক্তিকাদির) এব—ই। বিপরীতধর্ম্মত্ব-কল্পনা—তাহাতে যে ধর্ম্মসমূহের বিদ্যমানতা নাই, সেই ধর্ম্ম-সমষ্টির কল্পনা করাকে—অর্থাৎ শুক্তিকা এবং রজ্জু প্রভৃতি অধ্যাসাশ্রিত পদার্থে রজতত্ব ও সর্পত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে। (অধ্যাস) আচক্ষতে-বলিয়াথাকেন। সর্ব্বথা-সকল প্রকারে-অর্থাৎ যিনি যে প্রকার অধ্যাসের লক্ষণ নির্দ্দেশ করুন, সে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা। অপি—ই। তু—কিন্তু। অন্যস্য—একবিধ পদার্থে। অন্য-ধর্ম্মাবভাসতাং—অন্যবিধ পদার্থের এবং অপর পদার্থগত ধর্ম্মসমূহের অবভাসকে।

ন—না। ব্যভিচরতি—ব্যভিচার (অতিক্রম) করিতেছে। তথা—সেই প্রকার। চ—ই। লোকে—মানবগণের। অনুভব—প্রতীতি। শুক্তিকা (ঝিনুক) হি—ই। রজতবৎ—রৌপ্য সদৃশ। অবভাসতে—প্রকাশিত হইতেছে। একঃ—একই। চন্দ্রঃ—চাঁদ। সদ্বিতীয়বৎ—দুইটীর মত (অবভাসিত হইতেছিল) ইতি—ইহা। কথং—কি প্রকারে। পুনঃ—বা। প্রত্যগাত্মনি-চিৎস্বভাব আত্মাতে। অবিষয়ে-জ্ঞাতৃস্বভাবে—অর্থাৎ অপরাধীনপ্রকাশে—অধ্যাসঃ—তাদাত্ম্যারোপ। বিষয়তদ্ধর্ম্মাণাং। বিষয়ের—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির এবং বিষয়গত ধর্ম্মসমূহের—অর্থাৎ জরা, মরণ, কাণত্ব, খঞ্জত্ব, বধিরত্ব, সুখিত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতির। সর্ব্বঃ—সকল লোক। হি-ই। পুরঃ-অগ্রবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত। বিষয়ে—পদার্থে। বিষয়ান্তরং—পদার্থান্তরের। অধ্যস্যতি—অধ্যাস করিয়া থাকে। যুষ্মৎ-প্রত্যয়াপেতস্য—"যুষ্মদ্" অর্থাৎ "ইদং" "এই" এতাদৃশ জ্ঞানের অলভ্য। চ—কিন্তু। প্রত্যগাত্মনঃ-চিৎস্বরূপ আত্মাকে। অবিষয়-জ্ঞানের অনধিগম্য—অর্থাৎ বিষয়ী। ব্রবীষি—বলিতেছ। উচ্যতে—বলা যাইতেছে। ন—না। তাবৎ—এতাবতা। অয়ং—এই চিদাত্মা। একান্তেন—সর্ব্বপ্রকারেই। অবিষয়ঃ-জ্ঞানানধিগম্য। অস্মৎপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ—"অস্মদ্" "অহং" বা আমি, এতাদৃশ জ্ঞানাধিগম্যতা বশতঃ। অপরোক্ষত্বাৎ-প্রত্যক্ষ-হেতুক। চ—এবং। প্রত্যগাত্মপ্রসিদ্ধেঃ—চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধতা। ন-না। চ-বা। অয়ং—এই। অস্তি-আছে। নিয়মঃ—শৃঙ্খলবদ্ধ। পুরঃ-সমীপবর্ত্তী। অবস্থিতে—উপস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর। বিষয়ে—পদার্থে [illegible] বিষয়ান্তরং—অপর পদার্থের। অধ্যসিতব্যং—অধ্যাস (আরোপ) করিতে হইবে। ইতি-ইহা। অপ্রত্যক্ষে—ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অপি—ও। হি-যেহেতু। আকাশে-নভোমণ্ডলেতে। বালাঃ- অবিবেকী মানবগণ। তলমলিনতাদি—আকাশের তল, আকাশ নীল, আকাশ অস্বচ্ছ, ইত্যাদি। অধ্যস্যন্তি—অধ্যাস করিয়া থাকে। এবং—এইরূপ। অবিরুদ্ধ—কোন বিরোধ নাই। প্রত্যগাত্মনি-চিন্ময় আত্মাতে। অপি-ও। অনাত্মাধ্যাসঃ—আত্মাভিন্ন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসের। তং—প্রসিদ্ধ। এতং—এই। এবং লক্ষণং—এতদ্রূপ। অধ্যাসং—অধ্যাসকে। পণ্ডিতাঃ—পণ্ডিতগণ—তত্ত্ববিদ্মানবগণ। অবিদ্যা-অনাদি-অনির্ব্বচনীয়-জ্ঞান-বিরোধি-ভাবরূপ অজ্ঞান। ইতি—ইহা। মন্যন্তে—মনে করিয়া থাকেন। তদ্বিবেকেন—তাহা হইতে পৃথক্‌ভাবে—অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র-রূপে। চ-এবং। বস্তুস্বরূপাবধারণং—তত্ত্বের যথাযথ রূপনির্ণয় করাকে—অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপাববোধকে। বিদ্যাং—জ্ঞান। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। তত্র—তবে। এবং—এই প্রকার। সতি—হইলে। যত্র—যাহাতে। যদধ্যাসঃ-যাহার তাদাত্ম্যারোপ। তৎকৃতেন-তজ্জনিত। দোষেণ—দোষ দ্বারা। গুণেন—গুণ দ্বারা। বা—অথবা। অণুমাত্রেণ—অত্যল্প মাত্রায়। অপি—ও। স—সে। ন—না। সংবধ্যতে—সম্বদ্ধ হয়। ৩।

বিশদ বঙ্গানুবাদ। যদি জিজ্ঞাসা কর, এই 'অধ্যাস' নামক পদার্থটী কি? তদুত্তরে বলা যায় "স্মৃতিজ্ঞানসদৃশশুক্তিকাদি পদার্থে পূর্ব্বানুভূত রজতাদি পদার্থের যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহাকেই অধ্যাস বলা যায়। এই অধ্যাসকে সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ-পণ্ডিতগণ "বাহ্যপদার্থে জ্ঞানগত ধর্ম্মের

আরোপ" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ শুক্তিকা-রজ্জু প্রভৃতি বাহ্য পদার্থজাতে আভ্যন্তরীণ জ্ঞানগত রজতত্ব, সর্পত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের আরোপই অধ্যাস, এবম্প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন। "যাহাতে যাহার আরোপ, তাহাদের পার্থক্য-জ্ঞানাভাব জনিত ভ্রমই অধ্যাস" অধ্যাসের এই লক্ষণ অপর সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—অর্থাৎ দৃষ্ট শুক্তিকাদিতে স্মৃত রজতাদির পার্থক্যজ্ঞানাভাব-নিবন্ধন জ্ঞান ও স্মরণের পরস্পর সামানাধিকরণ্য-ব্যপদেশপূর্ব্বক রজতের ব্যবহারকেই 'অধ্যাস' বলিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ, যাহাতে যাহার অধ্যাস, তাহারই বিপরীত ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস বলিয়াছেন; অর্থাৎ যে শুক্তিকাদিতে রজতাদির আরোপ করা হয়, সেই শুক্তিকাতেই বৈপরীত্যরূপে রজতত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনাকে অধ্যাস নামে নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু যিনি যেপ্রকারই অধ্যাসের লক্ষণ নির্ণয় করুন, সেই সমস্ত লক্ষণ দ্বারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থ-ধর্ম্মের অবভাস যে অধ্যাস, এই সাধারণ লক্ষণের ব্যভিচার হইতেছে না; অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য ধর্ম্মের কল্পনা যে মিথ্যা এবং অনির্ব্বচনীয়, ইহা সকল পণ্ডিতেরই অভিমত। এই মিথ্যানুভব যে কেবল পরীক্ষকদিগেরই হইয়া থাকে, তাহা নহে, প্রাকৃত মানবদেরও এতাদৃশ মিথ্যানুভব হইয়া থাকে; অর্থাৎ যেমন লোকে বলিয়া থাকে "এই দৃশ্য শুক্তিকাই আমাদের নিকট এতাবৎকাল রজতের ন্যায় অবভাসিত হইতেছিল"। যদি বল, এক পদার্থে অন্য পদার্থের এইরূপ মিথ্যাবভাস লোকে প্রসিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু অভিন্ন একই পদার্থে ভেদ-বিভ্রম কোন স্থানেইত দেখা যায় না; অতএব কিরূপে অভিন্ন এক আত্মারই জীবগণের সহ ভেদ-বিভ্রম ঘটিতে পারে? উত্তরে বলিব, এ আপত্তিও হইতে পারে না, কেননা "একই চন্দ্র দুইএর মত প্রতিভাত হইতেছে" বিভ্রম-মূলক এইরূপ ব্যবহারও অপ্রসিদ্ধ নহে। যদি বল, চিন্ময়বিষয়ী আত্মাতে দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অচেতন জড়পদার্থের এবং স্থূলত্ব, কৃশত্ব, কাণত্ব, বধিরত্বাদি জড়গত ধর্ম্মসমূহের কিরূপে অধ্যাস হওয়া সম্ভব? কেননা, দেখা যায়, সকল লোকই সমীপা-বস্থিত বিষয়েতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিয়া থাকে; বিশেষতঃ তুমি এই চিৎস্বরূপ আত্মাকে "যুষ্মদ্"—অর্থাৎ ইদং বা এই, এতাদৃশ জ্ঞানের অনধিগম্য এবং বিষয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ। অতএব চিন্ময় বিষয়ী আত্মাতে অচেতন দেহাদির অধ্যাস হওয়া কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? এই আপত্তির উত্তরে আমরা বলিব, চিন্ময় এই আত্মা কোন অবস্থাতেই বিষয় হন না, একথা আমাদের স্বীকার্য্য নয়, কেননা ব্যবহারদশাতে সংসারাবস্থায় "অস্মদ্" অর্থাৎ অহং বা আমি, এই জ্ঞানের বিষয় আত্মা হন, একথা আমরা স্বীকার করিয়া থাকি; বিশেষতঃ চিন্ময় আন্তর জীবাত্মার প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষই হইতেছে। অপর, তুমি যে আপত্তি করিয়াছ, "সমীপাবস্থিত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস হইয়া থাকে" এই আপত্তিও হইতে পারে না; কেননা এইরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না যে, পুরোবস্থিত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়েই বিষয়ান্তরের অধ্যাস করিতে হইবে; যেহেতু অবিবেকী মানবগণ অপ্রত্যক্ষ—ইন্দ্রিয়-গণের অবিষয় নিরাকার আকাশেও তলমা-

মলিনত্বাদি—অর্থাৎ আকাশের তল, আকাশ মলিন, আকাশ নীলবর্ণ, ইত্যাদি নানারূপ অধ্যাস করিয়া থাকে।' অতএব আমরা বলিব, চিন্ময় নিরাকার অস্মত্প্রত্যয়ের বিষয় আত্মাতে বিষয়ান্তরের—অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জরা, মরণ প্রভৃতি বিষয়ের অধ্যাস হওয়ায় কোন বিরোধই দেখা যায় না। পণ্ডিতগণ এই অনাদি-সিদ্ধ অধ্যাসকেই অবিদ্যা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং এই 'অবিদ্যা' হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মার যথাযথ স্বরূপাবধারণকে 'বিদ্যা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব অধ্যাসের স্বরূপ বিচার দ্বারা অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা যদি বস্তুতঃ মিথ্যাই নির্ণীত হইল, তবে অনির্ব্বচনীয় মিথ্যাভূত অবিদ্যা-জনিত দোষ দ্বারা বা গুণ দ্বারা চিন্ময় আত্মা অণুমাত্রও সম্বদ্ধ হন না, ইহাই অবিচলিত সিদ্ধান্ত। ৩।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।

পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

—•:০:•—

আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে যে (হিন্দুপত্রিকায় ১৩০৩ সনের ৩।৪।৫।৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) জীব মাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন। অবিদ্যার ধর্ম্ম এই যে, ঐ অবিদ্যা রজ্জু-সর্প-জ্ঞানের ন্যায় প্রকৃত বস্তুর অপ্রকৃতভাবে বোধ বা জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বেদান্তের মতে ব্রহ্মই আত্মা এবং আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র, এবং ঐ [illegible] ঐ ভাবময় জ্ঞানাভাস—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অবিদ্যাচ্ছন্ন প্রতিবিম্ব মাত্র। অবিদ্যা দূর হইলে, যখন ঐ প্রতিবিম্ব স্বরূপের সহিত এক হইয়া যায়, তখন সর্প মিথ্যা এবং রজ্জু প্রকৃত, এই জ্ঞানের ন্যায় দৃশ্য জগৎ মিথ্যা—আত্মা বা ব্রহ্মই প্রকৃত, এই জ্ঞান হয়; অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। উপনিষদ্—বেদান্ত-প্রণেতা মহর্ষিগণ এবং ভাষ্যকার মহাত্মা শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী অবিদ্যাচ্ছন্ন শিষ্যবর্গের অবিদ্যা দূরীভূত করার জন্য ঐ আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—

বুদ্ধিতৎস্থ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানংধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃস্ফুরেৎ॥
ব্রহ্মণ্যাজ্ঞান নাশায় বৃত্তির্ব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ং স্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে॥

বঙ্গানুবাদ—যেমন বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস ঘটে ব্যাপ্ত হওয়ায়, বুদ্ধি অন্তরের জড়তা—অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ নষ্ট করে, তখন চিদাভাস কর্ত্তৃক ঘট দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নির্ম্মল বুদ্ধি অন্তরের মলিনত্ব—অর্থাৎ ভ্রান্ত-জ্ঞান দূর করিয়া দিলে, স্বয়ং চৈতন্যের বিকাশ হওয়ায়, আভাস তদন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশিত হয়; অতএব ঋষিগণ বিষ দ্বারা বিষ নাশের ন্যায় মহাকাশ, ঘটাকাশ, জলাকাশ, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা বাহ্য জগৎ মিথ্যা, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা অবিদ্যা নষ্ট না হইলে, অপরোক্ষ জ্ঞানের, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎভাবে আত্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। অগ্রে গুরুর নিকট বেদান্ত-শ্রবণ বা পঠন সমাপ্তি করিয়া, তাহার অর্থ বোধগম্য হইলে, পরোক্ষ-আত্মজ্ঞানের উদয় হয়; তখন বাহ্যজগৎ

হইতে মন গুটাইয়া লইয়া, একাগ্রতার সহিত ঐ তত্ত্বের অবিচ্ছেদ-চিন্তা দ্বারা অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হইতে হয়, এবং অন্তর্জ্জগৎ সম্যক্‌রূপ পরিদর্শন ও তাহা ভেদ করিয়া, কারণ-ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারিলে অবিদ্যা নষ্ট হয়, এবং মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্ঞান-সূর্য্য সমুদিত হয়। যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের মলিন প্রতিবিম্ব জলে পতিত হওয়ার পর ঐ মেঘ এবং জল দূরীভূত হইলে, ঐ জলস্থ প্রতিবিম্ব সূর্য্যেই লীন হয়, সেইরূপ অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মার প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হইলে, আত্মা জীব-পদ-বাচ্য হন। ঐ বুদ্ধি কর্ত্তৃক অবিদ্যা দূরীভূত হইলে, আত্মার জ্যোতিতে বুদ্ধির স্বচ্ছতা মিশিয়া যায় এবং ঐ বুদ্ধিস্থ প্রতিবিম্বও আত্মায় লীন হইয়া আত্মার স্বরূপ-জ্ঞানের বিকাশ হয়। * এই দৃষ্টান্ত একদেশ-ব্যাপী হইলেও, প্রকৃত বিষয়ের অনেক সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মের ঐ নিত্য-কল্পনাশক্তিই তাঁহার মায়া; ঐ দর্পণস্থ বা বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্বই ঐ কল্পিত জগৎ দর্শন করেন।

এই দৃশ্য-জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি—কল্পনা বা কল্পিত ভাবের ছায়া মাত্র। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ; ব্রহ্মের ঐ কল্পনা-শক্তির নাম মায়া। ঐ শক্তির প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও অপ্রকাশ, এই ত্রিবিধ গুণ* আছে; শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাদিগের নাম যথাক্রমে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণই সচ্চিদানন্দের জ্ঞান-জ্যোতির প্রকাশক দর্পণ স্বরূপ। প্রকাশক দর্পণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ জ্যোতি চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইলে, সেই জ্যোতি চক্ষু-ফলকে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় দর্পণকে মহদ্‌ব্রহ্ম—মহান্ আত্মা—মহত্তত্ত্ব বলে। ঐ মহত্তত্ত্বই জগতে সমষ্টি-বুদ্ধি। ঐ সমষ্টি-বুদ্ধিতে জ্ঞানের আভাসময় ভাব-প্রবাহ সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রতিবিম্বিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে ঐ মহত্তত্ত্বই ব্রহ্মজ্ঞানের মহদ্দর্পণ স্বরূপ। ঐ মহদ্দর্পণে অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান-সূর্য্যের* বিকাশই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরকেও চিদ্‌বিম্ব বলা হইয়াছে; ঐ চিদ্বিম্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিম্ব অর্থে আকার বা মূর্ত্তি, এস্থলে সমষ্টি-বুদ্ধিরূপ দর্পণে চৈতন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকল্পনাকারী মহামানসাকারে প্রতিবিম্বিত বা প্রকটিত হন। ঐ মহামনের

---

* যেমন সূর্য্য উদয় হইলে, প্রদীপের স্বচ্ছতা থাকে না; সূর্য্যের জ্যোতিতে প্রদীপের আলোক মিশিয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে, বুদ্ধি আত্মার জ্যোতিতে মিশিয়া যায় এবং বুদ্ধিস্থ আত্মপ্রতিবিম্ব আত্মার লীন হয়।

* ঐ ত্রিগুণ প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুণ নহে; [illegible] প্রকাশ (ব্যক্তভাব) অপ্রকাশ (অব্যক্তভাব) প্রভৃতি অবস্থা মাত্র; প্রবৃত্তি ঐ প্রকাশ-অপ্রকাশ-ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক মাত্র। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ অব্যক্ত—অর্থাৎ তমসাচ্ছন্ন হওয়ায়, ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক রজোগুণ কর্ত্তৃক পুনঃ সৃষ্টি প্রকাশ হইলে, তৎসহ জ্ঞান দর্পণরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়।

* কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের মতে সূর্য্য স্বয়ং তেজোময় নহে; সূর্য্য তেজ বা জ্যোতির অক্ষ্য (ফোকস্); বিশ্বের সর্ব্বস্থানেই তৈজস বা তাড়িত-তত্ত্ব গুহাভাবে আছে; ঐ বিশ্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতি, সূর্য্যরূপ দর্পণে যে প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই সূর্য্য। আমাদের শাস্ত্রের মতে দ্বাদশ প্রকার তেজের অধিষ্ঠাতা দ্বাদশ আদিত্যস্বরূপ "হিরণ্ময় পুরুষ" সূর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন; জগৎ-প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার তেজোময় রশ্মি সকল সূর্য্যকে বহন করিতেছে, যথা—"জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং"।

অন্তরঙ্গ জ্ঞানাভাসময়ী চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ-ভাবাভাসময়ী জড় শক্তি। অপিচ, যখন ভাবময়ী শক্তির গুণ-ক্ষোভ-হেতু উক্ত মহদ্দর্পণে গুণের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত সত্ত্বগুণের সহিত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ হয় এবং ঐ রজস্তমোগুণের সংস্রবে সত্ত্বগুণ মলিন হয়; সুতরাং ঐ মলিন সত্ত্বগুণস্থ আনন্দ ও জ্ঞানের আভাস ভ্রান্ত ও বিকৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত রজস্তমোগুণের সংঘর্ষণ বা গুণ-ক্ষোভ সমষ্টি-সত্ত্বময় মহদ্দর্পণের বহিরঙ্গস্থিত ও একদেশব্যাপী; আবার উহা গুণের তারতম্যানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্ফুরিত হওয়ায়, ঐ ভ্রান্ত-সুখ ও জ্ঞানাভাসও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, অর্থাৎ মহদ্বুদ্ধিরূপ দর্পণে যে ভাবটী কল্পিত হয়, ঐ কল্পিত ভাবস্থিত জ্ঞানাভাস তদাকারে বিকাশিত হইয়া, আমিত্বরূপে প্রকটিত বা ঐ ভাবই স্বয়ং আমি, এই অভিমান হয়। এইরূপে অনন্ত-দর্পণে কোটি-কোটি 'আমি' ভাসমান হয়! ঐ মলিন সত্ত্বগুণই ভ্রান্ত-সুখ ও ভ্রান্তজ্ঞানের কারণীভূত অবিদ্যা বা জীবের কারণ-শরীর। উহা ঈশ্বরের পক্ষে বহিরঙ্গরূপে কল্পনা বা ভাবময়ী শক্তি হইলেও, জীবপক্ষে অন্তরঙ্গ; উহাই জীবের চিত্ত বা অন্তঃকরণের বীজ-স্বরূপ।

ঐ পৃথক্ পৃথক্ চিত্তস্থ সুখ ও জ্ঞানাভাসই ব্যষ্টি-জীবাত্মা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরের ভাব মহামানস-ক্ষেত্রে সৃষ্টি-কল্পনাকারে প্রকটিত হয়; জীবের চিত্তে ঐ সৃষ্টি সত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, গুণের বৈষম্য ও গুণ-ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, সত্ত্ব-দর্পণে রজো-গুণ-কল্পিত [illegible] আবৃত্তি হওয়ায়, জীবের কার্য্য ও ভোগের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ভাবাংশ তমোগুণাক্রান্ত হইয়া, দৃশ্য-জগতের কারণ-স্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ-তন্মাত্রে কল্পিত এবং ঐ সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্রা এই আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিরূপে প্রকটিত হয়, এবং ঐ সকল ভূতের পরস্পর-সংমিশ্রণে পৃথিব্যাদি স্থূল-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ পঞ্চ মহাভূত, তমোগুণ-প্রধান ভাব হইতে প্রকটিত হইলেও উহাদিগের অভ্যন্তরে সত্ত্ব-রজ-গুণ আছে। বিষয় মাত্রেই ত্রিগুণের বিকার। যেহেতু সত্ত্বগুণই প্রকাশ-স্বভাব; রজোগুণই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া-স্বভাব এবং তমোগুণই আবরণরূপ স্থূল-বিষয়-স্বভাব হইতেছে। যেমন মহাশক্তি-ক্ষেত্রে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতে মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি, রজোগুণ হইতে সৃষ্টি (কল্পনা) প্রবৃত্তি ও ক্রিয়া, তমোগুণ হইতে প্রাপ্ত বিষয়রূপ পঞ্চ-তন্মাত্রা প্রকটিত ও তাহা পঞ্চভূতরূপে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ ঐ পঞ্চ ভূতস্থ সত্ত্বাংশ হইতে জীবাত্মার ভ্রান্ত-জ্ঞান-প্রকাশের দর্পণ স্বরূপ বুদ্ধি ও তাহাতে বিষয়-ভোগ-কল্পনাকারী মন এবং ঐ বিষয়-ভোগের (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণের) দ্বারস্বরূপ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রসন ও আঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্বের বিকাশ হয়, এবং ঐ পঞ্চভূতস্থ রজোগুণাংশ হইতে ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাক, মল-মূত্র-ত্যাগ, উদ্গার এবং রক্তসঞ্চালনী ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক) পঞ্চপ্রাণ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা (বাগিন্দ্রিয়); শিশ্ন, পায়ু, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়-তত্ত্বের, এবং ঐ পঞ্চভূতের তমোগুণাংশ হইতে সপ্তধাতুময় স্থূল-দেহ-তত্ত্বের বিকাশ হয়। উপরোক্ত বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশতত্ত্বই জীবাত্মার ভোগাশ্রয় [illegible]

লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহ, এবং ঐ লিঙ্গদেহস্থিত জীবাত্মার আবার স্থূল-বিষয়-ভোগের নিমিত্ত ভোগাশ্রয়স্বরূপ স্থূল দেহ হইতেছে। উপরোক্ত জীব বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ; তন্মধ্যে কতক সূক্ষ্ম ভাবাপন্ন, কতকগুলি স্থূলভাবাপন্ন ; ঐ সূক্ষ্ম ও স্থূল, উভয় শ্রেণীতে জীবের মধ্যে আবার অবান্তর ভাগ আছে, এবং তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-শক্তি-বিকাশের ও অজ্ঞান-আবরণের তারতম্যানুসারে উচ্চ নীচ ভেদে তাহাদের অবস্থা, গুণ ও রূপেরও অনেক তারতম্য আছে। ঐ সূক্ষ্ম জীব-শ্রেণীর মধ্যে দেব, সিদ্ধ, পিতৃ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি আরও বহুতর জাতি আছে, এবং তন্মধ্যে প্রায় ঈশ্বরসদৃশ মহাশক্তি ও মহাজ্ঞানসম্পন্ন অত্যুচ্চ দেবতা হইতে অতি নিকৃষ্ট হিংস্র পিশাচের ন্যায় এবং তদপেক্ষাও নিকৃষ্টতম সূক্ষ্ম জীব আছে এবং ঐ প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেও আবার অবস্থা-ভেদে অবান্তর-ভাগ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মায়াবাদ।

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সোঽহম্ ব্রহ্ম।

——•:০:•——

আমার জ্ঞান-গোচরে কেবল আমি আছি ; আর আমি ব্যতীত যত কিছু, সবই আমার কল্পিত! সেই কল্পিত পদার্থ সকল যে অন্তে আমার মত কল্পনা করিতে পারে, ইহাও আমার কল্পনার [illegible] অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা সকলেই আমার কল্পিত ; আর আমার কল্পিত তোমরা আমার মত কল্পনা কর কখন? না—আমি যখন কল্পনা করি, যে তোমরা আমার মত কল্পনা করিতেছ! পক্ষান্তরে, আমার কল্পনার সহিত তোমাদের কল্পনা মিলে না কখন? না—যখন আমি ভাবি, যে তোমরা আমার মত ভাবিতেছ না। তোমরা যেমন আমার কল্পিত, তোমাদের কার্য্যগুলিও তেমনই আমার কল্পিত। তোমাদের প্রত্যেক কার্য্য (আমার কার্য্যের সঙ্গে মিলুক আর না'ই মিলুক) আমারই কল্পনা। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত কিছু দেখিতেছি, সকলই আমারই কল্পনা।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রৌপ্যং শুক্তৌ ফণা রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা॥
শরীরং স্বর্গ-নরকৌ বন্ধ-মোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যংচিদাত্মনঃ॥
বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গাইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীনস্বেব ধাবনম্॥

ব্যবহারিক কল্পিত জগতে শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্প-ভ্রম হয়, সৌরকর-তাপিত বায়ুতে যেমন জল-ভ্রম-জনক মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তেমনই আমারই প্রভাময়ী ঈক্ষনীশক্তিতে পারমার্থিক ভাবের অভাব-কালের "আলো-আঁধারিতে" আমিই আমাহইতে পৃথক্‌বৎ বিশ্ব-রূপেরই কল্পনা করিয়া থাকি। এমন কি, আমার দেহ, স্বর্গ-নরক-ভাবনাগত সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ-ভয় ইত্যাদি সকলই আমার কল্পনার লীলা-খেলা ; সুতরাং চিদাত্মা আমার পক্ষে এই কল্পিত মায়িক বিশ্বের সম্বন্ধাধীন সাংসারিক কোন কার্য্যেরই বাস্তবিকতা নাই। যেমন "জলের বিম্ব জলে উদয়—জলে লয় হয় সে মিশে জলে" তেমনই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান

বিচিত্র বিশ্ব আমাতেই উদিত ও বিলীন হয়। এহেন বিশ্বের বাস্তবিকতা-নিরূপণে পণ্ডশ্রম বৃথা। পরমার্থতঃ আমি ছাড়া আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত সমুদয় পদার্থ এবং সেই সমুদয় পদার্থের যাবতীয় ক্রিয়া আমারই কল্পিত; সুতরাং আমার কল্পিত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা সূক্ষ্ম-সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমিই! কি সুখকর কল্পনা!! এতকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে যে, আমি ভিন্ন এই জগতের দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তাই নাই! এ সকল যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই আমার কল্পিত—আমারই সৃষ্ট; সুতরাং আমিই এই সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা সেই (তটস্থ) ব্রহ্মা—(স্বরূপস্থ) ব্রহ্ম!

> "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
> যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভি-
> সম্বিশন্তি।"

সোঽহং ব্রহ্ম,—কি সুখকর কল্পনা! এই প্রকার কল্পনা যখন প্রতীতিতে অভ্যস্ত হইবে, তখন কত সুখী হইব! এই প্রকার কল্পনা অভ্যস্ত হইবার পর যখন মনে—মনের মনে দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিবে যে, এই বিশ্ব আমার কল্পিত বা সৃজিত, তখনই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—ব্রহ্মে লীন হইয়া—ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিব!!

(ক্রমশঃ)

ঋগ্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—•:০:•—

১১।—দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্ত্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।

আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ॥ ১১

পদপাঠঃ—দ্বাদশারম্। নহি। তত্। জরায়। বর্বর্তি। চক্রম্। পরি। দ্যাম্। ঋতস্য। আ। পুত্রাঃ। অগ্নে। মিথুনাসঃ। অত্র। সপ্ত। শতানি। বিংশতিঃ। চ। তস্থুঃ।

অন্বয়ঃ—ঋতস্য—দ্বাদশারং চক্রম্ দ্যাম্ পরিআ বর্বর্তি। তৎহি ন জরায় ভবতীতি শেষঃ। হে অগ্নে! অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ মিথুনাসঃ তস্থুঃ।

ব্যাখ্যা—ঋতস্য—সত্যস্বরূপ আদিত্যের। দ্বাদশ অরং—দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অর (চাকার পাকি) যুক্ত, চক্রম্—মণ্ডল, দ্যাম্ পরি—দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে, আ বর্বর্তি—পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে। তৎ—ঐ চক্র, নহি—কখনও, জরায় ভবতি—জীর্ণ হইতেছে না। হে অগ্নে! হে আদিত্য! অত্র—তোমার এই চক্রে, সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ পুত্রাঃ।—সাত শত বিংশতি পুত্র; মিথুনাসঃ—পরস্পর মিথুনরূপে, অর্থাৎ দিবারাত্রিরূপ যুগ্মভাবে তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে।

বঙ্গার্থ—আদিত্যের দ্বাদশ রাশি বা দ্বাদশ মাস স্বরূপ অরযুক্ত চক্র দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে বারম্বার পরিভ্রমণ করিতেছে; ঐ চক্র কখনও জীর্ণ হয় না। হে সূর্য্য! তোমার এই চক্রে অহোরাত্ররূপ সাত শত বিংশতি পুত্র পরস্পর মিথুনভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

টীকা—এই ঋকে রাশি-চক্রের কথা বলা হইতেছে; ঐ এক এক রাশিকে চক্রের এক অর স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে; প্রত্যেক রাশিতে স্থূল গণনায় সূর্য্যের ত্রিশ দিন অবস্থিতি, এবং তাহাতে বৎসরে ৩৬০ দিন; উহার দিন-রাত্রে দুইগুণ

করিলে ৭২০ হয়। এই ঋকেতে অতি প্রাচীন কালে আর্য্যদিগের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অভিজ্ঞতা প্রমাণিত হইতেছে।

পঞ্চ পাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং
দিব আহুঃ পরে অর্দ্ধে পুরীষিণং।
অথেমে অন্য উপরে বিচক্ষণং
সপ্তচক্রে ষড়র আহুরর্পিতং ॥ ১২

পদপাঠঃ—পঞ্চপাদং। পিতরম্। দ্বাদশাকৃতিম্। দিবঃ। আহুঃ। পরে। অর্দ্ধে। পুরীষিণং। অথ। ইমে। অন্যে। উপরে। বিচক্ষণম্। সপ্তচক্রে। ষট্ অরে। আহুঃ। অর্পিতম্।

অন্বয়—দ্বাদশাকৃতিম্ পঞ্চপাদম্ পিতরং পুরীষিণং দিবঃ পরে অর্দ্ধে অর্পিতং আহুঃ কেচিদিতিশেষঃ। অথ অন্যে ইমে সপ্তচক্রে ষড়রে উপরে বিচক্ষণং অর্পিতং আহুঃ।

ব্যাখ্যা—দ্বাদশাকৃতিম্—দ্বাদশমাসরূপ আকৃতি বিশিষ্ট। পঞ্চপাদং—পঞ্চঋতুযুক্ত (এস্থলে হেমন্ত এবং শিশিরের একত্ব কল্পিত হইয়াছে)। পিতরং—প্রীতিবিধায়ক। পুরীষিণং—সংবৎসরাখ্য চক্রকে, দিবঃ—দ্যুলোকের, পরে অর্দ্ধে—অন্তরীক্ষে (স্থিতে আদিত্যে ইতি অধ্যাহার্য্যং) অর্পিতং—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন। অথ ইমে অন্যে—অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ; বিচক্ষণং—বিবিধ দ্রষ্টা—সূর্য্যকে সপ্তচক্রে—সূর্য্যের সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট—অথবা অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, মুহূর্ত্ত, এই সপ্ত ক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট ষড়রে—ছয় ঋতুরূপ অর যুক্ত, উপরে—সংবৎসরে, অর্পিতম্—আয়ত্ত, আহুঃ—বলিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—কেহ কেহ দ্বাদশমাসরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পঞ্চঋতুযুক্ত প্রীতিপ্রদ সংবৎসরকে অন্তরীক্ষস্থিত সূর্য্যের অধীন বলিয়া থাকেন; আরও অন্য কোন কোন বেদবাদিগণ বিবিধদর্শী সূর্য্যকে, তাঁহার সপ্তরশ্মিরূপ চক্রবিশিষ্ট, অথবা অয়ন-ঋতু-মাস-অহোরাত্র-মুহূর্ত্ত, এই সপ্তক্রমরূপ চক্রবিশিষ্ট, এবং ছয়ঋতুরূপ অরযুক্ত সংবৎসরের অধীন বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ কেহ কালকে সূর্য্যের অধীন, কেহবা সূর্য্যকে কালের অধীন বলেন।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

গীতাভাস।

——०:०:०——

তৃতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

"ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছুই নাই"—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। বাস্তবিক জ্ঞানই পবিত্রতার উৎস, জ্ঞান-বারি ব্যতীত মনের মালিন্য আর কিছুতেই সম্যক্ বিধৌত হয় না। ভক্তি অতি পবিত্র সামগ্রী, কিন্তু তাহা জ্ঞান-উৎসেরই একটী প্রবল প্রবাহ। জ্ঞানই মনুষ্যত্ব; জ্ঞান ব্যতীত মানব দ্বিপদ-পশু মাত্র, কদাচ 'মনুষ্য' নামের উপযুক্ত নহে। অতএব জ্ঞানের উন্মেষেই মনুষ্যত্বের প্রারম্ভ; জ্ঞানের ক্রম-বিকাশেই জীবের ক্রমোন্নতি, এবং জ্ঞানের চরমোৎকর্ষেই জীব ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে। জ্ঞানই নর-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য-মুখে অগ্রসর হওয়াই মানব-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট হইলেই মানবের পতন হয়। মনুষ্য এই লক্ষ্য পরিত্যাগ করিলে, ক্রমশঃ অবনত হইয়া পশুর তুল্য হইয়া পড়ে।

জীবাত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই শরীর রক্ষার্থ প্রকৃতি-প্রণোদিত হইয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কেবলমাত্র তাহাতেই দিবসের কিয়দংশ ব্যয়িত করিয়া, অবশিষ্ট সময় জ্ঞানার্জ্জনে ক্ষেপণ করিলেই মনুষ্য-জীবন যথার্থ যাপন করা হয়। প্রাচীন আর্য্যদিগের—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের জীবন-কাল এইরূপেই অতিবাহিত হইত, এবং তাহার ফলেই আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া একদা জগন্মান্য হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সে নিয়ম, সে আচার, লুপ্তপ্রায় হইয়াছে ; এক্ষণে শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য প্রায় কেহ জ্ঞানান্বেষণ করে না ; জ্ঞান এখন উদ্দেশ্য নহে, ইতর-অভিপ্রায়-সিদ্ধির উপায় মাত্র। কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কি চতুষ্পাঠীর অন্তেবাসী, প্রায় সকলেরই উদ্দেশ্য—ক্ষমতা, পদ বা অর্থ-প্রাপ্তি ; কাজেই প্রকৃতজ্ঞানের অধিকারী তেমন আর কেহই হইতেছে না ; প্রকৃত জ্ঞান, ঐহিক ক্ষমতা, যশ বা অর্থ-লিপ্সার সহচর নহে। যখন জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র সামগ্রী ইহজগতে আর কিছুই নাই, তখন অপবিত্র ঐহিক ক্ষমতা বা অর্থ প্রভৃতির সহিত জ্ঞানের সংহতি হইলে, জ্ঞানের পবিত্রতা কিরূপে রক্ষিত হইবে? এই অর্থ ও ক্ষমতা-সংস্পর্শে পবিত্র জ্ঞান যে অনেক স্থলে মলিন হইয়া পড়ে, তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত কি আমাদিগের নয়ন-পথে প্রতিপদেই পতিত হইতেছে না?

যথার্থ জ্ঞান কি? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

"অধ্যাত্মজ্ঞান—অর্থাৎ আত্মা-পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহাতে নিত্যত্ব—অর্থাৎ নিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য যে মোক্ষ, তাহারই যে আলোচনা, তাহাকে প্রকৃত জ্ঞান বলা যায় ; আর ইহারই যে অন্যথা, তাহাই অজ্ঞান পদ বাচ্য।" আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই মার্জ্জিত মানব-বুদ্ধির চরম লক্ষ্য, এবং ইহারই ফল দুঃখ হইতে মুক্তি। মনুষ্য সুখ চাহে ; মনুষ্য যাহা কিছু কার্য্য করে, তাহা সুখের জন্য ; সুখই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। সেই সুখের অন্বেষণে মনুষ্য ব্যস্ত ; কিন্তু প্রকৃত সুখ কি এবং কিরূপে তাহা লাভ করিতে পারা যায়, তাহা না জানিয়া, অজ্ঞান বশতঃ ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে ; এবং যাহাকে আপাততঃ সুখ বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা পরিণামে দুঃখ রূপে প্রতীয়মান হয়। অজ্ঞানই এরূপ দুঃখের মূল ; অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া, আমরা প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পাইতেছি না ; যাহাকে যাহা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি, সে তাহা নহে! রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় সমস্ত বিষয়েই আমাদিগের ভ্রম উপস্থিত হইতেছে। অজ্ঞানেই এই ভ্রান্তি, এবং এই ভ্রান্তি বশতই আমাদিগের দুঃখ। এই দুঃখ হইতে মুক্তিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য, এবং জ্ঞানই সেই মুক্তির উপায়। আমি অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কই—দুঃখ ত ঘুচিতেছে না ; বরং চেষ্টার ফলে ঐ দুঃখের উপচয়ই হইতেছে। ভাবিলাম, মান-সম্ভ্রম এবং অর্থ-পরিজনে সুখ আছে ; বৈষয়িক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, প্রাণপণে ঐ সকল সামগ্রীর অনুসরণ করিলাম, এবং অধ্যবসায়-বলে উহাদিগকে হস্তগত করিলাম, কিন্তু 'কৃতার্থ' হইতে পারিলাম কই? সুখ ত পাইলামই না, বরং কতকগুলি দুঃখকে ডাকিয়া আনিলাম! বুঝিলাম, প্রকৃত সুখ কি, তাহা জানি না ; প্রকৃতপক্ষে আমার কি উপাদেয়, তাহা বুঝি না ; বাস্তবিক কোন্‌

বস্তুটী আমার, তাহা নির্ণয় করিতে পারি না; কারণ, মূলে 'আমি কে?' আমার তাহারই পরিচয় নাই। আমি যদি জানিতাম আমি কি, যদি আমার সহিত আমার প্রকৃত পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে আমি আমার বাস্তবিক অভাব বুঝিতে পারিতাম। আমার কি যথার্থ উপাদেয়, তাহাও জানিতে পারিতাম; ফলতঃ আমাকে দুঃখমুক্ত করিবার প্রকৃত পথও পাইতাম। এখন বুঝিলাম, আত্মজ্ঞানই সেই পথের প্রদর্শক; আত্মতত্ত্ব ব্যতীত আমার ভ্রান্তি ঘুচিবে না; আমি আমাকে চিনিতে পারিব না; আমি অজ্ঞানান্ধকারে সুখের আকাঙ্ক্ষায় বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইব; প্রকৃত সুখ-লাভে কখনই অধিকারী হইব না। যদি সেই সুখই আস্বাদন করিতে না পারিলাম, তবে এই জীবন ধারণের সার্থকতা কি? শুদ্ধ কি এই রোগ-শোক-সন্তপ্ত দেহভার বহন করিতে, ভাগ্য-জলধির জোয়ার-ভাটায় হাবুডুবু খাইতে, শিশুর ন্যায় কখন হাস্য ও কখন ক্রন্দন করিতে এই ভব-রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছি? এবং কিছুকাল ক্ষণিক সুখ-দুঃখের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলের ন্যায় রঙ্গ করিয়া, রঙ্গমঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হইব? এই কি মনুষ্য-জীবনের পরিণাম? কখনই না; বুদ্ধদেবের সহিত সমস্বরে বলিতে হইবে "কখনই না; অবশ্য ইহার কোন নিগূঢ় কারণ আছে, তাহা জানি না বলিয়াই আমার এই দুঃখ; এই দুঃখ হইতে মুক্তি—অর্থাৎ মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য।" মনু বলিয়াছেন—

তপো বিদ্যাচ বিপ্রস্য নিশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

"তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান, এতদুভয় মাত্র ব্রাহ্মণের মোক্ষ-লাভের হেতু। তন্মধ্যে তপস্যা দ্বারা পাপাসক্তি যায় এবং জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়।"

জ্ঞান ব্যতীত যে যথার্থ সুখ বা শান্তি লাভ করা যাইতে পারে না, তাহা স্থূলতঃ একরূপ হৃদয়ঙ্গম হইল; এখন দেখিতে হইবে, কিরূপে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারা যায়,—যথার্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ কি? গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥

"যাঁহার সমুদয় কর্ম্ম কামনা ও সঙ্কল্পরহিত, বুধগণ সেই জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ-কর্ম্মাকে "পণ্ডিত" বলেন।" অর্থাৎ যিনি অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম-ভাবে কর্ম্ম করেন, এজন্য যাঁহার চিত্ত বিমল হইয়া যথার্থ জ্ঞানে পূর্ণ হইয়াছে, এবং সেই জ্ঞানরূপ বহ্নি দ্বারা যাঁহার কর্ম্ম সকল—অর্থাৎ কর্ম্মফল দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি। জ্ঞানী আসক্তিশূন্য; কর্ত্তব্যানু-রোধেই তিনি কর্ত্তব্য-প্রতিপালন করিয়া থাকেন; ফলার্থের প্ররোচনায় কোন কামনা দ্বারা চালিত হন না। ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশে; তিনি কদাচ ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী নহেন; তিনি এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ ও অনুচিন্তন দ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান-পথে আরোহণ করিয়া, জগতের আদি কারণ ব্রহ্মের তত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়েন এবং নিত্যানন্দে তৃপ্ত হইয়া অকিঞ্চিৎকর বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও অনা-সক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। খ্যাতি বা অর্থের জন্য রাশি রাশি পুস্তক অধ্যয়ন করতঃ তাহাদিগের মর্ম্ম কণ্ঠাগ্রে রাখিয়া তর্কবিশারদ হইলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। বিমল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ না করিয়া, ধনাদি ইতরা-ভিপ্রায়ে জ্ঞানের অনুসরণ করিলে, কদাচ আত্মোৎকর্ষ সংসাধিত হয় না। আত্মোৎ-কর্ষ-সাধনই জ্ঞানের উদ্দেশ্য, বিষয়-বিভব

জ্ঞানের লক্ষ্য নহে ; বরং অনেক স্থলে জ্ঞানের বিরোধী। এই পরিদৃশ্যমান জগৎই আমাদিগের জ্ঞান-ক্ষেত্র ; ধরাতলস্থিত একটী ক্ষুদ্র তৃণ হইতে গগনস্পর্শী ভূধর পর্য্যন্ত সকল বস্তুই জ্ঞানের উদ্দীপক ; শ্যামল তরুশির-বিহারী খদ্যোৎ হইতে অনন্ত-গগন-বক্ষস্থিত শশধর পর্য্যন্ত সকলই সৃষ্টির অতুল বিভবের পরিচায়ক। আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা এই বাহ্য জগতের সহিত যতই পরিচিত হইতে থাকি, এবং তদভ্যন্তরে কি এক অনির্ব্বচনীয় সত্তার অনুভব করিয়া পরম আনন্দ লাভ করি, ততই আমাদিগের জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া সৃষ্টি-কৌশলের তাৎপর্য্যাবগতি হওয়াতে স্রষ্টার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। সৃষ্টি হইতেই স্রষ্টার ধারণা ; বাহ্যজগৎ হইতেই অন্তর্জগতের উন্মেষ ও উন্নতি। অন্তরিন্দ্রিয় মন, চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গণের সহযোগে বাহ্য জগতের সহিত পরিচিত হইয়া, অন্তর-রাজ্যে তাহার সূক্ষ্ম ছায়া সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। স্থূল বা জড়-জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম বা মনোময় জগৎ ক্ষণস্থায়ী নহে। যে জড়-পদার্থের ছায়া মন একবার গ্রহণ করিয়াছে, সেই জড়-বস্তু বিধ্বস্ত হইলে বা অপ্রত্যক্ষ থাকিলেও মনোগৃহীত তদীয় ছায়ার নাশ হয় না। এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে উপনীত হইতে থাকিলে, জ্ঞান ক্রমশঃ পরিমার্জ্জিত হইয়া একমাত্র নিত্য সূক্ষ্মতম বস্তু পরব্রহ্মে পরিসমাপ্ত হওয়ায়, যাঁহার চিত্তে সেই পরব্রহ্মের—সেই সচ্চিদানন্দের আভাস-মাত্রও প্রতিফলিত হইয়াছে, তিনিই বিমল নিত্য সুখ অনুভব করিয়া পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়েন। তাঁহার নিকট এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত পদার্থই আনন্দকর। তিনি সর্ব্বত্রই সেই পরমাত্মার ছায়া অনুভব করিয়া, সকলই শিবময় দেখিয়া থাকেন ; কাজেই তাঁহার অন্তরে সতত বিমল প্রীতির প্রবাহ বহিতে থাকে। যাঁহার চিত্তে এই আনন্দ-প্রবাহ, তাঁহার অন্তর সতত সেই আনন্দ-বারি-বিধৌত হইয়া অতীব নির্ম্মল ও স্বচ্ছ—অতএব বিকারহীন। চিত্ত অবিকৃত থাকিলে, দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ; কেন না মনের বিকারেই দুঃখের জন্ম ; মন বিকৃত হইলেই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়, আমি অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ি—আমার স্থল অতি সঙ্কীর্ণ হয় ; আমি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীব হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে স্বার্থ-রজ্জুতে বদ্ধ থাকাতে, জীবনে দুঃখ বই সুখ দেখিতে পাই না। অজ্ঞানের এই বিকার ; অতএব অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে, কিছুতেই সুখের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আত্মজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান ; এই জ্ঞান না জন্মিলে মনের বিকার ঘুচে না। এই আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে গীতায় যেরূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক অধ্যায়ে যথাস্থানে বিবৃত করা যাইবে ; এস্থলে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জ্ঞান ব্যতীত যে প্রকৃত সুখের সম্ভাবনা হয় না ও যথার্থ আনন্দ অনুভব করিবার শক্তিই জন্মে না, তাহাই প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

"হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! রোগাদি-অভিভূত আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থার্থী—অর্থাৎ ইহকাল বা পরকালে ভোগ-সাধনভূত-অর্থ-লিপ্সু ও জ্ঞানী, এই চারি-

প্রকার সুকৃতিমান্ জনেরা আমাকে উপাসনা করে। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আমাতে নিষ্ঠাবান্ ও একমাত্র আমাতে ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ ; আমি সেই জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয়, আর তিনিও আমার প্রিয়।" শ্রীকৃষ্ণ, উপাসকদিগের মধ্যে জ্ঞানীরই শ্রেষ্ঠতা দেখাইলেন। বাস্তবিক যিনি জ্ঞানী, তিনিই নিষ্কাম হইতে সক্ষম। জ্ঞান ব্যতীত আসক্তির নাশ ও সংশয়ের ছেদন হয় না ; কাজেই নানা কামনা দ্বারা চালিত হইয়া, ভোগসুখার্থে লোকে ভগবানের কাম্যফলপ্রদরূপ নানা দেব দেবীর উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যিনি অনাসক্ত জ্ঞানী, যাঁহার কামনা দূর হইয়াছে, যাঁহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, তিনি একমাত্র ভগবানের মুক্তিদাতৃত্ব-স্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতেই নিষ্ঠাবান হইতে সক্ষম এবং তাঁহার ভক্তিই অচলা। তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মফল-লিপ্ত নহেন ; অতএব তিনিই মুক্ত হইবার উপযুক্ত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

(নবদ্বীপ)

ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

সত্যনিষ্ঠ, সংযতচরিত্র, ভগবানে ভক্তিমান্ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিভূষিত হইয়া বিদ্যার্থীরা মাতৃভূমির মঙ্গল-সাধনোপযোগী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এতদ্দেশে এরূপ কোন বিদ্যামন্দির না থাকাতে, তদুদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান ব্রহ্মচারি-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সংস্থাপনের প্রস্তাব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গ সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। ১৩০২ সালের হিন্দুপত্রিকার শেষ সংখ্যার এবং ১৩০৩ সালের প্রথম দুই সংখ্যার উক্ত আশ্রম সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল ; সুতরাং যে যে নিয়মে উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইবে, এস্থলে তাহার বিস্তৃত বিবরণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ হিন্দুপত্রিকার উক্ত সংখ্যা সমূহে প্রকাশিত আশ্রম-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

ব্রহ্মচারি-আশ্রম সম্বন্ধীয় আমাদের উদ্দেশ্য সমূহ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করা দীর্ঘ-সময়-সাপেক্ষ। আপাততঃ আমি ইহার আরম্ভ মাত্র করিতেছি, এবং আরম্ভই নিরতিশয় আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ব্রহ্মচারি-আশ্রমের সুপরিচালন এবং অধ্যাপনার জন্য, সৌভাগ্যবশতঃ আমরা মাদ্রাজের অন্তর্গত কোম্বাকোনাম-নিবাসী বেদ, উপনিষদ্, এবং হিন্দুদর্শন-শাস্ত্রে সম্যক্‌প্রকারে অভিজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহোদয়ের সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও তিন জন সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত আশ্রমের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আশ্রম নিজের ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে না পারিবে, ততদিন তাঁহারা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া অধ্যাপনাদি করিবেন। ইহা ভিন্ন নব্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রের শিক্ষা-বিধানের জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুদর্শী দুইজন উপাধিধারী মহোদয়ের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহারাও আপাততঃ বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

যত সত্বর সম্ভব হয়, আমি হিন্দু-দর্শন-শাস্ত্রের প্রত্যেক বিভাগের এবং কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্ম-শাস্ত্র, হিন্দু-গণিত, জ্যোতিষ

ও আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

আশ্রমে যে ২ বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করা যাইবে, তাহার, এবং অধ্যাপকগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিষয়।	অধ্যাপক।
পাণিনি ব্যাকরণ—নিরুক্ত	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
ঋগ্বেদ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
সামবেদ (সামগান সহ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক। (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
অথর্ব্ববেদ ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
উপনিষদ্ সমূহ ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ...	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
জৈমিনি বা পূর্ব্বমীমাংসা ...	ঐ
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক, (এখনও নিযুক্ত হন নাই)
বেদান্ত—(বিশিষ্ট এবং বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ)	পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক (বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বিষয়ক) পণ্ডিত দ্বারকানাথ বেদান্তরত্ন।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, কাণাদ বা বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্র।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
সংস্কৃত কাব্য এবং অলঙ্কার ...	পণ্ডিত মদনমোহন কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ।

বিষয়।	অধ্যাপক।
ঐ ...	সহকারী অধ্যাপক পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।
পালি—(বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের ভাষা) ...	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু-গণিত, হিন্দু জ্যোতিষ, সঙ্গীত-বিদ্যা (দেশীয় ও ইউরোপীয়)	এখনও নিযুক্ত হন নাই।

(সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, কল্পসূত্র, পুরাণ প্রভৃতিতেও পণ্ডিত রাঘবতাতাচার্য্য অগ্নিহোত্রী বিশেষ অভিজ্ঞ, কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর বিষয়ের অধ্যাপনা একজনের দুঃসাধ্য বলিয়া, অন্যান্য অধ্যাপক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যাইতেছে।)

বিষয়।	অধ্যাপক।
আয়ুর্ব্বেদ,—ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষাসমূহ, যথা—বাঙ্গালা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, দ্রাবিড়ী ও এসিয়াখণ্ডের আধুনিক ভাষাসমূহ, পারসীক ও আরবিক ইত্যাদি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ—ফরাসী, জর্ম্মণ্, ইটালীয় ইত্যাদি ও ইংরাজী।—	বাবু রাখালদাস চক্রবর্ত্তী এম, এ, (ইংরাজী) (অন্যান্য অধ্যাপক এখনও নিযুক্ত হন নাই।)
ইউরোপীয় প্রাচীন ভাষা—ল্যাটিন গ্রীক্ প্রভৃতি।—	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
ইতিহাস-ভূগোল ...	বাবু হৃদয়নাথ দত্ত, বি, এ,
নব্য বিজ্ঞান—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্বিদ্যা, পশু-বিদ্যা, খনিজ বিদ্যা, শারীর-বিদ্যা প্রভৃতি।	এখনও নিযুক্ত হন নাই।
পাশ্চাত্য দর্শন ও তর্কশাস্ত্র ...	ঐ
পাশ্চাত্য গণিত (উচ্চ ও নিম্ন) ...	ঐ

অর্থের অসদ্ভাবে আমি আশ্রমের জন্য আপাততঃ পর্ণকুটীর প্রস্তুত করাইতেছি। আশা করি, আশ্রমের কার্য্য সত্বরই নিয়মিতরূপে আরব্ধ হইবে।

যে সমুদয় বিদ্যার্থী চিরকৌমার্য্যব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচারে ও সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহাদের ব্যয়-ভার আশ্রম বহন করিবেন, এবং যাঁহারা পাঠ সমাপনান্তে গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহাদের ব্যয়ও আশ্রম হইতে প্রদত্ত হইবে।

সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকেই আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন ও দেবার্চ্চনাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে আশ্রম-নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন থাকিতে হইবে।

প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে অন্ততঃ তিন-মাস কাল পরীক্ষাধীন থাকিতে হইবে। ঐ নিরূপিত সময়ের অন্তে, যদি তিনি আচার্য্যকর্ত্তৃক বিদ্যার্থীরূপে গৃহীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রহণ করা যাইবে।

বিদ্যার্থিগণের উপযোগিতা অনুসারে তাঁহাদের অধ্যেতব্য বিষয় স্থিরীকৃত হইবে। কোন বিশেষ কারণ ব্যতীত ঐ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের ব্যতিক্রম করা যাইবে না।

দেবার্চ্চনা, ধ্যান, লঘু ব্যায়াম, স্বল্পভ্রমণ প্রভৃতি প্রত্যহিক কর্ম্ম সমাপন করিয়া বিদ্যার্থিগণ অধ্যয়নে নিরত হইবেন, এবং অধ্যয়নান্তে স্বতন্ত্রভাবে বা অপরাপর বিদ্যার্থিবৃন্দের সহিত সমবেত হইয়া পাক-ভোজনাদি করিবেন।

সায়ংকালে যথাবিহিত দেবার্চ্চনার পরে বিদ্যার্থিগণ আচার্য্যের নিকট নানাবিষয়ক মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আশ্রমের কার্য্য সম্পাদনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন; আমি আশা করি, জন্মভূমির হিতাভিলাষী প্রত্যেক ব্যক্তিই আশ্রমকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন। সাহায্যের পরিমাণ যত অল্প হউক না কেন, আশ্রমের উদ্দেশে যিনি যাহা শ্রদ্ধায় প্রদান করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে।

আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, স্বদেশ-বৎসল মহোদয়গণ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবারও ব্রহ্মচারি-আশ্রমকে স্মরণ করিয়া, সাধ্যানুসারে এই সদনুষ্ঠানের আনুকূল্য করিবেন। বিগত দুই বৎসর যাবৎ আমি বিভিন্ন স্থান হইতে সহানুভূতিসূচক অনেক পত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। যে সমুদয় মহাত্মারা পূর্ব্ব হইতে এই শুভ অনুষ্ঠানের প্রতি সহানু-ভূতি প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য স্ব স্ব সাধ্যানু-সারে সর্ব্বত্র ঘোষিত করেন; তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে আশ্রমের পূর্ণতা লাভ হইতে পারিবে। সর্ব্বসাধারণের অনুকম্পা ব্যতীত এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ হইবার আশা নাই।

আমি স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী—কারণ বহ্বারম্ভে কোন ফল হয় না; এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া, মৃদুভাবে আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিলাম; ভগবানের কৃপা হইলে, সুযোগ এবং সুবিধা অনুসারে ক্রমশঃ আশ্র-মের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত করা যাইবে।

এই স্থানে ব্রহ্মচারি-আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে পর, অন্যান্য স্থলেও এতদনুরূপ আশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যত্নবান্ হইব। আশ্র-মের দেব-মন্দির এবং পুস্তকালয় স্থাপনেরও ব্যবস্থা করা হইতেছে; ইতি।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

চিত্তানুশাসন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

——০:০:০——

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৯। ২০। ২২ সর্গে বাল্য-যৌবন জরা প্রভৃতি দোষ সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। উহা বহু বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না; তবে যদি পাঠকগণের শুনিবার আগ্রহ জানিতে পারি, ক্রমশঃ প্রকাশ করিব।

কাম "দুরাপূর"—কামনার তৃপ্তি সাধন করা যায় না, উহা অতি দুর্ঘট। যযাতি রাজা শুক্রাচার্য্য-শাপে জরাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ জরা শর্ম্মিষ্ঠা তনয় পুরুকে দান করিয়া, তাঁহার যৌবন গ্রহণ করিয়া, বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহস্র বৎসর বিষয় ভোগ করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি না হইয়া অনুদিন কামনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল! তজ্জন্য তিনি কহিয়াছিলেন, যথা বিষ্ণু-পুরাণে ৪র্থাংশে ১০ম অধ্যায়—

নজাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ৯॥

কাম্য দ্রব্যের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনা শান্তিলাভ করে না; ইহা ঘৃতের দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে ও ৭৫ অধ্যায়ে ও মৎস্যপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে যযাতি-উপাখ্যানে এই শ্লোকই দৃষ্ট হয়।

অপিচ, পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপে ১৪৬ শ্লোক ও মনু ২য় অধ্যায়ে ৪ শ্লোক ইহাই। এইরূপ দৃষ্টান্ত-শতকে যথা—

ভোগেচ্ছা নোপভোগেন ভোগিনাং
জাতু শাম্যতি।
লবণোদকপানেন তৃষ্ণা প্রত্যুত জায়তে॥

লবণাম্বু দ্বারা যদ্রূপ তৃষ্ণা বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ ভোগীদিগের ভোগেচ্ছা উপভোগে কখনও যায় না। তজ্জন্য যযাতি কহিয়াছিলেন যে—

যা দুস্ত্যজাদুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভি-
পূর্য্যতে॥ ১২॥

(বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অঃ।)

দুর্ম্মতি লোক যাহা ত্যাগ করিতে পারে না, জীর্ণ ব্যক্তির যাহা জীর্ণ হয় না, জ্ঞানী-লোক সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করেন।

তজ্জন্য পুনরায় কহিয়াছিলেন—

জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ কেশা দন্তা জীর্য্যন্তি জীর্য্যতঃ।
ধনাশা জীবিতাশাচ জীর্য্যতোঽপি ন জীর্য্যতি॥

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অং ১০ অঃ ১৩॥

জীর্ণ ব্যক্তির কেশ জীর্ণ হয়, জীর্ণ ব্যক্তির দন্ত জীর্ণ হয়, কিন্তু ধনাশা ও জীবিতাশা কখনও জীর্ণ হয় না। তজ্জন্য যযাতি বিষয় ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, কারণ তিনি কোনরূপেই কামনার তৃষ্ণা মিটাইতে পারেন নাই। যযাতির ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়-বাসনা ত্যাগ না করিলে, কোনরূপেই সেই বাসনা ভোগীকে ত্যাগ করিবে না। সুতরাং কামনা হইতে মনকে প্রত্যাবর্ত্তিত করাইয়া, যাহাতে সেই বৃন্দাবন-বিহারী রাধারমণ হরির পাদপদ্মে রত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। সেরূপ না করিয়া, মনকে বিষয়াসক্ত করিলে, তাহা হইতে আর মুক্তি-লাভের আশা নাই। তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, বিষ একজন্ম নাশ করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তর নাশ করে।

বিষং বিষয় বৈষম্যং নবিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষম্॥
যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩।

এইরূপ শান্তি-শতকে তৃতীয় পরিচ্ছেদেও কহিয়াছেন—

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমপি হেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ॥ ১৭॥

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষম-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখ-রূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না॥

তজ্জন্য শ্রীশিহ্লনমিশ্র খেদে কহিয়াছিলেন—

ভিক্ষাশনং ভবনমায়তনৈকদেশঃ
শয্যা ভুবঃ পরিজনো নিজদেহ ভারঃ॥
বাসশ্চ জীর্ণ-পট-খণ্ড-বিবদ্ধকন্থা
হা হা তথাপি বিষয়ান্ নজহাতি চেতঃ॥১৩॥
ঐ ১ম পরিচ্ছেদে।

ভিক্ষাই খাদ্য, কোন গৃহের এক স্থানই ভবন, মৃত্তিকা শয্যা, নিজদেহ-ভারই পরিজন; জীর্ণ বসন সমূহে নিবদ্ধ বস্ত্র ও কন্থাই পরিধেয় ও শীতবস্ত্র; হায়! তথাপি বিষয় পরিত্যাগ করে না।

এবিষয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য লীলায় ১১শ পরিচ্ছেদে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা প্রতাপরুদ্র রায় মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রথমতঃ রাজা বিষয়ী জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়॥
কর্ণে হস্ত দিঞা প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥

তজ্জন্যই মহাপ্রভু কহিয়াছিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িনামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষ-ভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ৮ম অঙ্কে।)

নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ, ভবসাগর-পারে যাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তির স্ত্রীলোক কিম্বা বিষয়িব্যক্তির দর্শন বিষ-ভক্ষণ হইতেও মন্দ।

অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং
নমীনোঽপি জ্ঞাত্বাবৃতবড়িশমশ্নাতি পিশিতম্।
বিজানন্তোঽপ্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জালজটিলান্
নমুঞ্চামঃ কামান্ হহ গহনো মোহমহিমা
(শান্তিশতকে ১ম পরিচ্ছেদে ৮।)

শলভ দহন-যাতনা না জানিয়া দীপ-দহনে প্রবেশ করে; মীনও না জানিয়া মাংসাবৃত বড়িশ গ্রাস করে; কিন্তু আমরা এই সকল জানিয়াও বিপদসমূহ-ব্যাপ্ত ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিতে পারি না! মোহের মহিমা কি দুর্ব্বোধ!

পতঙ্গ মাতঙ্গ কুরঙ্গ ভৃঙ্গ মীনাহতাঃ পঞ্চ-
ভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং নহন্যতে যঃ সেবতে
পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

গরুড় পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ১১৫ অং ২১ ও ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ৮ অধ্যায় ৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদধৃত বচনং।

কোগৃহেষু পুমান্সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈর্দৃঢৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুং॥৯॥

যদি বল যে যৌবনে গৃহাসক্ত হইলেও পশ্চাৎ বিরক্ত হইয়া মঙ্গল লাভ হইবে, এরূপ আশা করিও না, যেহেতু একবার গৃহাসক্ত হইলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া দুর্ঘট; কারণ

কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দৃঢ়-স্নেহ-পাশে বদ্ধ আপনাকে মুক্ত করিতে সাহসী হইয়াছে? ৯॥

[একবার আসক্ত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না; সুতরাং বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম আচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিতি।" কোমল বৃক্ষকে শীঘ্র নত করা যায়, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ককে শীঘ্র নত করা যায় না।] শাস্ত্র কহিতেছেন যে—

"পঞ্চমে রাজ্য-সম্বন্ধাদ্বন্ধু ভৃত্যাদি সঙ্গতঃ।
সর্ব্বং তদ্ভজনং লীনং ধিগ্ ধিগ্ মাং যন্নরোদিমি॥

(বৃহদ্ভাগবতামৃতে ৪ অধ্যায়ে ২১।)

ভগবত-প্রধান প্রহ্লাদ নারদ ঋষিকে কহিয়াছিলেন—

দেখুন, রাজ্য-সম্বন্ধে ও বন্ধু-ভৃত্যাদি-সঙ্গে আমার পূর্ব্বের শ্রীকৃষ্ণ-ভজন সমুদয় লোপ পাইয়াছে, তজ্জন্য আমাকে ধিক্—যে আমি রোদন করিতেছি না!

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

স্নেহানুবন্ধো বন্ধুনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ।

(শ্রীভাগবতে ১০ স্কঃ ৪৭ অঃ ৫।)

বন্ধুদিগের স্নেহ-সম্বন্ধ মুনিরাও ত্যাগ করিতে পারেন না। ভরত রাজা রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিয়াছিলেন। তথায় একটী মাতৃহীন মৃগ-শিশুকে লালন-পালন করেন। ক্রমে তাহাতে এরূপ চিন্তা-সক্তি হয় যে, ক্ষণকাল না দেখিলে ব্যাকুল হইতেন। সেই চিন্তাসক্তিতে মৃত্যু-সময়েও হরিণ-শাবককে চিন্তা করার ফলে হরিণী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি দেহের সহিত বিনষ্ট হয় নাই, কারণ তিনি যোগাভ্যাস-রত ছিলেন।

মৃগমেব তদা দ্রাক্ষীৎ ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।
তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নান্যৎ কিঞ্চিদচিন্তয়ৎ॥৩২॥

ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।
জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো মৃগঃ॥৩৩॥

(বিষ্ণু পুরাণ ২ অংশে ১৩ অধ্যায়ে।)

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! সেই ভরত প্রাণ-পরিত্যাগ-কালেও মৃগকেই দর্শন করিয়াছেন; মৃগ চিন্তা করিয়া, তন্ময়ত্ব প্রযুক্ত অন্য কিছুই চিন্তা করেন নাই। ৩২।

তদনন্তর সেই কালকৃত তাদৃশ ভাবনা-প্রাপ্ত হইয়া জম্বুমার্গ নামক মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে, মৃত্যু-সময়ে যে চিন্তা করিয়া দেহী জীবন ত্যাগ করে, সেই ভাবনাময় দেহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥

(পঞ্চদশী-ধ্যানদীপে ১৩৭।)

দেহী যে যে ভাব স্মরণ করিয়া অন্তে কলেবর ত্যাগ করে, তাহার চিত্ত সেই সেই দিকে শাস্ত্রমত যাইয়া সেই জন্মই প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ গীতায়ও ৮ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক যথা—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে-

যতো যতো ধাবতি দৈব চোদিতং
মনোবিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে॥ ৪২॥

নানা বিকারাত্মক মন নানা ফলাভিমুখ-কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া, দেহের পঞ্চত্ব-সময়ে মায়া দ্বারা নানা দেহরূপে রচিত যে যে দেব-তির্য্যক্ আদি দেহের প্রতি ধাবমান হইয়া অভিনিবেশ দ্বারা যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই রূপে দেহী পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। (যদিও মনই কর্ত্তা, তথাপি আমিই সেই মন,

এইরূপ স্থির করিয়া, জীব মনের সহিত উৎপন্ন হয়) ।৪২॥

জীবদ্দশায় সৎকার্য্য করিলে, মৃত্যুকালেও সৎবিষয়ের ভাবনা বর্ত্তমান থাকে; তজ্জন্য আমাদের মনকে বিষয়-ব্যাপারে নিযুক্ত না রাখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বশিষ্ঠ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—

বহির্ব্যাপার সংরম্ভো হৃদি সংকল্প বর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥
(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে)

হে রাঘব! বাহিরে কর্ম্মী হইবে, কিন্তু হৃদয়ে সংকল্পশূন্য হইবে; তুমি বাহিরে কর্ত্তা ও অন্তরে অকর্ত্তা হইয়া এইরূপে বিচরণ করিবে।

চিত্ত স্নেহ-পাশে বদ্ধ হইলে, তাহাকে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই বিমোচন করিতে সমর্থ হয় না।

এই জন্যই কহিয়াছেন যে—

ধনেন কিং যন্ন দদাতি যাচকে।
বলেন কিং যেন রিপুং ন বাধতে॥
শ্রুতেন কিং যেন ন ধর্ম্মমাচরৎ।
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো বশী॥
(শান্তিপর্ব্বণি ৩২১ অধ্যায়। ৯৩)

যদ্দ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বশী না হওয়া যায়, তাদৃশ আত্মাতে প্রয়োজন কি? সুতরাং জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক; কারণ জিতেন্দ্রিয় হইলে সংসার-তাপাভিভূত হইতে হয় না। সংসারে রমণীয়তা কি আছে? অজ্ঞানীর নিকটেই উহার রমণীয়তা, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সার নাই বলিয়া বোধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—০:০:০—

বান্ধবং ব্যাকরণম্।

বাবু শৈলেন্দ্র বন্ধু রায় বি, এল, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীব। প্রাচীন আর্য্য-ভাষার প্রতি তাঁহার এই নিঃস্বার্থ অনুরাগ দর্শনে বড়ই প্রীত হইয়াছি। 'নিঃস্বার্থ' বলিলাম এইজন্য যে, আজকাল সংস্কৃত-ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া যশ বা অর্থ লাভের আশা প্রায় অসম্ভব, কেননা দিন দিন সকলেই যেন ভাষাবিষয়িণী ব্যাকরণমূলা-প্রগাঢ়-ব্যুৎপত্তির প্রতি উদাসীন হইয়া ক্রমশঃ সাহিত্য সম্বন্ধে পল্লবগ্রাহিতারই পক্ষপাতী হইতেছেন; সুতরাং এই নবরচিত সংস্কৃত-ব্যাকরণখানি সাধারণ্যে প্রীতির চক্ষে অবলোকিত হউক বা না হউক, অন্ততঃ যদি একবার পঠিতও হয়, তাহাহইলেও শৈলেন্দ্রবন্ধুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে।

ব্যাকরণখানির সূত্র-গ্রন্থন-পদ্ধতি বর্ত্তমান দেশ-কালের সম্যক্ উপযোগিনী হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সংস্কৃত-সূত্রের দৌর্ব্বোধ্য ও উচ্চারণ-কাঠিন্য-ভয়ে অনেকে সূত্রের আবৃত্তির নামেও আতঙ্কিত হয়েন। আলোচ্য ব্যাকরণ খানি হইতে সে ভয় তিরোহিত হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, গ্রন্থকার সূত্রগুলিকে সুবোধ্য ও সুখোচ্চার্য্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং অনেক স্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বহুবিষয়-সম্পন্ন সামান্য সূত্রসমূহ ছন্দোবন্ধনে সংযত করিয়া, পাঠার্থিবৃন্দের অনায়াসে কণ্ঠস্থ করিবার বিশেষ সুবিধা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত-সূত্র, তৎপরে বঙ্গভাষায় রচিত বৃত্তি এবং সংস্কৃত দৃষ্টান্তের সন্নিবেশ করিয়া

অতি বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। কেননা, এই প্রণালীতে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকেও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হইবে না। অতি দুরূহ 'বৈদিক প্রকরণ' এত সরল ভাবে গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে যে, পাঠার্থিগণ অনায়াসেই ঐ প্রকরণ আয়ত্ত করিতে পারিবেন। এই বৈদিক ব্যাকরণাংশ-বিরচনে গ্রন্থকার বিশেষ ধন্যবাদ এবং অভাবনীয়-অভাব-পরিপূরণ-হেতু কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য সংস্কৃত-ব্যাকরণে এ অংশের অবতারণা নাই।

ছন্দোবদ্ধ সূত্র-নিচয় এতই মনোরম এবং এতই সরল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে যে, উহা আবৃত্তি করিলে, প্রাচীন কারিকা বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলাম,—

সম্মানে নিশ্চয়ে ব্যয়ে ঋণ নির্যাতনে তথা।
উৎক্ষেপণে প্রার্থনেচ সংস্কার প্রাপণেঽপিচ
ভৃত্যেভ্যো ভৃতি দানার্থেঽপনয়ে তঙ্
নিয়োমতঃ॥

তদ্ধিত—২৯৮ পৃষ্ঠায়—

তস্য ধর্ম্ম্যমিদং রাজা বিকারঃ ফলমেব চ।
ঈশ্বরো ভবনং ক্ষেত্রং মূলং পূরণমেবহি॥

তদ্ধিত—৩০০পৃষ্ঠায়—

তদস্মিন্নধিকং সোঽস্য নিবাসোঽভিজনশ্চ বা।
সংখ্যামাত্রেঽস্য তৎপণ্যং শিল্পং শীলং
প্রমাণকম্॥

এই সমুদয় শ্লোক সংবলিত প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট সূত্র আবৃত্তি করিবার সময়ে সেই মহাকবি কৃষ্ণানন্দ-বিরচিত অন্তর্ব্যাকরণ বা নাট্যপরিশিষ্টের, এবং রত্নমালার সুমধুর শ্লোকসম্বদ্ধ সূত্রগুলি স্মৃতি-পটে প্রতিফলিত হয়। ফলতঃ ব্যাকরণখানির এই অংশ-সমূহ অতি উপাদেয় হইয়াছে।

অংশান্তরে যে সমুদয় ত্রুটি পরিলক্ষিত হইল, আশা করি, পুনঃসংস্করণ-কালে, গ্রন্থকার সে সকল সংশোধিত করিয়া ব্যাকরণখানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন। কতিপয় স্থল সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির বহির্ভূত হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করিলাম, যথা—

১। "জসি দীর্ঘোঽতঃ" (অজন্তপুং ৬০ পৃষ্ঠায়) " এস্থলে বিশেষণীভূত প্রথমান্ত 'দীর্ঘ' শব্দের বিশেষ্য "অত্" এই শব্দে প্রথমা বিভক্তি প্রযুক্ত হইলেই সমীচীন হইত, ষষ্ঠী বিভক্তি সঙ্গত হয় নাই। সূত্র-নির্ম্মাণ-প্রস্তাবে আছে—"সূত্রে ষষ্ঠী ততঃ স্থানে" ইত্যাদি। বিশেষতঃ মনে রাখা উচিত যে, বিশেষণ সর্ব্বদাই বিশেষ্যের সমানাধিকরণ।

২। "স্বর ব্যঞ্জনম্" (সংজ্ঞা-প্রকরণ) এস্থলে স্বর এবং ব্যঞ্জন, এই দুই পদে সমাহার-দ্বন্দ্ব না করিলেই যেন ব্যাকরণের অনুশাসন-সঙ্গত এবং "বর্ণাঃ" এই বিশেষ্যীভূত পূর্ব্বসূত্রের সহিত বিশেষণ-ভাবে সুসমঞ্জস হইত। অথবা "স্বর-ব্যঞ্জনসংজ্ঞকাঃ" এই প্রকার করিলেও অনুবৃত্তি-ক্রমে আগত পূর্ব্বসূত্রের সহিত অন্বয় নির্ব্বাহ পক্ষে কোন বাধা জন্মিত না। এবম্বিধ আরও অনেক স্থল আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শন করিলাম না।

সূত্র এবং সূত্রের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বিধি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সমালোচ্য গ্রন্থের কতিপয় স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল। শাস্ত্রে আছে—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখং।
অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥
সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এবচ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্র-লক্ষণং॥

ইহাই হইল সূত্র-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়; কিন্তু বান্ধব-ব্যাকরণের কতিপয় স্থলে এই কারিকাদ্বয়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ভরসা করি, দুস্তর শব্দসাগরে নবাবতীর্ণ গ্রন্থকার বারান্তরে তাঁহার এ ত্রুটি সংশোধিত করিতে যত্নপর হইবেন।

যাহাহউক, অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার "বান্ধবং ব্যাকরণং" এই নামটী অন্বর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। গণপাঠাদি কারিকানিবদ্ধ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রথম সংস্করণে যে কিছু ত্রুটি পরিদৃষ্ট হইল, আশা করি, সংস্করণান্তরে সেই সকল সংশোধিত হইবে, এবং "বান্ধব ব্যাকরণ"ও প্রকৃত বান্ধবের ন্যায় সর্ব্বত্র অকৃত্রিম আদর লাভ করিবে। গ্রন্থকার নানাবিধ জটিল কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণশীল হইয়াও যে এতাদৃশ দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সফল-মনোরথ হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তদীয় অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান এই উদ্যমশীল গ্রন্থকারকে দীর্ঘজীবী এবং এতাদৃশ সদনুষ্ঠানে উত্তরোত্তর সমধিক উৎসাহী করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

দৈত্যেন্দ্র-পরাভব বা বাণ-পরাজয়।

(দৃশ্যকাব্য)

শ্রীপঞ্চানন কাঞ্জিলাল-প্রণীত।

কাব্যখানির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মনোহর হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি-বিষয়েও নবীন কবি বেশ একটু নবীনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। অনুশীলন থাকিলে, কালে ইনি একজন সুকবি হইতে পারিবেন। কোন কোন স্থলের রচনা অতি মধুর ও ভাব-বিস্পষ্ট হইয়াছে; একটী স্থলে শচীর উক্তি—

পতির সুখেতে সুখ,
পতির দুখেতে দুখ,
পতির জীবনে জীয়ে—সতী যে রমণী;

দেবেন্দ্র-মহিষীর মুখে কি এরূপ কথা না হইলে শোভা পায়? অপর, বাণের বীরদর্পে কবি বেশ সজীব বীর-রস-প্রবাহ বহাইয়াছেন। স্থলান্তরে, শিব-কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যমে দেবগণ শশব্যস্তে সমাগত হইলে, ব্রহ্মা কর্তৃক শিবের প্রতি সেই—

জয় জয় গিরিবালা-মানস-রঞ্জন!
ত্রিপুর-নাশন-হর! মহাদেব-মহেশ্বর!
কুমার-জনক! জয় মদন-মথন!
জয়তি ভয়-ভঞ্জন! যোগীশ্বর! পঞ্চানন!
ভুজগ-ভূষণ-ভূতনাথ-ত্রিনয়ন!
জয় জয় পুরহর! বিঘ্ন-বিনাশন!

ইত্যাদি স্তব সুন্দর লাগিয়াছে। পুস্তকখানি অভিনয়-পক্ষেও বেশ উপযোগী হইয়াছে, বোধ হইল।

আশা করি, গ্রন্থকার উত্তরকালে কাব্যাদি প্রণয়ন-সময়ে কাব্যের জীবন অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রতি একটু সমাহিত-দৃষ্টি হইবেন; তাহা হইলেই, আলোচ্য পুস্তকের স্থানে ২ চরিত্র-চিত্র ও ভাব-সঙ্গতি বিষয়ে যে একটু শবলতা দৃষ্ট হইল, তাহা সংশোধিত হইবে।

দার্শনিক-মীমাংসা।

হিন্দু-পত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। হিন্দু-পত্রিকার পাঠকমাত্রেই ইহার লেখার সারবত্তা অবগত আছেন; এই গ্রন্থের সমালোচনাস্থলে তদ্বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। চিন্তাশীল দার্শনিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের নিকট এ গ্রন্থে বিশেষ আদরণীয় হইবে, আশা করি। এই গ্রন্থ মানবের প্রকৃত শিক্ষা কি, তাহার সাধন ও পরিণাম-ফল কি, তাহাই বিবিধ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শাস্ত্র, প্রমাণ, যুক্তি, তর্ক প্রভৃতি দ্বারা আলোচিত হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী—অর্থাৎ ধর্ম্মার্থী—মনুষ্যত্ব-প্রার্থী এতৎপাঠে স্বীয় সাধন-পথে বিশেষ সাহায্য পাইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। | আশ্বিন। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

———:০:———

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

(১)

ওঁ ব্রহ্ম-বাদিনো বদন্তি।

কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ

জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ।

অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১

অন্বয়ঃ—কিং ব্রহ্ম কারণম্? স্ম (বয়ং) কুতঃ জাতাঃ? কেন (বা) জীবাম? (জীবাঃ) ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ (স্মঃ), অথবা (বয়ং) ক চ সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ স্যাম। (বয়ং) কেন অধিষ্ঠিতাঃ (সন্তঃ) সুখেতরেষু বর্ত্তামহে? হে ব্রহ্মবিদঃ! ব্যবস্থাম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ—প্রলয় কালে স্থিতাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ—নিয়মিতাঃ, ব্যবস্থাম্—(ছান্দসং) (বি+অব+অস+ বিধিলিঙ্ যাম) অনুবর্ত্তামহে।

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনশীল পণ্ডিতগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য সমবেত হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিতেছেন যে—হে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ! ব্রহ্মই কি এই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ? না কারণ ব্যতিরেকেই এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে? আমরা কোথা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং কেনই বা জীবিত রহিয়াছি? প্রলয়কালে এই জগতের জীববৃন্দ কোথায় অবস্থান করিয়াছিল, এবং কোথাই বা অবস্থান করিবে? অথবা প্রলয়কালে আমরা কোথায় ছিলাম এবং কোথাই বা থাকিব? কি জন্য বা কাহার কর্ত্তৃক আমরা সুখে দুঃখে নিয়মিত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি? ব্রহ্মই কি এই সমুদয় ব্যাপারের কারণ? না আপনা হইতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে?

(২)

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা—

ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।

সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবা-

দাত্মাঽপ্যনীশঃ-সুখ-দুঃখ-হেতোঃ॥

অন্বয়ঃ—কিং কালঃ যোনিঃ? উত স্বভাবো যোনিঃ? বা নিয়তির্যোনিঃ? অথবা যদৃচ্ছা যোনিঃ? কিংবা ভূতানি যোনিঃ? উত পুরুষঃ যোনিঃ? ইতি চিন্ত্যা তত্ত্বানুসন্ধিৎসুভিঃ। আত্মভাবাৎ এষাং সংযোগঃ ন তু যোনিঃ; তথা সুখ-দুঃখ-হেতোঃ আত্মা অপি অনীশঃ।

বিষমপদ-ব্যাখ্যা—যোনিঃ—কারণম্। (কেহ কেহ বলেন "যোনিঃ প্রকৃতিঃ" তাঁহাদের মতে পূর্ব্ব শ্লোক হইতে "কারণ" পদ অনুষক্ত হইবে—অর্থাৎ যোনিঃ কারণং কিং?) আত্মভাবাৎ আত্মনঃ বিদ্যমানত্বাৎ আত্মা অপি অনীশঃ—জগৎকারণত্বেন অঙ্গীকর্ত্তুং অশক্যঃ।

বঙ্গার্থ—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিপরিণামের হেতু—অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের আধার কালই কি জগদুৎপত্তির কারণ? না পদার্থের প্রতিনিয়ত-শক্তি-স্বভাব হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে? অর্থাৎ স্ব স্ব প্রাকৃতিক শক্তি-হেতুই কি পদার্থ সমূহ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে? অথবা প্রাক্তন-পুণ্য-পাপের ফলানুসারে, নিয়তি কর্ত্তৃক কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে? কিংবা কোন কারণ ব্যতীত, অকস্মাৎ এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে? অথবা আকাশাদি-পঞ্চ-ভূত, কিংবা বিজ্ঞানময় আত্মাইকি এই অনন্ত জগদুৎপত্তির কারণ, ইহা নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। দেশ, কাল এবং নিমিত্ত প্রভৃতি সংহত না হইলে, অর্থাৎ দেশ, কাল ও কারণ সম্যক্-রূপে একত্রীভূত না হইলে যখন কোন পদার্থই সমুদ্ভূত হয় না, তখন কালাদিকে পৃথগ্‌ভাবে জগদুৎপত্তির কারণ বলা যায় না। পুনশ্চ, আকাশাদি-পঞ্চভূতের বিনাশ হইলেও যখন আত্মার বিনাশ হয় না, তখন আকাশাদি-পঞ্চভূত এবং আত্মা, ইহাদের সংযোগকেও বিশ্ব-সৃষ্টির উৎপাদক বলা যাইতে পারে না; কেবল জীবাত্মাকেও জগদুৎপাদনের হেতু বলা যায় না, কেন না—জীবাত্মা সর্ব্বদাই পুণ্য এবং পাপ-কর্ম্মজনিত সুখ ও দুঃখের অধীন; কর্ম্মানুসারে জীবাত্মাকে সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব কর্ম্মাধীন জীবাত্মা কথনও বিশ্ব-বিধানের হেতু হইতে পারে না।

(৩)

তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম-শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্ম-যুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ (পরমাত্মা), কালাত্ম-যুক্তানি তানি (পূর্ব্বকথিতানি "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা" ইতি সূত্রোক্তানি) কারণানি অধিতিষ্ঠতি। তে ব্রহ্মবাদিনঃ ধ্যানযোগানুগতাঃ সন্তঃ তস্য পরমাত্মনঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং দেবাত্মশক্তিং অপশ্যন্।

বঙ্গার্থ—জগদুৎপত্তির বিবিধ হেতু বর্ণনান্তর সেই ব্রহ্মবাদী বিদ্বদ্বৃন্দ ধ্যান-যোগাবহিত-চিত্ত হইয়া অবগত হইয়াছিলেন যে, যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা, কাল, জীবাত্মা, নিয়তি, স্বভাব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহ নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন—অর্থাৎ প্রাগ্‌বর্ণিত কাল-স্বভাব-আকাশাদি ভূতসমূহ যাঁহার আয়ত্তীভূত, সেই পরাৎপর পরমাত্মার প্রকৃতি-সংবৃত আত্মশক্তিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জননয়িত্রী। অর্থাৎ পরমপুরুষ যখন পরমা প্রকৃতির সহিত মিলিত হয়েন, তখন তাঁহার সেই মিলন-সম্ভূত কোন অবর্ণনীয় চিন্তার অতীত শক্তিই এই বিশ্ব-বিধান করিয়া থাকেন। নতুবা পূর্ব্বকথিত কারণসমূহের কোন একটি স্বতন্ত্রভাবে জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না; কেন না, ঐ সমস্ত কারণই সেই পরমপুরুষের অধীন; তিনিই ঐ সকল কারণের একমাত্র পরিচালক। তাঁহার পরিচালনা ব্যতীত ঐ সকল কারণের কোনই কারণতা থাকে না। "স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং"—এই পদের এইপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে

পারে, স্বগুণ—অর্থাৎ পরমেশ্বরের নিজের গুণ সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত যে আত্ম-শক্তি, অথবা স্বগুণ-সত্বরজস্তম-এই ত্রিগুণা-বৃতা যে আত্মশক্তি,—অর্থাৎ সত্বগুণে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু, এবং তমোগুণে রুদ্র-রূপে যাঁহার স্বকীয় শক্তি—এই জগতের উদয়, স্থিতি এবং লয়ের হেতু হইয়া থাকে, তাদৃশ যে আত্মশক্তি, কিংবা স্বগুণ—ব্রহ্মপরতন্ত্র প্রকৃত্যাদি-উপাধি দ্বারা নিগূঢ় অন্যের অজ্ঞের যে আত্মশক্তি, প্রত্যেক পদার্থেই তাঁহার সেই আত্ম-শক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করিতেছে।—ইহার কিছু পরেই কথিত হইবে যে, "একো দেব সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ" এক পরমাত্মা সর্ব্বভূতে গুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এতাদৃশী আত্মশক্তিকেই বিশ্ববিধায়িনী বলিয়া ব্রহ্মবাদিগণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। আরও অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, বিস্তৃতি-শঙ্কায় বিরত হইলাম।

(৪)

তমেক-নেমিং ত্রিবৃতং ষোড়শান্তং
শতার্দ্ধারং বিংশতি প্রত্যরাভিঃ।
অষ্টকৈঃ ষড়্ভির্বিশ্বরূপৈকপাশং
ত্রিমার্গ-ভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্।

অন্বয়ঃ—যঃ একঃ সন্ নিখিলানি অধিতিষ্ঠতি ইত্থম্ভূতং তম্ অপশ্যন্———ইতি সম্বধ্যতে———এক নেমিং, ত্রিবৃতং, ষোড়শান্তং, শতার্দ্ধারং, বিংশতি প্রত্যরাভিঃ, তথা ষড়্ভিঃ অষ্টকৈশ্চ যুক্তং, বিশ্বরূপৈকপাশং, ত্রিমার্গভেদং, দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ তম্, (নিখিলেষু কারণেষু অধিতিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং অপশ্যন্) অথবা অধীমঃ ইতি পরস্থিত ক্রিয়াপদেন অন্বয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—ত্রিবৃতং—সত্বরজস্তম, এই প্রাকৃতিক গুণত্রয় কর্তৃক আবৃত। ষোড়শান্তং ষোড়শ—পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি-ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চভূতানি ইতি ষোড়শ-প্রকারাঃ অন্তাঃ—অন্তভাগাঃ যস্য তথোক্তং,—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়—পঞ্চভূত এবং ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ), এই ষোড়শ প্রান্তভাগ বিশিষ্ট।

বঙ্গার্থ—তত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যে ব্রহ্ম-চক্রকে বিশ্বোৎপত্তির হেতুরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন, অধুনা সেই ব্রহ্ম-চক্রের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অনাদি অনন্ত আকাশ এই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মচক্রের নেমি—অর্থাৎ চক্রধারা স্বরূপ। এই মহাচক্রের অবধি মহান্ ব্যোম।

সত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিবিধ গুণ ঐ ব্রহ্ম-চক্রকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, ষট্ জ্ঞানেন্দ্রিয় (মন সহ) এবং পঞ্চভূত, এই ষোড়শবিধ পদার্থ ঐ চক্রের অন্তভাগ। ঐ চক্রে পঞ্চাশৎ অর (চক্রশলাকা) আছে। অর (চক্র-শলাকা) দ্বারা যেমন চক্র সুসংযত হয়, তদ্রূপ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র, এই পঞ্চবিধ বিকার। অষ্ট-বিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, সর্ব্বসমেত এই পঞ্চাশৎ প্রকার চক্রশলাকা দ্বারা বক্ষ্যমাণ ব্রহ্ম-চক্র সুসংবদ্ধ রহিয়াছে। চক্র-শলাকার দৃঢ়তা বিধানের জন্য যেমন নেমি এবং চক্র-শলাকা এতদুভয়ের সংযোগস্থলে কীলক প্রোথিত করা হয়, সেই প্রকার ঐ উপরি বর্ণিত ব্রহ্ম-চক্রের অর—(চক্র-শলাকা সমূহকে) সুদৃঢ় করিবার জন্য, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই দশবিধ ইন্দ্রিয়, এবং রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ, এই দশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের বিষয়, সর্ব্বসমেত এই বিংশতিটি প্রত্যর—

(কীলক) প্রোথিত আছে। এই চক্রে ছয়টি অষ্টক আছে—যথা—

১। প্রকৃত্যষ্টক—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার।

২। ধাত্বষ্টক—চর্ম্ম, মাংস, রস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র।

৩। ঐশ্বর্য্যাষ্টক—অণিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যাপ্তি, প্রকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িতা।

৪। ভাবাষ্টক—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য।

৫। দেবাষ্টক—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃ ও পিশাচ।

৬। গুণাষ্টক—দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা।

এই ষড়্‌বিধ অষ্টক। এই সমুদয়ও ঐ ব্রহ্ম-চক্রের অন্তর্ভূত। স্বর্গ, পুত্রাদি ও অন্নাদি-বিষয়ের ইচ্ছা, এই চক্রের পাশ স্বরূপ। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই ত্রিবিধ পন্থা ঐ চক্রের বিচরণ-ভূমি—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি পথ দিয়া ঐ মহাচক্র পরিচালিত হইয়া থাকে। এতত্রয় ব্যতীত ঐ চক্রের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পাপ এবং পুণ্যের হেতুভূত দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, জাতি প্রভৃতি অনাত্মপদার্থে আত্মাভিমানই এই মহাচক্রের নিমিত্ত। অভিমান বশতই এই চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ সুমহৎ ব্রহ্ম-চক্র হইতে এই নিখিল বিশ্ব উৎপন্ন, ইহাই তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

(৫)

পঞ্চ স্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং
পঞ্চ প্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদি-মূলাম্।
পঞ্চাবর্ত্তাং পঞ্চ দুঃখৌঘ বেগাম্
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ॥

অন্বয়—(পূর্ব্বং চক্ররূপেণ দর্শিতং, অধুনা নদীরূপেণ দর্শয়তি।)

বয়ং (পূর্ব্বোক্তাঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ) পঞ্চস্রোতোঽম্বুং পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাম্ পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চবুদ্ধ্যাদি মূলাং পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্ পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বাং নদীং (নদীরূপেণ পরিণতং প্রাগুক্তং ব্রহ্মচক্রং) অধীমঃ (জানীমঃ)

বিষম পদ ব্যাখ্যা—পঞ্চস্রোতাংসি (চক্ষুরাদিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) অম্বুস্থানানি যস্যাঃ—তাম্। চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জল-বিশিষ্ট। পঞ্চযোন্যুগ্রবক্রাং—পঞ্চ যোনিভিঃ ক্ষিত্যাদিভির্হেতুভূতৈঃ উগ্রা, তথা বক্রা——তাম্——জগদুৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পঞ্চ-ভূত দ্বারা বর্ণনীয় নদী নিরতিশয় ভীতিপ্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণোর্ম্মিং পঞ্চপ্রাণা উর্ম্ময়ো যস্যাঃ তাম্—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চ বিধ বায়ু অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় ঐ তটিনীর তরঙ্গ সদৃশ। পঞ্চ বুদ্ধ্যাদিমূলাম্——পঞ্চ বুদ্ধীনাং (চক্ষুরাদি-জন্যানাং জ্ঞানানাং) আদি (কারণং) মনঃ মূলং যস্যাঃ তাম্——চক্ষুরাদি-পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের নিদান মন মূল স্বরূপ যার, তাদৃশী নদী। পঞ্চবর্ত্তাং পঞ্চবিষয়াঃ (শব্দাদয়ঃ) আবর্ত্তাঃ (জলভ্রমিস্থানীয়াঃ) যস্যাঃ তাদৃশীম্—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয় আবর্ত্ত স্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী।

পঞ্চ দুঃখৌঘবেগাম্—পঞ্চ দুঃখৌঘানি (গর্ভজং জন্মজং জরাজং ব্যাধিজং মরণজঞ্চ ইতি পঞ্চবিধং দুঃখং) বেগাঃ যস্যাঃ তাম্—

গর্ভজ, জন্মজ, জরাজ, ব্যাধিজ, এবং মরণজ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ বেগস্বরূপ যাহার, তাদৃশী নদী। পঞ্চাশৎ ভেদাঃ যস্যাঃ তাম্—পঞ্চ-বিকার, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি এবং অষ্টপ্রকার সিদ্ধি, এই পঞ্চাশৎ ভেদ যাহার, তাদৃশী। পঞ্চপর্ব্বাম্—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ পর্ব্ব—অর্থাৎ স্তর যাহার, তাদৃশী নদী।

বঙ্গার্থ—সম্প্রতি প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্রকে নদীরূপে ব্যাখ্যাত করা হইয়াছে।

চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এই নদীর সলিল। বিশ্বোৎপত্তির মুখ্য কারণ ক্ষিত্যাদি ভূত-পঞ্চক কর্ত্তৃক এই তটিনী নিরতিশয় ভীতি-প্রদা এবং বক্রভাবাপন্না হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবিধ বায়ু-বিতাড়নে এই স্রোতস্বিনী নিরন্তর তরঙ্গায়িতা, (অথবা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চপ্রকার কর্ম্মেন্দ্রিয় এই প্রবাহিণীর তরঙ্গ)। মন এই তরঙ্গিণীর মূল উৎস স্বরূপ। যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র হেতুই মন; এই সর্ব্বজ্ঞান-নিদান মন হইতেই এই প্রবাহিণীর উদ্ভব হইয়াছে; আবার মন যখন সর্ব্ববিষয়-নিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র অতুলানন্দে বিভোর ও প্রশান্ত হয়, তখন এই তটিনী সেই প্রশান্ত সাগরে মিশিয়া যায়। তখন আর দ্বৈতাদ্বৈতভেদ থাকে না। যত দিন মনের মনোভাব দূরীভূত না হয়, ততদিনই এই জগৎ-প্রপঞ্চ, ততদিনই ভেদ-বুদ্ধি; সেই জন্যই মনকে এই মহানদীর মূল বলা হইয়াছে। মনের সর্ব্বহেতুত্ব-দর্শন-কল্পে শাস্ত্রান্তরেও কথিত হইয়াছে যে "মনোবিজৃম্ভিতং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্। মনসোহন্যমনোভাবে দ্বৈতং ভিন্নোপলভ্যতে" মনের প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই; এই মনের উপর যাঁহারা প্রভুত্ব করিতে সমর্থ, তাঁহাদের আর দ্বৈতাদ্বৈত-ভেদ থাকে না। তখন প্রকৃত তথ্য তাঁহাদের বিবেক-মুকুরে প্রতিনিয়ত প্রতি-বিম্বিত হইতে থাকে; তাঁহাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ মনই যাবতীয় বোধের নিদান, সেই জন্যই মনকে এই সংসার-তরঙ্গিণীর মূল—অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পঞ্চ প্রকার ইন্দ্রিয়াধি-গম্য বিষয় এই নদীর আবর্ত্ত, অর্থাৎ জল-ভ্রমি স্বরূপ। কেন না, এই সংসার-তরঙ্গিণীর মহান্ জল-ভ্রমি-প্রতিম শব্দাদি-পঞ্চবিধ বিষয়ে প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন হইয়া, গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে অক্ষম হয়। কোন জল-যাত্রী যেমন অকস্মাৎ জল-পাকে পতিত হইলে আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছিতে পারে না, প্রত্যুত, প্রবল স্রোতোবেগে শিথিলাঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ নিমগ্ন হইতে থাকে, তদ্রূপ এই দুস্তর-তরঙ্গ-সঙ্কুল-সংসার-জলধির অনুত্তরণীয় শব্দাদি-মহাবর্ত্তে প্রাণিনিকর পতিত হইলে, আর নিস্তার লাভ করিতে পারে না; ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ অজ্ঞান-গর্ত্তে বিলীন হইতে থাকে। তাই শব্দাদি এই নদীর ভ্রমিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। গর্ভ-বাস-জনিত দুঃখ, জন্ম-জনিত দুঃখ, জরা-জনিত দুঃখ, ব্যাধি-জনিত দুঃখ এবং মরণ-জনিত দুঃখ, এই পঞ্চবিধ দুঃখ এই তটিনীর প্রবল বেগস্বরূপ, অর্থাৎ গর্ভ-যাতনা, জন্ম-যাতনা, জরা-যাতনা, ব্যাধি-যাতনা ও মৃত্যু-যাতনা, এই পঞ্চ প্রকার যাতনা অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বদা সংসার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। তটিনী যেমন বেগ-প্রাচুর্য্য বশতঃ নিতান্ত ভয়ঙ্করাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার এই সংসাররূপা মহা-তটিনী, প্রাগুক্ত যাতনা-পঞ্চকের অপ্রতি-

বিধেয়তা নিবন্ধন নিরতিশয় ভীতি-প্রদা হইয়াছে। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, এই পঞ্চ প্রকার ক্লেশ দ্বারা সংসার-প্রবাহিণী পরিপূর্ণ; অর্থাৎ উক্ত ক্লেশ-পঞ্চক নিয়ত সংসার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিক্ষণ সংসারিগণের হৃদয়ে অরুন্তুদ যাতনা প্রদান করিতেছে। যাবতীয় দুঃখেরই একমাত্র নিদান ঐ পঞ্চ ক্লেশ। চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মচক্ররূপে এবং পঞ্চম সূত্রে নদীরূপে কার্য্য-কারণাত্মক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় অভিহিত হইল।

(৬)

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥

অন্বয়ঃ—হংসঃ সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে, আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ পৃথক্ মত্বা ভ্রাম্যতে, ততঃ তেন জুষ্টঃ সন্ অমৃতত্বম্ এতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সর্ব্বাজীবে—সর্ব্বেষাং আজীবনং অস্মিন্নিতি, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি। সর্ব্বসংস্থে—সর্ব্বেষাং সংস্থা (সমাপ্তিঃ প্রলয়ো বা) যস্মিন্নিতি,—সমস্ত পদার্থের সমাপ্তি—অর্থাৎ প্রলয়ক্ষেত্র। বৃহন্তে (বৈদিকঃ প্রয়োগঃ, বৃহতি ইতি বোধ্যঃ) ইতি বৃহৎ, ব্রহ্মচক্রে—প্রাগ্‌বর্ণিত ব্রহ্মচক্ররূপে অস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে। হংসঃ—(হন্তি গচ্ছতি অধ্বানং ইতি হংসঃ, হন গতি হিংসয়োরিতি গত্যর্থত্বং) জীবঃ, যে গমন করে—জীব। আত্মানং-জীবাত্মানং-জীবাত্মাকে। প্রেরিতারং—প্রেরণকর্ত্তারং ঈশ্বরং, প্রেরণ-কর্ত্তা ঈশ্বরকে। পৃথক্—ভেদেন—জীবেশ্বর-ভেদ দর্শনেন—ইতি তাৎপর্য্যং। ভিন্ন ভাবে জানিয়া। ভ্রাম্যতে—সংসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্ততে—সংসারে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণায়মান হয়। তেন—ঈশ্বরেন—ঈশ্বরের দ্বারা। জুষ্টঃ সেবিতঃ—(পূর্ণানন্দ ব্রহ্মরূপেণ আত্মানং অবগতঃ সন্ ইতিভাবঃ) পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে আত্মাকে অবগত হইয়া, অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আত্মা, এতদুভয়কে অপৃথগ্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া। অমৃতত্বং—মোক্ষং—মোক্ষ—এতি-প্রাপ্নোতি, প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—এই ব্রহ্মচক্ররূপ অতীব বৃহদ্-ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থের জীবন-ভূমি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেই প্রাণি-নিবহ উজ্জীবিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা এবং ঈশ্বর, এতদুভয়কে পৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হইয়া, জীব পুনঃপুনঃ এই সংসার-ক্ষেত্রে গমনাগমন করে। যখন সে ভাব তিরোহিত হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা, এই উভয়ের ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত হয়, এবং এতদুভয়ের একীভাব সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—জীবাত্মা এবং ঈশ্বর, এই উভয়ের ভেদজ্ঞানই সংসারে পুনরাবৃত্তির কারণ। যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই দ্বৈতভাব জীবের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাহাকে বারংবার দুঃখ-সঙ্কুল সংসারে গতিবিধি করিতে হয়। অনাত্মভূত দেহাদিতে আত্মাভিমান বশতঃ জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে ভিন্নভাবে জ্ঞাত হইয়া, মোহান্ধ জীব, সুর-নর-তির্য্যগাদি নানা যোনিতে ভ্রমণ করে; অনন্তকাল গর্ভজ এবং জন্মজ যাতনা প্রাপ্ত হইয়া, সংসারের অসংখ্য ক্লেশ রাশিতে জীর্ণ হইতে থাকে; পরে যখন সে ভাব চলিয়া যায়, সদ্‌গুরু-

পদেশ বশতঃ এবং চিত্ত-পরিকর্ম্মাদি দ্বারা হৃদয়ের সে বিষময় সংস্কার বিনষ্ট হয়, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং আত্মাকে এক বলিয়া বুঝিতে পারে, অর্থাৎ "ব্রহ্মই আমি" এতাদৃশ জ্ঞান জন্মে, তখন আর জীবের বন্ধন-যাতনা ভোগ করিতে হয় না; তখন সে আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া, অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার সকল যাতনা তিরোহিত হইয়া যায়। ফলকথা এই যে, যিনি আত্মাকে পূর্ণানন্দ-ব্রহ্মরূপে জানিতে পারেন, তিনিই মুক্তি লাভ করেন; আর যিনি আত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে জ্ঞাত হয়েন, তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে পুনঃ পুনঃ সংযত হইতে হয়। আত্মা এবং পরমাত্মার এবম্বিধ ভেদ-দর্শনই সংসারাবৃত্তির মুখ্যতম হেতু; এ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে—য এব বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্যহ ন দেবাশ্চ না ভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতাংউপাস্তে, অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামিতি।

বিষ্ণু-ধর্ম্মেও কথিত হইয়াছে যে—

পশ্যত্যাত্মানমন্যন্তু যাবদ্বৈ পরমাত্মনঃ।
তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা।
সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশ্যতি।
অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষয়ো ভবেৎ॥

ইহার অর্থ এই যে, জীব যত কাল পর্য্যন্ত আত্মাকে পরমাত্মা হইতে, অন্য বলিয়া—অর্থাৎ আত্মা এবং পরমাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান করে, যাবৎ কাল তাহার এই ভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহাকে নিজের দুর্ব্বিপাক কর্ম্ম-কলাপে মোহিত হইয়া বার বার এই সংসার-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে হয়। তদনন্তর যখন তাহার সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া যায়, ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হয়, পরব্রহ্মকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার পরিশুদ্ধতা জন্মে, এবং পরিশুদ্ধতা নিবন্ধন দুর্ব্বার ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। তাহার হৃদয়ের সমস্ত সংশয় মীমাংসিত হইয়া যায়। তাহার মানস অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃত-রসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

চিত্তানুশাসন।

—০:০:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কোঽর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ প্রাণেভ্যোঽপি য ঈপ্সিতঃ।
যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক্॥১০॥

যে অর্থতৃষ্ণা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই অর্থতৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? এই যে অর্থ, ইহাকে তস্কর, ভৃত্য ও বণিক্ প্রিয় প্রাণ দ্বারাও ক্রয় করিয়া থাকে।১০॥

প্রাণৈঃ ক্রীণাতি—প্রাণ দ্বারা ক্রয় করে, অর্থাৎ প্রাণ-হানি অঙ্গীকার করিয়াও লাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকে; কারণ, তস্কর দ্রব্য জন্য বিবিধ বিপদ সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াও ধনীর বাটীতে প্রবেশ করে, রাজকীয় সেবক জীবনান্তকর যুদ্ধাভিমুখে গমন করে; বণিক দুর্গম ভয়াবহ সমুদ্রে গমন করিয়া থাকে।

তজ্জন্যই অর্থকে দোষ দিয়াছেন—

অতি ক্লেশেনযেঽর্থাঃ স্যুর্ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণ চ।

অরের্ব্বাপ্রনিপাতেন মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ॥
মহাভারতে উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ৭৬॥

অতি ক্লেশে যে অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা ধর্ম্মহানি করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিম্বা শত্রুর প্রণিপাত দ্বারা যে অর্থ লাভ করা যায়, সেরূপ ধনে মন করিবেনা।

এইরূপ গরুড়পুরাণ পূর্ব্বভাগে ১০৯ অধ্যায়ে ২৮।

অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতিক্রমেণচ।
অরের্ব্বা প্রণিপাতেন মাভুবংস্তেকদাচন।

উৎখাতং নিধি শঙ্কয়া ক্ষিতিতলং
ধ্যাতা গিরের্ধাতবো।
নিস্তীর্ণং সরিতাং পতির্নৃপতয়ো
যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধন তৎপরেণ মনসা
নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণ বরাট কোঽপি ন ময়া
তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্॥৫॥
বৈরাগ্য-শতকে।

নিধিলাভার্থ পৃথিবী খনন করিয়াছি; পর্ব্বতের ধাতুর বিষয়ও চিন্তা করিয়াছি, অর্থাৎ আনয়নার্থ গমন করিয়াছি; সমুদ্রও পার হইয়াছি; রাজাকে যত্নে সন্তুষ্ট করিয়াছি, মন্ত্রারাধনাতৎপর মন দ্বারা শ্মশানেও রাত্রি-যাপন করিয়াছি, তথাপি এককড়া কাণা-কড়ীও প্রাপ্ত হই নাই! হে তৃষ্ণে! এখন আমায় পরিত্যাগ কর॥

তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

ভোগানভুক্তাবয়মেব ভুক্তা-
স্তপোনতপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা নজীর্ণা বয়মেবজীর্ণা।

আমাদের বিষয়-ভোগ ভুক্ত হয় নাই, কিন্তু আমরাই কাল দ্বারা ভুক্ত হইয়াছি; আমরা তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি) করি নাই, কিন্তু আমরা সন্তপ্ত হইয়াছি; কাল গত হয় নাই, কিন্তু আমরাই জীবনান্তে গমন করিয়াছি; তৃষ্ণা জীর্ণা অথবা ক্ষীণা হয় নাই, আমরাই জীর্ণ অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইয়াছি।

ভিন্দতি হৃদয়ং পুংসাং মায়াময়বিধায়িনী।
দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণাকৃষ্ণেব রাক্ষসী॥
(যোগবাশিষ্ঠে-মুমুক্ষু-প্রকরণে ১৭ সর্গে ১৮।)
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলং।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্ম-ষট্‌পদী॥
॥৩১॥

মায়া ও রোগ-বিধায়িনী, দুর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কালরাক্ষসীর ন্যায় পুরুষের হৃদয়কে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ১৮।

ক্ষণকাল পাতালে গমন করে; ক্ষণকাল শূন্যে গমন করে; ক্ষণকাল দিক্‌রূপ কুঞ্জে ভ্রমণ করে, তৃষ্ণা হৃদয়-পদ্মের ভ্রমরীর তুল্য॥৩০

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিলেই সুখ,—

যাদুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা নজীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যো সৌ প্রাণান্তিকোরোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ
সুখম্॥
(বনপর্ব্বণি ২ অধ্যায়ে ৩৩। শান্তিপর্ব্বণি ১৭৪ অধ্যায়ে ৫৮ ও ২৭৫ অধ্যায়ে ১২।)

তজ্জন্য কহিয়াছেন—

সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতৃভ্যো
জলম্।
পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমলঃ স্বাধ্যায় যজ্ঞঃ পরঃ
ক্ষুদ্‌ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ
কিং ধনৈঃ॥
(শান্তিশতকে ৩ পরিচ্ছেদে)

সত্য বলিবার জন্য অশেষ মনোহারিণী

সুলভা বাণী আছে; শরণাগত ব্যক্তিকে অভয়-দানরূপ মহাদান আছে; পিতৃ লোককে জল দিবার জন্য নির্ম্মল জল আছে; পর-মেশ্বরের পূজার জন্য বিশুদ্ধ বেদাধ্যয়নরূপ পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ আছে; ক্ষুৎব্যাধির শান্তির জন্য ফল-মূল আছে; যদি এরূপ হইল, তবে আর ক্লেশাত্মক ধনে প্রয়োজন কি?

তজ্জন্য অর্থকে পদধূলির সমান বর্ণন করিয়াছেন,—

"অর্থাঃপাদরজোপমাঃ" (হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে) কিন্তু বিষয়ী সেই ধনকে নিজ জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া থাকে;—

ধনাশা জীবিতাশাচ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
(হিতোপদেশঃ—মিত্রলাভে।)

ধনাশা ও জীবিতাশা জীবের পক্ষে গুরুতরা।

সেবকের জীবন ক্লেশকর—

সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতধিয়ঃ স্থানে শ্ববৃত্তিং বিদুঃ।
(মুদ্রারাক্ষসে ৩ অঙ্কে।)

জ্ঞানী ব্যক্তি লঘুকারিণী সেবাকে কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়া জানেন। যিনি কখনও রাজ-সেবা না করিয়াছেন, তাঁহার জীবন ধন্য!

অসেবিতেশ্বর-দ্বারমদৃষ্টবিরহব্যথং।
অনুক্ত ক্লীব-বচনং ধন্যং কস্যাপি জীবনম্॥
(হিতোপদেশ।)

যিনি কখনও রাজদ্বার-সেবা করেন নাই, যিনি কখনও আত্মীয়-স্বজনের বিরহব্যথা সহ্য করেন নাই, যিনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, এরূপ ব্যক্তিরই জীবন ধন্য।

সেবার অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৩৭ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে দেওয়া গিয়াছে।

বণিক্-জীবনও ক্লেশকর—

"কিং দুরং ব্যবসায়িনাম" জগতের দুর-দূরান্তরে-দিগ্‌দিগন্তরে, দুস্তর সাগরে, দুর্গম বনে, দুরারোহ পর্ব্বতে অর্থার্জ্জনের জন্য নানা বিপদ-বিভ্রাট ও দুঃখ-দুর্ভোগ সহিয়া যাহাদের অবস্থিতি, তাহাদের জীবন ক্লেশময়, সন্দেহ নাই। ফলিতার্থে সকাম-সংসারীর পক্ষে সংসারের যাদু-মন্ত্রিত অর্থাদি সাপেক্ষ-সুখের সেতু, কিন্তু নিরপেক্ষ-দুঃখের হেতু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মায়াবাদ।

(জগতের কাল্পনিকতা)

এই দৃশ্যমান জগতের কোন কিছু পদার্থ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত দূর সত্য, তাহা আরও একটু ভাল করিয়া আলোচিত হউক। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কোন পদার্থকেই যে তাহার প্রকৃত অবস্থায় জানিতে পারি না, ইহা পূর্ব্বে যত দূর সম্ভব, পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এখন দেখাইতে চাহি যে, কোন পদার্থের কোন অবস্থা দূরে থাকুক, কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই আমরা বুঝিতে পারি না। মনে কর, আমার সম্মুখে একটী পক্ক আম্র রহিয়াছে। এই আম্রটী যে রহিয়াছে, ইহা আমি কি করিয়া জানি? রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা উহার অস্তিত্ব কি আমি জানিতে পারিতেছি? কখনই না। বুঝিতেছি যে, আমি বড় জোর রূপ-রসাদি অনুভব করিতেছি এবং ইহার অধিক আর কিছুই অনুভব করিতেছি না; অথচ ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি একটী বাহ্য বস্তুতে আছে। রূপ-রসাদি কোন বাহ্য বস্তুতে আছে, ইহা ধরিয়া লইবার আমার কি

যুক্তি আছে? রূপাদিকে আমি বাহ্য বস্তুর গুণ বলিতেছি, অথচ বাহ্য পদার্থকে রূপাদি-গুণ ভিন্ন অন্য কোনরূপে জানিতে পারা যায় না। দ্রব্য ও দ্রব্যের গুণ, ইহাদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, দ্রব্য ও গুণ, এ উভয়কেই পৃথক্ ও একত্র, এতদুভয় প্রকারেই জানা উচিত; কিন্তু যখন দ্রব্য ও গুণকে পৃথক্ করা যায় না, অর্থাৎ গুণহীন দ্রব্যকে কিছুতেই অনুভবে আনিবার সম্ভাবনা নাই, তখন দ্রব্য (গুণী) ও গুণ একই পদার্থ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বাস্তবিকও আমি আম্র-ফলের অস্তিত্ব কিছুই জানিতেছি না, জানিতেছি কেবল রূপ-রসাদির অস্তিত্ব, এবং ভাল করিয়া না বুঝিয়াই ধরিয়া লইতেছি যে, এই রূপ-রসাদি পঞ্চগুণ মদিতর একই স্থানে বা দ্রব্যে আছে। আমার রূপ-জ্ঞান হইল; আমি মানিয়া লইলাম যে, ঐ রূপ-আমার সম্মুখস্থিত একটী দ্রব্য হইতে আসিল। আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, ধরিয়া লইলাম যে ঐ গন্ধ আমার সম্মুখস্থিত সেই দ্রব্যটী হইতেই আসিল। আমি প্রথমে একটী কল্পনা করিলাম, পরে দ্বিতীয় কল্পনাটীকে প্রথমটীর সঙ্গে যুক্ত করিলাম। হস্ত-চালনা করিয়া স্পর্শানুভব করিলাম, এবং তৃতীয় বার কল্পনা করিলাম যে, সেই রূপ-গন্ধের সংযোগ-স্থানেই এই স্পর্শ মিলিত হইয়াছে। তাহার পর একটী শব্দ শুনিলাম, আর অমনি ধরিয়া লইলাম যে, শব্দটীও রূপ-গন্ধ-স্পর্শের সন্ধিস্থান হইতেই আসিল। ইহার পর কল্পিত সন্ধিস্থান হইতে রূপ-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তুলিয়া আনিয়া মুখে দিয়া রস অনুভব করিলাম, এবং ধরিয়া লইলাম যে, রূপ-রসাদি পঞ্চ অনুভাব্য বিষয় সমুদয়ই একত্র একই দ্রব্যে থাকে, এবং সেই দ্রব্যটী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গেলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপাদিও স্থানান্তরিত হয়। এ সকলই কল্পনার কার্য্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ আম্রটীর অস্তিত্বই কাল্পনিক। আমি আমার কয়েকটী কল্পনাকে একত্র গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যে একটী কল্পনা-কেন্দ্র রচনা করিয়াছি, তাহাই আম্র! কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট প্রকারের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ সম্বন্ধীয় কল্পনাকে একটী কেন্দ্র-নিবিষ্ট কল্পনা করায় আম্রের উৎপত্তি। আমার একটী নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ কল্পনা-গ্রন্থির নাম আম্র; ইহা ব্যতীত আম্রের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই।

কথাগুলি একবার অন্য রকমেও আলোচনা করা যাউক। আমি একটী রূপ দেখিতেছি; অসতর্কভাবে যাহাকে আম্রের রূপ বলি, আমি তাহাই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আম্রের রূপ অনুভব করিতেছি বলিয়াই কি আম্রের বাহ্য-দ্রব্য-ধাতু-বিশিষ্ট অস্তিত্ব আছে? যদি দ্রব্য-ধাতুগত-আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে, তবে চক্ষুর্দ্বয়ের অন্য প্রকার বিন্যাস জন্য যখন একটা আম্রকে দুইটা বলিয়া চাক্ষুষ অনুভবে বুঝি, তখন কি পূর্ব্বানুভূত একটী বাস্তব আম্র পরের অনুভূতিমত বাস্তবিক দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল? অর্থাৎ একটী আম্র আবার সময়ান্তরে দুইটী হইয়া দাঁড়াইল? যুগল নেত্রের যে প্রকার বিন্যাসে সাধারণতঃ স্বীকৃত একটী বাস্তব পদার্থকে দুইটী বলিয়া বোধ হয়, সেই প্রকারে মানব-চক্ষু চিরবিন্যস্ত থাকিলে, এখনকার চির-একটী-বস্তু তখন চির-দুইটী-বস্তুরূপে সত্য বলিয়া অনুভূত হইত না কি? কিন্তু আমি কি মনে ধারণা করিতে পারি যে, যেই আমি ভ্রূ-কুঞ্চনে চক্ষুর্দ্বয়কে পৃথক্ করিলাম, আর অমনি একটী বস্তু বাস্তবিকই দুইটী হইয়া দুই স্থানে শোভা

পাইতে লাগিল? অবশ্য আমি যেরূপ ধারণা না করিয়া অন্ততঃ একটী আম্রকে অবাস্তবিক জ্ঞান করি, কিন্তু যেখানে দুইটীর মধ্যে একটী বস্তু আর একটী অবস্তু বলিয়া আমার জ্ঞান হইবে, সে স্থানে আমি কোন্‌টীকে বস্তু আর কোন্‌টীকে অবস্তু বলিব? চক্ষু আমার এ সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না; হস্ত দ্বারা কি সংশয় ভঞ্জন করিতে পারি? আচ্ছা— একবার হস্ত প্রসারণ করিয়া আম্রটীকে স্পর্শ করিয়া দেখি। একি! আমার হস্তও যে দ্বিত্ব প্রাপ্ত হইল!! আমার কোন্ হস্ত বাস্তবিক, আর কোন্ খানি অবাস্তবিক? হস্ত দ্বারা দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্র দ্বয়ের কোন্‌টী মিথ্যা স্থির করিবার পূর্ব্বে আমার হস্ত-যুগলের কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, স্থির করিতে হইবে। কিন্তু কিকরিয়া আমি এ সন্দেহ ঘুচাইব? দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রটীতে আমার দ্বিত্ব-প্রাপ্ত হস্ত সংলগ্ন হইয়া, আমার স্পর্শ-জ্ঞানকেও যেন দ্বিত্বপ্রাপ্ত করাইয়াছে। যদি স্বীকারও করি যে, আমি স্পর্শ করিয়া কিছু দুইটী আম্র অনুভব করিতেছি না; দৃষ্টিতে আম্র ও হস্তকে দ্বিত্বপ্রাপ্ত বোধ হইলেও স্পর্শ-জ্ঞান একই হইতেছে; কিন্তু সেই স্পর্শের একত্বে কি দ্বিত্ব-প্রাপ্ত আম্রের বা হস্তের কোন্‌টী বাস্তবিক, তাহা বুঝিতে পারিলাম? যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তবে স্পর্শে আমার সন্দেহ দূর করিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবেই হইল, স্পর্শ দ্বারা বাস্তবিক রূপের বা অবাস্তবিক রূপের সত্তা অনুভব করিতে পারা যায় না। আর এক কথা, চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি রূপ, হস্ত দ্বারা অনুভব করিতেছি স্পর্শ; সুতরাং চক্ষু যাহা অনুভব করিতেছে, হস্ত তদিতর অন্য কিছু অনুভব করিতেছে; তাহেই উভয়ের সাম্যের একতাই মূলে নাই। বস্তু-তত্ত্ব-বিষয়ে আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ-বিড়ম্বনা এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্য দর্শন। [illegible]

([illegible])

—•:০:•—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপ
ঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ত
তোঽভাবাৎ ॥ ১

পদপাঠঃ—দুঃখ, ত্রয়, অভিঘাতাৎ, জিজ্ঞাসা, তদ্-অপঘাতকে, হেতৌ। দৃষ্টে সা অপার্থা, চেৎ, ন, একান্ত, অত্যন্ততঃ, অভাবাৎ ॥

ব্যাখ্যা—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—দুঃখত্রয়ের অভিঘাত হইতে; দুঃখত্রয় যথা—

অধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। শারীরিক—বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা প্রভৃতির বৈষম্য জনিত যে দুঃখ; মানসিক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভয়, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি জনিত যে দুঃখ।

আধিভৌতিক-মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্পাদি জনিত যে দুঃখ।

আধিদৈবিক—যক্ষ-রক্ষঃ এবং গ্রহাদির আবেশজনিত যে দুঃখ, অথবা—বিদ্যুৎ-মেঘ-বজ্র ইত্যাদি দৈবদুর্বিপাকজনিত যে দুঃখ। জিজ্ঞাসা—জানিবার ইচ্ছা। তদপ-ঘাতকে হেতৌ—ঐ ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশক হেতুবিষয়ে। দৃষ্টে—ঐ দুঃখ-নাশের হেতু দৃষ্ট হওয়ায়; সা—ঐ জিজ্ঞাসা। অপার্থা চেৎ যদি নিষ্প্রয়োজন বল। ন—তাহা নহে।

একান্তাত্যন্ততঃ—একান্ত এবং অত্যন্তের-একান্ত-দুঃখনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা। অত্যন্ত-নিবৃত্ত দুঃখের পুনরনাগমন। অভাবাৎ—অভাবহেতু।

[illegible]ার্থ—[illegible]াত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ থাকাতেই, ঐ দুঃখত্রয়ের কিসে নাশ হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা জন্মে। যদি বল যে ঔষধ-মন্ত্রাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয় দ্বারাই এই দুঃখ নষ্ট করা যাইতে পারে, এবং তাহা হইলে এই দুঃখত্রয় বিনাশের ইচ্ছা নিষ্প্রয়োজন; তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, [illegible] জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন নহে; কারণ দুঃখ-নাশের দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আছে, সেই সমুদয়ে দুঃখ-নাশের অবশ্যম্ভাবিতা নাই, এবং দুঃখ একবার নষ্ট হইলে, তাহা যে পুনরায় উপস্থিত হইবে না, এরূপও নহে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই সংসারে যে দুঃখ আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, এবং ঐ দুঃখ হিন্দুশাস্ত্রকারগণ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কি উপায়ে এই দুঃখ নিবৃত্ত হয়, তজ্জন্য মনুষ্যগণ বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শারীরিক কোন রোগ জন্মিলে, ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে; ঐরূপ মানসিক কোন দুঃখ উপস্থিত হইলে, যাহাতে ঐ দুঃখের প্রতিকার হয়, তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে; ঐ প্রকার আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক যে সমুদয় দুঃখ, তাহার প্রতিবিধানার্থও বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য মানব যতই [illegible] না কেন, দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। ঔষধাদি দৃষ্ট যে সমুদয় উপায় আমরা অবলম্বন করি, তাহারা সকল সময়েই অব্যর্থ নহে। হয়তো কোন সময়ে এক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া ঔষধ দ্বারা প্রতিকার লাভ করিল, কিন্তু আবার অনেক সময়ে ঔষধের দ্বারাও রোগীর রোগমুক্তি হইল না। অন্যান্য দুঃখ নিবারণের লৌকিক উপায় সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাহাদের অবলম্বনে যে দুঃখ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে, এবং বিনষ্ট হইলে পর, সেই দুঃখ যে আর আসিবে না, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং এই সমুদয় দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়ে এই দোষ পরিলক্ষিত হয় যে, তাহাদের দুঃখ-নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা এবং পুনরনুৎপাদনের অভাব রহিয়াছে। সূত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ সমুদয় উপায় একান্তও নয়, অত্যন্তও নয়। তাই ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, লৌকিক যে সমুদয় উপায়, তাহা দুঃখ-নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়াতেই অন্য উপায় জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি হয়। সুতরাং এই প্রবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন নহে। কপিলদেব যে দুঃখ-নিবারণের একান্ত এবং অত্যন্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।

কেহ যদি আপত্তি করেন যে, লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের একান্ত বা অত্যন্ত নাশ না হইতে পারে, কিন্তু যে সমুদয় বৈদিক উপায় আদিষ্ট আছে, তাহা অবলম্বন করিলে ত দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইতে পারে। কেননা শ্রুতি বলেন যে "স্বর্গকামো যজেত ইতি" অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন। স্বর্গ কাহাকে বলা যায়—'যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং

অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্" যাহা বর্ত্তমানে দুঃখ-মিশ্রিত নহে, এবং উত্তরকালেও দুঃখগ্রস্ত হইবে না, এতাদৃশ ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত যে সুখ, তাহাই 'স্বর্গ' পদবাচ্য। অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত যে সুখ, তাহাই স্বর্গ। সুতরাং যখন শ্রুতি বলিতেছেন যে—"স্বর্গ—অর্থাৎ দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লিপ্সু ব্যক্তি যজ্ঞ করিবেন" এতদ্দ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারাই দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশ হইয়া সুখ লাভ হইবে। অতএব দুঃখ-নাশের লৌকিক উপায় না থাকিলেও, তাহার বৈদিক উপায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কাজেকাজেই সূত্রকারের "জিজ্ঞাসা" "অপার্থা" অর্থাৎ নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইতেছে। শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায় যে "অপাম সোমমমৃতা অভূম" সোমপান করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কিন্তু দুঃখ নাশ না হইলে, অমৃতত্বের লাভ হয় না; ইহা দ্বারাও দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নাশের উপায় সূচিত হইতেছে। এই সমুদয় পূর্ব্বপক্ষ পর্য্যালোচনা করিয়া সূত্রকার ভগবান কপিল দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধি ক্ষয়াতিশয়-যুক্তঃ।

তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ॥ ২

পদপাঠঃ—দৃষ্টবৎ। আনুশ্রবিকঃ। সঃ। হি। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ। তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টবৎ—আনুশ্রবিক—শ্রৌত বা বৈদিক উপায়ও দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় তুল্য। সঃ—ঐ শ্রৌত বা বৈদিক উপায়। হি—নিশ্চয়। অবিশুদ্ধি-ক্ষয়-অতিশয়-যুক্তঃ—অপবিত্রতা—ধ্বংস বা অনিত্যতা ও অসমতা-বিশিষ্ট। তদ্বিপরীতঃ—তাহার বিপরীত। শ্রেয়ান্—শ্রেয়ঃ। ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞাতা, এই তিনের পরিজ্ঞান হেতু।

বঙ্গার্থ—অবিশুদ্ধি, হিংসা এবং অসমতা প্রযুক্ত শ্রৌত উপায় সমূহও দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় দোষাবহ। ইহার বিপরীত উপায়ই প্রশস্যতর; এবং ব্যক্ত (অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্ত বা বিকাশভাব) অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি) জ্ঞ-(জ্ঞাতা পুরুষ), এই তিনের সম্যক্ জ্ঞানই সেই উপায়।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান কপিলদেব বলিতেছেন যে, বৈদিক উপায় সমূহও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ, কেন না বৈদিক যাগাদিতে জীব-হিংসাদি করিতে হয়, সুতরাং যজ্ঞাদির দ্বারা যেরূপ একটি অপূর্ব্ব পুণ্য লাভ হয়, সেইরূপ পশ্বাদির হিংসার দ্বারাও পাপ জন্মে। সুতরাং শ্রুতি অনুসারেও যাগাদি দ্বারা দুঃখশূন্য সুখ লাভ হয় না। যদি বল যে, বেদাদিতে হিংসার নিষেধ হইয়াছে—যথা—"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি"—তাহাও বলা যায় না, কেন না—বেদেই বিহিত হইয়াছে যে "অগ্নি-সোমীয়ং পশুমালভেত" অর্থাৎ অগ্নিসোমের অঙ্গীভূত পশু বধ করিবে; যদি আবার বল যে, ইহাতে বেদবাক্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সুতরাং পূর্ব্ববিধির দ্বারা আবার পরবিধি বাধিত হইল; তাহাও বলিতে পার না—কারণ এই বিধিদ্বয়ের প্রয়োগস্থল বিভিন্ন; প্রথম বিধির দ্বারা হিংসার নিষেধ করা হইতেছে, এবং দ্বিতীয় বিধির দ্বারা বিশেষভাবে হিংসার যজ্ঞোপযোগিতা বিহিত হইয়াছে। এতাবতা অবিশুদ্ধিহেতু বৈদিক উপায়ও লৌকিক উপায়ের ন্যায় দোষাবহ স্থিরীকৃত হইল।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদিক উপায় অনিত্য, কেন না

যজ্ঞাদি দ্বারা উপলব্ধ যে স্বর্গ, তাহা অনিত্য। তৃতীয়তঃ, অসমতা-দোষও প্রসক্ত হইতেছে; কেন না—বেদ-বাক্যানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি দ্বারা স্বর্গ-সাধন হয়, এবং বাজপেয়াদি দ্বারা 'স্বারাজ্য' পদ লাভ হয়; সুতরাং যাহাদের বাজপেয়াদি যজ্ঞের সাধনোপযোগী ধনাদি নাই, তাহাদের দুঃখ-বিরহিত-সুখ-লাভ হইতে পারে না; কারণ স্বর্গাদির অনিত্যতা-নিবন্ধন তাহাদিগকে পুনরায় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। শ্রুতির স্থলবিশেষে যজ্ঞাদি অমৃতত্বের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, (১) অপর কোনস্থলে তদ্বিপরীত—অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, এই প্রকার উক্ত হইয়াছে। (২) এই সমুদয় দেখিয়া ভগবান কপিল বলিয়াছেন যে—"তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্" অর্থাৎ শুদ্ধতা, নিত্যতা এবং সমতাযুক্ত উপায়ই প্রশস্যতর, এবং সেই উপায়ই ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞাতা পুরুষের সম্যক্ জ্ঞান। জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাকেই ব্যক্ত বলা যায়, এবং ইহারা সকলেই কার্য্য,—সুতরাং অনিত্য। কার্য্য হইতে অনুমান দ্বারা আমরা কারণে উপনীত হই। বিশেষ প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হয় যে, কারণগুলিও ক্রমে কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়, এবং ক্রমে কারণ হইতে কারণান্তরে গমন করিয়া আমরা জগতের একটি মূল (আদি) কারণে উপস্থিত হই। এই মূল কারণকেই ভগবান্ কপিল "অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি" বলিতেছেন, এবং ঐ অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্তাসমূহকে "ব্যক্ত" বলিতেছেন। এতদুভয় কার্য্য-কারণরূপে বিভিন্ন হইলেও একজাতীয়; এই উভয়ের সহিত পুরুষের পার্থক্য-জ্ঞান সম্যক্‌প্রকারে জন্মিলেই, ভগবান্ কপিলের মতে দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। এ বিষয় পরবর্ত্তী সূত্র-সমূহ দ্বারা বিশদীকৃত হইবে।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ। ৩

পদপাঠঃ—মূলপ্রকৃতিঃ। অবিকৃতিঃ। মহদাদ্যাঃ। প্রকৃতি। বিকৃতয়ঃ। সপ্ত। ষোড়শকঃ। তু। বিকারঃ। ন। প্রকৃতিঃ। ন। বিকৃতিঃ। পুরুষঃ।

ব্যাখ্যা—মূলপ্রকৃতি—(প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ) যিনি প্রকৃষ্টভাবে করেন—অর্থাৎ এই বিশ্ব উৎপাদন করেন, তিনি প্রকৃতি। তিনি এই জগতের মূল হওয়াতে তাঁহাকে মূল-প্রকৃতি বলা যায়। অবিকৃতিঃ—অর্থাৎ উৎপন্ন হয়েন না। (তাবৎ বিশ্বই মূল-প্রকৃতির বিকার, কিন্তু প্রকৃতি কাহারও বিকার নহেন, এই জন্যই তিনি অবিকৃতি। মহদাদ্যাঃ সপ্ত-মহদাদি সপ্ত—অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ—ইহারা মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা বিকার, এবং অন্যান্য "তত্ত্বের" উৎপাদক বলিয়া প্রকৃতি বা উৎপাদক। ষোড়শকঃ তু—পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই ষোড়শতত্ত্ব। বিকারঃ—উৎপন্ন। ন প্রকৃতিঃ—উৎপাদক নহে। ন বিকৃতিঃ—উৎপন্ন নহে। পুরুষঃ—পুরুষ।

(১) অপাম সোমমমৃতা অভূম।
(২) ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগেন [illegible] অমৃতত্বমানশুঃ।

বঙ্গার্থ—মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি—অর্থাৎ অনুৎপন্না, মহৎ আদি (মহৎ অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্র) সপ্ত তত্ত্ব উৎপন্নও বটে এবং উৎপাদকও বটে, অর্থাৎ মহৎতত্ত্ব মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন; আবার পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ ভূত, এই ষোড়শ তত্ত্ব উৎপন্ন—অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনঃ উৎপন্ন; পুরুষ উৎপন্নও নহেন—উৎপাদকও নহেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—সাঙ্খ্যকারের মতে জগতের মূল কারণ নিত্য; জগতের কারণ-শৃঙ্খল ধারণ করিয়া আমাদিগকে একটি মূল-কারণে যাইয়া উপস্থিত হইতে হয় এবং অনবস্থা-দোষ পরিহার করিবার জন্য, আমরা আর ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে পারি না; অর্থাৎ যাহাকে আমরা শেষ কারণ বলিলাম, যদি কেহ তর্কচ্ছলে বলেন যে, সেই শেষ কারণেরও কারণ আছে, এবং ক্রমে সকল কারণ গুলিরই কারণ আছে, তাহা হইলে আমরা কোন স্থলে যাইয়াই স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারি না, ইহাতে অনবস্থা-দোষের প্রসক্তি হয়।

অতএব অনবস্থা-দোষ পরিহারের জন্য আমরা যেটিকে জগতের শেষ কারণ বলিয়া স্থির করি, ভগবান্ কপিলের মতে তাহাই মূল-প্রকৃতি। পুরুষ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষও মূলপ্রকৃতির ন্যায় অনাদি। কিন্তু জগতের কর্তৃত্বে পুরুষের কোন হাত নাই, প্রকৃতি হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়; সাঙ্খ্যমতে পুরুষ কেবল সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। মহৎ বা বুদ্ধি প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। এই মহৎ বা বুদ্ধির সাহায্যেই পুরুষের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে। পুরুষ অন্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপ, কিন্তু বাহ্য বস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য, তাঁহার নিজের কোন উপকরণ নাই, প্রকৃতি-জাত মহৎ বা বুদ্ধিই সেই উপকরণ, কিন্তু এই মহৎ বা বুদ্ধি পুরুষের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংস্পৃষ্ট। ইহাও জড়াত্মক। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ কপিল কিংবা অপরাপর হিন্দু-দার্শনিকগণের মতে জড়জগৎ এবং মনো-জগতে কোন প্রভেদ নাই। মনোজগৎ বা জড়জগৎ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকার বিকাশ মাত্র। বস্তু হইতে বস্তুর জ্ঞানের কোন প্রভেদ নাই——অর্থাৎ বস্তুও যাহা, বস্তুর জ্ঞানও তাহাই। বিকাশোন্মুখী প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি; বুদ্ধিও যাহা, বুদ্ধির বিষয়ীভূত বস্তুও তাহা। এই বুদ্ধি হইতেই অহঙ্কারের উৎপত্তি, এই অহঙ্কার বা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞানও যাহা, অহঙ্কারের বিষয়ীভূত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুও তাহাই। এই সমুদয়ই জগতের সূক্ষ্মাবস্থা। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) অর্থাৎ এই ভৌতিক জগতের আদি পঞ্চ সূক্ষ্মঅবস্থা উৎপন্ন হয়। জাগতিক তাবৎ পদার্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, উহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কোন না কোন অবস্থা ব্যতীত, অন্য কোন অবস্থায় দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জগতের যাবতীয় পদার্থ বিভক্ত করিলে, তাহারা পঞ্চাতি-রিক্ত ভাগে বিভক্ত হয় না। কেননা— জগতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই। জগতের এই

পঞ্চ পদার্থ, এই পঞ্চ পদার্থের আদি সূক্ষ্মাবস্থার নামই পঞ্চতন্মাত্র। এদিকে দেখুন, পৃথক্ জ্ঞানের সত্তা বশতই পৃথক্ বস্তুর সত্তা। পার্থিব বস্তু সমূহকে আমি যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃষ্ট হইত না,—সমুদয়ই এক ভাবে দৃষ্ট হইত। বুদ্ধির সত্তা হেতুই অহঙ্কারের সত্তা, এবং অহঙ্কারের সত্তা হেতুই বস্তুর পার্থক্য-জ্ঞান। যখন কেবল বুদ্ধি আছে, তখন বস্তুর পৃথক্ জ্ঞান থাকেনা; ঐ বুদ্ধিই যখন অহঙ্কারে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখন বস্তুরও পৃথক্ জ্ঞান জন্মে। এই সমুদয় বস্তুর আদিম সূক্ষ্ম অবস্থাই পঞ্চতন্মাত্র। পুরুষের সহিত ইহাদের কোন সংস্রব নাই। কপিল, যদি জগৎ কেবল প্রকৃতি-সম্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি একভাবে অদ্বৈতবাদী হইতেন; কিন্তু তিনি পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিয়া, দ্বৈতবাদী হইয়াছেন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়—নিশ্চেষ্টভাবে আছেন। তিনি—কিছুই করেন না, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তাবৎই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে; বুদ্ধির সন্নিকর্ষহেতু কেবল পুরুষের জ্ঞান মাত্র হয়।

এই পঞ্চতন্মাত্র জগতের সূক্ষ্মাবস্থা, ইহা হইতে পঞ্চসূক্ষ্ম মহাভূতের উৎপত্তি হয়—যথা,—শব্দ হইতে আকাশ বা ব্যোম, স্পর্শ হইতে বায়ু বা মরুৎ, রূপ হইতে তেজ বা অগ্নি, রস হইতে জল বা অপ্, এবং গন্ধ হইতে পৃথিবী বা ক্ষিতি। ইহারা সমুদয়ই ভৌতিক সূক্ষ্মাবস্থা; স্থূল-মহাভূতের

এক দিকে যেমন অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আমাদের বিভিন্নপ্রকার পৃথক্ জ্ঞানের সাধারণ নাম অহঙ্কার। এই সমুদয় পৃথক্ জ্ঞানই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ-সম্ভূত। জ্ঞানেন্দ্রিয় যথা—কর্ণ, ত্বক, চক্ষুঃ, রসনা ও নাসিকা; কর্ম্মেন্দ্রিয় যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ। ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যবস্তুর সংস্রবে আসিলে, মনই সেই সমুদয় জ্ঞান ধারণ করিয়া, উহাদিগকে স্বতন্ত্র করে। মন এই সমুদয় জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উপস্থিত করেন; অহঙ্কার বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করেন; তখন পুরুষ বুদ্ধি-রূপ দর্পণের সহায়তায় বাহ্যজগতের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন।

আমরা যে বাহ্য-জগৎ দেখিতে পাই, ইহা ব্যক্ত, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা দৃষ্টি করিয়াই, আমরা অনুমানের দ্বারা, "ইহার একটি অব্যক্ত অবস্থা আছে" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ব্যক্ত অবস্থা অস্থায়ী এবং পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ইহার একটি স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল কারণ না থাকিলে, ইহা কখনও হইতে পারিত না। জগতের এই স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনশীল অবস্থাই অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি, এবং ইহাই জগতের বীজ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

জনন-সূক্ত।

শিষ্য—কিমর্থং জননং কার্য্যং?

অর্থ—জননের প্রয়োজনীয়তা কি?

১। গুরু—সৃষ্টি-সংরক্ষণায় তৎ।

অর্থ—সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্যই জননে

ব্যাখ্যা—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-সৃষ্টির মুহুর্মুহু যে অপচয় হইতেছে, একমাত্র জননই তাহার পরিপূরক। প্রতিক্ষণ অসংখ্য পদার্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু কিছুতেই বিচিত্র বিশ্বের ক্ষতি হইতেছে না; এত ক্ষয়—এত পদার্থাপচয় সত্ত্বেও যে বিশ্ব পদার্থহীন হইতেছে না, একমাত্র জননই তাহার মুখ্য কারণ। জনন যদি প্রতি-পলে পৃথিবীর অভাব পূরণ না করিত, যদি অনুক্ষণ বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থের পুনরুৎ-পাদন করিয়া অঙ্গ অক্ষত না রাখিত, তবে হয়ত এতদিন এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হইত!

"বিশ্ব" শব্দের অর্থ "সমগ্র"—অর্থাৎ পদার্থ-সমূহের সমষ্টি। পদার্থ বাদ দিলে, বিশ্বের আর কিছুই থাকে না। পদার্থ-নিচয়ই বিশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পদার্থ-সমষ্টিই বিশ্ব। জনন-নিবন্ধন এই পদার্থ-রাশি প্রতিনিয়ত উপচীয়মান হইয়া, বিশ্বের বিশ্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে। সেই জন্যই সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য শিষ্যের সংশয়-নিরাস-মানসে বলিতেছেন যে, এই বিচিত্র বিশ্বের একমাত্র কারণ জনন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসূন যেমন সূত্র দ্বারা গ্রথিত হইয়া, একগাছি মালার আকার ধারণ-পূর্ব্বক একত্রনিবদ্ধভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ নানাবিধ পদার্থ-নিচয়, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলে সৃষ্ট হইয়া, বিচিত্রভাব ধারণ করতঃ নয়ন-মুকুরে বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই বিচিত্র বিশ্বের পদার্থ-নিচয় যে সৃষ্টিরূপ তন্তু দ্বারা গ্রথিত হইয়া মালার ন্যায় সমষ্টিভাবে আভাসমান হইতেছে, জননই ইহার হেতু। ছিন্নতন্তু মালা যেমন অচিরাৎ ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিশ্বও যদি জননশূন্য হয়, তাহা হইলে অতি অল্প কালের মধ্যেই অস্তিত্বহারা হইয়া, কাল-সমুদ্রের অনন্ত বেলায় বিলীন হইয়া যায়।

কি উদ্ভিদ-জগৎ, কি প্রাণি-জগৎ, সমস্তই স্ত্রী ও পুরুষ-শক্তি-সমুদ্ভূত। যখন পুংজাতীয় কুসুমের রেণু বায়ু বা ভ্রমরাদি-কর্ত্তৃক স্ত্রীজাতীয় কুসুমের কেশরে আনীত হয়, তখন তাহা হইতে ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি পুং-কুসুমের পরাগ অন্য কোন ভিন্নজাতীয় স্ত্রী-কুসুমের কেশরে নিহিত করিলে, সেই স্ত্রী-কুসুম হইতে একটি ভিন্নতম শঙ্কর-কুসুমের উৎপত্তি হয়। এ সমুদয় প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়। মনুষ্যাদি প্রাণীর উৎপত্তি যে নিয়মের অধীন, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের উৎপত্তিও মূলতঃ সেই নিয়মের অধীন; তবে কোন স্থলে উহা প্রস্ফুট, কোনস্থলেবা অপ্রস্ফুট। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই স্ত্রী-পুং-সংযোগে সমুৎপন্ন। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমরা যে কিছু পদার্থ অবলোকন করি, তৎ সমস্তই স্ত্রী-পুং-শক্তি-সহযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি আরও একটু অভিনিবিষ্ট হই, তাহা হইলে প্রতীত হইবে যে, জগতের আদি কারণই যখন প্রকৃতি এবং পুরুষ, তখন এই প্রত্যক্ষ বিশ্বের পদার্থনিচয়ের নিদান যে স্ত্রী এবং পুরুষ হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? জনন ব্যতীত সৃষ্টি-রক্ষা হয় না, অতএব জননই যে বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, ইহার আর প্রমাণান্তর অনাবশ্যক। তাই আচার্য্য বলিতেছেন যে, বিশ্বের মূল জননক্রিয়া। ইহা সর্ব্বত্রই অব্যভিচারী। তবে কিনা, ঐ ক্রিয়া মানবাদির পক্ষে স্বীয় ইচ্ছা-

সাপেক্ষ, আর পশ্বাদির পক্ষে স্বাভাবিক পাশবিক বৃত্তি-সাপেক্ষ এবং জড়-জগতের পক্ষে বিশ্ব-নিয়ন্তার সুসম্বদ্ধ নিয়ম-সাপেক্ষ। কোথাওবা দৃশ্যভাবে, কোথাওবা অদৃশ্য-ভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত হয়।

সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানবের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, সৃষ্টি-রক্ষাই তাঁহার জনন-ক্রিয়ার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি-মানসে যাঁহারা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, এবং উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলেই বিরত হয়েন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ত্তব্য-পরায়ণ; আর যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে উদাসীন, অথচ ক্রিয়া-তৎপর, তাঁহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতা-জনিত মহাপাতকগ্রস্ত, এবং অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ও নিতান্ত নিন্দনীয়। প্রবৃত্তির উপর যাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই, নিবৃত্তি-জনিত দিব্য শান্তি-সৌরভে কখনও তাঁহাদের চিত্ত আমোদিত হয় না; তাঁহারা পদে পদে প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হইয়া দুষ্পরিহার্য্য কুকর্ম্মে মলিন হইয়া পড়েন। তাই আচার্য্যের বচন-ভঙ্গি-ক্রমে উপলব্ধি হইতেছে যে, সৃষ্টি-পুষ্টিই যখন জনন-ক্রিয়ার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত, কথিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে কেবল অনর্থই সংঘটিত হয় মাত্র; অতএব নিরুদ্দেশ্য-ব্যক্তির প্রস্তাব্য বিষয় হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্বাদি ইতর প্রাণিগণের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা কোন প্রকার হিতকর উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া প্রাগুক্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না; তাহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে অভ্যুত্থান করিতে যে মহাশক্তির প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের নাই; তাহারা প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইয়া, তাহারই চরিতার্থতা সাধন করিতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতির জ্ঞান বা প্রয়োজন তাহাদের নাই; তাই বলিতেছিলাম, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; তবে তাহাদিগের মধ্যেও প্রায়স্থলেই অপত্যোৎ-পাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না।

মানবগণের প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা আছে; ইচ্ছা করিলে, তাহারা চিরকাল নিবৃত্তিশীল হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত করিতে পারে। মানবের ঘৃণা, লজ্জা, অপমান, আত্মদৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তের উপরই লক্ষ্য আছে; হিতাহিত জ্ঞান আছে; তাই মানব পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—প্রাণি-জগতে মানবের উচ্চাসন দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এ হেন মানব যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া, মাত্র ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিতে উদ্যত হয়, পশ্বাদির ন্যায় কামোন্মত্ত হইয়া প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে, মানবের চিরউপাস্যা নিবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দানে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নরাকার জীব এবং পশু, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিল কি? অতএব প্রাগ্বর্ণিত উদ্দেশ্য—সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনেচ্ছা ব্যতীত কেবল মাত্র অকিঞ্চিৎকর বাসনা-পরিতৃপ্তির জন্য এবং প্রবৃত্তির প্রসার বৃদ্ধির জন্য জনন-সম্ভাবনাশূন্য জনন-ক্রিয়ানুষ্ঠান নিতান্ত গর্হিত।

প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য-শৃঙ্খলেই উহা সংযত। উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইলে আর কর্ম্মের আবশ্যকতা থাকে না। রতি কার্য্যের মূলে

উদ্দেশ্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতের কার্য্যাবলীর কোন প্রকার শৃঙ্খলা—অর্থাৎ সুব্যবস্থা থাকিত না ; তাবৎ কার্য্যই নিতান্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়িত, পৃথিবী অনন্ত অশান্তির আকর হইত। যাহারা ক্রিয়ার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া ক্রিয়া-সাধনে সমুদ্যত হয়, তাহারা কার্য্য-সাফল্য জনিত অনুপম আনন্দভোগের অধিকারী হয় না ; সুতরাং যখন যে কার্য্যই করা যাউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি এবং সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত ; নতুবা পদে পদে লাঞ্ছনা-প্রাপ্তি অনিবার্য্য। মহাজনগণ বলিয়াছেন—"কেবা নস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ"। পক্ষান্তরে ইহাও বিবেচ্য যে, প্রবৃত্তিকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে, তাহা উত্তরোত্তর ততই পরিবর্দ্ধিত হইবে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া কেহ কখনও তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই ; বরঞ্চ আরও অধিকতর প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন যে "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি, হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অর্থাৎ উপভোগের দ্বারা কখনও কামনা প্রশমিত হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাক্ত অনলের ন্যায় অধিকতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি যে শত-সহস্রগুণে শুভকরী, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অতএব যেস্থলে সৃষ্টির পুষ্টি-সাধনের সম্ভাবনা নাই, তথায় বার্থ-জননক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উত্তমকল্প। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"প্রবৃত্তেনিবৃত্তিরেব গরীয়সী"। বৃথা ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে যত নিবৃত্ত হওয়া যায়, ততই মঙ্গল ; মনু বলিয়াছেন "ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু নপ্রসজ্যেত কামতঃ" কাম-পরিচালিত হইয়া ইন্দ্রিয়ার্থে আসক্ত হইওনা। কাম-প্রসক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি চরিতার্থ করিলে, অতি অল্প কালের মধ্যে ইন্দ্রিয়াদিও শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাদ্বারা সেই ইন্দ্রিয় জনিত বাহ্য সুখেরও ব্যাঘাত ঘটে। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ হয় বটে, কিন্তু ঐ সুখই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ভোজন-ক্রিয়ায় সুখ আছে, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা ; ভোজন-ক্রিয়া যদি দুঃখজনক হইত, তাহা হইলে শরীর-রক্ষণে অবহেলাও হইতে পারিত। অতএব ভোজন-জনিত যে সুখ, তাহা শরীর-রক্ষার প্ররোচক মাত্র ; তাই ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য শরীর-রক্ষা, গৌণ উদ্দেশ্য অশন-সুখ। শরীর-রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, যে ব্যক্তি ভোজন-সুখের জন্যই কেবল ভোজন করে, সে অচিরাৎ রোগাদি-জনিত অমঙ্গল-ভাগী হয়। তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার মুখ্য উদ্দেশ্য অপত্য-উৎপাদন। যে ব্যক্তি সেই মুখ্য উদ্দেশ্য পরিহার পূর্ব্বক গৌণ-উদ্দেশ্য শারীর-সুখেরই অনুসরণ করে, সেও অচিরাৎ সেই সুখ হইতে বঞ্চিত ও বিবিধ অমঙ্গল-ভাগী হয়। ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত শারীর-সুখ অপত্য-উৎপাদনের প্ররোচক মাত্র। অপত্যোৎপাদন-ক্রিয়া দুঃখজনক হইলে, সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থ প্রবৃত্তির অভাব হইত। ইন্দ্রিয়-সুখ সেই অভাবের অপসারণ করিয়াছে মাত্র, নতুবা উহাই উদ্দেশ্য নহে, এবং উহাকেই উদ্দেশ্য করিলে, কদাচ অভ্যুদয়ভাগী হওয়া যায় না, ইহা প্রত্যক্ষ।

শিষ্য—কেনাধিকারিণস্তস্মিন্?

অর্থ—সেই জনন-ক্রিয়ায় অনধিকারী কাহারা? অর্থাৎ কীদৃশ ব্যক্তিগণ জগতের হিতার্থে সৃষ্টি-প্রবাহ অপ্রতিহত রাখিবার জন্য জীবোৎপাদন-কর্ম্মে বৈধভাবে সমর্থ, এবং কাহারাই বা অসমর্থ, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু—শক্তিরুৎপাদিকা যেষাং ইন্দ্রিয়েষু ন বর্ত্ততে।

অর্থ—যাহাদের শুক্রে উৎপাদিকাশক্তি নাই, তাহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—'ইন্দ্রিয়' শব্দের অর্থ শুক্র; যথা রত্নকোষে———"নৃ-বীজমিন্দ্রদৈবত্যং তস্মাদিন্দ্রিয়মুচ্যতে"। প্রথম সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রাখিবার জন্যই জনন-ক্রিয়া কর্ত্তব্য। অধুনা তাহার অধিকারি-নির্ণয়-মানসে অনধিকারিগণের উল্লেখ করা যাইতেছে; কারণ অনধিকারী ব্যতীত সকলেই অধিকারী। যাহাদের রেতঃ উৎপাদিকাশক্তিবিহীন, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা সৃষ্টি-রক্ষার অনুকূল জীবোৎপাদন-কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে না, তাহারা উল্লিখিত ক্রিয়ার অনধিকারী। সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্যই জনন-কার্য্য; যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহার পক্ষে প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিই শ্রেয়সী। ইন্দ্রিয়-সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; সুখই যদি ইন্দ্রিয়-সেবকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি নিবৃত্তি-মার্গে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে অনেক উৎকৃষ্টতর সুখ লাভ করিতে পারেন। তিনি যদি ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী না হইয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকারের জন্য অপর কোন সামাজিক—দৈশিক ব্যাপারে মনোভিনিবেশ করেন, তাহাহইলে তৎকর্ত্তৃক পৃথিবী অন্যভাবে প্রভূত উপকার-প্রাপ্ত হইতে পারে; আপ্রলয় তাঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকে, এবং তিনিও অপরিমিত আনন্দ ভোগ করেন; সে আনন্দের নিকট ইন্দ্রিয়-সুখ অতি তুচ্ছ। প্রাচীন ঋষিগণ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ইন্দ্রিয়-বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক জগতের মঙ্গলের-জন্য জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া চিরবরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে কর্ত্তব্যের পরিসীমা নাই; যিনি যতই কর্ত্তব্য-সাধন করুন না কেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আরও কিছু কর্ত্তব্য তাঁহার থাকিবেই থাকিবে। সৃষ্টি-রক্ষারূপ কর্ত্তব্য-পালনের জন্য যাঁহারা জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ত্তব্য-পালন করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে তাহা বিধেয়; কিন্তু যে সমুদয় ব্যক্তি উক্তরূপে সৃষ্টি-পোষণের অনুকূল কার্য্য-সাধনে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা গর্হিত। জগতের কোন উপকারই নাই, অথচ বৃথা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় শিথিল-শক্তি হইয়া ভারময় জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা প্রবৃত্তি-প্রশমনপূর্ব্বক সুস্থ ও সবলকায় হইয়া জগতের হিতকর অনুষ্ঠানে নিরত থাকাই কি নিরুদ্দেশ্যভাবে অকার্য্যা-নুষ্ঠান হইতে প্রশস্যতর ব্রত নয়? পশ্বাদির ন্যায় প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অপেক্ষা নিবৃত্তির অনুসরণই শ্রেয়স্কর।

৩। যে দীনা নিতরাং নিস্বাঃ।

অর্থ—যাহারা দীন, নিতান্ত নিঃস্ব, তাহারাও অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—"পৃথিব্যাং যানি দুঃখানি নরাণা-মাপতন্তি হি। তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি পুত্র-দর্শনজাৎ সুখাৎ॥"

এই দুঃখ-বহুল অবনীমণ্ডলে মানবের যত প্রকার দুঃখই থাকুক না কেন, একমাত্র পুত্র-মুখদর্শনেই তাবৎ দুঃখ বিনাশপ্রাপ্ত হয়

এহেন প্রাণপ্রিয় অপত্যকে যাহারা, (মনের সাধে খাওয়ান পরান দূরের কথা) অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারাও জীবিত রাখিতে অক্ষম, তাদৃশ নিতান্ত নিঃসম্বল দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পক্ষে জীবোৎপাদন অনুচিত; ইহাতে জগতের উপকার না হইয়া তদ্বিনিময়ে বিশেষ অপকারই হইয়া থাকে, এবং উৎপাদকগণও সন্তানের ক্ষুৎ-কাতর পরিম্লান মুখচ্ছবি দর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করেন। অতএব যাহারা কোন প্রকারে কোন উপায়ে অন্ততঃ গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্তও নির্ব্বাহিত করিতে অশক্ত, তাদৃশ উপজীবিকাশূন্য উপায়ান্তরবিহীন ভিক্ষুকগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে অনধিকারী। কেন না—দয়ালুর সংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহাতে দয়ার প্রয়োগস্থল—অর্থাৎ দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হয়, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। যে দেশে দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, সে দেশ তত নিস্তেজ, নিরবলম্ব ও নিঃস্ব; যে দেশে স্বাধীনজীবিক লোকের সংখ্যা যত অল্প, সে দেশ তত অনুন্নত। অতএব পৃথিবীতে কতগুলি নিঃস্ব নিরুপায় দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া, কতগুলি পরভাগ্যোপজীবী দয়া-প্রার্থীর সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দেশের অপকার করা অপেক্ষা, তাহা হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়; তবে যাহারা কোন মতে কায়-ক্লেশেও সন্ততি-পালনে পারক, তাহাদের প্রতি এ বিধি প্রসক্ত হইবে না।

দীনহীন কৃতদার ব্যক্তিকে নিঃস্বতা ও নিঃসম্বলতা-নিবন্ধন কেবল দারোপগমন হইতে বিরত করাই সূক্ষ্মদর্শী পরিব্রাজকাচার্য্যের লক্ষ্য নহে, পরন্তু তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে আদৌ দারপরিগ্রহই অনুচিত, ইহাও উক্ত সূত্রার্থে পরিজ্ঞেয়। মানব যাবৎকাল পর্য্যন্ত যে কোন বৈধ উপায়ে পরিজন-পালনক্ষম না হয়, তাবৎকাল তাহার দার-গ্রহণ করাই অসঙ্গত। পরিণীত হইয়া কতগুলি পরিবারের কষ্টের কারণ হইয়া কষ্ট পাওয়া অপেক্ষা অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখেচ্ছার সংযম-সাধন পূর্ব্বক কৌমার্য্যব্রত অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। অস্মদ্দেশে প্রায়শই এ নীতির ব্যভিচার দৃষ্ট হয়; পরের গলগ্রহ হওয়া যেন আমাদের কতকটা স্বভাব-সিদ্ধ। নতুবা যদি "স্বোপার্জ্জিত বা বৈধোপায়লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার পালন করিতে হইবে" এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষ এত দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। যতদিন পরিবার পালনের ক্ষমতা না জন্মে, ততদিন পরিবার-রূপ দুষ্পরিহর বাগুরায় আবদ্ধ হওয়া কদাচ আকাঙ্ক্ষনীয় নহে। সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার্থেই জননের প্রয়োজন। জাত সন্তানের সুপরি-পালন—সুপরিরক্ষণ না হইলে, সে কখনও জীবিত থাকিতে পারে না, সুতরাং জননের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সন্তান জন্মিল বটে, কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন অকালে—অনশনে—অপালনে—কালগ্রাসে পতিত হইল। এই জন্যই পরিব্রাজক বলিতেছেন যে, যাহার সন্তান-পরিপালনের শক্তি নাই, তাহার জননেরও অধিকার নাই।

যে দেশ যত দরিদ্র, সেখানে তত অকাল-মৃত্যু। ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ তুলনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে অকাল-মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এবং উহা প্রধানতঃ ভারতবর্ষের দরিদ্রতা নিবন্ধনই হইয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে ভারতে যেমন সাধারণ অকাল-মৃত্যু-সংখ্যা অধিক, তদ্রূপ ভারতের শিশুদিগের

মৃত্যু-সংখ্যাও ইংলণ্ডের শিশুদিগের মৃত্যু-সংখ্যা হইতে অধিক। এদেশে পিতা-মাতার দরিদ্রতাই উহার এক প্রধান কারণ। যদি বল, সমাজের ধনী ব্যক্তিরাই দরিদ্রদিগকে প্রতিপালন করিবেন, কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, জগতে অনিবার্য্য দুঃখ এতই রহিয়াছে যে, তাহা মোচন করাই পরোপকারী ধনিবৃন্দের পক্ষে সুকঠিন; সুতরাং স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া জগতের দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া, তন্মোচনার্থ ধনীদিগকে বাধ্য করিলে, জগতের দুঃখমোচনের প্রতিকূলতাই করা হয়।

৪। কুষ্ঠাদ্যৈশ্চ মহারোগৈঃ পীড়িতা যে চ মানবাঃ।

অর্থ—। যাহারা কুষ্ঠাদি অসাধ্য রোগ-গ্রস্ত, তাহারাও কথিত উপগমন-কার্য্যে অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—। কুষ্ঠ—যক্ষ্মা প্রভৃতি অসাধ্য-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিও যে পিতৃ-রোগে জর্জ্জরীভূত হইয়া থাকে, ইহা প্রায়শই পরিদৃষ্ট হয়। ঐ পিতৃরোগ কেবল যে অধস্তন এক পুরুষগামী হয়, তাহা নহে, উহা ধারাবাহিকরূপে ঐ বংশগত প্রায় তাবৎকেই পরিপীড়িত করে; এবং এইরূপে জগতে কুৎসিৎ অসাধ্য রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অতএব এতাদৃশ ক্ষেত্রে অবিবাহিতের বিবাহ এবং বিবাহিতের দারোপগমন অনুচিত; তবে যদি ভগবদনুগ্রহে কেহ রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু সাধারণতঃ কুষ্ঠাদি-রোগীর বিবাহে বা অপত্যোৎপাদনে সমাজ বিশিষ্ট-প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন; জগতে রোগীর সংখ্যা ক্রমশঃ উপচয়প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে [illegible] একটা ঘোর অশান্তিময় দুর্ভারগ্রস্ত সমাজ [illegible] করে। ইহাতে পিতা বা সন্তান, কাহারও সুখ হয় না; প্রত্যুত নিরতিশয় দুঃখই হইয়া থাকে। অতএব কতগুলি জীব সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে আজন্ম যন্ত্রণা এবং সাধারণের অবজ্ঞার পাত্র করা অপেক্ষা, জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ান্। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে—"যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধম্" স্ত্রী যে প্রকৃতির পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়, তাহার গর্ভে সেই প্রকৃতির সন্তান উৎপাদিত হয়। যদি কেহ বলেন যে, ইহার দ্বারাও সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয়, তদুত্তরে বলা যায় যে, ইহাদ্বারা আদর্শ-সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা হয় না। যে মানবের দ্বারা মানবের বিবিধ কর্ত্তব্য সংসাধিত না হইতে পারে; তাহার অস্তিত্ব কর্তৃক মানবাস্তিত্ব-প্রবাহ রক্ষিত হয়, ইহা বলা যায় না।

৫। অপক্করেতসো বা যে—

অর্থ—অপক্করেত-ব্যক্তিগণও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী,

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন সন্তান প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না, এবং জীবিতকাল পর্য্যন্ত দৌর্ব্বল্য ও অন্যান্য প্রকার রোগে প্রপীড়িত হইয়া পরিশেষে সুহৃদগণের অশেষ দুঃখের কারণ হয়। ইহাতে কাহারই সুখের সম্ভাবনা নাই; অতএব অপক্কবীর্য্য-ব্যক্তির প্রাগুক্ত ক্রিয়ায় অধিকার নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার ভূয়ঃ-প্রচলনে দেশের এবং সমাজের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহাতে বীজী এবং বীজোৎপন্ন অঙ্কুর, উভয়েই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহাদের দ্বারা সমাজের কোনই উপকার সাধিত হয় না। ইহারা ঘোর অকর্ত্তব্যতাকরণ-জনিত মহাপাপে মগ্ন হইয়া জীবনের কার্য্যকর অধ্যায়েই ইহধাম

পরিত্যাগ করে; ইহাতে সৃষ্টির কোনই অনুকূলতা হয় না, বরঞ্চ প্রকারান্তরে অপকারই সংঘটিত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"পুমান্ বিংশতি বর্ষশ্চেৎ পূর্ণষোড়শবর্ষয়া। স্ত্রিয়া সঙ্গচ্ছতে গর্ভাশয়ে শুদ্ধে রজস্যপি। অপত্যং জায়তে ভদ্রং তয়োর্ন্যূনেঽধমং স্মৃতং।" বিংশতিবর্ষীয় পুরুষ যদি পূর্ণ-ষোড়শবর্ষীয়া রমণীর সহিত যথাকালে সঙ্গত হয়েন, তবে তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তানই উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিংশতি বর্ষের ন্যূনবয়স্কের সহযোগে অপূর্ণ-ষোড়শী রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তান অধম হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপে অপরিপক্ক বীজোদ্ভূত সন্তান জন্মিতে থাকিলে, কালে মনুষ্য-বংশ ধ্বংস হইতে পারে।

আয়ুর্ব্বেদও বলিয়াছেন "ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্ত-পঞ্চবিংশতিঃ, যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে। জাতো বা নচিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ। তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং নকারয়েৎ।"

পঞ্চবিংশবর্ষের ন্যূনবয়স্ক পুরুষ, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান করিলে, গর্ভেতেই উৎপন্ন সন্তান বিপন্ন হয়; ঐ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে সে অধিক দিন জীবিত থাকে না; এবং যদিওবা অধিকদিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়; অতএব অতিবালাস্ত্রীতে কখনও গর্ভাধান করিবেনা।

৬।—বানপ্রস্থা ভিক্ষবো বা ব্রহ্মচর্য্যরতাশ্চ যে।

অর্থ—যাহারা বানপ্রস্থ, ভিক্ষু বা ব্রহ্মচর্য্যরত, তাহারাও উপগমন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—গৃহস্থেতর আশ্রমত্রয়-সেবীর পক্ষে প্রাগুল্লিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অনুচিত। ইহাতে তাঁহাদের গন্তব্য পথ অপ্রাপ্য হয়। ইহা তাঁহাদিগের সাধনের বিশেষ অন্তরায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে উদাসীন থাকিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব আশ্রমানুকূল ধর্ম্মে সমধিক আস্থাবান হইয়া আদর্শ-জীবন-সাধনে সমর্থ হউন, ইহাই একান্ত অভিপ্রেত। যাঁহারা এখনও প্রবৃত্তির কঠোর শৃঙ্খলে অনাবদ্ধ কিংবা একবার সেই দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিয়াছেন, এবং নিবৃত্তির স্বর্গীয় স্বাধীনতা-সুধা উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন, তাঁহারা যেন নিবৃত্তির নির্ভয় ক্রোড় পরিহার পূর্ব্বক, আর প্রবৃত্তির করাল কবলে প্রবিষ্ট হইয়া অশান্তি-পেষণে নিষ্পেষিত না হয়েন, ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। প্রবৃত্তির প্রসার যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, জীবন ততই দুঃখময় হইয়া দাঁড়াইবে; আবার নিবৃত্তির কৌমুদী-প্রভায় হৃদয় যতই আলোকিত হইবে, জীবন ততই শান্তির নিকেতন হইয়া উঠিবে। অতএব যিনি যত নিবৃত্তিশীল, তাঁহার সুখের পথ তত বিস্তৃত পক্ষান্তরে, যিনি যত প্রবৃত্তিমান্, তাঁহার দুঃখের জলধি তত অনন্ত। তাই প্রাচীন আর্য্যগণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তি সর্ব্বথা শ্রেয়সী। তবে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অবসানে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক অপত্যোৎপাদনে কোন বাধা নাই।

৭।—বৃদ্ধা বা জীর্ণবীর্য্যা চ।

অর্থ—যাহারা বৃদ্ধ বা জীর্ণবীর্য্য, তাঁহারাও জনন-ক্রিয়ার অনধিকারী।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা বার্দ্ধক্য বা অন্য কারণে নিতান্ত জীর্ণবীর্য্য, তাঁহাদের পক্ষেও প্রাগুক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান অসঙ্গত। জীর্ণবীর্য্যোৎপাদিত সন্ততি নিতান্ত জীর্ণ

ও ক্ষীণকলেবর হয়; শরীরে বলাধান মাত্র হয় না; নিরতিশয় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হয়; যদিওবা জীবিত থাকে, কিন্তু এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, তাহার দ্বারা জগতের কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকেনা; সে নানাবিধ রোগের আবাসভূমি হইয়া সংসারে জীবিত-যাতনা ভোগ করিতে থাকে মাত্র। সেই সন্ততি হইতে যদি কোন বংশ সমুৎপন্ন হয়, তবে সে বংশের তাবৎকেই পূর্ব্বপুরুষের ঐ ঘোর অপকর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ নানাপ্রকার রোগে ও দৌর্ব্বল্যাদিতে সমাজে নগণ্য হইয়া থাকিতে হয়; পৃথিবী তাহাদের ভারই বহন করেন মাত্র, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনরূপ উপকার প্রাপ্ত হয়েন না; প্রত্যুত রোগী এবং দীনের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অশেষবিধ অপকারই ভোগ করেন মাত্র। অতএব ইচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া কতগুলি অকর্ম্মণ্য, অলস, আময়গ্রস্ত জীবের প্রসার বৃদ্ধি করা অপেক্ষা, নিবৃত্ত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত।* এতাদৃশ ক্ষেত্রে, যাঁহারা এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, নিজের কর্ম্মের পরিণাম-ফলের দুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও, নিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া পরিণতি-বিরস ইন্দ্রিয়-সুখের বশবর্ত্তী হয়েন, তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদিগের জীবন্মৃত বংশীয়গণকে নানাবিধ অশান্তি ও সামাজিক অবজ্ঞা ভোগ করিতে হয়। যে যে কারণে অপরিপক্ক বীর্য্যোৎপন্ন সন্তান অপ্রশস্ত, সেই সেই কারণে জীর্ণবীর্য্যোৎপন্ন সন্তানও অপ্রশস্ত। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, যে সময়ে মানুষের বলী—অর্থাৎ চর্ম্ম শিথিল হয়, কেশ পলিত হয়, কিংবা পৌত্র-মুখ দর্শন হয়, সে সময়ে অরণ্য-প্রবেশ—অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম বিশিষ্ট গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, তদ্বর্জ্জিত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন বিধেয়। তাই শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, "পঞ্চশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" অর্থাৎ এই সময়ে সন্তান-উৎপাদনাদি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া, বান-প্রস্থাদি অবলম্বনপূর্ব্বক জগতের উপকার-সাধনে নিরত হইতে হইবে।

৮। শিষ্য—কিমাধারঞ্চ তদ্বদ।

অর্থ—তাহার—অর্থাৎ প্রাগুক্ত জনন-ক্রিয়ার কীদৃশ আধার হিতকর এবং শ্রেষ্ঠ, তাহা বলুন। বীর্য্যাধানের ক্ষেত্র কি প্রকার হওয়া উচিত, ইহাই এই প্রশ্নের তাৎপর্য্য।

গুরু———

৯।—যোষিৎ রোগবিহীনা যা।

অর্থ—যোষিৎ—স্ত্রী—অর্থাৎ যে পরিণীতা নারী রোগবিহীনা, অপত্য-উৎপাদনে তিনি শ্রেষ্ঠ আধার।

ব্যাখ্যা—রোগিনী-সমাগমে সমুৎপন্ন সন্ততির শরীরও রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠে, এবং সঙ্গতি-কর্ত্তাও রোগযুক্ত হয়েন; ইহাতে উভয়কেই অনর্থ ভোগ করিতে হয়; সুতরাং এতাদৃশ ক্ষেত্র জননক্রিয়ার অনুপযোগী। ইহার অনুষ্ঠানে আরও যে কত অবর্ণনীয় রোগাদির এবং অশান্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাষার অতীত। বিবেচকগণ একটু প্রণিধান করিলেই এ বিষয়ের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১২—স্বগুণৈরবিরোধিনী।

অর্থ—প্রাগুক্ত গুণবিশিষ্টা যে পরিণীতা ভার্য্যা স্বামীর শারীরিক এবং মানসিক গুণের অবিরোধিনী, তিনিই জনন-ক্রিয়ার উপযুক্ত পাত্রী।

ব্যাখ্যা—পতি এবং পত্নী, এতদুভয়ের

যদি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ প্রভৃতি গুণগত প্রভেদ না থাকে, তাহা হইলে এতদুভয়ের সংযোগ-সমুৎপন্ন সন্ততিই সৃষ্টির অলঙ্কার-রূপে পরিণত হয়; অন্যথা বিরুদ্ধগুণ-সম্পন্ন দারোপগমনে নানাবিধ কুসন্তান জন্মিয়া সৃষ্টি কলঙ্কিত করে, এবং তদ্ধেতু পতি ও ভার্য্যা, উভয়কেই শারীরিক ও মানসিক অশেষবিধ যাতনা ভোগ করিতে হয় ইহাতে উভয়ের মধ্যে কাহারই সুখ-লাভের আশা থাকেনা; পরন্তু নিরতিশয় দুঃখই ভোগ করিতে হয় মাত্র।

যে স্থলে স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়েরই গুণের সমতা থাকে, তথায় তদুভয়-সমুৎপন্ন সন্তান আশানুরূপ উৎকৃষ্ট হয়। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন "উভয়ং তু সমং যত্র সা প্রশস্তিঃ প্রশস্যতে"।

১১—নাতিবালা ন বৃদ্ধা বা।

অর্থ—প্রাগ্‌বর্ণিত গুণবত্তা সত্বে যে রমণী অতি বালা বা বৃদ্ধা নয়, তাদৃশী পরিণীতা ভার্য্যাই জনন-ক্রিয়ার সমধিক প্রশস্তা।

ব্যাখ্যা—অপক্কবীর্য্য বা জীর্ণবীর্য্য-সমুৎপন্ন সন্তান যেমন ক্ষীণায়ুঃ এবং অশেষ প্রকার অকল্যাণভাগী হয়, অপ্রস্ফুটবৃত্তি অপরিণত-বয়স্কা কিংবা গলিতযৌবনা রমণীর গর্ভ-সম্ভূত সন্তানও তদ্রূপ। ইহাতেও স্বামী এবং স্ত্রী, উভয়কেই নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ৫ম সূত্রেই দৃষ্ট হইবে যে, শাস্ত্রে ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্কা স্ত্রীতে গর্ভাধান অকর্ত্তব্য বলিয়া বিধান আছে।

১২—বয়সাচ কনীয়সী।

অর্থ—উল্লিখিত লক্ষণ সমন্বিতা পরিণীতা ভার্য্যা যদি বয়ঃকনিষ্ঠা হয়, তবে সেই জনন-ক্রিয়ার প্রশস্ত আধার।

ব্যাখ্যা—বয়োধিকারমণী-সহযোগে সন্তান-সন্ততিও প্রাগুক্ত বহুল দোষভাক্ হইয়া থাকে, এবং এই বিসদৃশ-সংস্পর্শে সংস্পর্শকর্ত্তার নানাপ্রকার রোগ ও আয়ু-ক্ষয় ঘটে। তাই আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র এ বিষয়ের ভয়ঙ্কর অপকারিতা প্রদর্শনপুরঃসর ইহা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহাতে শুধু শারীরিক নহে, মানসিক শক্তিক্ষয়ও অনি-বার্য্য। ফলতঃ ইহ-পারলৌকিক ক্ষেমকামী ব্যক্তিবৃন্দের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত যে, বয়োধিকা রমণীর সংযোগ অত্যন্ত অপকারপ্রদ এবং অপ্রীতিজনক,—ইহার পরিণামফল বিষম বিষময়;—ইহার অনিষ্টকা-রিতা বর্ণনারও অতীত।

১৩—পরিণীতা পতিপ্রাণা প্রহৃষ্টা গৃহ-ধর্ম্মস্থ। সা প্রশস্তা সিসৃক্ষূণাং প্রজোৎপাদন-কর্ম্মণি।

অর্থ—উপরিলিখিত গুণবিশিষ্টা পতিরক্তা সাধ্বী ও সংসার-ধর্ম্মে সতত উৎসাহ-প্রফুল্লা পরিণীতা রমণীই সৃষ্টি-লিপ্সুগণের প্রজা-সৃষ্টি-বিষয়ে প্রশস্যতম আধার। ৯ম হইতে ১৩শ সূত্র পর্য্যন্ত তাবৎ বিশেষণ-পদই ৯ম সূত্রস্থ বিশেষ্য 'যোষিৎ' পদের সহিত অন্বিত।

ব্যাখ্যা—আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে যাহা কিছু বলা হইল, তৎসমস্তই সম্পূর্ণভাবে যে রমণীতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সন্তান-উৎপাদনের শ্রেষ্ঠপাত্রী; তাদৃশী রমণীর গর্ভজাত সন্ততি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ত্রই শুভফলহেতু হইয়া থাকে। তাহাদের দ্বারা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, সংসার অলঙ্কৃত হয়, জগৎ নানা প্রকারে উপকারপ্রাপ্ত হয়। তাদৃশী লোক-ললামভূতা

ললনার শুভগর্ভ-সমুদ্ভূত-সন্তান যথার্থই 'সন্তান' পদবাচ্য; তাহার দ্বারাই সৃষ্টির সন্তান—অর্থাৎ বৃদ্ধি যথার্থ সুসাধিত হয়। সে সবল এবং সর্ব্ববিষয়ে সামর্থ্যশালী হইয়া অলোকসামান্য দিব্য প্রতিভা প্রকাশে বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করে। তাদৃশ একটি সন্তান দ্বারা যে কার্য্য সমাহিত হইতে পারে, দুর্ব্বল ক্ষীণমস্তিক বিবিধ-ব্যাধি-মন্দির অন্য শত-সহস্র তথা-কথিত সন্তান দ্বারা তাহা কদাচ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই পরিব্রাজক, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার জন্য দারোপগমনকারী ব্যক্তি-গণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রকৃত নিদানস্বরূপ প্রজা-সৃষ্টির আধার-নির্ণয়-প্রস্তাবে, নারী-জাতির গর্ভ-গ্রহণোপযোগিতার বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; যাঁহারা সৎ-অপত্য-লাভপ্রয়াসী, তাঁহারা যেন এ বিধির ব্যভিচারী না হয়েন, ইহাই একান্ত নিবেদন। যে জন্মিলে বংশ পতিত হয় না, সেই ত অপত্য; সেই অপত্য শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির সার্থক পাত্র (ন পততি বংশো অনেন)। প্রাগ্‌বর্ণিত সুলক্ষণা-ন্বিতা সাধ্বীর গর্ভসম্ভূত পুত্রই "পুত্র" শব্দের যথার্থ প্রতিপাদ্য।

১৬—যস্মাৎ প্রজাবিবৃদ্ধিস্তৎ মতং রতমনুত্তমং।

অর্থ—"ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চ রতং নিধুবনঞ্চ স" ইত্যমরঃ,—যে রত, অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম্ম—জীবোৎপাদন-কর্ম্ম হইতে প্রজা-বিবৃদ্ধি হয়, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা—সৃষ্টি-প্রবাহ-পরিপালন হেতুই উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, অতএব সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার উদ্দেশ্য ব্যতীত রততৎপর হওয়া অনুচিত। কেননা, তাহাতে সৃষ্টির কোনই [illegible] নাই, প্রত্যুত ব্যর্থ-বীর্য নিষেক-নিবন্ধন [illegible] হইয়া সৃষ্টির গলগ্রহ-রূপে পরিণত হয়েন। সেই জন্যই কথিত হইয়াছে যে, সন্তান-উৎপাদন-সম্ভাবনা ব্যতীত গ্রাম্যধর্ম্ম-পরিচর্য্যা অকর্ত্তব্য। উহাতে সৃষ্টির ক্ষতি বই বিন্দুমাত্রও লাভ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যেরই একটা বন্ধন—অর্থাৎ নিয়ম থাকা উচিত; যে কার্য্য কোন প্রকার নিয়ম-রজ্জুতে সংযত নহে, তাহাতে পদে পদে বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রায়শঃ পরিণাম-বিফলতা উপস্থিত হয়; অতএব তাবৎ কার্য্যেরই একটা নিয়ম থাকা আবশ্যক। উল্লিখিত রতক্রিয়াও যদি এই প্রকার সন্তান-জনন-সীমার আবদ্ধ থাকার নিয়মে সংযত না করা যায়, তাহাহইলে সমাজে মহতী বিপত্তির আবির্ভাব হয়;—অধুনা হই-তেছেও তাই। সংযম-ভ্রষ্ট হইয়া, প্রবৃত্তির দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন, অন্যান্য অশেষ কর্ত্তব্য অবহেলাপূর্ব্বক, অনেকে হয়ত উহাতেই সমর্পিতজীবন হইয়া থাকেন; সুতরাং প্রবৃত্তির পঙ্কিল-প্রবাহে শান্তিময়ী নিবৃত্তির অস্তিত্ব ভাসিয়া যায়। নানা প্রকার অনর্থ ভাবে আক্রান্ত হইয়া, সমাজ চিরদিনের মত উন্নতির উত্তুঙ্গ আশামঞ্চ হইতে নিপতিত হয়। অতএব যাহাতে উক্ত বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রসার বর্দ্ধিত না হয়, তজ্জন্য একটা নিয়ম থাকা প্রয়োজন; তাই পরিণামদর্শী আচার্য্য জনন-ক্রিয়ার বিষয়ে একটী বিশ্বজনীন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়া, শিবাকে কর্ত্তব্য শিক্ষাদান-চ্ছলে জগতের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন।

১৭—অন্যৎ নিরয়দং বিদ্ধি দুষ্কাম-কলুষীকৃতম্॥

অর্থ—প্রজা-প্রাপ্তি-বাসনা ও সম্ভাবনা ব্যতীত যে জনন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহা নরকজনক বলিয়া জানিবে; কেননা তাহা দুষ্প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত।

ব্যাখ্যা—কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যাহারা অপত্যেচ্ছা ব্যতীত উক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে জীবিত কালে

নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরিশেষে নরক-লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। সন্তানেচ্ছায় উদাসীন থাকিয়া জনন-ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যে কি মহান্ অনর্থপাত সংঘটিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বস্থ সূত্রসমূহে উক্ত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অতঃপর মাত্র ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সৃষ্টি-রক্ষার উদ্দেশ্যশূন্য উপগমন-ক্রিয়া কথঞ্চিৎ আপাত-সুখদ হইলেও পরিণাম-বিরস, অশেষ অকল্যাণকর ও অবনীর অশান্তিজনক। দুষ্কাম-কলুষিত রতানুষ্ঠানে যে সৃষ্টির কি মহৎ অনিষ্ট হয়, তাহা কেবল সুহৃদয় সম্বেদ্য, উহার প্রকাশোপযোগিনী ভাষা নাই। ইহাতে সমাজের বলক্ষয়, দেশের অবনতি ও জগতের মহতী ক্ষতি হয়।

১৮—ভার্য্যায়াং হি প্রজা কার্য্যা সৈব ক্ষেমঙ্করী ভবেৎ।

অর্থ—ভার্য্যাতেই প্রজা (সন্ততি) উৎপন্ন করা উচিত। কেননা সাধ্বী সদৃশী ভার্য্যা-সম্ভূত অপত্য ইহজগৎ এবং পরজগৎ, উভয়ত্রই মঙ্গলের কারণ হয়।

ব্যাখ্যা—নাস্তি পাপকরং কিঞ্চিৎ পরদারাভিমর্ষণাৎ। ভার্য্যেতরসঙ্গমাচ্চ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাৎ॥ শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, পরস্ত্রী-গমন বা সর্ব্বলোক নিন্দিত পণ্য-রমণী-(বারাঙ্গনা) অভিমর্ষণ অপেক্ষা অধিক পাপজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। এই কুকার্য্যের ফল অসহ্য লোকনিন্দা, অপরিমিত আত্মগ্লানি, অনন্ত অবমাননা, দুচিকিৎস্য ব্যাধি আধ্যাত্মিক অভাবনতি ইত্যাদি। আর পরত্রে উৎকট নরক ভোগের অনিবার্য্যতা শাস্ত্রে সুস্পষ্ট বর্ণিত। এহেন কুক্রিয়াজাত সন্ততি দ্বারা পিতৃকুলের কোনই প্রীতি সাধিত হয় না; পরন্তু জগতের মহান্ অপকার হয়। ক্ষেত্র বিশেষে প্রাণিহত্যার (নর হত্যাই বলা যায়) উৎকট পাপে আক্রান্ত হইতে হয়। তাই ভার্য্যা ব্যতীত ক্ষেত্রান্তরে সন্তান জনন নিতান্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। সাধ্বী ভার্য্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান বংশের এবং জগতের বিভূষণরূপে শোভা পায়। সূর্য্য-কুলপতি মহারাজ দিলীপ সন্তানকামী হইয়া বলিয়াছেন যে—"সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্ম্মণে" সৎকুল-সমুৎপন্ন অপত্য ইহ-পর উভয় লোকেই অশেষ মঙ্গলের নিদান। বাস্তবচক্ষে দৃষ্টি করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ড-প্রয়োজনঃ।" পুত্রের নিমিত্তেই ভার্য্যা-গ্রহণ, কেননা পুত্র-প্রদত্ত পিণ্ডপ্রাপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পরস্ত্রী-গর্ভসম্ভূত অসদপত্যে সে আশা থাকেনা। মানবধর্ম্মশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা, আয়ুষ্কামেন বপ্তব্যং ন জাতু পরযোষিতি" প্রাজ্ঞ বিনয়-ভূষিত জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ আয়ুষ্কাম-ব্যক্তি যেন কদাচ পরস্ত্রীতে বীজ-বপন না করেন। এসম্বন্ধে বিবিধ নিষেধশাস্ত্রে বিবিবদ্ধ হইয়াছে। আত্মপক্ষে পরভার্য্যা-নিষিক্ত-বীজের ব্যর্থতা প্রদর্শন-কল্পে ভগবান্ মনু আরও বলিয়াছেন যে, "নশ্যতীষুর্যথা বিদ্ধঃ খে বিদ্ধমনুবিদ্ধ্যতঃ। তথা নশ্যতি বৈ ক্ষিপ্রং বীজং পর-পরিগ্রহে" অন্য কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ কৃষ্ণসারের ক্ষতস্থলে বাণবেধ করিলে যেমন সেই পশ্চাৎ-বেধকারীর ক্ষিপ্ত শর নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ পরক্ষেত্রে বপিত উক্ত বীজও নিষ্ফল হইয়া যায়; বপন-কর্ত্তার কোনই লাভ হয় না,—পরন্তু ক্ষতিই হইয়া থাকে। অতএব সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষার্থ জননকর্ত্তার পক্ষে স্বভার্য্যেতর-রমণী-স্পর্শ শাস্ত্রতঃ এবং ব্যবহারতঃ, উভয়স্থলেই অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; অপত্যলিপ্সুর এতাদৃশ নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়াই বিধেয়। পরিণীতা ভার্য্যাই সংসারে লক্ষ্মী-রূপিণী। সংসারাশ্রমে বাস করিতে হইলে, যাহাতে দাম্পত্য বিরোধ না ঘটে, তৎপক্ষে সমধিক দৃষ্টি রাখা পতির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে সংসারে দম্পতীর মানসিক অকৌশল বিদ্যমান, তাহা নিত্য অশান্তির নিলয় স্বরূপ। একেই ত সংসার নানা দুঃখের আকর, তাহাতে আবার যদি দাম্পত্য প্রণয়জনিত অপার্থিব সুখটুকুও পৃথিবীতে না মিলে, তবে মানুষের সংসার-ধর্ম্ম বিষম বিড়ম্বনাময় হয়। তাই একজন প্রসিদ্ধ

কবি বলিয়াছেন—"পান্থাশ্রমেঽস্মিন্ সংসারে নানাতাপ-পিপাসুভিঃ। পতিভিঃ সর্ব্বদা লভ্যা শান্তির্ভার্য্যাবিনোদনাৎ।" এই পান্থাশ্রম-স্বরূপ সংসার-ক্ষেত্রে নানাতাপ-ক্লিষ্ট শান্তি-তৃষ্ণা-কাতর পতিগণের সাধ্বী পতিপ্রাণা ভার্য্যাকৃত মনোবিনোদন-সম্ভূত অপূর্ব্ব শান্তি লাভ করা উচিত। মনুও বলিয়াছেন—— "অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চহ।" অপত্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, আত্মপরিচর্য্যা, উত্তমা রতি, পিতৃপুরুষ এবং আত্মার স্বর্গ, এ সমস্তই সাধ্বী ভার্য্যার অধীন। অতএব যাহাতে সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যার প্রতি অসদ্ব্যবহার না করা হয়, তাঁহার অবমাননা না করা হয়, তাঁহার মনে বেদনা না দেওয়া হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে— "প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥" সন্তানলাভের জন্য মহোপকারিণী বহুকল্যাণ-ভাজনরূপিণী গৃহের শোভা-সংবর্দ্ধিনী স্ত্রী সর্ব্বদা প্রেমাদর-প্রাপ্তির যোগ্যা; কেননা গৃহীর গৃহে স্ত্রী এবং শ্রী-(লক্ষ্মী) এতদুভয়ের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। স্ত্রীই গৃহের লক্ষ্মীরূপিণী। এতাদৃশ-মঙ্গলময়ী প্রেমামৃত-প্রবাহিনী পতিপ্রাণা রমণীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহারা ঘৃণিত পরদারা-ভিমর্ষণকার্য্যে উদ্যত হয়, তাহাদের ন্যায় পাপাচার, বিশ্বাসঘাতক, আত্মদ্রোহী অভাগা জীব এ জগতে আর নাই। নারীজাতি প্রায়শই পতি-পথবর্ত্তিনী হইয়া থাকেন; পতির হৃদয়ের গুণ গরিমা প্রচ্ছন্নভাবে ললনা-হৃদয়ে অনুবিদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে তাদৃশ গুণসম্পন্না করিয়া তুলে; সুতরাং পতি যখন কল্যাণকরী ভার্য্যার প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক উৎপথবর্ত্তী হন, তখন তাঁহার মনে রাখা উচিত যে, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার ন্যায় আচরণ করিতে পারেন। তিনিই তাঁহার অজ্ঞাত-পরপুরুষতত্ত্বা সরলা ভার্য্যাকে বিষম বীভৎস পাপের অভিনয় দেখাই-তেছেন; এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীও উৎকুলগামিনী হইলে, তাহাতে স্ত্রীর দোষ অপেক্ষা পথ-প্রদর্শক (রক্ষাকর্ত্তা?) ভর্ত্তার দোষই অধিকতর। স্ত্রী স্বামীর গুণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অতএব স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎপক্ষে উদাসীন থাকা সর্ব্বথা অবিধেয়। এই উদাসীনতার ফল বংশের এবং জগতের অকল্যাণে পরিণত হয়। আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্রে উক্ত আছে—"যাদৃগ্গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥" সমুদ্র-সঙ্গতা তটিনীর ন্যায় ভার্য্যা স্বামীর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ব্যভিচার কালে স্বামীর মনে করা উচিত যে, তাঁহার এই দুষ্কার্য্যের পরিণাম সঙ্গ-সংক্রমণের অপরিহার্য্য ফলে তদীয় ভার্য্যার চরিত্রে সংসক্ত হইতে পারে; অতএব সংসার-সুখলিপ্সু সন্তানচিকীর্ষু আত্মার এবং পিতৃপুরুষের স্বর্গকামী ব্যক্তির ভার্য্যেতর-নারীসঙ্গ নিতান্ত অনুচিত। ভার্য্যেতর-সমুৎপন্ন পুত্র "পুত্র" পদবাচ্যই নয়;— তাহাতে উৎপাদনকর্ত্তার কোন প্রকার শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; তাই বিচক্ষণ পরিব্রাজক পুত্রোৎপাদনের বৈধাবৈধতার বর্ণনচ্ছলে অবশ্যজ্ঞেয় দার-ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। স্বভার্য্যা-গর্ভ সম্ভূত পুত্রের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন মানসে মনু আরও বলিয়াছেন যে, "স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতায়াস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্। তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং॥" বিবাহাদি-সংস্কার-পূত স্বক্ষেত্র-সমুৎপন্ন ঔরস-পুত্রই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ অপত্য। ভার্য্যেতর-রমণী-গমনে অশান্তি এবং বিপদ এতই জাজ্বল্যমান যে তাহা বাগাড়ম্বরে বুঝাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক। বিশেষতঃ ব্যভিচারোৎপন্ন সঙ্কর-সন্তান যে সমাজের কত অনিষ্টকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গীতায় অর্জ্জুনোক্তিতে উহা সংক্ষেপে সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। সঙ্কর-সৃষ্টিতে মানব-সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষার সাত্ত্বিক উদ্দেশ্য সুরক্ষিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পারিব্রাজক-সূক্তমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৯—ন বাহুল্যমপত্যানাং সৃষ্টি-শ্রেয়স্করং ভবেৎ।

অর্থ—বহুঅপত্য কথনও সৃষ্টির শ্রেয়স্কর হয় না।

ব্যাখ্যা—বহু অপত্য দারিদ্র্যের নিদান। সংসারে দরিদ্রতার প্রসার বৃদ্ধির এমন সহজ উপায় আর নাই। দরিদ্রতা জনিত যাবতীয় অশান্তিই এই বহু-অপত্য-জনন হইতে উৎপন্ন হয়। জগতে দারিদ্র্যের ভাগ যত অল্প হইবে, জগৎ তত সমুন্নত হইবে। এক দরিদ্রতা হইতে সৃষ্টি ধ্বংস-মুখে পতিত হইতে পারে। দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে, সৃষ্টির বৃদ্ধি অপেক্ষা নাশের সম্ভাবনা অধিক। দারিদ্র্যের ন্যায় সর্ব্ববিষয়িনী অবনতির এরূপ কারণ আর দ্বিতীয় নাই। মানব-সমাজে দরিদ্রতাই যে যাবতীয় অনর্থের হেতু, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহারাজ শূদ্রক একদা অতি কাতর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"

"দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি, হ্রী-পরিগতঃ
প্রভ্রশ্যতে তেজসঃ
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবাৎ
নির্ব্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি শোক-পিহিতো
বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধিঃক্ষয়মেত্যহো! নিধনতা
সর্ব্বাপদামাস্পদম্।"

দরিদ্রতা নিবন্ধন মানবের লজ্জা উপস্থিত হয়। লজ্জিত হইলে পর তাহাকে স্বতেজো-ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র নিস্তেজা বলিয়া নিতান্ত অবমাননা ভোগ করিতে হয়। অবমাননা হইতে আত্মগ্লানি জন্মে; আত্মগ্লানি জন্মিলে, শোকে কাতর হইয়া পড়িতে হয়। শোক-কাতরতা হেতু বুদ্ধিবৃত্তি তিরোহিত হয়। বুদ্ধিবিহীন হইলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; অতএব হায়! একমাত্র দরিদ্রতাই যাবতীয় আপদের নিদান। এতাদৃশ সৃষ্টি-বিপ্লবকারিণী দরিদ্রতা যাহাতে বর্দ্ধিত হইতে না পারে, সৃষ্টি-হিতাকাঙ্ক্ষীর তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

অপত্য-উৎপাদন-প্রয়োজনের মূল লক্ষ্য করিলে আমরা যাহা উপলব্ধি করি, তদনুসারে বহুঅপত্য-জনন যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। দেখিতে পাই, শাস্ত্রে তিন প্রকার ঋণের উল্লেখ আছে যথা—

দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ; এই ঋণত্রয়ে মানব আবদ্ধ; ঐ ঋণ পরিশোধের উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে,—যথা যাগাদি দ্বারা দেব-ঋণ, স্বাধ্যায়াদি দ্বারা ঋষিঋণ ও অপত্যোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ-পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। অতএব এই বিধি অনুসারে দুস্তর পিতৃঋণের পরি-শুদ্ধির একমাত্র উপায়ই যে সন্ততি, ইহা আমরা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি-তেছি। সন্ততি উৎপাদনের প্রধান কারণই হইল পিতৃ-ঋণ পরিশোধন—সৃষ্টি-সংরক্ষণ। যখন একটী মাত্র অপত্যের দ্বারাই প্রাগুক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে, তখন আর একাধিক সন্তান-জননের আবশ্যকতা কি? ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—"জ্যেষ্ঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ। পিতৄণামনৃণশ্চৈব স তস্মাৎ সর্ব্বমর্হতি" জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্রই মানব 'পুত্রী' পদবাচ্য এবং পিতৃ-ঋণ-বিমুক্ত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ পুত্র-পদ-প্রতিপাদ্য; অতএব জ্যেষ্ঠই তাবৎ ধনের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। ইহার দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রথম পুত্রের জন্ম হইলেই যখন মানবের পিতৃঋণ পরিশোধিত হইল, সৃষ্টি-প্রবাহ অব্যাহত রহিল, তখন পুত্রান্তর-উৎপাদন করিবার আর প্রকৃষ্ট প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। প্রথম পুত্রই পুং-নাম-নরক-ত্রাতা, সুতরাং যথার্থ পুত্র, তদিতর কামবৃত্তির কদর্য্য ফল স্বরূপ। এসম্বন্ধেও মনুর আদেশ স্মরণ করুন—"যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমশ্নুতে। স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ" যাহার জন্মপরিগ্রহে ঋণ পরিশোধিত হয়, পিতৃলোক অমৃতত্ব লাভ করেন, সেই পিতার ধর্ম্মসঙ্গত পুত্র, তদিতর কামজ—অর্থাৎ কামবশ্যতা-নিবন্ধন সমুৎপন্ন। অতএব যখন একটি মাত্র পুত্র কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অক্ষত রাখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, তখন বহুপুত্রের উৎপাদনের কারণতা কি? যদিও এই উচ্চাদর্শ সকলের পক্ষে সংরক্ষণীয় হইতে পারে না, কিন্তু যতদূর সাধ্য, ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এস্থলে সূত্রের উদ্দেশ্য এই বোধ হয় যে, প্রত্যেক পিতা স্বীয় সাংসারিক অবস্থা দেখিয়া, যে কয়েকটি সন্তানের সুপরিপালন তাঁহার পক্ষে সম্ভব, তদতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন প্রশস্ত নহে, ইহাই অবধারণ করিবেন। বিশেষতঃ অপত্য-বাহুল্যে গর্ভধারিণীর শরীরও মন অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বহু অপত্য-প্রসবে, বঙ্গমহিলাদিগের অনেকেই যৌবনে বৃদ্ধা হইয়া পড়েন, ইহা আমাদের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত। সৃষ্টিকে পুষ্ট করা না বলিয়া বরঞ্চ ভারময় করাই বহু-অপত্য-জননের ফল বলা যায়; তাই মন্বাদিমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃকার্য্যের মুখ্য অধিকারী। যেহেতু জ্যেষ্ঠই প্রকৃত পুত্র, তদিতর কামনাস্রোতের বুদ্‌বুদ্ স্বরূপ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ঋণমস্মিন্ সমুৎপন্নয়ত্যমৃতত্ত্বঞ্চ গচ্ছতি। পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চে জ্জীবতো মুখং॥" এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে, অপত্যের বাহুল্য যে অশেষ উদ্বেগ-প্রদ, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

২০। রমণাধিকৃতির্নাস্তি জননাধিকৃতিং বিনা।

অর্থ—জননাধিকার ব্যতীত রমণাধিকার নাই।

ব্যাখ্যা—এই সূত্র দ্বারা আচার্য্য বলিতেছেন যে, যে পুরুষের জননাধিকার নাই, তাহার রমণাধিকারও নাই;—যে স্ত্রীতে

জননাধিকার নাই, সে স্ত্রীতে রমণাধিকারও নাই; যে পুরুষের জননাধিকার আছে, তাহারও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই, এবং যে স্ত্রীতে জননাধিকার আছে, সে স্ত্রীতেও জননোদ্দেশ্য ব্যতীত রমণাধিকার নাই; জনন এবং রমণ সতত সমানাধিকরণ হওয়া উচিত। জনন (সন্তান-উৎপাদন) এবং রমণ যে স্বতঃই সমানাধিকরণ হইবে, এমত নহে; অর্থাৎ রমণ করিলেই যে সন্তান-উৎপাদন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয় নাই; কিন্তু আচার্য্যের উদ্দেশ্য এই যে, জননেচ্ছা ব্যতীত কখনও রমণে লিপ্ত হইবে না।

মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই এক একটি উদ্দেশ্য সংসাধন করে। যথাকালে যথোপযুক্তরূপে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয় নিয়োজিত হইলেই, তাহার স্বাভাবিক সার্থকতা জনিত শান্তি অব্যাহত থাকে; অন্যথা উহা হইতে অশেষ অমঙ্গল উদ্ভূত হয়। ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার জনিত যে সুখ, তাহা আদৌ তাহার উদ্দেশ্যই নহে। যদি ইন্দ্রিয়-সুখই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, তাহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়-সুখই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া লইলে, যখনই সুখেচ্ছা হইবে, তখনই ইন্দ্রিয়-সেবা করিতে হয়, এবং তাহাতে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের বিবৃদ্ধিহেতু ইন্দ্রিয় শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ায়, সেই ঈপ্সিত ইন্দ্রিয়-সুখই শেষে দুর্লভ হইয়া পড়ে। যদি বল যে, তুমি এমন কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে এই সুখ সম্ভোগ করিবে যে, তাহাতে শরীরের কোন অনিষ্ট না হয়, তবে তাহাতে আপত্তি কি হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তোমার নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারাই প্রতিপন্ন হইল যে, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবায় নিয়মের অধীন থাকা আবশ্যক। আরও দেখ, ইন্দ্রিয়-সুখই যদি তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তবে তোমার কৃত নিয়মের দ্বারাই তোমার সেই অভিপ্রেত ইন্দ্রিয়-সুখের অল্পতা-বিধান হইল। আরও একটু অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিয়া যে নিয়ম করিবে, তাহা কখনও সুপরিপালিত হইবে না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখই যে স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে পরিণাম-চিন্তার অভাব সততই বিদ্যমান। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে যে ভবিষ্যতে ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এরূপ চিন্তা ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হয় না, বা হইলেও তাহার স্থায়িত্ব জন্মে না। এই সুখলিপ্সু ব্যক্তিদিগের আপাত-সুখই অনুসরণীয় হয়, এবং তজ্জন্য ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির নির্দ্দিষ্ট সীমার অতিক্রান্তি হওয়ায়, উহার অতি-পরিচর্য্যাজনিত অশেষ অমঙ্গল মানব-জীবনকে আচ্ছন্ন করে।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি?—আত্ম-বিকাশ; যাহার যে অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে, তাহারই পূর্ণ-বিকাশে মানব-জীবন সার্থক ও সফল হয়। সুতরাং মানবের প্রত্যেক কার্য্য বা চিন্তা, প্রতিকূল না হইয়া, যাহাতে সেই বিকাশের অনুকূল হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রযত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়াদির যেরূপ ব্যবহার সেই মুখ্য উদ্দেশ্যের আনুকূল্য হয়, সেইরূপ ব্যবহারই বিধেয়। এক্ষণে দেখ যে,

ইন্দ্রিয়-সুখোদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা করিলে, মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না। উহার দ্বারা কেবল ইন্দ্রিয়পরায়ণতারই প্রসার বৃদ্ধি হয়; মনুষ্য-জীবনের বিশিষ্টত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-সুখ প্রজননের প্ররোচক মাত্র, এবং প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলেই সেই সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অন্যত্র উহা দুর্লভ হইয়া উঠে। প্রজনন-উদ্দেশ্য স্থির রাখিলে, কাম-লিপ্সার জন্য কখনও চিত্তবৃত্তি উদ্বেজিত হয় না,—হৃদয়ের শাম্য বিচলিত হয় না,—কদাচও শান্তির অভাব হয় না। শুদ্ধ কর্ত্তব্য-পথোন্মুখ হইলে, উহাতে নিষ্কাম ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ উদ্দেশ্য করিলে, তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে, এবং মানবের মানবত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয়তা আছে; তন্মধ্যে কতিপয় অঙ্গের পরিচালনা না করিলে, আদৌ জীবন রক্ষাই হয় না; সুতরাং জীবন-রক্ষার জন্য সেই সমুদয় অঙ্গের যতদূর ক্রিয়া প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইবে। তদতিরিক্ত স্থলে, সেই সমুদয় অঙ্গের পরিচালনা অমঙ্গলজনক। মুখের দ্বারা আহার করিতে হইবে, আহারের প্রয়োজন শরীর রক্ষা; শরীর-রক্ষা-উদ্দেশ্য-ব্যতীত আহার-গ্রহণে অমঙ্গল অনিবার্য্য। যাহা অমঙ্গলজনক, তাহাই পাপ এবং তাহাই মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্তরায়। শরীরের যে পরিমাণে ক্ষয়, সেই পরিমাণে ক্ষুধা, তৎপরিমিত আহারই প্রশস্ত; তদতিরিক্ত আহার শরীর-রক্ষারও বিরোধী। এই শরীর-রক্ষার জন্য জননেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যার প্রয়োজনীয়তা নাই; কারণ ভদ্বিরহিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন, এবং তৎসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও তৎপরিচর্য্যা ব্যতীত জীবন সংরক্ষণের কোন বাধা হয় না; সুতরাং শরীর রক্ষার্থ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই; পরন্তু উহাতে শরীরের ক্ষয়ই হইয়া থাকে; উহা বরং শরীর রক্ষার বিরোধী। যাহা শরীর রক্ষার বিরোধী, তাহা ভৌতিক জীবনের সুখ-নিদান হইতে পারে না। বিন্দু-রক্ষণই শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের একমাত্র সোপান, এবং বিন্দুত্যাগই তত্ত্বাবতের সংপূর্ণ অন্তরায়। শাস্ত্র বলিয়াছেন "মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। যদি বল যে, এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপারে সুখের বিদ্যমানতা কেন? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, সৃষ্টি-প্রবাহের নিয়মই এই যে, একের ক্ষয়, অপরের বৃদ্ধি। মাতা-পিতার শরীর ক্ষয় না হইলে পুত্র উৎপন্ন হয় না। ইতর-প্রাণি-জগতে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, অপত্য-জননে জনয়িত্রীর বিনাশ অপরিহার্য্য। কর্কটী-অশ্বতরী প্রভৃতি ইহার নিদর্শনস্থল। উদ্ভিদ-জগতেও এই নিয়ম অপরিদৃষ্ট নহে; ফলবান হইয়াই ওষধিগণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, আত্মশরীর কিছু অধিক স্থায়ী করা অপেক্ষা সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর। আত্মত্যাগ ভিন্ন জগতের উপকার সংসাধিত হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যা, শরীর-ক্ষয়ের কথঞ্চিৎ কারণ হইলেও, সৃষ্টি-প্রবাহ রক্ষার্থ উহা অপরিহার্য্য। কিন্তু বিবেক সর্ব্বত্র সুলভ নহে, এই জন্যই ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যায় সুখের বিধান। উহাতে ঐ সুখ না থাকিলে, কিংবা উহা দুঃখজনক হইলে, জন্তু কর্ত্তৃক জানে সৃষ্টি-সংরক্ষণে প্রবৃত্তির

অভাব হইত। এই জন্যই, ইন্দ্রিয়-সুখ ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার উদ্দেশ্য নহে, উহা ইন্দ্রিয়-পরিচর্য্যার প্ররোচক মাত্র; এবং যে ইন্দ্রিয় যে উদ্দেশ্যে সংগঠিত, সেই উদ্দেশ্যে তাহা পরিচালিত না হইলে, অমঙ্গল অনিবার্য্য। এতদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে জনন-অধিকার ব্যতীত রমণ-অধিকার নাই। এস্থলে ইন্দ্রিয়-সুখের তাৎপর্য্য স্পর্শ-সুখ বলা যাইতে পারে; এই স্পর্শ সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং পরিণতি-বিরস। ঐ সুখ-সম্ভোগ জননেন্দ্রিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না; অপত্য-উৎপাদনই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সূত্র দ্বারা পরিব্রাজকাচার্য্য অবশ্য ইঙ্গিতে আরও কতকগুলি উপদেশ করিয়া গেলেন—যথা, যে স্থলে জননাধিকার নাই, সে স্থলে রমণাধিকার না থাকায়, গর্ভিণী রজস্বলা প্রভৃতিও রমণ বিষয়ে নিষিদ্ধা হইল; কারণ ঐরূপ আধারে জননের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে কেবল রমণ মাত্র হয়। ভার্য্যেতর-রমণীতে জননাধিকার না থাকায় রমণাধিকারও নিষিদ্ধ হইল, এবং ইহা দ্বারা অঋতুমতী-ভার্য্যাতেও রমণাধিকার প্রতিষিদ্ধ হইল; কেননা তদ্রূপ গমনে সন্তান-জননের সম্ভাবনা নাই। তবে নিম্নাধিকারীদিগের পক্ষে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যায় ঋতু-ভিন্ন কালেও গমন একেবারে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এরূপ ব্যবহার আদর্শ হইতে পারে না, কেননা উহাতে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ভিন্ন অন্য কোন সদুদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

অনেকে বলিতে পারেন যে, এই সমুদয় আদর্শ অতি উচ্চ, সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় উপদেশ কার্য্যে পরিণত করা সহজ নহে; কিন্তু আদর্শ মহান্, উচ্চ ও সম্পূর্ণ হওয়াই প্রয়োজনীয়। কেননা এ প্রকার আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিলে, জীব একেবারে অধঃপতিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি বৃক্ষের শিরোদেশ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই বাণ বৃক্ষের শিরোদেশ ভেদ করিতে পারুক বা না পারুক, অন্ততঃ বৃক্ষের নিম্ন প্রদেশ হইতে উচ্চতর কোন না কোন প্রদেশ বিদ্ধ করিবেই করিবে। অতএব উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এবং ইহা নিশ্চিত যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইলে, কোন না কোন সময়ে আমরা অভীষ্ট স্থলে উপনীত হইতে পারিবই পারিব।

ইতি পারিব্রাজক-সূক্তমালায়ং জনন-সূক্তনাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৭)

উদ্‌গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম,
তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাক্ষরঞ্চ।
অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনি-মুক্তাঃ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ উদ্‌গীতং (বেদান্তৈরিতি-শেষঃ), ব্রহ্ম পরমং তু (ভবতি), তস্মিন্ ত্রয়ং (প্রতিষ্ঠিতং), তৎ সুপ্রতিষ্ঠা, অক্ষরং চ (ভবতি)। ব্রহ্মবিদো অত্র অন্তরং বিদিত্বা তৎপরাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (ভূত্বা) যোনিমুক্তাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা——উদ্‌গীতং——গীতং উপদিষ্টং,—বেদান্তাদিতে উপদিষ্ট। তু-এব—নিশ্চয় অবধারণে। ত্রয়ং—ভোক্তা,

ভোগ্য, প্রেরিতা, ইতি ত্রিবিধং,—ভোক্তা ভোগ্য এবং প্রেরিতা,—এই তিন। সুপ্রতিষ্ঠা-শোভন প্রতিষ্ঠা,—উত্তম প্রতিষ্ঠার স্থল. অর্থাৎ আধার। অক্ষরং—ন ক্ষরতি-বিনশ্যতি ইতি অক্ষরং—অবিনাশী,—অবিনশ্বর, নিত্য। চ এব—নিশ্চয়ে। অন্তরং—অসংস্পৃষ্টং—অযুক্ত। তৎপরা,—"তৎ" ব্রহ্ম এব "পরং" পরমধ্যেয়ং যেষাং তে—ব্রহ্মধ্যানরতাঃ; ব্রহ্ম-চিন্তনরত। যোনি-মুক্তাঃ—গর্ভ-জন্ম-জরা-মরণ-সংসার-ভয়াৎ মুক্তাঃ—গর্ভাদিজনিত যাতনা হইতে মুক্ত।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব সূত্র সমূহে কার্য্য-কারণাত্মক সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম-বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ মায়া-সম্বলিত ব্রহ্মই যে জগদুৎপত্তির নিদান, এবং আত্মা ও ব্রহ্মের অবিভেদ-বুদ্ধিই যে মুক্তির কারণ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু "তং যথোপাসতে তদেব ভবতি" তাঁহাকে যে প্রকারে উপাসনা করা যায়, (উপাসক) তৎপ্রকার হয়" অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মের চিন্তা করা যায়, উপাসক সেই ভাবাপন্নই হইয়া থাকেন; এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা মায়াময় ব্রহ্মের উপাসনায় মোক্ষপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব ৬ষ্ঠ সূত্রের শেষ চরণ "জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" এই বাক্য-বিহিত মোক্ষোপদেশ অনুপপন্ন হইয়া দাঁড়ায়; ইত্যাদি বিরোধ পরিহার বাসনায় বক্ষ্যমাণ সপ্তম সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে যে, মায়া-সম্বলিত সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই যে বিশ্ব-বিধানের কর্ত্তা, তাহা সত্য, বেদান্তাদিতে এ বিষয়ের নির্বিরোধ মীমাংসা উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি হইলেও, ব্রহ্মের মননাদি সময়ে তাঁহার সেই গুণাতীত পরমাবস্থা[illegible] চিন্তা করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রপঞ্চ-ধর্ম্মরহিত উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের আরাধনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই "তং যথা উপাসতে তদেব ভবতি" এই প্রাগ্বর্ণিত শ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের পরিচর্য্যার ফলে উৎকৃষ্টতম ফল মুক্তি লাভ হইবে। এস্থলে আর এক প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রহ্মের যখন গুণান্বিত ও গুণাতীত এই দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইল, তখন "অদ্বিতীয় ব্রহ্ম চিন্তনে মুক্তি হয়" এই পূর্ব্বব্যাখ্যাত বাক্যের সার্থকতা থাকে কৈ? কেননা উপরিতন বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা খণ্ডন পূর্ব্বক, তাঁহাকে দ্বিবিধ ভাবে অভিহিত করা গিয়াছে। এই প্রশ্ন নিরাসের জন্যই সূত্রের দ্বিতীয় চরণের অবতারণা হইয়াছে যে, প্রপঞ্চাতীত এবং সপ্রপঞ্চ, এই উভয়বিধ অবস্থার অর্থ অন্য প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চ হইতে সর্ব্বদাই অসংস্পৃষ্ট, কিন্তু মায়াদি প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে বিমুক্ত নহে; কেননা ভোক্তা, ভোগ্য, এবং প্রেরিতা, এতত্রয় সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কিছু পরেই এই সম্বন্ধে উক্ত হইবে যে, "অজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থ-প্রযুক্তা।" তিনি মায়াতীত বটে, কিন্তু মায়া প্রভৃতির তিনি ভিন্ন অন্য আধার নাই। তাঁহার মায়া[illegible] বিকৃত অবস্থাবিশেষ হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে; কিন্তু তিনি স্বরূপতঃ জাগতিক তাবৎ ব্যাপার হইতেই পৃথক্। জগতের কর্ম্মে তাঁহার আসক্তি নাই। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই গুণাতীত পরব্রহ্মে অতি শোভনভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহার বিকারাদি যদিও প্রপঞ্চাশ্রয় নিবন্ধন ক্ষয়-পরিণামী, কিন্তু তিনি স্বয়ং অক্ষর, অর্থাৎ অক্ষয়, নিত্য, অবিনাশী; কেননা তদীয় বিকারই মায়াত্মক, কিন্তু তিনি মায়াত্মক

নহেন। তিনি বিকারাশ্রয়ী হইলেও সর্ব্বদাই কূটস্থ, অচল, নিত্য এবং সর্ব্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত। ব্রহ্মতত্ত্বানুশীলন তৎপর পণ্ডিতগণ, তাঁহার এই মায়াদি হইতে অসংস্পৃষ্ট নির্গুণ নির্বিকল্প 'অবাঙ্‌মনসোগোচর' অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, আত্মার সহিত ব্রহ্মের অভেদ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তাহাতে লীন হয়েন, এবং সেই মহাসমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক জন্ম-মরণাদি যাবতীয় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও সংসার-ভয়-বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। আত্মার সহিত গুণাতীত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানের অন্যতর আখ্যা সমাধি; এই সমাধি হইতেই পরমাত্মদর্শন পুরঃসর মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

যদর্থমিদমদ্বৈতং অরূপং সর্ব্বকারণং।
আনন্দমমৃতং নিত্যং সর্ব্বভূতেষ্বস্থিতং॥
তদেব নান্যধীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনা।
তস্মিন্ প্রলীয়তে হ্যাত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যমাদিগুণ-সংযুতঃ।
আত্মমধ্যে মনঃ কুর্য্যাদাত্মানং পরমাত্মনি॥
পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েত্ততঃ।
তদাতু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মনাখণ্ডিতে।
প্রত্যগাত্মা স এব স্যাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ।

৮

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ।
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।

অন্বয়— ঈশঃ ব্যক্তাব্যক্তং ক্ষরং অক্ষরঞ্চ সংযুক্তং এতৎ বিশ্বং ভরতে। অনীশঃ চ আত্মা ভোক্তৃভাবাৎ বধ্যতে, দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা—সংযুক্তং পরস্পরসংযুক্ত। ক্ষরং—বিনাশী। অক্ষরং অবিনাশী। ব্যক্তং বিকারজাতং, বিকার হইতে সমুৎপন্ন। অব্যক্তং অবিকারজং, যাহা বিকার হইতে উৎপন্ন নহে। ভরতে—বিভর্ত্তি, ভরণ করিয়া থাকেন। অনীশঃ—প্রতিবিধাতুমশক্তঃ প্রতিবিধানে অসমর্থ। ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃত্বনিবন্ধনাৎ (হেতোঃ) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন। বধ্যতে—অবিদ্যয়া তৎকার্য্যভূত দেহেন্দ্রিয়াদিভিশ্চ আক্রম্যতে, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকে। দেবং নিরুপাধিকং পরমপুরুষং, উপাধিরহিত পরমপুরুষকে। সর্ব্বপাশৈঃ—সমস্ত পাশ কর্ত্তৃক। মুচ্যতে—মুক্ত হইয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্র নিচয়ে পরব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা, এবং জীবাত্মার অবিভেদ-বুদ্ধির মুক্তি-হেতুতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাময়িক উপাধিগত ভেদ ব্যতীত যে প্রকৃত কোনই প্রভেদ নাই, তাহাই বিবরিত হইতেছে।

বিশ্বের কার্য্য-কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন, ব্যক্ত এবং অব্যক্ত; যাহা বিকার সম্ভূত, তাহাই ব্যক্ত, এবং যাহা বিকারজাত নহে, তাহাই অব্যক্ত। যাহা কোনপ্রকার বিকৃত ভাব হইতে উদ্ভূত, তাহাই বিনাশী (ক্ষর) এবং যাহা—বিকৃতভাবোৎপন্ন নহে, তাহা অবিনাশী (অক্ষর)। এই অব্যক্ত—অর্থাৎ অবিকারজাত নিত্য কারণই ভগবান্ কপিলের মতে "মূল প্রকৃতি," তাই তিনি বলিয়াছেন "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ"। অব্যক্ত কারণ, সময়বিশেষে ব্যক্তভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক বিকৃত হইয়া থাকে। উহা অব্যক্তেরই অংশ। উপাধিভেদে ব্যক্তরূপে আভাসমান হয় মাত্র। অব্যক্তের ঐ উপাধিগ্রস্ত ব্যক্ত ভাব হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কেননা,

অব্যক্ত অবিকৃত অতীন্দ্রিয় কারণ হইতে ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকৃত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্বের সৃষ্টি অসম্ভব। সেই জন্যই অব্যক্তের ঐ ব্যক্তীভূত অবস্থাকেই ব্যক্তীভূত জগতের কারণরূপে অভিধান করা হইয়াছে। অতএব প্রণিধান করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, জগতের প্রযুজ্য কারণ ব্যক্তভাব যখন প্রয়োজক কারণ অব্যক্তেরই অধীন, তখন পরম্পরাসূত্রে প্রয়োজক অব্যক্ত কারণই জগৎসৃষ্টির অন্যতর হেতু। এই জন্যই উক্ত হইয়াছে যে, বিশ্বের কার্য্য কারণ দ্বিবিধ ভাবাপন্ন—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত। পরমেশ্বর এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কারণদ্বয়াত্মক কার্য্যরূপ বিশ্বের ভরণ করিতেছেন। উপাধিগ্রস্ত সাময়িক ভেদ ব্যতীত, তাঁহার সহিত জীবাত্মার প্রকৃত কোনই ভেদ নাই। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা সেই নিরুপাধিক পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব মাত্র। এক বস্তু জলই যেমন সময়ভেদে তুষারে পরিণত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার পরিণতি জলব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে, তদ্রূপ এক পরমাত্মাই সৃষ্টিচিকীর্ষার বশবর্ত্তিতা নিবন্ধন, জীবাত্মারূপে উপাহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই উপাধিগত জীবাত্মার পরিণতি পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মাই যখন উপাধিমুক্ত হয়েন, তখন তাঁহাতে এবং পরমাত্মাতে আর কোনই প্রভেদ থাকে না। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে কার্য্য-ভেদে পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এক। তবে প্রভেদ এইটুকু যে, জীবাত্মা অনীশ—অর্থাৎ অবস্থাবিশেষের অধীন, আর পরমাত্মা ঈশ—অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থারই স্বাধীন। অধীন জীবাত্মা কর্ম্মের শুভাশুভফল ভোগ করিয়া থাকেন; স্বাধীন পরমাত্মা কর্ম্ম বা কর্ম্মজনিত ফলের কোনই ধার ধারেন না। ফলভোগ করিতে হয় বলিয়াই, জীবাত্মাকে মুক্তির অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত অবিদ্যা এবং তাহার কার্য্য দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুশ্ছেদ্য পাশে সংযত থাকিতে হয়। পরমাত্মার ফলভোক্তৃত্বও নাই, তাঁহাকে অবিদ্যাগ্রস্তও হইতে হয় না। এতাদৃশ কূটস্থ, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী উত্তম পুরুষই পরমাত্মা পদবাচ্য। এই অব্যয় পুরুষই লোকত্রয় ভরণ করিতেছেন; একমাত্র ইনিই সত্য, ইনিই সনাতন; অন্যান্য সমগ্র ভূতনিচয় অনিত্য। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্য পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥

উপাধি-বিকৃত জীব যখন এতাদৃশ নিরুপাধিক পরমাত্মাকে উপাধিগত জীবাত্মা হইতে অপৃথক্‌ভাবে জ্ঞাত হয়, তখন তাহার সর্ব্বপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, তাহারও ভেদ চলিয়া যায়, সে পরম পুরুষের সাযুজ্য লাভ করে। পরমপুরুষের এই সমুদয় উপাধিগ্রস্ত ভেদ যে তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, এই জ্ঞান যখন জন্মে, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থের স্বরূপোপলব্ধি হয়, এবং বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান—অর্থাৎ ধর্ম্ম-জ্ঞান-নিবন্ধন সেই সমুদয় অভিজ্ঞাত পদার্থের নশ্বরতা, ভঙ্গুরতা প্রভৃতি হৃদয়ঙ্গম হওয়ায়, অন্তঃকরণ হইতে বৃথা-বস্তু-সংসক্ত আসক্তি দূরীভূত হয়; অনাসক্তিপ্রযুক্ত লাভ বা ক্ষতি জনিত হর্ষ বা বিষাদে মানস উদ্বেলিত করিতে পারে না; চিত্তের অস্থায়ী চঞ্চল ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, অতুল অন[illegible]

ব্রহ্মানন্দ-রসে মনঃপ্রাণ মজিয়া থাকে।

এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই যে উপাধি-গ্রস্ত আত্মারূপে বহু পদার্থে বিরাজ করিতেছেন, তৎপ্রদর্শনকল্পে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন——

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্‌ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥

একমাত্র মহা আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ উপাধিসমূহে পৃথক্ পৃথক্-ভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা মহাকাশ হইতে স্বতন্ত্র নহে; কেননা ঘটাদির বিনাশের পর আর উহার কোনই অস্তিত্ব থাকেনা; ঐ ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়; কিম্বা একমাত্র অংশুমালী সূর্য্য যেমন জলাধারসমূহে অসংখ্যভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে, সত্বগত একাতিরিক্ত নহেন, তদ্রূপ এক মাত্র আত্মাই উপাধিভেদে অনেকরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি এক।

আত্মা যাবৎকাল প্রাকৃত-গুণ-সংযুক্ত থাকেন, তাবৎ পর্য্যন্ত পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হন সত্য, কিন্তু যখন সেই সকল গুণ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধি লাভ করেন, তখন আবার পরমাত্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আত্মা অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া, স্ব-নিহিত পরব্রহ্মতত্বকে ভিন্নভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। অবিদ্যামুক্ত হইলে, সে ভাব তিরোহিত হয়। বিষ্ণুধর্ম্মে এসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞোঽয়ং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ। তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে॥ অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়মবিদ্যয়া। যুক্তঃ পশ্যতি ভেদেন ব্রহ্মত্বাত্মনি সংস্থিতম্॥

তবে এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাকৃত গুণ-সংসর্গ বশতঃ আত্মপুরুষে কোনপ্রকার মালিন্য-প্রসক্তি হয় কি না? গুণীভূত অবস্থার অপগম হইলে, গুণ-ধর্ম্মাশ্রয়-জনিত বিকারে অবিকৃত পুরুষ কোন-প্রকার বিকার-স্পৃষ্ট হয়েন কি না? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধূম, অভ্র, ধূলি প্রভৃতি দ্বারা বর্ণান্তরিত দৃষ্ট হইলেও যেমন আকাশ প্রকৃত পক্ষে কোনপ্রকার মালিন্যপ্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ পুরুষ প্রাকৃত গুণ-সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মারূপে নানাধারে বিরাজ করিয়া, যখন গুণ-বিমুক্ত হইয়া স্বকীয় মূল অবস্থাপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাতেও কোন প্রকার বিকার বা মলিনতা সংযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মপুরাণে এসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "ধূমাভ্রধূলিভির্ব্যোম যথা ন মলিনীয়তে। প্রাকৃতৈরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা।" শুক-শিষ্য গৌড়পাদাচার্য্যও বলিয়াছেন——"যথৈকস্মিন্ ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে। ন সর্ব্বে সংপ্রযুজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ সুখাদিভিঃ॥" অতএব অদ্বিতীয় পরমাত্মায় উপাধিগ্রস্ততা প্রযুক্ত জীব এবং ঈশ্বরের ভেদ ব্যবস্থা-সিদ্ধ হইল। সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভোগের একমাত্র কর্ত্তা সেই উপাধিগ্রস্ত জীবাত্মা, নতুবা বিশুদ্ধ সত্বোপাধি-পরমাত্মাকে উপাধি সাহিত্য-নিবন্ধন সুখ-দুঃখ-মোহ-মায়াদি কিছুই ভোগ করিতে হয় না। এতাবতা ইহাও স্থিরীকৃত হইল যে, উপাধি-বিমুক্ত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন পার্থক্য নাই। জীবাত্মার উপাধিবিরহিত অবস্থারই অন্যতর আখ্যা পরমাত্মসাযুজ্য।

৯

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থপ্রযুক্তা

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ঈশানীশৌদ্বৌজ্ঞাজ্ঞৌ অজৌচ ভবতঃ। হি (যস্মাৎ) এক অজা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থপ্রযুক্তা ভবতি। আত্মা অনন্তঃ চ ভবতি। হি (যস্মাৎ) (অয়ং আত্মা) বিশ্বরূপঃ অকর্ত্তা (চ) ভবতি। এতৎ ত্রয়ং (ত্রিবিধ লক্ষণাত্মকং) ব্রহ্মং যদা বিন্দতে, তদা মুচ্যতে ইতি শেষঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—জ্ঞাজ্ঞৌ-জানাতীতি জ্ঞঃ (জ্ঞাধাতোর্ডঃ) ঈশ্বর, যিনি সমস্ত জানেন। অজ্ঞঃ—জীব। জ্ঞশ্চ অজ্ঞশ্চ তৌ জ্ঞাজ্ঞৌ সর্ব্বজ্ঞাসর্ব্বজ্ঞৌ—সর্ব্বজ্ঞ এবং অসর্ব্বজ্ঞ। অজৌ-নজায়েতে ইতি অজৌ-জাতাদিরহিতৌ, জন্মাদি রহিত। ঈশানীশৌ (অত্র ছান্দসং হ্রস্বত্বম্ ঈশানীশৌ ইতি প্রকৃতপদং) ঈশশ্চ অনীশশ্চ তৌ—ঈশ্বরজীবৌ, ঈশ্বর এবং জীব। অজা—নজায়তে ইতি অজা প্রকৃতিঃ, পরমা মায়া বা, প্রকৃতি বা পরমা মায়া। ভোক্তৃভোগ্যার্থ প্রযুক্তা—ভোক্তৃ—ভোগ্য-অর্থাঃ, তৈঃ প্রযুক্তা, ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্যার্থাঃ—ভোগ্যবস্তূনি, তৈঃ—প্রযুক্তা—বিশিষ্টা। ভোক্তা জীবাত্মা এবং ভোগ্য পদার্থনিবহ কর্ত্তৃক যুক্ত। অথবা ভোক্তৃ-ভোগার্থ প্রযুক্তা ইত্যত্র "বাহিতাগ্ন্যাদিষু" ইতি সূত্রেণ প্রযুক্ত ভোক্তৃ ভোগার্থা ইতি পদং স্বীকর্ত্তব্যং, এতৎপক্ষে সমাসঃ যথা—প্রযুক্তাঃ (প্রেরিতাঃ প্ররোচিতাঃ বা,) ভোক্তা (আত্মা) ভোগার্থাঃ (ইন্দ্রিয়াদি তদ্গ্রাহ্যপদার্থনিবহাশ্চ) যয়া সা প্রযুক্ত ভোক্তৃভোগার্থা, প্রাগুক্ত সমাসবিধিনা প্রযুক্তেতি বিশেষণ পদস্য পরনিপাতো ন দোষমাবহতীতি সুসমঞ্জসম্। আত্মা এবং আত্মগ্রাহ্য পদার্থ নিচয়ের প্ররোচিকা। বিশ্বরূপঃ—বিশ্বমেব রূপং যস্য তাদৃশঃ—নিখিলজগৎস্বরূপঃ, বিশ্বই তাঁহার রূপ। চ অবধারণে। অকর্ত্তা—কর্ত্তৃত্ববিহীন। ত্রয়ং পরমাত্মা, অজা বা পরমা প্রকৃতিঃ, ভোক্তা বা জীবঃ ইতি ত্রিবিধং, পরমাত্মা, পরমা প্রকৃতি এবং জীব, এই তিন। ব্রহ্মম্—(মকারান্তত্বং ছান্দসম্) ব্রহ্ম।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্বতন সূত্রে, পরমেশ্বর যে ব্যক্তাব্যক্ত কার্যকারণাত্মক বিশ্ব-ভরণের কর্ত্তা, এবং প্রকৃতি-বশবর্ত্তী জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্গ্রাহ্য পদার্থনিবহের অধীন, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে, অধুনা এতদুভয়ের অপর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যও প্রকটিত করা যাইতেছে। পরমাত্মা সমগ্র বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহার জ্ঞানের অতীত কিছুই নাই; জীবাত্মা সর্ব্ব বিষয়েই অনভিজ্ঞ, জীবাত্মার নিকট সকলই অজ্ঞেয়। পরমাত্মা সর্ব্বশক্তি-মান্, জীবাত্মা শক্তিবিহীন। প্রকৃতির শক্তি ব্যতীত জীবাভিধেয় আত্মার নিজের কোনই শক্তি নাই। কিন্তু এই উভয়ই অনাদি। কেননা জন্মাদি সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত আত্মা অদ্বিতীয়া সনাতনী পরমাপ্রকৃতি কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া, "জীব" এই উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সংসার-ভোগের কর্ত্তা হইয়া থাকেন। উপাধিগ্রস্ত হইলেই জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়েন। নতুবা তাঁহার নিজের জন্মাদির কোন বাস্তবতা নাই, তিনিও পরমাত্মবৎ অজন্মা। তাঁহার নিজের কোন পৃথক্ শক্তি নাই, পরমা প্রকৃতি বা পরমা মায়ার শক্তিতেই তিনি পরিচালিত হইয়া, প্রকৃতির বিকার-জাত ভোগ্য পদার্থ সমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন তিনি মায়া বা প্রকৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাতে "জীব"

এই উপাধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। তিনি ভোগকর্ত্তারূপে শুভাশুভ, দ্বেষা-সম্মত ব্যাপার ভোগ করেন। নতুবা তিনি অর্থাৎ আত্মা কদাচও সংসার-ধর্ম্মভাগী নহেন। আত্মা প্রকৃতির প্রশ্রয়ে জীবরূপে ভোগ করেন মাত্র। আত্মা অকর্ত্তা—অর্থাৎ পরমাত্মার ন্যায় সংসার-ধর্ম্মে অসংসৃষ্ট। তিনি অনন্ত, এই চরাচরবিশ্ব তাঁহারই স্বরূপ। প্রকৃতির আশ্রয় প্রযুক্ত তিনি জীবোপাধি গ্রহণপুরঃসর সুখদুঃখাদিভোক্তা বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। যে ব্যক্তি পরমাত্মা, প্রকৃতি-আশ্রিত জীবাত্মা ও প্রকৃতি, এই দুরভিজ্ঞেয় তত্ত্বত্রয়ের যথাযথ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ, তিনিই পরম ব্রহ্মজ্ঞানের মুখ্য অধিকারী; তিনি সর্ব্বপ্রকার পাশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া শাশ্বতী গতি লাভ করেন।

১০

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ।
তস্যাভিধানাদ্‌যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ্‌-
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়া-নিবৃত্তিঃ॥

অন্বয়—(ইদং জগৎ) ক্ষরং, প্রধানং (তু) অমৃতাক্ষরং, হরশ্চ ভবতি। (স) একো দেবঃ ক্ষরাত্মনৌ ঈশতে (ঈষ্টে); ভূয়ঃ তস্য অভিধানাৎ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাচ্চ অন্তে (সতি) বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ (স্যাৎ)

বিষম পদব্যাখ্যা—ক্ষরং—ক্ষরতি ইতি ক্ষরং—বিনশ্বর। প্রধানং—পরমাত্মা। অমৃতাক্ষরং—অমৃতংচ তৎ অক্ষরংচ ইতি অমৃতাক্ষরং (বিশেষণসমাসঃ) অমৃত এবং অবিনশ্বর। হরঃ—হরতি—অবিদ্যাং অপনয়তি ইতি হরঃ—অবিদ্যার হরণকর্ত্তা। (হর ইত্যত্র বিধেয় প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বম্)।

অভিধানাৎ—অভিধ্যানাৎ—মননাদ্বা, অভিধ্যান বা মনন হেতু। যোজনাৎ—বিশ্বানাং পরমাত্মসংযোজনাৎ, পরমাত্মাতে বিশ্বের সংযোগ সম্পাদন হেতু। তত্ত্বভাবাৎ—অহংব্রহ্ম অস্মীতি সকৃৎ চিন্তনাৎ, আমি সেই পরমব্রহ্মের অংশ, এই প্রকার তত্ত্বনিশ্চয় দ্বারা। অন্তে—সর্ব্বস্মিন্ ব্যাপারে "অন্তে" সমাপ্তে সতি—সমস্ত কর্ম্ম শেষ হইয়া। বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখ মোহাত্মকাশেষপ্রপঞ্চরূপমায়াবিরহঃ—সুখ-দুঃখ-মোহ প্রভৃতি অশেষবিধ মায়াকৃত—বিকারের বিনাশ।

বঙ্গার্থ—এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড "ক্ষর" অর্থাৎ বিনশ্বর। একমাত্র সেই পরমাত্মাই অমৃত এবং অক্ষর—অর্থাৎ অবিনাশী। তিনি জীবের অবিদ্যা হরণ করেন, তাই তাঁহার অন্য নাম হর। সেই সর্ব্বপ্রধান অদ্বিতীয় পুরুষ, জীবকে বিনাশশীল ভোগ্য-পদার্থে প্ররোচিত বা রুচিমান্ করিয়া থাকেন; অথবা তাঁহার আশ্রয় নিবন্ধনই জীবাত্মা নশ্বর ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে সমর্থ হন।

পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্ররোচিত জীবাত্মার বিশ্বভোগ কার্য্য প্রদর্শন কল্পে শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে—"তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপুরুষঃ। স জাতোঽত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ॥" সেই নিরাকার পরম পুরুষ হইতে বিরাট্—অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ উৎপন্ন হইল, এবং সেই বিরাট দেহের উপরে—অর্থাৎ বিরাট দেহ আশ্রয় করিয়া দেহাভিমানী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। সর্ব্ববেদ-বেদান্ত-বেদ্য পরমাত্মা মায়াদ্বারা বিরাট দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী

জীব হইলেন। তিনি যখন জীবরূপ ধারণ করিলেন, তখন দেবতা মনুষ্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিলেন, এবং পঞ্চভূত ও জীব-শরীরাদি সৃষ্ট হইল। এতাদৃশ— সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপ্রভু সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরমাত্মার নামোচ্চারণ— অর্থাৎ তদভিধায়ক প্রণব-কীর্ত্তন, বিশ্বস্থ যাবৎ পদার্থে তাঁহারা ব্যাপ্তি, অর্থাৎ তিনি বিশ্ব-ব্যাপক, বিশ্ব অনুক্ষণ তাঁহার সংযোগ-সূত্রে দৃঢ়নিবদ্ধ, এবং আমি সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার একটি অংশ, জগতের যাবতীয় পদার্থই তাঁহার অংশ, এবম্প্রকারে তত্ত্বনিরূপণ প্রভৃতি দ্বারা মানববৃন্দ দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ-পূর্ব্বক, সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অশেষ-বিধ প্রপঞ্চরূপ মায়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়েন। সর্ব্বদা আত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদচিন্তা, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁহার বিভূতি-দর্শন এবং প্রণব-কীর্ত্তন হইতেই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারমাত্রই জীব মুক্তি লাভ করে, ইহাই এই সূত্রের ফলিতার্থ।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মায়াবাদ।

—০:০:০—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্পর্শ-জ্ঞানের সমালোচনা করিলেও আমরা বুঝিতে পারি যে, স্পর্শ জ্ঞানের বিষয়টী বাহ্য বস্তু নহে; প্রত্যুত আমাদের শরীরেই একপ্রকার চেতনাবস্থায় কার্য্য, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভব নহে, অথবা সম্ভব হলেও আমাদের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। কেননা, বাহ্যজগৎবাদীরা নিজেই স্বীকার করেন যে, কোন এক পদার্থ অন্য এক পদার্থকে প্রকৃতপক্ষে স্পর্শ করিতে পারে না; এমন কি, কোন এক জাতীয় পরমাণুকেও স্পর্শ করিতে পারে না। কোন দুইটী পরমাণু, কোন দুইটী অণু, কোন দুইটী পদার্থ, যতই ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকুক না কেন, তাহাদের উভয়ের মধ্যে অল্প বিস্তর কিছু না কিছু অন্তর বা ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং আমার দেহের কোন এক বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট হইতে পারা দূরের কথা, আমার দেহেরই এক অংশ অন্য অংশকে স্পর্শ করিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এমন অবস্থায় দেহ অন্য বস্তুর সহিত সংস্পৃষ্ট বা সম্বদ্ধ হইল বিবেচনা করিলেও, আমার দেহ ও সেই বস্তু, এতদুভয়ের মধ্যে অন্তর থাকিবে, এবং সেই অন্তর বা শূন্য স্থানটী আমাদের দেহের নিকটতর, তাহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্পর্শ দ্বারা বাহ্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করা সম্ভবপর হইলে, সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বক্ষণে সেই একমাত্র শূন্যের ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর সত্তা অনুভব করার সম্ভাবনাই নাই।

আর স্পর্শই কি অভ্রান্ত? স্পর্শ করিয়া স্থলবিশেষে অনেককে এক বলিয়া বোধ হয় এবং এক স্পর্শকে অন্য স্পর্শ বলিয়া বিবেচনা হইয়া থাকে। একখানি চিরুণীর দন্ত সমুদয় গাত্রে স্পর্শ করাইলে, দন্তের সংখ্যানুসারে অনেক-স্পর্শ-জ্ঞান না হইয়া একই অবিচ্ছিন্ন স্পর্শজ্ঞান হয়; একই স্পর্শ পদতলে একরূপ, কক্ষ-তলে (বগলে) অন্যরূপ সুড়সুড়ীর অনুভব জন্মায়, এবং মস্তকে বা পৃষ্ঠে তৃতীয়রূপ অনুভব জন্মায়,

তবে ভ্রান্ত স্পর্শকে জানিয়া শুনিয়া কিসে অভ্রান্ত বোধ করিবে? আম্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় সাক্ষী রসনেন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিতে চাও? আচ্ছা দেখ দেখি সেই বা এসম্বন্ধে কি বলে। রসাস্বাদন করিয়া কি তুমি বলিতে পার যে, সেই দ্বিত্বপ্রাপ্ত আম্রদ্বয়ের কোন্‌টীর রস তুমি অনুভব করিলে? অপর, রসনেন্দ্রিয় কি কোন বস্তুর সংখ্যা বা বাস্তবিক সত্তার সাক্ষ্য দিতে পারে? রসনেন্দ্রিয় পরের রসানুভূতির ক্ষণিক বর্ত্তমানতায় সাক্ষ্য দিবে। সেই অনুভূতি কোথা হইতে কেমন করিয়া হয়, রসনেন্দ্রিয় তাহা বলিতে পারে না। রসানুভূতি এক কথা, আর রস যাহাতে থাকে বল, তাহা অন্য কথা। জিহ্বায় আম্র রাখিয়া বলত তাহার কি রস? যাহাকে তুমি বাস্তবিক আম্র বল, তাহার রূপ দেখিলে, বাহ্যাংশের স্পর্শ করিলে, বাহ্যাংশ-রসানুভব করার সময় সে অংশ গ্রহণ না করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ একটী অংশ গ্রহণ করিলে, সুতরাং যাহার রূপ দেখিলে, তাহার রস অনুভব করিলে, এ কথাই বা কি করিয়া বল? পূর্ব্বদৃষ্ট যে আম্রটী চিবাইয়া রস অনুভব করিয়াছে, এখন সেই আম্রটীর রূপ দর্শন করিয়া বল ত ইহা পূর্ব্বের মত দেখায় কি না। ফলতঃ রসানুভব দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সাক্ষীর স্থলে দাঁড় করাইবে; সেও ত বাহ্য পদার্থের কোন কথা বলিতে পারে না। গন্ধ কি, সে তাই জানে না! মনে কর, ঐ আম্র দশ হাত দূরে রহিয়াছে, উহা হইতে অদৃষ্ট, অস্পৃষ্ট, অশ্রুত, অনাস্বাদিত যেন কি আসিয়া তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিয়া ঘ্রাণানুভূতি জন্মায়, একথা বলিবার কি হেতু আছে? গন্ধই কিছু আম্র নহে; গন্ধ আম্র হইতে একটী স্বতন্ত্র কিছু, যাহা আম্র দর্শন করিয়া কি স্পর্শন করিয়া, শ্রবণ করিয়া কি রসানুভব করিয়া স্থির করিবার উপায় নাই। সুতরাং গন্ধ যে তোমার সম্বন্ধে বাহ্য কোন পদার্থ, তাহাই তোমার জানা নাই; অথচ তুমি সেই অজ্ঞাত-কুল-শীল সাক্ষীর একরূপ সাক্ষ্যকে অন্যরূপ কেন বুঝিয়া লও? তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিল যে, সে একটা গন্ধানুভব করিতেছে; কিন্তু তুমি বলিলে সেই গন্ধটা দূরস্থিত কোন দ্রব্য হইতে আসিতেছে, এবং যাহা হইতে আসিতেছে, সে পীত বসন পরিয়াছে, তাহার শরীর কোমল এবং তাহাকে মুখ-গহ্বরে ফেলিয়া নিষ্পেষিত করিলে রস পাইবে। তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাক্ষী যতটুকু বলে নাই বা যতটুকু বলিবার তাহার কোন ক্ষমতা নাই, কেন তুমি নিজে নিজে ততটুকু ধরিয়া লও? আম্রের বাস্তবিক অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য যদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্য লও, তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিবে না; কেননা শ্রবণেন্দ্রিয় কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে সে একটা শব্দ শুনিতেছে; সে শব্দটি কোথা হইতে আসিল, সে তাহা বলিতে পারে না। তুমি ধরিয়া লইলে যে, ঐ দশহস্ত-দূরস্থিত আম্র-যুগল হইতেই শব্দ আসিল। শব্দ রূপ-রসাদির অপরিচিত, সুতরাং তাহাদের বলিবার অধিকার নাই যে সে শব্দ কি, এবং তাহা কোথা হইতে আসে।

যাহাহউক, এই আম্র-যুগলের বাস্তবাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন কথা বলে না।

চক্ষু কেবল এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা রূপ অনুভব করিতেছে; স্পর্শ এইমাত্র বলিতেছে যে, সে একটা স্পর্শানুভব করিতেছে; নাসিকা কহিতেছে যে, সে একটা গন্ধ পাইতেছে; রসনেন্দ্রিয় বলিতেছে যে, সে একটা রস অনুভব করিতেছে, এবং কর্ণ বলিতেছে যে, সে একটা শব্দ শুনিতেছে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম সাক্ষ্য দিল, এবং কোন এক সাক্ষীও অন্যের অনুভূত বিষয় বুঝিতে পারে নাই, এরূপ স্থলে পাঁচজনে একই কথা বলিতেছে, কি করিয়া বল? আবার উক্ত আম্র-যুগলের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, আর কোন্‌টি বা অপ্রকৃত, এত প্রমাণ লইয়াও কি একটা মীমাংসা করিতে পারিতেছ? দেখ একবার ভাবিয়া দেখ, কি সঙ্কটে উপনীত হইয়াছ! সম্মুখে আম্র-যুগল রহিয়াছে, ইহার একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা, কিন্তু কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারিতেছ না; অথচ বলিবে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব বুঝিতে পারি, ইহা কতদূর অসঙ্গত!

(ক্রমশঃ)

গীতাভাস।

চতুর্থ অধ্যায়।

কর্ম্মের আবশ্যকতা।

—:০:—

প্রকৃতি-প্রসূত এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও হৃদয় ধারণ করিয়া প্রকৃতিবশে সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে; কোন কর্ম্ম না করিয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতেহ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥

"কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও কেহ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতি বা সত্ত্বাদি গুণ সকল সকলকেই অবশ করিয়া কর্ম্ম করায়।" কর্ম্ম করাও নিতান্ত আবশ্যক; কর্ম্ম না করিলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। প্রকৃতি-প্রবর্ত্তিত এই সংসার-চক্র প্রতিনিয়তই আবর্ত্তিত হইতেছে; আবর্ত্তনেই ইহার স্থিতি; প্রত্যেক প্রাণী, প্রত্যেক বৃক্ষ-লতা, এমনকি—প্রত্যেক পরমাণু সংসার-যন্ত্রের সেই আবর্ত্তনের সাহায্য করিতেছে। এরূপ স্থলে যন্ত্রের একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি স্বকার্য্যে নিরস্ত থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী; অতএব সংসার-যন্ত্রের কার্য্যের সহায়তা করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা শ্রেষ্ঠ", তাহার একটী প্রধান যুক্তি এই,—কর্ম্মে জ্ঞানের পরিপাক হয়; তুমি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞান পাইলে, কার্য্যতঃ যদি তাহার অনুষ্ঠান না কর, তাহাহইলে সে জ্ঞান কদাচ বদ্ধমূল হইবে না, তাহা প্রবৃত্তি-স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানাভ্যাস সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয়; শুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনে বিশেষ উপকার নাই, বরং অপকারেরই সম্ভাবনা; কেননা উহাতে দাম্ভিকতা ও তার্কিকতা মাত্র প্রসব করিয়া থাকে। জ্ঞানাভ্যাস ব্যতীত কদাচ আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়না, এবং অভ্যাস পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করার নামান্তর মাত্র।

অতএব কর্ম্মেই জ্ঞানের বৃদ্ধি ও পরিপাক হইয়া আত্মার উন্নতি হইতে থাকে।
"সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"
"হে পার্থ! জ্ঞানেতেই সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি।"

কর্ম্মের আবশ্যকতা চিত্ত-শুদ্ধির জন্য। কর্ম্ম না করিলে, চিত্তের মালিন্য ঘুচেনা। দান, ধ্যান, বন্দনা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম দ্বারা চিত্তক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব প্রীতির উদ্ভব হইয়া থাকে; ঐ প্রীতিরূপ পূতবারি ধারায় ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য ধৌত হইয়া যায়। কুপ্রবৃত্তিজনিত কলুষকলাপে চিত্ত প্রায়ই সমল; চিত্তের এরূপ অপরিস্কৃতাবস্থায় জ্ঞানোপদেশে কি ফল ফলিবে? উহা কদাচ তথায় প্রতিফলিত হইতে পারে না। চুম্বকের লৌহাকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু কর্দ্দমপ্রলিপ্ত চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে না; কাচের আলোক প্রতিফলিত করিবার শক্তি আছে, কিন্তু সমল কাচখণ্ডে কি কখনও জ্যোতি বিম্বিত হইয়া থাকে? সেইরূপ চিত্তমুকুর যতদিন সমল থাকিবে, ততদিন জ্ঞানালোক তথায় প্রতিবিম্বিত হইবে না; অতএব চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অন্তঃকরণ মলিন থাকিলে সংসারই মালিন্যময় হইয়া উঠে। মন ও বুদ্ধি অন্তঃকরণেরই বৃত্তি; অন্তঃকরণ অশুদ্ধ থাকিলে, মন ও বুদ্ধিও তদবস্থাপন্ন হইবে। মন অন্তরিন্দ্রিয়, মনের বশে দশ বাহ্যেন্দ্রিয়; মন ইহাদিগের চালক, অতএব মন যদি মালিন্যযুক্ত হয়, তাহা হইলে ইতরেন্দ্রিয়গণও তাহার সহবাসে মলিন হইবে; এবং তদবস্থ ইন্দ্রিয়গণের সংস্পর্শে সমস্ত বাহ্যজগৎই অপ্রীতিকর মলিন ভাব ধারণ করিবে। এখন ভাবিয়া দেখ, চিত্ত-শুদ্ধির কতদূর প্রয়োজনীয়তা; চিত্ত-শুদ্ধ না থাকিলে. সকলই অসুখের হইয়া পড়ে; অতএব কর্ম্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি-বিধান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

যাহার যেরূপ চিত্তের অবস্থা, চিত্ত-শুদ্ধির জন্য তাহার তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। চিত্তের অবস্থানুসারে কর্ম্মের ব্যবস্থা। কর্ম্ম শব্দে এখানে পূজ-ধ্যানাদি বুঝিতে হইবে। আর্য্যশাস্ত্রে নানারূপ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। অধিকারী-ভেদে—অর্থাৎ মানসিক অবস্থানুসারে তন্মধ্য হইতে আত্মাধিকারানুরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাচিত করিয়া ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা অনুষ্ঠেয়। উপাসনা প্রভৃতি কর্ম্মে সর্ব্বসাধারণের জন্য এক নিয়ম প্রচলিত হইতে পারেনা; যে যে দেশে সাধারণের জন্য ব্যক্তি বা সমাজ-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মাচরণের একই নিয়ম প্রচলিত, সেই সেই স্থলে—অজ্ঞ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদিগের কোনই ধর্ম্ম নাই; উচ্চপ্রকৃতির ধর্ম্ম তাহাদিগের হৃদয় কখনই স্পর্শ করিতে পারে না; কাজেই তাহারা ধর্ম্মহীনতা জন্য অতিশয় দুর্বৃত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। সেই জন্য শাস্ত্রে সদ্‌গুরূপদেশের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী মহাত্মাকে নমস্কার দ্বারা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদ্বারা এবং সেবা দ্বারা জ্ঞানলাভ কর; তাঁহারা তোমাকে প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ করিবেন।" সদ্‌গুরুই অধিকার বিচার করিয়া তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং তদনুসারী হইয়া কর্ম্ম করিলে, ক্রমশঃ চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। গুরূপদেশ গ্রহণ করা সাধারণ নিয়ম; কিন্তু সুকৃতিসম্পন্ন উচ্চচেতা

ব্যক্তিগণের তাদৃশ গুরূপদেশের আবশ্যকতা হয় না। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎস! তোমার গুরু বলিতেছেন—তোমাকে তিনি এরূপ উপদেশ দেন নাই,তবে কে তোমাকে এরূপ শিক্ষা দিয়াছে, বল। প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন—

শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদিস্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তাত কঃ কেন শাস্যতে॥

"পিতঃ! ভগবান্ বিষ্ণু, যিনি জগৎবাসী জীবমাত্রেরই হৃদয়ে বাস করিতেছেন, তিনিই আমার উপদেষ্টা। সেই পরমাত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় উপদেষ্টা কাহার কে আছে?" বাস্তবিক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্যক্তির স্বসত্ত্ব-প্রত্যয় যেরূপ আপনা হইতে পুনরাগমন করে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মের অভ্যস্ত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান উপদেশাদি ব্যতিরেকেও সাধকের হৃদয়ে আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।

কেহ কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-সংন্যাস অবলম্বন করেন; কিন্তু বলপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ করিলে কি হইবে? যতক্ষণ মনে মনে বিষয় চিন্তা করা নিবৃত্ত হয় নাই, যতক্ষণ ইন্দ্রিয়ার্থের বিষয় মনে উদয় হইয়া থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসের সার্থকতা কোথায়? সেরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসী অতীব মূঢ়। যাহার চিত্ত শুদ্ধ হয় নাই, যাহার মন হইতে আসক্তি তিরোহিত হয় নাই, তাহার কখনই কর্ম্ম-সন্ন্যাস হইতে পারে না; সে কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, মনে মনে সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। যিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফল কামনা করেন না, তিনিই যথার্থ ত্যাগী, তিনি কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত নহেন। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা সহজ নহে; যাঁহার চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহারই কোন কর্ম্মের প্রয়োজন নাই; শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং নবিদ্যতে॥

"যিনি কেবল আত্মাতে প্রীত ও আত্মাতে তৃপ্ত, অর্থাৎ আত্মানন্দ-অনুভবে সুখী এবং অন্য ভোগাপেক্ষা না করিয়া আত্মাতেই সন্তুষ্ট হয়েন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই।" কেন নাই? যেহেতু তাঁহার কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে কর্ম্মের যাহা উদ্দেশ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ওরূপ অবস্থার উপনীত হইতে পারে না; কর্ম্মই জ্ঞান-মার্গের প্রথম সোপান ও প্রথমাবস্থা; প্রকৃতির উত্তেজনায় সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্ম করিতে করিতে বুদ্ধির পরিপাকসহকারে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে যে, সকাম-কর্ম্মে সুখ-শান্তি নাই। বিষয়াসক্তি কেবল দুঃখ ও অশান্তির কারণ; এইরূপ বুদ্ধিই নিষ্কাম-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। নিষ্কাম-কর্ম্মাভ্যাসই দ্বিতীয়াবস্থা। কামনা পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্গভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইলে, চিত্তশুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই তৃতীয়াবস্থা। এই অবস্থাতেই ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লেখ; এই অবস্থায় যে কর্ম্মই করা যায়, তাহাতে পাপ-স্পর্শ হয়না, কেন না,

ব্রহ্মণ্যাধায়কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি ঈশ্বরে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক অনাসক্ত রহেন, তিনি জলে অলিপ্ত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপে লিপ্ত নহেন। তাহার পর, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ; ইহাই চতুর্থ এবং চরমাবস্থা; এই অবস্থা নিত্যানন্দময়, এই অবস্থায় ভেদাভেদ নাই, এই অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, এই অবস্থা হইতেই মুক্তি।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

জাতীয় উৎসব জাতীয় উন্নতির একটি প্রধান উপাদান। যে জাতির সার্ব্বজনীন কোন উৎসব নাই, সে জাতির ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যময়। বিশুদ্ধ উৎসবাদিতে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণভাব তিরোহিত হয়, আত্মপর-দেভজ্ঞান নষ্ট হয়; ধন, পদ বা বংশজনিত আত্মাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়; ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, রাজা, প্রজা, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক অভূতপূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং একতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়।

বঙ্গদেশের অবস্থা যতই শোচনীয় হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে, সে পর্য্যন্ত নির্জীব নিস্তেজ হইলেও বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে না।

এই উৎসবে হিন্দু-বঙ্গবাসী মাত্রেরই প্রাণ এক অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; এবং প্রাণের সেই আবেগময় ভাব বঙ্গদেশস্থ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও মাতাইয়া তুলে। এই জাতীয় উৎসবে এতদ্দেশবাসীরা সকলেই যেন অশেষবিধ ধর্ম্ম, আচার ও ব্যবহারগত পার্থক্য সত্ত্বেও, একতা সূত্রে নিবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্যদ্-জাতীয় অভ্যুদয়ের পূর্ব্বাভাস প্রদান করে। ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই মহাশক্তি-পূজার নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত নহেন বলিয়া, এই জাতীয় উৎসবের প্রতি তাঁহাদের তাদৃশ অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস আরস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, যখনই কোন জাতি বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখনই তাহার পৃষ্ঠভাগে শৌর্য্য, বীর্য্য, ধন, বিদ্যা, গভীর চিন্তাশীলতা এবং সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি দণ্ডায়মান হইয়া, সেই জাতির গৌরব সংরক্ষণ করিয়াছে। কোন জাতিই কেবল কেশরি-সদৃশ পাশব বলের দ্বারা উন্নতি লাভ করিতে পারে না; কিন্তু উন্নতি বিধানের জন্য শারীরিক বলেরও প্রয়োজন বটে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত হইয়াও গ্রীক্‌জাতি এক সময়ে রোমীয়দিগের পাশব বলের নিকট পরাভূত হইয়াছিল; এবং কালে ঐ রোমীয়েরাও সভ্যতায় উচ্চতম শিখরে অবিষ্ঠিত হইয়াও, গথ্ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির সিংহ-পরাক্রমের নিকট স্থির থাকিতে পারে নাই। শ্রুতি বলিতেছেন,—

"শতং বিজ্ঞানবতাং একো বলবান্ আকম্পয়তে, বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেন অন্তরীক্ষং, বলেন দ্যৌর্বলেন পর্ব্বতাঃ, বলেন দেব-মনুষ্যা, বলেন পশবশ্চ বয়াংসিচ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীট-পতঙ্গ পিপীলকং, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি" অর্থাৎ এক জন বলবানব্যক্তি বলহীন শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকে কম্পান্বিত করেন। বলের দ্বারাই পৃথিবী অবস্থান করিতেছে, বলের দ্বারাই দ্যুলোক এবং পর্ব্বতরাজি অবস্থান করিতেছে; দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, তৃণ, বনস্পতি, শ্বাপদ, অধিক কি—কীট-পতঙ্গ-পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্তই বলের দ্বারা অবস্থিত রহিয়াছে; বলের দ্বারাই সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত। অতএব বলই জাতীয় অভ্যুদয়ের প্রথম এবং প্রধান উপাদান। এই জন্যই শক্তি পশুশ্রেষ্ঠ সিংহোপরি

আরাধ্য। হে বঙ্গবাসিন্! তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই বিভূষিত হও না কেন, তোমার বলের উপাসনা প্রয়োজন। সে উপাসনা না থাকাতেই তুমি দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও নির্জ্জীব, এবং তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের উপাসনাও নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ এবং দৃঢ়তা-বিহীন; উহা অন্তরেই আছে, কার্য্যক্ষেত্রে অপ্রকাশিত।

একটু প্রণিধান করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন ধনের প্রয়োজন, তেমন বিদ্যারও প্রয়োজন; যে দেশে বিদ্যা নাই, সে দেশে ধন নাই, ; যে দেশে ধন নাই, সে দেশে বিদ্যা নাই। ব্যক্তিগত জীবনে ধন ও বিদ্যার একত্র অবস্থান বিরল হইলেও জাতীয় জীবনে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব কখনও পরিদৃষ্ট হয় না। মিশর, বেবিলন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস এবং ইংলণ্ড, জাপান প্রভৃতি আধুনিক দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই এই সত্যের উপলব্ধি হইবে। এই জন্যই কমলা ও বীণাপাণি উভয়েই অভ্যুদয়াভিলাষী ব্যক্তির আরাধ্য দেবতা। প্রাচীন ঋষিগণ অতি অপূর্ব্ব কৌশলে এই জাতীয় উৎসবে জাতীয় উন্নতির যাবৎ উপাদানের সমাবেশ করিয়াছেন। শক্তির পদতলে যেমন সিংহ অবস্থিত, তদ্রূপ উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মানা।

জাতীয় উন্নতির জন্য যেমন বল, বীর্য্য, উদ্যম, অধ্যবসায়ের আবশ্যক, তদ্রূপ স্থিরবুদ্ধি এবং চিন্তাশীলতারও প্রয়োজন। এইজন্য শক্তির উভয় পার্শ্বে বীরবর দেবসেনাপতি ও চিন্তাশীল সিদ্ধিদাতা গণপতি বিরাজমান। মধ্যস্থলে সর্ব্বতোমুখী-বৃত্তি সম্পন্না মহাশক্তি দশ দিকে দশ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক জাতীয় জীবনের সংরক্ষণ ও তাহার অভ্যুদয়ের পরিচালন করিতেছেন! যে জাতির উন্নতির উপাদান এবম্বিধ, তাহার অন্তরায় অসুর সদৃশ প্রবল হইলেও অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেই হইবে।

অন্যভাবে দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, দুর্গা-পূজার মধ্যে একটী সুন্দর আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত রহিয়াছে। দুর্গাপূজা দেবাসুর সংগ্রামের প্রকট মূর্ত্তি বিশেষ। আমাদিগের সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ দেবতা, এবং তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহই অসুর; অনাদি কাল হইতে, প্রতি দেহেই এই দেবাসুর-সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। এই তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তিরূপ অসুরের পরাভবের জন্য পরব্রহ্মের আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন; কিন্তু তিনি গুণাতীত হওয়ায়, তাঁহার শক্তির আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এইজন্য আদ্যাশক্তি এবং আদ্যাশক্তি-সম্ভূত যাবৎ শক্তির আধার স্বরূপ অপরাপর যাবৎ দেবতাও এই মহাপূজায় আরাধ্য দেবতা স্বরূপ হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রকার সাত্ত্বিকী শক্তির সুসমঞ্জস পরিচালন হইলেই অসদ্-ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ অসুর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহাই দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক উপদেশ, অলমতি বিস্তরেণ।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য্য-মণ্ডল হইতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর দেব-লোকের স্থান; উহা সপ্তভাগে বিভক্ত। ঐ সপ্ত স্বর্গো-কস্থ জ্যোতির্ম্ময় দেবতাগণ উচ্চ হইতে উচ্চ-

তর শ্রেণীর, তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ও উচ্চতম মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্য-লোক আছে। ঐ সকল লোক সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন। পৃথিবী হইতে সূর্য্য-লোক পর্য্যন্ত স্থলকে ভূর্লোক বা অন্তরীক্ষ কহে। ঐ অন্তরীক্ষে কতিপয় শ্রেণীর উপ-কারক বায়ুময়, তেজোময় দ্রবময় সূক্ষ্ম দেবতা আছেন, এবং অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর অপকারক সূক্ষ্ম জীবও আছে।

এতদ্ভিন্ন চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থান-বিশেষে পিতৃলোক আছেন।* পূর্ব্বে সূক্ষ্ম জীবের বিষয় কথিত হইয়াছে। এক্ষণে স্থূল জীবের বিষয় কথিত হইতেছে। এই পৃথিবীতে মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর জীব আছে; তদ্ভিন্ন উদ্ভিদ, আকরজ ধাতু, প্রস্তর, এমন কি, মরুভূমিস্থ বালুকা-কণার পর্য্যন্ত জীবন আছে; কিন্তু যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহাতে বাহ্যতঃ জীবত্বের কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; তাহাতে জীবত্ব গুহ্য—অর্থাৎ অপ্রকাশ (হাঁড়ি-চাপা আলোর ন্যায়) আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও অধিকাংশ পুরাণে "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে স্থিত, অথবা সর্ব্বভূত ঈশ্বরে স্থিত" বলিয়া বর্ণিত আছে। যদি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তবে বালুকা-কণায়—এমন কি, প্রত্যেক পরমাণুতেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।

তাহা হইলে, বালুকা-কণারও জীবত্ব অস্বীকার করা যায় না। আধ্যাত্মিক ভাবে দৃষ্টি করিলে, ঐ মতের বিশেষ সার আছে, প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, মহদ্দর্পণ সদৃশ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে ত্রিগুণের সংঘর্ষ বা গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ ত্রিবিধ ভাবরূপ সৃষ্টাভিমান প্রকটিত হয়,—যথা—আমি সৃষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও সুখ অনুভব করিব; আমি সৃষ্টি-ক্রিয়া করিয়া, তাহার বিষয় ভোগ করিব; আমি সৃষ্টির বিষয় হইয়া ভুক্ত-ভোগাশ্রয় হইব। শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ ভাবত্রয় সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার নামে অভিহিত হয়।* ঐ ত্রিবিধ ভাবময় জ্ঞানাভাসই তিনটী আমি; অথবা তিনের সমষ্টি মহা আমি। প্রথমতঃ সৃষ্টির বিষয় ব্যতীত সৃষ্টি-প্রকাশ বা সৃষ্টি-ক্রিয়া হইতে পারে না, এজন্য সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বাগ্রেই তামসিক অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে বিবর্ত্তিত হয়*। ঐ পঞ্চ-ভূতস্থ সত্ত্বাংশ হইতে বুদ্ধি ও মন, রাজসাংশ হইতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব এবং তামসাংশ হইতে দেহ-তত্ত্বের যে বিকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষৎ, পঞ্চদশী, মনুর সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং ভাগবত প্রমুখ পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে

* চন্দ্রলোক বা চন্দ্রমণ্ডলস্থ স্থানই জীবের পরলোক বা পিতৃ লোক। ইহার বৈজ্ঞানিক রহস্য সৃষ্টি তত্ত্বে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত দেখিবেন, আশা করি। যে সকল জীব পুণ্যফলে স্বর্লোক ভোগ করেন, তাঁহাদের এই পৃথিবীতে পুনর্জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে চন্দ্রলোকে আসিতে হয়। ইহা অতিশয় গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

* সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-প্রকাশ হয়, তাহার নাম বৈকারিক সৃষ্টি ও উহা মানস ব্যাপার বা অন্তর্বিকাশ এবং রাজসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া হয়, তাহা সূক্ষ্ম বৈষয়িক ও তামসিক অহঙ্কার হইতে যে সৃষ্টি হয়, তাহা স্থূল বৈষয়িক ব্যাপার।

*প্রথমে শব্দ ও গতি, তাহা হইতে জ্যোতি এবং তেজের বিকাশ হয়; ঐ তেজ হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। উহা প্রথম সূক্ষ্ম, পরে স্থূলভাবে বিকাশিত হয়। সূক্ষ্ম ওঁ শব্দ হইতে যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ বিকাশিত হয়, তাহার বিজ্ঞান-সঙ্গত তত্ত্ব মৎকৃত—"সৃষ্টিতত্ত্ব—ত্রিমূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (হিন্দু-পত্রিকা ৩য় খণ্ড। ১ম, ২য় সংখ্যা, ২৫ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

যে, হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি-জীব-স্বরূপ মহাপুরুষের সূক্ষ্ম দেহই সমষ্টি-বুদ্ধি মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-তত্ত্ব, এবং স্থূল দেহই সূক্ষ্ম বিষয়রূপ পঞ্চমহাভূত হইতেছে। উক্ত সূক্ষ্ম মহাভূতের এক একটী সূক্ষ্ম ভূত হইতে বহুবিধ তত্ত্বের বিকাশ না হইলে, এই চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রপূর্ণ বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন সমষ্টি-মহৎ-ক্ষেত্রে ভাবময় মহাপুরুষের দেহরূপ সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্র-কল্পিত ও তাহা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ এক একটী তন্মাত্র বা মহাভূত তাঁহার অংশস্বরূপে এক একটী ভাবময় দেবতার দেহরূপে গণ্য হয়। যেমত মহৎ-ক্ষেত্রে সমষ্টি-পঞ্চ-তন্মাত্রের অধিষ্ঠাতা মনোময় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ, সেইরূপ তাঁহার এক এক স্বরূপ এক একটী তন্মাত্রের (অর্থাৎ শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র ইত্যাদি) অভিমানী অহংতত্ত্ব বা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী এক একটী মনোময় সূক্ষ্ম দেবতা হইতেছেন। ঐ এক একটী তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতই উক্ত দেবতার শরীর।* এক একটী ভাব হইতে ক্ষুদ্র ২ বহুভাব কল্পিত হয়; আবার ঐ কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসমূহ সম্মিলিত ও কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ভাবে পরিণত হয়; যথা—রূপ-তন্মাত্র হইতে তেজ, জ্যোতি, তড়িৎ, অগ্নি প্রভৃতি বহুতর তৈজস তত্ত্ব কল্পিত হয়। স্পর্শ-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় বায়বীয় তত্ত্ব, রস-তন্মাত্র হইতে নানা জাতীয় দ্রব-তত্ত্ব; গন্ধ-তন্মাত্র হইতে বহুতর ক্ষিতিজাতীয় (কঠিন) বস্তু-তত্ত্ব কল্পিত হয়। ঐ ঐ তত্ত্বস্থ অধিষ্ঠাতৃদেব—দ্বাদশ আদিত্য, ঊনপঞ্চাশৎ পবন, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। আবার ঐ সকল তত্ত্ব পরস্পর সম্মিলিত ও ঘনীভূত হইয়া, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীরূপে বিবর্ত্তিত হয়। ঐ সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র-সূর্য্য-চন্দ্র পৃথিব্যাদির উপাদানের নির্ম্মলতা, মলিনতা, সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার পরিমাণ অনুসারে তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বগুণের প্রকাশ ও রজোগুণের ক্রিয়ার ন্যূনাতিরেক হয়; তন্নিবন্ধন চিদাভাস-রূপ জীবের বিকাশ বা অবিকাশ হয়। জীবগণ মন-বুদ্ধিরূপ দর্পণের উজ্জ্বলতা-মলিনতা নিবন্ধন দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ প্রভৃতি বহুতর শ্রেণীতে পরিণত হয়; এবং যে স্থলে, তমোগুণোৎপন্ন স্থূল জড়পদার্থের আবরণ হেতু বুদ্ধিরূপ দর্পণের আদৌ বিকাশ না হয়, সে স্থলে তাহার দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিরও বিকাশ হয় না; সুতরাং যে পদার্থে আদৌ চেতনার বিকাশ নাই, তাহাকে আমরা অচেতন জড়পদার্থ বলি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবতারতত্ত্ব।

—•:০:•—

(১৩০৪ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের হিন্দু-পত্রিকার ৬০ পৃষ্ঠার পর)

পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহার উত্তরে যদি আমরা বলি যে, ঐ সূর্য্য ও চন্দ্রোপাসক সম্প্রদায়ই (অর্থাৎ যাঁহাদের কুল-দেবতা সূর্য্য ও চন্দ্র ছিলেন) সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বিখ্যাত, তবে সে উত্তরে পাঠকগণ কখনই

* বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ৫২১ পৃঃ হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল ও বায়ু-প্রকৃতি যে দেবতা-দিগের শরীর, ইহা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। [illegible] দ্রষ্টব্য।

সন্তুষ্ট হইবেন না ; তাঁহারা বলিবেন যে, যদি সূর্য্য ও চন্দ্র-উপাসকগণের বংশধরগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজা হইলেন, তবে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেব-উপাসকগণের বংশধরবৃন্দের আর কোন উল্লেখ নাই কেন? বা তাঁহারাই একেবারে উল্লেখযোগ্য হইলেন না কেন ?* বিশেষতঃ সমাজনেতা প্রধান উপাসক ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার সপ্ত মানস-পুত্রের বংশধর বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন, ঐ প্রকার কোন উপাস্যদেবের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হন নাই কেন? এই প্রশ্নের উত্তর অতীব কঠিন। ইহা সম্যকরূপে বুঝাইবার শক্তিও আমার নাই, এবং অনেকের তাহা ধারণা করিবারও শক্তি নাই ; উহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বা মানস-ব্যাপার। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাষা দ্বারা বর্ণন করা অতীব কঠিন ; যেহেতু উহা বাক্যাতীত, কিন্তু মনাতীত নহে। যদি কোন পাঠক-মহাশয় বাক্য দ্বারা উহার আভাস প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় চিন্তা ও মানসোপলব্ধি দ্বারা কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন, এইজন্য উহার তাৎপর্য্য আমরা যতটুকু বুঝিতে ও ব্যক্ত করিতে পারি তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এইপ্রবন্ধের প্রথম ভাগোল্লিখিত প্রকৃতির অভ্যন্তরে সর্ব্বসামঞ্জস্যসূচক ত্রিগুণাত্মক যে সর্ব্বন্যায় ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা আছেন, ঐ প্রজ্ঞা হইতে সত্ত্ব, রজ, তম—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার, ত্রি-শক্তিতে বিভক্ত হয়েন। ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণই স্থিতি-শক্তি, রজোগুণই ইচ্ছা বা মনোময় সৃষ্টি-শক্তি। সৃষ্টিকারী রজোগুণই ব্রহ্মা। প্রকৃতির যে নিয়মানুসারে কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, উহা যেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নিরাকার*মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তির একটী মানস ব্যাপার। ঐ সৃষ্ট সূক্ষ্ম ও স্থূল পদার্থে ঐ শক্তির কিছু না কিছু আভাস বিদ্যমান আছে। কিন্তু ঐ বাহ্যজগতে তাঁহারই আভাস-অনুভূতির নিমিত্ত তাঁহারই মানসপুত্ররূপ মানসাণু বা 'মনু' বিকাশিত হওয়ায়, অনন্তজগৎ জ্ঞাতা-জ্ঞাত বা দ্রষ্টা দৃষ্ট, এই দুইভাগে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহার ভাবাংশই জড়, স্বরূপাংশই চিৎ। জীব জড়-চৈতন্য মিশ্রিত। এই জড়-জীব-রাজ্য তাঁহারই বিভূতি স্বরূপ। বাহ্যজগতে সত্ত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণের অস্তিত্ব প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত ভাবে আছে, উহাই জড়-জগৎ হইতে ক্রমে বিকাশিত হইয়া, নিম্ন হইতে উচ্চতর জীব-জগতে পরিণত হইয়াছে। উপরোক্ত গুণত্রয়ের সংযোগ হইতেই জড়দেহে চৈতন্য বিকাশিত হয়। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণই চিদ্বিকাশিনী শক্তি। রজোগুণ বাসনা-উদ্দীপনী ও কার্য্যকারিণী শক্তি, তমোগুণ জ্ঞানাবরণী বা বিক্ষেপণী শক্তি। পূর্ব্ববর্ণিতমত জীবের ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ব্রহ্মার মানস-পুত্ররূপ ঐ মানসাণু বা মনু বিকাশিত হওয়ায়, ঐ মানস-পুত্র মনুই মানবের আদি-

*পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হিমালয়ের শিখরবাসী সুরগণই ঐন্দ্র, বায়বীয় ও বারুণীতত্ত্ব বা শক্তিসাধন করিয়া, অর্থাৎ স্ব-স্ব উপাস্যদেব বা দ্যুতি সাধন করিয়া, সেই সেই নামে অভিহিত হইতেন, তাহাদেরই বংশধরগণের কথা এই স্থলে হইতেছে।

*প্রকৃত পক্ষে মহাপ্রজ্ঞা বা মহাশক্তি নিরাকার নহে, উহা মহা মানসাকারেই অবস্থিত আছেন; তবে আমাদের ন্যায় স্থূল দেহধারী নহেন বলিয়া নিরাকার বর্ণিত হইয়াছেন।

পুরুষ বলিয়া বর্ণিত ও পরিগণিত। ঐ মনু পাশ্চাত্য প্রদেশে 'নু' বা 'নোয়া' নাম ধারণ করিয়াছে; কিন্তু এই স্থানে পুরাণের সহিত তন্ত্র শাস্ত্রের আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হয়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত মানসপুত্র বশিষ্ঠাদি সপ্তজন আদ্যঋষি. তাঁহারাই ব্রাহ্মণদিগের আদি-পুরুষ। ব্রহ্মার অন্য মানস পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ; কশ্যপের স্ত্রী অদিতির গর্ভজাত পুত্র ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র প্রভৃতি আদিত্য বা দেবগণ, এবং দিতির গর্ভজাত পুত্র দৈত্য বা অসুর-গণ বলিয়া বর্ণিত আছে; ঐ অদিতির গর্ভজাত পুত্র সূর্য্য, সূর্য্যেরই পুত্র বৈবস্বত মনু ও চন্দ্রের পুত্র বুধ; ঐ বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, কন্যা ইলা। ঐ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়গণই সূর্য্যবংশীয় ও ইলার গর্ভে বুধের ঔরসে জাত পুত্রের বংশধরগণই চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তত্ত্ব-শাস্ত্রের সহিত পৌরাণিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইলেই উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হইবে।

বিশুদ্ধ রজোগুণময় সৃষ্টিকরী শক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় স্থিতিশক্তিতে অবস্থিত। যেহেতু কোন বিষয়ের স্থিতি-শক্তি সাম্ভাবনা ব্যতীত কখনই সৃষ্টিকারী শক্তিতত্ত্বের বিকাশই হইতে পারেনা। ঐ স্থিতি-শক্তিই অনন্ত প্রজ্ঞা; অতএব ঐ প্রজ্ঞা বা মহৎ-বুদ্ধিতেই সৃষ্টি-কল্পনাকারী মহামানস স্থিত আছে। অন্য কথায় বলিতে হইলে. ঐ সৃষ্টি-কারিণী রজ শক্তিই পূর্ব্ববর্ণিত কারণ বারিতত্ত্ব ও সত্ত্ব তাহার বীজস্বরূপ* ঐ কারণ বারিতে পূর্ব্বোক্ত তেজের যে জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, উহাই মরীচি; ঐ মরীচি হইতে জীবন্ময় তড়িতের বিকাশ হয়* ঐ তড়িৎ মরীচির পুত্রস্বরূপ, উহাই পৌরাণিক কশ্যপ; ঐ তড়িতের দুইপ্রকার শক্তি আছে। সত্ত্বগুণময়ী জৈবীশক্তি (Inteligent life principal) ইহাই অদিতি ও তমোগুণময়ী জৈবীশক্তি, (Blind life principal) ইহাই দিতি। ঐ জীবন্ময় তড়িৎই রজোগুণের বা তৈজস তত্ত্বের বিকাশ। ইহা বলা বাহুল্য যে, ঐ রজোগুণ হইতেই প্রবৃত্তি-উদ্দীপনী বা কার্য্য-কারিণী শক্তির (active force) সত্ত্বগুণ হইতে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির ও তমোগুণ হইতে জড়তত্ত্ব—অর্থাৎ পঞ্চভূত ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম বিকাশিত হয়। ঐ দিতি ও অদিতি ভিন্ন কশ্যপের আর দুইটী পত্নী ছিল,—যথা কদ্রু ও বিনতা; উহারাই যথাক্রমে যৌগিক ও বিয়ৌগিক তড়িৎ। কদ্রুর গর্ভ সম্ভূত পুত্র জগতের বন্ধন শেষ নাগরূপ সংশ্লেষণী শক্তি * ও বিনতার গর্ভসম্ভূত পুত্র গরুড়রূপ বিশ্লেষণী শক্তির বিকাশ হয়। ঐ সংশ্লেষণী শক্তি-প্রভাবে ঐ তেজময় দ্রবীভূত অনন্তব্যাপী আকাশের বিস্তীর্ণ তৈজসাণু সকল ঘনীভূত হইয়া প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্পময় পদার্থে পরিণত হয়। ঐ বাষ্প মধ্যস্থ গরুড়রূপী

*রজোগুণ হইতেই তেজ বা তাপের বিকাশ হয়; ঐ তাপ হইতে মহাভূত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণবীভূত হয়; ঐ একার্ণবমধ্যস্থ মহত্তেজ বা তৈজস কেন্দ্রই লোক পিতামহ ব্রহ্মা।

*এ জীবন্ময় তড়িৎকে ইংরাজিতে Animal magnatism কহে; বঙ্গভাষায় জীবন্ময় বা জীবোৎপাদক তড়িতের পরিবর্ত্তে উষ্মা শব্দ কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

*পুরাণে বর্ণিত আছে যে, বিষ্ণু অনন্ত-নাগ-শয্যায় শয়িত ছিলেন, ঐ অনন্ত নাগই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ (universal attraction) আকর্ষণের গতি (motion) সর্পের ন্যায় বক্র। পৃথিবীর কৈন্দ্রিকাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণরূপ বাসুকি ঐ বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের অন্তর্গত।

বিশ্লেষণী শক্তি প্রভাবে ঐ বাষ্প অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইতে না পারায়, অর্থাৎ উহার স্থিতিস্থাপকতা-গুণ থাকায়, ঐ বাষ্পস্থ তৈজসাণুসকল ঐ প্রকাণ্ড গোলকাকার বাষ্প প্রতিবিম্বিত করিয়া, জগতে অজস্র কিরণ-জাল বিতরণ করিতেছে; উহাই জগতের প্রাণদাতা সূর্য্য, সৌরজগতের ক্রিয়াকারী শক্তিতত্ত্ব, উহাই দেবাংশ, এবং দিতিগর্ভজাত সংশ্লেষণী বা আকর্ষণীশক্তিই অসুরাংশ; ঐ আকর্ষণী শক্তিই জগতের বন্ধন স্বরূপ। এইরূপ পঞ্চভূতে, তড়িৎ, ম্যাগনেট্ প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্ব মৃত জড়ের ন্যায় হইলেও তদভ্যন্তরস্থ সত্ত্বাংশ হইতে মনোময় জ্যোতিঃ ও রাজসাংশ হইতে প্রাণময়ী কার্য্যকরী শক্তি বিকাশিত হইতে পারে। ইহা আর্য্য-বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রানুমোদিত; এই জন্য প্রত্যেক ভূতের, প্রত্যেক তত্ত্বের, প্রত্যেক গ্রহ-নক্ষত্রাদির, এমন কি—মানবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, শারীরিক প্রত্যেক ক্রিয়া-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হইয়াছে। মানব ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি; ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার তত্ত্ব আছে, মানবে তাহার অংশ আছে, অতএব বাহ্যজগতে যে সকল অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, মানবের অন্তরেও তাহা আছে; কিন্তু অন্তর ও বাহ্য, উভয় জগতেই ঐ সকল দেবতা গুহ্যভাবে (Latent) আছেন, উহা যোগ-সাধন-বলে বিকাশিত হইতে পারে। যেমন আপনি মন ও বুদ্ধির বাহ্য সাধন দ্বারা টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করিয়া, তাহার গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আত্মাধীন করিতে পারেন, সেইরূপ যদি আপনি মন-বুদ্ধির অন্তঃসাধন দ্বারা মনের অধিষ্ঠাতৃদেব দ্বিদলস্থ অক্ষিপুরুষকে জাগরিত করিতে পারেন, তবে সেই অক্ষিপুরুষরূপের আত্মজ্ঞান জ্যোতি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের গুণ ও কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন করিতে পারিবেন না কেন? ঐ হিরণ্ময় পুরুষের বর্ণনা সূর্য্য-অর্ঘ্যের মন্ত্রে বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তিনি ব্রহ্মার ভাস ও বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ; তিনি জগৎপ্রসবিতা এবং অর্থপ্রদাতা; অতএব উহাতে জাগতিক প্রজ্ঞা ও সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে। অন্যান্য দেবতা এক এক প্রকার শক্তির বা তত্ত্বের বিকাশ মাত্র, কিন্তু সূর্য্য সমস্ত শক্তির ও তত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃদেব। ঐ সূর্য্যের নাম বিবস্বান্ এবং ব্রহ্মার মানসপুত্রের নাম মনু বা মানসাণু। ব্রহ্মার ঐ মানসাণুই মনের অধিষ্ঠাত্রীদেবতাস্বরূপ। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন যে, যিনি মানব-মনের অন্তঃসাধন দ্বারা মানসাধিষ্ঠাতৃদেবকে জাগরিত করিয়া ঐ অপরোক্ষ মানসোপলব্ধি দ্বারা সৌরাধিষ্ঠাতা হিরণ্ময় পুরুষের সমগ্র গুণ ও সমগ্র কার্য্যকরী শক্তি অনুভব ও আয়ত্তাধীন পূর্ব্বক সৌরী শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না? সূর্য্যের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভে মনুর উৎপত্তি পুরাণে বর্ণিত আছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিবৃত হইবে।* এই স্থানে

---

*বিশ্বকর্ম্মা অর্থে বিশ্বের ক্রিয়ার শক্তি; ঐ ক্রিয়া-শক্তি হইতে সংজ্ঞা—অর্থাৎ জ্ঞান বা বোধশক্তির বিকাশ হয়। কোন কোন বিজ্ঞানের মতে জলজ চুম্বক (Loonar maghnetism) হইতে বোধশক্তি বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হয়; ঐ ম্যাগনেটই জগতের ক্রিয়া-শক্তি; উহা হইতে সংজ্ঞার উদ্ভব হয়; সংজ্ঞাই আদি [illegible] [illegible]।

পাঠক মহাশয় একবার ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোক স্মরণ করুন।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনু রিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ
এবং পরম্পরা প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ
সকালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥"

বঙ্গানুবাদ—আমি (কৃষ্ণ) এই যোগ সূর্য্যকে শিক্ষা দিয়াছিলাম; সূর্য্য মনুকে, মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে শিক্ষা দিয়াছিলেন; এইরূপে ঐ যোগ রাজর্ষিগণ বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘ কাল বশে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কবিতার আবরণ ভেদ করিলে বুঝা যায়, সেই সর্ব্বমঙ্গলময় অনন্তশক্তিমান হইতে সূর্য্য পূর্ব্বোক্ত শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সূর্য্য সাধন-যোগবলে কেবল বৈবস্বতমনু বংশ-পরম্পরাক্রমে উহা লাভ করিয়াছিলেন; দীর্ঘকালে যে উহা কেন নষ্ট হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন দ্বারা বিশদ ও পরিস্কৃত হইবে। এখন পাঠক বুঝিলেন যে, সূর্য্যবংশ কি? চন্দ্রে যে সৌরকর পতিত হয়, উহাকে সূর্য্যবংশীয় কন্যা কল্পনা করা নিতান্ত অদার্শনিক নহে। ফলিতজ্যোতিষানুসারে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার স্বরূপ। তন্ত্রে বর্ণিত আছে, ষট্‌চক্রের ষষ্ঠ বা ললাটে আজ্ঞা চক্রই চন্দ্রের স্থান; ঐ আজ্ঞাচক্রই মনের উচ্চাঙ্গ; ঐ আজ্ঞাচক্রে জৈবীশক্তি স্থির করিতে পারিলে মানব যোগ-সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মনের উচ্চাঙ্গের বিকাশ হয়। পৌরাণিক মতেও মানবাত্মা পরলোক-ভোগান্তে চন্দ্রলোকে অবস্থানান্তর তথায় পুনঃ সূক্ষ্ম-শরীর (জৈব ও মানসোপাদান) আকর্ষণ-পূর্ব্বক পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন; ইহার প্রকৃত মর্ম্মোদঘাটন করিতে হইলে দর্শন, জ্যোতিষ ও কয়েকখানি পুরাণের বিশেষরূপ আলোচনা আবশ্যক; তাহা হইলে স্বতন্ত্র একখানি গ্রন্থ লিখিতে হয়, এজন্য তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম; ভরসা করি, সূর্য্যবংশ বর্ণন দ্বারা চন্দ্রবংশের তাৎপর্য্য পাঠকগণ কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে যিনি অন্তঃসাধন দ্বারা চান্দ্রিকী শক্তি অর্থাৎ জলজ চুম্বক (Loonar magnatism) আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বুধ (পণ্ডিত); বুধ সূর্য্যবংশীয়া কন্যা ইলাকে বিবাহ করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইলা পুরুষ ও স্ত্রীরূপী; অতএব ইলা সৌর তেজ ও জ্যোতি বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্ভিন্ন বুধের প্রকৃত-প্রস্তাবে বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলাকে বিবাহ করাও অসম্ভব নহে; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রূপকের কোন হানি হয় না; অতএব সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় রাজগণই যে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ রাজবংশ, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এখন পাঠকগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বশিষ্ঠাদি সপ্ত আদ্যঋষি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ মাসপুত্র বা উত্তমাঙ্গ-নির্গত বলিয়া বর্ণিত আছেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? ব্রাহ্মণগণ কি সূর্য্য-সাধন করেন নাই? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, সূর্য্য বিষ্ণুতেজ হইলেও জগৎপ্রসবিতা প্রাণময় ক্রিয়াশক্তি। প্রকৃত-পক্ষে সূর্য্য সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের বা ক্রিয়াশক্তির আধার, অতএব শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং বল-বীর্য্য লাভ দ্বারা পৃথিবীর উপর সর্ব্বপ্রকারে আধিপত্য সংস্থাপনই সৌরী-শক্তি সাধনের উদ্দেশ্য। মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ উহার সাক্ষাৎ ফল নহে। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি -জাগতিক শক্তি অবলম্বন

অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের চেষ্টা করেন নাই, তাঁহারা প্রকৃতির অন্তরের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া, সেই সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় প্রজ্ঞা সাক্ষাৎভাবে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মজ্ঞান-বলে মূল সত্য (পরব্রহ্ম) অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ মহর্ষিগণই ঈশ্বরের মূর্ত্তিমান সত্বগুণ, সমাজের স্থিতি-শক্তি *, এইজন্য তাঁহারা সত্বময় শুক্লবর্ণ ও ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গ নিঃসৃত। ব্রহ্মার উত্তমাঙ্গই যে প্রজ্ঞা বা সত্বময় স্থিতি-শক্তি, তাহার আর সন্দেহ নাই। বোধ হয় হিমালয়ের শিখরস্থিত যে সপ্তজন আর্য্যগুরু সমাজের মঙ্গলার্থে সত্য-জ্ঞানানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণই ব্রাহ্মণ; এইজন্য উক্ত সপ্ত ঋষিই সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির আদি পুরুষ। বোধ হয় ব্রাহ্মণগণ যতদিন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ততদিন যিনি যে বংশের প্রধান থাকিতেন, তিনিই আদি পুরুষের উপাধি ধারণ করিতেন; এই জন্যই বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে ৫৩ পুরুষ পরে রামচন্দ্রের কুলগুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। * যাহাহউক আমরা এক্ষণে সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশের বংশাবলীর কুলচিনামা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের তাৎকালিক সমাজিক অবস্থা ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী বর্ণন করিব।

প্রথমে সূর্য্য-বংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনুর বৃদ্ধপ্রপৌত্র পৃথুরাজকে সম্রাট বা পৃথ্বীশ্বর নামে খ্যাত দেখিতে পাই; তৎসময় অন্য কোন বংশীয় রাজপুরুষ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার বিশেষ কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ঐ পৃথুরাজের পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ প্রভৃতি কতিপয় খ্যাতনামা রাজগণের নাম পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, এবং তাঁহাদের নামানুসারে সূর্য্যবংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণের বংশোপাধিও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা সম্রাট বা পৃথিবীপতি বলিয়া কোথাও বর্ণিত হন নাই। বিশেষতঃ বেদ হইতে পুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এই বেদ সকলের মধ্যে ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৯ম সূক্তে পৃথুর পরিচয় (অর্থাৎ তাঁহার যজ্ঞের উল্লেখ) আমরা প্রথম প্রাপ্ত হই; তৎপরে দশম মণ্ডলের ১৪৮ সূক্তে তাঁহার বিবরণ কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু উহাতে পৃথু বেদের সূক্তের রচয়িতা ঋষি বলিয়া বর্ণিত আছেন। এক্ষণে ঐ রাজা-পৃথু ও ঋষি-পৃথু যে এক,

*এই স্থিতি অর্থে সমাজের পালন-শক্তি।

*এই স্থলে আর একটা আধ্যাত্মিক তত্ব আছে। যথা— তন্ত্র-শাস্ত্রানুসারে বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু। মনু কোন বিশেষ মানব নহেন; এক একটী প্রলয়ান্তে সেই কল্পের মানব কূলের বীজ মহৎ ব্রহ্মে লুক্কায়িত হন বা ব্রহ্মা নিদ্রিত হন। ঐ নিদ্রান্তে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া প্রথমে যে বুদ্ধিতত্বে পরিণত হয়, তাহা মনু। ঐ মনু কর্ত্তৃক যখন পৃথিবীর মানব সৃষ্টি-ক্রিয়ার আরম্ভ হয়; অর্থাৎ মানবকূলের প্রথম বিকাশ হয়, তখন ব্রহ্মার প্রাতঃকাল; পরে এই পৃথিবীর মানব-সৃষ্টি-ক্রিয়া যখন স্থগিত হয়, তখন সন্ধ্যা হয়। এই হিসাবে প্রত্যেক সৃষ্টির আবর্ত্তনে দুইটী মনু গণনীয়, যথা—মূল-মনু ও বীজ-মনু; অতএব সপ্ত গ্রহের সপ্ত আবর্ত্তনে চতুর্দ্দশ মনু গণনীয়। তত্বজ্ঞদিগের মতে বর্ত্তমান মন্বন্তর পৃথিবীর চতুর্থ আবর্ত্তন; অতএব তৃতীয় আবর্ত্তনের ষষ্ঠ মনুর অন্তে চতুর্থ আবর্ত্তন বা চতুর্থ মন্বন্তরের প্রারম্ভে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল গণনীয়; তদ্ধেতু সূর্য্য-সাধক বা সূর্য্যবংশের আদিপুরুষের নাম উপরোক্ত আধ্যাত্মিক নামানুসারে বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত হওয়াও বিচিত্র নহে।

তাহাও ঐ সূত্রের পঞ্চম ঋকে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে। কিন্তু ঐ ঋকে পৃথু বেন-তনয় বলিয়া প্রথিত। যে পৃথুর বিষয় আমরা বর্ণন করিব, ঐ পৃথু বেন-তনয় বলিয়া পুরাণেও বর্ণিত। আবার টড্-প্রণীত রাজস্থানের সূর্য্যবংশীয় তালিকায় এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু ইক্ষ্বাকুর প্রপৌত্র অনরণ্যের পুত্র এবং কোন কোন পুরাণে পৃথু পৃথিবীর আদিরাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পৃথুই পৃথিবীকে দোহন করিয়া পৃথিবীর অন্তর্নিহিত বলকর অন্ন ও রত্নাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তিনি গোরূপা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; এই ইতিবৃত্তের রূপক বা আবরণাংশ পরিত্যাগ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পৃথুরাজই হিমালয় হইতে পার্ব্বত্য প্রদেশ ও আর্য্যাবর্ত্তের বনভূমি পরিষ্কারপূর্ব্বক নগর, গ্রাম ও রাজধানী প্রভৃতি সংস্থাপন ও ভূমি-কর্ষণ দ্বারা বলকর অন্নাদি, নানাবিধ ওষধি ও শস্য প্রভৃতি উৎপাদন, পর্ব্বত আকরাদির আবিষ্কার ও খনন দ্বারা মণি-মাণিক্য-রত্নাদি ও স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই ভারতের বৈষয়িক উন্নতির প্রথম ও প্রধান যুগ। এই স্থান হইতেই আর্য্যদিগের পার্থিব উন্নতির প্রথম সূত্রপাত। একদিকে অনার্য্য দস্যুগণ ক্ষত্রিয়দিগের তেজ ও পরাক্রম দ্বারা ভস্মীভূত—পরাজিত ও বিতাড়িত হওয়ায়, আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যদিগের রাজত্ব দৃঢ় এবং তাঁহাদের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়াছিল, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক ও লৌকিক যাগ যজ্ঞ, ভূমি-কর্ষণ এবং অন্তর্বাণিজ্য প্রভাবে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অতুলনীয় ধন-সম্পদ ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আবার একপক্ষে ক্ষত্রিয়দিগের তত্ত্বশাস্ত্র-জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, পরাক্রম, ক্ষমতা প্রভৃতি ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে অধিরোহিত হওয়ায়, এবং পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণদিগেরও বংশ বিস্তৃত ও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইয়া আসায়, ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপনের বা ব্রাহ্মণদিগের পদে উন্নীত হওয়ার আশাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। আর্য্যগণ হিমালয় অঞ্চলে বাস কালে সোম-যাগ প্রভাবে দেবোপাধি ধারণপূর্ব্বক যখন অসুর উপাধিধারী ভ্রাতৃগণকে যুদ্ধে পরাজিত ও চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, হিমালয়ের শিখরে সুরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক সৌরীশক্তি সাধন ও ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুগণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে জাতি-সম্প্রদায় বিভাগ না হওয়ায়, একতা নষ্ট বা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ উপস্থিত হয় নাই। ঐ আর্য্যগণই দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া, সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা ও প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। যে আর্য্যগণ এক সময় বলবীর্য্য-অনুশীলন দ্বারা অনার্য্যগণকে পরাজয়, জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ধনার্জ্জন দ্বারা বৈষয়িক উন্নতি সাধন এবং সমাজে জ্ঞান, ধন ও বল-বীর্য্য-সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রয়োজনের নিমিত্ত সমাজ বিভাগ করিয়া প্রাকৃতিক গুণানুসারে ব্রাহ্মণগণকে নেতাস্বরূপে শীর্ষদেশে স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই আর্য্যগণের মধ্যে বল-বীর্য্যের নেতা ক্ষত্রিয়গণ,

আর্য্যগুরু ও সমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণকে অধঃপাতিত করিয়া সমাজের শীর্ষদেশে উত্থিত হইতে অভিলাষী হইয়া ছিলেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত প্রায় বহিঃশত্রুশূন্য হওয়ায় আর্য্যগণের তাত্ত্বিক ও বৈষয়িক জ্ঞান ও ক্ষমতা, সমাজের কর্ত্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও প্রভুত্ব লইয়া যে অন্তর্বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কামধেনু লইয়া বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে যুদ্ধ, বিশ্বামিত্র রাজার ব্রাহ্মণত্ব-পদ লাভের চেষ্টা, ক্ষত্রিয়গণের সহিত পরশুরামের যুদ্ধ, রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক ঋষিগণের শাস্ত্র পরাজয় ইত্যাদিই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই বিবাদের কারণ যে কেবল বহিঃশত্রুর অভাব ও ক্ষত্রিয়গণের অবাধিত বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও প্রভুত্ব, ইহা কেহ মনে করিবেন না। ব্রাহ্মণগণের পদস্খলন, কর্ত্তৃত্বের ত্রুটি ও স্থানবিশেষে সমাজে আধিপত্যের অপব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ। অধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ বৈষয়িক জ্ঞান ও শক্তির ন্যায় প্রায় নিশ্চিতরূপে বংশানুক্রমিক (Hereditory law) নিয়মাধীন নহে; উহা বিশেষ অনুশীলন-সাপেক্ষ, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধিবিশিষ্ট উন্নত সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানানুশীলন যেরূপ সহজ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন সেরূপ সহজ নহে। যে সমাজে বৈষয়িক জ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা থাকে, সেই সমাজে পিতৃ-মাতৃ দৃষ্টান্ত ও গুরূপদেশে সহজেই জ্ঞানোপার্জ্জন হয়। কিন্তু সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চ্চা থাকিলেও পূর্ব্বোক্তমত দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা সহজে ঐ জ্ঞানার্জ্জন হয় না। যেহেতু দৃষ্টান্ত ও উপদেশ বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বাহ্য জগতের সম্বন্ধ অতি অল্প। প্রকৃতির বিশেষ অনুকূলতা ব্যতীত বাহ্য-শিক্ষা, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা অন্তর্জ্জগতে প্রবিষ্ট হওয়া অতীব কঠিন। ভারতের সমতল-ভূমির এক যোজন উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর প্রদেশস্থ প্রকৃতি (স্বভাব) হইতে আর্য্যগুরুদিগের যে অধ্যাত্মিক জ্ঞানশিক্ষা ও শক্তির বিকাশ হইয়াছিল, সমতল ভূমিস্থ প্রকৃতি হইতে তদ্রূপ শিক্ষা হয় নাই; তদ্ধেতু তাঁহাদের বংশধরগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলন তদ্রূপ হইতে পারে নাই। আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের প্রধান উপাদান অন্তর্সাধন, যথা—ধ্যান, ধারণা ও সমাধি; কিন্তু অন্তর্সাধনের পূর্ব্বে বাহ্যসাধন—অর্থাৎ দেহের ও মনের বাহ্যাঙ্গের ক্রিয়া সাধন, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ব্যতীত অন্তর্সাধন অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত যোজনৈক উর্দ্ধে হিমালয়ের শিখর-দেশের প্রকৃতি যে উপরোক্ত বহিঃসাধনের শিক্ষাগুরুর যোগ্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। উক্ত শিখরদেশ সাধারণ মানবের দুর্গম্য। তথাকার বায়ু স্বভাবতঃ এরূপ সূক্ষ্ম, যে উহা প্রাণায়ামের সম্পূর্ণ অনুকূল। তথায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া—শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রূপ ও রস, সমস্তই আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর কঠোর। তথাকার প্রকৃতি হইতেই অধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশক সোমরস প্রভৃতি উদ্ভূত হওয়াই সম্ভব। এই জন্য হিমালয়ের শিখরদেশ যোগের যেরূপ অনুকূল, সমতল ক্ষেত্র সেরূপ নহে। তদ্ধেতু সাধারণ জনগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ক্রমেই মন্দীভূত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কঠোরানুষ্ঠানে মানবের মন ধাবিত

হয় না। এজন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের হ্রাস হওয়ায় ক্রমেই উহা অতিপ্রাকৃত ও অমানুষিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। যদিও ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শক্তি অনেকে হারাইয়াছিলেন, তথাচ সমাজে আত্মগরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ঐ আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুষ্ঠানের নামে সমাজে বহুল কঠোরতর যজ্ঞ, কর্ম্মানুষ্ঠান ও কঠোরতর বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা সাধারণ জনগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে ঋষিগণ অবশ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান হারান নাই। আদ্যঋষিগণের প্রধান বংশধরগণের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তি না থাকিলে উহার পুনর্বিকাশ হইতনা। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে অনেক স্তর নিম্নে নামিয়াছিলেন। এমন কি, সমগ্র বেদানুষ্ঠানে তৎকালে প্রায় কেহই শক্ত না থাকায়, এক এক ব্রাহ্মণ-বংশে বেদের এক একটী শাখা মাত্র অধ্যয়ন প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ শাখার নামানুসারে ব্রাহ্মণ-গণ এক একটী শাখা অনুসারে কঠ-কুথুমাদি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময় ব্রাহ্মণগণের অতিরিক্ত আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হওয়ায়, ক্ষত্রিয়গণও পূর্ব্বোল্লিখিতমতে অত্যন্ত অভিমানী ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুরাচরণেও ক্ষান্ত হন নাই। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের উপর কীদৃশ দৌরাত্ম্য ও ব্রাহ্মণগণকে কি প্রকার নিগৃহীত করিয়াছিলেন, রাজা নহুষের উপাখ্যান পাঠ করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ নহুষ রাজা যে অশ্বের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণগণকে রথে যোজনা করিয়া দিয়া রথ টানাইতেন, তাহা বোধ হয় অনেক পাঠক অবগত আছেন। ক্ষত্রিয়দিগের এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে মহাবীর পরশুরামের অভ্যুদয় হয়। এই জন্যই পরশুরাম দশাবতারের মধ্যে একটী আংশিক অবতার-গণ্য। নহুষ প্রমুখ ক্ষত্রিয় রাজগণের, ব্রাহ্মণগণের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নহেতু ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হওয়ায়, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র ও নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণগণের অন্তরের বেদনা, ক্লেশ, দুঃখ, অভাব ও আবশ্যকতার বেগ বা স্রোত অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছিয়া ছিল ও তথায় তাঁহাদের আবেদন বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। তথাকার সর্ব্বন্যায়ানুমোদিত সর্ব্বমাঙ্গলিক ঐশ্বরিক নিয়ম হইতেই ক্ষত্রিয়দিগের দমনের জন্য সেই সর্ব্বশক্তিময়ের শক্তি বা বলের মূর্ত্তিমান আভাসস্বরূপ ব্রাহ্মণকুলে ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ পরশুরাম যে সামান্য আংশিক অবতার, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; যদিও উক্ত পরশুরাম-অবতার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল সংঘটিত হয় নাই বটে, তথাচ পরশুরাম সেই সর্ব্বন্যায়-মঙ্গল-ময়ের অবতারের অগ্রসূচী আংশিক অবতার-গণনীয়। আশুদৃষ্টিতে পরশুরাম মঙ্গলের অবতার না হইয়া বরং অমঙ্গলের অবতার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন; কারণ ক্ষত্রিয়গণই ভারতের রক্ষক ও পালক ছিলেন, তাঁহাদের ধ্বংসে সমাজ বিশৃঙ্খল ও ভারতের প্রভূত বলহানি হইয়াছিল। আর্য্যগণের বলহানি ও দুর্দ্দৈবকালে পূর্ব্ব-বিতাড়িত দাক্ষিণাত্যের প্রান্তবাসী ও দ্বীপনিবাসী নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ (রাক্ষস) যে পুনরুত্থিত ও ভয়ঙ্কর বলশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও আর্য্যাবর্ত্তের স্থানে স্থানে বন-ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপনপূর্ব্বক আর্য ভূমি কলুষিত, বিধ্বস্ত ও আর্য জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, মহর্ষি বাল্মীকির অমৃতনিস্যন্দিনী-লেখনী-নির্গত পুণ্যময় রামায়ণই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

সাংখ্যদর্শন।

—০:০:০—

(গত আশ্বিনের পত্রিকার ১৫৮ পৃষ্ঠার পর)

দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্বপ্রমাণ সিদ্ধত্বাৎ।
ত্রিবিধম্প্রমাণামিষ্টম্প্রমেয়সিদ্ধিঃপ্রমা-
ণাদ্ধি॥ ৪।

পদপাঠঃ—দৃষ্টম্। অনুমানম্। আপ্তবচনম্। চ। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধম্। প্রমাণম্। ইষ্টম্। প্রমেয়সিদ্ধিঃ। প্রমাণাৎ। হি।

ব্যাখ্যা—দৃষ্টম্—প্রত্যক্ষ। অনুমানম্—অনুমান। আপ্তবচনম্—ঋষিবাক্য। চ—সমুচ্চয়ে। সর্ব্বপ্রমাণ-সিদ্ধত্বাৎ—সকল প্রকার প্রমাণই এই ত্রিবিধ প্রকারে সিদ্ধ হয় বলিয়া। ত্রিবিধম্—তিন প্রকার। প্রমাণং—প্রমাণ। ইষ্টম্—পর্য্যাপ্ত। হি—কেননা। প্রমেয়-সিদ্ধিঃ—যাহা প্রামাণ করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ। প্রমাণাৎ—প্রমাণ হইতেই হয়।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন (ঋষিবাক্য), এই ত্রিবিধ প্রমাণই পর্য্যাপ্ত, কেননা যাবতীয় প্রমাণই এই তিনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। প্রমাণ দ্বারাই প্রমেয়-সিদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রতি বিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমান-
মাখ্যাতম্।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্ত বচনন্তু॥৫

পদপাঠঃ—প্রতি-বিষয়-অধ্যবসায়ঃ। দৃষ্টং। ত্রিবিধং। অনুমানং। আখ্যাতম্। তৎ। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং। আপ্তশ্রুতিঃ। আপ্তবচনং। তু।

ব্যাখ্যা—প্রতিবিষয়-অধ্যবসায়ঃ—প্রতি বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষহেতু যে জ্ঞান। দৃষ্টং—তাহাই দৃষ্ট। ত্রিবিধং—তিন প্রকার। অনুমানম্—অনুমান। আখ্যাতম্—কথিত হইতেছে। তৎ—সেই অনুমান। লিঙ্গ-লিঙ্গিপূর্ব্বকং—যাহার পূর্ব্বে লক্ষণ এবং লক্ষণ-যুক্ত পদার্থ আছে। আপ্ত-শ্রুতিঃ—ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-শূন্য যে বাক্য। আপ্তবচনং—তাহাকে আপ্তবচন বলে। তু—ও।

বঙ্গার্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হওয়াতে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অনুমান ত্রিবিধ—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, এবং সামান্যতঃ দৃষ্ট। ঐ অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে। প্রথমে সামান্য লক্ষণের জ্ঞান, তৎপরে, ঐ সামান্য লক্ষণ যে বিশেষস্থলে প্রযোজ্য, তাহার জ্ঞান, এবং এই দুই জ্ঞানের সংযোগের দ্বারাই অনুমান হয়। ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশূন্য শ্রুতি-বচনই আপ্তবচন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অনুমান ত্রিবিধ; প্রথমতঃ পূর্ব্ববৎ, যথা আকাশে মেঘ দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, আমার এই জ্ঞান আছে, তৎপরে মেঘ দেখিতেছি, অতএব বৃষ্টির অনুমান করিতে পারি; এস্থলে কারণ-মেঘ হইতে কার্য্য-বৃষ্টির অনুমান করা হইল; শেষবৎ—যথা—জলবৃদ্ধি দেখিয়া বৃষ্টির অনুমান; এস্থলে কার্য্য জলবৃদ্ধি হইতে কারণ-বৃষ্টির অনুমান করা হইল; সামান্যতঃ দৃষ্ট যথা—এক পদার্থ পূর্ব্বে অবগত আছি, সেই পদার্থের ন্যায় অন্য পদার্থ দেখিয়া, শেষে যে পদার্থ দেখিলাম, তাহা যে প্রথমে যে পদার্থ দেখিয়াছি, তাহার সহিত এক জাতীয়, এইরূপ অনুমানকে সামান্যতঃ দৃষ্ট কহে। গুণের সামান্য দৃষ্টি করিয়া এই অনুমান হয়।

প্রত্যেক অনুমানে পঞ্চ অবয়ব থাকে—যথা (১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু বা অপদেশ, (৩) উদাহরণ বা নিদর্শন (৪) উপনয় (৫) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা—পর্ব্বত বহ্নিমান।
হেতু—পর্ব্বত ধূমবান।
নিদর্শন—যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি।
উপনয়—পর্ব্বত ধূমবান।
নিগমন—অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্।

কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে অবয়ব তিনটিও হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথম তিনটি অথবা শেষ তিনটি। ধূম দেখিতেছি মাত্র, ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করিতে হইবে, কিন্তু ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান কিরূপে হইবে? যে স্থলেই আমি ধূম দেখিয়া থাকি, সেই স্থলেই যদি বহ্নি দেখিয়া থাকি, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা যায়; সুতরাং যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি, এই মান করিলাম, উহা বহ্নিমান; পর্ব্বতের বহ্নিমত্তা প্রত্যক্ষজ্ঞান নহে, উহা ধূম দর্শনে অনুমিত হয়। পঞ্চ অবয়ব নিষ্প্রয়োজন, কারণ দৃষ্ট হইবে যে, প্রথম দুইটি এবং শেষ দুইটি অবয়ব একই। পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রেও তিনটি মাত্র অবয়ব প্রচলিত। মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, অনুমানের পূর্ব্বে লিঙ্গ এবং লিঙ্গী থাকে; এই লিঙ্গ এবং লিঙ্গী কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য—মর্ত্ত্য বা মরণশীল।
রাম—মনুষ্য।
অতএব—রাম মর্ত্ত্য।

এস্থলে প্রথমে ভূয়োদর্শনের দ্বারা আমি স্থির করিয়াছি যে, মনুষ্য মর্ত্ত্য; যদি কেহ অমর মনুষ্য দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার অনুমান ভ্রমাত্মক হইবে। কিন্তু যদি সকল মনুষ্যই মরণধর্ম্মশীল, একথা ঠিক হয়, এবং কুত্রাপি তাহার ব্যভিচার দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলে রাম নামক ব্যক্তিরও অবশ্য মরিতে হইবে, ইহা নিশ্চয়। এখানে আমি অনুমান করিতে চাই যে—রাম মর্ত্ত্য। কিসের দ্বারা আমি এ অনুমান করি? না যেহেতু রাম মনুষ্য। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে, এ সিদ্ধান্ত আমি কোথায় পাইলাম? না মনুষ্যমাত্রেই মরিয়া থাকে। সুতরাং রাম মর্ত্ত্য, এই হইল আমার প্রতিজ্ঞা (proposition); রাম মনুষ্য, এই হইল আমার হেতু (reason) মনুষ্য মর্ত্ত্য, এই হইল আমার উদাহরণ বা নিদর্শন। (instance or example)

রাম মর্ত্ত্য (প্রতিজ্ঞা)
রাম মনুষ্য (হেতু)
মনুষ্য মর্ত্ত্য (উদাহরণ)

এইরূপ যদি উদাহরণ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধদিকে যাই, তাহা হইলে—

মনুষ্য মর্ত্ত্য—(উদাহরণ)

রাম মনুষ্য—উপনয় (application of the reason.)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য—নিগমন (conclusion)

মনুষ্য মর্ত্ত্য (Major premiss)

রাম মনুষ্য (Minor premiss)

(অতএব) রাম মর্ত্ত্য (conclusion)

এইক্ষণে দেখুন "মর্ত্ত্য" "মনুষ্য" অপেক্ষা বৃহত্তর, অর্থাৎ মনুষ্য ব্যতীত জগতে মর্ত্ত্য আরও অনেক আছে, সুতরাং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্ত। এ "মর্ত্ত্য" ন্যায়ের "ব্যাপক" এবং "মনুষ্য" "ব্যাপ্য"—অর্থাৎ "মর্ত্ত্য" "মনুষ্যকে" ব্যাপ্ত করিয়াছে, এবং "মনুষ্য" "মর্ত্ত্য" দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ব্যাপ্যের আর এক নাম "সাধ্য"। মনুষ্য রামের মর্ত্ত্যতাই আমার প্রমাণ করিতে হইবে বা উহাই আমার 'সাধ্য', কিন্তু কি উপায় দ্বারা প্রমাণ করিব? না "রাম" "মনুষ্য"; অতএব "ব্যাপ্য" 'মনুষ্য' হইল "সাধন" বা উপায় বা "হেতু"। এই "হেতু"কে লিঙ্গও বলা যায়, কারণ "রামেতে" "মনুষ্য"-রূপ "লিঙ্গ" বা লক্ষণ থাকাতেই, আমি তাহার "মর্ত্ত্যতা" সিদ্ধ করিলাম; অতএব "লিঙ্গ" "হেতু", "ব্যাপ্য", "সাধন", একই কথা, আর "মর্ত্ত্য" "লিঙ্গী", কারণ "মর্ত্ত্যে" লিঙ্গ আছে, অর্থাৎ "মর্ত্ত্যের" অন্তর্ভুক্তই "মনুষ্য" রূপ "লিঙ্গ"।

যে পাঠক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র (Logic) পড়িয়াছেন, তিনি জানেন যে, প্রত্যেক Syllogismএ Major term (predicate of the conclusion) Minor term (subject of the conclusion) middle term (the term connecting the major and minor terms) আমাদের ন্যায়শাস্ত্র Major termকে সাধ্য, ব্যাপক বা লিঙ্গী বলে, এবং Minor termকে "পক্ষ" (সংদিগ্ধ সাধ্যবান) এবং middle termকে লিঙ্গ, হেতু, ব্যাপ্য বা সাধন বলে। মনুষ্য মর্ত্ত্য, রাম মনুষ্য, অতএব রাম মর্ত্ত্য; এস্থলে মর্ত্ত্য সাধ্য লিঙ্গী বা ব্যাপক Major trem; সাধন, হেতু বা লিঙ্গ middle trem, এবং রাম পক্ষ minor trem. সাধ্য বা ব্যাপক সাধন বা হেতু অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং সাধন বা হেতু পক্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। উপরোক্ত উদাহরণে সাধ্য-মর্ত্ত্য হেতু মনুষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং হেতু-মনুষ্য পক্ষ-রাম হইতে বৃহত্তর। মর্ত্ত্য মনুষ্য অপেক্ষা অনেক অধিক, মনুষ্যও রাম অপেক্ষা অনেক অধিক। অনুমানকে "লিঙ্গ-লিঙ্গি-পূর্ব্বকং" বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারাই "পক্ষ"ও বুঝাইতেছে।

যে স্থলে ধূম, সেই স্থলে বহ্নি,—
পর্ব্বত ধূমবান,—
অতএব পর্ব্বত বহ্নিমান্।

এস্থলে বহ্নি সাধ্য Major trem, ধূম—হেতু Middle trem, এবং পর্ব্বত পক্ষ minor trem. ন্যায়ের মতে প্রমাণ চতুর্ব্বিধ—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান (৩) উপমান (৪) শাব্দ। বেদান্তের মতে ঐ চারিটি ব্যতীত 'অর্থাপত্তি"ও "অভাব" প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। দেবদত্ত দিনে খান না, অথচ তাঁহাকে পুষ্ট দেখা যায়, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি রাত্রিতে খান। এই হইল "অর্থাপত্তি"; আকাশে কুসুম থাকিতে পারে না, এই হইল "অভাব"। উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, এগুলি বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের

অন্তর্ভুক্ত। কপিলের মতে প্রমাণ ত্রিবিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন বা শ্রুতি। কপিল কথনও শ্রুতির অবমাননা করেন নাই।

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।

তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্ ॥৬

পদপাঠঃ—সামান্যতঃ। তু। দৃষ্টাৎ। অতীন্দ্রিয়াণাং। প্রতীতিঃ। অনুমানাৎ। তস্মাৎ। অপি। চ। অসিদ্ধং। পরোক্ষং। আপ্ত। আগমাৎ। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা—সামান্যতঃ—সামান্যের—অর্থাৎ ভৌতিক জগতের। দৃষ্টাৎ—দর্শন—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হইবে। অতীন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সমূহের। প্রতীতিঃ—জ্ঞান। অনুমানাৎ—অনুমান হইতে। তস্মাদপি—তাহা হইতেও। অসিদ্ধং—অনির্দ্ধারিত। পরোক্ষং—যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আপ্তাগমাৎ—আপ্ত আগম হইতে। সিদ্ধম্—সিদ্ধ।

বঙ্গার্থ—প্রত্যক্ষ দ্বারা ভৌতিক জগতের জ্ঞান হয়, অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান হয়, এবং অপ্রত্যক্ষ যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান এবম্প্রকারে সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্তবচন দ্বারা সিদ্ধ হয়। (অতীন্দ্রিয় বলিতে কেবল ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য বস্তু বুঝায় না; যাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে রহিয়াছে, অর্থাৎ কোন কারণে প্রত্যক্ষ হইতেছে না, (যেরূপ পর্ব্বতের বহ্নি) তাহাও বুঝায়।

অতি দূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।

সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥৭

পদপাঠঃ—অতি দূরাৎ। সামীপ্যাৎ। ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ। মনসঃ। অনবস্থানাৎ। সৌক্ষ্ম্যাৎ। ব্যবধানাৎ। অভিভবাৎ। সমানাভিহারাৎ। চ।

বঙ্গার্থ—অত্যন্ত দূরত্ব, অত্যন্ত নিকটত্ব, ইন্দ্রিয়ধ্বংস, (অন্ধত্ব, বধিরত্ব, ইত্যাদি), মনের অনবস্থান বা অমনোযোগ, পদার্থের সূক্ষ্মতা, অন্য পদার্থের ব্যবধান, (অন্য পদার্থের যদি মধ্যে অবস্থিতি হয়) অন্য পদার্থের প্রাবল্য, এবং সমান বস্তুর সহিত মিশ্রণ, এই সকল হেতুতে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে।

বিশেষ ব্যাখ্যা—যে সমুদায় পদার্থ প্রত্যক্ষীকৃত করা যায় না, তাহা অনুমানের দ্বারা, এবং অনুমানের দ্বারা যাহার প্রতীতি হয় না, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। কিরূপস্থলে পদার্থ প্রত্যক্ষ করা যায় না, এখানে তাহাই বলা হইতেছে। দূরে পর্ব্বত রহিয়াছে, এবং ঐ পর্ব্বতে দাবাগ্নি হইয়াছে, দূরত্ববশতঃ তাহা দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ঐ অগ্নিসম্ভূত ধূম দ্বারা তাহার অনুমিতি হইতেছে। আকাশমণ্ডলে পক্ষী উড্ডীন হইল, ক্রমে উহা এত উর্দ্ধে উঠিল, যে উহাকে আর দেখা গেল না। কিছুকাল পরেই পক্ষী যখন অবতরণ করিতে লাগিল, তখন আবার উহাকে দেখা যাইতে লাগিল। পক্ষী যে অদৃশ্য হইল, সে কেবল দূরত্বহেতু এবং এই অদৃশ্য অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অতি দূরত্বহেতু পদার্থ যেরূপ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত নৈকট্যজন্যও পদার্থ অদৃশ্য হইয়া থাকে; যেমন লোচনস্থ অঞ্জন দেখা যায় না। অন্ধতা, বধিরতা প্রভৃতি কারণে পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। মনের চাঞ্চল্য বা অমনোযোগ

প্রভৃতি কারণে সন্নিকটবর্ত্তী পদার্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুর সূক্ষ্মত্ব-হেতুও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেমন আকাশ-মণ্ডলে ভাসমান সূক্ষ্ম ধূলিকণা সকল দৃষ্টি-গোচর হয় না; সূক্ষ্মত্ব হেতু পরমাণু দেখা যায় না। অন্য কোন পদার্থ মধ্যে থাকিলেও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হয়। সূর্য্যরশ্মির প্রাবল্য হেতু দিবসে নক্ষত্রাদি দৃষ্ট হয় না। জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইলে, জলের স্বতন্ত্র সত্তা দৃষ্ট হয় না। এই সমুদায় স্থলে অনুমানের দ্বারা বস্তুর সত্তা সিদ্ধ করিতে হয়।

সৌক্ষ্ম্যাত্তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎ কার্য্যতস্ত-দুপলব্ধেঃ।
মহদাদি তচ্চ কার্য্যম্প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ॥৮।

পদপাঠঃ—সৌক্ষ্ম্যাৎ। তৎ। অনুপ-লব্ধিঃ। ন। অভাবাৎ। কার্য্যতঃ। তৎ। উপলব্ধেঃ। মহৎ। আদি। তৎ। চ। কার্য্যম্। প্রকৃতি সরূপং। বিরূপং। চ।

ব্যাখ্যা—সৌক্ষ্ম্যাৎ—সূক্ষ্মত্বহেতু। তৎ অনুপলব্ধিঃ—প্রধান বা প্রকৃতির অনুপলব্ধি হয়। ন অভাবাৎ—অভাব বা অনস্তিত্ব হেতু নহে। কার্য্যতঃ—কার্য্য হইতে। তৎ উপলব্ধেঃ—প্রধান বা প্রকৃতির উপলব্ধি হয় বলিয়া। মহদাদি—বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি। তৎ কার্য্যম্—সেই কার্য্য। প্রকৃতি সরূপং বিরূপং চ—এই কার্য্য প্রকৃতির সরূপ ও বিরূপ, উভয়ই।

বঙ্গার্থ—সূক্ষ্মত্ব বশতঃ প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতির অস্তিত্ব নাই বলিয়া যে উপলব্ধি হয় না, তাহা নহে; কারণ ইহার কার্য্য দ্বারা ইহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। বুদ্ধি আদি ইহার কার্য্য, এবং ইহারা প্রকৃতির সদৃশও বটে, বিসদৃশও বটে।

বিশেষ ব্যাখ্যা - তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, মূল-প্রকৃতি অনুৎপন্না এবং মহৎ বা বুদ্ধি—অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা ঐ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; অর্থাৎ মহৎ মূল-প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, অহঙ্কার মহৎ হইতে উৎপন্ন এবং পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। পঞ্চতন্মাত্রা হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি। ভগবান্ কপিল বলিতেছেন যে, সূক্ষ্মত্বহেতুই এই প্রধানের উপলব্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়দিগের অসম্পূর্ণতা এবং অন্যান্য কারণে আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বাধা হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে অনুমানের সাহায্যেই আমরা সেই সমুদয় বস্তুর সত্তা নিরূপণ করিতে পারিয়া থাকি। আমরা যে বাহ্য জগৎ দেখিতে পাই, উহা ব্যক্ত অবস্থা, এবং এই ব্যক্ত অবস্থা হইতে যুক্তি দ্বারা আমরা উহার অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হই,—অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণে উপনীত হই। কপিল এই জগতের আদি অবস্থাকে প্রকৃতি বা প্রধান নামে অভিহিত করেন। তাঁহার মতে, যেমন বৃক্ষ বীজে নিহিত আছে, তদ্রূপ এই জগৎ মূল-প্রকৃতিতে নিহিত আছে। এক পক্ষে বীজে ও বৃক্ষে কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ কার্য্যে ও কারণে কোন প্রভেদ নাই, কারণ বৃক্ষ বীজের পরিণাম মাত্র; অন্য পক্ষে দেখিলে, বীজ বৃক্ষ হইতে স্বতন্ত্র, কারণ ভবিষ্য-বৃক্ষ বীজে নিহিত থাকিলেও বীজ বৃক্ষ নহে। কপিল নিমিত্ত-কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। মৃত্তিকা হইতে কুম্ভকার যেমন ঘট প্রস্তুত করে, তদ্রূপ এই জগৎ কেহ নির্ম্মাণ করেন নাই। কপিলের

মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমাদের বাহ্য বস্তুর [illegible] হয়; মন সেই জ্ঞান অহঙ্কারের নিকট উ[illegible]; [illegible] তাহা[illegible] বুদ্ধির নিকট [illegible] উহাকে পুরুষের [illegible] তখন বুদ্ধি[illegible] [illegible]তের [illegible] প্রাপ্ত হয়েন; পুরুষ [illegible] প্রকৃতির [illegible] স্বীয় বৈষম্য দেখি[illegible] এই জন্য [illegible] সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই [illegible] কবিলা মুক্তি প্রা[illegible]।

গীতাভাষ্য।

—•:০:•—

পঞ্চম অধ্যায়।

জাতিভেদ।

সাধারণতঃ কাহার কি কার্য্য করিতে হইবে, হিন্দু-শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিগত; প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া কর্ম্ম করিবার কাহারও সাধ্য নাই; "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবো মুর্দ্ধি বর্ত্ততে"। এই প্রকৃতি-বিচার দ্বারা শাস্ত্রে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এবং কর্ত্তব্যানুসারেই জাতিভেদের উৎপত্তি; অতএব জাতিভেদ স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ।

"আমি গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণ্য—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি।" ভগবান্ চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, তিনি মানব-সমাজে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, কালসহকারে সেই শক্তি-প্রভাবে সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত হইতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় ব্যক্তি-সমষ্টি সমাজেরও বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা আছে। সমাজের যখন বাল্যাবস্থা, তখন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপুষ্ট হয় না; তখন শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ থাকে না; যে যাহা করিতে ইচ্ছা করে বা করিতে সক্ষম হয়, সে তাহাই করে; তখন সমাজ-শক্তির কেবল মাত্র অস্ফুটভাবে বিকাশ হইতে থাকে। সমাজের যখন যৌবনাবস্থা, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল বলিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে; তখন আপনাহইতে শ্রম ও কর্ত্তব্যের বিভাগ হইয়া বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই নিয়মানুসারেই হিন্দু সমাজের যৌবনাবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণের উৎপত্তি; এবং অন্যান্য সমাজেও শ্রম-বিভাগের সহিত শ্রেণী-বিভাগের উদ্ভব। এমন উন্নত সমাজ নাই, যেখানে সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের শ্রেণী-বিভাগ নাই; শ্রেণী-বিভাগ ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই,—সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চারি বর্ণের উদ্ভব, ইহার তাৎপর্য্য নিম্নে বিবৃত করা হইতেছে।

প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ প্রকৃতির তিনটী গুণ, যথা—সত্ব, রজঃ ও তম; এই তিন গুণে জগতের সৃষ্টি। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি যাহা কিছু প্রসব করেন, তাহাতেই এই ত্রিগুণের অংশ থাকে; বিশ্বস্থ সমস্ত পদার্থই বিশ্বমাতা প্রকৃতির এই তিনটী গুণ উত্তরাধিকারিত্ব-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব গুণত্রয় মনুষ্যেও বর্ত্তমান আছে; কিন্তু সকলেই সমানাংশে ইহার অধিকারী নহে: অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেতেই একই পরিমাণে

এই গুণত্রয় পরিদৃষ্ট হয় না। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ; দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্গুণ ইহা হইতেই উদ্ভূত; রজোগুণ মধ্যম, যশোলিপ্সা, ধনাকাঙ্খা প্রভৃতি এই গুণের কার্য্য; তমোগুণ নিকৃষ্ট, পরাপকার, অসদুপায়ে ধনার্জ্জন, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি তমোগুণ-প্রসূত। এই তিনটী গুণ সমানাংশে কোন সাবয়ব পদার্থেই অবস্থান করে না; কোন না কোনটীর বা কোন দুইটীর প্রাবল্য ঘটিয়াই থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রে এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য বিচার করিয়াই চারি বর্ণের উৎপত্তি; যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা সত্ত্বরজঃ-প্রধান, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; যাঁহারা রজস্তমঃ-প্রধান, তাঁহারা বৈশ্য; আর যাহারা তমঃপ্রধান, তাহারা শূদ্র।

যাহার প্রকৃতিতে যে যে গুণের প্রাবল্য, তাহার তদনুরূপ হৃদয়-বৃত্তি; যাহার যেরূপ বৃত্তি, প্রকৃতিবশে তাহাকে তদনুরূপ কর্ম্মই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান, অতএব ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, পরোপকার, ধন প্রভৃতি পার্থিব বিভবে বিতৃষ্ণা, সামান্য অশন-বসনে পরিতৃপ্তি, এবং শম দম প্রভৃতি গুণানুশীলন। ক্ষত্রিয় রজঃ ও সত্ত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, রাজ্যভোগ, বীরত্ব-প্রকাশ, শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ-রক্ষা, যশোলিপ্সা এবং প্রভুতা। বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণ-প্রধান, বৈশ্যের কর্ত্তব্য শাস্ত্রাধ্যয়ন, কৃষি-বাণিজ্য ও অর্থাহরণ ইত্যাদি। শূদ্র তমঃপ্রধান, শূদ্রের কর্ত্তব্য দ্বিজাতির সেবা, কৃষি প্রভৃতির সাহায্যেই দাসত্ব-স্বীকার। গুণানুসারে শূদ্র শিশুর ন্যায় রক্ষণীয়। শূদ্র স্বাধীনভাবে চলিতে অক্ষম; উচ্চ শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত শূদ্রের প্রতিপদেই পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা, সেই জন্যই দ্বিজাতির সেবাই শূদ্রের এক মাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত। সমাজে শূদ্রকে এরূপ নিম্নস্থান অর্পণ করাতে অনেকেই এখন ভাবিয়া থাকেন, শূদ্রের প্রতি অযথা আচরণ করা হইয়াছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, শূদ্রের প্রকৃতি অনুসারে উক্ত প্রাচীন ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কল্যাণকর। এইরূপে গুণানুসারে প্রত্যেক বর্ণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্যগুলি যতদিন বিধিমতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ততদিন সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলি অক্ষুণ্ণ ছিল,—ততদিন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সমাজের উন্নতির জন্য উক্ত চারি বর্ণের চতুর্ব্বর্ণোচিত কর্ম্মের নিতান্ত প্রয়োজন; ইহার যে কোনটী বিলুপ্ত হইলে, সমাজ ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব বর্ণ-বিভেদ সামাজিক মঙ্গলের কারণ, এবং ইহা স্বাভাবিক নিয়ম; অধুনা হিন্দুসমাজে এ নিয়ম বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্য সমাজের দুরবস্থাও ঘটিয়াছে, ইহাও স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত। হিন্দু-সমাজের এখন বৃদ্ধাবস্থা, বাল্যাবস্থার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই বর্ণগত বিভ্রাট সমুপস্থিত। গুণ ভেদেই বর্ণভেদ, এবং বর্ণভেদেই কর্ত্তব্য-ভেদ; অতএব স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্যেই ব্যক্তিমাত্রেরই অধিকার, এবং তদনুষ্ঠানেই ব্যক্তিগত উন্নতি; ইহার অন্যথা করিলেই অবনতি অনিবার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

"উত্তম অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম

স্বধর্ম্মও শ্রেয়। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।" যাহার যে কার্য্য, সে তাহাই করিবে; ন্যায়-যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম, অহিংসাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; যুদ্ধে জীবহত্যা—নরহত্যা করিতে হয় বলিয়া ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণোচিত অহিংসা-পরতন্ত্র হইয়া যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য-বিমুখতা-নিবন্ধন নরকগামী হইবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবক-বৃন্দের নিকট জাতিভেদ-প্রথা নিতান্ত ন্যায়-বিগর্হিত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এ প্রথা সামাজিক শক্তির বিকাশে সমুদ্ভূত, কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য নহে। প্রথাটীও বস্তুতঃ কুফল-প্রসবিনী নহে; তাহা হইলে প্রাচীন আর্য্যেরা কদাচ তাদৃশ সামাজিক উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হইতেন না। জাতিভেদ-প্রথা আর্য্য-সমাজের উৎকর্ষের মূলে অবস্থিত; কিন্তু প্রথাটী অধুনা বিলক্ষণ ভ্রষ্ট হইয়াছে,—ইহার আর সেরূপ সদুদ্দেশ্য নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জাতিভেদ গুণগত; গুণোৎকর্ষেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বর্ণ, কেননা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণ আছে,—ব্রাহ্মণ সত্ত্ব গুণে মণ্ডিত। ব্রাহ্মণ যদি রজস্তমোগুণাভিভূত হয়েন, তবে আর তিনি ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য নহেন। এখন আর সে অবস্থা নাই; এখন অনেক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই শুদ্ধ যজ্ঞোপবীতের বলে আপনাদিগের উৎকর্ষ ভাণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহা-দিগের আর ব্রাহ্মণ-বৃত্তি দেখা যায় না। যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই [illegible] ব্রাহ্মণ, আর যিনি সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই সাধন-পথে সত্ত্বগুণাবলম্বনে অগ্রসর, তিনিও গৌণতঃ ব্রাহ্মণ, কিন্তু তদ্ভিন্ন শুধু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না। গৌতম সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

"শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং
জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষা শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-নির্দ্দেশ-স্থলে ভূরি২ শাস্ত্রে এই জাতীয় ভূরি২ উক্তি রহিয়াছে;—অধিক উদ্ধৃতির আড়ম্বর অনাবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্মজ্ঞান।

আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনের ক্ষমতা আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। আমি কি? এই প্রশ্ন-মূলে আত্মজ্ঞানের আরম্ভ। 'আমি আছি' এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, আমার অস্তিত্বে আমার দৃঢ় বিশ্বাস! কিন্তু 'আমি কি থাকিব?' এই প্রশ্নের উত্তরে অসন্দিগ্ধচিত্তে কাহাকেও 'হাঁ' বা 'না' বলিতে শুনা যায় না। প্রশ্নটী—অতি দুরূহ, সন্দেহ নাই, কিন্তু আর্য্য-দর্শনের সূক্ষ্ম গবেষণায় এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন—"হাঁ, তুমি থাকিবে"। তুমি বলিতে পার "আমি কেমন করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিব? আমি যদি থাকিব, তবে আমি মরিয়া যাই কেন? এ সংসারে কেহ ত চিরদিন থাকেনা,—সকলকেই মরিতে হয়; তবে আমি থাকিব কিরূপে?" সত্য কথা, জন্মের পর মরণ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারাতেই 'আমি মরি' এই মহাভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। আমি কে?

আমি কি আমার দেহকে 'আমি' বলিব ? সাধারণ-বুদ্ধিতে আমার দেহকে 'আমি' শব্দে বাচ্য করিয়া থাকি বটে, কিন্তু আমার দেহ আমার আশ্রয়-গৃহ মাত্র, আমি অবিনশ্বর আত্মা। আমি মরি না, আমার দেহ মরে, আমার গৃহ নষ্ট হইয়া যায়; আমি আবার নূতন গৃহে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। শ্রীকৃষ্ণ অতি উত্তম উপমায় মৃত্যুর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন ; তিনি বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

"যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ আত্মা (দেহী) জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়।„

আত্মা সত্য বস্তু, ইহার জন্ম-মৃত্যু নাই। আত্মা অস্ত্রে ছিঁড়ে না, অগ্নিতে পোড়ে না, জলে পচে না, বায়ুতে শুকায় না, আত্মার অবস্থান্তর নাই। এই অবিনাশী আত্মাই আমি ; অতএব আমি পূর্ব্বেও ছিলাম, নতুবা আসিলাম কোথা হইতে ? আবার নিশ্চয়ই চিরদিন এ দেহে রহিব না,—অন্য দেহকে আশ্রয় করিতে হইবে ; কিন্তু কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা এখন আমি জানি না, তাহা আমার সংপূর্ণ অগোচর। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত-নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

হে ভারত, ভূত সকল অব্যক্তাদি—অর্থাৎ উৎপত্তির পর প্রকাশ্য, এবং অব্যক্ত-নিধন—অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অপ্রকাশ্য হয় ; অতএব তাহাতে পরিদেবনা কি ? অর্থাৎ ইহা কদাচ শোকের বিষয় নহে। যাঁহারা এই তত্ত্ব অবগত নহেন, যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অজ্ঞানতা ও মোহবশতঃ মৃত্যুতে শোক করিয়া থাকেন। বাস্তবিক মৃত্যু শোকের বিষয় নহে ; ইহা কৌমার, যৌবন ও জরার ন্যায় দেহের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। তত্ত্ব-দর্শীগণ যাহা সৎ—অর্থাৎ যাহা সত্য, যাহার রূপান্তর নাই, ও যাহা অসৎ—অর্থাৎ যাহা অনিত্য, যাহা চিরকাল এক ভাবে অবস্থিত নহে, এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিয়া ও আত্মার নিত্যত্ব উপলব্ধি করিয়া, মৃত্যু প্রভৃতি ভৌতিক পরিবর্ত্তনে দুঃখ বা শোকপ্রাপ্ত হয়েন না।

আত্মতত্ত্ব, জ্ঞান-জলধি-নিহিত সাররত্ন। ইহার আহরণ করা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। যিনি সেই জলধিতে সন্তরণ দিতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহার সে রত্ন অন্বেষণের মাত্র অধিকার জন্মিয়াছে ; আর যিনি সেই জলধি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস নিগ্রহ করতঃ তদবস্থ হইয়া কিছুকাল থাকিবার অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই সেই রত্ন প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন ; আর যাঁহারা কেবল মাত্র সেই জলধি-তীরে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা এখনও সে রত্নের অস্তিত্বেরও সন্ধান প্রাপ্ত হয়েন নাই ! যাঁহারা তত্ত্বান্বেষণে জ্ঞান-জলধিতে সন্তরণ দিতেছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নাবলির উদয় হয়,—"আমি কে ? কেন এই ধরাধামে আসিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছি ? যদি আসিলাম, তবে ইহা পরিত্যাগ করিয়া আবার যাই কেন, এবং কোথায় যাই ?" মানব-জীবনের

ইহাই অতি গূঢ় রহস্য; এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু জ্ঞান ও যুক্তিবলে আর্য্যশাস্ত্র ইহার যেরূপ সূক্ষ্ম মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সেরূপ আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

'অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং', জগতের মূল-কারণ ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মের অংশ জীবরূপে প্রত্যেক দেহকে অধিকার করিয়া ভোক্তা-রূপে বর্ত্তমান আছেন। দেহ ও দেহাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাংশ বা আত্মা লইয়া 'আমি'। প্রথমের নাম ক্ষেত্র ও দ্বিতীয়ের নাম ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভেদ বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহার নাম বিবেক। দেহ ক্ষেত্র নামে কেন অভিহিত হইয়াছে? দেহ হইতেই সংসারের প্ররোহত্ব—অর্থাৎ দেহ হইতে উৎপত্তিজন্য সংসারের স্থিতি, এ নিমিত্ত দেহের নাম ক্ষেত্র। অহঙ্কার বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয়, শব্দাদি পঞ্চ বিষয়, ও ভূম্যাদি পঞ্চমহাভূত, ইহাদিগের সমবায়ে দেহ গঠিত। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম। অতএব ক্ষেত্রের—অর্থাৎ দেহের স্বরূপ কি, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্ষেত্রজ্ঞ কি? ক্ষেত্রজ্ঞ চিদংশ, ইহা দেহাধিষ্ঠিত জীবাত্মা। ইনি কৃষিবলের ন্যায় ক্ষেত্রোৎপন্ন সুখ-দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা বলিয়া ইহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। বস্তুতঃ ব্রহ্মই ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত আছেন। অমানিত্ব (স্বগুণ-শ্লাঘারাহিত্য), অদাম্ভিত্ব, অহিংসা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ আত্মার। এখন আভাস পাইলাম, আমি কে; ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অংশ পুরুষ বা আত্মা উভয়ে মিলিত হইয়া যে পরিচ্ছিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন, তাহাই "আমি" শব্দের বাচ্য। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, ও তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত; প্রকৃতিই তাহাদিগের কর্ত্রী। প্রকৃতি স্বয়ং জড় হইলেও পুরুষের বা চিদংশের সান্নিধ্য-বশতঃ তাহার কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি-কৃত কর্ম্মের ভোক্তা। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, পুরুষ যখন ঈশ্বরের অংশ, আত্মা যখন নির্লিপ্ত ও অবিকারী, তখন কিরূপে সুখ-দুঃখরূপ বিকার তাঁহাকে অধিকার করিবে? কিরূপে পুরুষ তাহাদিগের ভোক্তা হইবেন? সত্য, আত্মা স্বয়ং অবিকারী ও স্বচ্ছ, তাঁহাতে কিছুমাত্র মলিনতা নাই; কিন্তু প্রকৃতির সান্নিধ-হেতু আত্মাকে মালিন্য বা বিকার স্পর্শ করিতে পারে। যেরূপ শ্বেত ও স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে জবা পুষ্প রাখিলে, স্ফটিকও জবা পুষ্পের লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতির বিকার পুরুষকেও বিকৃতবৎ করিতে পারে। অতএব পুরুষের ভোক্তৃত্ব ইহাতেই সম্ভব।

মন সুখ-দুঃখের ভোক্তা বলিয়া আপাততঃ ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেন না, সূক্ষ্ম দেহের সহিত মনের ধ্বংস হয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে, অর্থাৎ তাহা আর তদ্রূপে চির অবস্থিতি করে না; বিনাশের ইহাই অর্থ। জগতে যাহা কিছু আছে, প্রকৃতি যাহা কিছু প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একেবারে ধ্বংস নাই; কেন না প্রকৃতি অনন্ত ঈশ্বরের শক্তি; অতএব প্রকৃতিও অনন্ত! পরিদৃশ্যমান বস্তুজাত সেই প্রকৃতিরই বিকার; অতএব তাহাদিগের অবস্থান্তর

ঘটিতে পারে, কিন্তু বিধ্বংস অসম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, "Matter is indestructible" অতএব মনের যখন বিনাশ হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ কে ভোগ করে? অবিনাশী আত্মা বা পুরুষই সেই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। মনকে বড়-জোর তাঁহার সুখ-দুঃখ-ভোগের যন্ত্র বলা যায়। এক্ষণে কর্ম্ম সূত্রের কথা আসিয়া উপস্থিত হইল। গীতায় উক্ত হইয়াছে——

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণ-সঙ্গোহস্য সদসদ্ যোনি-জন্মসু ॥

"পুরুষ প্রকৃতিতে—অর্থাৎ তৎকার্য্য দেহে অবস্থিত হওয়াতে, প্রকৃতিজনিত সুখ-দুঃখাদি গুণ সকল ভোগ করেন; আর এই পুরুষের দেবাদি সৎ যোনি ও তির্য্যগাদি অসৎ-যোনিতে যে জন্ম হয়, শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়রূপ গুণের সংসর্গই তাহার কারণ" ইন্দ্রিয় সকল করণ, ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা শুভাশুভ ও সদসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। কর্ম্ম মাত্রেরই ফল অবশ্যম্ভাবী; আমি যেমন কর্ম্ম করিব, আমাকে তেমনই ফল ভোগ করিতে হইবে এ নিয়মের অন্যথা হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতি ও প্রকৃতিস্থ পুরুষ, উভয়ে মিলিয়া আমি; আমি যাহা করি, তাহা আমার প্রকৃতিতে করে, এবং সেই কর্ম্মের ফল যাহা আমি ভোগ করিয়া থাকি, তাহা আমার প্রকৃতিস্থ পুরুষ ভোগ করিয়া থাকেন; সংক্ষেপে প্রকৃতি কর্ত্তা ও পুরুষ ভোক্তা। শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমার—অর্থাৎ পুরুষের সৎ বা অসৎ-যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। প্রাক্তন-কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করিতেছি, তাহার ফল ভোগের জন্য আমাকে আবার তদনুরূপ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া পুরুষকে বারংবার যাতায়াত করিতে হইতেছে এবং কর্ম্মানুসারে নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হইতেছে। কর্ম্মই জন্ম-জন্মান্তরের প্রবর্ত্তক; যতদিন সেই কর্ম্ম ক্ষয় না হইবে, ততদিন জীবাত্মার মুক্তি নাই;—ততদিন তাঁহাকে এই প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ থাকিতেই হইবে। ইহাই আর্য্যশাস্ত্রের মীমাংসা; এই মীমাংসা-ভূমির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না; এবং উহা বুঝিতে না পারাতেই অসন্তোষ ও নাস্তিকতা আসিয়া নর-হৃদয়কে পঙ্কিল করিয়া তুলে। তুমি ধনাঢ্যের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ত্রিতল-অট্টালিকায় নানা বহুমূল্য দ্রব্য উপভোগ করতঃ সুখে বাস করিতেছ, আর আমি শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হইয়া নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে উদরান্নের জন্য পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি! এ মর্ম্মভেদী বৈষম্য জগতে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র নিস্তব্ধ। প্রসিদ্ধ ইংরাজ-মহিলা আনি বেস্যান্ট বাইবেল হইতে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার একটী শিশু কন্যা পীড়ার যন্ত্রণায় অতিশয় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জননী কন্যাটীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন,

"এই এক বৎসরের শিশু—এখনও পাপ-পুণ্য কিছুই করে নাই, তবে ইহার এ যন্ত্রণা কেন ?" বেস্যান্ট্ খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের কন্যা ও খ্রীষ্টধর্ম্ম-যাজকের পত্নী, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস, তাই বাইবেলে এই প্রশ্নের সদুত্তর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহা পাইলেন না। সেই দিন হইতে বেস্যান্টের ধর্ম্ম-বিশ্বাস বিচলিত হইল, তিনি ক্রমশঃ নাস্তিকতা গ্রহণ করিলেন। অধুনা হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের সেই বিষম সন্দেহ দূর করিয়াছে! হিন্দু-শাস্ত্র তাঁহাকে বলিয়াছে—"অজ্ঞান শিশুর পীড়ার যন্ত্রণা তাহার প্রাক্তন-কর্ম্মের ফল"।

হিন্দুরা অদৃষ্টবাদী; অদৃষ্টে—অর্থাৎ প্রাক্তন-পৌরুষে হিন্দুর অটল বিশ্বাস; তাই হিন্দুসমাজের ঈদৃশ নৈতিক উৎকর্ষ; তাই হিন্দুর ন্যায় শান্ত, ধীর ও সহিষ্ণু জাতি অবনীতলে আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই প্রকৃত হিন্দুর হৃদয় শান্তি ও সন্তোষের বাসগৃহ। হিন্দু অতি শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হইলে মনে করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের ফের; আমি যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তদনুরূপ ফলভোগ করিতেছি; কর্ম্মের ফল কোথায় যাইবে? ইহজন্মের সুখ-দুঃখ অনেক পরিমাণে প্রাক্তনের উপর নির্ভর করে; অতএব বৃথা কাতর হইয়া কেন পরমার্থ হারাইব? যাহাতে পরকালে ভাল হয়, তাহার চেষ্টা করি; যাহাতে জন্মান্তরে আবার এরূপ ক্লেশ পাইতে না হয়, তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি"। এইরূপ ধারণাই হিন্দুর ধীরতা ও ধর্ম্মপ্রবণতার কারণ।

"আমি কে?" এখন সে রহস্য আর বুঝিলাম; ইহজন্মে আমি কেন সুখ-দুঃখ ভোগ করি, সে রহস্যও বুঝিলাম; ধরাধামে আসিয়া, কিছুদিন যাবৎ সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, আবার যাই কেন, তাহাও একরূপ বুঝিলাম; বুঝিলাম, প্রকৃতির কার্য্য এই দেহ ও তদধিষ্ঠিত চিদংশ বা পুরুষ আমি; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলে ইহজন্মে আমাকে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়; বুঝিলাম, প্রাক্তন-কর্ম্মফলের ভোগ হইলে, ইহজন্মে পুরুষকার বশতঃ যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাই আগামী জন্মের প্রাক্তন, এবং তাহারই ফল-ভোগার্থ তদনুরূপ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আমার মৃত্যু বা দেহান্তর-প্রাপ্তি হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ।

মণিরত্নমালা।

—•:০:•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১)—দিব্য ব্রত কি?

গুরুর উত্তর—সমস্তদৈন্য—অর্থাৎ সম্পূর্ণ দীনতা বা সমস্ত বিষয়ে দীনতা (অকিঞ্চনতা) সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত।

ব্রত—পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম্ম।

"ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধার্থমুপায়গ্রহণং ব্রতং" (যোগী যাজ্ঞবল্ক্য) ধর্ম্ম, অর্থ, ও কাম প্রাপ্তির নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহার নাম ব্রত; যথা—চান্দ্রায়ণাদি। —কিন্তু দৈন্য দ্বারা চতুর্ব্বর্গ-শিরোমণি যে মোক্ষ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কারণ দৈন্যকে 'দিব্য ব্রত' বলিয়াছেন।

(ক) দৈন্য—দরিদ্রতা বা অকিঞ্চনতা (ঐশ্বর্য্যবিহীনতা)। ঐশ্বর্য্য বা ঐশ্বর্য্য

বিষম অনর্থের হেতু বলিয়া প্রায়শঃ নিন্দিত হইয়াছে।

অর্থ।

প্রায়েনার্থাঃ কদর্য্যানাং ন সুখায় কদাচন।
ইহ চাত্মোপতাপায় মৃতস্য নরকায়চ॥
অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে
নাশোপভোগআয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তাভ্রমো নৃণাং॥ ১)
স্তেয়ংহিংসানৃতংদম্ভঃকামঃক্রোধঃস্ময়োমদঃ।
ভেদো বৈরমবিশ্বাসঃ সংস্পর্দ্ধা ব্যসনানিচ॥
এতে পঞ্চদশানর্থা হ্যর্থ মূলা মতা নৃণাং।
তস্মাদনর্থমর্থাখ্যং শ্রেয়োর্থী দূরতস্ত্যজেৎ॥
(ভাগবত ১১।২৩ অধ্যায়)

কদর্য্য লোকদিগের ধন-সম্পত্তি প্রায় সুখের নিমিত্ত হয় না; উহা ইহলোকে অনুতাপের ও পরলোকে, নরক প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে। অর্থ প্রায়ই কষ্টদায়ক, যেহেতু তাহার সাধন ও বর্দ্ধনে আয়াস, রক্ষণে চিন্তা, ব্যয়ে—উপভোগে ত্রাস, এবং নাশে ভ্রম হইয়া থাকে। চৌর্য্য, মিথ্যা, হিংসা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, বিস্ময়, মত্ততা, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যূত ও মদ্য, এই পনরটী মনুষ্যের অর্থ-ঘটিত অনর্থ। অতএব শ্রেয়স্কামী ব্যক্তি অর্থরূপ অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ প্রকৃত উপদেশ এই যে, অর্থে অনাসক্ত হইবে।

শ্রী বা ঐশ্বর্য্য (১)।

ইয়মস্মিন্ স্থিতো দারা সংসারে পরিকল্পিতা।
শ্রীর্মুনে পরিমোহায় সাপি নূনং কদর্থদা॥
হিমং বৈরাগ্য বন্দীনাং বিকারো লূক যামিনী।
রাহুদ্রংষ্ট্রা বিবেকেন্দোর্মোহ কৈরব চন্দ্রি কা॥

হে মুনে। এই সংসারে শ্রী কেবল অনর্থদায়িনী ও মোহের হেতুভূতা। মূঢ় জনেরা উহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। বিষয়-শ্রী বৈরাগ্যরূপ বন্দীগণের হিমানী স্বরূপ, বিকাররূপ পেচকের যামিনী-স্বরূপ, বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-দ্রংষ্ট্রা স্বরূপ, এবং মোহ-কৈরবের চন্দ্রিকাস্বরূপ। (যোগ-বাশিষ্ঠ ১।১৩ অধ্যায়)।

দৈন্যের প্রশংসা।

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনং।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥
যথাকণ্টক-বিদ্ধাঙ্গোজন্তোর্নেচ্ছতিতাংব্যথাং।
জীব সাম্যং গতো লিঙ্গৈর্নতথাহবিদ্ধকণ্টকঃ॥
দরিদ্রো নিরহং স্তব্ধো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥
নিত্যং ক্ষুৎক্ষাম দেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে॥
দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাচ্চ সিধ্যতি॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাং।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ॥

নারদ কহিলেন—"এই কারণ আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, শ্রী-মদে অন্ধ মূঢ় লোকদিগের কেবল দরিদ্রতাই শ্রেষ্ঠ অঞ্জন। কারণ দরিদ্র লোক আপনার দৃষ্টান্তে অন্য সকলকে দেখিয়া থাকে, সুতরাং কাহারও দ্রোহ করিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই মুখের মলিনতাদি চিহ্ন দ্বারা সকল জীবেরই দুঃখ-

(১) "অর্থানামর্জ্জনে দুঃখমর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনং॥"

(১) "ঐশ্বর্য্যং বিপদাং বীজং জ্ঞানপ্রচ্ছন্ন কারণং।
মুক্তিমার্গার্গলং মূঢ়ং হরিভক্তিব্যবধায়কং॥

জন্ম মৃত্যু জরারোগ শোকভীতাঙ্কুরং পরং।
সম্পত্তি তিমিরান্ধশ্চ মুক্তিমার্গং ন পশ্যতি।
সম্পন্মদ-প্রমত্তশ্চ বিষয়ান্ধশ্চ বিহ্বলঃ।
মহাকামী রাজসিকঃ সত্ত্বমার্গং ন পশ্যতি॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ২৭৩ অধ্যায়)

দুঃখ্য সমান, ইহা জানিতে পারে। সুতরাং সকল জীবকে সমান বোধ করাতে সেই ব্যক্তি যেমন অন্য প্রাণীর কণ্টক-বেধ-জন্য ব্যথা ইচ্ছা করে না, যাহার অঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, তাহার তেমন ইচ্ছা হয় না। দরিদ্রতা যে ভাল, তাহার অন্য কারণ এই—দরিদ্রতা হইতে মুক্তিও সাধিত হয়। কেননা যে ব্যক্তি দরিদ্র, তাহা হইতে অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব নির্গত হইয়া যায়, এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার মদশূন্য হয়, এবং যদৃচ্ছাক্রমে যে কষ্ট পায়, তাহাই তাহার পরম তপস্যা। অধিকন্তু অন্নাকাঙ্ক্ষী দরিদ্র পুরুষের দেহ নিত্য ক্ষুধায় ক্ষীণ হইতে থাকে, অতএব তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবিলম্বে শোষিত হয়, এবং তাহা হইতে পরহিংসাও নিবৃত্ত হয়; অপিচ, সমদর্শী সাধু পুরুষেরা দরিদ্র-সঙ্গেই সঙ্গত হইয়া থাকেন। সেই সাধু পুরুষদিগের দ্বারা দরিদ্র ব্যক্তিদিগের তৃষ্ণা ক্ষয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই তাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। হে গুহ্যক-সন্তানগণ! ধনিগণই সাধুগণের প্রিয়, দরিদ্রজন প্রিয় নহে, এরূপ মনে করিও না। সাধুগণ সমচিত্ত, ভগবান্ মুকুন্দের চরণ মাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান; ধনগর্ব্বিত অসদাশয় অসৎলোককে তাঁহারা উপেক্ষা করিয়া থাকেন। (মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অনুবাদ) ফল-কথা, ভোগ-বিলাসের অভাবে দরিদ্রের চিত্ত ও ইন্দ্রিয় অনুত্তেজিত থাকায়, ধর্ম্ম-সাধনে তাহারই অধিকতর সুবিধা হয়।

আকিঞ্চন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ তুলয়া সমতোলয়ন্।
অত্যরিচ্যত দারিদ্র্যং রাজ্যাদপি গুণাধিকং ॥
আকিঞ্চন্যেচ রাজ্যে চ বিশেষঃ সুমহানয়ং।
নিত্যোদ্বিগ্নোহি ধনবান্ মৃত্যোরাস্যগতো যথা ॥
নৈবাস্যাগ্নির্নচাদিত্যো নমৃত্যুর্নচ দস্যবঃ।
প্রভবন্তি ধনত্যাগাদ্বিমুক্তস্য নিরাশিষঃ ॥

(মহাভারত, মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়)

"রাজ্য এবং অকিঞ্চনতা, এই উভয়কে তুলা-দণ্ডের উভয়দিকে স্থাপন করিলে দেখা যায় যে, রাজ্যৈশ্বর্য্য অপেক্ষা অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে; বিশেষতঃ এতদুভয়ের এই এক মহা বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তি কাল-গ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু অকিঞ্চন মুক্ত ব্যক্তির ধনত্যাগ-নিবন্ধন অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, দস্যু বা অন্য কোন বস্তু হইতে ভয় বা দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না।" অতএব—

"স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং প্রাপ্য লোকমিমং পুমান্।
দ্রবিণে কোঽনুসজ্জেত মর্ত্ত্যোঽনর্থস্য ধামনি ॥" (১)

(ভাগবত ১১।২৩।২৩)

স্বর্গ ও অপবর্গ-দ্বারস্বরূপ এই মনুষ্য-লোক প্রাপ্ত হইয়া অনর্থমূল অর্থে কোন্ ব্যক্তি আসক্ত হয়? অর্থাৎ কাহারও আসক্ত হওয়া উচিত নহে।

শান্তিশতকে বলিয়াছেন:—

"সত্যং বক্তুমশেষমস্তি সুলভা বাণী মনোহারিণী,
দাতুং দানবরং শরণ্যমভয়ং স্বচ্ছং পিতুং জলং।

(১) "মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥" (মোহ-মুদ্গর)
"অর্থানামর্জ্জনে দুঃখং তাপয়ন্তি বিয়োগতঃ।"
মোহোঽতীব চ সম্পত্তেঃ কথমর্থাঃ সুখাবহাঃ।"
(নীতিশাস্ত্র)

পূজার্থং পরমেশ্বরস্য বিমল-স্বাধ্যায়যজ্ঞঃ পরং,
ক্ষুদ্ব্যাধেঃ ফলমূলমস্তি শমনং দোষাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ॥”

সত্য—অথচ সুলভ এবং মনোহর নানা প্রকার কথা আছে, বল; শরণাগত ব্যক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান যে অভয়দান, তাহা দ্বারা তুষ্ট কর; নদ্যাদিতে নির্ম্মল জল আছে, তদ্দ্বারা তর্পণ করিয়া পিতৃলোকের প্রীতিবিধান কর; বেদাধ্যয়নরূপ পবিত্র যজ্ঞ (ব্রহ্ম যজ্ঞ) দ্বারা (ও ফল-জল-পত্র-পুষ্প দ্বারা) পরমেশ্বরের উপাসনা কর; ক্ষুধারূপ ব্যাধির উপশমার্থে নানাবিধ ফল-মূল রহিয়াছে, ভক্ষণ কর। ধন না থাকিলেও যখন দান-ধ্যান, তর্পণ ও ঈশ্বরোপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, তখন দোষাত্মক অর্থে প্রয়োজন কি? কিন্তু পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণাদিরূপ লৌকিক ও অবশ্যকরণীয় যাগ-যজ্ঞাদিরূপ বৈদিক ক্রিয়াকলাপের নিত্য অনুষ্ঠান গৃহাশ্রমীর পরম ধর্ম্ম। “ধনাৎ ধর্ম্মং ততঃ সুখং”—ধন হইতে ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতে মনুষ্য সুখ লাভ করে। এ নিমিত্ত গৃহীর দৈন্য অত্যন্ত ক্লেশের কারণ (১)। পোষ্যবর্গের ভরণ এবং যাগযজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে, নরক ভোগ হয়।

“অর্থেন হি বিমুক্তস্ত পুরুষস্যাল্পচেতসঃ।
বিচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্ব্বা গ্রীষ্মে কুসরিতো যথা” ॥

“অর্থহীন ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষের সমস্ত কার্য্য গ্রীষ্মকালে স্বল্পতোয়া নদীর ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।”

ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা যত্নস্তস্যার্জ্জনে মতঃ।
রক্ষণং বর্দ্ধনং ভোগ ইতি তত্র বিধিঃ ক্রমাৎ” ॥

ধন (গৃহস্থের) সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের মূল, অতএব ধনোপার্জ্জনে যত্ন করা বিধেয়, এবং অর্জ্জিত ধনের সংরক্ষণ, বর্দ্ধন এবং ভোগ বিহিত।

“প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্য বিরোধিনং
অপীড়য়াতয়োঃ কাম্যং উভয়োরপি চিন্তয়েৎ” ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া ধর্ম্ম-চিন্তা করিবে, পরে ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থ চিন্তা করিবে, এবং ধর্ম্ম ও অর্থের কোন প্রকার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া কাম্য বিষয় চিন্তা করিবে।

“যেঽর্থা ধর্ম্মেণ তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃ শ্রিয়ঃ”

ধর্ম্ম পালন করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ (সদর্থ); আর যাঁহারা ধর্ম্ম পালন করিয়া সম্পদ লাভ করেন, তাঁহারাই যথার্থ মনুষ্য (সৎপুরুষ)।

“অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থা ধর্ম্মস্যাতি-
ক্রমেণ চ।
অরের্ব্বা প্রণিপাতেন মাস্তুবংস্তে
কদাচন” ॥

অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, ধর্ম্ম অতিক্রম বা নষ্ট করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, অথবা শত্রুর উপাসনা করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, সে অর্থে প্রয়োজন নাই।

“নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বিরোধকৃতি

---

(১) দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী’। (কবিবাক্য)
দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ।
কালে শ্রুত্বা হিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপদ্যতে” ॥
(গরুড় পুরাণ)
“মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে।
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গ্যতে ॥
অর্থ প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপ মাত্রং সুহৃৎ।
তস্মাদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ” ॥
(কবিবাক্য)
অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥
(ভীষ্মবাক্য)
যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥
(গরুড়পুরাণ)

লাভের ইচ্ছা করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম-পথে অবস্থানপূর্ব্বক যে অর্থ উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই যথার্থ অর্থ। (তদিতর অনর্থ) ইহলোকে ধর্ম্মই নিত্য ধন; অনিত্য ধন-লাভের নিমিত্ত সেই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। অধর্ম্ম-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যদি বিপুল অর্থও লাভ হয়, তথাপি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির উচিত নহে।" (জানাখুধি)

——o——

মায়াবাদ।

——•:o:•——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আম্রের অস্তিত্ব যে বাস্তব নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারিবে। আচ্ছা, বলতো আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন, কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি পীতাভ সবুজ;—আম্র নানা রঙ্গের হইতে পারে। কোন আম্র নমনীয়; কোনটি স্থিতিস্থাপক, কোনটি কোমল, কোনটি কঠিন, কোনটি শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন আম্র বর্ত্তুল, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি ঠুটি, কোনটি চেপ্টা, তাই বলিতেছি যে, তোমার দ্রব্য-ধাতুবিশিষ্ট আমের আম্রের প্রকৃত কোন রূপ নাই। একটা নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটি মধুটক্, কোনটি গোপাল ভোগ, কোনটি সিঁড়ি টক, কোনটি "পান্সা," কোনটি অম্ল-মধুর। গন্ধও অবশ্য সকলের এক রূপ নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, তুমি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি স্পর্শ, এই নানা প্রকার গুণ-কল্পনার সংমিশ্রণে তোমার ইচ্ছানুসারে একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ না কি? একটি বস্তু হইতে অপর একটি বস্তু রূপে, রসে গন্ধে, স্পর্শে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে একই 'আম্র' নামে অভিহিত করিতেছ।

আবার দেখ, আজ যে আম্রটিকে দেখিলে, এক মাসের পর তাহাকে দেখিয়া, তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ! ভিন্ন সময়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শের এত বাস্তব বিভিন্নতা দেখিয়া, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি রহিল, বল দেখি? বস্তুতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ দ্বারা তদিতর বাহ্য কোন কিছুর দ্রব্য-ধাতুনিষ্ঠ বাস্তব সত্ত্বা অনুভব করা যায় না।

কেহ বলিতে পারেন যে, চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব জানা না গেলেও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন এবং সেই সঞ্চালনের প্রতিরোধক জ্ঞানের দ্বারা আমরা বাহ্য-জগতের বাস্তব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। কিন্তু কথাটা কি ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ নহে? আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিয়া সময়ে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু বাধার কারণ যে তদিতর বাহ্য পদার্থ, তাহা কি করিয়া বলি? মনে কর, এক জন জন্মাবধি চতুরিন্দ্রিয়বিহীন, তুমি তাহার গাত্রে একটা ধাক্কা দিলে, এই ধাক্কা যে সে বাহির হইতে পাইল, এ জ্ঞান কি তাহার স্পর্শজ জ্ঞান? মনে কর, তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস করিতেছ, তোমার বক্ষদেশ এক-বার প্রসারিত ও একবার কুঞ্চিত হইতেছে

সুতরাং চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুর সহিত ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছে, কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা কি তুমি বায়ু-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতেছ? দেহাবরকের অন্তর্দ্দিকে অভ্যন্তরস্থ পদার্থ-রাশির বিস্তরণ-চেষ্টা এবং বহির্দ্দিকে বহিঃস্থ ভূ-বায়ুর চাপ সাধারণ চাপ নহে। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪॥; সুতরাং সমুদায় দেহের ক্ষেত্রফল ২০০০ বর্গ ইঞ্চিতে ৩৭৫ মণ ভার! ইহার কি কিছু অনুভব কর? কখনই না,—কর কেবল অনুমান, কর কেবল কল্পনা। বস্তুতঃ এই বাধা-উৎপাদক ইন্দ্রিয়-দল আদপেই বাহ্য জগতের কোন খবর বলে না; বলে কেবল আপনার নানা প্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তনের কথা; কিন্তু তুমি তাহা হইতে ধরিয়া লইতেছ যে, তোমার এই বাধা-জ্ঞানটি বাহ্য কোন পদার্থের সঙ্গে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকলের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে হইল। একটি বস্তুকে হস্ত দ্বারা তুলিতে আমার হস্তস্থ পেশীতে একটা টান পড়িল; এই টান যখন বেশি হয়, তখন দ্রব্যটাকে গুরু বলি, এবং টান যখন কম হয়, তখন দ্রব্যটাকে লঘু বলি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ যে, দ্রব্যের অস্তিত্ব আর একটা টান-জ্ঞান, দুইই স্বতন্ত্র বিষয়। কলেরার সময় যখন হাত পা টাঁসিয়া ধরে, তখন তো আমাদের একটা টান-জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহাতে কি কোন বাহ্য-বস্তুর অস্তিত্ব বুঝিয়া থাকি? [illegible]

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার দুর্ব্বল [illegible] যে পদার্থকে যত ভার জ্ঞান হইবে,—অর্থাৎ যে টানকে যত বড় টান বোধ হইবে, সবল অবস্থায় সে পদার্থকে তত ভার কিম্বা সে টানকে তত বড় টান জ্ঞান হইবে না। আবার সেই একই দ্রব্য আমার কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতে আমি যে ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব, বাহু দ্বারা আকর্ষণাদি করিতে তেমন ক্লান্তি বা ভার বা বাধা অনুভব করিব না। আম্রটীকে কর্ণের কুণ্ডল করিয়া ঝুলাইলে যে ক্লান্তি অনুভব করিব, বাহু-মূলে ঝুলাইলে, তাহা হইতে অন্যরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব। মল-মূত্রাদি তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে, একপ্রকার অননুভূত অনুভূতি জন্মায়, কিন্তু স্বস্থান-ভ্রষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে, গুরু, লঘু, কঠিন, কোমল, স্থির, চলিষ্ণু, ইত্যাদি বিসদৃশ জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অন্নরাশি উদর-প্রাচীরের অঙ্গে এবং অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়া কেমন বিসদৃশ অনুভূতি উৎপাদন করে! ফলতঃ টান বা বাধা-জ্ঞানের প্রতি, কারণ যদি বাস্তব বাহ্য বস্তু হইবে, তবে আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনে সেই অপরিবর্ত্তিত একই বাহ্য বস্তুকে বিভিন্নমত বোধ হইবে কেন?

এখন একবার স্বপ্নসময়ের পৈশিক জ্ঞানের অবস্থাটিও ভাবা উচিত। আমি স্বপ্ন সময়ে কাগজ—কলম—কালী লইয়া লেখা-পড়া করিলাম। অবশ্যই আমার পৈশিক ইন্দ্রিয় বাহ্য কাগজ—কলমের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছে। কিন্তু আমি, কাগজ—কলমের তাৎকালীন বাস্তব অস্তিত্বই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। অথবা স্বপ্নে আমি একটী যুদ্ধে রাজপক্ষে থাকিয়া খরতর করবাল করে [illegible] শত্রু সংহার করিয়া বহুদিন [illegible]

প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সেই যুদ্ধ-ব্যাপারকে আগুন্তই অলীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি। আবার যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন কতবার কতপ্রকারে হস্ত-পদাদি বিক্ষেপণ করিয়া কত রকমে কত কত বাধা পাই, কিন্তু এ সকল বাধার কোন জ্ঞানই আমার হয় না। পুনরপি স্বপ্ন-সঞ্চরণ কালেও কতপ্রকারে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া সত্যসত্যই কত কার্য্য করি, এবং তৎকালে তাহাতে আমার বাধার জ্ঞান হইলেও, স্বপ্ন হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া সে সকল বাধার বিন্দুমাত্রও আমি স্মরণে আনিতে পারি না! পুনশ্চ, সম্পূর্ণ জাগ্রত-কালেও কত সময় 'মনোঽনবস্থানাৎ' কতপ্রকার বাধা পাইয়াও সে বাধা অনুভব করিতে পারিনা। এমন কি, আমার একটী অঙ্গ ছিন্ন হইলেও তাহা না জানিতে পারি! কত সময় দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতে কত প্রকার ধারাল কাচ-কঙ্করাদি পদার্থে আহত হইয়া চরণ ক্ষত হইয়াছে, স্রোতো-বেগে শোণিত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তৎকালে আমি তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুভব করিতে পারি নাই! ফলতঃ আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই বুঝিতে পারিতেছি যে, যেমন এক সময়ে বাহ্য বস্তুর সংঘর্ষে আমার বাধা-জ্ঞান হয়, তেমনি, অন্য সময়ে বাহ্য বস্তুর অবর্ত্তমানেও আমার বাধা-জ্ঞান হয়। যদি আমার বাধা-জ্ঞান জন্মিবার পক্ষে কোন কোন সময়ে বাহ্য বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব অনাবশ্যক হয়, এবং কখনও বাহ্য বস্তুর বাধা বর্ত্তমানেও আমি তাহা অনুভব করিতে না পারি, তাহাহইলে বাহ্য বস্তুর সহিত বাধা-জ্ঞানের কার্য্য-কারণরূপ অবিনাভাবী নিত্য সম্বন্ধ থাকে কৈ?

আম্রের বাস্তব অস্তিত্ব যে আমার ভ্রান্তি, তাহা বিবেচনা করিবার পক্ষে আরো কারণ আছে। আম্রটী দূরে রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতে নানা আকারে বর্ণ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার যে কিছু অংশ আমার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল ইন্দ্রিয়ে সমান ঘা মারিলেও, কেবল তাহার ক্ষুদ্রতম দুইটী স্বতন্ত্র অসমান তরঙ্গের এক একটী একএক চক্ষে গৃহীত হইল। আম্র যত বড়ই হউক না কেন, আমার চক্ষু দুইটীর অত ক্ষুদ্র স্থানে সেই বর্ণ-তরঙ্গের কতকটা চক্ষুগত পদার্থে আলোচিত হইয়া অবশিষ্টাংশ সমতল ক্ষেত্রবৎ ক্ষুদ্র ও বিপর্য্যস্ত চিত্রে অঙ্কিত হইল। সেই চিত্রদ্বয় হইতে আবার তরঙ্গ উঠিয়া তরঙ্গাকারে আমার দর্শন-স্নায়ুদ্বয়কে একটী নির্দ্দিষ্ট প্রকারে স্পন্দিত করিল, এবং সেই স্পন্দন আমার মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া কখনও একটী—কখনও দুইটী সমবর্ণের অবিপর্য্যস্ত বৃহৎ ঘন-ক্ষেত্রের রূপ-জ্ঞান জন্মাইল!! কিন্তু আমার দর্শন-স্নায়ুর স্পন্দন কি আমি কিছু অনুভব করিতে পারিয়াছি? আম্র হইতে তরঙ্গ আসিয়া আমার চক্ষে ঘা পড়িল, তাই কি-আমি বুঝিতে পারিলাম? যে সকল ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আমি আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে যাইতেছি, সেই সকল ক্রিয়াই যখন মূলে আমার বুঝিবার উপায় নাই, তখন সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত আম্রের বাস্তবাস্তিত্বের নিত্য-সম্বন্ধ কি করিয়া স্বীকার করি? পুনশ্চ, এখন জাগ্রত অবস্থায় যে ক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তিতায় আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাই, স্বপ্নকালেও ঠিক সেই সকল ক্রিয়া হইলেও

তথাদৃষ্ট আম্রের বাস্তবাস্তিত্ব স্বীকার করিনা !!

আমি শব্দ শুনিলাম—আম্রে কোন পদার্থ সংঘর্ষিত হইয়া তাহার পরমাণুরাশি বহুরূপে স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন বায়ু-সাগরে সঞ্চালিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; তাহারই অল্পাংশ আবার সকল ইন্দ্রিয়ে এবং সর্ব্বাঙ্গে প্রতিঘাত হইলেও, কেবল দুইটি তরঙ্গ আমার দুইটি কর্ণের পটহে (অবশ্য অগ্র-পশ্চাৎ-ভাবে) প্রতিহত হইল, আর তাহা হইতে নাকি আবার একই প্রকারের দুইটী আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহা শ্রবণ-স্নায়ুদ্বয় দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে মস্তিষ্কে নীত হইয়া জন্মাইল কি না শব্দ !! আমি শ্রবণ স্নায়ুর কোন আন্দোলন অনুভব করিতে পারিলাম না—কর্ণ-পটহের স্পন্দন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সেই সকল অননুভূত ক্রিয়ার সহিত শব্দের অস্তিত্ব স্বধু নহে—শব্দাধারের বাস্তবাস্তিত্ব পর্য্যন্ত বুঝিয়া লইলাম !!

আমার গন্ধ-জ্ঞান হইল, তাহাই বা কিরূপে? আম্র হইতে কি একটা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ছড়াইয়া পড়িলেও, এবং অন্য সকল ইন্দ্রিয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিলেও, কেবল নাসিকাই তাহার কিছু গ্রহণ করিল, আর তাহা তরঙ্গাকারে আঘ্রাণ-স্নায়ুযোগে রূপান্তরিত ও মস্তিষ্কে নীত হইয়া—জন্মাইল গন্ধ। আমি রস অনুভব করিলাম; আম্রটী আমার সর্ব্বাঙ্গে স্পৃষ্ট হইলেও কোন ইন্দ্রিয়ই তাহার রসানুভব করিল না, কেবল জিহ্বাই নাকি কি একটা তরঙ্গকে রসন-স্নায়ু-যোগে মস্তিষ্কে প্রেরণ করিয়া রসের জ্ঞান জন্মাইল !! স্পর্শ দ্বারাও আমি আম্রের বাস্তব অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না; আম্রকে স্পর্শ করিয়া, টানিয়া বা ঠেলিয়া গুরুত্বাব-বোধকতাদি যে কয়প্রকার পৈশিক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহাতেও আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব জানিবার কোন কথা নাই। স্পর্শ দ্বারা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায় না; গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান দ্বারাও বাহ্য জগতের অস্তিত্ব জানা যায় না। গতি বা স্থিতি-রোধ-জ্ঞান কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নহে; তাহা চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু যখন চাক্ষুষ ও স্পর্শ-জ্ঞান বাহ্য বস্তুর পদার্থগত অস্তিত্বের কোন কথা বলিতে পারে না, এবং পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ করিয়া থাকে, তখন তাহাদের সাহায্যে অনুমান-লব্ধ গতি বা স্থিতির জ্ঞান দ্বারা বাহ্য জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার সম্ভাবনা কোথায়?

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বাধা-জ্ঞানের প্রতি কারণ কোন বাস্তব বাহ্য প[illegible] নহে। বাধা-জ্ঞান প্রতিকূল গতি দ্বারা নিজ গতির রোধে জন্মে; সুতরাং বাধা-জ্ঞানের মূলে যদি কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা গতি বা স্থিতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমি অন্ধ, সম্পূর্ণরূপে দর্শন-শক্তিহীন, এখন যদি আমি চলিতে থাকি, তবে আমার গতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মিবে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির গতি-জ্ঞান হইতে অনেকটা অন্য প্রকার। আমি গতি দ্বারা যে স্থান অতিক্রম করিতেছি, তাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া, কেবল পর্য্যায়ক্রমে (চরণের পৈশিক আকুঞ্চন-প্রসারণ জন্য) এক প্রকার ক্লান্তি এবং (ভূপৃষ্ঠে পদাঘাত জন্য) এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইতে থাকিবে। এইরূপে আমি চলিয়া যাইতেছি, ইতিমধ্যে একখানি স্থির শকটে স্পৃষ্ট হওয়াতে আমার আয়াস

অনুরূপ স্পর্শ জ্ঞান জন্মিল; তাহার পর একটু বল-প্রয়োগ করিলে, সেই স্পর্শ ক্রমে দূর হইয়া গেল, এবং শকটও আমার অগ্রে অগ্রে যাইতে আরম্ভ করিলে, আমার বাধার জ্ঞান দূর হইয়া কেবল স্পর্শ-জ্ঞানই থাকিল; এই অবস্থায় শকট অশ্ব-যোজিত হইয়া বেগে সম্মুখে চালিত হইলে, যদি আমি রজ্জু দ্বারা তাহার সঙ্গে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে পূর্ব্বানুভূত বাধা-জ্ঞান দূরে থাকুক, স্থির থাকিবার চেষ্টায় অক্ষমতারূপ একটা স্বতন্ত্র নূতন প্রকারের স্পর্শ-জ্ঞান আমার হইবে; তবেই দেখ, একই বস্তুর সহিত সংস্পর্শে আমার কখনও বাধা-জ্ঞান, কখন স্থিতি-জ্ঞান, আবার কখনও স্থিতি-ক্ষমতার অভাব জ্ঞান হয়। এমতস্থলে কোন অপরিবর্ত্তনশীল বাস্তব-পদার্থকে আমার গতি বা স্থিতি-রোধের কারণ জ্ঞান করা কি সঙ্গত?

গতি বা স্থিতি-[illegible] দ্বারা যে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা অন্য প্রকারেও বুঝিতে পারি। তুমি যখন উল্লম্ফন করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাও, তখন একটু উপরে উঠিয়া তোমার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয়; ক্ষণকাল পরেই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ঊর্দ্ধগতির বিপরীত গতি লাভ কর, এবং সেই গতি প্রতিরুদ্ধ না হইলে, তোমাকে তোমার পূর্ব্বাধিকৃত স্থান হইতেও নীচে প্রেরিত করে। তুমি একটী উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া গভীর গহ্বরে পড়িয়া গেলে; এখানে প্রথমতঃ তোমার ঊর্দ্ধ-গতি হইল, তাহার পর কোন বাস্তব পদার্থকে স্পর্শ না করিয়া তোমার গতি-রোধ হইল, তদুপরে তোমার নিম্নগতি, তার-পর সেই গতি-রোধ, এবং এইবার গতি-রোধের সহিত তোমার পদাদিতে এক প্রকার স্পর্শ-জ্ঞান হইল। এখন এই যে তোমার কয়েক রকমে গতি ও গতি-রোধ হইল, ইহার অধিকাংশই—অধিকাংশ কেন—কোনটীই তুমি অনুভব করিতে পার নাই। তুমি কেবল তোমার গতি-রোধ অনুমান করিতেছ, কল্পনা করিতেছ। এই স্পর্শ সহকৃত বাধা-জ্ঞানে সেই স্পর্শ বা বাধার কারণ যে বাহ্য বস্তু, তাহা আমি কিসে বুঝি? তোমার পদ প্রকৃতপক্ষে ধরণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; ধরণী এবং তোমার পদ, এতদুভয়ের মধ্যে যে অন্তর বা শূন্য স্থান আছে, তোমার পদ বড় জোর তাহাই স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তোমার স্পর্শ বা বাধা-জ্ঞানের কারণ যদি কোন বাহ্য পদার্থ হয়, তবে তাহা সেই শূন্য-ময় অবস্থ।

আরো বিবেচনা কর, হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে যে গতি হয়, সেই গতির প্রতিরোধ কোন প্রতিকূল গতি ভিন্ন অন্য কিছুতেই হইবার নহে; কিন্তু গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া কোন সচেতন পদার্থ ভিন্ন জড় বস্তুতে সম্ভবে না। গতি বা তদুৎপাদক ক্রিয়া চিৎশক্তির লীলা খেলা, এবং চিৎশক্তির এই লীলা খেলার বিচিত্রতার বহুলতাই সর্ব্ব-প্রকার বাধা-জ্ঞানের জননী। চিৎশক্তির এক প্রকার ক্রিয়াবশে হস্ত যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি তাহার বিপরীত ক্রিয়াবশে সঙ্কুচিত হয়, এবং এই দুই প্রকার লীলা-খেলার রঙ্গ-ভূমিতে বিপরীত ক্রিয়ার শুভ সম্মিলনে বাধা-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। চিৎশক্তির লীলা-বৈপরীত্য জন্য যে প্রতিনিয়ত আমাদের বাধাজ্ঞান জন্মিতেছে, তাহা নিষ্ক্রিয় বস্তুর উৎপন্ন করা সম্ভবপর নহে। যাহার নিজের কোন ক্রিয়া নাই, যে নিজ ইচ্ছায় চলিতে—বা চালিত হইলেও—থামিতে পারে না, এবং

যাহার সহিত আমার দেহের স্পর্শ হইতে পারে না, সে কি করিয়া আমার গতির প্রতিরোধ করিবে? যদি বলি যে, জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় সকল পদার্থই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট, এবং সেই আকর্ষণ জন্য সকল পদার্থেরই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে গতি হইয়া থাকে, আর পৃথিবীর পৃষ্ঠে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই গতি নিরুদ্ধ হইয়া থাকে, এবং সেই নিরুদ্ধ গতিই প্রতিকূল ক্রিয়ার দ্বারা আমার হস্তকে বারিত করে, তাহাই বা কি করিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে? পৃথিবী কিছু সচেতন পদার্থ নহে। উহাও নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থ, সুতরাং জড়া নিষ্ক্রিয়া পৃথিবী আর সকলকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহা কি সম্ভবপর? পৃথিবীকেই আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিনা, রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ দ্বারা আমি পৃথিবীকে কিম্বা পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রিয়া জানিতে পারিতেছি না, কেবল মায়াবশে কতকগুলি কল্পনাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, সেই সকল কল্পনার সহিত মাধ্যাকর্ষণের কল্পনার একতা কল্পনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়? বরং মানসিক ব্যাপারে তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করায় কাল্পনিক অস্তিত্বই স্বীকার করা উচিত। পৃথিবী যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কি আমি স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করি? কখনই নহে। মাধ্যাকর্ষণের না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে গন্ধ, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ! পৃথিবীর কল্পনা হওয়ার পর কত কাল গেল, কত শত সহস্র লোকের জন্ম-মৃত্যু কল্পনা হওয়ার পর আমি নিউটন নামা এক ব্যক্তির কল্পনা করিতেছি, এবং সেই কল্পিত ব্যক্তির দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের কল্পনা করাইতেছি। পৃথিবী তাঁহাকে প্রতিনিয়ত মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট করিল; কিন্তু তিনি তাহা টের পাইলেন না; কোথায় গাছ হইতে একটা আতা ফলকে ভূমিতে পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি থাকা এবং তৎপর জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই অন্য পদার্থকে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকার বিষয় অনুমান করিলেন। এ সকলই কল্পনার লীলাখেলা নয়ত কি?

কেহ বলিতে পারেন, আম্রের বাহ্য অস্তিত্ব যেন নাই থাকিল, রূপ-রসাদি গুণের অস্তিত্ব তো আর অজ্ঞেয় নহে, সুতরাং তাহাদের গুণগত বাহ্য অস্তিত্ব থাকিতেছে; অতএব তাহাদিগকে বাহ্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করার বাধা কি? এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে, রূপাদির বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারিনা। রূপাদি আমার ইন্দ্রিয় বা কল্পনা-সাপেক্ষ ভিন্ন ইন্দ্রিয় বা কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য পদার্থ নহে; যাহা আমার কল্পনার সাপেক্ষ, তাহাতে আমার কল্পনার নিরপেক্ষ বাহ্য অস্তিত্ব অসম্ভব। যখন রূপ থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তির অভাবে তাহা দৃষ্ট হয় না; পক্ষান্তরে, রূপ না থাকিলেও আমার দর্শন-শক্তি রূপ গড়াইয়া লইতে পারে; তখন রূপ দর্শন হইল বলিয়াই তাহার বাহ্য অস্তিত্ব কেন স্বীকার করিব? সদাশঙ্কিত ব্যক্তি কত কল্পিত বিভীষিকা দেখে, আমরা যে স্থলে কিছুই দেখিতে পাই না, সেইস্থলেই যে সে কত কি দেখে বা শুনে। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ই সে অনন্যরূপ অনুভব করে, ইহা কি রূপাদির বাহ্য সত্তা আছে বলিয়া, না তাহার উত্তেজিত কল্পনায় তাহাকে ঐ প্রকার অনন্যসাধারণ কল্পনা করায় বলিয়া? যদি রূপাদির জ্ঞান হইতে তাহার

বাহ্য অস্তিত্ব অবশ্য গ্রাহ্য হয়, তাহাহইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্ন বা বিভীষিকা-দর্শনকালেও রূপাদির বাহ্য অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে; কিন্তু এ কথা কেহ স্বীকার করে না এবং করিতেও পারে না; সুতরাং তাহার বাহ্য অস্তিত্ব না থাকাই সঙ্গত।

তর্কস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, স্বপ্নাদি দর্শন কালে আমরা অবস্তুতে বস্তু দর্শন করি না, বস্তুতেই বস্তু দর্শন করিয়া থাকি; তবে যে সে সকল বস্তু অন্যে দেখিতে পায় না তাহার অন্য কারণ আছে। আমার জাগ্রতাবস্থা হইতে সুপ্তাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি অনেকাংশে অনুরূপ ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বাহ্য রূপাদিরও সময়২ রূপান্তর হয়। রূপান্তরিত সূক্ষ্ম রূপাদি রূপান্তরিত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃত পা র জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিকৃত রূপ জাগ্রত-অবস্থায় অবিকৃত স্থূল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেরূপ স্থূল জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। স্থূলে স্থূলে যে সম্বন্ধ, সূক্ষ্মে সূক্ষ্মেও সেই সম্বন্ধ, কিন্তু স্থূলে সূক্ষ্মে বা সূক্ষ্মে স্থূলে—মিলিত হইলে, কোন জ্ঞানই হয়না। আজকালকার "স্পিরিচুয়ালিজমের" বাড়াবাড়ির দিনে এ সকল কথা আপাততঃ অসঙ্গত বোধ না হইলেও, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার অকিঞ্চিৎকরত্ব বুঝা যায়। আচ্ছা স্বীকার করিলাম, সুপ্তাবস্থায় সূক্ষ্ম দৃষ্টি হয়, এবং জাগ্রত-অবস্থায় স্থূল দৃষ্টি হয়; স্বীকার করিলাম, রূপাদি সময়ে সূক্ষ্ম—সময়ে স্থূল রূপ ধারণ করে, এবং যখন সূক্ষ্ম রূপাদি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির সহিত মিলিত হয়, তখন স্থূল—ইন্দ্রিয়াদির সহিত স্থূল বিষয়ের মিলনের ন্যায় স্পষ্ট রূপাদি-জ্ঞান লাভ হয়; তদ্বৈপরীত্যে স্থূল ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপাদি অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় স্থূল রূপাদি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু এসকল মানিয়া লইলেও একটী অলঙ্ঘনীয় সঙ্কটে উপস্থিত হইতে হইবে, যাহা উত্তীর্ণ হইবার উপায়ান্তর নাই। মনে কর, আমি যে সময়ে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, তুমি অন্য ঘরে শুইয়া স্বপ্নাবস্থায় সেই সময় আমাকে তোমার ঘরে বসিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে দেখিতেছ; এখন বিবেচনা কর দেখি, এইযে একই সময় আমাকে দুইটী স্বতন্ত্র দেশে স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রকাশ পাইল, ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা? যদি এমন মনে কর যে, আমি স্থূলরূপে এখানে বসিয়া লিখিতেছি, আর সূক্ষ্ম-রূপে তোমার কাছে বসিয়া আলাপ করিতেছি, তাহা হইলে এই অতি জ্ঞাতব্য বিষয়টী আমার অজ্ঞাত থাকা কেমন অসঙ্গত!! আমার স্থূলরূপ এক স্থানে থাকিল, আর সূক্ষ্ম রূপ অন্যস্থানে থাকিল, অথচ আমার কি স্থূল রূপ, কি সূক্ষ্ম রূপ, কি উভয়ের সমষ্টিগত প্রকৃত রূপ, এবিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলনা! ইহা বলিতে পারিলেও হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম রূপ অনন্ত পূর্ণভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, আর আমি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না! এ প্রকার মীমাংসা বরং কল্পনাতেই শোভা পায়, জ্ঞেয় পদার্থের বাস্তবিক বাহ্য অস্তিত্বে শোভা পায়না। বস্তুতঃ স্বপ্নাদি কালে আমরা অবিদ্যমান

বস্তুতেই বস্তু কল্পনা করি; সূক্ষ্ম বস্তুতে স্থূল দর্শন করিনা। আর স্বপ্ন কালে যদি অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে পারি, তাহা হইলে স্বপ্নেতর সময়েইবা অবস্তুতে বস্তু কল্পনা করিতে না পারিব কেন?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বাহ্য পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব যেন অস্বীকার্য্য হইল, অমার এই প্রত্যক্ষ দেহাদির সত্তা কি স্বীকার্য্য নহে? প্রশ্নটী নিতান্ত সঙ্গত এবং উত্তরটিও বড় সোজা নহে! যাহাহউক, এ সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। কিন্তু দেহাদির বাস্তব সত্তা আছে কি না, এ সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে গেলে, "আমি কি" সে আলোচনাটি অতি প্রয়োজনীয় হয়; অতএব "আমি কি" এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, আমার সঙ্গে দেহাদির কি সম্বন্ধ।

(ক্রমশঃ)

অবতারতত্ত্ব।

—•:o:•—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাচীন ভারতের দুর্দ্দান্ত অনার্য্যদিগের ভয়ে ক্ষত্রিয় রাজগণও সর্ব্বদা কম্পিত কলেবর ছিলেন, এইজন্যই পরশুরামের অবতারত্ব আপাততঃ প্রাচীন আর্য্যকুলের জাতীয় অভ্যুদয়ের অন্তরায় বলিয়া বোধ হয়; যেহেতু ব্রাহ্মণগণের উপর ক্ষত্রিয়গণের অত্যাচার নিবারণ ব্রাহ্মণের পক্ষে আশুপ্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় রাজগণ হীনবল হওয়ায়, তাহাদের বল ও বীর্য্যাভাবেও ব্রাহ্মণগণ, অনার্য্য রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অধিকতর উৎপীড়িত হইয়া ছিলেন, সুতরাং সেপক্ষে তাঁহাদের মঙ্গলাপেক্ষা অমঙ্গলই বহুগুণে সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম এইযে, দুষ্কৃতগণ কর্ত্তৃক সমাজ ঘোরতররূপে উৎপীড়িত এবং অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে যে তৎপ্রতিকার-প্রসবিনী ঐশী শক্তির বিকাশ হয় না, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে প্রমাণিত ও দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যদিও পূর্ব্বে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পাপাত্মা নরমাংসভোজী অনার্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, তথাচ সেই পাপবীজের মূল ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উচ্ছেদিত হয় নাই। উহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বনে ও ভারতের প্রান্তস্থিত লঙ্কাদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল। উহাদের মূল উচ্ছেদিত না হইলে, সমগ্র ভারত আর্য্যদিগের করতলস্থ ও আর্য্যজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু পাপ বা অত্যাচার চরমসীমা প্রাপ্ত না হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পাপী বা অত্যাচারীর মূল উচ্ছেদ অসম্ভব। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যে ঐ প্রদীপ অধিকতর উজ্জ্বল হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যাহাহউক, আর্য্যগণের সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও বলহানি ব্যতীত অনার্য্যদিগের পাপ পরিপূর্ণ হইতে পারেনা, এবং আর্য্যদিগের বল-বীর্য্য পুনঃ সন্ধুক্ষিত ও তেজ প্রজ্বলিত হইতে পারে না। এই জন্যই পরশুরাম-অবতার "বিষস্য বিষমৌষধম্" স্বরূপ। বিষের উপর বিষ প্রয়োগ করিলে প্রথমতঃ রোগীর ভয়ঙ্কর অবস্থা সংঘটিত হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে শেষোক্ত বিষ পূর্ব্ব বিষকে নষ্ট

করিয়া আপনিই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ঐ উত্তর বিষ নষ্ট হইলে, রোগী ক্রমে সতেজ ও বলবান হইয়া উঠে। পরশুরামের **অবতার উপরোক্তমত** বিষের উপর বিষ-**প্রয়োগ ভিন্ন** কিছুই নহে।

এক পক্ষে ব্রাহ্মণগণ শারীরিক বলে **বলবান ও ক্ষত্রিয়গণের প্রতিদ্বন্দ্বী** হওয়ায় ও **প্রান্তবাসী রাক্ষসগণ মস্তক** উত্তোলন করায়, **ক্ষত্রিয়গণের বল-বীর্য্য ও** সামর্থ্যের পরি-**বর্দ্ধন, অস্ত্রাদির** সংস্করণ ও রণ-পাণ্ডিত্য এবং **ধনাগারের পূর্ণতা,** রাজ্যের সুশৃঙ্খলা, ঐশ্বর্য্যের **পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি** পার্থিব উন্নতি বিশেষ **প্রয়োজন হইয়াছিল;** পক্ষান্তরে, ক্ষত্রিয় **রাজর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও** শক্তি লাভ **করায়, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতার** প্রয়োজন হেতু **ব্রাহ্মণ ঋষিগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞান** ও শক্তি **লাভের যত্ন অতীব প্রবল** হইয়াছিল। **প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতাই** উন্নতির **মূল। ঐ প্রতিযোগিতাই** আবশ্যকতা হইতে **উৎপন্ন হয়। একদিকে** পরশুরাম প্রমুখ **পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণগণের,**—অন্যদিকে দশানন **প্রমুখ পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের** প্রতিদ্বন্দ্বিতায় **ভগীরথ, দিলিপ, রঘু,** কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন **প্রমুখ রাজগণ অতীব পরাক্রান্ত** এবং ঐশ্বর্য্য **ও ক্ষমতাশালী** হইয়াছিলেন; আবার **বিশ্বামিত্র,** শিরধ্বজ ও জনক প্রমুখ রাজর্ষি-গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, অগস্ত্য, গৌতম, অষ্টাবক্র প্রমুখ মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্ম-তেজে তেজস্বী হইয়াছিলেন। এই সময়ই ভারতের [illegible] গৌরবের সময়; এই উন্নতির ফল [illegible] রামাবতার। ঐ রামাবতার দ্বারা [illegible] জাতিদের মধ্যে সৌহৃদ্য সংস্থাপন, [illegible] রাক্ষসদিগের মূল-উৎপাটন, অনার্য্য-জাতিকে বশীভূত করণ এবং ভারতে সর্ব্ব প্রকারে নির্ব্বিবাদ ও পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল। তদনন্তর আর্য্যগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাশূন্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করায় ক্রমেই হীনতেজ হইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে এইরূপ চিরপ্রবাদ আছে যে, রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ নিতান্ত উৎপীড়িত হইলে, রাক্ষস-বংশ ধ্বংসের নিমিত্তই সূর্য্য-বংশীয় রাজকুলে রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা আমরা সর্ব্বতো-ভাবে স্বীকার করি, কিন্তু রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছিল, অন্য কোন মহদুদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই, কেবল রাক্ষসকুল ধ্বংসের নিমিত্তই রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যিনি বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু যিনি রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার কেবল ঐরূপ বিশ্বাস করা উচিত নহে। যেহেতু বাল্মীকীয় রামায়ণের মতে রামচন্দ্র বিষ্ণুর পূর্ণ অবতাররূপে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে সমাজের পূর্ণ শান্তি সংস্থাপন, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বমঙ্গল সাধনই পূর্ণ অবতারের উদ্দেশ্য; তাহাই রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব-বর্ণনানুসারে রামচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে আর্য্য-সমাজ যেরূপ বিশৃঙ্খল ও অশান্তিময় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, সর্ব্ব-মঙ্গলময় বিশ্ব-ভীষক কর্ত্তৃক তদনুরূপ সর্ব্বরোগ-নাশক মহৌষধ প্রেরণ ও প্রয়োগই তাহার যথার্থ ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে রামায়ণের আবরণ ও রূপকাংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান করিলে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক যে নিম্নলিখিত মত সমাজের [illegible]কর

মহৎকার্য্য সকল সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা,—

১। পরশুরামকে দমনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ-শান্তি।

২। ব্রাহ্মণগণের উন্নত পদ ও তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার স্বীকার, তাঁহাদিগের ন্যায়ানুমোদিত আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রানুমোদন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে পুনঃ সৌহৃদ্য-সংস্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগের পদোন্নতি-সাধন।

৩। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে নর-ভোজী দুরন্ত-অনার্য্যগণকে ধ্বংস ও দূরীভূত করিয়া ব্রাহ্মণদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, শাস্ত্র ও বৃত্তানুশীলন এবং সমাজের হিতকর যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদির বিঘ্ন-নিবারণ এবং উপদ্রব-শান্তি।

৪। তৎকালে ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অযোধ্যা ও বিদেহরাজ্য মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন এবং সংশোধিত, সংস্কৃত ও সমুন্নত প্রণালী অনুযায়ী যুদ্ধ, কৃষি ও বাণিজ্যাদি-প্রচলন ও বিনিময় দ্বারা, উভয় রাজ্যের হিতানুষ্ঠান।

৫। রাজ্য ও সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বনমধ্যে বাস, তথায় নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসগণের ধ্বংস সাধন, অন্যান্য অনার্য্য জাতিদিগের বশীকরণ, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রচার, তাহাদের সহায়তায় সুদূর লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ, তথাকার নরমাংসভোজী দুরন্ত রাক্ষসদিগের প্রধান নেতাগণকে সংহার, অবশিষ্ট অনার্য্য-রাক্ষসগণকে স্ববশে আনয়ন, তাহাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ অসভ্যপ্রথা (অর্থাৎ ব্যভিচার, নরহত্যা, নরমাংস-ভোজন ইত্যাদি) এককালে নিবারণ; জ্ঞান, ধর্ম্ম, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সমাজের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষাদান ও দাক্ষিণাত্যকে আর্য্যাবর্ত্তের রাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া, তথায় অসভ্যজাতির মধ্যে সভ্য-রাজ-নিয়ম ও সমাজ-নিয়ম প্রচলন, এবং তন্নিবাসিগণকে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষাদানপূর্ব্বক তত্রত্য সুখ-সমৃদ্ধি সাধন।

৬। পরমজ্ঞানী সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ কবি-গুরু বাল্মীকির দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন, তাঁহার আশ্রমে স্বীয় পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা-সংস্কার, বাল্মীকির নেতৃত্বে ঐ পুত্রদ্বয় দ্বারা অবশিষ্ট সংস্কার সাধনপূর্ব্বক সাধারণ ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও সংগীত প্রভৃতি নানাবিধ হিতকর জ্ঞান ও বিদ্যা প্রচার।

৭। ভারতভূমিকে এক-ছত্রা করণ—অর্থাৎ একটী সর্ব্বপ্রধান রাজশক্তি ও ক্ষমতার অধীনতায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন।

বলা বাহুল্য যে, অনার্য্যজাতি দমনের পূর্ব্বে আর্য্যগণের অন্তর্বিবাদ নিবারণ অতীব আবশ্যক হইয়াছিল। অন্তর্বিবাদ নিবারণ ব্যতীত বহিঃশত্রু দমন অসম্ভব; বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুশিক্ষার নেতাই ব্রাহ্মণগণ; সুতরাং ব্রাহ্মণগণ হীনতেজ হইলে, সে সমাজ হীনপ্রভ ও দুর্ব্বল হইবে, মহাত্মা রামচন্দ্র তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, একপক্ষে বিবাদের প্রধান নেতা মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্ধর্ষ পুরুষ পরশু-রামকে দমনপূর্ব্বক স্বীয় তেজ, বল, বীর্য্য, ক্ষমতা ও পরাক্রম প্রচার পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণের উচ্চাধিকার স্বীকার, তাঁহাদের হিতকর আদেশ-উপদেশ প্রতিপালন, তাঁহাদের বিধি-

ব্যবস্থা, মান ও সম্ভ্রম রক্ষা ইত্যাদি। বিনয়-নম্রতা-বাধ্যতা ব্যতীত তাঁহাদের সহিত ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ব সৌহৃদ্য পুনঃ স্থাপন অসম্ভব, এইজন্যই তিনি একপক্ষে হরধনু-ভঙ্গ ও পরশুরামকে পরাজয়, পক্ষান্তরে ঋষিদিগের হিতার্থে বিশ্বামিত্র ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাড়কা-বধ ও সুবাহু, মারিচ প্রভৃতি রাক্ষসগণকে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ তিনি সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রানুমোদিত আজ্ঞাপালনে কখনই অবহেলা করিতেন না। তিনি লঙ্কা-জয় করণান্তর ভারতের প্রধান রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ব্রাহ্মণ-দিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, নিয়ম, বিধি, ব্যবস্থা, সমস্তই মান্য করিয়া চলিতেন। এমন কি, একটী ব্রাহ্মণের অভিযোগানু-সারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত-নিয়ম-উল্লঙ্ঘনকারী শম্বুক নামক শূদ্র তপস্বীর শীর্ষচ্ছেদরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ-গণের অতিরিক্ত পক্ষপাতী ছিলেন, সমাজে সাম্য-নীতি তাঁহার ছিল না। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একবার সমাজের কার্য্য-বিভাগের উদ্দেশ্য, প্রাকৃতিক জাতি-বিভাগ ও তৎকালে অনার্য্যগণের উচ্চ তত্ত্বানুশীলনের কুফল সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহা এইস্থানে একবার স্মরণ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্ত প্রশ্নের আর নূতন উত্তরের প্রয়োজন হইবে না। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন যে, এরূপ নিয়ম-লঙ্ঘনকারীর প্রাণ-দণ্ড অতীব কঠোর এবং অসভ্যজনোচিত। ইহার উত্তরে আমি পাঠকগণকে জিজ্ঞাসা করি, শম্বুক-উপাখ্যানের আবরণ ভেদ করিলে, শম্বুক কি রাম কর্ত্তৃক প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়? শীর্ষচ্ছেদ অর্থে শিখা-কর্ত্তনরূপ অত্যবমাননা-সূচক দণ্ড বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু তাহার শীর্ষচ্ছেদের পর তাহার সহিত রামের অনেক কথোপকথন হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামচন্দ্র শম্বুককে দণ্ডপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশের মধ্যে শীর্ষচ্ছেদের কথাটী আছে, যথা,—

শীর্ষচ্ছেদ্য স তে রাম
ত্বং হত্বা * জীবয় দ্বিজ।

আমরা এস্থলে শম্বুক-বধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত নহি। তৎকালে সমাজের বন্ধন ও সুশৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-প্রণীত বিধি-ব্যবস্থা কিরূপ আদরণীয় ছিল, তাহাই দর্শান আমাদিগের উদ্দেশ্য; তবে উহার মধ্যে যদি ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু থাকে, তবে শম্বুকের শিখা-কর্ত্তন-রূপ দণ্ড বিধান দ্বারা তাহার অকরণীয় কর্ম্ম নিবারণ ও সমাজের সুশৃঙ্খলা-রক্ষা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এস্থলে কেহ কে[illegible] বলিতে পারেন যে, প্রবন্ধ-লেখক যখ[illegible] আধ্যাত্মিক জ্ঞান-শক্তি ও পরলোক স্বীকা[illegible] করেন, তখন আধ্যাত্মিক শক্তিবলে শম্বুকে[illegible] আত্মার সহিত রামের কথোপকথন অসম্ভ[illegible] হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এ[illegible] প্রবন্ধ-লেখক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শ[illegible] স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শ[illegible] শাস্ত্রানুমোদিত তত্ত্ব ভিন্ন বিশ্বাস করেন ন[illegible] তত্ত্ব-শাস্ত্রোক্ত পরলোক কর্ম্মভূমি ন[illegible] এবং মৃতের আত্মা আমাদের নিকট আ[illegible]

* হিন্দুশাস্ত্রে মৃত্যু-দণ্ড অনেক প্রকার; মস্ত[illegible] মুণ্ডন, শিখা-কর্ত্তন প্রভৃতি অবমাননা একপ্র[illegible] মৃত্যু-দণ্ড সদৃশ।

আমাদের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে পারেন, ইহা প্রেত-তত্ত্ববাদীর অনুমোদিত হইলেও অদ্যাপি তত্ত্বশাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহাহউক, ঐ সকল বিষয়ের অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ আর একটী তর্ক উঠিতে পারে যে, কৃষ্ণ-প্রচারিত মতের সহিত রামচন্দ্র-প্রচারিত মতের এতাধিক বৈসাদৃশ্য কেন? কৃষ্ণ-কৃত উপদেশের মধ্যে আমরা প্রাপ্ত হই যে, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞানই প্রকৃত ধর্ম্ম, বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সমদৃষ্টিই যথার্থ পণ্ডিতের লক্ষণ; কিন্তু রাম বিহিত মত যেন ইহার বিপরীত; এই তর্কের উত্তর ইহার পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে, যথা রাম চন্দ্রের সময়ে সমাজের অবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ-প্রচারিত প্রচলিত কর্ম্ম-প্রধান ধর্ম্মই ভারত-মাতার কৌলিকধর্ম্ম ছিল, আর শ্রীকৃষ্ণের সময়ে সামাজিক অবস্থানুসারে তাহারই সূক্ষ্ম ও সমুন্নত পরিণতি স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা সত্য জ্ঞানই ভারত-প্রকৃতির অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

——•:o:•——

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১১

জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ।
তস্যাভিধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে
বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ।

অন্বয়ঃ—দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ (ভবতি)। ক্লেশৈঃ ক্ষীণৈঃ (সদ্ভিঃ হেতুভিঃ) জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ (ভবতি)। তস্য অভিধ্যানাৎ দেহভেদে (সতি) তৃতীয়ং (ফলং) বিশ্বৈশ্বর্য্যং (ভবতি); (ততঃ) কেবলঃ সন্ আপ্তকামো ভবেৎ।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—সর্ব্বপাশাপহানিঃ—পাশরূপাণাং সর্ব্বেষাং অবিদ্যাদীনাং অপ-হানিঃ, পাশস্বরূপ সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাদির বিনাশ।

অভিধ্যানাৎ—চিন্তনাৎ, চিন্তনহেতু।

তৃতীয়ং—পূর্ব্বোক্তদ্বয়াতিরিক্তং,—সমস্ত পাশ-বিচ্ছেদ এবং জন্ম-মৃত্যু-বিরহ, এই দ্বিবিধ ব্যতীত অতিরিক্ত তৃতীয় ফল।

বিশ্বৈশ্বর্য্যং—নিখিল ঐশ্বর্য্য। কেবলঃ—নিরস্তসমস্তৈশ্বর্য্যঃ—সমস্ত ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ।

আপ্তকামঃ—আয়ত্তকামঃ—সফলমনোরথ।

বঙ্গার্থ—পরম দেবতা পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইলে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত আত্মার এবং অন্যান্য পদার্থের যে কোন ভেদ নাই, সর্ব্বত্রই যে তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী বিভূতি অনুস্যূত রহিয়াছে, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বস্থ, এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, পাশরূপ অবিদ্যাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। জন্ম-মরণ প্রভৃতি দুঃখাদির কারণ অবিদ্যাদি ক্ষীণ হইলে, তাহাদের কার্য্যভূত জন্ম, মৃত্যু-বা জরা জনিত যাতনারও নিবৃত্তি হয়। অবিদ্যা-বিমুক্ত আত্মার কোন প্রকার ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাদি-পাশবিমুক্ত এবং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতির নিবৃত্তি ব্যতীত, সেই পরমেশ্বরের চিন্তার তৃতীয় ফল এই যে তদীয় ভাবনাবশতঃ জীব দেহান্ত সময়ে দেব-মার্গে তন্নিকর্ষে গমনপূর্ব্বক বিশ্বের যাবতীয় ভোগ্য ঐশ্বর্য্য ভোগপুরঃসর তাহাতে বীতস্পৃহ হইয়া, সমস্ত কামনা

পরিপূর্ণতা-হেতুক বাসনাশূন্যভাবে পূর্ণানন্দ পরাৎপর পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—অবিদ্যা—অর্থাৎ অজ্ঞানই যাবতীয় দুঃখের নিদান। নিত্য সনাতন পরমেশ্বর সর্ব্বদা সমস্ত পদার্থে বিরাজমান আছেন। সমস্তই তাঁহার অংশ, ইত্যাদি বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই সঙ্কোচ-জ্ঞান ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে তাঁহার সত্তা অনুভব করে। সর্ব্বত্র তদীয় বিভূতি এবং অস্তিত্ব জ্ঞান হইয়া, যখন পদার্থসমূহ তাঁহারই প্রতিকৃতি, তিনিই সমস্ত, এবম্বিধ জ্ঞান জন্মে, তখন আর একের অভাবে বা অন্যের সদ্ভাবে ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তনজনিত দুঃখ বা হর্ষে জীবকে দুঃখিত বা প্রহৃষ্ট করিতে পারে না। তখন সর্ব্বত্র-সমদর্শন জীবের অবিদ্যা-বিনাশ হওয়ায়, অবিদ্যার কার্য্য জন্ম-মরণ প্রভৃতিও বিনিবৃত্ত হয়। জীব দেহাবসানে অবিদ্যারূপ মহাপাশের বিচ্ছেদ হেতু জীব-ভাব—অর্থাৎ জীবোপাধি পরিহারপূর্ব্বক সর্বৈশ্বর্য্যময় পরমেশ্বরের সালোক্য প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্রহ্মলোকের বিচিত্র ধর্ম্ম-নিবন্ধন সর্ব্বভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া ব্রহ্মত্ব—অর্থাৎ শাশ্বতী মুক্তি লাভ করেন। পরমে-শ্বরের ধ্যান হেতু প্রথমতঃ অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে নির্ব্বিকার সুখ, এবং তত্ত্বজ্ঞান বশতঃ সেই সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীব বিদেহ হইয়া শাশ্বতী মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে শিবধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—"জ্ঞানাদৈশ্বর্য্য-মতুলমৈশ্বর্য্যাৎ সুখমুত্তমং। জ্ঞানেন তৎ পরি-ত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাপ্নুয়াৎ॥" সূত্রের ভাষায় বলিতে গেলে—এই সময়ে জীব জীবাভিধা ত্যাগ করিয়া "আপ্তকাম" হয়; অর্থাৎ সর্ব্বকামনাসুসিদ্ধি-হেতু সকল-মনোরথ হয়। ইহারই অন্যতর আখ্যা মুক্তি; কেননা মুক্ত ব্যক্তিরও কোন প্রকার আকাঙ্ক্ষা বা কর্ত্তব্য থাকে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ইহলোকে পরে চৈব কর্ত্তব্যং নাস্তি তস্য বৈ। জীবন্মুক্তো মতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ"। ধ্যান-ধারণাদি দ্বারাই যে ক্রমশঃ অবিদ্যাদির ক্ষয় হইয়া মুক্তি অথবা পরা গতি লাভ হয়, তাহা প্রদর্শন-চ্ছলে ভগবান্ গীতায়ও বলিয়াছেন—"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতং। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ এবং যুঞ্জন্ সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ। সুখেন ব্রহ্ম-সংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥ সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং॥"

১২

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তাভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ॥

অন্বয়—ভোক্তা, (ভোক্তারং ইতি অব-ধেয়ং; অত্র তু শ্রৌতিকঃপ্রয়োগঃ কোঽপি ন দোষমাবহতি) ভোগ্যং সর্ব্বং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, এতৎ আত্মসংস্থং (ব্রহ্ম) নিত্যমেব জ্ঞেয়ং (জিজ্ঞাসুভিঃ)। হি (যতঃ) অতঃপরং কিঞ্চিৎ (অপি) বেদিতব্যং নাস্তি; এতৎ ত্রিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মমেব।

বিষম পদ ব্যাখ্যা—ভোক্তা জীবঃ-জীব। সর্ব্বং প্রেরিতা—সর্ব্ব নিয়ন্তা। (অত্র সর্ব্ব-মিতি কর্ম্মণি ন কর্ত্রী) ভোগ্যং—ভোগ্য বস্তু

মত্বা—অপৃথগ্‌ভাবেন বিভাব্য, অপৃথগ্‌ভাবে—অর্থাৎ অভিন্নরূপে জ্ঞান করিয়া। আত্মসংস্থং—আত্মনি সন্তিষ্ঠতে ইতি আত্মনিহিতং—আত্মগত। নিত্যং—নিয়মনেন নিয়মপূর্ব্বক অবিরত। জ্ঞেয়ং—জানা উচিত। এতৎ ত্রিবিধং—জীব ভোগ্যবস্তু এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিনই। প্রোক্তং—পূর্ব্বকথিতং, যদ্বা সর্ব্বশ্রুতিসম্মতং—পূর্ব্বকথিত কিংবা সর্ব্বশ্রুতি সম্মত। ব্রহ্মং ব্রহ্ম (অকারান্তত্বং ব্রহ্ম-শব্দস্যাত্র ছান্দসং)।

বঙ্গার্থ—ভোগকর্ত্তা জীব, ভোগ্য বস্তু সমূহ এবং সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর, এতত্রয় অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া—অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী পরমপুরুষের সহিত জীব এবং ভোগ্য পদার্থ নিবহের কোন ভেদ-জ্ঞান না করিয়া, নিয়ত আন্তরিক যত্নপূর্ব্বক সেই আত্মনিহিত পরমব্রহ্মের ধ্যান করা উচিত। তিনি সর্ব্বদা আত্মাতে অবস্থিত রহিয়াছেন। আত্মদৃষ্টি থাকিলে, তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পদার্থান্তর আশ্রয় করিতে হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞানিবন্ধন পরব্রহ্ম পরিজ্ঞানান্তর পরম পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। অতএব আত্মহিতাকাঙ্ক্ষিগণের সর্ব্বদা সেই আত্মস্থ পরম পুরুষের সহিত আত্মা এবং বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেরই অভিন্নভাবে চিন্তা করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় জ্ঞান করা বিধেয়। যেহেতু তিনি ব্যতীত জীবের আর কোনই জ্ঞাতব্য নাই। তিনিই একমাত্র জানিবার এবং বুঝিবার জিনিষ। তাঁহাকে আত্মসত্তায় অবলোকন করিতে না পারিলে শান্তির বা মুক্তির আশা নাই।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান হইলেই, তাঁহার সাক্ষাৎকার সমগ্র প্রাণী তাঁহারই মহতী শক্তি বশে পরিচালিত, তিনিই একমাত্র সৎ, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নাই, এবম্বিধ প্রতীতি কেবল আত্মজ্ঞান হইলেই জন্মিয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে যত্নশীল হওয়া মুমুক্ষুর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি আত্মায় তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষে ব্রহ্মের বহিরন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে আত্মসত্তায় অনুভব করিতে না পারিলে দুঃখ বিনাশ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে,—"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং মুক্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।" যে সমুদয় পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আত্মস্থ অবলোকন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী শান্তি লাভ হইয়া থাকে, অন্যের তাহা হয় না।

আত্মাই জীবের পরম তীর্থ, যিনি আত্মতীর্থে অবগাহন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর তীর্থান্তর গমনের প্রয়োজন নাই; আত্মাই জীবের পরম জ্ঞাতব্য, যিনি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার আর অন্য জ্ঞাতব্য নাই। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে কোন ক্রিয়াই কর না কেন, তাহা অলবণ-ব্যঞ্জনবৎ অনভিপ্রেত। শিবধর্ম্মোত্তরে বর্ণিত আছে "আত্মস্থং যে ন পশ্যন্তি তীর্থে মার্গন্তি তে শিবম্। আত্মস্থং তীর্থমুৎসৃজ্য বহিস্তীর্থাদি যোব্রজেৎ। করস্থং স মহারত্নং ত্যক্ত্বা কাচং বিমার্গতি॥" অর্থাৎ যাহারা মঙ্গলময়কে আত্মায় অবলোকন করিতে অক্ষম, তাহারাই বাহ্যিক তীর্থাদিতে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া থাকে; প্রকৃত-

তেমনিভাবে বিদ্যমান, তবে আত্মজ্ঞানের অভাবেই এরূপ সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি আত্মস্থ মহাতীর্থ পরিহারপূর্ব্বক বহিস্তীর্থাদিতে গমন করে, সে করতলগত অমূল্য-রত্ন পরিত্যাগ করিয়া, কাচের অন্বেষণে স্থানান্তরে প্রয়াণ করে মাত্র। পাণ্ডবের প্রতি অধ্যাত্মোপদেশ প্রদান কল্পে মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—"আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা, সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ॥ তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥" আত্মাই মহানদী, সংযম তাহার পবিত্র তীর্থ, সত্য তাহার জল, শীল তাহার তট, এবং দয়া তাহার উর্ম্মিস্বরূপ; হে পাণ্ডুপুত্র! তুমি সেই অনঘ-তীর্থে দেহের এবং মনের অভিষেক কর। সেই পবিত্র তীর্থে অবগাহন করিয়া আত্মার বিশুদ্ধি বিধান কর; বারিদ্বারা অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আত্মা ব্যতীত অন্য ধ্যেয় নাই, আত্মাই আত্মপদ-প্রাপ্তির সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন, আত্মজ্ঞানই সর্ব্বশান্তির মূল উৎস। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তদানীমোমিত্যেতেনাক্ষরেণ পরমপুরুষমভিধ্যায়ীত। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। ওমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা ইতি॥ সেই আত্মজ্ঞান-বেলায় ওঁ এই প্রণবাক্ষরদ্বারা পরমপুরুষের অভিধ্যান করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে তাঁহার সহিত যুক্ত করিবে। ওঁ এই প্রণবদ্বারা আত্মাকে ধ্যান করিবে; সেই পরব্রহ্ম সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রাপ্তব্য, কেননা তিনি আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান।

শ্রেষ্ঠাধিকারিগণের পক্ষে আত্মজ্ঞান, আত্মধ্যান, আত্মবিশ্বাস, আত্মরতি প্রভৃতিই তৎপদপ্রাপ্তির মুখ্য হেতু।

১৩

বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তিঃ
ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গ নাশঃ।
সভূয়- এবেন্ধন-যোনিগৃহ্য
স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেণ দেহে।

অন্বয়ঃ—যথা যোনিগতস্য বহ্নেঃ মূর্ত্তিঃ ন দৃশ্যতে, লিঙ্গনাশশ্চ ন এব (ভবতি) স এব ভূয়ঃ ইন্ধন যোনিগৃহ্যঃ (ভবতি); তৎ উভয়ং বা (ইব) দেহে প্রণবেণ (আত্মস্থং পরংব্রহ্ম গ্রহীতব্য ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুভিরিতিশেষঃ)।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—যোনি গতস্য—অরণি-গতস্য, অরণিগত—অর্থাৎ কাষ্ঠস্থিত। লিঙ্গনাশঃ—লিঙ্গস্য সূক্ষ্ম দেহস্য বিনাশঃ—সূক্ষ্মদেহের বিনাশ। ভূয়ঃ-পুনঃপুনঃ। ইন্ধন যোনিগৃহ্য—ইন্ধনমেব যোনিঃ কারণং-তেন গৃহ্যঃ—গ্রহণীয়; মথনেন গ্রাহ্যঃ, ইতি বিশদার্থঃ, (যোনি শব্দোঽত্র কারণ বচন পরঃ) ইন্ধনরূপ কারণদ্বারা গ্রহণীয়—অর্থাৎ পুনঃপুনঃ ইন্ধনদ্বয় ঘর্ষণে উৎপাদনীয়। তৎ উভয়ং বা (ইব), সেই বহ্নি এবং ইন্ধনের ন্যায়, (এখানে বা শব্দ ইবার্থে প্রযুক্ত)

বঙ্গার্থ—আত্মান্বেষণপূর্ব্বক পরব্রহ্ম ধ্যানের প্রধান অঙ্গই প্রণব, তাই প্রণবের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন,—

অরণি—অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠের মধ্যনিহিত অগ্নির মূর্ত্তি পরিদর্শন করিতে পারা যায় না, অথচ তাহার লিঙ্গ-শরীর (সূক্ষ্ম দেহ) ঐ কাষ্ঠমধ্যে সর্ব্বদাই বিরাজ করে; যখন ঐ কাষ্ঠখণ্ডের সহিত অপর একখণ্ড কাষ্ঠের মথন—অর্থাৎ ঘর্ষণ করা যায়, তখন যেমন তন্মধ্যস্থ অগ্নি পরিদৃষ্ট হয়, সেই প্রকার দেহরূপ কাষ্ঠের সহিত মথন প্রণবরূপ কাষ্ঠান্তরের মথন বা ঘর্ষণ করা যায়, তখন সূক্ষ্মাবস্থায় দেহ মধ্যে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান আত্মারূপ অগ্নি দৃষ্টি-গোচর হয়। অর্থাৎ প্রণব-সাধনবলে আত্মতত্ত্ব—যাহার অন্যতর আখ্যা ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব আত্মতত্ত্ব-পিপাসু মোক্ষকামিবৃন্দের প্রণব ধ্যান সর্ব্বদাই বিধেয়; কেননা প্রণব-সাধনা ব্যতীত আত্মজ্ঞানপুরঃসর ব্রহ্মজ্ঞানের আশা নাই।

১৪

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং।
ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যে-
ন্নিগূঢ়বৎ ॥

অন্বয়-(উপাসকঃ) স্বদেহং অরণিং (তথা) প্রণবং চ উত্তরারণিং কৃত্বা—ধ্যান-নির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ (হেতোঃ) দেবং নিগূঢ়বৎ পশ্যেৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—অরণিং—অনলোৎপাদকঃ ইন্ধন-বিশেষঃ,—অনলোৎপাদক কাষ্ঠবিশেষ। উত্তরারণিং—অপর কাষ্ঠ। ধ্যাননির্ম্মথনা-ভ্যাসাৎ—ধ্যানস্য ব্রহ্মচিন্তনস্য নির্ম্মথনং পুনঃ পুনঃ করণং, তস্য অভ্যাসাৎ—পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচিন্তনের অভ্যাস বশতঃ। নিগূঢ়বৎ-গুপ্তা-গ্নিবৎ-কাষ্ঠনিহিত সংগুপ্ত অগ্নির ন্যায় নিগূঢ়।

বঙ্গার্থ।—এই সূত্রে পূর্ব্বের সূত্রেরই পুনর্বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যিনি নিজের শরীরকে অরণিস্থানীয় ও প্রণবকে উত্তরা-রণি-স্থানীয় করিয়া নিয়ত ব্রহ্মধ্যানরূপ ঘর্ষণ করেন, অর্থাৎ প্রণবজপপুরঃসর অবিরত ব্রহ্ম-ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তিনি অচিরাৎ আত্মনিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কার লাভ করেন। কাষ্ঠের সহিত কাষ্ঠের ঘর্ষণে যেমন তন্মধ্যস্থ গুপ্ত অগ্নি বহির্গত হইয়া পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ দেহের সহিত—অর্থাৎ দেহ শব্দের লক্ষ্যীভূত অধরের সহিত প্রণবের মন্থনে (অধরে প্রণব উচ্চারণে) আত্মনিগূঢ় পরমজ্যোতিস্বরূপ পরম দেব পরিদৃষ্ট হয়েন। নিয়ত প্রণব ধ্যান করিলেই আত্মস্থ পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-কার লাভ করা যায়। তিনি আত্মায় নিগূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সতত প্রণব-কীর্ত্তনে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

(১৫)

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মনি গৃহ্যতেহসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্যতি ॥

অন্বয়ঃ—তিলেষু তৈলমিব, দধিনি সর্পিরিব স্রোতঃসু আপ ইব, অরণীষু অগ্নিরিব, আত্মনি অসৌ (পরমপুরুষঃ পরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ) এবম্প্রকারেণ গৃহ্যতে। যঃ সত্যেন তপসা (চ আত্মানং অন্বেষ্যতি, স) এনং অনুপশ্যতি। অন্বয়ান্তরং বা—যঃ সত্যেন তপসা (চ). এনং (আত্মানং) অনুপশ্যতি, তেন কর্ত্রা, ইব (যথা) তিলেষু তৈলং গৃহ্যতে (যন্ত্রপীড়নেন ইতি শেষঃ), দধিনি সর্পির্গৃহ্যতে (মথনে-নেতিশেষঃ), স্রোতঃসু আপঃ গৃহ্যন্তে (ভূখননেন ইতিশেষঃ), অরণীষু চ অগ্নি-র্গৃহ্যতে (ঘর্ষণেন ইতি শেষঃ) এবং (তথা এবম্প্রকারেণ ইত্যর্থঃ) অসৌ (পরমেশ্বরঃ পরংব্রহ্ম) আত্মনি গৃহ্যতে (সত্যতপশ্চরণাদিভিরাত্মান্বেষণাৎ ইতি শেষঃ)। পরপক্ষীয়োহন্বয়ঃ সমীচীনঃ।

প্রাগুক্ত অনুশাসনপ্রতিপাদ্য অর্থের দৃঢ়তা প্রকটনের জন্য কতিপয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইল।

ব্যাখ্যা—তিলমধ্যগত তৈল যেমন সর্ব্বদাই অদৃশ্য, নিষ্পীড়নাদি ব্যতীত উহা কদাচও বহির্গত হয় না; দধিনিহিত সর্পি (ঘৃত) যেমন প্রতিনিয়তই গুপ্তভাবে দধিমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে, মন্থনাদি করিলে তবে উহা দৃষ্টিগোচর হয়; নদী-খাত-গূঢ় সলিলরাশি নিরন্তর অদৃশ্য হইলেও যেমন ভূখননাদি দ্বারা উহা গ্রহণ করা যায়, অরণিমধ্যে লুক্কায়িত অনলশিখা যেমন অবিরল দর্শনাতীত থাকে, কিন্তু অন্য অরণীর সহিত ঘর্ষণ মাত্রই সেই নিগূঢ় অনল দৃষ্টিগোচর হইয়া পড়ে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতের হিতেচ্ছা মূলক সত্য দ্বারা (সত্যং ভূতহিতং প্রোক্তং ইতি স্মরণাৎ) এবং ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতার দ্বারা নিয়ত আত্মান্বেষণ করিতে সমর্থ, তিনি অচিরকাল মধ্যেই এই সমুদয় সাধনাবলে আত্মাতে নিয়ত নিগূঢ় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারক হয়েন। নিষ্পেষণ মথনাদি ব্যতীত যেমন তিল দধি প্রভৃতি হইতে তৈল ঘৃত ইত্যাদি গ্রহণ করা যায় না, সেই প্রকার সত্যাদিমূলক আত্মসমাধি ব্যতীত আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভও অসম্ভব। আত্ম-

ন্বেষণ, আত্মবিচার, আত্মচিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং আত্মরতি প্রভৃতিই পরব্রহ্মের নিরবচ্ছিন্ন-সুখ সৌধ-প্রবেশের সোপান-শ্রেণীস্বরূপ। এই দুরারোহ প্রাসাদে আত্মান্বেষণাদি অবলম্বন ব্যতীত আরোহণ করা অসাধ্য। অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর আত্মদৃষ্টি সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

১৬

সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্॥
তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ ইতি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—আত্মদৃষ্ট্যা কথং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারো ভবতি কথং বা পূর্ব্বানুশাসনস্থং "এনং আত্মানং" অনুপশ্যেদিতিস্ফুটীকরোতি সর্ব্বব্যাপিনমেতি—যঃ (সত্যাদি-সাধন যুক্তঃ জনঃ) সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিব অর্পিতং আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্ অনুপশ্যতি, তেনৈব অসৌ পরমাত্মা স্বাত্মনি গৃহ্যতে ইতি পূর্ব্বানুশাসন তৃতীয়পাদেন সহ সম্বধ্যতে।

বিষমপদ ব্যাখ্যা।—ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্ ক্ষীরে দুগ্ধে যথা সর্পিরেব সারভূতং তদ্বৎ সর্ব্বেষু পদার্থেষু সারভূতত্বেন অর্পিতম্, নিরন্তরতয়া আত্মত্বেন নিহিতং অবস্থিতং বিদ্যমানমিতিযাবৎ,—দুগ্ধের সার যেমন সর্পিঃ অর্থাৎ ঘৃত, (সেই প্রকার বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে সাররূপে বিদ্যমান যে আত্মা। আত্মবিদ্যাতপোমূলং—"আত্মবিদ্যা"—অবিদ্যা-বিরহঃ, "তপঃ"—মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ একাগ্রতা, উক্তঞ্চ—"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ") তয়োর্"মূলং" কারণং; অবিদ্যাবিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়-জয়ের প্রধান কারণ।

তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ পরম্—"তৎ"—সআত্মরূপং ব্রহ্ম (স চ তৎ ব্রহ্মচেতি তদ্ব্রহ্ম) "উপনিষৎ" (উপনিষণ্ণমস্মিন্ পরং শ্রেয়ঃ ইতি রহস্য ব্রহ্মবিষয়নিবন্ধঃ পরম শ্রেয়োমূলো গ্রন্থঃ বেদান্তো বা ধর্ম্মো বা, তথাচ কোষঃ—"ধর্ম্মেহপনিষৎসমে বেদান্তেচ রহস্যপি") "তৎ পরং" তদেব পরং প্রধানং যস্য তাদৃশং—উপনিষৎ প্রতিপাদ্যমিত্যর্থঃ—সেই আত্মরূপ পরমব্রহ্ম নিয়ত উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য।

কেচিৎ ঈদৃশং ব্যাচক্ষতে যৎ—কীদৃশং আত্মানং অনুপশ্যতি যঃ ক্ষীরে সর্পিরিব সর্পিতং সর্ব্বব্যাপিনং আত্মানং অনুপশ্যতি, তেন পর-ব্রহ্ম স্বাত্মনি গৃহ্যতে, কীদৃশং তৎ ব্রহ্ম? আত্মবিদ্যাতপোমূলং তথা উপনিষৎ পরম্ ইতি। মতমিদং দূরান্বয়তয়া প্রকৃতের-সম্যগুপযোগিতয়া চ সুধীভিবিভাব্যম্। বয়ন্তু গ্রন্থব্যাখ্যাতারো ঝটিতি অর্থাগমাৎ পরমতমেব সমীচীনতয়া মন্যামহে।

বঙ্গার্থ—দুগ্ধ-নিহিত ঘৃতই যেমন দুগ্ধের সার সেইরূপ আত্মা সর্ব্ব পদার্থে সারভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন; বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই তাঁহার অবিকৃত, আত্মা বিহীন বস্তু জগতে নাই। আত্মা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসারভূত ব্রহ্মের সহিত আত্মার কোন ভেদ নাই। আত্মবিদ্যা—অর্থাৎ অবিদ্যা বিনাশ এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদির বিজয়-সাধন. সেই আত্মরূপী পরব্রহ্মেরই অধান, তিনিই সাধনাবশে উপাসক-হৃদয়ে স্ফুটাবির্ভূত হইয়া ঐ সকলের সংহার বিধান করিয়া থাকেন। তচ্চিন্তা তন্মনন প্রভৃতি বশতঃ অবিদ্যাদ আচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তিনিই জ্ঞান-যোগ প্রদানের নিমিত্ত সাধু-দিগকে সাধুকর্ম্মে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। সেই আত্মনিষ্ঠ পরব্রহ্ম উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য. উপনিষৎ সমূহ তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপদার্থের, সর্ব্ব জ্ঞানের, সর্ব্ব গ্রন্থের, সর্ব্ব শাস্ত্রের এবং সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র সার; তিনি ব্যতীত জগতে অন্য কিছু জ্ঞেয় বা জিজ্ঞাস্য নাই।

[অধ্যায়-সমাপ্তির জন্য সূত্রের অন্তিম বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে।]

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা।	পৌষ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

কৃষ্ণতাণ্ডব-স্তোত্রং।

—০:০:০—

ভজে ব্রজৈকমণ্ডনং সমস্ত পাপ খণ্ডনং
স্বভক্ত-চিত্তরঞ্জনং সদৈব নন্দনন্দনং।
সুপিচ্ছ-গুচ্ছ-মস্তকং সুনাদ-বেণু-হস্তকং
অনঙ্গরঙ্গ-সাগরং নমামি কৃষ্ণনাগরম্। ১ ॥
মনোজ-গর্ব্ব-মোচনং বিশাল ভাল-লোচনং
বিধূত-গোপ-শোচনং নমামি পদ্মলোচনম্।
করারবিন্দ-ভূধরং স্মিতাবলোক সুন্দরং
মহেন্দ্রমানদারণং নমামি কৃষ্ণ বারণম্ ॥ ২ ॥
কদম্বসূন-কুণ্ডলং সুচারু গণ্ডমণ্ডলং
ব্রজাঙ্গনৈকবল্লভং নমামি কৃষ্ণ দুর্লভং।
যশোদয়া সমোদয়া সকোপয়া দয়ানিধিং
উদূখলে সুদুঃসহং নমামি নন্দশংবহম্ ॥৩॥
নবীন গোপনাগরং নবীন কেলিমন্দিরং
নবীনমেঘ-সুন্দরং ভজে ব্রজৈকমন্দিরং।
সদৈব পাদপঙ্কজং মদীয় মানসে নিজং
দধাতু নন্দবালকঃ সমস্তভক্ত-পালকঃ ॥ ৪ ॥

সমস্ত গোপনাগরী-হৃদং ব্রজৈকমোহনং
নমামি কুঞ্জ-মধ্যগং প্রসূন-ভাল-শোভিনম্।
দিগন্ত-কান্তরেঙ্গনং সাহসবাল-সঙ্গিনং
দিনে দিনে নবং নবং নমামি নন্দসম্ভবম্ ॥৫॥
গুণাকরং সুখাকরং কৃপাকরং কৃপানরং
ত্বরা সুখৈকদায়কং নমামি গোপনায়কম্।
সমস্তদোষ-শোষণং সমস্তলোক-তোষণং
সমস্তদাস-মানসং নমামি কৃষ্ণ লালসম্ ॥৬॥
সমস্তগোপনাগরী-নিকাম-কামদায়কং
দৃগন্ত চারুসায়কং নমামি বেণুনায়কং।
ভবোদ্ভবাবতারকং ভবাব্ধি-কর্ণধারকং
যশোমতেঃ কিশোরকং নমামি দুগ্ধচোরকম্ ॥৭
বিদগ্ধ-মুগ্ধ-গোপিকা-মনোমনোজদায়কং
নমামি মঞ্জুকাননে প্রবৃদ্ধবহ্নিপায়িনং।
যদা তদা যথা তথা তথৈব কৃষ্ণ-সৎকথা
ময়া সদৈব গীয়তাং তথা কৃপা বিধীয়তাং [illegible]

সম্পূর্ণং।

মনোজ—মদন। করারবিন্দভূধরং—করপদ্মে গোবর্দ্ধন যাঁহার, তাঁহাকে। মহেন্দ্রমানদারণং—যিনি ইন্দ্রের অহঙ্কার দূর করিয়াছিলেন, তাঁহাকে। কদম্বসূন—কদম্বকুসুম। সুদুঃসহং—বন্ধ করিতে অসক্ত যাঁহাকে। শংবহং (যিনি নন্দের) আনন্দ (মঙ্গল) উৎপন্ন করেন তাঁহাকে। দিগন্ত কান্তরেঙ্গনং—[illegible] কান্তরে (বনে) ইঙ্গন—গমন যাঁহার, তাহাকে। কৃপানরং—কৃপা বশতঃ নররূপীকে। নিকাম—[illegible]। দৃগন্ত চারুসায়কং—অপাঙ্গ যাঁহার মনোহর বাণস্বরূপ তাঁহাকে। ভবোদ্ভবাবতারকং—সংসারের উদ্ভব (সৃষ্টি) কারককে। গোপকা—দায়কং—গোপিকার মনে নিষ্কাম-কামোদ্দীপন কারীকে। মঞ্জু কাননে—মনোহর কাননে—বৃন্দাবনে। বিধীয়তাং—কর। যাহাতে আমি সর্ব্বদা কৃষ্ণকথা গান করি, [illegible]

সাংখ্য দর্শন।

—•:o:•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্ব-
সম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ
সৎকার্য্যম্ ॥

পদপাঠঃ—অসৎ—অকরণাৎ। উপাদান-গ্রহণাৎ। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ। শক্তস্য। শক্য—করণাৎ। কারণ-ভাবাৎ। চ। সৎ-কার্য্যম্।

ব্যাখ্যা—অসৎ-অকরণাৎ (অসতঃ অকরণাৎ) অসদ্ব্যাপার হইতে কিছুই হয় না বলিয়া। উপাদান-গ্রহণাৎ—উপাদান গ্রহণ হেতু। সর্ব্ব-সম্ভব-অভাবাৎ—সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির অভাব হেতু, অর্থাৎ এক উপাদানে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না। শক্তস্য—যাহার বস্তুবিশেষের উৎপাদনের শক্তিমত্ত্বা আছে, তাহার। শক্য-করণাৎ—ঐ উৎপাদ্য বস্তুর উৎপাদন হেতু। কারণ—ভাবাৎ কার্য্যে কারণাত্মকতা নিবন্ধন। সৎকার্য্যম্—সৎ-কার্য্য সিদ্ধ হয়।

বঙ্গার্থঃ—এই সদ্রূপ জগৎ কার্য্য অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন; যেহেতু অসৎ হইতে কোন কার্য্য হয়না; কোন কার্য্য উৎপাদন করার জন্য উপাদান গ্রহণ করিতে হয়; একই উপাদান হইতে সর্ব্ববিধ কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। যে কার্য্য উৎপাদন করিতে হইবে, সেই কার্য্য যে [illegible] দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কারণই [illegible] করিতে হয়; তদ্ভিন্ন কারণে সেই [illegible] হইতে পারে না; এবং কার্য্যে কারণের ভাব থাকে, অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণ অভিন্ন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ভগবান্ কপিলের মতে এক প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উৎপন্ন। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, কেবল পুরুষের সন্নিকর্ষ হেতু প্রকৃতি হইতেই বিশ্ব উদ্ভূত হয়। তাঁহার মতে কার্য্য-কারণে কোন প্রভেদ নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার মতে বীজ এবং বৃক্ষের পরস্পর যাদৃশ সম্বন্ধ, কার্য্য এবং কারণেরও পরস্পর তাদৃশ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান সূত্রে তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, এই জগৎ সতের কার্য্য, অর্থাৎ সৎবস্তু হইতে উৎপন্ন। গীতায়ও উক্ত আছে—"না-সতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"; অর্থাৎ অসৎ (যাহা নাই) হইতে কিছু হয় না, এবং সৎ (যাহা আছে), তাহারও কখন ধ্বংস হয় না। এই জগৎ আছে, ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক; সুতরাং অসৎ—অর্থাৎ যাহা নাই, তাহা হইতে ইহার উৎপত্তি হইতে পারে না। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব সৎরূপ জগতের কারণও সৎ হইবে। কার্য্যের কারণ যে সৎ হইবে, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, যখনই কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তখনই তাহার উপাদানের আবশ্যকতা হয়। ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিতে হইলেই ইষ্টকরূপ উপাদানের প্রয়োজন; কিন্তু ইহাও মনে রাখা চাই যে, যে কোন উপাদান গ্রহণ করিলেই চলিবে না। ইষ্টকালয়ের নির্ম্মাণ করিতে ইষ্টকেরই প্রয়োজন; তৃণাদি দ্বারা উহার নির্ম্মাণ অসম্ভব। সুতরাং সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কার্য্যে এবং কারণে একাত্মীয়তা থাকা চাই। যে বস্তু [illegible] যে বস্তু উৎপন্ন

হয়, সেই বস্তু নির্ম্মাণে সেই বস্তুরই প্রয়োজন। কার্য্য ও কারণ পরস্পর সম্বন্ধ ও একজাতীয়। নবনীত প্রস্তুত করিতে হইলে দুগ্ধেরই প্রয়োজন, বারি-মন্থনে উহা উৎপন্ন হয় না। বস্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, তন্তুবায়ের প্রয়োজন, কুম্ভকারের দ্বারা হয় না। মহর্ষি কপিল নানাবিধ জাগতিক অভিজ্ঞতাবলে দেখাইতেছেন যে, কার্য্য ও কারণ একই প্রকার হওয়া চাই, অন্যথা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। সর্ব্বশেষে তিনি বলিতেছেন যে, জগতে আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাতেই এই দেখিতে পাই যে, কারণে কার্য্যের সত্তা আছে; কিন্তু কার্য্য সৎ, সুতরাং কারণও সৎ। এতাবতা প্রমাণিত হইল যে, কার্য্য ও কারণ উভয়ই সদাত্মক। কার্য্য ও কারণে পরস্পর সম্বন্ধ কি? যাহার আদি আছে, তাহারই কারণ আছে, এবং যখনই এক বস্তু অপরিহার্য্যরূপে অন্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, তখনই পূর্ব্ববস্তুকে পরবস্তুর কারণ বলা যায়। সূর্য্যের উদয়ে আলোক হইল, সূর্য্যের অস্তে অন্ধকার হইল। উদয়ে আলোক এবং অস্তে অন্ধকার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সূর্য্যই আলোকের কারণ। যদি সূর্য্য অস্তমিত হইলেও আলোক থাকিত, তাহাহইলে সূর্য্যকে আলোকের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতাম না। কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, অন্বয় ও ব্যতিরেক, এই উভয়ই চাই। কেবল একের বিদ্যমানতাস্থলে অপরের বিদ্যমানতা বা একের অবিদ্যমানতাস্থলে অপরের অবিদ্যমানতা থাকিলে হইবে না; একের বিদ্যমানতা সত্বে বিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানতা সত্বে অবিদ্যমানতা চাই; অর্থাৎ তৎসত্বে তৎসত্বা ও তদসত্বে তদসত্বা চাই। যে স্থলে কারণ সৎ আছে, সেস্থলে কার্য্যও সৎ; যেখানে কারণ অসৎ, সেখানে কার্য্যও অসৎ; অর্থাৎ যেখানে কারণের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই, সেখানে কার্য্যেরও কোন অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না; এই জন্যই কপিল বলিতেছেন—"অসৎ-অকরণাৎ" এবং "কারণভাবাৎ"। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কপিলের মতে প্রকৃতিই জগতের প্রসূতি, কিন্তু উহাতে পুরুষের কোন সংস্রব নাই; অথচ তিনিই বলিতেছেন যে, পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি জগৎ প্রসব করেন না। যদি পুরুষের সন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রকৃতি বিশ্ব-প্রসবে অসমর্থা হয়েন, তাহা হইলে অবান্তর-ভাবে পুরুষের কিছু না কিছু কর্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। কপিল কেবল উপাদান কারণের কথাই বলিতেছেন, কিন্তু তিনি নিমিত্ত কারণের সম্বন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিতেছেন না। মৃত্তিকা উপাদান হইতে ঘট প্রস্তুত হয়; কিন্তু কুম্ভকাররূপ নিমিত্তকারণ না থাকিলে কে ঘট প্রস্তুত করে? যদি বল যে, প্রকৃতির এমন শক্তি আছে যে, সে শক্তি দ্বারা জাগতিক বস্তু নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত স্বতঃই উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে আবার পুরুষের সন্নিকর্ষের প্রয়োজন কি? বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তিমাত্র, এবং ঐ শক্তিই জগতের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। ঐ প্রকৃতি ব্রহ্মে অব্যক্তভাবে লীন থাকেন, এবং সৃষ্টির প্রাকালে ব্যক্তভাব ধারণ করেন। প্রত্যেক বস্তুরই তিনটি কারণ আছে,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত-কারণ। তন্তুগুলি পটের সমবায়ী কারণ, ঐ পট ও তন্তুর

সংযোগই অসমবায়ী কারণ; পট-কারক ঐ পটের নিমিত্ত-কারণ। কপিলদেব মাত্র সমবায়ী কারণের কথা বলিতেছেন, কিন্তু অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণের কথা কিছুই বলেন নাই। বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, সাঙ্খ্যশাস্ত্রে তাহার সুস্পষ্ট মীমাংসা পাওয়া যায় না; কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, পুরুষ সাঙ্খ্য-মতে নিষ্ক্রিয়।

হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেক-
মাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীত-
মব্যক্তম্।

পদপাঠঃ—হেতুমৎ। অনিত্যম্। অব্যাপি। সক্রিয়ম্। অনেকম্। আশ্রিতম্। লিঙ্গম্। সাবয়বম্। পরতন্ত্রম্। ব্যক্তম্। বিপরীতম্। অব্যক্তম্।

ব্যাখ্যা—ব্যক্তম্—ব্যক্ত—অর্থাৎ বিকাশ-প্রাপ্ত বিশ্ব। হেতুমৎ—কারণবিশিষ্ট। অনিত্যং—অনিত্য। অব্যাপি—যাহা ব্যাপী নহে। সক্রিয়ং—পরিবর্ত্তনশীল। অনেকম্—বহু। আশ্রিতম্—অধীন। লিঙ্গম্—সগুণ। সাবয়বম্—পরস্পর সংযোগার্হ। পরতন্ত্র—পূর্ব্বতত্ত্বের সাহায্যাপেক্ষ। অব্যক্তম্—অব্যক্ত। বিপরীতম্—পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-সমূহের বিপরীত।

বঙ্গার্থ—এই ব্যক্ত বা বিকাশপ্রাপ্ত বিশ্ব কারণবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, পরিবর্ত্তনশীল, অনেক, অধীন, সগুণ, পরস্পরসংযোগার্হ ও পূর্ব্বতর তত্ত্বের সাহায্যসাপেক্ষ। অব্যক্ত প্রকৃতি এই সমুদয়ের বিপরীত লক্ষণবিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—এই ব্যক্ত জগতে ত্রয়ো-বিংশতি তত্ত্ব আছে, যথা—বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং ইহারা সকলেই "হেতুমৎ"—অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট। ইহারা সকলেই অনিত্য, কারণ ইহারা সকলেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, এবং প্রকৃতিতেই লীন হইয়া থাকে। ইহারা ব্যক্ত অবস্থায় অনিত্য কিন্তু প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হওয়ায় আবার নিত্যও বটে যেহেতু কপিলের মতে ধ্বংস কেবল কার্য্যের, কারণে পুনরাবৃত্তিই মাত্র। প্রকৃতি সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় না; ইহারা পরিবর্ত্তনশীল, অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়; ইহারা অনেক, অর্থাৎ সৃষ্টি মধ্যে বহু আকার ধারণ করিয়া থাকে; ইহারা অধীন—অর্থাৎ প্রত্যেক তত্ত্বই তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর (প্রকৃতি পর্য্যন্ত) পূর্ব্বতত্ত্বের আশ্রিত; ইহারা লিঙ্গযুক্ত—অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন কোন লক্ষণ বা গুণ আছে যদ্দ্বারা ইহাদিগকে অন্যতত্ত্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে জানা যায়; ইহারা পর-স্পরের সহিত যুক্ত হইয়া সৃষ্টি-বিধান করে; ইহারা পরতন্ত্র, অর্থাৎ বুদ্ধি—অহঙ্কার না জন্মান পর্য্যন্ত প্রকৃতির বল অপেক্ষা করে, অন্যান্য তত্ত্বেরও এইরূপ। কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি অহেতুক, নিত্য, ব্যাপী, নিষ্ক্রিয় বা অপরিবর্ত্তনশীল, এক, অনাশ্রিত, লিঙ্গ-রহিত, অনবয়ব ও স্বতন্ত্র। যদিও প্রকৃতির পরিণামহেতু তাহাকে একহিসাবে সক্রিয় বলা যায়, তথাপি বাহ্যিস্পন্দ—অর্থাৎ অবস্থান্তর না থাকা হেতু তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলা যায়।

১১

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম-
চেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত-
স্তথা চ পুমান্॥ ১১

পদপাঠঃ—ত্রিগুণম্। অবিবেকি। বিষয়ঃ। [সা]মান্যম্। অচেতনং। প্রসব-ধর্ম্মি। ব্যক্তম্। [ত]থা। প্রধানম্। তদ্‌বিপরীতঃ। তথা। [চ]। পুমান্।

ব্যাখ্যা—ত্রিগুণম্—ত্রয়ো গুণাঃ (সত্ত্ব-[র]জস্তমাংসি) অস্য ইতি, সত্ত্ব-রজস্তমো[বি]শিষ্ট। অবিবেকি—বিবেকবিহীন। বিষয়ঃ—[জ্ঞা]তব্য বিষয়; পুরুষ বা আত্মাই একমাত্র [বি]ষয়ী, এবং মহৎ বা বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের তাবৎ বস্তুই ঐ আত্মা বা [পু]রুষের গ্রাহ্য বিষয়। সামান্যম্—সাধারণ; [পু]রুষ অসাধারণ, কেননা পুরুষের সহিত অন্য [ক]াহারও স্বজাতীয়তা নাই, প্রকৃতি-জাত তাবৎ [ত]ত্ত্ব এবং তত্ত্বসমূহ-জাত তাবৎ বস্তুর মধ্যে [অ]নেক সাধারণ গুণ পরিদৃষ্ট হয়, এই জন্যই [বল]া হইয়াছে "সামান্যম্"; অচেতনম্—[অ]চেতন, কেবল পুরুষই চেতনাবিশিষ্ট; [বু]দ্ধি-মনঃ-অহঙ্কারাদি পুরুষের জ্ঞান প্রাপ্তির [উপক]রণস্বরূপ। প্রসবধর্ম্মি—ইহারা প্রসব-ধর্ম্মযুক্ত, [অ]র্থাৎ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার [প্র]ভৃতি প্রসূত হয়, কিন্তু পুরুষ হইতে কিছুই [প্র]সূত হয় না, পুরুষ অপ্রসবধর্ম্মী। ব্যক্তম্—[প্র]কাশযুক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রকৃতি-জাত [জা]গতিক তাবৎ পদার্থ। তথা-প্রধানং—[অ]ব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতিও ঐ সমস্ত গুণ-[বি]শিষ্ট। তদ্‌বিপরীতঃ উপরোক্ত গুণ-[সমূ]হের বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী। তথা চ—ও। [পু]মান্—পুরুষ।

বঙ্গার্থঃ—অব্যক্ত প্রকৃতি বা প্রধান এবং ব্যক্ত প্রকৃতিজাত মহৎ বা বুদ্ধি প্রভৃতি অপরাপর জাগতিক পদার্থ ত্রিগুণবিশিষ্ট, বিবেকবিহীন, জ্ঞাতব্য বা গ্রহণ-যোগ্য বিষয়, সমজাতীয়, অচেতন এবং প্রসবধর্ম্ম-যুক্ত, কিন্তু পুরুষ বা জ্ঞাতা, বিবেকী, বিষয়ী, অসামান্য, চেতন, এবং অপ্রসব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

বিশেষ ব্যাখ্যা—বিষয় আর বিষয়ী বিরুদ্ধ-স্বভাবসম্পন্ন, এক অন্যের স্থান অধিকার করিতে পারে না। বিষয় কখনও বিষয়ী হইতে পারে না, কিংবা বিষয়ী কখনও বিষয় হইতে পারে না। কর্ত্তা কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না, কিম্বা কর্ম্ম কখনও কর্ত্তা হইতে পারে না; কর্ত্তা চিরকালই কর্ত্তা, কর্ম্ম চির-কালই কর্ম্ম। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, এই বিশ্ব-জগৎ, এবং জাগতিক তাবৎ পদার্থ আমার বহির্ভাগে; ইহারা বিষয়, আমি বিষয়ী। আমি চক্ষু দ্বারা দেখি, কর্ণ দ্বারা শুনি, মনের দ্বারা সঙ্কল্প করি, এইরূপ তাবৎ জ্ঞান, কর্ম্ম, এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য জগতের জ্ঞান উপলব্ধি করি। ঐ সমুদয় ইন্দ্রিয় আমার জ্ঞাতব্য—অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়। তাহারা "আমি" নহে। "আমি" বিষয়ী, ইহারা সমুদায়ই আমার বিষয়। মানুষ মিথ্যা-জ্ঞানে বিষয়ীতে বিষয়ের ধর্ম্ম এবং বিষয়ে বিষয়ীর ধর্ম্ম আরোপিত করিয়া থাকে। তত্ত্ব-জ্ঞান জন্মিলে, বিষয় এবং বিষয়ী, জ্ঞাত এবং জ্ঞাতা, প্রকৃতি এবং পুরুষে পরস্পরের ধর্ম্ম আরো-পিত হয় না। এই পুরুষই জ্ঞাতা বিষয়ী বা চৈতন্যশক্তিবিশিষ্ট এবং প্রকৃতি জ্ঞাত, বিষয় বা অচেতন। সাংখ্য-মতে পুরুষ বহু, কিন্তু বেদান্ত-মতে পুরুষ একমাত্র তবে প্রকৃতি-জাত গুণ বা উপাধিযুক্ত হওয়ায় বহু প্রতীয়মান হয়েন। জগতে প্রকৃতিজাত যে

সমুদয় বস্তু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তেরই তিনটি গুণ দেখিতে পাই—যথা সত্ত্ব, রজ, তম। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, রজঃ বৰ্দ্ধনাত্মক এবং তমঃ বিনাশাত্মক। বীজ যে অঙ্কুরিত হইল, উহাই সাত্ত্বিক অবস্থা, বীজ অঙ্কুরিত না হইয়া যদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তবে উহাই তামসিক অবস্থা; অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বে বীজের যে অবস্থা ছিল, তাহাকে রাজসিক অবস্থা বলা যায়। মনে কর, কবিতা লিখিতেছি, কিন্তু ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলেও হয়ত শব্দ যুটিতেছে না; বহু কষ্টে উভয়ই আসিল, তখন কবিতাটি লিখিতে পারিলাম। মনের যে অবস্থায় কবিতাটি লিখিতে পারিলাম, ঐ অবস্থাকেই সাত্ত্বিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; এবং যে অবস্থাতে উত্তম চেষ্টা প্রভৃতি হইতেছিল, ঐ অবস্থাকে রাজসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে; আর যে অবস্থায় উত্তম চেষ্টা কিছুই হইতেছে না, মন জড়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে, উহাকেই তামসিক অবস্থা বলা যাইতে পারে। প্রকাশ-অবস্থা সুখের অবস্থা, উত্তম বা চেষ্টার অবস্থা দুঃখের অবস্থা, এবং অপ্রকাশ মোহ বা অজ্ঞানের অবস্থা। প্রকৃতজাত তাবৎ বস্তুই এই ত্রিগুণ অর্থাৎ তিন অবস্থা বিশিষ্ট, ইহারা অবিবেকী। বিবেক—অর্থাৎ বিচার-শক্তি কেবল জ্ঞাতা বা পুরুষের। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়। মন ঐ জ্ঞান অহঙ্কারে উপনীত করে, অহঙ্কার ঐ জ্ঞান বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, পুরুষ বুদ্ধিরূপ দর্পণে ঐ জ্ঞান উপলব্ধি করেন, এবং তাহার কোন্‌টি সৎ, কোন্‌টি অসৎ, তাহার বিচার করেন। পুরুষ প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তু হইতে বিভিন্ন; সুতরাং পুরুষের সমজাতীয় আর কিছুই নাই; কাজেই পুরুষ অসামান্য; কিন্তু প্রকৃতিজাত তাবৎ বস্তুই পরস্পর সমগুণবিশিষ্ট, সুতরাং সামান্য। বুদ্ধি পর্য্যন্ত অচেতন, কারণ তাহা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ মাত্র; পুরুষই কেবল জ্ঞাতা, সুতরাং চেতনাবিশিষ্ট। পুরুষ হইতে কিছুই উৎপন্ন হয় না; পুরুষ চিরকালই পুরুষ রহিয়াছেন, কিছুই প্রসব করেন না; প্রকৃতি এবং তজ্জাত অন্যান্য তত্ত্বাদি হইতেই জাগতিক তাবৎ বস্তু প্রসূত হইয়া থাকে।

পারিব্রাজক সূক্তমালা।

—০:০:০—

দান-সূক্ত।

শিষ্য—কিমুদর্কং ভবেদ্দানং?

অর্থ—দানের উত্তর ফল—অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি? (উদর্কং ফলমুত্তরম্—ইতি কোষঃ)

গুরু—১। জীবদুঃখ-নিরাকৃতিঃ।

অর্থ—জীবের দুঃখ নিবারণ করাই দানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা—পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—

"নাস্তি দানোপমং ধর্ম্ম্যং কার্য্যমন্যৎ জগত্ত্রয়ে।
দানেনামরতামেতি মরোঽস্মিন্ চলভূতলে॥
মৃতোঽপ্যমৃতবদ্দান-বীরো হি স্তূয়তে সদা।
দানোৎসর্গীকৃতপ্রাণো দধীচিস্তন্নিদর্শনং॥
যথাতিচণ্ডবাতেন বেপতে ন হিমাচলঃ।
তদ্বদাপ্রলয়ং দান-বীর-কীর্ত্তির্নকম্পতে॥"

অর্থাৎ ত্রিজগতে দানের তুল্য অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মমূলক কার্য্য নাই। এই বিনশ্বর পৃথিবীতলে মর জীব দানের দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারেন। (১) দান বীর মৃত হইলেও নিরন্তর জীবি

ব্যক্তির ন্যায় সংস্কৃত হইয়া থাকেন। পরোপকারোদ্দেশে সমর্পিতজীবন দধীচিই তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ২। হিমাচল যেমন প্রচণ্ডতম বায়ু-বিক্ষোভেও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয়েন না, তদ্রূপ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দান-বীরের বিশ্ববিকাশিনী কীর্ত্তিও বিন্দুমাত্র কম্পিত হয় না। যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকে, তত দিন দাতার নাম এবং কীর্ত্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিছুতেই ইহার ধ্বংস হয় না। ৩। এতাদৃশ বিশ্বহিতকর দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ নিরাকরণ। এই অবনীমণ্ডলে যে সমুদয় মহাপ্রাণ মহামহিম উদারচেতাগণ কোন প্রকার স্বার্থাভিসন্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া কেবল লোকহিতৈষিণীবুদ্ধি বশতঃ দুঃখীর দুঃখাশ্রু মোচন করিবার জন্য দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই যথার্থ দান-বীর। তাঁহাদের দানই প্রকৃত দান-পদ-বাচ্য। এই মহোচ্চ দানের কথা স্মরণ করিয়াই কালের সাক্ষী কবিবর শ্রীহর্ষদেব বলিয়াছিলেন "যুবানচক্রেঽহল্লিত কল্পপাদপঃ প্রণীয় দারিদ্র্য-দরিদ্রতাং নৃপঃ॥" ভূপৃষ্ঠ হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, ভূমির উপকারের জন্য মেঘমালা যেমন সেই জলই আবার বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী হইতে নানা উপায়ে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক, দয়ালুগণ পৃথিবীর উপকারের জন্যই আবার সেই ধন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। অর্থের যদি কোন প্রকার সদ্ব্যবহার থাকে, তবে তাহা একমাত্র জীবদুঃখ-নাশোদ্দেশে দান বই আর কিছুই নয়। দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই জীবের দুঃখ দূরীকরণ।

শিষ্যঃ—কীদৃশং তৎ প্রশস্তং স্যাৎ?

অর্থ—কিরূপ দান শ্রেষ্ঠ?

গুরুঃ—২। যদন্তরেণ যঃ ক্লিষ্টস্তস্মৈ তদ্দানমুত্তমম্॥

অর্থ—যাহার যাহা ব্যতীত ক্লেশ হয়, তাহাকে তাহা দান করাই উত্তম।

ব্যাখ্যা—যাহার যাহা অভাব, সঙ্গতি থাকিলে, তাহাকে তাহা দেওয়াই উচিত, ইহারই নাম উত্তম দান। যে দেশে পানীয় জলের অভাব, তথায় বাপী-কূপাদি খনন; যেখানে বিদ্যাচর্চ্চার অভাব, তথায় বিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠা, যথায় ভিষক বা ভেষজের অভাব, সেইস্থলে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি সমস্তই এই অনুশাসনের অনুমত। কালচক্রের অপ্রতিবিধেয় নিষ্পেষণে যদিও প্রাচীন মঙ্গলকরী রীতি নীতি সমুদয় নিষ্পেষিত হইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি বর্ত্তমান সময়ে যে স্থানে স্থানে জল-ছত্র, পান্থনিবাস, ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠার অস্তিত্ব দেখা যায়, তাহা একমাত্র এই সংস্কারেরই মুখ্য ফল। প্রতিকূল বাত্যায় প্রায় সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে; তথাপি যাহা কিছু অবশিষ্ট দেখিতে পাই, তাহা এই প্রাক্তন-সংস্কারেরই জীর্ণ প্রকৃতি। নদী শুষ্ক হইলেও, বহুদিন যাবৎ তাহার রেখা বিদ্যমান থাকে। মহামতি আচার্য্য শিষ্যকে বিশ্বজনীন দান-যজ্ঞের ঋত্বিকরূপে পরিণত করিবার জন্য, এতাদৃশ সর্ব্বাভাব-ধ্বংসক দানের শিক্ষা বিধান করিয়া জগতে দানের স্বরূপ এবং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

৩। অসন্ধেয়ফলং শস্তম্॥

অর্থ—ফলাভিসন্ধানবিরহিত দানই প্রশস্ত।

ব্যাখ্যা—প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হইয়া যে দান করা যায়, তাহাই প্রশস্ত দান। জীবের দুঃখ বিনাশ ব্যতীত অন্য কোন

উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী না হইয়া যিনি দান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই যথার্থ দান-বীর-পদ-বাচ্য; নতুবা যাঁহারা দানের মুখ্য উদ্দেশ্যে উদাসীন থাকিয়া, ব্যক্তি বিশেষের সন্তোষ নিমিত্ত বা পদবিশেষের লাভের নিমিত্ত দানচর্য্যা করেন, তাঁহারা প্রকৃত দাতা নহেন, তাঁহারা দাতৃত্ব-কঞ্চুক ধারী পণ্যব্যবসায়ী সাজিয়া স্বস্ব অভিপ্রেত বিষয় সিদ্ধ করিয়া লয়েন,—তাঁহারা দান-বণিক মাত্র। দাতৃনামধারী মহাশয়েরা স্বার্থ-পঙ্কের অতি তুচ্ছ ক্রিমি স্বরূপ। তাঁহাদের দানে জগতের কোন উপকার হয় না; বরঞ্চ নিঃস্বার্থ দাতৃবৃন্দের ভিতর সেই কৃত্রিম প্রথা প্রসারিত হইয়া, জগতের অশেষ এবং বিষম অপকারই সাধন করে। দানের প্রকৃত মূর্ত্তি অন্তর্ধান, এবং কৃত্রিম প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায়, সাত্ত্বিকদানের সংখ্যা মন্দীভূত হইয়া যায়। দানের সুমহান্ উদ্দেশ্য ক্রমেং অতি তুচ্ছতম সঙ্কীর্ণ ভাবে উপনীত হয়। তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন "দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽ নুপকারিণে, দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং" ১৭।২০ "দান করা উচিত" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দেশ কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া নিষ্কামভাবে প্রত্যুপকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে যে দান করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক দান, এবম্বিধ দানই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

"যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥" কিন্তু যাহা প্রত্যুপকার প্রাপ্তির আশা বা অন্য কোন প্রকার ফলাভিসন্ধান পূর্ব্বক অতিকষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়, সেই দান রাজস বলিয়া অভিহিত হয়। রাজোঽভিমানী ব্যক্তিগণই এতাদৃশ রাজসিক দানের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ইহা অপকৃষ্টতর।

"অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।" দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা না করিয়া, সৎকার ব্যতীত এবং অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহাকে তামস বলে। ইহা অপকৃষ্টতম। এতাদৃশ দানের অনুষ্ঠানে দাতা বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

কালধর্ম্মানুসারে দানের প্রকৃত সাধু উদ্দেশ্য লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সাত্ত্বিক দানের সংখ্যা বড়ই কম। রাজস দানের অনুপাতানুসারে সাত্ত্বিক দানের অস্তিত্ব অতি ক্ষীণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। শুধু দান বলিয়া নয়, সময়স্রোতের অপ্রতিহত বেগে ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রায় সমস্তই লোপ পাইতে বসিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী আচার্য্য দান সম্বন্ধে যে মহান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা যদি পালন করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় জীবজগৎ একটি অপূর্ব্ব শান্তি-কাননে পরিণত হয়।

শিষ্যঃ—কো বা তৎ-পাত্রমুত্তমং?

অর্থ—সেই দানের উপযুক্ত পাত্র কে?

গুরুঃ—৪।স্বকর্ম্মানুশয় প্রাপ্তঃ।

অর্থ—নিজের কৃত কর্ম্মের জন্য যে অনুতপ্ত, সেই দানের যথার্থ পাত্র।

ব্যাখ্যা—আত্মকৃত অপকার্য্যের জন্য যাহার চিত্ত সতত অনুতাপের অনন্ত বৃশ্চিক-দংশনে কাতর, স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের অপকারিতা ভোগ বা চিন্তা করিয়া, যাহার দেহ মন প্রাণ অবসন্ন, তাদৃশ ব্যক্তি যথার্থই দয়ার পাত্র; তাহাকে দান করিলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক দানের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়।

পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—"পাপানি ক্ষয়মায়ান্তি পাপিনোঽনুশয় ক্রমাৎ। ন কঠোরতমঃ কশ্চিৎ দণ্ডোঽস্ত্যনুশয়াদৃতে॥ দণ্ডক্লেশভয়াৎ পাপী ন পাপাদ্বিরতো ভবেৎ। নৈব দংশাৎ নিবর্ত্তেত ব্যালো দণ্ডিতোঽপি সহস্রধা। কেবলং বিরমেৎ পাপাৎ পাপীয়োঽনুশয়ং গতঃ। তস্মাদনুশয় প্রাপ্তঃ কৃপামর্হতি সর্ব্বতঃ" অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবেই তাহার সেই পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অনুতাপ অপেক্ষা কঠোরতম দণ্ড অন্য কিছু নাই। সর্প যেমন সহস্র প্রকারে দণ্ডিত হইলেও দংশন হইতে নিবৃত্ত হয় না, তদ্রূপ পাপী ব্যক্তি দণ্ডজনিত ক্লেশশঙ্কায় কদাপি পাপ-লিপ্সা পরিহার করিতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বীয় দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই পাপীই পাপ কার্য্য হইতে বিরত হয়। অতএব পাপী ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়, তবে সে সকলের নিকটেই কৃপা পাইবার যোগ্য। এই সমুদয় নীতিগর্ভ বাক্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, স্বকীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত বিকৃত ব্যক্তিকে সাধ্যানুসারে দানাদি দ্বারা প্রকৃতিস্থ করা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত। শুধু পাপী বলিয়া নয়, অপরিণামদর্শিতা বা অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি যে কোন দোষে মানব বিপন্ন হইলে, যদি তাহার স্বকীয় তারল্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, এবং যদি যে দানাকাঙ্ক্ষী হইয়া উপযাচমান হয়, তবে তাহাকে দান করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দিতে হইবে, সত্য, কিন্তু স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য যদি কেহ অভাবগ্রস্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র নহেন; তবে, যদি তাঁহার স্বকার্য্য-জনিত অনুতাপ জন্মে, তাহা হইলে তিনি দানের পাত্র; এই সূক্তে তাহাই বলা হইল।

৫। তথা দৈব-বিড়ম্বিতঃ।

অর্থ—দৈববিড়ম্বিত ব্যক্তিও দানের উপযুক্ত পাত্র।

ব্যাখ্যা—যে যে কোনভাবে দৈবকর্ত্তৃক নিগৃহীত হউক না কেন, সে দানপ্রার্থী হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ দান করা বিধেয়। মনে কর, কোন উদারচেতা ব্যক্তি সমাজের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, একটি সুদুষ্কর মহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া, বিধি-বিড়ম্বনে যদি তাহাতে সফলকাম হইতে না পারেন, এবং সেই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত বা অন্য কোন প্রকারে দুরুত্তর বিপদসাগরে পতিত হইতে হয়, তবে তাদৃশ দৈব-পীড়িত মহাত্মাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলেরই উচিত। যে দেশে এরূপ ক্ষেত্রে সহানুভূতি নাই, সে দেশ কোনদিন উন্নতির ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে পারে না। সে দেশে কোন প্রকার সুমহৎ অনুষ্ঠান আরব্ধ হয় না। তাদৃশ সহানুভূতি-বিহীন সমবেদন-শূন্য দেশ চিরদিনই সঙ্কোচজ্ঞানের অন্ধতমসে নিমগ্ন থাকে; কোন কালেও তাহার অভ্যুদয় হয় না। এই প্রকার বিশেষ হইতে সমান্যভাবেও যে দুর্ভাগ্যবশে বিপন্ন হয়, সে সকলেরই করুণার পাত্র। অস্মদ্দেশে প্রায়শই দৃষ্ট হয় যে, দৈববিড়ম্বনে ধান্যাদি শস্য বিনষ্ট হইলে কৃষকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা কাহারও নিকট তাদৃশ সাহায্য-প্রাপ্ত হয় না; ইহারা নিজের সম্পূর্ণ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়াছে, দুরদৃষ্ট-ক্রমে সমস্ত ব্যর্থ হইল,

সমাজেরও সাহায্য পাইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ঝটিকার প্রাবল্যে গৃহাদির বিনাশ হইল, দরিদ্র গৃহী পথের ভিখারী হইয়া পড়িল, এতাদৃশ স্থলে আমাদের দেশে প্রথা এই যে, ধনিগণ এই সময়ে টাকা ধার দিয়া বিপন্নদিগের যথেষ্ট উপকার করিলেন, ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু ফলে দাঁড়ায় এই যে, ইহাতে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হইয়া পড়ে; ঐ ঋণের জন্য ক্রমশঃ বিড়ম্বিত হইয়া শেষে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অগ্নিতে গৃহদাহ হইলে পূর্ব্বে প্রতিবাসিগণ যথেষ্ট সাহায্য করিত, এখন যদিও স্থানে স্থানে ঐ সাহায্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্রমশই উহা উঠিয়া যাইতেছে। এবম্বিধ স্থলই দানের প্রকৃত প্রয়োগস্থল। যাহারা উপার্জ্জনক্ষম, যাহারা বলিষ্ঠ, তাহারা কোন প্রকার ভেল ধরিয়া—অর্থাৎ ফকির বা বৈষ্ণব সাজিয়া লোকালয়ে দানের প্রধান পাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিড়ম্বিত—চলচ্ছক্তি-রহিত, তাহাদিগকে দান করা হয় না। কতগুলি সমর্থ লোককে সাহায্য করিয়া, জগতে তাদৃশ অপকৃষ্ট-প্রকৃতি লোকের প্রসার বৃদ্ধি করা নিতান্ত গর্হিত। অতএব যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দৈব-বিড়ম্বিত, তাহারাই দানের উপযুক্ত পাত্র।

৭। নালস্য-জীবিনে দেয়ং সামর্থ্যশালিনে ক্বচিৎ।

অর্থ-আলস্য-জীবী সামর্থ্যশালী ব্যক্তিকে দান ক্রিয়া নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা—সামর্থ্য সত্ত্বেও অলসতাই যাহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাদৃশ অলস শক্তিমত্তা সত্ত্বেও অশক্তবৎ প্রতীয়মান ব্যক্তিদিগকে কদাচ দান করা উচিত নহে। ঈদৃশ পাত্রে দান করিলে তাহাতে জীবের দুঃখ ধ্বংস না হইয়া প্রকারান্তরে দুঃখের প্রসারই বর্দ্ধিত হয় মাত্র। এই সমুদয় অসদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ নিবন্ধন সমাজের মজ্জা স্বাবলম্বন ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী সমাজ চিরদিনের মত অবনত হইয়া পড়ে। যে সমাজে স্বাবলম্বনের প্রাচুর্য্য নাই, আত্ম-নির্ভরের বাহুল্য নাই, সে সমাজের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র। স্বাবলম্বনহীন দেশ বা সমাজ কখনও উন্নত হয় না। অতএব এবম্বিধ ক্ষেত্রে কতকগুলি অলসের প্রশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক দেশ-সংহার করা অপেক্ষা দান ক্রিয়া হইতে বিরত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

৮। ন ভিক্ষাব্যবসায়িভ্যঃ।

অর্থ—ভিক্ষা-ব্যবসায়ীদিগকেও দান করা অনুচিত।

ব্যাখ্যা—শারীরিক শ্রম-লব্ধ জীবিকার্জ্জন অপেক্ষা যে সমুদয় নির্ঘৃণ পরমুখপ্রত্যাশী ব্যক্তিগণ "ভিক্ষা" এই ব্যবসায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সুচতুর এবং সুখী মনে করে, স্বোপার্জ্জিত বৃত্তি অপেক্ষা পরার্জ্জিত-প্রার্থনাই যাহারা শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করে, তাদৃশ ছল-কঞ্চুক নীচমনাদিগকে দান করা কদাচ বিধেয় নহে। ইহাতেও প্রাগুক্ত দোষের প্রসক্তি জন্মে। তবে যাহারা অচল, পঙ্গু বা রোগান্তরে অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র; কেননা তাহারা ভিক্ষা-ব্যবসায়ী নহে। তাহারা দুর্দৈব কর্তৃক বিড়ম্বিত, অতএব সেই সকল দৈবপীড়িত দিগকে দান করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা ৫ম সূত্রেই সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

৯। ন বাতিরিচ্য বর্ত্তনং।

অর্থ—বর্ত্তন শব্দের অর্থ বৃত্তি—অর্থাৎ

অবস্থা (আজীবো জীবিকা বার্ত্তা বৃত্তির্বর্ত্তন-জীবনে ইতি অমরঃ)। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত দান অনুচিত। (৭ম সূত্রস্থ "দেয়ং" এই পদ ৯ম সূত্র পর্য্যন্ত অনেুতব্য)।

ব্যাখ্যা—বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন—"অসমঞ্জসতামেতি হ্যসমঞ্জসকারকঃ। নিদানং সর্ব্বদুঃখানাং অসমঞ্জসভাবনা"। অসমঞ্জস কারক—অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই যে ব্যক্তি কার্য্য করে, যাহার কর্ম্মে কার্য্য-কারণের সুসঙ্গতি নাই, সে প্রতিপদেই বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়, তাহার যাবতীয় কার্য্যই দুর্ব্যবস্থ হইয়া পড়ে। এই ভূমণ্ডলে অসম্ভাবনাই তাবৎ দুঃখের মূল। সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে, সর্ব্ববিষয়ে তুল্যদৃষ্টি থাকিলে, মানবকে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয় না, বা দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অতএব দানকর্ত্তাও যদি দানানুষ্ঠানের সময়—স্বীয় অবস্থানুসারে দান করেন, তাহা হইলে, তাঁহাকেও পরিণামে অনুশোচিত হইতে হয় না। বিশৃঙ্খলতার বিষময় প্রদাহ তাঁহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না। স্বকীয় সামর্থ্য বিবেচনা না করিয়া দান করিলে, সে দানের প্রশংসা করা যায় না। লোকহিতকর সাধু অনুষ্ঠানও অবিমৃশ্যকারিতাদোষে সময় সময় অসৎ কার্য্যবৎ নিন্দিত হইয়া থাকে। জগতে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তাই মতিমান্ আচার্য্য শিষ্যকে এযাবৎ দান ক্রিয়ার অনুপম আদর্শ পরিদর্শিত করিয়া, অধুনা প্রণয়াস্পদ শিষ্যের মঙ্গলাভিলাষে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে অনুমতি করিলেন। যে স্থলে অবস্থানুসারে ব্যবস্থার অভাব, তথায় প্রতিনিয়তই শত অনর্থ-পাত আপতিত হইয়া ঘোর অশান্তির উৎপাদন করে। শ্রুতি বলিয়াছেন—। "শ্রিয়া দেয়ম্" অর্থাৎ নিজের সম্পদনুসারে দান করা উচিত।

১০। শ্রেয়ং ব্যক্তিগতাদ্ দানাৎ সমাজগতমুত্তমম্।

অর্থ—ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজ-গত দান সর্ব্বোত্তম।

ব্যাখ্যা—কোনও ব্যক্তিবিশেষকে দান করিলে তাহাতে তাহারই উপকার হয় মাত্র, তাহাতে জগতের কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয় না; কিন্তু সমাজ-গত দানে একটা হীনাবস্থ সমাজ উন্নত হইলে, দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, সমাজগত দানে সমাজস্থ তাবৎ ব্যক্তিই উপকৃত হয়েন। দেশের অভ্যুদয়প্রত্যাশী ব্যক্তিগণের প্রত্যেকেরই স্মরণ করা উচিত যে, যতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক উন্নতি না হইবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব। সমাজসমষ্টি লইয়াই দেশ। অতএব দেশের অস্থি-মজ্জা স্বরূপ সমাজের সংস্কার ব্যতীত দেশ অভ্যুদিত হইবে কি প্রকারে? প্রতিমা-বিহীন পঞ্জর কি পূজিত হইয়া থাকে? যিনি যতই দেশহিতৈষণা হৃদয়ে ধারণ করুন না কেন, কিন্তু যাবৎকাল তাঁহার দৃষ্টি সমাজের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পর্য্যন্তও পরিচালিত না হইবে, তাবৎ তাঁহার পক্ষে দেশোপকার বিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশ-প্রেমের মূলে সমাজানুরক্তি চাই, সমাজ-দৃষ্টি-বিরহিত স্বদেশ-প্রেম কল্পনার পুত্তলিকাপ্রায়; তাহার বাস্তব কোন প্রতিকৃতি নাই। যে দেশে সমাজগত উন্নতির প্রতি লক্ষ্য নাই, সে দেশের পরিণাম প্রগাঢ় তিমিরাবৃত; ভবিতব্যতার দুর্নিরীক্ষ্য আলেখ্য প্রতি বিবেক-নয়নে দৃষ্টি করিলে, সেই দেশের

অননুভবনীয় পরিণতির করাল ছায়া অবলোকন করিয়া শিহরিত হইতে হয়। তাই প্রাজ্ঞ প্রবীণ পরিব্রাজক, ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা, সমাজগত দানের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভূতলে দেবভাবাপন্ন পরহিত-সর্ব্বস্ব ৺ ভূদেব বাবুর প্রবীণ হৃদয় ব্যক্তিগত দান অপেক্ষা সমাজগত দানের প্রভূত উপকারিতা অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই তিনি চিরজীবন সংযত থাকিয়া পরিশেষে সমাজবিশেষের মঙ্গলোদ্দেশে সর্ব্বস্ব অঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক সাত্বিক দান-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতকর অনুষ্ঠান, অস্মদ্দেশবাসী ধনকুবেরগণের প্রত্যেকেরই অনুকরণীয়। নতুবা এই অধঃপতিত দেশের পুনরুত্থান-আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। সম্প্রতি বোম্বে প্রদেশে মহামতি টাটা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। লাহোরের সর্দ্দার দয়াল সিংহ প্রায় ৪। ৫ লক্ষ টাকা উইলের দ্বারা দান করিয়াছেন। এই প্রকার দানের দ্বারা সমাজের অনেক ব্যক্তির উপকার হয়; ইহাতে তাঁহারা উন্নতি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এবং পরিণামে তাঁহাদের দ্বারাও অনেকে উপকৃত হইতে পারেন। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দান করা অপেক্ষা যে দানের স্থায়িত্ব বংশানুক্রমে বিদ্যমান থাকে, তাদৃশ স্থায়ী দানই শ্রেষ্ঠ, দেশের যাহাতে দারিদ্র্য ধ্বংস হয়, দেশ যাহাতে ধনী হইতে পারে, সেই প্রকার দানই হিতকর। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায় যাহাতে উন্নত হয়, দেশ যাহাতে দারিদ্র্য-শূন্য হয়, অস্মদ্দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান অতি বিরল, সুতরাং ব্যক্তিগত দানের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশ এত দরিদ্র, এত নিঃস্ব; এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে তাদৃশ অনুষ্ঠান থাকাতেই সেই সমুদয় দেশ অত সমুন্নত।

১১। দানাদপি শুভাং বিদ্ধি দানীয়-বিরহক্রিয়াম্।

অর্থ—দান অপেক্ষা যাহাতে দানপাত্রের অভাব হয়, তাহা করা আরও উৎকৃষ্ট।

ব্যাখ্যা—যে দেশে দান-প্রার্থীর সংখ্যা যত অধিক, বুঝিতে হইবে, সে দেশ তত দরিদ্র, অতএব দানপ্রার্থীর সংখ্যার হ্রাস করিতে পারিলেই দেশের প্রকৃত উপকার করা হয়। যাহাতে মানুষের কার্য্যকরী শক্তি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে মানব শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভা-প্রভাবে আত্ম-নির্ভর দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহিত করিতে পারে, তাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান দানক্রিয়া হইতে শতধা উচ্চস্থানভাগী। ব্যবসায় বাণিজ্যে শিল্প-কৃষি প্রভৃতির বিস্তার, অভিনব উপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার, দীন দুঃখী দিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া কর্ম্মক্ষম করিয়া উঠান প্রভৃতি কার্য্য যে কতদূর মঙ্গল-জনক, তাহা ভাষার অতীত। নিঃস্ব দরিদ্রগণ যাহাতে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বন করিতে পারে, দেশস্থ তাবতে যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আত্মনির্ভর করিতে সমর্থ হয়, অবাধে স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরিবার-প্রতিপালন করিতে পারে, তাদৃশ অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা সর্ব্বথা স্তুতিযোগ্য। বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক শিক্ষা বিস্তার করিয়া, বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, সকলকে তাহাতে উৎসাহিত করা এবং তাহার স্বাধীন-জীবতা সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া

প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক এবং যথার্থ দানবীর বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা এবম্প্রকারে দেশের দানীয়—অর্থাৎ দান-পাত্রের অভাব সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ এইরূপভাবে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করাইয়া সকলকে স্বাধীন-জীবতার মধুময় রস আস্বাদিত করাইতে পারেন, তাঁহারা প্রকৃতই দেবতা। তাঁহাদের দ্বারাই জন্মভূমি যথার্থ পুত্রবতী এবং পৃথিবী বসুন্ধরা নামের সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েন। অতএব যাহাতে সমাজস্থ তাবতেই শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, যাহাতে সাধারণের উপার্জ্জনের পন্থা প্রসারিত হয়, তাদৃশ অনুষ্ঠান দানানুষ্ঠান অপেক্ষা সহস্র প্রকারে প্রশংসনীয়।

যে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা যত অধিক, সে দেশে দানের পাত্র তত বেশী। সুতরাং দরিদ্রের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলেই দানপাত্রের হ্রাস করা হয়। যে দান গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, সে তাহাতে তত সুখী হয় না, কেননা পরাবলম্বন-জ্ঞান তাহার মনকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করে। সুতরাং তাহাকে যদি স্বাবলম্বনের পথ দেখাইয়া দেওয়া যায়, এবং সেই স্বাবলম্বনের পথ দেখাইতে যদি কিছু দান করিতে হয়, তবে তাহা করাই শ্রেয়; ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েরই তৃপ্তি। মনে করুন, কোন ব্যক্তি উপার্জ্জনের কোন পন্থা জ্ঞাত নহে; সে স্থলে, তাহার প্রাত্যহিক বৃত্তি প্রদান অপেক্ষা তাহাকে উপার্জ্জনক্ষম করিয়া দিলে আর তাহার দৈনিক বৃত্তি প্রদানের আবশ্যকতা রহিল না, এবং সে নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিলে, পরিণামে তাহার কৃত দানেও অনেকে ঐ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে, এবং তাহাহইলেই দাতার সেই পূর্ব্বকৃত দান পল্লবিত হইয়া সহস্র মূর্ত্তিতে সমাজের প্রভূত উপকার করিতে পারে।

কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

—— ০:০:০ ——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ।
অগ্নের্জ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যাভরৎ॥

অন্বয়ঃ—সবিতা তত্ত্বায় প্রথমং মনঃ ধিয়ঃ (চ) যুঞ্জানঃ (সন্) অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচায্য পৃথিব্যাঃ অধি আভরৎ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা—তত্ত্বায় মম তত্ত্বজ্ঞান-লাভায়, আমার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য। ধিয়ঃ—বাহ্য বিষয়জ্ঞানানি যদ্বা—প্রাণান্—তথাচ শ্রুতিঃ—"প্রাণা বৈ ধিয়ঃ; বাহ্য বিষয় জ্ঞান কিম্বা প্রাণ, যুঞ্জানঃ—পরমাত্মনি সংযুজ্য পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া। নিচায্য—সংগৃহ্য যদ্বা দৃষ্ট্বা—সংগ্রহ করিয়া কিংবা দর্শন করিয়া। পৃথিব্যা অধি—অস্মিন্ শরীরে, এই শরীরে। আভরৎ আহরৎ—আহরতু ইতিভাবঃ, আনয়ন করুন।

বঙ্গার্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসনে ধ্যানের পরমাত্মদর্শনোপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে (ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ)।

অধুনা সেই ধ্যানের প্রণালী বিশদীকৃত করা যাইতেছে। ধ্যানারম্ভের প্রাক্কালে সংযত-চিত্ত এবং বহির্ব্যাপার-নির্লিপ্ত হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবার জন্য এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে যে, পরম তেজস্বী মার্ত্তণ্ডদেব আমার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য—অর্থাৎ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, ধ্যানারম্ভের প্রথম হইতেই মদীয় চিত্ত এবং বহির্বিষয়জ্ঞান পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিয়া, ও পরমদীপ্তিমান্ অগ্নির জ্যোতি সংগ্রহ করিয়া, আমার এই শরীরে প্রতিষ্ঠাপিত করুন, বা আনয়ন করুন। অর্থাৎ তেজো-নিধান সবিতা, অগ্ন্যাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেববৃন্দের বিশ্বপ্রকাশিকা শক্তি আমাতে প্রকাশিত করুন। ব্যাখ্যান্তর যথা—ধ্যানের আরম্ভ কালে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশে অভি-নিবিষ্ট হইয়া, যোগমার্গের অপরিহার্য্য অন্তরায় বহির্বিষয়জ্ঞান হইতে চিত্ত সংযত করিয়া এবং একান্ত সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে মনঃ-সংযোগ-পূর্ব্বক তেজস্বী সবিতৃদেবের উপাসনা করিবে। কেননা, জগৎ-প্রকাশক সবিতা সেই পরমজ্যোতিঃ পরমাত্মার তেজোময়াত্মক অগ্নির প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেজঃপ্রকাশে উদ্ভাসিত করিতেছেন। ইন্দ্র চন্দ্রাদি অপরাপর অনুগ্রাহক দেবতাগণ সেই পরাৎপরের পরমোচ্চ প্রসাদবলেই স্বকীয় প্রভুত্ব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। এই জগতীতলে, যে সমুদয় আশ্চর্য্য কার্য্য বিশ্ব-নয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডবক্ষে যে সকল বিভূতিময় পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তৎ সমস্তই সেই পরম পুরুষের পরমা বিভূতির অত্যদ্ভুত মহিমার ফল।

(২)

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। স্বুবর্গেয়ায় শক্ত্যা।

অন্বয়ঃ—বয়ং যুক্তেন মনসা দেবস্য সবিতুঃ সবে, স্বুবর্গেয়ায় শক্ত্যা (প্রযতামহে)

বিষম পদব্যাখ্যা—যুক্তেন—পরমাত্মনি সংযোজিতেন, পরমাত্মাতে সংযুক্ত। সবিতুঃ সূর্য্যস্য, সূর্য্য দেবের। সবে—অনুজ্ঞায়াং সত্যাং, অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া অর্থাৎ অধীন থাকিয়া। স্বুবর্গেয়ায়—(ছান্দসং) স্বর্গায় ইত্যর্থঃ স্বর্গপ্রাপ্তয়ে পরমার্থলাভায়, স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য অর্থাৎ পরমার্থ লাভের জন্য অথবা স্বুবর্গেয়ায়—স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ম্মণি, স্বর্গলাভের হেতুভূত পরমাত্ম-চিন্তনে। শক্ত্যা যথাসামর্থ্যং, যথাসাধ্য। প্রযতামহে প্রযত্ন করিব। "শক্ত্যা" এই স্থলে কোন পুস্তকে 'শক্ত্যৈ" এতাদৃশ চতুর্থ্যন্ত পাঠ দৃষ্টিগোচর হয়, তাদৃশ পাঠেও চতুর্থী বিভক্তিকে "ছান্দস" স্বীকার করিয়া, ঐ পদের তৃতীয়ান্ত অর্থই করিতে হইবে।

বঙ্গার্থ—আমরা পরমাত্মায় সংযুক্ত, এবং আত্মদৃষ্টির জন্য একান্ত সমাহিত অন্তঃকরণের সহিত পরমদেবতা সবিতার অনুজ্ঞার বশবর্ত্তী থাকিয়া, পরমার্থ লাভের জন্য কিংবা স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যেন যথাসাধ্য প্রযত্ন করি।

ব্যাখ্যান্তর যথা—আমরা যে সময়ে পরমাত্মতত্ত্ব নির্দ্দেশের নিমিত্ত, পরমাত্মায় মনোঽভিনিবেশ পূর্ব্বক দেহেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা বিধান করিব, সেই সময়ে পরমার্থলাভের হেতুভূত পরমাত্মচিন্তনে যথাসাধ্য যত্নশীল হইব। এবম্প্রকারে অধ্যবসায়সহকারে আত্মচিন্তা এবং আত্মদৃষ্টি করিতে পারিলে অনুপম আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়।

(৩)

যুক্ত্বায় মনসা দেবান্ সুবর্যতো ধিয়া দিবম্।
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্।

অন্বয়ঃ—সুবর্যতঃ (তথা) ধিয়া দিবং বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ দেবান্ মনসা যুক্ত্বায় (যুক্ত্বা ইত্যর্থঃ), সবিতা তান্ প্রসুবাতি।

বিষমপদব্যাখ্যা—সুবঃ—স্বর্গং পূর্ণানন্দ-ব্রহ্ম (যত ইতি শতৃপ্রত্যয়ান্তক্রিয়াপদস্যকর্ম্ম) স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্ম। যতঃ—গচ্ছতঃ (ইধাতু শতৃদ্বিতীয়াবহুবচনং) গমনকারী। (দেবান্ ইতি পরস্থ কর্ম্মণো বিশেষণমেতৎ)। পুনরপি বিশেষণমাহ—ধিয়া—সম্যগদর্শনেন, সম্যক্ দর্শন দ্বারা। দিবং—দ্যোতন-স্বভাবং চৈতন্যৈকরসমিতিভাবঃ, দ্যোতনস্বভাব অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় চৈতন্যাত্মক। বৃহৎ—মহৎ, ব্রহ্ম। জ্যোতিঃ প্রকাশং, প্রকাশ। করিষ্যতঃ দেবান্ ইত্যেতস্য-বিশেষণান্তরং। দেবান্—করণানি মন আদীনি ইন্দ্রিয়ানি, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নিচয়। যুক্ত্বায় (ছান্দসং) যুক্ত্বা—সংযুক্ত করিয়া। সবিতা সূর্য্যদেব। তান্—প্রাগুবর্ণিতান্ দেবান্ করণানীত্যর্থঃ, পূর্ব্ব-কথিত ইন্দ্রিয় সমূহ। প্রসুবাতি—, তথা কর্ত্তুং অনুমন্যতাং, যথা করণানি বিষয়েভ্য নিবৃত্তানি সন্তি আত্মাভিমুখানি ভূত্বা আত্মপ্রকাশং লভেরন্, সবিতা তথাবিধং করোতু ইতি বিশদার্থঃ। সেই প্রকার করিতে অনুমতি করুন, অর্থাৎ যে প্রকারে আমার ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়-বাসনা হইতে নিবৃত্ত এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মপ্রকাশ লাভ করিতে পারে, যোগাধিদেব সূর্য্য আমার ইন্দ্রিয় নিচয়কে, তাদৃশ ভাবে নিযুক্ত করুন।

বঙ্গার্থ—স্বর্গ অর্থাৎ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাভিমুখে গমনোদ্যত এবং সম্যক্প্রকারে তত্ত্ব-দর্শন দ্বারা অনন্তজ্যোতিষ্মান্ পরম ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ, ইন্দ্রিয় সমূহকে মনের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া, অর্থাৎ বাহ্য এবং আন্তরিক তত্ত্বনিবহ একসূত্রে সংবদ্ধ করিয়া, যাহাতে, ইন্দ্রিয়-নিচয় নিরন্তর তাদৃশ কার্য্য (ব্রহ্মের ধ্যান-মনন ইত্যাদি) করিতে পারে, যোগাধিদেব সবিতা তাহাদিগকে তাহা করিবার জন্য আদেশ করুন।

বিশেষ ব্যাখ্যা—ধ্যানারম্ভ সময়ে সূর্য্য-দেবের সন্নিধানে পুনরায় এবম্বিধ প্রার্থনার ব্যপদেশে আত্মদৃষ্টি, আত্মানুসন্ধান, এবং আত্মত্যাগ অভ্যাস করিতে হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-নিচয় স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্বান্বেষণে অভিনিবিষ্ট হউক। অর্থাৎ অস্মদিন্দ্রিয়াদির যে সমুদয় নিত্য গ্রাহ্য অসত্য বিষয় আছে, সেই সমুদয় হইতে বিরত হইয়া, তাহারা সেই অমৃতময় সত্য বিষয়-গ্রহণে আসক্ত হউক। আমরা ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখি, শুনি বা আলোচনা করি, তৎসমস্তই অনিত্য এবং অশান্তি-পরিণামক, এই বিশ্বমণ্ডলে প্রকৃত দেখিবার, শুনিবার বা আলোচনা করিবার জিনিষ মাত্র এক। তিনি সত্য, সুদর্শন, সুখাত্মক ও সুবিমল। অতএব আমাদের নয়ন যেন অলীক বাহ্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ না হইয়া, সেই চিরানন্দ চিরন্তন রূপলিপ্সার বশবর্ত্তী হয়, শ্রবণ যেন আশুরম পার্থিব শ্রোতব্যের প্রতি আসক্ত না হইয়া, সেই সুখশ্রাব্য পরমব্রহ্মবিভূতিপ্রকাশক ওঙ্কার গীতির প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে, এবংপ্রকারে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণই যেন সর্ব্বতোভাবে বহির্বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত

হইয়া আন্তরতত্ত্বসমূহকে স্ব স্ব জ্ঞান-বিষয়ীভূত করিতে যত্নবান হয়, এইভাবে উপাসনার পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া, বহির্ম্মুখীন প্রবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখীন করিতে পারিলেই উপাসকের সম্মুখে বন্ধুর এবং দুরারোহ ধ্যানমার্গ অতি সুগম সমতল বীথিকার ন্যায় প্রতীত হয়।

(৪)

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো
বিপ্রা বিপ্রস্য বৃহতো বিপশ্চিতঃ।
বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক ইন্‌
মহী দেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ॥

অন্বয়ঃ—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে, উত ধিয়ঃ যুঞ্জতে, (তৈঃ) বিপ্রস্য বৃহতঃ বিপশ্চিতঃ দেবস্য সবিতুঃ, মহী পরিষ্টুতিঃ (বিধেয়াইতিশেষঃ) বয়ুনাবিৎ একঃ (সবিতা) ইৎ হোত্রাঃ বি-দধে।

বিষমপদব্যাখ্যা—যে বিপ্রাঃ মনঃ যুঞ্জতে পরমাত্মনি যোজয়ন্তি, যে সমুদয় সাধক বিপ্রগণ মন পরমাত্মায় সংযোজিত করিতে পারেন। উত—অথবা। ধিয়ঃ—ইতরাণি ইন্দ্রিয়াণি, অপরাপর ইন্দ্রিয় সমূহকে। বুদ্ধি দ্বারাই ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় বলিয়া এস্থলে বুদ্ধির নামান্তর ধীশব্দ কর্ত্তৃক ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরামর্শ করা হইয়াছে। বিপ্রস্য বিশেষণব্যাপ্তস্য, সর্ব্বব্যাপী। বৃহতঃ-মহতঃ, অতি মহান্। বিপশ্চিতঃ—বিপ্রকৃষ্টং চিনোতি ইতিবিপশ্চিদ্ তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বজ্ঞ, দেবস্য—পরম দেবতা। সবিতুঃ—সূর্য্যের। মহী—মহতী প্রশস্তা। পরিষ্টুতিঃ—প্রকৃষ্ট স্তব, স্তোত্র। (বিধেয়া এই অধ্যাহার্য্য পদের সহিত অন্বেতব্য)। বয়ুণাবিৎ—প্রজ্ঞাবিৎ সর্ব্বসাক্ষীভূতঃ ইত্যর্থঃ—সকল বিষয়ের সাক্ষিস্বরূপ। একঃ—অদ্বিতীয়। ইৎ—এব, নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। হোত্রা—হোত্রাণি (বৈদিকমিদং পদং) হবনাদি-ক্রিয়া। বিদধে-বিধান করিয়া থাকেন।

বঙ্গার্থ—যে সমুদয় বিপ্রবৃন্দ মন এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়-নিচয় বহির্বিষয় সমূহ হইতে উপসংহৃত করিয়া পরমাত্মাতে যোজিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বব্যাপী, মহান্, এবং সর্ব্বজ্ঞ সূর্য্যদেবের মহতী স্তুতি অবশ্য-কর্ত্তব্য। কেননা, পরম প্রজ্ঞাশালী সবিতৃদেবই জাগতিক ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষিস্বরূপ। তিনি অশেষ কর্ম্মজ্ঞ এবং তিনিই হবনাদি যাবতীয় ক্রিয়ার একমাত্র বিধানকর্ত্তা। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন সমাহিত করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ সূর্য্যদেবের পরম দীপ্তির ধ্যান করিতে করিতেই সেই বিশ্বপ্রকাশক পুনরাবৃত্তিরূপ প্রগাঢ় অন্ধকার বিনাশক পরমপুরুষের পরমজ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। অতএব যোগজীবন বিপ্রবৃন্দের পক্ষে সূর্য্যোপাসনাই কৈবল্য-পদপ্রাপ্তির নিদানীভূত

(৫)

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নমোভি
র্বিব শ্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

অন্বয়ঃ—বাং পূর্ব্ব্যং ব্রহ্ম নমোভিঃ যুজে (অহমিতিশেষঃ)। (মম) শ্লোকঃ সূরেঃ পথি এব বি এতু। (ভোঃ) অমৃতস্য বিশ্বে পুত্রাঃ, যে দিব্যানি ধামানি আতস্থুঃ, (তে ভবন্তঃ) শৃণ্বন্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা—বাং—যুষ্মাকং (অমৃতস্য পুত্রাণাং ইত্যর্থঃ অত্র বহুত্বে দ্বিত্বনির্দ্দেশো বৈদিকঃ;) অথবা বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহ-

করয়োঃ সম্বন্ধিপ্রাকাশুত্বেন তাভ্যাং করণানু-গ্রাহকাভ্যাং প্রকাশিতম্ ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তোমাদের (অমৃতের পুত্রগণের) অথবা ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ানুগ্রাহক দেবতা, এতদুভয়ের প্রকাশিত (ব্রহ্ম এই পদের বিশেষণ)। পূর্ব্ব্যং—পূর্ব্বেভূতং চিরন্তনং—চিরন্তন। ব্রহ্ম—ব্রহ্মকে-নমোভিঃ--নমস্কারৈঃ--চিত্তপ্রণিধানাদি-ভিরিত্যর্থঃ। নমস্কার—অর্থাৎ চিত্তপ্রণিধানাদি দ্বারা। যুজে—সমাদধে, আমি সমাধান করি। শ্লোকঃ—শ্লোকাতে—পরিকীর্ত্ত্যতে, স্তূয়তে বা অসৌ ইতি শ্লোকঃ—স্তুত্যঃ পরিকীর্ত্তনীয় ইতিযাবৎ, স্তবার্হ বা পরিকীর্ত্তনীয় অর্থাৎ আমি যাঁহার স্তব করিতেছি বা বিশ্ববাসিগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, সেই পরমপুরুষ। সূরেঃ—সাধোঃ—সাধুর। পথি—মার্গে, সূরেঃ—পাথি—সন্মার্গে বি—এতু-বিশেষভাবেন আগচ্ছতু-প্রকাশিতো ভবতু ইতিভাবঃ—বিশেষরূপে প্রকাশিত হউন। অমৃতস্য—ব্রহ্মণঃ-ব্রহ্মের। বিশ্বে-সমগ্র সমুদয়। পুত্রাঃ—পুত্রগণ। যে দিব্যানি ধামানি আ তস্থুঃ—যে তোমরা নিয়ত দিব্য ধামে অবিষ্ঠিত রহিয়াছ, সেই তোমরা। শৃণ্বন্তু—আমার এই প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ কর। 'পথ্যেব' এই পদের এপ্রকার ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে যে—(মম) শ্লোকঃ—ময়াকৃতং বাক্যং, অহম্ যদ্ যদ্ কথয়ামি, যানি যানি বাক্যানি মম কণ্ঠাৎ বহির্গচ্ছন্তি, তানি' সমস্তানি, "সূরেঃ" পরমপুরুষস্য, "পথ্যা" "ইব" স্তব ইব, "বি—এতু" বিশেষভাবেন ভবতু ইত্যর্থঃ। মৎকথিতং—মদুচ্চারিতং সমস্তমেব বাক্যং কেবলং ব্রহ্মবিষয়কং ভবতু। মৎকণ্ঠাৎ ব্রহ্মবিষয়কবাক্যাদৃতে নান্যৎ আবির্ভবতু ইতি বিশদার্থঃ। আমার শ্লোক—অর্থাৎ আমি যে সমুদয় বাক্য উচ্চারণ করি, তৎসমস্তই ব্রহ্মবিষয়ক হউক। ব্রহ্মবিষয়িণী কথা ব্যতীত যেন অন্য কথা আমার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত না হয়।

বঙ্গার্থ—হেঅমৃত-পুত্রগণ! আমি তোমাদের চিরন্তন ব্রহ্মকে চিত্ত-প্রণিধানাদি দ্বারা সমাধান করি। সেই প্রণিধাতব্য পরমপুরুষ আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হউন। আমার হৃদয়রূপ সন্মার্গে বিচরণ করুন। হে দিব্যলোকনিবাসী অমৃত-পুত্রগণ! তোমরা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত কর। ব্যাখ্যান্তর——ইন্দ্রিয় এবং তদনুগ্রাহক দেবতা কর্ত্তৃক অন্তঃকরণে প্রকাশিত অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রণিধান করি। আমি যাহা কিছু বলি—অর্থাৎ আমার কলুষিত কণ্ঠ হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, তৎসমস্ত বাক্যই যেন ব্রহ্মবিষয়ক হয়। ব্রহ্মবিষয়ক আলাপ ব্যতীত—ব্রহ্মগুণানুকীর্ত্তন ব্যতীত আমি যেন অন্য কিছুই বলিনা। আমার রসনা যেন অনন্যসাপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা তৎকথা-মৃত পান করিতে নিযুক্ত থাকে। হে অমরধামবাসী অমৃত-তনয়গণ! তোমরা পরম অনুগ্রাহক; আমাকে এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিবার সামর্থ্য দানপূর্ব্বক অনুগ্রহ প্রকাশ কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

মণিরত্নমালা।

—•:০:•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধনব্যয়ের নিয়ম।

"অলব্ধং চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদ-
পক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যগ্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিঃ-
ক্ষিপেৎ।" (হিতোপদেশ)

ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তং ইহামুত্র চ মোদতে॥
দেবর্ষি পিতৃ ভূতানি জ্ঞাতীন্ বন্ধুংশ্চ-
ভাগিনঃ। (১)
অসংবিভজ্য চাত্মানং যক্ষবৃত্তঃ পতত্যধঃ॥
(২) (ভাগবত)

"ন্যায়াগতেন দ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং পারলৌকিকং।
দানংহি বিধিনা দেয়ং কালেপাত্রে গুণান্বিতে"॥
(স্মৃতি)

অলব্ধ ধন লাভ করিবার চেষ্টা করিবে, লব্ধ ধন অপব্যয় হইতে রক্ষা করিবে, রক্ষিত ধন বর্দ্ধিত করিবে, এবং বর্দ্ধিত ধন তীর্থাদিতে নিক্ষেপ করিবে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, যশ, অর্থ, কাম এবং স্বজন, এই পাঁচের নিমিত্ত আপনার ধন পাঁচ প্রকারে বিভাগ করেন, তিনিই ইহলোকে ও পর-লোকে সুখী হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ধন থাকিতেও ভাগ-প্রাপ্তি-যোগ্য দেব, ঋষি, পিতৃ, ভূত, জ্ঞাতি, বন্ধু ও আত্মাকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, যক্ষবৃত্তি অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। ন্যায়ো-পার্জ্জিত ধনদ্বারা পরকালের কার্য্য করিবে, এবং কাল ও পাত্র বিবেচনায় দানযোগ্য গুণবান্ ব্যক্তিকে বিধিপূর্ব্বক দান করিবে। (তন্নষ্টং যন্নদীয়তে)

অবার ধনহীন বা বিভবহীন হইলেই যে মনুষ্য প্রকৃত দরিদ্র হয়, তাহা নহে; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতিও তৃষ্ণা বা আসক্তি-শূন্য না হইলে, চিরদুঃখে কাল হরণ করিয়া থাকেন।

বৈরাগ্যশতকে যতি ও নৃপতি-সম্বাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

বয়মিহ পরিতুষ্টাবল্কলৈস্ত্বং দুকূলৈঃ,
সম ইহ পরিতোষো নির্ব্বিশেষো বিশেষঃ।
সতু ভবতি দরিদ্রো যস্য তৃষ্ণা বিশালা,
মনসি চ পরিতুষ্টে (১) কোঽর্থবান্ কো
দরিদ্রঃ॥

যতি কহিতেছেন—"হে রাজন্! ইহ সংসারে আমরা এখন বল্কল-বসনে পরিতুষ্ট হই, কিন্তু দুকূল (পট্টবস্ত্র) পরিধানে তোমার পরিতোষ জন্মায়, এ বিষয়ে "পরিতোষ" পদার্থটী উভয়ের সম্বন্ধে সমান হইতেছে, সুতরাং দুকূল ও বল্কল-ভেদে যে বিশেষ ভাব, তাহা নির্ব্বিশেষ হইয়া পড়িতেছে। অতএব যে ব্যক্তির বিষয়-তৃষ্ণা বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র, এবং মন পরিতুষ্ট হইলে (সন্তোষামৃতে পরিতৃপ্ত হইলে) ধনবানই বা কে? আর দরিদ্রই বা কে? অর্থাৎ তখন ধনী ব দরিদ্রের কোন প্রভেদ থাকে না।

(১) গৃহমেধীর নিত্য কর্ত্তব্য—
"অধ্যয়নং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽ-
তিথিপূজনং॥ (মনু)
পোষ্যবর্গের পালন—পিতা মাতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা-
দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ
উদাহৃতঃ॥ (স্মৃতি)

(২)— "মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং বসুরক্ষং বসুন্ধরা।
[illegible] হসতি স্বপতিং পুত্রবৎসলং।"

(১) গোধন, গজধন, বাজীধন, আওর্ রতনধন-খান্।
যব্ আওত সন্তোষধন সবধন ধূরিসমান্।
(তুলসীদাস)

রাজর্ষি জনক, আদিরাজ পৃথু, অম্বরীষ, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারাজ-চক্রবর্ত্তীগণ সসাগরা ধরার অধীশ্বর (*) হইয়াও পরমাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নারদাদি হরিপরায়ণ যোগী মহর্ষিগণ সানন্দ চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট গমনাগমন করিতেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেন। প্রজাপালনতৎপর স্বধর্ম্ম-পরায়ণ ঐ সকল ভূপতিবৃন্দ ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ বা অহংকার-গর্ব্বিত ছিলেন না, এবং সর্ব্বথা আসক্তি-পরিশূন্য (*) হইয়া বিষয়-ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিতেন।

(খ) দৈন্য—সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে দীনতা বা অকিঞ্চনতা।

"পরিগ্রহো হি দুঃখায় যদ্ যৎ প্রিয়তরং নৃণাং।
অনন্তসুখমাপ্নোতি তদ্বিদ্বান্ যস্ত্বকিঞ্চনঃ"॥
(ভাগবত)

যে যে বস্তু মনুষ্যগণের অত্যন্ত প্রিয়, তত্তৎ বস্তুর পরিগ্রহ (গ্রহণ বা আহরণ) দুঃখের কারণ (১) হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও যে ব্যক্তি অকিঞ্চন (২) অর্থাৎ ত্যক্ত-পরিগ্রহ হয়েন, তিনি অনন্ত সুখ লাভ করেন।

এস্থলে অকিঞ্চনতা দারিদ্র্যকে না বুঝাইয়া পরিগ্রহ-ত্যাগ বা অপরিগ্রহকে (৩) বুঝাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটী যোগের অঙ্গ। "অপরিগ্রহ" প্রথমাঙ্গ যমের অন্তর্গত। "অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।"—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, এবং অপরিগ্রহ, এই কয়টী যম। অপরিগ্রহ—"ভোগবিলাসের জন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ বা তাহার আহরণ না করা, কেবল শরীর রক্ষার্থে উপযুক্ত বস্তু ব্যতীত অতিরিক্ত কিছুরই আবশ্যক না রাখা।"

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

অতঃকবির্নামসু যাবদর্থঃ, স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র, পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ॥

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ,
বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্ন পাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ॥
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধাগুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্।
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥
(ভাগবত, ২য় স্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে ৩।৪।৫)

(সুখ-বাসনায় শয়ান পুরুষ যেমন স্বপ্নযোগে সুখ দর্শন মাত্র করে, বস্তুতঃ ভোগ করিতে পায়ন, তাহার ন্যায় মায়াময় স্বর্গাদি পথে ভ্রমণকারী জন তত্তৎ লোক প্রাপ্ত হইলেও পরমার্থতঃ নিরবদ্য সুখ লাভ

(*) "ভোজ্যং ভোজন-শক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাস্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দান শক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলং॥"

(*) "বনেঽপিদোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং,
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে,
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥"

(১) "যদ্ যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখ বৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি।"

(২) অকিঞ্চনঃ—ত্যক্তপরিগ্রহঃ, নতু দরিদ্রঃ।
(শ্রীধর স্বামী)

(৩) "অনাদানং হি দ্রব্যাণাং আপদ্যপি মুনীশ্বরাঃ।
অপরিগ্রহ [illegible]॥

করিতে পায় না।) অতএব যাহা নাম মাত্র বাস্তবিক, যাহাতে কোন সার বস্তু নাই, এরূপ ভোগ্য বিষয়ে আস্থা করা পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে; যে পরিমাণ ভোগ্য বিষয় দ্বারা দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণ বিষয়ের জন্যই সাবধান হইয়া যত্ন করিবেন, (তাহাতেও আসক্ত হইবেন না); কিন্তু উহা স্থির নহে; পরমার্থ সুখ নহে, এইরূপ নিশ্চয়-বুদ্ধি হইয়া সেই দেহ-যাত্রা যদি অন্যপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে বৃথা পরিশ্রম জানিয়া আর সেই সেই বিষয়ের যত্ন করিবেন না। দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহের স্বভাবসিদ্ধ উপায় রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন, সুবিস্তীর্ণ ধরাতল থাকিতে শয্যার প্রয়োজন কি? স্বতঃসিদ্ধ বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধানের (বালিশের) আবশ্যকতা কি? অঞ্জলি বর্ত্তমান থাকিতে নানা প্রকার জলপাত্র ও ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? এবং দিক্ ও বল্কল (বৃক্ষত্বক) সর্ব্বত্রই অনায়াস-লভ্য, এ সকল থাকিতে পট্টবস্ত্রাদির নিমিত্ত প্রয়াস কেন? যদিও অন্ন-বস্ত্রাদি বিনা যাচ্ঞায় প্রায় লভ্য হয় না সত্য, তথাচ তদর্থ ধনদুর্ম্মদান্ধ লোকদিগের সেবা করা কেন? (১) পথে কি আচ্ছাদনোপযোগী জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড পড়িয়া থাকে না? ফলাদি দ্বারা পরপোষণকারী বৃক্ষসমূহ কি ফলাদি দান করে না? নদী সকল কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সে জলে কি পিপাসা নিবারণ করা যায় না? (বিবেকবান্ ব্যক্তি এ সমস্ত বস্তু সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারেন।) যদ্যপি এ সকল পদার্থও কদাচিৎ লভ্য না হয়, তাহা হইলে শরণাগত-পালক বিশ্বম্ভর ভগবান্ হরি কি শরণাপন্ন লোকদিগকে রক্ষা (পালন) করেন না? অর্থাৎ ভগবান্ পালন করিতেছেন এবং করিবেন; অতএব ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির সেবা করা বিবেকীর পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং ভগবানের ভজনা করাই বিধেয়।

দৈন্য সম্বন্ধে—

১। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন:—

"মন করো না সুখের আশা। (১)
যদি অভয়-পদে লবে বাসা॥
হয়ে ধর্ম্ম-তনয়, ত্যজে আলয়, বনে গমন
হেরে পাশা।
হয়ে দেবের দেব মহাদেব তবু শিবের
দৈন্যদশা॥
সে যে দুঃখী দাসে দয়া বাসে, (২) মন
সুখের আশে বড় কসা।
মন ভেবেছ কপট-ভক্তি করে পুরাইবে
আশা।
(লবে) কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবে না
রতি-মাষা॥

২। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন:—

"হ্যধিকোঽস্মীতি সর্ব্বেভ্যো হ্যধিক জ্ঞান-
বানহং।
ধর্ম্মতত্ত্বমিদমিতি নৈবং মন্যেত বুদ্ধিমান্॥
অস্তি মৎস্যঃ তিমির্নাম শতযোজন-বিস্তৃতঃ
তিমিঙ্গিল-গিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি
রাঘবঃ।

---

(১) ফলমলমশনায় স্বাদু পানায় তোয়ং,
শয়নমবনিপৃষ্ঠে বাসসী বল্কলেচ।
ধনলব মধুপান ভ্রমি-সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং,
অবিনয় মনুমন্তুং নোৎসহে দুর্জ্জনানাং॥
(বৈরাগ্য শতক)

(১) আপতমধুর বিষয়-সুখের আশা করিলে পরিণামে অবশ্যই বলিতে হয় যে—
"জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্তচিন্তামণির্ময়া"॥

(২) "অভিমানদ্বেষিত্বাদ্ দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ" (নারদকৃত ভক্তি-সূত্র)

কাশ্চত্তু তদ্দিশোহস্তাতি মত্বা মন্যে ন কর্হিচিৎ॥

"আমিই সকল ব্যক্তি অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানবান্, অতএব আমিই সর্ব্বপ্রধান" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাপি এরূপ মনে করিবেন না, ইহাই লৌকিক ধর্ম্মের সার উপদেশ। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শতযোজন-বিস্তৃত সমুদ্রচর "তিমি" নামক মৎস্যকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল" নামক জলচর আছে; আবার তাহাকে গ্রাস করিতে পারে, এরূপ "তিমিঙ্গিল-গিল" নামক জলজন্তু আছে, আবার "তিমিঙ্গিল-গিল"কে গ্রাস করিতে পারে, 'রাঘব' নামক এমন প্রকাণ্ড মৎস্য আছে; আবার রাঘব-গ্রাসী কোন জলচর জীব কোথাও আছে, ইহা জানিয়া "আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" এরূপ মনে করা কখনই কোন ব্যক্তির উচিত হয় না।

অতএব—"দুর্গুণানাং খনিরহং গুণাধানং কথং ময়ি।
মন্যেব চাক্ততাহপ্যস্তি মন্যতে সোহধিকোহখিলাৎ॥
সাধুস্তস্য দেবাহি কলালেশং লভন্তি ন॥"

"আমিই সমস্ত দুর্গুণের (দোষের) আকর, আমাতে কোন সদ্গুণই নাই, আমিই কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য" যে ব্যক্তি এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি জগতে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে (উন্নতি লাভ করে) এবং সেই ব্যক্তিই সাধু হয়; দেবতারাও তাহার কলালেশ লাভ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাহার সদৃশ হইতে পারেন না।

এস্থলে অহংকার ও আত্মশ্লাঘাদি বর্জ্জন এবং বিনয় ও শিষ্টাচারাদি সদ্গুণাবলম্বনকে বুঝাইতেছে।

৩। ভগবানের ভক্তগণের দৈন্য—

"মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।"

"হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই; বলিব কি? পাপ-পরিহারের নিমিত্ত তোমার নিকট দৈন্য জানাইতে আমার লজ্জা হইতেছে"।

"দীনবন্ধুরিতি নাম তে স্মরন্
যাদবেন্দ্র পতিতোহহমুৎসহে।
ভক্তবৎসলতয়া ত্বয়ি শ্রুতে।
মামকং হৃদয়মাশু কম্পতে॥
পরমকারুণিকো ন ভবৎপরঃ,
পরম শোচ্যতমো নচ মৎপরঃ।
ইতি বিচিন্ত্য হরে ময়ি পামরে,
যদুচিতং যদুনাথ তদাচর॥"

হে যাদবেন্দ্র! আমি পতিত, অতএব তোমার 'দীনবন্ধু' নাম স্মরণ করিয়া আমার উৎসাহ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া শ্রুত হওয়াতে সম্প্রতি আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে, অর্থাৎ আমি কখনও তোমার ভজন করি নাই, এই কারণে আমার প্রতি তোমার কৃপা হইল না। হে হরে! তোমার তুল্য পরম করুণাময় আর কেহ নাই, এবং আমা হইতে শোচনীয় ব্যক্তিও আর কেহ নাই; হে যদুনাথ! এই বিবেচনা করিয়া এই পামর জনের প্রতি যাহা উচিত হয়, তাহা আচরণ কর।

(পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ)

ভগীরথের দৈন্য বা মানশূন্যতা এইরূপ—

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥"

"মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি স্বরূপ ছিলেন,; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতিলাভ করতঃ ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন, এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির নিকটও প্রণত হইতেন।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে শ্রীরূপ, সনাতন, হরিদাস ও রঘুনাথ প্রভৃতি ভক্তগণের অতীব বিস্ময়কর দৈন্য-বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়।

(৪) চৈতন্য দেব বলিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণজাতি স্বভাবতঃ নম্র, সর্ব্বদা ভূমিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং অন্য কর্ত্তৃক পীড়িত (ছিন্ন বা পদদলিত) হইলেও আপনার মস্তকোত্তলন করেনা, যিনি এই তৃণজাতি অপেক্ষা আপনাকে নীচ মনে করেন; তরুজাতি পুষ্প, পত্র, ফল, মূল ও ত্বক্ প্রভৃতি দ্বারা সকলেরই উপকার করে, এবং উপকৃত মনুষ্যেরা ছেদন করিলেও তাহাদের সেই অপরাধ সহ্য করে, যিনি এই তরুজাতির ন্যায় সহনশীল, এবং যিনি অন্য কর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়া (সম্মানিত না হইয়াও) অনাদরকারীর সমাদর করেন, অথবা যিনি স্বয়ং মানশূন্য হইয়া অপরকে সম্মান প্রদান করেন, এবম্ভূত মহাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক হরি নিরন্তর কীর্ত্তনীয় হন।

মহাভাগবত ৺কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিব।
তাড়ন ভর্ৎসনে কারে কিছু না বলিব॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিবা শাক ফল খাইব॥
সদা নাম লৈব যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তি-ধর্ম্ম-পোষ"॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গীতাভাস।

—•:০:•—

সপ্তম অধ্যায়।

ঈশ্বর।

সহৃদয় ভাবুকমাত্রেই এই বিচিত্র কৌশলময় দৃশ্য জগতের সুষমারাশি দর্শনে পুলকিত ও বিমোহিত হইয়া সত্যই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "এই অনন্ত-অম্বর-পরিব্যাপ্ত-রবি-শশি-তারকা-বিমণ্ডিত পৃথিবীর কোথা হইতে উৎপত্তি হইল? কে ইহাকে এমন বিচিত্র শোভাময় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন?" এই স্বাভাবিক অনুসন্ধানের ফল ঈশ্বর-তত্ত্বের অবতারণা। এই বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা কে, জানিতে না পারিলেও সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাকে মানিয়া লই। ঈদৃশ কৌশলময় জগৎ নিয়ন্তৃবিহীন, ইহা হৃদয় কদাচ বিশ্বাস করিতে চাহে না; অবশ্যই ইহার ধাতা ও পাতা আছেন, ইহাই অন্তরের বিশ্বাস। জগতের সেই আদিকারণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয় হেতুরহেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু যদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র॥

(অস্য) এই জগতের যিনি (স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়হেতুঃ) স্থিতি, উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু, কিন্তু যিনি স্বয়ং (অহেতু) অনাদি; (যৎ) যিনি (স্বপ্ন-জাগর-সুষুপ্তিষু) স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তিতে, (বহিশ্চ) ধ্যানাদিতেও, (সৎ) বিদ্যমান থাকেন; (দেহান্দ্রিয়াসু হৃদয়ানি) দেহ, ইন্দ্রিয়, অসু—অর্থাৎ প্রাণ এবং হৃদয় (যেন সংজীবিতানি) যাঁহাদ্বারা অসু প্রাণিত—অর্থাৎ জীবন্ত হইয়া (চরন্তি) স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত হয়, হে (নরেন্দ্র) রাজন্! (তৎ) তাঁহাকে (পরং) ব্রহ্ম (অবেহি) জানিও। ভাগবতের এই উক্তি হইতে জানিতে পারিলাম যে, ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও প্রলয়কর্ত্তা; ঈশ্বরেই জগতের উৎপত্তি, তাঁহাতেই স্থিতি, এবং তাঁহাতেই লয় হইয়া থাকে। তিনিই একমাত্র সৎ বস্তু, কি সপ্নে, কি জাগরণে, কি নিদ্রা-বস্থায়, কি সমাধিতে, সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে তিনি বিদ্যমান আছেন। আমা-দিগের দেহ, ইন্দ্রিয় নিচয়, প্রাণ ও মন, জড় পদার্থ হইলেও, ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা চেতন্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্রতী আছে। তিনি চৈতন্যস্বরূপ, এ বিশ্ব তাঁহারই দ্বারা উদ্ভাসিত ও জীবন্ত; এ জগৎ তাঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।

ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত-কারণ; তিনি তাঁহার সৃষ্ট এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে অনু-প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছেন। এই চরাচর তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে, তিনিই ইহার আধার; কিন্তু ঈশ্বরের কি অঘটন-ঘটনা চাতুর্য্য যে, ভূত সকল তাঁহাতে থাকিয়াও তাঁহাতে নাই। অর্থাৎ ঈশ্বররূপ আধারে এই চরাচররূপ আধেয় অসংলগ্নভাবে বিদ্যমান আছে। সাধারণ অর্থে আধারে আধেয়ের সংলগ্নতা উপলব্ধি হয়; যথা কলস আধার, জল আধেয়; কলসে জল অবশ্য সংলগ্ন আছে; অতএব আধার ও আধেয় পরস্পর সংলগ্ন। ঈশ্বর এই চরাচরের আধার, কিন্তু এ অর্থে নহেন। চরাচর তাঁহাতে সংলগ্ন নাই, তিনি অসঙ্গ। সংলগ্ন থাকিতেও পারে না; নিরবয়বে সাবয়ব বস্তুর সংলগ্নতা কিরূপে সম্ভব হইবে? শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥

"সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ বায়ু যেরূপ নিত্য আকাশে স্থিত, সেইরূপ সমস্ত ভূত আমাতে স্থিত, ইহা জানিও।" অর্থাৎ নিরবয়ব আকাশ নিঃসঙ্গভাবে যেমন বায়ুর আধার, বায়ু যেমন নির্লিপ্তভাবে আকাশে অবস্থান করিতেছে, ভূতগণ তেমনই ঈশ্বরের নিরবয়বত্ব—অতএব নিঃসঙ্গত্বহেতু নির্লিপ্ত-ভাবে তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। ঈশ্বর এই অর্থে জগতের ধাতা।

ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ; প্রকৃতি জগতের উপাদান-কারণ। প্রকৃতি ঈশ্বরের মায়াশক্তি। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা, অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম, এই তিনটী গুণযুক্তা। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির বিকারেই জগতের উৎপত্তি, অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম, এই তিন গুণের অসম-মিলনেই সাবয়ব বস্তু-মাত্রের উৎপত্তি। ঈশ্বরে এই তিনটী গুণ সমানাংশে বিদ্যমান আছে, সেজন্য ঈশ্বর ব্রহ্ম-স্বরূপে নিরবয়ব। সত্বগুণে স্থিতি, ইহা উত্তম গুণ; রজোগুণে জন্ম, ইহা মধ্যম গুণ; তমোগুণে নাশ, ইহা অধম গুণ। সত্বগুণ

মধ্যস্থ, অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে মধ্যে রাখিয়া রজঃ ও তমোগুণ বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ প্রত্যেক সত্তার (দৃশ্য বস্তুর) আদিতে জন্ম বা উৎপত্তি, মধ্যে স্থিতি, এবং শেষে নাশ বা লয় অনুস্যূত আছে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের যে কোনটি প্রবল হইলেই ক্রিয়া বা প্রকৃতির বিকার উপস্থিত হয়; এই ক্রিয়ার উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, স্থূলতঃ এই তিন অবস্থাই আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এবং রজ, সত্ত্ব ও তম, পর্য্যায়ক্রমে ইহাদিগের এক একটির প্রাবল্যই উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, সংস্থান ও প্রলয় ব্যাপারে লিপ্ত আছে। প্রকৃতিই জগতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর্ত্রী। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, অতএব ঈশ্বর গৌণভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। প্রকৃতি ত্রিগুণের দ্বারা কার্য্য করিতেছে, চিন্ময় ঈশ্বর তাহার নিকটে সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। ঈশ্বরের সান্নিধ্য মাত্রই ঈশ্বরের কর্তৃত্ব; ঈশ্বর এই অর্থে জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই জগতের স্থিতি, তাহা একরূপ বুঝিতে পারা গেল; এক্ষণ ঈশ্বর জগতের প্রলয়কর্ত্তা, ইহার অর্থ অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।

কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং॥

"হে কৌন্তেয়, কল্পক্ষয়ে—অর্থাৎ প্রলয়-কালে সর্ব্বভূতই মদীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে লীন হইয়া যায়। কল্পাদিতে—অর্থাৎ সৃষ্টিকালে পুনরায় আমি তাহাদিগকে উৎপাদন করি।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি বা মায়া এই দৃশ্যমান জগতের জনয়িত্রী, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারেই জগতের প্রকাশ—দৃশ্য জগতের উৎপত্তি। আবার কিছুকাল স্থিতির পর স্বাভাবিক নিয়মে এই দৃশ্য-জগতের নাশ বা প্রলয় হয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ব্যক্তভাব পুনরায় অব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। দৃশ্যমান কার্য্য অদৃশ্যমান কারণে লীন হইয়া যায়। নিদ্রা ও জাগরণ, প্রলয় ও সৃষ্টির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তির 'এই আমি', 'এই বৃক্ষ', 'এই তুমি', এরূপ বিশেষ জ্ঞান থাকে না, সকল বিশেষ-জ্ঞান এক অবিশেষ-জ্ঞানে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলয়কালে জগতের বৈচিত্র্য তিরোহিত হইয়া প্রকৃতির অভিব্যক্ত স্থূল অবস্থা ঘুচিয়া, কারণরূপ অব্যক্ত সূক্ষ্ম অবস্থা উপস্থিত হয়; তখন আর শশী, সূর্য্য, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি প্রকৃতির পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন রূপ-নামাদি থাকে না। আবার যেমন নিদ্রার অবসানে নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি—'নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে যে জ্ঞান ছিল, তৎসমুদায় প্রাপ্ত হয়,' সেই-রূপ প্রলয়ান্তে প্রকৃতিও পূর্ব্বের অভিব্যক্ত বিচিত্র স্থূল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা প্রলয়ের স্বরূপ, সেই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিদ্রাকে দৈনন্দিন বা নিত্য-প্রলয় নামে অভিহিত করিয়াছেন। কার্য্য আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্রিয়া—আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু শক্তি অতীন্দ্রিয়। শক্তি মূর্ত্তিমতী হইলেই ক্রিয়া নাম গ্রহণ করে। ঈশ্বর-শক্তি প্রকৃতিও যখন সত্ত্বাদি-গুণত্রয়ের বৈষম্যে গতিশীলা, তখনই অভিব্যক্তা—তখনই মূর্ত্তিমতী ও সৃষ্টিকারিণী; আবার গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় গতিহীনা, অব্যক্তা ও প্রলয়কারিণী।

সৃষ্টির এই রহস্য অতি চমৎকার! যিনি এই রহস্য পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে; তিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শন করিয়া জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ভাব-বিকারের অনিত্যতা-জনিত সুখ-দুঃখে বিমোহিত হন না; তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর মায়াত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতগ্রামকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিতেছেন; সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব", সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমস্ত জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। এ সৃষ্টিতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই; ঈশ্বরের স্বার্থ থাকিতেও পারে না, কেননা তাঁহার অহঙ্কার নাই। ভেদ জ্ঞান হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। 'তুমি' 'আমি' ভেদে অহঙ্কার। যিনি অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার পরিচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব হইবে? যখন সকলই ঈশ্বর, যখন ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়, তখন ঈশ্বর কাহা হইতে আপনাকে পৃথক্‌বোধে অহঙ্কারী হইবেন? কাজেই তাঁহার স্বার্থ নাই। স্বার্থ নাই বলিয়া তাঁহার কর্ম্ম-বন্ধনও নাই; তিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত। প্রকৃতির বিকারেই সৃষ্টি হইতেছে; জীবগণ আপনাকে বিস্মৃত হইয়া স্বভাব-বশে কর্ম্ম জন্য পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেছে। তত্ত্বদর্শী দেখিতে পান যে, কর্ম্ম জন্যই জীবের পুনরাবর্ত্ত, আবার আসক্তি জন্যই, সকাম কর্ম্ম; অতএব আসক্তির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে, সকাম কর্ম্মের নাশ নাই; কর্ম্মনাশ না হইলেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানী, যিনি এই জগতের রহস্য অবগত হইয়া, স্থূল জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা ও কারণরূপিণী প্রকৃতির নিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পুত্র-কলত্র-বিষয়বিভব প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যে আপনা-হইতেই আসক্তি তিরোহিত হয়। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান——

"সর্ব্বতঃ পানিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

ঈশ্বর সর্ব্বত্র হস্ত-পদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট হইয়া লোকে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।" তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ড-ময় হস্ত-পদ, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার মস্তক ও চক্ষু, এই ব্রহ্মাণ্ডময় তাঁহার শ্রুতি—অর্থাৎ কর্ণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে এইরূপে ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন। বস্তুতঃ পরব্রহ্মের মস্তক-চক্ষু প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ এই বিশ্বব্যাপারে যেখানে যাহা ঘটিতেছে, তাহা তিনি জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, কিন্তু তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-গ্রাহ্য রূপাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের প্রকাশক। তিনি সঙ্গহীন, অথচ এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি নির্গুণ—অথচ গুণের পালক। তিনি জল-তরঙ্গের ভিতরে বাহিরে জলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীর ভিতর ও বাহিররূপে বিদ্যমান। ভূতাদি প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থচয় ব্রহ্ম-সাগরের ঊর্ম্মিমালা; কাজেই জল-তরঙ্গের জলের ন্যায় উহাদিগের ভিতরে ও বাহিরে ব্রহ্ম। তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম; কেননা কার্য্য কারণাত্মক, কারণই কার্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। তিনি সূক্ষ্ম, রূপাদিহীন, এজন্য ইন্দ্রিয়-সাহায্যে

তাঁহাকে স্বরূপতঃ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তিনি ভূতগণে তাহাদিগের কারণরূপে অবিভক্ত হইয়াও কার্য্যরূপে বিভক্তের ন্যায় অভিব্যক্ত। তিনি নিখিল অন্তঃকরণে নিয়ন্তা-রূপে নিয়ত অধিষ্ঠিত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

মায়াবাদ।

—০ঃ০ঃ০—

(পরিশিষ্ট।)

আমি কি? এই কেশ কি আমি? এই হস্ত, এই পদ, এই নাসা, এই চক্ষু, ইহাদের প্রত্যেক কি 'আমি' শব্দে বাচ্য? অবশ্য এ সকলের কোন একটী আমি নহে। যেমন এই বস্ত্র খানির এ সূতাটী বস্ত্র নহে, ও সূতাটী বস্ত্র নহে, সে সূতাটিও বস্ত্র নহে—সমুদয় সূত্রের তথাবিধ একত্র অবস্থানই বস্ত্র। যেমন এই টেবল্‌টীর এ পা খানি টেবল্ নহে, ও পাশিটা টেবল্ নহে, উপরের কাষ্ঠ-খানিও টেবল্ নহে, এই সমুদয়ের তথাবিধ সমাবেশই টেবল্। যেমন সম্মুখস্থ দালানটীর এই কড়ীটা দালান নহে, ও বর্গাটী দালান নহে, ঐ ইষ্টকখানি দালান নহে, এতৎসমুদয়ের তথাবিধ মিলন ও বিন্যাসই দালান। সেইরূপ আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, একক কোনটীই 'আমি' নই, এ সকলের এবম্বিধ সমাবেশে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরমাণু সকলের নির্দ্দিষ্টরূপ বিন্যাসজন্য যে হস্ত-পদাদি-সংযুক্ত সচেতন-মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ 'আমি' বলিয়া জ্ঞান করি। যেমন এই বস্ত্র খানির একটী সূত্র খুলিয়া গেলেও বস্ত্র খানিকে অসম্পূর্ণ মনে করিনা, যেমন দালান-টীর অত্যল্পাংশ খসিয়া পড়িলেও দালানের দালানত্ব লোপ পায় না, যেমন টেবলের একটী কোণ হইতে একটু কাষ্ঠ কাটিয়া ফেলিলেও যে টেবল্ সেই টেবলই থাকে, তেমনই মস্তক মুণ্ডন করিলে, বা (এমন কি) হস্ত-পদহীন হইলেও সাধারণতঃ আমি আমিই থাকি। কিন্তু যেরূপ বস্ত্রখানির খানিকটা ছিঁড়িয়া গেলে ছিন্ন বস্ত্র বলি, টেবলের একাংশ নষ্ট হইলে, ভাঙ্গা টেবল বলি, এবং ঐরূপ দালানের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলে ভাঙ্গা-দালান বলিয়া বুঝি, তদ্রূপ আমার চক্ষু নষ্ট হইলে আমি অন্ধ হই, পা অচল হইলে পঙ্গু হই, ইত্যাদি। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, যে সকল পদার্থের যেরূপ সমাবেশে আমার উৎপত্তি, মূল-সমাবেশ স্থির রাখিয়া সেই সকল পদার্থের (নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে) ন্যূনাতিরেক যোগ-বিয়োগে সাধারণতঃ আমিত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি মনে করিনা বটে, কিন্তু পূর্ণ আমিত্বের পরিবর্ত্ত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। একই আমি ভ্রূণাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সাধারণ-ভাবে একই থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি সর্ব্বাবস্থায় এক থাকিনা। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার অন্তর্বাহ্য সত্তার পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ এত ধীরে ধীরে এবং এত অলক্ষিত ভাবে হইয়া থাকে যে, বিশেষ চিন্তা করিয়া না দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়না। গর্ভস্থ 'আমি' আর বৃদ্ধ 'আমি' তে রূপে-গুণে জ্ঞানাজ্ঞানে এত বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে যে, তাহা ক্রমে ক্রমে না হইয়া যদি সহসা হইত, তাহা হইলে অপরে আমাকে চিনিতে পারা দূরে থাকুক, আমিই আমাকে চিনিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ! শৈশবে যে আমাকে একবার দেখিয়াছে আশীতি বৎসরান্তে দ্বিতীয়বার দেখিলে, সে কি আমাকে সেই শিশুর পরিণতি বলিয়া

জানিতে পারে? কিন্তু যে আমার নিত্য-সহচর, সে বয়োবৃদ্ধির সহিত পর পর আমার রূপ-গুণাদির ক্রম-পরিবর্ত্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে বলিয়া আমাকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাহউক, অনেকেরই সংস্কার 'আমি' 'আমার' দেহ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। এ সম্বন্ধে তাঁহাদের একটী যুক্তি এই যে, আমরা যখন আমার হাত, আমার পা, আমার চক্ষু, আমার মন, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করি, তখন অবশ্যই এই মনে করি যে, আমাদের বাড়ী, ঘর, ঘটী, বাটী, ছাতী, লাঠীর মত আমার হস্ত-পদও আমাহইতে ভিন্ন। ইহা না হইলে, আমার হাত, আমার পা, না বলিয়া আমি হাত, আমি পা ইত্যাদি বলিতাম। যুক্তিটি বড় লোকের, সুতরাং অগ্রাহ্য করিতে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে হস্ত-পদাদি হইতে আমার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমের খোসা, আমের আঠি, আমের রস, এসকল প্রয়োগ দেখিয়াও বলিতে হইবে যে, খোসা, আঠি, রস, এসব আমের অংশ নহে! অথবা ছাতীর ডাঁট, ছাতীর শিক, ছাতীর কাপড়, ইহারা ছাতীর কোন অংশ নহে; যেন ছাতী হইতে এসকলগুলি বাদ দিলেও যে ছাতী সেই ছাতীই থাকে। ফলে চৈতন্যের অভাব ও সদ্ভাব-ভেদে উক্ত যুক্তি সঙ্গত হইলেও, অর্থাৎ চৈতন্যই মানুষের খাস আমিত্বের সম্বল ধরিয়া নিলেও "আমার মন" "আমার আত্মা" এই সকল প্রয়োগ দেখিয়া তবে বলিতে হয় যে, আমি ও আমার আত্মা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু!

যাঁহারা মনে করেন যে, একখানি হস্তের অভাবে আমার কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, একটি চক্ষু বিনষ্ট হইলেও যে আমি সেই আমিই থাকি; এমন কি—সমস্ত ইন্দ্রিয়-সহিত দেহের লোপ হইলেও আমার আমিত্ব নষ্ট হয় না, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা আমিত্বকে বাড়াইতে যাইয়া আমিত্ব-জ্ঞানের পথই বন্ধ করেন, কার্য্যতঃ আমিত্বকে বিনাশ করিয়া নামতঃ তাহাকে রক্ষা করেন। আমার সাংসারিক আমিত্ব কিসে? আমার জ্ঞানেই আমার অস্তিত্ব। "নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽয়মাত্মা" নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপ আত্মাই অহং-বাচ্য। জ্ঞান যতক্ষণ, আমি ততক্ষণ। যেই জ্ঞানের অভাব, সেই আমারও অভাব। জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আমার হ্রাস-বৃদ্ধি। জ্ঞানের স্ফুরণে আমিত্বের জন্ম, জ্ঞানের বিলোপে আমিত্বের মরণ। মনুষ্য-জীবন একটী মায়িক জ্ঞানের ধারা। যেখানে এই মায়িক জ্ঞান-প্রবাহের সহসা পরিবর্ত্তন হয়, সেইখানেই লৌকিক জন্ম বা মৃত্যু। ইহা ভিন্ন লৌকিক জন্ম-মরণের অন্য ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। এই মায়াবচ্ছিন্ন জ্ঞান ধারার দুইটি পরিবর্ত্তন দিকের মধ্যস্থানে সামান্য স্রোতগতি ঋজু-বক্র হইতেছে এবং বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিমুহূর্ত্তে হইতেছে। তাহাতেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত আমি কত নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি, কত পুরাতন জ্ঞান হারাইয়াছি। কত শিখিতেছি, কত ভুলিতেছি। যাহাহউক, এই মায়িক জ্ঞান-ধারা আমার মায়িক ইন্দ্রিয়-পথে প্রবর্ত্তিত হয়। শক্তিরূপী—মায়ারূপী ইন্দ্রিয়েই আমার সাংসারিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয় বিনাশ কর, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে; মায়ার উচ্ছেদ কর, মায়িক জ্ঞান বিনষ্ট হইবে—মায়া-শ্রিত আমিত্ব লোপ পাইবে; সুতরাং ইন্দ্রিয়কে—মায়াকে অস্বীকার করিয়া মায়া-বচ্ছিন্ন আমাকে বজায় রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মায়িক ইন্দ্রিয় সকলকে

আমার মায়িক অবস্থার মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকা বিবেচনা করা সঙ্গত হইতেছে, এবং বিশ্ব-রচনা কার্য্যে মায়িক জ্ঞান ধারার আধার-রূপে হস্ত-পদাদিরও কল্পনা করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে।

হস্ত-পদাদিকে ইন্দ্রিয়ত্বের এক পাশে স্থান দিলেও, আমি কিন্তু তাহাদের পারমার্থিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বলিতেছিনা। ইন্দ্রিয়-লভ্য যত কিছু, সকলই বাহ্য, এবং যাহা কিছু বাহ্য, তাহার অস্তিত্ব প্রকৃত নহে, সুধু কাল্পনিক—মায়িক। আমার মায়া-রাজ্যের একটি নিয়ম এই যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান-ধারা ইন্দ্রিয়-খাতে প্রবাহিত করিতে হইবে। হস্ত-পদাদি আমার সেই সৃষ্টি-শক্তিশালী ইন্দ্রিয়-সকলের কল্পিত কর্ম্মাধার (কর্ম্মেন্দ্রিয়) মাত্র। স্বপ্নের দৃষ্টান্তে কথাটা একটু পরিষ্কার করি। স্বপ্নকালে আমার বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল বাহ্যতঃ অক্রিয় অবস্থায় দৃষ্ট হইলেও, আমার কল্পনা-শক্তি অপর কতকগুলি মায়িক হস্ত-পদাদি সৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে; সুতরাং অন্ততঃ স্বপ্ন সময়ে আমি চক্ষু-কর্ণাদি কল্পনা করিয়া সেই মায়াময় ইন্দ্রিয় দ্বারা তাৎকালিক দর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে,—

"অপানি পাদৌ জবনো গ্রহীতা, পশ্চত চক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণঃ—(ইত্যাদি)

বস্তুতঃ হস্ত পদাদির বাহ্য অস্তিত্ব নাই; তবে আমি তাহাদের বাহ্য অস্তিত্ব এবং তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কল্পনা করি; খাস আমিত্বে তাই তাহারা আমার অঙ্গ স্বরূপ। যখন সেই কল্পিত হস্ত-পদাদির অস্তিত্ব-কল্পনা করি না, তখন সেই সেই অঙ্গের কল্পিত ক্রিয়াদিরও কল্পনা করি না। চক্ষু নাই, এই কল্পনার সঙ্গে দর্শনাভাব কল্পনা করি। কর্ণের অকল্পনার সঙ্গে শ্রবণাভাব কল্পনা করি। হস্তাভাব-কল্পনার সহিত গ্রহণ-ক্রিয়াভাব কল্পনা করিয়া থাকি। কিন্তু ঐ সকল কল্পনা চিরস্থায়ী নহে, সকলই সাময়িক ও মায়িক।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীতনুমাশ্রিতাঃ
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরং।

অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বভূতের সৃজন শক্তিশীলত্বের পরম তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমি অপনাকে মানুষ-দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছি বলিয়া বিবেচনা করি; পরমার্থতঃ আমার হস্ত-পদাদির কোন দেহ নাই।

আমি যখন আমিত্বের আলোচনায় পটু হইব, যখন কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত কল্পিত দশ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধ আর কল্পনা না করিয়া তদ্বিপরীত জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য কল্পিত জগৎ হইতে টানিয়া লইয়া আমাতেই স্থির করিব, (তদা স্বরূপেঽবস্থানম্) তখন আমার সৃষ্ট্যন্তর "Sabbath Day" অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবান্ত উপস্থিত হইবে। আমি তখন পরিদৃশ্যমান সমুদয় সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, সুদীর্ঘ-সুষুপ্তিতে মগ্ন হইয়া, চিদাত্মারূপে স্বরূপে অবস্থান করিব। তখন আমার হস্ত-পদাদি কিছুই থাকিবেনা। আবার সুদীর্ঘ-কাল পরে স্বরূপ সংহত করিয়া সুষুপ্তি হইতে জাগরিত হইয়া তটস্থ লক্ষণে বিচিত্র বিশ্ব-রচনা কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। তখন আবার আমার হস্ত-পদাদি সমুদয় পরিকল্পিত হইবে। ফলতঃ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারে একমাত্র পদার্থ, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে,

তাহা চৈতন্যময় আমিই। আর আমি ভিন্ন যত কিছু, (তা আমার দেহই হ'ক, আর দেহাতিরিক্ত তোমরাই হও) সমুদয়ই মায়িক, সমুদয়ই আমার কল্পিত—আমার সৃষ্ট; ঠিক এখন আমার মায়ায় আমি মুগ্ধ! আমার স্বরূপতঃ ইচ্ছা হইলে, এখনই এই জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহার স্থানে অন্যরূপ সৃষ্টি গঠিত হইবে। এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে সৃষ্টিকর্ত্তা—সে ত আমিই!—"সোঽহং ব্রহ্ম" সৃষ্টিকর্ত্তা যখন জাগরিত থাকেন কিনা সৃষ্টি চিন্তা করেন, তখন "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।" মদীয় অব্যক্ত-শক্তি নিহিত এই জগৎ ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং যখন তিনি শান্ত হইয়া নিদ্রিত হয়েন তখন 'রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে।" এই ব্যক্ত জগৎ মদীয় অব্যক্ত শক্তিতে বিলীন হয়, তাই "যদা সদেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি।" এবং এইরূপে "ভূত গ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে" সেই ভূতগ্রাম :পরাব্যক্ত পরমেশ্বর-নিয়োজিত কর্ম্মবশে অব্যক্ত আমা হইতে আমার কল্পনার বিরাম সময়ে পুনঃ পুনঃ লয়প্রাপ্ত এবং আমার কল্পনার লীলা সময়ে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হয়। আমি সেই ব্রহ্ম; কিন্তু তুমি কি? যদু, মধু, রাম, শ্যাম, তুমি, তোমরা যে কেহ, আমার কল্পিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড—যাহাকে আমি আমার কল্পনাবলে সৃষ্টি করিয়া "তুমি" বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, এসকল কি? না "তত্ত্বমসি"—তুমিও সেই ব্রহ্ম। যেমন আমি এই জগতের স্রষ্টা, তেমনি তোমরা আমার সৃষ্ট, স্রষ্টা! স্রষ্টা ও সৃষ্ট, উভয়েই সেই ব্রহ্ম। পুরুষ যেমন প্রকৃতিতে রমণ করেন, তদ্রূপ আমি যখন আমার কল্পনাতে রমণ করি—স্রষ্টা যখন সৃষ্টির আলোচনা করেন—তখন, "যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ" এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়; আবার পুরুষ যখন প্রকৃতির রতি ত্যাগ করেন, (আমি যখন আমার সর্ব্বপ্রকার সৃষ্টি-কল্পনা হইতে বিশ্রাম লাভ করি) স্রষ্টা যখন সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তখন—"যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্ব্বং নিমীলতি" এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর সকলই মহাপ্রলয়ে অন্তর্হিত হয়।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমি কোথায় আসিলাম! পরিদৃশ্যমান জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মের অন্বেষণে বাহির হইয়া বিশ্বচরাচর খুঁজিয়া দেখিলাম যে আমিই সেই ব্রহ্ম! আর মদিতর যত কিছু, সকলই সেই ব্রহ্মের—"তত্ত্বমসি" বা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্যের মহিমাবৃত। আমি এই সকল কল্পনা করিতেছি, এবং আমার কল্পিত তোমরা কল্পনাময় আমার অন্তর্গত; সুতরাং তোমাতে আমাতে আশ্রিত-আশ্রয়-ভাববৎ একটী অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কল্পিত। সেই জন্য তুমিত্ব জ্ঞান দূরে রাখিয়া, আমার আমিত্ব-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। যখন তোমাকে হারাই, তখন বিশ্বস্রষ্টারূপী আমি আমাকেও বিস্মৃত হই, এবং যখন তোমাকে পাই, তখনই আবার আমার বিশ্বস্রষ্টৃত্ব ভাবের আমিত্ব-জ্ঞান পরিস্ফুটিত হয়। তাই তুমি-আমি সাংসারিক দৃষ্টিতে—মায়িক দৃষ্টিতে—দর্পণের প্রতিবিম্ববৎ পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বসাপেক্ষ। আমি স্রষ্টা ও তোমরা সৃষ্ট; আমি কারণ, তোমরা

কার্য্য; কিন্তু যেমন কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অভেদরূপে কারণে থাকে, তদ্রূপ তোমরা কল্পিত হওয়ার পূর্ব্বে আমার প্রসুপ্ত কল্পনা মধ্যে লীন ছিলে, এবং যেমন "কার্য্যস্থ কারণাত্মকত্বাৎ" কারণই কার্য্যোৎপত্তির আংশিকরূপে কার্য্যে অন্য প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আমার কল্পনাই তোমাদের রূপ ধারণ করিয়া আমাহইতে পৃথক্‌বৎ দেখায়। "ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্ব-ভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥" এই পরিদৃশ্য-মান জগৎ অব্যক্ত-মূর্ত্তি আমারই শক্তিতে পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ সকলই আমার কল্পনার অন্তর্গত, আমি ইহাদের অন্তর্গত নহি; আমি এইরূপ কল্পনা করি বলিয়াই ইহারা এইরূপ দেখায়; নতুবা ইহারা আছে বলিয়া আমি এইরূপ দেখি না। আবার-"নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ।" এই সকলই আমার কল্পনাগত হইলেও, ইহারা আমার স্বরূপের অন্তর্গত নিত্য পদার্থ নহে। পরব্রহ্ম-নির্দ্দিষ্ট—আমার ইহা একটি অঘটন-ঘটন-চাতুরী যে, আমি এই সকলের উৎপত্তি-স্থিতির কারণ হইয়াও আমি ইহাদের অন্তর্গত পদার্থ নহি। বস্তুতঃ তোমরা সকলই আমার কল্পনাসম্ভূত, এবং আমার কল্পনা-সম্ভূত বস্তু ভিন্ন আমা হইতে পৃথক্ এমন কিছু বাহ্য বস্তু আমার সৃষ্টির মধ্যে নাই; সুতরাং আমার পরিকল্পিত জগতে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম কিন্তু এই সকলই কি অনাদ্যন্ত-দেশ-কালব্যাপী সকলেরই শেষ? আমার সৃষ্টিই কি চূড়ান্ত সৃষ্টি এবং আমার সৃষ্টি ছাড়া কি আমার অজ্ঞাত অন্য কোন সৃষ্টি নাই? আমার সৃষ্টির বাহিরে অন্য সৃষ্টি নাই—একথা আমি কল্পনা করিতে পারিনা, বরং আমি বুঝিতে পারি যে, প্রভূত শক্তি থাকিতেও আমি আমার কল্পিত কাল ও দেশের আদি-অন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিনা; পরন্তু বুঝিতে পারি যে, আমার কল্পনার উপর আমার কোন স্বাধীন নিয়ন্তৃত্ব নাই, যেন কোন এক অনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বময় শক্তির সম্পূর্ণ বশতা-পন্ন হইয়া তাহারই হস্তে ক্রীড়া পুত্তলিকাবৎ ক্রীড়া করিতেছি। অধিক কি, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্ব-চরাচর-কল্পনা করিবার আমার যে এক ক্ষমতার এত বড়াই করিয়া আসিলাম, তাহাও সেই অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্রাংশ-বিশেষ; পরমার্থতঃ চরাচর-ভূত সকলের কারণীভূত হিরণ্যগর্ভাখ্য যে অব্যক্তশক্তি আমি, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে পরা ব্যক্ত শক্তি, তিনি সনাতন এবং মদীয় ভৌতিক কল্পনার বিনাশ হইলেও তাঁহার বিনাশ নাই। তিনিই প্রকৃত অব্যক্ত-পদ-বাচ্য অক্ষর পুরুষ, আর তিনিই সকলের পরমা গতি; তাঁহাকেই জানিতে পারিলে আর কল্পনা-গত জরা-মরণ-ভাবময় সংসারে পুনরা-বর্ত্তন করিতে হয়না। "পরস্তস্মাত্তু ভাবো-ন্যোঽব্যক্তোব্যক্তাৎ সনাতনঃ। যঃ সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি" "অব্যক্তো-ক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।" "যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই অনাদ্যন্ত-অচিন্ত্য-শক্তি পরমাশ্চর্য্য পরমপুরুষের সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হই, এবং সকলের সর্ব্বময়কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করি।

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্ত রূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্ক
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিত-বিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

সেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম অনন্তকাল ধরিয়া অনন্ত প্রদেশ ব্যাপিয়া অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতেছেন, তাঁহারই একটী জ্ঞান-ধারা ব্রহ্মরূপী আমা দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব করাইতেছেন, এবং তিনিই আমার কল্পনা-শক্তির কেন্দ্রস্থানে বসিয়া, কেমন অলক্ষিতভাবে তাঁহার নিজ শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া প্রকৃতি-প্রসঙ্গাধীন পুরুষ আমাকে ক্রীড়া পুত্তলীবৎ নাচাইতেছেন! জানিনা, সেই মহাপ্রভু আমাকে আবার কখন কোন্ স্রোতে ভাসাইয়া কোন্‌দিকে লইয়া যাইবেন। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, তিনিই—যখন যে পথে ইচ্ছা—অহং-জ্ঞান-বাচ্য জ্ঞান-ধারাকে প্রবাহিত করেন। তিনি আমাকে তাঁহার ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না; কেননা, তাঁহার ক্রোড় ছাড়া স্থান কল্পনায় আইসে না, এবং যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে তাঁহার সেই সর্ব্বমঙ্গলময় ক্রোড় সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিতে পাই। সেই পরম জ্ঞান-ধারার কেন্দ্রস্থান অনির্দ্দিষ্টরূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, এবং তাহার আদি-অন্ত কোথাও নাই।

"নান্তং নমধ্যং নপুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

হে প্রভো! আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার আশ্রিত। জানিনা, তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে আমা দ্বারা এই সকল সৃষ্টি করাইয়া, সেই কল্পিত সৃষ্টির সুখ-দুঃখে পরমার্থতঃ অনাসক্ত আমাকে মায়াপহৃত করিয়া, কখনও হৃষ্ট কখনও ক্লিষ্ট করিতেছে।

"জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ,
জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

হে প্রভো! কি প্রকার কল্পনায় সুখ হয়, তাহা বুঝি, কিন্তু সে প্রকার কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিনা; কি প্রকার কল্পনায় দুঃখ হয়, তাহাও বুঝি, কিন্তু সে কল্পনা নিবারণ করিতে পারিনা। তুমি সর্ব্ব-প্রকার কল্পনার ঈশ্বরস্বরূপ আমাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদ্বারা যখন যেমন কল্পনা করাও, আমি তখন তেমনই ভিন্ন অন্যরূপ কল্পনা করিতে পারিনা। অক্ষমতা প্রযুক্ত সুখকর কল্পনা দ্বারা তোমার শান্তি-ময় ক্রোড়ে রহিয়াও শান্তি সুধাপান করিতে অশক্ত হই। অতএব আমি সর্ব্বদা তোমার শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করি যে, তুমি দয়া করিয়া আমাকে শান্তি-সুখকর কল্পনা করিবার ক্ষমতা ও উপায় শিক্ষা দেও।

—"শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

(সমাপ্ত)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

—o:0:o—

Psychology of Bhudhism—by Charu Chandra Bose. Published by the Mahabodhi-Society, 2, Creek Row. Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু চারু চন্দ্র বসু প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক এই ইংরাজি পুস্তিকা পাঠ

করিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, এবং ইহাতে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের স্থূল মর্ম্ম সমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক ভ্রমাত্মক সংস্কার পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী বা বিদ্বেষী নহে, পরন্তু মূল তত্ত্ব সমূহে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পূর্ণভাবেই হিন্দুধর্ম্মের অনুগামী। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি দ্বাদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চস্কন্ধ (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চস্কন্ধ আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় নামক পঞ্চকোষ। তৃতীয় অধ্যায়ে পুনর্জন্ম এবং কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইদানীন্তন বৌদ্ধ-শিক্ষকেরা যেরূপ ভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। অধুনা বৌদ্ধশিক্ষকেরা শরীর হইতে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও পুনর্জন্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পালিভাষা-লিখিত "ধম্মপদ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের এই সংস্কার হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব স্বয়ং দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আচার বা শীল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শরীর, মন এবং বাক্য পবিত্র রাখার সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের উপদেশে কোনই প্রভেদ নাই। তৎপরে গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে সমাধি, ধ্যান, জ্ঞান ও নির্ব্বাণের সুন্দর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুস্তিকা খানি পাঠ করিলে সকলেই অনায়াসে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। গ্রন্থের মূল্য ।৶ ছয়আনা মাত্র, কলিকাতা ২নং ক্রিক্‌রো ভবনে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার।

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ-প্রণীত। সাকার নিরাকার-তত্ত্ববিচার লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিয়াছে। পুস্তক-পুস্তিকায়, পত্র-পত্রিকায়, সভায়-বক্তৃতায়, এমনকি, অভিনয়ের রঙ্গালয়ে—যাত্রার আসরে পর্য্যন্ত "সাকার-নিরাকার" প্রসঙ্গের তরঙ্গ আসিয়া লাগিয়াছে! যাহাহউক, এ প্রসঙ্গের প্রবলবেগ কিছুদিন পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে নব্য শিক্ষিত সমাজ প্রায়শঃ হয় নাস্তিকতা—নয় আধুনিক নিরাকারবাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় এখন ক্রমশঃ তাহার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে; ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-উপাধিধারী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর্য্যশাস্ত্র-বিহিত সাধনোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক যুগ-যুগান্ত পরীক্ষা পূত সদ্যঃসিদ্ধিপ্রদ সাকার-উপাসনায় নিরত হইতেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনও বি-এ উপাধিধারী; ইনি স্বীয় গুরুদেবের চরণেই এই গ্রন্থচ্ছলে নিজ হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন। যতীন্দ্র বাবু গ্রন্থখানির জন্য অনেক খাটিয়াছেন। ভগবৎকৃপায় তাঁহার এ শ্রমও নিষ্ফল হইবেনা, গ্রন্থপাঠে ইহাই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শন ও আর্য্যশাস্ত্র মন্থন করিয়া ইনি উপাসনা-তত্ত্ব-বিষয়ে যে সিদ্ধান্তামৃত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা নব্য-শিক্ষিত-সমাজ আস্বাদন করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হউন, ভগবচ্চরণে আমাদের এই প্রার্থনা। হিন্দু পত্রিকার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সন্দর্ভখানির সম্যক্ আলোচনা সম্ভাবিত নহে। ফলে ব্রাহ্মসমাজের মত ও নগেন্দ্র-বাবু প্রমুখ নিরাকারবাদ-লেখকগণের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন-সঙ্গে২ পাশ্চাত্য নাস্তিক্যবাদ নিরসনপূর্ব্বক ভারতের সিদ্ধর্ষি সেবিত সাকারোপাসনা-তত্ত্ব গ্রন্থখানিতে সুন্দর প্রতিপাদিত হইয়াছে। উপসংহারে,—বিচার-সংগ্রামে বিজয় শ্রম শ্রান্ত গ্রন্থকার আবেগভরে 'পৌত্তলিকত্ব' সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা বড়ই মিষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। ভরসা করি, পাঠাভিলাষীগণ একটী মাত্র টাকা ব্যয় করিয়া "বাউষখালী (ফরিদপুর)" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট হইতে গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

ঋগ্বেদ।

(গত ভাদ্র-সংখ্যার পর হইতে।)

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে তস্মিন্না তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা।
তস্য নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ সনাদেব ন শীর্য্যতে সনাভিঃ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। পঞ্চ-অরে। চক্রে। পরিবর্ত্তমানে। তস্মিন্। আ। তস্থুঃ। ভুবনানি। বিশ্বা। তস্য। ন। অক্ষঃ। তপ্যতে। ভূরিভারঃ। সনাৎ। এব। ন শীর্য্যতে। সনাভিঃ।

ব্যাখ্যা। পঞ্চ-অরে—পঞ্চঋতুরূপ অর বা শলাকা আছে যাহার তাদৃশ। চক্রে কাল-চক্রে। পরিবর্ত্তমানে নিয়ত পবিবর্ত্তনশীল। তস্মিন্ সেই প্রসিদ্ধ কালচক্রে। বিশ্বা সমগ্র। ভুবনানি—জগৎ। আ-তস্থুঃ—অবস্থান করিতেছে। তস্য—তাহার। অক্ষঃ—ধুর। ন—না। তপ্যতে—ক্লান্ত হয় না। ভূরিভারঃ—ভূরি—বহুভার যাহার সেই অধিক ভারযুক্ত। সনাৎ—সনাতন। এব—নিশ্চয়ে। ন শীর্য্যতে—শীর্ণ হয় না। সনাভিঃ—সমানাবস্থাপন্ন নাভি অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ নাভি।

বঙ্গার্থ। নিয়ত আবর্ত্তমান পঞ্চঋতুরূপ অরবিশিষ্ট কালচক্রে এই বিশ্ব ভুবন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, উহার অক্ষ—অর্থাৎ ধুর বহুভার বহনেও কখন ক্লান্ত হয় না; উহার নাভিও চিরকাল সমান অবস্থায় রহিয়াছে, উহা কখন বিশীর্ণ হয় না।

সনেমি চক্রমজরং বিবাবৃত উত্তানায়াং দশযুক্তা বহন্তি।
সূর্য্যস্য চক্ষূরজসৈত্যাবৃতং তস্মিন্নার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। সনেমি। চক্রং। অজরম্। বি। ববৃতে। উত্তানায়াং। দশ। যুক্তাঃ। বহন্তি। সূর্য্যস্য। চক্ষুঃ। এতি। আবৃতম্। তস্মিন্। অর্পিতা। ভুবনানি। বিশ্বা।

ব্যাখ্যা। সনেমি—সমাননেমি। চক্রম্—চক্র। অজরম্—জরারহিত অর্থাৎ সনাতন। বি-ববৃতে—পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে বিবৃত হয়। উত্তানায়াং—উর্দ্ধদেশে। দশ—দশদিক। যুক্তাঃ—পরস্পর মিলিত হইয়া। বহন্তি—পৃথিবীকে বহন করে। সূর্য্যস্য—সূর্য্যের। চক্ষুঃ—মণ্ডল। রজসা—বৃষ্টিদ্বারা। এতি—হয়। আবৃতম্—আবৃত। তস্মিন্—সেই সূর্য্য মণ্ডলে। ভুবনানি—জগৎ। বিশ্বাঃ—সমগ্র।

বঙ্গার্থ। সমাননেমি চক্র জরারহিত হইয়া অর্থাৎ চিরদিন অক্ষতভাবে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হয়। দশদিক্ পরস্পর মিলিত হইয়া পৃথিবীকে উর্দ্ধ প্রদেশে বহন করিয়া রাখে, সূর্য্যমণ্ডল বৃষ্টিদ্বারা আবৃত হয়। তাহাতেই বিশ্বভুবন অর্পিত রহিয়াছে।

সাকংজানাং সপ্তথমাহুরেকজংষলিদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।
তেষামিষ্টানি বিহিতানি ধামশঃ স্থাত্রে রেজন্তে বিকৃতানি রূপশঃ ॥১৫

পদপাঠঃ। সাকংজানাং। সপ্তথম্। আহুঃ। একজম্। ষট্। ইত্। যমাঃ। ঋষয়ঃ। দেবজাঃ। ইতি। তেষাম্। ইষ্টানি। বিহিতানি। ধামশঃ। স্থাত্রে। রেজন্তে। বিকৃতানি। রূপশঃ।

ব্যাখ্যা। সাকংজানাং—একত্র উৎপন্নদিগের মধ্যে। সপ্তথম্—সপ্তম ঋতু। আহুঃ—বলিয়া থাকেন। একজম্—অযুগ্ম। ষট্—ছয় ঋতু। ইৎ—নিশ্চয়ে। যমাঃ—যুগ্ম। ঋষয়ঃ—গমনশীল। দেবজাঃ—দেব অর্থাৎ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন। ইতি—এই প্রকার বলিয়া থাকেন। তেষাম্—ঋতূনাং—ঋতুসমূহের। ইষ্টানি—সর্ব্বলোকাভিমত বিহিতানি—বিহিত স্থাপিত। ধামশঃ—পৃথক্ স্থানে। স্থাত্রে—অধিষ্ঠাতার নিমিত্ত। রেজন্তে—ভ্রমন্তি জগদ্ব্যবহারায় পুনঃ পুনরাবর্ত্তন্তে ইতিভাবঃ। জগতের ব্যবহারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়। বিকৃতানি—বিবিধ আকৃতিযুক্ত। রূপশঃ—রূপভেদে।

বঙ্গার্থঃ। আদিত্যের সহজাত সপ্তঋতুর মধ্যে সপ্তম ঋতু কেবল একক অর্থাৎ অযুগ্ম, অন্য ছয় ঋতু যুগ্ম. গমনশীল ও আদিত্য হইতে উৎপন্ন। এই ঋতুগণ সকলের অভিমত এবং স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্থাপিত এবং রূপভেদে বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা আপনার অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেবের জন্য পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে।

বিশেষ ব্যাখ্যা। দ্বাদশ মাসে বৎসর হয়, কিন্তু সৌর মাস না ধরিলে সময় সময় ত্রয়োদশ মাসেও বৎসর হয়। দুই দুই মাসে এক এক ঋতু, ইহারা যুগ্ম;

কিন্তু ত্রয়োদশ মাসে যে ঋতু, তাহা একক—অর্থাৎ ঐ মাসকে "নিঃসূর্য্য অধিক" মাসও বলে।

স্ত্রিয়ঃ সতীস্তাঁ উমে পুংস আহুঃ পশ্যদক্ষণ্বান্ন বি চেতদন্ধঃ।
কবির্যঃ পুত্রঃ স ঈমাচিকেত যস্তা বিজানাৎ স পিতুষ্পিতাসৎ॥১৬॥

পদপাঠঃ। স্ত্রিয়ঃ। সতী। তান্। উম্। মে। পুংসঃ। আহুঃ। পশ্যাৎ। অক্ষণ্বান্। ন। বি। চেতৎ। অন্ধঃ। কবিঃ। যঃ। পুত্রঃ। সঃ। ঈম্। আ। চিকেত। যঃ। তা। বিজানাৎ। সঃ। পিতুঃ। পিতা। অসৎ।

ব্যাখ্যা। স্ত্রিয়ঃ—স্ত্রী। সতীঃ—হইলেও। তান্—রশ্মিসমূহকে। উ—নিশ্চয়ে। মে—মদীয়া যা দীধিতয়ঃ—আমার যে রশ্মিসমূহকে। পুংসঃ আহুঃ—পুরুষ বলে। পশ্যৎ—(পশ্যতি) দেখে। অক্ষণ্বান্—জ্ঞানচক্ষু বিশিষ্ট। ন বিচেতৎ—(ন বিচেতয়তি) জানে না। অন্ধঃ—স্থূলদৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান। কবিঃ—ক্রান্তদর্শী। যঃ—যে। পুত্রঃ—পুত্র। সঃ—সে। ঈম্—এই স্ত্রী পুরুষভাব। আ চিকেত—বিশেষরূপে জানে। যঃ—যে। তা—(তানি) সেই সকল অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্ররূপ। বিজানাৎ—(বিজানাতি) জানে। সঃ—সে। পিতুঃ—পিতার অর্থাৎ পিতৃরূপ রশ্মির। পিতা—পিতা অর্থাৎ রশ্মির জনক আদিত্য স্বরূপ। অসৎ—(ভবেৎ) হয়। অথবা পিতার পিতা হয় অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদির সহিত দীর্ঘজীবী হয়।

বঙ্গার্থ। আমার (সূর্য্যের) রশ্মিসমূহ স্ত্রী হইলেও পুরুষ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইহা বুঝিতে পারেন। অজ্ঞানগণ ইহা বুঝিতে পারে না। ক্রান্তদর্শী (মেধাবী) পুত্রই ইহা বুঝিতে পারেন। যিনি এই স্ত্রী পুরুষ এবং পুত্রভাব বুঝিতে পারেন, তিনি পিতার পিতা।

বিশেষ ব্যাখ্যা। সূর্য্যরশ্মি উদকগ্রহণ করেন, এইজন্যই স্ত্রীরূপা এবং বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এইজন্যই পুরুষরূপ। জ্ঞানী ব্যক্তিই এই প্রত্যেক বস্তুর স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি পুত্রত্ব, স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব, এই অবস্থাত্রয় অনুভব করিয়াও তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখেন না, সে ব্যক্তি পিতারও পিতা অর্থাৎ পরম জ্ঞানী।

আধ্যাত্মিকব্যাখ্যা। নিরুপাধিক আত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। আত্মা উপাধিগ্রস্ত হইলেই তাঁহার স্ত্রীত্ব পুংস্ত্বের অভিধান হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান্ অসি ত্বং কুমার উত কুমারী" অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী। অর্থাৎ তুমি যখন যে দেহ আশ্রয় কর, তখন তাহারই আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ নৈবচায়ং নপুংসকঃ" ইনি পুরুষ নহেন, স্ত্রীও নহেন বা নপুংসকও নহেন, দেহভেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন মাত্র। বস্তুমাত্রেই স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি নিহিত আছে, এই উভয় শক্তির মূলে সেই ব্রহ্মশক্তি। যাহাকে আমরা স্ত্রীলোক বলি, বস্তুতঃ সেই স্ত্রীলোকের আত্মা কিছু স্ত্রী নহেন, তদ্রূপ

যাহাকে আমরা পুরুষ বলি, সেই পুরুষের আত্মা কিছু পুরুষ নহেন, উপাধিভেদে আত্মা স্ত্রী পুরুষ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। এই আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া এই মন্ত্রের অর্থ করিলে এই অর্থ হয় যে—অজ্ঞগণ যাহাদিগকে স্ত্রী বলে, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকেই আবার পুরুষ বলেন, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষ কোন প্রভেদ দেখেন না—(যা ইদানীং স্ত্রিয়ঃ সতীঃ স্ত্রীত্বং প্রাপ্তাঃ আহুঃ লৌকিকাঃ, তান্ উ [এব] মে [মহ্যং] পুংস (পুরুষান্ আহুঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ ইতি সায়নঃ)। জ্ঞানী ব্যক্তিই এ স্ত্রী-পুরুষের তত্ত্ব বুঝিতে পারেন, অজ্ঞ বুঝিতে পারে না। পুত্র অর্থাৎ বয়ঃ কনিষ্ঠ হইলেও যদি তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী হন, তাহা হইলে তিনি এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন (ঈমা আচিকেত) যিনি এই সকল বুঝেন, তিনি পিতারও পিতা হইয়া থাকেন অর্থাৎ এতাদৃশ ক্রান্তদর্শী পুত্র তত্ত্বানভিজ্ঞ পিতারও পিতা অর্থাৎ শিক্ষক হইয়া থাকেন, (যস্তান্ বিজানাৎ, সঃ পিতুঃ পিতা অসৎ মূল।) শ্রুতিতে আছে যে শিশু অঙ্গিরস, তত্ত্বজ্ঞান নিবন্ধন তাঁহার পিতৃদিগেরও শিক্ষক হইয়াছিলেন, (শিশুর্বাঙ্গিরসো মন্ত্রকৃতাং মন্ত্রকৃদাসীৎ, স পিতৄন পুত্রকা ইতি আমন্ত্রয়ন্তেতু পক্রম্য তং পিতরোক্রুবন্নধর্ম্মং করোষি যো ন পিতৄন্ সতঃ পুত্রকা ইতি, আমন্ত্রয়ত ইতি সোহব্রবীদহংবাবপিতাস্মি যো মন্ত্রকৃদিতি দেবান পৃচ্ছান্ত তে দেবা অব্রুবন্ এষবাব পিতা যো মন্ত্রকৃদিতি তদ্বৈস উদজয়দিতি। মন্ত্রদ্রষ্টুরেব কিলপিতৃত্বং তত্ত্ববিৎ পিতুঃ পিতা সদিতি কিমাশ্চর্য্যম্ ইতি অভিপ্রায়ঃ) সায়নঃ।

ভক্তিসাধন।

সকল সাধনের মুখ্য সাধন ভক্তি, সাধক যাহার সাধন করিবেন তাঁহাতে ভক্তি না থাকিলে তিনি সে সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না, সাধনা-সিদ্ধির প্রধান কারণ ভক্তি, অভক্তের সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। জগতে অনেক বিষয়ের অনেক প্রকার সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ জড়ের সাধক, অর্থাৎ জড় লাভ বিষয়ে তাঁহার সাধনা, পার্থিব ধন, রত্ন প্রভৃতির প্রাপ্তি বা সিদ্ধি তাঁহার সাধনার উদ্দেশ্য, কেহ জৈবসাধক, কেহ জ্ঞানের সাধক, কেহ আনন্দের সাধক, কেহ বা সচ্চিদানন্দের সাধক। যে সাধক যে বিষয়ে পূর্ণ কাম হইয়াছেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সে বিষয়ে অচলা ভক্তি ছিল, বহু লোকের সাধনা যে পূর্ণ হয় না তাহার কারণ ভক্তি-হীনতা; ভক্তি সাধনের মূল বিশ্বাস, আমি যাঁহাকে ভক্তি করিব, প্রথমে তাঁহার উপরে আমার বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, তিনি আমার ইষ্ট সাধক, এই বিশ্বাস জন্মিলেই তাঁহার উপরে স্বতঃই ভক্তির সঞ্চার হইবে; তখন তাঁহার প্রিয় সম্পাদনের জন্য কার্য্য করিতে দৃঢ় উৎসাহ আসিবে এবং সেই কার্য্য যতই ক্লেশকর হউক না তাহার

সম্পাদনে ক্লেশের পরিবর্ত্তে আনন্দ অনুভব হইবে; যাঁহার প্রতি যাঁহার যতদূর বিশ্বাস তাঁহার প্রতি তাঁহার ততই অচলা ভক্তি। এই ভক্তিতে হয় কি? ভক্তিমান্ মানুষ অপরের অসাধ্য-সাধনে সমর্থ হয়, বিমলানন্দের অধিকারী হয়, নৈষ্ঠিক-ভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি দুঃখ কাহাকে বলে তা জানে না, সে সর্ব্বস্ব নাশে কাতর হয় না, দেহ মনঃপ্রাণ দান করিয়াও আনন্দিত হয়। সুখ ও শান্তি যদি আমাদের প্রার্থনায় হয়, তবে আমাদের ভক্তি সাধন করিতে হইবে, সুখ শান্তি কে না কামনা করে? সুখের বস্তু কে না অর্জ্জন করে? মানুষ মাত্রেই সুখানুসন্ধানে নিরত, যে বস্তু লাভ করিলে সুখী হইব বোধ করে, সেই ধন-মান বিদ্যা-পদ প্রভৃতি কত যত্নে উপার্জ্জন করে, কিন্তু কাহারও দ্বারা সুখী হইতে পারে না, অতৃপ্ত হইয়া যতই উপার্জ্জন করে, ততই দুঃখ বর্দ্ধিত হয়, দুরাশার আশ্বাস বাক্যে কেবল সেই গভীর দুঃখ সহ্য করে, ভক্তিহীন শুষ্কচিত্ত কঠোর ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই এই কথার যথার্থতায় আর সন্দেহ থাকে না। নিজে যদি সুখী হইতে চাও তবে সৎ ও পবিত্র পদার্থে ভক্তিমান্ হও, মানুষকে যদি সুখী করিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে ভক্তি শিক্ষা দাও. শৈশবে তাহাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা ভক্তির বীজ বপন কর, পুত্র, কন্যা, ছাত্র ও শিষ্যদিগের নবীন কোমল হৃদয়ে গার্হস্থ্য সৎ পবিত্র ধর্ম্মে এবং ধর্ম্মাধিরাজ পরমেশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদিত কর, তবে তাহারা ধর্ম্মে ও ধর্ম্মরাজে ভক্তি করিতে শিখিবে, পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ভক্তির সঞ্চার হইলে পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হইয়া স্বতঃই তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইবে, আর সচ্চিদানন্দ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইলে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সম্পাদনে তৎপর হইবে। শাস্ত্রে ভক্তির অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, যথা হৈতুকী, নৈষ্ঠিকা প্রভৃতি আমরা এখানে সে সকল বড়-বড় কথা কিছুই বলিব না, সহজ কথা এই প্রথমতঃ ভক্তি দুই প্রকার কৃত্রিম ও অকৃত্রিম, ভয় ও প্রলোভন জন্য যে ভক্তি তাহা কৃত্রিম, আর বিশ্বাস জন্য যে ভক্তি তাহাই অকৃত্রিম। আমাদের দেশে আগে অকৃত্রিম ভক্তি ছিল, বাল্যকাল হইতে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাস হেতু গুরুজনে, ঈশ্বরে ও পরমেশ্বরে ভক্তি সঞ্চার হইত, অজ্ঞানতার একাধিপত্য কালে এদেশীয়দিগের উর্ব্বর অন্তঃকরণ কুসংস্কার কণ্টক বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে সেই নিবিড় কণ্টক বনের মধ্যেও ভক্তি বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইত; এখন অকৃত্রিমের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ভক্তি আসিয়াছে, এখন আমরা আসল অপেক্ষা নকলের আদর করি, নকলে দেশ ছাইয়াছে, সকল বস্তুরই নকল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, এখন শ্রদ্ধাজাত ভক্তি অপেক্ষা ভয়জাত ভক্তি সংক্রামিত হইতেছে, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি সেই শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন ভক্তি আর দেখা যায় না, সেই জন্য গুরুজনদিগের বশ্যতা এখন আর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় বশ্যতা শব্দই আর দেখা যায় না, বশ্যতার পরিবর্ত্তে এখন বাধ্যতা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বাধ্যতা শব্দ সংস্কৃত [illegible] প্রাচীন বাঙ্গালা

পুস্তকেও পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইংরাজী obedience শব্দের অনুবাদে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। অনুবাদ ঠিক্ হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বশ্যতা ও বাধ্যতা শব্দে অনেক প্রভেদ আছে। বশ্যতা অর্থে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অধীনতা, বাধ্যতা অর্থে অনিচ্ছাসত্ত্বে অর্থাৎ বলপূর্ব্বক অধীনতা, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া করিতে হইল, ইহার অর্থ তিনি অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই কাজ করিলেন। ভক্ত ভক্তিভাজনের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুগামী হয়, অকৃত্রিম ভক্তিতে বশ্যতা উৎপাদন করে। শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তিমান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে ভক্তিভাজনের অনুগামী হয় এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, আর কৃত্রিম ভক্তিমান্ বাধ্য হইয়া প্রভু অনুমত কার্য্য করে, দুয়েতেই কার্য্য হয় বটে কিন্তু একটীতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আর একটীতে অনিচ্ছাপূর্ব্বক একটী লৌহ চুম্বকরূপী ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়, অপরটী গলবদ্ধ রজ্জুর আকর্ষণের ন্যায় প্রভুর আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হয়; একজন সন্তুষ্টচিত্ত আনন্দিত, আর একজন অসন্তুষ্ট ও সদা দুঃখভোগী। এখন দেখ কোন্ ভক্তি ভাল। ভক্তি মানুষের সকল প্রকার উন্নতির মূল, মানব সমাজ ভক্তিদ্বারাই গঠিত, ভক্তি না থাকিলে মানুষ সামাজিক জীব হইতে পারিত না, সমাজ বদ্ধ বলিয়াই মানুষ এত দিনে এতদূর উন্নত হইয়াছে এবং ক্রমোন্নত হইবে, সেই সমাজ বন্ধনের মূল ভক্তি, পুত্র যদি পিতামাতার প্রতি ভক্তি না করিত, পিতামাতা যদি ধর্ম্মে ভক্তি না করিতেন, তবে মানুষের সমাজ থাকিত না, পশু সংঘের ন্যায় দ্বিপদ জীবের অল্প দিন স্থায়ী এক একটা দল হইত। সুতরাং এই সুখের প্রস্রবণ উন্নতির মুখ্য উপায় ভক্তি আমাদের শিক্ষণীয়, পালনীয়, এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ ভক্তি? আসল না নকল? আসল রাখিয়া কে নকল গ্রহণ করে, কিন্তু নকল বড় সস্তা, আসলের মূল্য বেশী, সুলভ নকলের দ্বারা যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তবে কে শ্রমসাধ্য বহুমূল্য আসল গ্রহণ করে? ভয় জাত কৃত্রিম ভক্তি বা বাধ্যতা দ্বারা সামাজিক কার্য্য সম্পন্ন হয় বটে কিন্তু মানবাত্মার অবনতি হয়, মানুষের সমাজের সহিতই কেবল সম্বন্ধ নহে, মানবাত্মা অমর; পরমাত্মার সহিত তাহার চিরকালের সম্বন্ধ জ্ঞান ও আনন্দ তাহার চির দিনের উপার্জ্জনীয়। সেই মানবাত্মাকে অধঃপতিত করিয়া তাহার বিমল সুখের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে সামাজিক উন্নতি তাহা কি বাঞ্ছনীয়?

ধর্ম্মে বিশ্বাস বিহীন ব্যক্তিদিগকে সৎপথে রাখিবার জন্য তাহাদিগের দ্বারা সৎকার্য্য করাইবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তির জন্ম হইয়াছে, স্বয়ং ধর্ম্মে বিশ্বাস হীন পিতা প্রভৃতি পুত্র প্রভৃতিকে শিষ্ট কার্য্যক্ষম ও সুখী করিবার জন্য এই ভয়জাত কৃত্রিম ভক্তি তাহাদিগের অন্তরে উৎপাদন করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন, ইহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি হইবে তাঁহারা সামাজিক বা পার্থিব উন্নতি, যাহা যাহা কামনা করেন, তাদৃশ পুত্রাদি দ্বারা সে সকলই সম্ভব হইতে পারে; হয় না কেবল একটী, তাঁহারা যে তাহাদিগকে সুখী করিতে কামনা করেন, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না, সুখ কিসে হয়?

ধর্ম্মে, আন্তরিক ধর্ম্মে; তাহা যাহাদের নাই, যাহাদের মুখে ধর্ম্ম, তাহাদের সুখ কোথায়? আমি পিতার বাধ্য ভয়ে, রাজার বাধ্য দণ্ডের ভয়ে সমাজের বাধ্য নিন্দার ভয়ে, প্রভুর বাধ্য অর্থ হানির ভয়ে; এত ভয় যার, তার হৃদয় কি আর বিকাশিত হইতে পারে? সে কোথায় 'জড়সড়' হইয়া লুক্কায়িত থাকে, কেহই তাহা অনুভব করিতে পারে না, সে সতত পরাধীন অসন্তুষ্ট অবিশ্বাসী ও প্রীতিশূন্য। পরাধীন কেন? সে যত কাজ করে একটী ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে, সে অর্থের লোভে, যশের লোভে, উচ্চ পদের লোভে বাধ্য হইয়া কাজ করে, সে ভাবে আমি ধর্ম্ম বন্ধনের কোন ধার ধারি না, আমি বড় স্বাধীন, কিন্তু তার মত পরাধান পশুরাও নহে, সে অসন্তুষ্ট কেন? তার আশা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না, সে অবিশ্বাসী কেন? কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই, সে স্বয়ং যেমন অপরকেও সেইরূপ প্রস্তুত করে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা বন্ধু প্রজা ভৃত্য কাহারও উপরে তাহার বিশ্বাস হয় না, অবশ্য মুখে বলে বিশ্বাস আছে, কিন্তু বিশ্বাস থাকিতেই পারে না, কারণ তাঁহার স্ত্রী পুত্রাদিরা যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য করে তাহাত বাধ্য হইয়া। তাহাদিগের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হয় পাছে রজ্জুর আকর্ষণের শিথিলতা হয়; তাঁহারত কাহারও প্রতি প্রীতি থাকে না; বিশুদ্ধ ভক্তি ভিন্ন প্রীতি থাকে না যে হৃদয়ে বিশুদ্ধ ভক্তি নাই, সে হৃদয়ে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, আনন্দও নাই। বাধ্যতা-দ্বারা সামাজিক সমুন্নতি অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু তাহা উপভোগ করে কে? স্বাধীনতা রত্ন অপহৃত, অনুক্ষণ অসন্তোষ আত্মগ্লানি রূপ গভীর দুঃখ হ্রদে নিমগ্ন মানব কি কখনও বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপভোগ্য বস্তুতে সুখী হইতে পারে? হৃদয় সুখের নিলয়, সুখের আকর, বুদ্ধি সুখের বস্তু উপার্জ্জন করে, হৃদয় গ্রহণ করে, হৃদয় গ্রহণ করিতে না পারিলে প্রথবা বুদ্ধি আরও নূতন নূতন পদার্থ আহরণ করে, যতই আহরণ করে, হৃদয় তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, এই ধ্রুব সত্য কথার দ্বারা বুঝান কঠিন। ভয় জাত ভক্তি হৃদয় শুষ্ক করে, ভয়জাত ভক্তিমান্ লোক ক্রমে ক্রমে হৃদয়শূন্য হয়, হৃদয় বিহীন মানুষ একরূপ মৃত, তাহারা জড় নয় অথচ মৃত, তাহারা দৌড়ায় জোরে কথা বলে, কাজ করে, উপার্জ্জন করে, নূতন বস্তু প্রস্তুত করে, তথাপি তাহারা মৃত, তাহারা পরাধীন, অসন্তুষ্ট, হৃদয় হীন বলিয়াই মৃত, হৃদয় শুষ্ক হইলে হৃদয় না থাকিলে, হৃদয়ের বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না, অচিরমৃত শরীর যেমন চক্ষু থাকিতে দেখিতে পায় না, কর্ণ থাকিতে শুনিতে পায় না, স্পর্শ করিলে জানিতে পারে না, হৃদয় হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিতেও এক অন্তরিন্দ্রিয় অসাড় হইয়া যাওয়াতে সে অন্তরে কিছুই অনুভব করিতে পারে না, অন্ধ স্বহস্তে সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিলে সে যেমন তাহার রূপ স্বয়ং দর্শন করিয়া অনুভব করিতে পারে না, হৃদয়হীন ব্যক্তিও সেইরূপ সুদৃঢ় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিদ্বারা বহু-বিধ উপভোগ্য বস্তু প্রস্তুত করিয়াও স্বয়ং তাহা উপভোগ করিতে পারে না. সকলেই শূন্য হৃদয় হইলে সকলেই অসন্তুষ্ট, যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলে কে তাহা অনুভব করে? অন্ধের দেশে

প্রতিদিন পূর্ণিমার রাত্রি হইলেই বা কি আর না হলেই বা কি? এক উপকথা শুনিয়া ছিলাম, এক রাজপুত্র সাগর-পারে এক দেশে উপস্থিত হইলেন, সে স্থানটী রাজধানী। রাজপুত্র এক প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়া রাজার সুরম্য প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারে দ্বারবান্ ছিল না, রাজপুত্র একেবারে রাজার প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন গৃহ প্রকোষ্ঠ সব অতি সুন্দররূপে সজ্জিত, তিনিও রাজপুত্র কিন্তু অমন সুন্দর মহার্ঘ দ্রব্যে সজ্জিত গৃহ তিনি কখনও দেখেন নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে সকল গৃহেই বেড়াইতে লাগিলেন, ভোজনাগারে গিয়া দেখিলেন, স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সাজান রহিয়াছে, কিন্তু মানুষ নাই, সকল সুন্দর সজ্জিত গৃহে বেড়াইলেন কিন্তু কোথাও একটী মানুষ দেখিতে পাইলেন না, সেই রাজপুরী যেরূপ, হৃদয়হীন লোকের কাছে এই পিতামাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি ও অতুলৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পৃথিবীও কি সেইরূপ নহে? শ্রদ্ধাসমুৎপন্ন বিশুদ্ধ ভক্তিমান্ মানব পর্ণকুটীরে শাকান্ন ভোজনে যেরূপ বিমলানন্দ উপভোগ করেন, তাহা বাক্যে বুঝান যায় না, আত্মানুসন্ধান করিলেই ইহার যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশুদ্ধ ভক্তি হৃদয় সরস করে, হৃদয় প্রশস্ত করে এবং অপরের হৃদয়েও সুখশান্তি প্রদান করে। সন্দেহ ও অসন্তোষ বিদূরিত হয়, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন।

ভক্তই যথার্থ স্বাধীন, পরাধীন হইয়াও স্বাধীন, ভক্ত ভক্তিভাজনের অনুগামী হন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার ইচ্ছা স্বতঃই ভক্তিভাজনের ইচ্ছার সহিত মিশিয়া যায়, লৌহ যেমন জানে না যে, আমি কেন অয়স্কান্তের অনুগামী হই, আমার এই জড় দেহে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল, আমি কেন চুম্বকের সহিত মিশিবার জন্য এরূপ মহাবেগে ধাবিত হইতেছি, ভক্ত ও সেইরূপ ভক্তিভাজনের অলক্ষিত আকর্ষণে তাঁহার অনুগামী হন, সে অনুগমন তাঁহার আয়াসসাধ্য নহে, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তির ন্যায় অনায়াসসাধ্য; সুতরাং তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। অপরের আদেশে আমাকে কাজ করিতে হইলেই আমি পরাধীন, আমি যদি সর্ব্বভূমীশ্বর হই, আমার আদেশে সমস্ত জড়জগৎ, জীবজগৎ ও মানবসমাজ আমার সেবায় নিযুক্ত হয়, আর আমি স্বয়ং কোন অর্থ নীতির আজ্ঞানুবর্ত্তী হই, তবে আমি পরাধীন।

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥"

মহর্ষি মনু যথার্থ বলিয়াছেন, তিনি সুখদুঃখের সংক্ষেপে যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য; স্বাধীনতা সকলই সুখ, এই সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীন কে? যিনি আত্মার বশীভূত, যিনি আত্মধর্ম্মের বশীভূত তিনিই ভক্ত, তিনিই সুখী, তিনি সুখ কামনা করেন না, সুখ কোথা হইতে তাঁহার হৃদয় কন্দরে আসিয়া উপস্থিত

হয়। ভক্তিভাজনও ভক্তকে সতত স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, তাহার কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে তাঁহার বিন্দু মাত্র অবিশ্বাস থাকে না; তিনি জানেন, আমার ভক্ত কখনই আমার অপ্রিয়াচরণ করিবে না, তাহার কার্য্যের প্রতি আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ভক্ত জানেন, আমার প্রভু কখনও আমার অমঙ্গল করিবেন না। পরস্পরের এইরূপ স্বাধীনতা ও বিশ্বাস কি সুখের আকর! এইরূপ মানব-সমাজ স্বর্গের দেবসমাজ। এই অকৃত্রিম ভক্তি আমাদের অন্তঃকরণে যাহাতে উৎপন্ন হয়, আমাদের পুত্র, কন্যা, ভাই, বন্ধু, সকলেই যাহাতে হৃদয়বান্ হন, প্রকৃত সুখী হন, আমাদের কি তাহাই কর্ত্তব্য নয়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশ্বাস—অর্থাৎ শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ ভক্তির মূল; শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তি উৎপন্ন হয়। ধর্ম্মে ও পরমেশ্বরে যাহাতে বিশ্বাস হয়, প্রথমে সেই শিক্ষাই প্রদাতব্য। শৈশবই ইহার পুণ্য-কাল; শিশুর কোমল হৃদয়ই ইহার উত্তম ক্ষেত্র। ধর্ম্ম আমাদিগের সুখ ও শান্তির মূল; ভগবান্ সেই ধর্ম্মের অধিপতি। তিনিই আমাদের সৃজনকর্ত্তা, তিনিই আমাদের মঙ্গলবিধাতা, তিনি দয়া করিয়া 'ধর্ম্ম' নামে অতি মধুর বস্তু দিয়াছেন; ধর্ম্মাচরণের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে লাভ করিতে পারিব। তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বত্র-ব্যাপী, আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। কিন্তু ধর্ম্মাচরণ করিলেই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারিব; ধর্ম্ম যত বর্দ্ধিত হইবে, আমরাও তাঁহাকে তত জানিতে পারিব। আমাদের সকলেরই আত্মা আছে, সেই আত্মা অজর-অমর, আমাদের এই শরীর ধ্বংস হইলেও আত্মার ধ্বংস নাই, ধর্ম্মনাশেই বরং আত্মার নাশ বলা যায়; সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। আমরা ধর্ম্মাচরণ করিতেই এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলেন—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দামোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

(মনুসংহিতা)

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

"যদন্যৈর্বিহিতং নেচ্ছেদাত্মনঃ কর্ম্মপূরুষঃ।
ন তৎপরেষু কুর্ব্বীত জানন্নপ্রিয়মাত্মনঃ।
যদ্‌যদাত্মনিচেচ্ছেত তৎপরস্যাপি চিন্তয়েৎ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ধর্ম্মলক্ষণাধ্যায়)

মানুষ আপনার উপরে অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা না করে, সেইরূপ আচরণ নিজের অপ্রিয় জানিয়া অপরের প্রতিও তাহা করিবে না; নিজের প্রতি অপরের যেরূপ আচরণ ইচ্ছা করিবে, অপরের প্রতিও নিজে সেইরূপ আচরণ করিবে।

সংক্ষেপে এই ধর্ম্মের লক্ষণ বলা হইয়াছে; এইরূপ আচরণ করিলেই ধর্ম্মাচরণ করা হয়। এই পৃথিবীতে যাঁহারা আমাদের এই ধর্ম্মাচরণের সহায়তা করেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের উপকারী তাঁহারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা, মাতা, উপাধ্যায়, আচার্য্য প্রভৃতি আমাদের মঙ্গলের জন্য—আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে কতশত যত্ন ও কত পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দান করেন; দয়াময় পরমেশ্বর দয়া করিয়া আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার জন্য এই পৃথিবীতে তাঁহাদিগকে মিলাইয়াছেন; তাঁহাদের অন্তরে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারা না থাকিলে কে আমাদিগকে পালন করিত? কে বা ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া সুখের পথ দেখাইয়া দিত? অতএব পিতা-মাতা প্রভৃতি আমাদের পরম গুরু, পরমদেবতা, সুতরাং পরম ভক্তির পাত্র।

"পিতা-স্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরিপ্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥"

এখানে পিতৃশব্দের অর্থ পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী প্রভৃতি। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা প্রসন্ন হইলে পরম দেবতা প্রসন্ন হন, এই সকল সত্য মঙ্গলকর বাক্যে বিশ্বাস উৎপন্ন হইলে ধর্ম্মাচরণে সহজে প্রবৃত্তি জন্মে। পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াই অকৃত্রিম অচলাভক্তির উদয় হয়। ধর্ম্মের মধুরাস্বাদ একবার পাইলে, সে বুঝিতে পারে, এমন মধুরতম পদার্থ জগতে আর নাই, মানব-আত্মার চিরদিনের অক্ষয় ধন এমন আর নাই, অনন্তকালের সুহৃদও এমন আর নাই; পৃথিবীর ধন-রত্ন-বিভবের সহিত এই পার্থিব শরীরের সম্বন্ধ; এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধ্বংস প্রাপ্ত হলেই তাহাদিগের সম্বন্ধ উঠিয়া যায়; কিন্তু ধর্ম্মের সহিত চিরদিনের সম্বন্ধ; ধর্ম্ম আত্মার অন্ন, অর্থ শরীরের অন্ন; তখন সে বিচার করে, কোন্ অন্ন আমার বড়, ধর্ম্ম না অর্থ; শরীর রক্ষার নিমিত্ত অর্থ উপার্জ্জনীয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম আমার আগে, তারপর অর্থ; ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া—অনন্তকালের অন্ন সঞ্চয় না করিয়া, আমি দুদিনের অন্ন সংগ্রহ করিতে পারি না; আর ধর্ম্ম-রত্ন একবার সঞ্চয় করিলে তাহার আর ধ্বংস নাই। আত্মার উদরে এ অন্ন পরিপাক হইয়া যায় না, ইহা চিরদিন লৌহ-কবচের ন্যায় আত্মাকে রক্ষা করে, পারিজাত-কুসুমের ন্যায় অনুদিন আত্মার শোভা ও সৌরভ বিস্তার করে; এইরূপ বিবেক-বিচারণা আসিলে, তিনি কি আর অর্থকে বড় করিতে পারেন? তখন তাঁহার ধর্ম্মে, পরলোকে ও পরমেশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ় হয়; ইহাই ভক্তি শিক্ষার বা ভক্তি-সাধনের প্রকৃষ্টতম উপায়।

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণই ভগবদ্ভক্তির পূর্ব্ব কারণ। অন্তরে ভগবানের প্রকাশ অনুভূত না হইলে বিশুদ্ধ ভক্তি উদিত হয় না। এই ভগবদ্ভক্তিই মানবের মুক্তির অদ্বিতীয় হেতু, অনন্তকাল নিত্য সুখের নিদান। এই ভক্তির সঞ্চার হইলেই মানুষ পরিত্রাণ পায়। ভগবানের প্রকাশ বা স্বরূপের উপলব্ধি ভিন্ন ভক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই। ঐ উপ-

নহি ভিন্ন যে ভক্তি, সে কৃত্রিম ভক্তি; তাঁহার মাধুর্য্যের আস্বাদ না পাইয়া যে ভক্তি, সে ভক্তিতে মানুষ পরিত্রাণ পায় না। যদি বল, ঐ অন্ধ-ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়, কিন্তু তা যায় না; তিনি কি কোথাও লুকাইয়া আছেন, যে তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে হইবে? তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। সকল হৃদয়েই তাঁহার মধুর জ্যোতিঃ নিপতিত হইতেছে; কোথাও ন্যূনাধিক্য নাই, কিন্তু তাহা গ্রহণ করে কে? ধর্ম্ম-জ্ঞানের দ্বারা নির্ম্মলীকৃত অন্তঃকরণই তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; (ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ঐ ধর্ম্ম যত উপার্জ্জন করা হইবে, অন্তঃকরণ ততই নির্ম্মল হইয়া আসিবে; তখন সেই স্বচ্ছহৃদয়ে পরমব্রহ্মের শান্ত-স্নিগ্ধ-মধুর-জ্যোতিঃ প্রবেশ করিলে, সেই ভাগ্যবান্ মানব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। শারদ-কৌমুদী সকল সরোবরের উপরেই পতিত হয়, কিন্তু যে সরোবর শৈবালাচ্ছাদিত, তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। হৃদয়-সরসীর শৈবাল অজ্ঞানতা, তাহা বিদূরিত না হইলে, তাহাতে ব্রহ্ম-প্রকাশ প্রতিফলিত হয় না। ঐ অজ্ঞানতা বা আবিলতা দূরীকরণের একমাত্র উপায় ধর্ম্মজ্ঞান।

জ্ঞানেন হি যদা জন্তুরজ্ঞানপ্রভবং তমঃ।
ব্যপোহতি তদা ব্রহ্মপ্রকাশতে সনাতনং॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত আবিলতা বিদূরিত করে, সেই কালে সনাতন ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান। মানুষ যত ধর্ম্মার্জ্জন করিবে, ততই পাপাচরণ হইতে বিরত হইবে। পাপই হৃদয়ের আবিলতা; যখন মানুষ সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিরত হয়, তখন তাহার অন্তরে আর কিছুমাত্র আবিলতা থাকে না; সেই নিরাবিল হৃদয়ে অপাপবিদ্ধ শুদ্ধ-বুদ্ধ পরমদেবের পরম আনন্দময়—অমৃতময় জ্যোতিঃ উদিত হয়।

"যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম।)

যে কালে মানুষ ধর্ম্মজ্ঞানে ধীর হইয়া শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা এবং মনের দ্বারা সর্ব্বভূতে পাপাচরণ না করেন, সেই কালে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন। শারীরিক, মানসিক ও বাচনিক পাপের নির্দ্দেশ শাস্ত্রে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

অদত্ত বস্তুর—অর্থাৎ যাহা কেহই দান করে নাই, সেই দ্রব্য গ্রহণ, অবৈধা হিংসা ও পরদারাভিগমন, এই ত্রিবিধ শারীরিক পাপ।

"পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্ব্বিধং॥"

পারুষ্য—অর্থাৎ পরুষতা—যে কথা বলিলে অপরের ক্রোধ, সন্তাপ অথবা ভয় উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কথা বলা। মহর্ষি দেবল পরুষের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"যচ্চান্যৎ ক্রোধ-সন্তাপ-ত্রাস-সংজননং বচঃ।
পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং যচ্চান্যচ্চ তথাবিধং॥"

অনৃত—অর্থাৎ মিথ্যাকথা বলা, পৈশুন্য—অর্থাৎ কোন লোকের ধন-মানাদি হানির নিমিত্ত রাজা, প্রভু বা মিত্রাদি সকাশে তাহার দোষ কথন, এবং অসংবদ্ধ প্রলাপ, বাচনিক পাপ এই চতুর্ব্বিধ।

"পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনং।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসং॥"

অপহরণের নিমিত্ত পর-ধনের চিন্তা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট-চিন্তা ও মিথ্যা বস্তুতে মনোনিবেশ বা নাস্তিকতা, এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। এই দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। পূর্ব্বে যে দশবিধ ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই দশবিধ ধর্ম্মোপার্জ্জন ভিন্ন কি মানুষ দশবিধ পাপ হইতে বিরত হইতে পারে? ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিয়া, পাপ হইতে বিরত না হইয়া, অন্ধ-ভক্তিদ্বারা বা কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কি কখনও ভগবানকে লাভ করা যায়? ধৃতি, ক্ষমা, দম, শৌচ প্রভৃতি ধর্ম্মকে কেবল রসানাগ্রে রাখিয়া কৃত্রিম ভক্তিদ্বারা কে অন্তর্যামী ভগবানকে লাভ করিতে পারে? ভক্তি করা কর্ত্তব্য, চরমা-ভক্তির লক্ষণ সকল শিক্ষা কর, একথা বলিলে কেহ ভক্তি সাধন করিতে পারে না। ভক্তির বড় বড় কথা মুখস্থ করিলেই কেহ ভক্তি শিখিতে পারে না; ঈদৃশ প্রণালীতে যাহা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বালক প্রহ্লাদের নৈষ্ঠিকী ভগবদ্ভক্তি কিরূপে জন্মিয়াছিল? প্রহ্লাদ জ্ঞান লাভ করে নাই, ধর্ম্মশিক্ষা করে নাই, অধর্ম্মাচারী দৈত্যকুলে তাহার জন্ম, সে কিরূপে ভগবানকে লাভ করিয়াছিল? ইহার উত্তরে পূর্ব্বজন্মবাদীরা বলেন, প্রহ্লাদ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুল ধর্ম্মার্জ্জন করিয়াছিল, সেই ধর্ম্ম-বলে সে দৈত্য-জন্মে সচ্চিদানন্দের আনন্দময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল। যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে প্রহ্লাদের জন্ম অসম্ভব, প্রহ্লাদের উপাখ্যান তাঁহাদের নিকটে কপোল-কল্পিত। কেহ কেহ অজ্ঞের ন্যায় বলিয়া থাকেন, ভগবানের বিশেষ কৃপায় প্রহ্লাদ তাঁহাকে পাইয়াছিল; তিনি করুণা-ময়, তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে। তাঁহার করুণায় সকলই হইতে পারে, ইহা

ধ্রুব সত্য, কিন্তু উহার অর্থ এই, তাঁহার করুণা সকল মানবের উপরে সমান, কাহারও প্রতি কম-বেশী নাই; সকলকেই তিনি তাঁহার পবিত্র. ধর্ম্মে সমান অধিকারী করিয়াছেন। সেই মধুরতম ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়াছেন। সেই ধর্ম্ম আমরা যত উপার্জ্জন করিব, ততই তাঁহার স্বারূপ্য অনুভব করিয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে তাঁহার মঙ্গলময়ী বিলাস লীলার আধার মানবাত্মাকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মে নিরত রাখিবার জন্য নিয়ত কার্য্য করিব, ইহাই তাঁহার অপার করুণা; নতুবা ব্যক্তিবিশেষের উপরে তাঁহার বিশেষ করুণা বলিলে, সেই নিরঞ্জন চিরচিদানন্দময় জগৎপতিকে পক্ষপাতিতা দোষে দোষী করিতে হয়। আর কোন দীন বালককে করুণা না করিয়া কেবল প্রহ্লাদকে করুণা করিলেন, ইহাও কি কখন হয়? সুতরাং তাদৃশ কথা অশ্রদ্ধেয়। সত্য, শৌচ, ধৃতি, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মই আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত দশবিধ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে। পাপাচরণ করিয়া সমস্ত দিন ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ হয় না; প্রকৃত ভক্তের অভিনয় করিলে, তাঁহার ভক্ত হওয়া যায় না। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ ও পাপ হইতে বিরতিই ভক্তিসাধনের উপায়। ভগবানের প্রিয় পবিত্র ধর্ম্মাচরণদ্বারাই দিন দিন ভগবদ্ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দিন দিন নির্ম্মলান্তঃকরণে আনন্দময়ের বিমলানন্দ অনুভব করিয়া ভক্তিমান্ ভক্তবৎসলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন; পরিশেষে যখন পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সর্ব্বাপেক্ষা চিরস্থায়ী সম্বন্ধ অনুভব করেন, তখনই তাঁহার অপার-করুণা জানিতে পারেন। তখনই ভগবান সর্ব্বাপেক্ষা মধুময় রূপে প্রতীত হন, তখনই ভক্ত বলেন—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥"

তুমি মনোহরা! তুমি মনোহরতরা!! তুমি নিখিল সুন্দর অপেক্ষা অতি সুন্দরী; তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তুমিই পরমেশ্বরী।

"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥"

হে দেবদেব! তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব; ভগবদুদ্দেশে এই কথা যখন সাধকের অন্তর হইতে উত্থিত হয়, তখনই তিনি কৃতার্থ হন; তখনই তিনি যথার্থ ভক্ত হইয়া ভগবানের পরম কৃপা উপভোগ করেন; নতুবা কেবল মুখে ঐ কথা বলিলেই ভক্ত হওয়া যায় না।

হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! হে শরণাগত-পরিত্রাণ-পরায়ণ! আমরা যেন তোমার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়া পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তিমান্ হই, এবং তাঁহাদিগের আশী-

র্ব্বাদে তোমার কৃপা-কণা লাভ করিয়া তোমার মাধুরী অনুভব করিতে পারি, এবং তোমাতে সমগ্র চিত্ত সমর্পণ করিয়া যেন বলিতে পারি, হে পরম সুন্দর! পরমানন্দের মহাসাগর! পরম নির্ব্বাণ-দাতা! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন।

নীতিসারঃ। *

হিংসাস্তেয়ান্যথাকামপৈশুন্যং পরুষানৃতম্। সংভিন্নাপব্যাপাদমমিথ্যাদৃগ্‌বিপর্য্যয়ম্।
পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাবাঙ্‌মানসৈস্ত্যজেৎ॥ ১॥
ধর্ম্মকার্য্যং যতন্ শক্ত্যানোচেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ। প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র বৈ নাস্তি সংশয়ঃ॥ ২॥
মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ। তৎ প্রাপ্নোতি ফলং তস্তেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥ ৩॥
অবৃত্তি-ব্যাধি-শোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ। আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীট-পিপীলিকম্॥ ৪॥

হিংসা, চৌর্য্য, অবৈধরতি, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, বিভিন্ন আলাপদ্বারা মনোভঙ্গ. অদম-অর্থাৎ অবিনয়, নাস্তিকতা, বিপর্য্যয়—অর্থাৎ অবৈধ আচরণ, কায়, বাক্য ও মনদ্বারা এই দশবিধ পাপ হইয়া থাকে, উহাকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য॥ ১॥

যত্ন সহকারে ধর্ম্ম কার্য্য করিয়া মনুষ্য নিজ শক্তিদ্বারা যদি তাহা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলেও সেই ব্যক্তি সেই কার্য্যের পুণ্য-ফল এই লোকেই লাভ করিতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ২॥

মনে পাপ চিন্তা করিলে কর্ম্মদ্বারা তাহা কখনও ইচ্ছা করিবে না, এইরূপে পাপকর্ম্ম করিলে, সেই কর্ম্মের সেই ফল পায়, ইহা ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিয়াছেন॥ ৩॥

শক্তি অনুসারে বৃত্তি-রহিত ব্যক্তিকে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও শোকার্ত্তকে সাহায্য করিবে। কীট ও পিপীলিকাকেও সর্ব্বদা আত্মবৎ দর্শন করিবে॥ ৪॥

---

* মানভূমান্তর্গত ঝালদা-ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত উদ্ধবচন্দ্র সিংহ, আমাকে রাজাদিগের কর্ত্তব্যতাচরণ হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গত ভাদ্র মাসে বৃন্দাবন বাস কালীন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্যদাস প্রমুখ কয়েকটী বৈষ্ণবমহাত্মা মনুষ্যের নীতি বিষয়ক উপদেশ জ্ঞাত হইবার জন্য আমাকে আদেশ করেন। তাঁহাদের আদেশ পালনার্থে আমি প্রথমতঃ শুক্রনীতি হইতে সাধারণের জ্ঞাতব্য উপদেশ প্রকাশ করিতেছি। পরে কামন্দকী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।

উপকার-প্রধানঃ স্যাদপকারপরেঽপ্যরৌ। সম্পদ্বিপৎ স্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু॥ ৫॥
কালে হিতং মিতং ব্রূয়াদবিসংবাদি পেশলম্। পূর্ব্বাভিভাষী-সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ॥ ৬॥
নৈকঃ সুখীন সর্ব্বত্র বিশ্রব্ধো ন চ শঙ্কিতঃ॥ ৭॥
ন কঞ্চিদাত্মনঃশত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ॥ ৮॥
জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥ ৯॥
ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥ ১০॥
এণো গজঃ পতঙ্গশ্চ ভৃঙ্গো মীনস্তু পঞ্চমঃ। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধ-রসৈরেতে হতাঃ খলু॥ ১১॥
এবু স্পর্শো বরস্ত্রীণাং স্বান্তহারী মুনেরপি। অতোঽপ্রমত্তঃ সেবেত বিষয়াংস্তু যথোচিতান্॥ ১২॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাত্যন্তৈকান্তিকং বসেৎ। যথা সম্বন্ধমাহ্বয়াদাভাষ্যাশ্চাস্তু বৈ স্ত্রিয়ম্॥
স্বীয়াং তু পরকীয়াং চ সুভগে ভগিনীতি চ॥ ১৩॥
সহবাসোঽন্যপুরুষৈঃ প্রকাশমপি ভাষণম্। স্বাতন্ত্র্যং ন ক্ষণমপি হ্যাবাসোঽন্য গৃহে তথা॥ ১৪॥
ভর্ত্রা পিত্রাঽথবা রাজ্ঞা পুত্র-শ্বশুর-বান্ধবৈঃ। স্ত্রীণাং নৈব তু দেয়ঃ স্যাদ্ গৃহকৃত্যৈর্বিনাক্ষণঃ॥ ১৫॥

অপকারী শত্রুরও উপকার করিবে ও তাহার সম্পৎ ও বিপৎকালেও অবিচলিত-চিত্ত হইবে। কোন কারণ দেখিলে বিদ্বেষ করিবে; কিন্তু যাহাতে ফল-হানি হয়, এরূপ বিদ্বেষ করিবে না॥ ৫॥

পূর্ব্ব-আলাপকারী ব্যক্তি সহাস্যবদন, সুশীল এবং দয়াশীল হইয়া সময়ে মিত, সুসঙ্গত ও মধুর বাক্য কহিবে॥ ৬॥

একাকী সুখাসক্ত হইবে না, সর্ব্বজনকে বিশ্বাস করিবে না ও শঙ্কান্বিত হইবে না॥ ৭॥

কাহাকেও নিজের শত্রু বিবেচনা করিবে না ও আপনাকে কাহারও শত্রু বিবেচনা করিবে না; প্রভুর নিকট অপমান ও স্নেহশূন্যতা প্রকাশ করিবে না॥ ৮॥

পর-রঞ্জক ব্যক্তি মনুষ্যের অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া, যে ব্যক্তি যে প্রকারে সন্তুষ্ট হয়, তাহাকে সেইরূপে সন্তুষ্ট করিবে॥ ৯॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে পীড়া দিবে না, কিম্বা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রশ্রয় দিবে না; কারণ ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত প্রবল হইলে, মনকে বলপূর্ব্বক হরণ করে॥ ১০॥

হরিণ, গজ, পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মৎস্য,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও রস দ্বারা এই পঞ্চ নিশ্চয়ই হত হইয়া থাকে॥ ১১॥

এই সকল শব্দাদির মধ্যে উত্তমা স্ত্রীর স্পর্শ মুনিরও মনোহারী, তজ্জন্য সাবধান হইয়া যথোচিত বিষয় সেবা করিবে॥ ১২॥

মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার নিকট নির্জ্জনে বসিবে না। স্বসম্পর্কীয় ও অন্য স্ত্রীকে সম্বন্ধানুসারে "সুভগে" "ভগিনি" ইত্যাদি বলিয়া মিষ্ট বাক্যে সম্বোধন করিবে॥ ১৩॥

অন্য পুরুষের সহিত সহবাস, প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা, ক্ষণকাল জন্যও স্বাধীনতা ও পরগৃহে বাস, এই সকল স্ত্রীলোকের দূষনীয়॥ ১৪॥

চণ্ডং ষণ্ডং দণ্ডশীলমকামং সুপ্রবাসিনম্। সুদরিদ্রং রোগিণং চ ত্বন্যস্ত্রীনিয়তং সদা ॥ ১৬ ॥

পতিং দৃষ্ট্বা বিরক্তা স্যান্নারী বান্যং সমাশ্রয়েৎ। ত্যক্ত্বা তান্ দুর্গুণান্ যত্নাদতো রক্ষ্যাঃ স্ত্রিয়ো নরৈঃ ॥১৭॥

বস্ত্রান্ন-ভূষণ-প্রেম-মৃদুবাগ্‌ভিশ্চ শক্তিতঃ। স্বাত্যন্তসন্নিকর্ষেণ স্ত্রিয়ং পুত্রঞ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ১৮ ॥

চৈত্য-পূজ্য-ধ্বজাশস্তচ্ছায়া-ভস্ম-তুষাশুচীন্। নাক্রামেচ্ছর্করা-লোষ্টবলিস্নানভুবোঽপি চ ॥ ১৯ ॥

নদীং তরেন্ন বাহুভ্যাং নাগ্নিং ছন্নমভিব্রজেৎ। সন্দিগ্ধনাবং বৃক্ষঞ্চ নারোহেৎ দুষ্টযানকম্ ॥ ২০ ॥

নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্ বিলিখেদ্ ভুবম্। ন সংহতাভ্যাং পাণিভ্যাং কণ্ডূয়েদাত্মনঃ শিরঃ ॥ ২১ ॥

নাঙ্গৈশ্চেষ্টেতবিগুণং নাসীতোৎকটুকশ্চিরম্। দেহবাক্ চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্‌শ্রমাদ্‌বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ২২ ॥

নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্। তথা চত্বরচৈত্যং ন চতুষ্পথসুরালয়ান্ ॥ ২৩ ॥

শূন্যাটবী-শূন্যগৃহ-শ্মশানানি দিবাপি ন। সর্ব্বথেক্ষেত চাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ ॥ ২৪ ॥

নেক্ষেত সততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যা প্রিয়াণি চ ॥ ২৫ ॥

সন্ধ্যাস্বভ্যবহার-স্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়ন-চিন্তনম্। মদ্য-বিক্রয়-সন্ধান-দানাদানানি নাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

স্বামি, পিতা, রাজা, পুত্র, শ্বশুর ও বন্ধু-বান্ধব, ইহাঁরা গৃহ-কার্য্য ব্যতিরেকে স্ত্রীগণকে অল্প সময়ও দিবেন না ॥ ১৫ ॥

স্ত্রী, পতিকে উগ্র, ক্লীব, দণ্ডশীল, অনমুরক্ত, দীর্ঘপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী ও অন্যস্ত্রীরত দেখিয়া বিরক্ত হয়, অথবা অন্যকে আশ্রয় করে, তজ্জন্য এই সমুদায় দোষ ত্যাগ করিয়া পুরুষ স্ত্রীকে রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

অন্ন, বস্ত্র, ভূষণ, প্রেম, মৃদুবাক্যদ্বারা নিজের অত্যন্ত নিকটে রাখিয়া স্ত্রী ও পুত্রকে যথাশক্তি রক্ষা করিবে ॥ ১৮ ॥

চৈত্য বৃক্ষ, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজা, অশস্ত বস্তুর (অপ্রশস্ত বস্তুর) ছায়া, ভস্ম, তুষ, অশুচি, শর্করা, (বালি) লোষ্ট্র, পূজা-দ্রব্য ও স্নান-ভূমিকে অতিক্রম করিবে না ॥ ১৯ ॥

হস্তদ্বারা (সন্তরণে) নদী উত্তীর্ণ হইবে না, আচ্ছাদিতাগ্নির অভিমুখে যাইবে না, সন্দেহযুক্ত নৌকা কিম্বা বৃক্ষে আরোহণ করিবে না। (অর্থাৎ ভারবহনে শক্ত কি না, চিন্তা না করিয়া আরোহণ করিবে না) ও দুষ্ট অশ্বাদি বাহনে আরোহণ করিবে না ॥ ২০ ॥

নাসিকা কুঞ্চিত করিবে না, বিনা কারণে ভূমিতে লিখিবে না, ও দুই হস্তে আপনার মস্তক কণ্ডূয়ন করিবে না ॥ ২১ ॥

অঙ্গদ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা করিবে না, বহুকাল উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া থাকিবে না। ক্লান্ত হইবার পূর্ব্বে শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ ক্লান্ত না হইবে, ততক্ষণ শরীর, বাক্য ও মনের ক্রিয়াকরিবে ॥ ২২ ॥

বহুকাল জানু ঊর্দ্ধ করিয়া থাকিবে না, রাত্রে বৃক্ষতলে থাকিবে না, প্রাঙ্গনস্থিত বৃক্ষ ও চতুষ্পথস্থিত দেবালয় আশ্রয় করিবে না ॥ ২৩ ॥

দিবাভাগেও শূন্য বন, শূন্য গৃহ, শ্মশান ও সম্যক্‌প্রকারে সূর্য্য দর্শন করিবে না, ও মস্তকে ভার বহন করিবে না ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বদা সূক্ষ্ম পদার্থ, দীপ্তিমান্ পদার্থ ও অপবিত্র পদার্থ দৃষ্টি করিবে না ॥ ২৫ ॥

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ। অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকার্থে পরীক্ষকঃ॥ ২৭॥
রাজ-দেশ-কুল-জাতি-সদ্ধর্ম্মান্ নৈব দূষয়েৎ। শক্তোঽপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥ ২৮॥
অযুক্তং যৎ কৃতং চোক্তং ন বলাদ্ধেতুনোদ্ধরেৎ॥ ২৯॥
দুগুর্ণস্য চ বক্তারঃ প্রত্যক্ষং বিরলাজনাঃ। লোকতঃ শাস্ত্রতো জ্ঞাত্বা হ্যতস্ত্যজ্যাংস্ত্যজেৎ সুধীঃ।
অনয়ং নয়সঙ্কাশং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥ ৩০॥
অয়ং সহস্রাপরাধী কিমেকেন ভবেন্মম। মত্বা নাঘং স্মরেদীষদ্বিন্দুনা পূর্য্যতে ঘটঃ॥ ৩১॥
নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি। দুঃখভাঙ্ন ভবেদেবং নিত্যং সন্নিহিত স্মৃতিঃ॥ ৩২॥
সমাসব্যূহ হেত্বাদি কৃতেচ্ছার্থং বিহায় চ। স্তুত্যর্থবাদান্ সন্ত্যজ্য সারং সংগৃহ্য যত্নতঃ॥ ৩৩॥
ধর্ম্মতত্ত্বং হি গহনমতঃ সৎ সেবিতং নরঃ। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥ ৩৪॥
নোপেক্ষেত স্ত্রিয়ং বালং রোগং দাসং পশুং ধনম্। বিদ্যাভ্যাসং ক্ষণমপি সৎসেবাং বুদ্ধিমান্ নরঃ॥৩৫॥
বিরুদ্ধো যত্র নৃপতির্ধনিকঃ শ্রোত্রিয়ো ভিষক্। আচারশ্চ তথা দেশো ন তত্র দিবসং বসেৎ॥ ৩৬॥

সন্ধ্যাকালে অভ্যবহার (আহার) স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা, অধ্যয়ন, বিষয়-চিন্তা, সুরাপান, বিক্রয়, সন্ধান, দান, আদান ও গ্রহণ করিবে না॥ ২৬॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সকল কার্য্যে সমাজীয় ব্যক্তিই গুরু, তজ্জন্য বিবেচক ব্যক্তি সামাজিক বিষয়ে সমাজস্থ ব্যক্তিকেই অনুসরণ করিবে॥ ২৭॥

রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও সাধুর ধর্ম্মকে দোষ দিবে না। সমর্থ হইলে, মনেও লৌকিকাচারকে লঙ্ঘন করিবে না॥ ২৮॥

যাহা অযুক্তরূপে কৃত ও উক্ত হয়, বল ও হেতুদ্বারা তাহার অপলাপ করিবে না॥ ২৯॥

সমক্ষে দুর্গুণের বক্তা বিরল, তজ্জন্য লোক-ব্যবহার ও শাস্ত্র-ব্যবহার জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ত্যাগযোগ্য বিষয়কে ত্যাগ করিবে; দুর্নীতিকে নীতি তুল্য মনেও চিন্তা করিবে না॥ ৩০॥

এই ব্যক্তি সহস্রাপরাধী, আমার এক অপরাধে কি হইবে? ইহা মনে করিয়া অল্প পাপও করিবে না, কারণ বিন্দু বিন্দু বারি পতনে ঘট পূর্ণ হইয়া থাকে॥ ৩১॥

এক্ষণ কিরূপ কার্য্য আচরণ করিয়া আমার দিবারাত্রি গত হইতেছে, এইরূপ আলোচনা করিলে, মনুষ্য দুঃখভাগী হয় না॥ ৩২॥

জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রমাণ দ্বারা, তর্ক দ্বারা ও হেতুদ্বারা কৃত ইচ্ছার্থকে ত্যাগ করিয়া—অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি আদি প্রমাণদ্বারা নিজের অভিমত-পুষ্টি-করণেচ্ছা ত্যাগ করিয়া ও স্তুতিবাদ ত্যাগ করিয়া, যত্নপূর্ব্বক সার গ্রহণ করিয়া, সাধু সেবিত কর্ম্ম আচরণ করিবে; কারণ ধর্ম্মতত্ত্ব গহন॥ ৩৩—৩৪॥

স্ত্রীলোক, বালক, রোগ, দাস, পশু, ধন, বিদ্যাভ্যাস ও সৎসেবাকে ক্ষণকালের জন্যও জ্ঞানী লোক উপেক্ষা করিবেন না॥ ৩৫॥

যে দেশে রাজা, ধনী, শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ) বৈদ্য, আচার ও দেশ বিরুদ্ধ, সে স্থানে এক দিবসও বাস করিবে না॥ ৩৬॥

অবিবেকী যত্র রাজা সভ্যা যত্র তু পাক্ষিকাঃ। সন্মার্গোজ্‌ঝিতবিদ্বাংসঃ সাক্ষিনোঽনৃতবাদিনঃ ॥ ৩৭ ॥
দুরাত্মনাঞ্চ প্রাবল্যং স্ত্রীণাং নীচজনস্য চ। তত্র নেচ্ছেদ্‌ধনং মানং বসতিঞ্চাপি জীবিতম্ ॥ ৩৮ ॥
মাতা ন পালযেদ্ বাল্যে পিতা সাধু ন শিক্ষযেৎ। রাজা যদি হরেদ্বিত্তং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৩৯ ॥
সুসেবিতাঃ প্রকুপ্যন্তি মিত্র-স্বজন-পার্থিবাঃ। গৃহমগ্ন্যশনিহতং কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪০ ॥
আপ্তবাক্যমনাদৃত্য দর্পেণাচরিতং যদি। ফলিতং বিপরীতং তৎ কা তত্র পরিদেবনা ? ॥ ৪১ ॥
সাবধানমনা নিত্যং রাজানং দেবতাং গুরুং। অগ্নিং তপস্বিনং ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধং সুসেবয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মাতৃ-পিতৃ-গুরু-স্বামি-ভ্রাতৃ-পুত্র-সখিষ্বপি। ন বিরুধ্যেন্নাপকুর্য্যান্মনসাপি ক্ষণং ক্বচিৎ ॥ ৪৩ ॥
স্বজনৈর্ন বিরুদ্ধ্যেত ন স্পর্দ্ধেত বলীযসা। ন কুর্য্যাৎ স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ-মূর্খেষু চ বিবাদনম্ ॥ ৪৪ ॥
একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ। একোন গচ্ছেদধ্বানং নৈকঃ সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ ॥ ৪৫ ॥
নান্যধর্ম্মং হি সেবেত ন দ্রুহ্যাদ্ বৈ কদাচন। হীনকর্ম্ম-গুণৈঃ স্ত্রীভির্নাসীতৈকাসনে ক্বচিৎ ॥ ৪৬ ॥
ষড়্‌দোষা পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা। নিদ্রা-তন্দ্রা-ভয়ং-ক্রোধ-আলস্যং-দীর্ঘসূত্রতা।
প্রভবান্ত বিনা তায় কার্য্যস্যোতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

যে স্থানে রাজা মূর্খ, সভ্যগণ পক্ষপাতী, জ্ঞানীলোক সদাচারভ্রষ্ট, সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী, দুষ্টজনের, স্ত্রীলোকের ও নীচজনের প্রাবল্য, সে স্থানে ধন, মান, বাস ও জীবন ইচ্ছা করিবে না ॥ ৩৭—৩৮ ॥

যদি মাতা বাল্যকালে না পালন করেন, পিতা সৎশিক্ষা না দেন, রাজা যদি ধন হরণ করেন, তাহা হইলে বৃথা দুঃখ কেন ? ॥ ৩৯ ॥

যে স্থানে মিত্র, স্বজন, রাজা উত্তমরূপে সেবিত হইলেও কোপ প্রকাশ করেন, গৃহ অগ্নি ও বজ্র দ্বারা দগ্ধ হয়, সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪০ ॥

যদি আত্মীয়লোকের বাক্য অনাদর করিয়া, গর্ব্বে তাঁহাদের বাক্য না শুনিয়া বিপরীত ফল হয় ; সে স্থানে দুঃখ কেন ? ॥ ৪১ ॥

সাবধান হইয়া প্রতিদিন রাজা, দেবতা, গুরু, অগ্নি, তপস্বী, ধর্ম্ম ও জ্ঞানে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে (কেবল বয়সে বৃদ্ধ নহে) সেবা করিবে ॥ ৪২ ॥

মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখাতে কখনও ক্ষণকালের জন্য বিরুদ্ধাচরণ করিবে না ও তাঁহাদের অপকার করিবে না ॥ ৪৩ ॥

বন্ধুর সহিত বিরোধ করিবে না, বলবান্ ব্যক্তির সহিত স্পর্দ্ধা করিবে না, এবং স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও মূর্খের সহিত বিবাদ করিবে না ॥ ৪৪ ॥

একা সুস্বাদু দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না, একা কার্য্য চিন্তা করিবে না, একা পথে হাঁটিবে না, নিদ্রিত ব্যক্তি সকলের মধ্যে একা জাগিবে না ॥ ৪৫ ॥

অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে না, কাহারও সহিত দ্রোহ আচরণ করিবে না, কোন স্থানে দুর্জ্জন ব্যক্তির ও স্ত্রীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না ॥ ৪৬ ॥

ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তির এই সংসারে নিদ্রা, তন্দ্রা (অনুৎসাহ) ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্

উপায়জ্ঞশ্চ যোগজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ প্রতিভানবান্। স্বধর্ম্মনিরতে নিত্যং পরস্ত্রীষু পরাঙ্মুখঃ।
বক্তোহবাংশ্চিত্রকথঃ স্যাদকুণ্ঠিতবাক্ সদা ॥ ৪৮ ॥
চিরং সংশৃণুয়ান্নিত্যং জানীয়াৎ ক্ষিপ্রমেব চ। বিজ্ঞায় প্রভজেদর্থান্ ন কামং প্রভজেৎ কচিৎ ॥ ৪৯ ॥
ক্রয়বিক্রয়াতিলিপ্সাং স্বদৈন্যং দর্শয়েন্ন হি। কাব্যং বিনান্যগেহেন ন জ্ঞাতঃ প্রবিশেদপি ॥ ৫০ ॥

সূত্রতা, এই ষড়্‌বিধ দোষ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, কারণ এই সকল দোষই কার্য্যে ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বদা উপায়জ্ঞ, যোগজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, প্রতিভান্বিত, নিত্য স্বধর্ম্মনিরত, পরস্ত্রী-পরাঙ্মুখ, বাক্‌পটু, উহবান্ (তর্কনিপুণ), সর্ব্বদা মধুরভাষী ও অকুণ্ঠবাক্ হইবে ॥ ৪৮ ॥

অভিনিবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ সর্ব্বদা অর্থের বিষয় শ্রবণ করিবে, শীঘ্র জানিবে, জানিয়া বিশেষরূপে সেবা করিবে, কিন্তু কখনও কামবশ হইবে না ॥ ৪৯ ॥

ক্রয় ও বিক্রয়ে অত্যন্ত লিপ্সা রাখিবে না, নিজের দৈন্য প্রদর্শন করিবে না, কার্য্য ব্যতিরেক কিম্বা অজ্ঞাতরূপে অন্যের গৃহে প্রবেশ করিবে না ॥ ৫০ ॥ (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬

অগ্নির্যত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্যত্রাধিরুধ্যতে।
সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥

অন্বয়ঃ। যত্র অগ্নিঃ অভিমথ্যতে, যত্র বায়ু অধিরুধ্যতে, যত্র সোমঃ অতিরিচ্যতে, তত্র মনঃ সঞ্জায়তে।

বিষমপদব্যাখ্যা। অভিমথ্যতে—অরণিদ্বয়-সংঘর্ষণেন সমুৎপদ্যতে যদ্বা ভরণ-মথনতৎসাধনাদৌ উৎপাদয়িতুম্ সম্পীড্যতে, অরণিদ্বয়ঘর্ষণদ্বারা সমুৎপাদিত হয়, অথবা—ভরণমথন প্রভৃতি কার্য্যসাধনোদ্দেশে ঘর্ষিত হয়। অধিরুধ্যতে—অগ্নি-সন্ধুক্ষণার্থং কুণ্ডে নিরুদ্ধো ভবতি, এবঞ্চ প্রাণায়ামাদীনামনুষ্ঠানাৎ দেহাভ্যন্তরে সংরোধিতো ভবতি; অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে আবদ্ধ হয়, অথবা—প্রাণায়ামাদির অনু-
[illegible] সোমঃ অতিরিচ্যতে—সোমঃ [চন্দ্রঃ] [illegible]

[নিরতিশয়মনুকূলো ভূত্বা—কর্ম্মণঃ পরিপূর্ণত্বং বিদধাতি,] যত্র সোমঃ—[সোমরসঃ] অতিরিচ্যতে—[অধিকো ভবতি, যত্র যজ্ঞাঙ্গীভূতস্য সোমরসস্য বাহুল্যমস্তি, ইতি ভাবঃ ;] যেখানে সোম—অর্থাৎ চন্দ্রদেব স্বয়ংই সাধকের অনুকূল হইয়া সাধ্য কর্ম্মের পূর্ণতাবিধান করেন অথবা যেখানে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ সোমরসের অভাব নাই। তত্র—তস্মিন্ ক্রতৌ, সেই সমস্ত যজ্ঞাদিতে। মনঃ—প্রবৃত্তিঃ—প্রবৃত্তি। সঞ্জায়তে—সম্যক্‌প্রকারেণ আসক্তো ভবতি, সম্যক্‌প্রকারে জন্মিয়া থাকে।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বশ্লোকসমূহে সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্মের প্রার্থনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাঁহারা পুনরায় প্রার্থনা করিয়া কামনা-পরবশচিত্তে ভোগের নিমিত্ত যোগে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা সেই সেই ভোগের অধিকারী হইয়া থাকেন, সুতরাং সে স্থলে অরণিদ্বয় ঘর্ষণে অনল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যে যজ্ঞে অনল কর্তৃক মথন-ভরণাদি ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে, যে যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য যজ্ঞকুণ্ডে ও রেচকাদি ক্রিয়া দ্বারা দেহ মধ্যে বায়ু সংরুদ্ধ করা হয়, যে যজ্ঞে চন্দ্র স্বয়ং যজ্ঞের পূর্ণত্ব বিধান করেন, অথবা যে যজ্ঞে সোমরসের অভাব নাই, তাদৃশ সর্ব্বোপকরণ সম্বলিত অগ্নিষ্টোমাদি বেদবিহিত স্বর্গ-সাধক যজ্ঞাদি কর্ম্মে, জ্ঞানযোগের অনধিকারী ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৎপর ক্রমশঃ কর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ জ্ঞান-তরণীর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সাধক দুস্তর কর্ম্ম-সাগর উত্তরণ-পূর্ব্বক বিমল অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে নিমগ্ন হয়েন, তাঁহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। জ্ঞানযোগ-বিমূঢ় ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠানই জ্ঞান-সন্দর্শনের প্রশস্ততম উপায়।

এই শ্লোকের অপরবিধ ব্যাখ্যা যথা—"অগ্নিঃ" পরমাত্মা (অবিদ্যা তৎকার্য্যস্য দাহকত্বাৎ পরমাত্মনঃ অগ্নিত্বং উপলক্ষিতং উক্তঞ্চ গীতায়াং—অহমজ্ঞানজং তমঃ। নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা, ইতি) "যত্র" যস্মিন্ পুরুষে "অভিমথ্যতে" ধ্যান-নির্ম্মথনাদিভিঃ সংদৃশ্যতে (উক্তঞ্চ প্রাক্—স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ, ইতি।) "বায়ুঃ অধিরুধ্যতে"—প্রাণায়ামাদিভিঃ দেহমধ্যে অব্যক্তং শব্দং করোতি। "সোমঃ অতিরিচ্যতে"—অনেক জন্ম সেবয়া অতিরিক্তো ভবতি, "তত্র" তস্মিন্ যজ্ঞ-দান-তপ, প্রাণায়াম-সমাধি-বিশুদ্ধান্তঃকরণে সঞ্জাতে সতি তত্র চেতসি পূর্ণানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারং সমুৎপদ্যতে। প্রাণায়ামবশাদেব চিত্তশুদ্ধিঃ ভবতি ; চিত্তে পরিশুদ্ধিং গতে তত্র ব্রহ্মাভিব্যক্তির্জায়তে, উক্তঞ্চ প্রাণায়াম-বিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশ্যতি তৎপরম্। তস্মান্নাতঃপরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ।

৭

সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ব্বমক্ষিপৎ ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সবিত্রা প্রসবেন পূর্ব্ব্যম্ ব্রহ্মজুষেত। তত্র যোনিং কৃণ্বসে। (এবং কুর্ব্বতঃ) তে পূর্ব্বং ন হি অক্ষিপৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সবিত্রা—সবিতুঃ (অত্র কর্ত্তরি ন ষষ্ঠী, কারকবিধেঃ ক্বচিদনিত্যত্বাৎ) সূর্য্যের। প্রসবেন—প্রসাদে। পূর্ব্ব্যম্—পূর্ব্বতনং—পূর্ব্বতন—অর্থাৎ সনাতন। ব্রহ্ম—ব্রহ্ম—জুষেত—সেবেত—সেবা কর। তত্র—ব্রহ্মণি সেই ব্রহ্মে। যোনিং—আশ্রয়ং সমাধিলক্ষণমিতি যাবৎ, সমাধিরূপ আশ্রয়। কৃণ্বসে—কুরুষ—কর। (এইরূপ করিলে পরে) তে—তব, তোমার। পূর্ব্বম্—পূর্ব্বাচরিতং কর্ম্ম—পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম। নহি অক্ষিপৎ—ন কদাপি তব চিত্ত-বিক্ষেপং করিষ্যতি—তোমার চিত্ত বিক্ষেপ করিবে না।

বঙ্গার্থ। হে সাধক! পূর্ব্বানুশাসনসমূহে যে সূর্য্যাত্মক ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে সূর্য্যদেবের প্রসাদে সনাতন ব্রহ্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তদীয় অভিধ্যানাদিতে মনঃসংযোগ কর। এতাদৃশ আবরণে তোমার পূর্ব্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া-কলাপ তোমার চিত্তে অশান্তির উদ্রেক করিতে পারিবে না। উক্তবিধ ক্রিয়াদ্বারা স্মৃতি-বর্ণিত বা শ্রুতিবিহিত ক্রিয়ায় বন্ধন হইবে না। সূর্য্যাত্মক তেজোময় ব্রহ্ম চিন্তনে তোমার জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তোমার যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড বিদগ্ধ করিবে।

৮

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥

অন্বয়ঃ। বিদ্বান্ ত্রিরুন্নতং শরীরং সমং স্থাপ্য ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্য ব্রহ্মোড়ুপেন সর্ব্বাণি ভয়াবহানি স্রোতাংসি প্রতরেত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ত্রিরুন্নতং—ত্রীণি—[উরো গ্রীব শিরাংসি] উন্নতানি দেহস্য সরলভাবেন সংস্থাপনাৎ সম্যগুন্নতাসি যস্মিন্ তং, সরলভাবে সংস্থাপন নিবন্ধন উরস্, গ্রীব এবং শির উন্নত যাহার। ব্রহ্মোড়ুপেন—ব্রহ্মাঃ [ব্রহ্মপ্রাপ্তেরিতিজ্ঞেয়ং] ব্রহ্মার। উড়ুপেন—উপায়ভূতেন প্রণবরূপেণ ভেলকেন—ব্রহ্মপ্রাপ্তির মুখ্যহেতু প্রণবরূপ ভেলক দ্বারা।

বঙ্গার্থ। বিদ্বানগণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মবৃন্দ উরঃস্থল, গ্রীবা, এবং মস্তক, এই উন্নত স্থানত্রয় সমভাবে স্থাপিত করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় নিচয় হৃদয় মধ্যে সম্যক্‌প্রকারে নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে এই ভয়াবহ সংসার-সরিৎ উত্তীর্ণ হয়েন।

৯

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥

অন্বয়ঃ। ইহ (সাধকঃ) প্রাণান্ প্রপীড্য সংযুক্ত চেষ্টঃ (সন্) প্রাণে ক্ষীণে সতি নাসিকয়া উচ্ছ্বসীত। বিদ্বান্ অপ্রমত্তঃ (সন্) দুষ্টাশ্বযুক্তম্ বাহম্ ইব এনং (এনৎ) মনঃ ধারয়েত।

বিষমপদব্যাখ্যা। ইহ—অত্র বিষয়ে, এই বিষয়ে। প্রাণান্—প্রাণবায়ূন্—প্রাণবায়ু। প্রপীড্য—সংযম্য, সংযত করিয়া। সংযুক্তচেষ্টঃ—সংযুক্তা [সংযতা] চেষ্টা [অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্পন্দনাদি-ক্রিয়া যস্য, সঃ] সমস্ত কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া। প্রাণে—প্রাণবায়ৌ বা মনসি প্রাণবায়ু বা মন। ক্ষীণে—শক্তিহীনতয়া তনুত্বং গতে সতি, শক্তিহীনতা নিবন্ধন তনুত্বপ্রাপ্ত হইলে পর। নাসিকয়া—নাসাপুটাভ্যাং—নাসাপুটদ্বারা। উচ্ছ্বসীত—শ্বাস-প্রশ্বাসং কুর্য্যাৎ—শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। অপ্রমত্তঃ—প্রণিহিতাত্মা সন্, প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া। দুষ্টাশ্বযুক্তম্—উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত। বাহম্ ইব, রথের ন্যায়। এনং (এনৎ) এই চঞ্চল মনকে। ধারয়েত—ধারণ করিবে।

বঙ্গার্থ। অতঃপর মনঃ স্থিরতার প্রধান উপায় এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট নিদান প্রাণায়াম-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

সাধক এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াকালে প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ করতঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পরিস্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সকল সংযত করিয়া, অর্থাৎ যাবতীয় কায়িক ব্যাপার নিবৃত্ত করিয়া, মন শক্তিশূন্য হইলে পর, নাসাপুটদ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া করিবেন। মুখদ্বারা কদাপিও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবৃত্তি বিধেয় নহে। সারথি যেমন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল অশ্বযুক্ত রথ-রশ্মিধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিও নিরতিশয় স্থিরচিত্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রণিধান সহকারে এই চঞ্চল মনকে ধারণ করিবেন। মনের উপর আধিপত্য করিতে পারিলেই দুর্গম সাধন-মার্গ অতি সুগম হয়। মনই তাবৎ ব্যাপারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির হেতু। যিনি মনোরাজ্যের রাজা, তাঁহার পক্ষে কৈবল্য-রত্ন তত দুষ্প্রাপ্য নহে।

১০

সমে শুচৌ শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ।
মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ ॥

অন্বয়ঃ। (সাধকঃ) সমে, শুচৌ, শর্কর-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (রহিতে) যদ্বা (করণৈঃ) মনোঽনুকূলে, ন তু চক্ষুঃ পীড়নে, গুহানিবাতাশ্রয়ণে (স্থানে) প্রয়োজয়েৎ (পরমাত্মনি চিত্তমিতি শেষঃ)।

বিষমপদব্যাখ্যা। সমে—সমতল। শুচৌ—পবিত্র। শর্করা-বহ্নি-বালুকা-বিবর্জ্জিতে—শর্করা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, বহ্নি—অনল, বালুকা—প্রস্তরচূর্ণ;—এই সমুদয় রহিত। শব্দ-জলাশ্রয়াদিভিঃ—শব্দ—কলহাদি ধ্বনি, জল—সর্ব্ব প্রাণীর উপভোগ্য পদার্থ। আশ্রয়—জনপদাদি; এই সমুদয় বর্জ্জিত। অথবা প্রকৃতির প্রিয় পুতুল বিহঙ্গমাদির সুমধুর কলশব্দ, প্রস্রবণাদি কিম্বা প্রসন্নসলিলা তটিনী এবং সুস্নিগ্ধ লতা-মণ্ডপাদি আশ্রয় দ্বারা। মনোঽনুকূলে—মনসঃ অনুকূলে—চিত্তবিনোদনে ইত্যর্থঃ; মনের পরিতৃপ্তিসাধক—অর্থাৎ নৈসর্গিক [illegible] ন তু চক্ষুপীড়নে—([illegible])

চক্ষুর পীড়াজনক নয়—অর্থাৎ মনোজ্ঞ দর্শন। গুহা-নিবাতাশ্রয়ণে—গুহা—কন্দরাদি নির্জ্জনস্থলী, নিবাত—বায়ু প্রবাহ-বর্জ্জিত—অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্যজনক বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য, আশ্রয়ণে—আশ্রয়ে স্থানে, প্রযোজয়েৎ—পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবে, অর্থাৎ ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইবে।

বঙ্গার্থ। সমতল, সুপবিত্র এবং প্রস্তরখণ্ড, অগ্নি ও প্রস্তর-চূর্ণাদি বালুকা বিরহিত, প্রকৃতির প্রিয় সন্ততি বিহঙ্গমাদির কলরব, প্রসন্নতোয়া তটিনী বা স্নেহস্রাবী প্রস্রবণ এবং পর্ণবিরচিত আশ্রয় অথবা নৈসর্গিক লতাকুঞ্জ প্রভৃতিদ্বারা চিত্ত-বিনোদন, মনোজ্ঞ দর্শন এবং গিরিকন্দর বা চিত্তবিক্ষেপকর সমীরণ-সম্পাতশূন্য স্থানে, সাধক পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিবেন; অর্থাৎ প্রাগুক্ত প্রাকৃতিক সুরম্য স্থলে প্রণিহিত-চিত্ত হইয়া, সিদ্ধিকাম মনীষী অনন্যমনে ব্রহ্ম-চিন্তনে নিরত হইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে বৈগুণ্যমাপতেৎ।
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ মৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ। সৎ ছিল, ইহা ভেদার্থ হইলে, বৈগুণ্য-দোষ এবং অভেদার্থ হইলে, পুনরুক্তি-দোষ হয় ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। 'সৎ' শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা, 'ছিলেন' এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা, এস্থানে যদি সৎ ও ছিলেন, এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তাহা হইলেই দ্বিগুণ অর্থ হয়। অর্থাৎ বাক্যের অর্থ-সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে; আর যদি দুই শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্যমানতা অর্থ কর, তাহা হইলে পুনরুক্তি-দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও সৎ-মাত্র ছিলেন, এই বাক্যের অর্থও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩১ ॥

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রুতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্ ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ। কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি বহুবিধ পুনরুক্তি-দোষে দূষিত প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। উপরোক্ত সৎ আসীৎ—অর্থাৎ সৎ ছিলেন, এই বেদান্ত-বাক্য দূষিত হইতে পারে না; যেহেতু কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে ইত্যাদি প্রয়োগ লৌকিক ব্যবহারে প্রায়ই দেখা যায়। আচার্য্যগণ এইরূপে শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ মাত্র ছিলেন বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৩২॥

কালাভাবে পুরেত্যুক্তি কাল-বাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৩॥

বঙ্গার্থ। কালের অভাব হেতু পূর্ব্বকাল-প্রয়োগ হইতে পারে না, তবে কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে (পর-ব্রহ্মের) দ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য। বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ-শূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন; এক্ষণে "পূর্ব্বে" এই বাক্যটীর ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে "পূর্ব্বকাল" ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বকালও ছিল না। এইক্ষণ "পূর্ব্বকাল" ব্রহ্মযোগ—অর্থাৎ "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহউক, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্ত মতে অদ্বিতীয়ত্ব বিষয়ে কালের অভাব হইলেও কাল-ব্যবহারবাদী শিষ্যদিগের প্রতি কাল-ব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী করিলে, ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না॥ ৩৩॥

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈত-ভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৪॥

বঙ্গার্থ। অদ্যং—অর্থাৎ কাল সম্বন্ধে প্রশ্ন বা তাহার উত্তর দ্বৈতবাদীদিগের নিকট প্রযোজ্য; অদ্বৈতবাদীর পক্ষে প্রশ্ন বা উত্তর সম্ভবে না॥ ৩৪॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদান্ত-মতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই, যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জগৎ-সৃষ্টির "পূর্ব্বে" একমাত্র সৎ-স্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন; 'পূর্ব্বে' এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে, এবং পূর্ব্ব শ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও সম্ভব হয়। আর পরম ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে, ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত, কিছুই হইতে পারে না॥ ৩৪॥

অতস্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ। যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে, নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, তেজস্বরূপ বা তমোময় নহে, এবম্ভূত অবর্ণনীয় বাক্যাতীত সৎমাত্র অবশিষ্ট ছিলেন ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য। বাস্তবিক জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, এই বাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই চরাচর-জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা একরূপ বিশিষ্ট একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ-পরিজ্ঞান সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা বর্ণন করিতে বা মনে ধারণ করিতে পারে না। তাঁহার গভীর প্রকৃতি দুরধিগম্য ॥ ৩৫ ॥

নন্বু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বন্ত নাশতঃ।
কথন্তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ। নিশ্চয়ই (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ভূম্যাদি ছিল না, যেহেতু পরমাণু বিনাশশীল, অতএব আকাশও যে ছিল না, ইহা তুমি বুদ্ধিতে কি প্রকারে ধারণা করিবে ?

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে, যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বকালে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাহইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপত্তিশীল, এবং উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই বিনাশশীল; সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু, তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণা করিতে পার ? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহা-হইলে তোমার অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না; সুতরাং কোন একটী পদার্থের বর্ত্তমানতাতেও অদ্বৈততত্ত্ব সিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশম্ কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ। যদি তুমি জগৎ-শূন্য আকাশ বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পার, তাহা হইলে সেই প্রকার আকাশ-শূন্য সৎ (ব্রহ্ম) কেন বুদ্ধিতে ধারণা করিতে পারিবে না ? ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই মীমাংসা হইতে পারে; তোমরা যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি শূন্য মাত্র থাকে, ইহাই তোমার মতে স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার ? সেই আকাশও সৃষ্ট পদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে

মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে—আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎ মাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন, ইহা আমার বুদ্ধিতে ধারণ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এক্ষণে আমার অদ্বৈত-মতই সিদ্ধান্ত-পক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছ॥ ৩৭॥

নির্জ্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশ-তমসী-বিনা।
ক্বদৃষ্টং কিঞ্চতে পক্ষ ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥ ৩৮॥

বঙ্গার্থ। যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত আকাশ কে দেখিয়াছে? অতএব নিশ্চয়ই আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থ নহে॥ ৩৮॥

তাৎপর্য্য। যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি; যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অনুপপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুমানের হেতু অন্বেষণ করিয়া থাকে? যাহা হউক, এক্ষণে বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও? তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও, এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা আলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না, সেই আলোক বা অন্ধকারও জগৎ, তাহারাও—অর্থাৎ আলোক এবং অন্ধকারও জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে; কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে; সুতরাং জগৎ-শূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ, আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না॥ ৩৮॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

হিন্দু-সন্তান বেদত্রয়-অধ্যয়ন-বিরত হইয়া বৈদিক অগ্নি, বায়ু, মরুৎ, সূর্য্য, সবিতৃ, অর্য্যমা, রুদ্র, আদিত্য, ইন্দ্র, বরুণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, ঋতু, মিত্র, অশ্বিদ্বয়, উশনা, উষা, পূষা, অরুণ, পূষণ, সোম, বৃহস্পতি, বিশ্বদেব, ষড়্ঋতু, রতি, পিতৃ, দ্যু, পৃথ্বী দেবতাতে "একমেবা-দ্বিতীয়ং" পরমব্রহ্ম পরম পুরুষকে হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছেন, এবং সেই সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ ত্রিগুণাত্মক পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ উপনিষৎ ও অথর্ব্ববেদ পাঠে পরাঙ্মুখ হইয়া শক্তিদেবীর রূপ-কল্পনায় বিমুখ হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ দর্শনশাস্ত্র পাঠে জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব,

ধারণার অনুপযুক্ত হইয়াছেন। হিন্দু-সন্তানগণ পুরাণ ও তন্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণে অশক্ত হইয়া পৌত্তলিকতার মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-সন্তানগণ দেবহীন হইয়া ঘোর দুর্ব্বিপাকে পতিত। যদি ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইবার কামনা থাকে, তবে দীক্ষা গ্রহণ কর, গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন পাইবে; আবার মৃত হিন্দুর জাতীয় দেহে জীবন সঞ্চার হইবে।

মাঘী অমানিশাতে গিরি-শৃঙ্গে বা উন্নত প্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া একবার মনঃসংযমপূর্ব্বক পার্থিব ব্যাপার ভুলিয়া যাও, আকাশে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, নীল, পীত, লোহিত, শ্বেত ও হরিদ্বর্ণ অগণ্য তারা-নিচয়ে খগোল খচিত রহিয়াছে। নক্ষত্রমালা আকাশের নীলিমা সমুজ্জ্বল করিয়াছে। খগোলে শত সহস্র কহিনুর ঝাঁকে ঝাঁকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া অন্ধার তম হরণ করিতে করিতে বেধ-বলয় পর্য্যন্ত উঠিয়া ক্রমে পশ্চিমে অস্তমিত হইতেছে। নক্ষত্র-পুঞ্জের উদয় ও অস্ত-গমনের স্রোত অবিশ্রান্ত চলিতেছে। বিমানের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে ঐহিক চিন্তা দূরীভূত হইলে, চক্ষু নিমীলিত কর, এবং প্রকৃতির আদি-কারণে ক্ষণকালের জন্য আত্মসমর্পণ কর। পরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, গ্রহ-উপগ্রহ-ধূমকেতু-তারা নক্ষত্রগণ সকলেই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অবিরত ধাবমান, কেবল উত্তরাকাশে পীতবর্ণ একটী সামান্য তারক অটল অচল স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছে। ঐ তারকের নাম 'ধ্রুব'। এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটী তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম 'পরধ্রুব'। ঐ ধ্রুবের কিছু উত্তরে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর-মেরুদেশ, এবং ঐ পরধ্রুবের দক্ষিণে দক্ষিণ-মেরুদেশ।

মধ্যাকাশে ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া পরম-ব্রহ্ম বিরাট পুরুষ বিরাজমান। ঐ পরম পুরুষের কণ্ঠে ধ্রুব-তারক, হৃদয়ে ব্রহ্ম-হৃৎ-তারক (Capella) অয়নবৃত্ত তাহার কটি-বন্ধ, এবং বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ পদের গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত ছায়া-পথ উপবীতরূপে লম্বমান! অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ ঐ পরম পুরুষের শিরোদেশে এবং অসংখ্য তারামণ্ডল তাঁহার চক্ষুদেশে এবং বহুল তারককুল তাঁহার পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় পরম-পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎভাবে তোমার সম্মুখে বিরাজিত দেখিতেছ! ঐ পরম পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া সহস্রশীর্ষ, সর্ব্বদর্শী বলিয়া সহস্রাক্ষ, সর্ব্বতোগামী বলিয়া সহস্রপাৎ হইয়াছেন। ঐ পরমপুরুষ নিরাকার হইলেও সাকার, নির্গুণ হইলেও সত্ত্ব-রজ-তমোগুণে ভূষিত। ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক, তুমি ঐ গোলকে ঐ মহাপুরুষের বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিলে। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে 'কনকসন্নিভ' সুর-গুরু তারাপতি উদিত হইতেছেন, প্রাচীন ঋষিগণ তারাপতির মনোহর কান্তিতে পরমপুরুষের আবির্ভাব অনুভব করিতেন। ক্রমে রাত্রি-শেষে অসুর-গুরু শুক্রদেব নীলাভ-শ্বেতবর্ণে বিভূষিত হইয়া উদিত হইতেছেন; তৎপশ্চাৎ আস্তে আস্তে উষাদেবী অগ্রসর হইতেছেন! ক্রমে

লোহিতাঙ্গ অরুণদেব—সঙ্গে সঙ্গে সবিতৃদেব সমুদিত হইয়া জগতের তমোবিনাশ করিতে করিতে গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন। সবিতৃদেব ভৌতিক সত্বায় পরমব্রহ্ম নহেন, পরমব্রহ্মের আধার-বিশেষ মাত্র। যাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা সবিতৃদেবের অধিষ্ঠাতা দেবতার (বিষ্ণুর) ধ্যান করিয়া থাকেন।

সবিতৃ, অর্য্যমা, সূর্য্য, রুদ্র, আদিত্য, মিত্র, মিত্রাবরুণ, বরুণ, মরুৎ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা ঐশীশক্তির আবির্ভাব স্থানে পূজিত। অগ্নি সর্ব্বভূতের উৎপাদয়িতা (৭৭ সূক্ত—ঋক্) আকাশে সূর্য্যরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে (৯৫ সূক্ত) এবং স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত পদার্থে (৭০ সূক্ত) অবস্থিত এবং অগ্নিই নক্ষত্র-নিকরে নভোমণ্ডল বিভূষিত করিয়াছেন (৬৮ সূক্ত) অগ্নি রাত্রিকালে সবিতার প্রতিনিধি এবং দেবতা বলিয়া ঋষিগণের পূজনীয়। তুমি গোলোকময় অগ্নি দেখিতেছ না? এখন বিবেচনা কর, যে বিশ্বময় পরমপুরুষ দেখিতেছ, তাঁহাতে ও অগ্নিতে প্রভেদ কি? উভয়েই এক।

ঐ বিশ্বময় পরমপুরুষ বিশ্বের স্রষ্টা, পালক ও বিনাশক। এজন্য তিনিই রজঃ, সত্ত্ব ও তম, এই ত্রিগুণাত্মক। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তমোময় ছিল; তখন সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, কিছুই ছিল না; কেবল ঘোর তমসায় ব্রহ্মাণ্ড আবৃত ছিল। ঐ তমঃই বৃত্র, এবং এই অবস্থাই পরমপুরুষের তামসিক ভাব। ক্রমে বিশ্ব মধ্যে গতির সঞ্চার হইয়া জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, দ্যু, পৃথ্বী, জীবাদি সৃষ্ট হইল। জগৎ প্রকাশমান হইল। এই অবস্থার নাম রাজসিক ভাব। জল, বায়ু, শস্যাদি দ্বারা জীবগণ প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সবিতা ইহার মূল কারণ। এই বিকাশের অবস্থার নাম সাত্ত্বিক ভাব। সৃষ্ট বস্তু বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আবার সৃষ্ট ও পালিত হইবে, এই তিন অবস্থা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের বিকাশ মাত্র। এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নামে শাস্ত্রে অভিহিত। ত্রিগুণভেদে পরম-পুরুষের এই রূপত্রয় কল্পিত। শিবরূপে তমোগুণাধার, ব্রহ্মারূপে রজোগুণাধার এবং বিষ্ণুরূপে সত্ত্বগুণাধার বলিয়া পরমপুরুষ পূজিত। ত্রিগুণের এই ত্রিমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এক্ষণে গোলকে ঐ ত্রিমূর্ত্তি তোমাকে দেখাইব।

যে পরমপুরুষ বিশ্বময় দেখিতেছ, তাঁহাকে রজোগুণাধার ব্রহ্মা মনে করিলে দেখিবে যে, ব্রহ্মার হৃৎমণ্ডলে ব্রহ্মহৃৎ (Capella) তারক বিরাজমান। হৃৎমণ্ডলের অপর নাম ঔরিক মণ্ডল (Auriga Constellation)। চন্দ্ররূপী হংস যেন পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে বহন করিতেছে, এবং তাঁহার নাভি-পদ্মে যেন সূর্য্যরূপী বিষ্ণু বিরাজমান! ইহাই রাজসিক পুরাণের আদর্শ।

আবার ঐ পরমপুরুষকে সত্ত্বগুণাধার বিষ্ণু মনে কর, দেখিবে, ব্রহ্মাণ্ডের উত্তরমেরু-দেশে ঐ যে ভীষণ অজগর (Draco) দেখিতেছ—যাহার ফণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক্য জ্বলিতেছে, জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব। বিষ্ণু ঐ অনন্তদেবের ভোগোপরি শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া পরম পুরুষ বিষ্ণুর মস্তকদেশ আচ্ছাদন

করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ, বৈষ্ণব-চূড়ামণি ধ্রুব হরিভক্তির বলে পরমপুরুষের কণ্ঠ-ভূষণ হইয়াছেন! তাঁহার দক্ষিণে ব্রহ্মহৃৎ-তারক কৌস্তুভমণিরূপে পরমপুরুষের হৃদ্দেশ অলঙ্কৃত করিতেছে, এবং কটিদেশে অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে নাভিপদ্মে পূর্ণিমা-রাত্রে লক্ষ্মীদেবী মৃগাঙ্করূপে বিরাজমানা হয়েন। মৃগাঙ্কের কলঙ্কের নাম লক্ষ্ম বা চিহ্ন। লক্ষ্ম-ধারিণী লক্ষ্মীদেবী কোজাগর-পূর্ণিমা-তিথিতে পূজিতা। দিবাভাগে ঐ পরম পুরুষের নাভিপদ্মে (অয়ন-বৃত্তের দক্ষিণে) সূর্য্যরূপী ব্রহ্মা বিরাজমান থাকেন। সাত্ত্বিক-পুরাণ-বর্ণিত বিষ্ণুদেবের মূল এই। তুমি গোলকে বিষ্ণুর বিরাটমূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিলে। আবার ঐ দেখ, ব্রহ্মাণ্ডের মেরুদেশে শিব-শিরোপরি অনন্তদেব ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠদেশে গাঢ় নীলবর্ণ-রঞ্জিত ঐ অভিজিৎতারক (Vega) শোভা পাইতেছে,—সুতরাং 'নীলকণ্ঠ' নাম। অভিজিতের দক্ষিণে—পিনাক (Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে। পূর্ণিমা-তিথিতে শিব-ক্রোড়ে (অয়নবৃত্তে) সোমের উজ্জ্বলার্দ্ধ উমা রূপে অবস্থিত থাকেন, এবং অমানিশাতে সোমের তমসাময় ভাগ কালীরূপে অবস্থিত থাকেন। গোলকে ত্রিগুণের রূপত্রয়ের এবম্বিধ দর্শন লাভ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।

১২

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।

অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন মিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

পদপাঠঃ। প্রীতি—অপ্রীতি—বিষাদ—আত্মকাঃ। প্রকাশ—প্রবৃত্তি—নিয়ম—অর্থাঃ। অন্যোন্য—অভিভব—আশ্রয়—জনন—মিথুন—বৃত্তয়ঃ—চ—গুণাঃ।

ব্যাখ্যা। প্রীতিঃ—আনন্দ বা সত্ত্বগুণ। অপ্রীতিঃ—দুঃখ বা রজোগুণ। বিষাদ—মোহ বা তমোগুণ; এই তিন হইয়াছে আত্মা যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ। প্রকাশ—বিকাশ। প্রবৃত্তি—কার্য্যে প্রবৃত্তি। নিয়ম—প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ; এই সমুদয় অর্থ যাহাদের, তাদৃশ—অর্থাৎ সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের যথাক্রমে বিকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিয়ম, এই ধর্ম্মত্রয় সম্পন্ন। অন্যোন্য—পরস্পর। অভিভব—পরাভব। আশ্রয়—আশ্রয়। জনন—উৎপাদন। মিথুন-বৃত্তি— পরস্পর সংযোগ। চ—সমুচ্চয়ে। গুণাঃ—গুণ।

বঙ্গার্থ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি, অপ্রীতি ও বিষাদাত্মক, এবং

প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম (প্রতিকূল আচরণ), ইহাদের—অর্থাৎ এই তিন গুণের প্রয়োজন। ইহারা পরস্পর পরস্পরের অভিভব করে, পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, এবং পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে ও ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। জগতে সর্ব্বত্রই তিনটী শক্তি পরিদৃষ্ট হয়, যথা সৃষ্টিশক্তি, বর্দ্ধনশক্তি এবং নাশ-শক্তি। সৃষ্টিশক্তি এবং বর্দ্ধনশক্তি সৃষ্টের জীবন সম্বন্ধে এক জাতীয়; এই উভয় শক্তিকেই জীবনীশক্তি নাম দেওয়া যাইতে পারে, এবং তমঃ-শক্তিকে মৃত্যু-শক্তি বলা যাইতে পারে। এই জীবনীশক্তি এবং মৃত্যু-শক্তি হইতেই বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী দ্বন্দ্বাত্মক জগৎ। বীজ অঙ্কুরিত হইতে চেষ্টা করিতেছে; বীজ অঙ্কুরিত হইল বা অঙ্কুরিত না হইয়া বিনষ্ট হইল। চেষ্টার অবস্থা রজঃ-শক্তির কার্য্য, বিকাশের অবস্থা সত্ত্ব-শক্তির কার্য্য, এবং নাশের অবস্থা তমঃ-শক্তির কার্য্য। তমঃ দ্বারা নষ্ট না হইলে, রজঃ সত্ত্বে পরিণত হয়। মনে কোন ভাব উদয়ের চেষ্টা করিতেছি, ইহাই হইল মনের রাজসিক অবস্থা, ইহাই কষ্টের অবস্থা। যখন ভাব উদিত হইল, তখন সাত্ত্বিক অবস্থা; ইহাই সুখের অবস্থা। আর যখন সহস্র চেষ্টাতেও কোন ভাবই উদিত হইল না, তখনই তামসিক অবস্থা বা বিষাদের অবস্থা, ইহাই জড়ভাব। এই জন্যই সূত্রে বলা হইতেছে, "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ". প্রকাশই সত্ত্বের অবস্থা। রজঃ-শক্তির দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং তমঃশক্তি ইহার প্রতিকূল আচরণ করে। এইজন্য সূত্রে বলা হইয়াছে "প্রকাশ-প্রবৃত্তি-নিয়মার্থাঃ।" তৎপরে দেখুন, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ, কেননা একের অভাবে অন্যের সত্তা থাকিতে পারে না। জন্ম না থাকিলে মৃত্যু থাকে না, মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিতে পারে না। বর্দ্ধন না থাকিলে প্রকাশ হয় না, আবার মৃত্যু না থাকিলে বর্দ্ধন হয় না। ইহারা প্রত্যেকে অপর দুই গুণকে অভিভব করিয়া প্রবল হয়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—"রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত। "রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥"

রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া কখনও সত্ত্ব প্রবল হয়, কখনও সত্ত্ব-তমকে অভিভব করিয়া রজঃ প্রবল হয়, আবার কখনও সত্ত্ব ও রজঃকে অভিভব করিয়া তমঃ প্রবল হয়। সত্ত্ব প্রবল হইলে শান্ত বৃত্তি হয়; রজঃ প্রবল হইলে ঘোরা বৃত্তি হয়, এবং তমঃ প্রবল হইলে মূঢ়া বৃত্তি হয়। ইহারা পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে—অর্থাৎ রজঃও সত্ত্বে পরিণত হয়, সত্ত্বও রজে পরিণত হয়; এইরূপ তম ও সত্ত্ব রজে পরিণত হইতে পারে। যেমন সত্ত্বগুণাবলম্বী রাজা দোষী ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করেন। এস্থলে দণ্ডরূপ কার্য্য তমোগুণাত্মক, কিন্তু ইহা সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হইল। সর্পবিষ—যাহা মনুষ্য-জীবন নষ্ট করে, তাহা অবস্থা বিশেষে মনুষ্য-জীবন রক্ষাও করে—অর্থাৎ তমোগুণ সত্ত্বে পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাবিশেষে প্রত্যেক গুণই অপর গুণে পরিণত হয়। ইহারা পরস্পর মিথুনভাবাপন্ন—অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হয়। সত্ত্ব-তম, তমঃ-রজঃ, রজঃ-সত্ত্ব, এইরূপ মিথুনভাবে পরস্পর মিলিত হয় ও জগতে বিভিন্ন অবস্থা উৎপাদন করে।

১৩

সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু-বরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ ॥

পদপাঠঃ। সত্ত্বং। লঘু। প্রকাশকম্। ইষ্টম্। উপষ্টম্ভকম্। চলম্। চ। রজঃ। গুরু। বরণকম্। এব। তমঃ। প্রদীপবৎ। চ। অর্থতঃ। বৃত্তিঃ।

ব্যাখ্যা। সত্ত্বং—সত্ত্ব। লঘু—লঘু। প্রকাশকম্—বিকাশকর। ইষ্টম্—অভিপ্রেত। অপষ্টম্ভকম্—উৎসাহক বা উত্তেজক। চলম্—গতিশীল। চ—এবং। রজঃ—রজোগুণ। গুরু—গুরু। বরণকম্—আবরক। এব—পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্বেও। তমঃ—তমোগুণ। প্রদীপবৎ—প্রদীপের ন্যায়। চ—এবং। অর্থতঃ—অর্থ-প্রকাশের জন্য। বৃত্তিঃ—কার্য্যকারিতা হয়।

বঙ্গার্থ। সাঙ্খ্যাচার্য্যের মতে সত্ত্বগুণ লঘু এবং বিকাশকারী, রজঃ—কার্য্যকর এবং গতিশীল, এবং তমঃ গুরু ও আবরক। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও স্বস্ব কার্য্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপ সদৃশ।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, সৃষ্টির জন্য এই তিনেরই আবশ্যক। এক ভিন্ন অপর দুইটী থাকিতে পারে না, এবং তিনটী না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। ইহাদিগকে সূত্রে "প্রদীপবৎ" বলা হইতেছে। অগ্নি প্রদীপ এবং তৈলের বিরোধী হইলেও, এই তিনের সমাবেশে আলোকের উৎপত্তি হয়। জগৎও তদ্রূপ বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ দ্বারা প্রবাহিত রহিয়াছে। হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্রাহ্মণ" ও "বর্ণতত্ত্ব" প্রবন্ধ পাঠ করিলে, পাঠক এ বিষয়ের সুবিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পারিবেন।

দয়া-দাক্ষিণ্যাদি যে কিছু সদ্‌গুণ, তৎসমুদয়ই সত্ত্বগুণের অন্তর্ভূত। হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ প্রভৃতি রজোগুণের অন্তর্ভূত, এবং আলস্য, জড়তা, মোহ, অজ্ঞান, ভ্রান্তি প্রভৃতি তমোগুণের অন্তর্ভূত।

১৪

অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাত্তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্ ॥

পদপাঠঃ। অবিবেকি। আদেঃ। সিদ্ধিঃ। ত্রৈগুণ্যাৎ। তদ্বিপর্য্যয়ে। অভাবাৎ। কারণগুণাত্মকত্বাৎ। কার্য্যস্য। অব্যক্তং। অপি। সিদ্ধম্।

ব্যাখ্যা। অবিবেক্যাদেঃ—দুঃখ, মোহ প্রভৃতি অবিবেকিতা। সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি। ত্রৈগুণ্যাৎ—তিন গুণ হইতে। তদ্বিপর্য্যয়ে—সেই গুণত্রয়ের বিপর্য্যয় হইলে। অভাবাৎ—অবিবেকিতাদির অভাব হেতু। কারণ গুণাত্মকত্বাৎ—কারণের গুণযুক্ত বলিয়া। কার্য্যস্য—কার্য্যের। অব্যক্তঃ—অব্যক্ত—অর্থাৎ অদৃষ্ট কারণও। সিদ্ধম্—সিদ্ধ হইল।

বঙ্গার্থ। ত্রিগুণ হইতে অবিবেকাদির সিদ্ধি হয়; কেননা যেখানে ত্রিগুণ, সেই-খানেই অবিবেকাদি দৃষ্ট হয়, এবং যেখানে ত্রিগুণের অভাব, সেই খানেই অবিবেকাদিরও অভাব লক্ষিত হয়। কার্য্যে কারণের গুণ থাকা হেতু পরম্পরাভাবে অব্যক্ত প্রকৃতিরও সিদ্ধি হইল।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এস্থলে অন্বয়-ব্যতিরেক-ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ তৎ সত্ত্বে তৎ সত্তা, তদসত্ত্বে তদসত্তা) বলা হইতেছে যে, যেখানে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ দেখা যায়, সেইখানেই অবিবেকাদির—অর্থাৎ অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন, প্রসবধর্ম্মী (১১শ সূত্র) প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, এবং যে স্থলে ত্রিগুণ নাই, সেস্থলে এ সমুদয় লক্ষিত হয় না। ব্যক্ত জগতে এতাবৎ গুণ থাকা হেতু, এই ব্যক্ত জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তদ্‌গুণাবলম্বী বলিয়া প্রতিভাত হয়।

১৫

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য॥

পদপাঠঃ। ভেদানাং। পরিমাণাৎ। সমন্বয়াৎ। শক্তিতঃ। প্রবৃত্তেঃ। চ। কারণ। কার্য্য। বিভাগাৎ। অবিভাগাৎ। বৈশ্বরূপ্যস্য।

ব্যাখ্যা। ভেদানাং—ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্বের। পরিমাণাৎ—সসীমত্বহেতু। সমন্বয়াৎ—গুণের সামান্যহেতু। শক্তিতঃ—শক্তিহেতু। প্রবৃত্তেঃ প্রবৃত্তির। চ—এবং। কারণ কার্য্য-বিভাগাৎ—কারণ এবং কার্য্যের বিভাগ হেতু। অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপ্যস্য—এই বিশ্বের রূপের অবিভক্ততা নিবন্ধন।

বঙ্গার্থ। এই ভেদবিশিষ্ট বিচিত্র বিশ্বের সসীমত্ব নিবন্ধন, গুণত্রয়ের সামান্যহেতু প্রবৃত্তির শক্তি—অর্থাৎ কার্য্য-ব্যাপারে নিয়োগের শক্তিহেতু, কারণ এবং কার্য্যের বিভিন্নতাহেতু ও বিশ্বের অবিভক্ততা বা একতা নিবন্ধন প্রকৃতির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়।

বিশেষ ব্যাখ্যা। এই বিচিত্র বিশ্বে আমরা যাহা কিছু দেখি, তৎসমস্তই সসীম, এবং সসীম বস্তুর কারণ থাকিবে। বস্তুর গুণ সামান্য হইতে আমরা ক্রমশঃ একমাত্র কারণে উপনীত হই। বস্তু মাত্রেই বস্তু বিকাশের শক্তি পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং উহার বিকাশক কেহ আছে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, কার্য্য ও কারণ মূলতঃ এক হইলেও উহারা পৃথক্। বীজ ও বৃক্ষে মূলতঃ কোন প্রভেদ না থাকিলেও, বীজ ও বৃক্ষ এক নহে, বৃক্ষ এবং বীজ বিভিন্ন; সুতরাং কার্য্য ও কারণ এক না হইলে, জগৎ-কার্য্যের অবশ্য কারণ থাকিবে। এই বিচিত্র বিশ্বের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, প্রথমতঃ যাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহারা বিভিন্ন নয়। এইরূপে জগতের কারণের সংখ্যা ক্রমে কমিয়া আসে, এবং অবশেষে আমরা সৃষ্টির একমাত্র কারণে উপনীত হই। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

সম্পাদকীয় লাঞ্ছনা।

ভাবিয়া ছিলাম—বলিব না, দুঃখের কথা মনেই থাকুক; কেন না অস্মদ্দেশে পত্রিকা-সম্পাদকদিগের পথ যে অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ, তাহা সকলেই বিদিত আছেন, সুতরাং যিনি এরূপ কার্যে ব্রতী হয়েন, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই নানাবিধ বিড়ম্বনার জন্য প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। অস্মদ্দেশের সম্পাদকীয় জীবন যে বহুল বিড়ম্বনা-পূর্ণ, তাহা আমরা বিগত বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বিশেষরূপে অবগত ছিলাম এবং "হিন্দু-পত্রিকা সম্পাদনে যে আমাদিগকে বহুবিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে তাহাও আমরা বেশ জানিতাম; জানিয়া শুনিয়াই আমরা এই কার্যে ব্রতী হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগের আক্ষেপ বা অভিযোগের কোন কারণ নাই। সম্পাদকীয় জীবনে যত প্রকার যাতনা সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে পত্রিকার মূল্য আদায়ই সর্ব্বপ্রধান। এদেশের পাঠকবর্গ মনে করেন যে, তাঁহারা যে পত্রিকা পাঠ করেন, ইহাই যথেষ্ট অনুগ্রহ, ইহার উপর আবার মূল্য!! তাগীদের উপর তাগীদ, তাগীদের উপর তাগীদ, কিন্তু পাঠক নীরব! দরিদ্র সম্পাদক সাহস করিয়া পাঠকের নাম রেজিষ্টর হইতে কর্ত্তন করেন না, কেননা তাহাহইলে প্রায় সবই কাটা যায়। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় কত অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখেন, কত "মহোদয়" "মহাশয়" "স্বদেশবৎসল" "ধর্ম্মবৎসল" প্রভৃতি ব্যর্থবিশেষণ যোজনা করেন, কিন্তু নির্ম্মম পাঠকের কিছুতেই দয়া হয় না। তিনি যদিও মূল্যপ্রদানরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত, তথাপি পত্রিকাগ্রহণরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনে বিমুখ নহেন, বরং পত্রিকা প্রাপ্তিমাত্রেই অম্লানবদনে

পিপঠিষার পরিতৃপ্তি করেন। যদি তাগীদ একটু মধুতিক্তরসমিশ্রিত হয়, তা'হলেই পাঠক রুষ্ট হন এবং পত্রিকাগ্রহণরূপ অনুগ্রহে বঞ্চিত করেন বটে, কিন্তু নানাবিধ কার্যে বিব্রত থাকা হেতু পত্রিকার বাকী মূল্য প্রেরণ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। সম্পাদক বেচারী ক্রমে আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া পত্রিকা উঠাইয়া দেন। এইরূপে বঙ্গদেশে প্রতিবৎসরেই বহুসংখ্যক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকার অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। "বঙ্গদর্শন, "বান্ধব," "আর্য্যদর্শন," "প্রচার," "নবজীবন," "সাধারণী," প্রভৃতি বহুবিধ উৎকৃষ্ট পত্রিকা অকালে লীলাসংবরণ করিয়াছে। এ দোষ কি পত্রিকার সত্বাধিকারীদিগের? পত্রিকার গ্রাহকগণ যদি নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করিতেন, এবং সত্বাধিকারীদিগের যদি বিশেষ ক্ষতি না হইত, তাহা হইলে কখনও ঐ সকল উৎকৃষ্ট পত্রিকা উঠিয়া যাইত না। সর্ব্বত্রই এই অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যে, বাঙ্গালা পত্রিকার পাঠকেরা পত্রিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু মূল্য দেন না। কোন্ নীতিশাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের স্ব স্ব ঋণ পরিশোধ করিতে পরাঙ্মুখ, তাহা ভগবানই জানেন; তবে এই বোধ হয় যে, বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করাই তাঁহারা যথেষ্ট ক্ষতি মনে করেন, সুতরাং তাঁহাদের ঐ পাঠরূপ ক্ষতি স্বীকারের জন্য, তাঁহারা ত মূল্য দিতে বাধ্যই নহেন, বরং তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্পাদকের নিকট হইতে কিছু পাইবার অধিকারী। আমাদের ত মনে হয় না যে, এতাদৃশ সংস্কার না থাকিলে, কোন "ভদ্র" আখ্যাধারী ব্যক্তিই এইরূপ জঘন্য আচরণ করিতে পারেন। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম প্রদান করিয়া এক মহাত্মা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, সে বৎসরের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা প্রাপ্ত হইলেন, পর বৎসরের বৈশাখ মাসের পত্রিকা প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকেই ঐ বৎসরের মূল্যের জন্য লেখা হইল। টাকা আসিল না। জ্যৈষ্ঠের কাগজ গেল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় তাগীদ চলিল, এই প্রকারে সেই বৎসরের শেষ হইল, টাকা আসিল না। তৎপরে পর বৎসরের কাগজ এবং তাগীদও ঐরূপ চলিল, কিন্তু টাকা আসিল না। তাগীদের জোর যখন কিছু বেশী চলিল, তখন হয়ত সকরুণ পাঠক পত্রিকা খানি ফেরত পাঠাইয়া লিখিলেন যে, "মহাশয়! আমি আর পত্রিকা লইব না, আমার নিকট যে মূল্য বাকী আছে, তাহা পরে পাঠাইতেছি"। পত্রিকা পাঠান রহিত করিয়া বাকী মূল্যের জন্য যখন পত্র গেল, তখন পাঠক কার্য্যের ব্যস্ততাবশতঃ উত্তর দেওয়ার অবকাশ পাইলেন না, টাকাও পাঠাইলেন না, এইরূপে বাকী মূল্যের জন্য ২।৪ বার তাগীদ হইতে থাকিলে, তখন পাঠকের স্বহস্ত লিখিত "Refused" এবং স্থানীয় ডাক পিয়নের "মালিক লইলেন না" এই অভিজ্ঞানযুক্ত হইয়া তাগীদ পত্র ফেরত আসিতে লাগিল। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রকারে টাকা আদায়ে বিফলমনোরথ হইয়া সম্পাদক মহাশয়কে কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্পাদক মহাশয় অগত্যা বলিলেন যে, "আর তাগীদ দেওয়ায় লাভ কি,

বন্ধকর"। যে দেশের শিক্ষিত লোকদিগের ব্যবহার এইরূপ, সে দেশের ভবিষ্যৎ কি নৈরাশ্যময় নয়? তাহাই যদি হইল, তবে আর বারিপৃষ্ঠে এত বেত্রাঘাত কেন? তদুত্তরে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, "মনে বুঝে না—যদি কিছু হয়," তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া যেমন তরণী মগ্নোন্মুখ হইলেও কর্ণধার কর্ণ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ অস্মদ্দেশের ভবিষ্যদ্‌গগন নৈরাশ্যতিমিরে পূর্ণ হইলেও, স্বদেশের উন্নতি সাধনের চেষ্টা আমরা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে সমুদয় কর্ত্তব্যপরায়ণ গ্রাহক নিয়মিতরূপে মূল্য প্রদান করেন, তাঁহারা হয়ত বলিতে পারেন যে "যাঁহাদের মূল্য শেষ হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে পর বৎসরের কাগজ পাঠান হয় কেন? বৎসরের শেষে মূল্য শেষ হইয়া গেলে, পরবর্ত্তী বৎসরের মূল্য অগ্রিম না দিলে, কাগজ না পাঠাইলেই এই সমুদয় বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না।" তদুত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, যাঁহারা পত্রিকার মূল্য বৎসরের মধ্যেই শেষ করেন, এরূপ গ্রাহকও অনেক আছেন, কিন্তু তাঁহারা হয়ত বৎসরের প্রথম, মধ্য কি শেষ ভাগেই বৎসরের মূল্য পরিশোধ করিয়া থাকেন। এইরূপ গ্রাহকদিগের বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই, মূল্য বৎসরের মধ্যে দিলেই আমরা কৃতার্থ হই, কিন্তু বৈশাখ মাসের মধ্যেই সেই বৎসরের অগ্রিম মূল্য না পাইয়া পত্রিকা স্থগিত করিলে, মুদ্রিত পত্রিকা-সমূহ সম্পাদকের নিজেরই পাঠ করিতে হয় এবং ভাষান্তরে লিখিতে গেলে, পত্রিকার মুদ্রাঙ্কণ একেবারেই রহিত করিতে হয়; কারণ বাঙ্গালা দেশে আজও এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ পাঠক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়, যাঁহারা বৎসরের প্রথম মাসেই হেয় বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত পত্রিকার মূল্য প্রেরণ করেন। আমাদের দেশের নৈতিক আদর্শ এত উচ্চ হয় নাই এবং তাহা শীঘ্র হইবে বলিয়া আমরা আশাও করি না। বৎসরের মূল্য বৎসরের মধ্যে পাইলেই আমরা সন্তুষ্ট, চাই উহা বৎসরের প্রথম ভাগেই আসুক, কিম্বা পাঠকগণের সুবিধা অনুসারে উহা শেষ ভাগেই প্রেরিত হউক; কিন্তু আমরা এই টুকু আশা করিয়াছিলাম এবং এখনও করি যে, পাঠকবর্গ বৎসরের মূল্য বৎসরের মধ্যেই পাঠান এবং যদি কোন ক্রমে মূল্য বাকী পড়ে এবং পাঠকের ভবিষ্যতে পত্রিকা গ্রহণের ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পত্রিকা পরিত্যাগের সময় বাকী মূল্যটী দিয়া পরিত্যাগ করেন। প্রত্যেক অপকার্য্যের একটি প্রতিবিধান থাকা প্রয়োজন। দুই চারি টাকা আদায়ের জন্য সুদূর সহর বা পল্লীগ্রামস্থিত পাঠকের নামে আদালতে অভিযোগ করা অসম্ভব, কিন্তু অন্ততঃ অন্যান্য কর্ত্তব্যবিমুখ পাঠকবর্গকে কর্ত্তব্য-শিক্ষা দিবার জন্য দুই এক স্থলে হয়ত আমাদিগকে তাহাও করিতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ মূল্য বাকী ফেলেন, তাঁহাদের মধ্যে সমাজের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও আছেন, তাঁহারা যদি এই দুঃখের কাহিনী পাঠ করিয়াও স্বীয় মূল্য প্রদান না করেন, তাহা হইলে, যে স্থলে আমরা বহুব্যয়াশঙ্কায় আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব,

সে স্থলে, তাঁহাদের নাম, ধাম, পদ ও ঠিকানা, হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যপথবর্ত্তী করিতে চেষ্টা করিব। গত পাঁচ বৎসর যাবৎ আমরা "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করিতেছি, পত্রিকার জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত, পত্রিকা হইতে কখনও এক পয়সা গ্রহণ করি নাই, ভবিষ্যতেও গ্রহণ করিবার ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা এই যে, দেশের কিছু মঙ্গল হউক, এবং পত্রিকার যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা ব্রহ্মচারি-আশ্রমে ব্যয়িত হইতে থাকুক। হিন্দু-পত্রিকা ভালই হউক বা মন্দই হউক ভগবানের অনুগ্রহে ইহা সমস্ত বঙ্গদেশে আদৃত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের যে স্থলেই বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থলেই হিন্দু-পত্রিকা গৃহীত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার সকল মাসিক পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা যে অধিক, তাহা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা সমূহের ত্রৈমাসিক বিবরণ দেখিলেই প্রতীত হইবে। একথা বলি এইজন্য যে আমরা কিছুমাত্র পারিশ্রমিক না লইয়া, বহুসংখ্যক গ্রাহক সত্বেও পত্রিকার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হই, তাহার একমাত্র কারণ যে, আমাদের গ্রাহকবর্গ নিয়মিত মূল্য দেন না। হিন্দু-পত্রিকা বর্ত্তমানে প্রত্যেক মাসে রয়েল ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ বৎসরে ৩৮৪ পৃষ্ঠা বাহির হইতেছে. প্রথম বৎসরে পত্রিকার আকার প্রতি দুই মাসে ৪ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ রয়েল ৮ পেজী ৩২ পৃষ্ঠা ছিল; সুতরাং পত্রিকার আকার ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব শ্রেণীর গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য এবং অল্প মূল্য হইলে হিন্দু-পত্রিকার বহুল প্রচার হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্বসমূহ সাধারণ্যে প্রকাশিত হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যেই আমরা দুই টাকার স্থলে পত্রিকার মূল্য পুরাতন গ্রাহকগণের নিকট ১৷৴০ আনা এবং নূতন গ্রাহকের নিকট ১৷০ দেড় টাকা মাত্র ধার্য্য করিয়াছি। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ সুলভ পত্রিকা আজও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ পত্রিকার মূল্য যে বাকী পড়ে ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়। পাঠকগণ নিয়মিত মূল্য প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেই আমারা নিশ্চিন্ত মনে আমাদের স্বকর্ত্তব্য পালন করিতে পারি। সময় সময় আমাদিগকে এতদুর বিরক্তি সহ্য করিতে হয় যে, ইচ্ছা হয় হিন্দু-পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত করি, কিন্তু কর্ত্তব্যচিন্তা করিয়া এবং শত শত কর্ত্তব্যপরায়ণ পাঠকের নিয়মিত মূল্য প্রদান এবং তাঁহাদের উৎসাহ ও সহানুভূতি স্মরণ করিয়াই আমরা এই কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছি। আমরা আশা করি যে, হিন্দু-পত্রিকা তাঁহাদের অনুগ্রহে সজীব থাকিতে পারিবে এবং ইহাও আশা করি যে তাঁহাদের আদর্শ অন্যান্য পাঠকের অনুকরণীয় হইয়া ক্রমশঃ হিন্দু-পত্রিকার বল ও তেজ বৃদ্ধি করিবে। আমরা যে আমাদিগের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পরিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমরা তাহা বলিতেছি না, কিন্তু এইটুকু সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কর্ত্তব্য পরিপালনে আমাদিগের কখনও যত্ন, চেষ্টা বা ইচ্ছার অভাব হয়,

নাই। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য অতি সামান্য ১।৶০ এক টাকা ছয় আনা কি ১৷৹ এক টাকা আট আনা, উহা বৎসরে ব্যয় করা কোন শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষেই কষ্টকর নহে, অথচ এই সামান্য মূল্যের উপরেই হিন্দু-পত্রিকার জীবন নির্ভর করে। এই সামান্য মূল্য যথাসময়ে প্রদান করিয়া প্রত্যেক পাঠকই আমাদিগকে কর্ত্তব্য পরিচালনে সহায়তা করেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। সম্পাদকের বা অন্য কাহারও অনুরোধ যেন কেহ হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণ করেন না এবং মূল্য না দিয়া কেবল হিন্দু-পত্রিকা পাঠেও যেন কেহ সম্পাদককে অনুগৃহীত করেন না। যে সমুদয় পাঠক মনে করেন যে, তাঁহারা হিন্দু-পত্রিকা গ্রহণে স্বদেশের বা স্বধর্ম্মের কোন উপকার না করিয়া কোন না কোন ব্যক্তিকে উপকৃত করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় বাকী মূল্য প্রদানপূর্ব্বক, ভবিষ্যতে হিন্দু-পত্রিকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া ম্যানেজারকে পত্র লিখেন। হিন্দু-পত্রিকা কাহারও নিকট এরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে চাহে না।

আমিত্বের প্রসার।

(তিনটি শত্রু)

যতদিন তুমি মনে করিবে যে তুমি আমা হইতে স্বতন্ত্র; যতদিন তুমি বিবেচনা করিবে যে তোমার আত্মা ও আমার আত্মা স্বতন্ত্র, ততদিন তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে না। স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় জ্ঞানকর বলিয়াই তাহাদিগের সম্পদ বিপদ স্বীয় সম্পদ বিপদের ন্যায় জ্ঞান কর, এই আত্মীয়তা যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে। আত্মার বা "আমির" কখন বিনাশ নাই, বিনাশ করিতে হইবে "আমির সঙ্কোচ ভাব" বা "অহঙ্কারের"। অহংভাব হইতেই মানবাত্মা অপর মানবাত্মাকে স্বতন্ত্র করে, অহং ভাব নাশ হইলেই, সর্ব্বাধারেই একই "আমি" বিরাজিত পরিদৃষ্ট হয়। এই অদ্বৈত বা অভেদজ্ঞান কর্ম্ম ও জ্ঞান-তপস্যা সাধ্য। গাত্র ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিলে অহঙ্কারের ধ্বংশ হয় না। সন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হইলে জগতের হিতব্রত গ্রহণ করিতে হয়। "আত্ম মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ" এই হইল সন্যাসীর দীক্ষা মন্ত্র। যাহারা বিশ্বহিতমন্ত্র বিস্মৃত হন, তাহাদের কখনও মুক্তি হয় না। সর্ব্বাধারে ভগবানের সত্বা অনুভব করিতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার বা মুক্তি হয়, উহা জ্ঞান ও বিশ্বহিত কর্ম্ম দ্বারাই লাভ

হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট বা নিক্রিয় হইয়া থাকিলে কখনও মুক্তি হয় না। বিবিধ কর্ম্মের দ্বারাই জীবাত্মার নানাবিধ অজ্ঞান বিদূরিত হয়, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের তিনটি ঘোর শত্রু রহিয়াছে, তাহারা সততই মানবকে আমিত্বের প্রসাররূপ স্বর্গের দিক হইতে আমিত্বের সঙ্কোচরূপ নরকের দিকে লইবার জন্য সচেষ্ট। ঐ শত্রুত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান শত্রুই কাম। মানবের বাসনাই মানবের পরম শত্রু। বাসনাই মানবকে বিপথে লইয়া তাহাকে নানাবিধ যাতনা দেয়। ভোজন দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজন, কিন্তু ভোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া ভোজনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া আমরা বাসনার জালে পতিত হই। এই সংসারে বাস করিতে গেলে ধনের প্রয়োজন, গৃহ, বস্ত্র, ভোজন ইত্যাদির জন্য ধন ব্যতীত চলে না ; কিন্তু ধনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, যখন আমি ধনকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় জীবন পরিচালিত করি, তখনই বাসনা-বাগুড়ায় আবদ্ধ হই। অপত্যোৎপাদনের জন্য কাম প্রবৃত্তির প্রয়োজন, কিন্তু যখনই আমি কাম প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া, কাম প্রবৃত্তিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি, তখনই আমি বাসনা পাশে স্বীয় গলদেশ বন্ধন করি। ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে কোন প্রবৃত্তিই আমাদিগের অহিতকর নয়, কিন্তু প্রত্যেক প্রবৃত্তি চরিতার্থের একটি সীমা আছে, ঐ সীমা যতদিন অতিক্রম না কর, ততদিন তোমার কোন ভয় নাই ; কিন্তু ঐ সীমা অতিক্রম করিলেই কাম বা বাসনা রাজ্যে উপনীত হও। বাসনা সমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি বা কাম প্রবৃত্তি অন্যান্য প্রবৃত্তি অপেক্ষা দুর্জ্জেয় বলিয়া উহাই উপলক্ষণা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার বাসনার প্রতিনিধি স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকে। দেহই বাসনার আধার, কর্ম্ম দ্বারা আত্মবিকাশের জন্য দেহেরও প্রয়োজন ; কিন্তু দেহকে আত্ম প্রসারের উপকরণ জ্ঞান না করিয়া, যখন তোমার দৃষ্টি কেবল দেহেতেই নিবদ্ধ করিলে, তখন তুমি তোমার আত্মার সত্তা বিস্মৃত হইলে, তখন আর তুমি আত্মার প্রসারের চেষ্টা কেমন করিয়া করিবে। কাম প্রবৃত্তি অতীব বলবতী, এবং সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণার্থই এই প্রবৃত্তিকে এইরূপ বলবতী করা হইয়াছে। মানবহৃদয়ে কাম প্রবৃত্তি বলবতী না হইলে, কেহই রমণরূপ ঘৃণাজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। চিন্তা করিয়া দেখ দেখি হৃদয়ে এক অদমনীয় প্রবৃত্তির অভাব সত্ত্বে সাত্ত্বিক অবস্থায় কেহ ঐরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে কি না। তাই বলি যে সৃষ্টি সংরক্ষণ হেতুই ভগবান মানবে কেন সর্ব্বাধারেই কাম রোপিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ" অর্থাৎ জীবের পূর্ব্ব কল্পকৃত কর্ম্ম থাকায়, ভগবানের মনে সৃষ্টির কাম অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল। (হিঃ, পঃ, ৪র্থ বৎসর নাসদীয়-সূক্ত দ্রষ্টব্য) শ্রুতি আর এক স্থলে বলেন "সোঽকাময়তবহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি" তিনি সৃষ্টির জন্য কামনা করিয়াছিলেন। সুতরাং যখন কামনা ব্যতীত ভগবানের সৃষ্টি হয় নাই, তখন জীবে কামনা না থাকিয়া পারে না, কিন্তু কামের উদ্দেশ্য

বিস্মৃত হইয়া যিনি কামকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করেন, তিনি আমিত্বের প্রসারে নিশ্চিতই বঞ্চিত হইবেন। (৫ম বর্ষ হিন্দু-পত্রিকার জনন-সূক্ত দ্রষ্টব্য) অনেকে মনে করিতে পারেন, যাহার অপব্যবহারে জীবের অমঙ্গল হইতে পারে, এরূপ মনোবৃত্তির সত্তা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের উপর দোষারোপ করে। পাপাদি সৃষ্ট না হইলেই জীবের এত দুর্গতি হইত না। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, পাপাদির সত্তা জগতে অনিবার্য্য। জগতের মূল কারণ ব্রহ্মে পাপ-পুণ্য কিছুই নাই, কিন্তু তখন সৃষ্টিও নাই। অসীম নিরুপাধিক ব্রহ্ম হইতে সসীম উপাধিবিশিষ্ট বিশ্ব উদ্ভূত হয়, পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম, কিন্তু সকলই উপাধি বিশিষ্ট। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্ম, পাপপুণ্য ইত্যাদি সকলই ব্রহ্ম। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে, তিনিই ধর্ম্ম, তিনিই অধর্ম্ম, তিনিই পাপ, তিনিই পুণ্য, জগতে তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। আত্মা বা ব্রহ্মের অধোবিকাশই জগতের উৎপত্তি। জগৎ উদ্ভূত হইলে, যাহাতে জীবাত্মার উর্দ্ধবিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটে, তাহাই পাপ; অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচই পাপ। মিথ্যা ভাষণাদি এই উর্দ্ধ-বিকাশের প্রতিকূল বলিয়া উহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মিথ্যা না থাকিলে, সত্যের আস্তিত্ব কোথায়? মিথ্যা দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হয়। মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য এত সতেজ এবং বলিষ্ঠ। যাহাকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে, তাহার প্রতিকূলাচরণ করা আবশ্যক। মনে কর তোমার হস্তকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে; তখন তুমি কি কর? কোন গুরু বস্তুর পুনঃ পুনঃ উত্তোলন বা ঘূর্ণন কর। ঐ গুরু বস্তু তোমার হস্তকে নিম্নাভিমুখে লইতে উদ্যত, কিন্তু তুমি বল দ্বারা উহার সেই প্রতিকূলাচরণ পরাভব কর। ক্রমে ক্রমে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হয়। কিন্তু ঐ হস্তের কোন প্রতিকূলাচরণ না করিয়া যদি উহা বহুদিন এক ভাবেই রাখিয়া দেও, তাহা হইলে তোমার হস্ত বলিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক উহা জড়বৎ অসাড় হইয়া পড়িবে। সুতরাং হস্তের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য উহার বিরুদ্ধাচরণ আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে, দৃষ্ট হইবে যে এই দ্বন্দ্বাত্মক জগতে কোন দ্বন্দ্বের মধ্যে একের অভাব হইলে, অপরের সত্তা থাকিতে পারে না। ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি, ধ্বংস না থাকিলে সৃষ্টির সত্তা নাই। মনে কর এই জগতে কোন বস্তুর ধ্বংস নাই, তাহা হইলে সৃষ্ট হইবে কি? ধ্বংস আছে বলিয়াই সৃষ্টি। ঐরূপ শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম, মিথ্যা আছে বলিয়াই সত্য, পাপ আছে বলিয়াই পুণ্য। সুতরাং যাঁহারা জগতে দুঃখাদির অস্তিত্ব দেখিয়া দুঃখিত হয়েন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, দুঃখাদির সত্তা আছে বলিয়াই সুখাদির সত্তা। তৎপরে বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে পাপপুণ্য, সুখদুঃখ সমুদয়ই আপেক্ষিক। অবস্থা বিশেষে যাহা পাপ, অবস্থান্তরে তাহা পুণ্য; আবার অবস্থা বিশেষে যাহা পুণ্য, অবস্থান্তরে তাহা পাপ। কেহই বলিতে পারিবেন না

যে, কোন কার্য্য দেশকালবস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়া পাপ বা পুণ্য। ফল ভোগেই পাপ পুণ্যের, সুখদুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত অগ্নি হইতে বালকের গাত্রে উত্তাপ না লাগে, সে পর্য্যন্ত অগ্নিতে তাহার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু একবার কোন প্রকারে বালক অগ্নির উত্তাপ উপলব্ধি করিলে, কিছুতেই দীপ-শিখার দিকে তাহার অঙ্গুলি পরিচালিত করিবে না। কর্ম্মদ্বারাই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এই জ্ঞান এক জন্মে হয় না, ইহা বহুজন্ম-সুলভ। কোন পাপ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় যদি কাহার বিবেকে আঘাত না লাগে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মের দ্বারা তদ্বিষয়ে তাহার জ্ঞান লাভ হয় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত তাহার জ্ঞানলাভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সেই কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইবে না। কোন বালক হয়ত বারেক অঙ্গুলি দগ্ধ করিয়াই অগ্নির দাহিকা শক্তির জ্ঞানলাভ-পূর্ব্বক অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইল, অপর কোন বালক হয়ত পুনঃপুনঃ দগ্ধাঙ্গুলি হইয়াও অগ্নিস্পর্শ হইতে বিরত হইতেছে না; ইহার কারণ কেবল জ্ঞানের ইতর বিশেষ; একের পূর্ব্বজ জ্ঞান অপরের পূর্ব্বজাত জ্ঞান অপেক্ষা পরিপক্ক ছিল বলিয়াই একবার অগ্নিস্পর্শ করিয়াই দ্বিতীয়বার অগ্নিস্পর্শ করিবার সময়ে তাহার বিবেক প্রবুদ্ধ হইল, কিন্তু অপরের পক্ষে তাহা হইল না। এইরূপ কর্ম্মের দ্বারা ভোগ হইলেই আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টি হয়। অনেক অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে বৃদ্ধ মাতা পিতার বধ পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না, কেননা ঐ কার্য্যে তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে না; আবার অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সামান্য প্রাণীর জীবন ধ্বংসও পাপরূপে পরিগণিত হয়, কেন না পূর্ব্ব কর্ম্মদ্বারা তাহাদের জ্ঞান উন্নতি লাভ করিয়াছে। কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াই জ্ঞানের লাভ হয়, পাপ পুণ্য কর্ম্মের বিভিন্ন সংজ্ঞামাত্র। যে ব্যক্তির বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, সেই অবস্থায়, যে কার্য্য দ্বারা তাহার আত্মবিকাশের বিঘ্ন হয়, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ এবং যাহা আত্মবিকাশের অনুকূল তাহাই তাঁহার পক্ষে পুণ্য। বর্ত্তমান সুসভ্য মানব সমাজের জ্ঞানের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে পরদারাভিমর্ষণ পাপ, কিন্তু মানব সমাজের একদিন এরূপ অবস্থা ছিল, যখন উহাতে পাপ ছিল না। যাহার জ্ঞানের যে অবস্থা, ঐ অবস্থা হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে হইলে যে কার্য্য করা আবশ্যক, তাহাই পুণ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থা হইতে যে কার্য্য দ্বারা নিম্নাভিমুখে গতি হয়, তাহাই পাপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মের নিম্নবিকাশেই জগতের উৎপত্তি; নিম্নতর স্তর হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে আরোহণ করিতে করিতে জীব যখন সর্ব্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করে, তখনই তাঁহার মুক্তি হয়। এই মুক্তিই বা সম্পূর্ণ আত্মবিকাশই মানব জীবনের উদ্দেশ্য, এবং প্রত্যেক জীবের অবস্থানুসারে যে সমুদয় কার্য্যে তাহার মুক্তির অন্তরায় ঘটে, তাহাই তাহার পক্ষে পাপ, এবং যাহাতে মুক্তির অনুকূলত হয়, তাহাই তাহার

পক্ষে পুণ্য বলা যায়। আত্মপ্রসার বা মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। যদি প্রত্যেক মানবই তাহার পূর্ব্ব-কর্ম্ম লব্ধ-জ্ঞানদ্বারা প্রবুদ্ধ বিবেকের শাসনাধীন হইয়া এই ভবসাগরে স্বীয় জীবনতরী পরিচালিত করে, তাহা হইলে সে প্রতিকূল বায়ু ও স্রোত প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেই হইবে। জীবের গন্তব্য স্থান এক; যে যতটুকু অগ্রসর হইয়া রহিয়াছে, সেই স্থান হইতে ঐ গন্তব্য স্থান লক্ষ্য করিয়া তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু সকল যাত্রীরই তিনটি ঘোর শত্রুর কথা সর্ব্বদা স্মৃতিপটে জাগরূক রাখিতে হইবে। এই তিনটি শত্রুই কাম, ক্রোধ ও লোভ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন "ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামং ক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

এইক্ষণে চিন্তা করা আবশ্যক যে, কাম কি প্রকারে আত্মনাশ বা আত্মসঙ্কোচের কারণ হইল? সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আত্মপ্রসার বা আমিত্বের প্রসার। যখন সর্ব্বত্র আত্মার দর্শন না হয় বা ভেদজ্ঞান থাকে, তখনই আমিত্বের সঙ্কোচ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তির জন্য চিত্তে বাসনা হয়, তখনই আমরা কাম বা বাসনারাজ্যের প্রকৃতিত্ব স্বীকার করি। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিতেই যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তাহার হৃদয়ে কখনও পরহিতচিন্তার উদয় হইতে পারে না। গো, অশ্ব, যান, গৃহ, বসন, ভূষণ, দাস, দাসী, কামিনী ইত্যাদি বিলাসের উপকরণ। বিলাসী যখন পরের দিকে না তাকাইয়া, স্বীয় বিলাস সম্ভোগার্থে ছলে, বলে, কৌশলে নানাবিধ বিলাস-উপকরণ আহরণ করেন, তখন তিনি ভেদজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়েন। তখন তিনি আপনাকে অন্য হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া দ্বৈত-ভ্রম-পাশে আবদ্ধ হইয়া অদ্বৈত-সুধা হইতে বঞ্চিত হয়েন। নিম্নস্তর হইতে ঊর্দ্ধস্তরে আরোহণ করিতে গেলে, জড়ের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যের রাজ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, দেহ ছাড়িয়া আত্মাকেই লক্ষ্য করিতে হইবে, এবং দেহারাম না হইয়া আত্মারাম হইতে হইবে। দেহেরও কিন্তু আত্মার বিকাশের জন্য প্রয়োজন, কারণ দেহেই জীবাত্মা বিবিধ প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে পরমাত্মায় লীন হয়েন। সুতরাং বাসনা বা কাম ততদূর প্রয়োজনীয়, যতদূর দেহরক্ষার জন্য আবশ্যক। ঐ সীমা পর্য্যন্ত বাসনা বা কাম কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণনীয় এবং ঐ সীমা পরিত্যাগ করিলেই বাসনা বা কাম যথার্থ বাসনা বা কাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়া থাকুক, অমৃতত্ব-তীর্থাভিমুখে যে যতদূর অগ্রসর হইয়া থাকুক, দেশকাল-জ্ঞানভেদে যাহার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং যাহার যেরূপ সামাজিক আচার ব্যবহার হইয়া থাকুক না কেন, সকল অবস্থাতেই জড়কে চৈতন্যের অধীন রাখিতে হইবে, এবং তাহা করিতে হইলেই কামকে জয় করিতে হইবে, এবং উহা যে পর্য্যন্ত না করা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমিত্বের প্রসার দুরাশা মাত্র। আত্মবিকাশের জন্য কামের ন্যায়

ক্রোধও পরিহার্য্য। একজনের অন্যায় আচরণ দেখিলে তাহাকে সংশোধিত করিবার ইচ্ছায়. তাহার প্রতি কোপপ্রকাশ করা উপরোক্ত ক্রোধের অর্থ নহে। দয়াবিহীনতাই এস্থলে ক্রোধের অর্থ। বলবান দুর্ব্বলের প্রতি, ধনী দরিদ্রের প্রতি, জ্ঞানী মূর্খের প্রতি, রাজা প্রজার প্রতি, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে নৃশংসব্যবহার করেন, তাহাই ক্রোধ পদবাচ্য। পতিতের প্রতি অনুকম্পা নাই, সে মৃত্তিকায় পড়িয়া ধূলিধূসরিত হইতেছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করিলাম, যেহেতু আমি বলবান। কবে কস্মিন্‌কালে কেহ আমার সামান্য অনিষ্ট করিয়াছে, আমি আমরণ তাহা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলাম, কখনও বিস্মৃত হইলাম না। আমিত্ব সঙ্কোচ করিয়া নিজেতেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম, জগৎ পৃথক পৃথক দেখিতে লাগিলাম, অব্যয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কোচভাব অবলম্বন করিলাম। ক্রোধও কামের ন্যায় আত্মপ্রসারবিরোধী। উভয়ের মূলেই দূষণীয় দ্বৈতজ্ঞান। লোভ ও কাম এবং ক্রোধজাতীয়। ভেদজ্ঞান হইতেই সর্ব্বগ্রাসিনী প্রবৃত্তি হয়। সকলই আমার হউক, অপরের কিছুই না থাকুক, ইহাই লোভ। লোভও আমিত্বের প্রসারের বিষম অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া থাকে। এই আমিত্বের প্রসার লাভ করিতে হইলে, কাম ক্রোধ লোভ এই তিনটিরই সম্যগ্‌ভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্যক। এই জন্যই প্রজাপতি দেবতা মনুষ্য অসুরদিগকে কাম ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। "ত্রয়ঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমূষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টা ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্থেত্যোমিতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি।

অথ হৈনমসুরা উচুর্ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি ব্যজ্ঞাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্থেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজ্ঞাসিষ্টেতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতিঃ।

প্রজাপতির তিন পুত্র—দেবতা, মনুষ্য এবং অসুর, পিতৃসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেবতারা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা বুঝিলে?" তাঁহারা বলিলেন, আমরা বুঝিয়াছি, আপনি 'দাম্যত' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন কর এই উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐরূপ মনুষ্যেরা প্রজাপতির নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে "বুঝিলে" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে বুঝিয়াছি, আপনি "দত্ত" অর্থাৎ "দান কর" এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমরা বুঝিয়াছ"। ঐ প্রকার অসুরেরা তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি 'দ' এই অক্ষর দ্বারা উপদেশ দিলেন এবং

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "বুঝিয়াছ" তদুত্তরে অসুরেরা বলিলেন যে, বুঝিয়াছি—আপনি 'দয়ধ্বং' অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন, তিনি বলিলেন "হাঁ তোমারা বুঝিয়াছ।" প্রজাপতির উপদেশের মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রিয় সংযমকর, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিও না। লোভ পরিত্যাগ কর, সকলই নিজে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিও না, পরকেও দান কবিও। ক্রোধ পরিত্যাগ কর এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। হিংসাবৃত্তি হৃদয়ে পোষণ করিও না। যাঁহারা এই তিন মহাশত্রুকে পরাজিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা মর্ত্তভূমে দেবতুল্য। কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।

জীবনী-শক্তি।

কি ব্যক্তিগত জীবনে কি জাতিগত জীবনে কোন একটি বিশেষ শক্তির স্ফুরণ না হইলে, উহা নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ শক্তি বিকাশিত করিতে পারিলে, অন্যান্য শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে। স্রোতস্বতী নদী যেরূপ নানাবিধি পদার্থ স্বীয় বক্ষে ধারণ করা সত্ত্বেও আবিলতা প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু স্রোতোবিরহিত হইলেই অতি সামান্য আবর্জ্জনাতেই কলুষিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ কি ব্যক্তিগত জীবন, কি জাতীয়জীবন, যে পর্য্যন্ত উহাতে জীবনী শক্তি থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা নির্ম্মল ভাবে প্রবাহিত হয়; এবং ঐ জীবনী শক্তির হ্রাস হইলেই, উহার নির্ম্মলতা আর থাকে না। বেগ না থাকিলেই নদীতে শৈবালাদি জন্মে, কিন্তু বেগবতী নদীতে কখনও উহা দৃষ্ট হয় না; ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনও ঐ প্রকার।

জীবন সবেগ হয় কিসে? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, স্থির লক্ষ্যই জীবনের বেগবত্তার কারণ; যে জীবনে লক্ষ্য নাই, সে জীবন শৈবালপূর্ণ স্রোতোহীন নদীর ন্যায়। মানবজীবনের বহুবিধ লক্ষ্য হইতে পারে; ধন, জ্ঞান, ধর্ম্ম স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কোন না কোন লক্ষ্যে জাতীয় জীবন পরিচালিত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই দৃষ্ট হয় যে, এক একটি জাতি, এক একটি বিশেষ লক্ষ্য স্থির করিয়া, তদুদ্দেশ্যে ধাবমান হওয়ায়, অন্যান্য শক্তিরও অধিকারী হইয়াছে। ধনশক্তিই যদি কোন জাতির লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে, তাহা হইতে যে জীবনী শক্তি উৎপন্ন হয়, [illegible]রাই ক্রমশঃ অপরাপর শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে; তদ্রূপ বিদ্যাশক্তি যদি কোন[illegible]র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ঐ একমাত্র লক্ষ্যাভিমুখে গমন করিয়াই, সেই জাতি অ[illegible] শক্তি আয়ত্তাধীন করিতে পারে; ঐরূপ ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম জীবনের লক্ষ্য হই[illegible] বিদ্যাদি অন্যান্য শক্তিও

অনায়াসে লব্ধ হইয়া থাকে। মূল কথা—ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ, জাতীয় জীবনেও তদ্রূপ একটি লক্ষ্য স্থির করা বিধেয়। ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই "ইসলাম" ধর্ম্মাবলম্বীরা একদিন পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই তাহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়েও ইদানীন্তন সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের পর্য্যন্ত নেতৃ-স্বরূপ হইয়াছিল। একমাত্র ধর্ম্ম তাহাদের লক্ষ্য থাকাতেই এই বিপুল স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি তাহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। ধনই বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতির লক্ষ্য এবং ঐ ধন লক্ষ্য করিয়াই, তাহারা অদ্য সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের আধার এবং তাহাদের ধনশক্তিতেই অদ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের স্বীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। ধনৈষণাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন, ধনৈষণাতেই ভাস-কেডিগমা ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্বদেশপ্রেম হেতুই প্রাচীন গ্রীক ও রোম সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, এবং অদ্যাপিও তাহার ইউরোপীয় তাবৎ জাতির সর্ব্ব বিষয়ে শিক্ষকরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। প্রাচীন আর্য্যেরা কোন্ শক্তিদ্বারা বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, এস্থলে তাহা আলোচ্য নহে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের কোন স্থির লক্ষ্য আছে কি না, তাহা স্বদেশ হিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই সম্যক পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি? ধন, বিদ্যা, ধর্ম্ম বা স্বদেশপ্রেম? জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা বা অন্যান্য ইউ-রোপীয় জাতির ন্যায় আমাদিগের জাতীয় জীবনে কি কোন বিশেষ লক্ষ্য আছে? ভারতবর্ষীয় হিন্দু জাতির ধনৈষণা কোথায়? পরদেশে বাণিজ্য করা দূরে থাকুক স্বদেশের বাণিজ্যও পরহস্তগত। শিল্প কৃষির দিন দিন অধোগতি হইতেছে; যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে যে, আমাদের ধনৈষণা নির্জ্জীবভাব অবলম্বন করিয়াছে। গঙ্গাবক্ষে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত গমনাগমন করিতেছে, তাহার একখানিও ভারতবাসীদের নহে; ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সহস্র সহস্র চা-বাগান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তেরই সত্ত্বাধিকারী বিদেশীয়গণ। কল কারখানা, রেল প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই বিদেশীয়গণের হস্তে। যদি হিন্দু জাতির প্রবল ধনৈষণা থাকিত, তাহা হইলে দেশের কখনও এতাদৃশ দুরবস্থা হইতে পারিত না। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, "আমাদের ধনৈষণা না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের জ্ঞানৈষণা আছে"। কিন্তু কৈ? তাহাই বা কোথায়? ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জ্ঞানৈষণার যাদৃশ জলন্ত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়, ভারতবর্ষের কুত্রাপি তাহার শতাংশের একাংশও লক্ষিত হয় না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির গবে-ষণায় আমাদিগের মধ্যে কয়জন স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন? কিন্তু পাশ্চাত্য প্রদেশে শত শত ব্যক্তি ধন-স্পৃহা বর্জ্জিত হইয়া, মাত্র জ্ঞানের সেবাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করেন। ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের এই এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম যে, কোন এক

শক্তি বর্দ্ধিত হইলে, অপরাপর শক্তি স্বতই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে জাতির ধনৈষণা শক্তি প্রবুদ্ধ, সেই জাতির মধ্যেই এমন সহস্র সহস্র লোক দৃষ্ট হয় যে, যাঁহারা ধন লালসায় কখনও বিচলিত হয়েন না। ভোগই ত্যাগের মূলে, যাহার যাহা নাই, সে তাহা ত্যাগ করিবে কি প্রকারে? আমরা যে কিছু জ্ঞান আলোচনা করি, তাহার মূলে না ধন, না জ্ঞান; তাহার মূলে স্বাবলম্বনের অভাব; কোন প্রকারে কায়ক্লেশে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। আমাদের জ্ঞান চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য পরসেবা, কেননা পরসেবায় স্বাবলম্বনের প্রয়োজন নাই। প্রভু যাহা আদেশ করিলেন, তাহা পালনপূর্ব্বক নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিলাম। তৎপরে বর্ত্তমান হিন্দুদের অন্তঃকরণে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকিলে সহস্র সহস্র লোক কখনও প্রলোভন কিম্বা বলের দ্বারা ধর্ম্মবিচ্যুত হইতে পারিত না। যে জাতির মধ্যে জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, সে জাতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, হয় স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, কিম্বা স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়। মুসলমান বলের নিকট পরাভূত হইয়াই অগ্নি-উপাসক পারসীকেরা ইরাণ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আইসেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস না থাকিলে তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মই গ্রহণ করিতেন। জ্বলন্ত ধর্ম্ম বিশ্বাস থাকাতেই পিউরিটানেরা স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সহস্র সহস্র হিন্দু সন্তান ঐহিক সম্পদের জন্য অনায়াসে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাতে কি হিন্দুদের ধর্ম্মের জ্বলন্ত বিশ্বাস সূচিত হইল? কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় শতকরা নব্বই জন মুসলমান দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ মুসলমান, ইহারা সকলেই হিন্দু সন্তান। হিন্দু সন্তানের ধর্ম্মে জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিলে, কখন এমন হইতে পারিত না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে যে জ্বলন্ত বিশ্বাস ছিল না, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়; কিন্তু এখনই কি আমাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস আছে? আমার ত বোধ হয়, প্রলোভনে না হউক, অতি সামান্য বল প্রয়োগ করিলেই আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বী করাইতে পারেন। আমরা যে আমাদের ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করি নাই, ইহাতে আমাদের তত প্রশংসা নাই, প্রশংসা যাহা, তাহা আমাদের রাজপুরুষদের।

স্বদেশপ্রেমের অনেক কথা আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু কথা ব্যতীত কার্য্যে কিছুরই নিদর্শন পাই না। স্বদেশপ্রেমের যে কিছু পরিচয় পাই, সে কেবল বক্তৃতায়, বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে উহা আকাশে মিশিয়া যায়। জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকিলে আমাদের মধ্যে এত গৃহ-বিচ্ছেদ, এত দ্বেষ-হিংসা,, এত সাম্প্রদায়িক বা এত বর্ণগত সঙ্কীর্ণতা কখনই

থাকিতে পরিত না। স্বদেশপ্রেম বলিলে মৃত্তিকাকে ভালবাসা বুঝায় না, স্বদেশবাসীদের প্রতি ভালবাসা চাই; আমাদের দেশে সাধারণের জন্য কয়জনের প্রাণ কাঁদে? কয়জনে আমাদিগের মধ্যে পতিত উদ্ধার করিতে প্রস্তুত? আমাদের সার্ব্বজনিক প্রেম কোথায়? ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে স্পর্শ করেন না, চণ্ডাল ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। শিক্ষিত আখ্যাধারী ব্যক্তিদিগের মধ্যেও [illegible] ভাব পরিদৃষ্ট হয়; বাক্যে সকলি সকলের মিত্র, কিন্তু কার্য্যকালে [illegible]। সুতরাং যাহাতে জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, আমাদের এমন কিছুই নাই। আমাদের না আছে ধন-পিপাসা, না আছে জ্ঞান-পিপাসা, না আছে ধর্ম্ম-পিপাসা, না আছে স্বদেশপ্রেম; সুতরাং আমাদের জীবনীশক্তি আসিবে কোথা হইতে? যে ভাবে আমরা বর্ত্তমানে চলিতেছি, তাহাতে ভবিষ্যতে যে আমাদের জীবনীশক্তি হইবে, তাহারও কোন নিদর্শন পাই না। বর্ত্তমানে হিন্দু জাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, সেটি "অনুকরণ"। আমরা মৌলিকতা পরিত্যাগ করিয়া বড়ই অনুকরণপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের যে অনুকরণ, তাহা কেবল বিদেশীয়গণের অসদ্‌গুণের মাত্র, সদ্‌গুণের নয়। ইংরাজদিগের চরিত্রে যে সমুদয় সদ্‌গুণ আছে, আমাদের তাহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কিন্তু তাহাদের যে সকল দোষ, আমরা অগ্রেই তাহা অভ্যাস করিয়া বসিয়া আছি। এইরূপ আমাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা পাশ্চাত্য চরিত্রের দোষ সমষ্টি-মাত্র। জাতীয়জীবন গঠিত করিতে হইলে যে সমুদয় উপাদানের প্রয়োজন, আমাদের তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই; তৎপর ঐ জাতীয় জীবন কীদৃশ লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান করিতে পারিলে উহাকে বেগবান্ করা যাইতে পারে, তাহাও আমরা কখন আলোচনা করি না। হিন্দু-সম্প্রদায়কে বর্ত্তমানে একটি জাতীয় সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে কি না, তাহাও বিবেচ্য। হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে সাধারণত্ব কি আছে? কেন না সাধারণত্ব বা সামান্যই জাতির জ্ঞাপক। সমান বংশই অনেক সময় জাতির জ্ঞাপক হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক যখন বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা একই পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি, তখন তাঁহারা বস্তুতঃ এক পূর্ব্বপুরুষের সন্ততি হউন বা না হউন, ঐ বিশ্বাসহেতু পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট হয়েন। শাস্ত্রার্থবিপর্য্যয়ে হিন্দুজাতীর যেরূপ উৎপত্তি, সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয়, তাহাতে পরস্পরের প্রতি যে ভ্রাতৃভাবের উদ্রেক হওয়ার কতদূর সম্ভাবনা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এক জনকে যদি আমি বলি যে আমি মস্তক এবং সে আমার চরণ তাহা হইলে চরণ যে মস্তককে কিরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে, তাহা বুঝা দায়। এক বংশসম্ভূত না হইয়াও একরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনেক সময়ে জাতীয়তা গঠিত হয়। মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীরা বিভিন্ন জাতি হইয়াও এবং বিভিন্নদেশে বাস করিয়াও একজাতি; "আল্লা হো আকবর" বলিলে পৃথিবীস্থ তাবৎ মুসলমানেরই হৃদয়তন্ত্রী এক সুরে বাজিয়া উঠে; কিন্তু এক

প্রদেশস্থ হিন্দুরা হয়ত অপর প্রদেশস্থ হিন্দুর দেবদেবীর নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। বিঠবা বা বিঠল বলিলে বাঙ্গালী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীরা ইহারই উপসনা করেন। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনের বিশেষ অন্তরায়। ভাষারও একতা নাই। যখন দেশে সংস্কৃত ভাষার আদর ছিল, তখন বিভিন্ন প্রদেশস্থ পণ্ডিত গণই কেবল পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। ইংরাজী ভাষা এদেশে প্রচলিত হওয়ায়, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে যদিও ভাষাগত বৈষম্য অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে, তথাপি সাধারণ্য পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারে না। ধর্ম্ম ভাষা ও বংশ—এই তিনটিই জাতীয় জীবনের একতা সংস্থাপনের প্রধান উপাদান; কিন্তু আমাদের এই তিনটিরই অভাব। সুতরাং জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের একই ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং একই ভাষা হওয়া চাই; এবং আমরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহাও সাধারণের মনে ধারণা করান আবশ্যক, কিন্তু এ দিকে কাহার বড় দৃষ্টি দেখি না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যদি এক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত হয়, তাহা হইলে, ভাষাগত বৈষম্য কালে ধ্বংশ হইতে পারে এবং সর্ব্বত্রই উপনিষদাদিষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত করিতে পারিলে কালে ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইতে পারে। ভাষাগত ও ধর্ম্মগত সাম্য সংস্থাপিত হইলে ঐ জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্ত্যনুযায়ী কোন লক্ষ্য স্থাপন করিয়া সেই দিকে চালাইতে পারিলেই জাতীয় জীবনে জীবনীশক্তির সঞ্চার করা যাইতে পারে। হিন্দু-পত্রিকায় এ বিষয়ের বহুল আলোচনা দেখিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব।

হিন্দু-পত্রিকার কোন পাঠক।

লেখকের সহিত আমরা সর্ব্ববিষয়ে এক মত না হইলেও, তাঁহার প্রবন্ধে এমন অনেক গুরুতর বিষয় আছে যাহার আলোচনা হিন্দুসমাজের হিতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হিঃ, পঃ, সঃ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১১

নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং।
এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে॥

অন্বয়ঃ। যোগে (ক্রিয়মাণে) নীহার-ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং। খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি রূপাণি, ব্রহ্মণি অভিব্যক্তিকরাণি (সন্তি) পুরঃসরাণি

(ভবন্তি) যথা—যোগে (বিধীয়মানে) নীহার ধূম-অর্ক-অনিল-অনলানাং, খদ্যোত-বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং (চ) এতানি অভিব্যক্তিকরাণি পুরঃসরাণি রূপানি আবির্ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। যোগে—যোগ করণবেলায়াং যদা পরম যোগসিদ্ধেরুপক্রমো ভবতি তদা, যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরম যোগ সিদ্ধির উপক্রম হয় সেই সময়ে। নীহার-ধূমার্কানিলানলানাং—নীহারবৎ স্নিগ্ধা নির্ম্মলা চ চিত্তবৃত্তিঃ ভবতি, "ধূমঃ" ততঃ ধূম ইব আভাতি, ততঃ অর্ক ইব আভাতি, ততঃ বহ্নিরিব অত্যুষ্ণঃ বায়ুঃ প্রবহতি ইব। চিত্তবৃত্তি নীহারের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং নির্ম্মল হয়। তদনন্তর ধূমের ন্যায় আভা পরিদৃষ্ট হয়। অনন্তর সূর্য্যচ্ছায়ার ন্যায় তোজোরাশি লক্ষিত হয়। তৎপর অনলবৎ অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, এই সমুদয়ের রূপ এবং। খদ্যোৎ বিদ্যুৎ-স্ফটিক-শশিনাং—কখন কখন অন্তরীক্ষ খদ্যোত খচিতবৎ অনুভূত হয়, কখনও বা বিদ্যুদ্দাম বিকাশবৎ বোধ হয়, কখনও বা সুবিমল স্ফটিক প্রভা লক্ষিত হয়, আবার কখনও বা বোধ হয় যেন সম্মুখে পূর্ণশশী সমুদিত হইয়া বিশ্বভুবন উদ্ভাসিত করিতেছে, এই সমুদায়ের রূপ। ব্রহ্মণি—ব্রহ্ম-বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মের আবিষ্কার বিষয়ে। অভিব্যক্তি-করাণি, প্রথম ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পূর্ব্বাভাষরূপে। পুরঃসরাণি—অগ্রগামীনি অগ্রগামী অর্থাৎ প্রথমচিহ্ন স্বরূপ, আবির্ভূত হয়।

বঙ্গার্থ। যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন পরমযোগসিদ্ধির উপক্রম হয়, তখন চিত্তবৃত্তি নৈশনীহারবৎ নির্ম্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইতে থাকে, তৎপর ধূমপুঞ্জের আভার ন্যায় বিশ্বভুবন ধূমায়মান বলিয়া প্রতীতি হয়, এবং তদনন্তর সূর্য্যচ্ছায়াসদৃশ তোজোরাশি পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ অতীব উষ্ণ বায়ু প্রবাহ অনুভূত হয়, বোধ হয় যেন জগতে জ্বালাময় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। কখনও বা আকাশ মণ্ডল খদ্যোত খচিত, কখনও বা তড়িদ্ বিস্ফুরিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আবার কখনও বা স্বচ্ছ স্ফটিক প্রভায় জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত বলিয়া অনুভব হয়, কখনও বা, পুরোভাগে পূর্ণচন্দ্রের পীযূষময়ী অমৃতধারা প্রস্রবিণী বিমল কৌমুদী আলোকিত হইয়া যোগনিরত প্রণিহিত-চিত্ত সাধকের যোগসাধনার লক্ষ্যীভূত ব্রহ্মাবির্ভাবের পূর্ব্বাভাষ প্রদান করে। সাধক ব্রহ্মপ্রকাশের পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ এই সমুদয় বিস্ময়জনক মনোবিনোদন সুখদৃশ্য দর্শনে, বিহ্বল হইয়া বহির্বিষয়নির্লিপ্ত থাকিয়া অচিরেই তৎপদ প্রাপ্ত হয়েন।

১২

পৃথ্ব্যপ্তেজোঽনিলখে সমুত্থিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্॥

অন্বয়। পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ-অনিল-খে সমুত্থিতে (সতি), পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে (সতি), যোগাগ্নিময়ং শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য (সাধকস্য) রোগো (ন তিষ্ঠতি) জরা (ন তিষ্ঠতি) দুঃখং (ন তিষ্ঠতি)।

বিশেষ ব্যাখ্যা। পৃথ্বী-অপ্-তেজঃ অনিল খে—সমুত্থিতে সতি (অত্র দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন নির্দ্দিষ্টত্বে।) ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম, এই পঞ্চভূত সমুত্থিত হইলে অর্থাৎ ইহাদের যথার্থ যোগজ্ঞান হইলে। পঞ্চাত্মকে—ক্ষিত্যাদি-পঞ্চভূতোৎপন্ন। যোগগুণে প্রবৃত্তে সতি—যোগের গুণ প্রবৃত্ত হইলে পর, অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে গন্ধ, অপ্ হইতে রস, তেজঃ হইতে রূপ, অনিল হইতে স্পর্শ ও ব্যোম হইতে শব্দ এই সমুদয় পাঞ্চভৌতিকজ্ঞান প্রবৃত্ত হইলে। যোগাগ্নিময়ং—শরীরং প্রাপ্তস্য (সাধকস্য) যোগরূপ সর্ব্বকলুষদাহক অগ্নিময় শরীরধারী সাধকের।

বঙ্গার্থ। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম এই পঞ্চভূত বিষয়ক যোগজ্ঞান জন্মিলে এবং পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রবৃত্ত হইলে পর, সাধকের শরীর যোগরূপ অগ্নি-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়, তখন সাধক সেই পরম-দ্যুতি যোগদেহ প্রাপ্ত হন, তাঁহার শরীর নিহিত যাবতীয় দোষরাশি ঐ অনলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। যোগদেহধারী সাধক চিরদিনের জন্য আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ বিপদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তাঁহার রোগ, জরা এবং দুঃখ চিরতরে যোগানলে দগ্ধীভূত হয়। এতাদৃশ যোগ প্রবৃত্তির মধ্যে যদি সমস্তগুলি না হইয়া কাহারও কোন একটি মাত্র জন্মে, তবে তাহাকে প্রবৃত্ত যোগ বলা যাইতে পারে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা। গন্ধবত্যপরা প্রোক্তা চতস্রস্তু প্রবৃত্তয়ঃ॥ আসাং যোগ প্রবৃত্তীনাং যদ্যেকাপি প্রবর্ত্ততে। প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগ-চিন্তকাঃ।

১৩

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ।
গন্ধঃ শুভো মূত্র-পুরীষমল্পং যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি॥

অন্বয়। (যোগতত্ত্ববিদঃ) লঘুত্বম্, আরোগ্যম্, অলোলুপত্বম্, বর্ণপ্রসাদঃ, স্বরসৌষ্ঠবং শুভোগন্ধঃ, অল্পং মূত্রপুরীষং চ (ইত্যেতানি) প্রথমাং যোগপ্রবৃত্তিং বদন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা। অলোলুপত্বম্—লোভরাহিত্যাম্ অভিলাষশূন্যত্বমিতি ভাবঃ, নিরভি-লাষতা। বর্ণপ্রসাদঃ—বর্ণৌজ্জ্বল্যম্, বর্ণের উজ্জ্বলতা, দ্যুতিমতী কান্তি। স্বরসৌষ্ঠবং—কণ্ঠস্বরমাধুর্য্যং নিয়ত-মধুরভাষিত্বমিতি ভাবঃ—সুমধুর স্বর, সর্ব্বদা মধুরভাষিতা। গন্ধঃ শুভঃ—প্রতিনিয়তং আঘ্রেয়ঃ গন্ধঃ প্রীতিপ্রদঃ ভবতি যদ্বা—শারীরিকং সৌরভং সততমতি প্রফুল্লং ভবতি, সর্ব্বদা প্রীতিপ্রদ গন্ধ আঘ্রাত হয়, অথবা শারীরিক গন্ধ অর্থাৎ সাধকের দেহ সৌরভ সতত অতি প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্গার্থ। প্রবৃত্তযোগ সাধকের শরীরের লঘুতা, রোগশূন্যতা, নিরভিলাষতা, কান্তি-মত্তা, স্বরমধুরতা সুপরিমলতা ও মলমূত্রের অল্পতাকেই যোগতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যোগের প্রথম প্রবৃত্তি অর্থাৎ ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির সর্ব্ব

প্রথমে এই সমুদয় লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই লক্ষণসমূহ দ্বারাই যোগনিরত সাধকের অপার্থিব সুখের বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

১৪

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্বাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ॥

অন্বয়। যথা (প্রাক্) মৃদয়া উপলিপ্তং বিম্বং (পশ্চাৎ) সুধান্তং (সুধৌতং) [সৎ] তৎ তেজোময়ং ভ্রাজতে, তদ্ বা আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য একঃ দেহী কৃতার্থঃ বীতশোকঃ (চ) ভবতে (ভবতি ইত্যর্থঃ)

বিষম পদব্যাখ্যা। বিম্বং—সৌবর্ণরাজতাদিকং, সুবর্ণরজত প্রভৃতি সমুজ্জ্বল পদার্থ। মৃদয়া—মৃত্তিকয়া, মাটিদ্বারা। উপলিপ্তং—মলিনীকৃতং মলিনীকৃত। সুধান্তং—সুধৌতং, (সুধান্তমিতি ছান্দসং।) তদ্বা—তদ্বৎ, সেই প্রকার। ভবতে, ভবতি (অত্রাপি আত্মনেপদিত্বং ছান্দসং) হয়। বীতশোকঃ গতশোকঃ শোকবিমুক্তঃ ইতি ভাবঃ, শোক বিমুক্ত।

বঙ্গার্থ। যেমন সুবর্ণাদি সমুজ্জ্বল ধাতুখণ্ড প্রথমতঃ মৃত্তিকালেপনদ্বারা মলিনীকৃত হইলেও পশ্চাৎ সুধৌত করিলে অর্থাৎ তাহা জলে বা অনলে পরিষ্কৃত করিলে পুনরায় তাহা সমুজ্জ্বল দেখায়, সেইরূপ সংসারতাপ-মলিন মানবগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা আত্মরহস্য অবগত হইয়া সমস্ত শোকতাপ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন। তাঁহাদের যাবতীয় মালিন্য আত্মদর্শনরূপ অনলে হুত হয়। অর্থাৎ একমাত্র আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাই দুর্লভ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া সুদুর্লভ মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনপূর্ব্বক কৈবল্য পথের পথিক হইতে সমর্থ হয়েন।

১৫

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধম্ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

অন্বয়।—যদা তু যুক্তঃ (সাধকঃ) ইহ দীপোপমেন আত্মতত্ত্বেন ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপশ্যেৎ। তদা (সঃ) অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশৈঃ মুচ্যতে॥

বিষম পদব্যাখ্যা। যদা—যস্যাং অবস্থায়াং, যে অবস্থায়। যুক্তঃ—যোগযুক্ত সাধক। ইহ—অত্র। দীপোপমেন—দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ নিবাতনিষ্কম্পেন, দীপস্থানীয় প্রকাশস্বরূপ নিবাতনিষ্কম্প অর্থাৎ স্থির নির্ম্মল এবং জ্ঞানালোকময়। আত্মতত্ত্বেন—আত্মজ্ঞানেন, আত্মজ্ঞানদ্বারা অথবা আত্মাদ্বারা। ব্রহ্মতত্ত্বং পরমাত্মস্বরূপং, পরমাত্মারস্বরূপ। প্রপশ্যেৎ—প্রকৃষ্টভাবেন দ্রষ্টুং শক্নুয়াৎ, প্রকৃষ্টভাবে দেখিতে সমর্থ হয়। ধ্রুবং—অপ্রচ্যুত স্বরূপং, সনাতন। সর্ব্বতত্ত্বৈঃ বিশুদ্ধং—অবিদ্যাতৎকার্য্যৈঃ, অপরামৃষ্টং, অবিদ্যা এবং তৎ

কার্য্যদ্বারা অপরামৃষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধতাজনিত মায়াবিরহিত। সর্ব্বপাশৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ—পাশস্বরূপ অবিদ্যা প্রভৃতি দ্বারা।

বঙ্গার্থ। যখন যোগযুক্ত সাধক, দীপবৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, সেই সময়ে তিনি সনাতন অক্ষর অবিদ্যাস্পর্শদোষ-শূন্য সর্ব্বতত্ত্বাতীত পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্ববিধ সংসার পাশ হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

জ্ঞানদ্বারা যে সময়ে সাধকের "আমিই পরব্রহ্ম" এতাদৃশ অভেদবুদ্ধি সঞ্জাত হয়, সেই সময়ে তিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। এবম্বিধ জ্ঞানবান্ মহাত্মাকে আর সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয় না। তাঁহার জ্ঞানরূপ সুতীক্ষ্ণ অসিধারার নিশিত মুখে, সর্ব্বপ্রকার পাশ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়, তিনি চিরদিনের মত মুক্তিলাভে কৃতার্থ হয়েন।

১৬

এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ।
স বিজাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥

অন্বয়। এষঃ হি দেবঃ (পরমাত্মা) প্রদিশঃ অনু সর্ব্বাঃ (উপদিশশ্চ।) স হি পূর্ব্বঃ জাতঃ, স উ (এব) গর্ভে অন্তঃ (বর্ত্তমানঃ।) স বি (এব) জাতঃ, স জনিষ্যমাণঃ। (স) সর্ব্বতোমুখঃ (সন্) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—নিশ্চয়ে। প্রদিশঃ—প্রাচ্যাদাঃ দিশঃ, পূর্ব্ব প্রভৃতি দিক্ সমূহ। অনু সর্ব্বাঃ—অগ্নি প্রভৃতি অন্যান্য উপদিকসমূহ। পূর্ব্বঃ জাতঃ—হিরণ্যগর্ভ-রূপেণ সর্ব্বপ্রথমং সংবভূব, হিরণ্য-গর্ভরূপে সর্ব্বপ্রথমে সম্ভূত হইয়াছিলেন। স উ গর্ভে অন্তঃ—তিনি গর্ভের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান। স জাতঃ—তিনি শিশুরূপে জন্ম গ্রহণ করিতে-ছেন। স জনিষ্যমাণঃ—তিনিই উত্তরকালে জন্মগ্রহণ করিবেন। সর্ব্বতোমুখঃ—সর্ব্ব-প্রাণিগতানি মুখানি অস্য ইতি সর্ব্বপ্রাণিগতঃ। জনান্ প্রত্যঙ্—সর্ব্বেষাং জনানাং (অত্র জনপদং সর্ব্বপ্রাণিপরং) পশ্চাৎ; সর্ব্বপ্রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ।

বঙ্গার্থ। আত্মতত্ত্বদ্বারা পরমাত্মাকে জানিতে হইবে, এই পূর্ব্বানুশাসন বাক্য স্মরণ করিয়া তৎপ্রকার বর্ণনা করিতেছেন।

এই পরমদেব পরমাত্মাই পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ এবং অগ্নি প্রভৃতি উপদিকসমূহ। অর্থাৎ ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বদিকে বিরাজ করিতেছেন। ইনি সকলের আদি, কেননা ইনিই সর্ব্ব প্রথমে হিরণ্য-গর্ভরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইনিই সকলের গর্ভে বর্ত্তমান আছেন, জগতে যাহা কিছু উৎপন্ন হউক না কেন, তৎসমস্ত ইহার অবান্তররূপ। ইনিই শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছেন এবং উত্তরকালে এই পরমাত্মাই জন্মপরিগ্রহ করি-বেন। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রাণিগত হইয়া বিশ্বস্থ তাবৎ জনের পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই বিশ্বভুবনে ইনিই আদি এবং ইনিই অন্ত, ইনিই উৎপাদ্য এবং ইনিই উৎপাদিত। ইনিই কর্ত্তা এবং ইনিই কর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত এজগতে অন্য কিছুই নাই। একমাত্র ইনিই সৎ, যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি বা করি, তৎসমস্তই এই পরম দেব পরমাত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই প্রকার চিন্তাদ্বারা আত্মায় পরমাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

১৭

যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

অন্বয়। যঃ দেবঃ অগ্নৌ, যঃ অপ্সু, যঃ বিশ্বম্ ভুবনং আবিবেশ, যঃ ওষধীষু, যঃ বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ॥

বিষম পদব্যাখ্যা। সুগমা।

বঙ্গার্থ। নমস্কারাদিও যোগসাধনাদিবৎ অবশ্য বিধেয়। তাই নমস্কৃতি বিহিত হইতেছে। যে পরমদেবতা অগ্নির তেজঃস্বরূপ, যিনি সলিলের শৈত্যস্বরূপ, যিনি এই অখিল ভুবনপরিসর সংসার মণ্ডপের আশ্রয়দণ্ডস্বরূপ, যিনি শস্যাদি ওষধীনিকরে এবং অশ্বত্থাদি বনস্পতিসমূহে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, সেই বিশ্বাত্মক ভুবমূনল পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি।

ইতি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরশ্রুতৌ দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতাভাস।

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তি ও সাধনা।

সাধনার মূলে ভক্তি; যাহার ভক্তি নাই, তাহার সাধনাও নাই, ভক্তিব্যতীত সাধনা হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত অনুরাগের নামই ভক্তি, অন্তরের নিভৃতস্থানে ইহার বসতি, প্রীতি ইহার সহচরী। যাহার প্রতি যাহার প্রগাঢ় অনুরাগ তাহার প্রতি তাহার অটল বিশ্বাস, তাহাতে তাহার অতুল আনন্দ। অনুরাগের সামগ্রী অনুপস্থিত থাকিলেও, তাহার প্রতি চিহ্নেই প্রীতির উদ্রেক, তাহার প্রতি কার্য্য দর্শনেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ঘটিয়া থাকে; অতএব স্থূলতঃ তাহা অনুপস্থিত থাকিলেও

অর্থতঃ কদাচ অনুপস্থিত থাকিতে পারে না; অনুরাগবশতঃ চিত্ত তন্ময় হইয়া যাওয়াতে, তাহার প্রতি চিহ্নেই, তাহার প্রতি কার্য্যেই তাহাকে মানস নয়নে দেখিতে পাওয়া যায়; এবং অনুরাগ বশতঃ তাহারই সহিত কথোপকথনে ও তাহারই গুণানুবাদে পরম আনন্দ জন্মিয়া থাকে। যেখানে প্রকৃত অনুরাগ, সেই খানেই এইরূপ ভাবের অবতারণা। ঈশ্বরানুরাগও ভক্তের হৃদয়ে এই ভাবটী আনিয়া দেয়; ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরের সহবাসে কালযাপন করে; সৃষ্টির প্রতি কার্য্যেই তাঁহার প্রেমময় অস্তিত্বের উপলব্ধি করিয়া থাকে; একটী ভূতলশায়ী তৃণ হইতে গগন-বিহারী-জ্যোতির্ম্ময় দিবাকর পর্য্যন্ত সকল বস্তুতেই ঈশ্বরের প্রীতিময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পায়; নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তের হৃদয় আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, এবং সর্ব্বব্যাপী প্রেমিককে নির্জ্জনে পাইয়া, হৃদয়ের কপাট খুলিয়া প্রাণের কথাগুলি তাঁহাকে বলিতে থাকে। ইহারই নাম সাধনা, এ সাধনা ভক্তির কার্য্য। ইহাকে ভক্তি-যোগ বলে।

ভক্তিমার্গই ঈশ্বরকে পাইবার সুগম পথ; সে জন্য ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

"আমাতে মন একাগ্র করিয়া, সর্ব্বদা আমাতে যুক্ত থাকিয়া ও পরম শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ প্রধান যোগী।" দেহাভিমানী নরগণের পক্ষে অব্যক্ত নিষ্ঠা বা নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে, জ্ঞানের উৎকর্ষ ব্যতীত এরূপ উপাসনার অধিকার জন্মে না। নির্গুণের আবার উপাসনা কি হইবে? উপাসনা বা সাধনা সগুণেরই সাধ্য; ঈশ্বরকে বিশেষণযুক্ত না করিলে কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহার বিষয়ে কিরূপ ধারণাই বা করিব? হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের ধারণা সর্ব্বোৎকৃষ্ট; হিন্দুরা সগুণ ঈশ্বরের উপর নির্গুণ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়াছেন,—বৈদান্তিকেরা তাঁহাকেই তুরীয় চৈতন্য নামে অভিহিত করেন। এই নির্গুণ ব্রহ্ম গুণযুক্ত হইলেই ঈশ্বর পদবাচ্য হয়েন; এই সগুণ ঈশ্বর আবার নিরাকার ও সাকারভাবে উপাস্য। নিরাকারের উপাসনা সহজ নহে; ইহার প্রকৃত অধিকারী আধ্যাত্মিক জগতে অতি উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন; একমাত্র ঈশ্বরই তাঁহার চিত্তবৃত্তির বিষয়; তিনি নিষ্কাম, রাগদ্বেষবিহীন; তাঁহার ভক্তি উচ্চতম গ্রামে উপনীত হইয়া জ্ঞানশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। অতএব নিরাকারের উপাসনা সাধারণের পক্ষে বিহিত নহে; নিরাকারের সূক্ষ্ম ধারণা করিতে যাহার শক্তি নাই, সে "নিরাকারের উপাসনা করিতেছে" শুধু মুখে বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলে কি উপাস্যের কোন ছায়া পাইবে? কদাচ পাইবে না। উপাস্যের ধারণা

ব্যতীত উপাসকের ভক্তিবৃত্তি উত্তেজিত হয় না; হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত না হইলে উপাসনাও হয় না, ভক্তিহীন উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র।

পুষ্প যেমন প্রথম মুকুলিত হয়, পরে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত এবং ক্রমে পূর্ণ বিকসিত হইয়া ফলে পরিণত হয়, ভক্তিকুসুমেরও সেইরূপ ক্রমে পরিপাক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং শেষে পূর্ণ বিকসিত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ ভক্তি, তাহার উপাস্যও তদ্রূপ, তাহার ভজনাও তদনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে নিম্ন শ্রেণীর উপাসকদিগের নিমিত্ত বিগ্রহ-পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঈশ্বরের মনঃকল্পিত কোন মূর্ত্তি যতদূর সম্ভব হস্তে গঠিত বা পটে অঙ্কিত করিয়া, তদুদ্দেশে পূজা করা বিগ্রহ সেবার উচ্চাবস্থা। অনেকেই শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছ শোভিত বংশীধারী পীতবসন, নীরদবর্ণ বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এইরূপ বিগ্রহের উপাসনা করেন, তাঁহারা সাকার উপাসকদিগের মধ্যে অনেক উন্নত। এমন কি তাঁহারা সাকার উপাসনার উচ্চতম সোপানে পৌছিবার উপক্রম করিতেছেন। অব্যক্ত ঈশ্বরকে ব্যক্তভাবাপন্ন করিতে হইলে, এই বিশ্বরূপে তাঁহাকে ব্যক্ত দেখা সাকার-ধারণার সর্ব্বোচ্চ গ্রাম। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডময় ঈশ্বরের মূর্ত্তি বিম্বিত দেখেন, তাঁহার আর নিরাকার ধারণায় অধিক বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনও যিনি সেই বিশ্বমূর্ত্তির মানসিক ধারণায় অক্ষম, অথচ ঈশ্বরের এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে যাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বিগ্রহ-সেবায় স্বীয় ভক্তিবৃত্তি অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিবেন; ইহা বিশ্ব-মূর্ত্তিরই স্থূল আদর্শ। নীরদ বর্ণ দেহটি অনন্ত আকাশেরই প্রতিরূপ, আকাশ যে নীলিম আভায় রঞ্জিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে, বিগ্রহের দেহ সেই মনোহর শ্যামল বর্ণে রঞ্জিত। অনন্ত নীলিম পাথারে ভাসমান জ্যোতিষ্ক মালা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল উরসে শোভমান বনমালা। এক একটি বনপুষ্প এক একটি দীপ্তগ্রহ বা নক্ষত্র। শিখিপুচ্ছ মনুষ্যের দৃষ্টি মনোমোহন-কারী নানাবর্ণভাতির পরিচায়ক; পীতাম্বর—শূন্য গর্ভস্থ আলোকরশ্মি। এইরূপে বিগ্রহটি ক্ষুদ্রায়তনে বিশ্বমূর্ত্তি, যে সাধক ভগবানের ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করিতে অক্ষম, তিনি এই ক্ষুদ্র বিগ্রহে সেই বিশ্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন। নিম্নলিখিত গীতে ভক্তের হৃদয়ের ভাব গ্রথিত হইয়াছে—

মানস-মোহনরূপে কর মন সদা ধ্যান;
ভকতি-উচ্ছ্বাসে হের বিরাট বিশ্ব-বয়ান।
নীলিম আকাশ-কায়, তারা-হার শোভা পায়,
জ্যোতির পীত-বসন হের তাঁর পরিধান॥
প্রেমের পবিত্র ধ্বনি বংশী-রবে কাণে শুনি,
বিমোহিত মনপ্রাণ, কর তাঁতে সমাধান॥

সাধনার প্রথমাবস্থায় সাকার কল্পনাই প্রশস্ত পথ। ভক্তির পরিপাকের সহিত যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে নিরাকার উপাসনা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, নিরাকারের ধারণা—তখন সহজ ও সুগম হইয়া আইসে। যতদিন সাধক তদবস্থাপন্ন না হয়েন, ততদিন উপাসনা কালে কোন না কোন পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার মানস দৃষ্টিতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত, তিনি কালী মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন; কাল সহকারে ভক্তিবলে তাঁহার যেরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়,—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জাননা।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তার উপাসনা॥
জগতকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁরে আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগতকে পালিছেন যে মা সাদরে, তাও কি জান না,
তবে কেমনে দিতে চাও বলি, মেষ, মহিষ আর ছাগলছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মাত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করলে পূজা মা ত আমার ঘুস্ খাবে না॥

বাস্তবিক ভক্তিই সাধনার প্রাণ; ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তুমি ঈশ্বরকে যে কোন মূর্ত্তি অর্পণ করিয়া আরাধনা কর, তাহাতেই তোমার আরাধনার ফল ফলিবে, অর্থাৎ ক্রমশঃ তোমার চিত্তের মালিন্য দূর হইতে থাকিবে। চিত্তকে ক্রমশঃ পরিষ্কৃত করিয়া আধ্যাত্মিক বলের উপচয় করাই সাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু অধিকারী ভেদে উপাসনার ইতর উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে; কেহ অর্থের কামনায়, কেহ বা যশের কামনায়, কেহ বা বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত ঈশ্বরের প্রার্থনা করিয়া থাকেন; এরূপ উপাসনা সকাম, ইহাতে সাধনার প্রকৃত ফল না ফলিলেও, ইহা দ্বারা যে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে কোন না কোন প্রকারে ঈশ্বরের ভজনা করা হয়, তাহা বলিতেই হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥

"যে আমাকে যে প্রকারে ভজনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার (ভজন) মার্গ অনুসরণ করে।"

অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাধনা করা অপেক্ষা নানা দেব দেবীর আরাধনা করা নিম্ন শ্রেণীর উপাসনা। কিন্তু উপাসনা সম্বন্ধে হিন্দুমত অতি উদার; হিন্দুরা কোন প্রকার উপসনারই নিন্দা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুযায়ী হইয়া তাঁহারা মনে করেন, যাহার যেরূপ ভক্তি হয়, সে সেইরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পারে, তাহাতেই তাহার আরাধনাজনিত চিত্ত-প্রসন্নতা জন্মিবে। সত্বাদিগুণের প্রাবল্যবশতঃ উপাসক স্থূলতঃ তিন শ্রেণীর হইতে পারেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম ও অধম শ্রেণীর উপাসকদিগের পক্ষে সাকার উপাসনা প্রশস্ত, এরূপ উপাসনায় তাঁহাদিগের হৃদয়ে সহজে ভক্তির উদ্রেক হওয়ায় তাঁহারা আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। দেহাভিমানী মানব সহজে নিরাকারের ভাবনা করিতে অসমর্থ, সেরূপ আরাধনায় তাহার চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে না, তাহার মন আনন্দরসে আপ্লুত হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে সর্ব্বময় জানিয়া কি সৃষ্টি—বস্তুতে, কি মনঃ কল্পিত কোন সুন্দর মূর্ত্তিতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে হৃদয় প্রীতি-ভবে পূর্ণ হইয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। এরূপ আরাধনাই মধ্যম শ্রেণীর সাধকদিগের প্রীতিপ্রদ অতএব সুফলপ্রসূ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভক্তিই সাধনার প্রাণ। যথার্থ ভক্তির উদ্রেক হইলে, হৃদয়ে যথার্থ ঈশ্বানুরাগের উদয় হইলে, সাধক উপাসনার প্রণালী বা ক্রমের দিকে দৃক্পাতও করেন না; কোন মূর্ত্তি বিশেষ ও তাঁহার উপাস্য থাকে না; তিনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করত পরমানন্দ অনুভব করেন। প্রকৃত ভক্তের হৃদয়ই স্বর্গরাজ্য, সেখানে আনন্দরূপ দেবতা স্বভাবরূপ নন্দন কাননে সতত বিরাজিত আছেন। যথার্থ ভক্তের অন্তরেও অমরাবতী, বাহিরেও অমরাবতী; এ জগৎ সততই তাঁহাকে আনন্দ প্রদান করে। প্রকৃত ভক্তির অক্ষয়-ভাণ্ডারে কখন আনন্দের অভাব হয় না, কেনই বা হইবে? যিনি এরূপ ভক্তির অধিকারী, তিনি ত আর কিছু চাহেন না, তাঁহার অর্থলিপ্সা নাই, তাঁহার যশের কামনা নাই, ইন্দ্রিয়ার্থের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা নাই, তাঁহার আত্মপর-বিবেচনা-বলবর্ত্তিনী পুত্রকলত্রাদিতে মমতাও নাই; তিনি নিষ্কাম; তিনি কর্ম্ম করেন বটে, সে কেবল কর্ত্তব্যানুরোধে। ভক্তির পরিপাক হইলে ভক্তের কিরূপ অবস্থা হয় তাহা শ্রীকৃষ্ণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্য-নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

"শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে সমজ্ঞান, শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখে সমবোধ,

সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ আসক্তিহীন, নিন্দা ও প্রশংসাতে তুল্য বোধ; মৌনী অর্থাৎ সংযত বাক্, যে কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট অর্থাৎ যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই তৃপ্ত, অনিকেতন অর্থাৎ বাসস্থানহীন (অর্থাৎ গৃহ থাকিয়াও যিনি গৃহে আসক্ত নহেন,) স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।"

নবম অধ্যায়।

ধর্ম্মনিষ্ঠার আবশ্যকতা।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম শব্দটী অতি বিস্তীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ধৃ ধাতু হইতে, অর্থ পোষণ করা; অতএব যাহা মনুষ্যকে পোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মনুষ্য দেহধারী, মনুষ্যের হৃদয় আছে, মনুষ্য মানসিকবৃত্তি-সম্পন্ন; মনুষ্যের দেহ, হৃদয় ও মন যাহাদ্বারা পরিপুষ্ট হয় তৎসাধনের নাম ধর্ম্ম; মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম কহে। মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; প্রথম শ্রেণীর কর্ত্তব্য আত্মবিষয়ক, আপনার উন্নতি জন্য যাহা যাহা কার্য্য; দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য পরহিতার্থ, পরের বা দেশের হিতের জন্য যাহা যাহা করণীয়, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য ঈশ্বর বিষয়ক, জগৎ-নিয়ন্তার প্রতি প্রেম-প্রকাশ। এই শেষোক্ত কর্ত্তব্য সর্ব্বপ্রধান; কেন না এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি অন্যান্য কর্ত্তব্যের পরিচায়ক; যিনি ঈশ্বরের প্রেমে প্রেমিক, তাঁহার কি আত্মবিষয়ক, কি পর বিষয়ক, কোন প্রকার কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটী হইবার সম্ভাবনা নাই, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সাধনে তিনিই সমর্থ, সেই জন্য জ্ঞানবাদ মতে "মনের যে প্রবৃত্তিদ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম"।

যিনি ধার্ম্মিক, তিনি প্রেমিক; প্রেম ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ। বিশ্বপ্রেমিক জগদীশ্বর সেই প্রেমের অনন্তভাণ্ডার, প্রেম-প্রবাহের অক্ষয় উৎস; সেই উৎসের অনন্তধারায় এই বিশ্বের প্রকাশ, বৈচিত্র্যময় জগতের এক একটী পদার্থ সেই অনন্ত প্রেমের এক একটী নিদর্শন, অপরিচ্ছিন্ন প্রেমের এক একটী পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি, যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি স্পর্শ করিয়াছে, তিনি ক্রমে ক্রমে প্রেমময়ের প্রেম-নিদর্শন গুলি তত্তৎভাবে দেখিতে পান, এবং পরম প্রীতিরসে আর্দ্র হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তির ইহাই ফল, ঈশ্বর-আরাধনার ইহাই স্বর্গ। বাস্তবিক স্বর্গ নরক কোন স্থান বিশেষে বদ্ধ নাই, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক; "মনসঃ পরিণামোহয়ং সুখদুঃখাদি লক্ষণঃ"—সুখ বা দুঃখ কেবল অন্তঃকরণের পরিণাম মাত্র। সুখ বা দুঃখ কোন বস্তুবিশেষে নিহিত থাকে না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একই বস্তু কখন প্রীতিপ্রদ, কখন ক্রোধোদ্দীপক, কখন বা বিষাদের কারণ হইত না; অতএব সুখ বা

দুঃখ মনেরই পরিণাম। মন প্রকৃতিস্থ থাকিলেই সুখ, মনের বিকার ঘটিলে দুঃখ। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন্ বলিয়াছেন—

The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven.

এখন স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে যাহাতে মন সুস্থির থাকে, যাহাতে মন প্রেম-পূর্ণ থাকে, যাহাতে মনের বিকৃতি নাশ করে, এরূপ উপায় গ্রহণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। সে উপায়, সে সাধন ঈশ্বরেরই আরাধনা, অনন্তপ্রেমের কণিকামাত্র পাইবার প্রার্থনা, তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই সহিত কথোপকথন, প্রেমালাপে তাঁহারই সহিত সহবাস। ইহারই নাম যথার্থ সাধনা। সাধনা ব্যতীত সাধপূর্ণ হয় না। সাধনা ব্যতীত যথার্থ সুখের আস্বাদন পাওয়া যায় না। ধন, ঐশ্বর্য্য, বন্ধু, পরিজন সুখের কারণ নহে, কেন না সুখ বস্তুগত নহে; সুখ যখন মনের পরিণাম, তখন মনকে যাহাতে সেইরূপে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহাই সুখের সাধন, ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম মানসিক শান্তির নিদান। যে লক্ষপতি কিন্তু দুরাচার, তাহার সুখ নাই, সুখ সৎকর্ম্মে, সৎকর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে। সভক্তি ঈশ্বরসাধনায় যথার্থ সুখ; ভক্তির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার ও ইহার প্রভাবে সৎপথ অবলম্বন করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রংভবতি ধর্ম্মাত্মাশশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

"যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তি ও অনন্যভজনশীল হইয়া আমাকে ভজনা করেন, তবে তিনিও সাধু বলিয়া গণ্য; যেহেতু তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন। সেরূপ ব্যক্তিও আমাকে ভজনা করিলে শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হন এবং নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হন; হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত প্রণষ্ট হন না, ইহা তুমি নিঃশঙ্কভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পার।"

"ভক্ত প্রণষ্ট হয় না" এই বাক্যের সার্থকতা শুধু আধ্যাত্মিক অর্থে নহে, অন্যান্য অর্থেও ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে পারে। যিনি সরলান্তঃকরণে প্রকৃত ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তিনি সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী। তাঁহার ইন্দ্রিয় সংযত, তাঁহার পান ভোজনাদি নিয়মিত, তাঁহার হৃদয় দুশ্চিন্তা শূন্য; অতএব অনিয়ম বা অত্যাচার-জনিত ব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মনের সহিত দেহের বড় ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা; সেই যদি পবিত্র এবং প্রীতিভাবে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, রোগ শোকাদিদ্বারা দেহ কদাচ অবিভূত হয় না, মন সুস্থ থাকিলে শরীর ও সুস্থ থাকে; শরীর ও মন উভয়েই প্রকৃতিস্থ থাকিলে, ক্রমশঃই আপনার উন্নতি সাধন হইতে

থাকে, ক্রমশঃই চরিত্র সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হয়, ক্রমশঃই ঐ "অশ্রুময় ধরাতল" অমরাবতীর আকার ধারণ করিতে থাকে। যিনি ঈশ্বরভক্ত, তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় না, তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট, বিলাস-বিভবে তাহার স্পৃহা নাই, কাজেই অর্থ অর্থ করিয়া তাঁহাকে সদা ব্যস্ত থাকিতে হয় না। তাঁহার যাহা কিছু অভাব তাহা অনায়াসে পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন——

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনা পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহং॥

"অনন্য-কর্ম্মা হইয়া আমাকে চিন্তা করত যে ব্যক্তিরা উপাসনা করে, আমি সতত সেই মদেক-নিষ্ঠ ব্যক্তি দিগের যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ ও ক্ষেম অর্থাৎ লব্ধ দ্রব্যের পালনরূপ ভার বহন করি"।

এইরূপে ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি আত্মবিষয়ক কর্ত্তব্য গুলি সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। ঈদৃশব্যক্তির চিত্ত সতত প্রেম-পরিপূর্ণ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পাপ-বৃত্তি দ্বারা অপঙ্কিল, স্বার্থের বিষমতাড়নায় চিন্তা-বিদগ্ধ নহে। অতএব ঈশ্বর প্রেমিকের ন্যায় পরহিতৈষণাব্রতে জীবন অতিবাহিত করিতে আর কেহ সক্ষম নহে, তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার সাধনে আর কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না। পর-প্রেমই তাঁহার কার্য্যের প্রবর্ত্তক, খ্যাতি বা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পরোপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করেন না। প্রেমই কার্য্য প্রবর্ত্তক, প্রেমই কাম্য ফল, এমন নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যসাধনে কেবল প্রেমিকেরই ক্ষমতা থাকিতে পারে। জগতের ইতিবৃত্ত এইরূপ মহানুভব দিগের নিঃস্বার্থ কার্য্য-গৌরবে অলঙ্কৃত রহিয়াছে। অতএব ঈশ্বরভক্ত পরবিষয়ক কর্ত্তব্য পালনে বিশেষ দক্ষ। এখন বুঝিতে পারা গেল যে, সকল প্রকার কর্ত্তব্য-সাধনের মূলে ঈশ্বর-সাধনা। ভক্তিবিনা সাধনা হয় না; আবার নিতান্ত পঙ্কিলচিত্তে ভক্তিও প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কতকগুলি আচার ও নিত্য কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে গুলিকে নিতান্ত অসারবোধে ইদানীন্তন পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকেরা প্রায় তাহার কোনটীই প্রতিপালন করেন না। তাঁহারা যদি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শাস্ত্র প্রদর্শিত আচারগুলি অবলম্বন করেন, তাহা হইলে অচিরেই তাহার শুভময় ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অবশ্য স্বীকার করি; কতকগুলি আচার ভ্রষ্টভাবে ইদানীন্তন হিন্দু সমাজে বিদ্যমান আছে, সে গুলি আমাদিগের অবনতির সহিত তাদৃশ ভ্রষ্ট-ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাতে শাস্ত্রের কোন দোষ নাই। শাস্ত্রে আমাদিগের নিত্যাচার সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রায়ই আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিরজন্য; দৃষ্টান্তরূপে এখানে দুই একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। স্নান করিয়া বা অভাবপক্ষে গাত্রমার্জ্জনা ও পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করত ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বাহ্নে দেবার্চ্চনা প্রভৃতিকার্য্য শুদ্ধহৃদয়ে সম্পন্ন করিবে এবং

তৎপরে মধ্যাহ্নে ভোজন করিবে। স্নানের পর একখানি ধৌতবস্ত্র পরিধানের পর চিত্ত স্বতঃই অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হয়; তদবস্থায় দেবার্চ্চনা প্রভৃতি উপাসনা কার্য্য সমধিক পবিত্র হৃদয়ে ও সমাহিতচিত্তে সম্পন্ন হইবারই কথা। পূজা-বন্দনাদিদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহার পর ভোজনের বিধি; তদবস্থায় সানন্দ চিত্তে ভোজন করিলে আহারের উদ্দেশ্য যে অধিকতর সিদ্ধ হইবে, স্বাস্থ্য ও বলের যে অধিকতর উপচয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সামান্যতঃ এই সুবিধাটীরই অবমাননা করিয়া অনেক পূর্ব্বাহ্নে কিছু খাদ্য উপস্থিত পাইলেই আহার করিয়া থাকেন; অর্চ্চনাদির নিয়মও একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির সমস্তধর্ম্মই নিয়মিত, প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিশাগমে পুনরায় নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সেই নিত্যকর্ম্মগুলির অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং চিত্তশুদ্ধি সহকারে ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয়। সদাচার ব্যতীত সাধুতা জন্মে না। সদাচার সম্বন্ধে শাস্ত্রের একটী বচন উদ্ধৃত করিতেছি——

ধর্ম্মোঽস্য মূলান্যসবঃ প্রকাণ্ডো বিত্তানি শাখাশ্ছদনানি কামাঃ।
যশাংসি পুষ্পানি ফলঞ্চপুণ্যং অসৌ সদাচার তরুর্ম্মহীয়ান্॥

"সদাচাররূপ মহান্ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, প্রকাণ্ড বা গুঁড়ি (অসব) আয়ু, শাখা ধন, উহার পত্র কামনা, পুষ্প যশ, ফল পুন্য"। সদাচারেই ধর্ম্ম, সদাচারেই দীর্ঘজীবন, এবং সদাচারেই অর্থ যশ প্রভৃতির উৎপত্তি। অতএব সদাচারের অভ্যাস সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এইরূপ অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। আমাদিগের যে পূজা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা চিত্তের প্রীতিসম্পাদনের অতি সুন্দর উপায়; পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যদ্বারা উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে স্বতঃই যেন চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে, ভক্তির আপনা হইতে যেন উন্মেষ হয়। যাঁহাদিগের এখনও সেরূপ জ্ঞান জন্মে নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে একপ অভ্যাস যে সর্ব্বতোভাবে কল্যাণকর, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূজাবন্দনাদি সদাচারের অভ্যাস হইতে জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়, জ্ঞান জন্মিলে তবে ধ্যানাদিতে অধিকার জন্মে, এবং তৎপরে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; নিষ্কাম হইয়া ত্যাগী হইতে পারিলে পরমশান্তিলাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন-----

শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফল-ত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তি রনন্তরং॥

"অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ; ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ; ত্যাগ হইতে শীঘ্রই সংসার-শান্তি হয়।

সমাপ্ত। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বি

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিষ্ণুর অবতার। বসুদেব ও দৈবকী, শ্রীকৃষ্ণের জনক জননী। শ্রীরাধিকা, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা শক্তি। বৃন্দাবন, মথুরা, দ্বারকা এবং কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান। অসুর বিনাশার্থে, শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতার। শ্রীমদ্ভাগবৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে।

বৈদিক আর্য্যগণের পরম দেবতা সূর্য্যদেব (১) এবং বেদ মতে সূর্য্যদেবের অপর নাম বিষ্ণু (২) এবং বিষ্ণু সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (৩) আর্য্য হিন্দুগণ দেবাসুর পূজা করিবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

গোলকে রাশি চক্রে সূর্য্যদেবের এক বৎসর পরিভ্রমণ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া হিন্দুজাতির মনোরঞ্জন জন্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার অঙ্কুর রোপিত হয়। কিন্তু ক্রমে পর পর পুরাণে শাখা, প্রশাখা, পল্লব উদ্ভূত হইয়া, ঐ লীলাবৃক্ষে বিষময় ফল ধরিয়াছে।

নতুবা অধঃপতনশীল ভারতভূমিতে কুরুচির স্রোতে ভাসমান হইয়া অনাদিদেব শ্রীরাধা-কৃষ্ণ অতল স্পর্শ কলঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া কেন হাবু ডুবু খাইবেন? কালের কি বিচিত্র প্রভাব। অনন্তকাল অনাদিদেবকে গ্রাস করিতে উদ্যত। অনাদিদেব আজ ভারতে কলুষিতভাবে পূজিত। অঙ্গরাগ না হইলে সত্বর পূজা লোপ হইবে। ভারতের বিপ্রকুল সদাশয়ে সাধুচিত্তে এই রূপক কল্পনা করিয়াও আজ হিন্দুসমাজের নিকট দায়ী। এই জাতীয় ঋণ বিমোচনার্থে আমরা অদ্য শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রহস্য ভেদে কৃতসংকল্প হইলাম।

ফাল্গুনের অমা-প্রদোষে একবার গোলক সন্দর্শন কর। দেখিবে আদ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গোলকে অক্ষয় অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার শিরোপরে, তারকময় ধনুকাকৃতি যে নক্ষত্র দেখিতেছ, উহার নাম পুনর্ব্বসু। ঐ বসু নক্ষত্র বা বসুদেবের ক্রোড়ে ঐ দৈবকী (৪) বিরাজিত। ঐ বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে যে বিন্দু দেখিতেছ, ঐ বিন্দুর নাম কর্কট ক্রান্তি, ঐ বিন্দু উত্তরায়ণের চরম সীমান্তে অবস্থিত। ঐ বিন্দু

(১) গায়ত্রী। (২) ঋক্ ৮।৭৭।১০ এবং ১।২২।১৬। (৩) গায়ত্রী।

(৪) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবমাতা অদিতি উত্তরক্রান্তিতে অবস্থিত; কশ্যপবসুদেবশ্চ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে জন্মখণ্ডে, অদিতির্দেবকীহ্যভূৎ ইতি হরিবংশে, রেবতী হইতে চিত্রা পর্য্যন্ত অয়ন রেখার্দ্ধ অসিত না দৈবকী বলিয়া বর্ণিত।

স্পর্শ হইলে সূর্য্যদেবের অয়ন গতির শেষ হয়। এবং ঐ বিন্দুতে নববর্ষের বালার্ক উদয় হয়। ঐ বিন্দু বালকৃষ্ণের জন্ম স্থান। অতএব কর্কট ক্রান্তি বিন্দুতে, বসুদেবের গৃহে, দৈবকীর অঙ্কে আদিদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইল। কল্পনা নহে। নব-দুর্ব্বাদল শ্যাম (১) তোমার সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অয়ন রেখায় শিবা মণ্ডলের ছায়াতলে (২) দক্ষিণাচলে যাত্রা করিলেন। সম্মুখে কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু রাশি। শ্রীকৃষ্ণ যমুনা (৩) অতিক্রম করিয়া প্রথমতঃ অগ্রসর হইলে, সম্মুখে কর্কট রাশিস্থ ত্রিতারকাত্মক শরাকৃতি পুষ্যা পশ্চিমাভিমুখে বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্যা সংক্রমণের পরে কর্কট রাশিস্থ হ্রদ সর্প কালিয়। (৪) কালিয় সর্পের মস্তক ষট্ তারকময় চক্রাকৃতি। এবং ইহাকে অশ্লেষা নক্ষত্র বলে। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ফণী, শ্রীকৃষ্ণ অশ্লেষায় পদার্পণ করিয়া কালিয় দমন করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পঞ্চ তারকাময় মঘা। মঘার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। সুতরাং মঘার জ্যোতিঃ নবপ্রসূত বালকের জীবন সংহারক অহিপূতনা নামক বালরোগে উৎপাদক এই মঘাই পূতনা। মঘার যোগতারা (৫) দৈবকীর (অয়ন রেখার্দ্ধ) উপবিষ্ট বলিয়া পূতনাকে মাতৃ পদে অভিষিক্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য দানে ব্যাপৃত করা হইয়াছে।* পঞ্চ তারকময় বলিয়া মঘা বা পূতনা, এক্ষণে বঙ্গভূমিতে, পেঁচো, পাঁচী বলিয়া খ্যাত। সূর্য্যদেবের মঘায় অবস্থিতি কালে মঘা আচ্ছাদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ মঘা সংহার করিয়া পূতনা বিনাশ করিলেন। সম্মুখে সিংহ রাশিস্থ পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় ফাল্গুনি বা অর্জ্জুনি নক্ষত্র। (৬) এই দুই নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ ভঞ্জন লীলা প্রদর্শন করিলেন। সম্মুখে কন্যা রাশিস্থ, হস্তা, চিত্রা, তুলা রাশিস্থ স্বাতী, বিশাখা, বৃশ্চিক রাশিস্থ অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং ধনুরাশিস্থ মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ;নব নক্ষত্র। ইহারাই আধুনিক পৌরাণিক নবনারী। (৭) অষ্ট সখি এবং আদ্যাশক্তি বিশাখা বা রাধা (৮)

(১) Castor star. অর্থাৎ বিষ্ণুনামক পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ষট তারকের সর্ব্বোত্তরস্থ তারকা যথা—ধরধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতা ইতি ভরতঃ।

(২) Lyux constellation or canis minor. (৩) রাত্রি ঋক্ ১০।১৭।১।

(৪) Hydra constillation. (৫) Regulus. (৬) ঋক্ ১০।৮৫।১৩

(৭) চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা, বিশাখা, তুঙ্গ-বিদ্যা, রঙ্গদেবী চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা,

(৮) রাধা, বিশাখা পুষ্যে তু ইত্যমরঃ

* মঘাকে পূতনা বলিবার আরও কারণ আছে মঘা লাঙ্গলাকৃতি বলিয়া দেখিতে ধ্বজবৎ (flag) এজন্য মঘাকে ধ্বজিনী বলার সার্থকতা আছে এবং ধ্বজিনী বাহিনী সেনা পূতনাঽনীকিনী চমূঃ ইত্যমরঃ বচনে দেখা যায়—পূতনা শব্দ ধ্বজিনী অর্থে ব্যবহার্য্য, মঘা ও পূতনা উভয়েই ধ্বজিনী বলিয়া মঘা পূতনা, পূতনাকে শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানে বসাইবারও অনেক কারণ আছে, যথা—তৃতীয় দিবসে মাসে (বর্ষে বা গৃহ্ণাতি) পূতনা নাম মাতৃকা ইতি চক্রপাণি দত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পূতনা স্তন্য দিবার আরও কারণ আছে যথা ভাব প্রকাশে অহি পূতনা নাম বালরোগ চিকিৎসায়াং তত্র সংশোধনৈঃ পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যং বিশোধয়েৎ॥

বিশাখার আকৃতি পুষ্পমালা বা তোরণবৎ ৮ বা পদ্মাকৃতি। বিশাখার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শক্রাগ্নি বা বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুতাগ্নির নাম র, (৭ ক) এই র অগ্নির আধার বলিয়া বিশাখা, রাধা বলিয়া খ্যাত। (১) শ্রীকৃষ্ণ, চন্দ্রাবলি, চিত্রলেখা, ললিতা (২) সখিত্রয় সম্ভাষণ করিয়া শ্রীরাধার সদনে উপনীত হইয়া দেখিলেন অয়নরেখা (৩) শ্রীরাধা অধিকার করিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় মিলন হইল। এই শ্রীরাধা কে? বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেব 'বৃষভানু-রাজ। কলাবতী চন্দ্রিমা তাঁহার পত্নী। কলাবতী স্বীয় পতি বৃষ রাশিস্থ ভাস্করদেবের মিলনাশয়ে উন্মত্তা হইয়া পূর্ণাকৃতি লাভের জন্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাভিমুখে যাত্রা কালে পদ্মাকৃতি বিশাখার মধ্যে বিদ্যুৎরূপা রাধাকে প্রাপ্ত হইলেন। এই স্থানে রাধার পৌরাণিক জন্ম ও লালনপালনাদি স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের, তুলা রাশিতে শ্রীরাধা নক্ষত্র ভোগ কালে আকাশাগ্নি (সূর্য্য) অন্তরীক্ষ অগ্নিতে (বিদ্যুতে) মিলিত হইল। (৪) সাংখ্যকারের প্রকৃতি পুরুষ একত্রীভূত হইল। ক্রমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত; বিদ্যুৎময়ী! ষট্ কৃত্তিকার শোভায় পৌর্ণমাসীর রৌপ্যময় জ্যোতিঃ ঘর্ষিত হইল। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কৌমুদী জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিতে ও হাসিতে লাগিল। পশু, পক্ষী আদি সমস্ত জীবগণ এবং জগজ্জন আহ্লাদে পুলকিত হইল। জগজ্জন এই বিমুগ্ধকর রজনী নৃত্য গীত সুখে যাপন করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই জগৎময় নৃত্য গীতের নাম রাস (৫) লীলা। শ্রীকৃষ্ণদেব শ্রীরাধা ও অষ্ট সখী সমবেতা হইয়া রাসলীলায় বৃন্দাবনে প্রমত্ত। আজ পৌর্ণমাসী কলাবতী, এবং মাতৃকাগণ (৬) স্বসুতা রাধার শুভগ্রহে উন্মত্তা। বিমানে পুরন্ধ্রীগণ আজ অট্টহাস হাসিতেছে। প্রকৃতির অনুপম শোভায় জগৎ মুগ্ধ।

এই বৃন্দাবন কোথায়? ঐ দেখ গোলকে লক্ষ লক্ষ গোপ (৭) গোপী অর্থাৎ তারক, তারকা পরিবেষ্টিত হইয়া ধাতা ইন্দ্র সবিতা ইত্যাদি দ্বাদশ আদিত্য (৮) রূপে শ্রীদামন্, সুদামন্ প্রভৃতি দ্বাদশ রাখাল মণ্ডলসহ শ্রীসূর্য্যদেব, কৃষ্ণ নামে বৃন্দা-বনে রাসলীলায় বিরাজমান। (৯) যদি এই প্রাকৃতিক রাসলীলা সন্দর্শনে হৃদয়ে গভীর বিমল ঈশ্বর প্রেমের, উদয় হইয়া মন প্রাণ পুলকিত ও বিগলিত না হয়, এবং

(৮ ক) স্মৃতেঽরঃ পাবকে তীক্ষ্ণে ইতি মেদিনী। (১) বৈশাখে মাধবঃ রাধঃ ইত্যমরঃ।

(২) স্বাতি নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পবন এবং স্বাতি তুলা রাশিতে অবস্থিত বলিয়া ললিতা নাম। এবং হস্তার পঞ্চতারা চন্দ্রবৎ শুক্লবর্ণা।

(৩) অয়ন ঘোষ বা রায়াণ ঘোষ। (৪) ঋক্ ১। ৯৫। ৩

(৫) গুণে রাগে দ্রবে রসঃ ইত্যমরঃ। (৬) ষট্ কৃত্তিকা।

(৭) গো অর্থ কিরণ' ঋক ১। ৬২। ৫ প-পালকে।

(৮) বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সূর্য্য নাম ১ ধাতা, ২ ইন্দ্রে, ৩ সবিতা, ৪ বিবস্বান্, ৫ ভগ, ৬ পর্য্যণ্য, ৭ ভাস্কর, ৮ মিত্র, ৯ বিষ্ণু, ১০ বরুণ, ১১ পুষা ১২ ঈশ।

(৯) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড ৪র্থ অধ্যায়।

কলুষিত ভৌতিক প্রেমভাব যদি কাহারও ক্ষুদ্র কুসংস্কারতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তবে আমরা আর কি বলিব ; এই মাত্র বলিতে পারি, অন্য মূর্ত্তি পূজা কর। পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে পাপময় লীলা চিত্রিত করিয়া নিজে কলঙ্কিত হইও না। ক্রমশঃ—

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৫-ম ভাগ ১-ম, ২-য়, ৪-র্থ সংখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদন বিষয়েও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বঙ্গের কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি মনস্বী মহোদয়গণের চিন্তা ও গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ নিচয়ে দিন দিন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত হইতেছে। লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়া পরিষৎ দেশের মহান্ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। আমাদের স্থানাভাব, নতুবা, পরিষৎ পত্রিকার গভীর চিন্তাশীলতা পরিপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের কতিপয় অংশ পাঠকদিগকে উপহার দিতাম। এতাদৃশ উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকার সর্ব্বত্রই সমাদর হওয়া উচিত। কিন্তু আমোদ-প্রবণ বঙ্গদেশে তাহা হইবে কি ? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার উন্নতি এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রবুদ্ধ-ভারত। ইংরাজিতে সম্পাদিত, স্বামী বিবেকানন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। আমরা 'প্রবুদ্ধ ভারত' পাঠে নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলাম। ইহার লেখা প্রাঞ্জল এবং উদ্দেশ্যও মহান্। এই পত্রিকাখানি পূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে প্রকাশিত হইত, এইক্ষণ হিমালয়ের অন্তর্ভূত আলমোরা হইতে প্রকাশিত হইতেছে, এবম্বিধ পত্রিকার দ্বারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

উদ্বোধন। এ পত্রিকাখানিও স্বামী বিবেকানন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বামী ত্রিগুণাতীত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ইহারও উদ্দেশ্য মহান্, ভাষাও প্রাঞ্জল। এরূপ পত্রিকা যত অধিক প্রচারিত হইবে, ততই যে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা ইহার দীর্ঘজীবনে পরিতুষ্ট হইব। আজ কালের অনেক পত্রিকাতেই সাম্প্রদায়িকভাবের আতিশয্য দর্শনে আমরা বড়ই দুঃখিত, কিন্তু সুখের বিষয় যে, উক্ত দুই পত্রিকায় উহার লেশও নাই। স্বামী ত্রিগুণাতীত এবং তাঁহার সহচরগণ দেশের নানাবিধ হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন; এই পত্রিকাও তাঁহাদের সেই নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রতের অন্যতম অঙ্গ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৫ সাল, ১৮২০ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভূত-বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

সদ্বস্তু সিদ্ধস্তৃষ্ণীস্থিতিনিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জ্জনাৎ॥ ৩৯॥
সদ্‌বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্ব-সাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্॥ ৪০॥

বঙ্গার্থ। আমরা যখন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই সদ্বস্তু অনুভূত হয়; শূন্য যে অনুভূত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যদি বল যে, সদ্বস্তু বুদ্ধিতে অনুভূত হয় না, তাহা হইতে পারে না; যেহেতু নির্ম্মনস্ক কালে—অর্থাৎ যখন মনের ক্রিয়া রহিত হইয়া তুষ্ণীভাব অবলম্বিত হয়, তখন স্বপ্রকাশ বশতঃ সৎ সাক্ষীস্বরূপ থাকেন।

তাৎপর্য্য। তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্তু আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না, তেমনি তোমাদিগের বেদান্ত-মতে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয়না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্ত-মতও আমাদিগের মতের তুল্য হইল। তাহা তোমরা কখনই বলিতে পার না; কারণ যখন আমরা মৌনভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না; যেহেতু পূর্ব্বেই বিচার দ্বারা শূন্যত্ব-বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্তু অনুভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য।

সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষী স্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে; সুতরাং তৎকালে যে সৎপদার্থ অনুভূত হয় না, এ কথা কখনই বলিতে পার না। ৩৯-৪০॥

মনো জৃম্ভণ-রাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়া জৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সত্তথৈব নিরাকুলম্॥ ৪১॥

বঙ্গার্থ। মনের ক্রিয়া যখন না থাকে, তখন যেমন সদ্বস্তু সাক্ষীস্বরূপ অব্যক্ত থাকেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্য রহিত হইলে, সদ্ব্রহ্ম সর্ব্বসাক্ষীরূপে অব্যক্ত থাকেন।

তাৎপর্য্যার্থ। উক্ত প্রকার তুষ্ণী—অর্থাৎ মৌনাবলম্বন কালে নিষ্প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন। যখন মন নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ বিষয়ান্তরে অনাসক্ত হইয়া মৌনভাব আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সদ্বস্তু-স্বরূপ পরম-ব্রহ্ম অব্যক্তরূপে মনের সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্য স্বরূপ জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে সর্ব্বসাক্ষীরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। ৪১।

নিস্তত্ত্বা কার্য্য-গম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নি-শক্তিবৎ।
নহি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃপুরা॥ ৪২॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া প্রকৃত কোন তত্ত্ব নহে; যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি দহন-কার্য্যে অনুভূত হয়, সেইরূপ মায়া কার্য্যগম্যা—অর্থাৎ কার্য্য দর্শনে মায়া অনুভূত হয়; সৃষ্টিকার্য্যের পূর্ব্বে মায়াশক্তি বোধগম্য হয় না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে মায়ার কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন। এই জগতের আদিকারণ সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে বিভিন্নসত্তা-শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখনও কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না; সুতরাং সেই পরম পিতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরম ব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি-কার্য্য-জনন-শক্তি, তাহাই মায়া॥ ৪২॥

ন সদ্বস্তু স্বতঃ শক্তির্নহি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়াস্তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাং॥ ৪৩॥

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়া কার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদ্ যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেষ্যতাম্॥ ৪৪

বঙ্গানুবাদ। সত্ত্ব স্বয়ং শক্তি নহে, অগ্নিও স্বয়ং দাহিকা-শক্তি নহে, সৎ হইতে শক্তিকে পৃথক্ বলিলে, শক্তি কি তত্ত্ব? অর্থাৎ কোন তত্ত্ব নহে। যদি বল যে, উহা শূন্য, কিন্তু শূন্য মায়ার কার্য্য, মায়া স্বয়ং সৎ পদার্থ নহে, শূন্য ও নহে, সৎ এবং শূন্যাতিরিক্ত যাহা, মায়া তাহাই।

তাৎপর্য্যার্থ। কার্য্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া, পরমাত্মার শক্তির স্বরূপ মায়ার যে সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্ত্বা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না; কারণ, আপনি আপনার শক্তি, এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকা-শক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না, সেই প্রকার সেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনই পরমাত্মা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, [তাহা] হইলে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বর্ণন কর। শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ, এ কথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াছ; সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বরূপ স্বীকার করিতে হইল॥ ৪৩—৪৪॥

নাসদাসীন্নোসদাসীৎ তদানীং কিন্ত্বভূৎ তমঃ
সদ্ যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ॥ ৪৫
অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্নহি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্র তচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং গণ্যতে পৃথক্॥ ৪৬

বঙ্গার্থ। তৎকালে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) অসৎ ছিল না এবং পৃথক্ সত্ত্বও ছিল না, কিন্তু তম (অপ্রকাশ) ছিল; সৎ থাকা হেতু ঐ তম সৎ ছিল; সৎ না থাকিলে তমসের অস্তিত্ব অসিদ্ধ, সৎ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) স্বীকার না করিলে, তম (অর্থাৎ অপ্রকাশ) থাকিবে কি প্রকারে? অতএব শূন্যের ন্যায় দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায় না; লোক-সমাজেও শক্তির পৃথক্ তত্ত্ব কেহ গণনা করে না।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর-জগৎ-উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎও ছিল না এবং পৃথক্‌সত্তা-বিশিষ্ট কোন সত্ত্বও ছিল না; কিন্তু সেই কালে পরমাত্মশক্তিরূপা তমঃশব্দ-বাচ্যা মায়া মাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাত্ম

শক্তিরূপা মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। সেই সৎস্বরূপ পরব্রহ্মের সত্তাতেই সেই মায়ার সত্তা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহার দ্বারাও পূর্ব্বের ন্যায় পরম ব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব-শঙ্কা হইতে পারে না; যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি, এই উভয়ের পৃথক্ সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে, সেই স্থলে অমুক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে; কিন্তু অমুক পদার্থ সেই স্থানে নাই, কেবল মাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার কখনই হয় না॥ ৪৫—৪৬॥

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতশ্চেদ্ বর্দ্ধতে তত্রবৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকন্তথা॥
সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তি কার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্॥ ৪৭

বঙ্গানুবাদ। শক্তির আধিক্যে যদি পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শক্তির বৃদ্ধিত্ব আছে (অর্থাৎ শক্তি পৃথক্ গণ্য) কিন্তু বাস্তবিক শক্তি পরমায়ু-বৃদ্ধির কারণ নহে, যুদ্ধ-কৃষ্যাদি শক্তির কার্য্য। শক্তি সর্ব্ব স্থানেই পৃথক্‌তত্ত্বরূপে গণনীয় নহে, যেহেতু যুদ্ধ-কৃষ্যাদিও ছিল না (অর্থাৎ যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না, তখন) শক্তির দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কেন হইবে?

তাৎপর্য্যার্থ। যদি বল, আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের পরমায়ুর হ্রাস হয়, এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে। পরমায়ুর বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলে যে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলেই শক্তির কার্য্য কারণ। অতএব শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, তাহা ইহার দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদি দ্বারাই ঈশ্বরের সদ্বিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না; যেহেতু এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন যে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার করা, তাহাও নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না, তাহা হইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যরূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না॥ ৪৭॥

ন কৃৎস্ন ব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেক দেশভাক্।
ঘট-শক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধ মৃদ্যেব বর্ত্ততে॥ ৪৮

পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ং-প্রভঃ।
ইত্যেক-দেশ-বৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৯
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেক-দেশতাম্ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ। শক্তি, ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, কিন্তু একদেশ-ব্যাপিনী হইতেছে; যেমন সকল মৃত্তিকায় ঘট-জনন-শক্তি নাই, আর্দ্র মৃত্তিকায় আছে। ব্রহ্মের এক পাদ বিশ্ব—ত্রিপাদ স্বয়ং প্রকাশমান। মায়া এক-দেশ ব্যাপিনী, শ্রুতিতে আছে। আমি একাংশ দ্বারা জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছি, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বর-শক্তি মায়া পরব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে, পরন্তু এক-দেশ-ব্যাপিনী। যেমন ঘট-শরাবাদির জনন-শক্তি পৃথিবীর সর্ব্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, তেমন মায়ারূপা ঈশ্বর-শক্তিও তাঁহার একাংশ-ব্যাপিনী। এইরূপ মায়ায় ব্রহ্মের একাংশ-ব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতেছেন। শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎকর্ত্তা পরব্রহ্ম পাদ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন; সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিনপাদ নিত্য, শুদ্ধ, মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ-উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥ ৪৮—৫০ ॥

সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গানুবাদ। মায়া ব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে; একপাদ যে বিকারাবর্ত্তি, তাহা বেদান্তসূত্রে বিবৃত আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঈশ্বর-শক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়ব-ব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরকসূত্র বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন। অপরাপর শ্রুতিতেও ইহাই জানা যায় যে, জগৎপতি পরম ব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশ দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশ নিত্য-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ঊনবিংশতি সূত্রে লিখিত আছে যে, পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়ারূপ

বিকার দ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃতভাবেও অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ তাঁহার একাংশ মাত্র মায়া স্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্লিপ্ত, নিত্য, বিশুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্‌ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতুর্হিতৈষিণী ॥ ৫২ ॥

বঙ্গানুবাদ। যিনি পূর্ণ, অংশ-শূন্য, তাঁহার অংশ-আরোপ কি প্রকারে হইতে পারে? হিতৈষিণী শ্রুতি অংশ আরোপ করিয়া শিষ্যবর্গকে বুঝাইয়াছেন।

তাৎপর্য্যার্থ। সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্ব্বময় পরব্রহ্ম অবয়ববিহীন; তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব। অতএব পূর্ব্ব শ্লোকে যে তাঁহার কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর। যিনি নিরবয়ব, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোন-রূপেও সম্ভব হয় না, এই বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে,—ব্রহ্ম নিরংশ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বটে, তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ তাঁহার অংশচ্ছলে কেবল মাত্র শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

সত্ত্বমাশ্রিতাশক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধৈর্যথা ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। যেমন ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া তদুপরি নানা বর্ণের চিত্র রঞ্জিত হয়, সেইরূপ সৎকে আশ্রয় করিয়া শক্তি নানা বিকার কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে নিমিত্ত পূর্ব্ব শ্লোকে বিচার পূর্ব্বক পরব্রহ্মেতে শক্তিরূপা মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তাকল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে। যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ,ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই ভিত্তির নানা প্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্ম-শক্তি মায়া সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল কল্পনা করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত তাহাতে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্তের সমালোচনা)

উপরোক্ত ৩১ শ্লোক হইতে ৪৭ শ্লোক পর্য্যন্ত সৎ-ব্রহ্ম-তত্ত্ব ও তাহা কোন ভূত-পদার্থ নহে বা শূন্যও নহে। সৎ অর্থে নিত্য---অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে বা থাকে; ঐ সৎ ব্যতীত সমস্তই অসৎ—অর্থাৎ মিথ্যা, কখনই নাই, ছিল না বা কখন থাকিবেও না। সৎ আছে বা ছিল বলিলে, উহাতে দ্বৈগুণ্য-দোষ বা পুনরুক্তি-দোষ হয়; যেহেতু সৎ অর্থই যখন অস্তিত্ব-সূচক, তখন সৎ আছে বা ছিল বলায় দ্বৈগুণ্য বা পুনরুক্তি-দোষ হইবেই। তদ্ভিন্ন 'ছিল' শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে না; যেহেতু ঐ সৎ ব্যতীত কালাদি (অর্থাৎ অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ) মিথ্যা। 'ছিল' বলিলে অতীত বুঝায়, কিন্তু একমাত্র সৎ ব্যতীত আর কিছুই না থাকায়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কোথা হইতে আসিবে? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সৎ পদার্থ নহে বা স্বয়ং-প্রকাশমান নহে, ইহা অনুভূত বিষয়। অতএব 'ছিল' শব্দও প্রযুজ্য হইতে পারে না। সৎ আছে বা ছিল, ইহা ব্যবহারিক শব্দ মাত্র; অজ্ঞান শিষ্যগণকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ সকল 'আছে' 'ছিল' ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ সৎ পদার্থ ভূত বা ভৌতিক জগৎ নহে কিম্বা শূন্য নহে; ভূত বা ভৌতিক জগৎ ধ্বংসশীল, সৎপদার্থ অবিনশ্বর; শূন্য বা আকাশ নহে, উহার কোন অস্তিত্ব নাই, উহা স্বয়ং প্রকাশমান নহে। আকাশ কেহ দেখিতে পায় না বা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিতে পারে না; যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার-রাশি মাত্র। যে স্থানে কোন ভৌতিক পদার্থ নাই, সেই স্থান স্থূলপদার্থশূন্য, তথায় আলোক বা অন্ধকার মাত্র অনুভূত হয়; সুতরাং আকাশ বা শূন্য সৎ নহে, অর্থাৎ উহার অস্তিত্ব নাই। সৎ পদার্থ স্বয়ং প্রকাশমান, ভূত বা ভৌতিক জগৎ অনুভূত বিষয়। শূন্যও একটী সংস্কার মাত্র, তথায় কোন দৃশ্য ভৌতিক পদার্থ দৃষ্ট হয় না। সেই স্থানকে আকাশ বলি এবং দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আলোক বা অন্ধকাররাশি অনুভব করি; অতএব শূন্য স্বয়ং প্রকাশমান নহে। ভূত বা ভৌতিক জগৎও অনুভূত পদার্থ মাত্র। যখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, মন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, তখন যে নির্ব্বিকার চৈতন্য মনের সাক্ষীস্বরূপ অবশিষ্ট থাকে, সেই নির্ব্বিকার দ্রষ্টা চৈতন্যই সৎ পদার্থ। যখন মনের ক্রিয়া থাকে, তখন মন নানা বিষয় কল্পনা, চিন্তা ও অনুভব করে; ঐ অনুভূত পদার্থ যখন ধ্বংসশীল এবং প্রকাশমান নহে, তখন সৎ নহে। সত্তের শক্তিই মায়া; উক্ত সৎ পদার্থ (দ্রষ্টা চৈতন্য) অবলম্বনে যে জগৎ কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ শক্তির নাম মায়া। যেমন জীব-চৈতন্য অবলম্বনে মনে বুদ্ধির বিকাশ হইলে, মন কর্ত্তৃক নানা বিষয় কল্পিত, ইন্দ্রিয়দ্বারা ভৌতিক জগৎ অনুভূত এবং বুদ্ধি কর্ত্তৃক তাহার নিশ্চয় জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে তাঁহার শক্তিরূপা মায়ার বিকাশ হইলে, মায়া কর্ত্তৃক ভূত এবং ভৌতিক জগৎ

কল্পিত হয়, এবং ঐ কল্পিত বিষয় চৈতন্যের আশ্রয়ে প্রতিভাত হইলে, ঐ কল্পিত জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন জীবের মনের ক্রিয়া রহিত হইলে মন নিঃসঙ্কল্পভাবে চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়, বুদ্ধিও তৎসহ লুক্কায়িত হয়, কেবল সাক্ষী (দ্রষ্টা) চৈতন্য-ক্রিয়াহীন মন বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, সেইরূপ মায়ার ক্রিয়া রহিত হইলে, মায়া নিঃসঙ্কল্পভাবে অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যে লুক্কায়িত হয়েন; ব্রহ্মচৈতন্য ক্রিয়াহীন সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থাৎ অস্তিত্ব মাত্রে অবশিষ্ট থাকেন। মায়া স্বয়ং সৎ নহে বা অসৎ (কল্পিত ভূত বা ভৌতিক জগৎ কিম্বা শূন্য) নহে। মায়াশক্তি কর্তৃক মিথ্যা (যাহা নাই) জগৎ কল্পিত হয়। সৎ পদার্থ সত্য, স্বয়ং প্রকাশমান ও মায়া কর্তৃক কল্পিত মিথ্যা জগৎ মরীচিকা-ভ্রান্তির ন্যায় সত্য প্রতীয়মান হয়। অতএব মায়া সৎ নহে, অর্থাৎ মায়ার পৃথক্ অস্তিত্বও নাই; যেহেতু ভ্রান্ত কল্পনা বা ভ্রান্ত অনুভূতির সত্যত্ব বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। সত্য জ্ঞানে মায়ার ভ্রান্ত কল্পনা ভাসমান হয়, এবং ঐ মায়াশক্তির কার্য্য দর্শনে মায়াশক্তি অনুভূত হয়। যেমন দহন ক্রিয়া দর্শনে অগ্নির দাহিকাশক্তি জানা যায়। সেইরূপ জাগতিক কার্য্য দর্শনে ব্রহ্মশক্তি মায়া অনুভূত হয়। যেমন অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তি পৃথক্ নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নিও নহে, সেইরূপ মায়া স্বয়ং সত্য ব্রহ্ম নহে এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ তত্ত্বও নহে। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী; জগতের সমস্ত পদার্থে বা সর্ব্ব স্থানে অগ্নি বা তেজ আছে, (আধুনিক বিজ্ঞানের মতেও তড়িৎ বা তেজ সর্ব্বস্থানে লুক্কায়িত আছে,) অগ্নির দহন-কার্য্য যেখানে প্রকাশ পায়, তথায় দাহিকাশক্তি স্বীকৃত হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী সৎপদার্থ অবলম্বনে অসৎ জগৎ বা জাগতিক কার্য্যের বিকাশ হইলে শক্তি অনুভূত হয়; ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়াশক্তি সৎপদার্থ নহে বা সৎপদার্থ হইতে পৃথক্ তত্ত্বও নহে। মায়া অনির্ব্বচনীয়, যেহেতু মায়া কর্তৃক মন-বুদ্ধির বিকাশ হয়; ঐ মন-বুদ্ধির নিকট মায়া-কল্পিত ভ্রান্ত জগৎ সত্যবৎ অনুভূত হয়; ঐ মায়া-প্রসূত মন-বুদ্ধি মায়া যে কি পদার্থ, তাহা ধারণা করিতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ (কল্পিত জগৎ) ছিল না, পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট সৎ পদার্থও ছিল না। (পৃথক্ সত্তা সঙ্কল্পাত্মক) কেবল পরমাত্মশক্তিরূপা, তমোবাচ্য মায়া পরব্রহ্মে লুক্কায়িত ছিল। যখন মায়ার কল্পনা না থাকে, তখন ভ্রান্তজ্ঞানের বা ভ্রান্ত-জ্ঞানাধাররূপ জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ থাকে না; জীবের মন-বুদ্ধির বিকাশ না থাকিলে পৃথক্ সত্তা কে অনুভব করিবে? নির্ব্বিকার সাক্ষী (দ্রষ্টা) চৈতন্য কল্পনাশূন্য, ভ্রান্ত জগৎ তাঁহাতে নাই। মায়ার কার্য্যের অবিকাশহেতু মায়াকে তমঃস্বরূপা বলা হইয়াছে। তৎকালে দাহিকাশক্তির ন্যায় মায়া অব্যক্ত থাকায়, সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ তেজের ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্য সন্মাত্রে (অস্তিত্ব মাত্রে) পর্য্যবসিত থাকেন। তাঁহাতে তিনি অর্থাৎ অনন্ত সত্তাজ্ঞানে স্বপ্রকাশ থাকেন, তাঁহার পৃথক্ সত্তা থাকে না, ইত্যাদি মীমাংসা আছে।

নীতিসারঃ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

অপৃষ্টো নৈব কথয়েদ্ গৃহকৃত্যং তু কং প্রতি। বহ্বর্থমল্পাক্ষরং কুর্য্যাৎ সল্লাপং কার্য্যসাধকম্ ॥ ৫১ ॥
অদর্শয়েৎ স্বাভিমতমননুভূতাদ্ বিনা সদা। জ্ঞাত্বা পরমতং সম্যক্ তেনাজ্ঞাতোত্তরং বদেৎ ॥ ৫২ ॥
দাম্পত্যে কলহে সাক্ষ্যং ন কুর্য্যাৎ পিতৃ পুত্রয়োঃ। সুগুপ্তকৃত্যমন্ত্রঃ স্যান্নত্যজেচ্ছরণাগতম্ ॥ ৫৩ ॥
যথাশক্তি চিকীর্ষেত্ত কুর্ব্বন্ মুহ্যেচ্চ নাপদি। কস্যচিন্ন স্পৃশেন্মর্ম্মমিথ্যাবাদং ন কস্যচিৎ ॥ ৫৪ ॥
নাশ্লীলং কীর্ত্তয়েৎ কিঞ্চিৎ প্রলাপং ন চকারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
অস্বর্গ্যং স্যাদ্ধর্ম্ম্যমপি লোকবিদ্বেষিতং তু যৎ। স্বহেতুভির্ণহন্যেত কস্য বাক্যং কদাচন ॥ ৫৬ ॥
প্রবিচার্য্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ। শত্রোরপি গুণাগ্রাহ্যা গুরোস্ত্যাজ্যাস্তু দুর্গুণাঃ ॥ ৫৭ ॥
উৎকর্ষো নৈব নিত্যঃ স্যান্নাপকর্ষস্তথৈব চ। প্রাক্‌কর্ম্মবশতো নিত্যং সধনো নির্ধনো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মৈত্রীং নৈব চ হাপয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
দীর্ঘদর্শী সদা চ স্যাত্ প্রত্যুৎপন্নমতিঃ ক্বচিৎ। সাহসী সালসী চৈব চিরকারী ভবেন্নহি ॥ ৬০ ॥
যঃ সুহুর্ণিষ্ফলং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। প্রাগাদৌ দীর্ঘদর্শী স্যাৎ স চিরং সুখমশ্নুতে ॥ ৬১ ॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে কাহাকেও গৃহের কথা কহিবে না; বহুঅর্থযুক্ত অল্পাক্ষর কার্য্যসাধক সদালাপ করিবে ॥ ৫১ ॥

কোন বিষয় যথার্থ না জানিয়া নিজের অভিমত প্রকাশ করিবে না; সম্যক্‌রূপে পরমত না জানিয়া, যাহার সিদ্ধান্ত জানা নাই, এরূপ বাক্য বলিবে না ॥ ৫২ ॥

দম্পতীর ও পিতা-পুত্রের কলহে সাক্ষ্য দিবে না; গোপনে মন্ত্রণা করিবে, শরণাগতকে ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৩ ॥

যথাশক্তি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, আপৎকালে মুগ্ধ হইবে না, কাহারও মর্ম্মে পীড়া দিবে না, কাহারও সম্বন্ধে মিথ্যা বাক্য কহিবে না ॥ ৫৪ ॥

অশ্লীলবাক্য কহিবে না ও অনর্থক বাক্য বলিবে না ॥ ৫৫ ॥

যাহা লোক-বিদ্বেষিত কার্য্য, তাহা ধর্ম্মযুক্ত হইলেও অস্বর্গ্য—অর্থাৎ স্বর্গ প্রদান করিতে পারে না; নিজের জন্য কখনও কাহারও বাক্য নষ্ট করিবে না ॥ ৫৬ ॥

বিচার করিয়া উত্তর দিবে; সহসা কোন বাক্য কহিবে না; শত্রুরও গুণ গ্রাহ্য, গুরুরও দুর্গুণ অগ্রাহ্য ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বদা সুখের অবস্থা কিম্বা দুঃখের অবস্থা হয় না; পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বশতঃ সর্ব্বদা ধনবান ও নির্দ্ধন হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

তজ্জন্য সর্ব্বজীবে সদ্ভাব ত্যাগ করিবে না ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বদা দীর্ঘদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে, কিন্তু কখনও দুঃসাহসী (অবিমৃষ্যকারী) অলস ও দীর্ঘসূত্রী হইবে না ॥ ৬০ ॥

প্রত্যুৎপন্নমতিঃ প্রাপ্তাং ক্রিয়াং কর্ত্তুং ব্যবস্যতি। সিদ্ধিঃ সাংশয়িকী তত্র চাপল্যাৎ কার্য্যগৌরবাৎ॥ ৬২॥
যততে নৈব কালেঽপি ক্রিয়াং কর্ত্তুং চ সালসঃ। ন সিদ্ধিস্তস্য কুত্রাপি স নশ্যতি চ সান্বয়ঃ॥ ৬৩॥
ক্রিয়াফলমবিজ্ঞায় যততে সাহসী চ সঃ। দুঃখভাগী ভবত্যেব ক্রিয়য়া তৎ ফলেন বা॥ ৬৪॥
মহৎকালেনাল্প কর্ম্ম চিরকারী করোতি চ। স শোচত্যল্প ফলতো দীর্ঘদর্শী ভবেদতঃ॥ ৬৫॥
সুফলং তু ভবেৎকর্ম্ম কদাচিৎ সহসাকৃতম্। নিষ্ফলং বাপি প্রভবেৎ কদাচিৎ সুবিচারিতম্॥ ৬৬॥
তথাপি নৈব কুর্ব্বীত সহসানর্থকারি তৎ। কদাচিদপি সঞ্জাতমকার্য্যাদিষ্টসাধনম্॥ ৬৭॥
যদনিষ্টং তু সৎকার্য্যান্নাকার্য্য-প্রেরকং হি তৎ॥ ৬৮॥
ভৃত্যো ভ্রাতাপি বা পুত্রঃ পত্নী কুর্য্যান্ন চব যত্। বিধাস্যন্তি চ মিত্রাণি তত্কার্য্যমবিশঙ্কিতম্॥ ৬৯॥
যোহিমিত্রমবিজ্ঞায় যথাতথ্যেন মন্দধীঃ। মিত্রার্থে যোজয়ত্যেনং তস্য সোঽর্থোঽবসীদতি॥ ৭০॥
নহি মানসিকো ধর্ম্মঃ কস্যচিজ্জ্ঞায়তেঽঞ্জসা। অতো যতেত তত্ প্রাপ্ত্যৈ মিত্র লব্ধির্বরা নৃণাং॥ ৭১॥

যে ব্যক্তি কোন কর্ম্ম অতি কষ্টসাধ্য জানিয়াও সেই কার্য্য করিতে চেষ্টা করে, সে যদি প্রথমে শীঘ্র দীর্ঘদর্শী হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মদ্বারা স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হয়। ৬১॥

যে ব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতি হইয়া উপস্থিত কার্য্য করিতে সদা চেষ্টা করে, সে চাপল্য বশতঃ সেই কার্য্যের গৌরব হেতু সিদ্ধি-সংশয়-ভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি হয় না॥ ৬২॥

যে অলস ব্যক্তি যথাসময়ে কার্য্য করিতে যত্ন না করে, তাহার কার্য্য-সিদ্ধি কখনও হয় না ও সে সান্বয়নাশ প্রাপ্ত হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি ক্রিয়ার ফল না জানিয়া কার্য্য করে, সেই সাহসী ব্যক্তি সেই কর্ম্ম দ্বারা অথবা কর্ম্মের ফলের দ্বারা দুঃখভাগী হয়। ৬৪॥

যে দীর্ঘসূত্র ব্যক্তি বহুকালে অল্পকার্য্য করে, সে সেই কার্য্যের অল্প ফল বশতঃ অনুতাপ করে; এজন্য দীর্ঘদর্শী হইবে। ৬৫॥

কোন কার্য্য সহসা করিলে, তাহা কদাচিৎ সুফলপ্রদ হয়; সুবিচারিত কর্ম্ম কদাচিৎ নিষ্ফল হয়। ৬৬॥

যদি কদাচিৎ কার্য্য সফলও হয়, তাহা হইলেও সহসা কার্য্য করিবে না; কারণ বিবেচনা করিয়া কার্য্য না করিলে, তাহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কদাচ কুকার্য্যে মঙ্গল সাধন হয় না, তজ্জন্য কুকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ৬৭॥

সৎকার্য্য হইতে যদি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও তাহা অকার্য্য-সাধক হয় না॥ ৬৮॥

ভৃত্য, ভ্রাতা, পুত্র বা পত্নী যে কার্য্য না করে, ঐ কার্য্য মিত্র নিঃশঙ্কচিত্তে সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৬৯॥

যে মূর্খ যথার্থরূপে মিত্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মিত্রের জন্য কোন কার্য্য করে, তাহার সেই কার্য্য নষ্ট হয়। ৭০॥

কাহারও মানসিক ধর্ম্ম যথার্থরূপে জানা যায় না (কেবল মিত্রেরই জানা যায়) তজ্জন্য মিত্রলাভে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু মনুষ্যের মিত্রলাভই শ্রেষ্ঠলাভ। ৭১॥

নাত্যন্তং বিশ্বসেত্ কঞ্চিদ্ বিশ্বস্তমপি সর্ব্বদা। পুত্রং বা ভ্রাতরং ভার্য্যামমাত্যমধিকারিণম্ ॥ ৭২ ॥
ধনস্ত্রীরাজ্যলোভো হি সর্ব্বেষামধিকো যতঃ। প্রামাণিকঞ্চানুভূতমাপ্তং সর্ব্বত্র বিশ্বসেৎ ॥ ৭৩ ॥
বিশ্বসিত্বাত্মবদ্ গূঢ়ন্তৎকার্য্যং বিমৃশেৎ স্বয়ং। তদ্বাক্যং তর্কতোঽনর্থং বিপরীতং ন চিন্তয়েৎ ॥ ৭৪ ॥
চতুঃষষ্টিতমাং শং তন্নাশিতং ক্ষময়েদথ। স্বধর্ম্মনীতি বলবাংস্তেন মৈত্রীং প্রধারয়েৎ ॥ ৭৫ ॥
দানৈর্মানৈশ্চসংকারৈঃ সুপূজ্যান্ পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৬ ॥
কদাপি নোগ্রদণ্ডঃ স্যাৎ কটুভাষণ তৎপরঃ। ভার্য্যা পুত্রোঽপ্যুদ্বিজতে কটুবাক্যাৎ প্রদণ্ডতঃ ॥ ৭৭ ॥
পশবোঽপি বশং যান্তি দানৈশ্চ মৃদুভাষণৈঃ ॥ ৭৮ ॥
ন বিদ্যয়া ন শৌর্য্যেণ ধনেনাভিজনেন চ। ন বলেন প্রমত্তঃ স্যাচ্চাভিমানী কদাচন ॥ ৭৯ ॥
নাপ্তোপদেশং সংবেত্তি বিদ্যামত্তঃ স্বহেতুভিঃ। অনর্থমপ্যভিপ্রেতং মন্যতে পরমার্থবৎ ॥ ৮০ ॥
মহাজনৈর্ধৃতঃ পন্থা যেন সন্ত্যজ্যতে বলাৎ। শৌর্য্যমত্তস্ত সহসা যুদ্ধং কৃত্বা জহাত্যসূন্।
ব্যূহাদি যুদ্ধকৌশল্যং তিরস্কৃত্য চ শস্ত্রবান্ ॥ ৮১ ॥
শ্রীমত্তঃ পুরুষো বেত্তি ন দুষ্কীর্ত্তিমজো যথা। স্বমূত্রগন্ধং মূত্রেণ মুখমাসিকতে স্বকং ॥ ৮২ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না; এমন কি—পুত্র, ভ্রাতা, ভার্য্যা, অমাত্য ও কর্ম্মচারীকেও সর্ব্বদা অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না ॥ ৭২ ॥

সকল মনুষ্যের ধন, স্ত্রী ও রাজ্যে অধিক লোভ হইয়া থাকে, তজ্জন্য সর্ব্বত্র প্রমাণ-সঙ্গত, সুপরিচিত ও হিতৈষী লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। ৭৩ ॥

বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় বিশ্বাস করিয়া গোপনে তাহার কার্য্য বিচার করিবে ও তাহার বাক্য তর্কদ্বারা অনর্থ-বিপরীত, এরূপ চিন্তা করিবে না। ৭৪ ॥

যদি স্বধর্ম্ম-নীতিতে বলবান হয়, তাহা হইলে সেই বিশ্বস্ত দ্বারা নাশিত কর্ম্মের চতুঃষষ্টি ভাগের এক ভাগকে ক্ষমা করিবে, অর্থাৎ গণনা করিবে না; তাহাতেও মিত্রতা রক্ষা করিবে। ৭৫।

দান, মান, সৎকার দ্বারা পূজনীয় ব্যক্তিদিগকে পূজা করিবে ॥ ৭৬ ॥

কখনও উগ্রদণ্ড ও কটুভাষণতৎপর হইবে না, কারণ কটুবাক্য ও দণ্ড হইতে ভার্য্যা-পুত্রও বিরক্ত হয়। ৭৭ ॥ পশুগণও দান ও মৃদুবাক্যে বশীভূত হয় ॥ ৭৮ ॥

বিদ্যা, শৌর্য্য, ধন, বংশ ও বলদ্বারা কখনও প্রমত্ত ও অভিমানী হইবে না ॥ ৭৯ ॥

বিদ্যামত্ত ব্যক্তি নিজ তর্কদ্বারা আপ্ত ব্যক্তির উপদেশ বুঝিতে পারে না। স্বাভিপ্রায় অনর্থ হইলেও পরমার্থ তুল্য জ্ঞান করে ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক মহাজন-ধৃত পথ পরিত্যাগ করে, যেরূপ শৌর্য্যমত্ত ব্যক্তি সহসা ব্যূহাদি যুদ্ধ-কৌশল ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার ন্যায় সে ব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করে ॥ ৮১ ॥

ঐশ্বর্য্যমত্ত ব্যক্তি অজের ন্যায় স্বীয় মূত্র-গন্ধরূপ দুষ্কীর্ত্তি জানিতে পারে না; যেরূপ ছাগ স্বমূত্রদ্বারা নিজের মুখ লেপন করে, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ব্যক্তি নিজের দুষ্কীর্ত্তি দ্বারা নিজের মুখকে অবনত করে ॥ ৮২ ॥

তথাভিজনমত্তস্তু সর্ব্বানেবাবমন্যতে। শ্রেষ্ঠানাপীতরান্ সম্যগকার্য্যে কুরুতে মতিম্ ॥ ৮৩ ॥
বলমত্তস্তু সহসা যুদ্ধে বিদধতে মনঃ। বলেন বাধতে সর্ব্বান্ পশ্বাদীনপি হস্তথা ॥ ৮৪ ॥
মানমত্তো মন্যতেঽসৌ তৃণবচ্চাখিলং জগৎ। অনর্হোঽপি চ সর্ব্বেভ্যস্ত্বত্যুর্চ্চাসনমিচ্ছতি ॥ ৮৫ ॥
মদা এতেঽবলিপ্তানাং সতামেতে দমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৮৬ ॥
বিদ্যায়াশ্চ ফলং জ্ঞানং বিনয়শ্চ ফলং শ্রিয়ঃ। যজ্ঞদানং বলফলং সদ্রক্ষণমুদাহৃতম্ ॥ ৮৭ ॥
নামিতাঃ শত্রবঃ শৌর্য্যফলঞ্চ করদীকৃতাঃ। শমোদমশ্চার্জ্জবং চাভিজনস্য ফলং ত্বিদম্।
মানস্য তু ফলং চৈতৎ সর্ব্বে স্বসদৃশা ইতি ॥ ৮৮ ॥
সুবিদ্যা মন্ত্রভৈষজ্য-স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। গৃহ্ণীয়াৎ সুপ্রযত্নেন মানমুৎসৃজ্য সাধকঃ ॥ ৮৯ ॥
উপেক্ষেতপ্রনষ্টং যৎ প্রাপ্তং যৎ তদুপাহরেৎ। ন বালং ন স্ত্রিয়ং চাতি লালয়েৎ তাড়য়েন্ন চ।
বিদ্যাভ্যাসে গৃহকৃত্যে তাবুভৌ যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৯০ ॥
পরদ্রব্যং ক্ষুদ্রমপি নাদত্তং সংহরেদণু। নোচ্চারয়েদঘং কস্য স্ত্রিয়ং নৈব চ দূষয়েৎ ॥ ৯১ ॥
ন ব্রূয়াদনৃতং সাক্ষ্যং কৃতং সাক্ষ্যং ন লোপয়েত্। প্রাণাত্যয়েঽনৃতং ব্রূয়াত্ সুমহত্ কার্য্যসাধনে ॥ ৯২ ॥

বংশমত্ততা সকল লোককে—গুরুলোক ও অন্য লোককে অবমানিত করে ও সম্যক্ প্রকারে অকার্য্যে মতি করিয়া দেয় ॥ ৮৩ ॥

বলমত্ত ব্যক্তি সহসা যুদ্ধে মনোভিনিবেশ করে ও সর্ব্বদা পশ্বাদিকেও পীড়া দেয় ॥ ৮৪ ॥

মানমত্ত ব্যক্তি সমস্ত জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করে; অযোগ্য হইলেও সকল লোকের নিকটে অত্যুচ্চ স্থান পাইতে ইচ্ছা করে ॥ ৮৫ ॥

গর্ব্বিত ব্যক্তির পক্ষে এই সকল দোষ মদের কারণ, কিন্তু সাধু ব্যক্তির এই সকল দম বলিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই সকল দোষ সাধু ব্যক্তির বিনয়ের কারণ হইয়া থাকে ॥৮৬

বিদ্যার ফল জ্ঞান ও বিনয়, ধনের ফল যজ্ঞ ও দান, বলের ফল সাধুর রক্ষণাবেক্ষণ, ইহা কথিত হইয়াছে ॥ ৮৭ ॥

শৌর্য্যের ফল শত্রুপরাজয় ও করদীকরণ, উচ্চ বংশের ফল শম, দম ও ঋজুতা, মানের ফল সকলকে আপনার সমান দেখা ॥ ৮৮ ॥

সাধক (কার্য্যার্থী) ব্যক্তি মান পরিত্যাগ করিয়া যত্নপূর্ব্বক দুষ্কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র, ঔষধ ও স্ত্রীরত্ন লাভ করিবে ॥ ৮৯ ॥

যে দ্রব্য নষ্ট হইবে, তাহা উপেক্ষা করিবে; যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে; বালক ও স্ত্রীকে অত্যন্ত আদর করিবে না ও তাড়না করিবে না; উহাদিগের উভয়কে যথাক্রমে বিদ্যাভ্যাসে ও গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করিবে ॥ ৯০ ॥

পরদ্রব্য ক্ষুদ্র হইলেও, যদি দত্ত না হয়, কিঞ্চিন্মাত্রও গ্রহণ করিবে না; কাহারও পাপ কীর্ত্তন করিবে না ও স্ত্রীলোককে দূষিত করিবে না ॥ ৯১ ॥

মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে না, কৃতসাক্ষ্য লোপ করিবে না; অত্যন্ত মহৎ কার্য্য সাধনে প্রাণ গত প্রায় হইলে (তদ্রক্ষার্থ-প্রয়োজন-স্থলে) মিথ্যা বলিবে ॥ ৯২ ॥

কন্যাদাত্রে তু হ্যধনং দস্যবে সধনং নরং। শুপ্তং জিঘাংসবে নৈব বিজ্ঞাতমপি দর্শয়েত্॥ ৯৩॥
জায়াপত্যোশ্চ পিত্রোশ্চ ভ্রাত্রোশ্চ স্বামিভৃত্যয়োঃ। ভগিন্যোর্মিত্রয়োর্ভেদং ন কুর্য্যাদ্গুরুশিষ্যয়োঃ॥৯৪॥
ন মধ্যাদ্গমনং ভাষাশালিনোঃ স্থিতয়োরপি। সুহৃদং ভ্রাতরং বন্ধুমুপচর্য্যাত্ সদাত্মবত্॥ ৯৫॥
গৃহাগতং ক্ষুদ্রমপি যথার্হং পূজয়েত্ সদা। তদীয়কুশলপ্রশ্নৈঃ শক্ত্যাদানৈর্জলাদিভিঃ॥ ৯৬॥
সপুত্রস্তু গৃহে কন্যাং সপুত্রাং বাসয়েন্ন হি। সভর্তৃকাঞ্চ ভগিনীমনাথত্বে তু পালয়েত্॥ ৯৭॥
সর্পোঽগ্নির্দুর্জ্জনো রাজা জামাতা ভগিনীসুতঃ। রোগঃ শত্রুর্নাবমন্তোঽল্পোঽপ্যল্প ইত্যুপচারতঃ॥ ৯৮॥
ক্রৌর্য্যাত্ তৈক্ষ্ণ্যাদ্ দুঃখভাবাত্ স্বামিত্বাত্ পুত্রিকাভয়াত্। স্বপূর্ব্বজপিণ্ডদত্বাদ্ বৃদ্ধিভীত্যামুপাচরেত্॥৯৯॥
ঋণশেষং রোগশেষং শত্রুশেষং ন রক্ষয়েত্। যাচকাদ্যৈঃ প্রার্থিতঃ সন্নতীক্ষ্ণং চোত্তরং বদেৎ।
তৎকার্য্যন্তু সমর্থশ্চেৎ কুর্য্যাদ্ বা কারয়ীত চ॥ ১০০॥

জানিয়া শুনিয়া, কন্যাদাতাকে নির্ধনব্যক্তি, দস্যুকে ধনী ও হত্যাকারীকে লুক্কায়িত ব্যক্তি দেখাইবে না॥ ৯৩॥

দম্পতির, পিতা-মাতার, ভ্রাতার, প্রভু-ভৃত্যের, ভগিনীর, মিত্রের ও গুরু-শিষ্যের মনোভঙ্গ করিবে না। ৯৪॥

দুই ব্যক্তি কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন অথবা বসিয়া আছেন, এরূপ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিবে না; সুহৃৎ, ভাই ও বন্ধুর প্রতি সর্ব্বদা আপনার ন্যায় ব্যবহার করিবে।৯৫॥

গৃহাগত নীচ ব্যক্তিকেও যথাযোগ্যরূপে সর্ব্বদা পূজা করিবে; তাহার কুশল-প্রশ্ন ও যথাশক্তি জলাদি দানে সেবা করিবে॥ ৯৬॥

পুত্রবান ব্যক্তি গৃহে সপুত্রা কন্যাকে ও স্বামী সহ ভগিনীকে বাস করিতে দিবে না, কারণ উহাতে বিবাদ হইতে পারে; কিন্তু অনাশ্রয় হইলে, উহাদিগকে পালন করিবে। ৯৭॥

সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, শত্রু ও বালক, ইহাদিগকে স্বভাবতে অবমাননা করিবে না॥ ৯৮॥

খল স্বভাব বশতঃ সর্পকে, দাহিকা-শক্তি বশতঃ অগ্নিকে, দুঃখদাতৃত্ব বশতঃ দুর্জ্জনকে, স্বামিত্ব বশতঃ রাজাকে, কন্যার ক্লেশ ভয় বশতঃ জামাতাকে, পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদাতৃত্ব বশতঃ ভাগিনেয়কে, বৃদ্ধি বশতঃ রোগকে, ভয় বশতঃ শত্রুকে যত্ন করিবে। ৯৯॥

ঋণ-শেষ, রোগ-শেষ ও শত্রু-শেষ রাখিবে না; ভিক্ষু আদি প্রার্থনা করিলে, কর্কশ উত্তর দিবে না; সমর্থ হইলে তৎসম্পূরণ করিবে অথবা করাইবে॥ ১০০॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

১

য একোজালবান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ঈশিত ঈশিনীভিঃ।
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

অন্বয়। য একোজালবান্ (পরমাত্মা) ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে ইতি জ্ঞেয়ং) সর্ব্বাণ্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে।) য (জগতাং) উদ্ভবে সম্ভবে চ একএব, এতৎ (এতম্ পরমাত্মানং) যে বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষম পদব্যাখ্যা। য—যে। একঃ—অদ্বিতীয়। জালবান্—জালং [মায়া] তদস্তি অস্য ইতি, মায়াবী ইত্যর্থঃ; উক্তঞ্চ গতায়াং "মম মায়া দুরত্যয়া" মায়াবী। ঈশিনীভিঃ—স্বশক্তিভিঃ, নিজের শক্তির দ্বারা। ঈশিত—ঈষ্টে নিয়ময়তি ইতিভাবঃ, অত্র ঈশিত ইতিপদং ছান্দসং ঈষ্টে ইত্যবগন্তব্যং, নিয়মিত করেন। সর্ব্বাণ্—সকলান্ সকল। লোকান্—ভুবনানি তৎস্থজনানীত্যপ্যভিপ্রায়ঃ—তথাচ কোষঃ—"লোকস্তু ভুবনে জনে" ভুবন—অর্থাৎ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ। ঈশিনীভিঃ—পরমশক্তিভিঃ—স্বকীয় পরম শক্তি দ্বারা। ঈশিত—বিভর্ত্তি, নিয়ময়তি চ, ভরণ এবং নিয়মিত করেন। যঃ—যিনি। উদ্ভবে—উৎপত্তিকালে—অর্থাৎ জগতের আদিম অবস্থায়। সম্ভবে চ—পরিপালন বিষয়ে চ স্থিতৌ ইতি তাৎপর্য্যং। এবং জগতের পরিপালন বিষয়ে—অর্থাৎ বিশ্বস্থিতি বিষয়ে। একঃ এব হেতুরিতি শেষঃ, একমাত্র হেতু। এতৎ—এতম্—এতাদৃশ পরমাত্মাকে। যে বিদুঃ—যাঁহারা জানিতে পারেন; তে অমৃতাঃ ভবন্তি, তাঁহারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অমর হয়েন।

বঙ্গার্থ। যে অদ্বিতীয় মায়াবী পরম পুরুষ স্বকীয় পরম শক্তিবলে দৃষ্টাদৃষ্ট তাবৎ পদার্থ নিয়মিত করিতেছেন; যিনি তাঁহার সেই মায়াশবলিত শক্তি দ্বারা বিশ্বভুবন পরিপালন করিয়া থাকেন; জগতের উৎপত্তি এবং রক্ষণ বিষয়ে যিনিই একমাত্র হেতু, অর্থাৎ যিনি ব্যতীত বিশ্বের উৎপাদন এবং পরিরক্ষণের আর অন্য কোন কর্ত্তা নাই, এতাদৃশ "দুরত্যয়া" মায়াবিশিষ্ট পরম শক্তিশালী পরমাত্মাকে যাঁহারা অবগত হয়েন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন, মর হইয়াও অমর-পদের অধিকারী হয়েন।

২

একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাল্লোঁকানীশিত ঈশিনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোপান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

অন্বয়। হি (যস্মাৎ) রুদ্রঃ একঃ, য ইমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায় ন তস্থুঃ। (সঃ) জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, (স চ) বিশ্বাঃ ভুবনানি সংসৃজ্য, (তেষাং ভুবনানাং) গোপাঃ (ভবতি) চ (এবঞ্চ) অন্ত-কালে সঞ্চুকোপ।

বিষম পদব্যাখ্যা। হি—যেহেতু। রুদ্রঃ—রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি নিপাতনে র, যদ্বা "রুৎ" দুঃখং দ্রাবয়তি অপসারয়তি ইতি রুৎ+দ্রাবি+ডঃ "রুদ্রঃ" যদ্বা—"রুতঃ" শব্দরূপাঃ উপনিষদঃ, তাভিঃ রূয়তে প্রতিপাদ্যতে ইতি "রুদ্রঃ" যদ্বা "রুতঃ" শব্দা-ত্মিকা বাণী, তৎপ্রতিপাদ্যা আত্মবিদ্যা বা, তাম্ উপাসকেভ্যঃ রাতি দদাতীতি রুৎ+রা+ড—"রুদ্রঃ"। যদ্বা রুণদ্ধি আবৃণোতি ইতি "রুৎ" অন্ধকারাদিঃ তম্ দৃণাতি বিদারয়তি ইতি "রুদ্রঃ"। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা রুদ্র। একঃ—অদ্বিতীয়। যঃ ঈমান্ লোকান্ ঈশিনীভিঃ ঈশিত (ঈষ্টে) যিনি স্বকীয় শক্তিবলে এই লোক-সমূহ নিয়মিত করিতেছেন। (অতঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ) দ্বিতীয়ায়—এইজন্য ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয়। ন তস্থুঃ—ন স্বাকুর্ব্বন্তি, স্বীকার করেন না। "দ্বিতীয়ায়" ইত্যত্র ক্রিয়াভিপ্রায়ে চতুর্থী। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ অত্র তস্থুরিতি পদস্য স্বীকারার্থঃ সোঢ়ব্যঃ, তথাচ শাব্দিকাঃ—"ক্রিয়াবাচিত্বমাখ্যাতুং প্রসিদ্ধোঽর্থঃ প্রদর্শিতঃ। প্রয়োগতোঽন্যে মন্তব্যা অনেকার্থাহি ধাতবঃ।" সঃ—তিনি। জনান্ প্রত্যঙ্—প্রতিপুরুষং ইত্যর্থঃ। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতিভাবঃ, প্রতিপুরুষেতেই অবস্থান করিতেছেন। বিশ্বাঃ—(বিশ্বানি ইতি জ্ঞেয়ং) সমস্ত। ভুবনানি—ভুবন। সংসৃজ্য—উৎপাদ্য—সৃষ্টি করিয়া। গোপাঃ (ভবতি) রক্ষিতা ভবতি—গোপ্তা ভবতীতি যাবৎ, তাহাদের রক্ষক অর্থাৎ গোপ্তা হয়েন। চ—এবং, অন্তকালে—প্রলয়কালে। সঞ্চুকোপ—কোপমাবিশ্য প্রলয়ং আতনোতি—ইতিভাবঃ, কোপাবেশপূর্ব্বক প্রলয় বিধান করেন।

বঙ্গার্থ। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই তদীয় পরম শক্তির সাহায্যে এই নিখিল ভুবন নিয়মিত করিতেছেন বলিয়া তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্ব-বিধান বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিরচন-কার্য্যে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কোন দ্বিতীয় কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব নাই। সেই শক্তিমান্ পরম পুরুষ প্রতিনিয়ত প্রতি পদার্থের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন; শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, "তিনি রূপে রূপে প্রতিরূপ" হইয়াছেন। একমাত্র তিনিই এই নিখিল বিশ্বের উৎপাদনপূর্ব্বক ইহার পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এবং তিনিই আবার যুগান্তকালে কোপাবিষ্ট হইয়া প্রলয় বিধান পুরঃসর তাঁহার স্বরচিত বিশ্বের সংহার

সাধন করেন। অতএব তিনি গুণাতীত হইলেও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ, এই ত্রিশক্তির কার্য্য তাঁহা হইতেই নিষ্পাদিত হইয়া তাঁহাতেই উপরত হয়। সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়, এই অবস্থাত্রয়, একমাত্র তাঁহারই মায়াময়ী শক্তির স্তরভেদ মাত্র। তাই পূর্ব্বানুশাসনে, সেই মায়ানির্ম্মুক্ত পরম দেবতাকে "মায়াবী জালবান্" এই বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে, এবং এই জন্যই তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ একমাত্র তাঁহাকেই জগতের কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি রজঃ-শক্তিবলে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া "ব্রহ্মা" এই আখ্যা, সত্ত্ব-শক্তিবলে বিশ্বের বিকাশ ও পালন করিয়া "বিষ্ণু" এই আখ্যা, এবং তমঃশক্তিবলে বিশ্বের ধ্বংস করিয়া "রুদ্র" এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন; তিনি কার্য্যতঃ আখ্যাত্রয় সম্পন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক, অদ্বিতীয় এবং অনন্ত। তিনি ব্যতীত জগতের অন্য স্রষ্টা, পালয়িতা বা সংহর্ত্তা নাই।

৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখঃ বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥

অন্বয়। (সঃ) বিশ্বতশ্চক্ষুঃ (উত), বিশ্বতোমুখঃ (উত) বিশ্বতোবাহুঃ বিশ্বতস্পাৎ একঃ দেবঃ দ্যাবাভূমী জনয়ন্ বাহুভ্যাং (মনুষ্যাদীনিতি শেষঃ) সম্পতত্রৈঃ (পক্ষ্যাদীংশ্চেতি শেষঃ) সংধমতি।

বিষম পদব্যাখ্যা। বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—বিশ্বতঃ সর্ব্বপ্রাণিগতানি চক্ষূংষি যস্য, সঃ সর্ব্বদ্রষ্টা। উত—চ, এবং। বিশ্বতোমুখঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বমুখ—অর্থাৎ তিনিই গ্রহণ করেন, তিনিই উচ্চারণ করেন ইত্যাদি। বিশ্বতোবাহুঃ—পূর্ব্ববৎ সমাসঃ—সর্ব্বত্র বাহুরূপেণ স বিরাজতে, তিনি সর্ব্বত্র বাহুরূপে বিরাজ করিতেছেন, অর্থাৎ জীবের বাহু দ্বারা তিনিই সকল কার্য্য করেন, জীব নিমিত্ত মাত্র। বিশ্বতস্পাৎ—সমাসঃ পূর্ব্ববৎ, সর্ব্বত্রগ, সর্ব্বগামী। একঃ—অদ্বিতীয়। দ্যাবাভূমী—স্বর্গমর্ত্ত্য। জনয়ন্—উৎপাদিত করিয়া। বাহুভ্যাং মনুষ্যাদীন্—বাহু যুগল দ্বারা মনুষ্যদিগকে। পতত্রৈঃ—পক্ষ্যাদীন্—পক্ষ দ্বারা পক্ষীদিগকে। সংধমতি—সংযোজয়তি—সংযুক্ত করেন। ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ অত্র ধমতেঃ সংযোজনার্থঃ।

বঙ্গার্থ। সেই মহামহিম বিরাট্ পুরুষের চক্ষু সর্ব্বত্রই প্রণিহিত রহিয়াছে; তিনি সর্ব্বত্রই দেখিতে পান, সর্ব্বত্রই তাঁহার মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার পাদ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বগ্রাহক, সর্ব্বধারক এবং সর্ব্বগামী। সেই অদ্বিতীয় পরম দেবতা আকাশ এবং পৃথিবী উৎপাদিত করিয়া, মনুষ্যাদিকে বাহুদ্বারা এবং বিহঙ্গমাদিকে পক্ষদ্বারা সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনিই স্বর্গ-মর্ত্ত্যের একমাত্র স্রষ্টা; এ বিশ্বভুবনে তাঁহার অগম্য—অগ্রাহ্য—অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য কিছুই নাই। এই অনুশাসনে তাঁহার বিরাট্পুরুষত্ব বর্ণিত হইল। গীতায়ও উক্ত হইয়াছে, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে" ইত্যাদি।

৪

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়ঃ। দেবানাং প্রভবঃ, উদ্ভবঃ চ, বিশ্বাধিপঃ, মহর্ষিঃ, যো রুদ্রঃ পূর্ব্বং হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস, সঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা। প্রভবঃ—উৎপত্তিহেতুঃ—উৎপত্তির হেতু। উদ্ভবঃ—শক্তির হেতু। বিশ্বাধিপঃ—বিশ্বপতি। মহর্ষি—সর্ব্বজ্ঞ। যো রুদ্র—যে রুদ্রদেব। পূর্ব্বং—সৃষ্টির পূর্ব্বে। হিরণ্যগর্ভং—হিতং রমণীয়ং অত্যুজ্জ্বলং জ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যস্য—তম্, অত্যুজ্জ্বল-জ্ঞানসম্পন্ন—"হিরণ্যগর্ভ" পুরুষকে। জনয়ামাস—সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সঃ—সেই পরমশক্তিশালী পুরুষ। নঃ—অস্মান্—আমাদিগকে। শুভয়া বুদ্ধ্যা—আত্মার মঙ্গলকরী বুদ্ধিদ্বারা। সংযুনক্তু—সংযুক্ত করুন, আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অনুকূলা শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

বঙ্গার্থ। যাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রাপ্তিপূর্ব্বক অমর-রাজ্যের আধিপত্য করিতেছেন, যিনি এই বিশ্বভুবনের একমাত্র অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার অজ্ঞেয় কিছুই নাই, যে সর্ব্বজ্ঞ রুদ্ররূপে সৃষ্টির প্রাকালে অত্যুজ্জ্বলজ্ঞানসম্পন্ন "হিরণ্যগর্ভ" পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই পরম দেব অদ্বিতীয় চিরন্তন পুরুষ আমাদিগকে পরমপদপ্রাপ্তির অনুকূলা আত্মার মঙ্গলকরী শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্মদর্শিনী ধীশক্তি দ্বারা শক্তিমান্ করুন। এই প্রকারে প্রার্থনা করিতে হইবে।

৫

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥

অন্বয়। হে রুদ্র! হে গিরিশন্ত! তে যা শিবা অঘোরা অপাপকাশিনী তনূঃ (অস্তি ইতি শেষঃ) তয়া শন্তময়া তনুবা নঃ অভিচাকশীহি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। গিরিশন্ত!—"গিরৌ" স্থিত্বা "শং" সুখং তনোতীতি গিরিশন্তঃ—(সম্বোধনমিদং) যিনি গিরিপরে থাকিয়া সুখ বিস্তার করেন। শিবা মঙ্গলময়ী শিবা অবিদ্যা এবং তৎকার্য্যবিনির্মুক্তা—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দাদ্বয়ব্রহ্মরূপা। অঘোরা সুখপ্রদা, শশিবিম্ববৎ আনন্দ দায়িনী। অপাপকাশিনী—স্মরণ মাত্র পাপনাশিনী—অর্থাৎ পুণ্যাভিব্যক্তিকরী। তনূঃ—শরীর। তয়া সেই। শন্তময়া—সুখতমা—অর্থাৎ নিরতিশয় সুখময়ী। তনুবা—(তন্বা ইতি জ্ঞেয়ং তণুবেতি ছান্দসং) তনু দ্বারা নঃ অস্মান্, আমাদিগকে। অভিচাকশীহি—অভিপশ্য—দর্শন কর; অর্থাৎ শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর।

বঙ্গার্থ। হে রুদ্র! হে গিরিশন্ত! হে অনন্ত আনন্দময়! তুমি পর্ব্বতশায়ী হইয়া বিশ্বের মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্রতী রহিয়াছ, তাই তোমার নিকট এই নিবেদন যে, তোমার যে মঙ্গলময়ী, অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য হইতে নির্লিপ্তা, অভয়প্রদা, কৌমুদী সদৃশ প্রীতিদায়িনী এবং পুণ্যাভিব্যক্তিকরী—অর্থাৎ স্মরণমাত্রে কলুষহারিণী তনু আছে, তুমি করুণা করিয়া একবার সেই অনন্ত সুখময়ী তনুদ্বারা আমাদিগকে অবলোকন কর, অর্থাৎ তোমার সেই মহিমাশালিনী তনুর মহামহিমত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সামর্থ্য প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রেয়ঃ দ্বারা নিযুক্ত কর। আমাদিগের শ্রেয়ঃ বিধান কর, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

আমরা পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে রাধা নক্ষত্র পর্য্যন্ত, আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করিয়াছি, রাসলীলার বোধন করিয়াছি। কিন্তু বলদেব, নন্দগোপ, যশোদা-দেবী এবং রোহিণীদেবীর অভাবে রাসলীলা আরম্ভ হইতে পারে না। অন্য গ্রহের ন্যায় আদিত্য দেবের ক্রূর গতি নাই, (১) সুতরাং নন্দরাজ-ভবনে শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার উপায় রহিত ; (২) অতএব এক্ষণে বলদেব আদিকে নন্দালয় হইতে রাসলীলায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইতেছে। বহু পর্য্যটনের প্রয়োজন নাই।

ঐ দেখ, একবার রাশিচক্রে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কলাবতী চন্দ্রমার পশ্চাদ্ভাগে

(১) Retrograde motion.

(২) রাশিচক্রে, আদিত্যদেব, মেষরাশি হইতে ক্রমে পূর্ব্বদিকে, বৃষ আদি দ্বাদশ রাশি এক বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। বৃষ রাশিতে নন্দালয়, মিথুন রাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের পশ্চিমে বৃষরাশি অবস্থিত ; সুতরাং রাশিচক্র পর্য্যটন না করিলে শ্রীকৃষ্ণ বৃষ রাশিতে কিরূপে যাইবেন ?

বৃষবীথীতে (১) বৃষরাশির মধ্যে যশোদাদেবী (২) এবং রোহিণীদেবী (Aldebaran in Hyades) বিরাজ করিতেছেন। বৃষ রাশিস্থ স্বর্গা ইন্দ্রদেব (৩)। দেবরাজ-সখা নন্দরাজ কোথায়? যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং। সুতরাং আমরা আপাততঃ নন্দরাজকে বৃষরাশিতে স্থাপন করিলাম। বিচার পরে হইবে।

যথাস্থানে বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে বলদেবের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত নাই। যথাস্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে ঋষিবাক্যে বলদেবের জন্ম-বিবরণ প্রকাশিত নাই। যথাস্থানে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জন্মখণ্ডে সঙ্কর্ষণ দেবের (৪) জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত আছে। কিন্তু এক বার এই সঙ্গে বুধ-জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ কর (৫) ৪র্থ বসুদেব-পুত্র সঙ্কর্ষণ রোহিণী-গর্ভজাত বলিয়া রৌহিণেয় নাম পাইলেন, কিন্তু দেবকী-নন্দন কিম্বা বসুদেব-নন্দন নাম পাইলেন না। ৩য় বসুদেব (৬) পুত্র বুধ সৌম্য নাম পাইলেন, কিন্তু তারকানন্দন কি তারাসুত নাম পাইলেন না। উভয়ের জন্মবৃত্তান্ত রূপক-মূলক। আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে বুধের আবিষ্ক্রিয়া-ঘটনায় পাই যে, বুধ রৌহিণেয়। পুরাণে রূপক-ভঙ্গভয়ে ইহার ইতিহাস নাই, যে কি কারণে বুধ রৌহিণেয় নাম পাইলেন।

এক্ষণে দেখা যায় যে, বলদেবের নাম রৌহিণেয়। বুধের নাম রৌহিণেয়। গদাধারী (৭) এক রৌহিণেয় শ্রীকৃষ্ণের চিরসঙ্গী। গদাধারী অপর রৌহিণেয় আদিত্য দেবের চিরসঙ্গী (৮) আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ হইলে বলদেবকে ন্যায় মতে বুধগ্রহ বলা যায়। ঘরের বলাই দাদা ঘরেই আছেন; অন্যত্র সন্ধানের দরকার কি? "গৃহেচেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ"। এক্ষণে আমরা রাসলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

(১) বৃষরাশির পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে স্থিত দুই ধ্রুবক রেখার মধ্যবর্ত্তী গোলকাংশকে বৃষবীথী বলা হইল।

(২) বৃষরাশিস্থ পাটলবর্ণা দেবমাতৃকা কৃত্তিকা ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে দেবসেনা বা ষষ্ঠী নামে অভিহিতা ।।ং "তাং বদন্তি মহাষষ্ঠীং পণ্ডিতাঃ শিশুপালিকাং"। দেবমাতৃকা শ্রীকৃষ্ণ লীলায় যশোদা নাম পাইয়াছেন জ্যোতিষ্মতী বলিয়া। "যশসি ধবলতা"

(৩) জ্যেষ্ঠ মূলে ভবেদিন্দ্রঃ ইতি কৌর্ম্মে ১৮ অধ্যায়।

(৪) দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে কংসো রক্ষাং দদৌ ভিয়া।
রোহিণীজঠরে মায়া তম্ আকৃষ্য ররক্ষ চ।।
তস্মাত্ বভুব ভগবান্ নাম্না সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।।

(৫) তারকা-গর্ভসম্ভূতঃ স এব চ বুধঃ স্বয়ং। প্রকৃতিখণ্ডে ৬১ অধ্যায়।

(৬) ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চ অনিলোঽনলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাতশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাত্ স্মৃতাঃ।।
গদা বরদখড়্গিণং ইতি গ্রহযাগতত্ত্বে।

(৭) মুষলী মুষলায়ুধাত্।

(৮) বুধগ্রহ সূর্য্যের ৩০ অংশের মধ্যে থাকেন বলিয়া সূর্য্যকিরণে প্রায়শঃ গুপ্ত।

রাস-পূর্ণিমা।

কিরীট মণ্ডল
বিশাখা
স্বাতী
অনুরাধা
জ্যেষ্ঠা
জলবিষুব সংক্রান্তি
চিত্রা
হস্তা
বৃশ্চিক
তুলা
কন্যা
সিংহ
কর্কট
মিথুন
বৃষ
মেষ
মীন
কুম্ভ
মকর
ধনু
সূর্য্য
পৃথিবী
চন্দ্র
কর্কট ক্রান্তি
পুনর্ব্বসু
আর্দ্রা
মৃগশিরা
রোহিণী
কৃত্তিকা
ভরণী
অশ্বিনী
মহাবিষুব সংক্রান্তি
রেবতী
উত্তরভাদ্রপদ
পূর্ব্বভাদ্রপদ
শতভিষা
ধনিষ্ঠা
শ্রবণা
উত্তরাষাঢ়া
মকরক্রান্তি
পূর্ব্বাষাঢ়া
মূলা
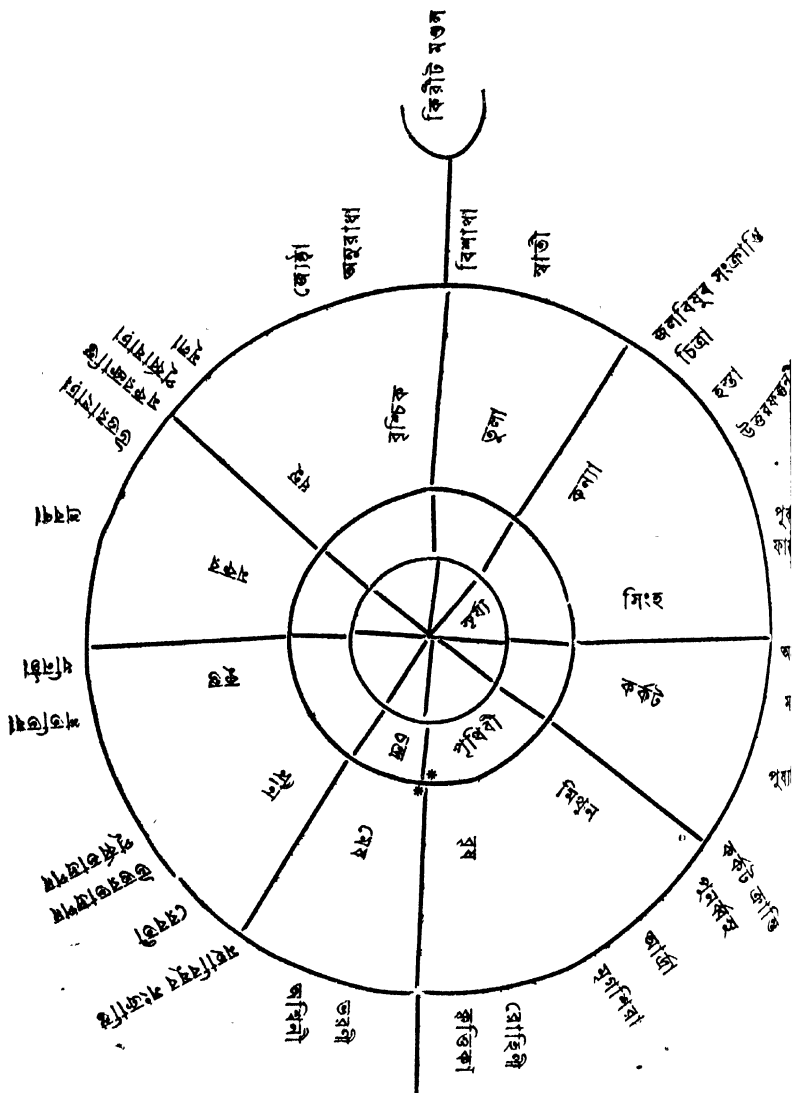
আর একবার রাশি চক্রে দৃষ্টিপাত কর। দেখিবে, দ্বাদশ রাশিস্থিত সপ্তবিংশতি নক্ষত্র মধ্যে, কেবল পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, স্বাতী, বিশাখার উত্তরস্থ এক তারকা এবং

রাশি	নক্ষত্র	তারা সংখ্যা	আকৃতি	অধিষ্ঠাতৃ দেবতা	
	অশ্বিনী	৩	ঘোটক-মুখ	অশ্বি	Aries
মেষ	ভরণী	৩	ত্রিকোণ	যম	Musca
	কৃত্তিকা	৬	অগ্নিশিখা	দহন	Pleiades
বৃষ	রোহিণী	৫	শকট	কমলজ	Hyades
	মৃগশিরা	৩	বিড়ালপদ	শশি	O
মিথুন	আর্দ্রা	১	পদ্ম	শূলভৃৎ	Betelgeuose
	পুনর্ব্বসু	৫	ধনু	অদিতি	Castor etc
কর্কট	পুষ্যা	৩	বাণ	জীব	Asellus
	অশ্লেষা	৬	চক্র	ফণি	Hydra
	মঘা	৫	লাঙ্গল	পিতৃগণ বা যম	Regulus
সিংহ	পূঃ ফাল্গুনি	২	খড়্গা	যোনি	Zosma & Subra,
	উঃ ফাল্গুনি	২	খড়্গা	অর্য্যমা	Denebola & another
কন্যা	হস্তা	৫	হস্ত	দিনকৃৎ	Curvus.
	চিত্রা	১	মুক্তা	ত্বষ্টৃ	Spica.
তুলা	স্বাতী	১	কুঙ্কুমবর্ণ	পবন	Arcturus.
	বিশাখা	৪	তোরণ	শক্রাগ্নি	Akrob, Dschubba. and others.
বৃশ্চিক	অনুরাধা	৭	সর্প	মিত্র	Antares etc.
	জ্যেষ্ঠা	৩	শূকর-দন্ত বা কুণ্ডল	শক্র	O
	মূলা	৯	শঙ্খ	নিঋর্তি	Lesath etc.
ধনু	পূঃ আষাঢ়া	৪	শয্যা	তোয়	Kaus
	উঃ আষাঢ়া	৪	সূর্প	বিশ্ববিরিঞ্চি	O
	(ত্যক্তা)				
মকর	শ্রবণা	৩	শর	হরি	Aquila
	ধনিষ্ঠা	৫	মর্দ্দল	বসু	Delphinus
কুম্ভ	শতভিষা	১০০	মণ্ডল	বরুণ	O
	পূঃ ভাদ্রপদ	২	খড়্গ	অজপাদ	Enif & Homan.
মীন	উঃ ভাদ্রপদ	৪	পর্য্যঙ্ক	অহিব্রধ্ন	Square of Pegasus
	রেবতী	৩২	মৎস্য	পূষা	Piscis.
(ত্যক্তা)	অভিজিতা	৩০	শৃঙ্গাটক	বিরিঞ্চি	Vega Etc.

শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, এই ছয়টী নক্ষত্র অয়নমণ্ডলের ঊর্দ্ধে, গোলকের কদম্বের (১)। সন্নিহিততর। কুরুক্ষেত্র পর্ব্বে আমরা প্রথম দুইটীর পরিচয় দিব। দ্বিতীয় দুইটী কৃষ্ণলীলার ললিতা ও শ্রীরাধা, তৃতীয় দুইটীর পরিচয় তৃতীয় অঙ্কে হইবে। ঐ দেখ, শ্রীরাধার কিরীট রাশিচক্রের এক ধনুর (২) শিরোভাগে উচ্চাসনে আসীন। বামে ললিতা সখী। অপর সখীগণ মধ্যে চন্দ্রাবলী (হস্তা) (৩) রাশি চক্রের দক্ষিণে, চিত্রলেখা (চিত্রা নক্ষত্র) রাশি-চক্রের মধ্যে। ললিতা (স্বাতী) ও শ্রীরাধার (বিশাখার) (৪) অবস্থিতির স্থান উপরে বর্ণিত হইয়াছে। রঙ্গদেবী (৫) রাশি চক্রের মধ্যে অবস্থিত। সুদেবী (৬) চম্পকলতা (৭) রাশিচক্রের দক্ষিণে অবস্থিত। তুঙ্গদেবী তুঙ্গে (৮) ও ইন্দুলেখা (৯) রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। অয়ন-মণ্ডলের অপর ধনুর শিরোভাগে বৃষ রাশিতে, যশোদা দেবী (দেবমাতৃকা কৃত্তিকা) (১০) এবং বলদেব-মাতা রোহিণীদেবীর বামে কলাবতী কৌমুদী চন্দ্রিমার অবস্থিতি-স্থান।

ঐ দেখ, কলাবতী আশ্বিনী পূর্ণিমা অশ্বিনী নক্ষত্রে অবস্থিতি করিয়া রাস-দর্শনোল্লাসে দ্রুতবেগে রাশিচক্রে ধাবমানা। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধায় রাসলীলার মন্ত্রণা হইতেছে। কলাবতী অশ্বিনী হইতে ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা আদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিতেছেন, আর ক্রমে জামাতার নিকটস্থ হইতেছেন বলিয়া ক্রমে নীল অবগুণ্ঠনে মুখ-কমল আচ্ছাদন করিতেছেন (১১) পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে (১২) বিষ্ণু তারক দর্শনে কলাবতী ৮ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৩)। ক্রমে শ্রীরাধা নক্ষত্রে উপনীত হইয়া জামাতৃ সন্দর্শনে ১৬ কলা আচ্ছাদন করিলেন (১৪) অনুরাধায় উপনীত হইয়া কলাবতী অবগুণ্ঠন বিমোচনের

---

(১) ধ্রুব ও অভিজিত্ নক্ষত্রের প্রায় মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ধ্রুব হইতে ২৪ অংশ দূরে কদম্ব অবস্থিত। ধ্রুবাত্ জিন লবান্তরে ইতি ভাস্করাচার্য্য।

(২) বৃত্তার্দ্ধ Amphi theatre.

(৩) হস্তার ৫ নক্ষত্র চন্দ্রবত্ শুক্লবর্ণ।

(৪) বিশাখার তিনপদ তুলারাশিতে এবং একপদ বৃশ্চিক রাশিতে এবং উত্তরস্থ তারকা অয়নমণ্ডলের উত্তরে এবং অন্য তিনটী দক্ষিণে, এজন্য দ্বিবচনের ব্যবহার। রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড। বিশাখার কিরীটে ১০টী নক্ষত্র।

(৫) অনুরাধার দ্বিতীয় তারা নরক লোহিতবর্ণ বলিয়া অনুরাধার রঙ্গদেবী নাম। ন—রক অর্থে ন—সূর্য্য। রকঃ স্ফটিক সূর্য্যয়োঃ। ইত্যমরঃ।

(৬) জ্যেষ্ঠা বক্রাকৃতি বলিয়া সুদেবী নাম Line of beauty.

(৭) মূলা লতাকৃতি।

(৮) তুঙ্গস্থ বলিয়া পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র তুঙ্গদেবী নাম পাইয়াছেন।

(৯) সূর্পাকার শুক্লবর্ণ চতুস্তারকাময় উত্তরাষাঢ়া ইন্দুলেখা বটে।

(১০) চতুর্থং মাতৃমণ্ডলং—কাশীখণ্ড।

(১১) কৃষ্ণপক্ষের কলাক্ষয় (১৩) কার্ত্তিকী কৃষ্ণাষ্টমী বা গোপাষ্টমী (১২)। পুনর্ব্বসু শব্দে বসুর ৣ অংশ। বসু. =৮।— সুতরাং ৮ × ৣ =৬। অর্থাত্ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ৬টী তারক। বর্ত্তমান হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্রে ৫টী

উদ্যম করিলে দেখেন, শ্রবণাবস্থিত ত্রিবিক্রম সম্মুখে—শ্বশ্রূ দর্শনে মহাপুলকিত। কলাবতী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতভাবে শ্রবণা অতিক্রম করিয়া ধনিষ্ঠাদি এক এক নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া মুখ-কমলের নীল অবগুণ্ঠন ক্রমে ক্রমে মোচন করিতে করিতে চলিলেন; (১৫) অবশেষে বৃষ রাশিতে উপনীত হইয়া কৃত্তিকা ও রোহিণীর বামভাগে আসিয়া আশ্বস্তভাবে আনন্দে নীল অবগুণ্ঠন একেবারে বিমোচন করিয়া আদরাসনে তুঙ্গে আসীন হইলেন, অমনি কার্ত্তিকী পূর্ণিমার কৌমুদী পৌর্ণমাসীর উদয় হইয়া জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোকময় হইল। কৌমুদীর জ্যোৎস্না-অঞ্চলে আবৃতা হইয়া যশোদাদেবী (কৃত্তিকা) প্রচ্ছন্নভাবে নীলমণির রাস-লীলা দেখিতে লাগিলেন। বলদেব-মাতা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত মুখে রাসলীলা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পৌর্ণমাসী কলাবতী শ্বশ্রূজন-সুলভ অকুণ্ঠিতভাব অবলম্বনে সর্ব্বজগৎ সমক্ষে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে, বাসর (দিবস) ঘরে রাসলীলা দর্শন কামনায় আড়ী পাতিয়া এক একবার উঁকি ঝুঁকি দিতেছেন, পুনর্ব্বার জগতের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধার সম্পদে গর্ব্বিত হইয়া, অট্ট অট্ট হাসিতেছেন। উষাকালে কৌমুদী-চন্দ্রমা বক্র নয়নে উভয় পার্শ্বস্থ বৈবাহিকাদ্বয়ের (১) দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিতেছেন দেখ দেখ বেন! আমার রাধা আজ স্বামী সমাগমে সখীকুল-(তারানিচয়) মধ্যে কোথায় লুকাইল? কখনও বা বাহুল্যকী চন্দ্রিমা আহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে উন্মত্তাপ্রায় হইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী বৈবাহিক সচ্চিদানন্দ গোপকে বলিতেছেন, বেই! আজ আমার কি শুভদিন! আ—নন্দপুত্র আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণের রূপাস্পর্শে আমার রাধা পবিত্রা হইল। নন্দরাজ আহ্লাদে গদগদভাবে বলিতেছেন, শ্রীমতী বেন্! তোমার সুতা রাধাই আদ্যাশক্তি। (২) ঐ দেখ শ্রীকৃষ্ণের রশ্মিচূড়া (ঊর্দ্ধমুখ ময়ূখ) তোমার রাধার পদতল মার্জ্জন ও ধৌত করিতেছে।

ঐ দেখ, কৌমুদী চন্দ্রমার ঊর্দ্ধভাগে প্রজাপতি ব্রহ্মা ঔরিক মণ্ডলে (৩) বিরাজমান। আজ প্রজাপতি ব্রহ্মা, পূর্ণচন্দ্রমারূপী হংস-পৃষ্ঠে সানন্দে সমারূঢ়। রাসলীলা দর্শনোল্লাসে তেত্রিশকোটি দেবতা সহ, বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধচারণ, দৈত, দানব, অসুর আদি পরিবৃত হইয়া রাসমণ্ডলের ঊর্দ্ধদেশে আসীন। (৪)

গৃহীত।- কিন্তু ৪টী তারক সাধারণ রাখিয়া বাকী ২টী তারকের এক একটী লইয়া দুই খানি ধনু দৃষ্ট হয়। বহু অর্থে ধনু? (১৪) অমাবস্যা (১৫) শুক্ল পক্ষে কলা বৃদ্ধি।

(১) যশোদা ও রোহিণী দেবী।

(২) কার্ত্তিকী বৎসর বিশাখা হইতে গণিত হইত এবং শক্রাগ্নি বা বিদ্যুত্-মূর্ত্তি অগ্নির আদি বিকাশ

(৩) Auriga constillation প্রজাপতি ব্রহ্মার শিরোদেশে প্রজাপতি নক্ষত্র delta auriga হৃৎপদ্মে ব্রহ্মহৃত্ (Starcapella) তারা, দক্ষিণ কুক্ষিতে অগ্নি তারক (Star Nath)। ব্রহ্মহৃত্ তারকের পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে ত্রিভুজাকৃতি ক্ষুদ্র তারকত্রয়, (the kids) কি ত্রিবেদ চিহ্ন? (emblem)

(৪) গোলকে পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দৃশ্য ছিল, এক্ষণে তত সুদৃশ্য নাই।

এই উপলক্ষ্যে শ্রীরাধা ব্রজেশ্বরী রাসেশ্বরী বলিয়া পুরাণে বর্ণিতা হইয়াছেন, এবং মহর্ষি বাল্মীকি বিশাখাকে সূর্য্যবংশের কুল-নক্ষত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বঙ্গ-কবিগণ রাধী-রাজা রাধী-কিশোরী নামে শ্রীরাধার নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ শ্রীরাধা নক্ষত্রের রাজমুকুট (corona) (৫) দিয়াছেন। আজ রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থানে, শ্রীকৃষ্ণ (সূর্য্যদেব) এবং তাহার দক্ষিণে বলদেব (বুধগ্রহ) অবস্থিতি করিতেছেন, এবং রাশিচক্রে গোপীগণ (তারকা-গণ) শ্রীরাধা ও অষ্টসখীর সমভিব্যাহারে চক্র-নৃত্যে নৃত্য করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। বলদেব রাসোন্মত্ত হইয়া চক্র-নৃত্যে যোগ দিলেন। রাসেশ্বর বাসুদেব চক্র-ব্যূহের গতি পরীক্ষা করিতেছেন। বাহুলী চন্দ্রিমা জ্যোৎস্না-বাহুবিস্তার পূর্ব্বক স্বর্গ মর্ত্ত্য-পাতাল আলিঙ্গন করিয়া স্নেহে আপ্লুত করিতেছেন। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর রৌপ্যময় জ্যোৎস্না-সাগরে ত্রিজগৎ ভাসিয়া চলিল। আনন্দময় সুধাংশু-সাগরে জীব মাত্রেরই হৃদয় নিমগ্ন ও অভিষিক্ত হইল। অনির্ব্বচনীয় বিমল জ্যোৎস্না-জলে বিশ্ব অবগাহন করিল। বাহুলী জ্যোৎস্না ভুজলতা বিস্তার করিয়া ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিমুগ্ধ করিল। এই মোহে বিমুগ্ধ হইয়া মুনি-ঋষি-গণ সর্ব্বভূতময় সর্ব্বব্যাপী পরম পুরুষকে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানকৃতরূপে সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ কহিয়াছেন, এবং সবিতৃমণ্ডল এই প্রাকৃতিক শোভার মূল কারণ (৬) বলিয়া সবিতৃমণ্ডলকেই বিষ্ণুভাবে পূজা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-লীলার রূপক রচনা করিয়াছেন। অদিতি-নন্দন আদিত্যদেবে এবং দেবকী-নন্দন শ্রীকৃষ্ণে পার্থক্য কোথায়? ঋষিগণ কি সতর্ক করিয়া দেন নাই যে, অদিতির্দেবকীহ্যভূৎ (হরিবংশে) এবং দেবমাতা (অদিতি) চ দেবকী (ব্রহ্মবৈবর্ত্তে জন্মখণ্ডে) ঋষিগণ কি ইঙ্গিত করেন নাই যে, আদিত্য-দেবই দেবকী-নন্দন?

ততোঽখিল জগৎ-পদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকী পূর্ব্বসন্ধ্যায়াং আবির্ভূতং মহাত্মনা॥

বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশ ৩য় অধ্যায়।

এত ভ্রান্ত কেন? বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ শাস্ত্র কি বলে নাই, যে যশোদার (কৃত্তিকার অভিদেবতা দহন (অগ্নি) এবং রোহিণীর কমলজ (ব্রহ্মা); অগ্নি এবং ব্রহ্মা একই। এই ব্রহ্মার নাভিপদ্মে (রাশিচক্র-কেন্দ্রে) বিষ্ণু বা আদিত্যদেব অবস্থিত। ঐ দেখ, রোহিণীর শিরোভাগে প্রজাপতি-ব্রহ্মা। ঐ ব্রহ্মাই নন্দরাজ।

(৫) শ্রীরাধার শিরোপরে কিরীট মণ্ডল, corona

(৬) সূর্য্যকিরণ চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোৎস্না জন্মে।

রাসলীলা-বস্ত্রহরণ।

রাশিচক্র-পরিচয় থাকিলে রাসলীলা হৃদয়ঙ্গম করা যায়; কিন্তু বস্ত্রহরণ-পালা বুঝিতে হইলে গোলক-পরিচয় প্রয়োজন। পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুববিন্দু রাখিয়াছেন এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি—যু—পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।

রাশিচক্রের কেন্দ্রস্থ জ্যোতির্ব্বিদ্ (?) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম কদম্ব দিয়াছেন; এবং ঐ কেন্দ্র হইতে দৃশ্যগোলক অয়ন-মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন। মানিয়া লও যে, কদম্ব-পরে সূর্য্য রাখিলে, অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগস্থ দৃশ্য গোলকার্দ্ধ অন্ধকারময় হইবে।

এখন বস্ত্রহরণ দেখ। অসীম গোলকের মধ্যে আদিত্যদেব অবস্থিত। আদিত্যদেবের কেন্দ্র (centre) এবং গোলকের কেন্দ্র একই বলিলে দোষ নাই। আদিত্য-মণ্ডল বেষ্টন করিয়া রাশিচক্র অবস্থিত; এই সসূর্য্য-রাশিচক্রের নাম সুদর্শন চক্র। নামটীর সার্থকতা আছে। ঐ দেখ, সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ ঐ কেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া সসূর্য্য-রাশিচক্র কুলাল-চক্রবৎ আবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুলাল-চক্রের শক্তিময় মেধিকাষ্ঠ। সূর্য্যমণ্ডল ঐ কুলাল-চক্রের হড্ডকাষ্ঠ (হেঁড়ে) এবং রাশিচক্র কুলাল-চক্রের বেষ্টন-কাষ্ঠ (বেলন কাঠ)। ঐ কুলাল-চক্র রাসলীলার আদর্শ। (৬ ক)

গোপীগণ (সপ্তবিংশতি নক্ষত্রময়) রাশিচক্রে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যকিরণ-বস্ত্রে আবৃতা হইয়া জগতের চক্ষের উপর থাকিয়া লোকের অদৃশ্যভাবে নৃত্য-গীতে প্রমত্ত। কুলাল-চক্রবৎ সসূর্য্য-রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সূর্য্য কিন্তু কেন্দ্র ত্যাগ করিতেছেন না, হড্ডকাষ্ঠবৎ ঘুরিতেছেন মাত্র। গোপীগণ চক্র-নৃত্যে আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কি সুদৃশ্য মনোহর ব্যাপার! বিরাটপুরুষের বিরাট ব্যাপার!

বিরাটপুরুষের নাভিস্থলে সূর্য্য। কিন্তু আদিত্যদেব পর্য্যন্ত কালের বশবর্ত্তী। তৃতীয় দিনে আদিত্যদেবকে শ্রীরাধা-নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া অনুরাধা নক্ষত্রে পদার্পণ করিতে হইবে। কাহার সাধ্য নিয়মভঙ্গ করে? এ দিকে গোপীগণ রাসে উন্মত্তা। অনুরোধ ত শুনিবে না। রাসে ভঙ্গ দিবে না। শ্রীকৃষ্ণ মায়া-জাল বিস্তার করিলেন। বিরাটের নাভিদেশস্থিত সূর্য্য কদম্বে স্থাপিত হইলেন। অয়ন-মণ্ডলের দক্ষিণস্থ গোলকার্দ্ধ নিশাময় হইল। গোপীর কিরণ-বস্ত্র অপহৃত হইল! জগজ্জন, চন্দ্রাবলী, চিত্রলেখা, তুঙ্গদেবী, রঙ্গদেবী, চম্পকলতা, সুদেবী ও ইন্দুলেখা প্রভৃতি তারা-সখীগণকে দেখিতে পাইল। লজ্জায় গোপীগণ নীল সমুদ্রে (৭) নিমজ্জিত হইলেন। কিন্তু পণ্ডপ্রয়াস। রূপ ঢাকিল না।

(৬ ক) কুলালচক্রপ্রতিমং মণ্ডলং পঙ্কজাঙ্কিতং। ইতি উৎকলকলিকা।

(৭) অন্তরীক্ষে ঋক্ ১০।১৮।৬—১২।

এই রূপকে, সূর্য্য শ্রীকৃষ্ণ, কদম্ব কদম্ববৃক্ষ, তারাগণ গোপী, সূর্য্যকিরণ বস্ত্র, নীল-অন্তরীক্ষ কালিন্দী-জল। মহর্ষিগণ-রচিত এই সুধাময়-রূপক-বৃক্ষের যে বিষময় ফল ধরিয়াছে, তদ্দৃষ্টে মহর্ষিগণ আত্মগ্লানিতে দগ্ধপ্রায়। রাসলীলা ভঙ্গ হইল। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে (অয়নপথে) চলিলেন। সম্মুখে অনুরাধা নক্ষত্র। ভ্রান্ত হিন্দুকুল! যে জ্যোতিষশাস্ত্র তোমাদের শয়নে, স্বপ্নে, আহারে, বিহারে, সম্পদে, বিপদে, উৎসবে, ব্যসনে, শোকে, সুখে, সমাজে, বিজনে, পাপে, পুণ্যে সহায়, আজ তোমরা সেই জ্যোতিষ শাস্ত্র ভুলিয়া শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আঙ্গীন রাসলীলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেছ। কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণ, কোথায় বা রাধা! পৃথিবী হইতে কোটী-যোজনাধিক অন্তরে সূর্য্য; তাহার লক্ষ লক্ষ গুণ যোজন অন্তরে রাশিচক্রের নক্ষত্র শ্রীরাধা আদি অবস্থিত। দুর্দ্দশায় পড়িলে এতই মোহ জন্মে। আদিজাত আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাশিচক্রই সুদর্শনচক্র। চক্রীর সেই চক্রের কিরণ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, হিন্দুজাতি পুরস্থিত প্রাকৃতিক রাস-লীলা দেখিতে অক্ষম। রূপক রক্ষার অনুরোধে, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনে পুরাণকার মহর্ষিগণ কৌতুকচ্ছলে কুক্ষণে দুই একটী দ্ব্যর্থ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বেদ ও বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলনে, এবং জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণে ভারতময় হিন্দুজাতি বিমুখ হইয়া, মহর্ষি-প্রণীত পুরাণস্থ ঐ সকল দ্ব্যর্থ শব্দের প্রকৃত অর্থগ্রহণে অক্ষম হইয়াছেন এবং মহর্ষিগণ-পূজিত আদিত্যদেবে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষ প্রকৃতদেব শ্রীহরিকে ভুলিয়া হিন্দুজাতি অন্ধের ন্যায় পথহারা হইয়া, "ঘোষ-পাড়া" পর্য্যন্ত ধাবমান্ হইতেছেন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! কি ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত! ষড়ঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন্ পণ্ডিত বেদের অর্থ করিতে পারেন? গোলকস্থ গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি ত্যাগ করিয়া, কোন্ সুশিক্ষিত সুধীজন পুরাণের ব্যাখ্যা করিতে পারেন? এই ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়া ভারত-মাতার হৃদয়ের কত শত গুণমণি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি স্থাপন করিতে অপারগ হইয়া, নকল কৃষ্ণের পদাশ্রয় লইতেছেন। কেহবা নবদ্বীপে মানব-ঈশ্বর স্থাপনে, ভক্তিবশে লালায়িত হইতেছেন। হিন্দুগণ! একবার আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহগণের গতি পরীক্ষা কর। বেদোক্ত শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীবিষ্ণু) চরিত্রের নির্ম্মলতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। থেই-হারা হইয়া হিন্দুজাতিকে নির্ব্বাক্ নিরুত্তরভাবে অবনত মস্তকে দেশে বিদেশে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, পথে ঘাটে, শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক-রটনা এবং ব্যঙ্গোক্তি আর শুনিতে হইবেক না। এই খেদে আমরা আজ পুরাণের রূপক-জাল ছিন্ন করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; নতুবা এমন মনোরম অপূর্ব্ব মরীচিকা ধ্বংস করিতে কাহার প্রবৃত্তি জন্মিত? (ক্রমশঃ)

শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমি দুই।

সর্ব্বসাধারণের সাধারণ-জ্ঞান আমি এক, কিন্তু বাস্তবিক আমি এক নহি, 'আমি' দুই! এক আমি নশ্বর, অনিত্য, দুঃখপূর্ণ, পরিবর্ত্তনশীল ও অন্য আমি নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দময়। নিত্য আমির তত্ত্ববার্ত্তা জানিতে পারিলে, মানব কখনই নিত্যকে ছাড়িয়া অনিত্যের উপাসনা করিবেনা, ইচ্ছা করিয়া অমরত্ব ত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে চাহিবেনা। সংসারে কে সুখকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দুঃখের প্রার্থনা করে? কেইবা চির-জীবী হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া মরিতে চায়? অদ্য আমরা এই দুই "আমি"র বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমি যে দুই, তাহা চিত্ত স্থির পূর্ব্বক বুঝিলেই স্থূলতঃ বুঝিতে পারা যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত দেহের পরিবর্ত্তন হইতেছে, (বাল্যের দেহ যৌবনে থাকেনা, আবার যৌবনের দেহ বার্দ্ধক্যে থাকেনা।) মন-বুদ্ধ্যাদিরও পরিবর্ত্তন হইতেছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, অদ্য আর সেরূপ নাই; শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আর এই দুই বৎসরে অনেক ঠেকিয়াছি—অনেক শিখিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি যে যে দ্রব্য ভালবাসিতাম, যাহার জন্য লালায়িত হইতাম, এখন আর সে দ্রব্য ভাল লাগেনা, নিকটে উপস্থিত হইলেও আর পাশ দিয়া যাই না; সেরূপ মন নাই, সেরূপ বুদ্ধি নাই, এমন কি—দুই বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা আমার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, অদ্য তাঁহারাও জানিতে পারিতেছেন যে, সে "আমি" আর নাই, আমার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনশীল "আমি"কে সর্ব্বদাই আমরা নানারূপে অনুভব করিয়া থাকি। বালক আমি, যুবা আমি, বৃদ্ধ আমি; কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক বিষয়ে আমি অজ্ঞ ছিলাম, অদ্য আমি জ্ঞানবান হই-য়াছি, এইরূপ অভিমান সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান; ইহা এক, এবং সর্ব্বদাই সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই প্রকার অনুভূতিও বর্ত্তমান। শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, মন ও বুদ্ধি বদলাইতেছে, কিন্তু "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান সর্ব্বদাই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিহিত থাকিয়া নিত্য "আমির" আমিত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। আমি বালক ছিলাম, এক্ষণে আমি যুবক; এই বিকারী "আমির" মধ্যে "আমি সেই" এই যে জ্ঞান, ইহা নিত্য "আমির"; দেহের পরি-বর্ত্তন, মন ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ইহার হয়না। জীবদ্দশায় দেখিতে পাই,—স্থির হইয়া চিন্তা করিলে জানিতে পারি, দেহাদির পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" এই জ্ঞান নিত্য বর্ত্তমান। স্থূল ভৌতিক দেহের পরিবর্ত্তন ও সূক্ষ্মভূতময় ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মানসাদির পরিবর্ত্তন যাহাতে কোনও প্রকার বিকার উপস্থিত করিতে পারিল না, তাহা যে জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর

পরেও ঠিক থাকে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মহাবীর অর্জ্জুন এই নিত্য "আমির" যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহার উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—

নত্বে বাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্॥ ১২

অর্জ্জুন, যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত সম্মুখস্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি রণে নিহত হইলে, তাঁহাদের অস্তিত্বের অভাব হইবে, ইহা মনে করিয়া, তাঁহাদিগের অনিত্য "আমির" ধ্বংস বুঝিতে পারিয়া কাতর হওয়ায়, অর্জ্জুনের অনিত্যের প্রতি দৃষ্টিজন্য শোক দেখিয়া, ভগবান, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রভৃতির নিত্য অশোচ্য "আমি"র বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি, তুমি এবং এই নরাধিপসমূহ জন্মের পূর্ব্বেও ছিলাম ও মৃত্যুর পরেও থাকিব" (সুতরাং তাঁহাদিগকে অনিত্য ভাবিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়) দেহ-ধর্ম্ম কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি নিত্য "আমির" যেরূপ কোনও পরিবর্ত্তন জন্মাইতে পারেনা, তদ্রূপ জন্ম-মরণাদির দ্বারাও ইহার কোন প্রকার বিকার জন্মে না, ইহা বুঝাইতে যাইয়া ভগবান্ বলিলেন,—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারংযৌবনংজরা।
তথা দেহান্তর-প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

আমরা যাহাকে "আমি" "আমি" করিয়া অসংখ্য শোক-দুঃখে কাতর হই, অর্জ্জুনেরও দৃষ্টি তাহারই উপর। এই যে প্রাতিভাসিক "আমি"—ইহা অনিত্য। বাজীকরের ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার সত্তা ভাণ মাত্র। ইহাই আপনাকে বালক, যুবা, বৃদ্ধ, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি কল্পনা করে। "জীবের এই দেহেতেই যেমন বাল্যাবস্থার পরিবর্ত্তনে কৌমার, কৌমারের পরিবর্ত্তনে যৌবন এবং যৌবনের পরিবর্ত্তনে বার্দ্ধক্য-অবস্থা হয়, মৃত্যুও তদ্রূপ একটা পরিবর্ত্তন-অবস্থা মাত্র; মৃত্যুতেও কেবল এই দেহেরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, দেহীর (আত্মার) কিছুই হয় না; অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে কিছুমাত্র বিমুগ্ধ হন না।" এই দুই প্রকার আত্মার বিষয় ভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥

এই জগতে দুই প্রকার পুরুষ আছে, একটী ক্ষর বা নশ্বর, আর একটী অক্ষর বা অবিনশ্বর। এই যে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সকল দেখিতেছ, ইহা বিনাশশীল; ইহাতে অভিমান বশতঃ যে প্রাতিভাসিক আমি জাত হয়, তাহাই ক্ষর-পুরুষ, (ক্ষর পুরুষোনাম সর্ব্বাণি ভূতানি বৃক্ষাদি স্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকী

লোকস্য শরীরেষ্বেব পুরুষত্বং প্রসিদ্ধেঃ—শ্রীধরস্বামী) এবং শরীর সকল নষ্ট হইলেও যিনি নির্ব্বিকার বশতঃ স্থির থাকেন, তিনি অক্ষর কূটস্থ জীব। (কূটোরাশিঃ শিলা-রাশিঃ পর্ব্বত ইব দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা সত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকীভিরিতি—শ্রীধরঃ) পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই কূটস্থ নিত্য জীব, অনিত্য ও ভাণমাত্র-শরীরাভিমানী জীবের প্রেরক ; ইহার সত্তাতে ভাসমান হইয়া ঐ ব্যবহারিক জীবাত্মা নানারূপ কর্ম্মফল ভোগ করে এবং এই নিত্য জীব উক্তরূপ অনিত্য ভোগ সকলের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া, তাহার সারসত্তা গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের অস্তিত্ব ও কার্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে, নিরুদ্ধ-ইন্দ্রিয়গ্রাম হইয়া, অভি-নিবিষ্ট মনে আপনার সমস্ত তত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে হইবে। বিকারী আমিত্বের প্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া মনোবৃত্তি সমূহের উৎপত্তি ও লয়ের ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে নিত্য জীব রাজার ন্যায় বসিয়া অনিত্য জীবকে ভৃত্যবৎ খাটাইয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। শ্রুতিতে দেখিতে পাই,—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩য় মুণ্ডক, ১ম খণ্ড।

দ্বা দ্বৌ সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভন পতনৌ পক্ষৌ সযুজা সযুজৌ সহৈব সর্ব্বদা যুক্তৌ সখায়া সখায়ৌ সমানাখ্যানৌ সমানাভিব্যক্তি-কারণৌ এবম্ভূতৌ সন্তৌ সমানং অবিশেষং উপলব্ধ্যধিষ্ঠানতয়া একং বৃক্ষং বৃক্ষমিব উচ্ছেদ সামান্যাৎ শরীরং পরিষস্বজাতে পরিষক্ত-বন্তৌ। তং শরীরং পরিষক্তবন্তৌ সুপর্ণাবিব লিঙ্গোপাধ্যাত্মেশ্বরৌ। তয়োর্বৃক্ষং পরিষক্তয়োঃ মধ্যে অন্যঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞো লিঙ্গোপাধির্বৃক্ষ-মাশ্রিতঃ পিপ্পলং কর্ম্মনিষ্পন্নং ফলং স্বাদু অত্তি—ভক্ষয়তি। অনশ্নন্ অন্যঃ—ইতরঈশ্বরো নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ (আত্মনঃ সর্ব্বজন্মাদেঃ) সর্ব্বত্র সঙ্গোপাধির্নাশ্নাতি। প্রেরয়িতা হ্যসৌ ভোজ্য-ভোক্ত্রোর্নিত্যসাক্ষিত্ব-সত্তামাত্রেণ সত্বনশ্নন্ অভিচাকশীতি পশ্যত্যেব কৈবলং দর্শনমাত্রং হি তস্য প্রেরয়িতৃত্বং রাজবদিতি।

সুন্দর পক্ষযুক্ত পরস্পর সখাস্বরূপ দুইটী পক্ষী বৃক্ষরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একটী স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী নশ্বর জীব, অন্যটী কারণ-শরীরস্থ

জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থার সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থ চৈতন্য। প্রথমোক্তটী সমস্ত কর্ম্ম করেন ও ফলভোগ করেন, দ্বিতীয়টী নিরঞ্জন থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বয়ং কর্ম্মাদি না করিয়াও রাজবৎ প্রেরয়িতা স্বরূপ হয়েন। এই দুই "আমি"র বিষয়, বেশ মনোযোগ করিয়া দেখিলে, সমস্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন। ইহাদের একটী অনিত্য, ঐন্দ্রজালিক ভাণমাত্র, তাহার অস্তিত্ব ছায়া স্বরূপ, আর একটী নিত্য, শাশ্বত। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

মূল—১৮।

জ্ঞাতুং ন শক্যং হি কিমস্তি সর্ব্বৈঃ, যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ং।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা ॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৫২) এ সংসারে কোন্ বিষয় পুরুষগণের অজ্ঞেয় ?

গুরুর উত্তর—নারীর মন ও চরিত্র (১)।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে স্ত্রী-স্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"উহারা (রমণীরা) নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব, উহাদিগকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করা এবং উহাদের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য। বিধাতা যে সময় সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূত সমুদায় ও স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের (২) সৃষ্টি করিয়াছেন। শম্বর, নমুচি, বলি ও কুম্ভীনসি প্রভৃতি দৈত্যগণ যে যে মায়া বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, কামিনীগণ তৎসমুদায়ই অবগত আছে। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তা শুক্রাচার্য্য ও বৃহস্পতির বুদ্ধিও স্ত্রীবুদ্ধি অপেক্ষা প্রশংসনীয় নহে"। শ্রীমদ্ভাগবতে নারী-জাতি ঈশ্বরের মায়ার মূর্ত্তি (৩) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অতএব স্ত্রীজাতির মন ও চরিত্র অবগত হওয়া কঠিন ব্যাপার।

---

(১) "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" ॥
অপ্রাপ্যং হৃদয়ং তথৈব বদনং যদ্দর্পণান্তর্গতং, ভাবঃ পর্ব্বত-সূক্ষ্মমার্গবিষমঃ স্ত্রীণাং ন বিজ্ঞায়তে।
চিত্তং পুষ্কর-পত্র-তোয়-তরলং বিদ্বদ্ভিরাশংসিতং নারীনামলিকাঙ্কুরৈরিব লতা দোষৈঃ সমং বর্দ্ধিতা ॥
(নীতিশতক)

(২) স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক দোষ—
"অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভিতা। অশৌচং নির্দয়া দর্পঃ স্ত্রীণামষ্টৌ বহুদ্ধর্পাঃ" ॥
(শুক্রনীতি)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৩) সকলের পক্ষে দুষ্পরিহার্য্য কি ?

গুরুর উত্তর—"দুরাশা"। "দুষ্প্রাপ্য-বিষয়-প্রাপ্তির আশা অথবা অসাধ্য-সাধন করিবার আশাই দুরাশা" (১)। দুরাশা-কুহকিনী স্বীয় মোহিনীশক্তি প্রভাবে মনুষ্য-হৃদয়ে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বিবেক-বুদ্ধির বিলোপ সাধন করে; সুতরাং দুরাশার দাস হইলে মনুষ্যের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রমুখ শূরশ্রেষ্ঠগণকে সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়াও হতবল লঙ্কেশ্বর ভগবান্ রামচন্দ্রকে পরাজিত করিয়া পতিদেবতাগণের শীর্ষস্থানীয়া তদীয় প্রণয়িনী সীতাঠাকুরাণীকে স্ববশে আনয়ন করিবার দুরাশাকে কোন মতে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের মহারণে আপনার অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ বিষম সর্ব্বনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াও ভগ্নোরুদণ্ড মুমূর্ষু দুর্য্যোধন শ্রীকৃষ্ণ-সহায় পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যলাভ করিবেন, এই উৎকট দুরাশার বশেই দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি-পদে বরণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, দুরাশা সহজে মনুষ্য-হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয় না। তবে যাঁহারা নিয়মিত সাধনাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া শান্তভাবে যোগ-মার্গে বিচরণ করেন, তাঁহারাই কেবল এ প্রকার আশা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়েন। (২)

শিষ্যের প্রশ্ন (৫৪) কোন্ ব্যক্তিকে পশু বলা যায় ? গুরুর উত্তর—যে ব্যক্তি বিদ্যা-বিহীন বা মূর্খ।

> বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং।
> বিদ্যাভোগকরী যশঃ সুখকরী বিদ্যাগুরূণাং গুরুঃ॥
> বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশ-গমনে বিদ্যা পরং দৈবতং।
> বিদ্যা রাজ-সুপূজিতা শুচিধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥
>
> (নীতিশতক)

বিদ্যাই মানবগণের প্রধান সৌন্দর্য্য, বিদ্যা অতি গুপ্ত ধন, বিদ্যা ভোগ-প্রদায়িনী ও যশ-সুখ-বিধায়িনী, বিদ্যা গুরুর গুরু, বিদেশ-গমনে বিদ্যাই বন্ধু (প্রধান সহায়),

---

(৩) কপিলদেব দেবহুতিকে বলিয়াছিলেন :—

"বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্। যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রুবিজৃম্ভেণ কেবলম্" ॥

ভাগবত। ৩১।৩৮ ॥

(১) মহাকবি কালিদাস স্বীয় বিনয়গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া রঘুতে বলিয়াছেন :—

"ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

মন্দঃ কবি-যশঃ-প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" ॥

তিনি বা তৎসদৃশ অন্য কোন মহাকবি ভিন্ন অপরের পক্ষে ইহা প্রকৃতই দুরাশা।

(২) আশা নাম নদী মনোরথ-জলা তৃষ্ণা-তরঙ্গাকুলা, রাগ-গ্রাহবতী বিতর্ক-বিহগা ধৈর্য্য-দ্রুমধ্বংসিনী।

মোহাবর্ত্ত-সুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গ-চিন্তাতটী, তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ॥

(বৈরাগ্যশতক)

বিদ্যা পরমদেবতা, বিদ্যা নৃপতিগণের নিকট পরম পূজা প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা বিশুদ্ধ ধন, বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে পশু বলা যায়।

"শাস্ত্রং (১) জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিৎ ন বিজানাতি যো নরঃ।
স মূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈর্গায়ত্রীরহিতোহথবা" ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করিলে জ্ঞান জন্মে; যে ব্যক্তি জ্ঞানপ্রদ শাস্ত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না, অথবা যে ব্যক্তি গায়ত্রীবর্জ্জিত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই মূর্খ বলিয়া থাকেন। মূর্খের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, (মূর্খে দোষা হি কেবলং) সুতরাং মূর্খব্যক্তি পশুর সমান (২)। মানুষকে "মানুষ" হইতে হইলে, বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হইবে। হিতোপদেশে বলিয়াছেন, "অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" পণ্ডিত ব্যক্তির সহবাস এবং শরীরস্থ মহাশত্রু আলস্যকে পরিত্যাগ করাই বিদ্যালাভের (৩) উৎকৃষ্ট উপায়।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং অর্থবিজ্ঞানমেব চ।
সহবাসাৎ পণ্ডিতানাং বুদ্ধিঃ পণ্ডা প্রজায়তে ॥
(শুক্রনীতি।)

"আলস্যং যদি ন ভজেজ্জগত্যনর্থং, কো ন স্যাদ্বহুধনকো বহুশ্রুতো বা।
আলস্যাদিয়মবনিঃ সসাগরান্তা সংপূর্ণা নরপশুভিশ্চ নির্দ্ধনৈশ্চ" ॥

পণ্ডিতগণের সহিত বাস করিলে, বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের অর্থজ্ঞান এবং সদসদ্বিবেচিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জগতে মনুষ্যগণ যদি সর্ব্বানিষ্টকর আলস্যের সেবা না করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি ধনবান্ না হয়? এবং কোন্ ব্যক্তিইবা বহুশাস্ত্রজ্ঞ না হয়? যাহারা আলস্যপরায়ণ, তাহারা বিদ্যা বা ধন কিছুই লাভ করিতে পারে না; সুতরাং আলস্য হইতেই সসাগরা ধরা নর-পশুতে ও নির্ধন লোকে পরিপূর্ণা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
(পূর্ব্বনপাড়া।)

---

(১) "অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায় বিস্তরঃ। পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্ব শ্চৈব তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থন্তু বিদ্যাহ্যষ্টাদশৈব তাঃ" ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

(২) অহিত-হিত-বিচারশূন্যবুদ্ধেঃ শ্রুতিবিষয়ৈর্বহুভির্বহিষ্কৃতস্য।
উদরভরণমাত্রকেবলেচ্ছোঃ পুরুষপশোশ্চ পশোশ্চ কোবিশেষঃ ॥ (হিতোপদেশ)
যে বালভাবায় পঠন্তি বিদ্যাং যে যৌবনস্থা অধনাস্বদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহ জীবলোকে, মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥ (গরুড়পুরাণ)

(৩) অন্য প্রকার বিদ্যা—"নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"। (অধ্যাত্ম রামায়ণ)
বিদ্যাহীনঃ—"মূর্খো—দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ"। (ভাগবত)

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৬ সালের সূচী-পত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

নব-বর্ষ।

দেখিতে দেখিতে আর এক বৎসর চলিয়া গেল। পুরাতন বর্ষ চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, নাও গেল বটে। পুরাতন বর্ষের যাহা কিছু ছিল, নব-বর্ষ তাহা সমুদয়ই নিজস্ব করিয়া লইয়া উপস্থিত হইল। পুরাতন বর্ষের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শত্রুতা-মিত্রতা আদি নব-বর্ষকে একেবারে নূতন হইতে দিল না। বস্তুতঃ এ জগতে একেবারে নূতন কিছু নাই বা হইতেও পারে না। যাহাই আমরা নূতন বলি, তাহাই পুরাতনের পরিণাম মাত্র; তবে প্রভেদ এই যে, মানবেতর-জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম-সাপেক্ষ পরিবর্ত্তনের অধীন; কিন্তু মানব-জগৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি-সত্বা হেতু সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নহে। একটী বৃক্ষ বা পশু, কাল যাহা ছিল, আজ তাহা না হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কল্যকার বিকাশ বা পরিণাম মাত্র। সে কোনও ক্রমেই অদ্যকে বিগত কল্য হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেনা। মানব যদিও অনেকটা অপরিবর্ত্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, তথাপি তাহার মধ্যে যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, তাহার প্রভাবে, সে একেবারে পারুক বা নাই পারুক, বর্ত্তমান এবং অতীতের সম্বন্ধ অতীব ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। বৃদ্ধের সুগঠিত চরিত্র স্তরেস্তরে খনন করিলে, তাহার বাল্য-চরিত্র দৃষ্ট হইবে বটে, কিন্তু যে স্থলে ইচ্ছা-শক্তির প্রবলতা আছে, সেই স্থলেই অতীত বর্ত্তমানের উপর কোনও সুস্পষ্ট চিহ্ন রাখিতে পারেনা। মানব যদিও অতীতের ফল স্বরূপ, তথাপি তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বর্ত্তমানে স্বীয় কার্য্যের দ্বারা অতীতাসংস্পৃষ্ট নূতন ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া লইতে পারেন।

মুহূর্ত-বাদারা বলেন যে বর্ত্তমান কাল নাই; আমাদের যে কিছু জ্ঞান, সে কেবল অতীতের এবং ভবিষ্যতের মাত্র। যাহাকে তুমি বর্ত্তমান বলিবে, ভাবিয়া দেখ, তাহাই অতীত। কালকে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া তুমি ধরিতে পার—এক ভবিষ্যৎ আর এক অতীত। যাই ভবিষ্যৎকে ধরিলে, অমনি সে বর্ত্তমানে পরিণত না হইয়াই একেবারে অতীতে পরিণত হইল! মানব স্বীয় সুবিধানুসারে অতীতেরই সুসন্নিহিত অংশকে সর্ব্বদাই 'বর্ত্তমান' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। বর্ত্তমান দিন বা বর্ষ ইত্যাদি অতীত এবং ভবিষ্যৎকালেরই কিয়দংশ মাত্র, বস্তুতঃ বর্ত্তমান দিন বা অংশ বলিয়া কিছু নাই। তর্কে আমরা বর্ত্তমানকে ধরিতে ছুঁইতে না পারিলেও, এবং হস্ত প্রসারিত করিতে গিয়া আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভিন্ন আর কিছু না পাইলেও, বর্ত্তমান দ্বারাই আমরা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করিয়া থাকি। যাহার অস্তিত্ব মাত্র উপলব্ধি করা অসম্ভব, বিধাতার বিধানে তাহাই আবার আমাদের যথাসর্ব্বস্ব। বর্ত্তমানই আমাদের কার্য্য করিবার একমাত্র সময়; কিন্তু এই বর্ত্তমান সর্ব্বদা অতীতে পরিণত হইতেছে,—কাহারও উপরোধ অনুরোধ শুনিতেছেনা। ক্রিয়াশীল মানব যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখে, যে তাহার জীবনের মুহূর্ত্তগুলি কত দ্রুতবেগে অতীতে পরিণত হইয়া, তাহার কার্য্য করিবার সময়ের অল্পতা বিধান করিতেছে, তাহা হইলে প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে সার্থক করিবার জন্য তাহার ইচ্ছা-শক্তি এক বিচিত্র বলে বলবতী হইয়া মুহূর্ত্ত অতীতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাহার হৃদ্দেশে কর্ম্ম-লাঞ্ছন প্রদান করে।

যদিও দার্শনিকভাবে দেখিলে, ভূত ও ভবিষ্যৎ ব্যতীত বর্ত্তমানের অস্তিত্ব কল্পনার বিষয় ভিন্ন বিশুদ্ধ উপলব্ধির বিষয় নহে, তথাপি বৈষয়িকভাবের দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, এই ঐন্দ্রজালিক অস্তিত্বময় বর্ত্তমানই আমাদের সর্ব্বস্ব। বর্ত্তমানই ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই দুইভাগে অখণ্ড কালকে খণ্ডিত করিতেছে। বর্ত্তমানকে স্বতন্ত্র পরিচ্ছিন্নভাবে ধরিতে না পারিলেও, আমাদের আত্মানুভূতি বর্ত্তমানেই নিত্য বর্ত্তমান। বর্ত্তমানই সমস্ত উপদেশ, সমস্ত শাস্ত্রের কার্য্য-পরিণতির লক্ষ্যীভূত। যাহা ভূত, তাহার জন্য আর উপদেশাদি কি? যাহা ভবিষ্যৎ, তাহাত অদৃষ্টান্ধকারে আবৃত; সুতরাং উপদেশাদি দ্বারা পরিচালিত বা শাস্ত্রাদি দ্বারা অনুশাসিত পুরুষকারের বর্ত্তমানই অনুষ্ঠান স্থল। অতএব ভূতের ভাল-মন্দের চিন্তা-চর্চ্চায় বা ভবিষ্যতের শুভাশুভের আশা-আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া, বর্ত্তমান-তত্ত্বে উদাসীন হওয়া ও শুভ পুরুষকার উপেক্ষা করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।

অনাদি-অনন্ত অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালের অংশত্ব বা নব-পুরাতনত্ব আমাদের ব্যবহারিক কল্পনা মাত্র হইলেও, সে কল্পনা আমাদের অপরিহার্য্য। আমরা কল্পনারই জীব। নিরাকারকে সাকার, অনন্তকে সান্ত, অখণ্ডকে খণ্ড ও চিরন্তনকে নূতন-পুরাতন আমরাই করিয়া থাকি। বেদান্তোক্ত অবিদ্যা-তত্ত্বের রহস্যই এই। এই ভাবেই

আমাদের সমগ্র সংসার চলিতেছে। অতএব এই ভাবেই আমরা এই ব্যবহারিক "নববর্ষ" পাইলাম। ভগবৎকৃপায় ইহা যেন আমাদিগকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করে। যেন এই নববর্ষে হিন্দু-সমাজের স্নেহাশ্রিতা এই ক্ষুদ্র হিন্দু-পত্রিকা নবোদ্যমে এই হিন্দু-সমাজেরই ইহ-পারত্রিক আপ্যায়নের নব নব উপকরণ-উপহারে সজ্জিত হইয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতে পারে।

উপসংহারে, আমরা এই শুভ নববর্ষাগমে হিন্দু-পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বর্গের উদ্দেশে যথাযোগ্য শুভ-অভিবাদন—আলিঙ্গনাদি প্রদান করিতেছি। মঙ্গলময় হরি তাঁহাদের মঙ্গলে তাঁহাদের হিন্দু-পত্রিকার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

৬

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্যস্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মাহিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥

অন্বয়ঃ—হে গিরিশন্ত! হে গিরিত্র! (ত্বম্) অস্তবে যাম্ ইষুং হস্তে বিভর্ষি তাম্ শিবাং কুরু, (তয়া) পুরুষং জগৎ (অপি) মা হিংসীঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। গিরিত্র—গিরিং ত্রায়তে ইতি গিরি-ত্রা-ড, গিরিরক্ষক। অস্তবে—অস্তুম্ বিধাতুং লয়ং কর্ত্তুম্ ইত্যর্থঃ (পদমিদং ছান্দসং)—লয় করিবার জন্য। বিভর্ষি—ধারয়সি, ধারণ করিতেছ। তাম্—ইষুরূপিণীং শক্তিমিত্যর্থঃ,—সেই ইষু অর্থাৎ দুর্ব্বাণ-রূপিণী শক্তি। শিবাং—মঙ্গলকরীং—মঙ্গলকরী। পুরুষং-জগৎ—পুরুষ-রূপেণ অধিষ্ঠীয়মানং জগৎ—সর্ব্বত্র পুরুষরূপ দ্বারা বিরাজিত জগৎ। মা হিংসীঃ—হিংসা করিও না।

বঙ্গার্থ। (অনন্তর প্রার্থনার প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে) হে অচলশায়িন্! হে ভূধর-ত্রাতা! তুমি প্রলয় বিধানের নিমিত্ত যে ইষুরূপিণী মহাশক্তি হস্তে ধারণ করিতেছ, তোমার সেই সংহারিণী শক্তিকে মঙ্গলময়ী কর। সেই অপ্রতিরথ শক্তি দ্বারা পুরুষাধিষ্ঠিত বিশ্বের ধ্বংস করিও না, অর্থাৎ জগন্ময় আকৃতিমান্ ব্রহ্ম প্রদর্শন কর। বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজমান বিশ্বনাথের আকৃতিময়ী মূর্ত্তি-দর্শন হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না; আমাদিগকে সাকার ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে দাও।

৭

ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি॥

অন্বয়। (সাধকাঃ কর্ত্তারঃ) ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং, বৃহন্তং, যথা-নিকায়ং, সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্, বিশ্বস্য একম্ পরিবেষ্টিতারং তম্ ঈশং জ্ঞাত্বা অমৃতাঃ ভবন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃপরম্—ততঃ—প্রাগ্‌বর্ণিতাৎ পুরুষযুক্তাৎ জগতঃ পরং—কারণত্বাৎ কার্য্যভূতস্য প্রপঞ্চস্য ব্যাপকম্ ইতিভাবঃ—পুরুষাত্মক জগৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ কারণত্ব হেতু কার্য্যভূত প্রপঞ্চের ব্যাপক। ব্রহ্ম পরং—'ব্রহ্মণঃ' হিরণ্যগর্ভাৎ 'পরং' শ্রেষ্ঠং—হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বৃহন্তং—বৃহৎ, যথানিকায়ং—সর্ব্বেষু শরীরেষু বর্ত্তমানং—সর্ব্ব শরীরে বর্ত্তমান। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্—সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নরূপেণ বিদ্যমানং—সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান। বিশ্বস্য একং পরিবেষ্টিতারং—নিখিলজগদ্ব্যাপকং—সর্ব্বমস্তঃ কৃত্বা স্বাত্মনা—সর্ব্বং ব্যাপ্য অবস্থিতং ইতিভাবঃ—নিখিল জগতের ব্যাপক—অর্থাৎ স্বকীয় মহতী বিভূতিদ্বারা ভূতনিচয় পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত। তম্—অমৃত-যোনিং প্রক্রান্তং প্রসিদ্ধং বা পরাৎপরং জ্ঞাত্বা, সেই অমৃত যোনি চিরবিশ্রুত পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া সাধকগণ অমৃতত্ব লাভ করেন।

বঙ্গার্থ—সেই অমৃত-যোনি বেদবিশ্রুত পরাৎপরের চিন্তা করিতে করিতে সাধকগণ, পুরুষযুক্ত জগৎ হইতেও মহান্, হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সুবৃহৎ ও প্রতি-শরীরে বর্ত্তমান, অথচ বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থেই প্রচ্ছন্ন, জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় পরিব্যাপক সেই পরাৎপরকে জ্ঞাত হইয়া অমৃতত্বলাভে সমর্থ হয়েন।

৮

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অন্বয়—অহম্, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ মহান্তং এতম্ পুরুষং বেদ। (সাধনাশীলঃ) তম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম্ অত্যেতি। (তদৃতে) অয়নায় অন্যঃ পন্থাঃ ন বিদ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা। আদিত্যবর্ণং—প্রকাশরূপং স্বয়ম্প্রকাশমিতিভাবঃ, প্রকাশরূপ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। তমসঃপরস্তাৎ—অজ্ঞান পরপারবর্ত্তিনং নিতরাং জ্ঞানাত্মকমিত্যর্থঃ, অজ্ঞানপথের অতীত—অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ। মহান্তম্ পূর্ণম্, সর্ব্বাত্মকত্বাৎ অখণ্ড-মিতিভাবঃ, পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড। অতি+এতি—অতিক্রামতি, অতিক্রম করে। অয়নায়—পরমপদ প্রাপ্তয়ে, কৈবল্যপদলব্ধয়ে, পরমপদপ্রাপ্তি—অর্থাৎ কৈবল্যপদ-লাভের জন্য।

বঙ্গার্থ—অনন্তর মন্ত্র-দ্রষ্টা সাধকের হৃদয়ে নিম্নবর্ণিত আত্মবিশ্বাস উদ্ভূত হইয়া

তাঁহাকে পূর্ণানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মপরিজ্ঞান নিবন্ধন পরমপদপ্রাপ্তির অধিকারী করে, যথা—

আমি এই নিত্যপ্রকাশস্বরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানময় মোহবিবর্জ্জিত পূর্ণ অখণ্ড পুরুষকে জানি। তাঁহাকে জানিলে মৃত্যু-পথ অতিক্রম করা যায়; অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারিলে, সাধকের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত অলীক সংসার-আসক্তিরূপ দুশ্ছেদ্য বাগুরাবর্ত্ত ছিন্ন হইয়া যায়। সাধক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হন; আর তাঁহাকে পুনরাবৃত্তি-জনিত দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হয় না। তিনি ব্যতীত মায়া বিমুগ্ধ জীবের পরমপদ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

৯

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥

অন্বয়ঃ—যস্মাৎ পরং (বা) অপরম্ (অপি) কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যস্মাৎ অণীয়ঃ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (বা) জ্যায়োঽপি কিঞ্চিৎ ন অস্তি। যঃ একঃ বৃক্ষঃ ইব স্তব্ধঃ সন্ দিবি তিষ্ঠতি, তেন পুরুষেণ ইদম্ (দৃশ্যাদৃশ্যম্ চরাচরম্) সর্ব্বম্ পূর্ণম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। পরং—শ্রেষ্ঠং, শ্রেষ্ঠ। অপরং—অশ্রেষ্ঠম্—অশ্রেষ্ঠ। অণীয়ঃ—ক্ষুদ্রতম। জ্যায়ঃ—বৃহত্তম। দিবি—দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি—দ্যোতনাত্মক স্বকীয় মহিমাতে। পূর্ণম্—নৈরন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তম্।

বঙ্গার্থ। পূর্ব্ব শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে যে, "তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুপথ অতিক্রম করা যায়" ইদানীং তাহার—মৃত্যুপথাতিক্রমণের হেতুনির্দ্দেশ করা যাইতেছে;—তিনি কীদৃশ?—যাহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, অর্থাৎ উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, এতদুভয়ই যে অচিন্ত্যশক্তি পরমপুরুষে নির্ব্বিরোধভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যিনি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অথচ বৃহৎ হইতেও বৃহৎ—অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্ব যে মহামহিম-শালী পুরুষে যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে অদ্বিতীয় পরমপুরুষ বৃক্ষবৎ নিশ্চল হইয়া স্বকীয় দ্যোতনাত্মক মহিমায় সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, যাঁহার বিশ্ববিকাশিনী শক্তি-মুকুরে এই বিশ্বভুবন প্রতিনিয়ত প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই পরম শক্তিশালী পরম পুরুষ কর্ত্তৃক এই দৃশ্যাদৃশ্য চরাচর সমস্তই নিরন্তরভাবে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং একমাত্র তাঁহাকে জ্ঞাত হইতে পারিলেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের জ্ঞান জন্মে, সমস্ত জ্ঞেয় একমাত্র তাঁহার জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

১০

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি ॥

অন্বয়—যৎ ততঃ উত্তরতরম্, তৎ অরূপম্ (চ)। যে এতৎ বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি। অথ ইতরে দুঃখং এব আপিয়ন্তি।

বিষমপদব্যাখ্যা। ততঃ—পূর্ব্বোক্তাৎ "ইদং"শব্দবাচ্যাৎ জগতঃ, পূর্ব্বোক্ত ইদং শব্দ-বাচ্য জগৎ হইতে। উত্তরতরম্—শ্রেষ্ঠতরং—কার্য্যকারণবিনির্ম্মুক্ত, জগৎ কার্য্য-কারণাত্মক, কিন্তু তিনি জগৎ হইতে উত্তরপথবর্ত্তী—অর্থাৎ কার্য্য-কারণ-সম্পর্কলেশ-শূন্য। অরূপম্—রূপাদিরহিত। অনাময়ম্—আময়শূন্য, আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয় নির্ম্মুক্ত, সুতরাং অজর। যে এতদ্ বিদুঃ—যাঁহারা এই কার্য্যকারণশূন্য রূপাতীত ও তাপত্রয়-বিমুক্ত পরম পুরুষকে জ্ঞাত হইতে পারেন। আপিয়ন্তি—আপ্নুবন্তি, (পদমিদংছান্দসং) প্রাপ্ত হয়।

বঙ্গার্থ—যিনি জগতের অতীত, অর্থাৎ যাঁহাতে জাগতিক ধর্ম্ম কার্য্যকারণাত্মকতার লেশও নাই, সেই পরাৎপর পরমপুরুষ রূপাতীত এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপত্রয়-বিমুক্ত; তাই তাঁহাতে ত্রিতাপ-যাতনা সংক্রমিত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্ববিধ যাতনা-পথের অতীত পথবর্ত্তী। যে সমুদয় পুণ্যশ্লোক মহাত্মা তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে আর সংসার-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিতে হয় না; তাঁহারা অচিরেই সমাধিপ্রভাবে সেই নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জনের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা এই মোক্ষজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন না, বা হইতে চেষ্টাও করেন না, তাঁহারাই দুর্ব্বিষহ সংসার-তাপানলে এবং দুরুস্তর মায়া-সাগরে নিরন্তর মগ্নোন্মগ্ন হইয়া কল্পনাতীত যাতনা ভোগ করিতে থাকেন।

১১

সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥

অন্বয়ঃ—স ভগবান্, সর্ব্বানন-শিরোগ্রীবঃ, সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ সর্ব্বব্যাপী (চ ভবতি) তস্মাৎ (সঃ) সর্ব্বগতঃ শিবঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ—সর্ব্বাণি আননানি শিরাংসি গ্রীবাঃ চ যস্যাঃ সঃ, বিশ্বস্থ সমস্তই আনন, শির এবং গ্রীবা স্বরূপ যাঁহার, তিনি। সর্ব্বভূত গুহাশয়ঃ—সর্ব্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং শেতে যঃ সঃ—সমস্ত ভূতসমূহের হৃদয়াভ্যন্তরে বর্ত্তমান। ভগবান্—ঐশ্বর্য্যাদি সমষ্টিঃ—উক্তঞ্চ ঐশ্বর্য্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ, জ্ঞানবৈরাগ্যা-য়াশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট। সর্ব্বগতঃ শিবঃ— সর্ব্বস্থিত এবং মঙ্গলময়।

বঙ্গার্থ। এই বিশ্বের দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই সেই পরমপুরুষের মুখ, মস্তক এবং

গ্রীবাস্বরূপ। তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়শায়ী—অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে তদীয় মহতী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যসমন্বিত, তিনি মঙ্গলময় রূপে সর্ব্বদা সর্ব্বপদার্থে বিরাজ করিতেছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি সকলের আত্মা, তাঁহার অধিষ্ঠানবশতই পদার্থের পদার্থত্ব।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

১ম অঙ্ক।

রাশি-চক্র-বর্ণন।

পৃথিবী যে মণ্ডলাকার-পথে ১ বৎসরে একবার সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করে, ঐ পথকে পৃথিবীর কক্ষা বৃত্ত (Orbit) বলে। সহজে গ্রহ-উপগ্রহগণের গতি হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে আমরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে, পৃথিবীকে অচলা ও স্থিরা ধরিয়া লই এবং কল্পনা দ্বারা সূর্য্যকে মণ্ডলাকার পথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাই। এই কল্পিত মণ্ডলাকার পথকে অয়ন-মণ্ডল বা রবি মার্গ (Ecliptic) বলে। এই অয়নমণ্ডল গোলককে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে; এবং এই অয়নমণ্ডল গোলকের কদম্ব (১) ও পর কদম্ব (২) হইতে সম দূর-বর্ত্তী। যেমন বি-ষু-প-মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে এবং ধ্রুব ও পর-ধ্রুব হইতে সম দূরে অবস্থিত, অয়নমণ্ডল গোলক সম্বন্ধে ঠিক সেই ভাবে অবস্থিত। পুরাণে অয়নমণ্ডল দক্ষরাজ বলিয়া বর্ণিত। দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গের সবিশেষ বিচার হইবে। গোলকের মধ্যভাগে একটী কটিবন্ধ (৩) আছে, ঐ কটিবন্ধকে জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিচক্র বলে (৪), ঐ কটিবন্ধের মধ্যরেখা অয়নমণ্ডল; এবং চন্দ্রের ও গ্রহ-পঞ্চকের (৫) (বুধ, শুক্র, মঙ্গল,

---

(১) রাশিচক্রের মেরুদণ্ড প্রসারিত করিলে, ঊর্দ্ধে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে, তাহাকে কদম্ব বলে, এবং এই কদম্বে গোলকের ক্ষেপ-সূত্র সকল সমবেত হয়।

সর্ব্বতঃ ক্ষেপ সূত্রাণাং ধ্রুবাৎ ভিন্ন দেশান্তরে, যোগঃ কদম্ব সংজ্ঞোঽয়ং ইত্যাদি।———

ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি—গ্রহণবাসনা ৮২।

(২) দক্ষিণ গোলার্দ্ধের কদম্বকে পর-কদম্ব বলে।

(৩) Zone. (৪) Zodiac.

(৫) মধুমাসে সিতে পক্ষে———' উচ্চস্থ গ্রহপঞ্চকে———

বৃহস্পতি ও শনি) কক্ষা গুলিও ঐ রাশিচক্রের মধ্যে অবস্থিত। কিন্তু এরূপ তির্য্যগ্ ভাবে স্থাপিত যে, কক্ষা গুলির অর্দ্ধাংশ অয়নমণ্ডলের উপরে ও অপর অর্দ্ধাংশঃ অয়নমণ্ডলের নিম্নে স্থাপিত। অয়নমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে ১০অংশ পর্য্যন্ত গোলকের ঐ কটিবন্ধ বিস্তৃত। রাশি-চক্র দৃষ্টি কর (৬)।

এই রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যদেব পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রদক্ষিণ-ব্যাপার নিয়ত সমভাবে সমগতিতে অয়ন-হয়ে (পথে) চলিতেছে। এজন্য এই প্রদক্ষিণ ব্যাপার যে কাল ব্যাপিয়া হয়, সেই কালকে 'সম' বা 'বৎসর' বা 'হায়ন' বলে। এই রাশিচক্র সমান দ্বাদশভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে রাশি বলে। এই রাশিচক্রে মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই দ্বাদশ রাশি এক এক ভাগে স্থাপন করা হইয়াছে। কারণ আদিত্যদেব মেষরাশিতে অবস্থিতি কালে বৈশাখ মাস হয়, এবং বৈশাখ মাস হইতে আমাদিগের বর্ত্তমান পঞ্জিকায় বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এক এক রাশিতে সূর্য্যদেব এক বৎসরের দ্বাদশ-অংশ-কাল অবস্থিতি করেন। প্রত্যেক রাশির মধ্যস্থিত তারাপুঞ্জ দ্বারা একটী ২ আকৃতি গঠিত হইয়াছে। ঐ আকৃতি অনুসারেই প্রত্যেক রাশির নাম হইয়াছে। যথা প্রথম রাশিস্থ তারাপুঞ্জ মেষ-আকৃতিবৎ দেখায় বলিয়া সেই রাশিকে মেষরাশি বলে। ২য় রাশিস্থ তারাপুঞ্জ বৃষ-আকৃতি, তাই সেই রাশিকে বৃষরাশি বলে। এইরূপে শিশুদ্বয়-মূর্ত্তি হইতে ৩য় রাশির মিথুন-রাশি নাম, কুলিরক হইতে ৪র্থ রাশির কর্কটরাশি নাম, সিংহ হইতে ৫ম রাশির সিংহরাশি নাম, কন্যাকৃতি হইতে ৬ষ্ঠ রাশির কন্যা নাম, মান-দণ্ড হইতে ৭ম রাশির তুলা নাম; দ্রোণ (বিছা) হইতে ৮ম রাশির বৃশ্চিক নাম, ধনুক হইতে ৯ম রাশির ধনু নাম, অর্দ্ধমৃগ অর্দ্ধমৎস্য হইতে ১০ম রাশির মকর নাম, মণ্ডলাকার হইতে একাদশ রাশির কুম্ভ নাম, মৎস্য-আকৃতি হইতে দ্বাদশ রাশির মীন নাম হইয়াছে। রাশিচক্রের মধ্যস্থিত অয়নমণ্ডল ৩৬০ অংশে (৭) বিভক্ত। প্রতি রাশি অয়ন-মণ্ডলের ৩০ অংশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। কিন্তু উত্তরে ও দক্ষিণে রাশিগুলি রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দুজাতি চান্দ্র মাস গণনায় প্রবৃত্ত হইয়া রাশিচক্রকে ২৭ভাগে বিভক্ত করেন, সুতরাং প্রত্যেক ভাগ অয়নমণ্ডলের ১৩⅓ অংশ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক ভাগ এক এক তারা বা এক এক তারা-সমষ্টির নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

মোচ্ছ সংস্থেষু পঞ্চসু——— প্রহেতু———

বাল্মীকি রামায়ণে আদিকাণ্ডে।

(৬) গত চৈত্র মাসের ১২শ সংখ্যা-হিন্দু-পত্রিকার ৫৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(৭) মণ্ডলের $\frac{1}{360}$ ভাগকে অংশ বলে।

মহাবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু হইতে অয়নমণ্ডলের ১৩ অংশ লইয়া যে এক ভাগ হয়, ঐ প্রথম ভাগকে অশ্বিনী বলে; কারণ ঐ ভাগে অশ্বিনী নক্ষত্র অবস্থিত। তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ২য় ভাগকে ভরণী নক্ষত্র নামক তারাত্রয় হইতে ভরণী বলা হয়। এইরূপে অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭নক্ষত্র হইতে অয়নমণ্ডলের ২৭ভাগের নাম হইয়াছে। সাধারণ ভাষায় তারা ও নক্ষত্রে একই অর্থ, কিন্তু জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে নক্ষত্র শব্দে ঐ ২৭টী তারা বা তারাপুঞ্জ বুঝায়।

২৭ নক্ষত্র মধ্যে আর্দ্রা, চিত্রা, স্বাতী, এই তিনটী মাত্র নক্ষত্র এক তারকাময়। অপর নক্ষত্রগুলির কোনটী বা দ্বি-তারকাত্মক, কোনটী বা ত্রি-তারকাময়। এবম্বিধ শত তারকময় নক্ষত্রও আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রা নক্ষত্র এবং ধ্রুব তারা। চিত্রা তারা বা ধ্রুব নক্ষত্র বলা রীতি নহে। ২৭ নক্ষত্র রাশিচক্রের বিস্তার দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। নক্ষত্রগণের স্থিতি নির্ণয় জন্য নক্ষত্র-সংস্থান-বীথিকা দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য যে, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা নক্ষত্রের একপদে যে ৩০ অংশ হয়, ঐ ৩০ অংশে মেষরাশি গঠিত। এইমত ধারাবাহিকরূপে নক্ষত্রের ৯ পদে প্রতি রাশি পূর্ণ। পরিচয়ের সুবিধা জন্য এক নক্ষত্রে একাধিক তারা যোজনা করা হইয়াছে; কিন্তু গণনা কালে একটী মাত্র মূল তারক ব্যবহার হয়। ঐ মূল তারককে যোগ-তারা বলে। যথা পঞ্চ তারকময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux), রোহিণী নক্ষত্রের (Hyades) যোগতারা রোহিণীতারা—(Aldebaran)। এবম্বিধ প্রত্যেক নক্ষত্রস্থিত তারাতে বা তারাগুলিতে এক এক আকৃতি গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ আকৃতি অনুসারে নক্ষত্রের নামকরণ হইয়াছে। অশ্ব-মুখাকৃতি হইতে অশ্বিনী নাম, ক্ষুরাকৃতি হইতে কৃত্তিকা নাম; এই কৃত্তিকা (কৃৎ কর্ত্তনে) (৮) বেদে মাতরঃ এবং পুরাণে ষট্ মাতৃকা (৯) আ—রোহিণী (শকট) হইতে রোহিণী নাম। মৃগশির হইতে মৃগশির নাম। সজল পদ্মাকৃতি হইতে আর্দ্রা নাম। ধনুর্দ্বয়—বা ষট্ বা সপ্ত তারক হইতে পুনর্ব্বসু নাম অথবা অয়ন রেখা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম। তূণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম। তারকা স্তবক (Pnecepe) হইতে অশ্লেষা (শ্লেষ বা বিচ্ছেদ রহিত) নাম হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঐ তারকা-স্তবকের অশ্লেষা নাম নক্ষত্রান্তরে অর্পিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে নক্ষত্রকে অশ্লেষা বলা যায়, তাহার পঞ্চ তারক বেশ বিচ্ছিন্নভাবে স্থিত। মঘ পুষ্প হইতে মঘা নক্ষত্রের নাম। সরল ফল্গুনি বা অর্জ্জুনি, অর্জ্জুন বৃক্ষ হইতে ফাল্গুনি নাম। করট (Curvus) নক্ষত্রের আকৃতি করতল

(৮) মাতরঃ ঋক্ ১।৯২।১

(৯) তং কুমারং ততো জাতং দৃষ্ট্বা সেন্দ্র মরুৎগণাঃ। তদা ক্ষীরপ্রদানার্থং কৃত্তিকাঃ সংস্তমো জয়ন্॥
তাঃ ক্ষীরং তস্য দেবস্য সময়েন দর্দুস্তদা। স্যাদস্মাকং অয়ংপুত্রঃ খ্যাতো নাম্নেতি রাঘবঃ।

বাল্মীকীয় রামায়ণম্।

সদৃশ বলিয়া হস্তা নাম। সুন্দর চিত্রিত আকৃতি হইতে চিত্রা নাম। স্বতঃস্থিত হইতে স্বাতী নাম। অয়নমণ্ডল কর্ত্তৃক দ্বিধা বিভক্ত বলিয়া রাধা নক্ষত্রের বি-শাখা নাম এবং এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শক্রাগ্নি; র—অর্থে অগ্নি এবং ঐ অগ্নির আধার বলিয়া র—আধা রাধা নাম। রাধার পরবর্ত্তী নক্ষত্র ত অনুরাধা নাম পাইবেই। অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা নক্ষত্রের নামের প্রকৃতি নির্ণয় সহজ নহে। কারণ এই তিনটী নক্ষত্রে ১৯টী তারক আছে, এবং এই তিনটী নক্ষত্রের তারা-সংখ্যা সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদ্ গণের মধ্যে মতভেদ আছে। কালিদাস মতে অনুরাধা ৭, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ৯ তারকময়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও শ্রীপতি-মতে অনুরাধা ৪, জ্যেষ্ঠা ৩, মূলা ১১ তারকময়। সুতরাং আকৃতি সম্বন্ধেও বিস্তর মতভেদ আছে। এস্থলে নামের সার্থকতা নির্ব্বাচন করা কঠিন। তবে মূলা ৯ বা ১১ তারকময় ধরিলে, লতাকৃতি বা সিংহ-পুচ্ছাকৃতি হয়, এবং পঞ্চ তারকাময় ধরিলে, মূলা শঙ্খাকৃতি হয়। পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া উভয়ই চতুস্তারকাময় শয্যাকৃতি, এজন্য উভয়ের নাম আষাঢ়া বা শয্যা। বর্ত্তমান কালে উত্তরাষাঢ়া সূর্পাকৃতি বলিয়া গণ্য। শ্রবণা ত্রিতারকাত্মিকা। তারাত্রয় এক সরল রেখায় অবস্থিত। মধ্যস্থ তারাটী বৃহত্তম; একারণ মনুষ্যের কর্ণের সহিত কিছু সৌসাদৃশ্য আছে বলিয়া শ্রবণ বা শ্রবণা নাম। অথবা বেদত্রয়ের চিহ্ন (Emblem) বলিয়া শ্রুতি-অর্থে শ্রবণা নাম; কিন্তু পৌরাণিকগণ তারাত্রয়কে ত্রিবিক্রমের পাদক্ষেপত্রয় চিহ্ন ধরিয়া লইয়া, শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীহরি নির্ণয় করিয়াছেন। ধনিষ্ঠার পঞ্চতারক সুবর্ণ-বর্ণ বলিয়া ধনিষ্ঠা নাম। (ক) শতভিষা অন্বর্থ নামা। কারণ শতভিষা শততারকময়, এজন্য ইহার অপর নাম শততারা ও শতভিষক্। পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, উভয়ই গোপদাকৃতি দ্বিতারকময় ছিল; কিন্তু এক্ষণে পৌরাণিকগণ মীনরাশিতে রাজসিংহাসন স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রকে চতুস্তারকময় পর্য্যঙ্কাকৃতি করিয়াছেন। রেবতীনক্ষত্র ৩২ তারকময় মৎস্যাকৃতি। রেবতী শব্দ মৎস্য-বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "রেব-প্লুতেরেবতে কপিঃ" ইতি দুর্গাদাস। ২৭ নক্ষত্র মধ্যে ১২টী নক্ষত্র হইতে ১২ মাসের নামকরণ হইয়াছে। মেষ রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালের নাম বৈশাখ মাস; কারণ এই মাসে বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়। অর্থাৎ এই মাসের পূর্ণিমাতে চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন। বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা নক্ষত্র, এই জন্য বৈশাখ মাসের অপর নাম রাধমাস। "বৈশাখে মাধবো রাধঃ" ইতি অমরঃ। এইরূপ বৃষরাশিস্থ সৌর মাস জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বিশিষ্ট বলিয়া জ্যৈষ্ঠ নাম পাইয়াছে। মিথুন রাশিস্থ ভাস্করে আষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আষাঢ় মাস; কর্কট রাশিস্থ ভাস্করে শ্রবণা নক্ষত্র হইতে শ্রাবণ মাস; সিংহ রাশিস্থ ভাস্করে ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইতে ভাদ্র মাস। কন্যা রাশিস্থ ভাস্করে অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে আশ্বিন মাস। তুলা রাশিস্থ ভাস্করে

(ক) ধনিষ্ঠ শব্দ মৃদঙ্গ বাচক হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহার নাই। "ধন্ রবে ধনতি মৃদঙ্গঃ" ইতি দুর্গাদাসঃ।

কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে কার্ত্তিক মাস। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে মার্গশীর্ষ মাস। পুষ্যা নক্ষত্র হইতে পৌষ। মঘা নক্ষত্র হইতে মাঘ। ফাল্গুনি নক্ষত্র হইতে ফাল্গুন মাস, এবং চিত্রা নক্ষত্র হইতে চৈত্র মাসের নামকরণ হইয়াছে। রাশি-চক্র পর্য্যবেক্ষণের সাহায্য জন্য ১২ রাশির উদয়াস্ত-গমন বীথিকা নিম্নে প্রকটিত করিয়া দেওয়া হইল। ২৭ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা কিরূপে নির্ণীত হইল, তাহার তথ্যানুসন্ধান আমাদের বিষয়ীভূত নহে; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, নক্ষত্রের ফলাফল দৃষ্টে অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ধ্রুব-বিন্দু (১০) কদম্ব-বিন্দু হইতে ২৪ অংশ দূরে, (১১) এজন্য অয়নমণ্ডলের এক ধনু বিষুপ-রেখার উত্তরে ও এক ধনু বিষুপ-রেখার দক্ষিণে থাকে। অয়নমণ্ডলের ধনুদ্বয়ের নাম উত্তর ধনু ও দক্ষিণ ধনু। রাশি-চক্রের রেবতী নক্ষত্র হইতে চিত্রা নক্ষত্র পর্য্যন্ত উত্তর ধনু, এবং চিত্রা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত দক্ষিণ ধনু। বিষুপ-রেখার উত্তরস্থ ধনুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্ব-উত্তর বিন্দুর নাম উত্তরক্রান্তি বা কর্কটক্রান্তি এবং বিষুপরেখার দক্ষিণস্থ ধনুর মধ্য-বিন্দু—অর্থাৎ সর্ব্বদক্ষিণ বিন্দুকে দক্ষিণক্রান্তি বা মকরক্রান্তি বলে। সূর্য্যদেবের উত্তর ক্রান্তি হইতে দক্ষিণক্রান্তিতে গমনের কালে দক্ষিণ অয়ন। দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপমণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, ঐ বিন্দুকে জল-বিষুপসংক্রান্তি বলে, এবং সূর্য্যদেবের দক্ষিণক্রান্তি হইতে পুনরায় উত্তরক্রান্তিতে গমনের কাল উত্তর-অয়ন। উত্তরায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্যদেব বিষুপ-মণ্ডলের যে বিন্দু ভেদ করিয়া বিষুপরেখা সংক্রমণ করেন, সেই বিন্দুকে মহাবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু বলে, এবং মহাবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দুকে ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুকে সম-রাত্রি-বিন্দু বলে; কারণ সূর্য্যদেব ঐ বিন্দুদ্বয় সংক্রমণ কালে দিবারাত্রি সমান হয়। ধ্রুব-বিন্দু ২৭০০০ বৎসরে মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে; সুতরাং ধ্রুব বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়; এই জন্য সেই সঙ্গে উত্তর-ক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণ-ক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু এবং জলবিষুপ-সংক্রান্তি-বিন্দু ৭৫ বৎসরে এক অংশ পশ্চিম দিকে স্থানান্তরিত হয়, উত্তরক্রান্তি বিন্দু ও দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু এবং ধ্রুব-বিন্দু ও পর-ধ্রুব-বিন্দু, এই ৪ বিন্দু যে মণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত ঐ মণ্ডলকে রবি-রেখা (১২) বলে, এবং মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, জলবিষুপ-সংক্রান্তি বিন্দু এবং ধ্রুব বিন্দু ও পর-ধ্রুব বিন্দু যে মণ্ডলে অধিষ্ঠিত, ঐ মণ্ডলকে সমরাত্রি-রেখা (১৩) বলে। ধ্রুব বিন্দুর গতির সহিত ঐ অপর ৫টী বিন্দু গতিশীল। একারণ রাশির সহিত ঋতুর নিত্য সম্বন্ধ নাই। সূর্য্যদেব যে দিন মহাবিষুপ সংক্রান্তি-

(১০) পৃথিবীর মেরুদণ্ড উত্তরে প্রসারিত করিলে গোলকের যে বিন্দু স্পর্শ করে; ঐ বিন্দুকে ধ্রুব-বিন্দু বলে।

(১১) ধ্রুবাৎ জিন লবান্তরে। ইতি ভাস্করাচার্য্য।

(১২) Solsticial colure. (১৩) Equinoctial colure.

বিন্দুতে অবস্থিতি করেন, সেই দিন সমরাত্রি-দিন হয়। আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকা ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। কারণ যে সমরাত্রি-দিন-বিন্দু চৈত্রসংক্রান্তি দিনে ছিল, ঐ বিন্দু ২০ অংশ পশ্চিমে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের মধ্যস্থলে স্থানান্তরিত হওয়ায়, ৯।১০ই চৈত্র সম-দিন-রাত্রি হইতেছে; কারণ ঐ সংক্রান্তি-বিন্দু এক অংশ সরিলে সম-দিন-রাত্রি একদিন সময়ান্তরিত হয়। বর্ত্তমান পঞ্জিকা-মতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্তে ঋষি-রেখা অবস্থিত; সুতরাং পঞ্জিকা প্রকটন কালে মহাবিষুপ পদ-বিন্দু ঋষি-রেখা হইতে ৯০ অংশ পশ্চিমে, মীন ও মেষ রাশির মধ্য-বিন্দুতে অবস্থিত ছিল। ঐ বিন্দু হইতে আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকার বৎসর গণনা হয়। কিন্তু যৎকালে ঐ ঋষি—রেখা মঘা নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের তৃতীয় পদান্ত হইতে ৩০ অংশে দূর-পূর্ব্বে ছিল, তৎকালে মহাবিষুপপদ-বিন্দু বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অবশ্যই অবস্থিত ছিল। সুতরাং তৎকালে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু হইতে বৎসর গণনা করিলে, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে বৎসর গণনা করিতে হইত।

সূর্য্যদেব ঋষিরেখাস্থিত উত্তরক্রান্তিতে (১৪) উপনীত হইলে, বর্ষা আরম্ভ হয়। আদি কালে ঐ উত্তরক্রান্তি হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসর শব্দের ঋতু ঘটিত আদি নাম অব্দ (১৫) বা বর্ষ। পরে শরৎ ঋতু হইতে বৎসর গণনা হইত বলিয়া বৎসরের নাম শরৎ হইয়াছিল। শীতঋতু হইতেও বৎসর গণনা হইত, (১৬) কিন্তু এক্ষণে শীতঋতু-বাচক কোন শব্দের বৎসর অর্থে ব্যবহার নাই। চৈত্রাদি বৎসরও গণনা হইত। (১৭) এক্ষণে বৈশাখ-আদি গণনা হইতেছে। মার্গ-শীর্ষ মাসের নাম অগ্র-হায়ন।

"বৎসরঃ শরদা বর্ষঃ বরিষং সম্বৎ ইতি অপি" ইতি শব্দ রত্নাবলি। "সম্বৎসরঃ বৎসরঃ অব্দঃ হায়নঃ অস্ত্রী শরৎ সমাঃ" ইতি অমর। সুতরাং রাশিচক্রের উত্তরক্রান্তি-বিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু ও জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু, এই ৪ বিন্দুর যে কোন বিন্দু হইতে বৎসর গণনা হইতে পারে ও গণনা হইয়াছে। বরাহ-মিহির-মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ঋষি-রেখা মঘা নক্ষত্রে অধিষ্ঠিত ছিল। (১৮) হিন্দু-রাশিচক্র মতে মঘার ক্ষেপ (১৯) ১২০ অংশ; সুতরাং তৎকালে মঘা নক্ষত্র হইতে মহাবিষুপ সংক্রান্তি ৯০ অংশ পশ্চিমে বৃষ রাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অধিষ্ঠিত ছিল।

(১৪) Tropic of cancer. (১৫) অপ্—দ। (১৬) শতং হিমাঃ ঋক্ ১।৬৪।১৪।

(১৭) বেদ লিখিত মাস চৈত্র হইতে ফাল্গুণ পর্য্যন্ত। মাধী-মাধব-শুক্র-শুচি ইত্যাদি এবং "ফাল্গুণা বৎসরান্তকঃ" ইতি রাজনির্ঘণ্ট হইতে দেখা যায় যে, বৎসর চৈত্র হইতে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুণ মাসে শেষ হইত।

(১৮) Mr. Brennand's Hindu Astronomy, page 117. (১৯) Longitude

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে নক্ষত্র-স্থিতি।

নক্ষত্র নাম	ক্ষেপ Longitude			বিক্ষেপ Latitude		উ: দ:	যোগতারা।
	রাশি	অংশ	কলা	অংশ	কলা		
অশ্বিনী (শুভ্রবর্ণ)	০	৮	০	১০		উ:	উত্তরস্থ।
ভরণী	০	২০	০	১২		,,	দক্ষিণস্থ।
কৃত্তিকা (পাটল)	১	৭	৩০	৫		,,	,,
রোহিণী (রক্তবর্ণ)	১	১৯	৩০	৫		দ:	পূর্ব্বস্থ।
মৃগশিরা	২	৩	০	১০		দ:	উত্তরস্থ।
আর্দ্রা (রক্তবর্ণ)	২	৭	২০	৯		,,	বৃহত্তম।
পুনর্ব্বসু	৩	৩	০	৬		উ:	মধ্যস্থ।
পুষ্যা	৩	১৬	০	০		,,	মধ্যস্থ।
অশ্লেষা	৩	১৯	০	৭		দ:	পূর্ব্বস্থ।
মঘা (পাণ্ডুবর্ণ)	৪	৯	০	০		উ:	দক্ষিণস্থ।
পূ: ফা: (ঐ)	৪	২৪	০	১২		,,	উত্তরস্থ।
(উ: ফা: ঐ)	৫	৫	০	১৩		,,	,,
হস্তা	৫	২০	০	১১		দ:	বায়ুকোণের পশ্চিমস্থ।
চিত্রা	৬	০	০	২		,,	বৃহত্তম।
স্বাতী (কুঙ্কুমবর্ণ)	৬	১৯	০	৩৭		উ:	,,
বিশাখা	৭	৩	০	১	৩০	দ:	উত্তরস্থ।
অনুরাধা	৭	১৪	০	৩		,,	মধ্যস্থ।
জ্যেষ্ঠা	৭	১৯	০	৪		,,	মধ্যস্থ।
মূলা	৮	১	০	৯		,,	মধ্যস্থ।
পূ: আ:	৮	১৪	০	৫	৩০	,,	উত্তরস্থ।
উ: আ:	৮	২০	০	৫		,,	,,
অভিজিৎ (নীলবর্ণ)	৮	২৬	৪০	৬০		উ:	বৃহত্তম।
শ্রবণা	৯	১০	০	৩০		উ:	মধ্যস্থ।
ধনিষ্ঠা (স্বর্ণবর্ণ)	৯	২০	০	৩৬		,,	পশ্চিমস্থ।
শতভিষা	১০	২০	০	০		দ:	বৃহত্তম।
পূ: ভা:	১০	২৬	০	২৪		উ:	উত্তরস্থ।
উ: ভা:	১১	৬	০	২৬		,,	,,
রেবতী	১১	২৯	৫০	০		,,	দক্ষিণস্থ।

দ্বাদশ রাশির উদয়-অস্ত-গমন-বীথিকা।

১লা বৈশাখ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০ ১

নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ১

ঊষা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

১লা জ্যৈষ্ঠ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১

নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

ঊষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

১লা আষাঢ়।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩৯ ১

নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

ঊষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১

১লা শ্রাবণ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ১

নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

ঊষা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০ ১

১লা ভাদ্র।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

ঊষা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১

১লা আশ্বিন।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

নিশীথ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১

ঊষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
৩০ ১

১লা কার্ত্তিক।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
৩০ ১

নিশীথ মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০ ১

ঊষা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০ ১

১লা অগ্রহায়ণ।

উদয়স্থান খ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
৩০ ১

নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১

ঊষা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১

১লা পৌষ।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
৩০ ১

নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
৩০ ১

উষা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩০ ১

১লা মাঘ।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
৩০ ১

নিশীথ কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
৩০

উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
৩০ ২

১লা ফাল্গুন।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
৩০ ১

নিশীথ তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
৩০ ১

উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
৩০ ১

১লা চৈত্র।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
৩০ ১

নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
৩০ ১

উষা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
৩০ ১

বৈশাখার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬

নিশীথ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬

উষা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬

জ্যৈষ্ঠার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
১৫ ১৬

নিশীথ কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬

উষা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

আষাঢ়ার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬

নিশীথ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬

উষা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

শ্রাবণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
১৫ ১৬

নিশীথ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬

উষা কর্কট সিংহ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

ভাদ্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬

নিশীথ বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

উষা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

আশ্বিনার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬

নিশীথ মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

উষা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

কার্ত্তিকার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা
১৫ ১৬

নিশীথ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

উষা তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬

অগ্রহায়ণার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক
১৫ ১৬

নিশীথ সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

উষা বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
১৫ ১৬

পৌষার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর ধনু
১৫ ১৬

নিশীথ কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

উষা ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬

মাঘার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ মকর
১৫ ১৬

নিশীথ তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ
১৫ ১৬

উষা মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট
১৫ ১৬

ফাল্গুনার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন কুম্ভ
১৫ ১৬

নিশীথ বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ
১৫ ১৬

উষা কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ
১৫ ১৬

চৈত্রার্দ্ধ অতীতে।

উদয়স্থান থ অস্তস্থান

সন্ধ্যা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন বৃষ মেষ মীন
১৫ ১৬

নিশীথ ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা সিংহ কর্কট মিথুন
১৫ ১৬

উষা মীন কুম্ভ মকর ধনু বৃশ্চিক তুলা কন্যা
১৫ ১৬

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চদশী-সমালোচনা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ।)

১। বিষয়শূন্য এক মাত্র অনন্ত সত্য জ্ঞানই সৎ ব্রহ্ম, উহাই সাক্ষী চৈতন্য।

২। পঞ্চভূত বা ভৌতিক জগৎ অসৎ, প্রকৃত পক্ষে ছিল না, নাই, থাকিবেও না (অস্তিত্বহীন), যেহেতু উহা মায়ার কল্পনাপ্রসূত মাত্র। ঐ কল্পনাশক্তিই মায়া এবং কল্পিত বিষয়ই ভূত বা ভৌতিক জগৎ।

৩। মায়া-কল্পিত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ ভ্রান্ত জ্ঞান বা ভ্রান্ত জীব-চৈতন্যের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভ্রান্ত জ্ঞান দূরীভূত হইলে, মায়িক জগৎ স্বপ্ন বা মরীচিকার ন্যায় অন্তর্হিত হয় এবং ভ্রান্তজ্ঞান অনন্ত সমুদ্রে বা সত্য জ্ঞানে পর্য্যবসিত হয়; উহাই সত্য।

৪। জীবের মন-বুদ্ধি মায়া-প্রসূত, ঐ মন-বুদ্ধিতে ভ্রান্ত জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। মন-বুদ্ধির ক্রিয়া রহিত হইলে, জীবচৈতন্যের নিকট জাগতিক ক্রিয়া অনুভূত হয় না। এক্ষণে ১ম প্রশ্ন এই যে, জীব কে? এবং মন-বুদ্ধির বিকাশ কি শক্তির দ্বারা হয়? ২য় প্রশ্ন, সাক্ষীচৈতন্য যখন নির্ব্বিকার, তখন কল্পনাশক্তির কর্ত্তা কে? কল্পিত বিষয় (অর্থাৎ জগৎ) সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, ঐ বিষয়ের কার্য্য-কারণের নিয়ামক কে? উত্তর—চৈতন্য অবলম্বনে মায়ার (অর্থাৎ জগৎ-কল্পনাশক্তির) বিকাশ হয়। ঐ কল্পনাশক্তিতে চৈতন্যের আভাস প্রতিভাত হওয়ায়, ঐ চিদাভাসে মায়া-শক্তি চেতনবৎ হইয়া মহতত্ত্বে অর্থাৎ সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হয়। ঐ শক্তিস্থ চিদাভাসই শক্তির নিয়ামক বা চৈতন্য-প্রতিভাসিতা শক্তি চৈতন্যের আভাসে জগৎরূপ ক্রিয়ার কর্ত্রী এবং নিয়ামিকা ঐশ্বরী শক্তি রূপে বিবর্ত্তিতা হন। প্রকৃতপক্ষে ঐ চিদাভাস হইতে শক্তি বা শক্তি হইতে চিদাভাস বা আভাস-চৈতন্য পৃথক্ নহে; পৃথক্ হইলে, শক্তি নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিস্থ আভাস-চৈতন্য মূল পরব্রহ্মে বা ব্রহ্ম-চৈতন্যে মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত মত সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতেছে যে, যেমন অগ্নিস্থ লৌহপিণ্ড উত্তপ্ত এবং স্বয়ং অগ্নিপিণ্ডে পরিণত হইয়া অন্য বস্তু দগ্ধ করিতে শক্ত হয়, কিন্তু ঐ পিণ্ডস্থ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, লৌহপিণ্ডের দাহিকাশক্তি বা উষ্ণত্ব ক্রমে অন্তর্হিত হয়; ঐ লৌহপিণ্ডের উষ্ণত্ব বা পিণ্ডস্থ অগ্নি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত তেজে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়; সেইরূপ চিদাভাস অন্তর্হিত হইলে, শক্তিও নিষ্ক্রিয়া হয়, ঐ শক্তিস্থ চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যে বিলীন এবং অব্যক্ত হয়। যেমন পৃথিব্যাদি গ্রহ-সৃষ্টির সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম তেজ সূর্য্যে ঘনীভূত হওয়ায়, সূর্য্য বা সৌরবিম্ব প্রকাশিত হয়, ঐ সূর্য্যের তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিব্যাদি গ্রহ উৎপন্ন হয় এবং জ্যোতি হইতে পৃথিবী ও গ্রহাদি প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিৎ-জ্যোতি ঘনীভূত হইয়া শক্তিস্থ

হইলে, অব্যক্ত মায়াশক্তি ব্যক্ত হন; ঐ মায়াশক্তির কল্পনায় জগৎ সৃষ্ট এবং শক্তিস্থ চিদাভাসে বা চৈতন্যের জ্যোতিতে জগৎ প্রকাশিত হয়। যেমন জ্ঞানের আভাসে তোমার চিন্তা বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইলে, তুমি পৃথিবীর একখানি মানচিত্র কল্পনার মানস-ক্ষেত্রে অঙ্কিত করিতে পার; ঐরূপ মানচিত্র অঙ্কিত হইলে, তোমার জ্ঞান-চক্ষে অর্থাৎ জ্ঞান-জ্যোতিতে বা বুদ্ধিতে তাহার দোষ-গুণ প্রতিভাত হয়, এবং ঐ মানচিত্র যথায় যেরূপ হইলে সুন্দর এবং সুদৃশ্য হয়, তদ্রূপ কল্পনা-ক্ষেত্রে তাহার সুব্যবস্থা করিতে পার, সেইরূপ চৈতন্যের জ্যোতি বা চিদাভাসে মায়া-শক্তি বিকাশিত—অর্থাৎ মহত্তত্ত্বে পরিণত হইলে, কল্পনার মহা মানস-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড প্রকটিত হয়, এবং ঐ মহা মানস-ক্ষেত্রে জগৎ প্রকটিত হইলে, সম্বিম্বিত চিৎ-জ্যোতিতে অর্থাৎ জ্ঞানালোকে তাহা প্রকাশিত, নিয়মিত ও সুব্যবস্থিত হয়। শক্তিস্থ চিদাভাস বা চিদ্‌বিম্বকে বেদান্তদর্শনে ঈশ্বর এবং ঐ চিদাভাসিতা-শক্তিকেই পরাশক্তি বা ঐশ্বরী শক্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। বিম্ব অর্থে আকার, কিন্তু শক্তিস্থ চিদাভাসের আকার কি প্রকারে সম্ভবে? শক্তি দৃশ্য পদার্থ নহে বটে, তবে চৈতন্যাভাসে চেতনবৎ হইয়া সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে পরিণত হইলে, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বে চিদাভাস বা চৈতন্যও সমষ্টি জ্ঞানাকারে বিম্বিত হয়েন; ঐ সমষ্টি জ্ঞানাকারের মধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা-ক্ষেত্রে ভাসমান হয়। ঐ চৈতন্যাভাসিত-সমষ্টিবুদ্ধি বা বিরাট মন জগতের কারণ-শরীর এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডই কার্য্য-শরীর। ঐ শক্তিস্থ চিদ্বিম্বই ভক্তের চিদ্ঘন ভগবান এবং চিদাভাসিতা শক্তিই মহামায়া আদ্যাশক্তি; এ উভয়ই সাংখ্যদর্শনোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি। যেমন তোমার কোন বিষয়-কার্য্যেতে জ্ঞানের আভাস আছে, এবং জ্ঞানেতে বিষয় বা কার্য্যের আভাস আছে, কার্য্যের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত ক্রিয়া-শক্তি বিজড়িত, সেইরূপ মায়াশক্তি এবং ঐ শক্তিস্থ চিদাভাস পৃথক্ নহে।

যেমন জগতে সর্ব্ব স্থানে গুহ্য তেজ বা অব্যক্ত অগ্নির অস্তিত্ব আছে; জগতে তেজশূন্য স্থান নাই, কিন্তু বস্তু-বিশেষের সংযোগ ব্যতীত তেজের বিকাশ হয় না। (যথা যদি জগতে সূর্য্যের অস্তিত্ব একেবারে না থাকে, তবে জ্যোতি ও তাপের বাহ্য বিকাশ থাকে না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জগতে তেজের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না) সেইরূপ জগৎ-প্রসূতি ক্রিয়াশক্তির অভাব হইলে, (অর্থাৎ চৈতন্য-শক্তির বিকাশ না হইলে) বাহ্যজ্ঞান-শক্তিও অবিকাশিত হয়, কিন্তু মূল চৈতন্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না; ঐ মূল সাক্ষী-চৈতন্য বা ব্রহ্ম-চৈতন্য কেবল অস্তিত্ব মাত্রে পর্য্যবসিত ও অব্যক্ত হয়েন। তড়িৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, ইহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকার করেন; কিন্তু যেমন তড়িৎ-পরিচালক ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় না, সেইরূপ, ক্রিয়াশক্তি ব্যতীত চৈতন্য বা জ্ঞানের বাহ্য বিকাশ হয়না। যেমন একই তেজ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিভাসিত হইলে, সেই সেই বস্তুর গুণানুসারে ঐ তেজ

বা জ্যোতি ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিকাশিত হয়; যথা মেঘে তড়িৎ, জলে বাড়বানল, বনে দাবানল, চন্দ্রে জ্যোৎস্না, কাষ্ঠে অগ্নি; কাচ, প্রস্তর, মুক্তা, ধাতু প্রভৃতিতে কেবল জ্যোতি ইত্যাদি নানা আকারে তেজ বিকৃত ও বিবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্ব-রজাদি-আশ্রিত এবং মিশ্র গুণে প্রতিভাসিত হইয়া, সেই সেই গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বে বা ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিবর্ত্তিত হয়েন। সৌরজগতে সূর্য্য যেমন সমষ্টি-তেজের প্রতিনিধি বা তেজোধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেইরূপ মায়া বিম্বিত চৈতন্য-ঘনই ভক্তের ভগবান বা মায়িক জগতের ঈশ্বর। যেমন সূর্য্য-বিম্বিত তেজোভাস বা জ্যোতি বিশেষ বিশেষ বস্তুতে প্রতিভাত হইয়া তদাকারে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ সৌর কিরণ দ্বারা বস্তুর রূপ বা আকার প্রকাশিত হয়, সেই রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস কর্ত্তৃক বিশ্ব প্রকাশিত হয়; অর্থাৎ যেমন একই সূর্য্য-কিরণ প্রস্তরে প্রতিভাত হইয়া প্রস্তরাকার, বৃক্ষে প্রতিভাত হইয়া বৃক্ষাকার, জলে প্রতিভাত হইয়া জলাকার ধারণ করে, সেইরূপ চিদাভাসিতা একই মায়া কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানবাদি অসংখ্য জীব এবং গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব নানা প্রকার জড় রূপে জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়। ভৌতিক জগতে যেমন আকাশ অবলম্বনে বায়ু (গতি), বায়ু হইতে তেজ (উষ্ণতা), তেজ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ পঞ্চভূত-সংমিশ্রণে গ্রহ-নক্ষত্র-পৃথিব্যাদি স্থূল জড় পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অধ্যাত্ম-জগতে সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তি বিকাশিত এবং ঐ মায়াশক্তির বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ চৈতন্যের আভাসে চিৎশক্তি বা চিন্ময়ী মহৎ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ সত্ত্বময় মহৎক্ষেত্রে রজোগুণের বিকাশ হওয়ায় সৃষ্টি-কল্পনা আরব্ধ হয়। ঐ কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, রূপ, রস এবং গন্ধ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। উক্ত মহৎক্ষেত্রে ঐ কল্পনা পঞ্চ-তন্মাত্রে বিবর্ত্তিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়; ঐ কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জীবের নিকট সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সমগ্র মন বিষয় বিশেষে একাগ্র না হইলে, তাহাতে সমাধি লাভ বা সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয় না; যদি তাহাই হয়, তবে সমগ্র চিন্ময়ী মহাশক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কি জড়তত্ত্বে অর্থাৎ পঞ্চতন্মাত্রে বিবর্ত্তিতা এবং তদ্দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকটিতা হয়েন? যদি তাহাই হয়, তবে জগতের নিয়ামক বা নিয়ামিকা-শক্তির অস্তিত্ব কোথায়? জড়তত্ত্ব কখনও জড়- ও জীব-জগতের নিয়ামক হইতে পারে না। সমগ্র চিন্ময়ী মায়া বা সত্ত্বময়ী মহাশক্তি জগৎ কল্পনা করিয়া, পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইলে, কে ঐ পঞ্চ-ভূতের নিয়ামক স্বরূপে সুশৃঙ্খলাপূর্ব্বক বিচিত্র জড় ও জীব-জগতের যথায় যেরূপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, তথায় সেইরূপ কার্য্য করে? এবং কেইবা মায়িক জগতের জীবরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া, ঐ কল্পিত জগৎ সত্যের ন্যায় অনুভব করিয়া, সুখ-দুঃখাদি

ভোগ এবং মায়িক জগতে ক্রিয়া করে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা উপরোক্ত ৪৮ হইতে ৫০ শ্লোকে এবং তৎপরে ৫৪ শ্লোক হইতে ৯০ শ্লোকে আছে এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা এই ভূতবিবেকের পর পঞ্চকোষ-বিবেকে বিশদরূপে আছে, তাহার সমালোচনা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এক্ষণে প্রথম প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর এই যে, সমস্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য বা ঈশ্বর কিম্বা সত্ত্বময়ী ঐশ্বরী শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চতন্মাত্রে বা পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত হন না। সৎব্রহ্ম সাক্ষী-চৈতন্য অবলম্বনে যে মায়া-শক্তির বিকাশ হয়, সেই মায়া-শক্তি সমগ্র চৈতন্যব্যাপিনী নহে। ব্রহ্মচৈতন্যের নিকট জগৎ কিছুই নহে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মচৈতন্য অবলম্বনে যে মহদ্‌বুদ্ধির বা কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, ঐ বুদ্ধি বা ঐ কল্পনাশক্তি সমস্ত চৈতন্যব্যাপিনী হইতে পারে না। আমি ভ্রান্ত জীব, সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রান্তি বা মরীচিকায় জল-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তবুদ্ধি) আমার সম্বল; তৎসত্ত্বেও যখন আমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করি, তখন আমাতে কোন বিষয়বুদ্ধি বা কল্পনা থাকে না। ঐ বুদ্ধি বা কল্পনাশক্তি অবিকাশিত হয়, কিন্তু আমার চৈতন্য স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ থাকেন। ইহা দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, মায়া বা মহৎ কল্পনাশক্তি সমগ্র-চৈতন্য-ব্যাপিনী নহে। আবার চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি (পরাশক্তি) বা সত্ত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধি-তত্ত্ব জড়জগতে পরিণত হয় না। ঐ চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি অবলম্বনে যে কল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্রে বিবর্ত্তিত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই জগৎ-কল্পনা ব্যতীত সমষ্টি চিন্ময়ী মহাবুদ্ধি জড়ত্বে পরিণত হয় না। আমি যে পঞ্চদশী ব্যাখ্যা করিতেছি, আমার সমগ্র জ্ঞান-শক্তি বা বুদ্ধি এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যায় কখনই নিবদ্ধ নহে; অন্য শত শত বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। আমি ভ্রান্ত জীব, আমার মন-বুদ্ধি যদি এই পঞ্চদশী-ব্যাখ্যায় তন্ময় হয়, তবে ঠিক সেই তন্ময়ত্বকালে অন্য কোন বিষয়-জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না বটে, কিন্তু এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যা হইতে মন অপসৃত হইলে, অন্যান্য বিষয়জ্ঞান আমার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, মহৎক্ষেত্রে সৃষ্টিকল্পনা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময় হইলে, তৎকালে সমষ্টি-চিন্ময়ী শক্তি বা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী সমষ্টি-জ্ঞান-শক্তি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত—অর্থাৎ জড়জগতে বিবর্ত্তিত হয় কি? উত্তর—না, মায়াশক্তিস্থ চিদাভাস সত্ত্বগুণাক্রান্ত হইলেও আবরণশূন্য; যেহেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব। * সেই পূর্ণ প্রকাশ-স্বভাব সত্ত্বময়ী চিৎশক্তি অবলম্বনে যে জগৎ-কল্পনা ভাসমান হয়, কেবল সেই জগৎকল্পনা-শক্তির সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া কল্পিত

* ঐ প্রকাশস্বভাবের পার্থিব দৃষ্টান্ত এইরূপে দেওয়া যাইতে পারে, যথা বিলাতী উৎকৃষ্ট কাচ নির্ম্মিত পরকলা বা চিম্‌নি আলোকোপরি আবরক হইলেও, ঐ চিম্‌নির স্বচ্ছতায় আলোক পরিষ্কার হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণে চিদাভাস সুমধিক প্রকাশিত হয়।

বিষয়ে তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আদৌ বিকৃত হন না, কিম্বা সমষ্টি-শক্তি-বিম্বিত ঈশ্বরও বিকৃত হন না; অথবা সত্ত্বস্থ সমষ্টি-চিদাভাস, যাহা মহৎক্ষেত্রে প্রকাশাত্মক সূক্ষ্ম মহাবুদ্ধি, সঙ্কল্পাত্মক সূক্ষ্ম মহামানসতত্ত্ব বা ক্রিয়াত্মক সূক্ষ্ম মহাপ্রাণ প্রতিভাসিত বা প্রতিবিম্বিত হইয়া হিরণ্যগর্ভরূপে জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি বদ্ধ বা বিকৃত হন না। কেবল ঐ মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার সত্তা তমোগুণাক্রান্ত হইয়া পঞ্চভূতে বা ভৌতিক বৈচিত্র্যময় জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, সেই বৈচিত্র্যময় জড়তত্ত্বস্থ শুদ্ধ চৈতন্যের জড়-সংস্পৃষ্ট ব্যষ্টি-মলিনাভাস—অর্থাৎ আভাস-চৈতন্য (বা ব্যষ্টি-জীবচৈতন্য) বদ্ধের ন্যায় প্রতিভাত হয়। অবশ্যই মহৎক্ষেত্রে যে কল্পনার ভাব পঞ্চভূতে বা ভৌতিক জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়, তাহাতেও আভাসচৈতন্য গূঢ় থাকে। কারণে যাহা আছে, কার্য্যে তাহার আভাস নিশ্চয়ই আছে। এই জন্য ৪৮। ৪৯। ৫০ শ্লোকে চৈতন্য সম্পূর্ণ বদ্ধ নহে, ত্রিপাদ-মুক্ত (অর্থাৎ সাক্ষীচৈতন্য ঈশ্বর ও হিরণ্য-গর্ভমুক্ত) একপাদ বিশ্ব-বদ্ধ হওয়ার উল্লেখ আছে, এবং তাহার দৃষ্টান্ত—অর্থাৎ সমগ্র মৃত্তিকার ঘট-শরাব-জনন-শক্তি নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকার ঘটাদি-জনন-শক্তি আছে, প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে ৫২ শ্লোকে নিরংশ ব্রহ্মচৈতন্যে অংশ বা পাদ কল্পনা হইতে পারেনা, কেবল অবিদ্যাচ্ছন্ন ভ্রান্তবুদ্ধি শিষ্যগণকে বুঝাইবার জন্য পাদ বা অংশ কল্পনা করা হইয়াছে, প্রকাশ আছে। বস্তুতই ঐরূপ অংশ বা পাদ শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝান অতীব কঠিন। এই জন্য তৎপরবর্ত্তী ৫৩ শ্লোকে প্রকৃত তাৎপর্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস প্রকাশের নিমিত্ত পুনঃ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা কোন ভিত্তির বা স্তম্ভের উপরিভাগ নানা বর্ণে রঞ্জিত করিলে, ঐ রঞ্জিত চিত্র, ভিত্তি বা স্তম্ভের উপরিভাগে ভাসমান হয় ব্যতীত ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের অভ্যন্তরে ঐ রঞ্জিত চিত্র প্রবিষ্ট হয় না, বা সমগ্র ভিত্তি বা স্তম্ভ রঞ্জিত ও বিকৃত হয়না; ঐ রঞ্জিত চিত্র ধৌত করিয়া ফেলিলে, স্তম্ভ বা ভিত্তির উপরিভাগেও ঐ রঞ্জিত চিত্র থাকেনা। বস্তুতঃ ঐ ভিত্তি বা স্তম্ভের ইষ্টক রঞ্জিত বা চিত্রিত হয়না বা ইষ্টক-গ্রথিত স্তম্ভ বা ভিত্তিও সম্পূর্ণ রঞ্জিত নহে; ঐ রঞ্জিত চিত্র স্তম্ভোপরি ভাসমান হয় মাত্র। এখন এই দৃষ্টান্তের সহিত আমার উপরোক্ত সমালোচনা পাঠকগণ মিল করিয়া দেখিলে, মায়াশক্তি এবং মায়িক জগতের আভাস কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন; তদ্‌ভিন্ন উহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত জগতে নাই ও ভাষায়ও অবর্ণনীয়। বাহ্য জগতে জীব-চৈতন্য এবং জীবের মানস-কল্পনার সহিত ব্রহ্মচৈতন্য বা মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার সর্ব্বাবয়বে সাদৃশ্য নাই, তদ্ধেতু বাহ্য জগতের দৃষ্টান্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পাঠকবর্গকে বুঝান কঠিন; যেহেতু মায়ার সৃষ্টিকল্পনা—যাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-বিম্বিত ঈশ্বর-চৈতন্যে ভাসমান হয়, তাহাই তমোগুণাক্রান্ত ও তন্ময়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়া, যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল দৃশ্য জগদাকারে বিবর্ত্তিত হয়; তদ্দ্বারা সাক্ষী ব্রহ্ম চৈতন্য বিকৃত হন না বা সত্ত্ব-বিম্বিত সমষ্টি-চিদাভাস (অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্য)

জড়ত্বে পরিণত হন না। জীবের মানস-কল্পনা ব্রহ্মশক্তি মায়ার সৃষ্টি-কল্পনার ন্যায় নহে বা তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইতে পারেনা; যেহেতু জীবের ঐ মানস-কল্পনা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত জীব-চৈতন্যে ভাসমান হয়, এবং কল্পনা মানস-ক্ষেত্র হইতে বাহ্য জগতে নানাপ্রকার কার্য্যে পরিণত হয়, কিন্তু ঐ মানস-কল্পনা সাক্ষাৎভাবে জড়ত্বে পরিণত কি বাহ্য জগতে স্থূল পদার্থে (ইন্দ্রজালের ন্যায়) বিবর্ত্তিত হওয়া দৃষ্ট হয় না; তবে কল্পিত বিষয়ে জীবের মন-বুদ্ধি বিকৃত হয়। * যদিও বুদ্ধি ঐ কল্পিত বিষয়ের দোষ-গুণ নির্ব্বাচন এবং তাহা সুনিয়মে সংস্থাপন করিতে শক্ত হয় বটে, তথাচ মন যখন কল্পিত বিষয়ে একাগ্র বা তন্ময় হয়, তখন বুদ্ধি বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-ঘনের সহিত সেই বিষয়ে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সৃষ্টি-কল্পনা জগদাকারে বিবর্ত্তিত হইলেও ব্রহ্ম-চৈতন্য-বিম্বিতা ঐশ্বরী শক্তি জড়ত্বে তন্ময় হন না। তাহার কারণ পঞ্চ-কোষ ও জীব-চৈতন্য ব্যাখ্যা কালে প্রদর্শিত হইবে। ফলতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য অবলম্বনে জীবচৈতন্যের উপরে ভ্রান্ত জগৎ ভাসমান হইলেও, সমষ্টি-ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত বা তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত (অর্থাৎ জড়ত্বে পরিণত) হন না। চৈতন্যের যে এক পাদ জড়-সংসৃষ্ট হয়, তাহাই যে জীব-চৈতন্য, তাহা ঐ পঞ্চকোষ ব্যাখ্যা কালে বিশদভাবে দর্শান যাইবেক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য।

(সোঽহংতত্ত্ব।)

ভগবদিচ্ছায় ভব-সংসারে মানবের বিবিধ সম্বন্ধ-সংস্কার স্থাপিত হইয়াছে। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, প্রভু ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, সখ্য প্রভৃতি বহুবিধ রসের আদান-প্রদান চলিতেছে। এতদতিরিক্ত কোন অপূর্ব্ব সম্বন্ধ-রসাস্বাদ মানবের অনভ্যস্ত ও অসংস্কার-সিদ্ধ। ভগবান ও ভক্তের সম্বন্ধজনিত যে সর্ব্বরসোত্তমোত্তম রস, তাহাও ঐ সমস্ত সাংসারিক সম্বন্ধ-রস হইতে সংপূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় নহে। উহা সাধকের পক্ষে রুচি বা অধিকারভেদে উহারই অন্যতম রসের চরমোৎকর্ষ স্বরূপ। সম্বন্ধাশ্রিত রসের শ্রেণী-ভেদ অনুসারে ভাবের ভেদ যেরূপই হউক না কেন, ফলিতার্থে সমস্তই "পরানুরক্তিরীশ্বরে"।

ঈশ্বরে শাক্তের মাতৃভাব, শৈবের পিতৃভাব, বৈষ্ণবের পতি, পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি (অধিকারভেদে) বহুভাব, সৌর ও গাণপত্যের প্রভুভাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত

---

* এই মন-বুদ্ধি বিকৃত হইলে, অন্তর্জ্জগতে মনের চিন্তা বা কল্পনা হইতে ভাবী শরীরতত্ত্ব প্রস্তুত হয়; ঐ তত্ত্ব হইতে পরজন্মে-কে মস্তিষ্ক প্রস্তুত হয়, তাহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

আছে। আর্য্য-ধর্ম্মের পরবর্ত্তী ধর্ম্মনিচয়েও ঈশ্বরের প্রতি ঐরূপ সম্বন্ধভাবাশ্রয় স্বীকৃত হইয়াছে; যথা বৌদ্ধের গুরুভাব, খ্রীষ্টানের প্রভু-পিতৃ-ভাব, মুসলমানের প্রভুভাব ইত্যাদি। মুসলমান-ধর্ম্মের স্থাপয়িতা স্বয়ং হজরৎ মহম্মদের সখ্যভাব-মিশ্রিত দাস্য-ভাবেরই সাধনা ছিল, ইহাই কোরাণে বর্ণিত। এইজন্যই মহম্মদ্ "খোদার দোস্ত" "হবিবুল্লা" (হবিব্-বন্ধু, উল্লা-আল্লার) আখ্যাতে ইস্লাম্-জগতে বিখ্যাত; কিন্তু তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ ও পরবর্ত্তী সমগ্র মুসলমান জাতিতে মাত্র প্রভুভাবের উপাসনাই স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মে খোদ যীশুখ্রীষ্টের (যিনি ঈশ্বর-পুত্র বলিয়া স্পষ্ট প্রসিদ্ধ) পরিষ্কার পিতৃভাবের সাধনা পরিদৃষ্ট হইলেও, তাঁহার আশ্রিত খ্রীষ্টান-জগতে প্রভুভাবই প্রতিষ্ঠিত হইল। পিতৃভাব ও প্রভুভাব পরস্পর বিশেষ নৈকট্যযুক্ত; সুতরাং পিতৃভাবের সূক্ষ্ম বিশেষত্বটুকু যেখানে অনায়ত্ত হয়, সেইখানেই প্রভুভাব-পরিণতি ঘটে। পিতৃভাবে ভয়ের ভাব ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব কম; ভক্তি, আদর ও আব্দারের ভাব বেশি; আর প্রভুভাবে ভক্তি-মিশ্রিত ভয় ও আপাত-সম্ভ্রমের ভাব প্রবল। "অনুরক্তি" সকল ভাবেরই প্রাণ। ভক্তি, প্রেম, স্নেহ, সখ্যাদি, সংজ্ঞা-ভেদে এই "অনুরক্তি" পদার্থটিরই প্রকার-ভেদ মাত্র। ইংরাজীতে "Love" শব্দটি প্রায় এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালায় এক "ভালবাসা" শব্দই ইহার সাধারণ প্রতিনিধি। যাহাতে প্রাণের টান, তাহাতেই ভালবাসা। এই ভালবাসা বা অনুরক্তি প্রবলতম অবস্থায় উপস্থিত হইলে, উহা যে কোন ভাবাশ্রিতই হউক না কেন, ভগবদুপাসনা-পক্ষে তাহাতেই উদ্দেশ্য-সাধন হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, সাধারণ বিচারে প্রভুভাব হইতে পিতৃভাবকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, কেন না প্রভুভাব পিতৃভাবের অন্তর্ভূত। যিনি প্রভু, তিনি পিতৃকল্প হইলেও সম্বন্ধ-রসে প্রভুই বটেন, কিন্তু পিতা সম্বন্ধ-রসানুসারেই পিতাও বটেন, প্রভুও বটেন। তারপর মনে করুন, ত্রেতাযুগের ভক্তচূড়ামণি হনুমান দাস্য-রসের সাধক; শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি প্রভুভাবেই উপাসনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অনুরক্তি অন্য সর্ব্বরসের শ্রেষ্ঠতম সাধকগণের তুলনায় কোন অংশেই ন্যূন বলিতে সাহস হয় না। মহামুনি শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্রেই ভক্তির লক্ষণ বর্ণনায় বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। যদি ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভগবদুপাসনার সর্ব্বার্থসাধিনী শক্তি হয়, তবে হনুমানের রামোপাসনায় তাহার চরম পরকাষ্ঠা জন্মিয়া সমগ্র ত্রেতাযুগ গৌরবান্বিত করিয়াছিল। ফলকথা, রুচ্যধিকার-ভেদে যিনি যে সম্বন্ধ-রসাশ্রয় ধরিয়াই ভগবানকে ভজনা করুন না কেন, তাঁহার তত্তৎ রস-ভাব পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইলে—অর্থাৎ পরানুরক্তিরূপে পরিণত হইলেই কৃতার্থতা (ভগবৎপ্রাপ্তি) লাভ হয়।

ভগবান উপাস্য, ভক্ত উপাসক, ইহাত সকলেই জানে, কিন্তু এই উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধটি কিরূপ? সাংসারিক দৃষ্টান্তে পিতা উপাস্য, পুত্র উপাসক; গুরু উপাস্য, শিষ্য উপাসক; এইরূপ পতি-পত্নী, প্রভু-ভৃত্য, রাজা-প্রজা ইত্যাদি উপাস্য-উপাসকত্বের

একটা সম্বন্ধ-তত্ত্ব আমরা বুঝি। উহা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সাংসারিক স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারের সঙ্গে সহজেই মিলে; কেননা আমরা এই ভব-রঙ্গভূমে মানব-সাজে অভিনয় করিতে আসিয়া ঐ সব সম্বন্ধেই সম্বদ্ধ হইয়া আছি। উপাস্য-সাজে আমি পিতা, পতি, গুরু, প্রভু বা রাজা ইত্যাদি, আবার উপাসক-সাজে আমিই পুত্র, পত্নী, শিষ্য, ভৃত্য, প্রজা ইত্যাদি। সংসারে একাই আমি এই বিবিধ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধাশ্রিত রসাস্বাদ করিতেছি, একাই আমি সংসারের সর্ব্ব-সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিতেছি; কিন্তু সংসারের সার যে ভগবান, তাঁহার সহিত ভক্তের যে পরম সম্বন্ধ, তাহার তত্ত্ব বুঝিতে সাধারণ মানবের অধিকার নাই। অবিদ্যাচ্ছন্ন মলিন জ্ঞানে সে ভগবানও নহে এবং বিষয়াতপ-বিশুষ্ক বিরস প্রাণে সে ভক্তও নহে, সুতরাং বুঝিবে কিরূপে? তাহার পক্ষে যদি ভগবান হইতে হয়, তবে সংসারের সেই পিতা-গুরু-প্রভু প্রভৃতিই হইতে হয়; আর যদি ভক্ত হইতে হয়, তবে সেই পুত্র-শিষ্য-ভৃত্য প্রভৃতিই হইতে হয়। মায়া-মোহাচ্ছন্ন মর্ত্ত্য-মানব-জীবনে এতদতিরিক্ত উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ-তত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত। তাই সাধনারম্ভে ভগবানের সঙ্গেও ঐ সমস্ত সহজ সংসার-সংস্কার-সাপেক্ষ সম্বন্ধ পাতাইবারই ব্যবস্থা। কিন্তু এই সম্বন্ধের অতীতাবস্থায় ভগবানের সহিত ভক্তের যে নিত্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ-সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহাই ভক্ত-ভগবানের প্রকৃত সম্বন্ধ, এবং তাহাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আলোচ্য। আলোচনা ভিন্ন সিদ্ধান্ত-প্রতীতির আশা আমাদের অধিকারে অসম্ভব।

আমাদের আর্য্য-শাস্ত্র এই সম্বন্ধ-নির্ণয়-সমস্যার এক অপূর্ব্ব রহস্যময় সিদ্ধান্ত শুনাইতেছেন। শাস্ত্র বলেন, ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই ভক্ত-ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। মোহান্ধ মানব! এখন তুমি ভক্তও নয়, ভগবানও নয়; ভগবান ও ভক্ত হইতে অনেক দূরে; সুতরাং সে মহা সম্বন্ধের অপূর্ব্ব অমৃত-রস তুমি কিরূপে আস্বাদিবে? তুমি চিরবিরহী, সে মিলনের মধু কত মধুর, তাহা তুমি কি বুঝিবে? বাস্তবিক মিলনেই সে সম্বন্ধের সার্থকতা। ভগবানের সহিত ভক্তের প্রকৃত সম্বন্ধ হয় কখন? উভয়ের মিলন হয় যখন। "যোগ"ইত মিলন, বিয়োগ ও বিচ্ছেদ একই কথা।

এই স্থলে আর একটি বিষয় আলোচ্য। ভগবান ও ভক্তের পূর্ণ মিলনে অদ্বৈততত্ত্ব এবং বিরহেই দ্বৈত-তত্ত্ব মূলতঃ প্রতিভাসিত। উপাস্য ও উপাসক, কারক-বাচ্যের প্রত্যয়ার্থ-ভেদে এই শব্দদ্বয় গঠিত হওয়ায়, উভয়ের পূর্ণ তাৎপর্য্যে যে অর্থগত ভেদ, তাহাই দ্বৈতভাব, অর্থাৎ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধই দ্বৈতভাব; তবে অদ্বৈতভাবে বা মিলনে সে সম্বন্ধের সার্থকতা কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যার সমাধানও আর্য্য-শাস্ত্রেই সম্পাদিত।

বিরহীই উপাসক বা সাধক, মিলিতই "সোঽহং"-সিদ্ধ। বিরহীর প্রিয়-মিলনার্থ পুরুষকারই উপাসনা। উক্ত পুরুষকারের সাফল্যে উপাসনার পূর্ণতা বা সোঽহং-তত্ত্ব-সিদ্ধি; কিন্তু

এই সোঽহং- তত্ত্বেই যে উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতত্ব একেবারে তিরোহিত হইতেছে, তাহা নহে ; সোঽহং-তত্ত্বের স্থূল অদ্বৈতভাবের ক্রোড়ে সূক্ষ্ম দ্বৈতভাব লুকায়িত আছে।

সঃ+অহং=সোঽহং, তিনি+আমি=তিনিই আমি ; একই কথা। সঃ+অহং বা তিনি+আমি, এইত দ্বৈতবোধ ; অর্থাৎ যেন তিনি একজন আর আমি একজন। এইত যোড় ; যোড়ইত সম্বন্ধ, যোড় ভাঙ্গিলেই সম্বন্ধচ্ছেদ। অদ্বৈত-সোঽহংতত্ত্বান্তর্গত এই যে দ্বৈত, সেই দ্বৈতজনিত সম্বন্ধই প্রকৃত উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ। অতএব ভক্তও তুমি, ভগবানও তুমি, ইহা যখন বুঝিবে, তখনই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-তত্ত্ব বুঝিবে।

উপ—সমীপে, আসনা—বসা ; উপাসনার অর্থই ঈশ্বরের কাছে বসা। আহা! অর্থটি এতই ঠিক—এতই মধুর যে—পাষণ্ডেরও প্রাণ-স্পর্শী! উপাসনা—তাঁহার কাছে বসা বা তাঁহাকে কাছে পাওয়াই বটে। তা তাঁহার কাছে বসিলে কি আর উঠা যায়? না উঠিতেই আছে? উপাসক সেই হইয়াছে, যে তাঁহার কাছে বসিয়া গিয়াছে! সোঽহং-তত্ত্ব এই যে—'সঃ'-সমীপে 'অহং' বসিয়াছে। 'অহং' 'সঃ'—উপাসনা করিতেছে! ইহাই প্রকৃত উপাসনা। এই উপাসনায় উপাস্য-উপাসকে যে সম্বন্ধ, তাহাই স্বরূপতঃ উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ। ইহাতে যে দ্বৈত, তাহাতেই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। যদি তিনাক্ষর সঃ-অহং কমিয়া সন্ধিতে (মিলনে) অ-লোপে দ্ব্যক্ষর সোঽহং—অবশেষে একাক্ষর সঃ মাত্র থাকেন, তবে তিনিই অদ্বৈত—প্রকৃত অদ্বৈত। তিনিই একাক্ষর—অর্থাৎ এক ও অক্ষর—কিনা ক্ষয়রহিত। এই যথার্থ অদ্বৈততত্ত্বই—"অবাঙ্‌মনসোগোচরঃ", উহাই "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—উহাই "যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্‌" "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" উহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌"—"সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম"—উহাতেই কেবল দ্বৈতভাবাত্মক উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ নাই। উহাই উপাসনাতীত উপনিষৎ-নিহিত নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব।

"সোঽহং" ত স্পষ্ট যোড়া—স্পষ্ট দ্বৈত; উপাসনার পূর্ণপরিণতি, ভক্তি-তত্ত্বের পরম প্রকর্ষ।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্‌।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌॥"

শাস্ত্রোক্ত এই নবধাভক্তি-লক্ষণরে নবম বা সর্ব্বশেষ লক্ষণই আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন যাঁহার হইয়াছে, যিনি পরমাত্মায় নিবেদিতাত্ম, তিনিইত সোঽহংতত্ত্বে উপনীত বা পরম পূর্ণভক্ত ; তিনিই সমীপে বসিয়াছেন, তিনিই সার্থক উপাসক হইয়াছেন। তাঁহারই উপাস্যের সহিত সম্বন্ধ, কারণ তিনিই উপাস্যে সম্বদ্ধ। "বেদান্ত নাস্তিকতা মানে, সোঽহংতত্ত্ব অদ্বৈতবাদ আনিয়া ভক্তিমার্গ অবরোধ করে বা উপাসনাকাণ্ড পণ্ড করে", এইরূপ যে একটা শাস্ত্র-সমন্বয়-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত মত আজকাল আমাদের সমাজে নূতন দেখা দিয়াছে, ইহা উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রহস্যটি সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা না করার ফল মাত্র।

অধুনা সোঽহং-তত্ত্বকে একটা মতবাদ বলিয়া ভুল বুঝাতেই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধ বুঝিতে আমরা ভুল করিতেছি। উহা মতবাদ নহে, উহা উপাসনারই পূর্ণ পরিণতির অবস্থা। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ইহাই নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহাই অদ্বৈত-তত্ত্ব—উপাসনার অতীত তত্ত্ব। ঈশ্বর-তত্ত্ব সগুণ ও দ্বৈতত্ত্বে উপাসনার বিষয়ীভূত। ব্রহ্মই বিশ্ব; সুতরাং বিশ্বাংশীভূত হওয়াতে, তুমি, আমি, সকলেই,—এমন কি, একটি কীটাণু বা একটি ধূলি-কণাও ব্রহ্ম। এ সিদ্ধান্ত পরিষ্কার, ইহাতে কোন গোল বা আপত্তি নাই। এই ভাবে একটি বিষ্ঠার ক্রিমিরও 'সোঽহং' বলিতে অধিকার আছে! কিন্তু উপাস্য সগুণ ঈশ্বরতত্ত্ব লক্ষ্য করিয়া 'সোঽহং' বলিতে সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকাশক স্বয়ং বেদব্যাসও ইতস্ততঃ করিতে পারেন; তুমি আমি কোন্ ছার! পরন্তু এই সোঽহংতত্ত্বের অপসিদ্ধান্ত-ফলে একজন অল্পাধিকারী উপাসনা-ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট হইতে পারে সত্য, এবং এই জন্যই উপাস্য-উপাসক-সম্বন্ধের পূর্ণপরিণতি স্বরূপ এই তত্ত্বের রহস্য-ভেদার্থে শাস্ত্র-সাহায্যে আলোচনার প্রয়োজন। এ তত্ত্ব যে উপাসনার বিরোধী নয়, বরং ইহাই উপাসনার চরম ও পরম লক্ষ্য, এবং এই তত্ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য নিহিত, এইটি বুঝিতে চেষ্টা করা উপাসনার্থী মাত্রেরই আবশ্যক।

তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব বুঝাইয়াছেন, ভগবানের সঙ্গে জীবের উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ জীব সর্ব্বদা প্রতিশ্বাসে "হংসঃ" বা 'সোঽহং' মন্ত্র জপের দ্বারা স্মরণ করিতেছে। শ্বাস গ্রহণে যে শব্দ হয়, তাহা ঠিক "হং" এবং শ্বাস-ত্যাগে যে শব্দ, তাহাই "সঃ"। এই "হংসঃ" মন্ত্রেই বিলোমভাবে 'সঃ+অহং' বা 'সোঽহং' হইতেছে। উপাসক জীব উপাস্য ব্রহ্মের সহিত অহরহঃ—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে আত্মসম্বন্ধ স্মরণ করিতেছে; অথচ মনন অভাবে সে সম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতেছে না।

কাছে না বসিলে উপাসনা হইবে না; তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া সুতরাং কৃতার্থ হওয়া যাইবে না। কাছে বসা চাই। হিন্দীভজন ঠিক গাইয়াছেন—"হরিসে লাগি রহোরে ভাই!" গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"নিবসিষ্যসি ময্যেব।" অর্থাৎ আমাতে লাগ—আমাতে থাক। বলিয়াছেন—"মামেকং শরণং ব্রজ।" আমারই আশ্রিত হও—আমারই শরণ লও, ইত্যাদি। উপাসনা দ্বারা তাঁহাতে আশ্রিত হইলেই তাঁহার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ পাতান হইল;—তাঁহাতে লাগিতে বা থাকিতে হইল। বসিলে আর উঠিবার যো নাই। সম্বন্ধ হইলেই সম্বন্ধ হইতে হয়। বাহিরের উঠাত উঠা নহে। পূজা-আহ্নিকের আসন ছাড়িয়া উঠিলেই উপাসনা ছাড়া হয় না। বাহিরের বিচ্ছেদে সম্বন্ধ যায় না; বরং ভক্ত উপাসকের পক্ষে হয় "ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"! শত বিষয়-ব্যাপারে পড়িয়া বাহ্যোপাসনা রহিত হইলেও "ধীরো নমুঞ্চতি মুকুন্দ-পদারবিন্দং।" বিষম বিষয়াকর্ষণেও ভক্তের চিত্ত অচ্যুতের চরণ হইতে বিচ্যুত হয় না।

উপাস্যের প্রতি উপাসকের চরম ভক্তির ফল আত্মনিবেদনেই সোঽহংতত্ত্ব-প্রাপ্তি

বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। গুরূপদেশ স্বরূপে মহাবাক্য "তত্ত্বমসি" যাহা, আত্মজ্ঞানরূপে 'সোহহং"—"শিবোহহং" তাহাই। গুরু, উপাস্য ব্রহ্মের সহিত উপাসক শিষ্যের সম্বন্ধ বলিয়াছেন "তত্ত্বমসি"। তৎ+ত্বম্+অসি=তুমি-তাই-হও, অর্থাৎ তুমিই তিনি; শিষ্য সিদ্ধ হইয়াবা সেই সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া বুঝিলেন—'সোহহং'—তিনিই আমি। উপনিষদুক্ত মহাবাক্য সমূহের দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ ঘোষিত হইতেছে, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য সেই সূক্ষ্ম দ্বৈতত্ব (ভাব-ভেদে) তাহারই অন্তর্ভূত। জ্ঞানকাণ্ডীয় মহাবাক্যের সহিত কর্ম্ম-কাণ্ডীয় স্থূল উপাসনার বিরোধ লক্ষিত হইলেও, সমুচ্চাধিকারী সাধকের কর্ম্মাতীত সূক্ষ্ম উপাসনার বিরোধ নাই।

দূরে থাকিয়া কাহারও তত্ত্ব সম্যক্ জানা যায় না, কাছে যাওয়া চাই। কাছে বসাই উপাসনা; অতএব উপাসনা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না, এবং তাঁহাকে জানিলেই আপনাকে জানা হয়! তাঁহাকে জানিলে তিনিই হইতে হয়! আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান একই কথা। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি।" ব্রহ্মে জানে যে, ব্রহ্ম হয় সে। ব্রহ্মকে জানা অর্থই ব্রহ্মকে আত্মসাৎ করা। আদর্শ উপাস্যকে আত্মসাৎ করিয়াই উপাসক কৃতার্থ হন। ধ্যান-ধারণার ফল সমাধি—সমাধিই তন্ময়ত্ব। তন্ময়ত্বেই উপাস্য-উপাসকের সমীকরণ (Assimilation)। সমাধি বা তন্ময়ত্বেই উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ-রসাস্বাদ ঘটে। অতএব উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্মিলন-সম্ভূত সম্বন্ধই একত্ব বা অভিন্নত্ব। উহা দ্বৈত হইয়াও অদ্বৈত বা অদ্বৈত হইয়াও দ্বৈত! শাস্ত্র বলেন,——

"অদ্বৈতে ভাবনা নাস্তি দ্বৈতমেব বিনশ্যতি।
দ্বৈতাদ্বৈতাবিভেদেন ব্রহ্ম ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ॥"

বাস্তবিক ভাবনাতীত বিধায় শুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব উপাসনাতীত, আর নাশশীল বা অসৎ বিধায় শুদ্ধ দ্বৈততত্ত্ব উপাসনার অযোগ্য; অতএব যোগ্য উপাসক যোগিগণ দ্বৈতাদ্বৈত মিলাইয়া ভগবৎসাধনায় সিদ্ধ হন। যেখানে আসিলে দ্বৈত ও অদ্বৈত এক হইয়া যায়, সেইখানে আসিয়াই উত্তমাধিকারী উপাসকগণ উপাস্যের সহিত স্বীয় সম্বন্ধের অপূর্ব্ব রসাস্বাদে সমর্থ হন।

এস্থলে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। পিতা-পুত্র, গুরু-শিষ্য প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি পার্থিব সকল উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধে একটা অনুরক্তি—অর্থাৎ "ভালবাসা" আছে, কিন্তু ভগবদুপাসক ভক্তের পক্ষে যাহাকে "ভক্তি" বলা যায়, তাহা আত্ম-নিবেদন-সিদ্ধির পরেও আর থাকে কি? সোহহংতত্ত্ব-পরিণতিতে সঃ-তত্ত্বের প্রতি অহংতত্ত্বের কোনরূপ অনুরক্তির অনুভূতি থাকে কি? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে,—তাহা থাকে; এবং তাহাই প্রকৃত অনুরক্তি। ভক্তিতত্ত্বের দর্শনকার মহামুনি শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরে পরমা অনুরক্তিই ভক্তি; তবে ভক্তির চরম লক্ষণ আত্মনিবেদনে যে সেই ভক্তি প্রকৃত পরানুরক্তিই হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

আমাদের ন্যায় অধমাধিকারিরা—ভক্তির সর্ব্বপ্রথম লক্ষণ যে "শ্রবণং", তাহাতেই বঞ্চিত। ভগবৎপ্রসঙ্গ একটু কাণে শুনিতেও ইচ্ছা হয় না! আমাদের কাছে আত্ম-নিবেদনই কল্পনাতীত—ধারণাতীত তত্ত্ব, সুতরাং সেই আত্মনিবেদনে যে কিরূপ আসক্তি, উপাস্য-উপাসকের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে কিরূপ প্রেমানুরক্তি, তাহা আমাদের সুদূর-কল্পনা-স্বপ্নের আকাশ-কুসুম মাত্র!

'সোঽহং'-'শিবোঽহং'-অবস্থাপন্ন মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক; তন্নিম্নাধিকারীরাত প্রেমের শিক্ষা-নবিশ মাত্র! দ্বাপরে মহারাস-লীলার সেই আকস্মিক মহা-কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা ব্রজগোপিকাদের যে (কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ-বোধক) আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল, এবং ঐরূপ কলিতে ভক্তা-বতার শ্রীগৌরাঙ্গের যে আত্ম-কৃষ্ণভাব অভিব্যক্ত হইত, পরমাত্মায় নিবেদিতায় সেই সুগূঢ়-সোঽহংতত্ত্বের সাধক নিষ্ক্রিয় সমাহিত যোগীর হৃদয় ব্যতীত—মহাভাবোন্মত্ত নিত্য-অহৈতুকীভক্তি-সুধা-স্নাত ভক্তচূড়ামণির চিত্ত ব্যতীত সে অপূর্ব্ব ও অতুল্য সম্বন্ধের রসানুভূতি বা প্রতীতি আর কোথায় প্রত্যাশা করা যাইবে? তবে সাধারণতঃ আমরা সকলেই একটি স্থূল স্বতঃ-সংস্কার-সিদ্ধ দৃষ্টান্ত দ্বারা কিঞ্চিৎ আভাস এই পাইতে পারি যে, আমরা আপনাকে যেরূপ ভালবাসি, বা আপনি আপনাতে যাদৃশ সম্বন্ধ-বদ্ধ বা আসক্ত থাকি, উৎকৃষ্টায় উৎকৃষ্ট উপাসকের পরমেশ্বরের প্রতি তাদৃশ বা ততোঽধিক আত্মহারা-আসক্তি। অধমাধিকারী আমাদের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া; আর উত্তমাধিকারী উপাসকের আত্মপ্রেম সর্ব্বভূতকে আত্মময় বা আপন করিয়া। ফলিতার্থে উপাসকের সহিত উপাস্য ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডেরও সেই সম্বন্ধ।

আমরা পিতা-মাতার অনুরক্ত, স্ত্রী-পুত্রে অনুরক্ত—ইত্যাদি; কিন্তু এ সবের উপরেও আমরা আত্মসত্তায় পরানুরক্ত, সন্দেহ নাই। অনেককেই ভালবাসি বটে, কিন্তু আত্ম-সর্ব্বস্ব আমরা আপনাকে যেমন ভালবাসি, তাহার তুলনা আর কিছুতে হয় কি? আর হয় কেবল পতিব্রতার পতি-প্রেমে। আমাদের আপনাকে ভালবাসা যেমন, পতিব্রতার পতিকে ভালবাসা যেমন, আত্মোৎসর্গকারী উপাসকের ভগবানে তদ্বৎ বা ততোঽধিক। আমাদের আপনার সহিত বা সতীর পতির সহিত যে সম্বন্ধ, যে ভাবানু-বন্ধ, আত্মোৎসর্গকারী প্রকৃত উপাসকের উপাস্য ভগবানের সহিত সেই সম্বন্ধ—সেই ভাবানুবন্ধ। প্রকৃত উপাসক পরমাত্মস্বরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া যে সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন, তাহাতে তিনি পরমাত্মার পরমাত্মীয় হন।

ঈশ্বরের প্রতি নিম্নাধিকারীগণের উপাসনা স্বকীয় সহজ জ্ঞান ও সংস্কার-সিদ্ধ পার্থিব সম্বন্ধ-সমূহের কোন না কোন ভাবাশ্রয় করিয়াই প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্থিব সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ভিন্ন কোন উপাসনাই আদৌ দাঁড়াইতে পারেনা।

এই বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মের উপাসনাকাণ্ড-গত সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও মহাম্মদীয় উপাসনারও সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ফলে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভগবদুপাসনা মাত্রেই এই সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় কোন না কোন পার্থিব সম্বন্ধ-সাদৃশ্যে সংস্থাপিত। মাত্র অর্দ্ধশতাব্দাধিক-বয়স্ক আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম মোহন রায় ব্রহ্মকে "পরম পিতা" প্রভৃতি সম্বোধনে পিতৃভাবেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, পরে কালক্রমে ব্রাহ্ম-বীর কেশববাবু পরমসিদ্ধ শাক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শক্তি-সমীর-স্পর্শে শাক্ত-ভাবে 'মা' বলিয়া কাঁদিলেন; তৎ সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে "প্রাণ-পতি" "প্রিয়সখা" প্রভৃতি বৈষ্ণবীয় সাধনার সুমধুর সম্বোধনগুলিও ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রহ্মোদ্দেশে উত্থিত হইতে লাগিল। আর্য্যশাস্ত্রে সগুণত্বে উপাস্য সাকার ঈশ্বর ও নির্গুণত্বে মাত্র তত্ত্বজ্ঞানগম্য নিরাকার ব্রহ্ম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য-স্বরূপে কোন সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ের হেতু না থাকায় 'ব্রহ্ম' ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছেন। শুদ্ধ আর্য্যশাস্ত্রের এই বিষয়টি ভাবিলেই বিস্মিত হইতে হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্বেই ব্রহ্মের নিরাকারত্ব—সুতরাং উপাসনার অবিষয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ নিরাকার-স্বরূপেই ক্লীব ব্রহ্মে সগুণত্ব আরোপণপূর্ব্বক, তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু, সখা ইত্যাদি সম্বন্ধের ভাবাশ্রয়ীভূত করিয়া কখনও পুং কখনও স্ত্রীলিঙ্গরূপে উপাসনা করিতেছেন। উপাসনায় সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অপরিহার্য্য। ইদানীং সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়েরই সুবিধার জন্য যুগ-যুগান্তর-সিদ্ধ-সংস্কার লব্ধ 'হরি' 'শিব' 'দুর্গা' প্রভৃতি মহামন্ত্ররূপী নামগুলিও ব্রাহ্মগণ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছেন। উপাসক মাত্রেরই উপাস্যে সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয় অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে কিনা, মানবের সংসার-সংস্কার-সুলভ পার্থিব সম্বন্ধ সমূহের সহজ ভাবাশ্রয় উপাসনার আদি-প্রবর্ত্তক হইলেও, প্রকৃত উপাসনা বা সম্বন্ধ-সিদ্ধি যখন ঘটে, তখন সে সকলগুলির স্থানেই এক অভেদ-সম্বন্ধ সোঽহংতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দৈহিক সত্তা-স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়াই অনেক মুনি, ঋষি, জীবন্মুক্ত পুরুষ সোঽহংতত্ত্ব লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন। আবার ভৌতিক দেহ-সত্তা সহ উপাস্যে আত্ম-বিসর্জ্জন বা অভেদ-সম্মিলনও সেই সোঽহংতত্ত্বোদ্ভূত ফল। প্রভাস-মিলনে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গে শ্রীরাধার তিরোধান, সতীর শিবৈকাঙ্গ-মিলনার্থ দক্ষালয়ে দেহ-ত্যাগ, এ সমস্ত পৌরাণিক বিবরণও দার্শনিক সোঽহংতত্ত্বেরই লীলা-বিলাস। উপাস্যে আত্মসমর্পণ সিদ্ধ হইলে, উপাসকের স্বতন্ত্র স্বরূপত্ব আর থাকে না। পরম প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুর জগন্নাথদেবের (মতান্তরে গোপীনাথ জীউর) অঙ্গে লীন হওয়ার বৃত্তান্তেও ঐ তত্ত্ব দেদীপ্যমান। সামান্য পার্থিক লোক-লীলায়ও দেখা যায়, আত্ম-সমর্পণ-সিদ্ধা সাধ্বী উপাস্য পতির মরণে সহমৃতা বা অনুমৃতা না হইয়া পারেন না। অধুনা সামাজিক 'সতীদাহ' রাজবিধি-বারিত হইলেও যথার্থ সতীর পত্যনুমৃতি বিশ্বরাজ বিধিতে চির অবারিত। তিনি আর থাকিবেন

কি লইয়া? তাঁহার 'অহং' যে সমস্তই "সঃ" সহ চলিয়া গিয়াছে! সতীর উপাসনার সম্বন্ধ-ভাবাশ্রয়ে উপাস্যের সাধারণ ব্যবহারিক সংজ্ঞা 'পতি'—কিন্তু উহা অতি স্থূল পরিচয়। স্ত্রীর পরিণয়-সম্বন্ধ-বদ্ধ পুরুষেই পতিত্ব। উহা সতী ও তদিতরা, উভয়ের পক্ষেই সাংসারিক পরিচয়-স্থলে সাধারণ; পতি-উপাসিকা সতীর উপাস্যসহ প্রকৃত যে সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া ভাষার অসাধ্য; এক মাত্র শাস্ত্রীয় "সোঽহং" বাক্যেই তাহার আভাস ভাসমান।

রামচন্দ্রে প্রভুত্ব—সুতরাং নিজের দাস্য-সম্বন্ধ-সাধক মহাবীর হনুমান এমনই আত্ম-সমর্পণ করিয়া সোঽহং-সম্বন্ধাশ্রিত হইয়াছিলেন যে, হনুমানের আর নিজের কিছুই ছিল না। বাহিরে তিনি অনিত্য ভৌতিক বানরদেহধারী হনুমান ছিলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে 'রাম' হইয়াছিলেন! তাইত রাম-সর্ব্বস্ব হনুমান হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া রাম-রূপ দেখাইয়াছিলেন! ইহাকেই বলে আত্ম-সমর্পণ,—ইহাতেই সোঽহংতত্ত্ব-সাধন। রামায়ণের এই আখ্যায়িকায় কি শিক্ষা দেয়? দেব-দুর্লভ সোঽহংতত্ত্বে ভক্তের—অর্থাৎ প্রকৃত উপাসকেরই অধিকার; উহা শুষ্ক বৈদান্তিক জ্ঞানকাণ্ডের শিক্ষা-সম্ভূত মতবাদ-বিশেষ নহে। যাঁহারা তাহা বলেন, তাঁহারা বেদান্তের মহীয়ান্ মহিমা বা বিশুদ্ধ বিশেষত্ব বুঝিতেই অক্ষম। বেদ তন্ত্র-পুরাণাদির ন্যায় বেদান্ত উপাসনা-শিক্ষার শাস্ত্র নহে; উহা উপাসনারই সিদ্ধি-কাণ্ডের ব্রহ্ম তত্ত্ব বার্ত্তায় বিভূষিত। এই জন্যই অনধিকারীর বেদান্ত-বিদ্যার বা সোঽহংতত্ত্বের চর্চ্চায় প্রকারান্তরে নাস্তিকতা বা ভক্তি-বাধকতাই জন্মে; অধিকারীর পক্ষে তদ্বিপরীত। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বেদান্ত-ব্যাখ্যা শ্রবণে কোন দিন ৺কাশীধামের দণ্ডী-স্বামী-সম্প্রদায়ে ভগবৎ-প্রেমানন্দের প্রমত্ত প্রবাহ বহিয়াছিল! বেদ-তন্ত্র-পুরাণের উপাসনা-শিক্ষায় উপাস্যের সহিত উপাসকের সম্বন্ধ-বন্ধন সংঘটন, আর বেদান্ত-বোধিত সোঽহংতত্ত্বে তাহার পূর্ণ পরিণতি সম্পাদন। কর্ম্ম-ভূমি ভারতক্ষেত্রে উপাস্য-উপাসকের এই চরম ও পরম সম্বন্ধ-সিদ্ধির দৃষ্টান্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে বহুল ছিল, এখনও এই পাদ-ধর্ম্ম বিশিষ্ট কলিযুগে যে একেবারে না আছে, তাহা নয়; তবে কিনা খুঁজিয়া ও বুঝিয়া লওয়াই সুকঠিন—ফলে সুকৃতি-সাপেক্ষ।

সম্বন্ধ (সম্যগ্ বন্ধন) অর্থই যোগ। যাহার সঙ্গে যাহার যেরূপ যোগ, তাহার সঙ্গে তাহার সেইরূপ সম্বন্ধ। পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র প্রভৃতি বড় প্রধান সম্বন্ধ; কারণ উভয়পক্ষে বড় প্রধান যোগ। প্রকৃত-উপাসকের সঙ্গে উপাস্যের কিরূপ যোগ?—না যতদূর যোগ হইতে পারে। এমন যোগ, যে—একেবারে যেন দুয়ে এক! যোড়া যত ভাল লাগে, যোড়-চিহ্ন তত অদৃশ্য হয়,—দুয়ে মিলিয়া এক হয়। এই মিলনই প্রকৃত সম্বন্ধ। অতএব ভগবানের সহিত ভক্তের চরম ও পরম মিলনই সোঽহংতত্ত্ব; সুতরাং ইহাই উপাস্য-উপাসকের প্রকৃত সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ যত দিন সিদ্ধ না হয়, ততদিন উপাসক-পূর্ণ উপাসক নহেন। ততদিন তাঁহার উপাসনা কেবল প্রকৃত উপাসক-পদ পাইবার জন্য উপাসনা মাত্র। এই সম্বন্ধ স্থাপন হইলে তবে প্রকৃত উপাসনার কার্য্য হয়।

যে অনধিকার-দুষ্ট বেদান্তমতের ইঙ্গিত পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহারই সিদ্ধান্ত এইরূপ যে, সোঽহংতত্ত্বের উদয়ে উপাসনা বিলুপ্ত হয়। উপাস্য উপাসক এক হইয়া গেলে আর কে কাহার উপাসনা করে? ইত্যাদি। ফলিতার্থে বাহ্য উপাসনা তখন থাকে না বটে, এমন কি—মানস-উপাসনাও তখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম-উপাসনার অবস্থাই সেই! উহাতে পুষ্প-চন্দন, গঙ্গাজল,—দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বদল,—উহাতে টিকী-ফোঁটা-আসন-বস্ত্র, স্তব, জপ, তন্ত্র, মন্ত্র, কিছুই থাকে না; জগৎকাণ্ড বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আর কিছুই থাকে না; থাকেন কেবল যুগল-মিলিত উপাস্য ও উপাসক,—সঃ আর অহং! "ভাব-চূড়ামণি" তন্ত্রে মহাদেব পরিষ্কার বলিয়াছেন,—

"অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।
উত্তমা মানসী পূজা, সোঽহংপূজোত্তমোত্তমা॥"

অধমাধিকারীর পক্ষেই প্রতিমা পূজা। (কলিতে অধমাধিকারীই অধিক, সুতরাং আমাদের প্রায় সকলেরই প্রতিমা-পূজা বিহিত।) মাত্র জপ-স্তোত্রাদি দ্বারা পূজার অধিকার মধ্যম; আর উত্তমাধিকারীর পক্ষেই মানস-পূজা,—উহাই উত্তম পূজা; কিন্তু উহার উপরেও পূজা আছে; তাহাই উত্তমেরও উত্তম—অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম 'সোঽহংপূজা' আমাদের প্রতি প্রতিমা-পূজাতেই অগ্রে শেষ ফল মানস-পূজার অনুশীলন ও স্বশিরে ধ্যানার্ঘ্য-গ্রহণে সর্ব্বশেষ ফল সোঽহংপূজারই অনুস্মরণ ব্যবস্থিত। ফলে সোঽহংপূজার অধিকারীই সর্ব্বোত্তম সাধক—প্রকৃত উপাসক। সোঽহংপূজাতেই প্রকৃত উপাসকের সহিত উপাস্যের প্রকৃত মিলন, প্রকৃত যোগ, প্রকৃত সম্বন্ধ, অতএব সোঽহংতত্ত্বে ঈশ্বর-পূজা নাই, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর ও জীবে নিত্য পূজ্য-পূজক বা সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। ঈশ্বর ও জীবের মহামিলন সোঽহংতত্ত্বেও তাহার অন্যথা নাই। সৃষ্টি অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য; ঈশ্বর ও জীবের—উপাস্য ও উপাসকের এই সম্বন্ধও অনাদি—অনন্ত—প্রবাহরূপে নিত্য।

উপাস্য-উপাসকের পৃথগত্বেও একত্ব-সম্বন্ধ বা একত্বেও পৃথগত্ব-বোধ সর্ব্ব-শাস্ত্র-সম্মিলিত সার সিদ্ধান্ত। বেদান্তে ও পুরাণে এখানে গলাগলি! জ্ঞানে ও ভক্তিতে এখানে কোলাকুলি। জ্ঞানের শাস্ত্র বলেন "সোঽহং"—ভক্তির শাস্ত্র বলেন—"ময়ি তে তেষু চাপ্যহং"। তাই বৈষ্ণব কবির মধুময়ী লেখনী ভগবদুক্তিতে গাইয়াছেন—

ভক্ত মোর কণ্ঠহার—ভক্ত মোর প্রাণ।
আমি তাতে সে আমাতে আমারি সমান॥

অতএব দেখুন, উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধ-রহস্য বুঝিতে যদি স্পষ্ট প্রশ্ন করা যায়, উপাস্য উপাসকের কে? সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত উত্তর—আত্মা। ঘুরাইয়া প্রশ্ন করুন,—উপাসক উপাস্যের কে? তাহারও ঐ উত্তর—আত্মা। এই অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তরের প্রকৃত রসাস্বাদ তত্ত্ব-রস-রসিকেরই উপভোগ্য।

হায়! উপাসনার অনধিকারী বা অন্ততঃ অধমাধিকারী বিষম-বিষয়-বদ্ধ জীব আমরা—ভগবানের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধের ভাবই অনুভব করিতে পারি না। মুখে হয়ত তাঁহাকে পিতা, মাতা, পতি, প্রভু প্রভৃতি একটা সুমধুর সম্বন্ধের ডাকে ডাকিতে পারি, কিন্তু অন্তরে তিনি আমাদের "মাসার শালা" বা "পিসার ভাই" ভিন্ন আর কিছুই নহেন! হাসির কথা নহে, ইহা অতি মর্ম্মভেদী শোক-বার্ত্তা। অহো! যিনি হৃদয়ের ধন—সর্ব্বস্বধন—জীবনের জীবন, সেই পরাৎপরকে এত পর ভাবিতেছি! কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় তাঁহারই কৃপা ভিন্ন উপায় নাই। দুর্লভ মানব-জন্মের একমাত্র সার্থকতা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপন ও সংস্থাপিত সম্বন্ধের অতুল অধ্যাত্ম-রসাস্বাদন; কিন্তু সে শুভযোগ ত বহুদূরের কথা, আপাততঃ সে দিকের চিন্তা-চর্চ্চায়ও একটু প্রবৃত্তি হইলে কৃতার্থ হইতাম। তারপর—সে প্রবৃত্তিও দূরের কথা, (এমন কি) সে প্রবৃত্তি জন্মিবার উপায় স্বরূপ যে সাধুসঙ্গ—শাস্ত্র-সেবা প্রভৃতি, তাহার অবলম্বনেরই বা প্রবৃত্তি কোথায়? হরি! রক্ষা কর। যদি কৃপা করিয়া তোমার সম্বন্ধানন্দ-লাভের অধিকার সমন্বিত মানব-জন্ম দিয়াছ, তবে সে সম্বন্ধের রহস্য বুঝাও, সে সম্বন্ধের মাধুর্য্যে মজাও। আর তোমার ভক্ত-কবির তানে তান মিলাইয়া—প্রাণ গলাইয়া—বলাও হরি!———

তোমাতে মিশিব আমি বিরহের ভয়ে।
আমাতে মিশিও তুমি মিলন সময়ে॥
এমনি তোমারি হব হে অন্তর-যামি।
আমি যেন তুমি হরি তুমি যেন আমি॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পাতঞ্জল দর্শন,—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য-সঙ্কলিত। বৃহৎ গ্রন্থ; কাগজ ও মুদ্রণ-পরিপাটি; মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। "খুলনা—সেনহাটী" ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ভারতের জগদ্বিখ্যাত ষড়্দর্শনের মধ্যে পাতঞ্জল-দর্শনই সাধকের আনুষ্ঠানিকতা পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইতঃপূর্ব্বে ইহার যে কতিপয় বাঙ্গালা-সঙ্কলন আমরা দেখিয়াছি, তাহা প্রায়ই সংক্ষিপ্ত, অসম্পন্ন ও অবিশদ; এখানিতে সে সমস্ত অভাব অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বঙ্গ-ব্যাখ্যা গুলি আর একটু প্রাঞ্জল হইলেই সর্ব্ব-সুন্দর হইবে, ভরসা করি। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র ইহার সঙ্কলনে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছেন। মূল সূত্র, সান্বয় ব্যাখ্যা, বাঙ্গালায় তাৎপর্য্যার্থ, সংস্কৃত ব্যাস-ভাষ্য, বাঙ্গালায় তদনুবাদ ও বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারে বাঙ্গালায় বিস্তৃত মন্তব্য বা ব্যাখ্যা যথাক্রমে বিন্যস্ত হওয়ায়, গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশেই গৌরবান্বিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীম-লিখিত Diary হইতে উদ্ধৃত।)

শরৎকাল। ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, মঙ্গলবার, বেলা সাড়ে পাঁচটা। কএক দিন হইল ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে। এ মহোৎসব শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী হরিষ-বিষাদে অতিবাহিত করিয়াছেন; কেননা তিন মাস ধরিয়া গুরুদেবের কঠিন পীড়া হইয়াছে। কণ্ঠদেশে Cancer. ডাক্তার সরকার ইঙ্গিত করিয়াছেন, পীড়া চিকিৎসার অসাধ্য। হতভাগ্য শিষ্যেরা একথা শুনিয়া একান্তে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। এক্ষণে শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শিষ্যেরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপণে সেবা করিতেছেন। বিবেকানন্দাদি কৌমার-বৈরাগ্যযুক্ত শিষ্যগণ এই মহতী সেবা উপলক্ষ্যে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগ পথপ্রদর্শী সোপান আরোহণ করিতে সবে শিখিতেছেন। এত পীড়া, কিন্তু দলে দলে লোক দর্শন করিতে আসিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসিলেই শান্তি ও আনন্দ হয়। অহৈতুক কৃপাসিন্ধু; দয়ার ইয়ত্তা নাই—সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেছেন—কিসে তাহাদের মঙ্গল হয়। শেষে ডাক্তারেরা—বিশেষতঃ ডাক্তার সরকার কথা কহিতে একেবারেই নিষেধ করিলেন। কিন্তু ডাক্তার নিজে ৬ ঘণ্টা ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন; বলেন, আর কাহারও সহিত কথা কহা হবে না, কেবল আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত পান করিয়া ডাক্তার একেবারে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাই এতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

এদিনে বিবেকানন্দ, ডাক্তার সরকার, শ্যাম বসু, কবিবর গিরীশ চন্দ্র ঘোষ ডাক্তার দোকড়ি, ছোট নরেন্দ্র ইত্যাদি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাক্তার সরকার আসিয়া হাত দেখিলেন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ডাক্তার (বেয়ারামের কথার পর ও ঔষধ খাবার পর) বলিলেন, "তবে তুমি শ্যাম বাবুর সঙ্গে কথা কও, আমি আসি"। শ্রীরামকৃষ্ণ (ও একজন শিষ্য) একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "গান শুন্‌বেন"?

ডাক্তার বলিলেন "তুমি যে তিড়িং মিড়িং করে উঠ! ভাব চেপে রাখ্‌তে হবে"। ডাক্তার আবার বসিলেন। তখন বিবেকানন্দ মধুর কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। তৎসঙ্গে তানপুরা ও মৃদঙ্গ ঘন ঘন বাজিতে লাগিল। তিনি গাইতে লাগিলেন—

(গান।)

চমৎকার অপার জগৎ তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।
অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধর ধন-ধান্যময়, পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার।

আবার গাইলেন—

(গান।)

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার-কোলে, মহানির্ব্বাণ-হিল্লোলে, চিরশান্তি-পরিমল
অবিরত যায় ভাসি॥
মহাকালরূপ ধরি, আঁধার-বসন পরি, সমাধি-মন্দিরে ওমা,
কে তুমি গো একা বসি;
অভয়পদ-কমলে, প্রেমের বিজলি জ্বলে, চিন্ময় মুখমণ্ডলে
শোভে অট্ট অট্ট হাঁসি॥

ডাক্তার মাষ্টারকে বলিলেন—"It is dangerous to him" (এ গান পরমহংসদেবের পক্ষে ভাল নয়, ভাব হইলে অনর্থ ঘটিতে পারে।)

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল্‌ছে"?

মাষ্টার উত্তর করিলেন, "ডাক্তার ভয় কর্‌ছেন—পাছে আপনার ভাব-সমাধি হয়"।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট,—ডাক্তারের মুখ পানে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন "না না কেন ভাব হবে"?

কিন্তু এ কথা বলিতে বলিতে তিনি গভীর ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। শরীর স্পন্দহীন। নয়ন স্থির। অবাক্ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্ট। বাহ্যজ্ঞান শূন্য। মন-বুদ্ধি অহংকারে, চিত্ত সমস্তই অন্তর্মুখ। আর সে মানুষ নাই!

বিবেকানন্দের মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান চলিতে লাগিল। তিনি আবার গাইলেন—

(গান।)

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লওহে নাথ।

আবার গাইলেন—

কি সুখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে!
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে॥

"সতীর পবিত্র প্রেম" গানের এই অংশ শুনিতে শুনিতে ডাক্তার অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিয়া উঠিলেন, "আহা আহা"।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আবার গাইলেন—

(গান।)

কতদিনে হবে প্রেমের সঞ্চার।
হয়ে পূর্ণকাম, বলব হরি নাম, নয়নে বহিবে প্রেম-অশ্রুধার।
কবে হবে আমার শুদ্ধ প্রাণ-মন, কবে যাব আমি প্রেমের বৃন্দাবন,
(হরি প্রেম-রসে মজে)
সংসার-বন্ধন হইবে মোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন-আঁধার।
কবে পরশমণি করি পরশন, লৌহময় দেহ হইবে কাঞ্চন,
হরিময় বিশ্ব করিব দর্শন, লুটাইব ভক্তিপথে অনিবার।
হায়! কবে যাবে আমার ধরম করম, (হরি-প্রেমে মত্ত হয়ে),
কবে যাবে জাতি-কুলের ভরম,
কবে যাবে ভয় ভাবনা-সরম, পরিহরি অভিমান-লোকাচার।
মাখি সর্ব্ব অঙ্গে ভক্ত-পদধূলি, কাঁধে লয়ে চিরবৈরাগ্যের ঝুলি,
পিব প্রেমবারি দুই হাতে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম-যমুনার।
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব, সচ্চিদানন্দসাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব, হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

ইতি মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন। গান সমাপ্ত হইল। তখন পণ্ডিত ও মূর্খের, বালক ও বৃদ্ধের, পুরুষ ও স্ত্রীর—আপামর-সাধারণের সেই মনো-মুগ্ধকরী কথা হইতে লাগিল। সভা শুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের

মুখপানে চাহিয়া রহিল। এখন সেই কঠিন পীড়া কোথায়? তাঁর মুখ এখন যেন প্রফুল্ল অরবিন্দ, যেন ঐশ্বরিক জ্যোতি বহির্গত হইতেছে! তখন তিনি ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ। লজ্জা ত্যাগ কর—ঈশ্বরের নাম কর্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? তাঁর নাম করে নাচ্‌বে, তাতে আবার লজ্জা কি? "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাক্‌তে নয়।" আমি এত বড়লোক, বড় বড় লোক শুন্‌লে আমায় কি বল্‌বে! যদি বলে ওহে ডাক্তারটা হরি হরি বলে নেচেছে! কি লজ্জার কথা! এ সব ভাব ত্যাগ কর।

ডাক্তার। আমার ওদিক দিয়েই যাওয়া নেই। লোকে কি বল্‌বে, আমি তার তোয়াক্কা রাখি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার উটি খুব আছে! (সকলের হাস্য)

(বিজ্ঞান কিরূপে হয়; ব্রহ্মদর্শন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখ জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হলে, তবে তাঁকে জান্‌তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, এই নিশ্চয় বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাঁকে বিশেষ রূপে জানার নাম বিজ্ঞান। যেমন পায়ে কাঁটা বিঁধেছে, সে কাঁটাটি তোলবার জন্যে আর একটি কাঁটার প্রয়োজন। কাঁটাটি তোলবার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়। প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটাটি দূর করবার জন্য জ্ঞান-কাঁটাটি আন্‌তে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞান দুটিই ফেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান-অজ্ঞানের পার!

পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ। লক্ষ্মণ বলেছিলেন, 'রাম! একি আশ্চর্য্য! অত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অধীর হয়ে কেঁদেছিলেন? রাম বল্লেন, 'ভাই! [illegible] তার অজ্ঞানও আছে। যার 'এক' জ্ঞান আছে, তার 'অনেক' জ্ঞান আছে। [illegible] আ[illegible] বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধ আছে। ঈশ্বর জ্ঞান-অজ্ঞানের [illegible], পা[illegible] পুণ্যের পার।

এই বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ রামপ্রসাদের গান আবৃত্তি করিয়া বলিতে লাগিলেন।—

(গান।)

আয় মন বেড়াতে যাবি। কালী-কল্পতরু-মূলেরে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে নিবি। ওরে বিবেক নামে তার বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি॥
অহংকার-অবিদ্যা তোর, পিতা-মাতায় তাড়িয়ে দিবি। যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধোরে রবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান সিন্ধুমাঝে ডুবাইবি॥

শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। তাদের দুই সতীনের পীরিত হলে তবে শ্যামামারে পাবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি। তাদের জ্ঞান-খড়্গে বলি দিয়ে উভয়ে কৈবল্য দিবি॥
প্রসাদ বলে এমন হলে, কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মতন মনটি হবি॥

(অবাঙ্মনসোগোচরম্।)

শ্যাম বসু। দুই কাঁটা ফেলে দেওয়ার পর কি থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নিত্য-শুদ্ধ-বোধরূপং। তা তোমায় কেমন করে বোঝাব?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ঘী কেমন খেলে?' তাকে এখন কি করে বোঝাবে? হদ্দ বোল্‌তে পার, 'কেমন ঘী—না যেমন ঘী।'

একটী মেয়েকে তার সঙ্গিনী একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, তোর স্বামী এসেছে, আচ্ছা স্বামী এলে কিরূপ আনন্দ হয়? মেয়েটী বল্লে, তোর স্বামী হলে তুই জান্‌বি, এখন তোরে কেমন করে বোঝাব? পুরাণে আছে, ভগবতী যখন হিমালয়ের ঘরে জন্মালেন, তখন তাঁকে মা নানা রূপে দর্শন দিলেন। গিরিরাজ সব রূপ দর্শন করে শেষে ভগবতীকে বল্লেন—মা! বেদে যে ব্রহ্মের কথা আছে, এইবার আমার যেন সেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। তখন ভগবতী বল্লেন "বাবা! ব্রহ্ম-দর্শন যদি কর্‌তে চাও, তবে সাধুসঙ্গ কর"। ব্রহ্ম কি জিনিস, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল, সব উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু, কেউ এ পর্য্যন্ত মুখে বল্‌তে পারে নাই। তাই ব্রহ্ম এ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট হন নাই।

আর সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া বা রমণ যে কি আনন্দের, তা মুখে বলা যায় না। যার হয়েছে, সেই জানে।

(পণ্ডিত ও অহঙ্কার।)

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ডাক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হব কবে? আমি যাবে যবে"। 'আমি' ও 'আমার' এই দুইটী অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার' এই দুইটী জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে, 'হে ঈশ্বর; তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব করেছো; আমি কেবল যন্ত্র। আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এ সব তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ, তোমার গৃহ, পরিজন, আমার কিছু নয়। তোমার যেমন হুকুম, সেই রূপ সেবা করিবার কেবল আমার অধিকার।' যারা ...টু বৈ টৈ পড়েছে, অমনি তাদের অহঙ্কার এসে যোটে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের সঙ্গে ...রের কথা হয়েছিল। তিনি বলেন 'ও সব আমি জানি'। আমি বল্লুম, 'যে দিল্লি

গিছলো, সে কি বলে বেড়ায়, আমি দিল্লি গেছি— আর জাঁক করে ? যে বাবু, সে কি নিজে বলে আমি বাবু ?

শ্যামবসু। তিনি (কালীকৃষ্ণঠাকুর) আপনাকে খুব মানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও গো বল্‌বো কি! দক্ষিণেশ্বর-কালীবাড়ীতে একটা মেথ্‌রাণীর যে অহঙ্কার! তার গায়ে দু একখানা গহনা ছিল। সে যে পথ দিয়ে আস্‌ছিল, সেই পথে দু একজন লোক তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেথরাণী তাদের বলে উঠলো, 'এই! তোরা সরে যা'—অন্য লোকের কথা আর কি বল্‌বো ?

(পাপ-পুণ্য।)

শ্যামবসু। মহাশয়, পাপের শাস্তি আছে; অথচ তিনিই সব কর্‌ছেন, এ কি রকম ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি তোমার সোণারবেণে-বুদ্ধি!

বিবেকানন্দ। অর্থাৎ Calculating বুদ্ধি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ওরে পোদো! তুই আম খেয়ে নে। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটী পাতা আছে, এসব হিসাবে তোর কাজ কি? তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা।

(শ্যামবাবুর প্রতি) তুমি এ সংসারে ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা কর। তোমার এতশতয় কাজ কি? ফেলাজফী (Philosophy) নিয়ে বিচার করে তোমার কি হবে? দেখ, আধপো মদে তুমি মাতাল হতে পার; শুঁড়ীর দোকানে কত মোন মদ আছে, এ হিসাবে তোমার কি দরকার ?

ডাক্তার। আর ঈশ্বরের মদ Infinite—সে মদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) আর ঈশ্বরকে আম্মোক্তারি দাওনা। তাঁর উপর সব ভার দাও। সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, তিনি কি অন্যায় করেন? পাপের শাস্তি তিনি দিবেন, কি না দিবেন, সে তিনি বুঝ্‌বেন।

ডাক্তার। তাঁর মনে কি আছে, তিনিই জানেন। মানুষ হিসাব করে কি বল্‌বে? তিনি হিসাবের পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যামবসুর প্রতি) তোমাদের ঐ এক! কল্‌কাতার লোকগুলো বলে 'ঈশ্বরের বৈষম্য-দোষ'। কেন-না তিনি একজনকে সুখে রেখেছেন, আর একজনকে দুঃখে রেখেছেন। শালাদের নিজের ভিতর যেমন, ঈশ্বরের ভিতরও তেমনি দেখে।

(লোক-মান্যতা কি জীবনের উদ্দেশ্য ?)

হেমবর দক্ষিণেশ্বরে যেত, দেখা হলেই আমায় বল্‌তো 'কেমন ভট্টাচার্য্য মশাই, জগতে এক বস্তু আছে—মান!' ঈশ্বরলাভ যে মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য, তা কম লোকেই বলে।

(সূক্ষ্ম শরীর।)

শ্যামবসু। সূক্ষ্মশরীর কেউ কি দেখিয়ে দিতে পারে? কেউ কি দেখাতে পারে যে, সেই শরীর বাহিরে চলে যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। যারা ঠিক ভক্ত, তাদের দায় পড়েছে তোমায় দেখাতে। কোন্ শালা মান্‌লে আর না মান্‌লে, তাদের তায় কি? একটা বড় লোক হাতে থাক্‌বে, এ সব ইচ্ছা তাদের থাকেনা।

শ্যামবসু। আচ্ছা স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহে প্রভেদ কি?

(স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পঞ্চভূত নিয়ে যে দেহ, সেইটী স্থূল দেহ। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত, এই নিয়ে সূক্ষ্ম শরীর। যে শরীরে ভগবানের আনন্দলাভ হয় আর সম্ভোগ হয়, সেইটী "কারণ-শরীর"। তন্ত্রে বলে 'ভাগবতী তনু'। সকলের অতীত মহাকারণ (তুরীয়)—বলাযায় না।

(সাধনের প্রয়োজন।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেবল শুন্‌লে কি হবে? কিছু করো। সিদ্ধি-সিদ্ধি মুখে বল্লে কি হবে? তাতে কি নেশা হয়? সিদ্ধি বেটে গায়ে মাখলেও নেশা হয়। কিছু খেতে হয়। কোন্‌টা একচল্লিশ নম্বরের সুতো, কোন্‌টা চল্লিশ নম্বরের সুতো, সুতোর ব্যবসা না করলে কি বলা যায়? যাদের সুতোর ব্যবসা আছে, তাদের পক্ষে অমুক নম্বরের সুতো বেছে দেওয়া কিছু শক্ত নয়। তাই বলি, কিছু সাধন কর; তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ কাকে বলে, সব বুঝ্‌তে পার্‌বে।

(ভক্তি একমাত্র সার।)

যখন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁর পাদপদ্মে একমাত্র ভক্তি প্রার্থনা কর্‌বে। অহল্যার শাপমোচনের পর রামচন্দ্র তাকে বল্লেন 'তুমি আমার কাছে বর লও'। অহল্যা বল্লেন "রাম! যদি বর দিবে, তবে এই বর দাও—আমার যদি শূকর-য়োনিতে জন্ম হয়, তাতেও ক্ষতি নাই; কিন্তু হে রাম! যেন তোমার পাদপদ্মে আমার মন থাকে"।

আমি মার কাছে একমাত্র ভক্তি চেয়েছিলাম। মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে হাত যোড় করে বলেছিলাম 'মা! এই নাও তোমার অজ্ঞান, এই নাও তোমার জ্ঞান, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় ভক্তি দাও। এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম্ম, এই নাও তোমার অধর্ম্ম, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

ধর্ম্ম কিনা দানাদি কর্ম্ম। ধর্ম্ম নিলেই অধর্ম্ম নিতে হবে, জ্ঞান নিলেই অজ্ঞান

নিতে হবে, শুচি নিলেই অশুচি নিতে হবে। যেমন যার আলো-বোধ আছে, তার অন্ধকার-বোধও আছে। যার এক-বোধ আছে, তার অনেক-বোধ আছে। যার ভাল-বোধ আছে, তার মন্দ-বোধ আছে।

যদি কাহারও শূকর-মাংস খেয়ে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, সে পুরুষ ধন্য; আর হবিষ্য খেয়ে তার যদি সংসারে আসক্তি থাকে, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে—

ডাক্তার। তবে সে অধম। এখানে একটী কথা বলি, বুদ্ধ শূকর-মাংস খেয়েছিলেন। শূকর-মাংসও খাওয়া, আর Colicও (পেটে শূল বেদনা) হওয়া! এই ব্যারামের জন্য বুদ্ধ Opium (আফিং) খেতো। নির্ব্বাণ টির্ব্বাণ কি জান, আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতো, বাহ্য জ্ঞান থাকতো না, তাই নির্ব্বাণ! বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ সম্বন্ধে এই নূতন প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিলেন। আবার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (শ্যাম বসুর প্রতি) সংসার কর, তাতে দোষ নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে কামনাশূন্য হয়ে কাজ-কর্ম্ম কর্‌বে। এই দেখোনা, যদি কারু পিঠে একটা ফোড়া হয়, সে যেমন সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, হয়ত কাজ কর্ম্মও করে, কিন্তু তাহার মন যেমন ফোড়ার দিকে পড়ে থাকে, সেইরূপ।

সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাক্‌বে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।

(ডাক্তারের প্রতি) বুঝেছ?

ডাক্তার। ও ভাব না থাক্‌লে বুঝ্‌বো কেমন করে?

শ্যাম বসু। কিছু বুঝো বই কি! [সকলের হাস্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে ২) আর ঐ ব্যবসা অনেক দিন ধরে কচ্চেন, কি বল?

(সকলের হাস্য)

শ্যামবসু। মহাশয়! Theosophy (থিয়সফি) কি রকম বলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। মোট কথা এই—যারা শিষ্য করে বেড়ায়, তারা হাল্‌কা থাকের লোক। আর যারা 'সিদ্ধাই'—নানা রকম শক্তি চালায়, তারাও হালকা থাক। যেমন গঙ্গা হেঁটে পার হয়ে যাওয়া, এই এক শক্তি; আর এক দেশে একজন কি কথা বল্‌ছে, তাই বল্‌তে পারা এই এক শক্তি। এ সব শক্তি-সিদ্ধ লোকের ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হওয়া ভারি কঠিন।

শ্যামবসু। কিন্তু তারা (Theosophists) হিন্দুধর্ম্ম পুনঃস্থাপিত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাদের বিষয় ভাল জানি না।

শ্যামবসু। মরবার পর জীবাত্মা কোথায় যায়—চন্দ্রলোকে কি নক্ষত্রলোকে ইত্যাদি—এ সব থিয়সফিতে জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা হ'বে। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা

করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বল্লেন, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র, এ সব কিছু জানি না; কেবল এক রামচিন্তা করি। আমারও ঠিক ঐ ভাব।

শ্যাম বসু। তারা বলে 'মহাত্মারা' আছেন। আপনার কি বিশ্বাস?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কথা বিশ্বাস করেন তো আছে। এ সব কথা এখন থাক্। আমার অসুখটা কম্‌লে আপনি আস্‌বেন। যাতে আপনার শান্তি হয়, যদি আমায় বিশ্বাস কর—উপায় হয়ে যাবে। দেখ্‌ছোতো আমি টাকা লই না, কাপড় লই না; এখানে প্যালা দিতে হয় না; তাই অনেকে আসে। [সকলের হাস্য।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি।) তোমাকে এই বলা—রাগ করো না—ও সবতো অনেক কর্‌লে,—টাকা, মান, লেক্‌চার; এখন মনটা দিন কতক ঈশ্বরেতে দাও। আর এখানে মাঝে মাঝে আস্‌বে। ঈশ্বরের কথা শুন্‌লে উদ্দীপন হ'বে।

কিয়ৎকাল পরে ডাক্তার বিদায় লইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এমন সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ আসিলেন ও ঠাকুরের চরণ-ধূলি লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও আবার আসন গ্রহণ করিলেন।

ডাক্তার। আমি থাক্‌তে উনি (গিরীশ বাবু) আস্‌বেন না। যাই চলে যাব যাব হয়েছি, অমনি এসে উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমায় এক দিন সেখানে (Science-association) নিয়ে যাবে।

ডাক্তার। তুমি সেখানে গেলে অজ্ঞান হয়ে যাবে—ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কাণ্ড সব দেখে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বটে!

(গুরুপূজা।)

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) আর সব কর, কিন্তু do not worship him—as God—এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ।

গিরীশ। কি করি মশাই! যিনি এই সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-সাগর থেকে পার করলেন, তাঁকে আর কি কর্ব্ব বলুন? তাঁর গু কি গু বোধ হয়?

ডাক্তার। গু জন্যে হচ্চে না; একটা দোকানীর ছেলে এসেছিল, তা বাহ্যে করে ফেল্‌লে। সকলে নাকে কাপড় দিল। আমি তার কাছে আধ ঘণ্টা বসে। নাকে কাপড় দিই নাই। আবার মেথর যতক্ষণ মাথায় করে নিয়ে যায়, ততক্ষণ আমার নাকে কাপড় দেবার যো নাই। আমি জানি, সেও যা, আমিও তা; কেন তাকে ঘৃণা কর্‌ব? আমি কি এঁর পায়ের ধূলা নিতে পারি না?" এই দেখ নিচ্চি। (শ্রীরামকৃষ্ণের পদ-ধূলি গ্রহণ।)

গিরীশ। Angels (দেবগণ) এই মুহূর্ত্তকে ধন্য ধন্য বল্‌ছেন।

ডাক্তার। তা পায়ের ধূলা লওয়া কি আশ্চর্য্য? আমি যে সকলেরই নিতে পারি—এই দাও—এই দাও— (সকলের পায়ের ধূলাগ্রহণ।)

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারের প্রতি) এঁকে আমরা ঈশ্বরের ন্যায় মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন Vegetable-creation (উদ্ভিদ) ও Animal-creation (জীবজন্তুগণ), এদের মাঝামাঝি এমন এক Point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণবিশিষ্ট জীব, স্থির করা ভারি কঠিন; সেই রূপ Man-world নরলোক ও God-world (দেবলোক), এই দুয়ের মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যেখানে বলা কঠিন, এ ব্যক্তি মানুষ না দেবতা।

ডাক্তার। ওহে ঈশ্বরের কথায় উপমা চলে না।

বিবেকানন্দ। আমি God (ঈশ্বর) বলছি না, God like man (ঈশ্বর তুল্য ব্যক্তি।)

ডাক্তার। ও সব নিজের নিজের ভাব চাপ্‌তে হবে। প্রকাশ করা ভাল নয়। আমার ভাব কেউ বুঝ্‌লে না। My best friends আমাকে কঠোর নির্দ্দয় মনে করে। এই তোমরা হয়তো আমায় জুতো মেরে তাড়াবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি) সে কি? এরা তোমায় কত ভালবাসে! তুমি আসবে বলে বাসক-সজ্জা জেগে থাকে।

গিরীশ। Every one has the greatest respect for you. ডাক্তার বলিলেন—"আমার ছেলে—আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আমায় মনে করে hard-hearted, কেন না আমার দোষ এই যে, আমার ভাব কারো কাছে প্রকাশ করি না।"

গিরীশ। তবে মশায়! আপনার মনের কপাট খোলাতো ভাল; at least out of pity for your Friends—এই মনে করে যে—তাঁরা আপনাকে বুঝতে পাচ্ছেন না।

ডাক্তার। বলবো কি! তোমাদের চেয়েও আমার Eeelings worked up হয়। (অর্থাৎ আমার ভাব হয়)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) I shed tears in solitude.

(মহাপুরুষ ও জীবের পাপ-গ্রহণ।)

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) ভাল তুমি যে ভাব হয়ে লোকের গায়ে পা দাও সেটা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি কি জান্‌তে পারি কারো গায়ে পা দিচ্চি কিনা?

ডাক্তার। ওটা ভাল নয়, এটুকুতো বোধ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার ভাবাবস্থায় কি হয়, তা তোমায় কি বলবো? সে অবস্থার পর এমন ভাবি, বুঝি আমার এই জন্যে রোগ হচ্চে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উন্মাদ হয়। উন্মাদে এরূপ হয়, কি করবো?

ডাক্তার (শিষ্যগণের প্রতি)। ইনি মেনেছেন। He expresses regret for what he does. কাজটা Sinful, এটী বোধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিবেকানন্দের প্রতি)। তুইত খুব শঠ, (পরমহংসদেব বুদ্ধিমান অর্থে 'শঠ' বলিতেন) তুই বল্‌না, একে বুঝিয়ে দেনা।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশাই! আপনি ভুল বুঝছেন, উনি সে জন্য দুঃখিত হননি। এঁর দেহ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। ইনি জীবের মঙ্গলের জন্য তাদের স্পর্শ করেন্। তাদের পাপ গ্রহণ করে এঁর দেহে রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন Colic (শূল বেদনা) হয়েছিল, তখন আপনার কি regret (দুঃখ) হয় নাই, কেন রাত জেগে অত পড়্‌তুম। তা বলে রাত্‌জেগে পড়াটা কি অন্যায় কাজ? নিজের দেহের রোগের জন্য ভাবনা হতে পারে, কিন্তু তা বলে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তাদের স্পর্শ করা কি অন্যায় কাজ, যে তাহার জন্য দুঃখ কর্‌বেন?

ডাক্তার। (অপ্রতিভ হইয়া, গিরীশের প্রতি) তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলা দাও। (গিরীশের পদধূলি গ্রহণ)।

(বিবেকানন্দের প্রতি) আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরীশের বুদ্ধিমত্তা) জান্‌তে হবে।

বিবেকানন্দ (ডাক্তারের প্রতি) আর এক কথা, দেখুন, একটা Scientific discovery করবার জন্য লোকে life devote কর্‌তে পারে, শরীর অসুখ ইত্যাদি কিছুই মানে না; আর ঈশ্বরকে জানা—Grandest of all science—এর জন্য health risk কর্‌বেন না?

(অবতারাদি)

ডাক্তার। যত religious reformer (ধর্ম্মাচার্য্য) হয়েছেন—Jesus, Chaitanya, Budha, Mahammad, সব শেষে অহঙ্কারে পরিপূর্ণ;—বলেন—আমি যা বল্লুম, তাই ঠিক; একি কথা?

এই বলিয়া ডাক্তার বিদায় লইতে দণ্ডায়মান হইলেন।

গিরীশ। (ডাক্তারের প্রতি) মশায়, সেই দোষ আপনারও হচ্চে। আপনি একলা—তাঁদের সকলের অহঙ্কার আছে, এ দোষ ধরাতে, ঠিক সেই দোষ আপনারও হচ্চে।

ডাক্তার নীরব হইলেন।

বিবেকানন্দ। (ডাক্তারের প্রতি) We offer to him worship, bordering on Divine worship.

বৈড়ালব্রত বা যৌগিক ব্যভিচার।

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, ইউরোপ এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, এবং ইহাতে উত্তরোত্তর লোকে যেরূপ আস্থাবান হইতেছেন, তাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, শীঘ্রই এই সনাতন ধর্ম্ম ইহার নৈসর্গিক বলে সমগ্র পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য সাধারণের যে এইরূপ আগ্রহাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। (১) কর্ণেল অলকট ও মাদম্ ব্লাভাডাস্কি প্রমুখ থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সাময়িক আবির্ভাব, এবং তৎকর্তৃক হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা; (২) বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীকৃষ্ণচরিত্র" এবং রমেশ-চন্দ্রের "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার পুরাবৃত্ত" (History of Civilisation in Ancient India) নামক পুস্তকের প্রকাশ; (৩) শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা; (৪) ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণের ব্রাহ্মধর্ম্ম-পরিত্যাগ এবং হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণ; (৫) রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপদেশ ও তাঁহার পরমভক্ত বিবেকানন্দের ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম এবং বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা; (৬) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বহুল প্রচার; (৭) মাদম্ আনি বেশান্তের হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা; ইত্যাদি কয়েকটী কারণ, মুখ্য এবং গৌণরূপে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু ভগবান্ অন্তরালে থাকিয়া এই সকল কারণ-কূট সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত কয়েকটী ঘটনাই যে হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ হইবে, আমরা তাহা বলি না; উহা নিরাবিল নহে, উহাতে পঙ্কিলতা রহিয়াছে। বাজারে কোন খাঁটি জিনিষের বেশি কাট্‌তি আরম্ভ হইলে, তাহার ভেজালও আরম্ভ হয়। খাঁটির নামে কিছুদিন ভেজালও চলে। অল্প পরিমাণে ভেজাল হইলে, তাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; কিন্তু ইহার মাত্রা অত্যন্ত অধিক হইলে, কালে ইহা সাংসারিক নিয়মে রহিত হইয়া যায়। ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ। যখন ধর্ম্মের আবেগ বৃদ্ধি পায়, তখন কতকগুলি পাষণ্ড সুবিধা বুঝিয়া, ধর্ম্মের সাজে সাজিয়া, সরল প্রকৃতির লোক-দিগকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করে। এখন যেমন একদিকে লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেছে, অপর দিকে ভণ্ডামিরও অভাব নাই। ধর্ম্মরাজ্যে ভণ্ডামির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হিন্দুধর্ম্মের ভাবী অভ্যুদয়ের হেতু বলিয়া বোধ হয়; কারণ পাপের মাত্রা পূর্ণ না হইলে সংস্কার আরম্ভ হয়না। ধর্ম্মরাজ্যে যখন কপটতা, ব্যভিচার, হিংসা প্রভৃতি অপ্রতিহতরূপে রাজত্ব করে, তখনই তাহার সংস্কারের জন্য কোন না কোন

মহাত্মা আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। যখন ১৬০০ শতাব্দীতে পোপের অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতায় ইউরোপ কলুষিত হইয়াছিল, তখন অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত, বজ্রলেপ-হৃদয়, মহাপ্রাণ মার্টিন্ লুথার জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "চিত্ত পবিত্র না হইলে মুক্তি পাওয়া যায় না; মুক্তিদাতা ভগবান্, কোন মনুষ্য নহে; পোপ-লিখিত একখণ্ড সামান্য কাগজের দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না; এই দেখ, আমি উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলাম"। যখন শাস্ত্রজ্ঞান-গর্ব্বিত ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতায়, নিগ্রহে, এবং জাতিভেদের ভ্রান্তবিদ্বেষে বঙ্গদেশ পাপের নিরয়-পঙ্কে ডুবিয়াছিল, তখন সরলহৃদয়, কোমলপ্রাণ গৌর-গুণমণি প্রেমের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া, সেই জাতি-বিদ্বেষ-প্রসূত দ্রোহিতার মস্তকে কুঠারাঘাত এবং তখনকার ব্রাহ্মণদিগের কঠোর আধিপত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল গতি রোধ করিয়াছিলেন। প্রতীচ্য ধর্ম্মযাজকদিগের চরিত্রহীনতা, ব্যভিচার, স্বার্থপরতা যখন অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তখনই পিউরিটান্-দিগের আবির্ভাব হয়।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব ভুলিয়া, বাহিক আচার-ব্যবহার, যাগ-যজ্ঞাদির প্রতি লোকে অধিকতর আগ্রহ দেখাইতেছে। বাহ্যিক ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, প্রকৃত ধর্ম্মভাব লুপ্তপ্রায় হয়; তাই আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ভাণ এত অধিক দেখা যায়। যাহারা অধার্ম্মিক এবং কলুষিতচরিত্র হইয়াও সাধারণের নিকট ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহে, তাহাদিগকেই শাস্ত্রকারগণ "বৈড়ালব্রতী" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই বৈড়ালব্রতীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) প্রথমশ্রেণী—গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী। ইহারা নানাস্থানে পর্য্যটন করেন; দুই চারিটী গীতার শ্লোক বা তুলসীদাসের দোঁহা সকলেরই অভ্যস্ত আছে; ফাঁক বুঝিয়া তাহা আওড়াইতে থাকেন। ঔষধ প্রায় সকলেই জানেন, এবং দিয়াও থাকেন; এবং তৎপরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ দর্শনীরও ব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাহা ঔষধের মূল্য নহে, কোনও স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার পাথেয় স্বরূপ। ইহাদের নামের পূর্ব্বে বা পশ্চাতে স্বপ্রদত্ত 'স্বামী' প্রভৃতি পূর্ব্বপদ অথবা প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে। নিজকে 'সাধু' বলিয়া, এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের কুহকে পড়ে, তাহা-দিগকে 'ভক্ত' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। গঞ্জিকাসেবন প্রায় সকলেরই ধর্ম্মাঙ্গীভূত; ভেল্কি এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায়ও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কাহারও কাহারও পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে স্থানে পসার না করিতে পারেন, সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—ধার্ম্মিক-বেশধারী সংসারী। ইহারা প্রত্যূষে—অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রো-খান করিয়া পুষ্পচয়ন করেন, তৎপরে জপ-তপ এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাধা করেন; তখন ইহাদের পট্টবস্ত্র পরিধান, অঙ্গে চন্দন-রেখা এবং গাত্রে নামাবলি।

আবশ্যক হইলে, ইহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদির সময় অন্যের সহিত সাংসারিক বিষয়ের বাক্য-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহা কিছু বাহ্যিক অশুচি, তাহাতেই ঘৃণা প্রদর্শন ও নাসিকাকুঞ্চন। আধুনিক যাহা কিছু, তাহারই প্রতি ভয়ানক আক্রোশ, এবং কথায় কথায় ঋষি-মুনিদিগের এবং শাস্ত্রাদির দোহাই; যদিও শাস্ত্র নামক কোন গ্রন্থই তাঁহারা চক্ষু-সংযোগে অনুগ্রহ করেন নাই! তীর্থ-পর্য্যটন, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ আস্থা, কারণ তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ঐ সকল কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের সমস্ত প্রচ্ছন্ন পাপ বিনষ্ট হইবে। এই সকল বাহ্যিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ভিন্ন আর যে কিছু ধর্ম্মকার্য্য আছে, তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপ দেখিলে বোধ হয় না। নীতি বিগর্হিত এরূপ কার্য্য অতি অল্পই আছে, যাহাতে তাঁহারা পরাঙ্মুখ; তথাপি তাঁহারা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী! আর একটী লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া যাইতেছি; সেটী এই—ইহারা সময় সময় লোকের লক্ষ্য আকর্ষণ করিবার জন্য অনতি-লঘুস্বরে ঈশ্বরের দুই একটী নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কখন কখন নানা কার্য্যের মধ্যেও জপের ভাবে থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণী—আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ। ইহার অনেকেই বাঁধা-ছড়ার মতন পূর্ব্বাহ্ণে এবং সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তৎপরে 'নির্লিপ্তভাবে' সংসারের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া কিঞ্চিৎ 'অনুতাপ' করেন। ইহারা মনে করেন, মদ্যপান এবং ব্যভিচার-দোষে কলুষিত না হইলেই সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মরক্ষা হইল। কোনও লোক ভিক্ষার জন্য দ্বারস্থ হইলে, অর্থ-নীতি সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া, তাহাকে মৃদুমধুর সম্ভাষণে স্থানান্তরে যাইতে বলেন। পিতা-মাতাকে ইহারা যেন একটু ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং গৃহিণীকে বিশেষ ভক্তি করেন। পরিচ্ছদাদিতে ইহারা কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের উদারতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যাহা কিছু, সকলই নিন্দার্হ, এবং দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি ইঁহাদের অঙ্গের ভূষণ; বোধ হয় অন্তিমকালে সঙ্গের ভূষণও তাহারাই হইবে। ইহাদের ন্যায় স্বার্থপর, ঘোরসংসারী এবং অর্থ-পিশাচ বোধ হয় আর পৃথিবীতে নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—'বাবাজী' সম্প্রদায়; ইহারা "যখন যেমন—তখন-তেমন" মন্ত্রের উপাসক। আবশ্যক হইলে, ইহারা সর্পের ন্যায় সময় সময় ধর্ম্মের খোসা বদলাইয়া থাকেন! দৈনিক কার্য্যকলাপের সহিত যে ধর্ম্মের কিছু সংস্রব আছে, ইহাদের ব্যবহার এবং কার্য্য দেখিলে তাহা বোধ হয় না। এরূপ পাপ পৃথিবীতে অতি বিরল, যাহাতে ইহারা লিপ্ত নহেন। কিন্তু সময়ানুযায়ী চাল্ দিয়া, ইহারা অনেককেই 'সাৎ' করিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এ দেশে ইহাদিগকে তীক্ষ্ণ চক্ষে দেখিবার লোক নাই; দেখিবে কে? সকলেই যে একাকার! এই শ্রেণী-বিভাগে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ পরিলক্ষিত হইলে, সহৃদয় পাঠকগণ নিজগুণে তাহা ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রকারেরা এই বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বতন্ত্র নরক নির্দ্দেশ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে, সাধারণ নরকের শাস্তিতে তাহাদের পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মনু বলেন :—

যে বকব্রতিনো বিপ্রা যে চ মার্জ্জারলিঙ্গিনঃ।
তে পতন্ত্যন্ধতামিস্রে তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

যে ব্রাহ্মণেরা বকধর্ম্মী—বিড়ালব্রতধারী, তাহারা সেই পাপে অন্ধতামিস্র নামক নরকে পতিত হয়।

অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥

যে ব্যক্তি যথার্থ ব্রহ্মচারী নহে, কিন্তু ব্রহ্মচারীর চিহ্ন মেখলাদি ধারণ করিয়া ভিক্ষাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে সেই পাপে ব্রহ্মচারীদিগের সকল পাপ হরণ করে এবং তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

যাঁহারা কথায় ধর্ম্ম মানিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও যে ধর্ম্মের ব্যভিচার করেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বৈড়াল-ব্রতীদিগের জন্য যে প্রত্যবায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদিগের উপরও বর্ত্তিবে।

ধর্ম্মরাজ্যে কপটতা সম্বন্ধে যখন এত কথা বলা হইল, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বস্তুর স্বাভাবিক সমীচীনতা-পৌনঃপুন্যে তাহার ব্যভিচার সংসারের পক্ষে অপকারী হয়। যে সকল খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা মনুষ্য জীবন ধারণ করে, তাহার ভেজালের দ্বারা অত্যন্ত অনর্থ, এমন কি জীবন-সংশয় হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যে মনুষ্য-জীবনের সর্ব্বপ্রধান এবং বহুমূল্য সামগ্রী, তদ্বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। (১) (২) (৩) ইহার স্বাভাবিক উৎকর্ষ প্রযুক্ত, ইহার ব্যভিচারই সংসারের আধ্যাত্মিক দুঃখের একমাত্র কারণ। সংসারের যে সকল কার্য্যে মনুষ্য মাত্রেই শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ অনুভব করে, সমাজ

(১) Religion! what treasure untold
Resides in that heavenly word!
More precious than silver and gold,
Or all that this earth can afford. (Cowper.)

(২) It is well said, in every sense, that a man's religion is the chief fac with regard to him. (Thomas Carlyle)

(৩) ধর্ম্মঃ সনাতনঃ সর্ব্বৈঃ সেবনীয়ঃ সদা মুনে। ধর্ম্মএব পরোবন্ধুঃ পিতা মাতা পিতামহঃ। ধর্ম্মো গুরুঃ সখা একো ধর্ম্মো এব পরা গতিঃ। ধর্ম্ম আত্মা ক্রিয়া ধর্ম্মস্তীর্থানি ধর্ম্ম এব হি। ধর্ম্মো ধনং সর্ব্বদেবো ধর্ম্ম এব ন সংশয়ঃ। ধর্ম্মঃ সম্পদ্ বিপদ্ ধর্ম্মরাহিত্যং ব্যর্থজীবনং॥ (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণম্)

দুর্বিনীত হয়, মনুষ্য পশু নামে অভিহিত হয়, ধর্ম্মের অভাব বা ব্যভিচারই তাহার মূলীভূত কারণ। যে কোনও ধর্ম্মই হউক না কেন, চরিত্র-গঠন এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য, সকল ধর্ম্মেই যথেষ্ট বিধান রহিয়াছে। 'ধর্ম্ম' শব্দের অনেক ব্যাখ্যা রহিয়াছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সহজে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগের মনে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে, ইহা সম্ভবপর নহে। তবে সুখের বিষয় যে, এরূপ লোকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে অতি অল্প; কারণ এই জগতের যে একটী আদি কারণ * আছে, তাহা প্রায় সকলেরই বিশ্বাস। যাহাহউক, অসাম্প্রদায়িক-ভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাউক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলভিত্তি। মানসিক পবিত্রতা অর্জ্জন করা ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কর্ম্মেই ইহার একমাত্র পরীক্ষা ‡। যাহার চিত্ত পরিষ্কার না হইয়াছে, বাহ্যিক অনুষ্ঠান যতই হউক না কেন, সে কখনই মুক্তি পাইতে পারে না। তোমার কি ধর্ম্ম, তাহা তোমার কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইবে। এই কার্য্যানুষ্ঠানই চরিত্র। তুমি বল, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ; কিন্তু তুমি পদে পদে অসৎব্যবহার এবং অজ্ঞানের ন্যায় কার্য্য কর; বল দেখি, তোমার ধর্ম্ম কোথায়? তুমি জান, অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, বিষের প্রাণ-নাশিকা শক্তি আছে, তথাপি তুমি অগ্নিতে নিজে ঝম্প প্রদান কর এবং হলাহল পান কর; তোমার 'প্রাণনাশিকা এবং দাহিকা শক্তি'-জ্ঞানের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হইয়া কার্য্য করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। বলা আবশ্যক যে, এই 'কার্য্য' দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক শক্তির চালনা, এই উভয়কেই বুঝিতে হইবে। এই জন্যই ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি-অর্থ—যাহা সকল মনুষ্যকে পোষণ করে। প্রত্যেক মনুষ্য কর্ত্তব্যপরায়ণ না হইলে, সমাজ অথবা সংসার কিরূপে পুষ্ট বা রক্ষিত হইতে পারে? এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিবেক-প্রসূত; সুতরাং যিনি বিবেকানুযায়ী কার্য্য করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। এই বিবেক অন্তরাত্মারূপে আমাদের মধ্যে নিভৃত-ভাবে রহিয়াছেন। যিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ, তিনিই ধার্ম্মিক, তিনিই ঈশ্বরপরায়ণ। যাহারা কর্ত্তব্যহীন, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক; তাহারা কর্ত্তব্যশীল নাস্তিক অপেক্ষা অধম। যাঁহারা কর্ত্তব্যশীল, সদা সৎকার্য্যে নিরত, তাঁহারা মুখে ঈশ্বর বিশ্বাস করেন না, এ কথা বলিলেও, তাঁহাদিগকে

* The consciousness of an inscrutable power, manifested to us through all phenomena, has been growing ever clearer. (First Principles. Herbert Spencer.

‡ If we look into the more serious part of mankind, we find many who lay so great a stress upon faith, that they neglect morality; and many who build so much upon morality, that they do not pay a due regard to faith. The perfect man should be defective in neither of these particulars,.......The Spectator.

ঠিক নাস্তিক বলা যুক্তিযুক্ত নহে ;* কারণ তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারাই স্রষ্টার মঙ্গলময় বিধানের সার্থকতা স্বীকার করিতেছেন। এই ভাবে দেখিতে গেলে, আমরা এক্ষণে যে অতি অধঃপতিত জাতি, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা সকলেই কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র নাই ; কথাটী ঠিক। ইহার কারণ এইযে, এক্ষণে আমাদের জীবন্ত ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহা কার্য্যের দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা নাই। ব্যক্তিগত জীবনের চরিত্র-বল—(ধর্ম্ম যাহার প্রসূতি—) যে পর্য্যন্ত না দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা যাঁহারা দেশকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের আশা সুদূরপরাহত। কোনও সদনুষ্ঠান যে আমাদের দেশে স্থায়ী হয় না, ধর্ম্মাভাবই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'নবজীবন', 'প্রচার', প্রভৃতি স্বনামখ্যাত মাসিক-পত্র কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। 'বেঙ্গলব্যাঙ্কিং করপোরেশন্,' এবং অন্যান্য যৌগ কারবার, যথা 'ম্যাচ্ ম্যানুফ্যাক্টারি' (Mach-manufactory) ইত্যাদি লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ন্যাশনল্ ফণ্ডের (National Fund) কথা আর শুনা যায়না। কংগ্রেসে (Congress) বৎসর বৎসর প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় ; কিন্তু মান্দ্রাজ এবং কলিকাতায় যে ইহার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা ভিন্ন অন্য কোন অধিবেশনের খরচের হিসাব অদ্যাপি বাহির হয় নাই। 'রিপণ্-স্মৃতিচিহ্ন' (Ripon-Memorial) কোথায়? তাঁহাকে নাকি আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতাম!! যাঁহারা স্বদেশ-হিতৈষণা-ব্রতে ব্রতী ছিলেন, একটী মাত্র কৃপা-কটাক্ষে তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বঙ্গের গৌরব মাইকেল মধুসূদন দত্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাঠক! এই সকল ঘটনার মূলে কি ধর্ম্মাভাব জাজ্জ্বল্যমানরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে না? সুতরাং ধর্ম্মাভাব যেমন ব্যক্তিগত অধঃপতনের কারণ, তেমনই সামাজিক ও জাতীয় অধঃপতনেরও মূল কারণ। জাতি ব্যক্তি-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই দ্বিজেন্দ্রবাবু আমাদের জাতীয় চরিত্রে ধিক্কার দিয়া লিখিয়াছেন,—

'আমরা Curious commodities, human oddities—Denominated the 'Babus.'

আমরা বক্তৃতায় বুঝি ও কবিতায় কাঁদি, কিন্তু কাজের সময় সব ঢু—ঢু!

আমরা beautiful muddle, a quire amalgam of শশধর, Huxley and Goose.'

'যোগ' এই বিষয়টী লইয়া আজকাল সর্ব্বত্রই আলোচনা হইতেছে। 'যোগ'

---

* .....It is generally owned that, there may be salvation for a virtuous infidel (particularly in the case of invincible ignorance) but none for a vicious believer.
(Ilied)

শব্দের অনেক অর্থ; তাহার উল্লেখ এবং সমালোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। সাধারণে 'যোগ' অর্থে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা এই:—'চিত্তের স্থৈর্য্য এবং বিশুদ্ধতা সম্পাদনের নিমিত্ত কতকগুলি শারীরিক অনুষ্ঠান'। পাতঞ্জল "চিত্তবৃত্তিনিরোধ"কে যোগ বলিয়াছেন। এই 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ' এবং 'চিত্তের স্থৈর্য্য' প্রায় একই কথা। বাহ্যিক বস্তু হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করিয়া কোন অভীষ্ট বস্তুতে সমর্পণ করিতে পারিলেই চিত্ত-নিরোধ হইল; সুতরাং ইহা ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মুক্তিলাভ করিবার প্রধান সহায়। সাধারণতঃ আমাদের চিত্ত সর্ব্বদাই চঞ্চল। এই চঞ্চলতা নিরাকৃত না হইলে, ঈশ্বর-সাধনা সাধ্যায়ত্ত হয় না; এই জন্য যোগের প্রয়োজন। দেহ এবং মন নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। দেহে রোগোৎপত্তি হইলে, অল্পাধিক পরিমাণে চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়; এবং চিত্ত অসংযত হইলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে দৈহিক বিকারও অনিবার্য্য। এইরূপ শরীর ও মন লইয়া উপাসনা, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কার্য্য সম্যক্‌রূপে সমাধা হওয়া অসম্ভব; এজন্য দেহের পটুতা আবশ্যক এবং চিত্তকেও সংযত করা বিধেয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করাই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য; শারীরিক অনুষ্ঠান কেবল তাহার সোপান মাত্র। শাণ্ডিল্যেরও এই মত। জ্ঞান এবং ভক্তি লাভের জন্য যোগানুষ্ঠান আবশ্যক; তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কিছু সার্থকতা নাই; * সুতরাং যে চিত্তশুদ্ধি বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, কেবল মাত্র দৈহিক পটুতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যোগানুষ্ঠানে রত, সে যোগের ব্যভিচার করে, এবং অতি পাষণ্ড; তাহাকে যোগ-ভ্রষ্ট বা অযোগী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্ত-শুদ্ধি-উদ্দেশ্য-বিহীন, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতা বা নিরোগত্ব লাভ করিবার জন্য আসন, মুদ্রা প্রভৃতি শারীরিক অনুষ্ঠান, মল্লদিগের লম্ফন এবং কুর্দ্দন অপেক্ষা কোনক্রমেই শ্রেষ্ঠ নহে। ঘেরণ্ড বলেন:—

আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জার্য্যমানঃ সদা ঘটঃ।
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥
শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনং॥
ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতঃ॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥

ইহা হইতেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মুক্তিলাভ করাই যোগের চরম উদ্দেশ্য। শারীরিক এবং মানসিক বিকৃতি থাকিলে এই মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। সেই জন্য

* যোগস্তূভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ॥ (১৯, শাণ্ডিল্য সূত্র।)

"ঘট," অর্থাৎ শরীরকে সপ্তপ্রকার সাধনা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যে 'শম,' 'দম,' 'তিতিক্ষা', 'আর্জ্জব,' 'অপৈশুন্য', 'অলোভ,' 'ক্ষমা', 'ধৃতি,' প্রভৃতি গুণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল মাত্র শারীরিক পটুতাকেই যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য করে, সে যোগের ব্যভিচার করে। তাহার প্রতিও বৈড়ালব্রতীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রত্যবায় প্রযোজ্য। যোগ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্য চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। প্রতি কার্য্যে যিনি সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁহার চিত্তশুদ্ধি সহজেই হইয়া থাকে। যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মের লক্ষ্য একই। কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়; সুতরাং ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, যোগ, ইহারা সকলেই পরস্পর বিশেষ-রূপে সংশ্লিষ্ট। যিনি চরিত্রবান্ না হইতে পারেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে অধিকার নাই। সাধারণের হাতে পড়িলে যোগের ব্যভিচার হইবে, এই আশঙ্কায়, অশেষ গুণালঙ্কৃত, ত্রিকালজ্ঞ মুনি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রকে অতি গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু কতকগুলি নর-পিশাচ, মানবকুল-গ্লানি, বৈড়ালব্রতীদিগের ব্যবহারে ইহা বাজারের জিনিষ—উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যে আর্য্য-তাপসগণ স্রোতস্বিনীর সৈকত-পুলিনে, নির্জ্জন কন্দরে, প্রকৃতির পবিত্র কাননে, সৃষ্টির প্রাণরূপিণী শক্তির আরাধনায় যোগরত থাকিতেন; যাঁহাদিগের যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যায় দেবতা-দিগেরও ভীতির সঞ্চার হইত, আজ সেই যোগের—যোগশাস্ত্রের এতাদৃশ ব্যভিচার দেখিয়া, কোন্ সহৃদয় আত্মা ব্যথিত না হয়? ধর্ম্মের গ্লানি, যোগের অপব্যবহার, চরিত্র-মাহাত্ম্যের অভাব, সকলই এই কলিযুগে হতভাগ্য ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইয়াছে। হে ভূতভাবন, নিত্যনিরঞ্জন, পতিতপাবন শ্রীহরি! আবার তুমি তোমার এই পবিত্র লীলা-ধামে, তোমার নিজ নামের প্রাণ-মন-হারী বংশী-বাদন-পূর্ব্বক, নির্জ্জীব, ধর্ম্মভ্রষ্ট, যোগভ্রষ্ট ভারতবাসীর প্রাণে নবোৎসাহ সঞ্চারের বিধান কর।

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী এম্, এ।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১২

মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ বৈ (নিশ্চয়েন) মহান্ প্রভুঃ, এষঃ সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ, ইমাং সুনির্ম্মলাং প্রাপ্তিম্ ঈশানঃ, জ্যোতিঃ অব্যয়শ্চ, ভবতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। বৈ—(অব্যয়) নিশ্চয়েন—নিশ্চয়। মহান্—অপ্রতিরথঃ—অপ্রতিরথ অদ্বিতীয়। প্রভুঃ—সমর্থঃ, সমর্থ। সত্ত্বস্য প্রবর্ত্তকঃ—জগদুদয়স্থিতিসংহারে অন্তঃকরণস্য প্রেরয়িতা, জগতের উদয়, স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে অন্তঃকরণের প্রেরয়িতা। সুনির্ম্মলাম্—স্বরূপাবস্থা-লক্ষণাং—পুনরাবৃত্তিরহিতাম্, অতএব—নিতরাং মঙ্গলকরীং, স্বরূপাবস্থালক্ষণ—অর্থাৎ পুনরাবৃত্তিরহিত, অতএব নিরতিশয়—মঙ্গলকরী। প্রাপ্তিম্—পরমপদপ্রাপ্তি। ঈশানঃ—ঈশিতা—অর্থাৎ নিয়ন্তা। জ্যোতিঃ—পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ। অব্যয়ঃ—অবিনাশী।

বঙ্গার্থ—সেই অপ্রতিরথ,—অতুল্য শক্তিসম্পন্ন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সমর্থ পরম পুরুষই (পরমাত্মা)—সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণের প্রবর্ত্তক। স্বরূপাবস্থাময়ী—পুনরাবৃত্তিরহিতা পরমপদ-প্রাপ্তির তিনিই এক মাত্র নিয়ন্তা, তিনি পরিশুদ্ধ বিজ্ঞানপ্রকাশ এবং অবিনাশী। তদীয় মননাদি-বলে সাধক তৎপদপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া আবৃত্তি-শৃঙ্খল ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন।

১৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
হৃদা মন্বীশো মনসাভিক্লৃপ্তো য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

অন্বয়ঃ। অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ—অভিব্যক্তিস্থান হৃদয়চ্ছিদ্র পরিমাণাপেক্ষয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ হৃদয়ের অভিব্যক্তিস্থানানুসারে—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত। পুরুষঃ—পুরে বসতি—শেতে ইতি পুরুষঃ, পুরশায়ী অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে—পুরাধিষ্ঠিত। মন্বীশঃ—জ্ঞানেশঃ—সর্ব্বজ্ঞানৈকনিধান। হৃদা—মনসা ("স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ"।) মনের দ্বারা—অর্থাৎ মনোময় দর্শন দ্বারা। অভিক্লৃপ্তঃ—প্রকাশিত।

বঙ্গার্থ। সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়াভ্যন্তরশায়ী অন্তরাত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বজনের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি অখণ্ড জ্ঞানময়, মনোময় নয়ন দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারা যায়, অর্থাৎ মননাদিরূপ সম্যগ্‌দর্শন-বলে তিনি সাধক-নয়নে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন। (অথবা তিনি মনের দ্বারা প্রকাশিত মনোরাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহাকে মনঃস্থিরতা প্রভৃতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়)। যে সমুদয় বিচক্ষণ মনীষী ইঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাঁহারা অচিরেই অমৃতত্ব লাভ করেন।

১৪

সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

অন্বয়ঃ। সঃ সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ পুরুষঃ, ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা দশাঙ্গুলম্ অতি-অতিষ্ঠৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। (অস্মিন্ অনুশাসনে সহস্রেতিপদং অনন্ত-শব্দ-সমার্থতয়া প্রযুক্তমিতি সুধীভির্বিভাব্যম্। সহস্রশীর্ষা—সহস্রাণি—অনন্তানি শীর্ষাণি অস্য ইতি, অনন্ত মস্তক। এবমুত্তরত্রাপি। সহস্রাক্ষঃ—অনন্তচক্ষু। সহস্রপাৎ—অনন্ত চরণ। পুরুষঃ—পূর্ণ। ভূমিং—পৃথিবী। বিশ্বতঃ—সর্ব্বতঃ—অন্তর্বহিশ্চ—অন্তরে এবং বাহিরে। বৃত্বা—ব্যাপ্য। দশাঙ্গুলম্—অনন্তম্ অপারম্, অথবা নাভেরুপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং তত্র অনন্ত অপার, অথবা নাভির উপরিস্থিত দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়, সেইস্থলে। অতি-অতিষ্ঠৎ—অতীত্য ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি, সমস্ত ভুবন অতিক্রম পূর্ব্বক বিশ্বের অন্তরে বাহিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

বঙ্গার্থ—সেই অনন্ত মস্তক, অনন্ত চক্ষু এবং অনন্ত চরণ বিশিষ্ট পূর্ণ পরমাত্মা পৃথিবীকে অন্তরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত অপার ভুবনের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অথবা নাভিদেশের ঊর্দ্ধতন দশাঙ্গুল-পরিমিত হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। এই পৃথিবীতে সমস্তই তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বত্রই তাঁহার বিভূতি বিরাজিত।

১৫

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥

অন্বয়ঃ। যদ্ ভূতম্ যৎ চ ভব্যম্, (তৎ) ইদং সর্ব্বং পুরুষ এব। (সঃ পুরুষঃ) অমৃতস্য ঈশানঃ। যৎ অন্নেন অতি রোহতি, (পুরুষঃ তস্য চ ঈশান ইতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা। অমৃতস্য—অমরণ-ধর্ম্মস্য, অমরণধর্ম্মের অর্থাৎ কৈবল্যের। যৎ অন্নেন অতিরোহতি—যাহা অন্নের দ্বারা পরিপুষ্ট হইতেছে। ভব্যম্—ভবিষ্যৎ।

বঙ্গার্থ। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান,—এ সমস্তই সেই পরমাত্মা, তিনি ব্যতীত এই সমুদয়ের দ্বিতীয় কর্ত্তা নাই। তিনিই একমাত্র অমরত্বের বিধাতা। এই বিশ্বে অন্ন দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট হইতেছে, তাহারও এক মাত্র নিয়ন্তা সেই পরম পুরুষ; অর্থাৎ এ জগতে তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।

১৬

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

অন্বয়ঃ। তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং, সর্ব্বতঃ অক্ষি-শিরোমুখং, সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ। (তৎ) লোকে সর্ব্বম্ আবৃত্য তিষ্ঠতি।

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং—সর্ব্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার হস্ত এবং পদ আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং—সর্ব্বতঃ অক্ষীণি শিরাংসিচ যস্য তৎ, সর্ব্বত্রই যাঁহার নয়ন, মস্তক এবং মুখ বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ—

সর্ব্বতঃ শ্রুতিঃ বিদ্যতে অস্য ইতি, যাঁহার শ্রবণ-শক্তি সমস্তই শ্রবণ করিতে সমর্থ। আবৃত্য—ব্যাপ্য—ব্যাপিয়া।

বঙ্গার্থ। পুনরায় নির্ব্বিশেষভাবে তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার হস্ত এবং পা সর্ব্বত্রই বিরাজমান, তাঁহার নয়ন, শিরোদেশ এবং মুখ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, এবং তাঁহার শ্রুতি সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥

কঠ-শ্রুতির উপরোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য এই যে,—

শরীরে দুই আত্মা প্রবিষ্ট আছেন। ইহাদিগের মধ্যে একটী সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন (একস্তত্র কর্ম্মফলং পিবতি নেতরঃ তথাপি পাতৃ সম্বন্ধাৎ পিবন্তাবিত্যুচ্যতইতি-শঙ্করাচার্য্যঃ) অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গদেহে অধিষ্ঠান বশতঃ আমি আছি, আমি সুখী-দুঃখী, আমি ভোগ করিতেছি, ইত্যাদি মনে করিয়া সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্যটী পরম উৎকৃষ্ট স্থানে বাস করিয়া প্রথমোক্তকে কর্ম্মফল প্রদান করে। যাঁহারা আত্মতত্ত্ববিৎ, তাঁহারা ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে ছায়া ও দ্বিতীয়টীকে আতপ বলিয়া থাকেন ও সেই রূপ ত্রিণাচিকেত-গৃহস্থরাও বলিয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে প্রথমটি (নশ্বর "আমি") কিরূপে জাত ও পুষ্ট হয়, তাহা বিশদভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি। সৎ-স্বরূপ নিত্য জীবই ইহার প্রেরক এবং ইহা স্থূল শরীর ও লিঙ্গ-শরীরাভিমানী। অবিদ্যা বা অপরা প্রকৃতিই ইহার জন্মের কারণ। ভগবানের দুইটী-প্রকৃতি আছে, একটীকে অপরা (নিকৃষ্টা) প্রকৃতি বলে; কারণ ইনি অশুদ্ধা ও অনর্থকরী, সংসাররূপা, বন্ধনাত্মিকা ও জড়া; আর অন্যটীকে বিদ্যা, পরা ও চিন্ময়ী প্রকৃতি বলে। স্থূল ও লিঙ্গদেহাভিমানী অনিত্য "আমি" পঞ্চভূত-ভৌতিক পদার্থময়; স্থূল-সূক্ষ্ম সংসৃষ্ট ভৌতিক সমস্ত চিন্তাই যে "আমির" অঙ্গ গঠন করে, সর্ব্বদাই যে অহংজ্ঞান আমাদের একটা না একটা শরীর লইয়া থাকে, সে "আমি" অবিদ্যা-কল্পিত নিকৃষ্টা প্রকৃতি-জাত; তাহারই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু সমগ্র পরিবর্ত্তনের

মধ্যে যে "আমি" অটল অচল থাকায় "আমি সেই" এইরূপ প্রতীয়মান হয়, তাহাই পরা-প্রকৃতিজাত চিন্ময়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান এই দুই প্রকার প্রকৃতির বিষয় বুঝাতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

আমা হইতে (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান হইতে) ভিন্না (বহির্মুখী জড়াত্মিকা) অষ্টপ্রকার প্রকৃতি-পদার্থ আছে, যথা—পৃথিবী-তন্মাত্র, জল-তন্মাত্র, তেজস্তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র, আকাশ-তন্মাত্র, অহঙ্কার-তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব; ইহাদের সকলেরই মূল অবিদ্যা।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

উপর্য্যুক্ত অবিদ্যা হইতে ভিন্ন আমারই অভিন্ন অংশ স্বরূপ (জীব-চৈতন্য) আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতরা প্রকৃতি আছে, যাহা এই অনন্ত জগৎ মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো! এই প্রকৃতিকে তুমি 'জীব' বলিয়া জানিবে। এই দুই প্রকার প্রকৃতি—অর্থাৎ চিন্ময়ী ও জড়াত্মিকা প্রকৃতি ভগবানের; চিৎ ও জড়, উভয়ই যাহাতে অর্পিত, তিনি ভগবান। অবিনশ্বর, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব জীবাত্মা চিন্ময়, এবং নশ্বর, বদ্ধ, অসংখ্য ক্লেশাকর, ভাণমাত্র ও অহঙ্কারে যাহাকে সর্ব্বদাই "আমি" বলিয়া জানি, ইহা জড়সম্বন্ধিনী ভাবনাময় এবং জড়ত্বাভিমানী বলিয়া জড়তত্ত্বময়ী অবিদ্যা-জাত।

"দূরমেতে বিপরীতে বিসূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা"। (কঠ, দ্বিতীয়া বল্লী।)

বিদ্যা আর অবিদ্যা, ইহারা পরস্পর দূরবর্ত্তিনী, ভিন্ন-গতি ও ভিন্নফলদা, ইহা জানাই আছে।

এই যে দুই প্রকার প্রকৃতি, যাহার বিষয় আমরা শ্বেতাশ্বতরেও দেখিতে পাই, যথা—

দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে।
ক্ষরন্ত্ববিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ৫ম অধ্যায়।)

দেশ-কাল-বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অক্ষর পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দুইটী গূঢ়ভাবে নিহিত আছে। বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই তাঁহার মাহাত্ম্য। অবিদ্যা জীবের মৃত্যুর কারণ ও সংসার-জনয়িত্রী; বিদ্যা অমৃতস্বরূপা, জীবের মোক্ষদাত্রী। জীব চিন্ময়, পরা-প্রকৃতি বিদ্যা-জাত; জীব নিজের স্বরূপ জানিবার জন্য, সমস্ত লোক বশীভূত করতঃ সচ্চিদানন্দময় চিদেকরূপ ভগবত্তত্ত্ব ভোগ করিবার নিমিত্ত অবিদ্যা মধ্যে প্রবেশ করে।

অবিদ্যা মধ্যে বহু কাল বদ্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে অবিদ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, আপনার স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয়। এই জ'বের স্বরূপ কি, তাহা পরে বলিব। ইহাই প্রকৃত নিত্য জীব; বেদান্তদর্শন কেবল ব্যবহারিক জীবের অনিত্যত্ব দেখাইয়া, এই নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম, নির্গুণ, নিষ্কাম পুরুষ প্রভৃতি নানা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবহারিক জীব যে অনিত্য, প্রাতিভাসিক ইন্দ্রজালময়, তাহা বেদান্ত উত্তমরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত-দর্শিত ব্রহ্মই যে এই নিত্যজীব, তাহা দেখাইতেছি। বেদান্তের বিষয় হইতেছে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করা, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্ম, ইহা দেখান। 'নেতি নেতি' করিয়া অপরা প্রকৃতিতে উপহিত আভিমানিক অনিত্য জীবের সত্তা ভ্রান্তি-জনিত দেখাইয়া, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহের অধিষ্ঠাতা চিদেকরস আত্মাই ব্রহ্ম, বেদান্ত বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। আমি কে, তাহা খুঁজিয়া খুঁজিয়া, পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া, বেদান্ত প্রকৃত নির্বিকার "আমি"কে পাইয়া স্থির হইলেন। এই সনাতন "আমি"কে পাইবার জন্য যেরূপ অন্বেষণ করা আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে করিলেন। দেহতত্ত্ব উত্তমরূপে বিচার করিয়া, জড়দেহের অতীত বস্তু চিন্ময় আত্মার জ্যোতি দেখিয়া বিভোর হইলেন! যেখান হইতে ফিরিতে হয় না, তথায় যাইয়া থামিয়া পড়িলেন। মোক্ষপাদেই গ্রন্থের শেষ করিলেন।

'অনাবৃত্তিঃশব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"

ব্রহ্মসূত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থপাদ, ২৩সূত্র।

নচ পুনরাবর্ত্ততে। সর্ব্বান্ কামানপ্যমৃতঃ
সমভবৎ সমভবদিত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

মুক্ত ব্যক্তির আর পুনরাগমন করিতে হয় না, ইহা বলিয়াই বেদান্ত নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহা ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রে উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন, এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানীই ব্রহ্ম, একথাও বলিয়াছেন। এক্ষণে এই ব্রহ্মজ্ঞানী—যাঁহারা ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিবেন, তাঁহারা অবিদ্যা অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইয়াছেন, ত্রিগুণাতীত হইয়া আত্মানন্দ ভোগ করতঃ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। গুণাতীত হইলে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কিরূপ লক্ষণযুক্ত হয়েন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
নদ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥
উদাসীনো বদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণাবর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ১০ ॥

সমদুঃখ সুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্য প্রিয়াপ্রিয়োধীরস্তুল্য নিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৪ ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৪শ অধ্যায়।)

এইরূপ ব্যক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানী, গুণাতীত ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরিয়া "অহংব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্য ইঁহারাই সফল করেন; এই ব্রহ্মভূত মহাত্মাগণের (অবিদ্যার পারে যাইলেও) "আমির" অস্তিত্ব থাকে; তবে কিনা সে 'আমিত্বের' সহিত আমাদিগের অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত মায়িক আমিত্বের কোনও মতে তুলনা হইতে পারে না। সেই নিত্য "আমি"ই ব্রহ্ম। 'আমি' না থাকিলে, মুক্তপুরুষদিগের ভোগ থাকিত না। ইঁহারা কিরূপ ভোগ করেন? মহর্ষি বেদব্যাস বলিতেছেন,—

"সম্পাদ্যাবির্ভাবঃ স্বেনশব্দাৎ" ॥১ ব্রহ্মসূত্র ৪র্থ পাদ।

মুক্তব্যক্তিরা ব্রহ্মকে পাইয়া, তাঁহার অনতিক্রমে কর্ম্মবন্ধ-বর্জ্জিত ভোগ করেন। ইঁহারা মুক্ত কিরূপে? বেদান্তদর্শন বলিতেছেন,—

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ॥উ-২ সূ।

যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্ম হইয়াছেন, তাঁহারাই মুক্ত।

"চিতিতন্মাত্রেণতদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ"। উ—৬ সূ।

চিতিমাত্রো দেহো মুক্তানাং পৃথগ্বিদ্যতে তেন ভুঞ্জতে। সর্ব্বেবা এতদচিৎ পরিত্যজ্য চিন্মাত্র এবাবতিষ্ঠতে তামেতাংমুক্তিরিত্যাচক্ষত ইত্যুদ্দালক শ্রুতিশ্চিদাত্মকত্বাদিতি ঔড়ুলোমির্ম্মন্যতে॥

(শ্রীমদানন্দতীর্থ-বিরচিত মাধ্বভাষ্য)

ঔড়ুলোমি আচার্য্য বলেন, মুক্তদিগের চিন্ময় দেহ আছে, সেই দেহ দ্বারা তাঁহারা ভোগ করেন। "মুক্তেরা অচিন্ময় দেহ ত্যাগকরিয়া চিন্ময়দেহে অবস্থান করেন, ইহাকেই মুক্তি বলে" এই উদ্দালক-শ্রুতি বলেন, মুক্তের চিন্ময় দেহ জানা যায়। ইহাতে যদি বল, মুক্তদিগের দেহ স্বীকার করিলে, তাঁহাদিগের সংসারিত্বাপত্তি হয়; তাহা নহে; কেননা অচিন্ময় কৃত্রিম শরীরেই সংসারিত্ব, চিন্ময় দেহের সংসারিত্ব নাই। এই ঔড়ুলোমির অভিমত চিন্ময় দেহ দ্বারা ভোগ এবং জৈমিনীর কথিত ব্রহ্মদেহের দ্বারা ভোগ, এই উভয়ই প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই পরসূত্রে কথিত হইয়াছে।

"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং" (বাদরায়ণঃ)

তাহাহইলে পূর্ব্বে বলা হইয়াছিল যে, আত্মা সকল দেহের অতীত এবং এক্ষণে

যে বলা হইতেছে যে, আত্মা চিন্ময়-দেহ, ইহাতে আর কোনও বিরোধ রহিল না; কেননা পূর্ব্বকথিত সমস্ত দেহই মর্ত্ত্য, জড়ময়; এক্ষণে যে দেহের কথা বলা হইতেছে, তাহা চিন্ময় ও সৎ। শ্রুতিতে (সৌপর্ণ) দেখিতে পাই, 'সবা এষ এতস্মান্মর্ত্ত্যা বিমুক্তশ্চিন্মাত্রো ভবতি অথ তেনৈব রূপেণাভিপশ্যত্যভিশৃণোত্যভিমনুতেঽভিজানাতি তামাহ মুক্তিমিতি।'

মুক্ত পুরুষেরা মর্ত্ত্যদেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়রূপ ধারণ করেন এবং সেইরূপে শ্রবণ করেন, দর্শন করেন এবং সকল জানিতে পারেন। ইহাকেই মুক্তি বলিয়া থাকে। এক্ষণে দেখুন, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ-দেহ বিনষ্ট হইলেও, চিন্ময় জীবের সত্তা থাকে। এই চিন্ময় জীবই ব্রহ্ম। বেদান্তদর্শনে ইহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদ উত্তমরূপে বিচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার চতুর্থ পাদের বিচার বেদান্ত করেন নাই। এই আত্মা যে চতুষ্পাৎ, তদ্বিষয়ে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ বলিতেছেন,—

সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।২॥

এই উপনিষৎ-পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে, আত্মা কিরূপ বস্তু। ইহার প্রথম তিনটী পাদ অবিদ্যা-ঘটিত ব্যবহারিক জীব, শেষ পাদটী চিন্ময় নিত্য-জীব। এই চতুর্থ পাদকে বুঝাইতে যাইয়া শ্রুতি বলিতেছেন,—

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং নপ্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ (মাণ্ডুক্য ॥৭)

ইনিই নিত্য-অক্ষর পুরুষ। ব্যবহারিক জীব না হইলেও ইনি নিত্যজীব। জীবত্ব না থাকিলে, আমিত্ব থাকে না।

কিন্তু "শিবোঽহং" "ব্রহ্মাহমস্মি" "শিবঃকেবলোঽহম্" প্রভৃতি শ্রুতিতে অহংতত্ত্ব স্পষ্টই আছে। মধুসূদন সরস্বতী-বিরচিত 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসারে' জড়-প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে "আমি" দর্শিত হইয়াছে, ইহা নিত্য 'আমি' জীব, ইঁহাকে শিবস্বরূপ বলা হইয়াছে; যথা,—

নভূমির্নতোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্নখং নেন্দ্রিয়ং বা নতেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎসুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃশিবঃ কেবলোঽহং॥১

অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গচ্ছত্যাতঃ।
সদাসর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ॥৪৩॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ ॥৩৫॥

এবংনিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যা বিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥৩৬॥

এই কয়টী শ্লোকের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য 'আত্মবোধ' নামক গ্রন্থে অবিদ্যার পরপারস্থ যে "আমিকে" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইনিই যে সেই সৎ "আমি" এবং ইনিই যে উপাধি-ভেদে বহু হইয়াও স্বরূপতঃ নিরূপাধিক সেই এক ব্রহ্ম-পদার্থ, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আধুনিক মায়াবাদ অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াই "আমি ব্রহ্ম" ইহার অর্থ জীব ও সর্ব্ব-জীবের নিয়ন্তা ভগবান্ এক, বুঝিয়াছে ও সংসারকে বিষম ভ্রমে পাতিত করিতেছে। এই মায়াবাদীদিগের মত এই যে, চৈতন্য অবিদ্যাতে উপহিত হইলে, জীব-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; সেই জীব অবিদ্যা-জাত বুদ্ধি-মন-চিত্তাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ অসংখ্য দুঃখ-জালে বিজড়িত হইয়া যাতায়াত করে। যদি কখনও কোনও মহাপুরুষ কৃপা করেন, তবে জ্ঞান-বলে অবিদ্যা নষ্ট হইলেই জীব ও ব্রহ্ম এক, ইহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন। মোটকথা এইযে, তাঁহাদিগের মতে জীব নিত্য নহে, জীব বলিয়া কোনও একটা বস্তু নাই, ওটা কেবল ইন্দ্রজাল মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম, সেইরূপ ও একটা ভ্রান্তিমাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই বস্তু, সংসারে আর সকলই অবস্তু। ফলে বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়ই ব্রহ্ম, বেদান্তের এই সত্য ব্যাখ্যার দোষে অনর্থজনক হয়। উপাদানকে অলীক বলিলে নিমিত্তেরও কোন সার্থকতা থাকে না; কারণ উহারা পরস্পর সাপেক্ষ; অতএব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ প্রলাপ-বাক্যে কাল-মাহাত্ম্যে সংসারের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক মায়াবাদীগণ এইরূপ মত প্রচার করিয়াছেন।

তাঁহারা শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহা স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শাস্ত্রের কথিত দুইপ্রকার প্রকৃতি তাঁহারাও স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা জীবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র যেরূপ বলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপে ভ্রমে পড়েন, এবং অহঙ্কার-সীমান্তর্ভূত-জ্ঞানের অনধিগম্য ব্রহ্মকে স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য মনে করিয়া চিত্রাজ্যের অপরূপ তত্ত্ব সমূহ দেখিতে পান্না। শ্রীমদ্ভারতী তীর্থ স্বীয় পঞ্চদশীতে নির্ব্বিকার, নিষ্কল, সাক্ষীস্বরূপ, নিত্য, বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জীবকে বুঝাইবার জন্য দ্বিবিধা প্রকৃতি দেখাইয়া বলিতেছেন,—

চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥১৫॥

সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমষ্টিকে প্রকৃতি- বলা হয়; এই প্রকৃতি দুইপ্রকার, মায়া ও অবিদ্যা।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়া-বিদ্যে চতে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥১৬॥

সত্বগুণের নৈর্ম্মল্য হেতু প্রথম প্রকারের নাম মায়া, এবং মালিন্য প্রযুক্ত দ্বিতীয় প্রকারের নাম অবিদ্যা। যিনি সত্বগুণপ্রধানা মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর।

অবিদ্যা বশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণ-শরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥ ১৭

(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক।)

অবিদ্যার বশ যে চৈতন্য, তিনি জীব। অবিদ্যার বিচিত্রতা নিবন্ধন জীবও অনেক প্রকার। অবিদ্যার নাম কারণ-শরীর; ইহাতে অভিমানী জীব সকলকে 'প্রাজ্ঞ' বলা যায়। রামকৃষ্ণ কিন্তু তাঁহার কৃত টীকায় ইহার এইরূপ অর্থ করেন যে,—

অবিদ্যায়া বশগোবিদ্যায়া প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ বিদাত্মাহন্যো জীবঃস্যাৎ স॰ তদ্বৈচিত্র্যাত্তস্যা অবিদ্যায়াউপাধিভূতায়া বৈচিত্র্যাদবিশুদ্ধি-তারতম্যাদনেকধা অনেক প্রকারো দেবতির্য্যগাদি ভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ।

অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, তাহাই জীব, সে সেই অবিদ্যার অধীন। অবিদ্যার নৈর্ম্মল্য ও মালিন্যের তারতম্যানুসারে দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয়।

সমস্ত বেদান্তে অনিত্য-ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিক জীবকেই 'জীব' বলা হইয়াছে; ইনিই ত্বং-পদবাচ্য এবং ঐন্দ্রজালিক ভাণ মাত্র; বস্তুতঃ ইনি সৎ নহেন বা ইহার সত্তা নাই। সত্তা না থাকিলেও একটা সৎ বস্তু ইহার ভিত্তি স্বরূপ আছে; তাহা না থাকিলে কদাচই ইহা সদ্রূপে ভাসমান্ হইতে পারিত না। যে সদ্বস্তুতে ইহার অধিষ্ঠান, ইহা যাহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, সেই বস্তুর সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রতিবিম্ব স্বভাবতঃই যে বস্তু হইতে প্রতিফলিত হয়, তাহার অনেকটা সমান হইয়া থাকে; আপনার ছায়া আপনার আকৃতির সমরূপ হইবেই হইবে, অনেকাংশে তদ্ধর্ম্মীও হইবে। যেমন সর্পের সহিত রজ্জুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়াই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, স্থাণুর সহিত মনুষ্য-মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে, সেই জন্যই স্থাণুতে মনুষ্য-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। এক্ষণে যে বস্তুর প্রতিবিম্ব এই মিথ্যা "আমি"—

তাহা কি, দেখা যাক। স্থূলাদি শরীর সমূহের সাক্ষী স্বরূপ প্রপঞ্চাতীত বলিয়া ইনি সৎ, এবং স্থিরমনে বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, একমাত্র জ্ঞানই সৎ; অতএব ইনি চিন্ময় বা জ্ঞানস্বরূপ; আবার সত্তাতেই সুখ, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। কেবল আমিত্বের সত্তা বজায় রাখিবার বা বাঁচিয়া থাকিবার জন্যইত আমাদিগের চেষ্টা ও এত শ্রম। জীবিত থাকা যদি সুখকর না হইত, অস্তিত্বই যদি আনন্দময় না হইত, তাহা হইলে কখনও কোনও জীব জীবনের জন্য ব্যস্ত হইত না। অতএব ইহাও দেখা গেল যে, ইনি আনন্দময়। এই যে নিত্যজ্ঞানময়, আনন্দময় "আমি"—ইহার সত্তাতে প্রাতিভাসিক "আমি"ও আপনাকে সৎ মনে করে; ইহার জ্ঞানেতেই অনিত্য অবিদ্যান্তরস্থ "আমি" আপনাকে জ্ঞানী মনে করে, এবং ইহার আনন্দেতেই ত্রিতাপ-দগ্ধ 'আমি"ও আপনাকে সুখী বিবেচনা করিয়া থাকে। ব্যবহারিক আমির নিজের ওরূপ একটিও গুণ নাই; পরন্তু সমস্তই বিপরীত—ছায়া মাত্র বলিয়া ইহা মিথ্যা, এবং চিন্ময়ের বা জ্ঞানের ছায়া বলিয়া ইনি তমঃপ্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যাস্বরূপ; এবং অবিদ্যা হইতে অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ-প্রভৃতি ক্লেশ সমূহ জাত হওয়ায়, ইহা ত্রিবিধ তাপে সর্ব্বদা সন্তপ্ত। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী হইয়াও, যে বস্তুর ইহা ছায়া, তাঁহার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেই জন্যই ব্যবহারিক জীবও আপনাকে আমি আছি, আমি সকল জানিতেছি; অতএব আমি জ্ঞানী, এবং আমি সুখী, এই প্রকার অনুভব করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

রাশিচক্রবর্ণন।

৫ম বর্ষ-হিন্দু-পত্রিকার ৩৪৬ পৃষ্ঠাস্থিত রাশিচক্র আকাশে স্থাপন করিয়া দক্ষিণাস্যে বসিয়া রাশিচক্র দৃষ্টি কর। কর্কটক্রান্তি উত্তর দিকে স্থাপন কর। মকরক্রান্তি দক্ষিণে পড়িল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু পশ্চিমে রহিল। জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু পূর্ব্বদিকে রহিল। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি মিথুন ও কর্কটরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মকরক্রান্তি ধনু ও মকররাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। মহাবিষুপ সংক্রান্তি মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি কন্যা ও তুলারাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত আছে। রাশিচক্রের এই ন্যাস (চিত্র) ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ৫২০ শকাব্দে বর্ত্তমান হিন্দু পঞ্জিকা প্রকটন কালে দৃশ্যমান ছিল।

* রাশিচক্রের এই ন্যাসে যে রেখা মহাবিষুপ সংক্রান্তি, জলবিষুপ সংক্রান্তি যোগ করিতেছে, ঐ রেখাকে বিষুপরেখা বলে; এবং ঐ ন্যাসস্থিত বৃহত্তম বৃত্তটীকে অয়নমণ্ডল বা রবিমার্গ বলে। ঐ অয়নমণ্ডলের যে অর্দ্ধবৃত্ত বিষুপরেখার উত্তরে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে উত্তরধনু বলে, এবং অয়নমণ্ডলের যে বৃত্তার্দ্ধ বিষুপরেখার দক্ষিণে অবস্থিত, ঐ বৃত্তার্দ্ধকে দক্ষিণ ধনু বলে। কর্কটক্রান্তি বা উত্তরক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের উত্তম স্থানে, এবং মকরক্রান্তি বা দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু অয়নমণ্ডলের অধম স্থানে। উত্তর ধনু স্বর্গ এবং উত্তরক্রান্তি-বিন্দু স্বর্গ-রাজধানী; এবং দক্ষিণ ধনু পাতাল এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু পাতাল-রাজধানী।

বিষুপরেখা মর্ত্ত্যলোক। বিষুপরেখা হইতে ধ্রুববিন্দু পর্য্যন্ত ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যঃ, এই সপ্ত স্বর্গ স্থাপিত; এবং বিষুপরেখা হইতে পরধ্রুব বা যাম্যধ্রুব পর্য্যন্ত অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল, রসাতল, এই সপ্ত পাতাল স্থাপিত।

ভূতল বিষুপরেখায় অবস্থিত। সপ্ত স্বর্গের উপর ধ্রুবস্থানে ধ্রুবলোক। তদুত্তরে যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, এই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।

এই স্বর্গ-রাজধানীতে অর্থাৎ বসুদেব (*) আলয়ে সূর্য্যদেব (দেবরাজ ইন্দ্র) শ্রীকৃষ্ণ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বসু পুত্র বলিয়া ইন্দ্রের বাসব নাম, এবং বসুদেব-পুত্র বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব নাম। একই বসু। 'কশ্যপো বসুদেবোঽভূৎ' বচনটী স্মরণ কর। তবে পার্থক্য এই যে, ইন্দ্রদেব সত্যযুগের সূর্য্য-নামান্তর (১) এবং শ্রীকৃষ্ণদেব দ্বাপর যুগের সূর্য্যাবতার। কিন্তু ধ্রুববিন্দু মণ্ডলাকার পথে কদম্ব-বিন্দু প্রদক্ষিণ করে, এই গতিগুণে উত্তরক্রান্তিবিন্দু, দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু, মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এবং জল-বিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু এই চারিটী বিন্দু ১৩ $\frac{১}{৩}$ + ৭৫ = ১০০ বৎসরে একটী নক্ষত্র অপক্রমণ করে। এবং ৩০ + ৭৫ = ২২৫০ বৎসরে এক রাশি অপক্রমণ করে। যথা পঞ্জিকার ২২৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তরক্রান্তি-বিন্দু বা কর্কট-ক্রান্তি-বিন্দু কর্কট ও সিংহ রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ-ক্রান্তি বিন্দু মকর ও কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু মেষ ও বৃষরাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল, এবং জলবিষুপ সংক্রান্তি-বিন্দু তুলা ও বৃশ্চিক রাশির সন্ধিস্থলে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি-বিন্দুতে উত্তরসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত ছিল। রাশিচক্রটী ৩০ অংশ ঘুরাইয়া উত্তরে অশ্লেষা নক্ষত্র স্থাপন কর। দক্ষিণে ধনিষ্ঠা পড়িল, এবং কিরীটি-মণ্ডল প্রমুখ রেখাটী একণে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিষুপরেখা হইল। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ বিষুপরেখার এই অপসরণকে সমরাত্রি-বিন্দুদ্বয়ের আক্রমণ নাম দিয়াছেন। (Precession of the

(১) পুনর্ব্বসু নক্ষত্র
(১) ঋক্ ১।১০২।৮ ঋক্ ১।১২১।২

Equinoxe) অপক্রমণ ব্যাপারটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। উত্তরক্রান্তি-বিন্দু হইতে দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দু ১৮০ অংশ দূরে অবস্থিত আছে। উত্তরক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম অদিতি এবং দক্ষিণক্রান্তি-বিন্দুর পৌরাণিক নাম দিতি। পঞ্জিকার ১৮০+৭৫= ১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে দিতিবিন্দু উত্তরধনুর উত্তম স্থানে উত্তরক্রান্তিরূপে অবস্থিত ছইল এবং অদিতি-বিন্দু দক্ষিণ ধনুর অধম স্থানে দক্ষিণক্রান্তিরূপে অবস্থিত ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

রাসলীলা-উপলক্ষ্যে তুলা রাশির সংক্রান্তি-বিন্দুতে শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আসিয়াছেন। সম্মুখে বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এবং মেষ রাশি এবং ঐ সকল রাশিস্থিত নক্ষত্র। এই সকল রাশি ও নক্ষত্র-ঘটিত লীলা নিচয় পুনর্যাত্রায় বর্ণিত হইবে। আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত রাশি-নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া নন্দালয়-দ্বারে মেষ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে (১) উপনীত হইলেন। সম্মুখে বৃষ রাশিস্থ নন্দালয়, এবং নন্দালয়ে দেবমাতৃকা ষট্ কৃত্তিকা এবং রোহিণী দেবী বিরাজমানা। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মমণ্ডলে (২) স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মা আসীন। ব্রহ্মার মস্তকে প্রজাপতি-তারক, উরোদেশে ব্রহ্মহৃৎতারক। পশ্চিম কুক্ষিতে অগ্নিস্তারক। এই ব্রহ্মাই নন্দরাজ, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ষট্কৃত্তিকা যশোদা দেবীর ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন, এবং বলদেব রোহিণী দেবীর ক্রোড় আশ্রয় করিলেন। আজ নন্দরাজ-ভবনে নন্দোৎসব উপস্থিত। স্বর্গীয় বৃন্দাবনে নব বর্ষাগমে জগৎময় গোপ-গোপীগণ হর্ষে পুলকিত। বৃন্দাবন দ্বাদশ মহাবনে বিভক্ত; (৩) মধ্যে যমুনা নদী, যমুনার পশ্চিম ভাগে সপ্ত মহাবন, এবং যমুনার পূর্ব্বভাগে পঞ্চ মহাবন। একবার গোলোকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিবে, নদী-রূপা ছায়াপথের পশ্চিমভাগে মিথুন-বীথী হইতে ধনু-বীথী, এই সপ্ত বীথী সপ্ত মহাবন রূপে অবস্থিত, এবং পূর্ব্বভাগে কর্কট-বীথী হইতে বৃশ্চিকবীথী, এই পঞ্চবীথী পঞ্চ মহাবনরূপে অবস্থিত। পুরাণ মতে বৃন্দাবনের অধীশ্বর মহীভানুসুত বৃষভানু বা বৃষরাশিস্থ ভানুদেব নন্দরাজ গোলকের অধিপতি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণমতে ধাত্রী-পত্নী

---

(১) বর্ত্তমান ১৮২০ শকাব্দে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পদান্তে মহাবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দু অবস্থিত আছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ বিন্দু ৫০ অংশ দূর পূর্ব্বে কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পদান্তে অর্থাৎ বৃষরাশির প্রথম অংশে অবস্থিত ছিল।

(২) ঔরিক মণ্ডল Auriga Constellation.

(৩) ১২ মহাবন প্রধানং দ্বাদশারণ্যং মাহাত্ম্যং কথিতং ক্রমাৎ।
পূর্ব্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
ইতি পাদ্মে পাতাল খণ্ডে ১ম অধ্যায়।

জটিলা-গর্ভে পুত্র আয়ান এবং কুটিলা ও যশোদা (৪) কন্যাদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন; এবং যশোদা-গর্ভে বাসুদেব মহামায়ার সহিত যমজ ভাবে জন্মগ্রহণ করিলেন (৫) উভয় বাসুদেব একত্রীভূত হইয়া পূর্ণাবতার (৬) হইবে। কিন্তু পুরাণান্তর মতে গোল-পত্নী জটিলা-গর্ভে পুত্র অভিমন্যু এবং গোল-ভগ্নী পাটলী-গর্ভে যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। পরিষ্কৃত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত হইলে, পুরাণ মধ্যে এরূপ মত-ভেদ ঘটিবার সম্ভব হইতনা। মূল বিষ্ণুপুরাণে শ্রীরাধার এবং আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যুর নাম মাত্র উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রূপক-ভঙ্গ-ভয়ে প্রথমে শ্রীরাধাদির নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল গোপ-গোপী (তারক তারকা) সহ কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণন করা হইয়াছিল। ক্রমে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন লোপ হইতে লাগিল এবং রূপক ভঙ্গের আশঙ্কা ক্রমে কমিতে লাগিল। পরবর্ত্তী পুরাণকারগণ ক্রমে নক্ষত্রাদির নাম প্রকাশে সাহস পাইতে লাগিলেন। জাতীয় জ্ঞান তিমিরাবৃত হইল। কুসংস্কার ভারত অধিকার করিল।

ক্রমে রূপকের কলেবর পর পর পুরাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রধানা গোপীর আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধার নাম প্রস্ফুটিত হইল, এবং বলা হইল, আদ্যাশক্তি শ্রীরাধা আয়ানপত্নী, এই প্রবাদ মাত্র রটনা হইবে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকার এই কলঙ্কের প্রতিপ্রসব স্বরূপ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিবাহ দিলেন; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার রাশিচক্রের মালা নাম দিলেন, এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়ন-মণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু উৎপন্ন হইল, এবং ঐ জটিলা-গর্ভে ষট্কৃত্তিকা যশোদা দেবী জন্মগ্রহণ করিলেন) কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার শ্রীরাধার কলঙ্কের সার্থকতা রক্ষার জন্য আয়ান গোপের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু শ্রীরাধার সতীত্ব রক্ষার্থে আয়ান-ক্রোড়ে ভাগিনেয় শ্রীকৃষ্ণকে অধিষ্ঠিত রাখিলেন, এবং বিবাহ কালে শ্রীকৃষ্ণ আয়ানকে ক্লীবত্ব দিলেন (৭)। কোন পুরাণকার স্বজনতা-দোষ পরিহারার্থে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত অংশাবতারের পক্ষপাতী হইলেন। বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণকার রাশিচক্রের মাল্যক নাম দিলেন। কোন পুরাণকার গোল নাম দিলেন। উভয় পুরাণে জ্যোতির্ব্বিদ্যার নাম জটিলা রাখিলেন। রাশিচক্র ও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সংযোগে অয়নমণ্ডল (আয়ান, রায়ান বা অভিমন্যু) উৎপন্ন হইল। গোলকস্থ অয়নমণ্ডলের উর্দ্ধোপরি যে রাধানক্ষত্র ছিল, সেই রাধানক্ষত্র যেখানকার সেইখানেই রহিল। এস্থলে ব্রজধামের বিবরণ এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(৪) কোষিলে বর্ষিতবস্য বালিস্যা জটিলা পিতেঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ উত্তরখণ্ড—আয়ানো বর্জরঃ সুতঃ ১৬।১০–১৩
যশোদা কুটিলা রাজন্ প্রভ কর্য্যভিধা যসা।

(৫) সুষুবে মিথুনং রাজ্ঞী কন্যামেকাং সুতদ্বয়ং। ৮।১১৪

(৬) বিষ্ণোরংশাংশ-সম্ভূতং চরিতং জগতাং হিতং। বিষ্ণুপুরাণ ৫।১।৪
অবতীর্ণো হি ভগবান অংশেন জগদীশ্বরঃ। ১০।৩৩।৩০

(৭) আয়ানাঙ্গ কৃষ্ণস্ত পুংস্ত্বাদপনয়ৎ তদা। শ্রীমদ্ভাগবত ১৫।৩৩

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। | আষাঢ়। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গোলকে সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পুরাণকারগণ স্ব স্ব যুক্তি ও রুচি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা পর্য্যায়ক্রমে গঠন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা রাশি ও নক্ষেত্রগণের অবস্থিতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন মাত্র করিব। তুলনা দ্বারা পরীক্ষা করণ জন্য পৌরাণিক ও জ্যোতিষিক লীলার ক্রমিক নির্ঘণ্ট দৃষ্টি করিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬
বিষ্ণুপুরাণ। ৫ম অংশ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ। অধ্যায়।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।	জ্যোতিষমতে নক্ষত্র ও গ্রহ।	শ্রীকৃষ্ণলীলা।
৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	৩	শ্রীকৃষ্ণের জন্ম	দহনদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র	যশোদা ক্রোড়ে
৫	পূতনাবধ	৬	পূতনাবধ	কমলজদৈবত রোহিণী নক্ষত্র	শকটভঞ্জন
৬	শকট পরিবর্ত্তন	৭	শকটভঞ্জন	বৃষরাশি	অরিষ্টবধ বা গো বৎস হরণ
৬	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	৭	তৃণাবর্ত্তবধ	সোম দৈবত মৃগশিরা	•
৭	কালীয়দমন	৯	শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন	রুদ্রদৈবত আর্দ্রা	•
৮	ধেনুকবধ	১০	যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন	মিথুনরাশি	রাহু বা প্রলম্ববধ

৯	প্রলম্ববধ	১১	বৎসাসুর বধ	অদিতি দৈবত	শ্রীকৃষ্ণ-জ
		১১	বকাসুর বধ	পুনর্ব্বসু	
১১	ইন্দ্রযুদ্ধ	১২	অঘাসুরবধ	জীবদৈবত পুষ্যা	•
১৩	গোবর্দ্ধন ধারণ	১৩	গো বৎস হরণ	ফণীদৈবত অশ্লেষা	কালীয় দ
১৪	রাস বর্ণন	১৫	ধেনুক বধ	কর্কটরাশি	চাণূর ব
১৬	অরিষ্টবধ	১৬	কালীয় দমন	যমদৈবত মঘা	পূতনা
১৭	কেশী বধ	১৭	দাবাগ্নি ভক্ষণ	যোনিদৈবত পূর্ব্বফল্গুণী বা অর্জ্জুনী	যমলার্জ্জু ভঞ্জ
১৯	অক্রূর প্রেরণ	১৮	প্রলম্ব বধ	সিংহরাশি	বস্ত্রহর
১৯	মথুরা প্রবেশ	১৯	দাবাগ্নি ভক্ষণ	অর্য্যমাদৈবত উত্তর ফল্গুণী বা অর্জ্জুনী	যমলার্জ্জু ভঞ্জ
১৯	রজক বধ	২২	বস্ত্রহরণ	দিনকৃৎদৈবত হস্তা	চন্দ্রাবলীস
১৯	মালাকার-গৃহে গমন	২৪	ইন্দ্রযুদ্ধ	কন্যারাশি	বৎসাসুর
২০	অনুলেপন গ্রহণ	২৫	গোবর্দ্ধন ধারণ	তষ্টৃদৈবত চিত্রা	চিত্রলেখাস
২০	ধনুশালাপ্রবেশ	২৮	নন্দ মোচন	পবনদৈবত স্বাতী	তৃণাবর্ত্তঅসুর
২০	রঙ্গপ্রবেশ	২৯	রাসলীলা	তুলারাশি	ধেনুক
২০	কুবলয়পীড় বধ	৩৪	সুদর্শন মোচন	শক্রাগ্নিদৈবত রাধা বা বিশাখা	রাধাকৃ বিব
২০	চাণূরমুষ্টিকবধ	৩৪	শঙ্খচূড় বধ	মিত্রদৈবত অনুরাধা	সুদর্শনমো
২২	জরাসন্ধ পরাজয়	৩৭	কেশী বধ	শক্রদৈবত জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্র
২৩	কাল যবন বধ	৩৭	ব্যোমবধ	বৃশ্চিক রাশি	অঘাসুর
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণলীলা—		৩৮	অক্রূর প্রেরণ	রাক্ষসদৈবত মূলা	০
জন্মখণ্ড অধ্যায়		৪১	মথুরাপ্রবেশ	তোয়দৈবত পূর্ব্বআষাঢ়া	•
৭	শ্রীকৃষ্ণবলরামের জন্ম	৪১	রজকবধ	বিরিঞ্চিদৈবত উত্তরাষাড়া	•
১০	পূতনা মোক্ষণ	৪১	মালাকারগৃহে গমন	ধনুরাশি	কেশী
১১	তৃণাবর্ত্ত বধ	৪২	অনুলেপন গ্রহণ	শ্রীহরিদৈবত শ্রবণা	০
১	২	৩	৪	৫	৬
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ জন্মখণ্ড অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণলীলা	শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ অধ্যায়	শ্রীকৃষ্ণলীলা	জ্যোতিষ মতে নক্ষত্র ও গ্রহ	শ্রীকৃষ্ণলী •
১২	শকটভঞ্জন	৪২	ধনুশালা-প্রবেশ	বসুদৈবত ধনিষ্ঠা	কুব্জামি লেপন গ্র

১৪	যমলার্জ্জুন ভঞ্জন	৪৩	কুবলয়পীড়বধ	মকররাশি	দাবাগ্নি ভক্ষণ
১৫	রাধাকৃষ্ণ বিবাহ	৪৪	চাণূরমুষ্টিক বধ	বরুণদৈবত শতভিষা	মালাকারগৃহে গমন
১৬	বকাসুর বধ	৪৪	কংশবধ	অজপাদদৈবত পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	ধনুর্ভঙ্গ
১৬	কেশীবধ	৪৪	দৈবকী-বসুদেব-মোচন	কুম্ভরাশি	রজকবধ ও কংশবধ
১৬	প্রলম্ববধ	৪৯	পঞ্চজন বধ	অহিব্রধ্নদৈবত উত্তরভাদ্রপদ	ব্যোমবধ
১৯	কালীয় দমন	৫০	জরাসন্ধ বিজয়	পুষাদৈবত রেবতী	কুবলয়পীড়বধ
১৯	দাবাগ্নিভক্ষণ	৫১	কালযবন বধ	মীনরাশি	মুষ্টিক বধ
২০	গো-বৎস হরণ			অভিজিৎ	•
২১	ইন্দ্রযুদ্ধ			বুধগ্রহ	বৎসাসুর বধ
২১	গোবর্দ্ধন ধারণ			শুক্রগ্রহ	মুষ্টিক বধ
২২	ধেনুক বধ			অমা সোমগ্রহ	কুবলয়পীড়বধ
২৭	বস্ত্রহরণ			মঙ্গল গ্রহ	দাবানল ভক্ষণ
২৮	রাসলীলা বর্ণন			বৃহস্পতি গ্রহ	চাণূর বধ
৭০	অক্রূর প্রেরণ			শনিগ্রহ	ধেনুক বধ
৭২	মথুরাপ্রবেশ			রাহুগ্রহ	প্রলম্ববধ
৭২	কুব্জাপ্রসাদ			কেতুগ্রহ	কেশীবধ
৭২	মালাকার গৃহে প্রবেশ			অগ্নিপিণ্ড উল্কাপতন	দাবাগ্নিভক্ষণ
৭২	রজক নিগ্রহ			মহাবিষুপ সংক্রান্তি	অক্রুর-প্রেরণ জরাসন্ধবিজয়
৭২	ধনুর্ভঙ্গ			রাত্রিবিনাশ	কালযবনবধ
৭২	গজনিধন			কদম্ববিন্দু-আরোহণ	বস্ত্রহরণ
	মল্লনিধন			কার্ত্তিকী পূর্ণিমা	রাসলীলা
				উত্তর ক্রান্তি	রথযাত্রা
				দক্ষিণায়ন	ঝুলন যাত্রা

( ) শূন্য চিহ্নিত রাশি ও নক্ষত্রের লীলা পরে বর্ণিত হইবে।

যশোদা দেবীর ক্রোড় হইতে গোপতি আদিত্যদেব অয়ন-ব্রজে যাত্রা করিলেন; সম্মুখে শকটাকৃতি পঞ্চতারকময় রোহিণীনক্ষত্র অতিক্রম করিলেন, অমনি শকট-ভঞ্জন হইল। সম্মুখে নদীরূপা ছায়াপথ। পথের পশ্চিমতীরে উজ্জ্বল লুব্ধক বা শৃগালরাজ তারক। পশ্চিমদিকে অনন্তদেব জলসর্প (Hydra) পশ্চিমাভিমুখে ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণদেব বলদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! এই নদীরূপা ছায়াপথ, ঐ শিবাতারা এবং ঐ ফণাধারী অনন্তদেবকে তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? বলদেব উত্তর করিলেন—পূজ্যপাদ বসুদেব তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার জন্ম-রাত্রিতে এই ছায়াপথরূপী যমুনা অতি কষ্টে পার হইয়াছিলেন। অন্ধকার রজনীতে কেহই পথ প্রদর্শক সঙ্গী ছিল না। কেবল ঐ শিবাতারার আলোকে তিনি নন্দালয় চিনিতে পারিয়া ছিলেন, এবং আমি ভ্রাতৃবাৎসল্য হেতু তোমার শিরোপরে ফণা ধারণ করিয়া প্রাবৃট কালের জলধারা হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এক্ষণে সতত তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য এই রৌহিণেয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছি; এবং যত কাল তুমি এই ব্রজে গোচারণ করিবে, তোমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিব। শ্রীকৃষ্ণ বলরামে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমত সময়ে অরিষ্ট অসুর বৃষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজমাঝে উপনীত হইল। শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অসুর সমাগত হইয়াছে। অমনি শ্রীকৃষ্ণ স্বতেজ প্রকাশ করিয়া বৃষ সংহার করিলেন। এই লীলা কেবল বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকারগণ দেখিলেন, বৃষ-বধে রুদ্রদেব রুষ্ট হইবেন। গতিকে অরিষ্ট-বধলীলা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে ব্রহ্মমণ্ডলস্থ প্রজাপতি কর্ত্তৃক বালার্করূপ সুকোমল নব প্রসূত গো-বৎস হরণের লীলা প্রকটন করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মমণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ তারক বালার্ক অপ্রতিভ করিতে সমর্থ হইলেও আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ নূতন গো-বৎসমালা মায়াবলে প্রকাশ করিলেন। নিমেষ মধ্যে নব নব গো-বৎস বা বালার্ক লক্ষ২ সৃষ্ট হইল। আদিত্য-কিরণাগ্নিতে ব্রহ্মাগ্নি-নির্ব্বাণ হইল। প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রতিভাশূন্য হইয়া আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। বৎসহরণলীলা সমাপ্ত হইল।

ভ্রম সংশোধন।

২২৩ পৃষ্ঠা (১) গায়ত্রী স্থলে (১) গায়ত্রী ঋক্ ৩।৬২।১০

২৯১ পৃষ্ঠা ১০ম ছত্রে

(Sagitta) তারক শোভা পাইতেছে স্থলে

(Cygnus.) তারক এবং বাণ (Sagitta) তারক রুদ্র ধ্বজরূপে এবং শিব বাহনরূপে হরি দৈবত (Aquila) তারক শোভা পাইতেছে।

৩২৪ পৃষ্ঠা টীকা (২) Lynx or canis minor স্থলে

(২) লুব্ধক তারক (Sirius in canis majoris)

৩৪৮ পৃষ্ঠা টীকা—(৫) অনুরাধার দ্বিতীয় তারা ইত্যাদি স্থলে

(৫) জ্যেষ্ঠার দ্বিতীয় তারা পারিজাত লোহিত বর্ণ বলিয়া জ্যেষ্ঠার রঙ্গদেবী নাম। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ পারিজাতকে মঙ্গল সম (Antares) বলেন।

বামন অবতার।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে প্রতিব্যাঃ সপ্ত ধা-মভিঃ। ঋক্ ১।২২।১৩

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূলহ মস্য পাং সুরে। ঋক্ ১।২২।১৭

ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যঃ অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্।

বঙ্গার্থ। বিষ্ণু গায়ত্রী আদি সপ্ত ছন্দের সহিত যে স্থান হইতে পরিক্রমণ (পদ-স্থাপন) করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। ১৬

বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমণ করিয়া ছিলেন। ত্রিপাদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই রজোযুক্ত পদে জগৎ আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ১৭

পালক বিষ্ণু ত্রিপাদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সেই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ দ্বারা ধর্ম্মকে ধারণ করেন। ১৮।

নিরুক্তকার মহর্ষি শাকপূণি এই তিন ঋকের এইরূপ টীকা লিখিয়াছেন যথা - বিষ্ণুরাদিত্যঃ। পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিতি ইতি।

অর্থাৎ বিষ্ণু আদিত্যদেব।

আদিত্যদেবের পদ-স্থাপনের স্থল পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গ। আচার্য্য ঔর্ণাভ ঐ টীকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আদিত্যদেব, পার্থিব অগ্নি স্বরূপে পৃথিবীতে, বৈদ্যুত ভাবে অন্তরীক্ষে এবং সূর্য্যরূপে স্বর্গে পাদ স্থাপন করেন। অর্থাৎ উষাকালে উদয়-গিরিতে উদয়-পদ, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে বিষ্ণুপদ এবং সন্ধ্যাকালে গয়শিররূপ অস্ত-গিরিতে অস্তপদ, আদিত্যদেবের এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ বুঝিতে হইবে।

জোতির্ব্বিদগণ আদিত্যদেব শ্রীহরির এই ত্রিপাদ-বিক্ষেপ ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া শরাকার তারাত্রয়াত্মিকা শ্রবণানক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা শ্রীহরি নির্ব্বাচন করিলেন। শ্রবণানক্ষত্র, ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর সাকার রূপ ধারণ করিল। কিন্তু পরম পুরুষের বিরাট মূর্ত্তির সহিত শ্রবণামূর্ত্তির তুলনা করিলে, শ্রবণামূর্ত্তি শ্রীহরির বামনরূপ বলিতে হয়। ত্রি-বিক্রম-নক্ষত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে বলি নিভ (*) অনুরাধানক্ষত্র অবস্থিত। বলি রূপ অনুরাধা নক্ষত্র একণে উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে ১৫৩ অংশ দূর পূর্ব্বে ঐ দৈবকী

(*) বলি নিভ তারাচতুষ্টয়াত্মিকাঃ ইতি দীপিকা টীকা

নক্ষত্র সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিদগণের এই একটী বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়।

বিষুপ মণ্ডলের দক্ষিণে অবস্থিত আছেন। ১৫৪ × ৭৫ = ১১৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বলিরাজ স্বর্গ রাজ্যে বিরাজমান ছিলেন। কিন্তু উত্তর ক্রান্তিবিন্দু এই ১১৫৫০ বৎসর ক্রমে অপক্রমণ করিতেছে। ৯০ × ৭৫ = ৬৭৫০ বৎসরে বলিরাজ উত্তরক্রান্তি বিন্দু হইতে জলবিষুপ সংক্রান্তিতে নামিয়া ছিলেন। পরে দৈবকী বিষুপরেখার দক্ষিণে নামিয়া ৬৪ × ৭৫ = ৪৮০০ বৎসরে দক্ষিণক্রান্তির অদূরে আসিয়াছেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকগণ বামন অবতারের মনোহর রূপক রচনা করিয়াছেন। দেবগণ দৈত্যসমরে পরাভূত হইয়া স্বর্গরাজ্য হারাইয়া পাতাল ভূতলে দীন হীন ভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আদিত্য দেব নারায়ণের শরণ লইলেন। আদিত্যদেব নারায়ণরূপে দৈত্যরাজ বলির নিকট ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা মাগিলেন। পরম বৈষ্ণব প্রহ্লাদ-পৌত্র বলিরাজ তথাস্তু বলিবা মাত্র চতুরচূড়ামণির বামন বেশ তিরোহিত। বিরাট পুরুষ এক পদ স্বর্গে, এক পদ মর্ত্ত্যে স্থাপন করিলেন, এবং বক্ষস্থল হইতে তৃতীয় পদ বাহির করিয়া বলিরাজকে বলিলেন তৃতীয় পদের স্থান কোথা? বলিরাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া মস্তক পাতিয়া দিলেন। তৃতীয়পদ বলিরাজ-শিরে স্থাপিত হইল। বলিরাজ পাতালে চলিলেন। আবার পুনর্ব্বসু নক্ষত্র-স্থিত বসুদেবগণ অশ্বিদ্বয় আদি দেবগণ সহ স্বর্গীয় বিষুপরেখার উত্তরে আসিয়া স্বর্গ-রাজ্য লাভ করিয়াছেন। রাশিচক্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাইবে, অদ্যাপি শ্রবণানক্ষত্রস্থ বামনদেব বলিরাজের মস্তকোপরি যেন একপদ স্থাপন করিয়া ক্রমে বলিরাজের সাপে সাপে পাতালে যাইতেছেন। রূপকটি সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহী বটে। কিন্তু ভগবানে ছলনা-আরোপ ভক্তির লাঘবকর। তবে দৈত্যকে দেবতুল্য ভক্তিভাজন করায় দোষ নাই। কারণ রাশিচক্রের গতিগুণে সুর ও অসুরগণ পর্য্যায়-ক্রমে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইতেছেন। এইজন্য পৌরাণিকগণ অসুরগণকে দেবযোনি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, এবং সেইসুরে অমর সিংহ বলিলেন,—

শুক্রশিষ্যা দিতিসুতাঃ পূর্ব্বদেবাঃ সুরদ্বিষঃ"

আর ১১৬ × ৭৫ = ৮৬৮০ বৎসরে আবার বলিরাজ বিষুপরেখার উত্তরে দেবোচিত স্বর্গরাজ্যে উঠিবেন।

তারাহরণ।

প্রাচীন কালে রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত। বৃহস্পতি দ্বাদশ রাশি দ্বাদশ বৎসরে পরিভ্রমণ করেন। এই বৎসরের নাম বার্হস্পত্য বৎসর ছিল, এবং এই পরিভ্রমণ ব্যাপার এক যুগে—অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরে সমাধা হইত। মীনরাশি হইতে বার্হস্পত্য যুগ-বৎসরের আরম্ভ হইত, এবং কুম্ভ রাশিতে যুগ-বৎসর শেষ হইত; এবং এই যুগাবসানে হিন্দুজাতি হরিদ্বারে মহা সমারোহ-ময় যে উৎসব করিতেন, ঐ উৎসব কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি গ্রহের অবস্থিতিকালে

হইত বলিয়া ঐ উৎসবের নাম "কুম্ভ-মেলা" হইয়াছে। এই বৎসর গণনায় বৃহস্পতির প্রতি তারা ভোগকাল নিয়মিত ছিল। এজন্য বৃহস্পতি তারাপতি নাম পাইয়াছিলেন, এবং দেবগণের মধ্যে বৃহস্পতি প্রধান হইয়াছেন বলিয়া বৃহস্পতির নাম দেবগুরু হইল। ক্রমে চান্দ্রমাস এবং চান্দ্র বৎসর গণনার সূত্রপাত হইল, এবং চন্দ্র ঐ রূপ নক্ষত্র ভোগে তারাপতি নাম পাইলেন। চন্দ্র ২৭১/২ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭১/২ দিনে একমাস গণনা হইত। এইরূপ দ্বাদশ চান্দ্রমাসে অর্থাৎ ৩৩০দিনে বৎসর গণণা হইত। এই ৩৩০দিনে রুদ্রদেব একাদশ রাশি পরিভ্রমণ করেন। দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণে সৌর বৎসর হয়। এজন্য সূর্য্য দ্বাদশ আদিত্যদেব এবং একাদশ রুদ্রদেব বলিয়া বর্ণিত হইলেন; এবং সোমদেব রুদ্রদেবের অষ্ট মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি বলিয়া রুদ্রদেবও তারাপতি নাম পাইলেন। এইরূপ বৃহস্পতির তারাপতিত্ব-পদে চন্দ্রদেব অধিষ্ঠিত হইলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে পৌরাণিকগণ বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারার চন্দ্র কর্ত্তৃক অপহরণের রূপক রচনা করিলেন; এবং তারাগর্ভে বুধের উৎপত্তি রচনা করিলেন। কিন্তু একটু মনোনিবেশ করিয়া তারাহরণ উপাখ্যান পাঠ করিলে, এই উপাখ্যান রূপক মাত্র, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। তারা কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি হইলে, বুধের নাম তারানন্দন বা তারাসুত হইত; কিন্তু বুধের নাম রোহিণী-পুত্র রৌহিণেয়। ইহাতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারা কোন নির্দ্দিষ্ট তারকা নহে। রোহিণী আদি ২৭নক্ষত্র। তবে বার্হস্পত্য বৎসর গণনা সময়ে বুধগ্রহের আবিষ্কার হয় নাই। চান্দ্র বৎসর গণনা কালে বুধগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল; এবং বুধগ্রহের আবিষ্কারের পরে পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা প্রচলিত হইল বলিয়া চন্দ্রদেব গুরু বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু পুত্রটী চন্দ্র গ্রহের রহিল। হিন্দু-জাতি জ্যোতিষ-বিদ্যানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া, এই রূপকের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণে এবং এই রূপকের মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া বিমল চন্দ্রদেবে কলঙ্ক-আরোপ করিতেছেন। পুনর্ব্বার বার্হস্পত্য বৎসর গণনা কালে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী হইতে কৃষ্ণ-চতুর্থী পর্য্যন্ত একপক্ষ গণনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া ঐ পক্ষ 'নষ্ট চন্দ্র' নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

গর্ভাধান-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণিপিংষতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতুতে।১।

অন্বয়। (হে বধু!) বিষ্ণুঃ (তব) যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা চ রূপাণি পিংষতু, ধাতা

প্রজাপতিঃ তে গর্ভং দধাতু ।১।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বধু! অয়ি ভার্য্যে! বিষ্ণুঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং কল্পয়তু প্রসবসমর্থাং করোতু। ত্বষ্টা দেববিশেষঃ তে তব রূপাণি পিংষতু প্রকাশয়তু। তথা প্রজাপতিঃ দেববিশেষঃ তব যোনিং প্রসবদ্বারং আসিঞ্চতু। যাবন্মাত্রেণ বীজেন গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তাবন্মাত্রমেব বীজং তত্র প্রক্ষেপয়তু ইতি বিশদার্থঃ। তথা ধাতা আদিত্যঃ তে তব গর্ভং দধাতু, যেন প্রকারেণ তব গর্ভঃ সম্পদ্যতে, তথা করোতু ইত্যর্থঃ ।১।

বঙ্গানুবাদ। অয়ি বধু! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার যোনিকে প্রসব সমর্থ করুন। (অর্থাৎ তোমার গর্ভধারণ-প্রতিবন্ধক কোনও যোনিপীড়া যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রশমন করুন) ভগবান্ সূর্য্যদেব তোমায় শরীর-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত করুন। (স্ত্রীলোকের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট না হইলে গর্ভসঞ্চার হয় না, একারণ দেবতার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট করিয়া তোমাকে গর্ভধারণক্ষমা করিয়া দিউন্) ভগবান্ বিধাতা, যে পরিমাণ শুক্রদ্বারা তোমার গর্ভসঞ্চার হইতে পারে, তৎ-পরিমাণ শুক্র তোমর যোনিতে পাতিত করুন, এবং প্রজাপতি তোমাকে গর্ভধারণ করাইয়া দিউন্ ।১।

ওঁ গর্ভংধেহি সিনীবালি! গর্ভংধেহি সরস্বতি!।
গর্ভংতেঽশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ ।২।

অন্বয়ঃ। হে সিনীবালি! গর্ভং ধেহি (মৎপত্ন্যাইতিশেষঃ) হে সরস্বতি! গর্ভং ধেহি। (তথা অয়ি ভার্য্যে!) পুষ্করস্রজৌ দেবৌ অশ্বিনৌ তে গর্ভং আধত্তাং ।২।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। হে ভগবতি! সিনীবালি! যোন্যধিষ্ঠাত্রিদেবতে! মৎপত্ন্যাঃ গর্ভং ধেহি। এষা যথা গর্ভধারণক্ষমা ভবেৎ তথা কুরুইত্যর্থঃ। হে সরস্বতি! ত্বমপি অস্যাঃ গর্ভং ধেহি,(দেবতাভ্যঃ এবং বরং সম্প্রার্থ্য সম্প্রতি ভার্য্যাং প্রতি বদতি।) অয়ি ভার্য্যে! পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ দেবৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গ-বৈদ্যৌ তে তব গর্ভং আধত্তাং ।২।

বঙ্গানুবাদ। হে সিনীবালি! আমার পত্নী যাহাতে গর্ভধারণ করিতে পারে, তাহা কর। হে সরস্বতি! আমার পত্নীকে গর্ভপ্রদান কর। পদ্মমালাধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার (পত্নীর প্রতি) গর্ভবিধান করুন। ২।

১। পুষ্করস্রজৌ—পুষ্করাণি পদ্মানি তৈঃ গ্রথিতাঃ স্রজে যয়োঃতৌ। মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় এবং বহুব্রীহি সমাস। ২। আধত্তাং—আপূর্ব্বাৎ ধা ধাতোঃ প্রার্থনায়াং লোট।

অথ পুংসবন-মন্ত্র-ব্যাখ্যা।

ওঁ পুমাংসৌ মিত্রাবরুণৌ পুমাংসাবশ্বিনাবুভৌ। পুমানগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ পুমান্ গর্ভ-স্তবোদরে। ১।

অন্বয়ঃ। মিত্রাবরুণৌ যথা পুমাংসৌ, (যথাচ) অশ্বিনৌ পুমাংসৌ অগ্নিঃ চ (যথা) পুমান্ (যথা বা) বায়ুঃচ পুমান্ তব উদরে (স্থিতঃ) গর্ভঃ (তথা) পুমান্ (ভবতু)। ১।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা। মিত্রাবরুণৌ আদিত্যপ্রচেতসৌ যথা যাদৃশৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিত-লিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতকর্ম্মক্ষমৌচ। যথা চ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ স্বর্গবৈদ্যৌ পুমাংসৌ পুরুষোচিতলিঙ্গধারিণৌ পুরুষোচিতাতিসুন্দরশরীরৌ চ। অগ্নিশ্চ অনলোঽপি যথা যাদৃক্ পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতগতিতেজঃসম্পন্নশ্চ। যথাবা বায়ুশ্চ অনিলোঽপি পুমান্ পুরুষোচিতলিঙ্গধারী পুরুষোচিতাতিবীর্য্যসম্পন্নশ্চ তব উদরে জঠরা-ভ্যন্তরে স্থিতঃ বর্ত্তমানঃ গর্ভঃ ভ্রূণঃ কুক্ষিস্থজন্তুঃ গর্ভোঽপবারকে হ্যগ্নৌ সুতে পনসকণ্টকে। কুক্ষৌ কুক্ষিস্থ জন্তৌচ ইতি যাদবঃ। তথা তাদৃক্ পুমান্ ভবতু। ত্বং মিত্রাবরুণতুল্য-কর্ম্মকুশলং অশ্বিনীকুমারদ্বয়সদৃশাতিসুন্দরকান্তিসম্পন্নং বহ্নিসমাতিতেজস্কং বায়ুসদৃশাতি-বীর্য্যং পুমাংসং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। ১।

বঙ্গানুবাদ। হে বধু! সূর্য্য এবং বরুণ যেরূপ পুরুষোচিতলিঙ্গসম্পন্ন এবং পুরুষো-চিত কর্ম্মকুশল, অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও অতিসুন্দর-কান্তিবিশিষ্ট, অগ্নি যেরূপ পুরুষোচিত তেজসম্পন্ন, বায়ু যেরূপ পুরুষোচিত মহাবীর্য্যশালী, তোমার উদরাভ্যন্তরবর্ত্তী সন্তানটীও সেইরূপ পুরুষোচিত লিঙ্গধারী ও পুরুষোচিত-গুণাবলী-সম্পন্ন হউক। ১।

১। মিত্রাবরুণৌ—মিত্রশ্চ বরুণশ্চ মিত্রাবরুণৌ (দ্বন্দ্বসমাসন্দেবতাদ্বন্দ্বে দীর্ঘঃঅগ্নীসোমা-বিত্যাদিবৎ।)

ওঁ যদ্যসি সৌমী সোমায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ২।

অন্বয়ঃ। (হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং) যদি সৌমী অসি (তর্হি অহং) ত্বা রাজ্ঞে সোমায় পরিক্রীণামি। ২।

সংস্কৃত ব্যাখা। হে ন্যগ্রোধশুঙ্গে! ত্বং যদি সৌমী সোমদেবতাকা চন্দ্র-সম্বন্ধিনী ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ওষধীনামিতি যাবৎ (চন্দ্রস্য রাজনামকত্বং প্রসিদ্ধং। সুশ্রুতসংহিতা-ব্যাখ্যাকারেণ ডল্লণমিশ্রেণ রাজযক্ষ্মা ইতিপদস্য ব্যাখ্যানে রাজ্ঞশ্চন্দ্রস্য যক্ষ্মা রাজযক্ষ্মা ইতি লিখিতং) তস্য সকাশাৎ ইতি যাবৎ (বিবক্ষয়া চতুর্থী) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি। ২।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! তুমি যদি চন্দ্রসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চন্দ্রের নিকট হইতে ক্রয় করি। ২।

ওঁ যদ্যসি বারুণী বরুণায় ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৩।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী অসি তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বরুণায় পরিক্রীণামি। ৩।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বারুণী বরুণসম্বন্ধিনী বরুণস্বামিকা

ইতিযাবৎ অসি ভবসি—তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতয়ে ভবৎস্বামিনে ইত্যর্থঃ বরুণায় ভবৎস্বামিবরুণসকাশাদিত্যর্থঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী ।) পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি যস্য যদ্বস্তুনি প্রয়োজনং স তৎপতি সকাশাৎ বিনিময়ং কৃত্বা অথবা মূল্যং দত্বা ক্রীণাতি বিনিময়দ্রব্যাভাবে অর্থাভাবেচ কশ্চিৎ প্রার্থনয়া গৃহ্লাতি ইতি ব্যবহারঃ। ৩।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদ্রি তুমি বরুণ-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরুণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৩।

ওঁ যদ্যসি বসুভ্যো বসুভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৪।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বসুভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা রাজ্ঞে বসুভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৪।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদিত্বং বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক বসুসম্বন্ধিনী অষ্টসংখ্যক বসুস্বামিকা ইতি যাবৎ * অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ বসুভ্যঃ অষ্টসংখ্যক-বসুভ্যঃ (পূর্ব্ববৎবিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি। ৪।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি অষ্টসংখ্যক-বসুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বসুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৪।

ওঁ যদ্যসি রুদ্রেভ্যো রুদ্রেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৫।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে রুদ্রেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৫।

সংস্কৃতব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং রুদ্রেভ্যঃ একাদশসংখ্যক রুদ্র নামধেয় দেবেভ্যঃ তেষাং সম্বন্ধিনী তৎস্বামিকা ইতিযাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বা ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতিযাবৎ রুদ্রেভ্যঃ একাদশ সংখ্যক রুদ্রেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্লামি। ৫।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি একাদশসংখ্যক রুদ্রদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে রুদ্রগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।৫।

ওঁ যদ্যসি আদিত্যেভ্যঃ আদিত্যেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।৬। *

---

* বসু আটটী, সাধারণ কথায় প্রচলিত আছে—অষ্টবসু। এখানে তাহাদের নাম লিখিত হইল, যথাঃ—ধরো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ বিষ্ণুশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যূষশ্চ প্রভাষশ্চ বসবোঽষ্টৌ ক্রমাৎ স্মৃতাঃ। রুদ্র একাদশটী যথা—অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ দৈবতঃ। হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ। সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিণাকী চাপরাজিতঃ। এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ গণেশ্বরাঃ।

* আদিত্য দ্বাদশটী, যথাঃ—মরীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা আদিত্যা দক্ষকন্যয়া। তত্র শক্রশ্চ বিষ্ণুশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি। অর্য্যমা চৈব ধাতাচ ত্বষ্টাপুষাচ ভারত। বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এবচ। অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যাঃ দ্বাদশস্মৃতাঃ।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে আদিত্যেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৬।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং আদিত্যেভ্যঃ দ্বাদশসংখ্যকাদিত্য-স্বামিকা অসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ ত্বৎস্বামিভ্যঃ ইতি যাবৎ আদিত্যেভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। পুরা কিল বিশ্বকর্ম্ম-কন্যা সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা প্রভূত তেজসঃ পত্যুঃ সহবাসমসহমানা নিজ-সপত্নীং ছায়াং "ভবতি! যাবৎ মৎপুত্রোঽতিদুর্দ্দান্তঃ যমঃ ত্বাং পদ্ভ্যাং ন প্রহরিষ্যতি তাবৎ মদনুরোধাৎ সপত্নীপুত্রদোষাস্ত্বয়া সোঢ়ব্যাঃ তথা মৎপিতৃভবনগমনবার্ত্তা পত্যুঃ সমীপে ন প্রকাশয়িতব্যা" ইত্যুক্ত্বা পিতৃগৃহং জগাম। ততঃ সমতিক্রামৎসু কালেষু কদাচিৎ যমঃ অজ্ঞাতমাতৃবৃত্তান্তঃ কদাচিৎ স্বমাতৃভ্রমেণ বিমাতরং পদ্ভ্যাং প্রজহার। সাপি উল্লঙ্ঘিতসময়া যমং অভিশশাপ; যমঃ অভিশাপগ্রস্তঃ সন্ পিতৃসমীপে সর্ব্বং বৃত্তান্তং নিবেদ্যাহ ভগবন্ অপরাধশতেনাপি মাতা পুত্রং নাভিশপ্তুমলং অতঃ এষা ন মম মাতা। বিবস্বানপি সম্যগ্‌বৃত্তান্তং অবগম্য ক্রোধেনাতিতীব্রতেজাঃ শ্বশুরালয়ং প্রতস্থে বিশ্বকর্ম্মাপি সমাগতস্তং বিবস্বতং নিরীক্ষ্য তদুপবেশনায় একং শাণং দদৌ মধুরবাক্যেন সান্ত্বয়ামাসচ ভগবতি সূর্য্যে শ্বশুরকথানুসারেণ তস্মিন্ উপবিষ্টে বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রঘর্ষণেন সূর্য্যং দ্বাদশধা বিভক্তবান্ ইতি পৌরাণিকী কথাত্রানুসন্ধেয়া।৬।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দ্বাদশাদিত্য সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে আদিত্যগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।

ও যদ্যসি মরুদ্ভ্যো মরুদ্ভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি।৭।

অন্বয়ঃ। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ অসি, তর্হি অহং ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে মরুদ্ভ্যঃ পরিক্রীণামি।৭।

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং মরুদ্ভ্যঃ উনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুভ্যঃ তৎ-স্বামিকা ইতি যাবৎ অসি ভবসি, তর্হি অহং ত্বাং রাজ্ঞে অধিপতিভ্যঃ (পূর্ব্ববৎ বিবক্ষয়া চতুর্থী) তেষাং সকাশাৎ ইত্যর্থঃ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি।৭।

বঙ্গানুবাদ। হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি উনপঞ্চাশৎসংখ্যক বায়ুসম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে বায়ুগণের নিকট হইতে ক্রয় করি।৭।

ওঁ যদ্যসি বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ দেবেভ্যস্ত্বা রাজ্ঞে পরিক্রীণামি। ৮।

অন্বয়ঃ—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি ত্বা (ত্বাং) রাজ্ঞে বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ পরিক্রীণামি। ৮।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বটশুঙ্গে! যদি ত্বং বিশ্বেভ্যঃ দেবেভ্যঃ দশসংখ্যক বিশ্ব-দেবেভ্যঃ অসি, তর্হি তেষাং সকাশাৎইতিযাবৎ পরিক্রীণামি বিনিময়েন গৃহ্ণামি। ৮।

বঙ্গানুবাদ—হে বটশুঙ্গে! যদি তুমি দশসংখ্যক বিশ্বদেবতা-সম্বন্ধিনী হও, তাহা হইলে তোমাকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করি। ৮।

ওঁ ওষধয়ঃ সুমনোসোঽস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

অন্বয়—হে ওষধয়ঃ! যূয়ং সুমনসঃ সত্যঃ অস্যাং বীর্য্যং সমাদধতু যতঃ এষা ইদং কর্ম্ম করিষ্যতি। ৯।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে ওষধয়ঃ যূয়ং ভবত্য সুমনসঃ প্রসন্নাঃ সত্যঃ অস্যাং বটশুঙ্গায়াং বীর্য্যং সামর্থ্যং সমাদধতু অর্পয়ন্তু। যতঃ এষা দেবতাঃ প্রসাদা গৃহীতা বটশুঙ্গা ইদং কর্ম্ম পুংসবনরূপং কার্য্যং করিষ্যতি সম্পাদয়িষ্যতি। ভবতীভিঃ সমাহিত তেজাঃ এষা বটশুঙ্গা ভক্ষিতা সতী মৎপত্ন্যাঃ উদরস্থিতং গর্ভং পুরুষং করিষ্যতি ইতি সরলার্থঃ। ৯।

বঙ্গানুবাদ—হে ওষধিসকল! আপনারা সুপ্রসন্ন হইয়া এই বটশুঙ্গেতে নিজ নিজ তেজ অর্পণ করুন। কারণ এই বটশুঙ্গা ভক্ষিতা হইয়া আমার পত্নীর গর্ভস্থ জন্তুকে পুরুষ করিয়া দিবে। ৯।

ওঁ পুমানগ্নিঃ পুমানিন্দ্রঃ পুমান্ দেবো বৃহস্পতিঃ। পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তং পুমাননুজায়তাং। ১০।

অন্বয়ঃ—হে বধু! অগ্নিঃ যথা পুমান্, যথাবা ইন্দ্রঃ পুমান্, যথাচ দেবঃ বৃহস্পতিঃ পুমান্, ত্বমপি তাদৃশং পুমাংসং পুত্রং বিন্দস্ব তথা তং অনু অন্যঃ পুমান্ জায়তাং। ১০।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—হে বধুঃ! অগ্নিঃ অনল যথা যাজক্ পুমান্ অতিতেজঃপুঞ্জশালী পুরুষ যথাবা ইন্দ্রঃ সুরপতিঃ পুমান্ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালী পুরুষঃ যথা চ দেবঃ বৃহস্পতিঃ সুরুগুরুঃ পুমান্ অনন্যসাধারণ-শাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নঃ পুরুষং, ত্বমপি তাদৃশ অদ এতেষাং সদৃশং পুমাংসং পুংলক্ষণযুক্তং পুরুষং বিন্দস্ব লভস্ব। ত্বং অনল সদৃশাতিতেজস্কং সুরপতি সদৃশ সর্ব্বলোকাতিগবিভবশালিনং সুরগুরুসদৃশানন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্নং পুংলক্ষণসমন্বিতং পুত্রং জনয় ইতি সরলার্থঃ। তথা তং অনু তস্য পশ্চাৎঅন্যোঽপি পুমান্ জায়তাং উৎপন্নো ভবতু—এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ইতি মনুসংহিতাবচনমত্র স্মর্ত্তব্যং। ১০।

বঙ্গানুবাদ—হে বধু! তুমি অনলের ন্যায় তেজঃশালী, ইন্দ্রের ন্যায় বিভবশালী এবং বৃহস্পতির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন পুত্র প্রসব কর, এবং তৎপরে তোমার অন্যান্য পুত্র সকলও উৎপন্ন হউক। ১০।

ইতিপুংসবন-মন্ত্রব্যাখা সমাপ্তা। শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

অবিশ্বাসীর ঈশ্বর-দর্শন।

—-০:০:০—-

মনে বড় সাধ—ঈশ্বর দর্শন করিব। গৃহ ছাড়িলাম, স্ত্রী-পুত্র ছাড়িলাম, গাত্রে ভস্ম মাখিলাম, তীর্থপর্য্যটন করিলাম, 'ঈশ্বর ঈশ্বর' বলিয়া কত ডাকিলাম, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম, নানাবিধ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। "হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর!" করিয়া কতই কাঁদিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-দর্শন পাইলাম না। যাহাকে দেখি, তাহাকেই ঈশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করি; কেহ তন্ত্রের, কেহ পুরাণের, কেহবা বেদান্তের কথা বলে। সকলের কথাই "পুঁথিগত বিদ্যার" মত বোধ হয়। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না যে, তিনি ঈশ্বর দেখিয়াছেন এবং আমাকে দেখাইতে প্রস্তুত। অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম যে, আজ ঈশ্বর দেখবই, ছাড়িবনা; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" করিব। অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তৎসম্মুখে ধ্যানে বসিলাম, দিবা অতিবাহিত হইয়া গেল, কিছুই দেখিতে পাইলামনা। সন্ধ্যা আগত। আমি যোগাসনে বসিয়া আছি। ক্রমে রাত্রির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বর দেখিব, নতুবা এই স্থানেই দেহ-পতন করিব। নিদ্রায় চক্ষু ঢুলু ঢুলু, ক্ষুধায় শরীর আচ্ছন্ন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে প্রায় উদ্যত; সেই অর্দ্ধ-নিদ্রিত অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, এক প্রকাণ্ড মৎস্য!—কেবল মস্তক দেখিতে পাইলাম, পুচ্ছ কোথায় শেষ হইয়াছে, দেখা গেলনা। কে যেন বলিল, এই ঈশ্বর! আমার বিশ্বাস হইলনা। মৎস্য অন্তর্হিত হইল। মৎস্যের পর কূর্ম্ম, কূর্ম্মের পর বরাহ, বরাহের পর সিংহ-শির এক মনুষ্য আসিয়া আমার নয়ন-পথে উদিত হইলেন। আমি সাহসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি, ভয় পাইলামনা; কিন্তু তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। ক্রমে অতি খর্ব্বাকৃতি এক মনুষ্য, পরে সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ রক্ত-কষায়িত-নেত্র মানব-মূর্ত্তি, পরে সৌম্য রাজপুরুষ-মূর্ত্তি, তৎপর এক মধুর মানব-মূর্ত্তি, তৎপরে এক যোগি-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন "তুমি যে "ঈশ্বর ঈশ্বর" করিতেছ, আমি সেই ঈশ্বর।" কিন্তু আমি কাহাকেও "ঈশ্বর" বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাঁহারাও সকলেই অন্তর্হিত হইলেন এবং আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে বসিলাম। তৎপরে দীর্ঘ-কেশ দীর্ঘশ্মশ্রু, "ন গৃহী নচ সন্ন্যাসী" এক শ্বেতকায় পুরুষ দর্শন দিলেন এবং ভিন্নদেশীয় ভাষায় বলিলেন "আমিই ঈশ্বর"। তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলামনা। তখন এক নবীন মুণ্ডিত-মস্তক গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী দেখা দিয়া বলিলেন "আমিই ঈশ্বর,"

আমাকেই বিশ্বাস কর"। আমি তাঁহাকেও ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তিনিও অন্তর্হিত হইলেন। আমি পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। হঠাৎ দৈববাণী হইল। "হে অবিশ্বাসি! তোর ঈশ্বর-দর্শন হইবেনা।" আমি জিজ্ঞাসিলাম——কেন? দৈববাণীতে উত্তর হইল—"তুই কি দেখিতে চাহিস"? আমি বলিলাম—"ঈশ্বর"। দৈববাণী বলিলেন— "ঈশ্বর কি? "ঈশ্বর" বলিলে তুই কি বুঝিস্?" আমি বলিলাম—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"— যাহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।" বাণী বলিলেন—যিনি এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন, তাঁহার কি আকার বলিয়া তোর ধারণা?" আমি বলিলাম—"নিরাকার"। বাণী বলিলেন "রে পাগল! তুই নিরাকারকে কিরূপে দেখিতে চাহিস?" আমি বলিলাম, ঠিক, তিনি নিরাকার বটে; কিন্তু তবু তাঁহাকে মন দেখিতে চাহে কেন? বাণী বলিলেন—"ঠিক কথা, মানব-হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বর-দর্শনাকাঙ্ক্ষী—এবং ঈশ্বরও তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মানব ঈশ্বরের অসীমত্ব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, সসীম-ভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিয়া থাকে, এবং তাহাতেই তাহার ঈশ্বর-বিভূতি দর্শন হয়। এই জগৎ ঈশ্বরময়, অথচ তিনি ইহার অতীত। কি সজীব, কি নির্জ্জীব, তিনি তাবৎ পদার্থেরই অন্তরে বাহিরে বিরাজমান থাকিয়া এই বিশ্ব নিয়মিত করিতেছেন। তিনই কৃমি-কীট, তিনিই পশু-পক্ষী, তিনিই মনুষ্য; অথচ তিনি এ সবের ঊর্দ্ধে! তাঁহার প্রশাসনেই চন্দ্র-সূর্য্যাদি উদিত হইতেছে. তাঁহার প্রশাসনেই হিমাচল স্বীয় মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার প্রশাসনেই গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখে ও সিন্ধু পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; তিনিই বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি, তিনিই এই বিশ্বের অন্তর্যামী। তাঁহাকে দেখা যায়না। অথচ সর্ব্বত্র সকলেই তাঁহাকে দেখিতেছে—কিন্তু দেখিয়াও উপলব্ধি করেনা। মানুষ কখনও বৃক্ষের উপাসনা করে, কখনও প্রস্তরের উপাসনা করে, কখনও গ্রহ-নক্ষত্রাদির উপাসনা করে, কখনও তীর্য্যগ্‌যোনির উপাসনা করে, কখনও মনুষ্যের উপাসনা করে। এ সমুদায় তাঁহার উপাসনাও বটে। যখন ভগবৎসত্তার উপলব্ধি হয়, তখন সর্ব্বাধারেই ভগবানের উপাসনা হইতে পারে। ভগবৎ-সত্তার উপলব্ধি ভিন্ন সাকারেও উপাসনা হয় না, নিরাকারেও হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। যাঁহার সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয় না, যিনি মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ প্রভৃতিতে, সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসিক পুরুষে, যিনি চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-অগ্নিতে, যিনি বৃক্ষে—পর্ব্বতে—নদীতে—সর্ব্বত্রই ঈশ্বরের সত্তা দৃষ্টি করেন, তাঁহারই ঈশ্বর-দর্শন হইয়া থাকে। তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর; নিমীলিত কর, দেখিবে ঈশ্বর! বাহিরে দেখ ঈশ্বর—অন্তরে দেখ ঈশ্বর! যখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বভূতে ঈশ্বরের সত্তা তোমার অনুভূত হইবে, তখনই তোমার প্রকৃত "ঈশ্বর-দর্শন" হইবে।" আমি বলিলাম—তবে আমিও কি ঈশ্বর? আমি এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীব, তৃণাদপি লঘু, আমিও কি ঈশ্বর?

আমি ইন্দ্রিয়ের দাস, স্বার্থের কীট, পাপের ভাণ্ড, আমিও কি ঈশ্বর? যে আমি 'আমি' কি, তাহা জানিনা, সেই আমিই কি ঈশ্বর? বাণী বলিলেন—"বিজ্ঞাতারং কো বিজানাতি"—"তত্ত্বমসি" এই কথা শুনিয়া যেন আমার মূর্চ্ছা হইল! মূর্চ্ছান্তে চারিদিকে "সোঽহং সোঽহং" ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য)

ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ।

একদা চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত। তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ। বিবাদ-ভঞ্জনের জন্য তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—

"যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমদৃশ্যতে স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি"

তোমাদের মধ্যে যিনি শরীর পরিত্যাগ করিলে, ঐ শরীর পাপিষ্ঠতর—অর্থাৎ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

তখন বাগিন্দ্রিয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া একবৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে?" তখন তাঁহারা বলিলেন "মূক ব্যক্তিরা যেরূপ কথা বলিতে না পারিয়াও প্রাণের দ্বারা শ্বাসক্রিয়া করে, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি।"

তখন বাগিন্দ্রিয় দেখিলেন যে, তিনি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন; কারণ তাঁহার অভাব হেতু শরীর একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় নাই। তৎপরে তিনি শরীরে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর দর্শনেন্দ্রিয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা আমার অভাবে কিরূপে জীবিত থাকিলে"? তাঁহারা বলিলেন—"অন্ধব্যক্তি যেরূপ দর্শন না করিয়াও প্রাণদ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া করে, বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাক্য বলে, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করে, মনের দ্বারা ধ্যান করে, আমরাও তদ্রূপ জীবিত আছি"।

দর্শনেন্দ্রিয় তখন বাগিন্দ্রের ন্যায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রবণেন্দ্রিয় তখন দেহত্যাগ করিয়া এক বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বধির ব্যক্তিরা যেরূপ শ্রবণ ভিন্ন শরীরের অন্যান্য কার্য্য সম্পাদন করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; তাঁহার অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। শ্রবণেন্দ্রিয় তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

তৎপর মন দেহত্যাগ করিয়া বৎসরান্তে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন করায়, তাঁহারা বলিলেন, শিশুরা যেরূপ ধ্যানাদি-শক্তি-বিরহিত হইয়া শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাঁহারাও এক বৎসর কাল তদ্রূপ করিয়াছেন; মনের অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য হয় নাই। মন তখন স্বীয় স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎপর প্রাণ দেহত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। তখন তেজস্বী অশ্ব কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পদবন্ধন-কীল অর্থাৎ খুঁটা উৎপাটিত করে, সেইরূপ প্রাণও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটিত করিবার উপক্রম করিলেন।

তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা ভীত হইয়া প্রাণ-সমীপে আগমন করিয়া বলিলেন—

"ভগবন্নেধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি" অর্থাৎ হে প্রভো, তুমি আমাদিগের সকলের শ্রেষ্ঠ, তুমি স্বীয় স্থানে থাক, দেহ পরিত্যাগ করিও না। বাগিন্দ্রিয় তখন বলিলেন, আমি যে 'বসিষ্ঠ' অর্থাৎ জগতের আবরণ স্বরূপ রহিয়াছি, সে তোমারই জন্য। শ্রবণেন্দ্রিয় বলিলেন, আমি যে 'সম্পৎ' অর্থাৎ জগতের ধন স্বরূপ, সে তোমারই জন্য। দর্শনেন্দ্রিয় বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'প্রতিষ্ঠা' সেও তোমার জন্য। মন বলিলেন যে—আমি যে জগতের 'আয়তন' সেও তোমার জন্য।

বস্তুতঃ প্রাণ ব্যতীত মন, চক্ষু, শ্রোত্র, বাক্ প্রভৃতি কিছুই নহে, তাহারা সকলেই প্রাণের অধীন।

তৎপরে প্রাণের অন্ন কি হইবে, প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন; ইন্দ্রিয়গণ বলিলেন—মাত্র জীব যাহা আহার করিয়া থাকে, তাহা আপনার অন্ন হইবে। বস্তুতঃ ভক্ষ্য বস্তু মাত্রেই প্রাণের অন্ন। এই শরীরের তাবৎ চেষ্টাই প্রাণের, এই জন্য প্রাণকে অন্ন বলা হইয়া থাকে।

তৎপরে প্রাণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার বাস বা পরিচ্ছদ কি হইবে? তাঁহারা বলিলেন—জলই আপনার বাস হইবে। এই জন্য লোক আহারের প্রথমে এবং আহারের শেষে জল পান করে।

সত্যকাম জাবাল—ব্যাঘ্রপাদের পুত্র বৈয়াঘ্রপদ গোশ্রুতিকে ইহা বুঝাইয়া দিয়া, তাঁহাকে বলিলেন যে, শুষ্ক তরুকেও ইহা বুঝাইয়া দিলে, উহাতে নব শাখা-পল্লব উদ্গত হইবে।

আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ।

বিদেহাধিপতি জনকের বহুদক্ষিণ-যজ্ঞ-সভায় কাশী-কোশল প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিত সমূহ সমাগত। সকলেই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্মবিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। তন্মধ্যে জরৎকারু-বংশীয় আর্ত্তভাগ নামক জনৈক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন—"কতিগ্রহাঃ—কত্যতিগ্রহাঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—"অষ্টৌ গ্রহা—অষ্টাবতিগ্রহাঃ।" অর্থাৎ আটটি এই সংসারের বন্ধন—এবং আটটি তাহাদের সাহায্যকারক। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, হস্ত ও মন (অন্তরিন্দ্রিয়), এই কয়টি জীবের গ্রহ—অর্থাৎ বন্ধন স্বরূপ, এবং ইহাদের কার্য্যই অতিগ্রহ, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ঐ বন্ধন সুদৃঢ় হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের এই উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, ইন্দ্রিয়াদির বহির্মুখতাই সংসার-বন্ধনের কারণ। যাঁহারা কূর্ম্মের ন্যায় ইন্দ্রিয়াদিকে বাহ্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মাভিমুখে লইয়া যাইতে পারেন, যখন আত্মাই তাঁহাদের ইন্দ্রিয়াদির উপভোগার্থ-বস্তু হয়, তখন তাঁহাদের মুক্তি হয়, এবং তখনই তাঁহারা সংসার-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন। তৎপর আর্ত্তভাগ ও যাজ্ঞবল্ক্যের এক অপূর্ব্ব প্রশ্নোত্তর হইল। "যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য অগ্নিং বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রং দিশঃ শ্রোত্রং পৃথিবীং শরীরমাকাশমাত্মৌষধীর্লোমানি বনস্পতীন্ কেশা অপ্সু লোহিতঞ্চ রেতশ্চ নিধীয়তে ক্বায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহর সোম্যাহস্তমার্ত্তভাগাহবামেবৈ তস্য বেদিষ্যাবো নঃ নাবেত তৎ স্বজন ইতি। তৌহোৎক্রম্য মন্ত্রয়াং চক্রাতে তৌহ যদুচতুঃ কর্ম্মহৈব তদুচতুরথঃ যৎ প্রশশংসতু কর্ম্মহৈব তৎ প্রশশংসতু, পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি ততোহ জারৎকারব আর্ত্তভাগ উপররাম।" তখন আর্ত্তভাগ জিজ্ঞাসা করিলেন,—যখন পুরুষের বাক্য অগ্নিতে মিশিয়া যায়, প্রাণ বায়ুতে মিশিয়া যায়, চক্ষু আদিত্যে মিশিয়া যায়, মন চন্দ্রে মিশিয়া যায়, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে মিশিয়া যায়, শরীর পৃথিবীতে মিশিয়া যায়, আত্মার আধার হৃদয় আকাশে মিশিয়া যায়, লোমসমূহ ওষধিতে মিশিয়া যায়, মস্তকের কেশ-সমূহ বৃক্ষাদিতে মিশিয়া যায়, শোণিত ও রেতঃ জলে মিশিয়া, যায়, তখন আত্মা কোথায় থাকেন?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"আর্ত্তভাগ! আমার হস্ত গ্রহণ কর এবং এস আমরা নির্জ্জনে যাই; সেই-খানে তোমার প্রশ্নের উত্তর করিব। এই জনাকীর্ণ স্থানে এই বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না।" তাঁহারা তথা হইতে উঠিয়া গিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন, সে কথাটি "কর্ম্ম"। তাঁহারা যাহা প্রশংসা করিলেন, সেও কর্ম্মের। পুণ্য-কর্ম্ম

দ্বারাই লোক পবিত্র হয় এবং পাপকর্ম্ম দ্বারা লোক অপবিত্র হয়। জরৎকারু-বংশীয় আর্ত্তভাগ তাহা বুঝিয়া উপরত হইলেন।

এই জগতে মনুষ্যের জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, তিনি আত্মা এবং পরলোক বিষয়ে নানাবিধ জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় পরাভব স্বীকার না করিয়া পারেন না। যখন বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ-শয্যায় শয়ান ছিলেন, তখন শিষ্যগণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। বুদ্ধদেব তদুত্তরে তাঁহাদিগকে কেবল "কর্ম্ম" করিতেই আদেশ দিলেন। আর তাঁহাদের জটিল প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা করিলেন না; বস্তুতঃ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রথমেই জটিল আত্মতত্ত্ব বিষয়ের মীমাংসার্থী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বুঝাইলেও বুঝা যায় না। সাধারণ মানবের পক্ষে এই সমুদয় জটিল প্রশ্ন হইতে বিরত হইয়া, সৎকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। বেদ বলিতেছেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবন্ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে।" যাজ্ঞবল্ক্যও আর্ত্তভাগকে ঐ উপদেশ প্রদান করিলেন। ফলিতার্থে আত্মতত্ত্ববিষয়ক বৈদান্তিক বাগ্বিতণ্ডা-বিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগই মানব-জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ম্ম-যোগ-সিদ্ধি ব্যতীত প্রকৃত আত্মতত্ত্ববোধ সুদূরপরাহত।

(কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য।)

সমাজোন্নয়ন।

—:০:—

ভগবদিচ্ছায় মানব-সমাজ বহু প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত হইলেও, দেশ ও জাতি-নির্ব্বিশেষে সাধারণতঃ দুইটি স্থূল বিভাগ সর্ব্ব সমাজেই দৃষ্ট হয়। যে সাধারণ দ্বন্দ্বাত্মক ভাবে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, উক্ত বিভাগদ্বয় তদন্তর্ভূত। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, উচ্চ-নীচ, সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-অজ্ঞান, ইত্যাদি বিশেষণ-দ্বন্দ্ব গুলিরই বিশেষ্য উক্ত সামাজিক বিভাগদ্বয়। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, লর্ড-কমন্স, সৈয়দ-সেখ, ইত্যাতি দ্বন্দ্বগুলি এখানে খাটেনা; কারণ উহা মানব-কৃত সামাজিক বিভাগ। শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ যে প্রকৃতি-কৃত স্থূল সামাজিক বিভাগ, তাহাই আমাদের প্রসঙ্গীভূত। একজন ধনী, ব্রাহ্মণ বা লর্ড,—নিকৃষ্ট, অসভ্য, অশিক্ষিত, অজ্ঞান হইতে পারেন; পক্ষান্তরে একজন দরিদ্র, চণ্ডাল, সাধারণ ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ, সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব নহে। ফলে "শ্রেষ্ঠ" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে সভ্য, শিক্ষিত, জ্ঞানী, এবং "নিকৃষ্ট" যাহাকে বলা যাইবে, তাহাকে অসভ্য; অশিক্ষিত, অজ্ঞানী বলিতেই হইবে। 'শ্রেষ্ঠ' 'সভ্য' প্রভৃতি ও 'নিকৃষ্ট' 'অসভ্য' প্রভৃতি প্রায় পর্য্যায়-শব্দ বলিলেও বলা যায়। যাহা-হউক, সমাজের এই যে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টাদিরূপ দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগ, এই দুই

বিভাগের মধ্যে পরস্পরের বিশেষ সম্বন্ধ ও ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য-দায়িত্ব রহিয়াছে, এবং এই কর্ত্তব্য-দায়িত্ব শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই পরিচালিত হইতেছে। যথা পিতা পুত্রের প্রতি, প্রভু ভৃত্যের প্রতি বা শিক্ষক ছাত্রের প্রতি স্বকর্ত্তব্য-পালন অব্যাহত রাখিলেই, পুত্র—ভৃত্য—ছাত্রও পিতা—প্রভু—গুরুর প্রতি স্ব-কর্ত্তব্য-সাধনে অব্যাহত থাকিবে। অগ্রে পিতার পুত্র-বাৎসল্য অনুভব করিয়াই পরে পুত্রের পিতৃভক্তি উন্মেষিত হয়। অবশ্য অপত্য-স্নেহশূন্য নির্ম্মম পাষণ্ড বা প্রমত্ত পিতারও পরম পিতৃভক্তিমান সুশীল পুত্র থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা অসাধারণ ঘটনা—সাধারণ নিয়মের ব্যতিরেক-স্থল (exceptional case) মাত্র। ফলে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতেই সামাজিক প্রকৃতির কার্য্য আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতাই নিকৃষ্ট বিভাগের কর্ত্তব্যশীলতার প্রসূতি বা অগ্রসূচী। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সমাজোন্নয়ন কল্পে এই শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালী মতে সমাজের নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

জ্ঞান, ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক ব্যবস্থা, ইত্যাদি সকল বিষয়েই মোটের উপর সমাজের যে বিভাগ অবনত, তাহার উন্নয়ন কল্পে উক্ত সমাজের সমুন্নত বিভাগ যথাশক্তি ও যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে বাধ্য। রাজনীতি বা সমাজ-নীতি দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা বাধ্য না হইলেও, ধর্ম্মনীতির বিশিষ্ট বিধানে বাধ্য, সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, আর্য্যসমাজের এই চারি বিভাগে অনুলোমভাবে ক্রমোৎকর্ষ-গতিতে সমাজোন্নয়ন-ক্রিয়া চলিলেও, সাধারণতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজ দ্বিজ ও শূদ্র (সেব্য ও সেবক), এই দুই স্থূল ভাগে বিভক্ত ছিল। সেব্য দ্বিজ-বিভাগ সুতরাং শ্রেষ্ঠানুগতিক-প্রণালীতে সেবক শূদ্র-বিভাগের ইহ-পারত্রিক মঙ্গল বিধানে রত ছিলেন। সেবক শূদ্র-বিভাগও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও উৎসাহ সহকারে সেব্য বিভাগের যথাযোগ্য সেবা-রত ছিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতে উক্ত উভয় বিভাগেরই সমাজোন্নয়ন যথাযথ অনুপাত অনুসারে উপযুক্তরূপেই সাধিত হইয়াছিল।

অনেকের একটা ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, প্রাচীন ভারতে দ্বিজাতি-বিভাগ হীন স্বার্থপরতা ও স্বপক্ষপাতিতা দোষে শূদ্রবিভাগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ও নিকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে পদতলে দলন করিয়া রাখিতেন। সমাজ-বিধির উপরেও রাজবিধি স্থাপন করিয়া তাহাদের সমাজোন্নয়নে বাধা দিতেন, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এইরূপ সংস্কার একটি ভয়ানক ভ্রম। মন্বাদি স্মৃতি-সংহিতায় শূদ্রের ধর্ম্মাধিকার, ধনাধিকার, দ্বিজাতির প্রতিকূলে কৃত অপরাধের দণ্ড প্রভৃতি বিষয়ক দু-চারিটি বচন দৃষ্টে প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য সংস্কৃতাধ্যাপক কতিপয় পণ্ডিতের যেরূপ মত ঘোষিত হইয়াছিল, অস্মদ্দেশের অল্পশাস্ত্রজ্ঞ নব্য দলের উক্ত সংস্কার তাহারই অন্ধ-অনুবর্ত্তিতার ফল মাত্র।

শাস্ত্রের ২।৪টা বচন মূল প্রকরণের উপক্রম-উপসংহারাবচ্ছিন্ন স্থূল তাৎপর্য্যের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য বোধ হইলে, তৎসমুদয়কে "প্রক্ষিপ্ত" সিদ্ধান্ত করাই সুধীজন-সম্মত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইহার বিশিষ্ট বিচার প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বিধায় সংক্ষেপে এই মাত্র বক্তব্য যে, শাস্ত্রসমূহের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, প্রতি প্রকরণের উপক্রম-উপসংহার বিচার, প্রাচীন ভারতীয় শূদ্রের সামাজিক অবস্থা, শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণের গভীর জ্ঞান, বিশিষ্ট বিদ্যাবত্তা, যোগ-সিদ্ধ বিবেক-বৈরাগ্য, সর্ব্বজীব-হিতৈষিতা ও বিশ্বজনীন প্রেমিকতার জ্ঞান, প্রমাণ, আলোচনা, বিচারণা ও বিশ্বাসের অভাব হইতেই উক্ত সংস্কারটি সমুদ্ভূত হইয়াছে। মোটামুটি এইটুকু ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, যাঁহাদের বেদ-বেদান্ত-বিলাসিনী অমরা লেখনী যম, নিয়ম, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি সাধন-তত্ত্ব সমূহের অতুল্য উপদেশ রাশির অজস্র অমৃত-ধারায় ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু-জগৎ আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি ওরূপ নির্লজ্জ নীচাশয়তা বা নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আরোপ বা কল্পনাও অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ফলকথা, প্রাচীন আর্য্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিভাগ দ্বিজাতি, নিকৃষ্ট বিভাগ শূদ্রাদির উন্নয়নার্থ সর্ব্বপ্রযত্নপরায়ণ হওয়ায়, শ্রেষ্ঠানুগতিক প্রণালীতে শূদ্রাদিরও দ্বিজ-সেবায় স্বতএব রতি-গতি-মতি জন্মিয়া, সমগ্র আর্য্যসমাজের সমুন্নত সংস্থান কোনদিন সভ্য মানব-সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ শোভা পাইয়াছিল! কিন্তু হায়! "তেহি নো দিবসা গতাঃ"—আর আমাদের সে দিন নাই। এক্ষণকার ভারতীয় আর্য্যসমাজে বা হিন্দুসমাজে সে "দ্বিজ-শূদ্র" রূপ বিভাগদ্বয় পরিষ্কারভাবে না থাকিলেও, সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট রূপ 'ভদ্র' ও 'ইতর' অভিধেয় বিভাগদ্বয় বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং সমাজের নৈসর্গিক নিয়মে তাহা সমাজ-স্থিতির সহিত চিরস্থায়ীও রহিবে বটে, কিন্তু উক্ত বিভাগদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের শিক্ষা-সাধনায় অধুনা শোচনীয় বিপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়াই সেই আদর্শোন্নত হিন্দুসমাজ অবনতির অন্তিম সোপানে অবতীর্ণ-প্রায়!

নিকৃষ্ট বিভাগের প্রতি শ্রেষ্ঠ বিভাগের কর্ত্তব্য-সাধনই প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ প্রয়োজনীয়, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় হিন্দুসমাজে শ্রেষ্ঠ বিভাগের সেই স্বকর্ত্তব্য-সাধনের অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রাচীন ভারতে সমাজ-বিধি ও রাজবিধির অটুট বন্ধনে ও শাসনে উক্ত কর্ত্তব্যসাধন সুব্যবস্থিত ও অব্যাহত ছিল। এক্ষণে তাহার অভাবে সব বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করে। কোন বিধি-ব্যবস্থা শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠবই নাই। স্বেচ্ছাচারিতা ও যথেচ্ছাকারিতায় সমাজ বিপ্লুত। সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি কোনরূপ কর্ত্তব্যসাধন—কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতির ভাবই নাই। অনেকস্থলে এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পর প্রবল স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে। কেহ কাহারও [illegible] ভাবে না; সকলেই স্ব-সর্ব্বস্ব! সে বংশানুক্রম-ভেদে ব্যবসায়-ভেদ আর নাই।

“চাকরী”র দিকেই “পনর-আনা সাড়ে-উনিশ-গণ্ডার” দৃষ্টি! চির-কৃষক-কুলধরেরাও “লাঙ্গলের মুটো” ছাড়িয়া “কলমের মুটো” ধরার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট! তাহাতেও আজ কাল গোল বাধিয়াছে। “ন স্থানং তিলধারণে”। বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র ‘পাস্-করা, প্রসব করিতেছে; বৃটিশ-রাজের সহস্র-শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিরাট রাজকার্য্য-ব্যাপারেও আর স্থান-সংকুলন হইতেছে না। অগত্যা উপজীবিকার অন্বেষণে অনেক অবান্তর উপায় অবলম্বিত হইতেছে। দেশমধ্যে এইরূপ জীবিকা-বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে ব্যবসায়-ভেদে শ্রেণীভেদের সেরূপ শৃঙ্খলা আর নাই। না থাকাতেও হানি ছিল না, যদি আমাদের সময়োপযোগিনী সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির একরূপ বিকলতা না ঘটিত। বুঝিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের সেরূপ সমাজ-শৃঙ্খলা বর্ত্তমানে ঈশ্বরাভিপ্রেত নয় বলিয়াই তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ইংরাজ-রাজ-বিধি, ইংরাজী বিদ্যালয়, ইংরাজী সভ্যতা, জাতি-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষ সমস্ত ভারতীয় প্রজাকেই সম-তুলাদণ্ডে তৌল করিতেছে। এ অবস্থায় আমাদের সমাজোন্নয়ন-সাধনার্থে শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বিশেষ পরিশ্রম ও প্রযত্নের প্রয়োজন। প্রাচীন সমাজ-বিধি বাঁধা-যন্ত্রের সুরের মত আপনিই লয় রক্ষা করিয়া চলিত; এখন সমাজের বিপ্লব-বিকৃত বিপর্য্যস্ত অবস্থায় আর সে আশা নাই। এখন কাজেই শিক্ষিত উন্নত সম্প্রদায় শাস্ত্রানুকূলভাবে সমাজ-ব্যবস্থার সময়োপযোগী সংস্করণে ব্রতী হইলে, তবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার কতকটা আশা করা যায়; নচেৎ এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব-প্রবাহ সমাজ-বক্ষে ক্রমাগত প্রবাহিত হইতে থাকিলে, আর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে যে কি অবস্থা হইবে, দূরদর্শী বুদ্ধিমান সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীগণ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছেন।

অগ্রে সমাজের শ্রেষ্ঠ-বিভাগ পথপ্রদর্শক হউন; ক্রমে নিম্ন বিভাগ আনুপাতিক প্রণালীতে তদনুকরণপরায়ণ হইলে, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত স্বকর্ত্তব্য-সাধনে অগ্রসর হইলেই সমগ্র সমাজোন্নয়ন সম্ভাবিত, নচেৎ নহে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,— ‘যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।’ ‘মহতের অনুকারী সাধারণে হয়। তৎকৃত সিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়।’ অতএব অগ্রে সমাজের উচ্চ বিভাগ নিম্ন বিভাগের যথাসম্ভব উন্নয়ন-সাধনে ব্রতী হউন। আপনারা সুখে স্বচ্ছন্দে একরূপ কাটাইয়া যাইতেছেন ভাবিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমগ্র সমাজ তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে; তাঁহারা সমাজের নিম্নাঙ্গের দিকে উদাসীন থাকিলে ঘোর প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। সর্ব্বাঙ্গের যথাযোগ্য পুষ্টি-সাধন ব্যতীত সমগ্র শরীরের পুষ্টি-বিধান বলা যাইতে পারেনা। যেমন দেহের সাধারণ-স্বাস্থ্য-বিধান পক্ষে বামপদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীটিও উপেক্ষণীয় নহে, তদ্রূপ সমগ্র সমাজোন্নয়নার্থ সমাজের অতি নিকৃষ্টতম স্তরও উপেক্ষণীয় নহে। মস্তকস্থ ব্রণের আরোগ্য-বিধানার্থ যেরূপ অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আনুপাতিকভাবে পদস্থ ব্রণ সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান উচ্চবিভাগ এই সত্যে শোচনীয়ভাবে উদাসীন। "আমি একতালা গড়াইবনা, একছের্ দোতালায় সুখে বাস করিব" অথবা "আমার মাথা ঠিক থাকিলেই হইল, পায়ের কপালে যা থাকে, হউক" এইরূপ সিদ্ধান্ত বা উক্তি যেরূপ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত ও উপহাস-বিষয়ীভূত, সমাজের নিম্ন বিভাগের উন্নয়ন উপেক্ষা করিয়া উচ্চ বিভাগের আত্মতৃপ্তিও তদ্রূপ।

অধুনা নিম্নবিভাগের উন্নয়নার্থে উচ্চবিভাগে যে কিছু চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা প্রায়ই 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'য় পর্য্যবসিত। তাহা প্রায়ই বক্তৃতায়, পত্রিকায়, পুস্তকে ও মস্তকে নিবদ্ধ! কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অনুষ্ঠান কোথায়? যাহাও কিছু কখনও দৃষ্ট হয়, তাহাও যথার্থ অনুষ্ঠান নহে, অভিনয় মাত্র। আসল কথা, সে জ্ঞান থাকিলেও সে প্রাণ নাই, বুদ্ধি থাকিলেও হৃদয় নাই, মস্তিষ্ক থাকিলেও ক্রিয়া নাই; কাজেই সমাজোন্নয়নার্থ বাহিরে আমাদের ভাস'-ভাসা চেষ্টা 'পুরুষকার' নামের অযোগ্য; উহা অরণ্যে রোদন,—মরুতে বারিবিন্দু-পাতন মাত্র!

যথার্থ সমাজোন্নয়ন-সমাধানার্থে আত্মোৎসর্গ চাই। একটি জীবনের যথার্থ আত্মোৎসর্গে যে কর্ম্ম হয়, শত জীবনের বক্তৃতা, কবিতা, অন্দোলন, আলোচনার ফাঁকা আওয়াজে তাহা সম্ভাবিত নহে। সমাজের যে বিভাগের যে বিষয়ের উন্নয়নের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে সেই বিভাগে প্রাণ ঢালিয়া মিশিয়া, আপনাকে সেই বিভাগীভূত করিয়া, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট উভয়ই হইয়া, শিক্ষকত্ব ও ছাত্রত্ব, যুগপৎ একাধারে গ্রহণ করিয়া, কর্ম্ম করিলে, তবে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা। আবশ্যক হইলে, এতদর্থে সঙ্গতিশালী শিক্ষিতের সাময়িক 'অজ্ঞাতবাস'ও বোধহয় অব্যবস্থা নহে।

> "চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
> কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু বিষধরে দংশেনি যারে?"

সদ্ভাব-শতকের এই সুপ্রসিদ্ধ কবিতার মহার্হ উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া, ব্যথিতের বেদন যথার্থ বুঝিতে চির-সুখীজনকে একবার আত্মসুখ উপেক্ষা করিতে হইবে; বিষের জ্বালা যথার্থ জানিবার জন্য অমোঘ-বিষৌষধধারীর একবার সাধিয়া বিষধর-দংশন গ্রহণ করিতে হইবে। শুনিয়াছি, অস্মদ্দেশের কোন মহাত্মা চা-ক্ষেত্রের কুলীর দুঃখ বুঝিবার জন্য স্বয়ং আড়কাটীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া কুলী সাজিয়া আসামে গিয়াছিলেন! অবশ্য তাহাতেই কুলীর দুঃখ দুর না হইলেও, ঐ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষা ও অনুকরণের স্থল, সন্দেহ নাই। আধুনিক সমুন্নত পাশ্চাত্য সমাজে এজাতীয় দৃষ্টান্ত বহুল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাজের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নার্থে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিতগণের ঐরূপ আত্মোৎসর্গের একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে ধর্ম্মতঃ দায়ী। মস্তিষ্কের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককে ভাবিতে হইবে, চরণের পীড়া নিবারণের জন্যও মস্তিষ্ককেই ভাবিতে হইবে।

মস্তিষ্কের ঔদাসীন্য উভয়ত্রই অনুপেক্ষণীয়। মস্তক ও পদ, উভয়ের স্বাস্থ্যসাধন-চিন্তায় যে মস্তিষ্ক ক্রিয়াশীল, সেই মস্তিষ্কই সমগ্র শরীরের স্বার্থ-মর্য্যাদা বুঝিতে সক্ষম। যে সমাজে নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়নার্থ আত্মসমর্পণ করিতে উচ্চশ্রেণীর অমর্য্যাদা, লজ্জা, ঘৃণা, সময়ের অপব্যবহার, স্বার্থহানি প্রভৃতি আপত্তি অনুভূত হয়, সে সমাজের উন্নয়ন দূরে থাক্, অধঃপতনই অনিবার্য্য। আমাদের দুর্ভাগ্য সমাজ এই জন্যই দিন২ অধঃপতনের নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে। আমাদের উচ্চশ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর জন্য বক্তৃতায় চেঁচাইতে, কবিতায় কাঁদিতে, সংবাদ-পত্রে শঙ্খ বাজাইতে খুব প্রস্তুত; আন্দোলনে লাফাইতে, হুজুকে হাঁপাইতে খুব তৎপর, কিন্তু প্রকৃত কাজের বেলায়—হরি হরি!—সব নিষ্ক্রিয়-নির্ব্বিকল্প-সমাধি-প্রাপ্ত!

এখনও কিন্তু সময় আছে। এখনও আশার শেষ শিখা নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনও আমাদের বাহ্য চাকচিক্য—বাহ্যোন্নতির সহিত কতকটা সজীবতা আছে। এখনও মস্তিষ্কের বল, বুদ্ধির ব্যাপ্তি, চিন্তার শক্তি, শিক্ষার অধ্যবসায় একরূপ বর্ত্তমান আছে; বরং সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে কোন ২ অংশে এ সমস্তের অপেক্ষাকৃত উন্নতিও হইতেছে। সহৃদয়, সমদর্শী, প্রজাহিতৈষী, ন্যায়পর ইংরাজজাতিকে আমরা রাজাও পাইয়াছি। ইংরাজের সমাজ-হিতৈষণায় আত্মোৎসর্গ, নিম্ন শ্রেণীর সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিধানার্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অক্লান্ত অধ্যবসায় ইত্যাদি আমাদের সহজেই অনুকরণীয় হইতে পারে। ভগবান সে সুযোগ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমাদের কর্ম্ম-দোষে বুদ্ধি-বশে সে সুযোগ হেলায় হারাইতেছি। ইংরাজের পান-ভোজন, বেশ-ভূষণ, ধরণ-করণ, ভাব-ভঙ্গি, কথা-প্রথা, এই সবই অনুকরণ করিতে আমরা সুপটু, কিন্তু ইংরাজের ক্ষাত্রধর্ম্ম, ইংরাজের কর্ম্ম-তপস্যা, ইংরাজের পুরুষকার-প্রিয়তা, সমাজ-হিতৈষিতা, স্বাবলম্বনশীলতা ও মহাপ্রাণতা আমাদের কৈ? এখনও সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিভাগ নয়নোন্মীলন করুন। কেবল রাজনৈতিক অধিকার-লাভোদ্দেশে কংগ্রেস্ প্রভৃতি করিলে সমাজের যথার্থ হিতসাধন হইবেনা। যাহাতে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর উন্নয়ন হয়, তাহাই সমগ্র সমাজোন্নয়নের প্রকৃষ্ট পন্থা। নিম্নের একতালা খারাপ হইলে, উপরের তালাগুলি কখনও ভাল বা স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজ-গৃহের নিম্নতলের সংস্করণে শিক্ষিত সমাজ এখনও মনোযোগী হউন। সে দিকে উদাসীন থাকিয়া সহস্রবিধ উন্নতির চেষ্টা করিলেও কিছুই হইবেনা। হাল ছাড়িয়া দিয়া, সজোরে শত দাঁড় বাহিলেও নৌকা অগ্রসর হইবেনা, কেবল ঘুরিবে মাত্র; ফলে যেখানকার নৌকা সেইখানেই থাকিবে। শৃঙ্খলাবদ্ধ-পদ বন্দীর যেরূপ রেলের গাড়ীতে বাড়ী যাইবার কল্পনা মস্তিষ্কে উদিত হইয়া মস্তিষ্কেই লয় পায়, সমাজের নিম্ন শ্রেণীকে অবনতির অন্ধকূপে পাতিত রাখিয়া, উচ্চ শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টায় সমগ্র সমাজোন্নয়নের আশা তদ্রূপ কল্পনার কুহক-স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদিগের শাস্ত্রীয় অবতারতত্ত্ব এ বিষয়ে এক মহাশিক্ষার স্থল। ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থে ভগবান নিজে নর-সমাজে নররূপে অবতীর্ণ হইয়া, সেই সমাজে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিয়া, যথার্থ সমাজোন্নয়ন সম্পাদন করিয়াছেন। মহতের অনুকরণই সাধারণের ধর্ম্ম। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"। অতএব মহৎ হইতেও মহৎ স্বয়ং ভগবানের পদানুসরণই এ বিষয়ে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ভগবান আপনি মানুষ সাজিয়া, মানুষের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম, দেহ-ধর্ম্ম ধারণ করিয়া, মানুষের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া, মানুষকে ধর্ম্মদানে কৃপা করিয়াছেন,—কৃতার্থ করিয়াছেন; অতএব ভগবানের বিশিষ্ট কৃপাপাত্র সুকৃতিমান্ সমাজাগ্রণী শিক্ষিতগণ ভগবানের অবতার-তত্ত্বের শিক্ষা শিরোধার্য্য করিয়া, নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ং নিম্ন-শ্রেণীস্বরূপে অবতারীভূত হইয়া, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে আপনা ভুলিয়া, অভেদে মিশিয়া, তাহাদিগের যথাযোগ্য ও যথাসম্ভব শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সদাচার, স্বাস্থ্য-সচ্ছলতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির যথাসাধ্যভাবে ব্যবস্থা করিলেই, কালে নিম্ন শ্রেণীও উচ্চ শ্রেণীর প্রতি যথাযোগ্য কর্ত্তব্য-সম্পাদনে সমর্থ হয়, এবং তাহা হইলেই ক্রমে সমগ্র সমাজের যথার্থ সমুন্নয়ন সম্ভাবিত ও সম্পাদিত হইতে পারে। নচেৎ উচ্চশ্রেণী যদি কেবল আপনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন, কিম্বা কেবল দূরে দূরে থাকিয়া ফাঁকা হুজুকের ফাঁকা চেষ্টায় নিম্ন শ্রেণীর হিতসাধনেচ্ছু হয়েন, তবে তাহাতে কোন ফলই ফলিবেনা; নিম্ন শ্রেণী আরও নিম্ন হইবে, উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীতে পরিণত হইবে; সমাজ অধঃপাতে যাইবে। এমন কি, সমাজের উচ্ছেদ আসিয়া ব্যাদিত বদনে অদূরে দেখা দিবে। ভগবান আমাদিগকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

নিম্ন শ্রেণীর অনন্ত অভাব। আপন ব্যবসায়টি কিরূপে ভালরূপে চালাইতে পারিবে, তাহা বুঝে না। রোগাদি হইলে কিরূপে দেহ রক্ষা করিবে, জানে না। রাজার কোপ, সমাজের পীড়ন, ভূস্বামীর অত্যাচার ও মহাজনের বিকট বিভীষিকার আক্রমণে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, তাহার ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুবুদ্ধি-সঙ্গত উপায় অবগত নহে। তদুপরি এবং সর্ব্বোপরি দারিদ্র্যের কশাঘাত, রিপুর তাড়না, অজ্ঞানের অন্ধকার, অসভ্যতার অনাচার, বাসনার বিকার ইত্যাদিতে তাহারা অনেকেই দুর্লভ নর-জীবনেও পশ্বাধমরূপে জীবন যাপন করিতেছে। এ সকল চিন্তা করিলে, সহৃদয় সমাজ-হিতৈষীর মস্তক অবনত, হৃদয় মথিত, নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয় না কি? শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীস্থ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে এ চিন্তা আসে না, শত অভাবের অরুন্তুদ-দংশন-ক্লিষ্ট হতভাগ্য নিম্নশ্রেণীর জন্য যাঁহার প্রাণ কাঁদে না, তাঁহাকে ধিক্! তাঁহার সে ব্যর্থ শিক্ষা-সভ্যতার বিকৃত বিলাস-বিভ্রমে ধিক্!

ছিঃ! ও মুচী, ওর সঙ্গে মিশিব না; থুঃ! ও মেথর, ওর কাছে ঘেঁষিব না; ও চণ্ডাল, ওর সঙ্গে আলাপও করিব না; ও চাষা, ছোট লোক, ও মূর্খ—পাড়াগেঁয়ে ভূত, ওর

সংস্রবে থাকিব না, ইত্যাকার ঘোর তামস গর্ব্বান্ধতা বা মোহান্ধতা, বুদ্ধি-বিকার ও কুসংস্কার; নিম্নশ্রেণীর প্রতি এই প্রকার অমার্জ্জনীয় অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অনেকস্থলে অন্ততঃ অন্তঃশীল ভাবেও আমাদের উচ্চশ্রেণীতে বর্ত্তমান। বাহিরে উদারতা— অন্তরে সংকীর্ণতাই সমাজের দুশ্চিকিৎস্য ব্যধি। প্রাগুক্তভাব যতদিন আমাদের উচ্চশ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইবে, ততদিন সে নাম-মাত্র "উচ্চশ্রেণী" সংজ্ঞা যথার্থ বলিয়া জ্ঞানীজন কর্ত্তৃক কদাচ স্বীকৃত হইবে না। সে "তথা-কথিত" (So-called) উচ্চশ্রেণীদ্বারা নিম্নশ্রেণীর অভাব-আকাঙ্ক্ষা কদাচ পূর্ণ হইবেনা। সে উচ্চশ্রেণীর চেষ্টায় সমাজোন্নয়ন সম্পূর্ণ সুদূরপরাহত।

উপসংহারে নিবেদন, শত বক্তৃতা, রচনা, হুজুকের আলোচনা; শত ধর্ম্মসভা, কর্ম্মসভা, ব্রহ্মসভা, একদিকে, আর যথার্থ কাজ একদিকে। যথার্থ কাজ যাহাতে কিছু হয়, তাহাই চাই। যদি নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়াই এক্ষণে উচ্চশ্রেণীর প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হয়, তবে তদ্বিষয়ে যথার্থ কার্য্যোপযোগিতার জন্য উচ্চশ্রেণীতে ভূরি আন্দোলনের প্রয়োজন; এবং কেবল আন্দোলনেই আন্দোলিত না হইয়া, যাহাতে উচ্চশ্রেণী-অভিমানী প্রত্যেকেই নিজ জীবনে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন-কল্পে কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন, তাহাই প্রার্থনীয়। উচ্চশ্রেণীস্থ সকলেই যথাশক্তি ও যথাসম্ভবভাবে ইহাকে জীবনের একটা বিশেষ ধর্ম্ম্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে ইহার যে কোনরূপ একটা আনুষ্ঠানিক কার্য্যাংশ (part) লইয়া, যে-কোন প্রকারে নিম্নশ্রেণীর উন্নয়ন উদ্দেশে যে কোন কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, তাঁহার উচ্চশ্রেণীস্থ জীবনের সার্থকতা হইবে।

উচ্চ ও নিম্ন পরস্পর-সাপেক্ষ (co-relative), অতএব নিম্নের সংস্রবশূন্য উচ্চতা কিরূপে সম্ভবে? নিম্নকে ফেলিয়া যাইও না—নিম্নকে সঙ্গে লও; নিম্নকে পাছেং— কাছেং রাখিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হও। ইহাই সমাজোন্নয়ন সাধনের মূলমন্ত্র। সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবান কৃপা করিয়া আমাদের অধঃপতিত সমাজে এই সাধনা সিদ্ধ করুন। শ্রীশঃ—

-----০ঃ০ঃ০-----

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(শ্রীমঃ-লিখিত।)

(শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কথোপকথন।)

আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। চিকিৎসার্থে কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজি ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, একথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহ মধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ; ঘরের মধ্যে শয্যা-রচনা হইয়াছে, তিনি তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দানী, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়াও দান করেন; আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর-চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬।৭ ঘণ্টা ধরিয়া থাকেন; ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা হইয়াছে। বাহিরে জ্যোৎস্না, পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন-চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘরে অনেক লোক, অনেকেই মহাপুরুষকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। শুনিবেন, তিনি কি বলেন—দেখিবেন, তিনি কি করেন।

ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

(নির্লিপ্ত সংসারী)

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু মোন বোঝা আছে, আর বর যাচ্চে; মাথায় বোঝা, তবুও সে বর দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।

যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌড়ী জলে সর্ব্বদা ডুব মারে, কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই আর গায়ে জল থাকে না।

(নির্লিপ্ত হ'বার উপায়)

কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে, কিছু সাধনা করা চাই। দিনকতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছমাস হোক, তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়, সর্ব্বদা তাঁহারকাছে ব্যাকুল হয়ে ভক্তির জন্য প্রার্থনা কর্‌তে হয়; আর মনে মনে বল্‌তে হয়, আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু'দিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব; হায়! কেমন করে তাঁরে পাব?"

ভক্তি লাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আর আটা লাগে না।

সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখ্‌তে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাত্‌তে হয়। দই পেতে মাখম তুল্‌তে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা হলে জলে মিশ্‌বে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাকবে।

ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, "মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মত নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার কর্‌বো।" আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে, ঊর্দ্ধপদ হয়ে, কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেঁটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার কর্‌তে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্‌তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি কর্‌লে দই বসে না।

জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কিনা দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে

থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

জনক ভারি বীর পুরুষ। দুখানা তরবার ঘুরুতেন; একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

(সংসার-আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞান)

যদি বল, সংসার-আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস-আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কিনা। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, ওটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর থাকৃতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকৃতে গেলে, যত সিয়ানই হও না কেন, কালদাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, তা হলে মাখন নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হলেই সন্দেহ হয়।

খই যখন ভাজা হয়, দুচারটে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ে। সে-গুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মতন দাগশূন্য হন। আর জ্ঞানের পর সংসার-খোলায় থাক্‌লে, একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হোতেও পারে। জনকরাজার সভায় একটি ভৈরবী এসেছিলেন। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচ করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, "হে জনক! তোমার এখনও স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণ জ্ঞান হলে, পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রী-পুরুষ ব'লে ভেদ-বুদ্ধি থাকে না।

যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে একটু দাগ থাকৃতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম্ম—লোকসংগ্রহার্থ)

কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা অনেকে নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন। তাঁরা বীর পুরুষ।

হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটী পাখী বস্‌লে ডুবে যায়, কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam-Boat আপনিও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

নারদাদি আচার্য্য এই বাহাদুরি কাঠের মত, এই Steam-Boatএর মত।

কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাক, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটি আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খায়।

নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরেও ভক্তি নিয়েছিলেন।

(জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুঁজে যায়, আর চক্ষে জল আসে। তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বা'রবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পাবে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে—এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভাবি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন্ পথ, সে জানত না—দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিমদিকে গিয়েছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করত। তারা বলে দিল, 'এ পথে নয়. ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিয়েছিল!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে. কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার—আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়েছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখতে লাগ্‌ল, জগন্নাথের গায়ে ঠ্যাকে কি না। একবার এ ধার থেকে ও ধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে. জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌ল না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই! পুনর্ব্বার দণ্ড এ ধার থেকে ও ধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেক্‌ল! তখন সন্ন্যাসী বুঝল, যে ঈশ্বর নিরাকার, আবার সাকার।

কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন? এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানা রূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেছেন, তাই তিনি নিরাকার। তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

একজনের এক গাম্‌লা রঙ্ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্ করতে আস্‌তো। সে লোকটি জিজ্ঞাসা করতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও?' একজন হয়তো বল্লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই।' অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে সেই কাপড়খানি ছুপিয়ে বল্‌তো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন বল্লে, 'আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটি সেই গামলায় কাপড়খানি ডুবিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার হল্‌দে রঙ্।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীল রঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে যে রঙে ছোপাতে চাইত, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হ'বে?' তখন সে বল্লে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)

একজন বাহ্যে গিয়েছিল—দেখ্‌লে, গাছের উপর একটি সুন্দর জানোয়ার রয়েছে।' সে এসে আর একজনকে বল্‌লে, 'ভাই! অমুখ গাছে আমি একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটি বল্‌লে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ্‌ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ্‌।' আর একজন বল্‌লে, 'না, না, সে সবুজ হতে যাবে কেন? সে যে হল্‌দে, এইরূপে আরও কেউ কেউ বল্‌লে, বেগুনি, নীল, কাল, ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া; তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে।' তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বল্‌লে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটিকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বল্‌ছো, সব সত্য, সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল, আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি, যেন কোন রঙই নাই!

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি। সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ -- আবার নির্গুণ (the Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ্‌, আবার কখন কখন কোন্ রঙই থাকে না! অন্য লোক কেবল তর্ক-ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র, কূল-কিনারা নাই। ভক্তি-হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত (Personal God) হয়ে— কখন কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞান-সূর্য্য উঠ্‌লে, সে বরফ গলে যায়।

ডাক্তার। সূর্য্য উঠ্‌লে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে, রূপ টুপ্‌ উড়ে যায়! তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না! তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (the Absolute) তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন-বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। (the Unknown and Unknowable)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বলে, ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল জমে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আট্‌কে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আট্‌কে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরের জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' তাতেও ক্ষতি নাই; জ্ঞানসূর্য্যে বরফ গলে যাবে;— তবে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরই রইল।

(কাঁচা-আমি ও পাকা-আমি; ভক্তের আমি)

"জ্ঞান-বিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোনমতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে ফিরে এই সংসারে আস্‌তে হয়।

গরু 'হাম্বা'হ (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, কিম্বা কসাইয়ে কাটে, তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষে নাড়ী-ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু (তুমি, তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয়।

যখন জীব বলে, 'নাহং' 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু, তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস-আমি' হয়ে। (সকলের হাস্য)

সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস-আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোকশিক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন।

দাস 'আমি,' বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি', এরই নাম 'পাকা আমি।'

"'কাঁচা আমি' কি জান? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান, আমাকে এমন কথা বলে, এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষ-পত্র কেড়ে নেয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিসে দেয়। বলে কি, জানে না, কার চুরি করেছে।

(বালকের আমি)

ঈশ্বর-লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি' ও পাকা 'আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা! আবার রজোগুণের বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় প'রে বেড়াচ্চে। খানিক ক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয় বগলদাবায় করে বেড়াচ্চে।

যদি ছেলেটিকে বল, 'বেশ কাপড়খানি রে!' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড় খানি দাও না।' সে বলে, 'না আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে; না, আমি দেব না'। তার পর ভুলিয়ে একটি পুঁতুল কি একটি বাঁশী যদি হাতে দাও, তাহলে পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে! আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণের আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, এক দণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না; কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য যায়গায় চলে গেল, তখন নতুন খেলুড়ে হল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরোণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত-অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, ও তোর দাদা হয়, তা সে ষোলআনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো-পোঁদে খাবে। আবার লোক-লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছুন ফিরে বলে 'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কি না।'

আবার 'বুড়োর আমি' আছে। (ডাক্তারের হাসা) বুড়োর অনেকগুলি পাশ। জাতি-অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, ইত্যাদি। বিষয়-বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না; হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিনই যায় না। তার পর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। 'বুড়োর আমি' কাঁচা-আমি।

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কেনিল্‌ওয়ার্থ। (সার্ ওয়াল্‌টারস্কটের উক্ত নামধেয় বিখ্যাত নভেলের বঙ্গানুবাদ) শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র-অনুবাদিত। মূল্য ১৷০, কলিকাতা, ৪২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্ হইতে প্রকাশিত। পুস্তকখানি তিনশতাধিক পৃষ্ঠায় সংপূর্ণ। কাগজ, ছাপা, বাইণ্ডিং সুপরিপাটি। শরৎবাবু অনুবাদেই মৌলিকগ্রন্থকারের সভা য শংলাভের যোগ্য হইয়াছেন। আমরা আদ্যন্ত পাঠে পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনেক স্থলে মৌলিক পুস্তক প্রণয়ন অপেক্ষাও এ প্রকার সুসম্পাদিত অনুবাদের অধিকতর উপযোগিতা অনুভূত হয়। পুস্তকস্থ পাত্র-পাত্রীগণের ও স্থানাদির নাম গুলি বিদেশীয় না হইলে, ইহাকে "অনুবাদ" বলিয়া বুঝা কঠিন হইত। মূল গ্রন্থের ভাব-মাধুর্য্য ও বর্ণনা-সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে অনুবাদক অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা শরৎবাবুর নিকট উত্তরোত্তর আরও এইরূপ উত্তম অনুবাদাভরণে বঙ্গসাহিত্যের প্রসাধন প্রত্যাশা করি। পুস্তকখানিতে কতকগুলি বর্ণাশুদ্ধি আছে; আশাকরি, ২য়সংস্করণে সে গুলি সংশোধিত হইবে।

ভারতী। "ভারতী" বহুকালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা। যে পরিবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী নির্ব্বিবাদে চিরবিরাজিতা, বঙ্গের সেই বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবার হইতেই ভারতীর প্রচার; সুতরাং অর্থ-সাধ্য অঙ্গসৌষ্ঠবে ও জ্ঞান-সাধ্য বিষয়-গৌরবে "ভারতী" চিররূপসী ও গরীয়সী। তবে কিনা, ভারতীর বীণায় পূর্ব্বেকার সে বেহাগ-বাগশ্রীর আলাপ অধিক আর বাজে না; ইদানীং "পিলু-বাঁরোয়া" প্রভৃতিরই লঘু-ললিত ঝঙ্কার অধিক শুনি। ফলে মিষ্টতা ও শিষ্টতার ত্রুটি নাই।

স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত এম্—বি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ২৩নং মদন মিত্রের লেন্ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। অস্মদ্দেশে এরূপ একখানি সাময়িক সন্দর্ভের অভাব ছিল; এই জন্য "স্বাস্থ্য"কে আমরা সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এখানি দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। তবে কিনা মাত্র পাশ্চাত্য বিধানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসাদির প্রচার এদেশে সম্যক্ উপযোগী ও উপকারী হইবে না; ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিধি-ব্যবস্থার সংমিলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি, দুর্গাদাস বাবু জনৈক আয়ুর্ব্বেদবিৎ সহকারীর সহযোগিতায় স্বীয় সময়োপযোগী সন্দর্ভ খানির সুসম্পন্নতা বিধান করিবেন।

সাবিত্রী। এখানি স্ত্রী-পাঠ্য মাসিক পত্রিকা। কলিকাতা ৩৫নং মিরজাফর্ লেন হইতে শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগ্‌চি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ মাত্র। হিন্দু-রমণীগণের সুপাঠ্য সাময়িক পত্রাদির বড়ই অভাব; এখানি দ্বারা তাহার আংশিক পূরণের আশা করা যায়। তবে লেখা গুলি কিছু কাঁচা কাঁচা। সম্পাদক মহাশয় পাকা-হাতের লেখা সংগ্রহে যত্নবান হউন; তাহা হইলে পত্রিকাখানির অচিরাৎ আশানুরূপ উন্নতি হইবে।

অন্তঃপুর। বনলতা দেবী-সম্পাদিত। কলিকাতা, বরাহনগর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। কেবল মাত্র স্ত্রী-লেখিকাগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। ইহাই ইহার বিশেষত্ব; সুতরাং অপাততঃ লিপি-গৌরব তাদৃশ না থাকিলেও, এই জন্যেই ইহার অনুকূলে সাধারণের উৎসাহ-দান একান্ত প্রার্থনীয়।

বামাবোধিনী। অনেক দিনের স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা। প্রায় ৪০ বৎসর চলিতেছে। মাত্র এই কথাতেই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা হয়; কারণ অস্মদ্দেশে সাময়িক সন্দর্ভের অয়ুষ্কাল সাধারণতঃ অতি সংক্ষিপ্ত "Survival of the fittest" এই পাশ্চাত্য প্রবাদ সত্যই বামাবোধিনীর বিশেষ গৌরবস্থল। পত্রিকাখানি পূর্ব্বে ব্রহ্মমত-প্রধানা ছিল, এখন ক্রমশঃ (দেশের সাধারণ-সমাজ-গতির সহিত) হিন্দুভাব-প্রাধান্যে পরিবর্ত্তিতা হইতেছে বোধ হয়। ইহা আরও শুভ লক্ষণ ও পত্রিকাখানির অধিকতর অভ্যুদয়ের কারণ। হইতেছেও তাহাই। ইদানীং বামাবোধিনী অনেকগুলি সুপাঠ্য লিপি-মালায় সমলঙ্কৃতা হইয়া বাহির হইতেছে; সুতরাং সমাদরও বাড়িতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব।—ত্রৈমাসিক দার্শনিক পত্রিকা। বার্ষিকমূল্য ১৲ টাকা। ৭৩।১ বেনিয়া-টোলা-ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সম্পাদিত। শুদ্ধ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার্থ এখানি ভিন্ন অন্য কোন সাময়িক সন্দর্ভ দৃষ্ট হয় না; এই জন্য সীতানাথ বাবু ধন্যবাদার্হ। সীতানাথ বাবুর নিজের ধর্ম্মমত ব্রাহ্মভাবের হইলেও, স্বাধীন দার্শনিক আলোচনায় কোন সমাজের আপত্তির কারণ নাই। বিভিন্ন মতবাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সাধারণ দার্শনিক সত্যেরই ঔজ্জ্বল্য বিকাশিত হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের ভাষা বিশদ-গম্ভীর,—দার্শনিক আলোচনারই উপযুক্ত।

পূর্ণিমা।—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। বাঁশবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকমূল্য ২৲ টাকা মাত্র। পত্রিকার কলেবর অনুসারে মূল্য অধিক নহে। ৬ বৎসর যাবত্ পত্রিকাখানি অনেক গুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সুলিপি-সাহায্যে দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। ইহার "মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা" সাহিত্য-সেবীগণের সুখ-পাঠ্য। শুনিয়াছি, বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম অভিভাবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়-চন্দ্র সরকার মহাশয় ইহার সম্পাদকতায় সংসৃষ্ট আছেন। সত্য হইলে, সুখের কথা এবং পূর্ণিমারও পূর্ণত্ব ও প্রোজ্জ্বল প্রভার অকাল-রাহুগ্রস্ত না হইবার কথা বটে।

অনুসন্ধান। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বটে; কিন্তু মাসিক সন্দর্ভের সুন্দর উপকরণে ও আকারে সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত। কাগজ ও মুদ্রণ সুন্দর। অনুসন্ধান হিন্দু-ধর্ম্ম ও সমাজের সেবক। অনুসন্ধানের লেখা সরস-প্রাঞ্জল-মধুর। মাঝে ২ কিছু তারল্য থাকে। বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ অনেকস্থলে সমাজ-হিতকর বটে, কিন্তু ভাবের তারল্য সাহিত্য-পোষণের পরিপন্থী। যাহা-হউক, মোটের উপর অনুসন্ধান সুন্দর। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ-সমাজের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারিণী মাসিক-পত্রিকা। বর্ত্তমান বর্ষে পত্রিকার দশমবর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার—স্বয়ং ভগবান, ইহা সমগ্র হিন্দুসমাজের সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত-সিদ্ধান্ত না হইলেও, বৈষ্ণব সমাজের বটে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরম ও পরম জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য—প্রেম-ভক্তি-পবিত্রতা, সমগ্র হিন্দুসমাজের—এমন কি, সমগ্র মানব-সমাজেরও অনুকরণীয় ও শিক্ষণীয়। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব লীলা-চরিত্র ও অতুল্য শিক্ষা-উপদেশ যে পত্রিকা দ্বারা প্রচারিত হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সে পত্রিকার সিদ্ধি-সমৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মূল ১৯।

বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ঃ মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।

মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং সৎ-সঙ্গতির্নির্ম্মমতেশ-ভক্তিঃ॥

শিষ্যের প্রশ্ন—(৫৫) কাহাদের সহিত বাস বা সংসর্গ কর্ত্তব্য নহে? গুরুর উত্তর—মূর্খ, নীচ, খল এবং পাপীগণের সহিত। কারণ "সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাং" অর্থাৎ জীব মাত্রের গুণ বা দোষ সংসর্গ জন্যই হইয়া থাকে।

১। মূর্খ-সংসর্গ। (ক)

চণ্ডায়তে বিবদতে স্বপিত্যশ্নাতি মাদকং।
করোতি নিস্ফলং কর্ম্ম মূর্খো বা স্বেষ্টনাশনং। (শুক্রনীতি)
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলং।
তস্মান্মূর্খসহস্রেষু প্রাজ্ঞএকো বিশিষ্যতে॥ (চাণক্য)

(ক) রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবাঃ।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ॥
নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনাঃ।
শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ ভিদ্যতে নচ নম্যতে॥
পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ; নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ। ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ বিবিধৈঃ মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্র-বিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধং॥ মূর্খস্তু পরিহর্ত্তব্যঃ প্রত্যক্ষং দ্বিপদং পশুঃ। ভিদ্যতে বাক্যশল্যেন হ্যদৃশ্যং কণ্টকং যথা॥

বরং গহনদুর্গেষ্বপি ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খ-জন-সংসর্গঃ সুরেন্দ্র-ভবনেষ্বপি ॥ (নীতিশতক)

মূর্খলোক অকারণ ক্রোধ করে, বিবাদ করে, নিদ্রায় সময় নষ্ট করে, মাদক দ্রব্য সেবন করে, বৃথা ভ্রমণাদি অনাবশ্যক কর্ম্মে রত থাকে, নাহয় অনবধানতা বশতঃ নিজের অনিষ্ট সাধন করে। পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির সকলই গুণ, আর মূর্খ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তির সকলই দোষ, এ নিমিত্ত সহস্র মূর্খজন অপেক্ষা এক জন পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ; অতএব দুর্গম অরণ্যে বনচর প্রাণিগণের সহিত ভ্রমণ করাও ভাল, কিন্তু সুরেন্দ্র-ভবনেও মূর্খজন-সঙ্গে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

ভ্রাতৃভক্ত মহাত্মা ভরত অরণ্যবাসী ভগবান রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত বনে গমন করিলে, রাম চন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণাং একমিচ্ছসি পণ্ডিতং।
পণ্ডিতো হ্যর্থ কৃচ্ছ্রেষু কুর্য্যান্নিশ্রেয়সং মহৎ ॥
সহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ ॥
অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা। (রামায়ণ)

হে বৎস! সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক। দেখ, সঙ্কটকাল উপস্থিত হইলে, পণ্ডিত ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। যদি রাজা সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত থাকেন, তাহা হইলেও তিনি তাহাদের দ্বারা কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারেন না। অতএব মূর্খজন-সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিত-সহবাসে থাকাই কর্ত্তব্য।

২। নীচ-সংসর্গ।

নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ (গরুড়পুরাণ)
উজ্জিতং সজ্জনং দৃষ্ট্বা দ্বেষ্টি নীচঃ পুনঃ পুনঃ।
কবলীকুরুতে স্বস্থং বিধুং দিবি বিধুন্তুদঃ ॥ (দৃষ্টান্তশতক)
দহ্যমানাঃ সুতীব্রেণ নীচাঃ পর যশোঽগ্নিনা।
অশক্তাস্তৎপদং গন্তুং ততো নিন্দাং প্রকুর্ব্বতে ॥ (চাণক্য)
নপ্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিৎ নীচসঙ্গাম্মহানপি।
বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ ॥ (১)

নীচব্যক্তি অন্যলোকের সর্ষপ-পরিমিত ক্ষুদ্র দোষ দেখিয়া থাকে, কিন্তু আপনার

(১) "হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃসহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্"॥

বিন্দু-পরিমাণ বড় দোষ দেখিয়াও দেখেনা, এবং রাহু যেমন আকাশে পূর্ণকর শশাঙ্কের শোভাদর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাকে গ্রাস করে, সেইরূপ নীচলোক সজ্জনকে উন্নত দেখিলে, পুনঃ পুনঃ দ্বেষ করিয়া থাকে। অন্যের যশরূপ সুতীব্র অগ্নিতে দহ্যমান নীচ ব্যক্তিরা তাহার পদলাভ করিতে সমর্থ না হইয়া নিন্দা করিতে থাকে। নীচ ব্যক্তির সঙ্গে থাকিলে, মহৎ ব্যক্তিও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পাবেন না। নীচ-সহবাসে মনুষ্যের বুদ্ধি হীনতাপ্রাপ্ত হয়; অতএব শাস্ত্রে বলিয়াছেন :—

"উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃ সহ সৎকথাং। অলুব্ধৈঃ সহমিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি"॥

যিনি নীচ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া উত্তমের সহিত বাস, পণ্ডিতের সহিত সদালাপ এবং লোভশূন্য ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করেন, তিনি কখনও দুঃখপ্রাপ্ত হন না।

চাণক্য নীতি-দর্পণে বলিয়াছেন :—

গম্যতে যদি মৃগেন্দ্র-মন্দিরং লভ্যতে করি-কপোল মৌক্তিকং।
জম্বুকালয়গতে চ প্রাপ্যতে, বৎসপুচ্ছ-খরচর্ম্ম-খণ্ডনং॥

যদি কেহ সিংহের গুহায় গমন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি করি-কপোলজাত মুক্তা লাভ করে, এবং শৃগালের গর্ত্তে গমন করিলে, গো-বৎসের পুচ্ছ ও গর্দ্দভের চর্ম্মখণ্ড প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত জম্বুকরূপী নীচ-জন-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া, সিংহরূপী উত্তমের সহবাসে থাকা মনুষ্যত্বরূপ-গজমুক্তা-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য।

৩। খল-সংসর্গ। (খ)

"অন্যোদয়াসহিষ্ণুশ্চ ছিদ্রদর্শী বিনিন্দকঃ।
দ্রোহশীলঃস্বাত্মনঃপ্রপন্নাস্যঃ খলঃ স্মৃতঃ"॥ (শুক্রনীতি)
"স্বীকৃত্বাপি স্বীয়হানিং পরনাশোদ্যতঃ সদা।
পরেষাং সুখতো দুঃখী খল এব প্রকীর্ত্তিতঃ"॥

(খ) খলতার তুল্য পাপ নাই "পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ" (গুণরত্ন)
"নদুর্জ্জনঃসাধুদশামুপৈতি বহুপ্রকারৈরপি শিক্ষ্যমাণঃ।
আমূলসিক্তঃ পয়সা ঘৃতেন ন নিম্ববৃক্ষো মধুরত্বমেতি"॥ (চাণক্য)
"ঘোর বিপিন মহ দেখি খল পুছহি পথিক চকাই।
কাহে বসহু বন মাঝ তুম্ কহহু মোহি সমুঝাই॥
খল কহে মেরে দেহকো লোথ্ বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব্ তঁখহি সব জগকে নর সমুদাই॥
সবকে অনহিত করণ হম্ বসহিঁ ঘোর বন মাহি।
করি নিজ হানি কবহিঁ খল পরকে বুরা সদাহি'॥ (দোঁহাবলী)
জনৈক পথিক কোন খলকে নিবিড় বনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মহাশয়! আপনি একাকী হিংস্রজন্তু-সঙ্কুল এ ঘোর বনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? পথিকের বাক্য শুনিয়া খল কহিল, "আমি খল, নিরন্তর পরের অনিষ্ট-চেষ্টাই করিয়া থাকি। আমি এই ভয়ঙ্কর বনে এই জন্যে দাঁড়াইয়া আছি যে, ব্যাঘ্র আমার প্রাণ নষ্ট করিয়া দেহ-মাংস ভক্ষণ করিলে, নরমাংসের আস্বাদ পাইবে, এবং লোভে পড়িয়া সকল মনুষ্যের প্রাণবধ করিয়া খাইয়া ফেলিবে।" (!)

পরশ্রী-কাতর, পরের দোষানুসন্ধায়ী, পরনিন্দক; পরহিংসাতৎপর, মলিনান্তর—অথচ সহাস্য-বদন ব্যক্তিকেই খল বলা যায়। যে ব্যক্তি নিজের ক্ষতি-স্বীকারেও সর্ব্বদা পরের বিনাশ-সাধনে তৎপর এবং পরের সুখে দুঃখ বোধ করে, সেই ব্যক্তিকেও খল বলে। (গ)

"হিংস্রজন্তু সমীপঞ্চ ন গচ্ছেৎ দুঃখকারণং।
খলেন সার্দ্ধং মিলনং ন কুর্য্যাৎ শোককারণং॥
খলেন মিত্রতাং হিত্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং।
মূর্খেন সঙ্গং হিত্বা চ গচ্ছ সজ্জন-সন্নিধৌ।"

হিংস্রপ্রাণীর নিকট গমন করিলে প্রাণবিনাশাদি দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব হিংস্রজন্তুর নিকট গমন করা কর্ত্তব্য নহে। আর খলের সহিত মিলনেও অশেষ শোকপ্রাপ্ত হইতে হয়; এ নিমিত্ত খলের সঙ্গ কর্ত্তব্য নহে। যদি নিজের মঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে খলের সহিত মিত্রতা ও তৎসঙ্গ এবং মূর্খ ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সজ্জন-সন্নিধানে গমন কর।

৪। পাপিষ্ঠ-সংসর্গ।

"নিষিদ্ধকর্ম্ম-করণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং"।

নরক-ভোগাদি বিষম অনিষ্টের হেতু বলিয়া শাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, তাহার নাম "নিষিদ্ধ কর্ম্ম"—যথা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ইত্যাদি। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তাহাকে 'পাপী' বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ী চট্টোপাধ্যায়।

(গ) "বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায় শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য, সাধোর্বিপরীতমেতৎ, জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥
"তুষ্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা ঘন-গর্জ্জিতে।
"সাধবঃ পরসম্পত্তৌ খলাঃ পরবিপত্তিষু॥
"খলোঽবলোকতে দোষান্ গুণপূর্ণেষু বস্তুষু।
"বনে পুষ্পফলাকীর্ণে পুরীষমিব শূকরঃ॥"
বিষাগ্নি সর্প শস্ত্রেভ্যো ন তথা যায়তে ভয়ং।
অকারণ-জগদ্বৈরি-খলেভ্যো জায়তে যথা॥
দ্বিজিহ্বমুদ্বেগকরং ক্রূরমেকান্ত দারুণং। খলস্য হাস্য-বদনং অপকারায় কেবলং॥
প্রাক্ পাদয়োঃ পততি খাদতি পৃষ্ঠমাংসং। কর্ণেকলং কিমপি রৌতি শনৈর্বিচিত্রং।
ছিদ্রংনিরূপ্য সহসা প্রবিশত্যশঙ্কঃ, সর্ব্বং খলস্যচরিতং মশকঃ করোতি॥
গ্রীষ্মে সূর্য্যাংশু-সন্তপ্তমুদ্বেজনমনাশ্রয়ং। মরুস্থলমিবাত্যুগ্রং ত্যজেৎ দুর্জ্জনসঙ্গতিং॥
নিশ্বাসোদ্গীর্ণ হুতভুক্ ধূম-ধূম্রীকৃতাননৈঃ। বরমাশীবিষৈঃ সঙ্গং কুর্য্যান্নত্বেব দুর্জ্জনৈঃ॥
খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া। উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বা বিসর্জ্জনং॥

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশেষ মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে "আমি"-জ্ঞান দাচই মায়া বা ভাণ মাত্র নহে, ইহা অত্যন্ত ভিতরের; সমস্ত উপাধি যাইলেও ইহা র্ত্তমান থাকে। আমার শরীর, আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, আমার মন, ইত্যাদি কার জ্ঞান অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং 'আমি' ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র; দি আমি স্বতন্ত্র না হইতাম, তাহা হইলে কদাচ আমার শরীর, আমার মন, আমার ত্যাদি, এরূপ অনুভব হইত না। আমি ও আমার দ্রব্য এক হইতে পারে না। শরীর, ন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সকলই আমার জ্ঞান-বিষয়, সকলই পরিবর্ত্তনশীল, সকলই মার ভোগ্য, আমি ভোক্তা এবং পরিবর্ত্তনশীল সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া, সকল রিবর্ত্তনেরই আমি দ্রষ্টা এবং আমি নিত্য। এই যে নিত্য আমিত্বের অনুভূতি, ইহাদ্বারা ইই জানা যায় যে, ইহা সর্ব্বভূতে এক নহে। এক হইলে, 'আমি' এ প্রকার ভব কখনই সম্ভব হইত না। কেননা 'আমি'-জ্ঞানই 'তুমি' প্রভৃতি জ্ঞানের রিচায়ক ও ভেদ-ব্যপদেশক। আমা হইতে স্বতন্ত্র কোনও বস্তু না থাকিলে 'আমি' াকার অনুভূতি একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িত। আমাতে সংযুক্ত সমস্ত উপাধি ড়িয়া দিলেও 'আমি' থাকি। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত এই 'আমি'ই বেদান্তের ব্রহ্ম। কেই লক্ষ্য করিয়া শঙ্কর বলিতেছেন,—

অহং শব্দেন বিখ্যাত একএব স্থিতঃপরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩১।

আত্মা দেহাতীত, অহং-শব্দ-লক্ষিত এবং 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান হইলে যাঁহাকে ধ করা যায়, তিনিই আত্মা। আত্মা এক, কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ভেদে দেহ ক। দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া আত্মা কখনই দেহময় বা দেহজাত হইতে পারে না।

অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহো দৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্॥ ৩২॥"

অহং('আমি') প্রত্যয়ের অবলম্বনীভূত আত্মা দ্রষ্টা। আমি শুনিতেছি, আমি দেখিতেছি, াদি অনুভব আত্মারই হইয়া থাকে; এইরূপ আমি দেখিতেছি, ইত্যাদিরূপে অনুভূত দ্রব্য আমা হইতে ভিন্ন। সোপাধিক দ্রষ্টা ও দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না; "ইহা আমার" ইত্যাকার জ্ঞান যে দ্রব্যের প্রতি প্রযুক্ত হয়, সেই দ্রব্য হইতে আমি ভিন্ন, ইহা স্বভাবতঃই অনুভূত হয়। যেমন "আমার ঘট" এইরূপ প্রয়োগে ঘটে

কেবল আমার সম্বন্ধ প্রতীয়মান হয়, কদাচই "আমি ঘট" এইরূপ অভেদ-জ্ঞান হয় ন
সেইরূপ "আমার দেহ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, দেহেতে আপন সম্বন্ধ প্রকাশ পায়; কি
দেহের সহিত আত্মার ঐক্য প্রতীত হয় না; অতএব কিরূপে আত্মা দেহজাত বা দেহম
হইবেন? দেহের সহিত আত্মার সংযোগ যে দুঃখের কারণ, তাহা পরে দেখাইব।

অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩।

"আমি" এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ীভূত আত্মা বিকারহীন; কিন্তু দেহ সর্ব্বদাই বিকা
প্রাপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, শরীরাদি সর্ব্বক্ষণই পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু সে
সমস্ত পরিবর্ত্তনের অবলম্বন এক নিত্য 'আমি' থাকে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পরিবর্ত
ঘটে। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে "আমি সেই" ইত্যাকার জ্ঞান এই আমিত্বেরই পরিচায়ক
দেহ বিকারী, "আমি" স্বরূপতঃ বিকারী নই, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীত হয়; সুতরা
পুরুষ কখনই দেহময় বা দেহজাত নয়।

শঙ্করাচার্য্য এখানে দেহাদিতে অভিমানী ভাণ-জীবত্বকে মিথ্যা মায়া মাত্র দেখাই
নিত্য জীবকেই ব্রহ্ম স্বরূপ দেখাইলেন।

এক্ষণে এই বেদান্ত-প্রতিপাদ্য "অহং"—ইনিই ব্রহ্ম, তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দে
থাকিতে পারে না। অনুভব, যুক্তি ও শাস্ত্র, সকলেই সমস্বরে জানাইতেছে যে "আ
ইত্যাকার জ্ঞান সকল সময়েই থাকে, ইহার কোনও বিকার নাই, ইহা নিত্য; তা
ইহাতে ইহা ব্যতীত অন্য যাহা যাহা সংযুক্ত হয়, তাহার বিকার আছে। কেন সংযু
হয়, পরে বলা হইবে; কিন্তু "সংহত" পদার্থ যে বিকারী, তাহা সাক্ষাৎসিদ্ধ। প
বিচার করিয়া দেখিব, এই দ্রষ্টা নিত্য-অহং (আত্মা) এক কি অনেক। যদি এ
হয়েন, তবে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দটী ব্যবহৃত হয়, ইনিই সেই ব্রহ্ম; কি
যদি এক না হয়েন, তবে যখন ইহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তখন সেরূপ অর্থে 'ব্রহ্ম' ব্যবহার ক
হয় না। আধুনিক মায়াবাদীগণ শ্রুতির তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না, এই জন
"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" ইত্যাদি অদ্বৈত-শ্রুতির সাহায্যে "আমিই ব্রহ্ম" ইহ
অর্থ আমি সর্ব্বজীবের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্, এইরূপ মনে করেন। ব্রহ্ম শব্দে যে ভগব
নয়, একথা স্বয়ং ভগবানই বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্যচ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭।
[গীতা, ১৪শ অধ্যায়।]

আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমারই একাংশ ব্রহ্ম, অপরা
প্রকৃতি; এজন্য শাশ্বত ধর্ম্মের আশ্রয়ও আমি, আর তজ্জনিত ঐকান্তিক সুখে

াকর আমি। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি অব্যয় নিত্য ব্রহ্মের াশ্রয়। আধার ও আধেয় কখনই এক হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্ম ও ভগবান খনই অভেদভাবে এক হইতে পারেন না। ভগবান ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যযুক্ত—সগুণ; ব্রহ্ম নরৈশ্বর্য্য—নির্গুণ। ব্রহ্ম নিত্য স্বরূপস্থ, সুতরাং ব্রহ্ম ব্রহ্মই; ঈশ্বর তটস্থে ভগবান, রূপে ব্রহ্ম। এইভাবে ভগবান বা ঈশ্বরে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। "প্রতিষ্ঠা" কথার অর্থ শঙ্কর রিয়াছেন "প্রতিতিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি", যাহাতে কোনও বস্তু থাকে, সে সেই বস্তুর প্রতিষ্ঠা বা াশ্রয়। সোপাধিক আশ্রয়-আশ্রিত অভেদ-ভাবে থাকিবে কিরূপে? সুতরাং স্বীকার রিতেই হইবে যে, এই ভাবে (আধার-আধেয়-ভাবে) ব্রহ্ম ও ভগবান্ অভিন্ন নহেন। ঠোপনিষদেও দেখিতে পাই,——

যস্য ব্রহ্মচ ক্ষেত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং কইথাবেদ যত্রসঃ॥ [২য়া বল্লী-কঠ।]

অর্থাৎ যিনি মৃত্যুর সাহায্যে ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করেন, সেই রমাত্মাকে সাধনহীন অজ্ঞানীরা কিরূপে জানিবে? বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম নিত্য, তদ্ব্যতীত কলই মায়া, সকলই অনিত্য; তিনি সকল জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সাক্ষী স্বরূপ র্ত্তমান থাকেন। পুরুষ নিত্য, সুতরাং পুরুষই ব্রহ্ম। ভগবান্ হইতে ইনি পৃথক্। পূর্ব্বে খাইয়াছি, পুরুষ দুই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য। ঈশ্বর এই নিত্য ও অনিত্য রুষের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা, ইনি পরমাত্মা। আত্মা জীব-চৈতন্য, তিনি ব্রহ্ম; পরমাত্মা ই আত্মার অধিষ্ঠান। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য ও অনিত্য পুরুষের কথা বলিয়াছেন;—

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ"।
"উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥"

বেদান্ত কেবল ক্ষর পুরুষের অনিত্যতা দেখাইয়া, শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত নিত্যপুরুষকেই হ্ম বলিয়াছেন। নিত্য জীবকেই বেদান্ত যদি ব্রহ্ম না বলিতেন, তবে এই প্রাতিভাসিক নিত্য জীবের প্রতিষ্ঠা নিত্য-জীব-ভাব "আমি" কোথায় থাকিবে? ছায়া অবশ্যই স্তুর অনুরূপ হইবে। নিত্য জীব না থাকিলে, মায়িক জীব কদাচই সম্ভাবিত নহে। ীব স্বরূপতঃ সনাতন। বিভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। [গীতা।]

যতই শাস্ত্র আলোচনা করিবেন, এই মায়াবাদের ভ্রম দেখিয়া ভক্তিমান্ হইতে সক্ষম ইবেন; নতুবা শুষ্কজ্ঞানে দুর্ব্বলতা ও নাস্তিকতা যুগপৎ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর অজ্ঞান- প অন্ধকূপে পাতিত করিবে। পুনর্ব্বার গীতাবাক্যে দেখিতেছি, জীব নিত্য, ভগবান্ মস্ত জীবের অধিনায়ক।—

যস্মাৎক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদেচ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

আমি (ঈশ্বর) পূর্ব্বোক্ত অনিত্য মায়িক পুরুষের অতীত এবং নিত্য চিন্ময় জীব-সমূহের নিয়ন্তা, এই নিমিত্ত সংসারে এবং বেদে আমাকে পুরুষোত্তম বলে।

চিন্ময়, প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানই চিৎ-কণা জীব সমূহের নিয়ন্তা ও ভর্ত্তা স্বরূপ। শ্রুতিতে দেখিবেন,—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥ ১৩॥

[শ্বেতাশ্বতর, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।]

যিনি সমস্ত নিত্য জীবের মধ্যে নিত্য—অর্থাৎ প্রধান, সমস্ত চেতনাশালীদিগের চৈতন্য-প্রদাতা, জগজ্জীবের যিনি এক মাত্র কর্ম্মফল-প্রদাতা, সেই সাঙ্খ্যযোগ-গম্য পরমাত্মা পরমেশ্বরকে জানিলে, জীব সর্ব্বপ্রকার মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হয়।

মোক্ষই বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রকৃতির বন্ধন হইতে জীবের কিসে মুক্তি হইবে, তাহাই বেদান্ত প্রভৃতি সমস্ত দর্শন দেখাইবার জন্য প্রকৃতি হইতে ভিন্ন চিন্ময় পুরুষকে দেখাইয়াছেন, এবং প্রকৃতির সহিত সংযোগই যে দুঃখের কারণ, তাহাও দেখাইয়াছেন। চিন্ময় সাক্ষী স্বরূপ পুরুষকে কখনও বেদান্ত অনিত্য বা মায়িক বলেন নাই।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুমান্"—ভগবান্ কপিল সাঙ্খ্যদর্শনে এই সূত্রে দেখাইয়াছেন পুরুষ শরীরাদি হইতে ভিন্ন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ হইতে "আমি" যথার্থই ভিন্ন জাগ্রদবস্থায় স্থূলদেহে আমি বর্ত্তমান থাকিয়া, স্থূল দেহেতে অভিমান বশতঃ "আমি গৌর" "আমি স্থূল" ইত্যাদি রূপ অনুভব করি; আবার স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহ অজ্ঞান হইয়া বিছানায় শয়ান থাকিলেও "আমি" সজ্ঞান থাকি! স্থূল শরীর অজ্ঞান হওয়ায়, আমার "আমি" জ্ঞানের কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জাগ্রদবস্থায় আহৃত কর্ম্ম-সংস্কার আমি স্বপ্নাবস্থায় ভোগ করি। সুতরাং আমি স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন। মন নানাবিধ ভোগ করিয়া থাকে, আমি তাহা দেখি মাত্র। মন কোনও বিষয়ে সুখী হইল, মনের সুখের সাক্ষীস্বরূপ আমি থাকিয়া তাহা অবলোকন করি; নতুবা মনের সুখ-দুঃখ আমি জানিতাম না। সুখ-দুঃখাদি মনের ধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম নহে; যদি আমার ধর্ম্মই হইত, তাহা হইলে আত্মা স্বয়ং সুখাত্মক হইয়া সুখভোগ করেন, এইরূপ "কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-বিরোধ" হইয়া পড়িত, এবং আমার সুখবোধ হইতেছে, এরূপ অনুভব কখনও হইত না। যেমন শরীরে

আত্মজ্ঞান বশতঃ "আমি কৃশ" ইত্যাদি অনুভব হয়, তদ্রূপ বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ আমার সুখবোধ হইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়; বস্তুতঃ আমি সুখ ও দুঃখাদির দ্রষ্টা মাত্র। আমার মনকে আমি বশীভূত করিতে পারিতেছি না, আমার মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতেছে, এইরূপ অনুভূতি হইতে জানা যায় যে, আমি মন প্রভৃতি হইতে ভিন্ন। আবার প্রগাঢ় স্বপ্নহীন সুষুপ্তিতে যখন চিত্তাদি অজ্ঞানে ডুবিয়া যায়, তখনও আমি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই অজ্ঞানকে দর্শন করি; সেই জন্যই জাগিয়া স্মরণ হয় যে, আমি এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম, অর্থাৎ অজ্ঞানকে অনুভব করিতেছিলাম! অজ্ঞানের অনুভবকর্ত্তা যদি আমি না হইতাম, তাহা হইলে "এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম" এরূপ জ্ঞান আমার কখনই হইতনা। অতএব আমি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির দ্রষ্টা স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত। এইজন্য আমরা সাংখ্যসূত্রে দেখিতে পাই,—ভগবান্ কপিল জীবের স্বরূপ নির্ণয় করাইবার জন্য বলিয়াছেন,—

"সুষুপ্ত্যাদি সাক্ষিত্বম্"।

শাস্ত্রান্তরে আছে,—

"জাগ্রৎ স্বপ্নঃ সুষুপ্তিশ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন ব্যবস্থিতঃ॥

ভগবান কপিল "ত্রিগুণাদি বিপর্য্যয়াৎ" সূত্রে আমি সুখ-দুঃখাদি-ধর্ম্মা চিত্তাদি হইতে ভিন্ন, ইহাই বুঝাইয়াছেন। বলিতে পারেন, পুরুষ যদি নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, সাক্ষীস্বরূপ, তবে "আমি জ্ঞানী" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি প্রকার অনুভূতি কেন হয়? তাহার কারণ স্থিরভাবে আলোচনা করিলে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলিতেছেন,--

"দ্রষ্টা দৃশিঃ মাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ"

পুরুষ দ্রষ্টা, চিন্মাত্র, স্বয়ং নির্ম্মল ও নির্ব্বিকার হইয়াও বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া, বুদ্ধিতে অধ্যাস বশতঃ স্বয়ং দেখিয়া থাকেন।

বুদ্ধি কি? পুরুষ যাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিয়া থাকেন, তাহাই বুদ্ধি বা দৃশ্য। বুদ্ধি বিষয়াকার বা চিত্তবৃত্ত্যাকার গ্রহণ করে ও পুরুষ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, বুদ্ধির বিষয়রাগ তাহাতে কলিত হয়, সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" এইরূপ অনুভব হয়। সাংখ্যসূত্রেও দেখি,—

"উপরাগাৎ কর্ত্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাচ্চিৎসান্নিধ্যাৎ" ॥

(১৬৪, সাং, ১ম অধ্যায়)

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সংযোগ হইলেই, প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে এবং পুরুষের ধর্ম্ম

প্রকৃতিতে সংযুক্ত হয়। সেই জন্য "আমি কর্ত্তা" "আমি সুখী" "আমি দুঃখী" ইত্যাদি-রূপ অনুভব হইয়া থাকে। এই পুরুষ নিতান্ত নির্গুণ। জ্ঞান, সত্তা বা আনন্দ ইঁহার গুণ নহে। যদি ইনি গুণপদার্থ হইতেন, তাহা হইলে ইহাঁতে প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সংযুক্ত হইতে পারিত না। গুণপদার্থে কখনই গুণ থাকিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ, স্বরাট্ ও অনাশ্রিত বিধায়, গুণাত্মক নহেন। গুণ সর্ব্বদাই আশ্রিত, কখনও অনাশ্রিত থাকিতে পারে না, এবং গুণের আশ্রয় গুণও হইতে পারে না; সুতরাং গুণ নির্গুণ পুরুষেরই আশ্রিত।

সেই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মো নির্গুণো বা কথঞ্চন।
জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদাশিবঃ॥

জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম বা গুণ নহে, তিনি জ্ঞানরূপী, নিত্য এবং সর্ব্বদাই মঙ্গলময়।

সাঙ্খ্যসূত্রেও দেখিবেন,—

"নির্গুণত্বাম্নচিদ্ধর্ম্মা"॥

শ্রুতিও "কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি বাক্যে আত্মার নির্গুণতাই প্রমাণ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

যাভা বা যবদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম।

ভারত-সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জমধ্যে যাভা বা যবদ্বীপ একটি দ্বীপ। প্রাচীনকালে হিন্দুরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে যব উৎপন্ন হইত বলিয়া উহার নাম 'যবদ্বীপ' রাখিয়াছিলেন; কালে যবদ্বীপ অপভ্রংশে "যাভা-দ্বীপ" নাম ধারণ করিয়াছে। হিন্দুরা এইক্ষণে যেরূপ ভারতবর্ষের বহির্ভাগে স্বীয় ধর্ম্মপ্রচার বা উপনিবেশ-স্থাপন করিতে সংপূর্ণ অনিচ্ছুক ও অশক্ত, পূর্ব্বে তাঁহারা সেরূপ ছিলেন না। যে মহাশক্তি-প্রণোদিত হইয়া ইউরোপবাসীরা আসিয়া, আফরিকা ও আমেরিকা মহাদেশে ধর্ম্ম ও রাজ্য-বিস্তারে অগ্রসর হইতেছেন, প্রাচীন ভারত সেই শক্তির বলেই ভারতসমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং শ্যাম, ব্রহ্মদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, স্বাধীন শ্যাম-প্রদেশে এখনও হিন্দু-মন্দির ও ব্রাহ্মণ আছেন। ব্রহ্ম-রাজধানী মন্দালয়েও ব্রাহ্মণ

অধিবাসী রহিয়াছেন। ভারতের প্রাচীনশক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। পরদেশে উপনিবেশ করা দূরে থাকুক, তাঁহারা এখন স্বদেশেও পরাধীন। অন্যজাতিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা একণে স্বীয় ধর্ম্মরক্ষণেই অসমর্থ। হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমস্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় উপনিবেশ হইতে হিন্দু-আধিপত্য ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে।

যাভাদ্বীপের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, যাভাদ্বীপ একসময়ে সংপূর্ণই হিন্দু-রাজ্য ছিল। এখনও যাভাদ্বীপে দেবনাগরাক্ষর প্রচলিত আছে। এখনও "ভারত-যুদ্ধ" "অর্জ্জুন-বিবাহ" প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ অধিবাসিগণের আদরের জিনিস। এখনও তাহাদের মজ্জায় মজ্জায় হিন্দু-ভাবের সূক্ষ্মপ্রবাহ বহিতেছে। যাভাদ্বীপে আগ্নেয় গিরির উৎপাত প্রবল, এবং তাহার আগ্নেয় নিঃস্রবেই কালে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হইয়াছিল। এখন ভূমি-খননাদি দ্বারা উক্ত মন্দিরাদি সময়ে সময়ে আবিষ্কৃত হইতেছে। এ সমুদায় মন্দিরাদির বৃত্তান্ত অবগত হইলে, হিন্দুজাতির অতুল্য প্রাচীন গৌরব-স্মৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া অসীম আনন্দ প্রদান করে।

হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান প্রচারকগণ বা হিন্দু-সমাজ-নেতৃগণ কেবল বৃথা বাগ্বিতণ্ডাতেই কালাতিপাত করেন। তাঁহারা পৈত্রিক সম্পত্তি বর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, রক্ষণের চেষ্টাও করেন না। যাভার ন্যায় মনোরম্য দ্বীপ পৃথিবীতে খুব কম আছে। যদিও যাভায় আগ্নেয় গিরির উৎপাত আছে, তথাপি যাভা ভারতবর্ষের ন্যায় নিত্য সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। ধান্য, ইক্ষু, নারিকেল; তাল, কদলী, কপি ইত্যাদি তথায় সুপ্রাপ্য। জল-বায়ু ভারতেরই সমতুল্য। পশ্বাদিও ভারতের ন্যায়। চাউলই যাভাদ্বীপের প্রধান খাদ্য। এই সুন্দর দেশ এখন ওলন্দাজদিগের অধিকৃত। হিন্দুদের হস্ত হইতে মুসলমানের হস্তে,—পরে ক্রমশঃ নানা রাষ্ট্রবিপ্লবের পর একণে ওলন্দাজের অধিকৃত। এখনও যাভার সামান্য দুটী অংশ নাম-মাত্র স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আছে। যাভা-বাসীদের ধর্ম্ম একণে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মিশ্রণে গঠিত; তবে অধিকাংশই 'মুসলমান' বলিয়া পরিচিত। এই রাজ বিপ্লব ও ধর্ম্ম বিপ্লব সত্ত্বেও যাবাবাসীগণ পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী, কিন্তু হিন্দুদের ন্যায় দুর্ব্বল ও পরপদ-দলিত। ভারতবর্ষ যেরূপ বৃটিশ-রাজত্বের ভূষণস্বরূপ, ওলন্দাজ-রাজত্বে যাবাদ্বীপও তদ্রূপ। বর্ত্তমানে যাবাদ্বীপে গমনাগমনের অসুবিধা নাই; ইংরাজ বা ওলন্দাজের জাহাজে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন হইতে পারে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া, একণে কোন মহাত্মা এই দ্বীপে পুনঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুভাব-প্রচারে অগ্রসর হইবেন কি?

গোলকে (১) সর্ব্ব-দেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

বিবিধ।

(দক্ষরাজ)

পুরাণ মতে ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি-কামনায় মহর্ষি বশিষ্ঠ আদি যে সকল মানস-পুত্র সৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের নাম প্রজাপতি। এই প্রজাপতিগণের মধ্যে একজনের নাম দক্ষ। এই দক্ষ 'দক্ষরাজ' বলিয়া অভিহিত। দক্ষরাজ অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, প্রভৃতি ২৭টি কন্যা চন্দ্রদেবকে দান করেন। (২)।

এই ২৭ কন্যা চন্দ্রের ২৭ গৃহিণী বলিয়া গণ্য। চন্দ্রদেব গৃহিণীগণের মধ্যে নিরুপমা রোহিণীদেবীর পক্ষপাতী হইলেন। অপর কন্যাগণ পিতৃসদনে চন্দ্রদেবের কুব্যবহার নিবেদন করিলেন। দক্ষরাজ তৎশ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রদেবের বিনাশ কামনায় চন্দ্রদেবকে অভিশাপ দিলেন,—"মূঢ়! সত্বর রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ) রোগ গ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হও"। চন্দ্রদেব তৎক্ষণাৎ রাজযক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। প্রতিদিন ১ কলা কমিতে লাগিল। পক্ষান্তে অমা-রজনীতে আকাশ চন্দ্র-শূন্য হইল। চন্দ্রমার সুধা-অংশু বিহনে লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা আদি দেবগণের অনুরোধে দক্ষরাজ নিরস্ত হইয়া চন্দ্রদেবের অভিশাপের এই মাত্র পরিবর্ত্তন করিলেন যে, অদ্য হইতে চন্দ্রদেবের এক এক কলা প্রতি তিথিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণিমা-প্রাপ্তি হইবে; কিন্তু আবার পূর্ণিমা-অন্তে কলা-ক্ষয় হইবে। এইরূপে প্রতিমাসে কলা-ক্ষয় ও কলা-বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রদেব অভিশাপ হইতে চিরমুক্ত হইবেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণ দক্ষরাজের এই প্রসাদেই সন্তুষ্ট হইতে স্বীকার করিলেন। চন্দ্রদেব

---

(১) গোলক শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ।

বিশ্বগোলক, গোলকব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বিশ্বজগৎ, জগৎব্রহ্মাণ্ড, এইরূপ যৌথ-প্রয়োগ সচরাচর হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র প্রয়োগও আছে, যথা—বিশ্বেষাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এবচ।--ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ডে ২।৫

দৃষ্ট্বা ডিম্বংচ সা দেবী হৃদয়েন বিদূয়তা। উৎসসর্জ্জচ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। ঐ ২।৫০

"যদ্রূপং গোলকং ধাম তদ্রূপং নাস্তি মামকে" ইতি তন্ত্রং। "বভূব জলপূর্ণঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ গোলকং।

জন্মখণ্ড ৮৪।৮১

(২) অতি প্রাচীনকালে অয়নমণ্ডলে ২৮ নক্ষত্র গণনা হইত, কিন্তু জ্যোতিষের উচ্চতর অনুশীলন আরম্ভ হইলে, অয়নমণ্ডলকে ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইল। প্রতি নক্ষত্র ১২$\frac{৭}{৮}$ অংশ হইল এবং নক্ষত্রের এক পদে ৩$\frac{৭}{৩২}$ অংশ পড়িল। নক্ষত্রের দ্বিপদে ৬$\frac{৭}{১৬}$ অংশ পড়িল। এই সকল বিষম অঙ্ক

শ্বশুর-কৃত অভিশাপ-ফলে অদ্যাপি এক পক্ষে ক্ষয় এক পক্ষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন। (৩) বহুবিবাহক পতির প্রতিফল পক্ষে পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্তি। অভিশাপ দ্বারা ক্ষয়রোগ জন্মিতে পারে, এবং বরদানে কলা-বৃদ্ধিও অসঙ্গত নহে; কিন্তু প্রতিনিয়ত পর্য্যায়ক্রমে কলাক্ষয় ও কলাবৃদ্ধির কারণ নিত্য ভিন্ন নৈমিত্তিক হইতে পারে না; সুতরাং এই ব্যাপারের গূঢ় রহস্য অবশ্যই আছে।

দক্ষরাজ অপর কন্যা সতীদেবীকে রুদ্রদেবকে দান করেন। (৪) কন্যাদান-পরে বিশ্ব-স্রষ্টাদিগের যজ্ঞে দক্ষরাজ শিব-নিন্দা করেন। শ্বশুরকৃত নিন্দাবাদ শ্রবণে রুদ্রদেব নীরব থাকিলেও, শিব-সহচর নন্দীশ্বর উচিত উত্তরবাদে দক্ষ-নিন্দা করিয়াছিলেন। তদাক্রোশে দক্ষরাজ রুদ্রদেবের অবমাননা-কামনায় বৃহস্পতি-যজ্ঞ উপলক্ষ্যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল নিমন্ত্রণ করিয়া, কেবল জামাতা রুদ্রদেব শিবকে অনিমন্ত্রিত রাখিলেন।

খেচর-মুখে পিতৃআলয়ে যজ্ঞ-সমারোহ-সংবাদ শ্রবণে সতীদেবী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃ-গৃহে যাইতে অভিলাষ করিলেন। পশুপতি দক্ষরাজের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত ছিলেন। সতীদেবীকে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু পিতৃগৃহাভিলাষিণী নারীকে কে নিবারণ করিতে সক্ষম? গৃহ-যুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় পরাভূত হইলেন। সতীদেবী স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃভবনে যাত্রা করিলেন। বামা-সুলভ চঞ্চলতা-বশে সতীদেবী পিতৃভবনে উপনীতা হইলেন; কিন্তু নির্য্যাতন-কুশল পিতৃদেব দক্ষরাজ সতীদেবীকে বাৎসল্যোচিত সম্ভাষণ করিলেন না।

যজ্ঞস্থলে শিব ব্যতীত সকল দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণ সভাসীন ছিলেন। সভাস্থলে হতাদরা হইয়া সতীদেবী যোগবলে দেহ ত্যাগ করিলেন। নারদ-মুখে সতীদেবীর দেহত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণে রুদ্রদেব ক্রোধান্ধ হইয়া স্বীয় জটামণ্ডল হইতে একটী জটা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ জটা হইতে রুদ্রঅবতার রুদ্রপরাক্রম বীরভদ্রদেব আবির্ভূত হইলেন। বীরভদ্র শিব-গণ সহ রণ-সজ্জায় দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। রুদ্রাবতার বীরভদ্রের সমরে দেবগণ পরাস্ত হইলেন। দক্ষ-যজ্ঞ ভঙ্গ হইল। রুদ্র-

---

দ্বারা জ্যোতিষ গণনা বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল। জ্যোতিষীগণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। অবশেষে সমস্ত জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সমবেত হইয়া বিষতুল্য অভিজিৎ নক্ষত্র ত্যাগের ব্যবস্থা করিয়া ২৭ নক্ষত্র রাখিলেন; ইহাতে প্রতি নক্ষত্রে ১৩ $\frac{১}{৩}$ অংশ হইল। নক্ষত্রের একপদে ৩ $\frac{১}{৩}$ অংশ, দ্বিপদে ৬ $\frac{২}{৩}$ অংশ ত্রিপদে ১০ অংশ পড়িল। গণনায় সরলতা হইল। (Brennand's Hindu Astronomy) এতদ্ভিন্ন আমাদের আরও বিবেচনা হয়, অতি প্রাচীনকালে ২৮ নক্ষত্র ছিল, কিন্তু ১৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন অভিজিৎ নক্ষত্রে ধ্রুববিন্দু পতিত হইল, তখন অভিজিৎ ধ্রুব নাম পাইলেন। গতিকে অয়নমণ্ডলের ২৮ নক্ষত্রের ১টী কমিয়া ২৭টী হইল। সকল পুরাণ-মতেই দক্ষের ২৭ কন্যা বর্ণিত; ইহাতে বোধ হয় পৌরাণিকের যুগের বহুপূর্ব্বে অভিজিৎ ত্যক্ত হইয়াছে।

(৩) ইতি পাদ্মে স্বর্গখণ্ডং।

(৪) শ্রীমদ্ভাগবত ৪। ১—৫

সেনাপতি বীরভদ্র ক্রোধান্ধ হইয়া দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদনে ও মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রু উৎপাটনে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অতি কষ্টে কণ্ঠ ও শ্মশ্রু ছিন্ন হইল। পরে দেবগণের কাতরতায় আশুতোষ দক্ষ-স্কন্ধে ছাগমুণ্ড আরোপণে দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। পতিনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ অসম্ভব নহে; কিন্তু মানবদেহধারী দক্ষরাজ স্কন্ধে ছাগমুণ্ড-যোজনা অনৈসর্গিক ব্যাপার। অতএব এই দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের অবশ্যই কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। এই দক্ষরাজ কে? তাঁহার ২৭ কন্যাই বা কে? চন্দ্রদেবই বা কে? সতীদেবীই বা কে? রুদ্রদেবই বা কে? এবং বৃহস্পতি-যজ্ঞই বা কি? আর ছাগমুণ্ডই বা কি? চন্দ্র-শাপ ও দক্ষযজ্ঞ পাঠে এই কয়েকটী প্রশ্ন সহজেই হিন্দুজাতির মনে উদিত হয়। আমরা এই প্রবন্ধে জ্যোতিষতত্ত্ব-মতে পুরাণোক্ত চন্দ্রশাপ ও দক্ষযজ্ঞ ব্যাপারের রূপক-রহস্য ভেদ করিতে যত্ন করিব।

আমরা রাশিচক্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, রাশিচক্রে চন্দ্র-গৃহিণী অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্র দীপ্যমান রহিয়াছে। এই ২৭ নক্ষত্র মধ্যে রোহিণী সর্ব্বাপেক্ষা রূপলাবণ্যবতী। প্রাচীন কালে এই ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে চন্দ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা চান্দ্রমাস গণনা হইত বলিয়া চন্দ্রদেবের তারা-পতি নাম। কারণ ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে রুদ্রদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বৎসর গণনা হইত বলিয়া রুদ্রদেব-গৃহিণীর নাম তারা, এবং ২৭ নক্ষত্রময় রাশিচক্রে বৃহস্পতিদেবের পরিভ্রমণ দ্বারা বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত বলিয়া বৃহস্পতির গৃহিণীর নামও তারা, এবং আদিত্যদেব শ্রীহরি (৫) রাধা-কান্ত (৬) বলিয়া বর্ণিত। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক কারণ আছে, ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠে সকলেই জানিতে পারেন; সহজ জ্ঞানে সকলেই বুঝিতে পারেন।

পুরাণ-লিখিত দক্ষশাপে চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বলিয়া কেহই বিশ্বাস করেন না। পৌরাণিক মহর্ষিগণ রহস্যচ্ছলে এই নৈসর্গিক ব্যাপারটী রূপকে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। এই রূপকে দক্ষরাজ, রাশিচক্র, ২৭ নক্ষত্র, চন্দ্র-পত্নী রোহিণীনক্ষত্রের রূপ-লাবণ্য অনর্থের মূল। চন্দ্রদেব উপগ্রহ চন্দ্রের বিম্ব।

এইরূপ সতীর দেহত্যাগ ব্যাপারটীও রূপক মাত্র। আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি, পুরাণে রাশিচক্র দক্ষরাজ নামে অভিহিত। এই দক্ষরাজ-কন্যা কন্যারাশি, এবং এই কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী হইতে চৈত্রাদি বর্ষগণনা হয়, এবং এই চৈত্রাদি-বর্ষ 'সম্বৎ' নামে অদ্যাপিও সমস্ত দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত আছে। চৈত্রাদিবর্ষের প্রারম্ভে সূর্য্যদেব (৭) মীনরাশিতে অবস্থিতি করেন, এবং রুদ্রদেব চৈত্র-পূর্ণিমায় সোমরাজে

(৫) পদ্মিনী-বল্লভো হরিঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।
(৬) রাধা বিশাখা পুষ্যেতু। ইতি অমরঃ।
(৭) যা শ্রীঃ সা গিরিজা প্রোক্তা যো হরিঃ সঃ ত্রিলোচনঃ। ইতি বরাহে।

কন্যারাশিস্থ চিত্রানক্ষত্রে অবস্থিতি করেন (৮)। রাশিচক্রস্থ যে রাশি হইতে কোন বর্ষ-গণনার সূত্রপাত হয়, সেই বর্ষ প্রচলন কালে ১২শ রাশির মধ্যে সেই রাশির প্রাধান্য হয়, এবং তৎসময়ে ঐ রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ বা মস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। চৈত্রাদি-বর্ষ গণনা কালে কন্যারাশি ও চিত্রা নক্ষত্রের প্রাধান্য ছিল, এবং এই দক্ষসুতা চিত্রা-তারা, তারা নামে রুদ্র-গৃহিণী ছিলেন। এই জন্যই আমরা পত্রিকাতে চিত্রা-তারার দশভূজা মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই বর্ষ গণনা সময়ে রুদ্রদেব তারাপতি নামে দক্ষ-রাজের পূজ্য ছিলেন, এবং এই সময়ে দক্ষরাজ রুদ্রের প্রীতি-অর্থে বিশ্বস্রষ্টৃযজ্ঞ করিতেন। কিন্তু মহর্ষি ভৃগু প্রমুখ ঋষিগণ বিশেষ কারণ বশতঃ চান্দ্রমাসে বৎসর-গণনা পরিত্যাগ করিয়া-রাশিচক্রে বৃহস্পতি গ্রহের পরিভ্রমণ দ্বারা বর্ষগণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। বিশ্বস্রষ্টৃযজ্ঞ ত্যাগে দক্ষরাজ এক্ষণে বৃহস্পতি-যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন। রুদ্রদেব বা তৎমূর্ত্তি সোমদেব দ্বারা বর্ষগণনা পরিত্যক্ত হইল বলিয়া দক্ষরাজের বৃহস্পতি-যজ্ঞে রুদ্রদেবের নিমন্ত্রণ অপ্রয়োজন হইল। রুদ্র-পত্নী সতী নাম্নী তারাদেবী পতির অবমাননায় দেহত্যাগ করিলেন। বার্হস্পত্য-বর্ষ-গণনা চলিতে লাগিল। বৃহস্পতি তারাপতি উপাধি গ্রহণে দেবগুরু বলিয়া পরিগণিত হইলেন। দ্বাদশবর্ষে বৃহস্পতিগ্রহ একবার ১২শ রাশি পরিভ্রমণ করেন। ইহাই প্রাচীন হিন্দু-জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং বৃহস্পতির একরাশি-সংক্রমণ দ্বারা একবর্ষ পরিগণিত হইতে লাগিল। বার্হস্পত্য বর্ষের নাম 'সম্বৎসর'। কিছুকাল পরে মহর্ষিগণ দেখিলেন, বার্হস্পত্যবর্ষ-গণনা ভ্রমসঙ্কুল (৯)। এজন্য ঐ পদ্ধতি পরিত্যাগে চান্দ্র পদ্ধতি পুনঃ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত রূপকে পৌরাণিকগণ দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা কালে কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতির সঞ্চারে জাতীয় মহোৎসব হইত। এ মহোৎসবের নাম হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। এই কুম্ভমেলা দক্ষযজ্ঞের অঙ্গীভূত বলিয়া বোধ হয়, এবং এই সময়ে দক্ষরাজের কুম্ভ-মুণ্ড ছিল বলিতে হয়। (১০) শিব-দূত বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকালে দক্ষরাজ-দেহ হইতে দক্ষমুণ্ডরূপ কুম্ভরাশি ছেদন করিল, এবং সেই সঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর শ্মশ্রুরূপ 'ভৃগুসিদ্ধান্ত' সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র হইতে উৎ-পাটিত হইল। আবার চান্দ্রমাস-গণনা-পদ্ধতি ভারতে প্রচারিত হইল। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-

(৮) মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইতি শিবপূজা-পদ্ধতি।

(৯) পরবর্ত্তী জ্যোতির্বিদ্‌গণ অবধারণ করিয়াছেন যে, বৃহস্পতি গ্রহ ১১ বৎসর ১০ মাস ১৫দিন ৩৬ দণ্ড ৮ পলে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করে। বোধ হয় এই ১ মাস ১৫ দিনের তারতম্য হেতু দ্বাদশবর্ষাত্মিক বার্হস্পত্য বর্ষগণনা ভ্রমমূলক অনুভূত হইয়াছিল।

(১০) বার্হস্পত্য বর্ষ কোন্ রাশি হইতে গণিত হইত, ইহা নির্ণয় করা দুরূহ। কাশ্যপ-মতে চৈত্র হইতে বার্হস্পত্য বর্ষ গণনা হইত; কিন্তু পরাশর-মতে কার্ত্তিক মাস হইতে গণনা হইত।

কামনায় জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা চন্দ্রের কক্ষা, রাহু-কেতুর স্থিতি-স্থান এবং রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থিতি-স্থান নিরূপণ করণার্থে বিশেষ কষ্ট লইয়াছিলেন। এই পর্য্যবেক্ষণ ব্যাপার সমুদ্র-মন্থন (১১) বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সমুদ্র-মন্থনে বীরভদ্র-অসি-ছিন্ন কুম্ভরাশি ধন্বন্তরিরূপে কলস-হস্তে আবির্ভূত হইলেন, এবং ধনু রাশির ৩০ অংশ অন্তরে নিজ পূর্ব্ব স্থান অধিকার করিয়া নব নামের সার্থকতা বিধান করিলেন, এবং চন্দ্র ও চন্দ্রের জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মীদেবী যমজরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং আকাশমণ্ডলে যথাস্থানে স্থাপিত হইলেন। চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ হইল। চান্দ্র শ্রাবণাদি-বর্ষ গণনা প্রচলনে মকর রাশি দক্ষরাজের উত্তমাঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং মকর রাশিস্থ শ্রবণা (কর্ণ) নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীর প্রাধান্য হেতু দক্ষরাজের অজকর্ণ (ছাগ) (১২) মুণ্ড হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে চিত্রা তারায় রুদ্রদেবের অধিষ্ঠান ও অশ্বিনী নক্ষত্রে পৌর্ণমাসীর অধিষ্ঠান অবলম্বন করিয়া আশ্বিনাদি-বর্ষ প্রচলিত হইল। এবার হিমাচল-পতি দক্ষরাজ হিমালয়রাজ নাম এবং তারা সতী-দেবী উমাতারা পার্ব্বতী নাম ধারণ করিলেন। নব বর্ষের প্রথম দিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা যুক্তিসিদ্ধ বটে। বাসন্তী ও শারদীয়া পূজার মূল এই। এক্ষণে সৌরমাস ও সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াও হিন্দুগণ নববর্ষের প্রথমদিনে বৎসররূপিণী ভগবতীর পূজা পরিত্যাগ করেন নাই।

মহামতি উপাধ্যায়বর শ্রীযুক্ত মিঃ ব্রেন্নাণ্ড সাহেব সতীদেহ-ত্যাগ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতে পারি না। তিনি বলেন (১৩) যে,—

খৃঃ পূঃ ২০০ শত অব্দে জ্যোতির্বিদ্ আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়। এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের ধর্ম্ম-বিপ্লবে জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ঘটিয়াছিল। মতিমান্ আর্য্যভট্ট জ্যোতিষশাস্ত্র পুনর্জীবিত করেন। ব্রাহ্মণগণের প্রিয়তম জ্যোতিষশাস্ত্রের অবনতি ও পুনরুত্থান ব্যাপার চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ সতীর দেহ-ত্যাগরূপ রূপক কল্পনা করিয়াছেন।

কালেই সৃষ্টি, কালেই লয়, এবং কাল হইতেই সমস্ত ব্যাপার উৎপাদিত। "কালোহি বলবত্তরঃ" এই মহৎ সত্য মুনি-ঋষিগণ প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা শাস্ত্রে মহাকাল দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়া কেন কল্পিত হইবেন? এবং মহাকাল-পত্নী বৎসর দুর্গারূপে কেন কল্পিতা হইবেন? হিন্দুগণ কাল-

(১১) সমুদ্রমন্থন ও সমুদ্রশোষণ প্রভৃতি শব্দে সমুদ্র অর্থে আকাশ; জলধি নহে। নিরুক্ত ধাত্র—অন্তরীক্ষ নামানি—সগরসমুদ্রৌ। ১৪।১৫

(১২) বর্করঃ পর্ণভোজনঃ। অজ্‌কর্ণশ্চ মেনাদঃ। বুকাত্মায়ুঃ। শিবাপ্রিয়ঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

(১৩) ১৪০ পৃষ্ঠা Hindu Astronomy by Mr. Brennand.

মাহাত্ম্য বিশেষ বুঝিয়াছিলেন, তাই রূপকে রাশিচক্রের দক্ষরাজ নাম ও কালাংশীভূত বৎসরের দেবী নাম হইয়াছে। দেব-মণ্ডলে মহাদেবের তাদৃশ প্রতিপত্তি ছিল না, ভাবিয়া, দক্ষরাজ যজ্ঞে সকল দেবের নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু দেব-দেব দুর্গা-পতি অনিমন্ত্রিত রহিলেন! দক্ষরাজের এই যজ্ঞ জ্যোতিষমূলক। দুর্গাদেবী পতির অবমাননা দর্শনে দক্ষ-গৃহে দেহত্যাগ করিলেন। এই রূপকের তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীনকালে রাশিচক্রে চন্দ্র. সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আদির স্থিতি-স্থান পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে বৎসর নিরূপিত হইয়াছিল, কালক্রমে রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির স্থান-বিপর্য্যয় হইয়া (অয়নাংশাদি-সংশোধন অভাবে) বৎসর ভ্রমসংকুল হইয়া পড়িল; সুতরাং বৎসরের সংস্কারের আবশ্যকতা হইল। দুর্গারূপিণী প্রাচীন বৎসর কাজেই দেহ ত্যাগ করিলেন। ক্রোধভরে দুর্গাপতি মহাকাল দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া, দক্ষ ও দেবগণের বিনাশ সাধন করিলেন, অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্র আদির জ্যোতিষিক জ্ঞান রহিল না।

অবশেষে ব্রহ্মা সৃষ্টি-লোপের সম্ভাবনা দেখিয়া, মহাকালরূপ শিবের প্রীতি-সাধন করিলেন। শিব প্রীত হইলেন, এবং দক্ষযজ্ঞে বিনষ্ট দক্ষ ও দেবগণেরা সকলই পুনর্জীবিত হইলেন; (অর্থাৎ রাশিচক্রে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র আদির অনুসন্ধান হইতে লাগিল।) কিন্তু বীরভদ্র-ছেদিত দক্ষরাজের মুণ্ড পাওয়া গেল না; গতিকে দক্ষদেহে ছাগ-মুণ্ড যোজিত হইল। এই লজ্জায় দক্ষ কাশীধামে বাস করিলেন। কাশীতে কখন কখন দক্ষরাজ দৃষ্টিগোচর হন। কিন্তু ছাগমুণ্ড ধারণে দক্ষরাজের মুখশ্রীতে বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হ্রাস হইয়াছে।

রূপকের শেষাংশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুনর্জীবন ব্যক্ত হইতেছে, এবং উজ্জয়িনী ও কাশীর জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্প্রদায় দ্বয়ের মধ্যে বিবাদ সূচিত হইতেছে। উভয় পক্ষ-মধ্যে বিতণ্ডা এই ছিল যে, মেষরাশিস্থ বাসন্তী-ক্রান্তিপাত হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত, অথবা মকরক্রান্তি হইতে বৎসর-গণনা প্রশস্ত। উজ্জয়িনী-সম্প্রদায় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অবলম্বনে আশ্বিন-পূর্ণিমা হইতে চান্দ্রমাস, এবং চান্দ্রমাস দ্বারা বৎসর-গণনার প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু কাশী-সম্প্রদায় সৌর-রাশিচক্র অবলম্বনে মকরক্রান্তিতে মূলক্ষেপ-সূত্র স্থাপন করিয়া, ঐ বিন্দু হইতে সৌরবৎসর-গণনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী হইলেন। এইরূপে ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ চান্দ্র পদ্ধতি ও সৌর পদ্ধতি দ্বারায় বিভক্ত হইয়া, স্ব স্ব পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গকে স্বপদ্ধতির পোষক করিলেন।

এইরূপে ভারতের রাজন্যবর্গ সৌর ও চান্দ্র, এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন।

(১১১ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রের টীকা) ....শশ্বৎ ভগবান্ জবঃ।....
ভূগোলুনুতে সমসি...... শ্রীমদ্ভাগবত ৪।৫।১১

কালবশে চান্দ্র পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ চন্দ্রবংশীয় এবং সৌর পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক রাজন্যগণ সূর্য্যবংশীয় নাম ধারণ করিলেন।

প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত চান্দ্র পদ্ধতির পক্ষ হইলেন। কেবল উত্তর-ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সৌর পদ্ধতির শিষ্য হইলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্-কুলরত্ন আর্য্যভট্ট সৌর পদ্ধতির নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সপ্তরত্ন।

বাঞ্ছা সজ্জন-সঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যত্র বসন্তি নির্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥ ১॥
রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ,
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষাচ জ্যোতির্ব্বিনা।
যোদ্ধা শূরবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দোবিনা গীয়তে,
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ২॥
ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষাপি শাখোটকে,
হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে কাকেষু নিত্যাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ,
এষা যত্র বিচারণা গুণিগণা দেশায় তস্মৈ নমঃ॥ ৩॥

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা, পরগুণে প্রীতি, গুরুতে নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বস্ত্রীতে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, কৃষ্ণে ভক্তি, আত্মদমনে শক্তি, খলের সংসর্গ-ত্যাগ, এই সকল নির্ম্মল গুণ যে মনুষ্যে থাকে, সেইসকল ব্যক্তিকে নমস্কার করি। ১॥

ধর্ম্মবিনা রাজা, শৌচহীন ব্রাহ্মণ, জ্ঞানশূন্য যোগী, সত্যশূন্য কান্তা, গতিশূন্য ঘোটক, জ্যোতিবিনা ভূষণ, শূরত্বশূন্য যোদ্ধা, নিয়মশূন্য তপস্যা, ছন্দশূন্য গীত, স্নেহশূন্য ভ্রাতা ও হরিভক্তিশূন্য মনুষ্যকে জ্ঞানীলোকেরা শীঘ্র ত্যাগ করেন। ২॥

চন্দন, আম্র ও চম্পকবন ছেদন ও শাখোটক (শেওড়া গাছ) বৃক্ষকে রক্ষা

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ,
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ,
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে।
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ ॥
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ।
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ ॥ ৫ ॥

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ,
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকর-করৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ।
মৃত্যুঃ কিং যদিদুর্জ্জনেষ্ববনতিঃ কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা,
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমিরুহৈঃ ॥ ৬ ॥

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে,
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ,
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে হিংসা ও কাকে নিত্য আদর, হস্তিদ্বারা গর্দ্দভ-ক্রয়, কর্পূর ও কার্পাসের তুল্যতা; যে স্থানে এই সকল বিচার, হে গুণিগণ! সেই দেশকে নমস্কার করি। ৩॥

ফলশূন্য বৃক্ষকে পক্ষী সকল, শুষ্ক সরোবরকে সারসগণ, মধুরহিত পুষ্পকে মধুপ, দগ্ধ বনপ্রান্তভাগকে মৃগ, নির্ধন পুরুষকে বেশ্যা ও ধনশূন্য রাজাকে মন্ত্রীরা ত্যাগ করিয়া থাকে; সংসারে কে কাহার প্রিয়? ৪॥

ধনে আবশ্যক কি, যদি দুঃখীকে দান না হয়? যদি পরোপকারে যত্ন না হইল, তাহাহইলে সেবাতে প্রয়োজন কি? যদি পুত্রলাভ না হইল, তাহা হইলে স্ত্রী-সঙ্গে প্রয়োজন কি? যদি স্ত্রীর বিরহ হইল, তাহা হইলে যৌবনে প্রয়োজন কি? ৫॥

যদি নিজ স্ত্রী প্রিয়া হয়, তাহা হইলে স্বর্গে প্রয়োজন কি? যদি লাবণ্য থাকে, তাহা হইলে ভূষণ-বিধির আবশ্যক কি? যদি সরস বাক্য হয়, তাহা হইলে চন্দ্র-কিরণে আবশ্যক কি? যদি দুর্জ্জনের নিকট অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুতে আবশ্যক কি? যদি যাচ্ঞা থাকে, তাহা হইলে নিন্দা-সূচক বাক্যে প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্র সদৃশ পূর্ণকাম হয়, তাহা হইলে কল্পবৃক্ষে প্রয়োজন কি? ৬॥

যে যাচককে ধন না দেয়, তাহার ধনে প্রয়োজন কি? যে শত্রুকে দমন করিতে না পারে, তাহার বলে প্রয়োজন কি? যিনি ধর্ম্ম-আচরণ না করেন, তাঁহার শাস্ত্র-জ্ঞানে আবশ্যক কি? যিনি জিতেন্দ্রিয় নহেন, তাঁহার জীবনে আবশ্যক কি? ৭।

অষ্টরত্ন।

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা ষড় জীবলোকেষু সুখানি রাজন্ ॥১॥

ব্যোমৈকান্ত-বিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাৎ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতে হি বিধৌ কুতঃ সুচরিতং কঃ স্থান লাভে গুণঃ ?
কালোহি ব্যসন-প্রসারিতকরো গৃহ্নাতি দূরাদপি। ২ ॥

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা,
দন্তানামল্পশৌচং বসনমলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বেসন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসন-শয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ,
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্। ৩ ॥

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে,
বিষ্ণুর্যেন দশাবতার-গহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপাল-পাণি রটনং ভিক্ষাটনং কারিতঃ,
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥ ৪ ॥

ধনলাভ, প্রতিদিন নীরোগতা, প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশীভূত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, সংসারে এই ছয় সুখজনক। ১ ॥

আকাশে একান্তে বিচরণকারী পক্ষীগণও আপদপ্রাপ্ত হয়; সমুদ্রের অগাধ সলিল হইতে নিপুণ ধীবর মৎস্য সকল ধরিয়া থাকে। বিধাতা প্রতিকূল হইলে, নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কি প্রকারে সম্ভব ও উত্তম স্থান লাভের গুণ কোথায়? কাল বিপদে হস্ত প্রসারিত করিয়া দূর হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকে। ২ ॥

প্রতিদিন তৃণচ্ছেদন, ভূমিতে নখদ্বারা লিখন, পদদ্বয় সম্যক্‌প্রকারে ধৌত না করা, দন্তের অল্প ধৌতি, বসনের মলিনতা, কেশের রুক্ষতা, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নিদ্রা, বিবস্ত্র হইয়া শয়ন, অত্যাহার ও অতিহাস্য, নিজের অঙ্গে ও পীঁড়িতে (কাষ্ঠাসনে) বাদ্য, এই সকল দোষে কুবের ও কেশবের লক্ষ্মীও নষ্ট হয়। ৩ ॥

ব্রহ্মা যাঁহাদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে কুম্ভকারের ন্যায় (সৃষ্টি বিষয়ে) নিয়োজিত হইয়াছেন; বিষ্ণু দশাবতাররূপ মহাসঙ্কট-বনে রক্ষিত হইয়াছেন, রুদ্র যদ্দ্বারা নৃশির হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান; সূর্য্যও প্রতিদিন আকাশে ধাবমান হন, সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি। ৪ ॥

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং,
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং,
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং ॥ ৫ ॥

বিলাস-ভোগে রোগভয়, কুলে কুলক্ষয়-ভয়, ধনে রাজার ভয়, মানে দারিদ্র্য-ভয়, বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়, শাস্ত্রে বিবাদ-ভয়, গুণে খলভয়, শরীরে শমন-ভয়। সংসারে সমুদায় দ্রব্য ভয়ান্বিত, কেবল বৈরাগ্যই অভয়। ৫ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সামবেদ সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তা)

অথ দ্বিতীয় খণ্ডে সেয়ং প্রথমা।

(আয়ুঙ্ক্ষ্বাহি ঋষিঃ)

১২ ৩১২ ৩১ র ৩১২ ১২৩১৩
নমস্তে অগ্ন ওজসে গৃণন্তি দেব কৃষ্টয়ঃ। অমৈরমিত্রমর্দ্দয় ॥১

অগ্ন=হে অগ্নি! দেব=হেদেব! তে=তুভ্যং=তোমাকে নমোগৃণন্তি=নমস্কার-শব্দমুচ্চারয়ন্তি=নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করে। ওজসে=বলায়=বলের জন্য। কৃষ্টয়ঃ=মনুষ্যাঃ=মনুষ্য সকল—অর্থাৎ যজমান সকল। অমৈঃ=বলৈঃ=বলদ্বারা—অমিত্রং=শত্রুং—শত্রুকে। অর্দ্দয়=নাশয়=নাশকর।

হে অগ্নিদেব! যজমানগণ বলের জন্য তোমার প্রতি নমস্কারশব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। (তজ্জন্য আমিও উচ্চারণ করিতেছি) তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের শত্রুগণকে নাশ কর। [এ মন্ত্রে যজমানগণ আপনার জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্বয়ং বলশালী হইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কিন্তু ঋত্বিক্‌গণ নিজে নিমিত্তভাগী হইতে ইচ্ছুক না হইয়া অগ্নি দ্বারা তাহার চেষ্টা পাইতেছেন; সুতরাং এ মন্ত্রে যজমান ও ঋত্বিক্‌গণের অভিপ্রায় পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন।]

এই ঋক্‌টি উত্তরার্চ্চি ৮।১।১২।১; ঋগ্বেদ সংহিতায় ৬অ, ৪-২৫বর্গে ১০সূক্ত।

সৈষা দ্বিতীয়া।

(বামদেব ঋষিঃ)

৩১ ২ ৩১ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ১ ২ ৩ ২

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্ত্যম্। যজিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা।২॥

(হে অগ্নে!)

বিশ্ববেদসং=বিশ্বং সমস্তং বেদো ধনং যস্যাসৌ বিশ্ববেদাঃ তং সর্ব্ববিদং বা সর্ব্ব-জ্ঞানসম্পন্ন।

হব্যবাহং=দেবেভ্যো হবিষাং বোঢ়ারং=দেবতাদিগের হব্যবাহক। অমর্ত্ত্যং=অমরণ-ধর্ম্মাণং=অমরণধর্ম্মাকে=মৃত্যুধর্ম্মাতীতকে। যজিষ্ঠং=অতিশয়েন যষ্টারং=অত্যন্তযাগ-কারী তোমাকে। দূতং=দেবানাং দূতং=দেবতাদিগের দূতকে। বঃ=ত্বাং=তোমাকে। গিরা=স্তুতিরূপয়া বাচা=স্তুতিরূপা বাক্যদ্বারা। ঋঞ্জসে=যজমানোঽহং প্রসাধয়ামি বর্দ্ধয়ামী-ত্যর্থ=আমি যজমান—বাক্যদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিতেছি—অর্থাৎ স্তব করিতেছি।

হে অগ্নি! তুমি বিশ্ববেত্তা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন; তুমি দেবতাদিগের হব্যবাহক, তুমি মৃত্যুধর্ম্মবিবর্জ্জিত; তুমি সর্ব্বদা যাগকারী; তুমি দেবগণের দূত স্বরূপ, আমি যজমান—তোমাকে স্তবদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি। ২॥

[প্রশংসা করা সতেরই হইয়া থাকে, অসতের কখনও সম্ভব হয়না; সুতরাং অগ্নি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন, নচেৎ স্তুতিবাক্যদ্বারা বর্দ্ধিত করিতেছি, এজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে।]

এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৩অষ্টকে ৫ অধ্যায়ে ৬বর্গেও আছে।

সৈষা তৃতীয়া।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১র ২র

উপত্বা জাময়োগিরো দেদিশতীর্হবিষ্কৃতঃ। বায়োরনীকে অস্থিরন্।৩॥

হবিষ্কৃতঃ=যজমানার্থং হবিষ্কৃতঃ=যজমান-প্রদত্ত হবির্দ্বারা বর্দ্ধিত। গিরঃ=স্তুতয়ঃ=স্তুতিসকল, অথবা গিরন্তি—ভক্ষয়ন্তি হবীংষি যাঃ, তাঃ গিরঃ ভক্ষয়িত্র্যঃ=ভক্ষয়িত্রী সকল। জাময়ঃ=স্বসারইব=ভগ্নির ন্যায় [জ্বালা=অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নির ভগিনী] দেদিশতীঃ=তব গুণান্ দিশন্ত্যঃ=তোমার গুণসকল বিস্তার করিয়া। ত্বা=ত্বাং উপতিষ্ঠন্তে=তোমার

নিকট থাকে। বায়োঃ=বায়ুর (বাতি গচ্ছতীতি বায়ুঃ, অর্থাৎ যিনি সকল যজমানের নিকট গমন করেন,) অনীকে=সমীপে স্বাং সমেধয়ন্ত্যঃ=নিকটে তোমাকে বৃদ্ধি করিয়া— অস্থিরন্=অতিষ্ঠন্=থাকেন।

এই ঋকৃটি সামবেদ-সংহিতার উত্তরার্চ্চিকে ৭ প্র। ২অ। ১৩। ১ ও ঋগ্বেদসংহিতার ৬ অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ১১ বর্গে ১৩ সূক্ত।

হে অগ্নে! যজমানগণ তোমাতে হবিঃ প্রদান করিলে, সেই হবিষ্কৃত স্তুতি সকল ভগিনীর ন্যায় তোমার গুণ সকল বিস্তার করিয়া, বায়ুর সমীপে তোমাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ হবিষ্কৃত জ্বালাস্বরূপিণী ভগিনীগণ তোমার স্ফুলিঙ্গ-রূপ গুণসকলকে বিস্তার করিয়া, বায়ুর (অর্থাৎ তোমার সখার (১)) নিকটে গিয়া তোমাকে বৰ্দ্ধিত করিয়া স্থির হইয়া থাকেন, তদ্রূপ আমাদিগের স্তুতিগুলিও তোমার গুণসকলকে বিস্তার করিয়া তোমার সখার [বায়ুর] নিকট গিয়া স্থির হইয়া থাকে। (২)

(ক্রমশঃ)

---

(১) অগ্নির সখা বায়ু, ইহাতে এই দেখি যে, ভট্টিকাব্যে দশম সর্গে—

বভৌ মরুত্বান্ বিকৃত সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ।
বভৌমরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রো বভৌ মরুত্বান্ বিকৃতঃ সমুদ্রঃ ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকটীর চতুর্থ পাদস্থ 'সমুদ্র' শব্দে টীকাকার ভরতমল্লিক কহিয়াছেন—"সমুৎসহর্ষোরোগ্নিঃ যস্মাৎ বায়োরগ্নিসখিত্বাৎ'।

(২) শব্দ সকল উচ্চারণ করিবামাত্র আমাদের বোধ্য বিষয়ের বোধ করাইয়া উহা বায়ুতে লীন হইয়া গিয়া থাকে। যদি ঐরূপ না হইয়া, ঐ শব্দসকল সর্ব্বদাই থাকিত, তাহা হইলে আমরা পরস্পরের বাক্য শ্রবণ করিতে সক্ষম হইতাম না। তাহা হইলে এই পাপ-তাপ-প্রপীড়িত সংসার কি ভয়ানক শব্দপূর্ণ হইত ও অশেষ যন্ত্রণার স্থান হইত, অনুধাবন করিতে পারা যায় না! সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমেশের কি অনুগ্রহ, আমরা স্থির করিতে পারি না। এই সমুদায় করুণা দর্শন করিয়া কি আমরা সেই জগৎ-চিন্তামণির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে অথবা তাঁহার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার নাম লইতে পরাঙ্মুখ হইতে পারি? কার্য্যদর্শন করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

কার্য্যদর্শনাৎ তদুপলব্ধেঃ। সাংখ্যদর্শনে ১অধ্যায়ে ১১০সূত্রং।

যখন তিনি আমাদের প্রতি এত অনুগ্রহ করিতেছেন, তখন কি তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নহে? তাঁহার গুণগান করিয়া কি আমরা শেষ করিতে পারি? ভাগবতাদি পুরাণে অনেক স্তব দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই স্তবের শেষও দর্শন করা যায়; কিন্তু স্তব সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া কি তাঁহার গুণ শেষ হইয়া গেল? স্তব করিতে করিতে স্তবকারীর বাক্য শেষ হইয়া যায়, কিন্তু তাঁহার গুণ-বর্ণন শেষ হয় না।—

মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য তব সংহ্রিয়তে বচঃ। শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা ন গুণানামিয়ত্তয়া॥
রঘুবংশে ১০সর্গে—৩২ ॥

তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে বাক্য শেষ হয়, তাহা শ্রম বশতঃ অথবা অশক্তি বশতঃ, তোমার গুণের শেষ বশতঃ নহে। যদিও তাঁহার গুণের ইয়ত্তা নাই, তথাপি অন্ততঃ কৃতজ্ঞতা-চিহ্নস্বরূপ(!) তাঁহার নাম গ্রহণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি সেই শ্যামসুন্দর গোলকবিহারী হরিকে দিনান্তেও একবার না ডাকি, তাহা হইলে এ সংসারে আর সুখ কি

ব্রহ্মচারি-আশ্রমের বিবরণ।

হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্ব২ অনেক সংখ্যায় ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য বিবৃত করা হইয়াছে। হিন্দু-পত্রিকার অনেক নূতন গ্রাহক আশ্রমের উদ্দেশ্যাদি জানিবার জন্য আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া থাকেন; তাঁহারা যদি অনুগ্রহ করিয়া হিন্দু-পত্রিকার ১৩০২ সালের শেষ, ১৩০৩র ১ম। ২য় ও ১৩০৫র ৫ম সংখ্যা পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মচারি-আশ্রমের উদ্দেশ্য অবগত হইতে পারিবেন। এস্থলে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, লুপ্তপ্রায় ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে যথাসম্ভব পুনর্ব্বার প্রচলিত করা, হিন্দুদিগের ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সহ বহুল প্রচার করা, এবং আড়ম্বরবিহীন নিষ্ঠাবান হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারকদিগের একটি কেন্দ্র সংস্থাপন করাই আশ্রমের মুখ্য উদ্দেশ্য। একটি আশ্রমের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপ স্থাপিত হইলে, দেশের অন্যান্য স্থানেও আশ্রম স্থাপনের উদ্যোগ করা যাইবে। আমরা স্বল্পারম্ভের পক্ষপাতী, এইজন্য বিশেষ কোন আড়ম্বর করি নাই। এইক্ষণ আশ্রমে ২১ জন ছাত্রের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ৬ জন ছাত্র এক্ষণে আশ্রমে অধ্যয়ন করিতেছেন; উপযুক্ত ছাত্র পাইলেই অবশিষ্ট ১৫ জনের স্থান পূর্ণিত হইবে। ঐ ১৫টী অবশিষ্ট ছাত্রবৃত্তির জন্য বিবিধ স্থান হইতে আবেদন আসিতেছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই আশ্রমে ২১ জন ছাত্র নিয়মিতরূপে অধ্যয়ন করিতে থাকিবেন। বেদ, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ন্যায়দর্শন, বৈশেষিকদর্শন, সাংখ্যদর্শন, স্মৃতি ও কাব্যের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমুদায় ছাত্রের সংস্কৃতভাষায় সাধারণ জ্ঞান আছে বা যাঁহারা মুগ্ধবোধ, কলাপ, সুপদ্ম, ব্যাকরণকৌমুদী বা অন্য কোন ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই আশ্রমের ছাত্রস্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকেন। তবে যাঁহারা ব্যাকরণ-পাঠ প্রায় শেষ করিয়াছেন, তাঁহারাও আশ্রমে গৃহীত হইবেন। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় সুশিক্ষিত—অথচ সংস্কৃত জানেন না, স্থলবিশেষে এরূপ ছাত্রও লওয়া যাইতে পারে। আপাততঃ আশ্রমে ২১ জনের অধিক ছাত্রকে আহারাদির ব্যয় দেওয়া যাইবে না। ২১ জনের অতিরিক্ত ছাত্রদিগকে স্বীয় স্বীয় আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আশ্রমের আয়-বৃদ্ধি হইলে, বৃত্তিভোগী ছাত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হইবে। আশ্রমের সকল ছাত্রকেই গীতা ও কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং বেদের সংহিতাভাগের কতকগুলি সূক্ত পাঠ করিতে হইবে, এবং তদ্ব্যতীত প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে। উদাহরণস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যদি কোন ছাত্র আশ্রমে 'ন্যায়' শিক্ষার জন্য আসেন, তাহাহইলে

তাঁহারা ন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে গীতা, কয়েকখানি উপনিষদ্ এবং সংহিতাংশের কয়েকটী সূক্ত পড়িতে হইবে। তৎপরে কোন এক শাস্ত্রের অধ্যয়ন শেষ হইলে, অন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন। আশ্রমের উন্নতি সহকারে হিন্দু-গণিত, হিন্দু-জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রেরও অধ্যাপনার বন্দোবস্ত করা যাইবেক। শাস্ত্রাদি অধ্যাপনকালে তত্তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলও ছাত্রদিগকে অবগত করান হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ছাত্রেরা প্রত্যহ নানাবিধ মৌখিক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ছাত্রদিগের আহারাদির ব্যয় ও ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই সম্পন্ন হয়। ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য-পরিদর্শনের জন্য সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। পীড়িত হইলে, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের বিনাব্যয়ে চিকিৎসা করা হয়। বর্ত্তমানে প্রত্যহ প্রাতে উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত্-স্বর সংযোগে ছাত্রগণকে বেদমন্ত্র আবৃত্তি করান হয়। তৎপরে সকলেই ভগবদ্গীতা অধ্যয়ন করেন। তদনন্তর প্রত্যেক ছাত্র স্বীয় স্বীয় বিশেষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হন। আশ্রমে একটী ভৃত্য ছাত্রদিগের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আহারাদি নিজেদেরই ইচ্ছানুসারে স্বতন্ত্রভাবে বা অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

আশ্রমের অধ্যাপকগণ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী বেদ-বেদান্ত-মীমাংসা ও সাংখ্য-দর্শনের অধ্যাপনা করাইবেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদাস কাব্যতীর্থ ও স্মৃতিতীর্থ কাব্য ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বেদান্তাদি শাস্ত্রের ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন কাব্যতীর্থ ও রাজেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কাব্য ও ব্যাকরণশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

আয়-ব্যয়।—বর্ত্তমানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্থ মহাশয় যৎসামান্য বৃত্তি-গ্রহণে অধ্যাপনা কার্য্য করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামদাস স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আশ্রমের অধ্যাপনা-কার্য্যের সহিত নিজে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নরহরি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি আপাততঃ আশ্রম হইতে কোন বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন না; কিন্তু ইঁহার জন্যও যত সত্বর পারা যায় একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করা হইবে। আপাততঃ আশ্রমের অধ্যাপকদিগের বৃত্তি ৬০৲, ছাত্রদের আহারাদির ব্যয় ৩৫৲ এবং অন্যান্য খরচ ৫৲, মাসে ১০০৲ টাকা লাগিতেছে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা অধিক হইতে থাকিলেই, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ৫৲ করিয়া মাসে লাগিবেক; সুতরাং পূর্ণসংখ্যা ২১ জন ছাত্রের জন্য ১০৫৲ [illegible] অধ্যাপকের বৃত্তিবৃদ্ধি এবং আর দুই একজন অধ্যাপক রাখিতে হইলে, সমস্ত ব্যয়ের জন্য মাসিক ২০০৲ টাকার একান্ত আবশ্যক। মাসিক ২০০৲ টাকা আয়ের স্থিরতা করিতে পারিলে, আশ্রমের গৃহাদির উন্নতি ও পুস্তকালয়-সংস্থাপনাদির প্রতি মনোনিবেশ করা যাইতে

পারিবে। এই ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য একমাত্র ভরসা ভগবানের কৃপা। শুভানুষ্ঠানে ভগবানের নিশ্চয়ই কৃপা হইবে, এই দৃঢ় বিশ্বাসে এই কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছি। শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়া হিন্দু-সমাজের কথঞ্চিৎ সেবা করিবার জন্য "হিন্দু-পত্রিকা" প্রকাশ করি, এবং এরূপ ইচ্ছা থাকে যে, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশের অর্থ আশ্রমের ব্যয়ার্থ নিয়োজিত হইবে; কিন্তু নিজে অজস্র পরিশ্রম করিয়া, বন্ধু-বান্ধব ও স্বীয় অনুগত লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াও হিন্দু-পত্রিকার আশানুরূপ লভ্য করাইতে পারি নাই। যে সমুদায় গ্রাহকগণের মূল্য বাকী পড়িয়াছিল, তাঁহাদিগকে মূল্য দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পত্র লেখা হয়, এবং তৎপরে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া, বাকী আদায়ের জন্য ১৩০৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা ভ্যালুপেবলে পাঠান হয়; কিন্তু অনেকেই ঐ সমুদায় ভ্যালুপেবল ফেরৎ পাঠাইয়া হিন্দু-পত্রিকাকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মারা নিজেই পত্র লিখিয়া পত্রিকার গ্রাহক হইয়াছিলেন, এবং তৎপরে কেহ একবৎসর, কেহ দুইবৎসরের মূল্যও দিয়াছিলেন; পরে মূল্য ক্রমাগত বাকী ফেলিয়া, অবশেষে ভ্যালুপেবল ফেরত্ পাঠাইয়াছেন! যাহাহউক, এরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরেও, হিন্দু-পত্রিকা-প্রেস্ খরিদ বাবদ হিন্দু-পত্রিকার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহা আমরা হিন্দু-পত্রিকা-তহবিল হইতে পরিশোধ করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে সামান্য কিছু ঋণ আছে; আশা করি, উহা শীঘ্রই পরিশোধিত হইতে পারিবে। হিন্দু-পত্রিকার ঋণ-পরিশোধ হইলেই, হিন্দু-পত্রিকার লভ্যাংশ সমস্তই আশ্রমের জন্য ব্যয়িত হইবে। ব্রহ্মচারি-আশ্রম পরিচালনার জন্য আমাদিগের প্রথম আশাস্থল হিন্দু-পত্রিকার আয়। হিন্দু-পত্রিকার অতি সামান্য মূল্য; হিন্দুমাত্রেই ইহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অনেক শিক্ষিতলোককেও বলিতে শুনি, হিন্দু-পত্রিকা কঠিন। ফলতঃ তাঁহারা হয়ত মনোযোগ করিয়া হিন্দু-পত্রিকা পাঠ করেন না বলিয়াই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। হিন্দু-পত্রিকার সর্ব্বাধিকারীর জ্ঞাতব্য শাস্ত্রার্থ ও লৌকিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়া থাকে। যাহাহউক, হিন্দু-পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে,অনায়াসেই ইহার গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে আশ্রমের বিশেষ উপকার হয়। আমাদের দ্বিতীয় ভরসাস্থল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণ। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের সাহায্যের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই; কেবল হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণের নিকটেই কখন কখন সাহায্য-প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং কেহ কেহ সাহায্যও করিয়াছেন। যদি প্রত্যেক গ্রাহকই স্বীয় দেয় মূল্যের সহিত আশ্রমের সাহায্যার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা হইলে অনায়াসেই আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমরা আপাততঃ স্ব-প্রণোদনায় কাহারও নিকট অধিক দান প্রার্থনা করি না। সকলেই যদি অল্প ২ কিছু ২ দান করেন, তাহা হইলেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমাদের তৃতীয় ভরসাস্থল স্বদেশহিতৈষী ধর্ম্মবৎসল ধনাঢ্য মহোদয়গণ। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একাকীই আশ্রমের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে

পারেন; এবং তাঁহাদের সাহায্যের উপরেই আশ্রমের পূর্ণবিকাশ বা সুসম্পন্নতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আশ্রমের পুস্তকালয়, দেবালয় এবং স্থায়ী পাঠ-মন্দির ও বাস-গৃহাদি নির্মাণের জন্য যে অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন, সামান্য দুই-চারি টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আমাদিগের কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন; একরূপ অসম্ভব বলিলেও হয়। এরূপস্থলে ধনশালী মহাত্মাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। যাহাহউক, আমরা নিঃশব্দে কার্য্য করিতে থাকিব; ভবিষ্যৎ ভগবানের চরণে সমর্পণ করিলাম। এ পর্য্যন্ত আশ্রমের আনুকূল্য জন্য হিন্দু-পত্রিকার যে সমুদায় গ্রাহকমহোদয়গণ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও দান-সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল; আশাকরি, তাঁহারা প্রতিবৎসরই আশ্রমের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রেরণ করিবেন। প্রথমে ১৮৯৮ সালের আগষ্ট হইতে ১৮৯৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা আশ্রমের সাহায্য জন্য এক টাকা বা ততোধিক মুদ্রা পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস, বৃন্দাবন ২৲ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, বাসাবাটী ২॥৶৹ গুরুচরণ সেন, গোয়ালপাড়া ২৷৶৹ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় বারাইচ ১০৲ মণিমোহন সেন, খাগড়া ১৲ নীরদবিহারী বসু, জব্বলপুর ২৲ শ্রীহট্ট——রাজা গিরিশচন্দ্র বাহাদুর ১০৲ লোকনাথ শর্ম্মা ২০৲ মহিমচন্দ্র বসু ৫৲ দ্বারকানাথ ঘোষ ১০৲ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩॥৹ রাধাবিনোদ দাস ৩॥৹ সীতামোহন দাস ২৲ রুক্মিণীমোহন রায় ২৲ নবীনচন্দ্র সিমলাই ১৲ দুলালচাঁদ দেব ১০৲ আনন্দকিশোর দেব ১॥৹ নগেন্দ্রনাথ দত্ত ২৲ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় ৫৲ রায়সাহেব নবকিশোর সেন ২৲ কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল ২॥৹ নবকিশোর দস্তিদার ৫৲ যোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, রাজারামপুর—দিনাজপুর ১৲ এন্ ভট্টাচার্য্য, বেসিন বর্ম্মা ১০৲ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর ১৸৹ ধনঞ্জয় দে, আদাবাড়ী টি ষ্টেট্ ৩৲ প্রমথনাথ বসু—বরাহনগর ৫৲। শিলচর——হরিচরণ দাস ১০৲ মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ৪৲ কামিনীকুমার চন্দ ২৲ কালীমোহন দেব ২৲ বৈকুণ্ঠকান্ত গুপ্ত ৫৲ জয়চন্দ্র দত্ত ২৲ ধর্ম্মচরণ দাস ২৲ হরকিশোর দত্ত ২৲ ব্রজনাথ দত্ত ১০৲ রজনীকান্ত গুপ্ত ৩॥৹। হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী—গিলাপুর ২৲ গোলকচন্দ্র দাস—জালিগঞ্জ ৫৲ কেদারনাথ ঘোষ—হিল্লিঘাটি ষ্টেট্ ৫৲ শিনার—খেলেন্দ্র সিং সুবেদার ৫৲ অবন্তীনাথ দত্ত ২৲ পদ্মলোচন সেন ২৲ জয়কুমার দে ২৲ মানগোবিন্দ চৌধুরী ১৲ শরচ্চন্দ্র মিত্র ২৲ ত্রৈলোক্যনাথ ধর ২৲ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲ রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৲ শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—নারায়ণপুর ১৲ মধুসূদন বিদ্যারত্ন—সাংদিয়া ২৲ গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ঘাটভোগ ২৲ কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শিলং ২৲ রেবতীমোহন গুপ্ত ঐ ২৲ চারুচন্দ্র গোস্বামী ঐ ১৲ রামজয় বাগচী, খোয়ালিয়া ১৲ বিদ্যানাথ সেন ভদ্রক ১৲ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য নড়াল ১০৲. কমলানন্দ বড়ুয়া আসাম ১৲ তালা লাইব্রারী ১৲ চারুচন্দ্র সোম কলিকাতা ৫৲ অজ্ঞাত-নাম একব্যক্তি ১০৲ অপূর্ব্বকৃষ্ণ পাল যোড়হাট ১৲ উত্তমচন্দ্র বড়ুয়া গেনাকুটি ১৲ কিশোরীমোহন চৌধুরী রাজসাহী ১৲। বৃন্দাবন——হেমচন্দ্র বড়াল ১৸৶৹

প্রমোদমোহিনী দাসী ২৲ সূর্য্যকুমার দত্ত—পণ্ডিতবাড়ী ১৲। কাশীধাম—গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲ গিরিশচন্দ্র কুণ্ড ২৲। হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় পানিহাটী ৪৲।

১৮৯৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে ২০এ জুলাই পর্য্যন্ত যে সমুদায় গ্রাহক এক বা ততোধিক টাকা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম—সূর্য্যকুমার তর্কভূষণ—মূলাযোড় ১৲ রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হরিশঙ্করপুর ২৲। তমলুক—রাজা পরমানন্দ বাহুবলেন্দ্র ৫৲ নিত্যানন্দ মাইতি ১৲ হরেকৃষ্ণ মাইতি ১৲ ইন্দ্রনাথ মাইতি ২৲ অটলবিহারী দাস ১১৲। নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ কলিকাতা ২৲ পার্ব্বতিচরণ বিদ্যাভূষণ-কৃত ডিব্রুগড় হইতে আদায় ১১॥০ অপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস ছাপরা ১৲ কেশবলাল দে কোলা ১০০৲ বনমালীচরণ দত্ত চাইবাশা ১৲ উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কাঁটাই ৫৲ কুশচন্দ্র রায়চৌধুরী ঐ ২৲ কেদারনাথ ঘোষ, তমলুক ৫৲ সারদাচরণ স্মৃতিভূষণ, মূলাযোড ১৲ ইন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বোয়ালিয়া টিপারা ১৲ কুলদাপ্রসাদ মজুমদার গোঁসাইগঞ্জ ১৲ কেদারনাথ ঘোষ হালিকা টি ষ্টেট্ ২৲ সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর ৩॥০। রংপুর—অন্নদাপ্রসাদ সেন ১০৲ রাইচরণ মজুমদার ১৲ রাধাচরণ মজুমদার ২৲ আশুতোষ লাহিড়ী ২৲ সিদ্ধেশ্বর সাহা ১৲ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী ১৲ উমেশচন্দ্র গুপ্ত ১৲। প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিহরপাড়া ১৲ ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ ১৲ বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী চিটিগাঁ ১৲ পান্নালাল সিংহ রংপুর ২৲ প্রিয়নাথ জৈন ঐ ২৲ হীরালাল বণিক ১৲ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐ ১৲ নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ ১৲ রামশরণ দত্ত রাজঘাট ১০৲ রাখালদাস রায় ঐ ১৲ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবসাগর ১৲। কুচবিহার—মহারাজার অফিস ২৫৲ কুমার যতীন্দ্র নারায়ণ ২৲ রাণী মীনকুমারী ৫৲ হুকুমচাঁদ ৪৲ তিকনচাঁদ ৪৲ মঙ্গলচাঁদ ৪৲ সম্ভাচাঁদ ৪৲ সকমল ২৲ রূপচাঁদ ২৲ গোলাপচাঁদ ১৲ দৌলৎরাম ২৲ মহাতপচাঁদ ১৲ নৃত্যকুমার রায় ১৲ কৃষ্ণচন্দ্র সেন ১৲ কেদারনাথ মজুমদার ৪৲ মহেশচন্দ্র সেন ১৲ গোপালচন্দ্র ধর ১৲ গোবিন্দপ্রসাদ রায় ১৲ হরিনাথ বসু ১৲ সত্যশচন্দ্র মুস্তফী ১০৲ চন্দ্রকুমার লাহিড়ি ২৲ রায় কালিদাস দত্ত বাহাদুর ২৲ প্রিয়নাথ দত্ত ২৲ প্রমোদারঞ্জন বক্সী ২৲ তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ৫৲ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ১৲ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲। যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, বিন্দুকুশী ১৸৴০ অক্ষয়কুমার মিত্র ৫৲—মাসিকচাঁদা ১৲ হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সোরার ২৲০ চন্দ্রকান্ত ঘোষ রংপুর ১৲ বিশ্বেশ্বর গুপ্ত নিলফামারী ১৲ হেমচাঁদ ঐ ২৲। জলপাইগুড়ি—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ২৲ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৲ শশিভূষণ সেন ২৲ [illegible] সান্যাল ১৲ কোন একবন্ধু ১৲। মদনমোহন গুহ—কুমিল্লা ১৲ রামচন্দ্র [illegible] বিনোদ প্রিয়জন খুলনা ২৲ কালীনাথ মুখোপাধ্যায় যশোহর—মাসিকচাঁদা ৪৲ এতদ্ব্যতীত [illegible]রের শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মিত্র বার্ষিক ১২৲ বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বার্ষিক ৪৮৲ ভূলবাড়ির বাবু ইন্দুভূষণ বসু বার্ষিক ১২৲ চন্দনীর বাবু প্রকাশচন্দ্র ঘোষ বার্ষিক ৪৲ যশোহরের বাবু কালীগোপাল মজুমদার বার্ষিক ৬৲ বাবু রাধিকাচরণ দত্ত

িক ৬৲ বাবু হৃদয়নাথ মজুমদার মুন্সেফ, লালবাগ, বর্ষিক ১৫৲ সাহায্য করিতে ীকৃত হইয়াছেন।

এক্ষণে আশ্রমের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ দেওয়া হইতেছে। গত ২৯শে জুলাই র্যান্ত আশ্রমের জন্য মোট ব্যয় হইয়াছে ৮৭৪৷৷৵০—তন্মধ্যে জমী খরিদ ও ৫খান ঘরের রের জন্য ব্যয় হইয়াছে ৪৭৫৷৵০—বিবিধ প্রকারের খরচ-৬৮৲—ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের রচ ৩৩০৷৷৵০—এই ব্যয়মধ্যে হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে মাট ৫৫৫৷৷০—যাহাহউক নানাবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া গত আষাঢ় মাস হইতে আশ্রম নয়মিতভাবে স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে, এবং তৎপূর্ব্বে নিয়মিতভাবে চলে াই বলিয়া খরচের পরিমাণ কম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণ হইতে আশ্রমের মাসিক ায় ন্যূনসংখ্যা ১০০৲ টাকার কম চলিবে না, এবং ২১জন ছাত্র পূর্ণ হইলে, ২০০৲ টাকার ম কিছুতেই চলিবে না। আমি নিজে ধনবান লোক নহি, তথাপি আমি নিজে যতদূর ারি, ইহার উন্নতিকল্পে কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য হিন্দু-ত্রিকার সহৃদয় গ্রাহকবর্গই আমার প্রধান ভরসাস্থল। আশাকরি, তাঁহারা স্বীয়২ সামর্থ্যানু-ারে বার্ষিক কিম্বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানে আশ্রমকে সজীব রাখিবেন ও ক্রমে ইহার উন্নতি বিধান করিবেন। ভবিষ্যতে প্রতি মাসের আয়-ব্যয় হিন্দু-পত্রিকায় নয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

পঞ্চদশী—ভূতবিবেক।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বভাববান্।
আকাশোঽস্তীতি সত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৩৪

টীকা। তত্র প্রথমঃ কার্য্যবিশেষং দর্শয়তি আদ্যো বিকার ইতি। তৎস্বরূপমাহ—সোঽবকাশ-স্বভাববানিতি। আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বে হেতুমাহ আকাশ অস্তীতি সত্ত্বমাকাশেঽপি অনুগচ্ছতীতি।

বঙ্গানুবাদ। মায়ার আদি বিকার আকাশ; ঐ আকাশের অবকাশ (শূন্য) স্বভাব। আকাশ অস্তি (আছে) ইহাই সত্তের অস্তিত্ব। আকাশে অনুগমন করে—অর্থাৎ সত্তের অস্তিত্বেই আকাশের অস্তিত্ব।

তাৎপর্য্যার্থ। সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মশক্তি মায়া, পরমব্রহ্ম-যোগে যে বিবিধ বিকাররূপ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার প্রথম বিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হইতেছে;

পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে আকাশে উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ—অর্থাৎ শূন্য-স্বভাব। যেহেতু আকা পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মা হয়; তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই।

একস্বভাবং সত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ'
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি সচৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥৫৫

টীকা। ততঃকিং ইতি অত আহ একস্বভাবং ইতি। উক্তমর্থ বিবৃণোতি—ন-অব কাশ ইতি। সতি-সদ্‌বস্তুনি অবকাশো নাস্তি। কিন্তু সৎস্বভাব এক এব আকাশে সচ সৎ স্বভাবশ্চ এষোঽপি অবকাশস্বভাবঃ অপি ইতি দ্বয়ং স্থিতং বিদ্যতে ইত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। সতের এক স্বভাব, আকাশ দ্বি-স্বভাবযুক্ত, সতে অবকাশ (শূন্য) নাই কিন্তু আকাশে সতের সত্তা এবং অবকাশ, উভয়ই আছে।

তাৎপর্য্যার্থ। সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র এক স্বভাব হইলেও সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য স্বরূপ আকাশের অবকাশ ও সত্তা, এই দুইটি স্বভা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, সেই আকাশের যে একটি প্রতিধ্বনি-গুণ আছে তাহা সদ্বস্তু পরমাত্মায় নাই। সুতরাং সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তামা একটী গুণ লক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যভূত আকাশের সত্ত ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটী গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৫৬

টীকা। সদাকাশয়োরেক দ্বিস্বভাবকং প্রকারান্তরেণ ব্যুৎপাদয়তি যদ্বা ইতি প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নো গুণঃ ইত্যুপপাদিতঃ অতস্তৎ অসৌ প্রতিধ্বনিঃ সদ্বস্তুনি নেক্ষ ন উপলভ্যতে ব্যোম্নিতু সদ্-ধ্বনিঃ সচ্ছব্দঃ উভৌ এব উপলভ্যেতে তেন কারণেন সদে এক স্বভাবং বিয়ৎ দ্বিগুণং দ্বিস্বভাবকমিত্যর্থঃ।

বঙ্গার্থ। আকাশের প্রতিধ্বনি-গুণ আছে; ঐ প্রতিধ্বনি সদ্বস্তুতে নাই। আকা সত্তা-শব্দ দুইই আছে, তদ্ধেতু সৎ একস্বভাব, আকাশ দ্বিগুণ—দ্বিস্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ। পরমাত্মা চৈতন্য বা জ্ঞানময়, চৈতন্য স্বয়ং জ্ঞাতা, শব্দাদি গু জ্ঞাত পদার্থ, উহা জ্ঞাতার নিকট অনুভূত বিষয়। আকাশও একটী অনুভূত বিষ মাত্র; ঐ আকাশের গুণই শব্দ। ঐ শব্দ-গুণ আকাশে উৎপন্ন হয়। এই শব্দ-গুণ সৎপদার্থে নহে। এক মাত্র জ্ঞানই সৎপদার্থ; উহা চির কালই বিদ্যমান। আকাশ-জ্ঞান বলিতে জ্ঞানের অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতা আকাশের সহিত এক হইয়া যাওয়ায়, আকাশে সতে (ঐ সত্যজ্ঞানের) সত্তা (বিদ্যমানতা) এবং আকাশের শব্দ-গুণ, উভয়ই প্রমাণিত হয়

অতএব সৎ এক, অদ্বিতীয়—আকাশে সত্তের সত্তা ও তাহার নিজের শব্দ-গুণে আকাশ স্বভাব বা দ্বিগুণ হইতেছে।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাং।

আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়ে নাবকল্পয়েৎ ॥ ৫৭

টীকা। যা মায়া সদ্বস্তুনি আকাশং কল্পয়তি সা। মায়া) প্রথমতঃ সদ্ব্যোম্নোরভেদং কল্পয়তি পশ্চাৎ উক্ত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবঞ্চ বৈপরীত্যেন কল্পয়তি; অতঃ আকাশস্য সত্বেতি ভাণমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। যে মায়াশক্তি আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া প্রথমতঃ সৎ-আকাশ অভেদ কল্পনা করে, পরে ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাবে বিপরীত কল্পনা করে।

তাৎপর্য্যার্থ। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করেন, সেই মায়া পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উক্ত উভয়ের ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা করেন। সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ—পরমাত্মস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মায়া দ্বারাই কল্পিত।

সতোব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাস্তু লৌকিকাঃ।

তার্কিকাশ্চবগচ্ছন্তি মায়য়া উচিতং হি তৎ॥৫৮

টীকা। বস্তুতত্ববিচারে মৃদো ঘটরূপত্বমিব সতো ব্যোমত্বমাপন্নং সদ্বস্তু ন আকাশত্বং প্রাপ্তং। লৌকিকাঃ প্রাণিনঃ শাস্ত্রীয়েষু মধ্যে তার্কিকাশ্চ তদ্বৈপরীত্যেন ব্যোম্নঃ গগনস্য ধর্ম্মিণঃ সত্তাং সদ্রূপত্বং জানন্তি। তদ্বিপরীত দর্শন হেতুত্বং মায়ায়া উচিতং ইত্যর্থঃ।

বঙ্গানুবাদ। সদ্ব্রহ্ম আকাশত্ব প্রাপ্ত হন; লৌকিক ও তার্কিকগণ যে আকাশের সত্তা-স্বীকার করেন—অর্থাৎ আকাশকে নিত্যবস্তু মনে করেন, ইহা মায়ার কার্য্য।

তাৎপর্য্যার্থ। বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এই জন্য ইহা পদার্থবিশেষ। পরন্তু যাহারা স্থূলদর্শী অজ্ঞ, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত নহে। তাহারা এবং আত্ম-গৌরবাভিমানী-পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকগণ যে আকাশের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য। মায়ার ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থ মাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

১৭।

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।

অন্বয়ঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং সর্ব্বস্য প্রভুম্ ঈশানং (চ) সর্ব্বস্য বৃহৎ শরণং (চ) (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাঃ বদন্তি)

বিষমপদব্যাখ্যা। সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেষাং ইন্দ্রিয়াণাং গুণান্ শক্তীঃ সাংসারিক বিষয়াবৎ আভ্যন্তরিক প্রকাশয়তি ইতি সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশক। সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্—সর্ব্বৈরিন্দ্রিয়ৈঃ বিশেষেণ-বর্জ্জিতং—রহিতম্, সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত সর্ব্বস্য প্রভুম্ সকলের প্রভু। ঈশানং ঈশিতারং পরিচালকং নিয়ামকং ইতি যাবৎ, সকলের ঈশিতা অর্থাৎ নিয়মকর্ত্তা।

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, তিনি স্বয়ং সমস্ত-ইন্দ্রিয়-বর্জ্জিত হইয়াও যাবতীয় ইন্দ্রিয়-শক্তির প্রকাশক, সকলের প্রভু; এই বিশ্বভুবনের একমাত্র তিনিই নিয়মকর্ত্তা। তিনি বৃহত্তর অপেক্ষাও বৃহত্তম, এবং তিনিই এ জগতের একমাত্র অনাবিল আশ্রয়-ভূমি।

১৮।

নবদ্বারে পুরেদেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ॥

অন্বয়—স্থাবরস্য চরস্য চ সর্ব্বস্য লোকস্য বশী হংসঃ নবদ্বারে পুরে দেহী (সন্) বহির্লেলায়তে।

বিষমপদব্যাখ্যা। স্থাবরস্য স্থিতিশীলস্য—স্থিতিশীল। চরস্য—জঙ্গমস্য গমনশীল। বশী—নিয়ামক। হংসঃ হন্তি তিমিরং অজ্ঞানং ইতি হংসঃ যদ্বা হন্তি গচ্ছতি বর্ত্ততি ইতি হংসঃ, হন লো হিংসাগত্যোরিত্যস্মাৎ "হন্ মাসিকমিভ্যঃ সঃ" ইতি সপ্রত্যয়ঃ নিখিল অজ্ঞান বিনাশক। নবদ্বারে—নবানি দ্বারাণি যস্মিন্। নয়নদ্বয়ং নাসারন্ধ্রদ্বয়ং কর্ণদ্বয়ং মুখং চ ইতি সপ্ত তথা পায়ু উপস্থরূপে দ্বে, ইতি নবদ্বারাণি যত্র—তাস্মিন্।

নয়নদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মুখ এবং পায়ু ও উপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট। পুরে—দেহে—পুরাত—গচ্ছাৎ, নহি চিরং তিষ্ঠতি, ইতি পুরং। নশ্বর দেহে। দেহী দিহ্যতে শোকমোহাদিভিঃ ক্লিশ্যতে ইতি দেহঃ তদ্বিশিষ্টঃ সন্, শোকমোহাদি-ক্লেশভাজন দেহধারী হইয়া। বহিঃ বাহ্যভাবেন লেলায়তে গমনাগমনং করোতি বাহ্যবিষয়ং উপভুঙ্ক্তে ইতি ভাবঃ। বাহ্যিক বিষয় সমূহ উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি নির্লিপ্ত।

বঙ্গানুবাদ। স্থাবর এবং জঙ্গম, এই সমস্ত লোকের তিনিই একমাত্র নিয়মকর্ত্তা। সেই অবিদ্যারূপ তিমিরনাশক পরমাত্মা এই নবদ্বারবিশিষ্ট নশ্বর কলেবরে "দেহী" রূপে বিরাজ করিয়া বহির্বিষয় সমূহ ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অপাপবিদ্ধ এবং সনাতন পুরুষ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	ভাদ্র ও আশ্বিন।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

সামবেদ-সংহিতা।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্ত)

সৈষা চতুর্থী।

(মধুচ্ছন্দ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ৩ ২ ৩২
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্দ্ধিয়া বয়ম্।

২ ৩ ১২৪ ১২
নমো ভরন্ত এমসি ॥৪॥

অগ্নে।=হে অগ্নে! বয়ং=অনুষ্ঠাতারঃ=আমরা অনুষ্ঠাতা। দিবে দিবে=প্রতিদিনং। দোষাবস্তঃ (১)=রাত্রাবহনিচ=রাত্রি ও দিনে (রাত্রিকালে অর্থাৎ সায়ং-হোমকালে ও দিনে অর্থাৎ প্রাতর্হোমকালে) ধিয়া=বুধ্যা=বুদ্ধিদ্বারা। নমো ভরন্তঃ=নমস্কারং সম্পাদয়ন্তঃ=নমস্কার করিয়া। উপ=সমীপে=নিকটে। ত্বা=ত্বাং=তোমাকে। এমসি=আগচ্ছামঃ। এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ২বর্গেও আছে।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন দিবস-যামিনী বুদ্ধি দ্বারা তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকটে আসিতেছি।৪।

---

(১) নিরুক্তে উত্তরষট্কে প্রথম অধ্যায়ে ৯।

অথ পঞ্চমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

১২ ৩ ১ ২ ৩ ২ ২ ৩ ১ ২
জরাবোধ তদ্বিবিড্‌ঢি বিশে বিশে যজ্ঞিয়ায়।
১ ১ ৩ ১ ২ ৩ ২
স্তোমꣳ রুদ্রায় দৃশীকম্‌॥৫॥

হে জরাবোধ! = জরয়া স্তুত্যা বোধ্যমানাগ্নে! = হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! বিশে বিশে = তত্তদ্‌যজমানরূপ প্রজানুগ্রহার্থং = সেই সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহজন্য। যজ্ঞিয়ায় = যজ্ঞসম্বন্ধ্যনুষ্ঠান-সিদ্ধ্যর্থং = যজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সিদ্ধির জন্য তদ্‌ = দেব যজনং = সেই দেব-যজনস্থান। বিবিড্‌ঢি = প্রবিশ = প্রবেশ কর। রুদ্রায় = ক্রূরায় অগ্নয়ে তুভ্যং — তোমাকে অথবা ভীমাকৃতি রুদ্ররূপী তোমাকে। দৃশীকং দর্শনীয়ং সমীচীনং স্তোত্রং করোতি = উত্তম স্তোত্র করিতেছেন। এই মন্ত্রটি উত্তরার্চ্চিকে ৮প্রপাঠকে ২অধ্যায়ে ৩সূক্তেও আছে, এবং ঋগ্বেদ-সংহিতায় ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২৩বর্গেও আছে।

হে স্তুতিদ্বারা বোধ্যমান অগ্নে! সেই যজমানরূপ প্রজাগণের অনুগ্রহ জন্য—অর্থাৎ যজ্ঞসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সিদ্ধ হইবার জন্য সেই দেব-যজন-স্থানে প্রবেশ কর। যজমানগণও রুদ্ররূপী তোমাকে উত্তম স্তব করিতেছেন।

অথ ষষ্ঠী।

(মেধাতিথি ঋষিঃ)

২ ৩ ১ ২র ৩ ১ ২ ৩ ২ ১ ৩ ২
প্রতিত্যঞ্চারুমধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
মরুদ্ভিরগ্ন আগহি॥৬॥ (ক)

অগ্নে। = হে অগ্নে! ত্যং = তথাবিধং = সেইরূপ। চারুং = মনোহরং = মনোহর। অধ্বরং = যজ্ঞং। প্রতি = লক্ষ্য = লক্ষ্য করিয়া। গোপীথায় = সোমপানায় = সোম (লতাবিশেষ, উহার রসে মত্ততা হইয়া থাকে) পানের জন্য। প্রহূয়সে = প্রকর্ষেণ ত্বং হূয়সে = বিশেষ-

(ক) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ১অষ্টকে ১অধ্যায়ে ৩৬ বর্গে আছে।

রূপে তুমি আহূত হও। মরুদ্ভিঃ=দেববিশেষৈঃ সহ=মরুদ্‌গণের সহিত। আগহি=আগচ্ছ=আগমন কর।

হে অগ্নে! (যে যজ্ঞ চারু—অঙ্গ-বৈকল্য রহিত) তুমি সেইরূপ মনোহর যজ্ঞের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহূত হইয়াছ; তজ্জন্য তুমি এই যজ্ঞে মরুদ্‌গণের সহিত আগমন কর ॥৬॥

অথ সপ্তমী।

(শুনঃশেপ ঋষিঃ)

২ ৩ ২ ৩ ১ ২ ২ ১ ২ ৩ ১ ২র

অশ্বংনত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিন্নমোভিঃ।

৩১ ২ ৩ ১ ২

সম্রাজন্তমধ্বরাণাম্ ॥৭॥ (গ)

অধ্বরাণাং=যজ্ঞানাং=যজ্ঞ সকলের। সম্রাজংতং=সম্রাট্‌স্বরূপং স্বামিনং অগ্নিং ত্বাং=সম্রাট্‌স্বরূপ স্বামী তোমাকে। নমোভিঃ=স্তুতিভিঃ=স্তুতি সকল দ্বারা। বন্দধ্যৈ=বন্দিতুং প্রবৃত্তা=বন্দনা (গ) করিবার জন্য প্রবৃত্ত। বারবন্তং=বালযুক্তং=পুচ্ছযুক্ত। অশ্বংন=অশ্বমিব (অশ্বো যথা বালৈর্বাধকান্ মশকমক্ষিকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিরস্মদ্ বিরোধিনঃ পরিহরসি।) ঘোটকের ন্যায়—অর্থাৎ যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছ দ্বারা কষ্টদাতা মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, সেইরূপ তুমিও পুচ্ছ সদৃশ জ্বালাদ্বারা আমাদিগের বিরোধিগণকে পরিহার কর।

হে অগ্নে! যজ্ঞসকলের সম্রাট্‌স্বরূপ তোমাকে আমরা স্তুতি সকল দ্বারা বন্দনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেরূপ অশ্ব নিজ পুচ্ছদ্বারা বাধা দিয়া মশক-মক্ষিকাদিগকে নিবারণ করে, তদ্রূপ তুমিও জ্বালা দ্বারা আমাদের বিরোধিগণকে দূর কর।

অথাষ্টমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২র ৩২ ২র

ঔর্ব ভৃগুবচ্ছুচিমপ্নবানবদাহুবে।

৩ ১ ২ ৩ ১ ২

অগ্নিং সমুদ্র বাসসম্ ॥৮॥ (ঘ)

(গ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদে ১অষ্টকে ২অধ্যায় ২২বর্গে আছে।

(গ) বন্দনা তিন প্রকার "কায়েন মনসা বাচা"। শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা বন্দনা। এখানে বাক্য দ্বারা বন্দনা।

(ঘ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতায় ৬অষ্টকে ৭অধ্যায়ে ৯ বর্গে আছে।

সমুদ্র বাসসং = সমুদ্র মধ্যবর্ত্তিনং বাড়বং = সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে। শুচিং = শুদ্ধং ঔর্ব্ভৃগুবং = যথা ঔর্ব্ভৃগুঃ = যেরূপ ঔর্ব্ভৃগুঋষি। অপ্নবানবং = যথা অপ্নবানঃ = যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আহুবে = অহমাহ্বয়ামি = (সেইরূপে) আমি আহ্বান করিতেছি। ঔর্ব্ভৃগুঋষি যেরূপ শুচিসম্পান্ন সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী বাড়বাগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই-রূপে আমিও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি॥৮॥

অথ নবমী।

(প্রয়োগ ঋষিঃ)

৩ ১ ২ ৩ ১ ২র৩ ১২ ৩ ১ ২
অগ্নিমিন্ধা নো মনসা ধিয় ং সচেতমর্ত্যঃ।
৩ ১ ২ ৩ ১ ২
অগ্নিমিন্ধে বিবস্বভিঃ॥৯॥ (ঙ)

মর্ত্যঃ = মনুষ্যঃ। অগ্নিমিন্ধানঃ = কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলয়ন্ কাষ্ঠদ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া। মনসা = মনসা এব শ্রদ্দধানঃ = মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া। ধিয়ং = কর্ম্ম = কর্ম্মকে। সচেত = কালে ভজেত = কালে ভজনা করেন। বিবস্বভিঃ = ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ = ঋত্বিক্‌গণদ্বারা। অগ্নিং = অগ্নিকে। ইন্ধে = প্রজ্বলয়তি = প্রজ্বলিত করে।

যে মনুষ্যঃ অর্থাৎ যজমান ঋত্বিক্‌গণদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন, তিনি কাষ্ঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া মনে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কালে কর্ম্ম করেন॥৯॥ (চ)

(ঙ) এই মন্ত্র ঋগ্বেদসংহিতায় ৬ অষ্টকে ৭ অধ্যায়ে ১২ বর্গে আছে।

(চ) বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রথমে আমাদের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শ্রীভগবদ্‌গীতার তৃতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মকে প্রশংসা করিয়াছেন ও কহিয়াছেন,—

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। ১৯॥

জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারাই সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ১৮ অধ্যা কহিয়াছেন,— মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু॥৬৫॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণে রামগীতায়ও কর্ম্ম-প্রশংসা করিয়াছেন।

এই বাহ্য ক্রিয়া করিলে শ্রদ্ধা হইবে। শ্রদ্ধা জন্মিলে পরমেশ-ধ্যানে ক্ষমতা হই

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্॥২॥ পাতঞ্জলদর্শনে বিভূতিপাদে।

যে স্থানে চিত্তের ধারণা হয়, সেই স্থানে জ্ঞানের একতানতাকে ধ্যান কহে।

ধ্যান হইতেই ক্রমে সমাধি হইবে।

"তদেবার্থ মাত্র নির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"॥৩॥ ঐ-ঐ

ধ্যান করিতে করিতে যখন অন্তঃকরণে একমাত্র ধ্যেয় বস্তু কেবল প্রকাশ পায়, উহাকেই যো চরম সীমা 'সমাধি' কহিয়া থাকে। এই সময় চিত্তের একাগ্রতা হওয়ায়, বিক্ষেপ পরিত্যাগ ক নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় মন স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে।

অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥৪৮॥ কুমারে ৩য় সর্গে।

মনদ্বারা উপাসনার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে; সুতরাং ঐ যোগশ দেখিলেই সমুদায় জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

অথ দশমী।

(বৎস ঋষিঃ)

১উ ৩২৩ ১২ ৩ ১ ২ ৩১
আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্।
৩২উ ৩১ ২ ৩১
পরোযদিধ্যতে দিবি ॥১০॥ (ছ)

পরোদিবি = দিবঃপরস্তাৎ অথবা দ্যুলোকস্যোপরি = দ্যুলোকের উপরে। যদ্ = যদা = যখন। ইধ্যতে = দীপ্যতে অর্থাৎ অযং বৈশ্বানরোঽগ্নিঃ সূর্য্যাত্মনা দীপ্যতে = এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে (জ) দীপ্তি পান। আদিৎ = অনন্তরমেব = অনন্তর। প্রত্নস্য = চিরন্তনস্য = চিরকালের। রেতসঃ = গন্তুঃ = গমনকারীর। বাসরং = নিয়ামকং বাসরস্য নিবাস-হেতুভূতং বা নিয়ামক অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত। জ্যোতিঃ = দ্যোতমানং তেজঃ = দীপ্তিশালী তেজকে। পশ্যন্তি = (সকল জন) দেখেন। যখন দ্যুলোকের উপরে চিরকাল গমনশীল এই বৈশ্বানর নামে অগ্নি সূর্য্যরূপে দীপ্তি পান, তাহার কিছুক্ষণ পর বাসর-নিয়ামক দীপ্তিশালী তেজকে অথবা দিবা-রাত্রির নিবাস-হেতুভূত দীপ্তিশালী তেজকে সকলে দেখেন॥১০॥

ইতি সামবেদসংহিতায়াং গ্রামে গেয় গানে প্রথমস্যার্দ্ধঃ প্রপাঠকঃ॥ (ক্রমশঃ)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

১৯

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন তস্যাস্তিবেত্তা তমাহুরগ্র্যম্ পুরুষং মহান্তম্॥

অন্বয়ঃ। (স পরমাত্মা) অপাণিপাদঃ (সন্নপি) জবনো গ্রহীতা (চ ভবতি) সঃ **অচক্ষুঃ** (সন্নপি) পশ্যতি, অকর্ণঃ (সন্নপি) শৃণোতি (চ)। স বেদ্যং বেত্তি,

(ছ) এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদসংহিতার ৬অষ্টকে ৮অধ্যায়ে ১৪বর্গে আছে।
(জ) বেদের উপাসনাকাণ্ডে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণ এক—কেবল নামের ভেদ মাত্র।

(কিন্তু) তস্য চ বেত্তা ন অস্তি। (তত্ত্বজ্ঞাঃ) তম্ (এব) অগ্র্যং মহান্তং (চ) পুরুষং আহুঃ।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অপাণিপাদঃ অহস্তচরণঃ,—কর-চরণ-বর্জ্জিত। জবনঃ—বেগবান্। বেদ্যম্—জ্ঞেয়ং, জ্ঞাতব্য। অগ্র্যম্—অগ্রেভবঃ অগ্র্যঃ, তম্, অগ্রজাত অর্থাৎ প্রথম। মহান্তং—মহ্যতে পূজ্যতে ইতি মহৎ, তম্। মহ পূজনে "নাম্নাতি অতুঃ"। মহনীয় পূজনীয়। পুরুষং—পুরৌ শেতে ইতি পুরুষঃ—যদ্বা পুরে বসতি ইতি পুরুষঃ (পুর+বস্+ক) পরমাত্মা।

সেই পরম পুরুষ কর-চরণাদি-বর্জ্জিত হইয়াও অনভিভবনীয় বেগবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপদার্থের গ্রহণসমর্থ। তিনি বহিশ্চক্ষুঃশূন্য হইলেও, তদীয় সনাতনী-প্রজ্ঞা-বলে সমস্তই তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

তাঁহার সামান্য লৌকিক শ্রুতি না থাকিলেও, স্বকীয় ঐশী ক্ষমতা বশতঃ তিনি সমস্তই শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিশেষভাবে পরিজ্ঞাত আছেন, কিন্তু তাঁহার কেহ পরিজ্ঞাতা নাই; কেন না তিনি জ্ঞানাতীত। তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ তাঁহাকেই একমাত্র অনাদি এবং পরম পূজনীয় পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

২০

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥

অন্বয়ঃ। অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্ আত্মা অস্য জন্তোঃ গুহায়াং নিহিতঃ (অস্তি) বীতশোকঃ (মনস্বী) ধাতুঃ প্রসাদাৎ যদ্বা ধাতু-প্রসাদাৎ তম্ অক্রতুম্ ঈশম্, (তস্য) মহিমানং (চ) পশ্যতি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। অণোঃ সূক্ষ্মাৎ, সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্ সূক্ষ্মতর। মহতঃ মহীয়ান্—মহৎ হইতেও মহত্তর। গুহায়া॰ গূহতি সংবৃণোতি আত্মানং ইতি গুহা, গুহ+ক+আপ্—হৃদয়। জন্তোঃ—জায়তে ইতি জন+তু—যে জন্মগ্রহণ করে, এতাদৃশ জরা-মরণশীল প্রাণীসমূহের। (এখানে বহুত্বে একবচন)। অক্রতুম্—কামরহিতং—নিস্পৃহ—অকাম। ধাতুঃ প্রসাদাৎ—বিধাতার অনুগ্রহে। 'ধাতু-প্রসাদাৎ' এই বিসর্গশূন্য পাঠে ধাতুশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়াদি, তাহাদের প্রসাদ অর্থাৎ প্রসন্নতা বশতঃ। বহির্বিষয়-বিমুখ ইন্দ্রিয় হেতু।

বঙ্গার্থ। সেই সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর—অথচ মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর আত্মা এই বিশ্বের প্রাণিসমূহের হৃদয় মধ্যে নিহিত রহিয়াছেন। যাবতীয় জীব-হৃদয়ই তাঁহার ক্রীড়াস্থল। শোক-মোহাদি-তামস-ভাব-বর্জ্জিত সাধনাশীল মনস্বী ধ্যান-ধারণাদি-বলে ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়া, স্বকীয় হৃদয় মধ্যেই সেই বাসনাবিহীন হৃদয়েশ্বরকে

এবং তদীয় অপ্রতিরথ মহিমাবলি দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়েন। দেখিতে জানিলে, আত্মতীর্থেই সেই সর্ব্বতীর্থেশ্বরের নয়নরঞ্জিনী মূর্ত্তি দর্শন করা যায়। আমাদের দেখিবার সামর্থ্য নাই বলিয়াই আমরা দিদৃক্ষু হইয়া তীর্থান্তর-ভ্রমণপূর্ব্বক ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া বেড়াই। তবে কিনা, অনধিকারে আত্মতীর্থসেবার্থী হওয়া অপেক্ষা বাহ্যতীর্থ-সেবাই বিহিত।

২১

বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥

অন্বয়ঃ। অহম্ এতম্ অজরম্ পুরাণম্ সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতম্ বিভুত্বাৎ বেদ। ব্রহ্ম-বাদিনঃ যস্য (যদ্ জ্ঞানস্য) জন্মনিরোধম্ প্রবদন্তি, (যম্ চ) নিত্যম্ অভিবদন্তি।

বিষমপদ ব্যাখ্যা। বিভুত্বাৎ তস্য আকাশবদ্ ব্যাপকত্বাৎ, আকাশ যেমন সর্ব্ব-ব্যাপী, তদ্রূপ তিনিও সর্ব্বব্যাপী। সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু। বেদ—জানামি—জানি। যস্য—যে জ্ঞানের অর্থাৎ যে ঈশ্বর-জ্ঞানের। জন্ম-নিরোধং—উৎপত্তি-অভাবম্, উৎপত্তির অভাব অর্থাৎ জন্মনিবারকতা। যে জ্ঞান জন্মিলে আর জন্ম-যাতনা ভোগ করিতে হয় না। নিত্যম্—সনাতম। ব্রহ্মবাদিনঃ—ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতবৃন্দ।

বঙ্গার্থ। আমি এই জরা-মৃত্যু-রহিত সর্ব্বাত্মক পুরাতন সর্ব্বগত ঈশ্বরকে আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপিরূপে জ্ঞাত আছি। ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার যে জ্ঞানকেই এক-মাত্র পুনরাবৃত্তি-নাশক বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং যে পরম পুরুষকে তাঁহারা নিত্য নিরঞ্জন বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন, আমি সেই সুদুর্লভ জ্ঞান এবং নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়াছি। সাধকের এবম্বিধ দৃঢ় বিশ্বাস যদি দম্ভের মলিন ছায়াপাতে কলুষিত না হয়, তবে ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎ সৎ।

ইতি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

পঞ্চদশী—ভূত-বিবেক।

[পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ]

যদ্ যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥৫৯

টীকা। যথা যেন শুক্তিকাদি রূপেণ বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং শুক্ত্যাদিরূপত্বং প্রমাণতঃ ভাতি স্ফুরতি অন্যথাত্বং রজতাদিরূপত্বং তদ্‌ভ্রমেণ—ভ্রান্ত্যা প্রতিভাতি ইতি অয়ংন্যায় সার্ব্বলৌকিকঃ সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধঃ ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। যে পদার্থ প্রকৃত, প্রমাণ দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হয়। ভ্রান্তি বশতঃ তাহা অন্যরূপ বিবেচিত হইতে পারে, ইহাই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম, তাহাই প্রমাণ দ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়; পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমান্ধ, তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেনা। শুক্তিতে যে শুক্তিত্ব-প্রকাশক জ্ঞানের পরিবর্ত্তে রজত-জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রম-জ্ঞান। এইরূপে ভ্রান্তি দ্বারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া, সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শনই করিতেছেন। ফলতঃ শুক্তিতে শুক্তিত্ব-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, প্রমাণ দ্বারা তাহাই সাব্যস্ত হয়; কিন্তু শুক্তিতে রজত-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ঐ ভ্রম-নিবৃত্তির উপায় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

এবং শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ যদ্ যথা বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিযৎ ॥৬০

টীকা। এবমুক্তেন প্রকারেণ শ্রুতি-বিচারাৎ প্রাক্ শ্রুত্যর্থ-বিচারাৎ পূর্ব্ব যদ্-বস্তু যদ্রূপং ব্রহ্ম ভ্রান্ত্যা যেন গগনাদি রূপেণ বর্ত্ততে অতঃ শ্রুত্যর্থ-পর্য্যালোচনেন বিপর্য্যেতি গগনাদি ভাবং পরিত্যজ্য সদ্রূপং ব্রহ্মৈব ভবতি ততঃ শ্রুতিবিচারেণ বস্তুযাথার্থ্য দর্শন সম্ভবাৎ তদ্‌বিয়চ্চিন্ত্যতাং বিচার্য্যতাং ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে যে বস্তু যেরূপ বোধ হয়, শ্রুতি-বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত অনুভূত হয়; অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, আকাশ কি বস্তু।

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-বিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, পরে বিচার দ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত-বিচার দ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না।

ভিন্নে বিয়ৎ সতী শব্দ ভেদাদ্ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায্বাদি ষ্বনুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীঃ॥৬১

টীকা। ভিন্ন ইতি প্রতিজ্ঞাতার্থে হেতুমাহ শব্দ-ভেদাদিতি। বিয়চ্ছব্দ সচ্ছব্দয়োরপর্য্যায়ত্বাদিত্যর্থঃ। হেত্বন্তরমাহ বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ ইতি। তমেব হেতুং বিবৃণোতি বায্বাদিষু ভূতেষু সদ্বায়ু সৎতেজ ইত্যেবম্প্রকারেণ অনুবৃত্তং ভাসতে ব্যোমতু নৈবং ভাসতে ইতি যজ্জ্ঞানং সা ভেদধীর্ভেদবুদ্ধিরিত্যর্থঃ।

অনুবাদ। সৎ এবং আকাশ শব্দ পৃথক্, যেহেতু বায়ু প্রভৃতি ভূতেঃসৎশব্দ অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ অনুবৃত্ত হয় না, ইহাই ভেদ-বুদ্ধি।

তাৎপর্য্য। বিচারপূর্ব্বক যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ; যেহেতু আকাশ ও সৎ, এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য্য স্বরূপ সত্তা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। বায়ু প্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকেনা, ইহাই সর্ব্বসাধারণের অনুমান।

সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি ব্যোমস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্॥৬২

টীকা। রূপরসাদিষ্বনুবৃত্তস্য দ্রব্যস্য এব আকাশ বায্বাদিষ্বনুবৃত্তস্য সতোধর্ম্মিত্বং রসাদিভ্য ব্যাপৃতস্য স্বরূপস্যেব বায্বাদিভ্য ব্যাপৃতস্য নভসো ধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। নতু তর্হি ঘটাদ্ভিন্নস্য রূপস্য যথা বাস্তবত্বং তথা সতোভিন্নস্য নভসোঽপি স্যাৎ ইত্যাশঙ্কাহ সদ্ ব্যতিরিক্তস্য নভসো দুর্নিরূপত্বাৎ নৈবমিত্যাহ ধিয়া সত ইতি।

অনুবাদ। সৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু ধর্ম্মী, আকাশ ধর্ম্ম; সৎবুদ্ধি পৃথক্ করিলে, আকাশের কি থাকে, বল।

তাৎপর্য্য। যিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অতএব সেই পরমাত্মা জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম; এই প্রকার যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ সবস্তু হইতে পৃথক্। এইরূপ

স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি, আর কি আকাশের স্বরূপত্ব থাকে? বাস্তবিক কিছুই থাকে না।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসৎ তদিতি চিন্ত্যতাং।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্‌ব্যাহতিস্তব ॥৬৩

টীকা। তর্হি সতো বিলক্ষণত্বাদসদেবস্ত্বাৎইতি পরিহরতি অসত্ত্বাদিতি ইতি। সতো বিলক্ষণস্য অসত্ত্বং নাস্তীতি বদতো দোষমাহ ভিন্নমিতি।

অনুবাদ। আকাশ যখন অবকাশাত্মক, তখন ইহা অসৎ বলিয়া মনে করিও। যদি বল—সৎ হইতে ভিন্ন, অথচ অসৎ নহে, তাহা হইলে উহা অসংলগ্ন হয়, অর্থাৎ ঐরূপ দোষযুক্ত বাক্য হইতে পারেনা।

তাৎপর্য্য। যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশ-স্বরূপ, অর্থাৎ যেথানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহা হইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল; এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ বলিতে পারনা। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না; ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসদ্ভাসমানন্তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥৬৪

টীকা। অসত্ত্বে ভানং নস্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য তুচ্ছবিলক্ষণত্বাদ্ ভানং ন বিরুদ্ধতে ইত্যাহ ভাতীতি চেদিতি। অবিরোধং দর্শয়িতুং মিথ্যাবস্তু লক্ষণং দৃষ্টান্তমাহ যদ্ অসদ্ভাসমানমিতি। যদ্ বস্তু স্বরূপেণ অবিদ্যমানমপি ভাসতে তৎ স্বপ্নগজাদিবৎ মিথ্যা ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ ভাসমান হয় বলিয়া উহা সত্য নহে। মায়ার লক্ষণ এই যে, দৃষ্ট পদার্থ স্বপ্ন-গজাদিবৎ মিথ্যা।

তাৎপর্য্যার্থ। তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সৎস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ, তাহাও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাভেদে সৎ-

স্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না।

জাতিব্যক্তৌ দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ॥৬৫

টীকা। নমু নিয়মেন সহোপলভ্যমানয়োর্ভেদ ন দৃষ্টচর ইত্যাশঙ্ক্যাহ জাতি-ব্যক্তীতি।

অনুবাদ। জাতি-ব্যক্তি, দেহি-দেহ এবং গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য, সেইরূপ সৎ এবং আকাশের মধ্যে পার্থক্য আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে।

তাৎপর্য্য। যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই নিমিত্ত "আকাশের সত্তা আছে" এইবাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন। যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যেপ্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যেপ্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে।

বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্য ভাবোঽস্য তে বদ॥৬৬

টীকা। ভেদো যদ্যপি বুধ্যতে তথাপি নিশ্চিতো ন ভবতীতি শঙ্কাতে। বুদ্ধোঽপীতি। তৎ পরিহারং বক্তুং নিশ্চয়াভাবে কারণং পৃচ্ছতি অনৈকাগ্র্যাদিতি।

অনুবাদ। সৎ আকাশের ভেদ বুঝিয়াও যদ্যপি চিত্তে নিরূঢ়িভাব না জন্মে, তবে তোমার চিত্তের একাগ্রতার অভাব বা সংশয় উহার কারণ নহে কি, বল দেখি?

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণ যুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ॥৬৭

টীকা। আদ্যে পরিহারমাহ অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্য ইতি। আদ্যে প্রথমে বিকল্পে ধ্যানাৎ তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানমিত্যুক্তে লক্ষণাদপ্রমত্তো ভব—সাবধানমনা ভবেতি যাবৎ। দ্বিতীয়ে পরিহারমাহ অন্যস্মিন্ বিবেচনং কুর্বিতি। ততশ্চ কিম্ ইত্যতঃ আহ ততো রূঢ়তমো ভবেদিতি।

অনুবাদ। আদ্যে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাব বশতঃ যদি মন দৃঢ় না হয়, তবে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হও। আর যদি সংশয় হেতু না হও, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ এবং যুক্তি অবলম্বন কর, তাহা হইলে মন দৃঢ় হইবে।

৬৬। ৬৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও, যদ্যপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মীমাংসা করিতেছেন। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্ব্বদা ঐ বিভিন্নতা বিষয়ে সংশয় হইতেছে; কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারিত হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা বিষয়ে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃ সংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তাহা হইলে সাবধানপূর্ব্বক ধ্যান-সাধন করিয়া, একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগ কর, তাহা হইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ় বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে।

ধ্যানানুমানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদ বিয়ৎসতোঃ।
ন কদাচিৎ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তুচ্ছিদ্রবন্নচ ॥ ৬৮

টীকা—ততোঽপি কিং ইত্যত আহ ধ্যানাদিতি। ধ্যানং পূর্ব্ব লক্ষণং, মানং ভিন্নে-বিষৎ সতী শব্দভেদাৎ বুদ্ধেশ্চ ভেদত ইত্যুক্তং, যুক্তিস্তু সদ্বস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ইতি আদৌ উক্তা, এতৈর্ধ্যানাদিভিঃ বিয়ৎ সতোর্ভেদে চিত্তে নিরূঢ়িং যাতে সতি বিয়ৎ কদাচিৎ ন সত্যং কিন্তু সর্ব্বদা মিথ্যৈব ভাসতে সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রবৎ আকাশবন্নচ নৈব ভবতীতি শেষ।

অনুবাদ। ধ্যান (চিন্তা) প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা সৎ এবং আকাশের ভেদ-জ্ঞান দৃঢ় প্রতীত হইবে; কদাচিৎ আকাশ সত্য এবং সদ্বস্তু ছিদ্রবৎ বোধ হইবে না।

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলে, এবং শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দ্বারা সবিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না; সুতরাং তাহা হইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্বস্তুর আকাশ-ধর্ম্মিত্ব-জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না; অর্থাৎ কোন সদ্বস্তুর যে আকাশই ধর্ম্ম এবং কোন সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখনও জন্মিতে পারে না।

জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখ পূর্ব্বকম্।
সদ্‌বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্ব পুরঃসরম্ ॥ ৬৯

টীক। বিয়ৎ সতোর্বিবেচন-ফলমাহ জ্ঞস্য ভাতীতি জ্ঞানবতো জনস্য আকাশং নিস্তত্ত্বং তত্ত্বশূন্যং ভাতি সদ্বস্তু অপিচ্ছিদ্রশূন্যং বিভাতি।

অনুবাদ। জ্ঞানীর নিকট আকাশ তত্ত্বশূন্য এবং সদ্বস্তু আকাশশূন্য প্রতীয়মান হয়।

তাৎপর্য্য। এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া, আকাশ ও সদ্বস্তুর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে। যাঁহারা প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ, তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, এবং তাঁহাদিগের নিকটেই সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান কখনও জন্মিতে পারে না।

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎ সত্যত্ব বাদিনম্।
সম্মাত্রা বোধ যুক্তশ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ ॥ ৭০

টীকা। বিয়ন্মিথ্যাত্বং সতো বস্তুত্বঞ্চ সদা চিন্তয়তঃ কিং ভবতীত্যাহ বাসনায়ামিতি। বুধো বিয়ৎ সতোস্তত্ত্বেক্ষা গগনস্য সত্যত্বং ব্রুবাণং নিরবকাশ সদ্বস্তুবোধরহিতং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ্নোতীতি।

অনুবাদ। অত্যন্ত বাসনাপরায়ণ ব্যক্তি—যাহারা আকাশকে সত্য বলে, তাহাদের সৎ পদার্থের জ্ঞান নাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন।

তাৎপর্য্য। যাঁহারা উক্ত প্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদ্বস্তুকে সত্যরূপে জানেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জানে, সেই সকল অজ্ঞানীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা অসার সংসার-মায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে, এবং তাহারাই পরমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-শূন্য, এই নিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্খলোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্য বোধ হইবেক, তাহা অসঙ্গত নহে।

এবমাকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্‌বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্ ॥ ৭১

টীকা। উক্ত ন্যায়মন্যত্রাপ্যাতিদিশতি এবং অনেন প্রকারেণ আকাশ মিথ্যাত্বে সৎ সত্যত্বেচ প্রমাণিতে সতি অনেন ন্যায়েন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু ব্রহ্ম প্রবিবিচ্যতাং।

অনুবাদ। এই প্রকারে আকাশ মিথ্যা—সৎ সত্য প্রমাণিত হওয়ায়, উক্ত প্রকার যুক্তি দ্বারা বায়ু প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তু বিচার কর।

তাৎপর্য্যার্থ। ইতি পূর্ব্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ দ্বারা নানা প্রকার যুক্তি

প্রদর্শন পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া, সদ্বস্তুর নিত্যত্ব সাধন পূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথগত্ব নিরূপণের বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে বায়ু প্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমঃ—লিখিত।]

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এ সব লোককে যদি বলা যায় যে, অমুক জায়গায় বেশ একটি সাধু আছেন, দেখ্তে যাবে? তারা অমনি নানা ওজর করে, বলে, 'যাব না।' আর মনে মনে বলে, 'আমি এত বড় লোক, আমি যাব'?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ, ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়)

তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার, অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়—তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ, তাই বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন।" তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ক্রোধ। ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

আবার তমোগুণের আর একটি লক্ষণ – কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু—এরাতো যাবে না, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হব না? আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তার পর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার কর্‌তে হয়, এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয়-সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়াব চক্ষু একেবারে বন্ধ করতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারে না।

নারদ—প্রহ্লাদ, এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে বাপের হাত ধরেচলে, সে কখনও হাত ছেড়ে খানায় পড়লেও, বাপ নিজে যাকে হাতধ'রে চালান,সে কখনও খানায় পড়ে না। মহাপুরুষদের বালক-স্বভাব; ঈশ্বরের কাছে তাঁহারা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার নাই। তাঁদের সব শক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি; নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চোকের দুদিকে ঠুলি না দিলে ঘোড়া কি এগুতে চায়? রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি যা বলচো, ওকে বিচারপথ বলে—জ্ঞান-যোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলেন, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

আবার ভক্তিপথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নাম-গুণগান করতে ভাল লাগে, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়-সংযম আর চেষ্টা করে করতে হয় না; রিপু বশ আপনাআপনি হয়ে যায়।

যদি কাহারও পুত্রশোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারে—না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখতে পায়, তা হলে কি সে আর অন্ধকারে থাকে?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক, সেও স্বীকার!

শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো! মণির আলো খুব উজ্জল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন।)

বিচারপথে,—জ্ঞানযোগের পথে তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই; আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখের অতীত; আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এসব কথা মুখে বলা খুব সোজা; কাজে করা, ধারণা হওয়া বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে

যাচ্চে, দরদর করে রক্ত পড়্‌ছে, অথচ বলছি, কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি; এ সব কথা বলা সাজে না। আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়ে পোড়াতে হবেতো।

(বইপড়া-জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য—শিক্ষা-প্রণালী)

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন করা, অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর-চাল ব'লে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী-লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান্; কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেল্‌চে, নিজেদের চাল ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর-চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়্‌লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে ফেরাডে নিজে দর্শন করত, তাই অতো Scientific truth discover কর্‌তে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে, অত হ'ত না। Mathemetical formulæ only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

(ঈশ্বর-প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকৃতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে;—আরও কত কি, তা কি বল্‌বো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়।" এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এখন যোগ-নিদ্রা তোরে দেয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়া'য়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি ব'লে, আমায় সবাই মানে। শম্ভুমল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং!

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বুদ্ধদেব-চরিত অভিনয়ের কথা হইতে লাগিল। তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিরিশের প্রতি) তুমি বড় বদ্‌লোক। আমায় কি রোজ থিয়েটারে যেতে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলছো, আমি বুঝ্‌তে পারছি না। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে।

(অবতারবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ঈশানের প্রতি) তুমি কিছু বল না, এ (ডাক্তার) অবতার মান্‌ছে না।

ঈশান মুখুয্যে। মহাশয়! কি আর বিচার কর্‌বো। বিচার আর ভাল লাগে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেন, সঙ্গত কথা বল্‌বে না?

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) অহংকারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণ্ডী রামচন্দ্রকে প্রথমে অবতার বলে মানে নাই। শেষে যখন সূর্য্যলোক, দেবলোক, কৈলাস ভ্রমণ করে দেখ্‌লে যে, রামের হাত থেকে কোনরূপেই নিস্তার নাই, তখন নিজে ধরা দিল, রামের শরণাগত হলো। রাম তখন তাহাকে ধরে মুখের ভিতর নিয়ে গিলে ফেল্লেন! ভূষণ্ডী তখন দেখে যে, সে তার গাছে বসে রয়েছে!

"অহঙ্কার চূর্ণ হলে, তবে কাক ভূষণ্ডী জানিতে পারিল যে, রামচন্দ্র দেখ্‌তে আমাদের মত মানুষ বটে, কিন্তু তাঁহারই উদরে ব্রহ্মাণ্ড! তাঁহারই উদরের ভিতর আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত; আবার জীব, জন্তু, গাছ ইত্যাদি।

(LIMITED POWERS OF THE CONDITIONED)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) ঐটুকু বুঝা শক্ত। তিনিই সরাট্—তিনিই বিরাট্। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি মানুষ হতে পাবেন না, এ কথা জোর করে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বল্‌তে পারি? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ সব কথার কি ধারণা হতে পারে? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে?

"তাই সাধু মহাত্মা—যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন, তাঁদের কথা বিশ্বাস কত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে থাকেন; যেমন উকীলেরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। তোমার কাক ভূষণ্ডীর কথা কি বিশ্বাস হয়?

ডাক্তার। যেটুকু ভাল, সেটুকু বিশ্বাস কল্লুম। ধরা দিলেই চুকে যায়; আর কোন গোল থাকে না। রামকে অবতার কেমন করে বলি? প্রথম দেখ, বালী-বধ। লুকিয়ে চোরের মত বাণ মেরে তাকে মেরে ফেলা হলো। এতো মানুষের কাজ নয়—ঈশ্বরই পারেন! তারপর দেখ, সীতা-বর্জ্জন।

গিরিশ ঘোষ। মহাশয়, এ কাজও ঈশ্বর পারেন, মানুষ পারে না।

(SCIENCE না মহাপুরুষের বাক্য)

ঈশান। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি অবতার মান্‌ছেন্ না কেন? এই আপনি

বল্লেন, যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার; যিনি মন করেছেন, তিনি নিরাকার। এই বল্লেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সব হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, এ কথা যে ওঁর Science এ (ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্রে) নাই; তবে কেমন করে বিশ্বাস হয়? (সকলের হাস্য)।

"একটা গল্প শোন। একজন এসে বল্লে. ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলুম, অমুকের বাড়ী হুড়্মুড়্ করে ভেঙ্গে পড়ে গেছে। যাকে ও কথা বল্লে, সে ইংরাজী লেখা পড়া জানে। সে বল্লে, দাঁড়াও, একবার খপরের কাগজখানা দেখি। খপরের কাগজ পড়ে দেখে যে, বাড়ী ভাঙ্গার কথা কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বল্লে, ওহে! তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না। (সকলের হাস্য) কই, বাড়ী ভাঙ্গার কথা ত খপরের কাগজে লেখে নাই। ও সব মিছে কথা। (সকলের হাস্য)

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) শ্রীকৃষ্ণকে আপনার ঈশ্বর মানতে হবে। আপনাকে মানুষ মানতে দেব না। আপনাকে বলতে হবে, either Demon or God.

(সরলতা—ঈশ্বরে বিশ্বাস।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। সরল না হলে, ঈশ্বরে চট্ করে বিশ্বাস হয় না। ঈশ্বর বিষয়-বুদ্ধি থেকে অনেক দূরে। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানা রকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, এই সব। (জনৈক ভক্তের প্রতি) ইনি (ডাক্তার) কিন্তু সরল।

গিরিশ ঘোষ। (ডাক্তারের প্রতি) মহাশয়, কি বলেন? কুচুটের কি জ্ঞান হয়?

ডাক্তার। রাম বলো! তাও কখন হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব সেন কি সরল ছিল! এক দিন ওখানে (রাসমণির কালী-বাড়ীতে) গিছিল; অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, হ্যাঁগা, কাঙ্গালদের কখন খাওয়া হবে? বিশ্বাস যত বাড়বে, মানুষ তত সরল হবে। জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায়, সে ছিড়িক্ ছিড়িক্ করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক, পাতা, খোসা, ভুষি, জাব, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়, সে গরু হুড়্ হুড়্ করে দুধ দেয়।

"বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন, ও তোর দাদা হয়—বালকের অমনি বিশ্বাস যে ও আমার ষোলআনা দাদা। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে; তা ষোল আনা বিশ্বাস যে, ও ঘরে জুজুই আছে! এইরূপ বিশ্বাস দেখলে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার-বুদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

ডাক্তার। (জনৈক ভক্তের প্রতি) গরুর কিন্তু যা তা খেয়ে খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ঐ রকম যা তা খেতে দিত। শেষে আমার ভারী ব্যারাম।

তখন ভাব্‌লুম এর কারণ কি। অনেক অনুসন্ধান করে টের পেলুম, গরু খুদ্‌, আরো কি কি খেয়েছিল। তখন মহা মুস্কিল। লক্ষ্ণৌ যেতে হোলো। শেষে বার হাজার টাকা খরচ! (সকলের হাস্য)

"কিসে কি হয় বলা যায় না। পাকপাড়ার বাবুদের বাড়ীতে ৭ মাসের মেয়ের অসুখ করেছিল—ঘুঙ্‌ড়ী কাসি (hooping cough)। আমি দেখ্‌তে গিছ্‌লাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক কর্ত্তে পারি নাই। শেষে জান্‌তে পাল্লুম, গাধা ভিজে ছিল! (সকলের হাস্য) যে গাধার দুধ সেই মেয়েটী খেতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) কি বলে গো! তেঁতুল তলায় আমার গাড়ী গিছিলো, তাই আমার অম্বল হয়েছে! (ডাক্তার ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (হাসিতে হাসিতে) জাহাজের কাপ্তেনের বড় মাথা ধরেছিল। তা ডাক্তারেরা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা (blister) লাগিয়ে দিল। (সকলের হাস্য)

[সাধুসঙ্গ ও ভোগবিলাস-ত্যাগ]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সাধুসঙ্গ সর্ব্বদাই দরকার। রোগ লেগেই আছে। সাধুরা যা বলেন, সেইরূপ কত্তে হয়। শুধু শুন্‌লে কি হবে? ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কট্‌কেনা কত্তে হবে। সুপথ্যের দরকার।

ডাক্তার। সুপথ্যতেই সারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। বৈদ্য তিন প্রকার, উত্তম বৈদ্য, মধ্যম বৈদ্য, অধম বৈদ্য। যে বৈদ্য এসে নাড়ী টিপে 'ঔষধ খেও হে' এই কথা বলে চলে যায়, সে অধম বৈদ্য;—রোগী খেলে কি না, এ খবর সে লয় না। আর যে বৈদ্য রোগীকে ঔষধ খেতে অনেক করে বুঝায়—যে মিষ্ট কথাতে বলে, 'ওহে! ঔষধ না খেলে, কেমন করে ভাল হবে? লক্ষ্মীটী খাও, আমি নিজে ঔষধ মেড়ে দিচ্ছি, খাও'—সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য, রোগী কোনও মতে খেলে না দেখে, বুকে হাঁটু দিয়ে, জোর করে ঔষধ খাইয়ে দেয়, সে উত্তম বৈদ্য।

ডাক্তার। আবার এমন ঔষধ আছে, যাতে বুকে হাঁটু দিতে হয় না। যেমন হোমিওপ্যাথিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিলে কোন ভয় নাই।

"বৈদ্যের মত আচার্য্যও তিন প্রকার। যিনি ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়ে শিষ্যদের আর কোন খপর লন না, সে আচার্য্য অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বুঝান্—যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণা কত্তে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভাল-বাসা দেখান—তিনি মধ্যম থাকের আচার্য্য। আর যখন শিষ্যেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে, কোন আচার্য্য জোর পর্য্যন্ত করেন, তাঁরে বলি উত্তম আচার্য্য।

(স্ত্রীলোক ও সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের পট পর্য্যন্ত দেখ্‌বে না। স্ত্রীলোক কিরূপ জান, যেমন আচার—তেঁতুল। মনে কল্লে, মুখে জল সরে। আচার—তেঁতুল সম্মুখে আন্‌তে হয় না।

"কিন্তু এ কথা আপনাদের পক্ষে নয়—এ সন্ন্যাসীর পক্ষে। আপনারা সংসারী লোক, আপনারা যতদূর পার, স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্‌বে। মাঝে মাঝে নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর-চিন্তা কর্‌বে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তার পর ঈশ্বরেতে বিশ্বাস-ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে। ২।১টী ছেলে হলে, স্ত্রী-পুরুষ দুইজনে ভাই-বোনের মত থাক্‌বে, আর ঈশ্বরকে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর্‌বে, যাতে ইন্দ্রিয়-সুখেতে মন না যায়, আর ছেলে-পুলে না হয়।

একজন ভক্ত। (ডাক্তারের প্রতি) আপনি এখানে তিন চার ঘণ্টা রয়েছেন ; কই, রোগীদের চিকিৎসা কত্তে যাবেন না ?

ডাক্তার। আর ডাক্তারি—আর রোগী ! যে পরমহংস হয়েছে, আমার সব গেল ! (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) দেখ, কর্ম্মনাশা বলে একটী নদী আছে। সে নদীতে ডুব দেওয়া এক মহাবিপদ। ডুব দিলে, সব কর্ম্ম নাশ হয়ে যায়—সে আর কোন কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)

ডাক্তার। (মাষ্টার ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) দেখ, আমি তোমাদেরই রইলুম। ব্যারামের জন্য যদি মনে কর, তা হলে নয়। তবে আপনার লোক বলে যদি মনে কর, তাহলে আমি তোমাদের।

(অহৈতুকী ভক্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) একটী আছে—অহৈতুকী ভক্তি। এটী যদি হয়, তা হলে আর কথা নেই। প্রহ্লাদের অহৈতুকী ভক্তি ছিল। সেরূপ ভক্তি বলে, হে ঈশ্বর ! আমি ধন, মান, দেহ, সুখ, এ সব কিছুই চাই না। এই কর, যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি হয়।

ডাক্তার। হাঁ, কালীতলায় লোকে প্রণাম করে ; দেখেছি, ভিতরে কেবল কামনা—আমার চাক্‌রী করে দাও, আমার রোগ ভাল করে দাও, এই সব।

* * * * * * *

ডাক্তার। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) তোমার যে অসুখ হয়েছে, লোকদের সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। তবে আমি যখন আস্‌বো, আমার সঙ্গে কথা কইবে। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই অসুখটা ভাল করে দাও। দেখ, তাঁর নাম-গুণ কর্‌তে পাই না।

ডাক্তার। ধ্যান কল্লেই হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম করে, মাছ খাই। কখন ঝালে, কখন ঝোলে, কখনও অম্বলে, কখনবা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখনবা ধ্যান, কখনবা তাঁর নাম-গুণ-গান করি, কখনবা তাঁর নাম করে নাচি।

ডক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

(অবতার না মানিলে কি দোষ আছে?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তা ক্ষতি কি? ঈশ্বরকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়; আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাক্‌লেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া, এই দুটীই দরকার। মানুষতো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে। একসের ঘটীতে কি চারসের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাক, ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই, তিনি ত অন্তর্যামী—সে আন্তরিক ড'ক শুনবেনই শুনবেন। ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও, আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকেই (ঈশ্বরকেই) পাবে। মিছরীর রুটী সিধে করেই খাও, আর আড়্ করেই খাও, মিষ্ট লাগ্‌বে।

"তোমার ছেলে অমৃতটী বেশ।

ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) আমার কোনও শালা চেলা নাই, আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের দাস—আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাঁদা মামা" সকলেরই মামা! (সভাস্থ সকলের হাসা)

আমি দুই।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

আত্মা যদি নির্গুণ সাক্ষীস্বরূপ হয়েন ও বুদ্ধ্যাদি সংযোগে আপনাকে সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি মনে করেন; যদি—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু॥ (গীতা।

তবে তাঁ'র বুদ্ধির সহিত সংযোগের কারণ কি? এবং প্রকৃতিরই বা অস্তিত্বের আবশ্যকতা কি? শাস্ত্র বলেন,—

"সংহতপরার্থত্বাৎ"[১]

প্রকৃতি পুরুষের ভোগের জন্য। যাহা কিছু দৃশ্য, সে সমস্তই পুরুষের ভোগের ও মোক্ষের জন্য। পুরুষ দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ভোগ করেন এবং বিবেকী হইলে, দৃশ্য হইতেই অপবর্গ লাভ করেন।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।

(পাতঞ্জল)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ যাহার কার্য্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পোষণ, এই ত্রিবিধ শক্তি বা গুণযুক্ত দৃশ্য সমস্তই অজ্ঞানীর ভোগের নিমিত্ত ও জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য হইয়া থাকে।

যে প্রকৃতি অজ্ঞানী পুরুষের বন্ধনের কারণ, সেই প্রকৃতিই আবার জ্ঞানীর মোক্ষের কারণ; পুরুষ প্রকৃতিকে জানিয়া, তাঁহার স্বরূপ সম্ভোগ করিবে এবং প্রকৃতিও পুরুষের ধর্ম্ম সমস্ত ভোগ করিবে, এই নিমিত্তই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ।

স্বস্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতু-সংযোগঃ।

(পাতঞ্জল)

অতএব প্রকৃতির আবশ্যকতা ও পুরুষের সহিত সংযোগের কারণ কি, দেখিলেন, এবং ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে যে, আত্মা বা পুরুষ কথনও এক নহেন।

ভগবান্ কপিল বলেন;—

"জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ-পুরুষবহুত্বম্" ॥

(১৪৯, ১ম অধ্যায়, সাংখ্য)

যেহেতু একব্যক্তির মৃত্যু আদি হইলে, অন্য ব্যক্তির হয় না; অতএব তটস্থ লক্ষণে বা সৃষ্টি-ব্যাপারাবচ্ছেদে পুরুষ কখনই এক হইতে পারে না। পুরুষের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু উঁহার দেহের সহিত—প্রকৃতির সহিত সংযোগ-বিয়োগ আছে। এখানে জন্মাদির অর্থ তাহাই; সুতরাং কপিলের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ অজ্ঞান বশতঃ হয়। জ্ঞানের দ্বারা সে অজ্ঞান কাটিয়া গেলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে পুরুষ নির্ম্মুক্ত হয়েন। যদি পুরুষ এক হইত, তাহা হইলে এক পুরুষের অজ্ঞান তিরোহিত হইলেই সকলেরই মোক্ষ হইত, কেননা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগের কারণ অজ্ঞানের অভাব হইত, এবং তাহা হইলেই সেই পুরুষের অন্যস্থলে প্রকৃতি-সংযোগ অসম্ভব হইত। যখন ইহা হয়না, তখন পুরুষও যে এই ভেদাত্মক সৃষ্টি-ব্যাপারে এক নয়, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

পতঞ্জলিও "একংপ্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্য সাধারণত্বাৎ" সূত্রে ঐ কথাই বলিয়াছেন। সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে শেষ পর্য্যন্ত পুরুষের বহুত্ব বিশদরূপে বিচারদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল এখানে তুলিলাম না। সাংখ্য অদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধ "নাদ্বৈত-শ্রুতি-বিরোধো জাতি-পরত্বাৎ" সূত্রের দ্বারা সুন্দররূপে ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা এই যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত শ্রুতি, সাংখ্য ও বেদান্তের পরস্পর মতভেদ আমরা অজ্ঞান বশতঃই দেখিয়া থাকি, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কখনই এক সত্যকে লইয়া বিভিন্নমত প্রকাশ করেন নাই।

অত্যন্ত মনোনিবেশের সহিত শাস্ত্র-দর্শিত পথে চিন্তা করিলে দেখিবেন, বাস্তবিক জীব কি, জীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধই বা কি? যে সম্বন্ধ জানিতে পারিলে জীব চরিতার্থ হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তকাল ভগবদ্রস ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে। প্রকৃতই জীব যদি অনিত্যই হইত, এবং জীবত্ব নাশের নাম মোক্ষ হইত, তবে মোক্ষ কখনই পরম পুরুষার্থ হইত না; কেননা "আমার" বিনাশ হউক, 'এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় নাই; বরং এরূপ ইচ্ছা সকলেরই হইয়া থাকে যে, আমি চিরদিন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ অব্যাহতভাবে ভোগ করি, যে আনন্দ ভগবানের পুতধাম! সে আনন্দ ভোগের জন্য জীবের যখন এত স্পৃহা, তখন সেই চিদানন্দরস ভোগ করাই বৈধ ধর্ম্ম হইতেছে। যদি আমিত্ব না থাকে, তবে কে কাহাকে ভোগ করিবে? ভোগ্য ও ভোগকর্ত্তা স্বতন্ত্র হওয়া চাই; অতএব ভগবৎসেবাই জীবের ধর্ম্ম। নিত্য-আমিত্বের নাশ কদাচই জীবের পরম পুরুষার্থ নহে। ব্রহ্মসূত্রের পবিত্র ভাব কাল-মাহাত্ম্যে মায়াবাদীগণের কূট ধাঁধাঁয় পড়িয়া কলুষিত হইয়াছে; সেই জন্যই অজ্ঞানান্ধ অবিদ্যার অধীন ক্ষুদ্রজীব মায়াধীশ জগদেকনিয়ন্তা ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট ভগবানের সহিত আপনার ঐক্য-ত্যাগ লক্ষণাদ্বারা করিতে যাইয়া, নীরস শুষ্ক হৃদয়ে গাঢ়-ঘন-তমিস্রা-পূর্ণ অজ্ঞান-কূপে পতিত হইয়া আত্মহারা হইতেছে। মায়াবাদ সম্বন্ধে পরম জ্ঞানী আদিগুরু ভগবান্ শঙ্করের বাক্য শুনুন;——

মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা ॥৭

(২৫ অঃ, উত্তর খণ্ড পদ্মপুরাণ)

কলিকালে মানব যখন স্বার্থান্ধ, দুষ্কর্ম্মে রত, যথেচ্ছাচারী হইবে, তখন নির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা যদি তাহাদের করতলগত হয়, তবে তাহারা স্বার্থপরতা বশতঃ আপনাপন সর্ব্বনাশ সাধন করিবে; তজ্জন্যই ভগবান্ জ্ঞানগুরু করুণাময় মহাদেব শঙ্করাচার্য্য-রূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করিয়া মায়াবাদ প্রচার করিলেন। একেবারেই ব্রহ্মবিদ্যা গোপন করেন নাই; কিন্তু দয়ার্ণব ভগবান্ মায়াবাদের মধ্যেও যথেষ্ট

সঙ্কেত রাখিয়া গেলেন; যাহার মধ্যে নির্ধূতকল্মষ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন সংসার-বিরাগী নির্ম্মলচেতা ব্যক্তিগণ শ্রদ্ধার সহিত,—ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিলে, ব্রহ্মজ্ঞানের বিমল আলোকে উদ্ভাসিত সুগম বর্ত্ম দর্শন করিয়া ভগবদভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইতে সক্ষম হইবেন। ইহাতে ভগবানের অপার করুণাই প্রকাশ পাইয়াছে। মায়াবাদের বিষম গোলকধাঁধাঁ মধ্যে পতিত হইয়া জীব যখন আবেগপূর্ণ হৃদয়ে কাতরে ভগবানকে ডাকিবে, যখন সংসার-জ্বালায় নিরন্তর সংদহ্যমান হইয়া বলিবে,—

ন গতির্ব্বিদ্যতে নাথ ত্বমেব শরণং মম।
পাপপঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
মোহিতো মোহ-জালেন পুত্রদারগৃহাদিষু।
তৃষ্ণয়াপীড্যমানোঽস্মি ত্রাহিমাং মধুসূদন॥
ভক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ-শোকাতুরং প্রভো।
অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহিমাং মধুসূদন॥

তখন দীনদয়াল করুণা করিয়া তাহাকে পথ দেখাইবার জন্য সদ্গুরু প্রেরণ করিবেন। নতুবা কাহার সাধ্য পবিত্রতা, দীনতা ও কাতরতা ব্যতিরেকে ধর্ম্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা যদৈব"—এবম্ভূত পন্থা স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা দেখিয়া লয়? সেই জন্যই দীনের সানুনয় নিবেদন, পাঠকগণ জীবতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ "আমিই ভগবান্" এরূপ না করিয়া, আমি নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-সিন্ধুর সোপাধিক বিন্দু চিন্ময় জীব, এরূপ করিয়া লইবেন। তাহাহইলে আর বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল; শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের বিরোধ থাকিবে না এবং যাহাতে হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হয়, তাহাই করিবেন। 'ব্রহ্ম' শব্দটী অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ ও জ্যোতির্ম্ময় হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, এই জন্যই দেখিবেন, শাস্ত্রে স্বরূপতঃ পুরুষও ব্রহ্ম, প্রকৃতিও ব্রহ্মময়ী। শাস্ত্রে মহত্তত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে, অহংতত্ত্বকেও ব্রহ্ম বলা হয়। জীবকেও ব্রহ্ম বলা হয়, জীবও আত্মস্বরূপে অতি বৃহৎ, চিন্ময়, নিত্যতত্ত্ব, কেননা তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইবে? সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন;— "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ"

শাস্ত্রান্তরেও দেখিবেন, "যদ্ব্রহ্মতদস্য ভগবতঃ তনুভা"। আমি ভগবান্—এরূপ অর্থ করিলে অনর্থ হইবে; ভগবদ্রস কখনই আস্বাদন করিতে সক্ষম হইবেন না। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আলোচিত এই অদ্বৈতে দ্বৈতাত্মক জীবতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ আভাস আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিলাম; আশাকরি, আপনারা স্বীয়গুণে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে গমন করিয়া, অদূরে অর্থাৎ অচিরে দ্রষ্টা-দৃষ্টভাবে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে 'দুই আমি'ই দেখিবেন। যিনি দেখিবেন, তিনিও এক আমি, যাঁকে দেখিবেন। তিনিও এক আমি, জীবাত্মতত্ত্ব এই দুই আমিরই মায়া-মিলন মাত্র।

শ্রীঅখিলচন্দ্র সরকার।

মণিরত্ন-মালা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিঃ)

"আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ সংসর্গাৎ সহভোজনাৎ।
আসনাৎ শয়নাদ্ যানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং" ॥
"একত্র শয়নং স্নানং ভোজনং বসতিং তথা।
ন কুর্য্যাৎ পাপিনাং সার্দ্ধং সর্ব্বনাশস্য কারণং"॥
"অকুর্ব্বতোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ।
পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মৎস্যা নাগ-হ্রদে যথা" ॥

আলাপ, গাত্রস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র ভোজন, একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন এবং এক যানে গমন করিলে মনুষ্যে পাপ সংক্রামিত হয়, অর্থাৎ যাহার সহিত সর্ব্বদা আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয়। পাপীর সঙ্গ সর্ব্বনাশের কারণ, এ নিমিত্ত পাপিগণের সহিত শয়ন, স্নান, ভোজন ও বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। যে হ্রদে সর্প থাকে, সেই হ্রদবাসী মৎস্যগণ গরুড় কর্তৃক নিহত হয়; সেইরূপ যাঁহারা পাপ করেন না, তাদৃশ শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণও পাপাত্মার সংসর্গে থাকিলে, তাহার পাপ জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন :—

পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্।
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ ॥
দূরাদপাস্তঃসম্পর্কঃ সহাস্যাপি চ পাপিভিঃ।
পাষণ্ডিভির্দুরাচারৈঃ তস্মাত্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ (ঘ)

পাষণ্ড, বিকর্ম্মস্থ, বিড়াল-ব্রতী, শঠ, হৈতুক এবং বক-বৃত্তিক, এই সকল মনুষ্যগণের সহিত কোন প্রকার সম্ভাষণ করিবে না। সম্পর্কের কথা দূরে থাকুক, পাপিগণের সহিত অবস্থান করিলেও দোষস্পর্শ হয়; অতএব তাদৃশ ব্যক্তিগণের সঙ্গ

(ঘ) ভ্রষ্টঃ স্বধর্ম্মাৎ পাষণ্ডঃ বিকর্ম্মস্থো নিষিদ্ধকৃৎ। যসাধর্ম্ম-ধ্বজো নিত্যং সুরাধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ ॥
প্রচ্ছন্নানিচ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ব্রতং। প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশং ॥
ত্যক্তোপরোধ চেষ্টশ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ। সন্দেহকৃৎ হেতুভিশ্চ সৎকর্ম্মসু সহেতুকঃ।
অর্ব্বাগ্‌দৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকবৃত্তিরুদাহৃতঃ ॥
এতে পাষণ্ডিনঃ পাপা নহোতা নালপেদ্‌বুধঃ। পুণ্যংনশ্যতি সম্ভাষাদেতেষাং তদ্দিনোদ্ভবং ॥
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং। কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং ॥

যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। পুণ্যবানের সংসর্গই সর্ব্বথা বিধেয়; কারণ—

বস্ত্রমাপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পানামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ॥

বস্ত্র, জল, তিল এবং ভূমি, কুসুম-সংসর্গে থাকিলে, কুসুমের সৌরভ যেমন ঐসকল পদার্থকে সৌরভযুক্ত করে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করে।

শিষ্যের প্রশ্ন (৫১) মুমুক্ষু ব্যক্তির সত্বর কিকর্ত্তব্য? গুরুর উত্তর—সাধুসঙ্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরে ভক্তি।

মুমুক্ষুত্ব—"মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছাবত্বং"। মুক্তিতে অতি তীব্র ইচ্ছাবত্তার নাম মুমুক্ষুত্ব। অবিদ্যার আবরণে আবৃত হইয়া জীব অনাত্ম-শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপ-ত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন করিয়া, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ এবং স্বরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। মুক্তিলাভ করিলে আর দেহধারণ করিতে হয় না; সুতরাং ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়; মায়ামুক্ত জীব অখণ্ড আনন্দ—শাশ্বতী শান্তি উপভোগ করে। মুক্তিলাভে যাঁহার তীব্র ইচ্ছা জন্মিয়াছে, তাঁহাকেই মুমুক্ষু বলে। মায়াময় সংসার-বন্ধন ছেদন করিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেরই দৃঢ় প্রযত্ন কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভের জন্য যত্ন না করে, শাস্ত্রে তাহাকে 'আত্মঘাতী' বলিয়াছেন।

ভাগবতে—নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥ (শ্রীকৃষ্ণবাক্য)

সর্ব্বফলের মূল, সুদুর্লভ অথচ সুলভ, গুরুরূপ পটুতর কর্ণধারবিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল-বায়ুচালিত মনুষ্য-দেহরূপ তরণী পাইয়া, যে ব্যক্তি ভবসিন্ধু-পার না হয়, সে আত্মঘাতী। অতএব নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য সকলেরই যত্ন করা বিধেয়। (ঙ)

মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

১। সাধুসঙ্গ।

সাধুর লক্ষণ—কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাং।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ॥
কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ॥

(ঙ) লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে, মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ, নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥ (ভাগবত)
মহতা পুণ্যপুঞ্জেন ক্রীতেয়ং কায়নৌস্তয়া। পারং দুঃখোদধের্গন্তং তর যাবন্নভিদ্যতে॥
(শান্তিশতক)

অপ্রমত্তো গম্ভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ॥
আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥

ভাগবত ১১। ১১। ২৯—৩২

যিনি কৃপালু (পরদুঃখাসহিষ্ণু) অকৃতদ্রোহ (জীবমাত্রের প্রতি হিংসারহিত) তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল) সত্যসার (সত্য যাঁহার বল) অনবদ্যাত্মা (অসূয়াদি দোষশূন্য) সম (সমদর্শী বা সুখ-দুঃখ-হর্ষ-বিষাদ-বিবর্জ্জিত), সর্ব্বোপকারক (যথাশক্তি সকলের উপকারী) কামে অহতধী (বিষয় সমূহ দ্বারা অক্ষোভিত-চিত্ত), দান্ত (সংযত বাহ্যেন্দ্রিয়) মৃদু (কোমলচিত্ত), শুচি (সদাচারসম্পন্ন) অকিঞ্চন (অপরিগ্রাহী), অনীহ, (নিরীহ, দৃষ্টক্রিয়া শূন্য) মিতভুক্ (লঘ্বাহার, পরিমিতভোজী) শান্ত (সংযতান্তঃকরণ), স্থির (স্বধর্ম্মনিরত) মচ্ছরণ (মদেকাশ্রয়) মুনি (মননশীল) অপ্রমত্ত (সাবধান), গম্ভীরাত্মা (নির্ব্বিকার) ধৃতিমান্ (বিপদেও ধৈর্য্যশালী) জিতষড়্গুণ (ক্ষুৎপিপাসা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু, দেহের এই ষড়্বিধ ধর্ম্মকে যিনি জয় করিয়াছেন) অমানী (মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য), মানদ (অন্যের প্রতি মানপ্রদ) কল্য (পরকে বুঝাইতে দক্ষ), মৈত্র (অবঞ্চক), কারুণিক (করুণা বশতঃই যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন—লোভ-বশে নহে) এবং কবি (সম্যগ্ জ্ঞানী), সেই ব্যক্তিই সাধুশ্রেষ্ঠ। আর যিনি গুণ ও দোষ সমূহ পরিজ্ঞাত হইয়া, বেদরূপ আমার আদিষ্ট কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ আমাকেই ঐকান্তিকভাবে ভাবনা করেন, তিনিও ঐরূপ—অর্থাৎ সাধুশ্রেষ্ঠ। (চ)

সাধু-মহিমা।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে নজানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভাগবত ৯।৪।৫১
যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুং।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥
নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণং।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাং॥

(চ) "অহিংসা সত্যবচনমানৃশংস্যমথার্জ্জবং। অদ্রোহো নাভিমানশ্চ হ্রীস্তিতিক্ষা দমঃ শমঃ॥
ধীমন্তো ধৃতিমন্তশ্চ ভূতানামনুকম্পকাঃ। অকামদ্বেষসংযুক্তস্তে সন্তো লোকসাক্ষিণঃ॥"
"সৎকথাশ্রবণালাপসৎকর্ম্মনিরতঃ সদা। কামক্রোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
"নির্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তঃ দম্ভাহংকারবর্জ্জিতঃ। নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃসাধুরিহোচ্যতে॥"

অন্নংহি:প্রাণিনাং প্রাণ আর্ত্তানাং শরণন্ত্বহং।
ধর্ম্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোর্ব্বাগ্ বিভ্যতো রণং॥
সন্তো দিশন্তি চক্ষূংসি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেবচ॥ ভাগবত, ১১২৬৩১-৩৪
বিচ্ছিন্ন গ্রন্থয়স্তজ্জ্ঞাঃ সাধবঃ সর্ব্বসম্মতাঃ
সর্ব্বোপায়েন সংসেব্যাস্তেহ্যপায়াঃ ভবাম্বুধৌ॥ (যোগবাশিষ্ঠ)

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছু জানেন না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত আর কিছুই জানি না। (ছ) যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, লোকের শীত, অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তেমনি সাধুগণের সেবা করিলে, লোকের কর্ম্ম-জাড্য, আগামি-সংসারভয় এবং সংসারের মূল অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। যাহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে, নৌকা যেমন তাহাদের পরম আশ্রয়, সেইরূপ ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকলই প্রধান অবলম্বন। যেমন অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ, যেমন আমি আর্ত্তগণের শরণ, যেমন ধর্ম্ম পরকালে মানবগণের ধন, সেইরূপ সাধুগণ সংসার-পতন-ভীত মনুষ্যগণের পরিত্রাণকর্ত্তা। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া একমাত্র বাহ্য চক্ষু প্রদান করেন, কিন্তু সাধুগণ মনুষ্যগণকে অশেষ চক্ষু প্রদান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণ-জ্ঞানোপদেশ দ্বারা মনের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া দেন। সাধুগণ দেবতা ও বান্ধব এবং সাধুগণই আত্মারূপী আমি। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সাধুগণের সেবা করা কর্ত্তব্য। সাধুরাই ভব-সমুদ্র পারের প্রকৃত উপায় স্বরূপ।

'সাধূপদিষ্ট মার্গেণ যন্মনোঽঙ্গ বিচেষ্টিতং।
তৎ পৌরুষং তৎ সকলং অনাদ্রুন্মত্ত চেষ্টিতং'॥ (যোগবাশিষ্ঠ)
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষা গুরু হয় কৃষ্ণ মোহান্ত স্বরূপে॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

সাধুগণের উপদেশ অনুসারে সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই পৌরুষ কহে; তদ্ভিন্ন সকল কার্য্যই উন্মত্ত-চেষ্টার ন্যায় বিফল। অন্তর্যামী গুরু চৈতন্যরূপ অর্থাৎ চিত্ত মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং জীব তাঁহার সম্মুখ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। অতএব কৃষ্ণ মোহান্ত—অর্থাৎ সাধু ভক্ত-শ্রেষ্ঠরূপে শিক্ষাগুরু হয়েন।

(ছ) "যে দারাগার পুত্রাপ্ত প্রাণান্ বিত্তমিমং পরং। হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥ ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ। বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
ভাগবত ৯।৪।৬৫।৬৬

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। (জ)
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গ মুক্তিভিঃ"॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ হিতোপদেশ দ্বারা মনের সমস্ত সংশয় ছেদন করিবেন।

সাধুসঙ্গ-মাহাত্ম্য।

এ সংসারে মানবগণের অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় সাধুসঙ্গ। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,"॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥" (মোহমুদ্গর)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাং॥

ভগবান্ কহিলেন—সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক সাধুসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; যোগ (আসন-প্রাণায়ামাদি), সাংখ্য (জ্ঞান, তত্ত্ববিবেক) ধর্ম্ম (অহিংসাদি), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন), তপস্যা, ত্যাগ (সন্ন্যাস) ইষ্টাপূর্ত্ত (ইষ্ট—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, পূর্ত্ত—কূপ-আরামাদি নির্ম্মাণ) দক্ষিণা (দান) ব্রত (একাদশ্যুপবাসাদি) যজ্ঞ (দেবার্চ্চনা) ছন্দস্ (রহস্য মন্ত্র) তীর্থ-নিষেবণ, যম ও নিয়ম সকল আমাকে সেরূপ বশ করিতে পারে না।

"জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চেতঃপ্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং"॥

সজ্জনের সহবাসে বুদ্ধির জড়তা দূর হয়, বাক্য সত্য হয়, মানোন্নতির উপদেশ লাভ হয়, পাপ দূর হয়, চিত্ত নির্ম্মল হয়, এবং সর্ব্বত্র যশঃ বিস্তারিত হয়। অতএব বল দেখি, সৎসঙ্গ পুরুষের কিনা উপকার করে?

"গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্পতরুর্হরেৎ।
পাপং তাপং তথা দৈন্যং সর্ব্বং সাধুসমাগমঃ"॥

গঙ্গা পাপ হরণ করেন, চন্দ্র তাপ নষ্ট করেন, এবং দানশীলব্যক্তি দারিদ্র্য দূর করিয়া থাকেন; কিন্তু এক সাধুসঙ্গ পাপ-তাপ-দৈন্য সকলই হরণ করে।

(জ) "প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতং॥
"সন্তঃ প্রতিষ্ঠা দীনানাং দেবাদুত্তুর্তপাপ্পনাং। আর্ত্তানামার্ত্তিহন্তারো দর্শনাদেব সাধবঃ॥

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্ বা।
নচ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈর্বিনামহৎপাদ রজোভিষেকং॥
যত্রোত্তমশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথা বিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে"॥

ভাগবত—৫।১২।১২।১৩

জড়ভরত কহিলেন—হে রহূগণ! এই প্রকার জ্ঞান (শ্রীবাসুদেবাখ্যবস্তু) মহাপুরুষগণের পদধূলির অভিষেক দ্বারাই মনুষ্য লাভ করিতে পারে। কি তপস্যা, কি বৈদিক কর্ম্ম, কি অন্নাদি সংবিভাগ, কি গৃহস্থ-কর্ম্ম দ্বারা পরোপকার, কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা, কিছুতেই ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সাধুগণ গ্রাম্যকথার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা উত্তমশ্লোক হরির গুণানুবাদ-কীর্ত্তনে নিরত থাকেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবানের সেই গুণানুবাদ শ্রবণাদি দ্বারা সেবন করিলে, বাসুদেবের প্রতি শুভাবুদ্ধি (প্রেম-ভক্তি) লাভ করিতে পারেন। (ঝ)

(ঝ) সাধুসঙ্গের দুর্ল্লভতা—"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নৈব সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে॥
"বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থ ক্ষেত্রাদি যোগতঃ। দৈবাত্তবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥
সাধুসঙ্গের সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিকতা—"যঃ স্নাতঃ শান্তি সিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিংতস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ॥
সর্ব্বেষ্টসাধকতা—"যানি যানি দুরাপাণি বাঞ্ছিতানি মহীতলে।
প্রাপ্যন্তে তানি তান্যেব সাধুনামেব সঙ্গমাৎ॥
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎ কৃতাত্মনাং। দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষোঃ সবিতুর্যথা॥
অনর্থস্যাপ্যর্থাপাদকতা—"সঙ্গো যঃ সংসৃতেহেতু রসৎসু বিহিতোঽধিয়া
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥
"তত্র তে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিতাঃ। সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষ হরাহি তে॥
সর্ব্বতীর্থাধিকতা—"গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থেষু যো নরঃ স্নাতুমিচ্ছতি।
যঃ করোতি সতাং সঙ্গং তয়োঃ সৎসঙ্গমো বরঃ॥
কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—"অতি মঙ্গলময় জানিয়ে সাধুসমূহ-সমাজ।
জয়সে জগকে বীচমে তীরথ তীরথরাজ॥———
রামভক্তি যঁহ সুর্ধুনী বাণী ব্রহ্ম বিচার। বিধি নিষেধময় কলিমল-হরণী যমুনা কর্ম্ম-প্রচার॥
জ্ঞান অক্ষয়বট সুভগজন অচল ধর্ম্মবিশ্বাস। পরহিতকারী সাধুজন অটল ভক্তি-নির্ঝাস॥
শুনি সমুঝহি জন মুদিত মন মজ্জহি অনুরাগে। লহহিঁ চারি ফল অচ্ছতনু সাধুসমাজ-প্রয়াগে॥
"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥
অতএব—"সদ্ভিরাসীত সততং সদ্ভিঃ কুর্ব্বীত সঙ্গতিং। সদ্ভির্বিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদ্ভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ॥

২। নির্ম্মমতা।

"মমেতি মূলং দুঃখস্য নির্ম্মমেতি নিবর্ত্ততে।
দত্তাত্রেয়ো হ্যলর্কায় ইদমাহ মহামতিঃ॥ (গরুড়পুরাণ)
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে॥" (তন্ত্র)

অনাত্ম-দেহাদিতে আত্মাভিমান—অর্থাৎ এই বিকারী পরিণামী জড় শরীরই আমি এবং এই আমার গৃহ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, ইত্যাদি 'আমার আমার' জ্ঞানকে মমতা বলে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় অলর্ককে বলিয়াছিলেন, মমত্বই জীবের সংসার-দুঃখের কারণ এবং নির্ম্মমতাই সেই দুঃখের নিবর্ত্তক। মম-ভাব থাকিলে জীব সংসার-পাশে বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মম হইলে, সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। মমতাই মোহ বলিয়া কথিত হয়।

"মমপিতা মম মাতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহং।
এবম্বিধং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কথ্যতে"॥ (ঐ)

আমার মাতা, আমার পিতা, আমার গৃহিণী, আমার গৃহ; এই প্রকার 'আমার আমার' জ্ঞানকেই মোহ কহে। সংসারে মমতা থাকিলে, মনুষ্যের মন সাংসারিক চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকে, সুতরাং ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,———

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥
অহো মে পিতরৌ বৃদ্ধৌ ভার্য্যাবালাত্মজাত্মজাঃ।
অনাথামামৃতে দীনাঃ কথং জীবন্তি দুঃখিতাঃ॥
এবং গৃহাশয়া ক্ষিপ্তহৃদয়ো মূঢ়ধীরয়ং।
অতৃপ্তাস্তাননুধ্যায়ন্ মৃতোহন্ধং বিশতে তমঃ॥ (ভাগবত)

যে ব্যক্তি গৃহে আসক্ত, পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর, এবং স্ত্রৈণ ও কৃপণ, সেই মূঢ়-ব্যক্তি—'আমি আমার' ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয়। "অহো! আমার পিতা-মাতা বৃদ্ধ, শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভার্য্যা, এবং আমার পুত্রকন্যাগণ আমা ব্যতীত অনাথ ও দুঃখী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবে?" এই প্রকারে গৃহ-বাসনায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অপরিতৃপ্ত

(ঐ) "অহমিত্যঙ্কুরোৎপন্নো মমেতি স্কন্ধবান্ মহান্। গৃহক্ষেত্রোপশাখশ্চ পুত্রদারাদিপল্লবঃ॥
ধনধান্য মহা পত্রোহ শেষকালাহ'বর্দ্ধিতঃ। পুণ্যাপুণ্য সুপুষ্পশ্চ সুখ-দুঃখ মহাফলঃ॥
বিধিবৎ সুখ শাস্ত্যর্থং জাতোহজ্ঞান মহাতরুঃ। সংসারাধ্বপরিশ্রান্তা যেহত্রচ্ছায়াং সমাশ্রিতাঃ।
ভ্রান্তিজ্ঞানসুখাসীনাস্তেষামাত্যন্তিকং কুতঃ। (গরুড় পুরাণ)

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্য তাহাদিগকে অনুক্ষণ চিন্তা করতঃ মরণের পর অতি তামসী যোনিতে প্রবেশ করে।

অতএব————"কুটুম্বেষু ন সজ্জেত ন প্রমাদ্যেৎ কুটুম্ব্যপি।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥
পুত্রদারাপ্তবন্ধূনাং সঙ্গমঃ পান্থ-সঙ্গমঃ।
অনুদেহং বিয়ন্ত্যেতে স্বপ্নো নিদ্রানুগো যথা॥
ইত্থং পরিমৃশন্মুক্তো স্বগৃহেষ্বতিথি বসন্।
ন গৃহৈরনুবধ্যেত নির্ম্মমো নিরহঙ্কৃতঃ॥
কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈরিষ্ট্বা মামেব ভক্তিমান্।
তিষ্ঠেদ্বনং বোপবিশেৎ প্রজাবান্ বা পরিব্রজেৎ"॥

জ্ঞানী গৃহস্থব্যক্তি কুটুম্বী হইলেও কুটুম্ব বিষয়ে আসক্ত হইবেন না এবং ঈশ্বর-নিষ্ঠাবিষয়ে (ভগবৎ-স্মরণাদিতে) অমনোযোগী হইবেননা, এবং বিচার করতঃ অদৃষ্ট (পারলৌকিক) বিষয়কেও দৃষ্ট (ঐহিক) বিষয়ের ন্যায় নশ্বর দেখিবেন। পুত্র, কলত্র, স্বজন ও বন্ধুগণের সহিত যে মিলন, তাহা পান্থশালায় পথিকগণের সমাগমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী; কারণ স্বপ্ন যেমন নিদ্রার অনুগামী, মমতাস্পদীভূত পুত্রাদি সেইরূপ দেহানুবর্ত্তী, অর্থাৎ দেহনাশেই তাহারা বিযুক্ত হয়। এই প্রকার বিচার করিয়া, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কৃত হইয়া, অতিথির ন্যায় উদাসীনভাবে গৃহে অবস্থিতি করিবেন, এবং গৃহ বিষয়ক আসক্তিতে আবদ্ধ হইবেন না। (ট)। ভক্তিমান্ ব্যক্তি বিধিবৎ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন দ্বারা আমার অর্চ্চনা করতঃ গৃহাশ্রমেই থাকিবেন, অথবা বানপ্রস্থ হইবেন কিম্বা পুত্রবান্ হইলে, পব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।

"মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।
তস্মাত্তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ"॥ (বৃহন্নারদীয়ে)

মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ, উভয়েরই হেতু; অর্থাৎ সংসারের প্রতি মমতা বন্ধনের এবং ভগবানের প্রতি মমতা মোক্ষের কারণ। অতএব পরমাত্মরূপী ভগবানে মমতা ন্যস্ত করিয়া সুখী হইবে। (ঠ) ভগবানের প্রতি প্রেমসঙ্গতা মমতাই ভক্তি।

(ট) মহামায়া প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তময় মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়।
"তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবেন সংসারস্থিতি কারিণঃ॥ (দেবিমাহাত্ম্য)
গৃহাদিতে অনাসক্তি জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।
"অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু"। গীতা ১৩।৯
দারাপত্য-গৃহাদি পরমার্থ-প্রতীপ বিষয়ে প্রীতিত্যাগ এবং পুত্রাদির দুঃখাদিতে ঔদাসীন্য।
(ঠ) ঈশ্বরে মমতা—"অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥
ব্রজগোপীগণ প্রেমসংযুক্ত অনন্যমমতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় দ্রষ্টব্য)

৩। ঈশ-ভক্তি। (ড)

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে"। (ভাগবত)

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার প্রতি ভক্তিই জীবগণের মুক্তিলাভের কারণ।

"ভজনাৎ ভক্তিরুচ্যতে"।

"ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সী"॥

"ভজ্" ধাতু হইতে ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা করা, অতএব "ভক্তিঃ সেবা ভগবতঃ" ভগবানের সেবার নামই ভক্তি।

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে"॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশের সেবনের নাম ভক্তি। এই সেবা সকল উপাধি হইতে মুক্ত (পরম প্রেমাস্পদ ভগবানে তদন্য-অভিলাষ-বিবর্জ্জিত) এবং কেবল মাত্র কৃষ্ণপর (জ্ঞান-কর্ম্ম-বৈরাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত) হইয়া নির্ম্মল হইবে। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন,—

"সবৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরেমন্দিরমার্জ্জনাদিষু, শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ, তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে, শ্রীমতুলস্যারসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে, শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কাম কাম্যয়া, যথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ॥

ভাগবত ৯।৪।১৮।১৯।২০

তিনি (মহারাজ অম্বরীষ) কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, হরিগুণানুবাদ কীর্ত্তনে বাক্য সকল, হরির মন্দির-মার্জ্জনাদি কর্ম্মে করদ্বয়, এবং অচ্যুতের পবিত্র কথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ-বিগ্রহের আলয় দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ, ভগবৎপাদপদ্ম-সৌরভ-সংপৃক্ত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদগ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবৎক্ষেত্রগমনে পদদ্বয় এবং তাঁহার চরণ-বন্দনায় মস্তককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্ম্মাল্য, স্রক্-চন্দনাদি-সেবা বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, ভগবৎপ্রসাদ বোধে অঙ্গীকার করিতেন।

(ড) ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণঃ।

মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, যেরূপে ভগবস্তুক্তজনাশ্রিত রতি উৎপন্ন হয়, তিনি সেই-রূপেই সকল কার্য্য করিতেন। এইরূপে ভগবানের সেবা করিতে করিতে—

গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু,
দ্বিপোত্তম-স্যন্দন-বাজি-পত্তিষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণায়ুধাদি-
ষনন্তকোশেষ্বকরোদসম্মতিং॥

গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয় রত্নাভরণ, অস্ত্রাদি, অনন্ত ভাণ্ডার, কিছুতেই আর তাঁহার আসক্তি রহিল না। (ঢ)

ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং॥ (ভাগবত)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ, তাঁহার চরণসেবা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য ও সৌখ্য, এবং তাঁহাকে আত্মনিবেদন, ইহাই নবলক্ষণা ভক্তি। এই নয়টী অঙ্গের কোন একটী অঙ্গের ভজনেও মনুষ্য ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাসোহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥

শ্রীবিষ্ণুর নাম-গুণাদি শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদ-সেবনে লক্ষ্মী, অভিবন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই একাঙ্গ-ভক্তি-যাজনে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা"॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দ্বারা মনুষ্য যেমন আমাকে সহজে লাভ করিতে পারে, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ধর্ম্ম, এ সকল দ্বারা তেমন পারে না। কারণ ভগবান্ ভক্তিপ্রিয়। বিদ্যা, জ্ঞান, রূপ, গুণ, ধন, আভিজাত্য, এ সমস্ত তাঁহার প্রীতির কারণ নহে। (ণ)

(ঢ) তজ্জ্ঞানং যত্র গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ। তৎকর্ম্ম যৎ তদর্থায় কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ॥
সা জিহ্বা যা হরিংস্তৌতি তচ্চিত্তং যৎ তদর্পিতং। তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎ পূজাকরৌ করৌ॥

(ণ) "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনং। (প্রহ্লাদোক্তি)

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা,
কুব্জায়াঃ কিমুনামরূপমধিকং কিং তৎ সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রসেনস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের সদাচার কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সুদাম ব্রাহ্মণের ধন কি ছিল, বিদুরের বংশগৌরব কি ছিল, কুব্জার সৌন্দর্য্য কি ছিল এবং যাদবপতি উগ্রসেনের কি শৌর্য্য-বীর্য্য ছিল? তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছেন। অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব ভক্তিদ্বারাই প্রীত হন; সদাচারাদি গুণ দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন:—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"॥ (ত)

হে অর্জ্জুন! তুমি মদর্পিতচিত্ত, মদ্ভক্ত, মদর্চ্চননিরত হও, এবং আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে দেহ, মন ও আত্মা আমাতে নিবেদন পূর্ব্বক মদেকাশ্রয় হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মলোকগত জীবেরও পুনরাবর্ত্তন হইয়া থাকে; কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করিলে, আর পুনর্জন্ম হয় না। অতএব ভগবদ্ভক্তিকে আশ্রয় করাই মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ভক্তি-সাধন।

"কৃষ্ণ-ভক্তি-জন্ম-মূল হয় সাধুসঙ্গ"। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"সতাং প্রসঙ্গান্ মম বীর্য্য সম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"॥

কপিল দেব কহিলেন, সাধুগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দজনক আমার প্রভাবপূর্ণ কথা আলোচিত হয়; সে সকল কথা সেবন করিলে, অপবর্গ-পথ স্বরূপ (অবিদ্যানিবর্ত্তক) আমাতে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি, পর্য্যায় ক্রমে জন্মিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধামৃত কথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনং।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্ত পূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥

(ত) "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ (গীতা)

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণং চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং॥
মদর্থেঽর্থ পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যানাং উদ্ধবাত্মনিবেদিনাং।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥ (ভাগবত)

"আমার অমৃত-কথায় শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা আমার অনুকীর্ত্তন, আমার পূজায় নিষ্ঠা, স্তুতি দ্বারা আমার স্তব, আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন আমার ভক্তগণের বিশেষভাবে পূজা, সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি করা, আমার জন্য অঙ্গ-চেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ-কথন, আমাতে চিত্তসমর্পণ, মদনা-সর্ব্বাভিলাষবর্জ্জন, আমাকে লাভ করিবার জন্য অর্থ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, এবং আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা; হে উদ্ধব। এই ভাবে যাঁহারা আমাতে আত্মনিবেদন করেন, এই সকল ধর্ম্ম সাধন দ্বারা আমাতে তাঁহাদিগের ভক্তি জন্মে। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, এমন ব্যক্তির আর কি অর্থের অভাব থাকে? (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা।

—:০:—

দৃষ্ট হইতেছে কন্যা ঊষার জার আদিত্য প্রতিনিয়ত গমন করিতেছেন। ঋক্ ১।১৫২।৪ আদিত্যের অশ্ব বা বল্গা নাই, তথাপি তিনি দ্রুতগতিতে আকাশের ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন। ঋক্ ১।১৫২।৫

রাশিচক্রের দ্বিতীয় বীথীস্থিত বৃষরাশিস্থ দহন-দৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্র ও কমলজ-দৈবত রোহিণী নক্ষত্রের অনতিদূরে রাশিচক্রের ৩য় বীথীতে মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল অবস্থিত। কালপুরুষের মস্তকে মিথুন রাশির সোমদৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র, কাল-পুরুষের বামহস্ত-মূলে রুদ্রদৈবত আর্দ্রা নক্ষত্র, কটিদেশে বাণাকৃতি তারাত্রয় এবং কালপুরুষ-মণ্ডল ময়ূরপুচ্ছ চন্দ্রিকাবৎ তোরণাকৃতি সহস্র ক্ষুদ্র তারকায় পরিবৃত।

কাল-পুরুষ মণ্ডলের অনতিদূরে "ইল্‌বলা তৎ শিরোদেশে তারকা নিবসন্তি যাঃ" "ইল্‌বলা পঞ্চতারকাঃ" (অমরকোষ)। একদা ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা উষাদেবীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন; এই পাপাচার দর্শনে রুষ্ট দেববৃন্দের সমবেত শক্তি হইতে ভগবান্ ভূতবৎ দেবের আবির্ভাব হয়, এবং দেববৃন্দের উপদেশে ভগবান ভূতবৎ ব্রহ্মার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্রহ্মা ও উষাদেবী বাণভয়ে মৃগ ও মৃগীরূপ ধারণে উল্লম্ফন পূর্ব্বক আকাশে পলায়ন করিলেন। ভূতবৎদেব-বিক্ষিপ্ত বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তদবধি মৃগশিরানক্ষত্ররূপে ব্রহ্মা ও রোহিণীনক্ষত্ররূপে উষাদেবী আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন। দেবকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ভূতবৎদেব দেববৃন্দের বরে পশু-জাতির পতিত্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই আখ্যান পাঠে অনেকে নাসিকা বিকুঞ্চিত করিয়া বলিবেন, এ সমস্ত বৃথা কল্পনামূলক, উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক-বিনিঃসৃত প্রলাপ-উক্তি মাত্র। কিন্তু উক্ত আখ্যানটী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তৃতীয় খণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্যক্ত আছে। উষাদেবীর নাম সরস্বতী। রোহিণী নক্ষত্র কমলজদৈবত কি কারণে হইলেন, কি কারণে রাশিচক্রের তৃতীয় বীথীস্থ তারামণ্ডলের নাম মৃগব্যাধ কাল-পুরুষ হইল, কি কারণে দেবাদিদেব শিব 'পশুপতি' নাম পাইলেন, এবং তাঁহার বাণ 'পাশুপত' নামে খ্যাত হইল, এবং গ্রীকজাতি Orion the hunter নাম কোথা পাইলেন, এবং Belt of orionই বা কি? এ সমস্ত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-উক্ত আখ্যান হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি।

বেদের আখ্যানটি সরলভাবে বিশদরূপে সুব্যক্ত বলিয়া এ আখ্যানের অর্থবোধে সন্দেহ বা মতভেদ সম্ভব নহে। পুরাণোক্ত আখ্যানগুলি যে সময়ে লিখিত, তৎকালে মহর্ষিগণ কাল-দেশ-পাত্র বিবেচনায় আখ্যানগুলি তাদৃশ সরলভাবে ও বিশদরূপে ব্যক্ত করেন নাই। এক্ষণে পুরাণোক্ত অর্দ্ধস্ফুট আখ্যানগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণ-লীলার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি-পূজা উপলক্ষে সমস্ত ব্রজবাসী সমবেত হইল; তাহাদের অভ্যর্থনা জন্য যশোদাদেবী নিদ্রিত শিশু শ্রীকৃষ্ণকে দধি-দুগ্ধাদি-গব্যপাত্রপূর্ণ শকট-তলে স্থাপন করিলেন, এবং ব্রজবাসীগণের অভ্যর্থনার্থে স্থানান্তরে গমন করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে শকট-তলে স্থাপিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং পদাঘাতে সগব্যপাত্র-শকট চূর্ণ করিলেন। আমরা বলি, কৃত্তিকা-ক্রোড় হইতে অয়নপথে যাত্রা করিয়া, শকটাকৃতি রোহিণী নক্ষত্রে আদিত্য-দেব শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলেন, রোহিণী সূর্য্য-তেজে বিলুপ্ত হইলেন। ইহারই নাম শকট-ভঞ্জন-লীলা। এখন বাণ-বিজয় আখ্যান স্মরণ করুন। বলি-পুত্র শিখিধ্বজ বাণরাজের উষা নামে কন্যা ছিল। উষা প্রাপ্তযৌবনা হইলেও বাণরাজ তাহার বিবাহ দেন নাই। বাণরাজ-আলয়ে হরপার্ব্বতী বিহার করিতেন।

উষা ক্রুদ্ধ হইয়া পার্ব্বতীর সমীপে আত্মনিবেদন জানাইলেন। পার্ব্বতি প্রসন্না হইয়া বলিয়া দিলেন—"রাত্রে যাহাকে স্বপ্নে দেখিবে, সেই তোমার পতি হইবে।" উষা নিশা-স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধের রূপ দর্শন পাইলেন। উষার সখি চিত্রা চিত্র-পটে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে, উষা স্বপ্নদৃষ্ট রূপ চিনিতে পারিলেন। চিত্রা চিত্রপট-লিখিত মূর্ত্তির অনুসন্ধানে ত্রিজগৎ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে দ্বারকানগরে অনিরুদ্ধের দর্শন পাইয়া আত্মনিবেদন করিলেন। চিত্রা সহ গোপনে অনিরুদ্ধ বাণরাজ-ভবনে উপনীত হইয়া পরম সুখে উষার সঙ্গ ভোগ করিতেছিলেন। বাণরাজ টের পাইয়া, অনিরুদ্ধকে কারারুদ্ধ করিলেন, এবং শিব-সমীপে শিখিধ্বজ বাণরাজ সমযোদ্ধা প্রাপণের প্রার্থনা জানাইলেন। অন্তর্যামী শিব চিন্তা করিয়া বলিলেন, যখন দেখিবে, শিখিধ্বজ তিরোহিত হইয়াছে, তখনই সমযোদ্ধা আগত হইবে। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ অনিরুদ্ধের তল্লাস লইয়া, নারদ-মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, অনিরুদ্ধের কারা-মোচন জন্য সসৈন্যে বাণরাজ-ভবনে সমাগত হইলেন।

পঞ্চাগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া শিখিধ্বজের ময়ূর-ধ্বজা দগ্ধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধে বাণরাজের সহস্র বাহু ছিন্ন হইলে, বরপুত্রের দুর্দ্দশা দর্শনে রুদ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সমরে রুদ্রদেব ত্রিভুবন-দহনক্ষম পাশুপত বাণ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিজগৎ-ধ্বংসন-শক্ত বৈষ্ণবাস্ত্র ছাড়িলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কম্পবান্! অসময়ে মহাপ্রলয় উপস্থিত! দেখিয়া শুনিয়া সরকারি সালিষ স্বয়ং বিধাতা আসিয়া উপস্থিত। বৈরভাব দূর হইল। শ্রীকৃষ্ণও রুদ্রদেবে সখ্যস্থাপন হইল। উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

চন্দ্রিকা-পরিশোভিত ময়ূর-পুচ্ছপরিবৃত মৃগব্যাধ কালপুরুষ-মণ্ডল যাঁহার পরিচিত, মৃগব্যাধ কালপুরুষমণ্ডলের কটিদেশের পাশুপত বাণ যাঁহার পরিচিত, এবং তাহার উত্তরস্থ ইল্বলা নামক পঞ্চতারক যাহার পরিচিত, (স-উষা) সোম-দৈবত মৃগশিরা নক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, রুদ্রদৈবত আর্দ্রানক্ষত্র যাঁহার পরিচিত, পুরাণোক্ত বাণরাজ তাঁহার অপরিচিত হইতে পারে না। জ্যোতিষশাস্ত্রে যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি অবশ্যই জানেন, যখন কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে অবস্থিত ছিল, তখন মিথুনরাশিতে আদিত্যদেবের অবস্থিতিকালে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য হইত, এবং এক্ষণকার জ্যৈষ্ঠমাসোচিত নির্ব্বাত গ্রীষ্ম তখন আষাঢ়ে অনুভূত হইত। সকলেই অবগত আছেন যে, উষার সহিত প্রভাত-বায়ুর নিত্য সম্বন্ধ, এবং বায়ুর গতি অপ্রতিহত ও বায়ু সর্ব্বতোগামী, সুতরাং বায়ুর নামই অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ মরুতের অধিপতি সূর্য্যরূপী দেবরাজ ইন্দ্র, ইহা বৈদিক সত্য, এবং সূর্য্যতেজে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাও বৈদিক সত্য, এবং বৈজ্ঞানিক সত্যও

বটে ; তবে কেন বলিব না যে, কালপুরুষ-মণ্ডলের বাণাকৃতি তারাত্রয়ই বাণরাজ। উষা তাহার কন্যা। প্রভাত-বায়ু অনিরুদ্ধ উষার প্রণয়ী। পূর্ব্বকালে আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি কালে জ্যৈষ্ঠ মাসোচিত গুমটা হইত বলিয়া বাণরাজ অনিরুদ্ধকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন। সূর্য্যদেব অর্য্যমা অগ্রে ময়ূরপুচ্ছস্থিত ক্ষুদ্র সহস্র তারাগুলি বালার্ক-প্রকাশে দগ্ধ করিলেন। ক্রমে বালার্ক প্রদীপ্ত হইলে, বাণরাজ সূর্য্যতেজে বিলীন হইলেন ; কিন্তু সমুজ্জ্বল রুদ্রদৈবত আর্দ্রা সহজে সূর্য্যতেজে অভিভূত হইলেন না। সূর্য্য-কিরণ তীব্রভাবে বর্ষিত হইলে আর্দ্রাও লুপ্ত হইলেন। তবে রুদ্র-পরাজয়-বর্ণন পরিহার মানসে ব্রহ্মার মধ্যস্থতার সৃষ্টি হইয়াছে। সূর্য্যতেজ ক্রমে প্রখর হইতে লাগিল। পূর্ব্ববায়ু বহিতে লাগিল। অনিরুদ্ধ মুক্ত হইল। বাণরাজ-বিজয় সাঙ্গ হইল।

বেদে কোনস্থলে উষা সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত আছে ; কারণ উষা হইতে আমরা সূর্য্য প্রাপ্ত হই। আবার বেদে কোন স্থলে উষা সূর্য্যের ভগ্নী বলিয়া বর্ণিত ; কারণ উষা ও সূর্য্য, উভয়কেই আমরা রাত্রি হইতে প্রাপ্ত হই। রাত্রি সূর্য্যের মাতা বলিয়া বর্ণিত। আবার বেদে উষা সূর্য্যের কন্যা বলিয়া বর্ণিত আছে ; কারণ সূর্য্য-কিরণেই উষার উৎপত্তি, এবং বেদে আদিত্যদেব উষার জার বলিয়াও বর্ণিত আছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আদিত্যদেব রজোগুণাধার ব্রহ্মারূপে বর্ণিত। উষার নাম-পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল ভূতবৎদেব এবং পাশুপত বাণ, এই উভয়ের অবতারণা হইয়াছে। পুরাণে পাশুপত বাণ বাণরাজ হইলেন। তৎকন্যা উষা। সবিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণ, তৎপৌত্র বায়ুদেব অনিরুদ্ধ। চৈত্রমাস দক্ষিণানিলের প্রবর্ত্তক, এজন্য চিত্রা উষার নিকট অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। তৎকালে আষাঢ় মাসের শেষে দক্ষিণানিল তিরোহিত হইত। পূর্ব্ব-বায়ু প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বে বায়ুর সঞ্চালন রহিত থাকিত। এই বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রূপকে আদিত্য-পৌত্র অনিরুদ্ধকে বাণরাজ-কারাগারে বদ্ধ করা এবং আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণের তেজ-বলে অনিরুদ্ধ কারামুক্ত হইয়া পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি আখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। শাক্তপুরাণে মৃগব্যাধ কালপুরুষ 'কার্ত্তিকেয়' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারকাসুর বধ।

দ্বাদশ মন্বন্তরে তারক অসুর দেবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিল। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য-চ্যুত হইলেন। যজ্ঞভাগ স্বর্গরাজ তারক গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া পাতালে—ভূতলে প্রচ্ছন্ন বেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ব্রহ্মার সদনে উপনীত হইয়া, আত্মনিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণ সহ ক্ষীরোদসমুদ্র-তটে উপনীত হইয়া বৈকুণ্ঠপতির

স্তব আরম্ভ করিলেন। নিম্নোলিখিত উপেন্দ্রদেব ব্রহ্মাকে জানাইলেন "পরম বৈষ্ণব তারক নারায়ণের বরে বলীয়ান্। তারক দেবদ্বেষী হইলেও নারায়ণের অবধ্য, কারণ বিষবৃক্ষও রোপণ করিয়া ছেদন করিতে নাই। তোমরা রুদ্রদেবের শরণ লও। দেবাদি-দেব-পুত্র কুমার কার্ত্তিকেয় ভিন্ন অন্য কেহ তারক-বিনাশে সমর্থ নহে। দেবদেব হিমাচলে সমাধিমগ্ন ছিলেন এবং গিরিসুতা পতি-কামনায় তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন; ইন্দ্র-সখা কামদেব সম্মোহন-বাণে ত্রিনেত্রের যোগভঙ্গ করিয়া, ত্রিনেত্রাগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেন; দেব-কার্য্য সিদ্ধ হইল। হর-পার্ব্বতীর মিলনে কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন। দেব-বৃন্দ স্ব স্ব অস্ত্র দান করিয়া কুমারকে দেবসেনার নেতৃত্ব পদে সেনানীরূপে অভিষিক্ত করিলেন। কার্ত্তিকেয় সহ সমরে তারক অসুর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। (গরুড় পুরাণ)

শাস্ত্রমতে নিরক্ষরেখার উত্তরস্থ সুমেরুর শৃঙ্গত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের আলয় এবং স্বর্গ এবং নিরক্ষ-রেখার দক্ষিণস্থ কুমেরু বলিরাজ-আলয় পাতাল। উভয় মেরুর মধ্য-ভূমি মর্ত্ত্য লোক। বিষুবরেখার উত্তরস্থ খ-গোলার্দ্ধ স্বর্গরাজ্য, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণস্থ খ-গোলার্দ্ধ অসুর রাজ্য।

রাশিচক্রের ৬ রাশি বিষুবরেখার উত্তরে ও ৬ রাশি বিষুবরেখার দক্ষিণে থাকে। কিন্তু রাশিচক্র সতত চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। ২৭০০০ বৎসরে একবার স্বকেন্দ্র আবর্ত্তন করে, এজন্য প্রত্যেক রাশি বিষুবরেখার উত্তর হইতে দক্ষিণে যাইতেছে, এবং দক্ষিণ হইতে আবার উত্তরে আসিতেছে।

শিবচতুর্দ্দশী-নিশার প্রদোষকাল হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত গগণমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে দেখিবে, প্রদোষকালে পূর্ব্বাকাশে ধক্ ধক্ করিয়া প্রকাণ্ড অসুর-তারক উদিত হইবে। তাহার সুনির্ম্মল জ্যোতিতে গগণের তারাকুল (দেবকুল) নিষ্প্রভ হইবে; তারক ক্রমে গগণ-মধ্যভাগে আরোহণ করিবে; তখন দেখিবে, তারকের পশ্চিম-ভাগে ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রিকা পরিবৃত সেনানী কুমার রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তারকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন! কুমারের কটি-বন্ধে চাকচিক্যময় তরবারি দোদুল্যমানা। কুমারের তীব্র তেজঃপুঞ্জে তারক পরাজিত। এই তারক অসুরকে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ লুব্ধক (Dog star) নাম দিয়াছেন, এবং সেনানী কুমারের নাম মৃগ-ব্যাধ কালপুরুষ (Orion the hunter) এবং যে স্তবক তরবারি তাহার নাম ছেফ্ (saiph)। যদি বিমল কল্পনাশক্তি ও বিশদ-কবিত্ব-প্রসূত মধুর রসাস্বাদে মন সরস করিতে ইচ্ছা হয়; যদি পৌরাণিক মহর্ষিগণের মনোমুগ্ধকর রূপকের রহস্য-ভেদে কৌতূহল জন্মে, এই শরৎ-নিশায় একবার মিথুনবীথীর দক্ষিণাংশ পর্য্যবেক্ষণ কর। জীবনে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও সমবেত দেখিতে পাইবেনা। পৌরাণিক মহর্ষিগণের রূপক-নৈপুণ্যের তাৎপর্য্য আপনা হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

যজুর্ব্বেদ।

ব্রহ্মযজ্ঞ প্রকরণ—(১)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

—•:০:•—

পিতুন্নু স্তোষম্মহো ধর্ম্মাণন্তবিষীম্।
যস্যত্রিতোব্যোজসাবৃত্রং বিপর্ব মর্দয়ৎ ॥৭

পদপাঠঃ। পিতুং। নু। স্তোষং। মহো। ধর্ম্মাণং। তবিষীম্। যস্য। ত্রিতঃ। বি ওজসা। বৃত্রং। বিপর্বং। অর্দয়ৎ।

ব্যাখ্যা। পিতুং অন্নং অন্নরূপ পিতাকে। অন্নদ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য অন্নকে পিতা বলা হইয়াছে। স্তোষং স্তৌমি, স্তুতি করি বা প্রশংসা করি। মহো মহসঃ অর্থাৎ মহৎ। তবিষীম্ তবিষ্যাঃ বলস্য বলের। বিভক্তি ব্যত্যয়—৬ষ্ঠীস্থলে ২য়া হইয়াছে। ধর্ম্মাণং ধারয়িতারং ধারণকারী। যস্য যাহার। ত্রিতঃ ত্রিস্থান ইন্দ্রঃ অর্থাৎ ত্রিস্থানস্থিত ইন্দ্র বা সূর্য্য। বৃত্রং বৃত্র নামক দৈত্যকে। ওজসা বলেন বলদ্বারা বিপর্বং বিপর্ব্ব করিয়া—অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া। বি অর্দয়ৎ বিশেষরূপে অর্দন করিয়াছিলেন।

বঙ্গার্থ। আমি মহৎ বলের ধারয়িতা পিতৃরূপ অন্নের স্তুতি করি। অন্নের বলের দ্বারাই ইন্দ্র বৃত্রকে বিপর্ব্ব করিয়া অর্দন করিয়াছিলেন।

অন্বি দনু মতে ত্বম্মন্যাসৈ শঞ্চনস্কৃধি।
ক্রত্বে দক্ষায় নোহি নুপ্রেণ আয়ূংষি তারিষঃ ॥৮

পদপাঠঃ। অনু। ইৎ। অনুমতে। ত্বম্। মন্যাসৈ। শম্। চ। নঃ। কৃধি॥ ক্রত্বে। দক্ষায়। নঃ। হিনু। প্র—। নঃ। আয়ূংষি। তারিষঃ।

ব্যাখ্যা। হে অনুমতে (চতুর্দশীযুক্তা পৌর্ণমাসী) ত্বং তুমি। অনুমন্যাসৈ অস্মদুক্তং বুধ্যস্ব আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। ইৎ নিপাতোঽনর্থকঃ। শম্ মঙ্গলং মঙ্গল। নঃ আমাদিগের। কৃধি কর। ক্রত্বে ক্রতবে সংকল্পায়। দক্ষায় তৎ সমৃদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধয়ে সংকল্পসিদ্ধির জন্য। নঃ আমাদিগকে। হিনু গময় প্রেরণ কর। নঃ আমাদিগের। আয়ূংষি আয়ু। প্রতারিষ বৃদ্ধি কর।

(১) ১৩০১ সালের অর্থাৎ প্রথমবর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ব্রহ্মযজ্ঞ-প্রকরণের কতকাংশ প্রকাশিত, অবশিষ্ট অংশ এইক্ষণ প্রকাশিত হইল। পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ অংশটুকু পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া লইবেন।

বঙ্গার্থ। হে অনুমতি দেবি! তুমি আমাদিগের উক্তি বোধগম্য কর। আমাদিগের মঙ্গল সম্পাদন কর। আমাদিগের সংকল্পসিদ্ধি কর এবং আমাদিগের আয়ুবৃদ্ধি কর

অনুনোঽদ্যানুমতির্যজ্ঞন্দেবেষু মন্যতাম্।

অগ্নিশ্চ হব্যবাহনো ভবতন্দাশুষেময়ঃ।৯

পদপাঠঃ। অনু। নঃ। অদ্য। অনুমতিঃ। যজ্ঞং। দেবেষু। মন্যতাম্। অগ্নিঃ। চ। হব্যবাহনঃ। ভবতং। দাশুষে। ময়ঃ।

ব্যাখ্যা। অনুমতি অদ্য আজ। নঃ আমাদিগের যজ্ঞং যজ্ঞ। দেবেষু দেবতাদিগেতে। অনুমন্যতাম্ অনুমত কর। অগ্নিশ্চ অগ্নিও। হব্যবাহনঃ হব্যবহনকারী। দাশুষে যজমানের জন্যে। ময়ঃ সুখরূপী। ভবতং ভবতাম্ হউন্।

বঙ্গার্থ। অনুমতী দেবী অদ্য আমাদের এই যজ্ঞকে দেবতাদিগের অনুমত করাও। হব্যবাহক অগ্নিও যজমানের মঙ্গল বিধান করুন।

সিনীবালি পৃথুষ্টুকে যাদেবানামসিস্বসা।

জুষস্বহব্যমাহুতম্প্রজান্দো বদিদিড্‌ঢিনঃ।১০

পদপাঠঃ। সিনীবালি। পৃথুষ্টুকে। যা। দেবানাম্। অসি। স্বসা। জুষস্ব হব্যম্। আহুতং। প্রজাং। দোব। দিদিড্‌ঢিনঃ।

ব্যাখ্যা। সিনীবালি (চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা)। পৃথুষ্টুকে হে পৃথুকেশভারে অর্থাৎ বহুকেশসংযুক্তে যামিনি (ত্বং) দেবানাম্ দেবতাদিগের স্বসা ভগিনী। অসি হও। সা (ত্বং) আহুতং হব্যং আহুত হব্যকে। জুষস্ব প্রীত্বা গৃহ্লাষ প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর। হে দেবি নঃ আমাদিগকে প্রজাং সন্তান দিদিড্‌ঢ দোহ দান কর।

বঙ্গার্থ। হে সিনীবালি, হে বহুকেশসংযুক্তে, তুমি দেবতাদিগের ভগিনী, এই আহুত হব্য তুমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ কর এবং আমাদিগকে সন্তান প্রদান কর। ১০

পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ।

সরস্বতীতু পঞ্চধাসৌ দেশেঽভবৎ সরিৎ॥১১

পদপাঠঃ। পঞ্চ। নদ্যঃ। সরস্বতীম্। অপিযন্তি। সস্রোতসঃ। সরস্বতী। তু। পঞ্চধা দেশে। সা। উ। অভবৎ। সরিৎ॥ ১১

ব্যাখ্যা। যা দৃষদ্বত্যাদ্যাঃ পঞ্চনদ্যঃ সরস্বতীমুপিযন্তি গচ্ছন্তি দৃষদ্বতী আদি (অর্থাৎ দৃশদ্বতী বা ইরাবতী শতদ্রু, বিতস্তা, বিপাশা ও চন্দ্রভাগা) পঞ্চনদী সরস্বতীতে মিলিত হইয়াছে। সস্রোতসঃ সমানং স্রোতঃ। যাসাং তাঃ যাহাদিগের সমান স্রোত। সা উ সৈব সরস্বত্যেব পঞ্চধা দেশে সরিৎ নদী অভবৎ পঞ্চানি স্বনামানি ত্যক্ত্বা সরস্বত্যেবা-

ভবৎ সেই সরস্বতী নদীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল, অর্থাৎ পঞ্চনদী স্বীয় স্বীয় নাম পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতী হইয়াছিল।

বঙ্গার্থ। তুল্যস্রোতস্বতী পঞ্চনদীই সরস্বতীতে মিলিত হয়, সরস্বতীই দেশে পঞ্চনদী হইয়াছিল। (এই জন্যই পঞ্চাপ বা পঞ্জাব প্রদেশের অন্য এক নাম সারস্বত প্রদেশ।)

ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।
তবব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসো জায়ন্ত মরুতো ভ্রাজ দৃষ্টয়ঃ॥১২

পদপাঠঃ। ত্বম্। অগ্নে। প্রথমঃ। অঙ্গিরা। ঋষিঃ। দেবঃ। দেবানাম্। অভবঃ। সখা। তব। ব্রতে। কবয়ঃ। বিদ্মনাপসঃ। জায়ন্ত। মরুতঃ। ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ।১২

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে ত্বং দেবানাং প্রথমঃ সখা অভবঃ, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা হও। কিম্ভূতস্তম—তুমি কিরূপ—না অঙ্গিরা-অঙ্গিভ্যঃ যজমানেভ্যঃ রাতি সুখমিত্যঙ্গিরা। ঋষি-দ্রষ্টা দেবঃ-দ্যোতমানঃ শিবঃ-কল্যাণঃ। তবব্রতে—তোমার কর্ম্মে। মরুতঃ—মরুৎ সকল অর্থাৎ ঋত্বিক সকল, কবয়ঃ—ক্রান্তদর্শিনঃ। বিদ্মনাপসঃ—বিদিতকর্ম্মাণ (অপাংসি-কর্ম্মাণি) ভ্রাজদৃষ্টয়ঃ—ভ্রাজন্তঃ শোভমানাঃ ঋষ্টয়ঃ আয়ুধানি যেষাং তে শত্রুঘাতকত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, তুমি দেবতাদিগের প্রথম সখা, তুমি অঙ্গিরা অর্থাৎ যজমানদিগকে সুখ দেও, তুমি ঋষি, তুমি কল্যাণরূপী, তুমি দ্যোতমান। তোমার ব্রতে কবি, কর্ম্মাভিজ্ঞ এবং উজ্জ্বল অস্ত্রধারী ঋত্বিকগণ জন্মিয়াছিলেন।

ত্বন্নো অগ্নে তবদেবপায়ুভির্মঘোনো রক্ষতন্বশ্চবন্দ্য।
ত্রাতাতোকস্যতনয়েগবামস্যনিমেষং রক্ষমাণস্তব ব্রতে॥ ১৩

পদপাঠঃ। ত্বং। নঃ। অগ্নে। তব। দেব। পায়ুভিঃ। মঘোনঃ। রক্ষ। তন্বঃ চ। বন্দ্য। ত্রাতা। তোকস্য। তনয়ে। গবাম্। অস্য। নিমেষং। রক্ষমাণঃ। তব। ব্রতে। ১৩

ব্যাখ্যা। হে অগ্নে হে দেব দ্যোতমান হে বন্দ্য স্তুত্য তবব্রতে বর্ত্তমানান্ মঘোনো ধনবতো যজমানান্ রক্ষ পালয়। নোঽস্মাকং শরীরাণি চ রক্ষ। কৈঃ তব পায়ুভিঃ পালনৈঃ ষতস্তমনিমেষং সাবধানং রক্ষমাণঃ পালয়ন্ সন্ তোকস্য পুত্রস্য তনয়ে পৌত্রস্য (বিভক্তি-ব্যত্যয়ঃ) গবাং চ ত্রাতা রক্ষকোঽসি।

বঙ্গার্থ। হে অগ্নে, হে দেব, হে বন্দ্য, তোমার পালন-শক্তির দ্বারা তোমার ব্রতানুষ্ঠানকারী ধনবান যজমানদিগকে এবং আমাদিগের শরীর রক্ষা কর। তুমি সাবধানতার সহিত পালনকরা-হেতু, তুমি আমাদের পুত্র, পৌত্র এবং গবাদির রক্ষক হইয়াছ। (ক্রমশঃ)

শতপথ-ব্রাহ্মণ।

স্বাধ্যায়-প্রশংসা।

পঞ্চ এব মহা যজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি। অহরহঃর্ভূতেভ্যোবলীং হরেৎ। তথা এতম্ ভূতযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহর্দদ্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ মনুষ্যযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্য্যাদা উদপাত্রাৎ তথা এতম্ পিতৃযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহা কুর্য্যাদাকাষ্ঠাৎ তথা এতম্ দেবযজ্ঞম্ সমাপ্নোতি। অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ তস্য বৈএতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহুর্মনঃ উপভৃচ্চ চক্ষুর্ধ্রু‌র্বা মেধা স্রুবঃ সত্যমবভৃতঃ স্বর্গো লোকঃ উদয়নম্। যাবন্তম হবৈ ইমাম্ পৃথিবীম্ বিত্তেন পুরাণং দদং লোকং জয়তিত্রিস্তাবন্তম্ জয়তি ভূয়াংসং চ অক্ষয়ং যঃ এবং বিদ্যানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

(৪) পয়াহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদৃচঃ। সযঃ এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ম্ অধীতে পয়াহুতিভিরেব তদ্দেবাংস্তর্প-যতি। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্ব্বাত্মনা সর্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পদ্ভিঃ ঘৃতকুল্যাঃ মধুকুল্যাঃ পিতৄণ্ স্বধা অভিবহন্তি। (৫) আজ্যাহুতযো হবৈ এতাঃ দেবনাম্ যদ্ যজুংষি। স যঃ এবং বিদ্বান যজুংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে আজ্যাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি। ৬ সোমাহুতয়ো হবৈএতা দেবানাম্ যৎ সামানি। স যঃ এবম্ বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে সোমাহুতিভিরেব তদ্দেবাং-স্তর্পয়ন্তি ইত্যাদি।

৭। মেদাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। স যঃ এবং বিদ্বানথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে মেদাহুতিভিরেব তদ্দেবাংশ্চ স্তর্পয়তি ইত্যাদি।

৮। মধ্বাহুতয়ো হবৈ এতাঃ দেবানাম্ যদনুশাসনানি বিদ্যা বা-কোবাক্যমিতিহাস পুরাণম্গাথাঃ নারাশংস্যঃ স যঃ এবম্ বিদ্বান ইত্যাদি।

৯। তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ যদ্বাতোবাতি যদ্বিদ্যেততে যৎ স্তনয়ত্যভস্ফূর্জতি। তস্মাদেবম্ বিদ্বান্ বাতে বাতি বিদ্যোতমানে স্তনয়ত্যভস্ফূর্জত্যধীয়ীত এব বষট্কারাণামচ্ছম্বট-কারায়। অতিহবৈপুন র্ম্মৃত্যুমমুচ্যতে গচ্ছতি ব্রহ্মণঃ সাত্মতাম। সচেদ্ অপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকম্ দেবপদম্" অধীত্য এব তথা ভূত্যেভ্যো ন হীয়তে।

১। অথাতো স্বাধ্যায়-প্রশংসা। প্রিয়ে স্বাধ্যায়ে প্রবচনে ভবতঃ। যুক্তমনাঃ ভবত্যপরাধীনোঽহরহরর্থান্ সাধয়তে সুখম্ স্বপিতি পরম চিকিৎসকঃ আত্মানো ভবতি। ইন্দ্রিয় সংযমশ্চ একারামতা চ প্রজ্ঞা বৃদ্ধির্যশো লোকপক্তিঃ। প্রজ্ঞাবর্দ্ধমানা চতুরো ধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণানামভিনিষ্পাদয়তি ব্রাহ্মণ্যম্ প্রতিরূপচর্য্যাম্ যশো লোক পক্তিম্। লোকঃ পচ্যমানশ্চতুর্ভির্ধর্ম্মৈর্ব্রাহ্মণম্ভুনক্ত্যর্চ্চযাচ দানেন চ অজ্যেয়তয়া চ অবধ্যতয়া চ।

২। যে হ বৈ কে চ শ্রমাঃ ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ স্বাধ্যায়ো হবৈ তেষাম্ পরমতা কাষ্ঠা যঃ এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৩। যদ্ যদ্ হ বৈ অয়ং ছন্দসঃ স্বাধ্যায়মধীতে তেন তেনহএব অস্য যজ্ঞ ক্রতুনা ইষ্টম্ ভবতি যঃ এবম্বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽঅধ্যেতব্যঃ।

৪। যদি হ বৈ অপি অভ্যক্তঃ অলঙ্কৃতঃ সুহিতঃ সুখে শয়নে শয়ানঃ স্বাধ্যায়মধীতে আহ্ এব স নখাগ্রেভ্যস্তপ্যতে য এবম্ বিদ্বান স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

৫। মধুহ বৈ ঋচো ঘৃতম্ হ সামান্যমৃতম্যজুংষি। যদ্ উহ বৈ অয়ম্ বাকোবাক্যমধীতে ক্ষীরৌদন মাংসৌদনৌ হ এব তৌ।

৬। মধুনাহ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবম্ বিদ্বান্ ঋচোঽহ-রহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনম্ তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ।

৭। ঘৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ সামান্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৮। অমৃতেন হবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ যজুংষ্য হরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে তে এনম্ তৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

৯। ক্ষীরৌদন মাংসৌদননা ভ্যামহবৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যমিতিহাসপুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এনমৃতৃপ্তাঃ ইত্যাদি।

১০। যন্তি বৈ অপঃ। এত্যাদিত্যঃ। এতি চন্দ্রমাঃ। যন্তি নক্ষত্রাণি। যথা হ বৈ ন ইয়ুর্ন কুর্য্যুরেবম্ হ এব তদহর্ব্রাহ্মণো ভবতি যদহঃ স্বাধ্যায়মনঅধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। তস্মাদপ্যৃচম্ বা যজুর্ব সাম বা গাথাম্ বা কুম্ব্যাম্ বা অভিব্যহরেদ্ ব্রাতস্য অব্যবচ্ছেদয়।

বঙ্গার্থ। মহাযজ্ঞের সংখ্যা পঞ্চ। তাহারা মহাসত্র বা যজ্ঞ। যথা ভূতযজ্ঞ, মনুষ্য-যজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ। প্রত্যহ ভূত অর্থাৎ পশু-পক্ষ্যাদিকে বলি দিবে, অর্থাৎ তাহাদের আহার্য্য বস্তু দিবে। এইরূপে ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ মনুষ্যকে দান করিবে; আর কিছু না থাকিলে জল প্রদান করিবে। এইরূপে মনুষ্য-যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অহরহ পিতৃপুরুষগণকে স্বধা মন্ত্রের সহিত পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। অহরহ স্বাহা মন্ত্রের সহিত দেবতাদিগের পূজা দিবে, অন্ততঃ কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিবে। এইরূপে দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। তৎপরে ব্রহ্ম-যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। স্বাধ্যায়কেই ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। (স্বীয় স্বীয় শাখান্তর্গত বেদাধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে—স্বাধ্যায়ঃ স্বশাখাধ্যয়নম্।) এই ব্রহ্মযজ্ঞে বাক্ জুহূ (১) মন উপভৃৎ, চক্ষু ধ্রুবা, মেধা স্রুব, সত্য অবভৃত, এবং স্বর্গই শেষ গতি বা—উদয়ন। যিনি অহরহঃ বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি ধনপূর্ণ পৃথিবী দানকারী অপেক্ষা তিন গুণ বৃহৎ অক্ষয় লোক জয় করেন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। ঋক্ সমূহ দেবতা-দিগের নিকট পয়ঃ বা দুগ্ধের আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ

(১) জুহূ, উপভৃৎ—ইত্যাদি যজ্ঞীয় পাত্র।

ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি পয়াহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া বেদাধ্যায়ীকে যোগ-ক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ), প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা, এবং সর্ব্ব প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। ঘৃতের নদী, মধুর নদী স্বধারূপে তাহার পিতৃগণের নিকট প্রবাহিত হয়।

ঘৃতের আহুতির ন্যায় যজুর্ব্বেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে আজ্য বা ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, এবং দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যোগ, ক্ষেম, প্রাণ, রেত, শারীরিক সুস্থতা এবং সর্ব্ব-প্রকার পুণ্য-সম্পদ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। (পূর্ব্ববৎ)

সোমের আহুতির ন্যায় সামবেদ দেবতাদিগের নিকট প্রিয়, যিনি ইহা অবগত হইয়া প্রত্যহ সামবেদ পাঠ করেন, তিনি হোমাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি। (পূর্ব্ববৎ)।

মেদের আহুতির ন্যায় অথর্ব্বাঙ্গিরস দেবতাদিগের নিকট প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া অহরহঃ অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি মেদাহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি সাধন করেন এবং তাঁহারা ইত্যাদি—(পূর্ব্ববৎ।)

(৮) অনুশাসনগ্রন্থ, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ, বাকোবাক্য, ইতিহাস পুরাণ-গাথা, স্তুতিবাক্য দেবতাদিগের নিকট মধুর আহুতির ন্যায় প্রিয়। যিনি ইহা জানিয়া প্রত্যহ এই সমুদয় পাঠ করেন, তিনি মধুর আহুতির দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তিসাধন করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

(৯) এই বেদযজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞের চারিটি বষট্‌কার আছে, যথা যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, যখন বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, যখন বজ্রধ্বনি হয়, যখন উহার অবস্ফূর্জন হয় অতএব যখন বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ প্রকাশিত হয়, বজ্রধ্বনি হয়, উহার অবস্ফূর্জন হয়, তখনই যিনি ইহা জানেন, তিনি যেন বেদাধ্যয়ন করেন, যেন বষট্‌কারের বিরতি না হয়। যিনি এইরূপ কার্য্য করেন, তাঁহার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয় না, তাঁহার ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। যদি তিনি অধিকও পাঠ না করিতে পারেন, একটি দেবপদও যেন পাঠ করেন; তাহা হইলে, তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং গো-অশ্বাদি হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

তৎপর স্বাধ্যায়-প্রশংসা। অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা অতিপ্রিয়। যিনি অধ্যয়ন করেন এবং অধ্যাপনা করান, তিনি যুক্তমনা হয়েন এবং পরাধীন হয়েন না, তিনি নিত্য অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হয়েন, সুখে নিদ্রা যান, এবং নিজেই নিজের চিকিৎসক হয়েন। ইন্দ্রিয় সংযম, মনের একাগ্রতা, প্রজ্ঞাবৃদ্ধি, যশ এবং জনগণকে শিক্ষা দিবার শক্তি, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার ফল। প্রজ্ঞাবৃদ্ধির সহিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য, উপযুক্ত

চর্য্যা, যশ এবং জনদিগকে শিক্ষা দিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ এইরূপ শিক্ষিত হইলে, মনুষ্যগণ ব্রাহ্মণকে চতুর্ব্বিধ অধিকার প্রদান করেন, যথা—সম্মান বা অর্চ্চনা, দানগ্রহণ, অত্যাচার হইতে মুক্তি এবং অবধ্যতা। (২) স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার শ্রম আছে, বেদাধ্যয়ন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। (৩) যখনই মানব বেদাধ্যয়ন করেন, তখনই তিনি সমস্ত যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

(৪) যখন কোন মানব দেহে সুগন্ধি দ্রব্য লেপন করিয়া, অলঙ্কার-ভূষিত হইয়া, ক্ষুধা নিবারণ করিয়া, এবং সুন্দর শয়নে উপবেশন করিয়া, বেদ পাঠ করেন, তিনি তাঁহার নখাগ্র পর্য্যন্ত তপশ্চর্য্যা করেন। অতএব বেদাধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

৫। ঋগ্বেদ মধু, সামবেদ ঘৃত, যজুর্ব্বেদ অমৃত। যখন মানব বাকোবাক্য বা মহাজনদিগের কথোপকথন, এবং প্রাচীন কথা পাঠ করেন, তখন তিনি দেবতাদিগকে দুগ্ধ এবং মাংসের আহুতি দেন।

(৬) যিনি ইহা অবগত হইয়া ঋগ্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে মধুর আহুতি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন, এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল কাম এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ দ্বারা সন্তুষ্ট করেন।

(৭) যিনি ইহা জানিয়া সামবেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ঘৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(৮) যিনি ইহা জানিয়া যজুর্ব্বেদ পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে অমৃতের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ

(৯) যিনি ইহা জানিয়া বাকোবাক্য, ইতিহাস, পুরাণাদি পাঠ করেন, তিনি দেবতাদিগকে ক্ষীরের এবং মাংসের আহুতি প্রদান করেন, ইত্যাদি—পূর্ব্ববৎ।

(১০) বারি সমূহ গতিশীল, সূর্য্য গতিশীল, চন্দ্র গতিশীল, নক্ষত্র সমূহ গতিশীল; ব্রাহ্মণ যদি কোন এক দিন বেদ পাঠ না করেন, তবে এই সমুদয় গতিশীল পদার্থ গমন না করিলে বা কার্য্য না করিলে যেরূপ হয়, তিনিও সেই দিন সেইরূপ হয়েন। অতএব বেদ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য, অতএব ঋক্, যজু, সাম, গাথা বা কুম্ব্য অধ্যয়ন করিবে, যেন ব্রতের ব্যবচ্ছেদ না ঘটে।

অন্তর্জ্যোতি।

(বৃহদারণ্যক শ্রুতি)-(৪-৩)

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি সদাসর্ব্বদাই জনক রাজার আলয়ে গমন করিতেন। উভয়ে একত্র হইলেই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা হইত। মধ্যে মধ্যে হাস্য-পরিহাসাদিও চলিত। কোন এক সময় যাজ্ঞবল্ক্য জনকের আলয়ে গমন করিলে, জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি উদ্দেশ্যে আগমন হইয়াছে? কূট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে, না পশুদান গ্রহণ করিতে? ("পশূনিচ্ছন্নণ্বন্তানিতি" ॥) যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন যে, উভয় উদ্দেশ্যেই তিনি আসিয়াছেন। আর এক দিন সভায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য মনে করিলেন যে, অদ্য কোন কথা বলিব না, দেখি জনক কি করেন। কিন্তু পূর্ব্বে কোন সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইচ্ছামত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া, জনক পূর্ব্ব বর স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন, মানব জগতে কোন্ জ্যোতির সাহায্যে তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে? (১)

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন "আদিত্য-জ্যোতিঃ", সূর্য্যের জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন, এবং কার্য্য করিয়া থাকে। (২)

জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—"সূর্য্য অস্তমিত হইলে কি হয়?"। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "সূর্য্য অস্তমিত হইলে চন্দ্রের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"চন্দ্র অস্তমিত হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে, "অগ্নির সাহায্যেই মানব তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করে।" জনক—"অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে কি হয়" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন যে "শ্রবণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানব তাবৎ কার্য্য

(১) কিং জ্যোতিরয়ং পুরুষ ইতি। কিমস্য পুরুষস্য জ্যোতির্যেন জ্যোতিষা ব্যবহরতি সোঽয়ং কিং জ্যোতিরয়ং প্রাকৃতঃ কার্য্যকারণ সংঘাতরূপঃ শিরঃপাণ্যাদিমানপুরুষঃ পৃচ্ছ্যতে। মূলে পুরুষের কি জ্যোতি, এই প্রশ্ন আছে। উহার অর্থ এই যে, কার্য্যকারণ সংঘাতরূপ শিরাদি-অবয়বযুক্ত প্রাকৃত পুরুষ অর্থাৎ মানব কোন্ জ্যোতি দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করেন?

(২) আদিত্যেনৈবায়ং জ্যোতিষাস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেত। উপবিশতি পর্য্যেতি কর্ম্ম কুরুতে বিপর্য্যেতি চ যথাগতম্।

সম্পাদন করে।" (৩) জনক—"বাক্যাদি উচ্চারিত না হইলে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য না করিলে, কোন্ জ্যোতির সাহায্যে বা কি উপায়ে মানব কার্য্য করে?" জিজ্ঞাসা করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

আত্মৈবাস্য জ্যোতির্ভবতীত্যাত্মনৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে
পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতীতি॥ (৬।৩।৪ অধ্যায়)

তখন আত্মারূপ জ্যোতির সাহায্যেই মানব উপবেশন করে, গমন করে, কার্য্য সম্পাদন করে এবং প্রত্যাগমন করে।" জনক জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ আত্মা"? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সহি স্বপ্নো (৪) ভূত্বেমং (৫) লোকমতিক্রামতি মৃত্যোরূপাণি (৬)॥ ৭।৩।৪

ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বিজ্ঞানময় যে পুরুষ এবং যিনি হৃদয়-নিহিত জ্যোতিঃস্বরূপ এবং যিনি হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া হৃদয় হইতে অভিন্নভাবে ইহলোক ও পরলোক, এই উভয়-লোকে বিচরণ করেন, বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থিত বলিয়া তিনিই ধ্যান করেন, বিচরণ করেন, এইরূপ বোধ হয়। তিনিই স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত অবস্থার তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন, তিনিই অবিদ্যা জনিত তাবৎ কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

সবা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরমভিসংপদ্যমানঃ পাপ্মভিঃ (৭) সংসৃজ্যতে (৮) স উৎক্রামন্ ম্রিয়মাণঃ পাপ্মনো বিজহাতি। ৮ (৯)

সেই পুরুষ জন্ম গ্রহণ ও শরীর গ্রহণ করিয়া পার্থিব কার্য্য-কারণের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মুক্তি লাভ করিলে, শরীর পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কার্য্য-কারণ হইতে বিমুক্ত

---

(৩) মূলে "বাগেবাস্যজ্যোতির্ভবতীতি বাচৈবায়ং জ্যোতিষাঽস্তে পল্যয়তে কর্ম্ম কুরুতে বিপল্যেতি॥ অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, বাক্‌রূপ জ্যোতি দ্বারা মানব উপবেশন, গমন, প্রতিগমন এবং নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, এই উহার শব্দার্থ। কিন্তু 'বাক্' এই উপলক্ষণ মাত্র। উহা ঘ্রাণ, স্পর্শ ইত্যাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চক্ষুহীন ব্যক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাবৎকার্য্য সম্পাদন করে। বাগজ্যোতিষো গ্রহণং গন্ধাদীনামুপলক্ষণার্থম্।

(৪) স্বপ্নো ভূত্বা স্বপ্নবৃত্তিমবভাসয়ন্ ধিয়ঃ বাসনাকারো ভূত্বা

(৫) ইমং লোকং জাগরিত ব্যবহার লক্ষণং কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মকং।

(৬) মৃত্যো রূপাণি ক্রিয়াফলাশ্রয়াণি।

(৭) পাপ্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়ৈঃ কার্য্যকারণৈঃ।

(৮) সংসৃজ্যতে সংযুজ্যতে।

(৯) বিজহাতি বৈযুজ্যতে।

হয়। অর্থাৎ একই দেহে বিজ্ঞানময় পুরুষ যেরূপ জাগ্রত অবস্থা হইতে স্বপ্ন এবং স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ সেই পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জন্ম ও মৃত্যুর অধীন হয়।

তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বেএব স্থানে ভবত ইদং চ পরলোকস্থানং চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদং চ পরলোকস্থানং। অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমাক্রমমাক্রম্যোভয়ান্ পাপ্মন আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ॥ ৯

এই পুরুষের দুইটী স্থান আছে—ইহলোক এবং পরলোক; এই উভয় লোকের সন্ধিস্থানকে স্বপ্নস্থান বলে। (দুইটী গ্রামের সীমা যেমন একটী স্বতন্ত্র গ্রাম নহে, তদ্রূপ স্বপ্নস্থান ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থান ব্যতীত একটী স্বতন্ত্র স্থান নহে)। সেই সন্ধিস্থানে থাকিয়া সেই পুরুষ ইহলোক এবং পরলোক, এই উভয় স্থান দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার আক্রম অর্থাৎ চেষ্টা অনুসারে তিনি সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। যখন এই বিশ্বের ভৌতিক মাত্রা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংই এই দেহ পাত করিয়া—অর্থাৎ নিঃসম্বোধ প্রাপ্ত হইয়া, নিজেই স্বীয় আভা ও জ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদেহ প্রস্তুত করিয়া নিদ্রা যান, তখন পুরুষ স্বয়ং জ্যোতি হয়েন—অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয়েন।

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্ত্যথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ন তত্রানন্দামুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ সৃজতে সহি কর্ত্তা। ১০ ॥

সেখানে রথ নাই বা অশ্ব নাই বা পথ নাই; তিনি রথ, অশ্ব ও পথ সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ নাই, হর্ষ নাই, কিম্বা অত্যন্ত হর্ষ নাই; তিনি আনন্দ, হর্ষ ও অত্যন্ত হর্ষ সৃষ্টি করেন। সেখানে হ্রদ, পুষ্করিণী বা নদী নাই; তিনি হ্রদ, পুষ্করিণী ও নদী সৃষ্টি করেন; কারণ তিনিই কর্ত্তা। (ক্রমশঃ)

আর্য্য।

—০:০—

পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, ভারতবর্ষের যে স্থানটি এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট, তাহাকেই প্রাচীনকালে "আর্য্যাবর্ত্ত" বলা হইত। "আর্য্য" নামক জাতি এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া উহা আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মনু বলেন,—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ তয়োরেবান্তরং গির্য্যোঃ (হিমবদ্বিন্ধ্যয়োঃ) আর্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ। অমরকোষ বলেন— "আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যে বিন্ধ্য হিমাগয়োঃ"। "আর্য্যা আবর্ত্তন্তেহত্র"—এই স্থানে আর্য্যেরা বাস করিতেন, এইজন্য আর্য্যাবর্ত্ত। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, এই আর্য্যজাতি ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহেন; তাঁহারা মধ্য-আসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারতবর্ষেই আপনাদিগের আধিপত্যের বিস্তার করেন। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিমনিবাসীই হউন কিম্বা অন্যস্থান হইতে এখানে আসিয়া থাকুন, তাঁহাদের সহিত যে ভারতবর্ষের অন্য একটি জাতির অনেক দিন ধরিয়া একটি ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাঁহারা শ্বেতকায় ছিলেন ও বেদমার্গ অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহাদের শত্রুবর্গ কৃষ্ণ-কায় ও বেদমার্গের বিরোধী ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল ১০৫ সূক্তে দৃষ্ট হয় "দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চপুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্ব্বাণি বর্হীৎ সনৎক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎসূর্য্যং সনদপঃ সুবজ্রঃ"॥ অর্থাৎ ইন্দ্র অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল মরুৎগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া, পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন। শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল প্রাপ্ত হইলেন। ঐ মণ্ডলের ১০১ ঋকে 'কৃষ্ণ' নামক একজন অসুরকে হনন করিয়া ইন্দ্র তাহার গর্ভবতী স্ত্রীদিগকে হরণ করিয়াছিলেন, এই বৃত্তান্তও পাওয়া যায়। ঐ মণ্ডলের ১০৩ সূক্তেও দস্যু ও আর্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন, উহাতে তাহার উল্লেখ আছে। ১০৪ সূক্তে দাস বা দস্যুদিগের উল্লেখ আছে। অনার্য্যেরা যজ্ঞবিহীন ছিল। বেদে তাহাদিগকে "অযজ্বান" বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ১২১ সূক্তে অনার্য্যদিগের নাম যে "রাক্ষস" বা "রক্ষ," তাহা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলে১২ ও২১ সূক্তেও রক্ষ

শব্দ পাওয়া যায়। তাহাদের বর্ণ যে কৃষ্ণ ছিল, তাহা ৪র্থ মণ্ডলের ১৬সূক্তে পাওয়া যায়। "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণ কৃষ্ণনিবপঃ"। ৪র্থ মণ্ডলের ৩০ সূক্তেও আর্য্য ও অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উল্লেখ আছে; উহাতেও 'দাস' শব্দ ব্যবহৃত আছে। "বিজানীহি আর্য্যান্ যে চ দস্যবঃ" আর্য্য ও দস্যুদিগকে পৃথকরূপে অবগত হইও ১-৫১-৮। "বিচিন্বান্ দাসমার্য্যম্"—আমি দাস ও আর্য্যদিগকে পৃথকরূপে অবগত হইয়াছিলাম ১০-৮৬-১৯ "হত্বা দস্যূন্ প্রার্য্যম্ বর্ণমাবৎ" ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ৩-৩৪-৯। এইরূপ বেদের বহুস্থানে আর্য্য ও দস্যুদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। দেবতারা আর্য্যদিগের সাহায্য করিতেছেন এবং দস্যুদিগের নগর ধ্বংস এবং তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছেন। কখন কখন আর্য্যদিগের মধ্যেও পরস্পর বিবাদ হইত এবং সম্ভবতঃ অনেক আর্য্য দস্যুগণের সহিত একতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বেদে তাহাদিগের বিনাশের জন্যও স্তোত্রাদি দৃষ্ট হয়। "দাসস্য বা মঘবনার্য্যস্য সমুতা যবয় বাধম্"। ১০—১০২—৩ দাসের বা আর্য্যের অস্ত্র বিমুখ কর। "সহ্যোমদাসমার্য্যম্ ত্বয়া যুগা" ১০-৮৩-১। তোমার সাহায্যে যেন দাস ও আর্য্যের আক্রমণ সহ্য করিতে পারি। "ত্বম্ তান্ ইন্দ্র উভয়ান্ অমিত্রাণ্ দাসান্। বৃত্রাণি আর্য্যা চ শূর বধীঃ" হে শূর! তুমি দাস ও আর্য্য-বৃত্রদিগকে, আমাদিগের উভয় শত্রুকে বধ করিয়াছিলে—৬-৩৩-৩ "যঃ নঃ দাসঃ আর্য্যঃ বা পুরুস্তুত অদেবাঃ ইন্দ্র যুদ্ধায় চিকেতাতি"। ১০-৩৮ ৩ যে কোন দাস এবং দেবহীন আর্য্য আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। এইরূপ বহুস্থানে দৃষ্ট হইবে যে, দাসদিগের বিরোধী বেদ-মার্গ অনুসরণকারী ভারতবর্ষের একটী জাতির নাম আর্য্য। যজুর্ব্বেদে দৃষ্ট হয় "যচ্ছূদ্রে যদার্য্যে যদেন স চক্রিমে বায়ম্।" আমরা আর্য্যের বিরুদ্ধে ও শূদ্রের বিরুদ্ধে যে সমুদায় পাপ করিয়াছি। এখানে ঋগ্বেদের "দাস" স্থলে "শূদ্র" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তিন জাতিতেই আর্য্য শব্দের প্রয়োগ হইত। শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় "অর্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। "ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায়" ইত্যাদি। ২৬-২ এই "অর্য্য" শব্দের অর্থ বৈশ্য। লাট্যায়ন সূত্রেও অর্য্য শব্দ পাওয়া যায়—"অর্য্যাভাবে"; ইত্যাদি ৪-৩-৬। পাণিনিতেও অর্য্য শব্দের অর্থ বৈশ্য এবং প্রভু, কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিকে দৃষ্ট হয় যে, যেস্থলে "অর্য্য" শব্দ "বৈশ্য" বুঝাইবে, সেস্থলে "অ" উদাত্ত হইবে, অর্থাৎ উহার উচ্চারণ "আর্য্যে"র ন্যায় হইবে। এইটি দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে "অর্য্য" ও "আর্য্য" শব্দ মূলতঃ এক। প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণেতেই অর্থাৎ সকল লোকেতেই আর্য্য শব্দ প্রযোজিত হইত, কিন্তু শেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবসায় নির্ব্বাচিত হইলে, কেবল ভূমি-ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকেই অর্য্য বা আর্য্য বলা হইত। বৈশ্যের আর এক নাম বিশ, (এইক্ষণেও কোন কোন উচ্চ জাতির মধ্যে বিট্ উপাধি পাওয়া যায়), ইহার অর্থ "গৃহ" এবং "লোক"ও ইহার এক অর্থ;

অর্থাৎ গৃহ ও গৃহবাসী উভয় অর্থে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঐরূপ বেদে 'ক্ষিতি' বলিতে বাসস্থান ও বাসকারীকে বুঝায়, কৃষ্টি বলিতে ভূমিকর্ষণ ও কর্ষণকারীকেও বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষায় যদি ভূমি অর্থে "অর" শব্দ থাকিত, তাহা হইলে যেমন গো শব্দ হইতে গব্য শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তদ্রূপ ঐ "অর" শব্দ হইতে অর্য্য ও আর্য্য উৎপন্ন করা যাইত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ভূমি অর্থে অর শব্দ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দ পাওয়া যায়, এবং ইলা শব্দও পাওয়া যায়। "র" ও "ল" পরস্পর পরিবর্ত্তনীয়। এই দুই শব্দের অর্থই ভূমি, ইলাবৃত—ইলা পৃথিবী—বৃত যেন। ঋগ্বেদে (৫-৮৩-৪) ইরা শব্দে পৃথিবী-উৎপন্ন আহার্য্য বস্তুও বুঝায়। অথর্ব্ববেদেও (৪-১১-১০) ইরা শব্দের ভূমি বা পৃথিবী অর্থ আছে। এই সমুদায় দেখিয়া পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি পূর্ব্বে "অর" শব্দও সংস্কৃত ভাষায় ছিল। সংস্কৃত ভাষার সমশ্রেণীয় ভাষা সমূহ দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাও বলেন যে, আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালের লোকেরা ভূমি হইতে নাম গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে আর্য্য শব্দে ভূমি হইতে জাত বা ভূমি বা কৃষি ব্যবসায়ী বুঝাইবে। "অর" শব্দে সংস্কৃত ভাষায় কোন স্থানে ভূমিকর্ষণ পাওয়া যায় না। ইরা শব্দে ভূমি পাওয়া যায়,—কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "অরিত্র" একটি শব্দ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ হ'ল, অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা যেরূপ ভূমি কর্ষণ করা হয়, তদ্রূপ হালের দ্বারাও সমুদ্র কর্ষণ করা হয়। আধুনিক সংস্কৃতেও অর্য্য শব্দের যে ধাতু, অরিত্র শব্দেরও সেই ধাতু। উভয়ই ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন; আর্য্য শব্দও ঐ ঋ ধাতু হইতে উৎপন্ন করা হইয়াছে; কিন্তু অরিত্রের পক্ষে ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় গমন, এবং আর্য্য ও অর্য্য শব্দের বেলায় ঋ ধাতুর অর্থ করা হয় "অর্ত্তুং প্রকৃতমাচরিতুং যোগ্যঃ"—অর্থাৎ প্রকৃত আচরণ করিতে যোগ্য। এই অর্থ যে ক্রমে ক্রমে আর্য্য শব্দে যোজিত হইয়াছে, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার সমজাতীয় প্রায় ভাষাতেই—অর্থাৎ গ্রিক, লাটিন প্রভৃতি ভাষায় অর ধাতু অর্থে কর্ষণ বুঝায়। ইংরাজি 'আরৎ' অর্থাৎ ভূমি এই অর ধাতু হইতে উৎপন্ন।

প্রাচীন পারস্য ভাষায় সংস্কৃত ভাষার ন্যায় আর্য্য শব্দ পূজ্য শ্রেষ্ঠ আদি অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং তদ্দেশবাসী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশেও যেমন কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য—সদ্বংশজ আদি অর্থ হইয়াছে, পারস্য ভাষায়ও তদ্রূপ হইয়াছে। পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তাতেও "অনার্য্য" শব্দ পাওয়া যায়। প্রাচীন পারস্য-ভাষায় আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ অবিকৃত অবস্থাতেই পাওয়া যায়। ডেরায়স্ রাজা আপনাকে আর্য্য এবং আর্য্যচিত্র বা আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতেন। কালে আর্য্যস্থানে ইরান্ হইয়াছিল এবং অনার্য্যস্থানে অনিরান্ হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রিক্ ভূগোল-বিদেরা দক্ষিণে ভারত-সমুদ্র, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, উত্তরে হিন্দুকুশ—পামিরস্ পর্ব্বত ইত্যাদি এবং পশ্চিমে পারস্য-উপসাগর, এই স্থানকে "আর্য্যানা" নাম দিতেন।

প্রাচীন সংস্কৃতে একই শব্দে অনেকস্থলে কার্য্য ও কারণ বুঝায়। যেমন ইরা শব্দে ভূমি বুঝায়, তেমন ঐ শব্দে খাদ্যাদি এবং তৎপরে বলও বুঝায়। গো শব্দে গো, দুগ্ধ ও চর্ম্মও বুঝায়। এই সমুদয় দৃষ্টি করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "অর" শব্দ ছিল, এবং "ইরা" শব্দ উহারই রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, অর শব্দের অর্থ ভূমি ছিল, এবং ঐ শব্দ হইতে আর্য্য অর্থাৎ ভূমিপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। যখন বৈশ্যদিগের হস্তে কৃষিকার্য্য পড়িল, তখন তাহাদিগকে বিশেষভাবে আর্য্য বলা হইত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন বর্ণের সাধারণ নাম আর্য্য হইলেও, ভূমিকর্ষণকারী বৈশ্যদিগকেই বিশেষরূপ আর্য্য বলা হইত। ঐ শব্দ তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগের সময় অর্য্য লেখা হইত, কিন্তু উচ্চারণ একরূপই হইত। কালে আর্য্য শব্দের পূজ্য শ্রেষ্ঠাদি অর্থও হইয়াছে।

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে সতু আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

এই শেষ অর্থ জাতি বিশেষে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ কর্ত্তব্য-আচরণ করা এবং অকর্ত্তব্য আচরণ না করা যদি আর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে আর্য্যাতিরিক্ত জাতিতেও উহা প্রযোজ্য হইতে পারে। বেদাদি শাস্ত্রে উত্তর ও দক্ষিণে হিমাচল ও বিন্ধ্যাচল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে সাগর, এই স্থানের বেদমার্গানুযায়ী জাতিদিগকে আর্য্য বলা হইয়াছে। শূদ্রাদিকে উহার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছে; বিশেষতঃ বর্ত্তমানে আমাদের দেশে 'শ্বেতকায়' শব্দ স্মরণ করিলে, আব্রাহ্মণ-শূদ্র পর্য্যন্ত সকলেরই যেরূপ বহুবিধ মানসিকগ্লানি উপস্থিত হয়, আর্য্য শব্দ তদ্রূপ বর্ণের পার্থক্যহেতু নানাবিধ অপব্যবহার ব্যঞ্জক। "আর্য্যংবর্ণমবৎ"—ইন্দ্র আর্য্যবর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন, ঐরূপ কৃষ্ণদিগকে বধ করিয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দুজাতিকে যদি আর্য্যশব্দের অন্তর্ভুক্ত না করা যায়, তাহাহইলে উহার পুনঃপ্রচলন করিয়া অনৈক্যপূর্ণ হিন্দুসমাজে অধিকতর অনৈক্যের বীজ রোপিত না করাই ভাল। হিন্দু শব্দ সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হপ্তহিন্দু' ও 'সপ্তসিন্ধু' এক কথা। এই হপ্ত হিন্দু হইতেই হিন্দু, তৎপরে ইনদ, ও তৎপরে ইণ্ডিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বে এক সংখ্যা হিন্দুপত্রিকায় দেখান হইয়াছে। প্রাচীন পারস্য ভাষায় হিন্দুশব্দের কদর্থ নাই। 'ওমর খায়িয়ম' প্রভৃতি গ্রন্থকার আধুনিক। মুশলমান-ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে, পারস্যবাসীরা প্রায় সকলেই মুসলমান হয়েন—ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। যাঁহারা মুশলমান হয়েন নাই, তাঁহারা ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বলিয়াছি, প্রাচীন পারসিক ভাষায় হিন্দু শব্দের কোন কদর্থ নাই। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা গৌরাঙ্গ ছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না; তাঁহাদিগকে প্রাচীন পারসিকদিগের কৃষ্ণাঙ্গ বলার কোনও

কারণ ছিল না। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকেই কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন; তবে যদি অনার্য্যদিগকেই পারসিকেরা কৃষ্ণাঙ্গ বলিতেন, এরূপ হয়, সে আলাহিদা কথা। কিন্তু হিন্দু শব্দ যে সিন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তর্কস্থলে যদি বলা হয় যে, সিন্ধু অর্থে যেরূপ নদী বুঝায়, তদ্রূপ সাগরও বুঝায়, এবং সাগর কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং সিন্ধু বা হিন্দু শব্দের দ্বারাই প্রাচীন পারসিকেরা ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলিতেন, তবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বেদে বহুস্থানে আর্য্যদিগের শ্বেতবর্ণের উল্লেখ আছে, এবং সিন্ধুনদের নামকরণ এই দেশের আর্য্যেরাই করিয়াছিলেন, পারসিকেরা করেন নাই। পারস্য ভাষায় হিন্দু শব্দের কৃষ্ণবর্ণ অর্থ আছে, কিন্তু তাহার কোন কৃষ্ণবর্ণত্ব-সূচক ধাতু পাওয়া যায় কি না, জানিনা; যতদূর অবগত হইয়াছি, উহা পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐ শব্দটি আদৌ পারস্য ভাষার নয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এদেশবাসীরা পারসিকদিগের দ্বারা হিন্দু বলিয়াই অভিহিত হইতেন, এবং উহার মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য দুই জাতিই অন্তর্ভূক্ত ছিল। কালবশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচলনে এদেশবাসীরা পারস্যদেশবাসীদিগের দ্বারা বিধর্ম্মী বা 'কাফের' বলিয়া ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হইতে পারে এদেশবাসীদের মধ্যে অনার্য্য থাকাতে এবং আর্য্যদিগের বহুদিন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস হওয়াতে, তাঁহাদের বর্ণের বিকৃতি হওয়ায়, কালে পারসিকেরা সিন্ধুদেশ-বাস-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজনা করিলেন। "ঐ লোকটি যেন কাফ্রি," এইরূপ কথা আমরা সর্ব্বদাই শুনি, সুতরাং কালে কাফ্রি অর্থে বাঙ্গালা কাল হইবে। ইংরাজিতে Nigger শব্দের অর্থ কাল এইরূপে হইয়াছে। সুতরাং কাল বর্ণ-জ্ঞাপক হিন্দু শব্দ হইতে হিন্দুশব্দ উৎপন্ন হয় নাই। হিন্দুশব্দ ছিল, উহা সিন্ধু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল; হিন্দুদিগের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ লোক থাকায়, কিম্বা পারস্যবাসী অপেক্ষা তাঁহাদের বর্ণ মলিন হওয়ায়, এবং তাঁহারা অন্যধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, কালে ঐ শব্দেই কৃষ্ণবর্ণ ও কাফের অর্থ যোজিত হইয়াছে। আমরা যদি এইরূপ 'ইংরাজ' শব্দে কোন কদর্থ যোজনা করি, অর্থাৎ উহাতে শ্বেতকুষ্ঠাদি রোগার্থ যোজনা করি, তাহা হইলে কি ইংরাজেরা ঐ শব্দ পরিত্যাগ করিবেন? কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কোন পল্লীগ্রামে একটী মেলায় উপস্থিত ছিলাম, ঐ সময় একটি শব্দ উঠিল "সাহেব আসিয়াছে, সাহেব আসিয়াছে"—দেখিলাম, স্থানীয় কোন শ্বেতকুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত বালক ঐ স্থানে আসিয়াছে, এবং জানিলাম, উহার শ্বেতকুষ্ঠ থাকায়, সাধারণ লোকে উহাকে সাহেব বলে।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

—— •:০:• ——

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদার্শনিক সম্প্রদায় সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত; আস্তিক এবং নাস্তিক। আপাততঃ অনেকেই এই দুইটি শব্দের অযথা প্রয়োগ করিয়া কর্ত্তব্য-মার্গ হইতে অনায়াসলভ্য বিচ্যুতিপ্রাপ্ত হয়েন। প্রাচীন সময় হইতেই অস্তিত্ববাদীই "আস্তিক" বলিয়া কথিত এবং অস্তিত্বাপলাপকারীই "নাস্তিক" সমাখ্যায় আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। এখন এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের সহিত কোন্ পদার্থের সম্বন্ধ হওয়া সমধিক সঙ্গত, তাহাই বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। দার্শনিক মাত্রেই কোনও না কোনও পদার্থের যে কোনও একরূপ অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন; সুতরাং সামান্যতঃ অস্তিত্বাপলাপকারিত্ব কাহারও সম্ভব নহে। অতএব নাস্তিকসংজ্ঞারও প্রয়োগস্থল দুর্ল্লভ হইল। এইজন্যই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয়রূপে একটি বিশেষ পদার্থ নির্ব্বাচন আবশ্যক হইয়াছে। তাহা কি? ইহাই বিবেচ্য। এইস্থানে দুইপ্রকার মতবাদ বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত হইতেছে। কেহ বলেন, এই অস্তিত্ব ও তদপলাপের বিষয় ঈশ্বর। কেহ বা উহাকে পরলোক অথবা জন্মান্তর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যদি ঈশ্বরাস্তিত্বে অবিশ্বাসীর নাস্তিক সংজ্ঞা হয়, তবে কপিল, জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিক-মহর্ষিগণও ঈশ্বরাঙ্গীকার না করায়, তাঁহাদিগকেও নাস্তিকসংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন হইবে। শাস্ত্রে কোনও স্থানে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ এবং নিন্দা করা হয় নাই; সর্ব্বত্রই অতি বিশদ-ভাবে সাংখ্য এবং মীমাংসক-মত বহুমানে আদৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। মীমাংসা-রচয়িতা মহর্ষি জৈমিনি মহোদয়কে "নাস্তিক" বলিলে, বেদোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান-রূপ আর্য্যাচারও নাস্তিকতার পরিপোষক গণ্য হইয়া উঠে এবং ঐরূপ সাংখ্যাচার্য্য কপিলদেবকে "নাস্তিক" নামে অভিহিত করিলে, পবিত্র যোগতন্ত্রেরও ঐ পথের পথিক হইতে হয়। আবার সেই সেই মতের অনুষ্ঠাতৃগণ সাধু, ধার্ম্মিক, যোগী প্রভৃতি নামে কথিত না হইয়া "নাস্তিক" নামে খ্যাত হওয়াই যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধহয়। তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে যে "নাস্তিক-নিন্দা" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংখ্য-মীমাংসাদিতেও প্রযুক্ত হইত। যখন ইহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না তখন তাঁহাদিগকে ঈশ্বর-স্বীকার না করিবার জন্য "নাস্তিক" বলা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; বিশেষতঃ সাধারণ্যে অবিসম্বাদরূপে তাঁহাদের মতবাদ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত

হইতেছে; সুতরাং প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এরূপ কপোলকল্পিত মত নিরাস করিবার আবশ্যকতা দেখিতে পাইনা। পরন্তু সাংখ্য ও মীমাংসামতে ঈশ্বরানঙ্গীকার যে ঈশ্বর-সত্বা-অস্বীকার নহে, তাহা পরে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায়েরই নাস্তিকাখ্যা দেওয়া প্রমাণসঙ্গত বলিয়া অবধারণ করা যাইতে পারে; কেননা, সকল আস্তিকদর্শনেই তাঁহাদের মত নিরসনকালে তাঁহারা যে জন্মান্তরাস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিলেন, একথা উল্লিখিত হইয়াছে। দেহাতিরিক্ত আত্মার বিদ্যমানতাও তাঁহারা অনেকে অস্বীকার করিতেন। সকলস্থানেই এরূপ মতের নিন্দাবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতাবলম্বিগণও তৌষ্টিক, প্রাকৃত, লোকায়তিক প্রভৃতি নিন্দিত নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিকে 'মুক্ত্যা-ভাস' বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। কপিলাদি আচার্য্যগণ জন্মান্তরস্বীকারে বদ্ধ-পরিকর, কাজেই তাঁহারা "নাস্তিক" নহেন। কোনও ব্যক্তি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র আলোড়ন করিলেও, তাঁহাদের প্রতি কোন নিন্দাবাক্য প্রয়োগ দেখিতে পাইবেন না। পরিশেষে আরও একটি অভিমত আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাউক। অনেক আধুনিক দার্শনিকের অভিপ্রায় এই যে, যাঁহারা বেদের অসংশয়িত প্রামাণ্য স্বীকারে আপত্তি করেন না, তাঁহারাই "আস্তিক" ও বিরুদ্ধপক্ষ নাস্তিক। এপক্ষেও চার্ব্বাকাদিরই তাৎপর্য্যানুসারে নাস্তিক নাম যুক্ত; যেহেতু তাঁহারাই বেদের প্রামাণ্য পরীক্ষায় বিপরীত পক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। যদিও চার্ব্বাক সম্প্র-দায়ের কোনও ব্যক্তি "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" (আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন) এই শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক নিজের "পুত্রাত্মবাদ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন * এবং অপর চার্ব্বাক "সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়:" এই বেদবাক্যের বলে নিজের অভিমত দেহাত্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন,† তথাপি তাঁহারা উহার সর্ব্বাংশের প্রামাণ্যবাদে অনুমোদন করেন না। আংশিক প্রামাণ্য স্বীকার একটি উপহাসের সামগ্রী। কোনও একটি বেদবাক্য অসংশয়-প্রমাণ, আবার কোনও একটি অপ্রমাণ, এরূপ স্বেচ্ছামূলক বিশৃঙ্খল বাক্য বালকের অনর্থক আব্দার বলিয়া দার্শনিকেরা উপহাস করিয়াছেন। ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন মিথ্যাবাদীর অপর একটী বাক্যও মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ "প্রত্যগস্থূলোঽচক্ষুরপ্রাণোঽমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ" ইত্যাদি শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার না করায়, "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" ইত্যাদির প্রামাণ্য স্বীকার করা হইল না। এই দুইটিই বেদবাক্য; ইহার

* অতিপ্রাকৃতস্তু আত্মা বৈ জায়তে পুত্র ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্নিব স্বপুত্রেঽপি প্রেমদর্শনাৎ পুত্রে পুষ্টে নষ্টেঽহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাদ্যনুভবাচ্চ পুত্র আত্মেতি বদন্তি। বেদান্তসারঃ।

† চার্ব্বাকস্তু সবাএষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদি শ্রুতেঃ প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্যাপি স্বস্য নির্গমদর্শনাৎ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ স্থূল শরীরমাত্মেতি বদতি। বেদান্তসারঃ।

একটি ভুল এবং অপরটি সত্য বলিয়া অবধারণ অসঙ্গত; কেননা, যে কোনওটি বেদবাক্যকেই না কেন ভুল বলি, তাহাতে বেদবাক্যের ভুল বলা হইল। অন্যটিও যখন বেদবাক্য, তখন বেদবাক্যের ভুল বলায় স্বেচ্ছাক্রমেই ইষ্টসাধক অভিপ্রেত সেই বেদবাক্যটিকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। সুতরাং যেটিকে সত্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাহার সেই সত্যতা মনোরথমাত্রে পর্য্যবসিত হইল বলিয়া নিজের প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের বাধ নিজে দেখিয়াও মৌনাবলম্বন করিতে হইল। উচ্চারক পুরুষের দোষ ও গুণ বাক্যে সংক্রমণ প্রাপ্ত হয়। বেদকে যদি অপৌরুষেয় বলা হয়, তবে তাহাতে পুরুষগত দোষ-সংস্পর্শ থাকা সম্ভব নয়। তাহা হইলে একটি বেদবাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে, অপরটি কোন দোষ না থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহার গূঢ় রহস্য বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা বেদকে পৌরুষেয় বলিয়া মানেন, তাঁহাদের মতে উহা ঈশ্বর-প্রণীত। অশেষ-বিজ্ঞাননিধি ভগবানের রচিত বেদে একদিকে ভ্রম ও অপরদিকে সত্যতা অনুমান করিলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের উপরও আপত্তি হইয়া উঠে। কাজেই ঈশ্বরত্বও বাঙ্মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া বস্তুতঃ অন্তঃসারশূন্য একটি জিনিষ হইয়া পড়ে। মহামতি চার্ব্বাক ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করুন, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি একই বেদবাক্যরূপ বস্তুর উপর পরস্পর-বিরুদ্ধ প্রামাণ্য এবং অপ্রামাণ্য এই ধর্ম্মদ্বয় আরোপ করিয়া বাস্তবিক বেদ-প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন না। আমরা ইহাতেই তাঁহাকে "নাস্তিক" সমাখ্যায় ভূষিত করিয়া বিশ্রাম করিলাম।

কপিল জৈমিনি প্রভৃতি বেদকেই অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেদ-প্রমাণের অবধারণার্থে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়া বেদানুরাগিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিতে নিরস্ত হইলাম। নাস্তিক-দর্শনের সমালোচনার সহিত এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই স্থলেই উহা পরিত্যক্ত হইল।

এখন ভারতীয় আস্তিক দর্শনের একটু আলোচনা করা যাউক। ভারতে আস্তিক-দর্শনের বিভাগ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তরমীমাংসা (বেদান্তদর্শন) কণাদ-দর্শন (বৈশেষিক) অক্ষপাদদর্শন (গৌতমকৃত ন্যায়) নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিলকৃত-সাংখ্যদর্শন) সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল বা যোগদর্শন)—এইরূপে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাননীয় মাধবাচার্য্য রামানুজ দর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশ-পাশুপতদর্শন, শৈবদর্শন, রসেশ্বরদর্শন প্রভৃতি আরও অনেক আস্তিক দর্শনের নামোল্লেখ এবং তাহাদের মত পৃথক্ পৃথক্ রূপে স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে আস্তিক-দর্শনের পূর্ব্বোক্ত বিভাগ অনুপপন্ন হইল কি না, তাহা এখানে বিচার্য্য নয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহারা স্বতন্ত্র দর্শন নহে,

ষড়দর্শনেরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই সকল দর্শনের কোনও কোনও ভাষ্যকারের মত ও তৎশিষ্যগণের বিভিন্ন মত সকলই উহাদের উৎপত্তির কারণ। রামানুজদর্শন বেদান্ত-দর্শনের শ্রীভাষ্যের (রামানুজকৃত) মতসংগ্রহ। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনও মাধ্বভাষ্যের (আনন্দতীর্থরচিত) মতসংগ্রহ। জীবাণুত্ব প্রতিপাদন করায়, ইহাকে কেহ অণুভাষ্য বলেন। কেহ বা মাধ্বভাষ্যের কতকাংশকে অণুভাষ্য কেহ বা আনন্দতীর্থ-বিরচিত ভাষ্যকে অণুভাষ্য নাম দিয়া অংশ-বিশেষকে মাধ্বভাষ্য বলেন। ফলতঃ এইরূপে উহাদিগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করা যাইতে পারিবে। এই ষড়দর্শনের প্রত্যেকের বিষয় এখানে সম্যক্‌প্রকারে আলোচিত হইবে না, তবে সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য অপর পাঁচটি আস্তিক দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের কিরূপ সম্বন্ধ অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সেই প্রসঙ্গে গৌণরূপে অপর পাঁচটি দর্শনের কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যমত নির্ব্বাচন আবশ্যক।

সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্বও বর্ত্তমান সময়ে প্রমাণ-সাপেক্ষ পদার্থ; কারণ উহাতে বহুকাল হইতেই নানাবিধ মতভেদ রহিয়াছে। সাংখ্যপ্রণেতা কপিলাচার্য্যের সম্বন্ধেও বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। অগ্রে আমরা কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শনের বিষয় প্রমাণ করিয়া পরে কপিলদেবের পরিচয় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। "সাংখ্যপ্রবচন" নামে ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কপিল-রচিত একখানি সাংখ্যদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহাত্মা বিজ্ঞানভিক্ষু এই গ্রন্থের ভাষ্যকার। তিনি এই গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অপর একখানি "সাংখ্যতত্ত্বসমাস" নামক কপিল-বিরচিত সাংখ্যদর্শন পাওয়া যায়; ঐ খানি সাংখ্যপ্রবচনের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া ভাষ্যকার অবধারণ করেন। "অথাতস্তত্ত্বসমাসঃ" "অষ্টৌপ্রকৃতয়ঃ" ইত্যাদি কএকটি মাত্র সূত্রে এই ক্ষুদ্র-কলেবর গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। ইহাতে পর-মত নাই; কেবল সাংখ্যদর্শনকারের স্বীকৃত পদার্থ-তত্ত্বই কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার ইহাকে সাংখ্যপ্রবচনের মূল বলিয়াছেন। ইহাতে যাহা বিষয় আছে, তাহাই পরমতোল্লেখপূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা সাংখ্যপ্রবচনে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনের পৌনরুক্ত্যাশঙ্কায় সংক্ষেপ ও বিস্তার বলিয়া তত্ত্বসমাস ও প্রবচনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন।* আরও বলিয়াছেন, কপিল-কৃত সূত্রেরও যোগদর্শনের ন্যায় "সাংখ্যপ্রবচন" সংজ্ঞা উপযুক্ত। তাঁহার বচন-রচনা দর্শনে অনুমান করা যায়, এ গ্রন্থখানি কপিলাচার্য্য শিষ্য-বুদ্ধি-সৌকর্য্যার্থে প্রণয়ন করেন। দেখিতেও পাওয়া যাইতেছে, এ গ্রন্থে কোনও একটি বিষয়ের যুক্তি দিয়াই নিরস্ত হওয়া হয় নাই। পুনঃ পুনঃ এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা যথাসম্ভব

* ননু এবং তত্ত্বসম সাখ্য সূত্রৈঃ সহাস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ পৌনরুক্ত্যং ইতি চেন্মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তাররূপেণো-ভয়োরপি অপৌনরুক্ত্যাৎ॥ সাংখ্যপ্রবচনে ভাষ্য-ভূমিকা॥

সহজ বোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উপনিষদে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, একই আত্মজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন রূপে বারম্বার বলা হইয়াছে। কেননা, একবার মাত্র শ্রবণ করিয়া শিষ্য গুরুবাক্যের অখিল-তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারে না; সুতরাং উপদেশ-বাহুল্যের আবশ্যকতা আছে। এ গ্রন্থে সেই সুচারু রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে।

আপত্তিকারীগণ বলেন, সাংখ্যপ্রবচন এবং তত্ত্বসমাস, ইহার একখানি গ্রন্থকেও কপিলাচার্য্য-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। প্রমাণ ব্যতীত কোনও পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে, জগতের প্রমাণ-ব্যবহার আপাততঃই লোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব উহার প্রমাণ আবশ্যক। আমরা উহার কপিল-প্রণীতত্ব বিষয়ে কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হই না; পরন্তু উহা যে কপিল-রচিত নয়, তাহারই বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কপিল অতি প্রাচীন কালে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সাংখ্যদর্শন তৎপরবর্ত্তিগণের পরিচিত হওয়া বিশেষ সম্ভব। সাহিত্য স্মৃতি ও বেদান্তাদি শাস্ত্রের যে সমস্ত গ্রন্থকারগণ কপিলদেবের পরবর্ত্তীরূপে নিশ্চিত, তাঁহারাও কপিলাচার্য্যের সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের সংবাদ রাখেন না। পরন্তু সকলেই সাংখ্য-মত সংগ্রহে ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত কারিকাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। প্রথমে দেখা যাইতেছে, মাঘ-প্রণীত শিশুপালবধ কাব্যের ১ম সর্গে ৩৩ শ্লোকে

(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহর্ষি নারদের উক্তি ঐ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)

সাংখ্যমতে আশঙ্কা করিয়া—সেই মতাবলম্বনেই সমাধান করা হইয়াছে। সেই শ্লোকটি এই—"উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈর্গৃহীতমধ্যাত্মদৃশা কথঞ্চন। বহির্ব্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথগ্বিদুঃ, পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥" ইহার অর্থ এই যে, পুরাতত্ত্বজ্ঞ কপিলাদি নিগৃহীতচিত্ত যোগিগণের অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারা কথঞ্চিৎ গৃহীত, বিকার-বহির্ভূত, প্রকৃতি হইতেও পৃথক্, উদাসীন, পুরাণ পুরুষ বলিয়া তোমাকেই জানেন। প্রথমতঃ নারদ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন "ত্বমেব সাক্ষাৎ করণীয় ইত্যতঃ, কিমস্তি কার্য্যং গুরু-যোগিনামপি।" (অর্থাৎ তুমিই সাক্ষাৎকরণীয়, ইহাপেক্ষা যোগিগণেরই বা মহৎ কার্য্য কি আছে?) এখানে আশঙ্কা হইতেছে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকই যোগিগণের চির প্রসিদ্ধ শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার অপেক্ষিত হয় না; কারণ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং প্রকৃতি—কিছুই নহেন। মহর্ষি এই অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার সারবত্তা নাই, ইহাই দেখাইতে এই শ্লোকে বলিতেছেন, তাঁহাকেই কপিলাদি আচার্য্যগণও প্রকৃতির অতিরিক্ত পরম পুরুষ বলিয়া থাকেন। টীকাকার শব্দশাস্ত্রপারীণ মল্লীনাথ সূরি মহোদয় ব্যাখ্যায় সাংখ্যাচার্য্যানুমোদিত এবং পুরুষাদিতত্ত্ব প্রতিপাদক "কারিকা"-বাক্য (মূল প্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রকৃত্যাদি-প্রতিপাদক সাংখ্যপ্রবচন

ও তত্ত্বসমাসের কোনও সূত্র উল্লেখ করেন নাই। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইল, প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকেরা "কারিকার" সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু সাংখ্যপ্রবচন ও তত্ত্বসমাসের তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এখন দেখা যাউক, নবীন স্মার্ত্তসম্প্রদায়ের অভিমত কি? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত তিথিতত্ত্বে বৈধহিংসা-বিচার প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সাংখ্যমতের সহিত গুরু-মতের বিরোধ উপস্থিত হয় দেখিয়া, তত্ত্বকৌমুদীর হিংসা-বিচার-স্থল উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। স্মার্ত মহাশয় সেখানেও সাংখ্যমত লিখিতে গিয়া অনন্যোপায় হইয়া কারিকার টীকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্ত-শাস্ত্রের অনুসন্ধান এবিষয়ে কতদূরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, তাহা একবার আলোচিত হউক। বেদান্তদর্শনের ১অ ৩পা ১১সূ ভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্কর "মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ" এই কারিকাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার সহিতও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের পরিচয় নাই। ভগবদ্গীতায় অষ্টাদশাধ্যায়ের "ত্যাজ্যং দোষবং বদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ" এই তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধি-ক্ষয়াতিশয় যুক্তঃ।" এই কারিকারই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কপিল-প্রণীত গ্রন্থের খোঁজ রাখেন না। বাচস্পতি বেদান্তদর্শনের শাঙ্করভাষ্যের "ভামতী" নাম্নী যে টীকা রচনা করেন, তাহাতেও "কারিকা" দ্বারা সাংখ্য-পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে; তাঁহার ভাগ্যেও কপিল-প্রণীত সাংখ্যগ্রন্থের দর্শন লাভ ঘটে নাই, তাহাহইলে তিনি অন্ততঃ একস্থানেও উহার উল্লেখ করিতেন।

অশেষ-ধিষণ মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" অপরাপর দার্শনিক মতের ন্যায় কপিলাভিপ্রেত নিরীশ্বর সাংখ্যমতও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃত্যাদি পদার্থ-প্রতিপাদক-প্রমাণ বলিয়া কারিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচনের কথা দূরে থাকুক, কপিল-প্রণীত গ্রন্থেরই আদৌ উল্লেখ নাই। জৈমিনিদর্শন নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে তাহার প্রথম সূত্র "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এবং যোগ-দর্শন নির্ণয় প্রস্তাবে তাহার প্রথম সূত্র "অথ যোগানুশাসনং" ও কণাদ-দর্শন-নিরূপণে "অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ" এই আদিম সূত্র ও গৌতম-দর্শনাবধারণ সময়ে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শপদার্থ সংগ্রাহক তাহার প্রথম সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। সামান্যতঃ গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়াদির আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য-দর্শনে সে রীতির অনুসরণ আদৌ উপেক্ষিত হইয়াছে। এখানে কারিকাদ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে বাচস্পতিমিশ্রের মতও অবলম্বিত হইয়াছে। "নিরীশ্বর-সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিলানুসারিণাং মতমুপন্যস্তং" এই বলিয়া পরিশেষে প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন। ফলতঃ কারিকা অনেকস্থলে উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সূত্রোল্লেখ দূরের কথা, তাহাদের নামও প্রাচীন কোন গ্রন্থকারের প্রতিগত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অনুমান করা যাইতে

পারে, ইহা পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও মনীষা-প্রসূত। উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা যখন স্বেচ্ছায় উহা কপিলদেবের নামে প্রচারিত করিয়া শান্তি পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রকৃত পরিচয়াদি অবগত হইতে চেষ্টা করিলে, সমীচীন ফল লাভ করা সম্ভব বোধ করি না। যখন মাধবাচার্য্যাদির সময়েও সাংখ্যপ্রবচন প্রচারিত ছিল না, তখন উহাকে আধুনিক বলিয়া অবধারণ করাই সঙ্গত হইতেছে। ঐ সাংখ্যপ্রবচনে সর্ব্বজনজ্ঞাত সাংখ্যসিদ্ধান্তের বহির্ভূত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এবিষয় গুলির আন্দোলনে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাংখ্যাচার্য্য কপিল-প্রণীত কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু যাহা সাংখ্য-প্রবচন নামে অধুনা জনসমাজে পরিচিত, তাহাও কারিকার এক একটি অংশকে সূত্রাকারে স্থাপন এবং ব্রহ্মসূত্রাদির দুই একটিকে কিঞ্চিৎ বিকৃতরূপে ব্যবস্থাপন দ্বারাই রচিত। মধ্যে মধ্যে স্বকপোল-বিরচিত দুই একটি যুক্তি প্রমাণাদি এবং অভিনব তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সূত্রও গ্রন্থকার ইহাতে সন্নিবেশিত করিতে মনোযোগ করিয়াছেন। এখানে আরও বলবত্তর প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গৌড়-পাদস্বামী একজন দার্শনিক সমাজে সুপরিচিত লোক। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই অনুমান করা হইয়া থাকে। তিনিও সাংখ্যকারিকার এক-খানি "ভাষ্য" প্রণয়ন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঐ গ্রন্থ দুর্লভ না হইলেও, উহা অদ্যাপি অনুসন্ধানাভাবে অনেকের দৃষ্টিপথ অলঙ্কৃত করে নাই। মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা গৌড়পাদ-প্রণীত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ কারিকার "ভাষ্য" প্রণয়ন করিয়া উহাকে গৌড়পাদের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতেই গৌড়পাদকে পূর্ব্বকালীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। গৌড়পাদ সাংখ্যপ্রবচনের কোনও সংবাদ রাখিতেন, এরূপ তাঁহার ব্যাখ্যায় প্রকাশ নাই। ইহাহইতে শঙ্করের পূর্ব্বেও কারিকারই প্রচ-লন প্রমাণীকৃত হয়, এবং তৎকালেও কপিল-বিরচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, এরূপ অনুমান করা যায়। কারিকা-ব্যাখ্যানে বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অপর সাংখ্যপ্রবচন অথবা তত্ত্বসমাসের অস্তিত্বশঙ্কাও লোকের মনে উদিত হয় না। কারিকার সাংখ্যমত বিবেচিত হইলে আশঙ্কা হইল, "এখানি প্রকরণ গ্রন্থ মাত্র, সাংখ্যশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ অর্থাৎ আচার্য্য-রচিত কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কি না?" বাচস্পতি মহাশয় সেই শঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন "নেদং প্রকরণং" "অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা প্রকরণ গ্রন্থ নয়। ইহাই "শাস্ত্র"। যদি সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-প্রণীত গ্রন্থ বিদ্যমান রহিত, তবে তাহাদেরই "শাস্ত্র" নামে উল্লেখ করা হইত। ইহাকে "প্রকরণ" অথবা "সংগ্রহগ্রন্থ" বলিলেই চলিত। কপিলাচার্য্য সাংখ্যতত্ত্ব শিষ্যকে বলিয়াছিলেন মাত্র। তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন না বলিয়াই আপাততঃ মনে করা যায়। মতপ্রবর্ত্তক গুরু বলিয়াই কপিলদেব সর্ব্বত্র

পরিচিত; গ্রন্থকার বলিয়া নহে। যদিও কপিল গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তবে সময়ের স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইলে, কারিকাই তৎস্থান অধিকার করিয়াছে। সাংখ্য ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য ভাষ্য ভূমিকায় সাংখ্যশাস্ত্রের কালগ্রাস বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বাক্যের দ্বারাও আরও সাংখ্যশাস্ত্রের "কলাবশেষ" অবগত হওয়া যায়। তিনি উহাকে বাক্যামৃতে পূর্ণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। * তাঁহার বাক্য বুঝাইয়া দিতেছে, কপিলাচার্য্য-প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। যাহা অপর সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থ আছে, তাহা অপরিচিত বলিয়া উহার দ্বারা শাস্ত্রের বিদ্যমানতা প্রমাণ হয় না। তবে তন্মতের প্রতিপাদক বলিয়া উহাকেই "কলাবশেষ" বলা হইয়াছে। নচেৎ মূল-আচার্য্য-রচিত দুইখানি গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে প্রকরণ-গ্রন্থাদির বিনাশে "সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত" একথা সঙ্গত হয় না। সুতরাং উহার তাৎপর্য্য মূলগ্রন্থের বিলোপ প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, "তবে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিলেই অনুমিত হইবে, ঐ গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া স্বীকার করিয়া তিনি ইষ্টসিদ্ধির একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সূত্র অবলম্বন না করিলে, তিনি ভাষ্যকার শঙ্কর এবং তত্ত্বকৌমুদীর বাচস্পতির মতে দোষারোপ করিতে সুযোগ পাইতেন না। সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিল-প্রণীত বাক্যাবলম্বনে কোনও মতবাদ প্রচার করিলে, তাহার অপ্রামাণ্য-শঙ্কা হয় না; এই বিশ্বাসই তিনি মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করেন। তদনুসারে সাংখ্য-প্রবচনেই তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অমোঘ সুযোগ লক্ষিত হয় দেখিয়া, উহাকেই কপিল-রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। গ্রন্থকারও কপিল-রচিত গ্রন্থ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া তৎপূর্ব্বেই ঐ গ্রন্থ কপিলের নামে প্রচার করেন। অনিরুদ্ধ প্রভৃতি দুই একজন লোক ইত-পূর্ব্বে সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় ঐ অভিনব কাপিল গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা এবং উহা কপিলাচার্য্য-রচিত বলিয়া স্বীকার করিয়া যান। শঙ্করের মতে দোষার্পণ করিলে অনেকদিন জগতে পরিচিত থাকা যাইবে, হয়ত এই প্রলোভনে এবং সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার স্বার্থ-পিপাসায় বিজ্ঞান উহা বুঝিতে পারিয়াও কপিলের নামে প্রচার করিলেন। স্বার্থসিদ্ধিতে মনুষ্য অন্যরূপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সত্য তাহার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত হয় না। তজ্জন্যই বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য তিনি গোপন করিতে পারিলেন না। 'সাংখ্যশাস্ত্রের লোপ' তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইল। অতএব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করা যাইতে পারে, কপিলদেব হয়ত গ্রন্থ রচনা করেন নাই; করিলেও তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনাদির সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। পূর্ব্বপক্ষের যুক্তির এইখানেই বিশ্রাম, সুতরাং এইখানেই পূর্ব্বপক্ষের অবসান করা হইল।

(ক্রমশঃ)

যশোহর–ব্রহ্মচারি-আশ্রম। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ।

---

* কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং। কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥ সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য।

GOSPEL OF WORK.

1. Hearken unto me, ye sons of Ind: in work and work alone lies your salvation.

2. Are you slaves or freemen? If slaves, sit idle; if freemen, work.

3. Verily by work alone, your fathers made India what it was; work ye too and be worthy of them.

4. Work while there is yet life; for death is before you.

5. Work; for everything is working, above you, below you and around you.

6. Work; for work is the best worship you can render to God

7. Work to-day; and to-morrow will take care of itself.

8. Work in this life; and your after-life will take care of itself.

9. Despise not any work, howsoever mean the fool may call it; for all work is divine.

10. Work, be it with the pen or the plough.

11. Work, be it with the brain or the muscle.

12. Work, even if it be as a sweeper in the street.

13. Work, be it as a master or a servant,.

14. Work; and be not a burden on others, even if they be your friends and relations.

15. Beg not, nor encourage idle beggars.

16. Work; for work is life and idleness death.

17. Work, for life is real.

18. Work, for only the fool thinketh that life is unreal.

19. If to-morrow is real, to-day must be real; therefore work.

20. If the after-life is real, this life must be real; therefore work.

21. The unreal can not lead to the real; therefore work.

22. As you sow, so shall you reap ; therefore work.

23. As you work, so shall you be ; therefore work.

24. Work like freemen, and curse not your fates like slaves.

25. Work not for yourself alone, but work for others as well.

26. Bring joy where there is sorrow, peace where there is discord, light where there is darkness, wealth where there is poverty ; and work.

27. Relieve the poor and the suffering ; and work.

28. Enrich your country by trade commerce, and industries; and work.

29. Work; and depend not upon foriegn lands even for bare necessaries of life.

30. Brave the perils of the sea and hardships of the mountain; and work.

31. Forget the wrong done to you ; and work even for the wrong-doer.

32. Be truthful, honest and diligent ; and work.

33. Work ; and let not evil thougths enter your head.

34. Work, so that thly limbs may not rust.

35. Work ; and shun gossips and scandals.

36. Work; and coperate with others in all their good works.

37. Work ;and be not jealous or malicious.

38. Work; and build not airy castles.

39. Work; and carp not at others

40, Work; and have an ideal to work at.

41. Work; and let neither caste, colour nor creed stand in they way of doing good work..

42. Be pure in body, mind and speech, and work

43. Be strong in body and mind; work.

44. Work, but practise meditation also, so that you may work. the better

45. Respect your superiors, be kind to your inferiors ; and work.

46. Be a good father, a good brother, a good son and a good husband ; and work.

47. Be loyal to your sovereign ; and work.

48. Be a good citizen; and work.

49. A lter, if you can, but obey the law, bad though it may be; and work.

50. Control thy evil passions ; and work.

51. Be neither an ascetic, nor an epicurean, but keep to the middle path ; and wor k.

52. Be kind, loving and gentle ; and work.

53. Be prayerful but not showy ; and work.

54. Be a brother to all men ;and work.

55, Be not cruel to mute creation ; and work.

56. Work, but covet not thy neighbour's wealth.

57. Let forms of religion take care of themselves ; the essence of all religion is work

58. Work ; for mere words bring not salvation.

59. Work ; God loves not flattery.

60. Protect the weak ; and work.

61. Resist the oppressor ; and work.

62. Work ; but set not your heart on reward or praise or honour.

63. Do you to others as you would others do to you; and work,

64. Whatsoever your hands find to do, do it with all thy might.

65. Work, for man best fulfils the mission of life by work,

66. Work; but be guided by the light that has been given unto you,

67. Work; but work out the means as if they were the end.

68. Work; and let the fruit take care of itself

69. Work with heart within and God overhead.

70. Work; and live a godly life; aye, be a god yourself.

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবেষচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ য়ঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামঃ মোঘং পার্থ সজীবতি॥

কর্ম্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূ মাতে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি॥

কর্ম্ম হৈব তদুচতুরথ যৎ প্রশশংসতু
কর্ম্ম হৈব তৎ প্রশশংসতু পুণ্যো বৈ
পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেনেতি॥

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা।	কার্ত্তিক।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

বৈরাগ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পরিদৃশ্যমান জগতের নশ্বরতা এবং জাগতিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অসারতা ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রলোভন ও আসক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা এই শোক-দুঃখময় সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ। সংসারের আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন, আবির্ভাব এবং তিরোভাব, অভ্যুত্থান এবং অধঃপতন সন্দর্শনে স্বতঃই ভৌতিক জগতের নশ্বরতা এবং তৎপ্রসূত সুখের অনিত্যতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব ভাব কল্পনা-বেলা-ভূমি অতিক্রম করিয়া, প্রবলবেগে মানসক্ষেত্রে যাইয়া আঘাত করে। কল্য যাঁহাকে মহৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, গুণরাশি-বিভূষিত, অগণন নরনারী কর্ত্তৃক পূজিত হইতে দেখিয়াছি; অদ্য তাঁহার নয়নরঞ্জন চিত্তবিনোদন বদন-কমল আর নেত্রগোচর হয় না; যে ব্যক্তি এক সময়ে কুবেরের ন্যায় ধনপতি ছিলেন, যাঁহার অট্টালিকা সর্ব্বদা লোক-কোলাহলে পরিপূর্ণ,—সঙ্গীতলহরী এবং বংশিধ্বনিতে মুখরিত থাকিত, যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের ভিখারী হইয়া শতশত লোক বাটীর বহির্ভাগে অবস্থিতি করিত, কালের কুটিলচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া অদ্য তিনি মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্য পরমুখাপেক্ষী! কল্য যে নয়নাভিরাম কুসুম, তাহার অনুপম রূপলাবণ্যের গৌরত্ব হেলিয়া দুলিয়া, প্রেমিক এবং কবিকে তাহার পবিত্র সান্নিধ্যে যাইবার জন্য অস্ফুট মধুর আহ্বান করিত, অদ্য তাহার সে প্রফুল্ল বদন শুষ্ক হইয়াছে; আর যে সেই কুসুমাবলীর হার পরিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল, অদ্য সে তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে।

কুসুমের সে সুবাস নাই, সে লাবণ্য নাই, সুতরাং তাহারও তজ্জনিত মনোসুখ তিরোহিত হইয়াছে। যে বিটপী উন্নত মস্তকে স্পর্দ্ধাসহকারে সকল বৃক্ষের উপর নিজ শির তুলিয়া, শতবর্ষ পর্য্যন্ত নানা আবর্ত্তনের মধ্যে স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, হঠাৎ প্রভঞ্জনের ভীম আক্রমণে সে নতশির—ভূতলশায়ী! আর বিহঙ্গকুল তথায় বিশ্রামলাভ করিবার জন্য আসে না, পথশ্রান্ত পথিক আর তাহার সুশীতল ছায়ায় ক্লান্তি অপনোদন করিতে পারে না। সাংসারিক সকল সুখই এইরূপ ক্ষণস্থায়ী; কেন না জগতের সকল বস্তুই নশ্বর। পিতা-মাতার স্নেহ, গুরুজনের অনুগ্রহ, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসা, প্রণয়িনীর প্রেম, প্রতিবাসীর মমতা, শিশুদিগের স্নেহ-স্নিগ্ধ অস্ফুট অমিয়-বাক্যাবলী; ধন-জন, জীবন-যৌবন, সকলই ক্ষণস্থায়ী—দুদিনের জন্য; কালের অতল গর্ভে সকলই ডুবিয়া যাইবে। এইরূপ ভাব যখন মনকে দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়া বসে, তখনই তাহার নিভৃত কন্দর হইতে আপনিই প্রশ্ন হয়, আমি কে? কোথা হইতে আসিলাম? আমার গন্তব্য স্থানইবা কোথায়? আমার হস্ত-পদাদি কি আমি? কই, হস্তপদাদি নষ্ট হইলেও ত আমার 'আমিত্ব' যায় না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কি কেবল পরমাণু-সমষ্টি,—না, ইহার অন্তরালে কোনও চৈতন্যরূপিণী শক্তি আছে? জীবনধারণ কি কেবল উদর পূরণের জন্য, না ইহার কোন মহত্তর উদ্দেশ্য আছে? এই সকল তত্ত্ব বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেই আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবে; আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মই এক মাত্র সৎ পদার্থ বলিয়া অনুমিত হইবে। ভৌতিক জগৎ নশ্বর। আত্মজ্ঞান জন্মিলে সংসার-বন্ধন ঘুচিবে এবং মুক্তিলাভ হইবে।

সংসার-হৃৎ কঃ প্রজিতাত্মবোধঃ
কোমোক্ষহেতু কথিতঃ স এব।

(মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি লাভ করাই মানব-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। মুক্তি কি? বিষয়-বিরাগই মুক্তি।

কা বা বিমুক্তির্বিষয়ে বিরক্তিঃ। (মণিরত্নমালা)

এই মুক্তি এবং প্রকৃত বৈরাগ্য—একই কথা।

বৈরাগ্য কি? বিষয়ে অনাসক্তিই বৈরাগ্য। রঞ্জ্ ধাতুর অর্থ—ভালবাসা (আসক্তি) বি উপসর্গের অর্থ—বিগত, শূন্য। আসক্তি-রাহিত্যকেই বৈরাগ্য বলে; কিন্তু এই আসক্তি-রাহিত্য অর্থে বিষয়-আসক্তি-রাহিত্য বুঝিতে হইবে; কারণ সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইলে ব্রহ্মেও আসক্তিশূন্য হইতে হয়। সম্পূর্ণ বৈরাগ্য অসম্ভব ও অসহনীয়। বিষয়ে-অনাসক্তি এবং ব্রহ্মে সম্পূর্ণ আসক্তিই প্রকৃত বৈরাগ্য। আত্মজ্ঞান

বা ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি লাভ হয়না, এবং বিষয়-আসক্তি শূন্য না হইলেও সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না; সুতরাং বৈরাগ্য অবলম্বনে মুক্তিলাভ এবং তদ্ধেতু আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভৌতিক শক্তির প্রভাবে সাংসারিকতা বা সংসার-প্রবণতাই প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে গণ্য, এবং বৈরাগ্য উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তুমি বলিবে, সংসারে থাকিয়া লোকসেবা, দেশসেবা, পরহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান করা কি ধর্ম্ম বা মহৎকার্য্যের মধ্যে পরিগণিত নহে? ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, লুথার্, পার্কার্, লিভিংষ্টোন্, রিএঞ্জি, গারফিল্ড, কোম্‌ৎ প্রভৃতির দ্বারা কি পৃথিবীর মঙ্গল সংসাধিত হয় নাই? তুমি তোমার নিজের আত্মজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত, তোমার দ্বারা সংসারের কোন্ উপকার হইবে? এতদুত্তরে এই বক্তব্য যে, লোকসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি মহৎকার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মারা সকলেই সংসারের অল্প-বিস্তর পরিমাণে মঙ্গল করিয়াছেন, তাঁহাদের কৃত কার্য্যগুলি 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইতে পারে, কেননা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান এবং ধর্ম্ম, একই কথা। কিন্তু কোন বিষয়ে সমীচীনতা লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বৈরাগ্য সেই আদর্শ লাভের অনুকূল, সংসারাসক্তি তাহার প্রতিকূল; এইজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত মহাত্মাগণ দেবোপম চরিত্রের আদর্শ হইলেও পূর্ণ-আদর্শ তাঁহাদিগকে বলা যাইতে পারে না—তাঁহারা মুক্ত পুরুষ নহেন। মুক্তিলাভ করাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। সংসারে বিশেষরূপে লিপ্ত থাকা এই মুক্তি লাভের পরিপন্থী। সংসারে লিপ্ত থাকিয়া যিনি যতই সাবধান হইয়া চলুন্ না কেন, অনাহত শরীরে কেহই তথা হইতে প্রত্যাগত হইতে পারেন না। তুমি কি চতুর্দ্দিকে মল-মূত্র-পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভাবিতে পার, যে তুমি চন্দন-পরিবেষ্টিত রহিয়াছে? এই জন্য ঋষি-মুনিগণ বনে গমন করিয়া, পূর্ণ আদর্শ লাভ করিবার জন্য যোগরত হইতেন। যে পরিমাণে তুমি সংসার বা বিষয়-জড়িত, সেই পরিমাণে তুমি পূর্ণ আদর্শ হইতে—মানব-জীবনের একমাত্র আদর্শ হইতে—দূরে অবস্থিত। ইহাও নিশ্চয় জানিবে যে, যাঁহারা কোন মহৎ কার্য্য সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন, এবং চরিত্রের বিমল সৌরভে পৃথিবীকে বিমোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। যে সকল মহাত্মাদিগের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবে যে, সংসার তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী ছিলেন। সংসার-প্রবণতা এবং সৎকার্য্যানুষ্ঠান বা চরিত্রমাহাত্ম্য, ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ। বৈরাগ্যের আবশ্যকতা কি, তাহা নিম্নে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুক্তি লাভ করা মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য; সাংসারিকতা এই উদ্দেশ্য লাভের কণ্টকস্বরূপ।

"যস্য সাংসারিকা চিন্তা চিন্তা চিন্তামণেঃকুতঃ।"

যাহার সাংসারিক চিন্তা প্রবল, চিন্তামণির চিন্তা তাহার কোথা হইতে আসিবে? এই চিন্তামণির চিন্তাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা। সংসারের প্রতি অনাসক্তি না হইলে, তাহা সম্ভব নয়। আমাদের চিত্তের স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, একই সময়ে দুইটী বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ করা অসম্ভব। যে পরিমাণে এক বস্তুর উপর তোমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেই পরিমাণে অন্য বস্তুর প্রতি অনাকৃষ্ট এবং তাহা হইতে বিচ্যুত। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান আদর্শ; সুতরাং যে পরিমাণে তোমার সংসারাসক্তি থাকিবে, সেই পরিমাণে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভে বাঞ্চিত হইবে। এক বস্তুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হইলেই তদ্বিপরীত বস্তুর প্রতি তাহার তৎপরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন মন ব্রহ্ম-সাগরের অমৃতাস্বাদনে একেবারে নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, তখনই প্রকৃত বৈরাগ্য—তখনই মুক্তিলাভ—আত্মজ্ঞানলাভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই জাগতিক সকল পদার্থই নশ্বর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী; বিজ্ঞান-জ্ঞান-গর্ব্বিত যুবক এতদুত্তরে বলিবেন, পৃথিবীর কোন বস্তুই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং জাগতিক পদার্থের নশ্বরতা-বোধ-জনিত বৈরাগ্যের কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, জাগতিক বস্তু সকলের সম্পূর্ণ ধ্বংস না হইলেও, রূপান্তর হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই রূপান্তরই কি ফলিতার্থে ধ্বংস নহে? মনুষ্যদেহ ভস্মীভূত হইলে, সেই ভস্ম কালে মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। তবে কি ভস্ম হইবার জন্য এত বিড়ম্বনা, এত পাপ, এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ-ভোগ? যে ব্যক্তি সজীব মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট ছিল, সে কি ভস্মে বা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পুত্তলিকাতে, প্রকৃত বস্তুর ধ্বংস হয় নাই ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? ছিল তোমার সোনার দেহ, হল তাহা ভস্মরাশি বা মৃত্তিকা-স্তূপ; এই অবস্থান্তর বা রূপান্তর ভাবিলে, কে জাগতিক বস্তুর প্রতি—সংসারের প্রতি—বীতস্পৃহ না হন? এই ভীষণ অবস্থান্তরই দৃশ্যমান নশ্বরতা। যাহা ছিল, তাহাত আর নাই! সংসারের সকল বস্তুরই এই গতি; তাহাতে আসক্তি কেবল দুঃখের হেতু, সুতরাং তাহা পরিহর্ত্তব্য। এই আসক্তির পরিহারই বৈরাগ্যের নামান্তর মাত্র।

আসক্তিই সকল দুঃখের কারণ। কামনার চরিতার্থতা না হওয়া দুঃখ; সুতরাং কামনার অভাব বা অনাসক্তিই সুখ। কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হইলেও কামনা পরিতৃপ্ত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

ভোগে কামনার অবসান হয় না। ঘৃতাহুতিতে অনলের ন্যায় ভোগাহুতিতে কামনার

বর্দ্ধনই হয় যে বস্তুর প্রতি আমাদের আসক্তি জন্মে, সেই বস্তুই নিজের করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের প্রস্রবণ।

মমেতি মূলং দুঃখস্য ন মমেতি চ নির্বৃতেঃ।
শুকস্য বিগমে দুঃখং ন দুঃখং গৃহমূষিকে॥

"আমার" এই জ্ঞানই দুঃখের মূল, "আমার না" এই জ্ঞানই সুখের মূল; কারণ, পোষিত শুকপাখীর অভাব হইলে, তাহাতে দুঃখ হয়; গৃহ-মূষিকের অভাব হইলে হয় না। এই আসক্তির বিষময় ফল ইয়ত্তা করা যায় না। আসক্তি বলিলেই, সাধারণতঃ বিষয়াসক্তি বা সংসারাসক্তি বুঝা যায়। এই বিষয়াসক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর।

"বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্না বিষয়া একদেশহরং বিষং" ॥

(যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষু প্রকরণ।)

বিষয়-বৈষম্যই প্রকৃত বিষ; প্রকৃত বিষকে বিষ বলে না; কারণ, বিষ একজন্ম নাশ করে, বিষয় জন্মজন্মান্তর নাশ করে।

বিষয়-বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষয়-বিষ-বিমর্দ্দ-ব্যক্ত-দুশ্চেষ্টিতানাং।
বিরম বিরম চেতঃ! সন্নিধানাদমীষাং
সুখ-কণ-মণি-হেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ।

(শান্তিশতক)

হে চিত্ত! দোষরূপ উৎকট দন্তধারী বিষয়রূপ সর্প সকলের নিকট হইতে দূরে থাক; বিষয়-বিষ-সঙ্গে উহাদের মনের কুভাব ব্যক্ত করে; সামান্য সুখরূপ মণির জন্য চেষ্টা করিও না।

সাংসারিক সুখ এবং সাংসারিক বস্তুর প্রতি লোকের আসক্তি প্রবল; কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, সংসারের অধিকাংশ সুখই আবিলতা পরিপূর্ণ বলিয়া প্রতীত হইবে। ইহার অসারতা এবং ক্ষণভঙ্গুরত্ব যেমন ইহার প্রতি ঔদাস্যের কারণ, ইহার আবিলতা ততোধিক। সংসারের ধন, মান, যশ, আত্মীয়তা, ভালবাসা, যেমন অসার এবং ক্ষণভঙ্গুর, তেমনই পাপমিশ্রিত, এবং অনেক সময়ে পাপ-প্রবর্ত্তক। ধনোপার্জ্জন যাঁহারা করেন, তাঁহারা অনেকেই নীতি এবং সততার মাত্রা অতিক্রম করিয়া থাকেন; এবং অনেকে ইহার জন্য অতি জঘন্য—লোমহর্ষণ,—পৈশাচিক কার্য্যেও লিপ্ত হয়েন। ইহার লালসা প্রবল হইলে, পাপের পথ প্রশস্ত হয়; এই জন্যই অর্থকে অনর্থের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। (Gold is the canker

of the breast)। আমরা যাহাকে যশ বা মান বলি, তাহা অনেক সময়েই ঘৃণিত উপায়ের দ্বারা অর্জ্জিত। অল্পসংখ্যক স্থলে ভিন্ন, সাধারণতঃ ইহা অপাত্রেই প্রদত্ত হইয়া থাকে। অনেকে নিজের বা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া, ইহ-পরকালের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মানী বা যশস্বী হয়েন; আর যাঁহারা প্রকৃত মান বা যশ পাইবার উপযুক্ত পাত্র, তাঁহারা সংসারের কুটিল চক্রের আবর্ত্তনের সহিত নিজ মতামত, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিকে যথাযথ বিঘূর্ণিত করিতে পারেন না বলিয়া, যশ এবং মান তাঁহাদের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হয় না। সংসারের ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই স্বার্থ-গন্ধযুক্ত, এই জন্য স্থায়ী হয় না, কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা একেবারেই নিঃস্বার্থ, এই জন্য তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। *

সংসৃতির সকল সুখই সাপেক্ষ। ইহার দ্বারা বিমল প্রাণ-মনঃস্নিগ্ধকর সুখ লাভ হয় না; কেননা আসক্তি ইহার অন্তরালে রহিয়াছে। সাপেক্ষ সুখ নিকৃষ্ট জাতীয়। মনু বলেন,—

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ-দুঃখয়োঃ ॥

শাস্ত্র যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রকৃত বৈরাগ্য ভিন্ন তাহা কখনও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

"ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

সত্য, সন্তোষ, ক্ষমা, অচৌর্য্য, শরীর ও মনের শুদ্ধি, মনের অবিকার, ইন্দ্রিয়ের সংযম, অক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। যাঁহার কোন প্রকার আসক্তি নাই, অর্থাৎ যিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার সত্য অপলাপ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। যে সংসারবিরাগী, তাহার ক্ষমা-পক্ষেও কোন অন্তরায়ই দেখা যায় না। যাহার লোষ্ট্র-কাঞ্চনে তুল্যজ্ঞান, তাহার কখনও সন্তোষের অভাব হয় না। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, শরীর এবং মনের শুদ্ধি জন্মে, বিকার থাকে না, ইন্দ্রিয় সংযত হয়, ক্রোধ তাহার মনে স্থান পায় না। যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছে, পরমার্থজ্ঞান লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ঈদৃশ ব্যক্তির সহজেই তত্ত্বজ্ঞান এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যিনি সংসার-বিরাগী, তিনি শরীরের দ্বারা, মনের দ্বারা, এবং বাক্যের দ্বারা কখনও পাপাচরণ করেন না, এই জন্য তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন।

* Love is not love which alters when in alteration finds. (Shakespeare.)

যদা ন কুরুতে ধীরঃ সর্ব্বভূতেষু পাতকং।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥

(মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব)

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মে ভক্তি হওয়া আবশ্যক। ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। * যিনি ব্রহ্মোপাসনা করিবার নিমিত্ত, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তি এবং জ্ঞান, উভয়ই লাভ হইয়াছে। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, বৈরাগ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এবং আত্মজ্ঞানের উপর। ইহা দ্বারা বিষয়াসক্তি রহিত হয়, বিমল এবং অনাবিল সুখ জন্মে; ধর্ম্ম অর্জ্জনের ইহা একমাত্র সোপান; ইহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়-সংযম হয়। এক কথায়—ইহা মনুষ্যত্ব লাভ করিবার একমাত্র উপায়। এই জন্যই বৈরাগ্যের আবশ্যকতা।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী; এমন কি, যাঁহারা সংসার-ক্ষেত্রকে কার্য্যস্থল মনে করিয়া চিরদিন তাহারই সেবায় রত ছিলেন, তাঁহারাও ইহার অরুন্তুদ-দংশনে ছট্‌ফট্‌ করিয়া, সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণ বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। তাঁহাদের কথার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, সংসারে নির্ম্মল সুখ দুষ্প্রাপ্য, বিষয়-বাসনা পাপ-প্ররোচক; কৃতঘ্নতা, অসত্য, নিষ্ঠুরতা অশান্তি, সর্ব্বদা সংসারে বিরাজ করিতেছে। কামনা এবং আসক্তি পরিত্যাগ না করিলে আর পরিত্রাণ নাই।

ঈশা, মুশা, নানক, চৈতন্য, দাউদ, কবির, তুলসীদাস, কার্লাইল, সক্রেটিস, লুথার, ডাইওজিনিষ্‌, প্রভৃতি সকলেই পরম বৈরাগী ছিলেন। ইঁহাদের বৈরাগ্য-প্রসূত দেবোপম চরিত্রের মাহাত্ম্যের নিকট ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব-মত্ত, বিলাসিতার কোমলাঙ্কে চির-লালিত পালিত, প্রতিদ্বন্দ্বী-রহিত ব্যক্তিরাও অবনত-শির হইয়া পদধূলি লইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে আলেকজান্দার অলোকসামান্য বীরত্বে সমগ্র পৃথিবীকে সন্ত্রাসিত করিয়াছেন, তিনিও ডাইওজিনিসের স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য এবং নৈসর্গিক তেজঃসন্দর্শনে বিগলিতচিত্ত হইয়া, করুণস্বরে বলিয়াছিলেন, "Were I not Alexander the Great, I would be Diogenes the cynie"। মুনি-ঋষিগণ মাত্রেই, সাংসারিক সুখের আবিলতা এবং অসারতা উপলব্ধি করিয়া, ইহার প্রতি ভ্রূকুটি এবং বিতৃষ্ণাভাব দেখাইয়াছেন। সাংখ্যের মতে, এই সংসার দুঃখ-শোকময়; ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য তিনি "অপবর্গের" প্রয়োজন প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৈরাগ্য ভিন্ন সেই "অপবর্গ" অপ্রাপ্য। ষ্টোইক্ Stoic দার্শনিকগণ যে virtue (চরিত্রোৎকর্ষ) লাভ করিবার

* Without love there is no wisdom. (Carlyle.)

জন্যই জীবনের প্রতি কঠোর শাসন করিতেন, তাহাও বৈরাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। শঙ্করাচার্য্যর চিরস্মরণীয় "নলিনীদলগত জলমতি তরলং, তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং। মাকুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং" ইত্যাদি, বৈরাগ্য-শতকের "তৃষ্ণেহধুনা মুঞ্চ মাং," যোগবাশিষ্ঠের "ভিন্দতি হৃদয়ং পুংসাং.........দৌর্ভাগ্যদায়িনী দীনা তৃষ্ণা কৃষ্ণেব রাক্ষসী," শান্তি-শতকের "ক্ষুধাব্যাধেঃ ফলমূলং অস্তি শমনং ক্লেশাত্মকৈঃ কিং ধনৈঃ," হিতোপদেশের "স্বচ্ছন্দবনজাতেন......অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ"—ইত্যাদি সকলই বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক। সেক্ষপিয়র কখনও মনুষ্যকে "Quintessence of dust," কখনও মনুষ্যজীবনকে "Full of sound and fury, signifying nothing" বলিয়াছেন। গ্রে-এর (Gray) "The paths of glory lead but to the grave," গোল্ড-স্মিথের "Man wants but little here below, nor wants that little long," এডমণ্ড বার্ক (EdmundBurke) এর "what shadows we are, what shadows we Pursue!" দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সংসারের সুখ এবং যশ, মান, ইত্যাদিতে ইঁহারা সুখী হন নাই; বরং ইহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছেন। সংসারের দুঃখ-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য কাউপার্ (Cowper) "O! for a lodge in some vast wilderness" এবং বায়রণ্ (Byron) "O! that the desert were my dwelling place," বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন। জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাবিয়া, ইয়ং (young) মনের আবেগে বলিয়াছিলেন, "How soon must he resign his very dusts;" Johnson's "Vanity of human wishes" এর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত, সংসারের ধন, মান, যশ প্রভৃতির অসারতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সক্রেটিশ্ বলিয়াছিলেন, "যে, যে পরিমাণে অভাব-সংকোচ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দেবতা"। ফলতঃ যাঁহারা ঘোর সংসারী, তাঁহারাও ইহার বৃশ্চিক-দংশনে ব্যথিত হইয়া, বৈরাগ্যের জন্য সময়ে সময়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। কেহ কেহ একেবারে সংসার ত্যাগ করিয়া, সংসারের পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য অরণ্যবাসী হইয়াছেন। জীবনের সার্থকতা কখনও বৈরাগ্য অবলম্বন ভিন্ন সংসাধিত হয় না। ইহা চির-সুখের উৎস, মহত্ত্বের প্রস্রবণ, সততার নিলয়, ব্রহ্মজ্ঞানের পবিত্র নির্ঝর, জীবনের মান-সরোবর, চরিত্রের পবিত্রক্ষেত্র, পুণ্য সঞ্চয়ের পূত ভূমি,—ইহা সর্ব্বসুখাধার। যিনি অকিঞ্চিৎকর, পাপ-প্রবর্ত্তক, সংসার-সুখের ধূলা-খেলায় মত্ত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায় বৈরাগ্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দেন, তিনি কাচের জন্য কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন; তাঁহার জীবন ধিক্—কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বিষয়-সুখে লিপ্ত হইয়া, পরমার্থ জলাঞ্জলি দিলে, পরিণামে অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই বলিতে হইবে—

জন্মেদং ব্যর্থতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

সংসার-সুখে লিপ্ত হইয়া আমার মহামূল্য জীবনকে ব্যর্থ করিয়াছি; হায়! আমি দেবদুর্ল্লভ চিন্তামণিকে অকিঞ্চিৎকর কাচ-মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি।

রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইহাতে, সংসারে এবং বিষয়ে লিপ্ত হইলে যে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তাহা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

কেবল আশার আশা, ভবে আসা, আসা মাত্র হ'লো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা, নিম্ খাওয়ালে, চিনি ব'লে, কথায় ক'রে ছল।
ওমা, মিঠের লোভে, তিতো-মুখে, সারা দিনটা গেল॥
মা, খেল্‌বে ব'লে, ফাঁকি দিয়ে, নাবালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে, মাগো আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হ'লো,
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চল॥

শ্রীকুলচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

আপত্তিকারীগণের অভিপ্রেত যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, সাংখ্যপ্রবচনের কপিল-প্রণীতত্ব সম্বন্ধে অনুকূল যুক্তি-প্রমাণ আছে কিনা। আমরা দেখিতে পাই, কপিলর্ষি আসুরি নামক এক ব্যক্তিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন; এ বিষয়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদন আছে। "পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কাল-বিপ্লুতং প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-বিনির্ণয়ং" এই প্রথম স্কন্ধের শ্লোক হইতেই আমরা ইহা অবগত হইতে পারিয়াছি। ভাগবতে কপিলদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমাবতাররূপে কথিত হইয়াছেন। ভগবান্ সত্যবতী-সুত বেদব্যাস মহাশয় সপ্তদশ অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। অল্পপ্রজ্ঞপুরুষগণের সম্যক্ প্রকারে গভীর

বেদার্থ অবগত হওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মহান্ বেদ-বৃক্ষকে তিনি নানা শাখায় বিভক্ত করেন। "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখাঃ দৃষ্ট্বা পুংসোহল্পমেধসঃ" এই শ্লোকে বেদব্যাসের অবতারভাব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়, বেদব্যাসের বহুপূর্ব্বে ভাগবতোক্ত দেবহূতি-পুত্র কপিল আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে যেরূপ নিয়মে গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের পরিচয় প্রকাশিত হইত, বর্ত্তমান ঐতিহাসিক রীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের সময় অবগত হওয়া যায় কিনা এবং আধুনিক অনুমান ভিত্তিশূন্য কিনা, তাহা পৃথক্ সময়ে আলোচিত হইবে। কপিল কে? কপিল বেদব্যাসের পরবর্ত্তী কি পুরাতন? কপিল নামক অনেকগুলি ব্যক্তি পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সাংখ্যকার কোন্ কপিল, তাহা "কপিল" শীর্ষক প্রবন্ধে নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করা যাইবে। ফলতঃ আমরা ভাগবতের শ্লোক হইতে অবগত হইতে পারিলাম, কপিল নামক ভগবানের পঞ্চমাবতার আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। ঈশ্বর কৃষ্ণও বলিয়াছেন "এতৎপবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ আসুরিরপি, পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রং" অর্থাৎ এই পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ সাংখ্যতত্ত্ব মুনি (কপিল) আসুরিকে প্রদান করিয়াছিলেন, আসুরিও পঞ্চশিখকে দিয়াছিলেন, তাঁহার (পঞ্চশিখের) দ্বারা বহুবিধ গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। এখানে "পঞ্চশিখের গ্রন্থ প্রণয়নই উক্ত হইয়াছে, কপিল বা আসুরির রচিত গ্রন্থের কোনও সংবাদ ইহা হইতে পাওয়া যায় না" এইরূপ আশঙ্কা উদিত হয়, তাহার সমাধানার্থে "তত্ত্বোপদেশ দেওয়া" "তত্ত্বকথন" প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী বলেন, কপিল আসুরিকে সাংখ্যতত্ত্ব বলিয়াছেন; তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই; তিনি সাংখ্যতত্ত্বের উপদেষ্টা মাত্র। বিশেষতঃ "অগ্নিঃ স কপিলোনাম সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ" এই শ্লোক হইতে জানা যায়, অগ্নিই কপিল নামধারী হইয়া সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনা করেন। এই প্রবর্ত্তক শব্দে গ্রন্থরচয়িতা বুঝায়না, শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক আদিগুরুকে বুঝায়। কপিল সাংখ্যতত্ত্ব বলেন। সেই মত শিষ্যাদি দ্বারা আলোচিত হইতেছিল; তখন গ্রন্থ-রচনা হয় নাই; পরে পঞ্চশিখের সময়ে গ্রন্থাকারে পরিণত হয়। তজ্জন্যই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিতেছেন, কপিল সাংখ্যোপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু পঞ্চশিখ গ্রন্থরচনা করেন। কপিল-প্রণীত তত্ত্বসমাস বা সাংখ্যপ্রবচনাদি গ্রন্থের কথা তিনি কিছুই বলিলেন না; পরন্তু পঞ্চশিখের গ্রন্থ-বিরচন তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইল না। কাজেই অনুমান করা যায়, সাংখ্যপ্রবচনাদি কপিল-রচিত নহে। প্রতিপক্ষের বাক্‌চ্ছেদ্য যুক্তির বিষয় আলোচনা করিলেই ইহার অসারতা প্রমাণীকৃত হইতে পারিবে।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় পূর্ব্বকালে কাগজের উপর কালী দিয়া লিখিয়া অথবা

এইরূপে মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থ-প্রচার হইত না। কতকগুলি এক বিষয়ক তত্ত্ব বাক্যাকারে গ্রথিত হইলে, তাহাকে গ্রন্থ নামে অভিহিত করা হইত। কাহাকেও কোনও বিষয়ে উপদেশ দিতে হইলে, দ্বিবিধ প্রণালীতে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিজের যে বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান আছে, অপরের সেইরূপ বোধ জন্মাইতে হইলে, যে বাক্যটি শ্রবণ করিয়া তাহার ঐরূপ জ্ঞান জন্মে, তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগ এক রীতি, অপর প্রণালী, তাদৃশ বাক্যের অভিজ্ঞান স্বরূপ অক্ষর-ব্যবস্থাপন দ্বারা লিপি রচনা করিয়া তাহাকে পাঠ করিতে দেওয়া। শেষোক্ত রীতি সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইতে পারে না, কারণ সকলেই অক্ষর গ্রহণে সক্ষম নয়; কিন্তু শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই উচ্চারিত বাক্য দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম। পুরাকালে লিপি-রচনার ব্যবহার ছিল না। তখন বাক্যোচ্চারণ দ্বারাই শিষ্যদিগের বোধ জন্মান হইত। বাক্যটি বিশেষ বিস্তৃত-রূপে রচিত হইলে, উহা স্মরণ রাখিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয়, এজন্য প্রাচীন আর্য্যমহোদয়েরা স্বল্পাক্ষর-সূত্র সকলের রচনা করেন। সূত্রের ব্যাখ্যাদি বুঝাইয়া দিয়া সেই সকল তত্ত্বের আকর স্বরূপ সূত্রটিকে অভ্যাস করান হইত। উহাকে যথাসম্ভব লঘু আকারে রচনা করিতে চেষ্টা করা হইত; এই সকল সূত্র শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখেই পঠিত ও অভ্যস্ত হইত। পরে যখন সময়-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে ভারতের আর্য্যগণ পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি-সামর্থ্য প্রভৃতি গুণের সম্যক্‌রূপে অধিকারী হইতে অযোগ্য হইলেন, মস্তিষ্ক-শক্তির অল্পতা অনুভূত হইতে লাগিল, পূর্ব্ব-পুরুষগত সম্পত্তি রক্ষণে অক্ষম হইলেন, তখনই লিপিবদ্ধ করা প্রণালীর অবতারণা। পূর্ব্বে আচার্য্যেরা সূত্র রচনা করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, বহুকাল পরে শিষ্যেরা মনে রাখিতে না পারিয়া লিখিয়া রাখিলেন। ঐ লেখা পূর্ব্বাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ নামে অভিহিত হইল। ফলতঃ কোনও শিষ্যই পূর্ব্বাচার্য্যের রচিত সূত্র ব্যতীত স্বকপোল-কল্পিত একটা কিছু লিখিয়া রাখিতেন না। এইরূপেই সকল গ্রন্থ প্রথম মুখে পঠিত— পরে লিপিবদ্ধ ভাব ধারণ করে। কপিলও ঐরূপে আসুরিকে প্রথমে সূত্র শিক্ষা দেন, তাহাই পঞ্চশিখের সময়ে লিখিত হয়; কাজেই ঈশ্বর কৃষ্ণ বলেন, পঞ্চশিখের দ্বারা গ্রন্থ রচিত হয়। এখানে পঞ্চশিখের নিজের দ্বারাও অনেক সূত্রাদি প্রণীত হয় বলিয়া বিশেষরূপে পঞ্চশিখের গ্রন্থ-রচনা লিখিত হইয়াছে। বেদান্ত প্রভৃতি সকল দর্শনই ঐরূপে সূত্রাকারে রচিত, পঠিত ও বহুকাল পরে লিখিত হইয়াও যদি সূত্রকারের নামেই প্রকাশিত হইতে পারে, তবে ঐভাবে রচিত হইয়া সাংখ্যদর্শনের কপিল-দেবের নামে প্রকাশিত হওয়ায় অপরাধ কি? বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের গ্রন্থ-কর্ত্তৃত্ব এবং পুরাকালের "সূত্র দ্বারা তত্ত্বকথয়িতৃত্ব" একই পদার্থ। বিশেষতঃ লিখিত না হইলে অথবা মুদ্রিত না হইলে, গ্রন্থ হইবে না, ইহার কোনও তাৎপর্য্য নাই। অপরা-পর মুনিরা যেরূপে সূত্র রচনা পূর্ব্বক শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন, কপিল তাহা হইতে

স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাও কোন বিশ্বাস্য বাক্য নহে। পঞ্চশিখের সময়ে সাংখ্যশাস্ত্র বিস্তৃতি লাভ করে; তজ্জন্যই ঐ সময় ঈশ্বর কৃষ্ণের নিকট বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। পঞ্চশিখের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি সূত্র আমরা দেখিতে পাই; উহা বিশেষ উপাদেয় বলিয়া ব্যাসভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। পঞ্চশিখ কপিল-সূত্রগুলিকে লিপিবদ্ধ করেন, এবং নিজেও অনেকগুলি সূত্র প্রণয়ন-পূর্ব্বক সাংখ্যশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। পঞ্চশিখের সূত্র ঐরূপ সময়ে আবার অন্য কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হয়। পঞ্চশিখ-সূত্রে সাংখ্য-প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

"সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ" একথা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি, তাহার অনুশীলন করা যাউক। শাস্ত্র-প্রবৃত্তি ও মূলসূত্র রচনা একই তাৎপর্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ শাসনবাক্য। তাহা যে পূর্ব্বে সূত্রাকারে রচিত হইত, একথা বলা হইয়াছে। তাহাকে গ্রন্থ সংজ্ঞাও দেওয়া যাইতে পারে। তত্ত্বকৌমুদীকার বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় শাস্ত্র শব্দে গ্রন্থই বুঝিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "নেদং প্রকরণং অপিতু শাস্ত্রমেবেদং" অর্থাৎ ইহা শাস্ত্র, প্রকরণ নহে। প্রকরণ গ্রন্থ-ভেদ। শাস্ত্র শব্দে তাঁহার যদি অন্য কিছু বুঝিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহাহইলে তিনি প্রকরণ নয়, একথা বলিতেন না। তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি "আর্য্যাসপ্ততি"কে প্রকরণ গ্রন্থ বলেন না; কেননা যাহাতে শাস্ত্রের একদেশ মাত্র সংগৃহীত হয় এবং বিচারিত হয়, সম্যক্‌রূপে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ের আলোচনা হয় না, তাহাই প্রকরণ গ্রন্থ। * এখানে সাংখ্যশাস্ত্রের ষষ্টিপদার্থ সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা প্রকরণ নহে, শাস্ত্র। আমরা জানিতে পারিনা, বাচস্পতি মহোদয় ইহাকে "সংগ্রহ" গ্রন্থ না বলিয়া "শাস্ত্র" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কেন? সাংখ্যশাস্ত্রের সকলপদার্থ ইহাতে বলা হয় নাই, একথা স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণই বলিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সাম্প্রদায়িকতা হইতে আমরা ইহার গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব। এপর্য্যন্ত দ্বারা অনুমান করিতে পারা যায়, কপিল সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তবে সাংখ্যপ্রবচনই ঐ সূত্র-সমষ্টি কিনা, তাহার আন্দোলন করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ "ষষ্টিতন্ত্র" নামক একখানি সাংখ্যদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বাচস্পতি মহাশয় নামমাত্র শুনিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন সাংখ্যদর্শনের অপর পরিচয় অবগত ছিলেন না, কাজেই তিনি সে-কথার আদৌ উল্লেখ করেন নাই। "সপ্তত্যাং কিলযেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য, আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জ্জিতাশ্চাপি।" এই

---

* শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্র-কার্য্যান্তরে স্থিতং। আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ।—প্রকরণ-লক্ষণ।

কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিতেছেন, সমগ্র ষষ্ঠি-তন্ত্রে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই আর্যাসপ্ততিতে তাহাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ না বলিলে কারিকার পদার্থ-স্থাপন-প্রণালী তাঁহার কপোলকল্পিত বলিয়া জনসাধারণে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে। এই আশঙ্কায়ই বলিতেছেন, মহামুনি-রচিত ষষ্ঠিতন্ত্র হইতেই ইহার পদার্থ সংগৃহীত। অতএব ইহা সাধারণের কথার ন্যায় উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সাংখ্যপ্রবচন ষষ্ঠিতন্ত্রের নামান্তর। ষষ্ঠিতন্ত্রের অর্থ—ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, অথবা যাহাতে ষষ্ঠিপদার্থই প্রধান, এরূপ শাস্ত্র, কিম্বা ষষ্ঠিপদার্থের সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র। (তন্ত্রং প্রধানে সিদ্ধান্তে)। সাংখ্যপ্রবচনেও ষষ্ঠিপদার্থের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র শব্দের যেরূপ যোগার্থই গ্রহণ করা যাউক না, তাহাতে সাংখ্যপ্রবচন ভিন্ন অপর গ্রন্থ প্রতিপাদিত হইবে না। সাংখ্যকারিকা ব্যতীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থ আর নাই, কেবল সাংখ্যপ্রবচনই আছে। সুতরাং সাংখ্যপ্রবচন যে কারিকার মূল এবং ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। পাতঞ্জলদর্শনে কৈবল্যপাদে ১৩সূ-ভাষ্যে, ভগবান্ ব্যাসদেব "তথাচ শাস্ত্রানুশাসনং। গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকং॥" এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন। তত্ত্ববৈশারদীকার বাচস্পতি মহাশয় "অত্রৈব ষষ্ঠিতন্ত্রশাস্ত্রস্যানুশিষ্টিঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "গুণানাং পরমং রূপং", এই শ্লোকটীকে ব্যাসদেব শাস্ত্রানুশাসন বলিলেন। বাচস্পতি মিশ্র তাহাকে ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। টিপ্পনীরচয়িতা মহামান্য বালরাম শাস্ত্রী মহোদয় "বার্ষগণ্যাচার্য্য-প্রণীত ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রস্য" বলিয়া পরিস্ফুট-রূপে বুঝাইয়াদিলেন। ষষ্ঠিপদার্থ-প্রতিপাদক সাংখ্যশাস্ত্রই ষষ্ঠিতন্ত্র। কপিলাচার্য্যই বার্ষগণ্য। অনেক মহোদয় বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য এবং ষষ্ঠিতন্ত্রকে যোগগ্রন্থ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। যোগদর্শনে ঐ ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদিত হয় নাই। সেই ষষ্ঠিপদার্থ কি এবং তাহা যেখানে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই যে ষষ্ঠিতন্ত্র, একথা ভোজরাজের বার্ত্তিক অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করা হইবে। মহামতিরা বার্ষগণ্যকে যোগাচার্য্য বলিবার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না। তবে যোগদর্শনে ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদন করা হয় নাই; ইহাই এপক্ষের অনুকূলে প্রমাণরূপে পরে প্রদর্শিত হইবে। ষষ্ঠিতন্ত্র কপিল-রচিত। আসুরি উহাই শিক্ষা করেন। অপরে উহা হইতে সংগ্রহ-শ্লোকাদি প্রণয়ন করেন, তাহাই ষষ্ঠিতন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশাসন রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুশাসন শব্দের অর্থ শিষ্টের পুনর্ব্বার শাসন। বাচস্পতি তত্ত্ববৈশারদীতে লিখিয়াছেন, "শিষ্টস্য শাসনং অনুশাসনং" ষষ্ঠিতন্ত্রে যে পদার্থ শিষ্ট, অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনর্ব্বার [illegible] গ্রন্থা-কারে শাসনের নামই ষষ্ঠিতন্ত্রের অনুশাসন। যেরূপ যোগানুশাসন শব্দে হিরণ্যগর্ভাদি

কর্ত্তৃক উপনিষৎ ও সংহিতাদিতে যে যোগ শিষ্ট অর্থাৎ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাই অনন্তদেব যোগ-দর্শনাকারে পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপন করেন, এজন্যই পাতঞ্জলের নাম যোগানুশাসন। পাণিনীর শব্দানুশাসনও সেইরূপ। পূর্ব্বাচার্য্য-গ্রন্থে যে সকল শব্দ যাদৃশরূপে সংস্কৃত অথবা ব্যুৎপাদিত হইয়াছিল, বররুচি প্রভৃতি তাহারই পুনর্ব্বার শাসন-বিধি সূত্রাকারে নিবদ্ধ করেন, সুতরাং শিষ্টের পুনঃশাসনই অনুশাসন। অতএব ঐ অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটিকে সাংখ্যসূত্র বলিয়া ভ্রম হইবার কারণ নাই।

ষষ্টিতন্ত্র অপর একখানি সাংখ্যদর্শন এবং বার্ষগণ্য অপর একজন সাংখ্যাচার্য্য, এরূপ মতবাদও অযুক্ত; কেননা বার্ষগণ্য অপর কেহ হইলে, তিনি ব্যাসাদির পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা পরকালীন, ইহা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। যখন ব্যাসদেব তাঁহার গ্রন্থের—অনুশাসন গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন যে তিনি বহুপূর্ব্ব-কালের, তাহাতে আর সন্দেহ পরলক্ষিত হইতে পারে না। এরূপ প্রাচীন আচার্য্য হইলে, যেরূপ কপিলকে সাংখ্যাচার্য্য বলিয়া পুরাণাদিতে এবং অন্যান্য গ্রন্থে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে সেরূপ বলা হয় নাই কেন? ধর্ম্মবিপ্লবে তাঁহার গ্রন্থ বিলীন হউক, কিন্তু তাঁহার নামটিও পুরাতত্ত্ব হইতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব। কপিল আসুরি পঞ্চশিখ ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বেদব্যাস যাঁহার বাক্যের প্রতিধ্বনিকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন, তিনি ইদানীন্তন বার্ষগণ্য হইতে পারেন না; বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনেই ষষ্টিপদার্থ-বিচার বিদ্যমান। অনুশাসন শাস্ত্রের শ্লোকটি যে ষষ্টিতন্ত্রের (সাংখ্যপ্রবচনের) সূত্র হইতে সংগৃহীত, তাহা পরে বিবেচিত হইবে। আরও এখানে বলা আবশ্যক, বাচস্পতি মহোদয় ও বালরাম শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত কয়েকটি অক্ষর বিন্যাস ব্যতীত "শাস্ত্র" শব্দে ষষ্টিতন্ত্র বুঝিবার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

যাহাহউক, ঋষিগণের দুইটি নাম থাকা ও গ্রন্থের দুইটি নাম থাকা একান্ত অসম্ভব নয়। দেখিতে পাওয়া যায়, যিনি গৌতম, তিনিই অক্ষপাদ ও অক্ষচরণ নামে খ্যাত, এবং কণাদ মহাশয় কণভক্ষ ও ঔলুক্য নামে অভিহিত। সাংখ্যকারিকা, সাংখ্যসপ্ততি, আর্য্যাসপ্ততি, একই গ্রন্থের নাম। চণ্ডী ও সপ্তশতী একই গ্রন্থের নাম-ভেদ। বেদান্ত-দর্শন ও ব্রহ্মসূত্র একই। বিশেষতঃ সাংখ্যপ্রবচনে ষষ্টিতন্ত্রের যোগার্থ লক্ষ্য ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদকতাও রহিয়াছে। ইহা একটি সমীচীন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়া উচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ ষষ্টিতন্ত্রের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। বাচস্পতি নামমাত্র শুনিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগ্রহণের বহুবর্ষ পূর্ব্বেই উহা অদর্শন-নগরের অধিবাসী হইয়াছিল। ষষ্টি-তন্ত্রের ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করিতে তিনি ভোজরাজকৃত রাজবার্ত্তিকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ষষ্টিতন্ত্র তাঁহার পরিচিত হইলে, তিনি বস্তুতঃ তাহা হইতেই ষষ্টিপদার্থ

প্রদর্শন করিতেন। রাজবার্ত্তিকে যে ষষ্টিপদার্থ বলা হইয়াছে, তাহা ষষ্টিতন্ত্র-সম্মত ষষ্টিপদার্থ কিনা, এই সন্দেহ নিরাসের জন্য অন্ততঃ ষষ্টিতন্ত্রের একটী সূত্রও উল্লিখিত হইলে, বাচস্পতির দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ ঘটিত।' বাচস্পতির সহিত ষষ্টিতন্ত্রের পরিচয় নাই, সুতরাং ঐ কারিকার ব্যাখ্যায় তিনি নির্ব্বাক্‌ হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। যদি ষষ্টিতন্ত্র সাংখ্য প্রবচন হইতে ভিন্ন, এরূপও তাঁহার জানা থাকিত, তাহাহইলে তিনি ষষ্টিতন্ত্রের পরিচয়ের আভাস দিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার অনেক পূর্ব্বে উহা লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু নামটির অস্তিত্ব যায় নাই; এইজন্য নাম জানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ-কারিকার "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি" এই অংশ ব্যাখ্যা করিলে, ষষ্টিতন্ত্র যে সাংখ্যপ্রবচন, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিবে না। ষষ্টিতন্ত্রের সমস্ত পদার্থ আর্য্যাসপ্ততিতে বলা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ষষ্টিতন্ত্রের আখ্যায়িকাধ্যায় ও পরপক্ষনির্জ্জয়াধ্যায়ের কিছুই তিনি আর্য্যায় লেখেন নাই, সুতরাং পক্ষান্তরে মিথ্যা কথাই বলা হইল দেখিয়া লিখিলেন, "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি"—অর্থাৎ আখ্যায়িকা এবং পরবাদ ব্যতীত সমস্তই আর্য্যায় লিখিত হইয়াছে। এই সাংখ্যপ্রবচন বা ষষ্টিতন্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে বিষয়-নিরূপণ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে—প্রধানকার্য্য-নির্ব্বাচন, তৃতীয়ে—বৈরাগ্যস্থাপন; চতুর্থে—আত্মজ্ঞানোপযোগী আখ্যায়িকা সকলের উদাহরণ, পঞ্চমে—পরপক্ষ ও তন্নির্জ্জয়, ষষ্ঠে উক্তাংশের বিস্তার ও অনুক্ত যুক্ত্যাদির উপন্যাস দ্বারা সকল শাস্ত্রার্থের সঙ্কলন করা হইয়াছে। আখ্যায়িকাংশই সাংখ্যদর্শনের অসাধারণ চিহ্ন। অপর কোনও দর্শনে এরূপ আখ্যায়িকাধ্যায় দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কারিকায় আখ্যায়িকাদি নাই। বাচস্পতি মহাশয় "আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ" ইত্যাদি অংশের আদৌ ব্যাখ্যা করেন নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, যে সাংখ্যদর্শন অথবা ষষ্টিতন্ত্রের কথা ঈশ্বরকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, তাহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যপ্রবচন; যোগদর্শন অথবা অপর গ্রন্থ নহে। আখ্যায়িকা এবং ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদনই সাংখ্যদর্শনের ইতর-ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্ম; এই আশঙ্কা (যোগদর্শনকে ষষ্টিতন্ত্র অথবা সাংখ্যপ্রবচন বলিবার আশঙ্কা) নিরসনার্থই পাতঞ্জলদর্শনের পাদশেষে "পাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে" লেখা হইতেছে; নচেৎ 'সাংখ্যপ্রবচন' বলিলেই চলিত। কাপিল সাংখ্যপ্রবচন অথবা ষষ্টিতন্ত্র নামে গ্রন্থের বিদ্যমানতা প্রমাণ করিতেই ব্যাসদেব এরূপ লিখিয়াছেন।

আপত্তি হইতে পারে, ব্যাসদেব অনুশাসনের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া ষষ্টিতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিলেই পারিতেন। কিন্তু এখানে বিবেচনা করা আবশ্যক, [illegible] হইতে কতটুকু গৌরবের কথা বলা হইত, ইহা হইতে অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। যে ষষ্টিতন্ত্রের অনুশাসনগ্রন্থ হইতে ব্যাসদেব প্রামাণ্যসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে কতদূর, ঈশ্বরের সোপানে স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা সহজেই বিবেচিত

হইতে পারে। বাচস্পতি ভোজরাজকৃত 'রাজবার্ত্তিক' নামক সাংখ্যবার্ত্তিকের ষষ্টিপদার্থ-প্রতিপাদক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বার্ত্তিকের শ্লোকটী অন্যত্র পাইয়াছিলেন, অথবা বার্ত্তিক দেখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায় না। বার্ত্তিককার যেরূপ স্বাধীনভাবে মতবাদের সমালোচনা করেন, তাহাতে বার্ত্তিকদর্শনে মূলগ্রন্থের সিদ্ধান্ত অবগত হওয়া দুষ্কর। ভাষ্য-মত দূরে থাকুক, বার্ত্তিককার স্থানে স্থানে মূলসূত্রের স্বারসিক অর্থ এবং মূলকারের মতও দুষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং স্বমত-সংস্থাপনে যুক্তির সন্নিবেশ করেন। বার্ত্তিকগ্রন্থে * স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলতাব দৃষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বার্ত্তিককার এই রীতির অনুসরণ করিতে ক্রটী করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক, উদ্যোতকরকৃত ন্যায়বার্ত্তিক, সুরেশ্বরের ভাষ্যবার্ত্তিক এবং কাত্যায়নের পাণিনীয়-বার্ত্তিক, ইহার প্রত্যেকটী এইরূপ স্বাধীনতার দৃষ্টান্তস্থল। ফলতঃ যাহাহউক, সমগ্র বার্ত্তিকের সহিত দেখাশুনা থাকিলে, বাচস্পতি ষষ্ঠিতন্ত্রের খবর পাইতেন। বার্ত্তিককার যে গ্রন্থের বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বহুবিষয় বার্ত্তিকে থাকা উচিত; কাজেই বাচস্পতি বার্ত্তিকের কিয়দংশ অথবা শ্লোকটী কোনও প্রকারে পাইয়াছিলেন।

ভোজরাজ সাংখ্যবার্ত্তিক রচনা করেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। এ আশঙ্কা সাধারণতঃই উদিত হইতে পারে। বিশেষতঃ তিনি পাতঞ্জলের ভোজবৃত্তি নামক যে ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন, তাহাতে লিখিয়াছেন "শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা, বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতন্বতা বৈদ্যকে, বাক্‌চেতোবপুষাং মলঃফণভৃতাং ভর্ত্রেব যেনোদ্ধৃতস্তস্য শ্রীরণরঙ্গমল্লনৃপতের্বাচো জয়ন্ত্যুজ্জ্বলাঃ॥" ইহা হইতে তাঁহার শব্দানুশাসন, পাতঞ্জলবৃত্তি ও রাজমৃগাঙ্ক নামক বৈদ্যশাস্ত্র প্রণয়ন অবগত হওয়া যায়। সাংখ্যবার্ত্তিকের পরিচয় কিছুই নাই। এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, ভোজবৃত্তি রচনার পর রাজবার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, সুতরাং বৃত্তিতে বার্ত্তিকের পরিচয় নাই। অথবা এ ভোজরাজ (বৃত্তিকার) হইতে বার্ত্তিককার ভোজরাজ অপর একজন ব্যক্তি। তত্ত্বকৌমুদীর ব্যাখ্যাকার "ভারতী যতি" মহোদয় "তথাচ রাজবার্ত্তিকং"—ইহার ব্যাখ্যায় ভোজরাজ-প্রণীত বার্ত্তিক বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বার্ত্তিকগ্রন্থ মূল-সূত্রাদির পরিচয় প্রদান করে, অতএব এ বার্ত্তিক হইতেও সাংখ্যপ্রবচনের অস্তিত্ব অনুমিত হইতে পারে। সাংখ্যগ্রন্থই কারিকার মূলগ্রন্থ, অপর দর্শনের গ্রন্থ হইতে পারে না। তাহার অভিমত ষষ্ঠিপদার্থ দর্শনান্তরে বিবেচিত হওয়াও সম্ভব নয়। অপর দর্শনের বার্ত্তিক-গ্রন্থও সাংখ্যশাস্ত্রাভিমত ষষ্টি পদার্থ প্রতিপাদনার্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। অতএব ভোজরাজ-বার্ত্তিক সাংখ্যবার্ত্তিক এবং ষষ্ঠিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন, ইহা প্রতিপাদিত হইল।

* উক্তানুক্তদুরুক্তাদি চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে, তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহুর্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ। (বার্ত্তিকলক্ষণ।)

পূর্ব্বে যে আপত্তিকারীর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, সাংখ্যপ্রবচন কপিল-রচিত সাংখ্যদর্শন হইলে, তাহা বিদ্যমান থাকিতেও সাংখ্যশাস্ত্র "কলাবশেষ"ও "ভক্ষিত" হইয়াছে বলা অসঙ্গত। তাহাতেও একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিজ্ঞানভিক্ষুর অপরাধ বোধ হইবে না। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদে, উপনিষদে, ইতিহাসে, পুরাণের সর্ব্বাঙ্গে, সমাদরে স্থান লাভ করিয়াছে, যাহার পূর্ব্বকালীন-গৌরবভাতি ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত অতিক্রম করিয়াও ছুটিতে ছিল; অদ্যাপি সমগ্র সভ্য-জগতের নির্ম্মল-গগনে যাহার বিমল প্রভা মধ্যে মধ্যে বিজলী-চমকের ন্যায় জনগণের নয়নরঞ্জন করে, এবং হৃদয়-স্তম্ভন করে, তাহারই,—যাহা সহস্র সহস্র বৎসর হইতে ভারতবর্ষে বিচারিত হইতেছিল, সেই সাংখ্যদর্শনেরই,—২১৩ খানি অপরিস্ফুট (টীকা ও মূলসমযোগে) গ্রন্থরূপে শোষিত হইয়া যাওয়াকে বিজ্ঞানভিক্ষু কি পূর্ণিমা বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন? বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনাকালে তত্ত্বসমাস, সাংখ্যপ্রবচন, তাহার অনিরুদ্ধভট্টকৃত বৃত্তি এবং মহাদেবকৃত বৃত্তিসার ও কারিকা এবং তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি তাহার ২১১ খানি ব্যাখ্যা-পুস্তক, আর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই একটি পঞ্চশিখ-সূত্র ব্যতীত আর কিছুই পাইয়াছিলেন না। তিনি "সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য" এবং "সাংখ্যসার" নামক আর একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত যোগদর্শনের বার্ত্তিক রচনা করেন। ব্রহ্ম-মীমাংসার (বেদান্ত দর্শনের) ভাষ্য রচনা করেন, একথা তাঁহার সাংখ্যভাষ্য এবং যোগবার্ত্তিকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার ব্রহ্ম-মীমাংসা-ভাষ্য অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাশয় সাংখ্যশাস্ত্রকে কলাবশেষিত রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের সহিত উপমা করিয়া অত্যুক্তি-দোষে দূষিত হওয়া দূরে থাকুক, বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন জন্য প্রশংসিত হওয়াই উচিত। সুধাকরের রাহুগ্রাস—পরক্ষণেই তাঁহার চারু-চন্দ্রিকাময়-মূর্ত্তি-দর্শনে আমরা আনন্দে আপ্লাবিত হইয়া ভুলিয়া যাই, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের প্রাচীন অমূল্যগ্রন্থ পঞ্চশিখ-সূত্রাদি—যাহা চিরদিনের জন্য নিয়তির ক্রোড়ে বিলীন হইয়াছে,—যে অভাব এ জীবনে পূরিবেনা,—তাহার কথা অন্তরে উদিত হইলে, কোন্ আর্য্যসন্তান অশ্রু-বারি সম্বরণ করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানাচার্য্যের ভাষ্য-বাক্যামৃতে, উহা যে কোনও প্রকারেই হউক না কেন—সজীব হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই কঙ্কালমাত্রাবশেষিত-দেহের পূর্ণিমা বোধ হয় আর ঘটিবে-না। সূত্রে সমস্ত পদার্থতত্ত্বই নিহিত আছে, কিন্তু তাহা আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে না। সূত্র কামদুঘ, তাহাকে দোহন করিয়া পঞ্চশিখ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে অমৃতরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে; কত জীব কণিকামাত্রে অমরকীর্ত্তিভাগী হইয়াছে; দুর্ভাগ্য আমরা—দরিদ্র হইয়াছি। সূত্র হইতে অমৃত দোহনের সাধ্য নাই। নিষ্পেষণ করিতে জানি, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার উপযোগ নাই। কাজেই বিজ্ঞানভিক্ষু সূত্র সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের দিকে তাকাইতে গিয়া হতাশ-প্রাণে বলিয়াছেন "কালার্কভক্ষিতং"। আবার

প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বপ্রতিভাবলে বলিয়াছেন,—"পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।"

'সাংখ্যপ্রবচন' যে "ঈশ্বর-কৃষ্ণ" মহোদয়ের অনুমোদিত এবং নানা কারণে সমীচীন গ্রন্থ, তাহা দেখান হইয়াছে; তবে সম্প্রতি, সেই প্রবলতর তর্কের প্রতিকূলে এই প্রমাণ-বাক্যাদি দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম কিনা, তাহাই বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম আপত্তিকারীর উপযুক্ত যুক্তি সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক, নব্যস্মার্ত্ত ও প্রাচীন দার্শনিকগণ, কেহই সাংখ্যপ্রবচনের সংবাদ রাখেন না। ইহার কারণাবধারণ করিতে হইলে দেখা আবশ্যক, উঁহাদিগের আবির্ভাব-সময়ের সহিত সাংখ্যদর্শনের প্রচার-সময়ের কত অন্তর। কপিলাচার্য্য ব্যাসাদির বহু পূর্ব্ব-বর্ত্তী, একথা স্বীকার্য্য; যৎকালে বিস্তৃত ভারতক্ষেত্রে সাংখ্যদর্শনের অটল-সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল, তখনই অপর দর্শনের আধিপত্য-বিস্তার আরম্ভ হয় নাই। সাংখ্য-দর্শনের মূল গ্রন্থ তত্ত্বসমাসে পরমত উল্লিখিত হয় নাই। তৎকালে এদেশে অপর দার্শনিকগণের প্রাধান্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইন্দ্রিয়াদির "আহঙ্কারিকত্ব" কাল-ক্রমে লোকের অশ্রদ্ধার দ্রব্য হইয়া পড়িল। তখন ভারতে ভূতবিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। ইন্দ্রিয়গণ "ভূত" হইতে উৎপন্ন, এরূপ সিদ্ধান্ত ভৌতিক মতের চরম অবধারণ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইল। সুশ্রুত-সংহিতায় সূত্রস্থানে সাংখ্যমতই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দর্শনান্তরের মতবাদ পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বেদব্যাসের সময় হইতে বেদান্ত-মত পুরাণে প্রবিষ্ট হয়। প্রায় সর্ব্বত্রই বেদান্ত এবং সাংখ্যমত ও উভয় মতের সমবায় দেখিতে পাওয়া যায়। গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপেই রচিত। প্রথমতঃ, চিকিৎসাশাস্ত্র—অর্থাৎ দেশীয় রসায়ন এবং ভূতবিজ্ঞান ও শারীরিক বিজ্ঞান একটু একটু বিস্তৃতি লাভ করে, তখনই সাংখ্যদর্শনের অবনতির আরম্ভ হয়; কারণ সাংখ্যাচার্য্যেরা দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখের অতিশয় নিবৃত্তি হওয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা রোগোপশমের জন্য রসায়ন-ব্যবস্থা ভালবাসিতেন না। পুনর্ব্বার দুঃখ হইবে, এই ভয়ে বাহ্য উপায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক আন্তর যোগোপায়—অর্থাৎ "প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বাবগম" তাঁহারা ভবরোগ-শান্তির উপায় বলিতেন। সুতরাংই দৃষ্ট-প্রতীকারেচ্ছু-চিকিৎসক আপাততঃই সাংখ্যশাস্ত্রের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরলোকাদি-অপ্রত্যক্ষ পদার্থের মঙ্গল-সাধন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, সাংখ্যদর্শনের অনুষ্ঠান আংশিক লোপপ্রাপ্ত হইল। সেই নির্ব্বাণপ্রায় দীপশিখায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইতে লাগিল। সমাজ ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া গেল। বেদান্তদর্শনও নিবু নিবু ভাবে আপন প্রভায় জ্বলিতে থাকিল। এই বিপ্লবে ধর্ম্ম-শাস্ত্র একরূপ অস্তিত্বশূন্য হইয়া গেল। তখন সুদূরদেশও বৌদ্ধধর্ম্মের বিজ্ঞানবাদ অকাতরে অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। অমাদের দুরদৃষ্টের দুরন্ত পরিণাম উপস্থিত হইল। অমূল্য রত্নরাজির ন্যায় গ্রন্থ সকল চিরদিনের জন্য কালের কবলে

বিলীন হইল। এই সময় অদম্য-উদ্যম ও অসাধারণ-প্রতিভা লইয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ভারতে অবতীর্ণ হন; তাঁহার অনির্ব্বচনীয় প্রতিভা-তেজঃ সহ্য করিতে অক্ষম বৌদ্ধেরা ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিল। তাহারা অনন্তকালের জন্য ভারতের আশা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইল। শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" প্রণয়নপূর্ব্বক বেদান্ত-দর্শনকে জীবিত করেন, উপনিষদের স্বমতে ব্যাখ্যা করেন। পরন্তু শিষ্যাদি-সমভিব্যাহারে তিনি সমগ্র ভারতে বিজয়ার্থ ভ্রমণ করেন। প্রায় সমস্ত দেশেই তাঁহার প্রণীত ভাষ্য এবং তাঁহার সন্ন্যাসের নব-বিধান স্বীকৃত হয়। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য ও তাঁহার সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী সন্ন্যাসীগণের গ্রন্থই বেদান্ত গ্রন্থ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধশূন্য অদ্বৈতবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের দার্শনিক দেখা যায় না। তাঁহার মত ভারতের মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হয়।

প্রকৃতি-প্রধান সাংখ্যশাস্ত্র জড়তত্ত্বেরই পক্ষপাতী। চৈতন্যের অবস্থিতি ব্যতিরেকে জড়ের কার্য্যকারিতার বিলোপ হয়, চৈতন্যের সান্নিধ্যে জড় পদার্থের কম্পন; বস্তুতঃ জড়জগৎ চৈতন্যকে ছাড়িয়া আপনার সত্তাই হারাইয়া ফেলে। এইরূপ আনুগত্য সত্ত্বেও সাংখ্যশাস্ত্রে "চৈতন্য" একটি প্রধান তত্ত্ব বলিয়া কথিত হয় নাই। জড়তত্ত্বকেই "প্রধান" সমাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে। ফলতঃ বৌদ্ধ-সঙ্ঘর্ষণে জড়বাদ বলিয়াই এ শাস্ত্র একেবারে অদর্শন প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত-মত (শাঙ্করমত) বৌদ্ধ মতের সহিত বিশেষরূপে সংসৃষ্ট, এ কথা বিজ্ঞানভিক্ষুর মতাবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে। বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন বেদান্ত ব্যতীত অপর শাস্ত্রের সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-পরাভবের সহিত ন্যায়-মতের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি হয়, কিন্তু তাহা শঙ্করের সমসময়ে নহে। শঙ্করের সময় হইতেই বৌদ্ধগণ পরাস্ত হইয়া প্রস্থান করে, পরে অবসরে তাহারা বিচারার্থ ভারতীয়দিগকে বারম্বার আহ্বান করিত এবং অনেক সময় কর্ম্মিসম্প্রদায়ের (মীমাংসক) লোকদিগকে পরাভূতও করিত। শঙ্করের জ্ঞানবাদে বৌদ্ধগণের দ্বারা অপরাভূত কর্ম্মিগণ অনেকে অনুমোদন করিয়াছিল। অনেকে পুনর্ব্বার-বৌদ্ধ-সমাগমে পরাজিত হইয়া অর্দ্ধ-বৌদ্ধ হইয়া ভারতে অবস্থান করিতে লাগিল। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের উপনিবেশ-পরিবর্ত্তনাদি নানা কারণে, গ্রন্থ প্রভৃতি অনেক সম্বল নষ্ট হইলে, ক্রমশঃ তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের যশোভাতি বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গ বহিয়া গেলে দেশে বেদান্ত-দর্শনের আদর সম্ভব, কেননা বৌদ্ধমতের সহিত উহার নিকট সম্বন্ধ। লোকের নিকট তখন ঐরূপই ভাল লাগিতে লাগিল। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য-মতের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ই নৈষ্কর্ম্ম্য শিক্ষা দিয়া বৌদ্ধানুমোদিত "কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করা" সমর্থন করেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিতে লোকের নূতন কিছু করিতে হইল না, কেবল মুখে মুখে গোটাকতক মতবাদ স্বীকার করিতে হইল।

এ অবস্থায় সাংখ্যদর্শনের আলোচনা দূরে থাকুক, উহার আরও প্রবলতর অনিষ্ট সাধিত হইল। ভগবান্ শঙ্কর সাংখ্যমতের ঘোর প্রতিপক্ষ ছিলেন। অপরাপর ভাষ্যকারেরা যে সকল সূত্রের ব্যাখ্যাদ্বারা স্বভাববাদ—মায়াবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি সেইসকল সূত্রদ্বারাই সাংখ্যমতে দোষার্পণ করিয়াছেন। তিনি যে সংখ্যমতের প্রতিবাদী, তাহাতে বিশেষ সুযুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সামাজিক লোক জড়জগতের একটী পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়, তবে তাঁহার বিজ্ঞানবাদ ভিত্তিশূন্য হইয়া যাইবে। পরন্তু সাংখ্যবাদে তাঁহার অনুমোদন থাকিতে পারে না। কেননা তিনি সাংখ্যাচার্য্যগণের নিকট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোক বলিয়াই কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ জড়জগতের ভ্রমকল্পিততাবাদী শঙ্করাচার্য্য সৎকার্য্যবাদীর শত্রু। তিনি প্রথমে ভাষ্যাদিপ্রণয়ন করিতে গিয়া সাংখ্যমতের খণ্ডন করিলেন। যদি সর্ব্বজ্ঞ আদি বিদ্বান্ কপিলর্ষি-প্রণীত একখানি গ্রন্থের অস্তিত্ব উঁহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহা-হইলে স্বমতস্থাপন কষ্টকর। কেননা সর্ব্বজ্ঞ ঋষি মহোদয় ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, একথা বলিলেই হস্তুতাড়নে অভিনন্দিত হইতে হয়! পরন্তু ইহাকে স্বমতে ব্যাখ্যা করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র। কাজেই শঙ্কর অবগত থাকিলেও সাংখ্যদর্শনের নামোল্লেখও করেন নাই। প্রাচীন কালে বিরুদ্ধমতবাদের গ্রন্থ নষ্ট করিবারও রীতি ছিল, কিন্তু অসাধারণ ধীমান শঙ্কর সে জঘন্য রীতির অনুসরণ করেন নাই। নামোল্লেখ না করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন।

শঙ্কর সাংখ্যমতের শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া তাহার অনার্ষ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহাহইতেই তাঁহার সাংখ্যপ্রবচন জ্ঞাত থাকার আভাস পাওয়া যায়। কারিকায় শ্রুতিসমন্বয় করা হয় নাই। এজন্য যিনি শ্রুতি-প্রামাণ্যেই অঙ্গীকার করিয়া অপর প্রমাণের লঘুতা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, সেই শঙ্কর মহোদয়ের ঐ গ্রন্থ হইতে "আর্য্যা" উদ্ধৃত করা একরূপ উপহাস করাই হইয়াছে। তিনি কারিকার শত্রু ছিলেন না, বরং মিত্রই ছিলেন। কেবল মাত্র কারিকাই প্রচলিত থাকিলে, তিনি ভাষ্যে যাহার জন্য বহুপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হয়। লোকে দেখিতে পাইবে যে, কারিকায় বাস্তবিকই শ্রুতি-সমন্বয় নাই। ইহাই আবার একমাত্র গ্রন্থ; সুতরাং সাংখ্যমত শ্রৌত নহে। ভাষ্যাবলম্বনে ইহার শ্রৌতত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যাইবে। কারিকায়ও প্রচ্ছন্নভাবে শ্রৌত বলিয়া বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব। যাহাহউক, সাংখ্যপ্রবচনের নামোল্লেখ না করা এবং কপিল-প্রণীত গ্রন্থের বিষয় আলোচনা করিতেই বিরত থাকা, এক কথা। শঙ্কর ইষ্টসিদ্ধির জন্য এরূপ প্রচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাংখ্যকারিকার অস্তিত্বস্বীকারে তাঁহার লাভ ছিল, একথা বলা হইয়াছে। কাজেই আমরা শঙ্করের সময় হইতে কারিকা ভিন্ন কিছুই পাই না।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময়ে সাংখ্যভাষ্য প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে, তাহার কোনওখানি রচিত হইতে বাঁকি ছিল না। কিন্তু এদেশে তখনও নব্যন্যায়-চর্চ্চা ব্যতীত অপর দার্শনিক-চর্চ্চার আরম্ভ হয় নাই। কাজেই তিনি উহা প্রাপ্ত হন নাই। তত্ত্বকৌমুদীকে তিনি প্রকারান্তরে পাইয়াছেন। স্মার্ত্তমত-বিচার-প্রসঙ্গে তিনি মৈথিলাদি স্মৃতিশাস্ত্র সংগ্রহ করেন, তাহার সঙ্গেই বাচস্পতির স্মার্ত্তমত তিনি অনুসন্ধান করেন। প্রসঙ্গে তত্ত্বকৌমুদী প্রাপ্ত হন।

কাব্যাদির টীকাকারেরা সাংখ্যগ্রন্থ বিদ্যমান থাকিলেও না পাইতে পারেন, কারণ উহা তাঁহাদের আলোচ্য নয়। শঙ্করের ধর্ম্মপ্রচারের সহিত সাংখ্যকারিকারও সর্ব্বত্র প্রচার হয়, তাহার কারণ বলা হইয়াছে। সুতরাং সাহিত্যাচার্য্য—স্মৃত্যাচার্য্য—কেহই উহাতে (কারিকায়) বঞ্চিত হন নাই।

শঙ্করদেবের মঠস্থাপনে ভারতবর্ষ ব্যূহরচনাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহাদের প্রবলতাকালে সাংখ্যপ্রবচন আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই। মাধবাচার্য্য শঙ্কর-সম্প্রদায়ের লোক। তিনি ওরূপ একখানি প্রামাণ্যগ্রন্থ অস্বীকার করাই সম্ভব। দার্শনিকমতের স্থাপন-পারম্পর্য্য তাঁহার অভিপ্রায় বুঝাইয়া দেয়। তিনি শেষে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিতেছেন 'সর্ব্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনং অন্যত্র লিখিতং"। যিনি সর্ব্বদর্শনের শিরোমণি বলিয়া শাঙ্করমত ব্যাখ্যা করিলেন, তিনি অবশ্যই সাম্প্রদায়িক লোক। তাঁহার নিকট নিরপেক্ষ আলোচনার আশা করা অন্যায়। তিনি যে সকল দর্শনের মতসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই অনেক উপাদেয় যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শাঙ্করদর্শনে খণ্ডিত যুক্তি গুলিরই উল্লেখ করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ধর্ম্মের সঙ্ঘর্ষ হইতেই সকল দর্শনের অবনতি। বেদান্ত এবং ন্যায়-আচার্য্যেরা পরে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতেই তাহাদের পুষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যতীত সাংখ্য-সম্প্রদায়ে একরূপ লোক আর কেহই জন্মেন নাই। কাজেই তাঁহার পূর্ব্বে উহা কঙ্কাল-মাত্রাবশেষ হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইবে। সময়-স্রোতে যখন আবার শঙ্কর-মঠের মধ্যে দুই একটি মঠ অপণ্ডিত সন্ন্যাসীর আবাসরূপে পরিণত হইল, তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অন্যান্য অনেক স্থানে দর্শনালোচনা ছড়াইয়া পড়িল। সন্ন্যাসীর গুরুত্ব অনেক কমিয়া গেল। এই সময় সাংখ্য ও মীমাংসার গ্রন্থ দুই একখানি করিয়া আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এই সময়ে বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য রচনা করেন। বস্তুতঃ শতশত গ্রন্থ—যাহার অস্তিত্বে বাদীর আপত্তি নাই, তাহাও মত-কথনে উদ্ধৃত হয় নাই, দেখা যায়; তাহাতে বিদ্যমানতায় সন্দেহ হয় না। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, সাংখ্যপ্রবচন অমূলক নয় এবং কপিল-প্রণীত। ধর্ম্মবিপ্লবে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। অবশিষ্ট যুক্তি বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথভারতী-সাংখ্যতীর্থ।

ব্রহ্মচারিআশ্রম, যশোহর।

বিষ্ণুপুরাণ।

পুরাণ মধ্যে বেদব্যাস-পিতা মহর্ষি পরাশর-প্রণীত বিষ্ণুপুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণের কাল নির্ণয়ে হিন্দুমাত্রেরই কৌতূহল জন্মে। প্রাচীন গ্রন্থের কালনির্ণয় করিতে গেলে তিনটী বিষয় তর্কক্ষেত্রে সমাগত হয়।

১। গ্রন্থেরভাষা। ২। গ্রন্থলিখিত সামাজিক আচার-ব্যবহার। ৩। গ্রন্থলিখিত কাল। তৃতীয়টী সাক্ষাৎ প্রমাণ, ১ম ও ২য় অনুমেয় প্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণের অভাব নাই। জ্যোতিষ-অংশে সাক্ষাৎ প্রমাণ ভূরিভূরি আছে। যথা বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশে এই জ্যোতিষতত্ত্ব বর্ণিত আছে,—

তুলা মেষ গতে ভানৌ সমরাত্রি দিনং তুতৎ। ৮। ৬৭
কর্কটাবস্থিতে ভানৌ দক্ষিণায়নমুচ্যতে।
উত্তরায়ণং অপ্যুক্তং মকরস্থে দিবাকরে। ৮। ৬৯
মেষাদৌচ তুলাদৌচ মৈত্রেয় বিষুবৎস্থিতঃ।
তদাতুল্যং অহোরাত্রং করোতি তিমিরাপহঃ। ৮। ৭০

অস্যার্থ।

ভানু তুলারাশি ও মেষ রাশিতে প্রবেশ করিলে সমরাত্রি-দিন হয়।

ভানু কর্কট রাশিতে প্রবেশ করিলে দক্ষিণায়ন হয়।

দিবাকর মকর রাশিস্থ হইলে উত্তরায়ণ হয়।

হে মৈত্রেয়! মেষরাশির প্রথমাংশে এবং তুলারাশির প্রথমাংশে বিষুবৎস্থিত সূর্য্য অহোরাত্র তুল্য করেন।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটী পাঠে শাস্ত্রানুসারে বিষ্ণুপুরাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতমহোদয়গণ মতামত ব্যক্ত করিবেন, ইহা আমাদের প্রার্থনা। (১)

---

(১) সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতে রেবতী নক্ষত্রের ধ্রুব ৩৫৯° ৫০´ এই রেবতী নক্ষত্র মীনরাশির সীমান্ত-নক্ষত্র এবং ইহার ১০´ পশ্চিমে মেষরাশি অবস্থিত। বর্ত্তমান ১৮২১ শকাব্দে রেবতী তারার ধ্রুব অনধিক ১৯° হিন্দুজ্যোতিষ-গণনানুসারে ৭৫বৎসরে ক্রান্তিপাত এক অংশ বিলোম গমন করে। সুতরাং অনধিক ১৯° বিলোম গমনে ঊর্দ্ধসংখ্যা ১৪২৫ বৎসর মাত্র লাগিতে পারে। সুতরাং ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মীন ও মেষরাশির সন্ধিস্থলে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত-বিন্দু অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ ১৪২৫ বৎসর মধ্যে মেষরাশির আদিতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত তুলারাশির আদিতে শারদীয় ক্রান্তিপাত এবং কর্কট-রাশির আদিতে উত্তরায়ণান্ত-বিন্দু এবং মকর রাশির আদিতে দক্ষিণায়নান্ত-বিন্দু অবস্থিত হয়। এবং ১৪২৫ বৎসর মধ্যেই মেষরাশির ও তুলা রাশির আদিতে সমরাত্রি-দিন হইত। কর্কট রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত এবং মকর রাশিতে সূর্য্য সংক্রমণ করিলে, উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে মেষরাশি ও তুলারাশির আদিতে ক্রান্তিপাতদ্বয় অবস্থিত ছিল না। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণ-লিখিত ক্রান্তিপাতদ্বয়ের অবস্থিতি বর্ণন ১৪২৫ বৎসরের পূর্ব্বে হইতে পারে না, এবং বিষ্ণুপুরাণ-উদ্ধৃত শ্লোকে 'করোতি' শব্দ বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত হওয়া গণ্য করিলে, উক্ত শ্লোক ১৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হওয়া অসম্ভব হয়।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

সমুদ্র-মন্থন উপাখ্যান মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৭ হইতে ১৯ অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

একদা মহাত্মা দেবগণ সুমেরুপর্ব্বত-শৃঙ্গে একত্র সমবেত হইয়া অমৃত-প্রাপ্তির মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। এমত সময়ে পরমদেব নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন "পিতামহ! দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হউন। তদনুসারে দেবাসুরগণ মন্থনদণ্ডোপযোগী মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন করিতে যত্ন করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরমদেব নারায়ণের আজ্ঞানুসারে অনন্তদেব মন্দর পর্ব্বত উন্মূলিত করিলেন, এবং দেবগণ মন্দর পর্ব্বত লইয়া সমুদ্র-কূলে উপনীত হইলেন। অমৃতাংশ প্রাপ্তির আশয়ে সমুদ্র স্বীয় মন্থনে সম্মত হইলেন, এবং কূর্ম্মরাজ মন্দরধারণে অঙ্গীকার করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র কূর্ম্ম-পৃষ্ঠে মন্দর স্থাপনপূর্ব্বক মন্থন-রজ্জু বাসুকি দ্বারা মন্দর বেষ্টন করিয়া সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ বাসুকির গলদেশ ধরিলেন। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছদেশ ধরিলেন। বিলোড়নে মন্দর পর্ব্বতস্থ মহাদ্রুম ও ওষধিগণ হইতে নির্য্যাস ও রস সাগর-সলিলে নিপতিত হইতে লাগিল, এবং অমৃত সদৃশ রস-স্রোতে ও কাঞ্চন-স্রোতে দেব-দেহ আপ্লুত হইলে, দেবগণ অমর হইলেন। অপূর্ব্বরসে মিশ্রিত হইয়া সমুদ্র-বারি দুগ্ধে পরিণত হইল, এবং দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

সমুদ্র-মন্থনে অগ্রে ঐ দুগ্ধ হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন, এবং ঘৃত হইতে লক্ষ্মীদেবী, সুরাদেবী, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা এবং অত্যুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি ক্রমে উৎপন্ন হইলেন। কৌস্তুভ-মণি পরমদেব নারায়ণ হৃদয়ে ধারণ করিলেন। পারিজাত ও সুরভি উৎপন্ন হইল। লক্ষ্মী, সোম, সুরা, উচ্চৈঃশ্রবা, আদিত্য-পথে দেবগণের নিকট গমন করিল। অনন্তর ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উত্থিত হইলেন, এবং দন্তে বেদ চতুষ্টয়-বিভূষিত ঐরাবত উত্থিত হইল। দেবরাজ ঐরাবত গ্রহণ করিলেন। অবশেষে কাল-কূট বিষ উৎপন্ন হইল। হলাহলের ঘ্রাণে ত্রিলোক মোহাভিভূত হইল। ব্রহ্ম-আজ্ঞায় মহাদেব বিষপান করিয়া ফেলিলেন। তদবধি মহাদেব 'নীলকণ্ঠ' নামে খ্যাত। এদিকে অমৃত-পানাকাঙ্ক্ষী দেবাসুরে সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া, পরমদেব নারায়ণ মোহিনী-

মূর্ত্তি ধারণে অসুর-সমীপে উপনীত হইলেন। মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে বিমূঢ়চিত্ত অসুরগণ পরিবেশনার্থ অমৃত-ভাণ্ড মোহিনীর হস্তে সমর্পণে সম্মত হইল। অমৃত হরণ পূর্ব্বক মোহিনী সংগ্রাম মধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। সংগ্রামকালে দেবগণ মোহিনী-হস্তস্থিত অমৃত পান করিতে লাগিলেন। দেবরূপে পরিচ্ছন্ন রাহু অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুর কপটতা ব্যক্ত করিয়া দিলে, পরমদেব নারায়ণ সুদর্শন দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন দানব-মস্তক নভোমণ্ডলে উঠিল। কবন্ধ ভূতলে পতিত হইল। বৈরনির্য্যাতনার্থে অদ্যাপি মধ্যে মধ্যে রাহু চন্দ্র-সূর্য্য গ্রাস করিয়া থাকে। (এই গ্রাসকে গ্রহণ বলে)।

দেবাসুর-সমরে স্বয়ং নারায়ণ প্রবেশ করিয়া সুদর্শন দ্বারা অসুরদল ছিন্ন ভিন্ন ও বিদারিত করিলেন এবং অসুর-মুণ্ড ভূপৃষ্ঠ শোভিত করিল। হতাবশিষ্ট অসুরগণ রণে পরাস্ত হইয়া মহীতলে ও সাগর-জলে প্রবেশ করিল। দেবরাজপ্রমুখ সুরগণ অমৃত-ভাণ্ড অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে ৫ম হইতে ১১শ অধ্যায়ে সমুদ্র-মন্থন বর্ণিত আছে। ভাগবত-মতে যে যে স্থলে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। মহাভারতে দেবগণের অমৃত পানেচ্ছার কোন কারণ উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে, অত্রি-তনয় শঙ্করাংশ মহর্ষি দুর্ব্বাসার অভিশাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন। অসুর-সমরে দেবসৈন্য পরাজিত হইল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া ভূতলে ও পাতালে আশ্রয় লইলেন। অসুরগণ স্বর্গরাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করিল। যজ্ঞাদি কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িল। ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া সুমেরু-শৃঙ্গে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া পরমদেব নারায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, অমৃত পানে সবল না হইলে অসুরগণকে রণে পরাজয় করিতে পারিবেনা, এবং দেবাসুর সমবেত হইয়া সমুদ্রমন্থন ব্যতীত অমৃতলাভের উপায় নাই। অতএব অসুরগণের সহিত কপট-সন্ধি করিয়া উভয় দলে সমুদ্রমন্থন কর। সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন অমৃত পরিবেশন কালে আমি অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া দেবগণকে অমৃতপান করাইব। নারায়ণ-আদেশে ইন্দ্র অসুরপতি বৈরত মনু-পুত্র বলিরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া সমুদ্র-মন্থনের উদ্যোগ করিলেন। দেবাসুরগণ মন্দর উৎপাটন করিলেন, এবং গরুড়-পৃষ্ঠে মন্দর সমুদ্রকূলে নীত হইল। সমুদ্রমন্থনে অগ্রে হলাহল বিষ এবং ক্রমে সুরভি, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, অষ্ট দিগ্‌গজ এবং অভ্রমু প্রভৃতি অষ্ট করিণী, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা, কমলাদেবী, বারুণী, কলস-হস্ত ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। রাহুবধ উপাখ্যান এই পুরাণেও দৃষ্ট হয়।

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশ ৯ম অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে প্রথমে সুরভি এবং ক্রমে বারুণী, পারিজাত, শীতাংশু চন্দ্রমা, হলাহলবিষ, কমণ্ডলুহস্ত ধন্বন্তরি ও শ্রীদেবী উৎপন্ন হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে রাহুবধ উপাখ্যান বর্ণিত নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৩৮ অধ্যায়ে সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-মতে সমুদ্রমন্থনে অগ্রে ধন্বন্তরি এবং ক্রমে অমৃত, উচ্চৈঃশ্রবা, নানারত্ন, ঐরাবত, লক্ষ্মী-দেবী, সুদর্শন চক্র উত্থিত হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য পুরাণেও সমুদ্রমন্থন বর্ণিত আছে।

সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটী পুরাণে বর্ণিত আছে বলিয়া অশিক্ষিত লোকে এই ব্যাপারটীকে রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না। কিন্তু উপাখ্যানটীর সম্ভব-অসম্ভবত্ব বিষয়ে আলোচনা করিলে, ইহার রচনা অর্থবাদপূর্ণ বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ, মন্দরপর্ব্বত উৎপাটন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ, মন্থন-রজ্জুভূত বাসুকি মন্থন-ব্যাপারে যে সময়ে মন্দর বেষ্টন করিয়াছিল, তৎকালে বাসুকি-অভাবে কে ধরা ধারণ করিয়াছিল? তৃতীয়তঃ, পৃথিবী-পৃষ্ঠ ২০ কোটী বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ১৫ কোটী বর্গ মাইল সমুদ্র বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রের মন্থন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? চতুর্থতঃ, বিষ্ণুপুরাণ-মতে মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রদত্ত পারিজাত-মালা দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-শিরে ন্যস্ত করিলে, ঐরাবত কর্ত্তৃক মহর্ষি-প্রসাদভূত ঐ পারিজাত-মালা ধরণী-পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ক্রোধ বশতঃ মহর্ষির অভিশাপ হয়। তৎপরে সমুদ্রমন্থনে আবার ঐরাবতের উৎপত্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? পঞ্চমতঃ, মহাভারতে লিখিত আছে, সাগর-মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আদিত্য-বর্ত্ম (অয়ন পথে) দেব সমীপে গমন করিল। যদি দেবগণ পৃথিবীতে আসিয়া পৃথিবীস্থ মন্দর পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদ্রের উপকূলে থাকিয়া সমুদ্র মথিত করিয়া থাকেন, তবে মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি আকাশস্থ অয়ন-পথে কিরূপে দেব-সমীপে গমন করিতে পারে? সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বী করিতে হইবে যে, এই উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গূঢ় অর্থ আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঈশ্বর-মানা।

ঈশ্বরকে মানা না মানার কথাটা আধুনিক। প্রাচীনকালে এদেশে একথা ছিলনা। অন্ততঃ এরূপভাবে ছিল না। প্রাচীন ভারতের নাস্তিকেরা এরূপ ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক নয়। যাহারা শাস্ত্রবিধি মানিতনা, বেদ মানিতনা; যাহারা পরলোক, পুনর্জন্ম, অদৃষ্ট, কর্ম্মফল মানিতনা; যাহারা কেবল স্থূল-প্রত্যক্ষবাদী ও বাহ্য-পুরুষকার-পূজক ছিল, তাহারাই প্রাচীন ভারতের নাস্তিক। "চার্ব্বাক্" একটি প্রাচীন নাস্তিকের পূর্ণ নমুনা। প্রসিদ্ধ চার্ব্বাক্-দর্শনেই তাহা প্রকৃষ্ট প্রমাণিত। উক্ত দর্শনে উপরোক্তরূপ নাস্তিকতারই

প্রগল্‌ভ-প্রচার; কিন্তু তাহাতে কোথাও ঠিক 'ঈশ্বর নাই,—ঈশ্বর-মানা ভুল' এরূপ কথা ঘোর ঘটায় ঘোষিত হয় নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা ঠিক ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকার নহে; ঈশ্বরে ঔদাস্য বা উপেক্ষা মাত্র,—আস্তিকতার অকিঞ্চিৎকরতা মাত্র।

আর্য্য-শাস্ত্রাচার্য্যগণের অনেকে বৌদ্ধগণকেও 'নাস্তিক' আখ্যা দিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণ-তত্ত্বাধিগম্য "বোধীসত্ত্ব" স্বরূপে ঈশ্বর মানেন, আত্মবিকাশ স্বরূপে ধর্ম্ম মানেন, কেবল বেদোক্ত কর্ম্ম মানেন না; অথচ তাঁহারা আর্য্যাচার্য্যের উক্তিতে নাস্তিক-পদবী পাইলেন। বেদাধীন হিন্দু-ধর্ম্মের সহিত পার্থক্য-সূচক বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-বিশেষত্বটুকু আমাদের কবি-কোকিল জয়দেব গোস্বামীর ঝঙ্কারেই ব্যক্ত হইয়াছে।—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং।
সদয়-হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং।
কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর জয়জগদীশ হরে॥"

হিন্দুর ঈশ্বরের অন্যতম অবতার বুদ্ধদেবই যাঁহাদের ধর্ম্মগুরু, বুদ্ধদেবই যাঁহাদের পরমাত্ম-গুরু এবং আনুষ্ঠানিক আরাধনায় চির-আরাধ্য, ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক তাঁহারা হইবেন কিরূপে? হিন্দুর ঈশ্বরের ষড়ৈশ্বর্য্য বুদ্ধদেবেই বর্ত্তমান। তবেই বুঝা গেল, স্থূলতঃ ও মূলতঃ বেদ-বিমুখতাই ভারতীয় নাস্তিকতা। অগন্মান্য গীতাশাস্ত্রে স্বয়ং ভগবানের মুখে "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" বাক্যে ভগবানের অবতার-স্বরূপে স্বীকৃত মহর্ষি কপিলদেব স্বীয় সাংখ্য-দর্শনে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" সূত্রের মূলতত্ত্ব প্রচার করিয়াও প্রাচীন ভারতে 'নাস্তিক' আখ্যা পায়েন নাই; পরন্তু পরমসিদ্ধ, মুক্তপুরুষ, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগাবতার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আধুনিক সাহেব-আচার্য্য ও বাবু-আচার্য্যগণই কপিলকে 'ঈশ্বর-না-মানার নাস্তিক' বলিতেছেন! এই জন্যই বলি, 'নাস্তিক' শব্দের অর্থ এখন অন্য-রূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে তত্ত্বে আদৌ নাস্তিকতার স্থান বা অবসর অসম্ভব, তাহাতেই এখন নাস্তিকতার সমগ্র অর্থটুকু আসিয়া জমিতেছে! এ কৌতুক কাল-মাহাত্ম্যের ফল ভিন্ন আর কি বলিব? কাল-মাহাত্ম্যে ভারতীয় আস্তিকতা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হইতে "O God! save me, if there is any God" পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ন+অস্তি=নাস্তি,—অর্থাৎ নাই; প্রাচীন ভারতের এই নাস্তিত্ব-সিদ্ধান্তে বেদের অভ্রান্ততা নাই, কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা নাই; পরকাল-পুনর্জ্জন্ম-অদৃষ্ট নাই; এই সকল নাস্তিত্ব-বুদ্ধিই নাস্তিকতা। 'ঐশ-সত্তা-ন-অস্তি' এই-রূপ আধুনিক নাস্তিত্ববাদ স্বাধ্যায়-সন্দীপ্ত আর্য্য-দৃষ্টিতে সার্থক বা স্বাভাবিক নহে। আধুনিক নাস্তিকতাকে সুতরাং এইরূপে স্থাপন করিতে হয় যে, বেদ-বিধি বা পর-লোকাদি স্বীকার দূরে থাক্, সর্ব্বকর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বরকেই অস্বীকার! এত দূর না পৌঁছিলে আর বুঝি ঊনবিংশ শতাব্দীর নাস্তিক হওয়া যায় না; অথচ মানুষের মানুষ-জন্মেও বুঝি এতদূর পিছাইয়া যাওয়ায় যো নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

যাঁহারা বলিতে পারেন, 'আমরা ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক'—তাঁহাদের ঐ বলাতেই প্রকারান্তরে আপনাদের নৈসর্গিক আস্তিকতার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ প্রকটিত হয়। নাস্তিকতার স্বাভাবিক অর্থ এখন অনেকেই আলোচনা করেন না; অস্বাভাবিক অর্থ লইয়াই এখন তর্ক-তরঙ্গ চলিতেছে।

আমাদের বোধ হয়, 'নিরীশ্বরবাদ-নাস্তিকতা' বলিলে, বাক্‌টি উচ্চশাব্দিক (High-sounding) হয় মাত্র, ফলিতার্থে সম্যক্ শূন্যগর্ভ। বর্ত্তমানে কথাটা তর্ক-সিন্ধুর তরঙ্গ-ভঙ্গ-সম্ভূত অসার ফেনাড়ম্বর মাত্র। উহার সমুদ্র-অতল-গর্ভ-তল-রক্ষিত রত্ন অবশ্য অমূল্য আস্তিকতা। ফেনার নীচে জল, জলের নীচে রত্ন, এই ভাবে যথাক্রমে যাঁহারা ফেনা ও জল অতিক্রম করিয়া তল পাইয়াছেন, সেই লব্ধরত্ন ভাগ্যবানেরাই আস্তিক। "নৈষা তর্কেন মতিরাপনীয়া"—তর্ক দ্বারা এই (ব্রাহ্মী) মতি-লাভ হয় না, এই বেদ-বাক্য;—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"—এই বঙ্গ-বিখ্যাত বৈষ্ণবীশিক্ষা-বাক্য, এ সকলেরই তাঁহারা অতীত! অথবা আমাদের ন্যায় ব্রহ্ম-বিমুখ বিষয়াসক্ত বিমুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য ওসব তাঁহাদেরই কৃপা-সিক্ত প্রসাদোক্তি।

ঈশ্বর-অস্বীকার বা জড়-জড়িত-চৈতন্য-সত্ত্বার অস্বীকার প্রভৃতি যে সব পাশ্চাত্য দর্শনের বিষয় এখন দর্শন দিয়াছে, এ সব ভারত-গৃহের নবীন অতিথি! এখানে দার্শনিক বিচারে 'ঈশ্বর-অস্বীকার' কথাটাই অদার্শনিক। ভারতীয় দার্শনিক পরীক্ষার কষ্টীপাথরে কথাটার দার্শনিক ধাতুত্বের কষ্ একেবারেই উঠে না। অতএব ভারতীয় দর্শনের প্রামাণিকনায়কত্ব (Authority) ধরিয়া, পাশ্চাত্য নাস্তিক্য-দর্শনের বিষয়কে পরিষ্কার নিরীশ্বরবাদ না বলিয়া, জড়বাদ, স্বভাববাদ, অনাত্মবাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ বা পাশ্চাত্য-মায়াবাদ প্রভৃতি বলিলেই যেন অপেক্ষাকৃত সঙ্গত হয়। অবশ্য শব্দের ভৌতিক সত্তায় কিছু আসে যায় না, কিন্তু উহার অর্থগত ভাব-সংস্কার ধরিয়াই মানুষের বাগ্বিন্যাস করিতে হয়, তাই 'নিরীশ্বরবাদ' শব্দটাতেও আপত্তি-অনুভব অসম্ভব নয়।

ঈশ্বর-নামানা কথাটা ইদানীং যত্র তত্র যে ভাবে ব্যবহৃত হয়, প্রকৃতপক্ষে সে ভাবের নাস্তিক কে হইতে পারে? পাশ্চাত্য পুরাণের স্বয়ং "সয়তান"ও ঈশ্বর-বিরোধী মাত্র,—ঈশ্বরাস্তিত্ব-অস্বীকারকারী নহে। একভাবে সয়তান বরং সর্ব্বপ্রধান আস্তিক! নচেৎ তাহার সয়তানত্বই অসিদ্ধ বা অসার্থক। ভারতের বড় বড় ঈশ্বর বিরোধী হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস প্রভৃতি 'ভয়ানক' আস্তিক! আস্তিকতার দৃঢ়তাতেই বিরোধিতার দৃঢ়তা,—নাস্তির সহিত আবার বিরোধ কি? আহা! ইহার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিয়াই ভারতীয় পুরাণবেত্তা মহর্ষিগণ উক্ত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে "শত্রুভাবের সাধক" বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। আস্তিকতার উগ্র আতিশয্যের উদ্দীপ্ত উত্তেজনায় শত্রুভাবের সাধনায় শীঘ্র "প্রাপ্তি,"—ইহাও আর্য্যশাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত। (শত্রুভাবের সাধনারূপ

আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ অপূর্ব্ব তত্ত্ব প্রবন্ধান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল) অতএব বলিতে ইচ্ছা হয়, পাশ্চাত্য নিরীশ্বর-বাদের মতে ঈশ্বরের ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে! বিলাতীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার শ্রাদ্ধ-শান্তি করিয়া অবসর লইয়াছেন! অথবা "শত্রুভাবের সাধনা" থাকুক্ না থাকুক্, মাত্র বিরোধিতার হিসাবে নব্য নাস্তিকেরা হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকেও অতিক্রম করিয়াছেন! ফলে আস্তিকদর্শনের আধ্যাত্মিক অণুবীক্ষণে তাঁহারা আদৌ নিরীশ্বরবাদীই নহেন; তাঁহারা জড়শক্তিবাদ প্রভৃতির অনায়াস-অবলম্বী আস্তিক। তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য শাক্ত। প্রাচীন স্বয়ম্ভু (শিব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক ও আধুনিক স্বয়ম্ভু (স্বভাব)-সীমন্তিনী শক্তির সাধক, উভয়েরই উপাসনা-প্রণালী বিভিন্ন হইলেও, সূক্ষ্মবিচারে মূল ও স্থূল আস্তিকতাপক্ষে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

শুনিয়াছি, এক নব্য-নাস্তিক-সভাগৃহে "God is no where" লিখিত এক প্রকাণ্ড নিদর্শন-ফলক (Sign-board) স্থাপিত ছিল; একদিন এক বর্ণপরিচয়ের ছাত্র সরল বালক তাহাতে অকস্মাৎ "God is now here" পড়িয়া ফেলিল! এই নগণ্য ঘটনাতেই নাকি সেই সুগণ্য নাস্তিক সভায় আস্তিকতার আকস্মিক প্রবল প্রবাহ বহিল!—সভার অস্তিত্ব ভূত-সাগরে ভাসিয়া গেল। এ জাতীয় গল্প আরও অনেক শুনা যায়। কোন নাস্তিক নাকি কৌতুকে একটা কুকুরকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া, Dog উল্টাইয়া God দেখাইতে গিয়া, সেই কুকুরেরই তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে তৎক্ষণাৎ আস্তিক-চূড়ামণি হইয়াছিলেন! অতএব এ সব 'বাত-পত্র'বৎ নাস্তিকতা ও আস্তিকতার চিন্তা-চর্চ্চা কেবল মনের ও ক্ষণের অপব্যবহার মাত্র। ফলে জড়োন্নতিশালিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতা জ্ঞানের বুভুক্ষায় যতই ভারতের সংস্রবে শনৈঃ শনৈঃ আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকিতেছে, ততই তাহার জড়বাদ বা ভাববাদ-দর্শনাদির নিঃসত্ত্ব-নাস্তিকতা নীরবে তিরোহিত বা আস্তিকতায় পরিণত হইতেছে। অনেকে অনুমান করেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃতচর্চ্চা, গীতার প্রবল প্রচার, মোক্ষমূলর প্রভৃতির সন্দর্ভ, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা, থিয়সফিষ্ট্ সম্প্রদায়ের কার্য্য, এই সমস্তের সমবেত অনুকূলতা অবলম্বনে অধুনা উক্ত প্রতিক্রিয়া ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ বেগে প্রসারিত হইতেছে।

একটু 'সেকেলে-ধরণের' একটি প্রবীণ পুরুষ একদিন আধুনিক নিরীশ্বরবাদিতার কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "বাবা! ঈশ্বরকে অন্ততঃ পেশাদারী হিসাবেও মেনে রাখা ভাল। যেহেতু যদি ঈশ্বর মানি, আর ঈশ্বর না থাকেন, তবে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, আর না মানি, তবেইত গোলের কথা; অতএব এই ঈশ্বর-নামামাটা খাঁটি নাস্তিকতা হউক না হউক, খাঁটি বোকামী বটে।" আস্তিকতার কল্পিত শত্রু উনবিংশ শতাব্দীর এই নিরীশ্বরবাদের প্রতিকূলে ইহা ভিন্ন আর কি অস্ত্র-প্রয়োগ হবে? "কল্পিত শত্রু" কেন বলিলাম? না প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ ঈশ্বরাস্তিত্ব

অস্বীকারের 'বোকামী' মানব-হৃদয়ে একরূপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। যিনি মুখে বলেন বা সন্দর্ভে লেখেন "ঈশ্বর মানিনা"—তিনিও একটা কিছু জগতের হেতুরূপে মানেন। যাহা মানেন, তাহাই ঈশ্বর। "Unknowing—Unknowable" যে কেবল স্পেন্সার-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, তাহা নহে; তাহার বহু-যুগ যুগান্ত পূর্ব্বে আর্য্যর্ষিদের "অবাঙ্মনসোগোচরম্" প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্য ঘোষিত হইয়াছিল। তবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞান-যোগে আর্য্য-ব্রহ্মতত্ত্বের নির্গুণ-স্বরূপই অজ্ঞেয়, কিন্তু ভক্তি-যোগে স্বগুণ-স্বরূপ সতত সুজ্ঞেয়। আর পাশ্চাত্য দার্শনিক ব্রহ্মতত্ত্ব স্বগুণ-স্বরূপ-কল্পনাতেই অজ্ঞেয়; এইহেতু আয়ুর্ব্বেদোক্ত 'গদোদ্বেগ' তুল্য আধুনিক নিরীশ্বর-বাদ এই অজ্ঞেয়তা-বাদ প্রভৃতিরই নিরাশ-পরিণাম-বিশেষ। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মজ্ঞানের শৈশব-সন্তান সূতিকাগৃহে একরূপ অনেক "পেঁচো-পাঁচী"র অধিষ্ঠান! তবে কিনা, ভগবদিচ্ছায় ভারতীয় আর্য্যর্ষি-ওঝার তন্ত্র-মন্ত্র ইদানীং দিন দিন ইহার বিলক্ষণ রক্ষা-কবচ হইয়া উঠিতেছে।

স্বভাবই সত্য ও স্বয়ম্ভূ; অথবা জগৎ মিথ্যা, মায়িক, কাল্পনিক, ঐন্দ্রজালিক বা স্বপ্নাত্মক—মনোভাবাত্মক, ইত্যাদি যাহাই বলা হউক না কেন, ইহার কোন কথাই ভারতে নূতন নহে; কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-নির্বিশেষ কার্য্য-কারণের অব্যভিচার-সম্বন্ধতত্ত্ব নিত্যপ্রত্যক্ষ বলিয়া, তৎসমস্তেরই কারণ-কল্পনা ঈশ্বরতত্ত্বে পর্য্যবসিত, বুঝিতে হইবে। না বুঝিলেও, এই কারণেই সাধারণ-আস্তিক্যবুদ্ধি মানবদেহধারী মাত্রেরই ক্ষুধিহারিণী ও নৈরাশ্য-নিবারিণী। দ্বীপ-নিবাসী আমমাংসাশী উলঙ্গাঙ্গ পশু মানব হইতে সুসভ্য সুশিক্ষিত সমুন্নত দেব-মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই জগৎ-কারণস্বরূপে কোন না কোন-রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব স্বীকৃত ও সেবিত। তবে অসভ্য জাতির ঈশ্বর না হয় বিকট মূর্ত্তি ভূত, আর তোমার ঈশ্বর না হয় সৌম্যমূর্ত্তি ভূতনাথ। অথবা অসভ্যের ঈশ্বর জড়ত্বময়—অতি স্থূল; আর সভ্যতাভিমানী তোমার—আমার ঈশ্বর না হয় সূক্ষ্ম হইতে হইতে একেবারে 'নিরাকার' হইয়া পড়িয়াছেন! অবশ্য উপাসনাতীত নির্গুণ-ব্রহ্মতত্ত্বে নিরাকারত্ব না বুঝিয়া, উপাস্য সগুণ-ঈশ্বর-তত্ত্বে নিরাকারত্ব-কল্পনাই এই কৌতুক-বাক্যের বিষয়ীভূত। সে যাহাহউক, এতাবতা নৈসর্গিক নিরীশ্বর-নাস্তিকের লক্ষণ-নির্দ্দেশ ন্যায়শাস্ত্র-সংসিদ্ধরূপে কদাচ সম্ভাবিত নহে।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব না মানিলেও ঈশ্বর-মানার বাধা হয় না। কারণ আত্মার দেহময়ত্ব বা দেহ-সর্ব্বস্বত্ব যাঁহার বিধান, তিনিই পরমাত্মা ঈশ্বর। ফলতঃ যে বুদ্ধি ঈশ্বরাভাব-প্রতীতি প্রসব করিবে, সেই বুদ্ধিরূপীই যে তিনি! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।" আর্য্যশাস্ত্রে কিছুই বাকি নাই। আর্য্যশাস্ত্র এই নিরীশ্বরবাদের দাঁড়াইবার স্থল রাখেন নাই।

চিন্তামাত্রেই চৈতন্য-জাত। চিৎ হইতেই চিন্তা; তবে ঈশ্বরাভাব-চিন্তার জনয়িত্রী চৈতন্য কি বিশ্ব-চৈতন্যের অংশীভূত নহে? এ অর্থে ত ঈশ্বরই ভাবেন "ঈশ্বর নাই"! অপিচ, জড়জগতের বস্তু-স্বাতন্ত্র্যগত কোনরূপ সোপাধিক ব্যষ্টি-চৈতন্যের তত্ত্ববোধ সাধারণ-মানব-বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেও, জড়জগতের স্থিতি, গতি, পরিবর্ত্ত, পরিণতি প্রভৃতির নিয়ন্ত্রী সমষ্টি-চৈতন্য-শক্তির সত্ত্ববোধ মানব-জ্ঞান-ক্ষেত্রে নিত্য বিদ্যমান। অতএব যে দিক দিয়াই যাও, এই স্বাভাবিক আস্তিকতার বেড়া-জাল এড়াইবার যো নাই। এ অর্থে সকলেই আস্তিক। মানুষ নাস্তিক নাই।

এক্ষণে কথা এই যে, এরূপ আস্তিকতায় ঈশ্বর-মানার প্রকৃত ফল ফলে না। মাত্র অস্তিত্ব-স্বীকাররূপ ঈশ্বর-মানাকে প্রকৃত ঈশ্বর-মানা বলা যায় না। "মান" শব্দের যথার্থ অর্থ-সাধন বা সার্থকতা-সম্পাদন তাহাতে সম্ভবে না। একজন কুভৃত্য বা কুছাত্র আপন প্রভু বা শিক্ষকের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাদের আদেশ-উপদেশ মানে না। আদেশ-উপদেশ না মানিলেই আদেষ্টা-উপদেষ্টাকে না-মানা হইল। বাধ্যতাই মানা, অবাধ্যতাই না-মানা। সংস্কৃত "মাননা" (মান্যকরা) হইতে অপভ্রংসে বাঙ্গালা "মানা" উৎপন্ন; অতএব মাননীয়ের সত্তা মাত্র স্বীকারেই তাঁহাকে মান্যকরা বা মানা হয় না। "ঈশ্বর-মানা" কথার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বর-সত্তা-স্বীকার নহে,—পরন্তু ঈশ্বরের নিয়ম-বাধ্যতা, বিবেক-বাধ্যতা, শাস্ত্র-বিধান-বাধ্যতা। প্রকৃতির নিয়ম ঈশ্বরের বিধান, বিবেকের প্রেরণা ঈশ্বরের বাণী, বেদাদির আপ্তবাক্য-বিধি ঈশ্বরের আদেশ; সুতরাং মাত্রা বা পরিমাণ যাহাই হউক, মোটের উপর ঈশ্বরে ভক্তি ও অনুরক্তি ভিন্ন যথার্থ ঈশ্বর-মানা হয় না।

প্রকৃত পক্ষে পাপীরাই নাস্তিক, সাধুরাই আস্তিক। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর মানেন, মুখে স্তব করেন, করে জপ করেন, মাথায় প্রণাম করেন, পায়ে দেবালয়ে বা তীর্থে যান, অথচ প্রবৃত্তির পরিতোষণে, রিপুর তর্পণে, স্বার্থের সাধনে, না করেন হেন কর্ম্মই নাই, তাঁহারা যদি আস্তিক, তবে প্রকৃত নাস্তিক কাহারা? আর যাঁহারা হয়ত বাহিরে (মতবাদ-তর্কে) ঈশ্বর মানেন না, পাশ্চাত্য জড়বাদী বা অনাত্মবাদী দার্শনিকের শিষ্য, অথচ সচ্চরিত্র, সত্যবাদী, স্বার্থত্যাগী, পরার্থানুরাগী, উদারচেতা, সর্ব্বসৎকর্ম্ম-নেতা, তাঁহারা যদি নাস্তিক, তবে ঈশ্বরের প্রিয়কারী প্রকৃত আস্তিক কাহারা?

শ্রুতি বলেন,—"তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" ঈশ্বরে প্রীতি ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধনই ঈশ্বরোপাসনা। যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বর-প্রীতি প্রদর্শন করেন, অথচ ঈশ্বরের অপ্রিয় কার্য্যে (পাপে) যাঁহাদের বিরতি নাই, তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতিই নাই, বুঝিতে হইবে। কারণ প্রীতিপাত্রের অপ্রিয়-সাধন প্রেমের ধর্ম্ম নহে; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বরোপাসকই নহেন। মানুষের পক্ষে কখন কখন আপাত-

অপ্রিয়-সাধন প্রেম-ধর্ম্মের বিরোধী হয় না; কারণ সেস্থলে অপ্রিয়ত্ব-বোধ মানুষের অজ্ঞতার ফল মাত্র; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞানময়—স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরে ত অজ্ঞতার কল্পনা সম্ভবে না; এই জন্য স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঈশ্বরের অপ্রিয়-সাধক কদাচ ঈশ্বর-প্রেমিক বা ঈশ্বরোপাসক হইতে পারে না। আর যাঁহাদের ঈশ্বর-প্রীতির বাহ্য-প্রদর্শন নাই, অথচ যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিত্য নিরত, তাঁহাদের আন্তরিক ঈশ্বর প্রীতির অভাব নাই। তাঁহারা যেরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রেরণা-শক্তি বা অনুরক্তি-বশে পুণ্য-পরায়ণ হউন না কেন, ঈশ্বর ধর্ম্মস্বরূপ ও পুণ্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের সেই অনুরক্তিই ঈশ্বরানুরক্তি, সন্দেহ নাই। ফলকথা, প্রকৃত নিরীশ্বরবাদের নাস্তিক যেখানে তত্ত্বতঃ কেহই হইতে পারে না, সেখানে কার্য্যতঃ যে ঈশ্বরের অপ্রিয়সাধক বা পাপকর্ম্মা, সে-ই নাস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানেনা। নামাবলী বা মালার ঝুলী প্রভৃতি তাহাকে আস্তিক করিতে পারে না। আর যে (সংক্ষেপতঃ) তদ্বিপরীত, সে-ই আস্তিক—সে-ই ঈশ্বর মানে। 'মিল্-কম্‌ট্-হক্সলী-টিণ্ডাল্' বাটিয়া খাইলেও সে নাস্তিক হইতে পারে না। পরন্তু, উক্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও কেহই অসম্ভব নিরীশ্বর-বাদের নাস্তিক হওয়া সম্ভবপর নহে। এই প্রত্যক্ষ জগৎ-কার্য্যের কারণত্ব যিনি যেরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই ঈশ্বরতত্ত্ব মানিয়াছেন, বলিতে হইবে। তবে যদি কেহ ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য-দোষে দোষী হইয়া থাকেন, তিনিই ঠিক ঈশ্বর-নামানার নাস্তিক বটে।

উপাসনার লক্ষণ-জ্ঞাপক "তস্মিন্ প্রীতি—"ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের আলোচনায় ঈশ্বর-মানা না-মানা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাশ্চাত্য হিতবাদ (Utilitarianism) অব্যাহত থাকিলেও এক হিসাবে উপাসনার মূলধন আস্তিকতার অস্তিত্ব থাকে। "পুণ্যায় পরোপকারং পাপায় পরপীড়নম্" প্রভৃতি বহু আর্ষবাক্যে হিতবাদের মূলসূত্র ভারতের চিরপরিচিত। হিতবাদ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ, কিন্তু ভজনের বৈধী দীক্ষা-শিক্ষারূপ বীজ-বপন ও তাহাতে ভক্তি-বারি-সিঞ্চন হইলেই উপাসনার অমৃত-তরু উৎপন্ন হইয়া কালে মোক্ষ-ফল ফলে। ঈশ্বর-প্রিয়সাধক পুণ্যবান কর্ম্মযোগী যদি ঈশ্বরোপাসনার মহাজন-নির্দ্দিষ্ট ও শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থার ভক্তিযোগে আনুষ্ঠানিক জপ, তপ, পূজা, আহ্নিক, আধ্যার ও শৌচাচার-পরায়ণ হন, তবে অবশ্য "সোণায় সোহাগা" হয়। তবেই ক্রমে তাঁহার পূর্ণ উপাসকত্ব, পূর্ণ মনুষ্যত্ব, পূর্ণ কৃতার্থত্ব লাভ হয়। সময়ে হয়ত তাঁহার বাহ্য-আনুষ্ঠানিকতা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পূর্ণতার হানি নাই; কারণ তখন যে পরিপূর্ণতা! সাধন যতক্ষণ, ক্রিয়া ততক্ষণ; সিদ্ধিতেই ক্রিয়ার পূর্ণতা বা নিষ্ক্রিয়তা।

ঈশ্বর মানিলে, ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জানিলে, আর পাপ করা চলে না। কোথায় পাপ করিবে? "এ জগতে হেন স্থান নাহিক কোথায়। যথায়

তাঁহার দৃষ্টি পরাভব পায়॥" বেদ-বিঘোষিত সেই "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সন্দীপ্যমান! একজন সাধু বলিয়াছিলেন—"বাবা! খুব পাপ কর, কিন্তু 'ভগা বেটা' যেন টের না পায়।" অতএব ভগবান টের পাইবেন, এ ভয় বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই ত আস্তিক। তিনি ঈশ্বরের অপ্রিয়-কার্য্য-বিমুখ; সুতরাং 'মান' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুসারে তিনিই ঈশ্বর মানেন। ঈশ্বরকে লুকাইয়া পাপ করা যায় না বলিয়া তাঁহার আর পাপ করা হয় না। এ হিসাবে আমরা প্রায় সাধাণতঃ সকলেই নাস্তিক। পাপকারী মাত্রেই নাস্তিক। পাপ না ছাড়িলে আর আস্তিকতার দাবী চলে না। যিনি দম-সাধনে (বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহে) সিদ্ধ হইয়াও, শম-সাধনের (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহের) অবস্থায় অবস্থিত, তাঁহারও দাবী তখন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য। পাপ বাহিরে আসিয়া কার্য্যতঃ ভৌতিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেই মানুষের দৃষ্ট হয়; কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভূত-চিৎ সমান, স্থূল-সূক্ষ্ম অভিন্ন, অন্তর-বাহির একাকার! কারণ তিনি যে দ্বন্দ্বাতীত।

আমরা পার্থিব গুরুজনের সাক্ষাতে সামান্য তামাকটুকুও খাইনা; অথচ বিশ্বগুরু ঈশ্বরের সাক্ষাতে কি পাপ না করিতেছি! যদি তাঁহার সত্তায় বা বিদ্যমানতায় যথার্থ বিশ্বাস থাকিত, অথবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায়—অন্তর্যামিতায় যথার্থ প্রতীতি থাকিত, তবে কি আর আজ এত দীর্ঘ-শ্বাসে হা-হুতাশে পুড়িতে হইত?—এত হাহাকারে—অশ্রুধারে ভাসিতে হইত? মানব-সমাজের সমস্ত দুঃখই কেবল ঈশ্বরকে না মানার—অর্থাৎ ঈশ্বরকে মান্য না করার ফল মাত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র মানিলে এ ফলভোগ অতিক্রম করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ একটি আদুরে ছেলে-বাবুর গল্প মনে পড়িল। বাবু একদিন পল্লীস্থ তাঁহার এক গরিব জ্ঞাতি-জ্যেঠাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"জ্যেঠা মহাশয়! আপনি একটু বারান্দায় যাউন, আমি তামাক খাব।" তিনি অবশ্য উক্ত জ্যেঠা-বেচারীর অস্তিত্ব বিষয়ে পরিষ্কার আস্তিক, কিন্তু জ্যেঠাকে 'মানা'টি তাঁহার কেমন!! সেইরূপ আমরাও সাধারণতঃ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়েই আস্তিক; তারপর তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে বিস্মৃতির 'বারান্দায় বিদায় দিয়া পাপের ধূম লাগাইতেছি। সেই দয়াময়ের প্রতি দয়া করিয়া বাহ্যতঃ তাঁহার অস্তিত্বটি মাত্র স্বীকার করিতেছি। ইদানীং ইহাই আমাদের ঈশ্বর-মানা। এমন বিড়ম্বনাময় 'ঈশ্বর-মানা' হইতে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

পঞ্চদশী।

ভুত-বিবেক।

[৫৭ হইতে ৭১ শ্লোক পর্য্যন্ত সমালোচনা।]

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, সত্যজ্ঞানরূপ অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্যোপরি ভাসমানা কল্পনারূপিণী মায়া (শক্তি) কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ভাসমান হয়।* উহা সত্যজ্ঞানের সহিত অসংস্পৃষ্ট কল্পিত পদার্থ মাত্র; কিন্তু ভ্রান্ত জীবচৈতন্যের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকা হেতু জীবের ভ্রান্তজ্ঞানের নিকট উহা সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদৃষ্টান্তানুরূপ সুধা-ধবলিত সৌধোপরি রঞ্জিত চিত্রের সহিত ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তির বা ইষ্টকের কোন সংস্রব নাই; কিন্তু যদি ভিত্তিস্থ ইষ্টকের আভাস বা প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ সৌধোপরি প্রতিফলিত হয়, তাহাহইলে ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়ার সহিত রঞ্জিত চিত্রের সংস্রব থাকে; যেহেতু ঐ প্রতিবিম্বিত ইষ্টকচ্ছায়া ঐ রঞ্জিত চিত্রের অন্তর্গত।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্যজ্ঞানাবলম্বনে মায়াশক্তি কর্ত্তৃক কল্পিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে, এবং ইহাও প্রমাণিত রহিয়াছে যে, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে, অথবা স্বয়ং অগ্নিও নহে,

* অনাদি অনন্ত নিরাকার সত্যজ্ঞান বা ব্রহ্মচৈতন্য এবং তাঁহার নিরাকার শক্তির বিষয় পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ সত্য জ্ঞানাবলম্বনে মায়া কর্ত্তৃক যখন বিষয় কল্পিত হয়; তখনই ঐ কল্পনার মধ্যে বিষয়ের আকার সূক্ষ্মভাবে প্রকটিত হয়, এবং তাহাই যে অবশেষে স্থূল-ভাবে জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠক পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায় পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন।

সেইরূপ মায়াশক্তি, সদ্ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন তত্ত্ব নহে অথবা স্বয়ং ব্রহ্মও নহে। অতএব মায়া নিস্তত্ত্বা কল্পনাশক্তি মাত্র, প্রমাণিত হইতেছে। ঐ কল্পনাশক্তির কার্য্যই এই বল্পিত জগৎ। উহা কখনই সত্য হইতে পারেনা। যে সত্যজ্ঞানাবলম্বনে এই বিশ্ব কল্পিত হইয়াছে, সেই জ্ঞানের সত্তাতেই বিশ্বের সত্তা ভিন্ন বিশ্বের পৃথক্ কোন সত্তা নাই; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক ব্যাখ্যা কালে জীবের বুদ্ধি, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, এই সপ্তদশ তত্ত্ব পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ বা পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বাদি গুণোৎপন্ন; সুতরাং সূক্ষ্ম বুদ্ধি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত কল্পিত মায়িক জগদন্তর্গত উক্ত বুদ্ধিতে চৈতন্যের আভাস বা বুদ্ধিস্থ চিদাভাসই জীবচৈতন্য। ঐ জীবচৈতন্যই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও দেহ সংসৃষ্ট; অতএব কল্পিত মায়িক পদার্থান্তর্গত ও তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানও কল্পিত এবং ভ্রান্ত। এই জন্য জীবের নিকট মায়িক জগৎ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ; অবকাশ অর্থাৎ শূন্যই উহার স্বভাব। আকাশ সৎপদার্থ নহে; সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। অদ্বিতীয় সৎপদার্থের কেবল সত্তা মাত্র স্বভাব। আকাশে সতের সত্তা এবং তাহার নিজের অবকাশ, এই দুইটী স্বভাব আছে। তদ্ভিন্ন আকাশের প্রতিধ্বনি একটী গুণ আছে, কিন্তু সৎপদার্থে তাহা নাই। সৎপদার্থের একমাত্র সত্তা। ঐ সতের সত্তাতেই আকাশের সত্তা; তদ্ভিন্ন আকাশের নিজের গুণ প্রতিধ্বনি, অতএব আকাশে সত্তা ও প্রতিধ্বনি, এই দুইটি গুণ পরিলক্ষিত হয়। যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশ কল্পনা করে, সেই মায়া সতের সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া, বিপরীতভাবে উভয়ের ধর্ম্মি-ধর্ম্ম কল্পনা করে; সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ হইলেও, আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার, উহা মায়াকল্পিত।

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে:—

(১) আকাশের পৃথক্ সত্তা (অস্তিত্ব) নাই কেন এবং সতের সত্তাতেই (অস্তিত্বেই) আকাশের সত্তার তাৎপর্য্য কি?

(২) সৎপদার্থের প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দগুণ নাই এবং অবকাশ-স্বভাবও নাই। আকাশের যদি নিজের সত্তা (অস্তিত্ব) না থাকে, তবে তাহার প্রতিধ্বনি (শব্দ) গুণ ও অবকাশ-স্বভাব কোথা হইতে আসিল? কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহার গুণ ও স্বভাব আছে, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? উপরোক্ত দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা একত্রে হইবে।

মীমাংসা।

আকাশও যাহা, অবকাশ বা শূন্যও তাহাই; ঐ অবকাশ বা শূন্য একটি ভাব মাত্র। যথায় কোন পদার্থ নাই, এই ভাবের উপলব্ধিই শূন্য; ঐ শূন্য-ভাব-জ্ঞান চৈতন্য হইতে উপলব্ধ হয় এবং চৈতন্য বা জ্ঞানই উহার স্থিতিস্থান; অতএব জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা-জ্ঞান হইতে যে ভাবের বিকাশ হয়, জ্ঞান অবিকাশিত হইলে, সেই ভাবও বিলীন হইয়া যায়। অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একই জ্ঞান-গর্ভে স্থিত; উহা সত্য জ্ঞানাবলম্বনে কল্পনাশক্তির বিকার স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপলব্ধি মাত্র। শক্তির বিকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শক্তি ব্যতীত বিষয়ের বিকাশ অসম্ভব। একটি শক্তি যে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিণত হয়, উহা শক্তির প্রকৃত অবস্থা নহে, বিকৃত অবস্থা। পূর্ব্ববর্ণিত মত ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞানের ন্যায় আকাশজ্ঞান, বায়ুজ্ঞান, তেজজ্ঞান, আপজ্ঞান, ক্ষিতিজ্ঞান; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মানব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জড়, উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু প্রভৃতি জ্ঞান সত্যজ্ঞানের ছায়া অবলম্বনে কল্পনা-শক্তির এক একটি বিকৃত ভাবমাত্র। ঐ ঐ জ্ঞানের অস্তিত্বেই আকাশাদি বিশ্বের অস্তিত্ব। ঐ ঐ জ্ঞানের বিকাশেই বিশ্বের বিকাশ এবং অবিকাশেই বিশ্বের অবিকাশ; অতএব জ্ঞানের বা চৈতন্যের সত্তাই আকাশের সত্তা। জ্ঞান বা চৈতন্যের সত্তা ব্যতীত আকাশের পৃথক্ কোন সত্তা নাই, প্রমাণিত হইল। স্থূল কথা এই যে, যদি জ্ঞানের বিকাশ না থাকে, তবে আকাশাদি কোন পদার্থেরই বিকাশ থাকেনা।

এক্ষণে, যাহার সত্তা নাই, তাহার গুণ কিপ্রকারে সম্ভব, তাহাই কথিত হইতেছে। স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট দহ্যমান গৃহমধ্যে অবশ্যই অগ্নির প্রকাশভাব, উষ্ণ-স্পর্শ ও দহনের শব্দাদি গুণের উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহা আপনার জ্ঞান বা চৈতন্যের উষ্ণ-গুণ নহে। ঐ চৈতন্যের অবলম্বনে যে ভাবের বিকাশ হয়, গুণও সেই ভাবের অঙ্গ বা অন্তর্ভূত গুণমাত্র; সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট অগ্নিময় ভাবের প্রকৃত সত্তা বা সত্যতা না থাকিলেও, ঐ ভাব-সংসৃষ্ট গুণ ঐ স্বপ্নকল্পিত ভাবের সহিত প্রকাশিত হওয়ার বাধা হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, অবকাশ বা শূন্য অর্থে কিছুই নাই; সুতরাং কিছুই নাই, এই অভাবজ্ঞানই শূন্য; কিন্তু শব্দগুণ অভাবজ্ঞান নহে, উহা একটী ভাবের উপলব্ধি; অতএব শূন্য (অভাব) হইতে শব্দগুণ রূপ ভাবজ্ঞান কি প্রকারে হইতে পারে? বা তাহা হইতেই বায়ুরূপ ভাবোপলব্ধি কিরূপে হয়? অবশ্যই অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হইতে পারেনা; যথা "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহা স্বতঃসিদ্ধ বটে, কিন্তু এস্থলে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় নাই; যেহেতু আকাশেরও যেরূপ পৃথক্ সত্তা নাই, বায়ু প্রভৃতি কোন ভূতেরও

সেইরূপ পৃথক্ সত্তা নাই। সতের সত্তাতেই আকাশ ও বায়ু প্রভৃতির সত্তা, তদ্ভিন্ন আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়না। অনন্তজ্ঞান অবলম্বনে কল্পনারূপিণী মায়াশক্তি-প্রসূত একটী ভাবের মধ্যে অন্যান্য ভাব যথাক্রমে স্ফুরিত বা প্রকটিত হয় মাত্র; সুতরাং অভাব হইতে কখনও ভাবের উৎপত্তি হয়না। শূন্যও একটি ভাব, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বস্তুর অভাবই শূন্যভাবের উপলব্ধি। আলোরূপ ভাবের অভাব অন্ধকার বটে, কিন্তু আলোর অভাবও একটি ভাবের উপলব্ধি, তাহার আর সন্দেহ নাই। আলো নাই, এই ভাবটি মনে হইলে, আলোর ভাব এবং তাহার নাস্তিত্ব, উভয়-সংসৃষ্ট ভাবের উপলব্ধি যেমন হয়, সেইরূপ শূন্য বা অবকাশ বলিলে, বস্তু এবং তাহার অভাব, এই সংসৃষ্ট ভাবের স্ফুরণ হয়। অতএব নাস্তিত্ব ভাবের সহিত অস্তিত্ব ভাব আপেক্ষিকরূপে বিজড়িত। অবকাশ বলিলে বস্তুর অবকাশ, নাস্তি বলিলে অস্তির নাস্তি, অভাব বলিলে, ভাবের অভাব বুঝায়। এইজন্য আকাশের সত্তা বায়ু প্রভৃতিতে অনুগমন করে, কিন্তু আকাশ অনুগমন করেনা, কথিত হইয়াছে। সাংখ্য, বেদান্ত-উপনিষৎ এবং পুরাণাদিতে প্রকাশ যে, (সাংখ্যোক্ত) অব্যক্ত প্রকৃতি, পুরুষ সংযোগে বা (উপনিষদ্ ও বেদান্তোক্ত) অব্যক্ত ব্রহ্মশক্তি মায়া চিদাভাসে ব্যক্ত ও মহত্তত্ত্বে (সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্বে) পরিণত হইয়া, সৃষ্ট্যর্থে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সৃষ্ট্যভিমান বা অহঙ্কার, অর্থাৎ ত্রিবিধ প্রবৃত্তি (Tendency) রূপে বিকাশিত হন; তন্মধ্যে তামসিক অহঙ্কার বা প্রবৃত্তি হইতে আকাশাদি পঞ্চভূত কল্পিত হয়।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশ যে,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রত্যক্ষ ও অবিজ্ঞেয় অবস্থায় যেন সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত ছিল„। তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণে আবরিত, সুতরাং বোধাতীত, লক্ষণ দ্বারা অনির্দ্দেশ্য, প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত, অবোধ্য (বোধের যোগ্য নহে) এইরূপ নিদ্রিত অবস্থাপন্ন একটি ভাব ছিল। ঐ অবস্থায় স্বয়ম্ভূ ভগবান অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া, মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমনাশক রূপে প্রকাশিত হইলেন, এবং বিবিধ প্রজাসৃষ্টির নিমিত্ত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও সেই জলে বীজ অর্পণ করিলেন। সেইবীজ হইতে সহস্রাংশু-সমপ্রভ জ্যোতির্ম্ময় অণ্ড প্রসূত হইল। সেই অণ্ডে সর্ব্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন এবং দেবমান সহস্র বর্ষ সেই অণ্ড মধ্যে বাস করিয়া তপ বা ধ্যান-বলে ঐ অণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক, অধঃখণ্ডে পৃথিব্যাদি সপ্ত দ্বীপমধ্যে অষ্ট দিক্ নিত্য অপাংস্থান—অর্থাৎ অর্ণব যুক্ত আকাশ সৃষ্টি করিলেন।*

* আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল ইত্যাদি সৃষ্টি-ক্রম বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বেদ-বেদান্তের মধ্যে ও মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টির আদিতে জল সৃষ্টির উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আকাশরূপ অর্ণব সমুদ্র হইতে বায়ুসৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। এই রহস্য ক্রমে প্রকাশ্য, এবং মৎকৃত সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি প্রবন্ধ শীর্ষক হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ১।২য় সংখ্যার ২৫ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঋক্ ও সাম বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যে প্রকাশ যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সত্য পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন। সর্ব্বত্র রাত্রি (তমোময় অর্থাৎ অব্যক্ত) ছিল; তদনন্তর "অভিদ্ধাত্তপসঃ—অভিদ্ধাৎ—প্রদ্ধরত্তাৎ—তপসঃ তাপাৎ, অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তাপ হইতে অর্ণব—সমুদ্র* উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই অর্ণব—সমুদ্র হইতে বিশ্ব-প্রকটনকারী বশী অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা নিয়মপ্রণেতা বিধাতা উৎপন্ন হইয়া, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, (আকাশ) সূর্য্য, চন্দ্র দিবা, রাত্রি, অয়ন, বর্ষ প্রভৃতি সমস্ত যথাক্রমে কল্পনা (সৃষ্টি) করিয়াছিলেন। সাংখ্য ও বেদান্তমতে আকাশ-সৃষ্টির পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব এবং ত্রিবিধ অহঙ্কার, তিন প্রকার সৃষ্টির কার্য্য প্রবৃত্তি (Tendency) এবং ঐ তিন প্রকার প্রবৃত্তির একতম প্রবৃত্তি হইতে আকাশ-সৃষ্টি দেখিতে পাই।

মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে ভগবানের মহাভূতে কার্য্যপ্রবর্ত্তন, তমনাশক জ্যোতি, অপ্, বীজ ও অণ্ড এবং অণ্ড মধ্যে বিধাতার উৎপত্তি; তদনন্তর স্বর্গ দ্রবীভূত আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির সৃষ্টিপ্রকরণ দেখিতে পাই। বেদোক্ত সন্ধ্যাবন্দনার মধ্যেও প্রায় তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। উপরোক্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ সমূহ শক্তির বিকার হইলেও, শক্তির মধ্যে ঐ সকল পদার্থ সূক্ষ্মভাবে চিরকালই আছে। যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ, গর্ভস্থ শুক্র-শোণিতের মধ্যে জীবের প্রকাণ্ড দেহ-বুদ্ধি-মন এবং মানসিক ও শারীরিক বৃত্তি ও ভাব সমস্তই সূক্ষ্মভাবে থাকে; যেমন নিদ্রাকালে জাগরণকালের সমগ্রভাব সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যক্ত শক্তি বা প্রকৃতির গর্ভে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত এবং ভৌতিক জগৎ সূক্ষ্মভাবে লুক্কায়িত থাকে। পরে চিদাভাসে প্রকৃতি বা শক্তি জাগরিত এবং প্রকৃতির অন্তর ব্রহ্মতেজে দ্রবীভূত হইলে, ঐ চিদ্‌বীজ কর্ত্তৃক তাহার গর্ভাধান হয়; তখন শক্তি বা প্রকৃতিমাতা সূক্ষ্ম জগৎরূপ অণ্ড প্রসব করেন এবং সেই অণ্ড মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত মানসিক তেজরূপী ধাতা কর্ত্তৃক আকাশ, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক স্থূল জগৎ কল্পিত ও দৃষ্ট হয়। পাঠক! একবার একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করুন যেন কিছুই নাই, আপনিও বিশ্বব্যাপী অচৈতন্যে বা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন; হঠাৎ যেন একটু কম্পনবৎ হইয়া ঐ অচৈতন্যের মধ্যে মানসিক তেজ হইতে ঈষৎ একটু জ্ঞানজ্যোতির আভাস বাহির হওয়ায়, ঐ তেজের আভাসে আপনার বিশ্বব্যাপী মানসিক ভাবময় দেহ যেন দ্রবীভূত

* ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তাপ অর্থে ব্রহ্মশক্তি, ঐ 'অভিদ্ধাত্তপসঃ' অর্থে পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তেজ নহে, উহাই ব্রহ্মতেজ; অর্ণব সমুদ্র অর্থে কারণ-বারি, ঐ কারণ-বারি পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ ভূতের চতুর্থ ভূত (জল) নহে। ঐ চতুর্থ ভূত জল আদি ভৌতিক পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত কারণ-বারি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে মানসিক ও ভৌতিক সমুদ্র পদার্থের কারণরূপিণী মাতৃস্থানীয়া বা সৃষ্টিপ্রবৃত্তির দ্রবীভূত অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে উহা ক্রিয়া-প্রবর্ত্তক সূক্ষ্ম উপাদান-কারণ হইতেছে। ঐ উপাদান-কারণই সংসারের বিধাতার যোনি স্বরূপ।

হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে আপনার মন যেন ঐ দ্রবীভূত ভাবের মধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিল। তখন যেন আপনি ঐ নিদ্রার ঘোরে সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্রবীভূত অবকাশ দেখিতে লাগিলেন। ঐ দ্রবীভূত পরমাণুর মধ্যে অবকাশ থাকায়, উহাদের গতির প্রসার ও পরস্পরের মধ্যে (Friction) ঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায়, ঐ অবকাশের মধ্যে শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। অবশ্যই বস্তুর মধ্যে অবকাশ বা ফাক না থাকিলে, পরস্পর সংঘর্ষণ বা শব্দের উৎপত্তি হইতে পারেনা। বস্তুর মধ্যে ফাক বা ছিদ্র না থাকিলে, সেই বস্তু কখনই গতিবিশিষ্ট হইতে বা নড়িতে পারেনা। নড়ার অর্থই গতি (Motion); ঐ গতি না হইলে বা নড়িতে নাপারিলে, সংঘর্ষণ বা শব্দ অসম্ভব; অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে ছিদ্র না থাকিলে, vibratory motion কখনই হইতে পারেনা। অতএব ছিদ্র বা আকাশ হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। আকাশেরই শব্দগুণ প্রমাণিত হইতেছে। আপনি যে নিদ্রার ঘোরে আকাশ ও শব্দ অনুভব করিলেন, উহা আপনার মানস-শক্তির বিকার বা মানসিক কল্পনা নহে কি? ঐ আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে মানসিক অস্পষ্ট ভাবের ঈষৎ বিকাশ হইয়াছিল, সেই মানসিক ভাব কর্ত্তৃক আকাশ-কল্পনা হয়নাই কি? এখন আপনার উপরোক্ত ভাবের সহিত বেদান্ত, সাংখ্য ও মনু প্রভৃতির সৃষ্টিতত্ত্ব একবার মিল করিয়া দেখুন, তাহাহইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আকাশ-কল্পনার পূর্ব্বে যে অস্পষ্ট ভাব, উহা মানস-শক্তির ভাব মাত্র; উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দগুণযুক্ত আকাশ বা অবকাশই আদিভূত। তৎপূর্ব্ববর্ত্তীভাব আপনার বাহ্য ভাব নহে; উহা আপনার মানস-অন্তর্ভূত বা কল্পনাশক্তির অন্তর্গত; তদ্ধেতু মায়াশক্তির প্রথম কার্য্যই আকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে এবং উপরোক্ত শাস্ত্রাদির সহিত নিজের যুক্তি ও বিজ্ঞান খাটাইয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই; সতের অর্থাৎ চৈতন্যের সত্তাতেই আকাশের সত্তা। ঐ আকাশ যে কল্পনারূপিণী মায়াশক্তির প্রথম বিকাশ বা প্রথম কার্য্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অতএব আকাশ নিস্তত্ত্ব, সাব্যস্ত হইল। এক্ষণে বায়ু প্রভৃতির বিষয় কথিত হইবে। অর্থাৎ আকাশের সহিত সদ্বস্তুর (চৈতন্যের) যেরূপ সম্বন্ধ, বায়ু প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈরাগ্যানুশাসনম্।

ন সংসারোৎপন্নে বিষয়মনুপশ্যামি কুশলং
বিপাকঃ পুণ্যানাং জনয়তি ভয়ং মে বিমৃশতঃ
মহদ্ভিঃ পুণ্যৌঘৈশ্চিরমপি গৃহীতাশ্চ বিষয়া
মহান্তো জায়ন্তে ব্যসনমিবদাতুং বিষয়িণাম্ ॥১॥

সংসারোৎপন্ন দ্রব্যে কোন কুশলদ্রব্য দেখিতে পাইনা, পুণ্যের পরিণাম চিন্তা করিতেই আমার ভয় উৎপন্ন হয়। মহৎ পুণ্যসমূহদ্বারা প্রচুর বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; উহা বিষয়ীদিগকে বিপদ দিবার জন্য আসিয়া থাকে। [শিখরিণী বৃত্ত]। ১॥

ভ্রান্তা দেশমনেক দুর্গ বিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপকর্ম্মপিশুনে নাদ্যাপি সন্তুষ্যসি ॥২॥

অনেক দুর্গম দেশ ভ্রমণ করিয়াও কিঞ্চিৎ ফল পাইলাম না; উচিত জাতিকুলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া বৃথা প্রভুর সেবা করিলাম; পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কার সহিত মান ত্যাগ করিয়া আহার করিলাম; হে পাপকার্য্য-প্রলোভিনী তৃষ্ণে! এখনও তুমি উৎপন্ন হইতেছ ? অদ্যাপি সন্তুষ্ট হইতেছনা ? [শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ]। ২॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাম্পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্ত কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চ মাম্ ॥৩॥

এই স্থানে ধন আছে, এই অনুধাবন করিয়া পৃথিবী খনন করিলাম, পর্ব্বতের গৈরিকাদি ধাতু আনিবার জন্য চিন্তা করিলাম, সমুদ্র পার হইলাম, যত্নে রাজাকে সন্তুষ্ট করিলাম; মন্ত্র আরাধন জন্য ব্যগ্রমন হইয়া শ্মশানে রাত্রি যাপন করিলাম, কিন্তু কাণা-কড়াও প্রাপ্ত হইলাম না। হে তৃষ্ণে! এক্ষণ আমাকে ত্যাগ কর। [ঐ বৃত্ত]।৩॥

খলোল্লাপাঃ সোঢ়াঃ কথমপি তদারাধনপরৈঃ
নিগৃহ্যান্তর্বাষ্পং হসিতমপি শূন্যেনমনসা।
কৃতশ্চিত্তস্তম্ভঃ প্রতিহতধিয়ামঞ্জলিরপি
ত্বমাশে! মোঘাশে! কিমুপরমতো নর্ত্তয়সি মাম্ ॥৪॥

খল ব্যক্তির আরাধনায় তৎপর হইয়া তাহাদের বাক্য কোনরূপে সহ্য করিলাম, হৃদয়াভ্যন্তরে অশ্রুবারি অবরুদ্ধ করিয়া শূন্যমনে হাস্য করিলাম, মনে ধৈর্য্য ধারণ করিলাম; তাহাদের বাক্যে আমার বুদ্ধিও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তথাপিও তাহা-দিগকে অঞ্জলি করিলাম। হে আশে! হে বৃথা-আশে! এক্ষণও আমাকে কেন আর নৃত্য করাইতেছ? [শিখরিণী বৃত্ত]। ৪॥

অমীষাং প্রাণানাং তুলিতবিসিনীপত্রপয়সাং
কৃতে কিম্নাস্মাভির্বিগলিতবিবেকৈর্ব্যবসিতম্।
যদাঢ্যানামগ্রে দ্রবিণমদনিঃসঙ্গমনসাং
কৃতং বীতব্রীড়ৈর্নিজগুণকথাপাতকমপি ॥৫॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী এই প্রাণের জন্য আমরা হতবুদ্ধি হইয়া কি না করিলাম, যেহেতু ধনমদে বিবেকশূন্য ধনী লোকের অগ্রে নির্লজ্জ হইয়া নিজগুণ-কথারূপ পাতকও করিলাম! [ঐ বৃত্ত] ॥৫॥

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেবভুক্ত-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ ॥৬॥

স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয় ভোগ করিলাম না, কিন্তু আমরা (কালদ্বারা) ভুক্ত হইলাম, কোন তপস্যাচরণ করিলাম না, কেবল আমরা সন্তাপ প্রাপ্ত হইলাম; কাল গেলনা, আমরাই গেলাম, অর্থাৎ জীবন শেষ করিলাম; তৃষ্ণা জীর্ণা (ক্ষয়প্রাপ্ত) হইলনা, আমরাই জীর্ণ হইলাম, অর্থাৎ জরাপ্রাপ্ত হইলাম। [উপজাতিবৃত্তম্] ৬॥

বলিভির্মুখমাক্রান্তং পলিতৈরঙ্কিতং শিরঃ।
গাত্রাণি শিথিলায়ন্তে তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে ॥৭॥

মাংস-সঙ্কোচ-রেখাদ্বারা মুখ ব্যাপ্ত হইল, পলিত (জরাজনিত শুক্লতা) দ্বারা মস্তক অঙ্কিত হইল, গাত্র শিথিল হইল, কিন্তু একা তৃষ্ণা নিত্য-নবীনা হইতেছে! [অনুষ্টুবৃছন্দঃ] ৭॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষ বহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো দুষ্টঃ কায়স্তদপি মরণোপায়চকিতঃ ॥৮॥

ভোগেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, মনুষ্যের বহুমানও নষ্ট হইয়াছে; প্রাণতুল্য সমবয়স্ক বন্ধুগণ এককালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; আস্তে২ যষ্টিদ্বারা উত্থিত হইতেছি; চক্ষু ঘন অন্ধকার দ্বারা আবৃত হইল, অর্থাৎ চক্ষে আর দেখিতে পাই না; অহো! দুষ্ট শরীর তথাপি মরণোপায় হইতে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়। [শিখরিণী] ।৮॥

আশানামনদী মনোরথজলা তৃষ্ণাতরঙ্গাকুলা
রাগগ্রাহবতী বিতর্কবিহগা ধর্ম্মদ্রুমধ্বংসিনী।
মোহাবর্ত্তসুদুস্তরাতিগহনা প্রোত্তুঙ্গচিন্তাতটী
তস্যাঃ পারগতা বিশুদ্ধমনসো নন্দন্তি যোগীশ্বরাঃ ॥৯॥

আশা নাম্নী নদী, উহাতে মনোরথ রূপ জল, উহা তৃষ্ণা রূপ তরঙ্গ দ্বারা ব্যাপ্ত, উহাতে বিষয়ানুরাগ রূপ জলজন্তু ও বিতর্ক রূপ পক্ষী আছে, উহা ধর্ম্ম রূপ বৃক্ষ-ধ্বংসিনী; অজ্ঞান রূপ আবর্ত্তদ্বারা সুদুস্তর ও অতি গভীর; উহাতে উন্নত চিন্তা রূপ তটী আছে; বিশুদ্ধমন যোগীশ্বরগণ উহার পারে গমন করিয়া আনন্দ লাভ করেন। [শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দ] ।৯॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চরত্নং।

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্ম্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥ ১০॥

মদদ্বারা হস্তী, পদ্মদ্বারা জল, পূর্ণচন্দ্রদ্বারা রাত্রি, স্বভাবদ্বারা স্ত্রীলোক, বেগের দ্বারা ঘোটক, নিত্যোৎসবে মন্দির, ব্যাকরণ দ্বারা কথা, হংসযুগলদ্বারা নদীসকল, পণ্ডিত দ্বারা সভা, সৎপুত্রদ্বারা কুল, রাজাদ্বারা পৃথিবী ও বিষ্ণুদ্বারা ত্রিলোক শোভাপায়। ১

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তদ্‌ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাস্তি ভগ্নোদ্যমঃ॥ ২॥

দুস্তর সমুদ্র পার হইবার জন্য জাহাজ, অন্ধকারে দীপ, বায়ুশূন্যকালে ব্যজন, মদান্ধ হস্তীর দর্পনাশ জন্য অঙ্কুশ; পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তু নাই, যাহার উপায় নাই; কিন্তু দুর্জন ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি হরণে বিধাতাও ভগ্নোদ্যম হইয়া থাকেন। ২॥

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যুদ্ধে কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তি শীঘ্রং বুধাঃ॥ ৩॥

পানরত বৈদ্য, কুশিক্ষিত নট, বেদাধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণ, যুদ্ধে কাপুরুষ, বেগশূন্য ঘোটক, মূর্খ পরিব্রাজক, কুমন্ত্রিদ্বারা বেষ্টিত রাজা, উপদ্রুত দেশ, যৌবনগর্ব্বিতা পররতা ভার্য্যা, এই সকলকে জ্ঞানীলোক শীঘ্র ত্যাগ করেন। ৩॥

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলং।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জনঃ কিমুধনৈর্বিদ্যানবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণেন কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥ ৪॥

যদি ক্ষমাগুণ থাকে, তাহাহইলে কবচে আবশ্যক কি? যদি মনুষ্যের ক্রোধ থাকে, শত্রু আবশ্যক কি? যদি জ্ঞাতি থাকে, অগ্নি আবশ্যক কি? যদি সুহৃৎ থাকে, উত্তম ঔষধে প্রয়োজন কি? যদি দুর্জন থাকে, তাহাহইলে সর্পে আবশ্যক কি? যদি উত্তম বিদ্যা থাকে, তাহাহইলে ধনে প্রয়োজন কি? যদি লজ্জা থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি কবিতা থাকে, রাজ্যে প্রয়োজন কি? ৪॥

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ সূর্য্যাতপঃ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন চপলো দণ্ডেন গো-গর্দ্দভৌ।
ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈরনুদিনং মন্ত্রপ্রভাবাদ্‌বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥ ৫॥

জলদ্বারা অগ্নি, ছত্রদ্বারা রৌদ্র, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশদ্বারা হস্তী, দণ্ডদ্বারা চঞ্চল গো-গর্দ্দ[illegible] প্রতিদিন বৈদ্যের ঔষধদ্বারা ব্যাধি, মন্ত্রপ্রভাবে বিষ, সকলেরই শাস্ত্রবিহিত ঔষধ আ[illegible] কিন্তু মূর্খের ঔষধ নাই। ৫॥

ষড়ুরত্নং।

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি পরিচিন্তনীয়ং
আরাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌচ কুতো বশিত্বম্॥ ১॥

শাস্ত্রকে চিন্তা করিলেও পুনঃ২ চিন্তা করিতে হইবে, রাজাকে আরাধনা করিলেও শঙ্কা করিতে হয়, যুবতি অঙ্কস্থিতা হইলেও রক্ষা করিতে হয়; শাস্ত্র, রাজা ও যুবতিকে কে বশ করিতে পারে? ১॥

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদো নাগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কোবা দুর্জ্জনবাগুবানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥ ২॥

অর্থ প্রাপ্ত হইয়া কে গর্ব্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ীর আপদ না হয়? সংসারে স্ত্রীদ্বারা কার মন খণ্ডিত (আকৃষ্ট) না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রিয়? কোন্ ব্যক্তি শমনের দৃষ্টি-পথে পতিত না হয়? কোন্ প্রার্থী গৌরব প্রাপ্ত হয়? কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জনের জালে পতিত হইলে মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে? ২॥

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবান্ তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যঃ
লোকে যড়েতানি বিড়ম্বিতানি। ৩॥

ব্রাহ্মণ মূর্খ, বৃদ্ধ গৃহস্থ, দরিদ্র কামী, তপস্বী ধনবান, কুরূপা বেশ্যা, কদর্য্য নৃপতি, সংসারে এই ছয়টি বিড়ম্বনা। ৩॥

দানং দরিদ্রস্য প্রভোশ্চ শান্তিঃ
যূনাং তপো জ্ঞানবতাঞ্চ মৌনম্।
ইচ্ছানিবৃত্তিশ্চ সুখাসিতানাং
দয়াচ ভূতেষু দিবং নয়ন্তি॥ ৪॥

দরিদ্রকে দান, প্রভুর (সামর্থ্যশালী ব্যক্তির) ক্ষমা, যুবার তপস্যা, জ্ঞানীর মৌন, সুখাসী ব্যক্তির ইচ্ছা-নিবৃত্তি, সর্ব্বজীবে দয়া, এই সকল গুণ স্বর্গভোগ করায়। ৪॥

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ণদর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্ত্রীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি ॥ ৫ ॥

নীতিদোষ কোন্ দুর্ম্মন্ত্রি-রাজাকে না আশ্রয় করে? রোগ কোন্ কুপথ্যভোজীকে না পীড়া দেয়? ঐশ্বর্য্য কাহাকে উদ্ধত না করে? মৃত্যু কাহাকে নিধন না করে? স্ত্রী-নিমিত্ত বিষয় কাহাকে দুঃখিত না করে? ৫ ॥

লোভোঽস্ত্যস্তি পরেণ কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ সুমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।
সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচিমনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্‌বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥৬॥

যদি লোভ থাকে, শত্রু তদধিক কি করিবে? যদি খলতা থাকে, অন্য পাতকের প্রয়োজন কি? যদি সৌজন্য থাকে, অন্য গুণের প্রয়োজন কি? যদি মহত্ত্ব থাকে, ভূষণে প্রয়োজন কি? যদি সত্য থাকে, তপস্যার প্রয়োজন কি? মন যদি শুচি হয়, তীর্থে প্রয়োজন কি? যদি সদ্‌বিদ্যা থাকে, ধনে প্রয়োজন কি? যদি অপযশ থাকে, মৃত্যুতে প্রয়োজন কি? ৬॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু।

পূর্ব্বসংখ্যায় পূর্ব্বপক্ষের প্রতিকূলে এবং সাংখ্যপ্রবচনের অনুকূলে যুক্তি-জালের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপেরও আপেক্ষিক আলোচনা করা গিয়াছে। এখন আপত্তিকারীর অপরাপর যুক্তিগুলিরও একটু একটু রহস্যভেদ করিতে চেষ্টা করা যাউক। গৌড়পাদস্বামী সাংখ্যকারিকার একটী ভাষ্য রচনা করেন; তিনিও স্বকীয় গ্রন্থে সাংখ্যপ্রবচনের বিদ্যমানতা লিখেন নাই। ইহাতেও সাংখ্য-প্রবচন আধুনিক বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। এই বাদীসিদ্ধান্তের সমাধানে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, গৌড়পাদ, সাংখ্যকারিকাই কাপিল-নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়া নিতান্ত নির্যুক্তিক নয়, কেননা তিনি এক-জন বেদান্তিসম্প্রদায়ের লোক। পরমতে একখানিমাত্রগ্রন্থ দেখিতে পাইয়া তিনি

মনে করিলেন, সর্ব্বত্র "কপিল" সাংখ্যমত-প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; এই কারিকা-গ্রন্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ সাংখ্য-সিদ্ধান্তই দেখিতেছি, অতএব ইহা কপিল-প্রণীত সাংখ্যকারিকা, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের মত মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইত না। উহা স্বসম্প্রদায়ের শিষ্যাদি-দ্বারা প্রচারিত হইত মাত্র। ভিন্ন-মতাবলম্বীরা কেবল বিচার কালে তত্তন্মতব্যাখ্যা অবগত হইতে পারিতেন। যত দিন তাঁহারা অকপটে ঐ গ্রন্থের পঠন-পাঠনাদি-ব্যবহার প্রবর্ত্তিত না করিতেন, ততদিন ছাত্রত্ব স্বীকার করিলেও, তাঁহারা গ্রন্থের অধিকারী হইতেন না। কেননা ভিন্ন-সম্প্রদায়ের লোককে পুস্তক-প্রদান ব্যবহার-বিরুদ্ধ ছিল। এই সকল কারণে গৌড়পাদ সাংখ্যকারিকা প্রাপ্ত হইয়াও নিঃসংশয়রূপে উহার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন নাই; প্রত্যুত প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। গৌড়-পাদ কারিকা-ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামে অভিহিত করিয়া আন্তরিক সংশয়ের আভাস প্রদান করিয়াছেন। প্রকরণ-গ্রন্থের ব্যাখ্যা "ভাষ্য" বলিয়া কথিত হয়না। ভাষ্য-গ্রন্থের লক্ষণ-পর্য্যালোচনায় * আমরা দেখিতে পাই, যেখানে সূত্রানুযায়ী পদদ্বারা সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং (আবশ্যকানুসারে) স্বোক্তপদেরও ব্যাখ্যা করা হয়, ভব্যবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে "ভাষ্য" বলিয়া জানেন। কারিকাকে যদি সূত্র বলিতে পারা যায়, তাহাহইলে গৌড়পাদের ব্যাখ্যান "ভাষ্য" নাম ধারণের কথঞ্চিৎ উপযোগী হইতে পারিবে; কিন্তু তাহার আবার মহান্ অন্তরায় উপস্থিত; "সূত্র" বলিলেই "সূত্র" হয় না। তাহা আবার "স্বল্পাক্ষর" "অসন্দিগ্ধ" এবং "সারবৎ" প্রভৃতি বিশেষণ ক্র স্ত হওয়া চাই। কারিকা যে কত স্বল্পাক্ষর-রচিত, তাহা যিনি "আর্য্যার" সহিত পরিচিত, তিনি সহজেই বুঝিবেন। গৌড়পাদ মহোদয়ের বিশ্বাসানুসারে উহাতে অসন্দিগ্ধতাও নাই। মাণ্ডুক্য কারিকায় তিনি তাহার অল্পাধিক পরিচয় দিতেও ক্রটী করেন নাই, সুতরাংই তাঁহার "ভাষ্য" নাম দিবার কারণ অনুসন্ধেয়। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-সূত্রের "ভাষ্য" দেখিতে পাওয়া যায়। পণিনি-সূত্রেরও "মহাভাষ্য" আছে। কারিকা "প্রকরণ" না হউক, "সংগ্রহ"—তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ কারিকাকার স্বয়ংই উহাকে "প্রকরণ" বলিবার আভাস দিয়াছেন, পরে প্রমাণীকৃত হইবে।

গৌড়পাদ উহাকে সূত্রই মনে করিয়াছিলেন, তাহার বীজও আছে। সূত্রের লক্ষণ রক্ষা করিয়াই সর্ব্বত্র সূত্র রচনা করা হয়, এরূপ নহে। ন্যায়-বেদান্তাদি দর্শনে এরূপ সূত্র বিরল নহে, যাহার অক্ষর-সমষ্টি অনুষ্টুপ-ছন্দের শ্লোকগত-বর্ণ-সমূহ-অপেক্ষা অধিক। বিশেষতঃ স্বল্পাক্ষরের সংখ্যাও অবধারিত নহে। বেদমন্ত্রের ও গীতা-শ্লোকের ব্যাখ্যানকে "ভাষ্য" নামই দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু গৌড়পাদকৃত-

*সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।

মাণ্ডূক্যকারিকারও শঙ্করাচার্য্য "ভাষ্য" রচনা করিয়াছেন। তাহারা কেহই "সূত্র" নাম ধারণে যোগ্য নয়। শঙ্করদেবের সময় হইতে "ভাষ্য" নাম, লক্ষণের "গণ্ডী" ছাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করে। তৎসময়ে ও পরবর্ত্তী সময়ে অনেক লোকের হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, "ভাষ্য" নাম দিলে "ব্যাখ্যান" গৌরবান্বিত হয়। পূর্ব্ব-তন-রাজকর্ম্মচারী—"আনন্দ রাম বড়ুয়া বাহাদুর"ও ভবভূতি-বিরচিত মহা-বীর চরিতের "রামজানকী ভাষ্য" রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্তানুমানের সার্থক্য-সম্পাদন করিয়া ছিলেন। যাহাহউক, যদিও শঙ্করের সময় হইতে "ভাষ্য" পদের উচ্ছৃঙ্খল-প্রয়োগ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি গৌড়পাদের সময়ে অত স্বচ্ছলতা ছিলনা, কাজেই তিনি কারিকাকে কপিল-রচিত-সূত্র বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলেন। গৌড়পাদ ভাষ্যারম্ভে কপিলাচার্য্যকে মাত্র নমস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন; বাচস্পতি মহাশয় কিন্তু 'ঈশ্বর-কৃষ্ণ" পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন * গৌড়পাদ প্রথমে কপিলকে নমস্কার করিয়া, পরে কপিল ব্রহ্মার পুত্র, তিনি নিত্য-সিদ্ধ-জ্ঞানৈশ্বর্য-সম্পন্ন, ইহাও বলিয়াছেন। তদনন্তর ভাষ্যভূমিকা-রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যথা—"এবং স উৎপন্ন সন্ অন্ধে তমসি মজ্জজ্জগদালোক্য সংসার পারম্পর্য্যেণ সৎকারুণ্যো জিজ্ঞাসমানায় আসুরি গোত্রায় ব্রাহ্মণায় ইদং পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানাং জ্ঞানমুক্তবান্ যস্য জ্ঞানাৎ দুঃখক্ষয়ো ভবতি। পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ। জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ। তদিদমাহুঃ, দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসেতি।" তৎপর কারিকা ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি যদি অবগত থাকিতেন যে, "ঈশ্বরকৃষ্ণ" এই কারিকার রচয়িতা, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশে একটী নমস্কার-বাক্য প্রয়োগ না করিয়া থাকিতেন না। প্রথমতঃ কপিল সাংখ্য-জ্ঞান বলেন, ইত্যাদি বলিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম মাত্রেরও উল্লেখ না করিয়া ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হওয়াতে বোধ হয় কপিলই গ্রন্থকার। গৌড়পাদ-ভাষ্যের প্রত্যক্ষর অনুসন্ধান করিলেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়না। সকল টীকা-ভাষ্যকারগণই গ্রন্থকারের উদ্দেশে নমস্কারে সম্মান প্রকাশ না করিলেও, অগত্যা গ্রন্থকে তদ্রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না। এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশেও অমনোযোগ করা প্রচলিত-প্রথাবহির্ভূত। সুতরাং অনুমান করা যায়, গৌড়পাদের বিশ্বাস, গ্রন্থকার কপিলাচার্য্য; কাজেই তিনি তাঁহাকে নমস্কার করিয়াই কৃতজ্ঞতার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন, মনে ভাবিয়াছিলেন। গৌড়পাদের বাক্য হইতে আমরা ইহার নিভৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার প্রথম বাক্য এই,——"কপিলায় নমস্তস্মৈ যেনাবিদ্যাম্বুধৌ জগতি মগ্নে, কারুণ্যাৎ সাংখ্যময়ী নৌরিব বিহিতা প্রতরণায়।" অর্থাৎ সেই কপিলকে নমস্কার করি, যিনি, জগৎ অজ্ঞানার্ণবে মগ্ন হইলে, করুণাপরায়ণ হইয়া প্রতরণার্থে নৌকার ন্যায় সাংখ্যময়ী-কারিকা-নৌকা রচনা করেন। 'প্রতরণায় নৌরিব সাংখ্যময়ী

*কপিলায় মহামুনয়ে মুনয়ে শিষ্যায় তস্য চাসুরয়ে, পঞ্চশিখায় তথেশ্বরকৃষ্ণায়ৈতে নমস্যামঃ। (সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী।)

বিহিতা' এইটুকুর সহিত অধ্যাহৃত "কারিকা" পদের অন্বয় করিতে হইবে। 'সাংখ্যময়ী বিহিতা' বলিলে 'কি' তাহা বলা হইলনা, বাক্য অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল।

যদি বলা যায় "প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা", তাহাহইলে "ইব" শব্দ দ্বারা যে সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হয়, তাহার উপায় কি? এখানে—নদ্যাদি প্রতরণায় নৌরিব অবিদ্যাম্বুধি-প্রতরণায় সাংখ্যময়ী নৌর্বিহিতা, এইরূপ তাৎপর্য্যে পদপ্রয়োগ, বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, 'অবিদ্যাম্বুধৌ'—এই যে অবিদ্যাকে অম্বুধিরূপে রূপণ করা হইল, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষার্থে নৌকারূপে কোন কিছুর রূপণ আবশ্যক। নৌকায় অম্বুধি পার হওয়া যায়, কিন্তু অবিদ্যা-পারে কিছু একটা চাই; তাহা কারিকাদি সাংখ্যশাস্ত্র ভিন্ন আর কি? বলা যাইতে পারে, 'সাংখ্যময়ী' এই শব্দে স্বরূপার্থে "ময়ট্" প্রত্যয় করিয়া "সাংখ্যরূপ নৌকা" এই অর্থ করা যাউক, তাহা হইলে রূপক অব্যাহতই রহিল। এখানে বিচার্য্য এই যে, যদি 'সাংখ্য'শব্দে "আত্মানাত্মবিবেক" বুঝিতে হয়, তবে কপিল তাহার বিধান করা অসঙ্গত। আত্মানাত্মবিবেক অনাদি কাল হইতে ব্রহ্মাদির নিকট পরিচিত। বিষ্ণুও যোগনিদ্রায় "আত্মানাত্মবিবেকার্থ"ই অবস্থান করেন। কপিল তাহার বিধান লিপিবদ্ধ করিতে পারেন, অথবা অপরকে উপদেশ দিতে পারেন। তাহা হইলে সেই তত্ত্বোপদেশরূপ সাংখ্যকে আমরা গ্রন্থই বলিব, কেননা পূর্ব্বকালে সম্প্রদায়সিদ্ধ সূত্রোপদেশকে গ্রন্থ বলা হইত। এখন সেই গ্রন্থ কি, তাহার নির্দ্দেশ অবশ্যক। গৌড়পাদ "প্রবচনাদি গ্রন্থ" অবগত ছিলেন না, তাহাতে তাঁহার ভাষ্যই প্রামাণ সুতরাং তিনি কারিকাকেই "কাপিল সাংখ্য" বলিয়া জানিতেন, বলিতে হইবে। সত্য সত্যই কপিলাচার্য্য "আত্মানাত্মবিবেক-পূর্ণ নৌকা" গড়িয়াছিলেন না; কাজেই বলা যাইতে পারে, "সাংখ্যময়ী কারিকা নৌর্বিহিতা"।

আরও দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরকৃষ্ণ যে কারিকায় আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সে কারিকা গৌড়পাদ জানিতেন না। "শিষ্য পরম্পরয়াগতমীশ্বরকৃষ্ণেন চৈতদার্য্যাভিঃ সংক্ষিপ্তমার্য্যমতিনাসম্যগ্বিজ্ঞায়সিদ্ধান্তং॥" এই কারিকার ব্যাখ্যা গৌড়পাদ আদৌ করেন নাই। তাহার পূর্ব্ব কারিকার (এতৎ পবিত্রমগ্র্যং ইত্যাদির) ও ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি ৬৯তম কারিকা ব্যাখ্যা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, তিনি অবশিষ্ট কারিকার সন্ধান রাখিতেন না। গ্রন্থ শেষে এরূপ উপক্ষিত হওয়া সঙ্গত নয়। আরও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির-জ্ঞাপক ও গ্রন্থকারের-পরিচায়ক শ্লোক অবশ্যই ব্যাখ্যাত হওয়া আবশ্যক। ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যার পর গৌড়পাদ মহাশয় একবার "স্পষ্টং" লিখিয়াও দায়িত্বের কর হইতে মুক্তি পাইতে পারিতেন, যদি তাঁহার নিকট অপর কারিকা পরিচয় রাখিত। উক্ত কারিকার ব্যাখ্যানের পরই তিনি লিখিতেছেন, "সাংখ্যং কপিলমুনিনা প্রোক্তং সংসার-বিমুক্তি-কারণং যত্রৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যা ভাষ্যং চাত্র গৌড়পাদকৃতং।" এখানেও ঈশ্বর কৃষ্ণের নামোল্লেখ

নাই। গ্রন্থকে কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস থাকায়, তিনি "সপ্তত্যৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" লিখিয়াছেন। তবে সর্ব্বাংশে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বলা যায় না। তাহাহইলে তিনি "প্রোক্তং" না বলিলেও পারিতেন। আমাদের অনুমানানুসারে "প্রোক্তং" বলাই যুক্ত হইয়াছে, কারণ তত্ত্বোপদেশকথন ভিন্ন পুস্তকাকারে কপিল-বাক্য কপিল স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান বলিয়া বোধ হয়না। এখানে সকলেরই মনে রাখা উচিত, গৌড়পাদের সংশয়-সমর্থনোদ্দেশেই একথা বলা হইল। কারিকাকারে তত্ত্বকথন-মতে আমাদের সহানুভূতি নাই। ঈশ্বরকৃষ্ণ স্বয়ংই সে সংশয়াপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

এখন বিবেচনা করা উচিত, ৬৯তম কারিকার ব্যাখ্যা করিয়া গৌড়পাদ মহোদয় "সপ্তত্যৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ" একথা লিখিলেন কেমন করিয়া? ব্যাখ্যা করিলেন ৬৯টীর, লিখিলেন ৭০টীর কথা? এ অসামঞ্জস্য নিবারণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আশঙ্কার সমাধানে বলিব, তিনি ৭০তম কারিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন না, কিন্তু সাংখ্য-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, ৭০তম কারিকায় কপিল হইতে সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়; ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য তিনি শেষ শ্লোকে "সাংখ্যং কপিল মুনিনা প্রোক্তং" ইত্যাদিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। সমগ্র ৭০তম কারিকা জানা থাকিলে, তিনি কপিলের কথা লিখিয়াই নিরস্ত হইতেন না; পঞ্চশিখ পর্য্যন্ত বলা উচিত হইত।

কেহ কেহ এখানে বলিয়া থাকেন, ৭০তম কারিকা তিনি সম্পূর্ণই জানিতেন, কিন্তু আসুরি বা পঞ্চশিখ-কৃত গ্রন্থাদি না পাওয়ায়, তাঁহাদের নামোল্লেখ করেন নাই। এ গ্রন্থকে তিনি কপিল-প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ৭০তম কারিকা কপিলের সময়ে রচিত নয়, উহার প্রণেতা পঞ্চশিখ। যখন সাম্প্রদায়িকতারক্ষা আবশ্যক হইল, পঞ্চশিখ বহুতর গ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তিনি কপিলর্ষি-মতানুসারে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, স্ববুদ্ধি-বৈভবে নয়, ইহা প্রতিপাদনার্থই কপিল-রচিত কারিকা গ্রন্থের পশ্চাতে ৭০তম কারিকা যোজনা করেন। বাস্তবিক পক্ষে কারিকা-গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত নয়। উহা কপিল-প্রণীত। বেদান্তিসম্প্রদায় কপিলের নাম উঠাইয়া দিলে গ্রন্থের গৌরব থাকিবেনা মনে করিয়া উহা 'ঈশ্বরকৃষ্ণ' নামে প্রচার করেন। এই কার্য্য গৌড়পাদের পর সময়ে সংঘটিত হয়। তখনই ৭১তম কারিকার রচনা হয় এবং 'ঈশ্বরকৃষ্ণ' নাম তাহাতে যোজনা করা যায়। বলা অধিকন্তু, এই সম্প্রদায় "সাংখ্য প্রবচনাদির" প্রামাণ্য এবং কপিল-কর্ত্তৃকত্ব স্বীকার করেন না। আমাদের মতে উহা "আঁধার ঘরের সাপ"—প্রমাণ পাইয়া মত-প্রচার করিতে হইলে সকলেই উহাকে ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত বলিয়া মানিবেন। বেদান্তিসম্প্রদায়ের ঐরূপ কার্য্যের কোনও সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাপি সংগৃহীত হইতে পারে নাই। তবে সাম্প্রদায়িকতার মূলে কত কি দুর্ঘটনা নিহিত আছে, তাহা অবধারণ করা দুষ্কর।

অনেকে স্বতন্ত্র পন্থাবলম্বনে শঙ্কা-সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মতের যুক্তিযুক্ততা নির্ব্বাচন করিতে সহৃদয় পাঠকবর্গের উপরই ভারার্পণ করিলাম। তাঁহাদের মত এই যে, ৬৯টী কারিকা সত্ত্বেও "সাংখ্যসপ্ততি" নামের ব্যাঘাত নাই। তখনও "সপ্ততিরার্য্যাঃ" শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। চণ্ডীর সংজ্ঞা "সপ্তশতী"। বাস্তবিক "চণ্ডী"তে সপ্তশত শ্লোক নাই; অনেক কম আছে। যদি "রাজোবাচ" "ঋষিরুবাচ" প্রভৃতিও একটী একটী শ্লোকরূপে পরিণত হয়, এবং দুই চরণেও শ্লোক-নিষ্পত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইচ্ছামত (৭০০) সাত শত অথবা (৮০০) অষ্টশত শ্লোকে "চণ্ডী"কে বিভক্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহা ঘটিল কৈ? শ্লোক যে আবার চতুশ্চরণ হওয়া চাই। "পদ্যং চতুষ্পদং তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা" এই প্রমাণ এবং "তত্র পদ্যং চতুষ্পদং" এই প্রমাণ-বলে চারি চরণ-বিশিষ্টকেই "পদ্য" বলা যায়। "পদ্য" ও "শ্লোক" একই কথা। "পদ্যে যশসিচ শ্লোক"—এই অভিধানবাক্য ইহার প্রমাপক। অতএব চণ্ডীর "সপ্তশতী" নাম রূঢ় বলিতে হইবে; না হয় অপর শ্লোক গুলি সময়-বশে বিলুপ্ত হইয়াছে, বলিতে হইবে। এপক্ষে কারিকাও দুই একটী বিলুপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। আর সামান্য একটু কমি-বেশীতে নামের অন্যথা হয় না, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। "শতক" গ্রন্থে (শান্তিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতিতে) শতাধিক শ্লোক (১০৮হইতে ১১১টী পর্য্যন্ত) বিদ্যমান থাকাতেও তাহার নামের অন্যথা ঘটিতেছেনা। এ সকল দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে, ৬৯ শ্লোক থাকিলেও "সপ্ততি" নাম অনর্থক নয়; কেননা আধিক্য সত্ত্বেও নাম অব্যাহত থাকিলে, ন্যূনতা সত্ত্বে থাকিবেনা কেন? পাঠক-মহোদয়গণের ধৈর্য্যচ্যুতিভয়ে আমাদিগের বলিতে হইল—"সপ্তৈতাঃ সপ্ততিরার্য্যাঃ"—এইরূপ বিশেষ করিয়া লেখাতেই সন্দেহের উদয় হয় না। শতকগ্রন্থে শতাধিক শ্লোক থাকিলেও শত শ্লোক পরিচয়ের বাধা জন্মে নাই। সপ্তশতীতে বলা হয় নাই যে, এখানে সপ্তশত শ্লোক বিদ্যমান আছে। চণ্ডীর "সপ্তশতী" সংজ্ঞাকে "রূঢ়" বলিতেও পারা যায়; কিন্তু এখানে প্রত্যক্ষরূপে ৭০টী উল্লেখ করিয়া আবার থুথু গিলিবার উপায় কি? কম হইলেও সংজ্ঞার অন্যমত হয়না, ইহার দৃষ্টান্ত মিলিল না বলিয়াই বোধ হইতেছে। একমাত্র স্থল "সপ্তশতী"—সেখানেও মহর্ষিগণ কিরূপ প্রণালীতে শ্লোক গণনা করিতেন, তাহা আবিষ্কৃত না হইলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না।' "রূঢ়" সংজ্ঞা বলিলে ত সকল আপদ চুকিয়া গেল।

আমাদের অভিপ্রায়ানুসারে গৌড়পাদের নিকট শেষোক্ত কারিকাটী অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ অপরিজ্ঞাত ছিল বলিলেই গৌড়পাদের সন্দেহ দৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইবে, সন্দেহ নাই। তৎকালে ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট গ্রন্থের অনেকাংশ অপরিচিত থাকিত, ইহা আশ্চর্য্য নহে। যখন একখানি গ্রন্থের ৭।৮ জন ভাষ্যকার সূত্র লিখিতে ঐক-

সত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই, তখন বিভিন্ন দলের লোকের নিকট প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত থাকা অসম্ভব কি? পাতঞ্জল দর্শনের চতুর্থ পাদের * একটী সূত্র ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৃত্তিকার ধারেশ্বর ভোজরাজ মহাশয় সূত্রটীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত নহেন। এক সম্প্রদায়ের দুই জনের সাময়িক অগ্র-পশ্চাতে এত বিশৃ-ঙ্খলতা ঘটিয়াছে। যাঁহাদের সম্প্রদায়গত ঐক্যটুকুও নাই, তাঁহাদের পক্ষে যে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও বিভিন্নমততা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, গৌড়পাদস্বামী স্বয়ং যে কারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহারই প্রকৃত রচনাকারী কে, ইহাও তাঁহার নিশ্চিতরূপে জানা ছিলনা! তিনি যে সংখ্যপ্রবচনের সংবাদ জানিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে প্রবৃত্তি জন্মেনা। প্রাচীন কালের যে সকল তত্ত্ব অতীতের গভীর তলে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সামান্য মাত্র স্ববুদ্ধি-খনিত্রে উদ্ধার করিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ হওয়ার উপক্রম কিনা, জানিনা; তবে এই মাত্র বলিতে পারি, ঋষিগণের হৃদয়ের অমূল্যরত্ন গুলি বিলীন হইয়াছিল, যদি পরভাগ্যে তাহার কথঞ্চিৎ উদ্ধার হয়, তবে তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন না করা কর্ত্তব্যের বাহিরে। এ মত উপহসিত হউক, তাহাতে আপত্তি নাই। আগামীতে আমরা পূর্ব্ববাদীর অপর যুক্তির বিষয়ে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

* কৈবল্য ভাষ্যমতে "নচৈকচিত্ততন্ত্রং বস্তু তদপ্রমাণকং স্যাৎ তদাকিং" এই সূত্র সন্নিবিষ্ট আছে। বৃত্তিকার এই সূত্রের উল্লেখ করেন নাই।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

(জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।)

সমুদ্র-মন্থন।

——:০:——

বেদ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, সমুদ্র ও সাগর শব্দ বেদে অধিকতরস্থলে আকাশ-র্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (১) এবং বেদাঙ্গ নিরুক্তশাস্ত্রে (১৪। ১৫)"অন্তরীক্ষ নামানি সগর-মুদ্র" উল্লিখিত আছে, এবং পুরাণে জল শব্দ কারণ-বারি অর্থে ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট ২) হয়; সুতরাং মহর্ষিগণ পুরাণে সমুদ্র-মন্থন বর্ণন কালে সমুদ্র ও সগর শব্দ আকাশ-র্থে ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, এবং সমুদ্র-মন্থন অর্থে আকাশ-মন্থন বুঝিলে, পাখ্যানটী সঙ্গত ও সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়; এবং মন্থন-উৎপন্ন রত্নগুলি দেব-সমীপে য়নপথে গমন করিতে পারে। সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানটীর প্রকৃত অর্থ এই যে, প্রাচীন ালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল। বেদ-বিহিত যাগ-জ্ঞাদির কাল-নির্ণয় অভাবে যাগ-যজ্ঞ ভারতে লুপ্ত হইল। জ্যোতিষশাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার না দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল। উভয় পক্ষ সমবেত হইয়া আকাশ মন্থন করিলেন। দরপর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তিপাত-বিন্দুতে সর্পাকৃতি বিষুবরেখা সংযোজিত হইল, এবং মান্বয়ে গোলার্দ্ধরূপী দিবারাত্রি আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া গোলক বিলোড়িত মথিত করিল। ক্রমে জ্যোৎস্নারূপিণী লক্ষ্মী সহ শশাঙ্কের অবস্থিতি-স্থান রাশি-ক্র নির্ণীত হইল, এবং খগোল মধ্যে সুরভিরূপিণী পৃথিবীর অবস্থিতির স্থান রাকৃত হইল। কৌস্তভরূপ ধ্রুবতারা বিরাটমূর্ত্তির হৃদয়ে স্থাপিত হইল, এবং হ-নক্ষত্রগণ রাশিচক্রের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। আবার 'সাবন' কাল যথো-তরূপে নির্ণীত হইতে লাগিল। যাগ-যজ্ঞাদি পুনরায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ন্বরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।

---

(১) সুদাসে দস্রা বসু বিভ্রতা রথে পৃক্ষো বহতমশ্বিনা। রয়িং সমুদ্রা দুত দিবস্পর্যস্মেধত্তং পুরুস্পৃহম্॥ ১।৪৭।৬ ঋক্

(ক) সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ ইতি সায়নঃ।

(২) উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডং গোলকে জলে। প্রকৃতি খণ্ড, ২। ০

মহর্ষি পরাশর বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনের উপসংহার বর্ণনায় অতি চাতুর্য্যের সহিত বলিতেছেন,—

ততঃ প্রসন্নভাঃ সূর্য্যাঃ প্রযযৌ স্বেন বর্ত্মনা।
জ্যোতীংষিচ যথা মার্গং প্রযযুর্মুনিসত্তম॥ বিষ্ণুপুরাণ-১। ৯।১১২

মহর্ষি ব্যাস-লিখিত সমুদ্রমন্থন-সমাপ্তি প্রতিভাশূন্য, যথা—

ততো দেবাস্ততো জগ্মুঃ আদিত্যপথমাশ্রিতাঃ।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অষ্টাদশ অধ্যায়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে সূর্য্য স্বামী এবং চন্দ্র পত্নী বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং বেদেও তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত আছে, যথা—

স মিথুনং উৎপাদয়তে রয়ীঞ্চ প্রাণঞ্চ এতে মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ।
ইতি প্রশ্ন উপনিষৎ। ৪।

অসমাপ্ত।

প্রজাসৃষ্টি-কামনায় ব্রহ্মা, চন্দ্র-সূর্য্য দম্পতীরূপে সৃজন করেন, এবং সূর্য্য-চন্দ্র হইতে মনু, মনু হইতে মানব-জাতির সৃষ্টি হয়। ফলিতজ্যোতিষ-মতে যদ্যপি চন্দ্র স্ত্রী-গ্রহ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু চান্দ্রমাস গণনাপে চন্দ্র, নক্ষত্র বা তারাপতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, এবং চন্দ্রের এই স্ত্রী-পুরুষ—উভয় প্রকৃতির রক্ষার জন্য পৌরাণিকগণ চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রের জ্যোতিঃ স্বতন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। সমুদ্রমন্থন হইতে চন্দ্রবিম্বের "লক্ষ্মী-সহজ" নাম হইল, যথা—

দাক্ষায়ণী-পতিঃ লক্ষ্মী সহজশ্চ সুধাকরঃ। ইতি শব্দরত্নাবলী।

চন্দ্রবিম্ব তারাপতি হইলেন, এবং লক্ষ্মবারিণী জ্যোৎস্নারূপিণী চন্দ্রিমা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণু-প্রিয়া বা সূর্য্য-পত্নী রহিলেন। বৈদিক প্রাচীন পদ্ধতি এবং পৌরাণিক নব পদ্ধতি, উভয়ের সামঞ্জস্য হইল।

অদ্যাপি গ্রীনল্যাণ্ডবাসী ইস্কিমো জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে, সূর্য্য স্বীয় পত্নী চন্দ্রিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুগ-যুগান্তর ধাবমান রহিয়াছেন, কিন্তু কখনও চন্দ্রিমা স্পর্শ করিতে পারেন নাই, এবং মিথুনদ্বয়ের এই ক্রীড়া উপলক্ষেই পৃথিবীতে দিবা-রাত্রি হইতেছে।

"সূর্য্যসিদ্ধান্ত" আদি জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহণের যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অয়নবৃত্ত ও চন্দ্র-কক্ষাবৃত্ত পরস্পর তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। চন্দ্রের কক্ষাবৃত্তের এক অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের উত্তরে এবং অপর অর্দ্ধাংশ অয়নবৃত্তের দক্ষিণে অবস্থিত, এবং অয়নমণ্ডল ও চন্দ্র-কক্ষার ছেদ-বিন্দুদ্বয়কে 'পাত' বলে। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখায় অমাবস্যার অবসানে চন্দ্র-সূর্য্য অবস্থিত হইলে, সূর্য্য-গ্রহণ হয়। ঐ পাত-বিন্দুদ্বয়ের যোগরেখার মধ্যস্থলে সূর্য্যবিম্ব অবস্থিত

থাকে ; ঐ যোগরেখাকে রাহু কল্পনা করিলে, সূর্য্যবিম্বরূপ সুদর্শন দ্বারা রাহু দ্বিখণ্ডিত হইতেছে, বলা যাইতে পারে, এবং পাত-বিন্দুদ্বয়ের একটী বিন্দুকে রাহু ও অপর বিন্দুকে কেতু বলা যাইতে পারে ; অথবা ঐ উভয় বিন্দুকে রাহু, এবং সর্পদেহবৎ পৃথিবীর ছায়া মধ্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে, চন্দ্রগ্রহণ হয় বলিয়া, ঐ ভূচ্ছায়াকে কেতু বলা অসম্ভব নহে। এইরূপ অর্থ করিলে, সমুদ্রমন্থনে রাহুর অমরত্বলাভ এবং সুদর্শন দ্বারা রাহু-ছেদন, উভয় ব্যাপারই সঙ্গত এবং বেদাঙ্গীভূত জ্যোতিষশাস্ত্রানু-মোদিত হয়।

আর একটী কথা বলিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। মহামতি রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তের ৩য় মন্ত্র এবং ১১০ সূক্তের ৮ম মন্ত্র হইতে পৌরাণিকগণ সমুদ্রমন্থনের উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন।

অনুবাদ সহিত মন্ত্র দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ত্বংহ্যঙ্গ দৈব্যা পবমান জনিমানি দ্যুমত্তমঃ অমৃতত্বায় ঘোষয়ঃ।৩

অস্যার্থ।

হে সোম! তোমার ন্যায় উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতা-বংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।

দিবঃ পীযূষং পূর্ব্যং যৎ উক্থ্যং মহঃ গাহাৎ দিবঃ আনিঃ অধুক্ষত
ইন্দ্রং অভি জায়মানং সম্ অস্বরন্।৮

অস্যার্থ।

প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদিগের প্রিয় বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গ-ধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল।

বিশ্বাস ও কার্য্য।

———:o:———

ভগবানের কার্য্যময় জগতে বিশ্বাসই জীব-জীবনে সর্ব্বকার্য্যের পরিচালক। আবার বিশ্বাসও কার্য্যদ্বারাই পরিচালিত—পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হয়। কার্য্য হইতেই বিশ্বাস উৎপাদিত এবং বিশ্বাস হইতেই কার্য্য কৃত হয়। ফলিতার্থে কার্য্য ও বিশ্বাস পরস্পর সাপেক্ষ-সম্বন্ধ-বদ্ধ (co-relative); অতএব কার্য্য-বিরুদ্ধ যে বিশ্বাস, সে অবিশ্বাস, এবং বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কার্য্য, সে অকার্য্য।

কার্য্য-কারণ পরস্পর সাপেক্ষ। এরূপও বলা যায় যে, কার্য্যের কারণ 'কারণ' এবং কারণের কারণ 'কার্য্য'। ইহাই 'বীজাঙ্কুর-ন্যায়'। বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে পর্য্যালোচিত হইবে যে, বিশ্বাসই কারণ এবং কার্য্যই কার্য্য; সুতরাং বিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই কার্য্য এবং অবিশ্বাসরূপ কারণ হইতেই অকার্য্য উৎপন্ন হয়। অধুনা আমাদের এই অনাথ-অনভিভাবক দীন-দুর্ব্বল সমাজ উক্তরূপ অকার্য্য-ভারে প্রতিনিয়ত প্রপীড়িত হইতেছে। আমাদের এই জরা-জীর্ণ সন্তাপ-শীর্ণ সমাজ-শরীরে এইরূপ অকার্য্যের বিষাক্ত সংক্রামকতা বিষম বেগে বিস্তারিত হইতেছে।

বিশ্বাস একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ, সেই কার্য্যই অকার্য্য। কখনও ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার ফল 'সু' হইলেও, বিশ্বাস-বিরুদ্ধতা-জনিত কপটতা হেতুক সেই কার্য্য কর্ত্তার অশুভ-অদৃষ্ট-উৎপাদক অকার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে, সরল বিশ্বাস-অনুরূপ কার্য্যের ফল কর্ত্তার উদ্দেশ্যাতীতভাবে 'কু' হইয়া পড়িলেও, তাহাতে তাঁহার অকাপট্যজন্যই অশুভ অদৃষ্ট সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ঘটেনা। এইজন্য একজন সরল-বিশ্বাসানুসারী মূঢ়কার্য্যকারী অসভ্যজাতীয়ের অপেক্ষা একজন বিশ্বাস-বিরুদ্ধাচারী বিষম কাপট্যকারী সভ্যজাতীয়ের অদৃষ্ট অধিকতর অপ্রসন্ন। সেরূপস্থলে সেই অসভ্য যদি যায় নরকে, তবে সেই সভ্য যান মহানরকে। অসভ্য যদি পায় পশুত্ব, সভ্য পান তবে কৃমি-কীটত্ব!

অধুনা আমাদের সভ্যতাভিমানী ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে, বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপটকার্য্য-কারীর—সোজা কথায়—কপটাচারীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি রাজ-নৈতিক, কি বৈষয়িক, প্রত্যেক বিভাগেই এই কপটাচারের প্রবল প্রসার পরিলক্ষিত হইতেছে। এই কপটাচারের করাল কালকূটে আমাদের জাতীয় জীবন জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহাতে এ জাতির উঠিবার আশা উঠিয়া যাইতেছে; পড়িতে পড়িতে দেশময় পড়িবার আর্ত্তনাদই পড়িয়া গিয়াছে। তবলার চাটি. বেণু-বীণার তান, সংগীতের ঝঙ্কার, বক্তৃতার হুঙ্কার ভেদ করিয়া সে করুণ ক্রন্দন সাধু-সহৃদয়ের মানস-শ্রুতিপটে বজ্রবৎ বাজিতেছে।

যে জাতির মনে এক, মুখে আর, কাজে অন্য; যে জাতির অনেক বিষয়েই কায়মনোবাক্যে ঐক্য নাই, যে জাতির বিশ্বাস ও কার্য্য সামঞ্জস্যশূন্য বা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতন একান্ত অনিবার্য্য। বিশ্বাস ও কার্য্যে পরস্পর প্রতিকূলতার প্রাবল্যই আসন্ন জাতীয় মৃত্যুর প্রকট পূর্ব্বলক্ষণ।

কোন কবি বলিয়াছেন,—

"বিশ্বাস-বনিতা চেষ্টা, তার গর্ভ-রসে,
জনমে জারজ কর্ম্ম কাপট্য-ঔরসে।"

বিশ্বাস-বিরুদ্ধ যে কপট-কর্ম্ম, কবি তাহাকে "জারজ কর্ম্ম" বলিয়াছেন। জারজ জান যেরূপ কুল-দূষক, জারজ কর্ম্মও তদ্রূপ সমাজ-দূষক; সুতরাং এই উভয়

জারজের জনয়িতাই প্রায় তুল্য পাপভাগী। হায়! সমাজে মূর্ত্তিমান কাপট্যরূপী জারজকর্ম্ম-উৎপাদয়িতাগণের উৎপাতে আমাদের এই ধুক্-ধুক্ জাতীয় জীবনটুক্ যায় যায় হইয়াছে।

প্রথমেই ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের বিষয় আলোচ্য; কেননা ধর্ম্মই সত্য ও সরলতা-স্বরূপ। মানবাত্মার মহাশত্রু কাপট্যের একমাত্র সংহারক ধর্ম্ম; অতএব ধর্ম্মনৈতিক বিভাগেই যদি কাপট্য স্থান পাইয়া থাকে, তবে তদিতর বিভাগসমূহে যে তাহার একাধিপত্য হইবে, তাহা ত স্বতএব স্বীকার্য্য। কিন্তু হরি হরি! অধুনা সেই ধর্ম্ম-বিভাগেরই কপটাচার অন্য সকল বিভাগকে পরাস্ত করিয়াছে! ভাল জিনিস নষ্ট হইলে অতি মন্দই হয়। পচা মাছ খাইবার লোক অনেক আছে, পচা দুধ খাইবার লোক পাওয়া কঠিন। অন্তর্দর্শী সাধুগণ গৃহী-লোকালয়ে প্রকাশ্য ধর্ম্ম-বিভাগেই কাপট্যের প্রবল পৈশাচ লীলা দেখিয়া, কেবলমাত্র "ঈশ্বরেচ্ছা" স্মরণ করিয়াই মনের সংক্ষোভ সংবরণ করেন।

ধর্ম্মনৈতিক বিভাগের একটি উদাহরণ কল্পনা করুন। ধরুন, আমি নিরাকার-বাদী ব্রাহ্ম, আপনি সাকারবাদী হিন্দু। আপনি আপনার সরল বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরের মূর্ত্তি-বিগ্রহ ধ্যানে পূজাদি করিতেছেন; আমিও আমার সরল বিশ্বাসানুসারে সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ ঈশ্বরত্বের আরোপ কল্পনা করিয়া, তাঁহারই গুণমাত্র চিন্তারূপ ধ্যানে ব্রহ্মোপাসনা হইল, ভাবিতেছি। এ স্থলে আমরা উভয়েই অন্ততঃ অকাপট্য জন্য অনিন্দিত। কিন্তু যদি ব্রাহ্ম-আমি ঠিক একটি আধুনিক কৌতুক-কবিতার বর্ণনার মত—

> "নিরাকারবাদের ঝঙ্কার ঝাড়ি মুখে;
> গোপনে মনসা-ঘটে আসি মাথা ঠুকে!
> দুরন্ত বসন্তকালে শীতলার দ্বারে—
> পলকে প্রণাম সারি চেয়ে চারিধারে।
> কালীর করাল অসি করি দরশন,
> কলেরা-সঙ্কটে স্মরি সে রাঙ্গা চরণ।"

ইত্যাদি অবস্থাপন্ন হই; অথবা হিন্দু-আপনি যদি কেবল ব্যবসায়ের খাতিরেই টিকী বাঁধেন, নামাবলী ছাঁদেন; স্ত্রীর অনুরোধে মন্ত্র লন, বায়ু-পরিবর্ত্তনের অনুরোধে তীর্থযাত্রী হন, দেনার তাগাদা এড়াইতে জপে থাকেন, দাদের দাগ ঢাকিতে চন্দন মাখেন, ব্যায়ামের প্রয়োজনে কীর্ত্তনে নাচেন, পাঁঠার প্রণয়ে শাক্ত সাজেন, তবে এই অহিন্দু-বিশ্বাসী হিন্দুকার্য্যকারী আপনি এবং সেই হিন্দু-বিশ্বাসী ব্রাহ্ম-কার্য্যকারী আমি, আমরা উভয়েই মূর্ত্তিমান কাপট্য, দেশের সাক্ষাৎশত্রু, সমাজোদ্যানের বিষ-বিপটী, জাতীয় জীবনের সংক্রামক ব্যাধিস্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদাহরণ-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কয়েকটী কল্পনা করা যাউক। কেহ হয়ত বাল্যবিবাহের উপযোগিতা বিশ্বাস করেন না, অথচ স্বার্থবিশেষ-বশে সেই তিনিই স্বীয় সাতবছরের-বালিকাটি দশবছরের একটি বালকের গলায় গাঁথিতেছেন! যিনি যৌবনে বিধবা বিবাহের বক্তৃতা দিতেন, তিনিই প্রৌঢাবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃবধূ বা ভগিনীকে বিধবা দেখিয়া "গোড়া হিন্দু" হইয়া পড়িতেছেন! কেহ কৌলিন্যের আবশ্যকতায় অত্যন্ত বিশ্বাস শূন্য, অথচ 'দাঁও' পড়িলে, নিজ প্রাপ্য "গণ-পণ" কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া নিতে আগ্রহে অগ্রগণ্য! কেহ পরকাল, পুনর্জন্ম বা প্রেততত্ত্ব মনে মানেন না, কিন্তু তিনি হয়ত "থিয়সফিষ্ট" হইতেছেন, পরলোকতত্ত্বের প্রবন্ধ লিখিতেছেন, "সার্কেলে" বসিয়া "মিডিয়ম্" বনিতেছেন! হয়ত গতকল্য কেহ ছাগ-শিশুর কোমলাঙ্গ-পক্ষপাতে ঘোর বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অদ্য হয়ত সন্দেশ-সরবতের সম্মোহিনী শক্তিতে কলিকাতার প্লেগ-সংকীর্ত্তনে ধূলি-ধূসরিতবেশী! কাহারও মূর্ত্তি-পূজায় বিশ্বাস নাই, কিন্তু বাড়ীতে দুর্গোৎসবের ধূম, সাহেব-ভোজের সুদীর্ঘ ফর্দ্দ! কেহবা ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সন্দিহান, অথচ নিজে নিঃসন্তান বলিয়া, অব্যবহিত আত্মীয়কে 'কদলি-প্রদর্শন' পূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বসম্পত্তি পরম ভক্তিভরে (?) পৈত্রিক শিব-শালগ্রামের সেবার্থ উৎসর্গ করিতেছেন! কেহ কেহবা রসনা ও বিবিধ বাসনার দায়ে চৈতন্যদেবকে জাতিভেদের বিচার-আচারশূন্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেহ কেহবা বিলাতী বাহবার ঐন্দ্রজালিক উত্তেজনায় বৈদান্তিক ধর্ম্মে খাদ্য-বিচার স্বীকার করিতেছেন না। কেহবা স্বয়ং কৃষ্ণকে লম্পট, বলরামকে মাতাল এবং শিবকে পাগল সন্দেহে "ঈশ্বর" বলিতে ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু গৌরকে কৃষ্ণ, নিতাইকে বলরাম, ও অদ্বৈতকে শিব বলিয়া নাচিয়া—কাঁদিয়া—মাতিয়া যাইতেছেন! আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক; ফলে যদি এইরূপ অনেক স্থলেই বিশ্বাস ও কার্য্যে বৈপরীত্য না ঘটিত, তবে এসব কিছুই দোষের হইত না। তবে এসব কেবল ধর্ম্ম-জগতে বিবিধ অধিকার-ভেদে স্বাভাবিক রুচি-বৈচিত্র্যেরই পরিচয় স্বরূপ হইত। কিন্তু হায়! অস্মদ্দেশের এই সব সমাজ ও ধর্ম্মের আন্দোলনে বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য পদে পদেই প্রমাণিত হইতেছে, তাহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বুঝিতেছেন। দেশের অবস্থাজ্ঞ সমাজতত্ত্বজ্ঞ কে না জানিতেছেন যে, গত ৫০।৭ বৎসরের মধ্যে "হিন্দু" সংজ্ঞাকে পরিচয়ের মূল ভিত্তি করিয়া, অন্যূন ৫০।৭টী বিভিন্ন ধর্ম্মান্দোলনকারী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে! চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বা নাম করিয়া দেখাইবার দরকার নাই। এই "দুর্জ্জয় মানের দায়"এর দিনে কথা চালিতে বা কলম ডালিতে বিশেষ সাবধানতা চাই যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতেই আশাকরি, আমাদের স্বধর্ম্মানুরাগী স্বজাতি-হিতৈষী সমাজ-শুভার্থী মহাত্মাগণ বুঝিবেন যে, বিশ্বাস ও কার্য্যের শোচনীয় বিচ্ছেদ ও ব্যভিচারে আমাদের জাতীয় জীবন কিরূপে শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্বগ্রাস্ত হইতেছে। বর্ত্তমানের আপাত-দ্রষ্টব্য ধর্ম্মান্দোলনের হুজুক বা আড়ম্বর-বৃদ্ধি কেবল সমাজ-শরীরের শোথের

ক্ষতি! শোথ-গ্রস্ত রোগী যদি মূঢ়-বুদ্ধি বশে আপনাকে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ভাবিয়া উৎফুল্ল হয়, তবে তাহা যেরূপ উপহাস-বিষয়ীভূত, আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মান্দোলনের উল্লাস-উচ্ছাসও তদ্বৎ। হায়! এইরূপেই বিশ্বাস ও কার্য্যের অসামঞ্জস্য-জনিত কপটাচারের কঠোর নিপীড়নে অধর্ম্মের অনঃশয্যায় শুইয়া, আমরা ধর্ম্মোন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি!

দ্বীপনিবাসী আমমাংসাশী, উলঙ্গ, উল্কা-চিত্রিতাঙ্গ অসভ্য মানবজাতিরও একটা জাতীয় জীবন আছে। তাহারা ভূত-প্রেত বৃক্ষ প্রস্তরের পূজা করে, বিধবা বিমাতা বিবাহ করে, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস খায়, কিন্তু এ সব পশূচিত বা পশ্বাধম কার্য্যও তাহারা সরল বিশ্বাসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া করে। তাহারাও মনে এক, কাজে আর নহে। তাহাদের এই লোমহর্ষণ-আচরণপূর্ণ মানবাধম জাতীয় জীবনেও যেটুকু দৃঢ়তা, সরলতা, স্বাবলম্বন, উদ্যম, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ দৃষ্ট হয়, সুসভ্যতাভিমানী আমরা তাহাতেও বঞ্চিত! যে জাতির প্রত্যেক বিভাগের অগ্রণীগণের অধিকাংশই বিশ্বাসে ও কার্য্যে মিল রাখিয়া চলিতে পারেন না, সে জাতির অবস্থা কতদূর শোচনীয়! এইজন্য আমরা একটা জাতি হইয়াও জাতি নহি। গ্রাম্য উপমার ভাষায় বলিতে হইলে, আমরা ঠিক যেন "কাঁঠালের আমসত্ব" বা "সোণার পাথর-বাটী"!

অসভ্য জাতির বিবেক-বুদ্ধি নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহারা যাহা বিশ্বাস করে, ঠিক তাহাই করে। আমাদের অনেক বিষয়েই কার্য্য বিশ্বাসের অননুরূপ, বিশ্বাস কার্য্যের অননুরূপ। আধুনিক ইউরোপীয় ও আমেরিক প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্য জাতীয়েরা ভগবদিচ্ছায় উভয়তঃ উৎকৃষ্ট। তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিতে স্বতঃই সবল ও সুপ্রস্তুত এবং তাঁহাদের শিক্ষা সভ্যতাও সুমার্জ্জিত। তাঁহারা যেমন বিশ্বাস ও কার্য্যের ঐক্য-বলে বলিষ্ঠ, তেমনই জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা-গুণেও গরিষ্ঠ। তাই তাঁহাদের জাতীয় জীবন আজ এত গৌরবান্বিত। আমরা কেবল পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করিয়া "মানের কান্না" কাঁদিতে পারি; আপনাদের বর্ত্তমান অযোগ্যতা সংশোধনের যথার্থ শিক্ষা-সাধনার কাছেও যাইনা। জীর্ণ শীর্ণ দীন দুর্ব্বল রোগী যদি স্বীয় রোগারোগ্যের চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-স্বাস্থ্য-সবলতা—পূর্ব্ব-হৃষ্ট-পুষ্টতার চিন্তায় ও হা-হুতাশে—দীর্ঘশ্বাসে কালক্ষেপ করে, তবে তাহার পরিণাম যেরূপ হয়, আমাদের এই রুগ্ন ভগ্ন মোহ-মগ্ন জাতীয় জীবনের পরিণামও সেইরূপ দাঁড়াইতেছে।

আমাদের পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষেরা যে কেবল শিক্ষা-সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা নহে; তাঁহারা বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য করিবার সুবিপুল বল ধারণ করিতেন। রামের সীতা-নির্ব্বাসন, পাণ্ডবের রাজ্য-বর্জ্জন ও বন-গমন, ভীষ্মের চিরকৌমার্য্য গ্রহণ ও নিজ মর-ণোপায় বিজ্ঞাপন, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্ব্বস্বদান, শিবী-বিপশ্চিৎ প্রভৃতির আত্মদান ইত্যাদি ঘটনা তাহার অনন্ত দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা-বলে

যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, ত্রিলোক বিপক্ষ হইলেও তৎসাধনে তিলমাত্র বিচলিত হইতেন না। তাঁহাদের জাতীয় জীবন যে মানবজীবনের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সে কেবল এই বিশেষত্ব—এক মূলমন্ত্র-নিষ্ঠত্ব তাহার মূলে ছিল বলিয়া। আমরা সেই মূল হারাইয়াছি বলিয়াই এইরূপে নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছি।

রোগ চিনিলেই চিকিৎসার উপায় হয়, এ কথা সত্য; "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"—এ কথাও সত্য। এই প্রসঙ্গে এই সব আন্দোলন-আলোচনা, চিন্তা-চর্চ্চা প্রভৃতিও সেই সত্যানুসরণেরই ফল মাত্র। বিশ্বাসানুরূপ কার্য্যকারিত্বই বীরত্ব এবং তদ্বিপরীতাই কাপুরুষত্ব, এই সত্যের শিক্ষা-বিস্তাররূপ পুরুষকারই এক্ষণে আমাদের অবলম্বনীয়। মূল কথা ভবিতব্যতাই সার। অতএব কাল-যবনিকার অন্তরালে ভবিতব্যতার প্রচ্ছন্ন ফলকে এই জাতির পরিণাম যে কিরূপ চিত্রিত রহিয়াছে, তাহা সেই চিত্রকরই জানেন,—সেই ভবিতব্য-বিধাতা ভগবানই জানেন।

উপসংহারে "বিশ্বাস ও কার্য্য" প্রসঙ্গের তত্ত্বকথা স্বরূপে এই মাত্র নিবেদন যে, সকল বিশ্বাসের সার ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ঈশ্বর-বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ঠিক থাকিলে, অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই বিশুদ্ধ হয়, এবং কার্য্যও ঠিক বিশ্বাসানুসৃত ও সারল্য-সাধিত হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস যাঁহার সুদৃঢ় ও প্রগাঢ়, তাঁহার অপর সর্ব্ববিধ বিশ্বাসই প্রায় স্বতএব অভ্রান্ত ও বলবন্ত। ধর্ম্মই তাঁহার বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট-কার্য্যকারিতায় যে শোচনীয় দীনতা ও কাপুরুষতা, ধর্ম্ম-বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী বীরের জীবন্ত জীবনে তাহা কদাচ সম্ভাবিত নহে। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অভাবেই অস্মদ্দেশে বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কপট কার্য্যের প্রভাব। একমাত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিশ্ব-বিজয়ী বলেই হিন্দুর জগদাদর্শ জাতীয় জীবনের অপূর্ব্ব কার্য্যাবলি মানব-জাতির ইতিহাসে অমর অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব বিশ্বাস ও কার্য্যের বিশুদ্ধ সামঞ্জস্য সাধন পক্ষে অপরাপর জাতির যে কোন মূল মন্ত্র হউক না কেন, হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা একদিন ধর্ম্মের দ্বারাই সুসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং যাহা বর্ত্তমানে ধর্ম্মের অবনতিতেই অবনত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহা আবার পুনঃসংস্কৃত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মই একমাত্র অবলম্বন। "ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।" বিধির বিধানে ভারত ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ও কর্ম্মক্ষেত্র; সুতরাং কপটাচারের নিরাকারণ, অথবা বিশ্বাস ও কার্য্যে সামঞ্জস্য সম্পাদন পূর্ব্বক সেই ভারতের জাতীয় জীবন সমুন্নত করিতে হইলে, একমাত্র ধর্ম্মের শিক্ষা-সাধনা দ্বারাই তাহা হইবে। ভগবান তাহাই করুন, ভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীশঃ——

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

পদপাঠঃ। কারণং। অস্তি। অব্যক্তং। প্রবর্ত্ততে। ত্রিগুণতঃ। সমুদয়াৎ। চ। পরিণামতঃ। সলিলবৎ। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা। কারণং—উৎপাদক, জনক। অস্তি—আছে। অব্যক্তং—ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রিগুণতঃ—তিন গুণ হইতে। সমুদয়াৎ—সমুদয় হইতে সমুদয় অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে উদয় কি আবির্ভাব। চ—ও। পরিণামতঃ—পরিণাম নিবন্ধন। (অবস্থান্তরাপত্তি-হেতুক) সলিলবৎ—জলের মত। প্রতি প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ—প্রত্যেকগুণ-অবলম্বন নিবন্ধন যে ভেদ, তাহা হইতে।

বঙ্গার্থ। (ব্যক্তকার্য্যের) অব্যক্ত কারণ আছে। এই অংশটুকু পূর্ব্বকারিকার সাধ্য; সেখানে "পরিমাণাৎ" ইত্যাদি যে সকল হেতু উপন্যস্ত হইয়াছে, তাহারা কোন্ সাধ্য সমাধানার্থে প্রযুক্ত, এই চিন্তা আপাততঃ উপস্থিত হয়, কেননা তথায় সেই হেতুজালের সাধ্যনির্দ্দেশ করা হয় নাই; এই কারিকাংশ সেই অভাব পূরণ করিতেছে। (তাহা কিপ্রকারে প্রবর্ত্তিত হয়, এই জিজ্ঞাসায় বলা যাইতেছে) ত্রিগুণ হইতে ও সমুদয় হইতে তাহা প্রবর্ত্তিত হয় (বিদ্যমান থাকে) (সমুদয় হইতে প্রবর্ত্তিত হয় বলিলে শঙ্কা হয়, ত্রিগুণ প্রত্যেকে একবিধ, তাহার অনেকরূপ প্রবৃত্তি অসম্ভব। আবার একটী প্রধান, অপরটী গৌণ, এইরূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি না হইলেও সমুদয় সিদ্ধ হয়না, কেননা সমুদয়ই কোনও একটীর প্রধান হওয়া। (তাহার উত্তরে বলা হইতেছে।) (গুণগণের) পরিণাম হয় বলিয়া জলের মত প্রত্যেক এক একটী গুণকে আশ্রয় করিয়া অপরগুণ যে পরিণামবিশেষ উৎপাদন করে, তাহা হইতে (নানারূপে প্রবর্ত্তিত হয়)।

বিশদ ব্যাখ্যা। ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূয়মান পদার্থ নিচয়, ইহাদের কারণ অব্যক্ত—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াগোচর হওয়া আবশ্যক। ব্যক্ত হইলে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তি হয়, কেননা স্থূল পদার্থসকল বহু সূক্ষ্মকারণের সমষ্টি, অথচ পরিণামী, ইহা আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই। ঘট একটী ব্যক্ত পদার্থ, ইহাকে

আমরা সহস্র২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারি; পরে যাহা প্রাপ্ত হই, তাহাই ঘটের কারণ বলিয়া বুঝিয়া থাকি; আবার সেই মৃত্তিকাখণ্ড গুলিকে বিভক্ত করিলে, তাহারও কারণ পাই; এতদ্রূপ যতক্ষণ আমরা উহাকে ব্যক্তাবস্থায় লাভকরি, ততক্ষণ উহার কারণ আছে, বুঝি। কেননা তাহা যতই কেন সূক্ষ্ম হউক, আমাদিগের ইন্দ্রিয়-গোচর ভাব যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারিবে, ততদিন আমরা উহার ক' অন্য একটী বলিয়া অবধারণ করিতে পারিব। এই ব্যক্ত কার্য্যের ব্যক্ত কারণ হইলে, আমাদের কারণানুসন্ধান-প্রবৃত্তি অনেক দূরে গিয়াও বিশ্রাম লাভ করিতে পারিবেনা। ইহাই অনবস্থা। এই হতাশ-সাগরে অনন্ত যত্ন চেষ্টা বিসর্জ্জন করিতে পারায়ায়না, কাজেই "অব্যক্ত" বলিতে হইল। অব্যক্তের প্রবাহ ঐরূপে চলিলে, আবার সেই ভীষণ অনবস্থা-রাক্ষসীর প্রচার বাড়িবে; সুতরাং "অব্যক্তে" "চরম" চিন্তা নিবেশ করিয়া আমরা চরিতার্থ হই।

অব্যক্তের বিদ্যমানতা বর্ণন করিতে হইবে, নচেৎ "অব্যক্ত" বলিলে, আমরা তাহার অবস্থা-পরিণামাদির পরিচয় পাইনা। বিদ্যমানতা আবার কারণ মাত্রেরই দ্বিবিধ ভাবে। একটী অনুলোমক্রম, অপরটী বিলোম। স্বর্ণ দিয়া বলয় রচনা করিলাম, সে সময়ে কার্য্যে অনুস্যূত যে স্বর্ণ, তাহার বিদ্যমানতা বলয় হইতেই। যখন স্বর্ণ কেবল পিণ্ডাকারে রহিল, অর্থাৎ বলয়-ভঙ্গের পরে যে বিদ্যমানতা, তাহা কেবল স্বাভিন্ন-অবয়ব-সমষ্টিরূপে। এই উভয় প্রকার প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে হইবে; তজ্জন্যই সাংখ্যাচার্য্য "ত্রিগুণ" ও "সমুদয়" এই দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিগুণ-প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রলয়ে, তখন জাগতিক জিনিষের বিকাশ নাই। স্বর্ণের সুবর্ণাবয়ব সমষ্টি পিণ্ডরূপে অবস্থানের ন্যায় অব্যক্তেরও স্বাভিন্ন গুণত্রয়-সমষ্টিরূপে স্থিতি। তখন আর কিছুই নাই, ত্রিগুণ হইতেই অব্যক্তের বিদ্যমানতা। সৃষ্টিসময়ে যখন মহত্তত্ত্বজনক বৈষম্যব্যাপার গুণত্রয়ের উপর অবাধভাবে রাজত্ব করিতে লাগিল, তখন একটী গুণ প্রধান হইল; অপর অপ্রধান হইল। প্রধান অপ্রধানকে পরাস্ত করিল। আবার অন্যটী প্রধান হইল, পরকে পরাভূত করিল। এই বৈষম্য-বঞ্ঝাবাতে গুণ বিকৃত হইয় মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হইল। অব্যক্তের "সমুদয়" হইতে বিদ্যমানতা সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভে। সমুদয়, অপর গুণকে অভিভূত করিয়া কোনও গুণের উদয়লাভ ভিন্ন কিছুই নয়। ইহাদ্বারা কারণের কার্য্যকারিণীশক্তির বিকাশাবস্থায় সক্রিয় ভাবে এবং ঐ শক্তির সংযমাবস্থায় সংহর্ত্তক্রিয় রূপে যে উভয় প্রকারে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ প্রবর্ত্তন বা বিদ্যমানতা, তাহাই বলা হইল।

কোনও একটি গুণ প্রধান হইল, অপর গৌণ থাকিল. আবার অপরে; প্রধান হইল, এই বিভিন্ন প্রকার পরিণাম প্রবৃত্তি কেমন করিয়া তিন প্রকারের তিনটি মাত্র গুণের সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক; তজ্জন্যই বলা হইতেছে, গুণের

স্বভাবই পরিণাম। ইহারা পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রধানকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ পরিণাম-বিশেষ প্রবৃত্ত করে, ইহার দৃষ্টান্তও বড় বিরল নহে। যেমন একই জল আম্রবৃক্ষের সম্মিলনে তরতা প্রধান মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া রসালের "রসাল" নামের সার্থকনামতা সম্পাদন করিল; এবং আমলক বৃক্ষে সংসৃষ্ট হইয়া তাহার প্রধান কষায়-রসাশ্রয়ণে আমলকফলে কষায় রস রূপে পৃথক্ পরিণাম প্রাপ্ত হইল। এইরূপে একই গুণ অপ্রধান ভাবে দুইবার দুইটি প্রধান গুণকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন পরিণাম-প্রবৃত্তির নিদান হইল। এইরূপ ন্যূনাধিক্যের পরিবর্ত্তন বশতঃ সহস্র ২ পরিণাম-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা সফল হইল।

সমুদয় ও ত্রিগুণ, এই উভয় প্রকারের প্রবৃত্তি বলিবার আরও গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। ইহার একটি ভোগমার্গের ও অপর মোক্ষমার্গের প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি নিরর্থক নহে, উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে চিরকালই জাজ্বল্যমান। অব্যক্তের প্রবৃত্তি হইতে পুরুষের ভোগ ও মুক্তি নিষ্পন্ন হয়। "ত্রিগুণ" প্রবৃত্তি বলিলাম, তাহার লক্ষ্য মোক্ষ, "সমুদয়" প্রবৃত্তির সাধ্য ভোগ। ভোগসাধন সাধারণতঃ বুদ্ধি বা মহতত্ত্ব। "সমুদয়" প্রবৃত্তির পরিণাম মহত্তত্ত্বের বিকাশ। প্রকৃতি এই প্রবৃত্তিদ্বয় দ্বারাই অব্যক্ত জগদ্ব্যাপারে এবং অনন্ত শান্তি-সাগরে নিমজ্জনরূপ মুক্তির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, পুরুষের পরম পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন; তাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতি, এই দুই লৌকিক ব্যবহারসিদ্ধ অর্থের এবং তাৎপর্য্যের আবিষ্কার হয়। সেই জন্যই অনেকে প্রকৃতিকে জগন্মাতা ও পুরুষকে জগৎপিতা বলিয়া যেন অনেকটা ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

আমরা এই কারিকাস্থ প্রবৃত্ত্যাদি পদের তাৎপর্য্য অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রবৃত্তি অর্থাৎ কার্য্যজননের নিদান বস্তুর সময়সিদ্ধ শক্তিবিশেষের বিকাশোন্মুখ "অব্যক্ত" কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু কারণের সহিত তাহার অবলম্বন অসাধারণ প্রবৃত্তি-শক্তির নির্ব্বাচনও চাই। যাহাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাত বর্ত্তমানই আছে। তবে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাব আমাদের অক্ষ-পথের পথিক হয় না কেন? আমি অবগত আছি, চম্পক বৃক্ষে চম্পককুসুম উৎপন্ন ও প্রস্ফুটিত হয়। অন্য বৃক্ষে উহার সদ্ভাব সম্ভব নয়। আবার চম্পক-বৃক্ষ বজ্রাগ্নিদগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইলেও আমরা সেই বৃক্ষের কুসুম-সন্দর্শনে চিরতরে বঞ্চিত হই। ফলতঃ ঐ বৃক্ষের বিদ্যমানতা সত্ত্বেই যে সর্ব্বদা ঐ নয়নরঞ্জক চম্পক কুসুমের প্রাণ-পাগলকারী সুবাসে আমাদের অন্তরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশির উদয় হয়, এরূপ নয়। এই রহস্য-দুর্গের প্রাকার-ভেদ একান্ত আবশ্যকীয় নয় কি? তাহা নূতন কিছু নয়, সর্ব্বদা ঐ বৃক্ষে পুষ্পজনন—শক্তির বিকাশ থাকেনা। তাহা আগন্তুক সময়াদি নানা কারণে উৎপন্ন হয়, এবং বৃক্ষের বিনাশের সহিত তদাশ্রিত ঐ শক্তিও লীলাসম্বরণ করে। এই মাত্র আমি বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হইতে দেখিলাম, লোচন ঝলসিয়া গেল; কিন্তু ঐ চঞ্চলা-

প্রকার কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিল, তাহার খবর লইতে চেষ্টা করিলে, কি দেখা যায়? আর কিছুই নয়, কেবল উহার চারিটি অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি, এবং প্রত্যেক কার্য্যেই ঐ চারিটি অবস্থা আছে, তাহাও অনুসন্ধান করিলে জানিতে পাইব। চপলা পদার্থটী কি? বিদ্যুৎ বলিয়া যাহা জগতে পরিজ্ঞাত, তাহাই। প্রবৃত্তি উহার প্রথমাবস্থায় এবং দ্বিতীয়ে প্রবাহ বা ব্যাপার। তৃতীয়ভাব ফল অথবা পূর্ণ-প্রকাশ; তৎপরে নিয়মন বা অদর্শন। ইহার মধ্যে তিনটি অবস্থা সর্ব্বথা অনুভবসিদ্ধ, চতুর্থ অদর্শন-অবস্থার অনুভবে কেহ কেহ আপত্তি করিলেও, ইহা অধিক সমীচীন মত নয়। প্রথম প্রবৃত্তির প্রতি সকলেরই প্রায় সম মত। উহা অনুভবে আসেনা। অনুভব বলিলে, এখানে প্রত্যক্ষানুভব বুঝিতে হইবে। অনুমানের দ্বারাই প্রবৃত্তির অনুসন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তড়িৎ-প্রবৃত্তি। পরে যখন উহা মেঘস্তর ভেদ করিয়া ব্যাপারিত হইতে লাগিল, তখন উহার প্রবাহ। যখন লোচন-পথকে অলঙ্কৃত করিয়া আলোকমালাধারিণী সুরসুন্দরী বিরাজমানা হইল, তখন পূর্ণ বিকাশ; পরে যখন আবার কোথায় লুকাইয়া গেল, তখন নিয়মন বা অদর্শন। অব্যক্ত কারণ ব্যক্ত কার্য্য জন্মাইতে প্রথমে প্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইল, পরে প্রবাহিত হইল। আবার পূর্ণ বিকসিত হইল; সর্ব্বশেষে অদর্শন রূপ নিয়মন অবলম্বন করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই প্রবৃত্তি "ত্রিগুণ" হইতে প্রথম হয়। অব্যক্তের এই কার্য্যকারিণী শক্তির বিকাশোন্মুখতা ত্রিগুণ হইতেই হয়। কেননা অপর কিছু পদার্থই নাই। প্রথম প্রবৃত্তি সেই স্বাভিন্ন অবয়ব গুলির উপরই হইয়া থাকে। সমুদয় হইতে দ্বিতীয় প্রবৃত্ত। সমুদয় অর্থ সমষ্টি; দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক সমষ্টি মহত্তত্ত্বই সাংখ্যশাস্ত্রে 'সমুদয়' শব্দে কথিত হওয়া উচিত। দ্রব্যশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি, এই তিনশক্তি লইয়াই সংসারের অস্তিত্ব। এই তিনটীর যে কোনটী বিশ্রামলাভ করিলে জগৎ অস্তমিত হয়। এই তিন মহাশক্তির পিণ্ডস্থান মহত্তত্ত্ব মহত্তত্ত্ব হইতে প্রবৃত্তি—অর্থাৎ অব্যক্তের তত্ত্বাকারে বিকাশোন্মুখতা ঘটে, এই জন্য ইহা তত্ত্বসৃষ্টি বিষয়ের দ্বিতীয় প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থান। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ও পূর্ণ বিকাশ, এই তিনটি অবস্থারই অনুলোমক্রমে আবশ্যকতা। পূর্ণ-বিকাশের পরে নিয়মন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু জগৎ-কারণের পূর্ণ বিকাশ সৃষ্টির চরম-পরিণতি। তদন্তেই প্রলয়-কালীন স্বরূপাবস্থান, যাহা প্রকৃত অব্যক্তভাব। জগৎ অশেষ কার্য্য-কারণের সমষ্টি; ইহার প্রত্যেক প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় কিনা, তাহা বিবেচ্য। যেমন একটি ঘট-প্রবৃত্তি, তাহার প্রবাহ ও তাহার পূর্ণ বিকাশ, পরে অদর্শন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নিয়মন ঘটিল না বটে, কিন্তু ঘটাপেক্ষায় মৃত্তিকাভাবধারণই ঘটের নিয়মন। এইরূপ আপেক্ষিক নিয়মন সর্ব্বদাই সম্ভব। মূল কারণের নিয়মন উহা হইতে পৃথক্ জিনিষ, কেননা তাহা সমস্ত জগতের অপেক্ষায় অদর্শন। জাগতিক ক্ষেত্রে, ঘট গেল, ব্যক্ত মাটি থাকিল, তাহাও ঘট সদৃশ ব্যক্ত। এখানে ব্যক্ত

গেল, রহিল অব্যক্ত; ইহাই পার্থক্য। ত্রিগুণ হইতে যে প্রথম প্রবৃত্তি, উহা প্রকৃতিকস্বরূপের উপর। গুণত্রয় প্রকৃতির স্বরূপ ভিন্ন কার্য্য নয়; এইজন্য ঐ প্রবৃত্তি বলিয়াও পৃথক্ সমুদয় প্রবৃত্তি বলিতে হইতেছে। "সমুদয়" প্রকৃতির কার্য্য উৎপাদ্যমান প্রথম তত্ত্ব। প্রথম প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ গুণগণের বৈষম্যভাব। দ্বিতীয় প্রবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ অহঙ্কার নামক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। তন্মাত্র পর্য্যন্ত পদার্থ সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়গোচর নয়, এজন্য বিদ্যুৎ-প্রকাশ দৃষ্টান্তানুসারে কেহ চক্ষু দিয়া দেখা যায়, মনে করিবেন না। তবে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, যোগীর দৃশ্য। সে তত্ত্ব আমাদের আলোচনার্হ নহে। অব্যক্ত কারণ প্রবৃত্তিসমন্বিত হইয়াই প্রবাহাদিক্রমে জগৎ-কার্য্যের প্রসব সম্পাদন করে। এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ কারিকার রচনা করিতে গিয়া কারণোদ্দেশের পরে তাহার প্রবৃত্তি-প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম প্রবৃত্তি, পরে প্রবাহ, ইত্যাদি প্রকারে একই অব্যক্ত নানাকার ধারণ করে কেমন করিয়া? একই পদার্থ তাহার সহকারী অপর কোনও জিনিষকে অপেক্ষা না করিয়া নানারূপে প্রতিভাত হওয়া সম্যক যুক্তিযুক্ত নয়। এই শঙ্কার নিরাসার্থ বলিতে হইতেছে, পরিণাম স্বভাব বশতঃ এরূপ হয়। পরিণাম ঘটিবার অপর কোনও কারণ আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা এ প্রসঙ্গে অসঙ্গত। যেখানে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আর কিছুই পাওয়া যায়না বলিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়, শত শত গবেষণাও অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইয়া যাইতে থাকে; মস্তিষ্ক ক্লান্ত, উদ্যম শান্ত ও চিন্তা বিভ্রান্ত হয়, তখনই লোকে স্বভাবের শরণাপন্ন হয়। প্রবাদও আছে— "স্বভাবে নাস্তি কারণং"। পরিণাম স্বাভাবিক হইবার কারণেও, গুণত্রয়-সমষ্টিরূপ অব্যক্তের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত লাভ আবশ্যক। দৃষ্টান্ত—জলের ন্যায় অব্যক্তেরও পরিণাম-ভেদ স্বাকার্য্য। পরিণাম স্বভাবতঃই হয় বটে, কিন্তু ভিন্ন ২ পরিণামের নিমিত্ত ভিন্ন ২ সহকারী কারণের আবশ্যকতা। জল সৌরকর-সন্তাপে বাষ্পরূপে পরিণত হইল। পরে ইহা লঘুতা হেতু গগনমার্গে উড্ডীন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ অনেক-পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া মেঘাকার ধারণ করিল। উত্তাপ-সংস্পর্শে দ্রবীভূত হইয়া পুনর্ব্বার ধারাকারে ভূতলে পতিত হইল। ইহাতে যেমন সাময়িক তাপাদি-সহকারি-কারণের আবশ্যকতা হইয়াছে, অব্যক্তের পরিণামে কাল ও স্বভাব এবং ভোগ, মোক্ষ প্রভৃতি কারণান্তর সাহায্য করিয়া থাকে। এখানে আবার আশঙ্কার উদয় হইতেছে। প্রবৃত্তি, প্রবাহ ইত্যাদি চতুর্দ্ধাভাবে পরিণতির কারণ কি? এতদপেক্ষা নূতন কোন প্রকার অবস্থা হইতে স্বভাবের বাধা কি? যদি বলা যায়, স্বভাবের বাধা কি, এ কথা জিজ্ঞাস্য নয়; কেননা বিদ্যমান বস্তুর কারণানুসন্ধান আবশ্যক। বস্তু কল্পনা করিয়া, তাহা কল্পিত হয় নাই কেন, এটি ভ্রমাত্মক প্রশ্ন। তাহা হইলেও পূর্ব্বের প্রশ্ন "প্রবৃত্ত্যাদির কারণ কি?" ইহা অক্ষত। এখানে প্রবৃত্তির ও প্রবাহাদির কারণ অবধারণ করা হইতেছে। প্রত্যেক গুণরূপ আশ্রয় (প্রবৃত্ত্যাদির প্রয়োগস্থল) বিশেষ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া। রজোগুণ সত্ত্ব হইতে ভিন্ন, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, সত্ত্বগুণে প্রবৃত্তি নাই, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ, তমোগুণের ধর্ম্ম অদর্শন। প্রবাহ ও রজঃকার্য্য প্রবৃত্তির পরিণতি বিশেষ মাত্র। অতএব প্রবৃত্তির নিমিত্ত রজোগুণ, তাহার অপর গুণ হইতে ভিন্নতাই উহার নিয়ামক। ভিন্নতা সেই সেই ধর্ম্ম না থাকা মাত্র। রজঃ প্রকাশক নয় এবং নিয়ামক নয়, অতএব প্রবর্ত্তক। যাহা প্রকাশক, তাহা প্রবর্ত্তক নহে, যেমন সত্ত্ব; ঐরূপ যাহা নিয়ামক, তাহাও প্রবর্ত্তক নয়, যথা তমঃ, ইহা সিদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ।)

অথর্ব্ববেদ।

চিত্রাণি সাকং দিবি রোচনানি সরীসৃপাণি ভুবনে জবানি।
অষ্টাবিংশং সুমতিমিচ্ছমানো অহানিগীর্ভিঃ সপর্যামিনাকম্॥ ১
সুহবং মে কৃত্তিকা রোহিণী চাস্তু ভদ্রং মৃগশিরঃ শমার্দ্রা।
পুনর্বসু সুনৃতা চারু পুষ্যো ভানুরাশ্লেষা অয়নং মঘামে॥ ২
পুণ্যং পূর্বা ফল্গুন্যো চাত্র হস্তশ্চিত্রা শিবা স্বাতিঃ সুখো মে অস্তু।
রাধে বিশাখে সুহবানুরাধা জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্টং মূলম্।৩
অন্নং পূর্ব্বা বসন্তাং মে অষাঢ়া উর্জং দেব্যুত্তর আবহন্তু।
অভিজিন্মে রাসতাং পুণ্যমেব শ্রবণঃ শ্রবিষ্ঠাঃ কুর্বতাং সুপুষ্টিম্॥ ৪
আমে মহচ্ছতভিষগ্বরীয় আমেদ্বয়া প্রোষ্ঠ পদা সুশর্ম্ম।
আ রেবতী চাশ্বযুজৌ ভগংম আমে রয়িং ভরণ্য আবহন্তু॥ ৫

বঙ্গার্থ। যে সমুদয় উজ্জ্বল এবং মনোহর নক্ষত্র আকাশে অতি দ্রুতগমনে গমন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং দিবস ও আকাশমণ্ডলকে আমি অষ্টাবিংশ মণ্ডল প্রাপ্তির কামনায় সংগীতের দ্বারা অর্চ্চনা করি। ১

কৃত্তিকা ও রোহিণী, মৃগশির ও আর্দ্রা আমার মঙ্গল বিধান করুন, পুনর্ব্বসু এবং সুনৃতা অর্থাৎ উষা, চারু পুষ্যা, সূর্য্য, অশ্লেষা এবং মঘা আমার অয়ন বা গতি স্বরূপ হউন। ২

ফল্গুনীদ্বয়, হস্ত, চিত্রা, স্বাতি আমার পুণ্য, মঙ্গল ও সুখস্বরূপ হউন। রাধা, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা এবং সুনক্ষত্র মূলা আমার মঙ্গলস্বরূপ হউন। ৩

পূর্ব্বাষাঢ়া আমাকে অন্নদান করুন, উত্তরাষাঢ়া আমাকে বল প্রদান করুন, অভিজিৎ আমাকে পুণ্য প্রদান করুন, শ্রবণ ও শ্রবিষ্ঠ আমাকে পুষ্টি প্রদান করুন। ৪

শতভিষক আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করুন, প্রোষ্ঠ পদদ্বয় আমাকে রক্ষা করুন, রেবতী এবং অশ্বযুজ আমাকে সৌভাগ্য প্রদান করুন, ভরণী আমাকে ধন প্রদান করুন। ৫

বৈদিক কালেই যে হিন্দুরা জ্যোতির্ব্বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কৃত্তিকা আদি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা ঘর, বা গৃহিণী বা ঘরণী। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে পথে পরিভ্রমণ করেন, এই নক্ষত্রগুলি ঐ পথে স্থাপিত। কৃত্তিকা Pleiades রোহিণী Aldebaran constellation এর প্রধান তারক। মৃগশিরস lunar asterism containing orionis স্বাতি Arcturus. চিত্রা **Spica Virginis হস্তা part of the constellation corvus, অশ্বযুজস the head of aries**

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(শ্রীম—কথিত)

[শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির সাক্ষাৎ ও পরমহংস-দেব-প্রদত্ত যুগধর্ম্মাদি সম্বন্ধে উপদেশ।]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠনঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুয্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অতি কোমলাঙ্গ, অতি সন্তর্পণে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন। তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।

গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল, যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতি বিনীত ভাব। ভক্তিভাবে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত কথামৃত পান করেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, রাম, মাষ্টার ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও প্রভুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে প্রভু ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বেশ! বেশ!" পরে পণ্ডিতকে বলিলেন, আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?

শশধর। মহাশয়! আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে, তার সময় কৈ? আজ কালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

"কর্ম্ম কর্‌তে যদি বল তো নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যনা' ওসব অত বল্‌তে হবে না। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লে হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ীলোক ও লেক্‌চার)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে, তবু দেয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে?

"সাধুর কমণ্ডলু (তুম্ব) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো—তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ীলোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

"তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পার্‌বে। বাছুর একেবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মাঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়। তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠলে, কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যতদিন না ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর, পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে; আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কর্‌তে হবে না।

ফল হইলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি ফল, কর্ম্ম—ফুল।

গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে, বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়লে, শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না; ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়। যেমন ঘণ্টার শব্দ টং। যোগী নাদভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন।

সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্ম ত্যাগ হয়।

(ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি)

সমাধির কথা বলিতে বলিতে প্রভুর ভাবান্তর হইল। তাঁহার চন্দ্রমুখ হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বাহির হইতে লাগিল। আর বাহ্য জ্ঞান নাই। মুখে একটি কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগদম্বাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তারপর আমি আবার বলেছিলাম মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখ্‌ব, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্‌।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

প্রভু শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে নাই উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তবে তুমি

লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো। (এই বলিয়া ঠাকুর শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্‌লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত, না বিবেক-বৈরাগ্য আছে? যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

যদি আদেশ হয়ে থাকে, তাহা হইলে লোক-শিক্ষায় দোষ নাই।

আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটি কিরণ আসে, তা হলে এমন শক্তি হয় যে, বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

প্রদীপ জাল্‌লে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ২ আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না। তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে খপর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে "আপনি কি লইবেন? আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল, এই সব এনেছি, আপনি কি লইবেন?' আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, দূর কর—আমার ওসব ভাল লাগেনা, আমি কিছু চাহিনা।"

চুম্বক পাথর কি লোহাকে বলে, তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে; তা' ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানে কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ও দেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ্‌ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্‌ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আবার জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্য বোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি হবে?

"একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিলে, "ভাইরে, আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম। এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, 'শালা বলে কিরে, মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল, "মহাশয় আপনি প্রচার কর্‌তে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম, ওগো একটা গল্প শোন। ওদেশে হাল্‌দার-পুকুর ব'লে একটি পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো, আর সকাল বেলা যারা পুকুরে আসতো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না। আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখতো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাশী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে, তখন কি আশ্চর্য্য, একেবারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল!

তাই বল্‌ছি, হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে, তবে লোকে মান্‌বে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,— তা'দের সঙ্গে তোমার লড়্‌তে হবে। এরা ত (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি হয়েছে, বল দেখি? আর যে আদেশ পায়, তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে, আর কি ফলই বা থাক্‌বে?

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়?)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি, ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।—

(গান)

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুজ্ খুজ্ খুঁজ্ খুজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্ দিব্ দিব্ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে
কোন্ জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এ সাগরে ডুবলে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

(নরেন্দ্র * ও অমৃতের সাগর)

"আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—'ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কিনা বল্। আচ্ছা মনে কর্, খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল্'? নরেন্দ্র বল্লে 'আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খা'ব। কেননা বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে'! তখন আমি বল্লাম, বাবা। এ যে সচ্চিদানন্দ-সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান, তারাই বলে যে ভক্তি-প্রেমের বাড়াবাড়ি কর্তে নাই। ঈশ্বর-প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?"

'তাই তোমায় বলি সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও'।

ঈশ্বর-লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোকশিক্ষাও হ'বে।

(ঈশ্বর-লাভের নানা পথ)

"দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্তে পার্লেই হ'ল।

"মনে কর, অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এর অমৃত একটু মুখে পড়্লই অমর হ'বে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক্; একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন কর্লেই তুমি অমর হ'বে।

(যোগ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ)

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে, ঈশ্বরকে পাবে।

"মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' আর 'ভক্তিযোগ'।

১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্তে চায়। 'নেতিনেতি' বিচার করে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বিচার করে—সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

* নরেন্দ্র—স্বামীবিবেকানন্দ।

২। কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ; তুমি যা শিখাচ্ছ।

অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান-ধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি আসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা, জপ, এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্মযোগ।

"ঈশ্বর-লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

"৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম-গুণকীর্ত্তন; এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।

(কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম করতে বলেছে, তার সময় কৈ?

"তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না করে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর-লাভ না করলে, ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে, একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, এ সকলের পার।'

"যদি রোগ-শোক, সুখ-দুঃখ, এ সব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বলছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?'

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ, আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্ত-বৎসল মনে করিলেই ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায়না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

কলকাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে, তা হলে গড়ের মাঠ, সুসা-ইটী, সবই দেখ্‌তে পায়।

কথাটা এই, এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি?

জগতের মাকে পেলে; ভক্তি পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব-সমাধিতে রূপদর্শন হয়, আবার নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়। তখন অহং থাকে না; নাম-রূপ থাকে না।

(ভক্ত ও কর্ম্ম, ভক্তের প্রার্থনা।)

ভক্ত বলে, মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মে কামনা আছে, সে কর্ম্ম কর্‌লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম্ম কর্‌তে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করি‌তে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম করিতে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে কর্‌তে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ কর্‌তে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ কর্‌বে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক কতক জায়গা দেখিয়াছি। হাজরা অনেক দূর গিছল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল—হৃষীকেশ গিছল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠিনাই।

"চিল শকুনিও অনেক উচে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা'হ'লে তীর্থে যাবার কি দরকার?
কাশী গিয়ে দেখিলাম, সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

"তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ'ল, তা' হ'লে তীর্থ-যাওয়ার আর ফল হ'ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল-শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়; আর বলে যে, শাস্ত্রে মেনে সকল কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত— টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ, এসব নিয়েই ব্যস্ত।

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা, আর কৌস্তুভ মণি ফেলে, অন্য হীরা-মাণিক খুঁজে বেড়ানও তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ'লে ফল হবে না।

'ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে, 'মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।' মা উত্তরে বল্লেন, 'বাবা হাগাতেই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেবনা।"

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

তিনরকম বদ্যি আছে।

"এক রকম আছে, তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল মাত্র ব'লে যায় 'ঔষধ খেয়ো হে।' এরা অধম থাকের বদ্যি।

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বদ্যি আছে, তা'রা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে, রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম-থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

আর উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা' হ'লে তা'রা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।

পণ্ডিত মহাশয়। যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয়না বল্‌লেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে, কিন্তু মনে কর, ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি করবে? উত্তম বদ্যিও কিছু করতে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাওনা। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে, আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, তোর কে আছে? মনে কর, বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে—তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে? শুন্‌ছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ, আমি সব শুন্‌ছি।

(ঈশ্বরের দয়া।)

তাহার পর ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুর বাড়ীতে কতকগুলি শিখ-সিপাই এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হ'লো। কথার মধ্যে একজন ব'ল্‌লে, ঈশ্বর দয়াময়, আমি ব'ললেম—বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জান্‌লে? তারা ব'ল্‌লে—কেন মহাশয়, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন, যত্ন কর্‌ছেন।

আমি ব'ললেম? সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ। বাপে ছেলেকে খাওয়াবে না তকে খাওয়াবে? তবে কি ও পাড়ার লোকে এসে দেখ্‌বে নাকি?

নরেন্দ্র। ঈশ্বরকে দয়াময় ব'লবো না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে কি আমি দয়াময় ব'ল্‌তে বারণ কর্‌ছি? আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক, পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে এক গ্লাশ জল রাখা হইয়াছিল, সে জল খাইতে পারিলেন না। আর এক গ্লাশ জল আনিতে বলিলেন। পরে শোনাগেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইঁহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে)। আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম। (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্‌লাম, জান?

সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ এর মানে বুঝিতে পারে নাই, তাই ভারী খুসী হ'য়েছিল। সীতার বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যত হবার, হয়েছে; এই বাক্য দিনদিন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্র; তাঁর দিনদিন বৃদ্ধি হবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রভু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাংখ্য দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥

পদপাঠঃ। সংঘাতপরার্থত্বাৎ। ত্রিগুণ-আদি-বিপর্য্যয়াৎ। অধিষ্ঠানাৎ। পুরুষঃ। অস্তি। ভোক্তৃভাবাৎ। কৈবল্যার্থং। প্রবৃত্তেঃ। চ।

ব্যাখ্যা। সংঘাতপরার্থত্বাৎ—সংঘাত অর্থাৎ সংহতভাবে অবস্থিত সমষ্টি, অপরের নিমিত্ত-হেতুক। ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ—ত্রিগুণাদির বৈপরীত্য-নিবন্ধন। অধিষ্ঠানাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাপিয়া থাকা বশতঃ। পুরুষ—আত্মা। অস্তি—আছে। ভোক্তৃভাবাৎ—ভোক্তৃত্ব-প্রযুক্ত। কৈবল্যার্থ—দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত বিনাশরূপ মুক্তির জন্য। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন থাকা হইতে। চ—ও।

বঙ্গার্থ। সংহত সকল পর প্রয়োজন সিদ্ধকরে বলিয়া, অসংহত পদার্থে ত্রিগুণের অবিদ্যমানতা-হেতু, জড়-জগতের চেতনাধিষ্ঠিততা বশতঃ, ব্যবহারিক ত্রিগুণাত্মক পদার্থ-প্রকরের ভোক্তা আবশ্যক, এই জন্য, আত্মার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। মুক্তির জন্য জন-সমাজে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে বলিয়াও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

বিশদ ব্যাখ্যা। জগতের মূলে বৈষম্যের বীজ নিহিত আছে। ইহার প্রতি অণুমাত্রও ঊর্দ্ধশিরে বৈষম্যের বিজয়-পতাকার পত্ পত্ শব্দের প্রতীক্ষায় আছে। সাংখ্য শাস্ত্রের সর্ব্বজনসিদ্ধ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অব্যক্তেই পর্য্যবসান। পুরুষতত্ত্ব উহার অতিরিক্ত। সামান্যতঃ চৈতন্যের সত্তা অস্বীকার করা স্বাভাবিক লোকের

অসম্ভব, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তিভাবে বর্ণনা করিতে যাইয়া কেহবা উহাকে গুণ অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম, কেহ বা শক্তি অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তি ইত্যাদিরূপে প্রমাণ করিতে গিয়া, উহাকে আবার জড়তত্ত্বের মধ্যে আনিয়া একটা পাকপাকি খিঁচুড়ী করিয়া বসেন। তাঁহারা চিন্তা করেন না যে, উহা শক্তি হউক, অথবা গুণই হউক, জড়ের ধর্ম্ম বলিয়া জড়জগতের "ভাগা" মাড়াইতে পারিলনা। জড়ত্ব যে চৈতন্যের অধিষ্ঠান ব্যতীত আত্মসত্তাহারা হয়, তাহাও কি একবার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় না? অব্যক্ত পর্য্যন্ত পদার্থ গুলির মধ্যে একটি অন্তঃসলিল স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, নিপুণ-দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে অনেক আভাস পাওয়া যায়; তাহার নাম "কার্য্যকারণ ভাব।" এখানে সেই ভাবের সদ্ভাব নাই। ইহাই এ তত্ত্বের নূতনত্ব। ফলতঃ এটি কথঞ্চিৎ প্রমাণার্হ। এ কারিকায় তাহাই করা হইতেছে।

আমরা প্রতিপলে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ সংঘাত মাত্র। কতকগুলি ক্ষুদ্র২ কণিকার সমবায়কে সংঘাত বলিলে, জগতের সাবয়ব জড়তত্ত্ব সবই তাহার ভিতরে পড়িল। যাহার অবয়ব প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানগম্য, তাহাও সাবয়ব। অব্যক্ত পর্য্যন্তও ঐ ভাবে সংঘাত, কারণ গুণত্রয়-সমূহ। এই সংঘাত "পরার্থ" অর্থাৎ পরের জন্য, স্বতন্ত্র নহে। সাগরের অনন্ত নীররাশি কখনও বাষ্প, কখনও হিমশিলা, কখনও মেঘ আবার জলাকার ধারণ পূর্ব্বক, বারিনিবাসে, মেরুদেশে, আকাশে, পুনর্ব্বার বারিধির বিশাল বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এই কার্য্যচক্র কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিতেছে? তাহা নয়। ইহা ইহার অনিবার্য্য পরতন্ত্রতার পরিজ্ঞাপক কতকগুলি অক্ষর-কার-মসীও পত্রাদির সংঘাতের নামান্তর পুস্তক, উহা যে পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুস্তক পুস্তকের জন্য নয়, পাঠকের নিমিত্তই উহার আবশ্যকতা। সূত্র-সংঘাত "বসন" নামে পরিচিত, তাহা বসনের নিমিত্ত নহে, পরিধানকর্ত্তার উদ্দেশেই বসন বিরচিত। যদি দেশে বসন-বয়ন-প্রণালী আবশ্যক-মূলক না হইত, তাহা হইলে যাহারা (অসভ্যেরা) বসন ব্যবহার-বিরত, তাঁহাদেরও প্রবৃত্তি হইত। বস্তুতঃ প্রয়োজনাপেক্ষা ব্যতীত জগতে প্রবৃত্তি নাই। বসনের দরকারই বসন বয়নের একমাত্র নিদান। যেমন পুস্তক পরার্থ, তাহাকে দেখিয়া পুস্তক যাহার জন্য, তাহার অনুমান হয়, তদ্রূপ সংঘাত পরার্থ বলিয়া, ঐ পরার্থ সংঘাত যাহার জন্য, তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। সংঘাত পরতন্ত্র, কিন্তু অপর একটী সংঘাত উহার দ্বারা অনুমিত হউক, কেননা দৃষ্টানুসারিকল্পনারই বিধান। ব্যবহার-ক্ষেত্রে দৃষ্ট হইল "সংঘাত" "পুস্তক", হস্ত-পদাদি সংঘাত রামের জন্য, তদ্রূপ অব্যক্তমহদাদি

সংঘাত অপর একটী সংঘাতের জন্য হওয়া উচিত। এইরূপ তর্ক অকিঞ্চিৎকর, কেননা বরাবরই সংঘাতের প্রবাহ চলিতে লাগিলে "পেঁচোপাচি"র ন্যায় সংঘাতে পড়িয়া বসিল। সংঘাত-জাল ছিন্ন করিয়া, সংঘাত যাহার জন্য, তাহা "অসংহত" এইরূপ বলিতে হইবে। প্রত্যুত বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, পুস্তক রামের শরীর-সংঘাতের নিমিত্ত নয়। উহা রামের দেহ-মন্দিরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা আত্মার জন্যেই, অতএব আত্মা অসংহত সিদ্ধ হইল।

যদি সংহতত্ব নিবৃত্ত হইল, তাহাহইলে ত্রিগুণত্বাদি যে ধর্ম্ম সংহতত্বের সমব্যাপ্ত, তাহাদেরও নিবৃত্তি হইল; ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অভাব—যথা অত্রিগুণত্বাদি আত্মার অনুমাপক হইল। প্রাণিত্ব ও জন্মিত্ব যেমন পরস্পর-ব্যাপক ও ব্যাপ্য তদ্রূপ ত্রিগুণত্ব এবং সংহতত্ব। যাহারা প্রাণী, তাহারা জন্মী। জন্মশীল নয়, এরূপ প্রাণী নাই। এখানে একের নিবৃত্তি হইলে অপরের নিবৃত্তি হইবে। সাধারণতঃ লোকে যাহার বৃত্ত বড়, তাহাকে ব্যাপক এবং তদন্তর্গত ছোট বৃত্তকে ব্যাপ্য বলে, উহা সমব্যাপ্তির স্থল নয়। উহারা পরস্পর পরস্পরের ব্যাপক এবং ব্যাপ্য নয়। একে অপরের ব্যাপ্য। যেমন বৃহৎ এবং তদন্তর্গত ক্ষুদ্রবৃত্তের ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব, তদ্রূপ সমস্থানব্যাপী অর্থাৎ একস্থানবর্ত্তী বৃত্তদ্বয়ের ব্যাপ্য ব্যাপকভাব স্বীকৃত।

অধিষ্ঠান অর্থাৎ অবস্থিতি। ত্রিগুণাত্মক পদার্থ মাত্রেই অপর দ্বারা অধিষ্ঠিত। যেমন রথের অধিষ্ঠাতা সারথি, সেইরূপ দেহাদি অব্যক্ত পর্য্যন্ত গুণময় পদার্থের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যরূপ আত্মা। জড়ের কার্য্যে চেতনের অধিষ্ঠাতৃত্ব অত্যাবশ্যক। যদি বলি দৃষ্টান্তানুসারে সারথি সদৃশ অপর একটী জীবৎ জড়পিণ্ড অব্যক্তের অধিষ্ঠাতা হউক। এবাক্য বালকের মত। জীবৎপিণ্ডের অধিষ্ঠাতৃত্ব বাস্তবিক কিছুই নয়। মৃত্যুর পরে সেই দেহেরই জীবিততা থাকেনা, তাহার কারণ অধিষ্ঠাতা নাই। যাহা নিজে পরের অবস্থিতি নিবন্ধন ব্যাপারিত হয়, তাহা "অধিষ্ঠাতা" হওয়া সম্ভব নয়। ফলতঃ একই চৈতন্য, দেহ এবং রথ, উভয়েরই অধিষ্ঠাতা।

ভোক্তৃত্ব হইতে আত্মার অনুমান হয়। এই অনন্ত রত্নরাজি কিজন্য বিরাজিত? কোনও নরেশের শিরোভূষণ হইবার জন্য অথবা কোনও কামিনীর কমনীয় কণ্ঠহার হইবে বলিয়াইত? যদি ফুলের গন্ধে অন্ধ হইয়া অলিকুল আকুলভাবে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া পীযূষপানে পরিতৃপ্ত না হইল, তবে উহার সার্থক্য কি? এখানে পরার্থতা ও ভোগ্যতা পরমার্থতঃ একপদার্থ হইলেও বোধের প্রকারভেদ আছে। পরার্থতা কেবল পরের জন্য, ইহা বুঝায়। ভোগ্যতা, পরের ভোগের জন্য, ইহা বুঝাইতেছে। সুখ-দুঃখের অনুভবই ভোগ শব্দের প্রতিপাদ্য। ভোগেরজন্য ভোক্তাই আবশ্যক। সুখের ভোক্তা সুখ নিজে নয়। সুখের সুখ হয় না, সুখীরই সুখ হয়। ঐ সুখানুভব শরীরের ও ইন্দ্রিয়াদির নহে, কেননা তাহারাও সুখ সাধন; যাহা সুখের করণ, তাহা

সুখের অনুভবিতা নয়। কর্ত্তা ও করণ এই দুইটী প্রসিদ্ধ পৃথক্ পদার্থ। সুখ-সাধনও সুখানুভবরূপ ভোগ হইতে ভোক্তার অনুমান হয়। ভোক্তার ভোগের বিষয় না হইলে তাহার ভোগ নাম বিফল। ভোগ না করিলেও ভোক্তৃত্ব বৃথা। উহার এক একটী অপরের অনুমাপক।

আরও দেখা যাইতেছে, শাস্ত্রে মুক্তির নির্ণয় আছে, বুদ্ধিমান লোকেরা তদর্থে প্রবৃত্তও হন। যদি প্রবৃত্তি-দ্বারা প্রয়োজন অনুমান করা গেল, তবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধির আশ্রয় যদি আত্মা না থাকে, তবে মোক্ষপ্রবৃত্তি বিফল। মুক্তি দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ। (একান্ত অভাব।) যদি আত্মা না থাকে, তবে দুঃখনিবৃত্তি হইবে কাহার? জড়জগতের মূলকারণ গুণত্রয়রূপ অব্যক্ত। তাহার অর্থাৎ গুণের ধর্ম্ম সুখ-দুঃখ-মোহাদি, কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং জড়জগৎ দুঃখময়। তাহাদের দুঃখনিবৃত্তি হইলে স্বরূপোচ্ছেদই হইল। অতএব নির্দুঃখ আত্মার কল্পনা আবশ্যক। তাহা দুঃখস্বভাব নয়, অতএব তাহার দুঃখবিনাশ সম্ভাবিত। দুঃখ নিত্য নয়, প্রতিক্ষণেই আমরা তাহার নিবৃত্তি লাভ করিতেছি। কিন্তু আবার উৎপন্ন হয়। দুঃখ-বৃক্ষের মূলচ্ছেদার্থ বিজ্ঞান-কুঠার প্রয়োজনীয়। যখন জন্মশীল মাত্রেই নিবৃত্ত হইবে, তখন দুঃখের কথা কি? উহা নিশ্চয়ই যাইবে। তবে সেই মোক্ষার্থ প্রবৃত্তি যে নির্দুঃখ আত্মার অনুমাপক, তাহা নিঃসন্দেহ। আত্মা না থাকিলে দুঃখস্বভাব জগতের মুক্তি কি? দুঃখের অত্যন্তোচ্ছেদ দুঃখ-স্বভাব বস্তুর হয়না। কারণ, স্বভাবের একান্ত-বিনাশ দৃষ্ট হয় না। অনুমান বা অপর-প্রমাণ-লভ্যও নয়। অতএব মোক্ষপ্রবৃত্তি দুঃখময় জড়তত্ত্বের অতিরিক্ত নির্দুঃখ চৈতন্যরূপ পুরুষেরই গমক, ইহা প্রমাণিত হইল।

জনন-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥

পদপাঠঃ। জনন-মরণ করণানাং। প্রতিনিয়মাৎ। অযুগপৎ। প্রবৃত্তেঃ। চ। পুরুষ-বহুত্বং। সিদ্ধং। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। জনন-মরণ-করণানাং—জন্ম, মৃত্যু, ইন্দ্রিয় সমূহের। প্রতি—উপর। নিয়মাৎ—ব্যবস্থা আছে বলিয়া। অযুগপৎ—পৃথক্ সময়ে। প্রবৃত্তেঃ—প্রযত্ন দেখা যায় হেতুক। চ—ও। পুরুষ বহুত্বং—আত্মার অনেকত্ব। সিদ্ধং— নিশ্চিত হয়। ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াৎ—তিন গুণের অন্যথা ভাব হইতে। চ—এবং। এব— নিশ্চয়ই।

বঙ্গার্থঃ। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি শরীরের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা থাকা বশতঃ আত্মার অনেকত্ব অনুমিত হয়। প্রতি দেহে যুগপৎ প্রযত্নাদি দেখা যায় না, ইহা হইতেও উহা বুঝা যায়। জীবজগতে ত্রিগুণের অন্যথা ভাব পরিলক্ষিত হয়, ইহা দ্বারা নিশ্চয় পুরুষের (প্রতিদেহে ভিন্নতা রূপ) বহুত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

বিশদ ব্যাখ্যা। জন্ম এবং মরণ প্রসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গণও জ্ঞান-সাধন বলিয়া জগতে পরিচিত। ইহাদের ব্যবস্থা দর্শনে প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র আত্মা বিদ্যমান আছে, বুঝিতে হইবে। এই পুরুষ-বহুত্ব নির্ব্বাচনে গ্রন্থকার ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাহা অনুসন্ধেয়। প্রতিপক্ষের আক্ষেপ তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে সন্দেহ নাই। যেমন একটী লণ্ঠনের ভিতর একটী আলোক স্থাপন করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, এই চতুর্ব্বিধ কাচ দিয়া উহার আবরণ নির্ম্মাণ করিলে, একই আলোক আবরণের লোহিতাদি গুণ বশতঃ লোহিতাদি আকারে পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ বিচিত্র উপাধি-ভেদে একই আত্মা বিচিত্র রূপে প্রতি দেহে পরিদৃষ্ট হইতেছেন। এইরূপ বাদীবাক্যের নিরাসার্থই প্রবৃত্তি। নচেৎ প্রত্যক্ষতঃ শরীর ভেদে পরস্পরের কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহা দেখা যাইতেছে; এখানে একত্বের শঙ্কাই হয় না।

পূর্ব্বপক্ষে বলা হইল, বিভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সিদ্ধান্তে প্রদর্শিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ জন্ম-মরণাদি হইতেছে। লণ্ঠনের আলোক নিবিয়া গেলে, সকল কাচের দিক হইতেই নিবে। একখানি হইতে নিবিয়া যায়, অপর খানিতে দৃষ্ট হয়, এরূপ নয়। এক আত্মা হইলে, একের জননে জগতের যাবতীয় জীব জন্ম গ্রহণ করা উচিত, এবং একের মৃত্যুতে অপর সকলেরই সেই পথের পথিক হওয়া আবশ্যক হয়। এক জন দেখিলে, সেই দর্শন-জ্ঞান সকলের হওয়া আবশ্যক এবং একের নয়নে অন্ধতা হইলে, সকলেরই চিরতরে দর্শন লাভে বঞ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু কই, তাহা ত হইতেছে না! অতএব প্রতিদেহে জীব ভিন্ন। যদি মরণাদি, দেহ রূপ উপাধি ভেদে ঘটে, অর্থাৎ উপাধির অনুগত হয়, তবে এক উপাধির গুণ অপর উপাধিতে সংক্রমিত হইতে পারে না বলিয়া, উহার কথঞ্চিৎ সমাধান করা যায়। সত্য বটে; কিন্তু দেহ উপাধি হইলে, দেহাবয়ব হস্তস্তনাদিও উপাধি হইবে, কিন্তু হস্তবিনাশে বা স্তন-বিনাশে জীবের মৃত্যু হয় না। স্তনোচ্ছেদে, অথবা দন্তোদ্গমে জীবের জন্মও হয় না। বস্তুতঃ উপাধিভেদে বস্তুভেদ হয় না। উপাধিগণই পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া নিপুণ ভাবে অবলোকন করিলে বুঝা যায়। উপধেয়-ভেদ ও উপাধি-ভেদ, ইহাদের পরস্পর প্রয়োজ্য-প্রয়োজক-ভাব অসিদ্ধ। জীব-ভেদ কিন্তু সর্ব্বথা সর্ব্বকালে সার্ব্বজনীন অনুভব-সিদ্ধ। এক শরীরে প্রযত্ন উৎপন্ন হইল, অপর শরীরে তখন তাহার উদয় নাই, ইহাও পরস্পর ভেদ-জ্ঞাপক। ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? একটি জীব সুখী, অপর দুঃখী। একে দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যায় শয়ন-সুখানুভব করিতেছে, অপরে মৃত্তিকা-শয্যায় শায়িত। একের হৃদয়ে প্রবল-পূতি-গন্ধময়-পাপ-স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, অন্যের অন্তঃকরণে কুসুম-সুবাসের ন্যায় ধর্ম্মামোদ বহিতে থাকে। এ বৈষম্য কি একই জীবের উপর উপযুক্ত? এক দেহে সেই একই জীব সুখভোক্তা ও অপর শরীরে দুঃখ-দগ্ধ হইতেছে ইহা কি সম্ভব? লোকে দেখিতে পাওয়া যায়,

দুঃখে অনিচ্ছা ও সুখে প্রীতি সর্ব্বসিদ্ধ। যে আত্মার এক দেহে সুখে প্রীতি আছে, অপর দেহে দুঃখে তাহার অপ্রীতি থাকাই উচিত। ভোগ কিন্তু অপ্রীতিতে থামিল না। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায়, যিনি সুখভোগে প্রীত, তিনিই তৎ সময়ে দুঃখে উদ্বিগ্ন, এ কথা অসম্ভব বলিয়া আত্মভেদ সিদ্ধ হইল। উপাধি ভিন্ন বটে, কিন্তু যিনি সুখ-দুঃখ-ভোক্তা, তিনি এক হইলে, এককালীন একেরই বিরুদ্ধ-সুখ-দুঃখভোগ-সাঙ্কর্য্য-রূপ মহদ্দোষ ঘটে। অতএব প্রতি শরীরে পুরুষ পৃথক্, ইহা প্রতিপাদন করা আচার্য্যের অভিমত। (ক্রমশঃ)।

শম্।

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা।১

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—(বেদাধ্যয়নের) অনন্তর। অতঃ—এই (অধীতবেদত্ব)-হেতুক। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা—ধর্ম্ম জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা। (কর্ত্তব্যেতিশেষঃ)।

বঙ্গার্থঃ। বেদাধ্যয়নানন্তর অধীতবেদত্ব নিবন্ধন ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক।

বিশদব্যাখ্যা। আর্য্যশাস্ত্রের প্রধান গৌরব অধিকার নির্ব্বাচন। এই সুচারু নিয়ম-বন্ধন বিপ্লাবিত হওয়ায়, অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতিকূল-স্রোতঃ ইহাতে অনবরত প্রতিহত হইতেছিল, তাহাই আ'জ দারুণ দুর্দ্দিন। বেদাধ্যয়নের ত্রৈবর্ণিক অধিকার সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সাঙ্গ বেদের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, ত্রৈবর্ণিক সমূহ বেদশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইবার মানসে বেদার্থবিচার করিবেন। সূত্রে মহামুনি "জিজ্ঞাসা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা পদের প্রকৃতার্থ (জ্ঞাতুমিচ্ছা) জানিবার ইচ্ছা। এখানে জানিবার ইচ্ছা অধিকারিগণের করায়ত্ত নয় এবং জানিবার ইচ্ছায়ও বেদের অনুষ্ঠান-প্রামাণ্য পরিতৃপ্ত নহে। বেদাধ্যয়ন করিয়া বেদবাক্যের পরস্পর বিরোধাপনয়নপূর্ব্বক প্রামাণ্য-পরীক্ষা-প্রত্যাশায় ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান না করিলে, কেবল মাত্র "অগ্নিহোত্র স্বর্গ-

সাধক" এই বাক্যের বারম্বার আবৃত্তি প্রত্যাবৃত্তিতে গগনমণ্ডলে শব্দ-তরঙ্গ উৎপাদন করিলে স্বর্গ-সম্প্রাপ্তি ঘটে না; বেদ প্রামাণ্য ও পরীক্ষিত এবং পরিরক্ষিত হয় না। কাজেই অনুষ্ঠান-সাপেক্ষবিষয়ে বিচারপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিভাবাদি সম্যক্ প্রকারে অবধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। অব্যাহতরূপে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে, স্বর্গ-প্রাপক অপূর্ব্বোৎপত্তি হয়, বেদ-প্রামাণ্যও রক্ষিত হয়। অনুষ্ঠান আবার বিচারাভাবে সুসম্পাদ্য নহে। অতএব জিজ্ঞাসা পদের অর্থ এখানে "বিচার" হওয়া আবশ্যক। তাহা লক্ষণাশক্তির সামর্থ্যেই বলিতে হইবে। বেদাধ্যয়ন না করিলেও বেদার্থ-বিচার সম্পন্ন হইতে পারে না। সামান্যতঃ পদার্থ-পরিচয় না থাকিলে, বিচাররূপ বিশেষাবধারণ একেবারেই অসম্ভব। এই আশয়ে আচার্য্য মহোদয় "অতঃ" শব্দদ্বারা পূর্ব্ববৃত্ত বেদাধ্যয়নকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদাধ্যয়নকে হেতু বলা হইল, কিন্তু এখন প্রবল অনুপপত্তি-রাহু এই সিদ্ধান্ত-শশীর সন্নিকটে সমাগত হইতেছে। ভাষ্যকার শবরস্বামি-মহাশয় তাহার গতিপ্রতিরোধে কি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করা যাউক। সূত্রে "অথ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "অথ" শব্দের মঙ্গল, আনন্তর্য্য ও অধিকার, এই অর্থত্রয় প্রসিদ্ধ। এখানে মঙ্গলার্থকতা স্বীকার করিলে, ইষ্টসিদ্ধির পথ কণ্টকিত বই পরিষ্কৃত হইলনা। আনন্তর্য্যার্থ অবলম্বন করিলেও আপাততঃ বিচার করা আবশ্যক, কিসের আনন্তর্য্য? বিচার কার্য্যবিশেষ। কার্য্য মাত্রই সসীম। বিচারের আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি থাকা বিধেয়। "আরম্ভ" অপর কিছুর অনন্তর হইবে, সন্দেহ নাই। অগত্যা নিত্যক্রিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদির পরও হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টই প্রতীত হইবে, সন্ধ্যাবন্দনাদি ও অপরকার্য্যের আনন্তর্য্য-বিধান আচার্য্যের অভিমত নহে। এই আনন্তর্য্যের অভ্যন্তরে অধিকার-নিরূপণের বীজ বিদ্যমান। তত্ত্বদর্শিমহর্ষিগণ অধিকারের ব্যবস্থা না করিয়া কোনও কার্য্যে কর্ত্তব্যতা বিধান করিতেন না। ধর্ম্মবিচার করিতে অধিকারী কে? ধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদিত। যাঁহারা সামান্যতঃ বেদার্থপরিজ্ঞাতা, তাঁহাদেরই বিচার-সামর্থ্য সম্ভব। তজ্জন্য এখানে বেদাধ্যয়নের আনন্তর্য্য বুঝিতে হইবে। এখন চিন্তনীয় এই যে, "বেদমধীত্যস্নায়াৎ" এই একটী শ্রুতিবাক্য শ্রুত হইতেছে। "বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে স্নান করিবে"—শ্রুতি নিরপেক্ষগম্ভীর রবে এই সত্যতত্ত্ব ঘোষণা করিয়া গুরুকুলে বেদাধ্যয়ন-সমাপ্তির পরে "সমাবর্ত্তন" বিধান করিতেছেন। আবার মহর্ষি মহোদয় সূত্রে বলিতেছেন "বেদাধ্যয়নের পরে বেদার্থ-বিচার করিবে।" ব্রহ্মচারীর গুরুকুলবাস, বেদাধ্যয়ন, পর্য্যাপ্ত হইল; এখন তিনি সমাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহাদি দ্বারা গৃহস্থ হইবেন; তাঁহার বেদার্থ-বিচারের অবসর রহিল কই? সমাবর্ত্তন না করিলেও বেদ-দর্শিত বিধি-বাক্যের অতিক্রম করা হইল। বিচার-বিধানে জৈমিনি-বচনই প্রমাণ, প্রতিকূলে প্রত্যক্ষশ্রুতি দণ্ডায়মানা। এই

সম্প্রাপ্ত-সঙ্কটে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলিতেছেন। আমরা সমাবর্ত্তন-বিধিকে অবমাননা করিতে প্রস্তুত আছি। যদি বেদাধ্যয়নের পরে সমাবর্ত্তন করিতে হইল, তবে বেদবিচার করা হইল না। বিচার না হইলে, অব্যাহত-অনুষ্ঠান হইতে পারিল না। না হইলে অননুষ্ঠান-জনিত অপ্রামাণ্য আপতিত হইল। সমস্ত বেদই খণ্ডিতাকারে পরিণত হইল। অতএব প্রয়োজনবান্ বিচার-বাক্যেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাৎপর্য্যাধীন গুরুকুল হইতে অধীতবেদ ব্রহ্মচারী সহসা সমাবর্ত্তনানুষ্ঠান করিবেন না, বেদ বিচার করিবেন, এইরূপ সূত্রার্থ পর্য্যবসিত হইল। "অথ" শব্দের বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়া" এই আনন্তর্য্যার্থ সুসঙ্গত হইল। সূত্রে পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের সন্নিবেশ আছে। ভাষ্যকার-বচন হইতে আমরা এই অভিপ্রায় অবগত হই। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি, এই পাঁচ প্রকারে অধিকরণ বিভক্ত। এই সূত্রে ধর্ম্মজিজ্ঞাসাধিকরণ ব্যবস্থাপিত। শবরস্বামীর মতে বিষয়—ধর্ম্ম-বিচার। সংশয়—ধর্ম্মবিচার কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য। পূর্ব্বপক্ষ—নির্ব্বিষয় এবং নিষ্প্রয়োজন বলিয়া অকর্ত্তব্য। বিষয় ধর্ম্মবিচার, যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে ধর্ম্ম-বিচারও থাকেনা। ধর্ম্ম প্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অনাবশ্যক; অপ্রসিদ্ধ হইলে, বিচার অসম্ভব। শশ-বিষাণ বা অশ্বডিম্বের বিচার কি? অতএব নির্ব্বিষয়। যদি ধর্ম্ম আছে, স্বীকার করিয়াই লওয়া যায়, তথাপি বিচারের প্রয়োজন নাই। উত্তর—ধর্ম্ম এবং বিচার, কিছুই অপ্রসিদ্ধ নয়, সামান্যতঃ প্রসিদ্ধ ধর্ম্মে বিচার দ্বারা বিশেষ নির্ণয় করা হয়। অনেকে ধর্ম্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে বিপ্রতিপন্ন; সুতরাং ধর্ম্মবিচার আবশ্যক ও প্রসিদ্ধ; সপ্রয়োজনও বটে। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুরুষ পরম-পুরুষার্থ নিঃশ্রেয়স প্রাপ্ত হন। বিচার বিনা অনুষ্ঠান অসম্ভব, সুতরাং প্রয়োজন আছে। এখানে কেহ কেহ "ধর্ম্ম" বিষয়, কেহবা "ধর্ম্ম-বিচার শাস্ত্র" বিষয় ইত্যাদিরূপে অধিকরণ-ব্যবস্থাপন শবরস্বামীর অভিলাষ, বলেন। পরে ইহার বিশেষ বিবেচিত হইবে। সঙ্গতি—অধ্যায়ের সহিত ও পাদের সহিত তৎপ্রতিপাদ্যার্থ-প্রতিপাদকত্ব। প্রথম সূত্রে অপর কিছুই পূর্ব্ববাক্য নাই; সুতরাং পূর্ব্বাপর-সঙ্গতি এখানে থাকিতে পারেনা।

চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ ॥২

পদপাঠঃ। চোদনালক্ষণঃ। অর্থঃ। ধর্ম্মঃ।

ব্যাখ্যা। চোদনালক্ষণঃ—ক্রিয়া-প্রবর্ত্তকবচন যাহার লক্ষণ, অর্থাৎ প্রমাণ বা অনুমাপক। অর্থঃ—প্রয়োজনবান্ অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স-প্রয়োজন-সম্পাদক। ধর্ম্মঃ—ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।

বঙ্গার্থঃ। ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের একমাত্র অলৌকিক সাধন বেদপ্রতিপাদ্যস্বরূপ "ধর্ম্ম" বলিয়া অবধারিত হইতে পারে।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধীতবেদ-ব্রহ্মচারী বেদার্থ-বিচারে মনোনিবেশ করিবেন। বেদানুমোদিত অর্থ যে ধর্ম্ম, তাহাও সামান্যতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন আপাততঃ আশঙ্কা হইতেছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—অর্থাৎ ধর্ম্মবিচার করিবেন, কিন্তু ধর্ম্ম কি, তাহা যতক্ষণ অব্যাঘাতভাবে নির্ব্বাচিত না হইতেছে, ততক্ষণ উহা আশার প্রসারেই পর্য্যবসিত। মহর্ষি এই শঙ্কাসমুদয়ের অবকাশকে নিরবকাশ করিবার মানসে বলিতেছেন ; "চোদনালক্ষণোঽর্থোধর্ম্মঃ।" পদার্থের পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, যাহা বর্ত্তমানে লোচন-পথে পতিত, তাহাকেই "ইহা এইরূপ" এই প্রত্যক্ষপ্রকারে প্রতিপাদিত করা সম্ভব। যে বস্তু ভবিষ্যজ্ঞান-বিষয়, ইদানীং অক্ষিপথের অধীন হয় না, তাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করিতে হইলে লক্ষণ কথন আবশ্যক। ধর্ম্ম বর্ত্তমানে চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট নয়, কেননা তাহা সম্পাদ্য-ভবিষ্য-বস্তু। কাজেই লক্ষণ-সমর্থনদ্বারা তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞানে প্রযত্ন বিধেয়। "চোদনালক্ষণঃ" ইহাই ধর্ম্মের সলক্ষণ স্বরূপ। চোদনা—অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচন। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা যায় "নদীতীরে অশেষ ফলরাশি সঞ্চিত আছে, আবশ্যক হইলে, গমন করিয়া গ্রহণ কর।" তাহাহইলে সেই ব্যক্তির ঐবাক্য শ্রবণানন্তর নদীতীরে গমনে প্রবৃত্তি হইল, অবশেষে ক্রিয়াসম্পাদন। এখানে অবহিতচিত্তে চিন্তা করিলে হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন, পূর্ব্বোক্ত বাক্যই পরোক্ত ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক। এইরূপ প্রবর্ত্তকবাক্য এখানে 'চোদনা' নামে অভিহিত হইবে কিনা, তাহা বিচার্য্য এবং বক্তব্য নয়, তবে এইটুকু বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, চোদনা শব্দে এখানে প্রবর্ত্তক বেদবাক্য বলিতে হইবে। কারণ, স্নান-ভোজনাদি-লৌকিক ব্যবহারে জনগণকে প্রবৃত্ত করিতে যে বচনাবলী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম প্রতিপাদক হইতে পারে না। মহোদয় জৈমিনির মতে ক্রিয়ার্থক অর্থাৎ কর্ত্তব্যতা-বিধায়ক বেদবাক্য প্রমাণ, অপরাংশ প্ররোচনাদিজনক অর্থবাদমাত্র। সমস্ত বিধিবাক্যই পুরুষ-প্রবৃত্তির নিমিত্ত, সন্দেহ নাই। "স্বর্গকামোঽশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি কর্ম্ম-প্রবর্ত্তক-বিধিবাক্য-প্রতিপাদিত যাগাদি পদার্থ 'ধর্ম্ম' নামে আখ্যাত হয়। লৌকিক প্রবর্ত্তক-বচন সকল সর্ব্বদা প্রামাণ্যবান্ নহে, কিন্তু বৈদিক প্রবর্ত্তক বাক্য (অগ্নিহোত্র ও জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতির জ্ঞাপক) সার্ব্বজনীন প্রমাণ, তাহা বেদপ্রামাণ্য প্রতিপাদন-সময়ে বিশেষরূপে বিবেচিত হইবে। প্রবর্ত্তকবাক্য ধর্ম্মপ্রতিপাদন করুক্ ; কিন্তু এ ধর্ম্মে আমাদের ইষ্টসাধনতা আছে কিনা, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। জগতের যত জিনিষ, "আমাদের কার্য্যে আসে" এরূপ না হইলে, তাহার কোনটির বিচারে মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে মনুজকুলের প্রবৃত্তি হয় না। অতএব প্রয়োজনের পরিচয় পাওয়া দরকার। তদুত্তরে বলা হইতেছে "অর্থঃ" অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন আছে। ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন সামগ্রী। যাগাদিরূপধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গাদি-

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধর্ম্মের প্রয়োজন যে কেবল 'স্বর্গ' সংজ্ঞক সুখলাভ, তাহা নয়; আবার অশেষ অনিষ্টজালের উন্নতশির বজ্রতেজোহত-বৃক্ষমস্তকের ন্যায় দারুণ-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার-মহোদয় এখানে অর্থ শব্দ প্রয়োগের যে কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহারও আংশিক আলোচনা আবশ্যক। বেদে প্রতিপাদিত পদার্থ অর্থ এবং অনর্থ, এই উভয়। যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্থ আছে, তেমনি শ্যেনযাগে অনর্থ অর্থাৎ পরহিংসাশরূপ হিংসাও আছে। ইহার অর্থই ধর্ম্ম। অনর্থ ধর্ম্ম নহে। এখানে আপত্তি হইতে পারে, বেদে অর্থরূপধর্ম্ম প্রতিপাদিত হউক্, অনর্থ ধর্ম্ম নহে, তাহার প্রতিপাদন কিজন্য? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলেন, বেদের প্রবর্ত্তক, অর্থাৎ বিধ্যংশের যেরূপ প্রামাণ্য, তাহাতে বিধ্যংশপ্রতিপাদিত পদার্থই ধর্ম্ম নামে কথিত হইবার যোগ্য। অনর্থপ্রতিপাদক বেদভাগ তত্তৎক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য নহে। কেবল তদিচ্ছুর উপায় কথন মাত্র। "যাহার বৈরিনির্য্যাতনে বাসনা আছে, তাহার শ্যেনযাগ উপায়।" এইরূপ অর্থ ভিন্ন "শত্রুবধেচ্ছু শ্যেনযাগ অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য" এরূপ নহে। এইসূত্রে বর্ণিত অধিকরণ "ধর্ম্মলক্ষণাধিকরণ" নামে বিখ্যাত। ইহার পঞ্চাঙ্গ বিচার পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অবধারণ করিতে হইবে। এই সূত্রের পূর্ব্বসূত্রের সহিত উপযুক্ত সঙ্গতিও আছে। অধ্যায় সমাপ্ত হইলে, আমরা সমস্ত অধিকরণের স্বরূপ ও সঙ্গতি প্রকাশ করিব।

তস্য নিমিত্তপরীষ্টিঃ ॥৩

পদপাঠঃ। তস্য। নিমিত্ত পরীষ্টিঃ।

ব্যাখ্যা। তস্য—তাহার (ধর্ম্মের)। নিমিত্তপরিষ্টিঃ—নিমিত্তপরীক্ষা—অর্থাৎ চোদনাই তাহার নিমিত্ত, অথবা অপর কিছু, তাহার নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। ধর্ম্মের প্রকৃত নিমিত্ত কি? তাহা নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।

বিশদব্যাখ্যা। বেদবিধিই ধর্ম্মপ্রতিপাদক, অপর ইন্দ্রিয়গ্রাম ধর্ম্ম প্রতিপাদক নয়। প্রত্যক্ষাদির অনিমিত্ততা প্রতিজ্ঞামাত্রে পরিতৃপ্ত নহে, সুতরাং প্রত্যক্ষস্বরূপ'ও সামর্থ্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি নিমিত্ত-ভাব নিরাশ-করণার্থে পরসূত্র প্রবৃত্তিত হইতেছে। এই অধিকরণ ধর্ম্মপ্রামাণ্যপরীক্ষ্যতাধিকরণ বলিয়া আচার্য্যেরা অভিমত প্রকাশ করেন।

সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম তৎপ্রত্যক্ষম্ অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ ॥ ৪

পদপাঠঃ। সৎসম্প্রয়োগে। পুরুষস্য। ইন্দ্রিয়াণাং। বুদ্ধিজন্ম। তত্। প্রত্যক্ষম্। অনিমিত্তং। বিদ্যমান—উপলম্ভনত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সৎসম্প্রয়োগে—বিদ্যমান বিষয়ের সহিত সম্পর্ক হইলে। পুরুষস্য—পুরুষের অর্থাৎ জীবের। ইন্দ্রিয়াণাং—ইন্দ্রিয়গণের। বুদ্ধিজন্ম—জ্ঞানোদয়। তত্—তাহা।

প্রত্যক্ষম্—প্রত্যক্ষ (বলিয়া কথিত হয়।) অনিমিত্তং—নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ নহে। বিদ্যমানোপলম্ভনত্বাৎ—বর্ত্তমানবস্তুর জ্ঞান হেতুক।

বঙ্গার্থ:। বিদ্যমান বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সংঘটন হইলে, পুরুষের যে জ্ঞানোদয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। ঐ প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে নিমিত্ত নয়; কেননা তাহা বিদ্যমান বস্তুর উপলম্ভক।

বিশদব্যাখ্যা। ধর্ম্মের নিমিত্ত পরীক্ষায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণ সমর্থ নহে, কেন? জাগতিক বস্তুজালের প্রমিতি বিষয়ে প্রত্যক্ষাদির নিমিত্ততা সর্ব্বজনসিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষাদি-সিদ্ধ নয়, তাহাকে শশবিষাণবৎ বলিলেই চলে। তজ্জন্য বলিতেছেন, প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি-প্রমাণসিদ্ধ না হইলে পদার্থ-সিদ্ধি হয়না, এরূপ নহে। বেদও প্রমাণ। ধর্ম্মে প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতে পারেনা, কেননা যে পদার্থ শতবর্ষাবসানে জন্মগ্রহণ করিবে, অদ্যতন-প্রত্যক্ষ তাহার উপর কার্য্যকারী হয় না। ধর্ম্ম ভবিষ্যবস্তু। অনুষ্ঠানানন্তর তাহার স্বরূপোৎপত্তি হইবে। বর্ত্তমান সময়ে, শ্রুত বেদবচন তাহাতে প্রমাণ হইতে পারে। যাগরূপ ধর্ম্মের অবরোধক বলিয়াই বিধি-বাক্যের নিমিত্ততা। এখানে প্রত্যক্ষ-নির্ব্বচন প্রকৃতোপযোগী নয়। বুদ্ধিজন্ম অথবা বুদ্ধি, কিম্বা সন্নিকর্ষ, ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রত্যক্ষের স্বরূপ, তাহাও বিবেচ্য নয়। তবে এই মাত্র অনুসন্ধেয় যে, বিদ্যমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়; অবিদ্যমানের নহে। ধর্ম্ম ভবিষ্য, সুতরাং তদুপদর্শনে প্রত্যক্ষের পরাক্রম প্রসর পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ম্মে প্রত্যক্ষের অনিমিত্ততাধিকরণ এই সূত্রে সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের বৃত্তিকার মহোদয় অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা ৫ম সূত্র ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। বিস্তৃতি ভয়ে বিশ্রামলাভ করিতে হইল। ভাষ্যের স্থূল২ মর্ম্মগুলি ক্রমশঃ সূত্র ব্যাখ্যায় সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন।
(যশোহর, ব্রহ্মচারিআশ্রম।)

সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)।

যুক্তির যুগে আপত্তিকারীর অভাব অল্প মাত্রই অনুভূত হয়, কিন্তু সদ্বিদ্য সমাধানকারীর সংখ্যা সুখলভ্য নয়। অর্ব্বাক্‌মতি চার্ব্বাকের পোষ্যপুত্র হইতে পয়সাব্যয় চাই না। সাধুতার সমদর্শনরূপ সুচারু অলঙ্কারে ভূষিত হওয়া সকলের অদৃষ্টে সমভাবে সংঘটিত হয় না। প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইতে প্রেয়-পথে পদার্পণ করিয়া পৈশাচ পানীয় লাভ করা প্রকৃত পক্ষে সুলভ। নিবৃত্তিরূপ নিশিত-নিস্ত্রিংশে আশা-পিপাসার পূতিগন্ধি-প্রবাহ স্বরূপ মোহপাশ ছেদ করিয়া নিরাশ-সুবাসে মানস-কানন আমোদিত করিবার অধিকারী কত কম, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

আবার একটী আপত্তির আক্রমণ আমাদের আংশিক বিপত্তির কারণ হইয়া উপস্থিত। শ্রদ্ধাস্পদ-বর্দ্ধমানমিশ্রকৃত কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে প্রকাশ, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি-মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন, সৃষ্টির প্রথমে আদিবিদ্বান্ মহামুনি ধর্ম্মজ্ঞানৈশ্বর্য্যসম্পন্ন কপিল প্রাদুর্ভূত হন। * ইহাতে সাংখ্যশাস্ত্রের তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত-সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। "সাংখ্যপ্রবচন" নামক যে গ্রন্থের অস্তিত্বের প্রমাণাদি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও যোগদর্শনের নামান্তর ব্যতীত অপর কিছুই নয়। কুসুমাঞ্জলিকার ন্যায়াচার্য্যবর্য্য উদয়ন বলিতেছেন "অনুশিষ্যতে চ সাংখ্য-প্রবচনে ঈশ্বর প্রণিধানং"। পাতঞ্জলসূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান বিধান করা হইয়াছে, সুতরাং প্রাক্ প্রদর্শিত সন্দিগ্ধ যুক্তির সারবত্তা বিশেষ বিশ্বাস্য হইতে পারে না। এই কর্কশ-তর্কের মর্কটায়মানতার প্রতিকূলে আচার্য্যগণের অভিমতানুগত প্রতিবাদ করিতে সহজেই সাধ হয়। "সাংখ্যপ্রবচন" সেশ্বর এবং নিরীশ্বর, উভয়বিধ সাংখ্যসূত্রের সাধারণ সংজ্ঞা বিশেষ বলিতে হইলে, কাপিল-সাংখ্যপ্রবচন এবং পাতঞ্জল সাংখ্যপ্রবচন ইহাই বলিতে হয়। উদয়ন, কপিল-পোষিত নিরীশ্বর সাংখ্যের মতনিরাশে অশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন এবং পাতঞ্জলের ঈশ্বর-প্রণিধানে অনুমোদ করিয়াছেন। "কপিল মত" অথবা "সাংখ্য মত" এই নামেই সে সকল স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। ঈশ্বরসত্তায় সাক্ষাৎসম্বন্ধে কাপিল সাংখ্যের সম্মতি নাই, ইহাই সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ, সুতরাং ঈশ্বর-প্রণিধান-স্বীকারে

---

* যথোক্তং তত্ত্বকৌমুদ্যাং বাচস্পতিমিশ্রৈঃ সর্গাদাবাদিবিদ্বান্ অনুভবম্ কপিলোমহামুনিঃ ধর্ম্মজ্ঞানৈ-শ্বর্য্যসম্পন্নঃ প্রাদুর্ব্বভূবেতি স্মরন্তি ॥

"পাতঞ্জল" না বলিয়া "সাংখ্য প্রবচন" বলাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বার্থসিদ্ধির সাধক ভাবিয়া উদয়নাচার্য্য মহাশয় তাহাই করিয়াছেন।

পরসম্প্রদায়ের গ্রন্থকারগণ অপর-সম্প্রদায়ের গ্রন্থের প্রমাণ অথবা নাম উদ্ধৃত করিয়া স্বমতে তাহার খণ্ডন করিতেছেন, এরূপ কোনও দৃষ্টান্ত লাভ করা যায় না। মধ্যবর্ত্তি-সময়ে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে যদিও পরবাক্যের উদ্ধরণ ও নিবসন এবং সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিমাণে বিদ্বেষসূচক ব্যাজনিন্দার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন কালের আচার্য্যবর্গ তাদৃশ অধৈর্য্যের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য-কার্য্যের বহির্ভূত স্বগৌরব-বিজ্ঞাপক বাক্যাবলীর উদ্গীরণ ও সম্প্রদায়বিশেষের উপর সরোষরসদৃষ্টির প্রক্ষেপ-সাধনে যত্নবান্ হইতেন না। যে সকল মধ্যবর্ত্তিকালের মহাপ্রভুরা পরবাদের প্রকৃষ্টালোচনে মনোনিবেশ করিতেন, তাঁহারা পরমত বিকৃত ও স্বাভিলষিতরূপে স্থাপন করিয়া পরে স্বকপোলবিলসিতপরমতাভাসের সামর্থ্যানুসারে খণ্ডন করিতেন। বাচস্পতি-মিশ্রকে আমরা আপাততঃ দৃষ্টান্তস্থলরূপে উপস্থিত করিতেছি। তিনি তত্ত্বকৌমুদীতে বৌদ্ধগণের অভিপ্রেত "ধ্বংসের কারণতা" নিরাস করিয়াছেন, তাহাতে স্বেচ্ছানুসারেই লেখনী সঞ্চালন করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ বলেন, সূত্র সকলের বিনাশই বসনোৎপাদনের কারণ। যদিও সূত্র একেবারে বিনষ্ট হইল না, তথাপি 'সূত্র' শব্দে তাহার নামকরণ বন্ধ হইল; অর্থাৎ "বসন" এই নাম তাহাতে মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইল, "সূত্র" সংজ্ঞা "গৌণ" অর্থাৎ বিশেষণীভূত হইয়া "সূত্র-নির্ম্মিত" এইরূপ ব্যবহারিক বোধ জন্মাইতে লাগিল। তন্নামে ব্যবহৃত হইবার চরমক্ষণ-সম্বন্ধই তাঁহাদের মতে ধ্বংস। সূত্র-সমষ্টির দগ্ধাবশেষকে "ধ্বংস" বলা অভিপ্রেত হইলে, তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদর্শন করিতেন না। রাশি রাশি সূত্র একত্র সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকারে ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক বহ্নিদেবের উদর-পূরণের বন্দোবস্ত করিলে যে ধ্বংস হয়, তাহাকে বস্ত্রের উৎপত্তি-কারণ বলিতে, বৌদ্ধ কেন, নির্ব্বোধ ব্যক্তিরও বিষম লজ্জার আবির্ভাব হয়। বাচস্পতি, ধ্বংস কারণতায় দোষ দিলেন। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্য প্রকারের প্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। তত্ত্ব-কৌমুদীকার বলেন, ধ্বংস যদি কারণ হয়, তবে ঘট-ধ্বংস বসনোৎপত্তির কারণ হইবে, কেননা ঘট-ধ্বংস ও তন্তু-ধ্বংস একই ধ্বংস, উভয় ধ্বংসে "ধ্বংসত্ব" সমান। এই মহান্ অনর্থ বৌদ্ধ-মতে আপতিত হয়। আমরা এখানে মূকতা অবলম্বন করিব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু "মুখরিত" করিয়া তুলিতে কোনও অনির্ব্বচনীয়শক্তি আমাদিগের উপর কার্য্য-কারিণী হইয়াছে। সেই মোহিনী শক্তির সম্মোহন-কুহকে আমরা পরিচালিত, সুতরাং উচিতবক্তার উপর শিষ্টবর্গের অসন্তুষ্টি হইবে না বোধ হয়। যদি ধ্বংস মাত্রের "ধ্বংসত্ব" থাকিলেই সাম্য উপস্থিত হইল, প্রতিযোগি-পদার্থ-প্রকর তবে কাহার "ব্যাগারে" গেল? ধ্বংসকে অতীতাবস্থা এবং প্রাগ্ভাবকে অনাগতাবস্থা বলিয়া যিনি সাংখ্যগ্রন্থে বিষম বিতর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, সেই প্রতন্বুদ্ধি বাচস্পতিমিশ্র মহাশয় বোধ হয় বুঝিতেন,

তিনি যে কৌশলে স্বাভিমত ধ্বংসাদির প্রতিযোগিভেদে ভিন্নতা বলিয়া থাকেন, সুবুদ্ধি বৌদ্ধের সে সুলভ উপায় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল না। অসম্বদ্ধ-কারণ কার্য্যজননে কি-জন্য পর্য্যাপ্ত নয়, হইলেও সর্ব্বকারণ হইতে সর্ব্বদা সকল কার্য্যের আবির্ভাবরূপ অব্যবস্থা উপস্থিত হয়, এই অসুবিধার পরিহার মানসে তিনি অনাগতাবস্থারূপ প্রাগ্‌ভাবের সহিত বস্তুর যেরূপ রীতিতে সম্বন্ধ-স্থাপন স্বীকার করিয়াছেন, সেই উপায়ে বৌদ্ধের পক্ষে ক্ষতি হইত না। এখানে এরূপ দোষে বৌদ্ধমতের কোনও কণিকা খসিল কিনা, বলিতে পারি না, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত না হইলে, বৌদ্ধ-সমরে জয়লাভ হয় বলিয়া বুঝিতে কষ্ট হয়। বৌদ্ধ মহাশয়ের ন্যায়াচার্য্যগণের মত "অমর ধ্বংস" লইয়া কারবার ছিল না; তিনি এক কথায়ই "অব্যবস্থার" মাথায় সুদৃঢ় বজ্রের ব্যবস্থা করিতেন।

যাঁহারা "অমর" হইব আশায় পরের মতের উপর 'পরমালজরীপ্' করিয়া এক একজন অপ্রতিহতপ্রতিভ দার্শনিককে কাঁচাছেলে সাজাইয়া বসিয়াছেন, তাঁহারাই "ভামতীর" প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে চিরাভিলষিত শত্রু সাংখ্যাচার্য্যের পুস্তকে প্রামাণ্যাঙ্গীকার করিবেন, ইহা সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে।

পরমতাবলম্বীরা স্বগ্রন্থে যখন মতখণ্ডন করেন, তখন "ইহা সর্ব্বজ্ঞমহর্ষি-প্রণীত অমুক্ গ্রন্থে আছে, তাহা ভ্রমাত্মক" একথা লিখিতে সাহস পাননা। কপিলকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলাম, তাঁহার মতে ভুল ধরিলাম, এটা বাতুলবৎ ব্যবহার, কাজেই পরগ্রন্থে প্রামাণিকগ্রন্থের পরিচয় থাকা প্রাচীনপ্রথা-বহির্ভূত।

যখন প্রাচীনবর্গের পুস্তকে নব্য-মহোদয়েরা টীকাপ্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে প্রতিপত্তিপ্রত্যাশায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, গ্রন্থে যে মত সমর্থিত হইয়াছে, তদ্বিপরীত সমস্ত মতই কিছু নয় বলিতে হইবে। জানি বা না জানি, পারি বা না পারি, খণ্ডন করিলাম, লিখিতে হইবেই। অগত্যা মতকে বিকৃত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে দুইএক লাইন্ বদরঙ্ ফলান গোছের অসম্বদ্ধ অথচ সহজগম্য নয়, এরূপ লিখিয়া, "মতং নিরস্তং" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে হইবে এবং অকাণ্ড তাণ্ডবে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপাইতে হইবে! এই ধরণের পক্ষপাতী টীকাকারনিকর দার্শনিক-সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়ায়, আর্য্যদর্শনশাস্ত্রের দারুণ দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়, সন্দেহ নাই।

সম্প্রদায়পাড়া হইতে গ্রন্থগৌরব অস্তমিত হওয়া অসঙ্গত নয়, তাহার উদাহরণ বোধহয় বিরল নহে। শাঙ্কর সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানগুরু, তাঁহারা অনেকে সাংখ্যশাস্ত্রের অনেকগ্রন্থ পড়াইতেন না। বাচস্পতি মহাশয় ভামতীতে খণ্ডন করিলেন, বিদ্যার্থী তাহা অভ্যাস করিলেন; বুঝিলেন, সাংখ্যমত অসার। যখন তিনি আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন শিষ্যকে বলিলেন, এ মত শ্রুতির অনুমোদিত নহে। তাহার অশ্রদ্ধা আপনিই আসিল। অপ্রচলন আরম্ভ হইল। ক্রমশঃ অদর্শনের অধিকার!! যিনি অমুদিবস হইল, অলন্দ্ধ্রুবতারার ন্যায় জগৎগগন হইতে অদর্শন লাভ করিয়া

অনন্তশান্তিসাগরের যাত্রী হইয়াছেন; যাঁহার অভাবে জীর্ণবিবর্ণপর্ণকুটীরবাসী হিন্দু-সন্তান ও অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া অন্তরের প্রবল আবেগ প্রকাশ করিয়াছেন; সেই মহাত্মা ৺বিশুদ্ধানন্দস্বামী মহোদয় সাংখ্যপ্রবচন প্রভৃতি সাংখ্যগ্রন্থ পড়াইতেন না, বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়। আমরা তাহার পরকপোলকল্পিত বাক্য ব্যতীত আর কিছুই প্রমাণ অবগত নহি। তত্ত্বকৌমুদী তিনি পড়াইতেন একথা তাঁহার উপযুক্ত ছাত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। যদি এ সংবাদ সত্য হয়, তবে সাংখ্যদর্শন-সম্প্রদায়ের অধঃপতনের কারণ কি, তাহা অবধারণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

আরও একটী দৃষ্টান্তে অবগত হওয়া যায়, রক্ষকের ভক্ষকতাই মূলতত্ত্ব। মাননীয় বালরাম স্বামী মহাশয় যখন তত্ত্ববৈশারদীর টিপ্পনী রচনা করেন, তখন তিনি যোগবার্ত্তিক-রচয়িতা বিজ্ঞানভিক্ষুর মত যে লঘু, এরূপ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন। * উক্ত মহামতি সে আশার প্রসারক্ষেত্রে সুখস্বপ্নাবেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অথবা যথার্থ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, সে বিষয়-বিচারে আমাদের সামর্থ্য নাই, সুতরাং অধিকারও নাই। আমরা বুঝিতে পারি না, তত্ত্ববৈশারদীর ব্যাখ্যা করিতে গেলে বিজ্ঞানভিক্ষুর উপর আক্রোশ উপস্থিত হয় কেন? যাঁহার নিকট সামাজিক-লোকে বিজ্ঞানাচার্য্যের অভিপ্রায় অবগত হইবার আশা করে, তিনিই সর্ব্বাগ্রে "সঙ্কীর্ত্তনে শিবনিন্দা"র পথপ্রদর্শক হইলেন। বাচস্পতিমহাশয়ের তত্ত্ববৈশারদীতে তিনি অনেক উৎকর্ষ দর্শন করিয়াছেন, সত্য বটে, তবে "ভামতীর" বিমল বিভায় তাহা কতক্ষণ লোকলোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে, বলা যায় না। দার্শনিক-ক্ষেত্রে শতশত মত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে উপেক্ষিত হইতে পারে, আবার বাধকপ্রমাণ পরাজিত হইলে, সাধকের বলে বলীয়ান্ হইতে পারে। স্বাধীন প্রতিভার বিশৃঙ্খল-বিচরণ এখানে দেখা যায়, মুখস্থ বা কণ্ঠস্থের করতবে চিত্ত-চমৎকার জন্মান এ প্রসঙ্গে অসম্ভব। তবুও যে পোড়া মন না বুঝিয়া নির্বন্ধের নিম্ন হয়, ইহাই জগতের বৈচিত্র্য! এরূপ উচ্ছৃঙ্খলভাবেও অনেকে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সাম্প্রদায়িকতার প্রকোপে সমাজ-শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শতধারে রুধিরস্রোতঃ বহিয়াছিল। আর এ শাসমারণের অবস্থায় কত যাতনা সহ্য হয়! কোনও ঋষির দার্শনিকমত ভ্রমাত্মক নয়। কারণ, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ-ধিষণার অবতার বিশেষ। সংযত হইয়া সমালোচনা করিলে "সমন্বয়" দেখা যাইবে। সহসাই সম্প্রদায়-বিশেষের শ্রেষ্ঠতা বলিয়া বসিয়া অমূল্যগ্রন্থ বিলোপ করা হইয়াছে। আর এ অভিনয়ের অবসর নাই। হায়! সাম্প্রদায়িকতা! তোমার কাছেই না স্বচরণে কুঠারঘাত করিতে শিখিয়াছি? আমরা সমন্বয়ের জন্য প্রয়াস পাইব।

* যোগবার্ত্তিককারক লঘয়িষ্যে সদ্যুক্তিতঃ। বালরামস্বামী।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিয়া এ যাত্রার মত নিরস্ত হইব। গ্রন্থ সকল যবন-বিপ্লবে অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহবা পরে পরভাগ্যে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। কাহারও বা চিরজীবনের জন্যই অদর্শন কার্য্যোপরিণত হইয়াছে। কোনও একখানি পুস্তক বহুদিবসাবধি এদেশে পাওয়া গেলনা, তৎপরে অনুসন্ধানে ইংলণ্ড অথবা জর্ম্মণীতে পাওয়া যায়, এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য? উহাকে কৃত্রিম অথবা অনুপযুক্ত বলিবার কোনও উপযুক্ত কারণ নাই। অথর্ব্ববেদের শ্রুতি-বাক্য দেশীয়-গ্রন্থে প্রায়ই উদ্ধৃত হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্যবশে দেশীয় মান্য গণ্য অনেক পণ্ডিতের পণ্ডশ্রম ও "অথর্ব্ববেদ মুসলমানদের" এইরূপ অযথার্থ বালবৎ "দিল্ খুশা আব্দারের" আবিষ্কার করিত। যখন লুপ্তরত্নের উদ্ধার আরম্ভ হইল, তখন নিজের ভয়ানক ভ্রমের বিষয় বুঝিতে পারিয়া অনেকে অম্লান বদনে উহার প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য স্বীকার করিলেন। কেহবা আন্তরিক সঙ্কীর্ণতার প্রকৃষ্ট-পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। বলিলেন, উহা "সাহেব-প্রণীত অথর্ব্ববেদ।" এখনও অনেক পল্লী-সেবক-পণ্ডিত, অন্ধবিশ্বাস-বশবর্ত্তী অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদিগের কর্ণবিবরে ঐ রূপে মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। আধুনিকতার অবধারণ করিতে হইলে, ভাষা, বিষয়, বেদের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় ইত্যাদি কতকগুলি নির্ব্বাচন করিতে হয়। তদভাবে "খাম খেয়ালী" আধুনিকতা বলা সকল গ্রন্থের উপরই প্রায় সমান; কেন না, অল্প বিস্তর যে কোনও রকমের একটু ঝড় সকলের গায়েই লাগিয়াছিল। যাঁহারা কথায় কথায় রক্তিমলোচন দেখাইতে পারেন, সেই রক্তিমগণ্ড মহোদয়-মণ্ডলীর নিকট জিজ্ঞাসা করি, "সূক্ত- সংহিতা" যে ইউরোপে মুদ্রিত হইয়াছিল; অদ্যাপি ভারতে হয় নাই; এ সংবাদ কেহ রাখেন কি?

সাংখ্যপ্রবচনের বিষয় এবং সময় ও বিচারাদি প্রাচীন পদ্ধতিরই অনুমাপক, এ কথা পরে প্রমাণীকৃত হইবে। অপ্রচারেই আধুনিকত্ব-সন্দেহ উপযুক্ত নয়, কেননা স্বমতগ্রন্থ হইতে উহার প্রাচীনতা দেখান হইয়াছে। পুরাণ-প্রচারের সময়ে সাংখ্যমতের এত আলোচনা কেন হইয়াছিল, তাহার উপযুক্ত কারণ আছে। সেই উৎকর্ষটুকু সাংখ্য-প্রবচনেই বিদ্যমান। কারিকা প্রভৃতিতে উহা প্রচুর আন্দোলনেও পরিলক্ষিত হয় না। পরে এ সকল বিষয় বিবৃত হইবে।

সাংখ্যভাষ্যকার-বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে দর্শন-সমন্বয় সাংখ্যশাস্ত্রের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধে মুখ্যতঃ প্রতিপাদ্য। সাংখ্যপ্রবচনের প্রাসঙ্গিক পরিচয় প্রদত্ত হইল। কপিলাচার্য্য কে? সাংখ্য-প্রণয়ন কোন্ সময় করেন? এই বিষয় আগামি-সংখ্যায় প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। পরে প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

যশোহর, ব্রহ্মচারি-আশ্রম। } শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।

গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন।

জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি।

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অবতার।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মহর্ষিগণ-বিরচিত যে সমস্ত জাতীয় গাথা প্রচলিত ছিল, ঐ সকল প্রাচীন গাথা সঙ্কলিত, সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এক এক খণ্ড পুরাণ হইয়াছে। এই জন্যই পুরাণ মধ্যে স্থানে স্থানে মতভেদ এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের পার্থক্য দৃষ্ট হয়; এবং বেদ ও বেদাঙ্গোক্ত কতকগুলি বৃত্তান্তে রূপক প্রয়োগ করিয়া, পৌরাণিক মহর্ষিগণ পুরাণোক্ত উপাখ্যানগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই পুরাণ বেদ-মূলক বলিয়া গণ্য ও মান্য।

পুরাণ মতে দ্বাপর যুগের অবসানে বা কলিযুগের প্রারম্ভে, বসুদেব-গৃহে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। এই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আদ্যন্ত লীলা ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারই অগোচর নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলা বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ হইতে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধানে হিন্দুমাত্রেরই কৌতূহল জন্মে।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত (১) পাঠে আমরা দেখিতে পাই, আদিত্যদেব বেদে হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ বলিয়া পূজিত; এবং আদিভূত বলিয়া আদিত্য নামে, জগতের প্রসূতি বলিয়া সবিতৃ বা সূর্য্য নামে খ্যাত। যথা—

> হিরণ্য গর্ভঃ ভগবান্ এষঃ ছন্দসি পঠ্যতে।
> আদিত্যঃ আদিভূতত্বাৎ প্রসূত্যা সূর্য্যঃ উচ্যতে॥

জড় সূর্য্যই যে পূজ্য ছিলেন তাহা নয়। জড় সূর্য্যের মধ্যে যে অন্তর্যামি-পুরুষ তাহাই হিন্দুদের উপাস্য। শালগ্রামাদি শিলায় যেরূপ বিষ্ণুর উপাসনা, তদ্রূপ সূর্য্য-মণ্ডলে হিরণ্ময়-অন্তর্য্যামি-পুরুষের উপাসনা। গায়ত্রী চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, সূর্য্যান্তর্গত এই পুরুষের উপাসনাই উহার লক্ষ্য। বিশ্বব্যাপী অন্তর্যামি-পুরুষের চিন্তা সূর্য্য-মণ্ডলে ব্যবস্থিত হইবার কারণ এই যে, সকল দিক বিবেচনা করিলে, এরূপ প্রতিনিধি দুর্ল্লভ।

এই সূর্য্যদেবই ত্রিবেদময় ভগবান্, কালাত্মা, কালকৃৎ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোগামী ও সূক্ষ্ম এবং এই সূর্য্যদেবেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। যথা—

> ত্রয়ীময়ঃ অয়ং ভগবান্ কালাত্মা কালকৃৎ বিভুঃ।
> সর্ব্বাত্মা সর্ব্বগঃ সূক্ষ্মঃ সর্ব্বং অস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং॥
>
> সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২।১৪

(১) অল্পাবশিষ্টেতু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
রহস্যম বিবস্বন্তং তপ তেপে সুদুশ্চরং। সূর্য্যসিদ্ধান্ত।১।১-৩।

এবং এই সূর্য্যদেব বেদোক্ত অষ্টবসুর শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাসুদেব নামে খ্যাত। যথা—

বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম তৎমূর্ত্তিঃ পুরুষপরঃ।
অব্যক্তঃ নির্গুণঃ শান্তঃ পঞ্চবিংশাৎপরঃ অব্যয়ঃ॥ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত।১২।১২

এবং বেদে এই সূর্য্যদেব পাপরূপ-বিষধ্বংসকারী ও পাপরূপ-বিষহরণকারী বলিয়া বর্ণিত। যথা—

উৎ অপপ্তৎ অসৌ সূর্য্যঃ পুরু বিশ্বানি জূর্বন্ ।১।১৯১।৯ ঋক্
অস্য যোজনং হরিষ্টা (১।১৯১।১০ ঋক্

এবং এই সূর্য্যদেব পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে এবং স্বর্গে ত্রিপাদ বিক্ষেপকারী বলিয়া পূজিত। যথা— ত্রীণি পদা বিচক্রমে বিষ্ণুঃ। ১.২২।১৮ ঋক্। (২)

বেদে ইহাও বর্ণিত আছে, সূর্য্য সপ্তরশ্মি, সূর্য্যের সপ্তাশ্ব (৩) এবং এই অশ্বের নাম তার্ক্ষ এবং রশ্মির নাম সুপর্ণ। যথা—

সপ্তত্বা হরিতঃ রথে বহন্তি দেব সূর্য্য। ১।৫।৮ ঋক্।
বি সুপর্ণঃ অন্তরিক্ষাণি অখ্যৎ গভীর বেপাঃ অসুরঃ সুনীথ॥ ১।৩৫।৭ ঋক্

বেদে সূর্য্য পক্ষশালী এবং গরুত্মান বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—

সঃ সুপর্ণঃ গরুত্মান্।১।১৬৪।৪৬ ঋক্।

উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টি কামনায় সূর্য্যকে পুরুষ এবং চন্দ্রকে স্ত্রী রূপে সৃজন করিয়াছিলেন। যথা—

স মিথুন মুৎপাদয়তে। রয়িং চ প্রাণং চেত্যেতৌ
মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যত ইতি। ১।৪, প্রশ্ন উপনিষদ্
আদিত্যঃ হ বৈ প্রাণঃ। রয়িঃ এব চন্দ্রমা।
১।৫, প্রশ্ন উপনিষদ্।

জ্যোতিষমতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে অদিতি দৈবত বসুনক্ষত্র কর্কট-ক্রান্তিতে অবস্থিত ছিল; এবং ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে কার্ত্তিকাদি বৎসর গণনা হইত; তৎকালে

---

(২) বিষ্ণুঃ আদিত্যঃ ত্রেধা নিদধে পদং। ইতি দুর্গাচার্য্য। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষেদিবি। ইতি শাকপূর্ণঃ সমারোহেণ উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং। নিধত্তে বিষ্ণুপদে মধ্যান্দিনে অন্তরিক্ষে গয়শিরসি অস্তং গিরৌ। ইতি ঔর্ণনাভঃ।

(৩) নিরুক্তশাস্ত্র অশ্বনামানি ১৪ তার্ক্ষ ২১ সুপর্ণ।
গরুত্মান্ গরুড়ঃ অর্কঃ সুপর্ণঃ পন্নগাশনঃ ইত্যমর।

কৃত্তিকা নক্ষত্র বাসন্তিক ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল, এবং রাধা নক্ষত্র শারদীয় ক্রান্তিপাত স্থানে অবস্থিত ছিল। রাধা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য উপনীত হইলে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতিথি সমাগত হয়।

শারদীয় ক্রান্তিপাত অর্থাৎ জলবিষুপসংক্রান্তি-বিন্দুতে দক্ষিণায়নের মধ্য সময়ে সূর্য্য উপনীত হয়। তৎকালে আকাশ মেঘহীন হইয়া নির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন রূপ ধারণ করে, এবং রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোক বিশদরূপে প্রস্ফুটিত হয়। সুতরাং তৎকালে বা তৎ সমকালে চন্দ্রমা পূর্ণ হইলে, চন্দ্রের আলোক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। বিশেষতঃ, এই সময়ে সূর্য্যের অস্তের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের উদয় হয়, এজন্য এসময়ে নিশার তমসা বিলুপ্ত হয়, এবং পার্থিব জনগণ তমসা বিলোপে হর্ষে নিমগ্ন হয়। পার্থিব-জনগণের হর্ষ উৎপাদিকা বলিয়া, এই কালের জ্যোৎস্নাকে কৌমুদী নাম দেওয়া হইয়াছে। ৩৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই শারদীয় জলবিষুপসংক্রান্তি দিবসে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইত। এই জন্য তৎকালে কার্ত্তিকী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম পাইয়াছিল। ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে শারদীয় জলবিষুপ সংক্রান্তি দিবসে আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি উপস্থিত হইতে লাগিল। তদবধি আশ্বিনী জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম অপহরণ করিয়া লইয়াছে। ক্রমে ৭৫০ বৎসর পরে ভাদ্র-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না কৌমুদী নাম ৩.ক) গ্রহণ করিবে, এবং তখন দ্বিতীয় অমর সিংহ নব অভিধান প্রচার করিবেন।

প্রাচীনকালে এই পূর্ণিমার আলোকে সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ মহাহর্ষে দিবারাত্রি শরৎ-শস্য কর্ত্তন ও আহরণ করিত। সর্ব্বদেশের কৃষকগণের অদ্যাবধি এই বিশ্বাস আছে যে, দয়াময় ঈশ্বর কৃষক জাতির শরৎ-শস্য আহরণের পৃষ্ঠ-পোষকভাবে এই শারদীয় পূর্ণিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। এইজন্য সর্ব্বদেশীয় কৃষকগণ এই শারদীয় পূর্ণিমাকে শস্য-আহরণী পৌর্ণমাসী (Harvest-Moon) নাম দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই পূর্ণিমা কোজাগরি-লক্ষ্মীপূর্ণিমা বলিয়া খ্যাত। ইহাই সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ফার্গুসন্ (৪) সাহেবের মত।

আমরা অধিকন্তু বিবেচনা করি যে, মানবজাতির কৃষিজীবী অবস্থার পূর্ব্বে, পশুজীবী অবস্থাতেই, রাখালগণ নিশাকালে সশঙ্কে হিংস্র শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণ হইতে পশুপাল সতর্কে রক্ষা করিত। এই শারদীয় পূর্ণিমার আগমনে কৌমুদীর জ্যোৎস্নার রৌপ্যময় ঔজ্জ্বল্য প্রভাবে তমসাপ্রিয় হিংস্র শ্বাপদ জন্তুগণ গোষ্ঠ হইতে তাড়িত হইত। এই পৌর্ণমাসী তিথিতে রাখালগণ গোষ্ঠ রক্ষার ভার মুক্ত হইয়া,

৩(ক) কৌমুদী কার্ত্তিকোৎসবঃ ইতি ত্রিকাণ্ড শেষঃ
আশ্বিনী পূর্ণিমা ইতি শব্দরত্নাবলী।

(৪) Fergussan's Astroonmy

নিঃশঙ্কে শুদ্ধচিত্তে শারদীয় পূর্ণিমা-রজনী পরমহর্ষে নৃত্য গীতে অতিবাহিত করিত; এবং এই শারদীয় পূর্ণিমার রজনীতে রাখালগণের নৃত্য-গীতময় উৎসব হইতে শারদীয় পূর্ণিমার রাসপূর্ণিমা নামের সূত্রপাত হইয়াছিল। ক্রমে পশুজীবী অবস্থা হইতে কৃষিজীবী অবস্থায় মানব জাতি সমাগত হইল। কৃষক-সমাজে রাসপূর্ণিমার ন্যায় শস্য-আহরণী পূর্ণিমা হইল। কিন্তু রাখাল-সমাজে শারদীয় পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত রহিল; এবং কৃষকগণ অবসর কালে রাখালগণের এই রাসলীলায় যোগ দিয়া, শস্য আহরণের শ্রান্তি দূর করিত।

ইহা বলা বাহুল্য যে, রাশিচক্রের মধ্যে সূর্য্যের অয়নপথ, গ্রহগণের কক্ষা এবং ১২রাশি ও ২৭নক্ষত্র অবস্থিত।

রাশিচক্র ও উপরিলিখিত জ্যোতিষিক জাতীয় উৎসব অবলম্বনে বেদ-বেদাঙ্গ-জ্যোতিষোক্ত বচনমূলে অয়নপথে বাসুদেব সূর্য্যের গতির রূপক বর্ণনাই, পুরাণে "শ্রীকৃষ্ণলীলা" বলিয়া খ্যাত।

পৌরাণিক মহর্ষিগণের কল্পনাবলে সূর্য্যের বাসুদেব নামের অভিনব ব্যুৎপত্তি-ক্রমে সূর্য্য বসুদেবের তনয় হইলেন। যখন সূর্য্যের বা বিষ্ণুর বাসুদেব নাম প্রথম হয়, তখন তিনি অষ্ট বসু অর্থাৎ ধরা, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রভাব ও প্রত্যূষ এই অষ্ট বসুর মধ্যে প্রধান বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অষ্ট বসুর মধ্যে বিষ্ণুই সূর্য্য। "নতু বসুদেবস্যাপত্যমিতি বিগ্রহঃ।"

ক্রমে বাসুদেব শব্দের অর্থ "বসুদেবের পুত্র" করা হইল। আকাশমণ্ডল কর্কট ক্রান্তি স্থিত বসু নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া সূর্য্য যাইতে পারেন না, এবং ঐ স্থান পর্য্যন্ত উঠিয়াই তাহার দক্ষিণায়ন পথে পুনর্ব্বার গমন করিতে হয় বলিয়া, তিনি বসুদেব নক্ষত্রের অধীন কল্পিত হইলেন; এবং বসুদেবের অধীন হইয়া, তিনি বাসুদেব বলিয়া আখ্যাত হইলেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, এই বসুদেব নক্ষত্র ভিন্ন কিছুই নহেন। সূর্য্যের বিষ্ণুনামের ব্যাপকত্ব ও ধাত্বর্থ অনুকূলে সূর্য্যের কৃষ্ণ নাম হইল। কৃষ্ণ শব্দের এক অর্থ এই যে, যিনি সর্ব্বজীবের আত্মা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। অদিতি দেবমাতা বলিয়া, দেবকীনাম গ্রহণ করিলেন। বসু নক্ষত্র অদিতি দৈবত। বিষুব রেখার উত্তরে যে অয়নার্দ্ধ তাহাতেই দেবতাদিগের বাস, এবং সেইজন্য ঐ অয়নার্দ্ধই দেবমাতা বা দেবকীকে বসু-নক্ষত্রের স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া এই দেবমাতাকে বসুদেব ও দেবকীর পুত্র করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ বা পরমানন্দ তনয় (৫) বাসুদেব সূর্য্য, অংশাবতারে নন্দসুত হইলেন। নন্দ ও আনন্দ একই কথা। জ্যোতিষোক্ত বাসুদেব কর্কটক্রান্তিতে অদিতি রূপিণী দেবকী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেও; দ্বাপর

(৫) চন্দ্রমা মনসা জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত। ঋগ্বেদ

[যু]গের কার্ত্তিকাদি বর্ষের অনুরোধে জন্ম মাত্রেই আদিত্যদেব শ্রীকৃষ্ণ, কৃত্তিকা [ন]ক্ষত্ররূপিণী যশোদা-ক্রোড়ে স্থাপিত হইলেন। অয়নপথ (৬) অভিধান বলে ব্রজনাম [ধ]ারণ করিলেন। ব্রজ শব্দেও পথ, অয়ন শব্দেও পথ।

অভিধান বলে গো-পাল (সূর্য্যকিরণমালা) গো-পালক শ্রীকৃষ্ণের ধেনু-পাল হইল। [র]ূপকবলে বেদোক্ত দ্বাদশ আদিত্য, ধাতা, ইন্দ্র, সবিতা, বিবস্বান্, ভগ, পর্জ্জন্য, ভাস্কর, [মি]ত্র, বিষ্ণু, বরুণ, পূষা, ঈশ, নামক বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ সূর্য্য শ্রীদামন্-সুদামন্-[স]ুবলাদি দ্বাদশ রাখাল সাজিলেন। কল্পনা-বলে বেদোক্ত সুপর্ণ (সূর্য্যরশ্মি) গরু-[ত্ম]ান্ (সূর্য্যবিম্ব) তার্ক্ষ (সূর্য্যাশ্ব) পক্ষী রূপ ধারণ করিয়া, গরুড় নামে আদিত্য[দ]েব শ্রীকৃষ্ণের বাহন হইলেন। বাসুদেব আদিত্যের সপ্তরশ্মি শঙ্খ, চক্র, গদা, [প]দ্ম, অসি, ধনু, শ্রীবৎস রূপে কল্পিত হইল, ও সূর্য্য সারথি অরুণদেব পুরাণে দারুক নাম পাইলেন। অসংখ্য দ্বারময় গোলকধাম শতদ্বার দ্বারকা নামে অবনীমণ্ডলে অভিহিত হইল। বৈদিক চৈত্রাদি বর্ষ গণনা মূলক মধুমাস মথুরাপুরী নাম পাইলেন, এবং জ্যোতিষোক্ত তিন সহস্র কোটি তারাময় আকাশ বৃন্দাবন আখ্যাত হইল। বৃন্দাবন শব্দের অর্থ অসংখ্য। ছায়াপথ (Milkyway) দেখিতে নদীর ন্যায়, উহা যমুনা নামে বর্ণিত হইল, এবং ছায়াপথের পূর্ব্ব তীরস্থ মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ পঞ্চ রাশি এবং ছায়াপথের পশ্চিম তীরস্থ মিথুনাদি সপ্তরাশি, এই দ্বাদশ রাশি পুরাণে দ্বাদশ মহাবন বর্ণিত হইল। ইহারাই বৃন্দাবনের দ্বাদশ মহাবন। যাঁহারা পার্থিব বৃন্দাবন দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কর্কটরাশিস্থ পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পশ্চিম-দক্ষিণ গগনে কৃত্তিকা নক্ষত্রে যাইতে হইলে, ছায়াপথ পার হইতে হয়, এইজন্যই মথুরা হইতে গোকুলে বা কৃত্তিকারূপিনী যশোদা গৃহে গমন করিতে বসুদেবের যমুনা পার হইতে হইয়াছিল। বৃষরাশিস্থ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসুদেব সূর্য্য সমাগত হইলে জ্যৈষ্ঠমাস হয়। যশোদা গৃহে বা কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য গমন করিলে গ্রীষ্মকাল হইল। গ্রীষ্মকালে দধি দুগ্ধ মন্থনে নবনীত অতি কম উৎপন্ন হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং কল্পনা বলে বাসুদেবকে ননীচোরা বলা হইয়াছে।

উদয়োন্মুখ বালার্কের নব-প্রসূত-কিরণ ব্রহ্ম মণ্ডলের ব্রহ্মহৃৎ আদি উজ্জল তারাগণের কিরণ অদৃশ্য করিতে পারেনা। সূর্য্য উদিত হইলেও ঐ সমুদয় নক্ষত্র দৃষ্ট হয়। অন্যান্য নক্ষত্র সূর্য্য উদিত হইলেই অদৃশ্য হয়। প্রকারান্তরে ঐব্রহ্ম-হৃৎ নক্ষত্র সূর্য্যের তেজ বা রশ্মি অপহরণ করিলেন বলা যাইতে পারে। এই জন্যই ব্রহ্মহৃৎ বা ব্রহ্মা গোবৎস (বালকিরণ) অপহরণ করিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অয়ন পথের দক্ষিণস্থ Hydra জলসর্পের মস্তক জ্যোতিষ শাস্ত্রে অশ্লেষা নাম পাইয়াছে। অয়ন পথে

(৬) ব্রজো গোষ্ঠ অধ্ব বৃন্দেষু। ইতি বিশ্বঃ।

গমন কালে আদিত্যদেব অশ্লেষা নক্ষত্রে উপনীত হইলে, বাসুদেব কালীয় সর্পের মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হইলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও কালীয় দমন বর্ণনা রূপকমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এইরূপ রূপক বলে যম দৈবত পাপনক্ষত্র মঘা পুরাণে পাপিনী পুতনা রূপ ধারণ করিয়াছে। ফাল্গুনী বা অর্জ্জুনীদ্বয় নক্ষত্র বৃক্ষ রূপ ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিষের চিত্রা পুরাণে চিত্ররেখা। জ্যোতিষের তুলা রাশিস্থ পবনদৈবত স্বাতি তারা পুরাণে ললিতা নাম পাইয়াছে, এবং পুরাণে অয়ন রেখাস্থ পদ্মাকৃতি সূর্য্যের প্রিয়তমা (৭) রাধা বা বিশাখা তারা বেদের রয়ি বা চন্দ্রমার স্থান অধিকার করিল। সূর্য্য রাশি চক্রে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া গমন করাতেই এক একটি লীলার সৃষ্টি হইল।

পুরাণে শক্রাগ্নি দৈবত বিদ্যুৎময়ী রাধানক্ষত্রের রাধানামের নূতন অভিনব ব্যাখ্যা হইল যথা—

রাসে সংভূয় রামাসা দধাব পুরতঃমম।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরা বিদ্‌ভিঃ প্রপূজিতা॥ জন্ম খণ্ড ৬৮।

রাসে উৎপন্ন হইয়া আমার সম্মুখে ধাবিত হইয়াছিল, ঐ রাসে শব্দের রা, এবং দধাব শব্দের ধা, এই দুই অক্ষর লইয়া রাধা নাম হইল।

শক্রাগ্নি দৈবত রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি "র (শক্রাগ্নি) অধীয়তে যত্র সা রাধা" এইরূপ বহুতর শব্দের আদিম ব্যুৎপত্তি লোপ হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

---

(৭) বিমলে চ প্রকাশেতে বিশাখে নিপরক্রবে।
নক্ষত্রং পরং অস্মাকং ঈক্ষাকূনাং মহাত্মনাং॥ বাল্মীকি ৬।৪।৫০।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

সাংখ্যদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(ঈশ্বর কৃষ্ণকৃতকারিকা।)

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ। ১৯॥

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। চ। বিপর্য্যাসাৎ। সিদ্ধং। সাক্ষিত্বং। অস্য। পুরুষস্য। কৈবল্যং। মাধ্যস্থ্যং। দ্রষ্টৃত্বং। অকর্তৃভাব। চ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। চ—ও। বিপর্য্যাসাৎ—বিপর্য্যয়ভাব অর্থাৎ বৈপরীত্য হইতে। সিদ্ধং—সিদ্ধ হইতেছে। সাক্ষিত্বং—সাক্ষিতা অর্থাৎ অর্থিপ্রত্যর্থির বিবাদ বিষয়ের নিরপেক্ষ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। অস্য—এই (ইহার)। পুরুষস্য—আত্মার। কৈবল্যং—কেবল ভাব অর্থাৎ তাপত্রিতয়রহিততা। মাধ্যস্থ্যং—মধ্যস্থতা অর্থাৎ দুঃখে দ্বেষ ও সুখে আতৃপ্তভাব প্রকাশ না করিয়া ঔদাসীন্যাবলম্বন। দ্রষ্টৃত্বং—দ্রষ্টৃ-ভাব। অকর্তৃভাবঃ—কর্তৃত্বশূন্যতা। চ—এবং।

বঙ্গার্থঃ। সেইগুলির (পূর্ব্বোক্ত ত্রিগুণত্ব অবিবেকিত্বাদির) বৈপরীত্যহইতে আত্মার সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ্য, দ্রষ্টৃত্ব ও অকর্তৃভাব সিদ্ধ হইতেছে।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে পুরুষের অস্তিত্ব ও বহুত্ব বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে, সম্প্রতি পুরুষের স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্মগুলির পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে। প্রত্যেক পার্থিব ব্যাপারেই প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং ইহার ও আবশ্যক মূলকতা প্রমাণকরা আবশ্যক। জাগতিক যাবতীয় অশান্তি উৎ-

শীতের উপশমার্থে—পুরুষ, প্রকৃতির পার্থক্যজ্ঞানই প্রবল "রক্ষাকবচ" বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পার্থক্য আবার পারস্পরিক; একটীকে অপরটী হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারণ করিতে হইলে, উভয়েরই সম্যকজ্ঞান আবশ্যকীয়। রাম এবং শ্যাম পৃথক্ একথা প্রমাণ করিতে হইলে, রামের গুণাদি ও শ্যামের গুণাদি এবং একের অন্যত্র সম্ভাব সম্ভব নয় ইত্যাদির অনুসরণ করা সঙ্গত। রামের কণক-চম্পক-বিনিন্দিত-সুবর্ণ-শরীর, কমল-দল-কোমল-বিশাল-লোচন, অসাধরণ-ঔদার্য্য, সুজন-সুলভ গাম্ভীর্য্য বিপত্তি বাতাহত হইলেও অচলোপম ধৈর্য্য স্বীকার, এসকলই বিদ্যমান। শ্যামের তাদৃশ শরীর সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব, সে অধৈর্য্যের অধীন, অনৌদার্য্যের আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত; অগাম্ভীর্য্যের আকর, এইরূপে গুণগরিমায় পারস্পরিক সমালোচনে রাম-শ্যামের পার্থক্য প্রতীত হয়। তদ্রূপ প্রকৃতিতে ত্রিগুণত্ব, অচেতনত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সাধারণত্ব ও প্রসবধর্ম্মিত্ব গুণগ্রাম বিদ্যমান। পুরুষে তাহার বিপর্য্যাস অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, চেতনত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব ও অপ্রসবধর্ম্মিত্ব রহিয়াছে। এই ত্রিগুণত্বাদির বৈপরীত্য অর্থাৎ অত্রিগুণত্বাদি হেতুক আত্মার সাক্ষিত্ব দ্রষ্টৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে। পুরুষ চেতন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ; সুতরাং দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে, দ্রষ্টা চেতনই হইয়া থাকে; অচেতনের দর্শন সামর্থ্য সম্ভব নয়, ইহা হইতে চেতন পুরুষের দ্রষ্টৃতা অনুমিত হইল। চৈতন্য ও অবিষয়ত্ব হেতুক সাক্ষিত্ব সমর্থিত হইতেছে। যাঁহাকে বিষয় প্রদর্শন করা হয়, সেই নিরপেক্ষদর্শকই সাক্ষিসংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকেন, অচেতনকে অথবা বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্যজড়তত্বকে বিষয় দেখান যাইতে পারেনা; কাজেই অবিষয়ত্ব ও চেতনত্ব হইতে সাক্ষিত্ব অনুমিত হওয়া যুক্তিযুক্ত। অত্রৈগুণ্য বশতঃ আত্মার কৈবল্য প্রতিপাদিত হয়। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির গুণত্রয় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। পুরুষের ত্রৈগুণ্য নাই, অতএব সুখ-দুঃখ-মোহ-শূন্যতারূপ কৈবল্য স্বভাব সহজেই অনুমেয়। অত্রৈগুণ্য বলিয়া কোনও ধর্ম্ম পুরুষ নাই, "বেদ বাক্য" বিজয়রবে তাহার নির্গুণতা ঘোষণা করিতেছেন। যে সকল ধর্ম্ম বলা হইল, তাহার কোনওটী স্বরূপাভিন্ন ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বস্বভাবের অনতিরিক্ত, কোনওটী ত্রিগুণত্বাদি ধর্ম্মের অভাবাত্মক, ইঁহাদের মতে অভাব অধিকরণাত্মক; আত্মায় ত্রিগুণত্বের অভাব আছে, উহা ঐ অভাবের অধিকরণ আত্মস্বরূপ ভিন্ন নূতন কিছুই নহে। অত্রিগুণতা হেতুক মাধ্যস্থ্যও প্রমাণীকৃত হইতে পারে, সত্বগুণের কার্য্য প্রকাশাত্মক্ সুখ, রজঃ কার্য্য দুঃখ, তমঃকার্য্য মোহ। যেখানে ত্রিগুণকুজ্ঝটিকার ঘটায় নয়ন যুগল্ আচ্ছন্ন হয় না, সেই স্বপ্রকাশ আত্মার সুখ-দুঃখ-মোহে ঔদাসীন্য হইতে পারে। অহর্নিশ্ সুখ-সাগরে ভাসমান থাকিতে যাঁহার বাসনা, সুখে অথবা তৎসাধনে তাঁহার কতদূর মধ্যস্থতাবলম্বন সম্ভব, তাহা ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। আবার দারুণ দুঃখ-দবদহনে যিনি মনোমৃগকে দুর্দ্দশাপন্ন করিতে ইচ্ছাকরেন না; দুঃখ

সাধনের উপস্থিতি সত্ত্বে তিনি যে দুর্দ্দমদ্বেষের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেন, তাহাতে স্বল্প মাত্রই সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়। মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট মাধ্যস্থের আশা নাই; সুখ-দুঃখ-মোহ রহিত ব্যক্তিই মধ্যস্থ অথবা উদাসীন বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারেন। পুরুষের সুখ-দুঃখাদি ও স্বভাবতঃই নাই, বিবেকী এবং অপ্রসব ধর্ম্মী বলিয়া অকর্ত্তা। কর্ত্তা হইলেই এসংসারে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, কেননা, স্বাভিলাষ সম্পাদনে তাঁহাকে অবশ্যই প্রয়াস পাইতে হইবে, কার্য্যক্রমে অবিবেকী বলিয়া পরিচিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রসবধর্ম্মিত্ব অর্থাৎ প্রসবরূপ ধর্ম্ম যাহার নাই, তাহার অসাধারণ ধর্ম্ম অকর্ত্তৃত্বের পরিচায়ক। কর্ত্তৃত্বরূপ গুরুভার যাঁহার মস্তকে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তিনি প্রসব অর্থাৎ সৃষ্টি জনিত বিকারাদি নানা দোষে মলিন হইয়া পড়েন। এই কর্ত্তৃত্বের সহিত সাংখ্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত পুরুষের ঔপচারিক মিথ্যা সম্বন্ধ ব্যতীত, বাস্তবিক কোনও সম্পর্ক নাই; অতএব কর্ত্তৃত্বের কঠোরতার প্রকোপে পুরুষকে বড় ব্যথিত হইতে হয় নাই। তিনি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব, আপনার আভায় আপনি আলোকিত হইয়া বসিয়া আছেন, কর্ত্তৃত্বের কালিমা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং তিনি অকর্ত্তা ইহা প্রতিপাদিত হইল।

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্তৃত্বেচ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ। ২০

পদপাঠঃ। তস্মাৎ। তৎসংযোগাৎ। অচেতনং। চেতনাবৎ। ইব। লিঙ্গং। গুণকর্ত্তৃত্বে। চ। তথা। কর্ত্তা। ইব। ভবতি। উদাসীনঃ॥

ব্যাখ্যা। তস্মাৎ—তন্নিমিত্ত। তৎসংযোগাৎ—তাহার (পুরুষের) যোগনিবন্ধন। অচেতনং—চেতনশূন্যজড়। চেতনাবৎ—চেতনাযুক্তের অর্থাৎ চেতনের। ইব—ন্যায়। লিঙ্গং—বুদ্ধ্যাদি। গুণকর্ত্তৃত্বে—গুণগণের অর্থাৎ গুণাত্মক জড়তত্ত্বের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকা সত্বে। চ—এবং। তথা—সেইরূপ। কর্ত্তা—ক্রিয়ানুকূল কৃতি (যত্নের) যান্। ইব—মত। ভবতি—হইতেছে। উদাসীনঃ—ঔদাসীন্যসম্পন্ন আত্মা॥

বঙ্গার্থঃ। সেইজন্য পুরুষ-সংযোগ হইতে অচেতন জড়তত্ত্বও চেতনের ন্যায় প্রতীত হয়। গুণগণের কর্ত্তৃত্বহেতুক (অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ) উদাসীন আত্মাও কর্ত্তার মত প্রতীয়মান হইতেছে। (এইরূপ ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।)

বিশদব্যাখ্যা। এই কারিকায় লৌকিকানুভব সিদ্ধ কৃতি ও চৈতন্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একাধিকরণতা ভ্রমমূলক বলিয়া প্রমাণ করা হইবে। লৌকিকানুভব শত শত যত্ন ও চেষ্টার সহিত সম্পন্ন হইলেও, তাহার ভ্রমসঙ্কুলতায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না; কেননা, লৌকিক প্রমাণাপেক্ষায় অলৌকিক শ্রুতিবাক্যের বলবত্তা আছে; পরন্তু যুক্তিযুক্ততাও তাহার অপর কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত ব্যব-

হারিক নিয়মের অনুভবাত্মক ভিত্তি বড়ই সুদৃঢ়। চেতনব্যক্তির চৈতন্যবশতঃ ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে প্রযত্নোদয়; তন্নিমিত্ত চেষ্টার আবির্ভাব, তদনন্তর ক্রিয়ানিষ্পত্তি; এখানে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কর্তৃত্ব ও চেতনত্ব একাধিকরণে বিদ্যমান। কপিলমতে কর্তৃত্বের বোঝা, জড়া; অচেতনা প্রকৃতি ঠাকুরাণীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, পুরুষ মহাশয় চৈতন্য স্বরূপ, তাহার কর্তৃত্ব একটা মনকে চোখঠার দেওয়ার মত, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের এখানে প্রসার নাই। এ সিদ্ধান্ত প্রতিমা পরপক্ষের যুক্তিযষ্টির তাড়নে কতক্ষণ যে বিপত্তিজলে বিসর্জ্জিত না হইয়া থাকিবে, তাহাই বর্ত্তমানে বিবেচ্য। এখানে বলা যাইতেছে, পরম্পরাধ্যাসবশতঃ কর্ত্তার চৈতন্য, এবং চেতনের কর্তৃত্ব এইরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যয় জন সমাজে প্রমাণরূপে গৃহীত হইতেছে। যেমন বহ্নি-সংযোগবশতঃ লৌহ দাহ করিতে সক্ষম হয়, ফলতঃ উহা দহনেরই শক্তি, লৌহের নহে। তদ্রূপ "চৈতন্য" আত্মার স্বভাব সিদ্ধ স্বরূপ, অন্যোন্যাধ্যাস হেতুক জড়ে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইতে জড়ও চেতন বলিয়া ভ্রমাত্মক প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা জড়ের গুণ নহে, জড় যেমন তেমনই জড় আছে। এখানে অনেকে আপত্তি করিতে পারেন, "তবে কর্তৃত্ব টুকুও জড়ের গুণ না হইয়া, আত্মার গুণ হউক না কেন"? আমরা যেরূপ আত্মার অনুমান করিয়াছি, তাহাতে যে কর্তৃত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তাহা পূর্ব্বেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে, এখানে আমাদের স্বতন্ত্র উত্তর নাই। শ্রুতি মন্দ্রমধুররবে "অকর্ত্তাচিন্মাত্রং" এই মহাসত্য তথ্য ঘোষণা করিয়া, বাদিবরের সন্দেহ প্রাসাদের শিরোদেশে বজ্রপাত ব্যবস্থা করিয়াই রাখিয়াছেন। এই বিষম ভ্রমে উদাসীন পুরুষেরও কল্পিত কর্তৃত্বরেখা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইল, অচেতন অপ্রকাশস্বভাব-জড়ও প্রতিফলিত-চৈতন্যপ্রকাশে চন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী হইল, চেতন বলিয়া জীবজগৎ ও তাহাকে অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইল। লিঙ্গ বলিলে সাংখ্য শাস্ত্রে সাধারণতঃ মহত্তত্ত্বই বুঝা যাইয়া থাকে; কিন্তু এখানে অখিল অব্যক্তাদি জড়তত্ত্বের সমষ্টিপিণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া অভিহিত হইলে, আমাদের অভীষ্টসিদ্ধির পন্থা পরিষ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এখানে যে সংযোগের কথা বলা হইল, তাহার অর্থ সন্নিধান অর্থাৎ সন্নিকর্ষ। অনেক টীকাকার মহাশয়েরা অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া, অশেষ সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই; আমরা সংযোগকে সন্নিধান বলিয়াই কার্য্যসিদ্ধিতে বিশ্বস্ত হইলাম।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধ বদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ ২১

পদপাঠঃ। পুরুষস্য। দর্শনার্থং। কৈবল্যার্থং। তথা। প্রধানস্য। পঙ্গু-অন্ধ-বৎ। উভয়োঃ। অপি। সংযোগঃ। তৎকৃতঃ। সর্গঃ।

ব্যাখ্যা। পুরুষস্য—পুরুষের। দর্শনার্থং—দেখিবারজন্য। কৈবল্যার্থং—মুক্তিরজন্য। তথা—সেইরূপ। প্রধানস্য—প্রকৃতির। পঙ্গ্বন্ধবৎ—পঙ্গু (গতিশক্তিহীন) ও অন্ধের (দর্শনাশক্তের) ন্যায়। উভয়োঃ—দুইজনের। অপি—ও। সংযোগঃ—সম্পর্ক। তৎকৃতঃ—তদুৎপন্ন। সর্গঃ—সৃষ্টি।

বঙ্গার্থঃ। পুরুষের কৈবল্যার্থ ও প্রধানের পুরুষকর্তৃক দর্শনার্থ পুরুষপ্রকৃতির সংযোগ উপস্থিত হয়। যেমন পঙ্গু ও অন্ধের (সংযোগ।) মহদাদি সৃষ্টির সেই সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়।

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ জড়চিতের অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ ধর্ম্মাবভাস ভ্রমাত্মক, এ ভ্রান্তির একমাত্র নিদান উভয়ের সংযোগ। যদি এই সংযোগ প্রকৃত পক্ষে প্রমাণিত না হয়, তবে সে আশার কুসুম চিত্তশাখায়ই শুকাইল। এ দারুণ দুর্দ্দৈব যাহাতে উপশান্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টাকরা আবশ্যক। সংযাগের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করাই এখন উদ্দেশ্য, "সংযোগ" "অপেক্ষা" ভিন্ন সম্ভাবনার সহিত পরিচিত হইতে পারে না। অলিকুল আকুলভাবে রসালশাখায় সমাসীন হইল, এ সংযোগ কি জন্য? ইহাতে কি কাহারও প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে? অবশ্য কাহারও জুড়ান সম্ভব। মধুব্রতের স্বীয়নামের সার্থকতা সম্পাদনে "অপেক্ষা" আছে, তাই এ সংযোগ। নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সংযোগের "অপেক্ষা" ও "উপহার" এই দুইটী মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, সুতরাং প্রকৃতি পুরুষসংযোগেও এ দুইটী থাকা বিধেয়, নচেৎ কল্পনার অসম্পূর্ণতা অপরিহরণীয়া। পুরুষকর্তৃক প্রধানের দর্শন আবশ্যক, দর্শন ভোগ। যাহার ভোগ্যতাসাধন আবশ্যক, তাহার সহিত ভোক্তার একটু সম্বন্ধ থাকাও চাই। নিজের আচরণাদি বিষয় প্রকৃতি পুরুষকে দর্শন করান; এই জন্যই প্রকৃতির পুরুষে "অপেক্ষা" আছে, উপকার আত্মপ্রদর্শন। এইরূপ পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করেন, উপকার তাপত্রয় বিগম। পুরুষ ভোগ্যবিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া জড়গত তাপানল, অজ্ঞান বশতঃ আপনাতেই অনুভব করেন, পরে ঔপচারিক দুঃখধূমকেতুর প্রশমন বিষয়ে প্রযত্নপর হয়েন। প্রকৃতি-পুরুষের অন্যথাজ্ঞান দুর্ব্বিপাক দমনের অসাধারণ কারণ, অন্যথাজ্ঞান তাৎপর্যতঃ ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞান প্রতিযোগি-পদার্থের অপেক্ষা করে, সুতরাং পুরুষ, প্রকৃতির অপেক্ষী। তিনি দুঃখদহনে আপনাকে আহুতি প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না, শান্তিবারিবর্ষণে তাপাগ্নির নির্ব্বাপন তাহার অভিপ্রেত; সাধনানুসন্ধানে অনন্যোপায় হইয়া তিনি ভেদজ্ঞান ও প্রকৃতি উভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরুষস্য কৈবল্যার্থং প্রধানস্য দর্শনার্থং, এইরূপ অন্বয় করিলে দূরতা দোষ ঘটে বটে, কিন্তু তাহা পণ্ডিত মণ্ডলীর অভিপ্রেত; সুতরাং আমাদৃশ লোকেরও তাহাই স্বীকার্য্য বিষয়। সংযোগ বিষয়ে অপেক্ষা প্রয়োজন যুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যেমন পঙ্গুব্যক্তি এবং অন্ধ ব্যক্তি পরস্পরের

অপেক্ষায় উপকার পাইতেই সংযুক্ত হইয়াছিল; তদ্রূপ পুরুষ প্রকৃতির সংযোগ। বিধির বিধানে লোচনহীন ব্যক্তি গতিশক্তি সম্পন্ন হইলেও, স্বাভিপ্রেত স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে গমন করিতে সক্ষম হয়, গমনাসমর্থ চক্ষুষ্মান ও তথৈবচ। প্রয়োজন সত্তই পথপ্রদর্শক, অন্ধের চক্ষুষ্মানের অপেক্ষা, গতিমানের অপেক্ষাও গতিহীনের স্বতঃই বিদ্যমান। চক্ষুষ্মান্ পথের পরিচয় দিলেন, গতিমান্ তাহাকে বহন করিয়া লইল, উভয়েরই উপকার ও অপেক্ষা হইতে সংযোগের সিদ্ধি হইল। প্রকৃতির জড়তাবশতঃ গত্যাদিজড়ধর্ম্ম তাহাতে আছে, পুরুষ দ্রষ্টা, তাহার দর্শনে সামর্থ্য আছে, দ্রষ্টার সংযোগে জড়ের গতিপরিণতি ঘটিল, প্রকৃতির স্বপ্রদর্শন সত্যই হইল, পরিণতিবলে দ্রষ্টার দুঃখরজনীর উষাকাল ক্রমেক্রমে আপন অঙ্গ প্রকাশ করিতে লাগিল। সংযোগ হইতে ভোগ-মোক্ষ নিষ্পন্ন হয়, সংযোগ ভোগের জোগাড় করিতে না পারিলে, মোক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতে পারে না; কাজেই সংযোগ হইতে সংসার প্রসারের আরম্ভ হইল। তারপর দুর্দ্দশার প্রপীড়নে পুরুষ বিবেকী হইয়া বিশ্লিষ্ট হইলেন, সকল সংসার জ্বালা জুড়াইয়া সুশীতল হইলেন, তখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে, যে সংযোগ ভোগাপবর্গার্থ সাধনের জন্য, তাহাতেই সৃষ্টির আবশ্যকতা, তৎপরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ; অতএব সংসার সৃষ্টি সংযোগজ, সন্দেহ নাই। এরূপ মহদুপকার ও প্রবল অপেক্ষা সত্ত্বে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ অমূলক বলিতে প্রবৃত্তি হইবে বা কেন?

প্রকৃতে র্মহাংস্ত তোঽহঙ্কার স্তস্মাদ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥২২॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতেঃ। মহান্। ততঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। গণঃ। চ। ষোড়শকঃ। তস্মাৎ। অপি। ষোড়শকাৎ। পঞ্চভ্যঃ। পঞ্চভূতানি॥

ব্যাখ্যা। প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি হইতে। মহান্—বুদ্ধিতত্ত্ব। ততঃ—তাহাহইতে। অহঙ্কারঃ—অভিমানাত্মক অন্তঃকরণপদার্থ। তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। গণঃ-সমূহ। চ—ও। ষোড়শকঃ—ষোড়শটী (একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র)। তস্মাৎ—সেই (তাহা হইতে)। অপি—ও। ষোড়শকাৎ—ষোড়শসংখ্যা পরিমিত সমূহের মধ্যে। পঞ্চভ্যঃ—পঞ্চতন্মাত্র হইতে। পঞ্চমহাভূতানি—পাঁচটী স্থূলভূতের (উৎপন্ন হইল।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, তাহা হইতে অহঙ্কার, তাহা হইতেও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এই ষোলটী; সেই ষোলটীর মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পাঁচটী স্থূলভূত উৎপন্ন হইল।

বিশদব্যাখ্যা। জড়জগতের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মূলতত্ত্ব কপিল মতে ক্রম বিকাশ। আধুনিক ক্রম বিকাশ মতের মত ইহার চরম বিকাশ অদ্যাপি পূর্ণতা লাভ করে

নাই, এমন নয়। বিকাশের শেষস্তর যখন গঠিত হইল, তখন মিশাইয়া জগত গড়া হইতে লাগিল; ইহাই আচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রকৃতি এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের অব্যক্ত অবস্থা বই আর কিছুই নয়; প্রকৃতি,মহত্তত্ব, ইহারা বস্তুতঃ পৃথক্ পদার্থ নহে, কার্য্যকারিতাও সাময়িক অবস্থা বিশেষে বস্তুবর্গ স্বতন্ত্র নামে পরিচিত হয়। বীজের ভিতর অপ্রকাশিত ভাবে বৃক্ষ বিদ্যমান, বীজ যখন আরও একটু বিস্তৃতিলাভ করিল, সামান্যতঃ আকার পরিবর্ত্তন ও কার্য্যকারিতা অন্যরূপ হইল, তখন নাম দিলাম অঙ্কুর, ক্রমশঃ উহাই স্বতন্ত্রাকার ধারণ করিয়া পত্র, কাণ্ড, শাখাদি সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া পরিশেষে বৃক্ষ বলিয়া বিখ্যাতি লাভ করিল। উহাতে যেরূপ অবাপ্যান্তর কারণ বশতঃ অঙ্কুরাদি কয়েকটী স্তর কল্পিত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি জগতের অব্যক্তাবস্থাস্বরূপ বলিয়া উহাকে অব্যক্ত বলা হয়। রজঃ, সত্ব, তমঃ এই তিন জাতীয় মহাণুর বিবিধ সংযোগ-বিয়োগে এই বুদ্ধ্যাদি তত্ব অবস্থাবশে পরিণতি প্রকোপে নব নব আকার ধারণ করিয়া, আমাদের লোচনপথ অলঙ্কৃত করিতেছে। বৈষম্য অর্থাৎ ক্রমিবেশীভাব হইতে পদার্থের পার্থক্য, যখন বৈষম্য ঘটে নাই, মহাণু অবিকৃত ভাবে পিণ্ডিত আছে, তাহারই নাম প্রকৃতি। মহত্তত্ব বৈষম্যের প্রথম পরিচয়ে ক্ষোভিত দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মক অন্তঃকরণ। জড়জগৎ আপনার স্বতন্ত্র সত্তা পায়না; কাজেই জ্ঞানে মিশিয়া ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়া প্রকাশিত হয়। বহির্জ্জগৎ কপিল মতে ও অন্তর্জ্জগতের বিকাশ বই আর কিছুই নয়; তবে জ্ঞানৈকবাদী যেমন জ্ঞানের অবস্থা বিশেষও জ্ঞানের সঙ্গেই বিলীন একটী পদার্থ বলেন, ইহারা তাহা বলেন না, জ্ঞানের সহিত দ্রব্যাত্মক জড় মিশামিশি লাভ করিল, সান্নিধ্য বশতঃই ক্রিয়ার আবির্ভাব হইল, এই দ্রব্যজ্ঞান ক্রিয়াত্মক জড়চিৎ সক্রিয় অন্তঃকরণ পরিণতি স্বভাব বলিয়া কোনও স্থানে জড়াংশগত বৈষম্য, কোথাও বা চিদংশগত বৈষম্য, আর কোনওখানে ক্রিয়ার বৈষম্য হেতুক অনন্ত আকার গ্রহণ করিয়াছে। জড়চিতের ক্রিয়াশ্রয় জড়চিৎ কার্য্যেই দেখা যাইতেছে, জ্ঞানের জড়াত্মক ছায়াময় কার্য্য বলিয়া, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিশ্বকে বিশ্বাস করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি হয় না, অহঙ্কারও ঐরূপ অন্তঃকরণ বস্তু বিশেষ, বেশীর ভাগে কেবল অভিমানটুকু সেখানে বিদ্যমান। বুদ্ধির অসাধারণ ব্যাপার ছিল অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞান, অভিমান এখানে বুদ্ধির পরিণাম হইতে সংজাত স্বতন্ত্র ব্যাপার। সংযোগ-বিয়োগ অবস্থা পরিবর্ত্তনে নূতন গুণের আবির্ভাব অনুভব বলেই সিদ্ধ হয়; অধ্যবসায় না থাকিলে, তদ্বিষয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়না। আমি যদি নিশ্চিতরূপে জানি যে, আমি ভদ্রবংশজ, তবেই আমার তদ্বিষয়ে গর্ব্ব হইতে পারে; ভ্রমবিশ্বাসে ও গর্ব্বের আবির্ভাব হয়, এবং ঐ বিশ্বাসকে নিশ্চিত বলিয়াই তখন বিবেচনা করা হয়। ব্যাপার দ্বয়ের পরস্পর কার্য্যকারণ ভাব বলে অহঙ্কারের ও বুদ্ধির কার্য্যকারণভাব অনুমান করা যায়। অহঙ্কার হইতে একেবারেই এগারটী

ইন্দ্রিয় ও পাঁচটী তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাবস্থা উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার ক্রিয়া-কারিতার অনেকাংশে নিশ্রিত, তজ্জন্যই অনেকগুলির তত্ত্ব অহঙ্কারের পরবর্ত্তী বিকাশ। ইন্দ্রিয় গুলি জ্ঞান ও ক্রিয়ার হেতুভূত অংশ, সূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন শক্তিমাত্রে বলিয়াই বোধ হয়, সাংখ্য মতের ত্রিগুণ (সত্বরজস্তমঃ) বৈশেষিকের গুণ পদার্থ নহে, সূক্ষ্ম দ্রব্য মাত্র। তাহাদিগকেই এখানে মহানু বা অণুশব্দ দ্বারা বলা হইতেছে, ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ নির্ব্বাচন যথাসময়ে করা হইবে। মনকে অনেকে ইন্দ্রিয় বলিতে নারাজ। জ্ঞান সাধক হইলে ইন্দ্রিয় শব্দটী প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। ভগবদ্গীতার বচন প্রমাণ তুলিয়া শব্দের জন্য বিবাদ দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে কণ্টকাগার করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তন্মাত্র গুলি ভূতগণের অমিশ্র ভাব, "তস্মিংস্তস্মিংস্তু তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।" এই শ্লোকটীতে তন্মাত্র নামের হেতু বলা হইয়াছে। আকাশ যদি আকাশ মাত্রই রহিল, তবে আকাশ তন্মাত্র বলা যায়। এইরূপ পঞ্চভূতের প্রত্যেকের বেলায়। আকাশ অবকাশ মাত্র নয়, উহাতে আণবিকতা রহিয়াছে, যাঁহারা মিশ্রণাদি স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অবকাশে বড় লাভ দেখিনা। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত আচার্য্যগণের অভিপ্রায় পরিস্ফুট হইবে আশা করা যায়। পঞ্চমহাভূত তন্মাত্রগণের পরাবস্থা। সূক্ষ্ম তন্মাত্র সকল পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অপরাপরের গুণ পাইয়া, স্থূলাকারে একটী নূতন জিনিষের মত গঠিত হইয়া আমাদের অনুভূয়মান মাটী, জল, বাতাস ইত্যাদি নাম ধারণ করিল; তাহার উপর ক্রিয়া-জ্ঞান ও দ্রব্যাণুর বৈষম্যানুসারে স্ত্রী, পুত্র, বধু, বস্ত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ছত্র, পত্র, পাত্র ইত্যাদি সকলই উৎপন্ন হইল; সৃষ্টির সংযোগ নিবন্ধন এই কথার পর সৃষ্টির ক্রম জানা আবশ্যক, এই কারিকায় তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ—

মীমাংসা-দর্শনম্।

(জৈমিনি-সূত্রম্)

(পূর্ব্বানুবৃত্তম্)

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানং উপদেশোঽ-
ব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।৫॥

পদপাঠঃ। ঔৎপত্তিকঃ। তু। শব্দস্য। অর্থেন। সম্বন্ধঃ। তস্য। জ্ঞানং। উপদেশঃ। অব্যতিরেকঃ। চ। অর্থে। অনুপলব্ধে। তৎ। প্রমাণং। বাদরায়ণস্য। অনপেক্ষত্বাৎ॥

ব্যাখ্যা। ঔৎপত্তিকঃ—নিত্য। তু—কিন্তু। শব্দস্য—শব্দের। অর্থেন—অর্থের সহিত। সম্বন্ধঃ—সম্পর্ক। তস্য—তাহার (অগ্নিহোত্রাদিলক্ষণ ধর্ম্মের।) জ্ঞানং—নিমিত্ত (জ্ঞায়তেহনেনেতিব্যুৎপত্ত্যা।) উপদেশঃ—বিশিষ্ট শব্দোচ্চারণ। অব্যতিরেকঃ—(জ্ঞানের) বিপর্য্যাস হয়না। চ—ও। অর্থে—পদার্থে। অনুপলব্ধে—(প্রত্যক্ষাদির দ্বারা) উপলব্ধির বিষয় যাহা নয় তাহাতে। তৎ—তাহা (নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য)। প্রমাণং—প্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের জনক। বাদরায়ণস্য—বাদরায়ণ মহর্ষির (ও এই মত।) অনপেক্ষত্বাৎ—(পুরুষান্তর অথবা প্রত্যয়ান্তরের) অপেক্ষা করেনা বলিয়া।

মন্ত্রার্থঃ। শব্দের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। উহা প্রত্যক্ষাদির দ্বারা অনবগম্য অগ্নিহোত্রাদিরূপধর্ম্মের নিমিত্ত। বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণেও জ্ঞানের অবিপর্য্যয় দেখা যায় বলিয়া নিত্যসম্বন্ধ বিশিষ্ট শব্দবৎবাক্য প্রমিতির উৎপাদক। অপর কাহারও অপেক্ষা করেনা বলিয়াও উহা প্রমান। বাদরায়ণ মহর্ষিরও এবিষয়ে এইরূপ অভিমত।

বিশদ ব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষপ্রমানের ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি নাই, অনুমানাদিও প্রত্যক্ষের অপেক্ষী; তাহাদের সকলেরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমান। যদি সকলেই ধর্ম্মাবরোধে অসমর্থ হইল, তবে প্রসিদ্ধ প্রমাণের অবিষয় বলিয়া শশশৃঙ্গাদিবৎ ধর্ম্ম মহাশয় ও অদর্শন নগরের অধিবাসী হইতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, বরং বিশেষরূপেই বদ্ধ হইবে, অতএব এ অনিষ্ট পরিহারের জন্য প্রয়াস পাওয়া বিধেয়; কাজেই বর্ত্তমান সূত্রে ধর্ম্মে "শব্দপ্রমাণগম্যত্ব" ব্যবস্থাপিত হইতেছে। শব্দের সহিত তদর্থের নিত্যসম্বন্ধ। যেখানে শব্দ আছে, সেখানে তাহা তৎপ্রতিপাদ্য অর্থের সহিত প্রতিপাদ্য প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই বিদ্যমান থাকিবে। অগ্নিহোত্র হোমানুষ্ঠানে অশেষ-সুখনিদান স্বর্গ লাভ সম্ভব, "বেদবাক্য" নিরপেক্ষভাবে এই তাৎপর্য্য প্রচার করিতেছেন। স্বর্গাদি শব্দের সহিত যদি স্বর্গাদি পদার্থের সম্বন্ধ নিত্য হয়, এবং অগ্নিহোত্র শব্দের সহিত অগ্নিহোত্ররূপ ধর্ম্মের তদর্থ বলিয়া শাশ্বতিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তবে "বেদবাক্য" যে ধর্ম্মে প্রমাণ একথা সুসঙ্গত হইতে অসম্ভাবনা রহিল কি? নিত্যসম্বন্ধই সকল আশার মূলতত্ত্ব, প্রত্যক্ষাগম্য পদার্থ অনুমান দ্বারা প্রতীত হইতে পারে। অনুমান বল যেখানে পরাভূত হয়, সেখানেও উপমানের পরাক্রম প্রভূতভাবে উপলব্ধ হয়। এখানেও প্রত্যক্ষাদি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং শব্দ প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশয় সজ্জিত হইতে হইতেছে। উপদেশ পরম্পরা দ্বারাও নিমিত্ততা প্রমাণীকৃত হইতে পারে। প্রাচীন কাল হইতে যে সিদ্ধোপদেশ ব্যবহার চলিতেছে, তাহা যদি যথার্থ হয়, তবে শব্দার্থসম্বন্ধ নিত্য সিদ্ধ সন্দেহ নাই। উপদেশ অনর্থক বলাও বিড়ম্বনা বিশেষ; অনন্তকাল ব্যবহার নিষ্পত্তির এক মাত্র মূলীভূত হেতু ঐ উপদেশ প্রবাহ। উহার অপলাপে ব্যবহার

বিরোধ অনুভূয়মান নিশ্চিত পরিণাম। শব্দজনিত অর্থাবগতিতে কোনও সময়ে অসম্পূর্ণতা ঘটেনা। জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয়না বলিয়া প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। অগ্নিহোত্র স্বর্গসাধক এই শব্দ জ্ঞান অন্য সময়ে অন্যরূপে আভাত হয় না। বাক্য স্বর্গ হইলেও পারে, না হইলেও পারে, এরূপ সাংশয়িক প্রত্যয় উৎপাদন করেনা। কালান্তরে, দেশান্তরে, পুরুষান্তরে ইহার বিপর্য্যাস অসিদ্ধ। যে শব্দের স্বর্গ হয় এই অর্থবোধনে সামর্থ্য আছে, তাহা কখনও স্বর্গ হয় না এইরূপ বিপরীত জ্ঞানের নিমিত্ত হইবেনা। শব্দ চিরকালই "স্বর্গ হইবে" বলিতেছে, সে জ্ঞান আমাদের প্রত্যক্ষানুভব। চার্ব্বাকচরণে শরণ লইয়া কাহার আশায় "স্বর্গ হয়না" এই অনুমানিক জ্ঞানের যথার্থতায় বিশ্বাস করিব? শব্দ অপর কাহার ও মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বীয় প্রমাণ্য প্রচার করিতে প্রস্তুত, অতএব তাহা স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক।

ভাষ্যকৃৎশবর স্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তিকার মহোদয় "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" এই সূত্র হইতে "ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি পঞ্চমসূত্র পর্য্যন্ত অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বচনাবলিতে নিপুণতরভাবে অন্তঃস্রোত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইতে হয়, পাঠক বর্গের পরিতুষ্টির জন্য তৎপ্রকার প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্যনিমিত্ত পরিষ্টিঃ" সূত্রের তদভিপ্রেত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মে যে শব্দগম্যত্ব বলা হইয়াছে তাহার পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। সূত্রের সহিত "ন কর্ত্তব্যা" এইটুকু পদ অধ্যাহার করিয়া অর্থকরাই তাঁহার অভিমত। চির প্রসিদ্ধ পদার্থে পরীক্ষা প্রযত্ন প্রকৃতোপযোগী নয়, প্রত্যুত তাহাতে বৃথা পরিশ্রম মাত্র পরিণাম। সন্দেহ কুহেলিকার নিরসন মানসে পরীক্ষারূপ অরুণ কিরণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যক্ষাদির ন্যায় আগম ও সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ প্রমাণ, সুতরাং পরীক্ষিতব্য নয়। সর্ব্বদা ব্যবহার নির্ব্বাহক প্রত্যক্ষ প্রকৃত পক্ষে পদার্থ-যাথার্থ্য প্রতিপাদক কিনা এই শঙ্কা যেমন স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে উদিত হয় না, সেইরূপ শব্দ প্রমান কিনা এচিন্তা একান্তই অসম্ভব, কেননা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে প্রসিদ্ধের পরীক্ষাপরতা অনাবশ্যক। চেৎ প্রচলিত ব্যবহারের লোপাপত্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারেঃ—প্রত্যক্ষাদির ব্যভিচার দর্শন সর্ব্বসম্মত, সুতরাং পরীক্ষার দ্বারা উপযুক্তাবধারণ শ্রেয়ঃ। পৌর্ণমাসী নিশায় চারু-চন্দ্রমা যখন রুচির চন্দ্রিকামৃতচয়ে চকোরের পিপাসা মিটাইতে সুধা শীতল মানারম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গগনমার্গে উদিত হন, তাঁহার বিমল বিভায় দশদিক্ চকাসিত হয়, বিটপিবৃন্দ অমল জ্যোৎস্নাজলে স্নান করিয়াও প্রকৃত পূত হইতে পারেনা, স্নাত অসাধুর অন্তঃকরণস্থ অজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারকে আপন বক্ষে লুকাইয়া রাখে, এবং মন্দানিলের আন্দোলনে শিরঃ সঞ্চালন দ্বারা "অলঙ্কারে কলঙ্কঢাকে না" এই ব্যঙ্গোক্তি বিধুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে। তখন সেই শাখিশাখায় লতা পাতার অন্তরালে

পথে "রিফাইন" করা যে জ্যোৎস্নাটুকু বাতাহত ঝোপের উপর পড়িয়াছিল, তাহাকে নর্তনকারিণী পিশাচাঙ্গনার পরিধেয় শুভ্রবসন বলিয়া প্রত্যক্ষ করা কি অপ্রসিদ্ধ? অমারজনীর সান্দ্রান্ধকারে চপলালোকে পথ মধ্যস্থ রজ্জুতেই প্রবীণ পথিকের সর্পদর্শন ঘটিয়া থাকে। এসকল স্থানে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইলে, ব্যভিচার আর কাহার কাছে দেখিতে চাহিব? অনুমানদিকে ও ঈদৃশাপন্ন হইতে দেখা যায়, অতএব শব্দের সহিত স্বতন্ত্ররূপ সম্বন্ধে সম্ভবনা সত্য নয়। এখনে দোষাদির অনুসন্ধান না করিলে পদস্খলন সম্পূর্ণ সম্ভব; কাজেই প্রত্যক্ষাদিও শব্দ সকলেরই প্রামাণ্য পরীক্ষা করা উচিত, নচেৎ অনর্থ প্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে।

প্রত্যুত্তরে বৃত্তিকার বলেন, যাহা প্রত্যক্ষ তাহার কদাচ বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হয় না; যাহার ব্যভিচার আছে তাহাকে প্রত্যক্ষ বলি না; তদ্রূপ অনুমানাদিও শব্দ। প্রকৃত প্রত্যক্ষ কি? এই প্রশ্নের সমাধানার্থে সূত্র "তৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম সৎপ্রত্যক্ষম্ ইত্যাদি। ভাষ্যকার সৎসম্প্রয়োগেও তৎপ্রত্যক্ষম্ এইরূপ সূত্রপাঠ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বৃত্তিকার "তৎ" শব্দের স্থানে "সৎ" শব্দ ও "সৎ" পদের স্থানে "তৎ" পদ বলিয়াছিলেন। বৃত্তিকৃৎপণ্ডিতের মতে সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, যেবিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে সেই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ থাকিলে ঐ প্রত্যক্ষই প্রকৃত প্রত্যক্ষ। তাহা হইলে সর্পে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ জনিত সর্পজ্ঞানই সৎপ্রত্যক্ষ রজ্জুসংযোগজ জ্ঞান প্রত্যক্ষ সংজ্ঞা লাভ করিতে সক্ষম হইলনা। যদি জিজ্ঞসা করা যায়, সর্পেন্দ্রিয় সংযোগজনিত সর্পজ্ঞান ও রজ্জুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সর্পজ্ঞান এতদুভয়ের স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই। তবে সর্পসংযোগও রজ্জুসম্প্রয়োগ কোথায় কি হইল কেমন করিয়া বুঝিব? তবে বলাযাবে, যেথানে অন্য সম্প্রয়োগ ঘটে নাই, তথায়ই সর্পসন্নিকর্ষ বুঝিব। আমার যদি শঙ্কা হয়, রঙ্গে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষসত্বে ও "আমার চক্ষুঃ রজত সন্নিকৃষ্ট" এইরূপ প্রতীতি হয়, এখানে অন্য সম্প্রয়োগ অবধারণ করিবার উপায় কি? তবে সে আশার ও অবকাশ নাই কেননা এবাম্পিছেস্থতর্কে কর্কশতায় শঙ্কিত হইতে হইতেছেনা। যেথানে পরক্ষণে বিশেষ দর্শন বশতঃ বাধক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বজ্ঞান অসারতা প্রমান করিয়া দেয়, সেখানেই অন্য সম্প্রয়োগ বুঝিতে হইবে। রঙ্গে রজতজ্ঞান পরে রঙ্গের বিশেষদর্শনে বাধিত হয়। যদি পুনর্ব্বার আশঙ্কা করা যায়, বাধক জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্যাবধারণ করা কষ্টকর। তখন অন্যসম্প্রয়োগ অনির্দ্দিষ্ট; সুতরাং প্রকৃষ্টরূপে পরিচায়ক আর কেহই রহিল না। তাহাহইলে আমরা সমাধানে বলিব, বিষয় ও ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের যে কেহ দোষদুষ্ট না হইলে সম্যক্ জ্ঞান সম্ভব, যদি ঘটাদি-বিষয় দূরত্বাদি দোষাক্রান্ত হয় অথবা চক্ষুঃ তিমির পিত্তাদি দোষ অভিভূত হয় তবে সৎপ্রত্যক্ষের প্রত্যাশা বৃথা। এথানে আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দুষ্টতার সম্বাদ পাইতে

উপায় কি? প্রত্যুত্তরে অপর কিছুই বক্তব্য নাই; বলিবার বিষয় কেবল এইযে, বহু যত্নে ও যখন দোষ খুঁজিয়া পাইবনা তখন অদুষ্ট বলিতে অতর্কিত ভাবে অগ্রসর হইব।

পূর্ব্ববাদীর আক্ষেপ তবুও নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় নাই, বিশ্রামান্তে অবসর পাইয়া তিনি অকাতারে যুক্তিধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ লৌকিক বস্তু সাধন, তাহাদের বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির দোষানুসন্ধান সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়; উপযুক্ত প্রয়াস পাইলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। শব্দ প্রমাণের বিষয় ভবিষ্যবস্তু ধর্ম্ম। ইদানীং ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় গত দোষ রহিল কিনা তাহা বুঝা গেলনা, এরূপাবস্থায় প্রামাণ্য পরীক্ষার আবশ্যক নতুবা শব্দ অপ্রমাণ। "অনিমিত্তং" এই সূত্রাংশ দ্বারা উক্ত অভিপ্রায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। অপ্রমাণ কিজন্য? এই প্রশ্নের উত্তরে হেতু প্রদর্শিত হইতেছে যে "বিদ্যমানোপলম্ভনত্বৎ।" অর্থাৎ যাহা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় অথচ উপলব্ধ হয় না, তাহা নাই বলিয়া বলা যাইতে পারে। পশুকাম ব্যক্তি যজ্ঞের দ্বারা পশুফল প্রাপ্ত হইবেন এই তথ্য বেদবচনে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানের পরক্ষণে পশ্বাগম দেখা যায় না। যদি বলা যায় পশু থাকে,—অথচ আমরা দেখিতে পাই না, তবে ইহাযে অশ্রদ্ধেয় বচন তাহা বুঝিতে কাহারও বহুযত্নের আবশ্যক নাই, কেননা পশু দর্শন যোগ্য সামগ্রী থাকিলে অবশ্যই দর্শন ঘটিত; যখন নয়ন অসমর্থ হইলেন তখন পশু নাই বলিয়াই নিশ্চয় করা গেল, যজ্ঞের পশুফলতা বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত হইল। এখানে ও যদি বল যায়, কালান্তরে পশুফল প্রাপ্তি সম্ভব, সে আশাও নপুংসকের দেহবসানে ঔরস সন্তান জনন প্রত্যাশার ন্যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। বিশেষতঃ, কার্য্যকালে ফললাভ পরীক্ষিত; যখন মর্দ্দন করা যায়, তৎকালেই মর্দ্দন সুখের অনুভব, আবার যে সময় রসবদ্বস্তুর উপর রসনাব্যাপার উপস্থিত করা যায় তৎসময়েই রসাস্বাদ লাভ। যজ্ঞ মহাশয় বর্ত্তমান থাকিতে ফল প্রদানে সমর্থ হইলেন না, যখন কালের করাল কবলে কবলিত হইয়া সত্তাশূন্য হইলেন, তখন তাঁহার নিকট ফলের আশা অতিশয় অস্বাভাবিক। কালবিলীনের কাছে কোনও আশাই কাজে আসিতে পারে না। যদি যজ্ঞ কোনও অদৃষ্টফলের জনক বলিয়া বলা যায় তাহাতে ও স্বার্থসিদ্ধি পশ্চাতে রহিল, কারণ বেদ বলেন পশুফল হইবে, হইল একটী "অদৃষ্ট" ফল, আপনা হইতেই অপ্রমাণ্য আসিয়া পড়িল। অতএব ভূতলে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টায় যজ্ঞের "অদৃষ্ট" ফল কল্পনা করিয়া বেদ প্রামাণ্য ব্যবস্থাপনের যত্ন অতি হাস্যাস্পদ। বেদপ্রামাণ্যস্থাপনের আশা অন্তরে উঠিল, আবার তথায় নিবিয়া গেল, "অদৃষ্ট" স্বীকার করে কি উপকারে আসিল তাহাও বিবেচ্য। বেদে বহুস্থানে সর্ব্বপ্রমান বিরুদ্ধ বাক্যাবলীর বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। অগ্নিচয়ন বিধান পূর্ব্বক

বেদ ঘোষণা করিতেছেন "সএষ যজ্ঞায়ুধী যজমানোঽঞ্জসা স্বর্গং লোকং যাতি"। কিন্তু যজমান সশরীরে স্বর্গে যায় কই? তাহার দেহ দৃশ্যভাবেই বহ্নিদেবতার বিকট বদনে আহুত হইয়া ভস্মভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব এজাতীয় বাক্যে বিশ্বাস করিবার কোনও সন্তোষ জনক কারণ নাই। অসম্ভব বিষয়ের অবরোধক বাক্যটি যে শুধু জনসমাজে অযথা বলিয়া উপেক্ষিত হয়, এমন নহে, তাদৃশ বচনের বক্তাও বাতুল বলিয়া অবধারিত হয়। "জলে শিলা ভাসে" "অলাবু সলিলে নিমগ্ন হয়" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিলে যে বচন রচনাকারী হস্ততাড়নে অভিনন্দিত হন, ইহা অনুভব সিদ্ধ। পূর্ব্ব পক্ষের এই সকল আপত্তি পরিহারার্থে—'ঔৎপত্তিকস্তু" ইত্যাদি পরসূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ অপৌরুষেয়, অনাদিকাল হইতে এরূপ শব্দার্থব্যবহার প্রণালী চলিতেছে, কোন সময়ে কোনও পুরুষ স্বপ্রতিভায় শব্দ ও অর্থকে পরস্পর সম্বন্ধ করেন নাই। এই অপৌরুষেয় সম্বন্ধ নিবন্ধন "চোদনাবাক্য" স্বার্থাববোধে সমর্থ, সুতরাং শব্দের প্রামাণ্য সংশয় অনুচিত। বাক্য সর্ব্বদাই প্রমাণ, তবে যে লৌকিক বাক্য অপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয় সে দোষ বাক্যের নিজস্ব না, পরের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ বক্তার দোষ বাক্য সংক্রান্ত প্রাপ্ত হয়, বাক্য চিরদিন সমান, সর্ব্বদাই প্রমাণ। জ্ঞান কখনও মিথ্যা নয়, তবে দোষ অর্থাৎ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের ত্রুটি অনুসন্ধান করা চাই; যদি কাহার ও কোন অসামর্থ্য খুঁজিয়া না মিলিল, তবে বুঝিলাম প্রমাণ। বৈদিক শব্দের জ্ঞান বাধিত হইতেছেনা এবং সন্দিগ্ধ অথবা বিপর্য্যস্তভাবেও জন্মিতেছেনা, অতএব অসংশয় সত্য, শব্দ প্রমাণ।

শব্দ ও অর্থের অপৌরুষেয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান সিদ্ধান্ত প্রাসাদের ভিত্তি। উহা প্রকৃত পদার্থ, অথবা কল্পনারাজ্যের মায়াদেবী আমাদের মানসনেত্রে মোহাঞ্জন দিয়া মরীচিকা স্বপ্ন দেখাইতেছেন, এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রথমতঃ আমরা শব্দার্থের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিব। মনে করা হউক আপত্তিকারীর সঙ্গে সমস্বরে আমরা বলিব "শব্দের ও অর্থের সম্বন্ধ নাই।" শব্দ মহাশয় উচ্চারণের পরেই অসীম বায়ু-সাগরে ডুবিয়া কোথায় গেলেন খোঁজ নাই, অর্থ কিন্তু অদূরে ভূমির পরে যেমন তেমনি! ইঁহাদের আবার নিত্য সম্বন্ধ! যদি তাহাই হইত, তবে "রসগোল্লা" শব্দ বলিবা মাত্র সুরসে রসনার পরিতুষ্টি হওয়া উচিত। আশ্রয় এবং আশ্রিতের যে সম্বন্ধ, তাদৃশসম্বন্ধ স্বীকার করিলে কুঠার শব্দোচ্চারণে মুখকর্ত্তন ও বহ্নি শব্দের কথনে আগুণ আবির্ভূত হইলে পবন-নন্দনের প্রিয়সদস্যের পদপ্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অতএব "কিরূপ সম্বন্ধ?" নির্ব্বাচন করা উচিত। আচার্য্য বলেন, শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অর্থ শব্দের প্রত্যায্য অর্থাৎ বোধ্য। পরস্পরের এরূপ সম্বন্ধ সত্ত্বে অনুপপত্তিও নাই, আর আবির্ভাব জনিত দুর্দ্দশা সম্ভাবনাও থাকিবে না। অনুভবসিদ্ধ সম্বন্ধ নাই বলিলে লাভনাই।

যে শব্দ কখনও শ্রুতিপথে আগত হয়নাই, তাহা প্রথমে শ্রবণ করিলে কোনওরূপ অর্থেরই অর্থবোধ জন্মেনা. যদি নিত্যসম্বন্ধ হয়, তবে এ ব্যভিচার দর্শনের অবসর কোথায়? ইহা হইতে অনুমান করাযায়, প্রথম শ্রবণের পর শব্দার্থসম্বন্ধ জন্মে, তৎপর ব্যবহার প্রবৃত্তি। এখানে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, "দৃষ্টমূলক অনুমানই গ্রাহ্য" যে সকল শব্দ অর্থপ্রত্যয়ের কারণ হইতেছে, তাহাদের সহিত সম্বন্ধাবধারণ করিতে যাওয়াই সঙ্গত। কোনও সময় একটী শব্দ অর্থজ্ঞানের কারণ হইল না, তাহাতে তাহার অপরাধ কি বুঝিনা? কারণ-কূটের একত্র সমাবেশ হইলে কার্য্যদর্শনের আশা, উপযুক্ত কারণও সহকারিগণের অপেক্ষা করে, চক্ষু প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ নয়ন, আলোক বিষয়ের যোগ্যতা ইত্যাদির সাহায্যেই কৃতকার্য্য হয়। অন্ধকারের আধিপত্য যে রাজ্যে অতিশয় প্রবল, সেখানে বিষয়ের চাক্ষুষজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া লোচন দোষী হইতে পারে না। শব্দ অর্থপ্রত্যায়ক, অসংশয়িত সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় শ্রবণাদি সহকারিকারণের বশবর্ত্তী হইলে তাহার কারণতার ব্যাঘাত হয় কেমন করিয়া?

সম্বন্ধের অপৌরুষেয়তায় আপত্তি হইতে পারে, পরম পুরুষ পরমেশ্বর শব্দও অর্থের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। সম্বন্ধ পুরুষকৃত। অসাধারণশক্তিসম্পন্ন জনের অসাধ্য কি? এরূপ সিদ্ধান্তে মীমাংসকাচার্য্যের সাক্ষাৎসম্বন্ধে সম্মতি নাই। তাঁহাদের মতে সম্বন্ধকর্ত্তা পুরুষ প্রমাণসিদ্ধ নহে, প্রাচীনকালে অনন্তসামর্থ্যের নিদান মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত ছিলেন ইহাতে সন্তোষজনক কারণ নাই। বর্ত্তমান সময়ে তাদৃশ মহাশক্তিমান্ বিদ্যমান আছেন এ কথায়ও বিশ্বাসস্থাপন কষ্টকর। যদি কোনও পুরুষ শব্দার্থসম্বন্ধ প্রবর্ত্তক হইতেন, তবে শব্দব্যবহার প্রণালীতে তাঁহার প্রতিভাময় সমুজ্জলচিত্র স্মৃতিফলক অলঙ্কৃতকরিয়াই সম্বন্ধ থাকিত। এরূপ অসামান্যব্যাপারের আবিষ্কর্ত্তার "পবিত্রস্মৃতি" স্মরণসম্বল মানবজাতির হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হওয়া কি সম্ভব? যে মনুষ্যসমাজ ও তাহার অস্তিত্ব কতকগুলি অতীতস্মৃতির পরিণতিরূপে আমরা অনুভব করিয়া থাকি, তাহা যে একটী অসামান্য স্মৃতি হারাইয়াও আত্মসত্তায় বঞ্চিত হয় নাই, ইহাও কি সামান্য আশ্চর্য্যের কথা! কেহ কোনও নূতনতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া জাগতিক জীব লীলাশেষ করিলেও, যতদিন তাঁহার আবিষ্কৃত-সত্য মনুষ্য সমাজ একেবারে বিস্মৃত না হইতে পারে, ততদিন প্রসঙ্গে তাঁহার পবিত্রমূর্ত্তি কল্পনাতুলিকায় আঁকিয়া হৃদয় ফলকেই স্থান নির্দ্দেশ করে। যিনি বহুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি লৌকিক পরিভাষা প্রকৃতোপযোগী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সেই শব্দপারাবার পারঙ্গত মহামুনি পাণিনি মহাশয়, "বৃদ্ধি" এবং "নদী" প্রভৃতি সংজ্ঞার অধ্যয়নকালে ব্যাকরণাধ্যায়ি—ছাত্র গণের দ্বারা স্মৃত হয়েন এটী অননুভূত নহে। তদ্রূপ ছন্দঃশাস্ত্র পাঠে 'ম' প্রভৃতিকে "তিনটী গুরুবর্ণ" ইত্যাদিরূপে যাঁহারা অবগত হন, তাঁহার এই প্রথার প্রথম

আবিষ্কর্ত্তা আচার্য্যচূড়ামণি পিঙ্গলকেও সেই সঙ্গে জানিয়া থাকেন। শব্দার্থসম্বন্ধে তাদৃশ কোনও পুরুষের স্মরণ নাই, সুতরাং প্রবর্ত্তক পুরুষের প্রমাণগম্য একথায় বিশ্বস্ত হইতে প্রবৃত্তি হয় না।

কার্য্য অর্থাৎ সম্বন্ধ দর্শনে কর্ত্তার অনুমান করিতে গেলেও তাহা সম্ভবপর নহে। কার্য্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে কর্ত্তার আবশ্যকতা। সম্বন্ধ যে কার্য্য তাহা কি মনোরথ মাত্রেই সিদ্ধ হইবে? অনাদিকাল হইতে জগতে শব্দার্থব্যবহার প্রবাহ একরূপে প্রবর্ত্তিত আছে। সিদ্ধোপদেশ দ্বারা গুরু-শিষ্য-প্রশিষ্যাদি-পরম্পরাক্রমে ইহা সাধারণে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। অনাদি সংসারে অনাদিব্যবহার প্রবাহের "কর্ত্তা" খুঁজিতে গেলে কতদূর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব, তাহা অনির্দ্দিষ্ট। বৃদ্ধব্যবহারে বালকের জ্ঞান জন্মিল, বালক আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপদেশ দিতে লাগিল, এইরূপে উপদেশ ও ব্যবহার সন্দর্শনে অপরের মধ্যে অবগতি ও ব্যবহারের বহুল প্রচার চলিতে লাগিল।

যখন ব্যবহর্ত্তা বা উপদেষ্টা কেহই ছিলেন না, অথচ কতকগুলি শব্দ ও সম্বন্ধশূন্য অর্থছিল। শব্দার্থ সম্বন্ধ বলা যায় না, পরে ব্যবহারানুরোধে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব পুরুষকৃত একথাও অকিঞ্চিৎকর শঙ্কার আবির্ভাব জন্মায়; এখানে সমাধানে বলা আবশ্যক ওরূপ "ছিলনা" সময়টাও "ছিলনা" বলাযায়। প্রথমব্যবহারনিষ্পত্তিতেও সম্বন্ধের অপেক্ষা, সুতরাং অনাদি সম্বন্ধকে স্বেচ্ছামতরূপে রঞ্জিত করা যায়না। শব্দ অর্থাববোধ প্রত্যক্ষ, পৌরুষসম্বন্ধ পক্ষে তাদৃশপুরুষ, ব্যবহারের সাদিত্ব, ও অপ্রমাণ সময় ইত্যাদি কল্পনা-জালের অন্তরালে থাকিতে হয়, অনাদি ব্যবহার অনাদি সম্বন্ধের অনুকূল। উপদেশে সম্বন্ধের প্রচার সাধন মাত্র। সম্বন্ধ অপৌরুষেয়, উপদেশাদির দৃষ্টান্তান্বেষণে ব্যগ্র হইতে হইবে না। নিজের বাল্যজীবন স্মরণ করিলে অনাদিসম্বন্ধই উপদেশদ্বারা ব্যবহারাপাদন করিতে পারিয়াছে বুঝা যাইবে, অন্যথাকল্পনা প্রয়োজন দেখি না।

আরও একটী হেতু-অব্যতিরেক। শব্দব্যবহার সর্ব্বত্রই সমান। একত্র যেরূপ শব্দার্থ সম্বন্ধ অপরত্র তাহার ব্যতিরেক দেখা যায় না, "গো"শব্দে জনপদবাসীরাও পশুবিশেষকে বুঝে, গ্রামবাসীরাও তাহাই; যদি নিত্যসম্বন্ধ না হইত, তবে দূরদেশস্থ সকল ব্যক্তি সে শব্দে সে অর্থ বুঝিত না। যদি বলাযায় প্রচারকেরা ভিন্ন২ দেশে এবং স্থানে অথবা একজনই এই বিপুল জনসমাজে শব্দার্থ সম্বন্ধ প্রচার করেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা, যে সময়ে ৺কাশীধামে যাইতে প্রস্তুত হইলে যাত্রীর জীবনশশী অচিরাৎ অস্তমিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইত, সে দিনে কি একজন ব্যক্তির সমগ্র-মানবসমাজে স্বকৃত সম্বন্ধের প্রচার করা সম্ভব; বহুল প্রচারকের ও প্রমাণ নাই। এখানে অনেক আধুনিক আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, "গো"শব্দে আমেরিকার অধিবাসীরা গরু বুঝে না, তবে, নিত্যসম্বন্ধ কিরূপ? ইহা তাহারমধ্যে একটী। এপ্রসঙ্গে আচার্য্য-

চবণ চিন্তা করিয়া বলিব, একই শব্দ, ব্যক্তিভেদে, দেশভেদে, অবস্থা অর্থাৎ শরীরের ভাবভেদে নানারূপে উচ্চারিত হয়। বিশেষকারণে এরূপভাবেই নীত হয় যে, পরিশেষে উহা পৃথক্ শব্দ বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতঃ উহা এক, সন্দেহ নাই। আমরা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, একইশব্দ দেশীয় ভদ্রলোকেরা একভাবে ও নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা অন্যরূপে উচ্চারণ করেন, এমন কি পরস্পরের কথোপকথনে উভয়ের বাক্য একরূপ বলিয়াও বোধ হয়না, কিন্তু তাহা এক শব্দ বই ভিন্ন নহে। নদীয়া ও চট্টগ্রামনিবাসী ব্যক্তিদ্বয় যদি এক শব্দোচ্চারণ করেন, তাহাহইলেও উভয়ের উচ্চরিত শব্দ একবলিয়া শ্রোতার ধারণা হয়না। সংস্কৃত ভাষায় একটী শ্লোক পড়িলে বঙ্গবাসী ও উত্তর পশ্চিমবাসী একরূপই বুঝিবেন, কিন্তু পরস্পরের উচ্চারণে উভয়ের অর্থবোধে বাকি থাকে। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সন্নিহিত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, ভারতবর্ষের উন্নতির দিনে আর্য্যমুখে উচ্চারিত "গো" শব্দ বিদেশীয় Cow শব্দ হইতে ভিন্ন হইতে নাপারে। বিশেষ ২ কারণে ব্যতিক্রম হইতে পারে, নচেৎ শব্দের সাদৃশ্য ও বস্তুতঃ একত্ব অসন্দিগ্ধ।

ইহার পর ও যদি কেহ সম্বন্ধ পুরুষকৃত বলিতে চাহেন, তবে "অব্যতিরেকঃ" শব্দের প্রকারান্তর ব্যাখার দ্বারা যে পথেও কণ্টকার্পণ করিতে পারা যায়, যখন সম্বন্ধ কৃত তখন কেহ করিয়াছেন। যিনি সম্বন্ধ করিবেন, তিনি অবশ্য বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাঁহার উচ্চরিত বাক্যের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল অথবা তিনি করিবেন, যদি তিনি করেন, তবে আবার পদপ্রয়োগ, আবার অর্থ সম্বন্ধ। এইরূপ অপ্রামাণিক অনবস্থা আসিয়া আক্রমণ করে, প্রাচীন ব্যবহার নির্ব্বাহক কতকগুলি শব্দ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, যদি করা হয় তবে প্রাচীন সময়ে যেরূপে ব্যবহার চলিত, বর্ত্তমানে ও তাহাই হউক, শব্দার্থ সম্বন্ধ বিহনে ব্যবহার উপপন্ন হয় না, সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, যাঁহাকে আমরা সম্বন্ধ কর্ত্তা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তিনি ও শব্দ ব্যবহারার্থ অসম্বন্ধ শব্দের প্রয়োগ না করিয়া সম্বন্ধেরই প্রয়োগ করিতেছেন। যদি তৎপূর্ব্বেও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে তাহা আমাদের অভিলষিত তাহাই সুসম্পন্ন হইল, তিনি সিদ্ধ সম্বন্ধের উপদেষ্টা মাত্র হইলেন। তাহা হইলে প্রতীত হইল, সম্বন্ধ ব্যতিরিক্ত কাল হইতে পারিবেনা অর্থাৎ যে সময় শব্দ আছে, অর্থ ও আছে,—অথচ সম্বন্ধ নাই, এরূপ কাল নাই। কেননা সম্বন্ধ কর্ত্তা ও সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া শব্দ ব্যবহার করিতে পারিলেন না, ইহাতে বুঝাগেল সম্বন্ধ অপৌরুষের। পুরুষের দোষ শব্দ সংক্রমিত হইবার সম্ভাবনা এখানে নাই, কাজেই ইহা প্রমাণ। শব্দ প্রমাণ বলিয়া বাক্য ও প্রমাণ। বাক্য শব্দসমুদয় ভিন্ন নূতন কিছু নয়। আরও দেখা যায়-শব্দ ইতরানপেক্ষ হইয়া স্বার্থবোধনে সমর্থ, শব্দ যে প্রমাণ তাহা ব্যবস্থাপিত হইল। অতএব "চোদনালক্ষণঃ" এই

ধর্ম্মলক্ষণ দোষ নির্ম্মুক্ত। বেদের প্রামাণ্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে যে সকল বিগান দেখান হইয়াছে, প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতি শঙ্কায় এখানে তাহার সমাধান করা হইল না। তত্ত্বনধিকরণের ব্যাখ্যার ও সকল শ্রুতিবাক্যের সার্থক্যসাধনে আচার্য্যগণ যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা যথাস্থানে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা রহিল। (ক্রমশঃ)

যশোহর, শ্রীকেদার নাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন-সাংখ্যতীর্থঃ।
ব্রহ্মচারি-আশ্রম।

প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ও সরলব্যাখ্যা।

——:০:——

ষড়দর্শন ভাগের সময় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে একশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গৌতম ঋষি ন্যায় শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক এবং কণাদ ঋষি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। উভয়েই উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পরীক্ষা দ্বারাই সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া থাকেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ের নামকরণকে উদ্দেশ্য বলে; বস্তুর পরিচায়ক ধর্ম্ম বা গুণকে লক্ষণ বলা যায়; যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনকে পরীক্ষা বলে। গৌতমের প্রণীত ন্যায়সূত্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগকে এক এক অধ্যায় বলে, প্রত্যেক অধ্যায় দুই দুই আহ্নিকে বিভক্ত এবং প্রত্যেক আহ্নিকে কতকগুলি প্রকরণ আছে, প্রতি প্রকরণে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ন্যায় দর্শনের প্রথম সূত্রে পদার্থের সাধারণতঃ উদ্দেশ করা হইয়াছে। গৌতমের মতে পদার্থ ষোলটী; যথা ১প্রমাণ, ২প্রমেয়, ৩সংশয়, ৪প্রয়োজন, ৫দৃষ্টান্ত, ৬সিদ্ধান্ত, ৭অবয়ব, ৮তর্ক, ৯নির্ণয়, ১০বাদ, ১১জল্প, ১২বিতণ্ডা, ১৩হেত্বাভাস, ১৪ছল, ১৫জাতি, ১৬নিগ্রহ স্থান।

(১) যাহা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রমাণ বলে। প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয়কে প্রমেয় বলে। কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনিশ্চিত জ্ঞানকে সংশয় বলে। ঐ সংশয় নানাবিধ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে; যেমন অন্ধকারে রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া সংশয় হয়, এই সংশয়ের কারণ এই যে, উভয়ের আকার প্রায় সমান এবং উভয়ই চক্র ভাবে লম্বমান রহিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, ইহার বিশেষ বিবরণ সংশয় নিরূপণ স্থলে উল্লিখিত হইবে।

(৪) উদ্দেশ্যকেই প্রয়োজন বলা যায়, কারণ উদ্দেশ্য ব্যতীত কার্য্য-প্রবৃত্তি হয়না। যেমন জল আনিতে বলিলাম, উদ্দেশ্য কি না পান করিব। এস্থলে পানই আমার প্রয়োজন।

(৫) লৌকিক পরীক্ষা স্থলকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যদি আমি বলি যে প্লেগ একটি মারাত্মক ব্যাধি, এবং যদি কেহ তাহার দৃষ্টান্ত চাহে, তাহাহইলে কলিকাতা ও বম্বে নগরে যে শত শত লোক এই রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে, দৃষ্টান্ত স্থলে ইহার উল্লেখ করিতে পারি।

(৬) কোন স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, যুক্তি ও শাস্ত্রাদি দ্বারা মীমাংসিত বিষয়কে সিদ্ধান্ত বলে।

(৭) বিচার স্থলে সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রধানতঃ যে পাঁচ প্রকার বাক্য দ্বারা ঐ সংশয় নিরাকৃত এবং প্রতিপাদ্য বিষয় স্থিরীকৃত হয়, ঐ বাক্যগুলির প্রত্যেককে অবয়ব বলে। ঐ বাক্য গুলি এই—(ক) প্রতিজ্ঞা, (খ) হেতু, (গ) উদাহরণ, (ঘ) উপনয়, (ঙ) নিগমন।

প্রতিজ্ঞা——রাম মর্ত্ত্য। হেতু——রাম মনুষ্য। উদাহরণ——মনুর্ষ্যমর্ত্ত্য।
উপনয়——রাম মনুষ্য। নিগমন——রাম মর্ত্ত্য।

আমার প্রতিপাদন করিতে হইবে যে রাম মর্ত্ত্য, এইটী প্রতিজ্ঞা। কিসের দ্বারা আমি ইহা প্রতিপাদন করিব না রাম মনুষ্য, এইটী হেতু। রাম মনুষ্য বলিয়া যে মরিবে তাহা কোথায় পাইলাম, দেখিতে পাইযে মনুষ্য মাত্রেই মরিয়া থাকে অর্থাৎ মনুষ্য মর্ত্ত্য এইটী উদাহরণ, সুতরাং রামকে যে মর্ত্ত্য বলিয়া স্থির করিতেছি তাহার হেতু মনুষ্যত্ব, এবং মনুষ্য মাত্রেই মরিয়া থাকে ইহাও দৃষ্টিগোচর হয়, তৎপরে রামে মনুষ্যত্ব আছে এইটী উপনয়, অতএব রাম মর্ত্ত্য এইটী নিগমন।

৮। মিথ্যা সিদ্ধান্ত স্থলেই তর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, যেমন এক জন যদি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, তাহা হইলে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, রাম শ্যাম প্রভৃতি অনেকে বাঙ্গালার মধ্যে সত্যবাদী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারাও মিথ্যা বাদী হইয়া পড়েন, এই প্রকার আপত্তি করাকে তর্ক কহে।

(৯)। উভয় পক্ষের তর্ক বিতর্ক হইতে বিষয় অবধারণকরাকে নির্ণয় বলা যায়।

(১০)। সত্য নির্দ্ধারণ জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে বাদ বলে।

(১১)। তর্কে জয় লাভ করিবার জন্য যে বাক্য প্রযুক্ত হয় তাহাকে জল্প বলে।

(১২)। যে বাক্যে কেবল পরমত খণ্ডন করে, কিন্তু স্বমত সংস্থাপন করেনা, তাহাকে বিতণ্ডা বলে।

(১৩)। দোষযুক্ত হেতুকে হেত্বাভাস বলে।

(১৪)। যে বাক্য যে অর্থে প্রয়োগ করা যায়, তাহার প্রকৃত অর্থ না লইয়া অন্যার্থ কল্পনা পূর্ব্বক দোষ দেওয়াকে ছল বলে।

(১৫)। বিচার স্থলে অনুপযুক্ত উত্তরকে জাতি বলে।

(১৬)। বিচার স্থলে পরাজয়ের যাহা প্রধান কারণ হয় তাহাকে নিগ্রহ স্থান বলে; হরি বলে যে সমস্ত বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী, আমি দেখিলাম যে রাম নামক বাঙ্গালী সত্য কথা বলে, বক্তার সিদ্ধান্ত মিথ্যা স্থির হইল, তাহার ঐ মিথ্যা সিদ্ধান্তই তাহার নিগ্রহস্থান, এ নিগ্রহস্থান বহুবিধ, উহা যথা স্থানে ব্যাখ্যাত হইবে। (ক্রমশঃ)

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথমঅধ্যায়। ১ম আহ্নিক।

---:o:---

এই দুঃখ বহুল সংসারে মানবগণের নানা প্রকারে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ঐ দুঃখ সকল তিন ভাগে বিভক্ত, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আদিভৌতিক। আধ্যাত্মিক তাপ, শরীরাভ্যন্তরস্থ পদার্থ হইতে জন্মে; ইহা মানসিক ও শারীরিক ভেদ দ্বিবিধ। কামক্রোধাদির চরিতার্থতা সম্পাদন না হইলে যে দুঃখ জন্মে তাহাকে মানসিক তাপ বলে, এবং রোগাদিজনিত যে ক্লেশ হয় তাহা শারীরিক তাপ বলিয়া অভিহিত হয়। আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই উভয়বিধ তাপই বাহ্য পদার্থ হইতে জন্মে; তন্মধ্যে অতিশয় ঝড় বৃষ্টি বা গ্রীষ্মাদি প্রযুক্ত ক্লেশকে আধিদৈবিক, এবং হিংস্রজন্তু প্রভৃতি প্রাণ্যন্তর জাত দুঃখকে আধিভৌতিক বলাযায়। কেহ কেহ তাপ সমূহকে কায়িক, বাচিকও মানসিক ভেদেও ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন। এই দুঃখ সমূহের কোনও একটী উপস্থিত হইলে তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা সকলেরই সহজতঃ জন্মে; কিন্তু অনেকে উপস্থিত দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিতেই নিশ্চেষ্ট থাকেন, ভবিষ্যতেও যাহাতে ক্লেশের উৎপত্তি না হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ে উৎকট বাসনা চেষ্টা করিতে অবসর দেয়না। একদা তাপ ত্রয় পরাহত বিবেকযুক্ত কতিপয় বিশ্বাসী শিষ্য, বেদাদি অধীত শাস্ত্র সমূহ হইতে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ বলিয়া অবধারণ করেন, পরে তাঁহারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পথ জিজ্ঞাসু হইয়া, পরম কারুণিক সংসার বিরক্ত তত্ত্বজ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন মহামুনি কণাদের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করয়াতে, মুনি উক্তশিষ্য মণ্ডলীর পরিজ্ঞানের জন্য এই দর্শন

প্রণয়ন করিলেন। এই গ্রন্থে প্রথমাধ্যায়ে সাধারণতঃ পদার্থ সমূহের নির্ব্বাচন, দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্রব্যের নিরূপণ, তৃতীয়াধ্যায়ে যুক্ত্যাদিদ্বারা আত্মার ও মনের স্বরূপ নিরূপণ, চতুর্থাধ্যায়ে শরীর ও তদুপযোগি-পদার্থের বিচার পূর্ব্বক নির্দ্দেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্মের প্রতিপাদন, ষষ্ঠাধ্যায়ে শ্রৌত ধর্ম্মের বিচার, সপ্তমাধ্যায়ে গুণ ও সমবায়ের প্রতি-পাদন, অষ্টমাধ্যায়ে জ্ঞানোৎপত্তি ও তাহার কারণাদির নিরূপণ, নবমাধ্যায়ে বুদ্ধির প্রকার বিশেষের প্রতিপাদন, এবং দশমাধ্যায়ে সুখ দুঃখাদিরূপ আত্মগুণের ভেদ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যদ্যপি এই গ্রন্থে পদার্থ নিরূপণেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়, তথাপি ধর্ম্মই পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানের মূলীভূত কারণ; সুতরাং ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ইহা বিবে-চনা করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে অগ্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন॥

অথাহতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥

পদব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, শিষ্যজিজ্ঞাসা করিবার পর। অতঃ—একারণ, অসূয়াদি দোষ রহিত শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম শিষ্যগণ উপদেশ প্রার্থী হইয়াছে এজন্য। ধর্ম্মং—ধর্ম্মকে। ব্যাখ্যাস্যামঃ—ব্যাখ্যা করিব, লক্ষণ ও স্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরূপণ করিব।

অনুবাদ। অসূয়াদি দোষ রহিত শিষ্যগণ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসু হওয়ায়, তাহাদের জিজ্ঞা-সার পরে মহর্ষি বলিতেছেন তিনি ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

তাৎপর্য্যার্থঃ। জিজ্ঞাসা ব্যতীত ধর্ম্ম নিরূপণ করিলে, তাহা নিষ্প্রয়োজনীয় বিধায় অর্থান্তর অর্থাৎ অজিজ্ঞাসিতাভিধানরূপ নিগ্রহস্থান ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অন্যকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইতে হয়, একারণ অথ শব্দের দ্বারা শিষ্য জিজ্ঞাসার আনন্তর্য্য দেখাইয়াছেন, পরন্তু অথ এই শব্দের উচ্চারণটী ও মাঙ্গলিক, তাই তদ্দ্বারা মঙ্গল সূচনা করিয়া, গ্রন্থারম্ভ সময়ে বিঘ্ননাশের নিমিত্ত শিষ্টেরা যে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে শিষ্যের জিজ্ঞাসাথাকাতেই ধর্ম্ম ব্যাখ্যানের প্রয়ো-জনীয়তা রহিয়াছে; তবে অতঃ এই শব্দ দ্বারা হেতু দেখানের প্রয়োজন কি? যদ্যপি এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তথাপি যাহাদের শ্রবণাদিতে পটুতা বা গুরু বাক্যাদিতে বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ নাই, তাহাদের নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপযোগি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করার কোনও ফল নাই, এনিমিত্ত গুণবান্ শিষ্যদিগের গুরুর নিকট উপস্থিতিই ধর্ম্ম নিরূপণের হেতু হইয়াছে, পরন্তু অসূয়াদি দোষ শূন্য শ্রবণাদি বিষয়ে সক্ষম বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণই মুক্তির পথপ্রদর্শক ও এই শাস্ত্রে যথার্থ অধিকারী, ইহাও সূত্রের হেত্বংশ প্রদর্শন দ্বারা সূচিত হইতেছে।

যতোঽভ্যুদয় নিঃ শ্রেয়স সিদ্ধিঃ সধর্ম্মঃ ॥২॥

পদব্যাখ্যা। যতঃ—যাহা হইতে। অভ্যুদয়—সুখ, স্বর্গাদিসুখ। নিঃশ্রেয়স—মুক্তি, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি। সিদ্ধিঃ উৎপত্তি। স সেই। ধর্ম্মঃ ধর্ম্মপদের প্রতিপাদ্য।

অনুবাদ। যাহা হইতে স্বর্গাদি সুখ জন্মে এবং যাহা হইতে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিরূপ মুক্তি উৎপত্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে।

তৎপর্য্যার্থঃ। পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্ম নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, ধর্ম্ম যদি কোনও অকিঞ্চিৎ কর পদার্থ হয়, তবে তাহার নিরূপণে প্রয়োজন কি? তন্নিবন্ধনই সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থের অসাধারণ কারণ রূপে ধর্ম্মের লক্ষণ করিয়াছেন। এতদ্দারা ধর্ম্মের অতি প্রয়োজনীয়তা দেখান হইয়াছে, নতুবা ধর্ম্ম এই পদের প্রতিপাদ্য যে সেই ধর্ম্ম এইরূপ ও লক্ষণ হইতে পারে। এস্থলে কোন্‌টী লক্ষ্য পদার্থ এরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেই প্রতীয়মান হইবে যে, শ্রুতিতে উক্ত আছে "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করিবে, সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্গাদি সুখের সাধক ধর্ম্ম, এবং "আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" মুক্তি উদ্দেশ্যে, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মনঃ পরিশুদ্ধ হইলে, প্রথমতঃ বেদ বাক্য হইতে আত্ম-বিষয়ক শ্রবণ করিবে, পরে বহুহেতু দ্বারা আত্মার অনুমান করিবে, অনন্তর একাগ্রচিত্ত হইয়া আত্মার পুনঃ পুনঃ চিন্তন রূপ নিদিধ্যাসন করিতে হইবে; তাহার পরে আত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিবে "আত্মজ্ঞাতযোনসপুনরাবর্ত্ততে" যে আত্মা সাক্ষাৎকার করিতে পারিবে, সে আর শরীর ধারণ করিবেনা মুক্ত হইবে। এই সকল শ্রুতিদ্বারা আত্মবিষয়ক শ্রবণ মননও নিদিধ্যাসনাদি এবং তাহার উপযোগি চিত্তেরপরিশোধক কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তি, এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই সমস্ত মুক্তির উপযোগি-ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। সূত্রে সধর্ম্ম এই তৎপদই স্বর্গ সাধক ও মুক্তি সাধক উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের লক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। এস্থলে ইহা বিবেচনীয় হইতেছে যে, সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তি এই দুইটী পদার্থই আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন, কেননা সুখের জ্ঞান হইলেই সুখের উৎপত্তি হউক, এবং দুঃখের জ্ঞান হইলেই দুঃখ না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে; অন্য যে কোন বিষয়েই ইচ্ছা হয়, তাহা সুখ কিম্বা দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া হইয়া থাকে; একারণ সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া থাকে; এজন্য সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলে। পুরুষার্থ পদে পুরুষের স্বতঃ প্রয়োজন অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছা সহজতঃ জন্মে, বস্তুতঃ অন্য কোন ইচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয় যাহা হয় তাহাকে বুঝায়। এই স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম, এতাদৃশ সাধারণ লক্ষণ অভিপ্রায় করিয়া গ্রন্থকার "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ" এই অংশ দ্বারা ধর্ম্মে স্বর্গাদি সুখ সাধকত্ব এবং মুক্তিরূপ দুঃখ নিবৃত্তির সাধকত্ব দেখাইয়াছেন, নতুবা যাহাতে সুখ হয় এই লক্ষণ মুক্তির উপযোগি ধর্ম্মকে বুঝায়না; কিম্বা যাহাতে মুক্তি হয় এলক্ষণও যাগাদি ধর্ম্মের বোধক হয়না। স্বর্গও মুক্তি এই

উভয়ের জনক একটী পদার্থ নাই, এজন্য উভয়ের জনক বলিয়া লক্ষণ সঙ্গত না সুতরাং ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ না বলা নিবন্ধন গ্রন্থকারের ন্যূনতা হয়। স্বতঃ প্রয়োজনের অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম; এই সামান্য লক্ষণে অসাধারণ কারণ বলিতে; বলবদনিষ্টের অজনক বেদবিধি বিহিত কারণ বুঝাইতেছে, অন্যথা পরপীড়ন পরস্ত্রী সম্ভোগাদি অসৎ কার্য্যও ক্ষণিক সুখের সাধক হইয়াছে বলিয়া, তাহাতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি অর্থাৎ অলক্ষ্যে লক্ষণ গমনরূপ দোষ হইতে পারে, এবং "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বিহিত অভিচারানুকূল শ্যেন নামক যাগাদিতেও অতিব্যাপ্তি হয়, উক্ত বিশেষণ দেওয়াতে পরপীড়নাদি অসৎ কার্য্য শ্রুতি বিহিত নয়, এবং শ্যেন যজ্ঞাদি, বলবদনিষ্টের অজনক নয়, এনিমিত্ত তাদৃশ অতিব্যাপ্তিরূপ দোষ নাই; অতএব জৈমিনি মীমাংসা দর্শনে "চোদনা লক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন। চোদনা শব্দে প্রবর্ত্তক বাক্য অর্থাৎ প্রবৃত্তির জনক বেদস্থ বিধি বাক্যকে বুঝায়, তাদৃশ প্রবর্ত্তক বাক্য হইতে লক্ষিত যে অর্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদি তাহাই ধর্ম্ম শব্দ প্রতিপাদ্য। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কার রচয়িতা শঙ্কর মিশ্র "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ" এই স্থলে প্রকারান্তরে ও অর্থ দেখাইয়াছেন। অভ্যুদয় শব্দের অর্থ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় অর্থাৎ যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎসহকারে মুক্তি জন্মায়, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। এই মতে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যদিগের জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে, এজন্য তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগি-নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মই এস্থলে লক্ষ্য; সুতরাং লক্ষণ দ্বারা তাহারই প্রতিপাদন করিতেছেন, এইরূপ সমাধান বুঝিতে হইবে। এপর্য্যন্ত লক্ষণাদি দ্বারা পুরুষের অনুষ্ঠেয় পদার্থকেই ধর্ম্ম বলা হইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বলিতে হইবে যে, যজ্ঞাদিরূপ বিহিত ক্রিয়া সাধ্য অদৃষ্ট রূপ পুরুষের গুণ বিশেষের নাম ধর্ম্ম। "চিরধ্বস্তং ফলায়ালং ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা" দীর্ঘকাল নষ্ট হইয়া যায় যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম, সে অতিশয় অর্থাৎ স্বজনিত অদৃষ্টরূপ ব্যাপার ব্যতীত ফল সাধনে সমর্থ হয়না, উদয়নাচার্য্য প্রণীত কুসুমাঞ্জলির এই কারিকাংশ দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, যজ্ঞাদি কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল পরে তাহার ফল ভোগ হয়, এই ফলটী কে সম্পাদন করিবে? কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ নাথাকিলে কখনও কার্য্য জন্মেনা, এনিমিত্ত যাগাদি ক্রিয়াও স্বর্গাদি সুখ এই দুয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল স্থায়ী অদৃষ্টরূপ পুরুষের গুণ বিশেষ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অতএব "বিহিত ক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসোগুণোমত" শাস্ত্রে বলিয়াছেন বিহিত ক্রিয়া হইতে জন্মে যে পুরুষের গুণ বিশেষ তাহাই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক ধর্ম্মে প্রমাণ কি; অদৃষ্ট পদার্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু অনুমান ও শব্দ এই দ্বিবিধ প্রমাণ বলতই ধর্ম্মের সত্তা উপলব্ধি হইতেছে। দেখা যায় কোন ব্যক্তি স্বয়ং উপভোগ করিবার জন্য বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও নিজ অভীপ্সিত

বস্তুর সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু পরক্ষণেই রোগাদিপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে সেই সংগৃহীত বস্তু তাহার ব্যবহারে আসেনা, অন্য ব্যক্তি তাহা ভোগ করে। ভোগ্য পদার্থে এইরূপে পুরুষ বিশেষের উপভোগ দেখিয়া অনুমান করা যাইতেছে যে, ইহার প্রতি কোন বিশেষ কারণ আছে, জগদীশ্বরই কারণ এমত বলিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি পুরুষ দিগের নিজ নিজ কর্ম্ম জনিত অদৃষ্টরূপ ফলানুসারেই তাহাদের ভোগাদি বিধান করিতেছেন; নচেৎ সাক্ষী স্বরূপ ঈশ্বরের পুরুষ ভেদে ব্যবস্থার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া বিকার কল্পনা করিতে হয়। ধর্ম্মে আগমও বলবৎ প্রমাণ, "স্বর্গ কামোযজেত" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যে বিধি প্রত্যয়ের পূর্ব্বার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে যাগ জনিত অদৃষ্টই স্বর্গাদি ফলে সাধক ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং ॥৩॥

পদব্যাখ্যা। তদ্—ঈশ্বর। বচনাত্—বাক্যহেতুক। আম্নায়স্য—বেদের। প্রামাণ্যং—প্রমাজ্ঞানজনকত্ব অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানজন্মান।

অনুবাদ। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, সুতরাং আপ্তবাক্য অর্থাৎ ভ্রম রহিতপুরুষের বাক্য বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে।

তাৎপর্য্যার্থঃ। তদ্ এই শব্দ দ্বারা প্রায়শঃ পূর্ব্বোপক্রান্ত বস্তুরই প্রতীতি জন্মে; কিন্তু তাৎপর্য্য বশতঃ স্থলবিশেষে প্রসিদ্ধার্থও বুঝাইয়া থাকে। "তদপ্রামাণ্যমনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্তদোষেভ্যঃ" এই গৌতম সূত্রে অনুপক্রান্ত বেদকে বুঝাইয়াছে। এস্থলেও প্রসিদ্ধার্থক তদ্ শব্দদ্বারা ঈশ্বরই প্রতীত হইতেছেন, অথবা "ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো-ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ওঁ, তৎ এবং সৎ এই তিনটী শব্দই ঈশ্বরের সংজ্ঞা, সুতরাং তদ্বচনাত্ এই স্থলে তৎ পদদ্বারা ঈশ্বরকে বুঝিবার কোনও বাধা নাই।

পূর্ব্ব সূত্রে ধর্ম্মের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে, ধর্ম্ম যে স্বর্গাদির সাধক হয় কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া তৎ সহকারে মুক্তি জন্মায়, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ ইহা অবশ্য বলিতে হইবে; কিন্তু বেদ প্রমাণ কিনা? "তদ প্রামান্য মনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষেভ্যঃ" অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা বিহিতের নিন্দাপূর্ব্বক নিরাসরূপ ব্যাঘাত এবং কথিতের পুনর্ব্বার কথনরূপ পুনরুক্ত এই সমস্ত দোষ বেদে দেখা যায়, একারণ বেদের প্রামাণ্য নাই। বেদে বিহিত আছে "পুত্রকামঃ পুত্রেষ্ট্যা যজেত" সন্তান কামনায় পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিবে, কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায় ঐ যজ্ঞ করিয়াও সন্ততি লাভ হয় না, সুতরাং শ্রুতিতে মিথ্যাত্ব রূপ দোষ আছে। "উদিতেহোতব্যং" সূর্য্যের উদয় হইলে হোম করিবে। "অনুদিতে হোতব্যং" সূর্য্যের উদয় না হইতে হোম করিবে। "সময়া ধ্যুষিতে হোতব্যং" সূর্য্য উদয়ের আরম্ভ যখন নক্ষত্র দেখা না যায়, এমত সময়ে হোম করিবে। এরূপ বিধান থাকা সত্বে পুনর্ব্বার তাহার নিন্দাকথন হইতেছে "শ্যাবোস্যাহুতিমভ্য ব

হরতি ষট্‌উদিতে জুহোতি" যে উদয় কালে হোম করে, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। "শবলোঽস্যাহুতিমভ্যবহরতি যোঽনুদিতে জুহোতি" যে অনুদয় কালে হোম করে, নানাবর্ণে মিশ্রিত বর্ণের কুক্কুর বিশেষ তাহার আহুতি হরণ করে। "শ্যাব শবলাবস্যাহুতি মভ্যব হরতো যঃ সময়া ধ্যুষিতে জুহোতি" যে সময়াধ্যুষিতে হোম করে, শ্যাব ও শবল তাহার আহুতি হরণ করে, ইহা দ্বারা শ্রুতিতে ব্যাঘাত দোষ প্রতীত হইতেছে, এবং "ত্রিঃ প্রথমা মন্বাহ ত্রিরুত্তমাং মন্বাহ" এই শ্রুতি বাক্যে সামধেনী নামক একাদশ সংখ্যক ঋকের প্রথমটীর ও শেষের মন্ত্রটীর বারত্রয় উচ্চারণ করা বুঝাইতেছে, একটী মন্ত্রের নিরর্থক তিনবার পাঠ করিতে বলায় অবশ্য পুনরুক্ত দোষ বলিতে হইবে, সুতরাং বেদের প্রামাণ্য নাই। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য, "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এই সূত্রের অবতারণা হইয়াছে, ইহা দ্বারা ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া বেদের প্রামাণ্য, সাধারণতঃ এই মাত্র প্রতীত হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও আশঙ্কা এই যে, বেদ ঈশ্বর প্রণীত কিম্বা অন্য পুরুষ তাহার রচয়িতা। ঈশ্বরই বেদ রচনা করিয়াছেন এমত কোনও নিশ্চয়তা নাই, তদুত্তরে বলিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদ বেদান্তর্গত, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ বলিয়া আধুনিক যে সকল গ্রন্থের ব্যবহার হয়, তাহা ঐ বেদান্তর্গত আয়ুর্ব্বেদ মূলক, যেরূপ শ্রুতি মূলক স্মৃত্যাদি শাস্ত্র হইয়াছে, ঐ আয়ুর্ব্বেদ যে প্রমাণ তাহা উহার ব্যবহারেতেই জানা যায় এবং আয়ুর্ব্বেদের রচয়িতা যে তদুক্ত পদার্থে যথার্থ জ্ঞানী, তাহা উহার প্রামাণ্যই অনুমান করাইয়া দিতেছে। এইক্ষণ অনুমান করিব বেদ স্বপ্রতিপাদিত বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চরিত, যেহেতু তাহাতে বেদত্ব আছে, যে প্রকার আয়ুর্ব্বেদে বেদত্ব আছে, উহা বাস্তবিক যথার্থ জ্ঞান যুক্ত পুরুষোচ্চারিত ও বটে। বেদে নিখিল বিষয় বর্ণিত আছে, সুতরাং বেদ কারের নিখিল বিষয়ে যথার্থজ্ঞান থাকা নিবন্ধন অভ্রান্ততা নিশ্চয় হইতেছে। এইক্ষণ ভ্রম রহিত পুরুষ প্রণীত বলিয়া সমস্ত বেদের প্রামাণ্য অনুমিত হওয়ার বাধা নাই, এবং তাদৃশ অভ্রান্ততা মনুষ্যাদির মধ্যে থাকা সম্ভব নাই বিধায় ঈশ্বরই বেদের বক্তা ইহাও নিশ্চয় হইতেছে। এই স্থলে যদি এমত আপত্তি উপস্থিত হয় যে, আজ কালও অনেকে অনেক প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, তবে কি বেদ মূলীয় অনুমান রীতিতে রচয়িতাকে অভ্রান্ত বলিতে হইবে, তাহাতে বক্তব্য এই যে প্রামাণিক গ্রন্থের রচয়িতা তাহার গ্রন্থোক্ত বিষয় গুলিতে অবশ্য অভ্রান্ত, তবে কিনা আধুনিক রচয়িতা যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, কিম্বা প্রামাণিক গ্রন্থান্তর হইতে উপদেশ পাইয়াছেন, তদ্বিষয়েই তাহার ভ্রমজ্ঞান নাই; অন্য বিষয়ে যে তাহার ভ্রম আছে তাহা প্রত্যক্ষাদি বলতঃ নিশ্চয় জানা যায়, কিন্তু বেদকারের আয়ুর্ব্বেদাংশে যথার্থ জ্ঞান থাকিয়া, অন্য অংশে যে ভ্রমজ্ঞান রহিয়াছে ইহার কোনও জ্ঞাপক নাই। পূর্ব্বোক্ত অনৃত ব্যাঘাত পুনরুক্ত দোষ থাকাতেই বেদকারের ভ্রম সূচিত হইতেছে, এমত বলা

যায় না, কারণ উক্ত স্থল সমূহে বাস্তবিক অনৃতাদি দোষ নাই। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিলেও যেখানে পুত্রোৎপত্তি দেখা যায় না, সেই স্থলে জন্মান্তরে ফল হইবে এমত কল্পনা করা হয়; বিশেষতঃ, সর্ব্বত্রই যে যজ্ঞাদি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা নহে। এমতস্থলে কার্য্য বৈগুণ্যও কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু একমাত্র যজ্ঞফলই পুত্রসম্পাদন করেনা; সহকারিকারণেরও প্রয়োজন আছে; পুরুষের যথা-সময়ে স্ত্রী সহবাসাদি না করাও সন্তান না হওয়ার কারণ হইতে পারে। "উদিতে হোতব্যং" ইত্যাদি বিধানানুসারে সঙ্কল্প করিয়া অনুদিত কালে বিহিত যে হোম, তাহা উদিত কালে করিলে, কিম্বা উদিত কালে যে হোম, তাহা অনুদিত কালে করিলে, অথবা সময়াধ্যুষিত কালের হোম উদিত বা অনুদিত কালে করিলে তাহারই দোষ; "শ্যাবোহস্যাহুতি মভ্যবহরতি য উদিতে জুহোতি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যদ্বারা দেখাইয়াছেন। "ত্রিঃ প্রথমামন্বাহ ত্রিরুত্তমা মন্বাহ" এইস্থলে একাদশ সংখ্যক সামধেনী ঋকের প্রথমোক্তটীরও শেষোক্তের বারত্রয় পাঠকরিতে বলার প্রয়োজন আছে; নিষ্প্রয়োজন স্থলেই বাস্তবিক কথিতের কথনে পুনরুক্ত দোষহয়। "ইমমহংভ্রাতৃব্যং পঞ্চদশাবরেণ বাগ্বজ্রেণবাধে যোহস্মান্ দ্বেষ্টিযঞ্চবয়ং দ্বিষ্মঃ" পঞ্চদশ সামধেনী রূপ বজ্রদ্বারা এই ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাধা-করিতেছি; যে আমাদিগের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহাকে দ্বেষকরি, এই মন্ত্রে পঞ্চদশ সামধেনীকে বজ্র বলিতেছে। একাদশ সংখ্যক সামধেনীর প্রথম মন্ত্রটীর তিনবার ও শেষটীর তিনবার, পাঠহইলে একত্রে ছয় হইল; তাহা মধ্যবর্ত্তী অপর নয়টীর সহিত যোগকরিলেই পঞ্চদশ সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, এই প্রয়োজনেই ত্রিঃপ্রথমামিত্যাদি বাক্য বলাহইয়াছে। এই প্রকারে বেদের নির্দ্দোষত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য, কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির অভিঘাত শব্দের অভিব্যঞ্জক মাত্র। একপ্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে, চিরদিন তাহাদ্বারা একবিধ অর্থই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। "বৃক্ষ এই শব্দটী দ্বারা আজ তরুকে বুঝাইতেছে, ইহার পূর্ব্বেও তাহাকেই বুঝাইয়াছে, ভবিষ্যতেও তাহাকে বুঝাইবে। শব্দের সহিত অর্থের এতাদৃশ নিত্য সম্বন্ধ থাকায় শব্দ যে নিত্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতে বাধা নাই। শব্দ যদি নিত্য হইল, শব্দাত্মক বেদ, সুতরাং নিত্য, এই মতানুযায়ী পণ্ডিতগণ নিত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপন করিয়া থাকেন। "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যং" এইসূত্রে তৎ পদদ্বারা সন্নিহিত পূর্ব্বোপক্রান্ত ধর্ম্মকেই বুঝাইতেছে, তাহাতে অর্থ হইতেছে যে, ধর্ম্মকে প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া বেদের প্রামাণ্য আছে। যে বাক্য প্রামাণিক অর্থকে প্রতিপাদন করে, সেই বাক্য অবশ্যই প্রমাণ। ধর্ম্ম যে প্রামাণিক পদার্থ তাহা অনুমানগম্য; স্থল বিশেষে সৎকার্য্যের ফলপ্রত্যক্ষ দেখাযায়। এতাদৃশ ভাবেও মতের ব্যাখ্যা কেহকেহ করিয়া থাকেন।

সামবেদ

ইন্দ্র স্তুতি।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিবয়েমিরে ॥১
ইন্দ্রং বিশ্বা অবীবৃধৎং সমুদ্রব্যচসঙ্গিরঃ।
রথীতমং রথীনাং বাজানাং সৎপতিম্পতিম্ ॥২
ইমমিন্দ্র সুতম্পিব জ্যেষ্ঠমমর্ত্ত্যং মদম্।
শুক্রস্য ত্বা ভ্যক্ষরন্ ধারা ঋতস্য সাদনে ॥৩
যদিন্দ্র চিত্রম ইহ নাস্তিত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়া হস্ত্যাভর ॥৪॥
শ্রুধী হবন্তিরশ্চ্যা ইন্দ্রয় স্ত্বাস পর্য্যতি।
সুবীর্য্যস্য গোমতো রায় স্পূর্দ্ধি মহাং অসি ॥৫
অসাবি সোম ইন্দ্রতে শবিষ্ট ধৃষ্ণ বাগহি।
আত্বাপৃণক্তিন্দ্রিয়ং রজঃ সূর্য্যোন রশ্মিভিঃ ॥৬
এন্দ্রয়াহি হরি ভিরুপণ্বকস্য সুষ্টুতিম্।
দিবো অমুষ্য শাসতো দিবং যযদিবাবসো ॥৭
আত্বা গিরো রথী রিবাস্থুঃ সুতেষু গির্বণঃ।
অভিত্বা সমনূষত গাবোবৎ সম্নধেনবঃ ॥৮
এতোম্বিন্দ্রং স্তবামশুদ্ধং শুদ্ধেন সাম্না।
শুদ্ধৈরুক্থৈ র্বাবৃধ্বাং সংশুদ্ধৈ রাশী র্বাম্মমত্তু ॥৯
যোরয়িং বোরয়িন্ত মোয়োদ্যুম্নৈর্দ্যুম্নবত্তমঃ।
সোমঃ সুতঃস ইন্দ্রতেহস্তিস্ব ধাপতেমদঃ ॥১০

হে শতোক্রতো (বহুপ্রজ্ঞ)! সাম-গায়ক বা উদ্গাতাগণ তোমার মহিমা গান করেন, হোতাগণ পূজনীয় তোমাকে অর্চ্চনা করেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি অন্য যাজ্ঞিকগণ তোমার স্তুতি দ্বারা তোমাকে উন্নত বা গৌরবান্বিত করেন। সুপুত্রেরা যেরূপ স্বীয় স্বীয় বংশ উন্নত করেন, তাঁহারাও তোমাকে তদ্রূপ উন্নত করেন। (১)

টীকা। বংশ বলিতে এস্থলে বংশ বাঁশও বুঝাইতে পারে। যাদুকরেরা যেরূপ ক্রীড়াকালে বংশ দণ্ড উন্নত করে, তাঁহারা তদ্রূপ তোমাকে উন্নত করেন; এরূপ অর্থও হইতে পারে।

শতক্রতু বলিতে যিনি শতযজ্ঞ করিয়াছেন, অনেক কার্য্য করিয়াছেন বা বহুপ্রজ্ঞ, এই কয় অর্থই হয়। উৎযেমিরে—উন্নত করেন।

ইন্দ্র আমাদের স্তুতি, গিরঃ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিতেছে অর্থাৎ গৌরবান্বিত করিতেছে। ইন্দ্র কীদৃশ—সমুদ্র ব্যচসং অর্থাৎ যাহার প্রভা সমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, সমস্তরথী বা যোদ্ধা দিগের মধ্যে যিনি প্রধান রথী, যিনি অন্নের (বাজানাম্) অধিপতি, আর যিনি সৎপতি অর্থাৎ সন্মার্গবর্ত্তীদিগের পালক। (২)

হে ইন্দ্র! তুমি অভিযুত (সুতং), অতিশয় শ্রেষ্ঠ (জ্যেষ্ঠ), অমারক (অমর্ত্ত্যং), মদকর (মদং) সোমরস পানকর। যজ্ঞ (ঋতাস্য) গৃহে দীপ্তমান (শুক্রস্য) সোমের ধারা তোমার অভিমুখে সঞ্চালন করিতেছে (স্বামত্যক্ষরণ)। (৩)

হে বজ্রধারি (অদ্রিব) বিচিত্র ইন্দ্র! যে ধন (রাধঃ) আমাদের নাই, তাহা তোমার দাতব্য। হে বিদদ্বসো! লব্ধধন উভয় হস্তের দ্বারা আমাদিগকে বিতরণ কর। (৪)

হে ইন্দ্র! যে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছে (সপর্য্যতি), সেই অঙ্গিরস্ বংশীয় তিরশ্চী ঋষির স্তুতি (হবং) শ্রবণ কর (শ্রুধি)। আমাদিগকে বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান কর, আমাদিগকে গবাদি পশু দান কর, এবং ধন দ্বারা (রায়) পূর্ণ কর (পূর্দ্ধি); যেহেতু তুমি মহান্। ৫

হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিযুত হইয়াছিল, হে বলবান্ ধর্ষয়িতা ইন্দ্র! (শবিষ্ঠ, ধৃষ্ণো) তুমি যজ্ঞ স্থানে আগমন কর (আগহি)। সূর্য্য যেরূপ কিরণ দ্বারা অন্তরীক্ষ (রজঃ) পূর্ণ করেন, সোমরসোৎপন্ন সামর্থ্য তোমাকে তদ্রূপ পূর্ণ করুক্। ৬

হে ইন্দ্র! কণ্বের সুন্দর স্তুতির দিকে রশ্মিরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া আগমন কর, হে দিবাবসো! (দিন হইয়াছে বসু বা ধন যাহার) তুমি স্বর্গ লোকের শাসন কর্ত্তা, সেস্থানে আমার সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ৭

হে গির্বণ! (বাক্য দ্বারা স্তবনীয়) সোমরস অভিষুত হইলে আমাদের স্তুতি বাক্য রথীর ন্যায় ক্ষিপ্র গমন করিয়া তোমাকে আশ্রয় করুক্, ধেনু সকল বৎস লক্ষ্য করিয়া শব্দ করে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যেন সেইরূপ শব্দ করে (সমনূষত)। ৮

হে ইন্দ্র! আমারা বিশুদ্ধ সামের দ্বারা বিশুদ্ধ ইন্দ্রের স্তবকরি, বর্দ্ধমান সেই ইন্দ্রকে বিশুদ্ধ উক্থ দ্বারা স্তব করি। আশীর্বান্ অর্থাৎ গব্যাদি দ্বারা সংস্কৃত, সোমরস ইন্দ্রকে মত্ত করুক্। ৯

যে ধন সকল ধনের শ্রেষ্ঠ, (রয়ি) যাহা অতিশয় যশস্বী, হে অন্নপতে! সেই সোমরস রূপ ধন তোমার মদকর হউক্। ১০

জরাসন্ধ বধ।

বিষ্ণুপুরাণ মতে বৃহদ্রথের পুত্র শকলদ্বয় বা খণ্ডদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন, জরাকর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়া জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণ ৪।১৯।১৯। বিষ্ণু পুরাণে আরও লিখিত আছে, কংশরাজ জরাসন্ধের অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুহিতাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ করেন, এবং গিরিব্রজ-পতি জরাসন্ধ জামাতৃ হন্তার বধ কামনায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা পুরী অষ্টাদশ বার অবরোধ করেন, অবশেষে জরাসন্ধ ভয়ে শ্রীহরি মথুরা হইতে পলায়ন করিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ২২ অধ্যায়। মহাভারতে জরাসন্ধের উপাখ্যান বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। মগধরাজ বৃহদ্রথের পুত্রকামনায় কাক্ষিবান পুত্র মহর্ষি চণ্ড কৌশিকের আরাধনা করিয়া একটী আম্রফল প্রাপ্ত হয়েন। বৃহদ্রথের মহিষীদ্বয় আম্রফল দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভক্ষণ করেন, এবং গর্ভবতী হইয়া যথা কালে মহিষীদ্বয় একজনে শিশুর বামাঙ্গ এবং অপরে দক্ষিণাঙ্গ প্রসব করিলেন। ধাত্রী খণ্ডিত গর্ভদ্বয় চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিল। জরানাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক খণ্ডদ্বয় শরীর যথাযথ সংযোজিত হইয়া শিশু মূর্ত্তি ধারণ করিল। সভাপর্ব্ব ১৩ অধ্যায়।

রাজা পুত্রের নাম জরাসন্ধ রাখিলেন, এবং কুমার জরাসন্ধকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বনে গমন করিলেন। হংস ও ডিম্বক জরাসন্ধের সহায় হইল। সভাপর্ব্ব ১৭ অধ্যায়। কংশ জরাসন্ধ দুহিতা অস্তি ও প্রাপ্তির পাণি গ্রহণ করেন, এবং জরাসন্ধের সাহায্যে কংশ স্বীয় পিতৃদেব উগ্রসেনকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া মথুরার সিংহাসন আরোহণ করেন। কংশরাজের দৌরাত্মে ভোজবংশীয়গণ শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইলেন; এবং শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরকে আহুকের কন্যা সম্প্রদান করিয়া ও বলভদ্রকে সহায় করিয়া সুনামা কংশ রাজকে নিধন করিলেন। বিধবা কংশপত্নীদ্বয় পিতার শরণ লইল। জরাসন্ধ জামাতৃ ঘাতকের বধ কামনায় বারম্বার মথুরা অবরোধ করিতে লাগিলেন। সপ্তদশতম আক্রমণ কালে জরাসন্ধের পার্শ্বরক্ষক হংস ও ডিম্বক নিহত হইল। অষ্টাদশতম অবরোধ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া রৈবত শৈল সহ কুশস্থলী নগরীতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু জরাসন্ধ তাঁহার অনুসন্ধানে তথায় উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ গোমন্ত পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধ গোমন্তপর্ব্বত অবরোধ করিলে, শ্রীহরি সাগর মধ্যস্থ দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিলেন, এবং ইন্দ্রপ্রস্থ-পতি যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মহারাজ খ্যাতি লাভের বাসনা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারাবতী হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, জরাসন্ধ

কারাগারে ভূরি ভূরি রাজগণ কারাবরুদ্ধ আছে, তাহাদিগের মুক্তি না হইলে, রাজসূয়যজ্ঞ নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সভাপর্ব্ব ১৬ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, শিবমন্দিরে বলি প্রদানার্থে জরাসন্ধ ৮৬জন ভূপতি দুর্গে আবদ্ধ রাখিয়াছে; আর ১৪জন ভূপতি জয় করিয়া বন্দি করিতে পারিলেই জরাসন্ধ স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবে। সভাপর্ব্ব ১৪ অধ্যায়।

অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের মত সমর্থন করিলে ভীমার্জ্জুন সহ শ্রীকৃষ্ণ কুশাম্ব দেশের বক্ষঃস্থল রূপ মগধরাজ্যে উপনীত হইয়া, গোরথ পর্ব্বতের অধিত্যকাস্থ গিরিব্রজ দুর্গ দর্শন করিলেন। সভাপর্ব্ব। ১৮। ১৯ অধ্যায়।

তাঁহারা তিনজনে পঞ্চশৈলে রক্ষিত গিরিব্রজ পুরী চৈত্যাঙ্ক শৈলশৃঙ্গ ভেদ করিয়া, তথায় প্রবেশ পূর্ব্বক যজ্ঞস্থ জরাসন্ধ সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন; জরাসন্ধ সাদরসম্ভাষণ করিলেন, ভীমার্জ্জুন মৌন রহিলেন। অর্দ্ধরাত্রে জরাসন্ধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্রয়কে সৎকার গ্রহণে পরাঙ্মুখতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন শত্রুর পরিচর্য্যা গ্রহণীয় নহে। সভাপর্ব্ব ২০ অধ্যায়।

পরে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিলেন, মহাদেবের মন্দিরে শতরাজ বলি দিয়া ক্ষত্রিয় বংশ ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ; তোমার বিনাশ কামনায় আমরা ক্ষত্রিয়ত্রয় তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। মহাবীর জরাসন্ধ অযোগ্য বোধে কৃষ্ণার্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া, ভীমের সহিত যুদ্ধ স্বীকার করিল, মল্লযুদ্ধে উভয়ই সমকক্ষ হইল। মহাবীর ভীম শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ প্রার্থী হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন প্রভঞ্জন হইতে প্রাপ্ত দৈববল বিস্তার কর। সাঙ্কেতিক বাক্যের মর্ম্মবোধে ভীম জরাসন্ধ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিলেন। সভাপর্ব্ব ২১। ২২। ২৩ অধ্যায়।

মহাভারতে লিখিত এই উপাখ্যানটীর সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত জরাসন্ধ-বধ উপাখ্যান তুলনা করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, বৃহদ্রথের অন্য ভার্য্যা দুই অণ্ড সন্তান প্রসব করেন। জননী সন্তান দ্বিখণ্ডিত দেখিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করেন, জরারাক্ষসী "জীব জীব" বলিয়া ক্রিড়া করিতে২ শকলদ্বয় যথাযথ সংযোজনা করিলে, বালক সর্ব্বঅবয়ব প্রাপ্ত হইয়া সজীব হইল, এবং জরাসন্ধ নাম গ্রহণ করিল। ৯মস্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

ব্রজে বকাসুরের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে কংশরাজ সারথী অক্রুরকে বালক শ্রীকৃষ্ণের আনয়নার্থে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন, এবং বালক শ্রীকৃষ্ণের মথুরার রাজসভায় উপনীত হইয়া, কুবলয় পীড় হস্তী এবং অন্ধ্র বা চানুর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় পরাজিত করিয়া, অবশেষে কংশরাজের বিনাশ সাধন করিলেন। ১০ম স্কন্ধ ৪৪অধ্যায়।

জরাসন্ধের কারাগারে নিক্ষিপ্ত বিংশতি লক্ষ রাজন্যগণ মুক্তি কামনায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারাবতী নগরে দূত প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে ভীমার্জ্জুনকে [illegible]

মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ত্রয় জরাসন্ধের গৃহে আতিথ্য বেলায় প্রবেশ করিলেন ও ব্রাহ্মণ সেবা যাচ্ঞা করিলেন, এবং আতিথ্য গ্রহণ করিয়া অবসর মতে যুদ্ধ প্রার্থী হইলেন। যুদ্ধে ভীম ও জরাসন্ধের মধ্যে ইতর বিশেষ লক্ষিত হইলনা, শ্রীকৃষ্ণ একটী শাখা বিদারণ করিয়া, সঙ্কেত দ্বারা ভীমকে শত্রুর বধোপায় বলিয়া দিলেন। ভীম সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া জরাসন্ধের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া দেহ বিদারণ করিলেন। জরাসন্ধ সমরে নিপাতিত হইলে, ২০০০৮০০ কুড়ি লক্ষ আটশত রাজন্যগণ মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন। ১০ম স্কন্ধ ৭২। ৭৩ অধ্যায়।

হরিবংশ পাঠে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ-সমরে হংস পরাজিত হইয়া ভয়ে যমুনা-জলে দেহ বিসর্জ্জন করে, এবং ডিম্বক ভ্রাতার নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া, যমুনাজলে নিপতিত হইয়া ক্রোধ ভরে বারংবার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হওয়ায় যমুনা-বারি আন্দোলিত করিয়া তুলিলে, অবশেষে ডিম্বক সমূলে স্বীয় জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। ভবিষ্য পর্ব্ব ৩১৮। ৩১৯ অধ্যায়

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে জন্ম খণ্ডে বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ বর্ণিত আছে। পুরাণের এই উপাখ্যানটী হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। মহাভারতোক্ত রাজনৈতিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ, ও শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত রাখাল বালক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক কংশবধ মধ্যে অসামঞ্জস্য পরিত্যাগ করিলেও, এবং পুরাণের অপর অংশে সম্ভব যোগ্য হইলেও জরাসন্ধের জন্ম বৃত্তান্ত এবং জীবন লাভ বৃত্তান্ত ও জরাসন্ধের দেহ দ্বিধাকৃত বধবৃত্তান্ত কদাচ সম্ভব ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবেনা, এবং মহাভারতেরও শ্রীমদ্ভাগবতের লিখিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম বৃত্তান্ত প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লইলেও জীবন লাভ বৃত্তান্ত একান্ত অনৈসর্গিক ও অসম্ভব বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে; এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধে অজেয় মহাবীর জরাসন্ধের করোটি মেরুদণ্ড খণ্ড যোগ্য ছিল, ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন, কারণ নরদেহ তত্ত্বমতে সামান্য মানবের ও মেরুদণ্ড ও করোটি দ্বিধাযোগ্য হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, জরাসন্ধের গিরিব্রজ নগরে জরাসন্ধকে ভীমবধ করিলেন; কিন্তু জরাসন্ধের সৈন্যগণ বা আত্মীয়গণ ক্ষত্রিয়ত্রয়ের হিংসা না করিয়া পূজা করিল, ইহা সম্ভব পর নহে, ও একটী নগর মধ্যে বিংশতি লক্ষাধিক রাজন্য বন্দি থাকা একান্তই অসম্ভব। হংসের বিরহে ডিম্বকের দেহ ত্যাগ সন্দেহ হইলেও যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া আবার ডিম্বকের স্বীয় জিহ্বা উৎপাটনের কোন প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না।

সুতরাং জরাসন্ধের উপাখ্যানের অবশ্যই কোন গূঢ় মর্ম্ম আছে। বৃহৎরক্ষ ইন্দ্রদেব, এবং বেদে মেঘ ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। সূর্য্যতেজ জল জরাবৎ বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্য ভাবে আকাশে উত্থিত হয়, এবং ঐ বাষ্পকণার সকল সঙ্ঘ প্রাপ্ত বা সংযোজিত হইলে মেঘরূপ ধারণ করে। এই জন্য বেদে মেঘগণ জলদায়ী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, খগোলে প্রথমশ্রেণীর তারা ২০টী দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬৯টী, তৃতীয় শ্রেণীর ১৮২টী এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৫৩০টী তারা আছে। এতদ্ভিন্ন বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি এই পাঁচটী গ্রহ তারা বলিয়া খ্যাত, এবং রাহু-কেতু এই সহসপ্ত গ্রহ; সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তারাসমষ্টি এবং এই সপ্তগ্রহ একত্রিত করিলে ৮৬তারা হয়। ঐ ৮৬তারা এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর তারা সমষ্টি করিলে ৭৯৮সংখ্যক তারা হয়।

জ্যোতিষ পাঠে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, বিষুপ রেখার উত্তরে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত, এবং দক্ষিণে অয়ন পথের অর্দ্ধাংশ অবস্থিত। সূর্য্যরূপী বিষ্ণু মহাবিষুপ সংক্রান্তি অতিক্রম করিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে ঐ উত্তরাস্থ অয়ন পথার্দ্ধে ভ্রমণ কালে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬মাসে মেঘগণ সূর্য্যদেবকে বারংবার অবরোধ করিতে থাকে; ক্রমে বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব উত্তর পূর্ব্ব গমনে মহা-বিষুপ সংক্রান্তি হইতে মেষ, বৃষ ও মিথুন রাশি অতিক্রম করিয়া কর্কট রাশিতেপ্রবেশ করেন, এবং কর্কট ক্রান্তিতে উপনীত হন। এইরূপ উত্তরায়ন শেষ হয়, ও দক্ষিণয়ণ আরম্ভ হয়। সূর্য্যদেব ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্ব গমনে কর্কট রাশি অতিক্রম করিয়া সিংহরাশিতে প্রবেশ করেন, এবং পিতৃপতি দৈবত মঘানক্ষত্রের সহিত কিয়ৎ কালের জন্য মিলিত হন। তৎপরে সূর্য্যদেব অর্জ্জুনী নক্ষত্রের সহিত উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। সম্মুখে পঞ্চতারকাময় হস্তা নক্ষত্র, তৎপশ্চাতে চিত্রা-নক্ষত্রের অনতিদূরে জলবিষুপ সংক্রান্তি বিন্দু বা আশ্বিন সংক্রান্তি বিন্দু অয়ন রেখায় অবস্থিত, এবং চিত্রানক্ষত্রের অনতিদূরে পবন দৈবত স্বাতি তারা বিদ্যমান রহিয়াছে। বিষুপ রেখার উত্তর অয়ন পথে যে অর্দ্ধাংশ অবস্থিত আছে, ঐ অর্দ্ধাংশ অয়ন পথে গমনকালে অষ্টাদশ মেঘ, মহিষ, বরাহ, মাতঙ্গ, জীমূত, বলাকা, গর্দ্দভ, পুষ্কর, আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পর্জ্জন্য, ঐরাবত, পুণ্ডরিক, বামন, কুমুদ, পুষ্প, দন্ত, অঞ্জন, সর্ব্বভৌম সুপ্রতিক, একে ২ সকলে সূর্য্যরূপী বিষ্ণুকে অবরোধ করিতে থাকে। সকলেই অবগত আছেন শরতকালে মেঘ মালা উষাকালে উদিত হইলে, হংস জাতীয় বকশ্রেণী উড্ডীয়মান হইয়া মেঘমালা শোভিত করে, এবং বক সখা তড়িৎমালা হইতে ডিম্ব বা ভরধ্বনিবহির্গত হইতে থাকে, ক্রমে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বকশ্রেণী গিরিব্রজ বা মেঘপথ পরিত্যাগ করিয়া আকাশে নিমগ্ন হয়, এবং বকবিরহে বকসখা তড়িতমালা ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় জিহ্বারূপী বজ্রবর্ষণ করিয়া আকাশে তিরোহিত হয়। ঐ উষাকালে প্রভাত বায়ু প্রবল হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, মেঘ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মেঘরুদ্ধ তারকাবৃন্দ মেঘমুক্ত হইলেই সুপ্রকাশ হয়, সূর্য্যোদয়ে তারকাবৃন্দ বিলুপ্ত হয়, এবং আশ্বিনী সংক্রান্তি বা জল বিষুপ সংক্রান্তি অতীত হইলে, গিরিব্রজ বা মেঘপথ জরাসন্ধ বা মেঘ বিলুপ্ত হয়।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইন মতে রেজিষ্টীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষষ্ঠ খণ্ড, ১১দশ সংখ্যা।	ফাল্গুন।	১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

অথর্ব্ববেদ।

বাচস্পতি স্তোত্র।

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা-রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১
পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসাসেহ।
বসোষ্পতে নিরময় ময্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ২
ইহৈবাভিবিতনূভে আর্ত্নী ইবজ্যয়া।
বাচস্পতির্নিযচ্ছতু মজ্যেবাস্তু ময়িশ্রুতম্ ॥ ৩
উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বেয়তাম।
সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪

বঙ্গানুবাদ। যে সমুদয় অসংখ্য দেবতারা বিবিধ প্রকার রূপ ধারণ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতেছে, হে বাচস্পতে! তুমি অদ্য আমাকে তাহাদের বল ও শক্তি প্রদান কর। (১)

হে বাচস্পতে! তুমি পুনর্ব্বার দৈব মন সংযুক্ত হইয়া আগমন কর। হে বসোষ্পতে! তুমি এইস্থানে রমন কর, আমি যেন জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। (২)

টীকা। বাচস্পতি বাক্ বা বাক্যের অধিপতি। ত্রিসপ্ত বলিতে অসংখ্য বুঝায়। বিশ্বের যে সমুদয় অসংখ্য ঐশীশক্তি দৃষ্টহয়, তাহা। বসোষ্পতি বলিতে বসুর বা যে ধনের অধিপতি তাহাকে বুঝায়, বেদে অন্যত্র এই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না।

তুমি এইস্থানেই ধনুর দুইপ্রান্তভাগের ন্যায় বাহু বিস্তার কর। বাচস্পতি যেন এইরূপ বিধান করেন। আমি যেন জ্ঞানলাভার্থে সমর্থ হই। (৩)

বাচস্পতিকে আমরা আহ্বান করিয়াছি, তিনি যেন আমাদিগকেও আহ্বান করেন। আমরা যেন শ্রুতির সহিত সংগত হই, আমরা যেন শ্রুতি হইতে কখন বঞ্চিত না হই। (৪)

গোরক্ষণ।

—:o:—

গো-জাতিদ্বারা মানবের বিবিধ প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় বলিয়াই, মহর্ষিগণ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাপ-প্রধান ভারতবর্ষে গো-দুগ্ধই পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে প্রধান খাদ্য। কৃষি প্রধান ভারতে ভূমিকর্ষণ এবং ভার-বহনাদি কার্য্য, গোজাতি দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদর্শ হিন্দুরা গো-জাতিকে সন্তান নির্ব্বিশেষে পালন করেন, এবং তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে আত্ম-প্রাণ সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। হিন্দুগণ গোবধকে মহাপাপ মনে করেন, এবং গোহত্যাকারিগণকে অতিশয় ঘৃণার চক্ষে দেখেন। যে দেশে গো-জাতির প্রতি এত আন্তরিক যত্ন, যে দেশে গো-জাতির উন্নতি আশা করা ন্যায্য ও স্বাভাবিক; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেইদেশেই গো-জাতি দিন দিন খর্ব্বাকার ও দুর্ব্বল হইয়া যাইতেছে। হিন্দুগণ গোবধে বিরত হইলেও, অপালনে তাঁহারা যে গো-বংশ ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। বঙ্গের কোন স্থানেই বলিষ্ঠ বলীবর্দ্দ বা গাভী দৃষ্ট হয় না। গো-জাতি সর্ব্বত্রই অর্দ্ধাশনে জীর্ণ-শীর্ণ-কলেবর এবং সর্ব্বত্রই গো-জাতির আকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতেছে। পূর্ব্বে বঙ্গের সর্ব্বত্রই গোচরণের জন্য যথেষ্ট ভূমি থাকিত; কিন্তু এইক্ষণ কোন গ্রামেই উহা নাই। আপাতঃ স্বার্থদ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভূস্বাধিকারিগণ প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত ভূমিই কৃষিকার্য্যের জন্য প্রজাগণের মধ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। কি কৃষিব্যবসায়ী, কি অন্যবিধব্যবসায়ী লোক, কেহই গোচরণের ভূমির অভাবে গোদিগকে যথেষ্ট আহার দিতে পারে না; এবং তজ্জন্য গো-জাতি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

হৃষ্ট পুষ্ট ও বৃহৎকায় ষণ্ডদ্বারা গাভীদিগের গর্ভাধান না হওয়ায়, এ দেশের গো-জাতি ক্রমশঃ ক্ষুদ্রকায় হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক গ্রামে যাহাতে দুই চারিটি বলিষ্ঠ-বৃষ থাকে, তদ্বিষয়ে ও সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে উত্তম বৃষের বা গাভীর এবোকের

অভাব হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ স্থলে উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে বলিষ্ঠ বৃষ আনিয়া, গো-জাতির উৎকর্ষ সাধন করা ধনশালী ভূম্যাধিকারগিণের অতীব কর্ত্তব্য।

গো-জাতি হিন্দুধর্ম্মের একাঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগের ঔদাস্য দেখিয়া বিস্মিত এবং ব্যথিত না হইয়া পারি না।

গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন।

(সমালোচনা) (১)

হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। মনে করিয়াছিলাম, প্রবন্ধগুলি শেষ হইয়াছে; কিন্তু পৌষমাসের হিন্দু পত্রিকায় আর এক প্রবন্ধ প্রকাশিত দেখিলাম। লেখকের বক্তব্য শেষ হইলে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রবন্ধনিচয় তাদৃশ ধারাবাহিক নহে, সুতরাং সমুদয় প্রবন্ধ শেষ না হইলেও বর্ত্তমান স্থলে দুই এক কথা বলা চলে।

---

(১) ইতঃ পূর্ব্বে "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" প্রবন্ধের কয়েকটী সমালোচনা আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি পাঠ করিয়া দেখিলাম ঐ সমুদয় সমালোচনা, সমালোচনা নামের যোগ্য নহে। ঐ সমুদয় সমালোচনায় প্রবন্ধের ভ্রম দেখান হইয়াছিল না, কেবল মাত্র বলা হইয়াছিল যে, প্রবন্ধকারের মত যথার্থ হইলে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রতি কুঠারা-ঘাত করা হয়; এই জন্য ঐ সমুদয় সমালোচনা প্রকাশিত করা হয় নাই। কটক রেভেনসা কলেজের সুযোগ্য বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সমালোচনা সাদরে প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গোলকে সর্ব্বদেব দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি। জ্যোতিষ পুরাণের ভিত্তি হউক না হউক, জ্যোতিষ যে পুরাণের একটী প্রধান অঙ্গ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্র পৌরাণিক দেবতা, ২৭টী নক্ষত্র পুরাণে চন্দ্রের ২৭ স্ত্রী, অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ বা গৃহিণী: এ স্থলে রূপক অতি জাজ্বল্যমান, কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু পুরাণে এমন অনেক রূপক আছে, যাহার রূপকত্ব ভাব সহসা উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া যে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, আমি এখনও এরূপ কোন প্রমাণ পাই নাই। শ্রীকৃষ্ণের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যলীলা যে সমুদয়ই জ্যোতিষিক রূপক দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা বলিতে পারি না। বৈদিক কাল হইতে সূর্য্য হিন্দু উপাস্য হইয়া

অধিকাংশ প্রবন্ধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং কয়েকটি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রায় তিন বৎসর হইল, কয়েক খানি পুরাণ পাঠ করিবার সময় কোন কোন পৌরাণিকী কথার মূলে জ্যোতিষ স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। তদনন্তর এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমার অনুমান দৃঢ় করিতে সচেষ্ট ছিলাম। যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা গ্রন্থান্তরে * প্রকাশের চেষ্টায় আছি। উক্ত গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষের নাম 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' রাখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, 'পৌরাণিক জ্যোতিষ' লিখিবার সময় হিন্দু-পত্রিকার লেখকের অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের ফল লাভ করিতে পারি নাই। এই আত্ম পরিচয় দিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনধিকার চর্চ্চার দোষ হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎরূপে মুক্ত করিতে চাই। আর এক উদ্দেশ্য এই যে, অদ্যাবধি

আসিতেছেন, আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই এখনও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ব মুখ হইয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া থাকেন; সূর্য্যদেবেই গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা। শালগ্রাম শিলাদি উপলক্ষ্য করিয়া যেমন ঈশ্বরের উপাসনার ব্যবস্থা, সূর্য্য উপলক্ষ্য করিয়াও তদ্রূপ ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার, দশাবতার· সকলই বিষ্ণুর অবতার। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়; তাহা হইলে তিনি যখন অবতার বলিয়া গৃহীত হইলেন, তখন তাঁহার জীবনের সহিত বিষ্ণুর বা সূর্য্যের (কারণ বেদে বিষ্ণু এবং সূর্য্য এক) লীলা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলার সহিত যে সূর্য্যের লীলা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাল্য-লীলা যদি এরূপ রূপকের উপর ন্যস্ত না করা যায়, তাহা হইলে পরম পবিত্র গীতাশাস্ত্রের প্রবর্ত্তকের চরিত্রের উপরে পরদারাভিমর্শন দোষ স্পর্শে। পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের বাল্য-লীলা শ্রবণ করিয়া, শুকদেবকে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ছিলেনঃ——

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ। অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তাকর্ত্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥
আপ্ত কামো যদু পতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভি প্রায় এতংনঃ সংশয়ং ছিন্ধিসুব্রত॥

যে সংশয় পরীক্ষিতের মন বিলোড়িত করিয়াছিল, সেই সংশয় এখনও অনেকের মনে উদিত হইয়া থাকে। স্বতঃই লোকের মনে এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এবং অধর্ম্ম প্রশমনের জন্য যাহার জন্ম; তিন পরদারাভিমর্শনরূপ কার্য্যে কিরূপে· প্রবৃত্তহইবেন? হয় ইহা কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার, নয় কোন জ্যোতিষিক রূপক, হয় রাধাকে হ্লাদিনী শক্তি করিতে হইবে, নয় রাধাকে রাধা নক্ষত্র করিতে হইবে, নতুবা অবতারের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়না। শুকদেবের মুখে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নের

---

* "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষ" সম্প্রতি মুদ্রিত হইতেছে।

প্রকাশিত সমুদয় প্রবন্ধের আলোচনা করিবার অবসর নাই। অবসর থাকিলেও মুদ্রিত প্রায় প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, এ নিমিত্ত নিরস্ত হইতে হইল। তথাপি মোটের উপর দুই এক কথা বলিতে দোষ নাই। সমালোচনা ভিন্ন সত্য আবিষ্কৃত হয় না। জানি, গড়া অপেক্ষা ভাঙ্গা সহজ, এবং ইহাও জানি, উপস্থিত ক্ষেত্রে ভাঙ্গিতে গিয়া অপ্রীতিকর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতেছি; কিন্তু গড়িতে পারি, না পারি, ভাঙ্গিলেও উপকার হইতে পারে।

যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা কেহই সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। ঈশ্বরানাং বচঃ সত্যং তথৈব আচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ॥ একথা বলিলে কাহারও মনের সংশয় যায় না; পরীক্ষিতেরও গিয়াছিল কিনা সন্দেহ। আমি সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিব, তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্য করিও না; আমি যাহা বলিব, তাহাই করিও। একথা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মুখে শোভা পায় না। অবতারের প্রয়োজন কি? অবতারবাদীরা বলেন যে, মানবের শিক্ষাই অবতারের প্রয়োজন। যে কার্য্যে মানবের সুশিক্ষা না হইয়া কুশিক্ষা হয়, সেরূপ কার্য্য অবতারে আরোপ করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেরূপ ভাবেই দেখা যাউক্, কৃষ্ণের বাল্যলীলা ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন। বাল্য-লীলার নানাবিধ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। মৎসম্পাদিত গোপালতাপনি উপনিষদের ব্যাখ্যায়, আমি বাল্য-লীলা আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাইতে চাহেন যে, বাল্য-লীলা জ্যোতিষিক রূপকের উপর ন্যস্ত। কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে রাসলীলা হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হন। কালী বাবু বলেন, কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতেই সূর্য্য রাধা নক্ষত্রে প্রবেশ করেন; এবং যখন ঐ সময়েই রাসলীলার সময় নির্দ্ধারিত রহিয়াছে, তখন আমারা কেন অনুমান করিব না যে, সূর্য্যের রাধা নক্ষত্রে প্রবেশই শ্রীকৃষ্ণের রাধার সহিত মিলন। এইরূপ তিনি অন্যান্য বাল্য-লীলার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং উহা হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই সত্যের অনুসন্ধান প্রয়োজন। যদি কালী বাবুর প্রবন্ধের কোন ভ্রম থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রদর্শিত হউক্; এবং ঐরূপ প্রবন্ধও হিন্দু-পত্রিকায় বর্ত্তমান প্রবন্ধের ন্যায় সাদরে প্রকাশিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ বা রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের চরিতের কোন কোন অংশে রূপক অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে বলিলে, তাঁহাদিগের সত্তা অসিদ্ধ হয় না; এবং তাহাতে তত্তদুপাসকদিগের ক্ষোভের কোন কারণ নাই। সর্ব্বজন আরাধ্যদিগের চরিতে যে কতকগুলি অর্থ বিহীন উপন্যাস বা কলঙ্ক আরোপ করা হইয়া থাকে, তাঁহা নির্দ্দোষ, সার্থক, রূপক মাত্র এবং তাহাতে অবতারদিগের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ হয় না, ইহা দেখানই প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য।

সম্পাদক, হিন্দু-পত্রিকা।

পুরাণের অমানুষিক ও অতিপ্রাকৃত যাবতীয় উপাখ্যানের মধ্যে কল্পনা ভিন্ন অন্য মূল নাই ; বোধ করি, কেহই ইহা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন না। কিন্তু তা বলিয়া 'জ্যোতিষই পুরাণের ভিত্তি' বলিতে পারি না। এ কথা বলিতে হইলে সমুদয় উক্তির শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। আপনারা-বা আমার অনুমানই যে ঠিক, তাহা বলিতে গেলে কেবল দৃঢ়োক্তি ফল দায়িকা হয় না। জানি, বিভিন্ন পাঠকের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রমাণ আবশ্যক, এবং মমতাভিমানী লেখক বা কথক সমুদয় প্রমাণ নাও দিতে পারেন। পুরাণাভিজ্ঞ-পাঠকের নিকট 'সমুদ্র মন্থন' নামক ব্যাপারটি বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন ; কিন্তু যখন তাহার অর্থান্তর করিতে হয়, তখন কেবল দৃঢ়োক্তি পাঠ করিয়া পাঠক প্রীত হইতে পারেন না। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রবন্ধে দৃঢ়োক্তি প্রচুর আছে, কিন্তু উক্তির হেতু তত নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' দেখুন (৬ষ্ঠ বর্ষ ৮৫ ৮৬, ৮৭ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণলীলার জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা ব্যতীত অন্যান্য ব্যাখ্যাও আছে।

যে কোন পুরাণ-কথা হউক, তাহার মূল অনুসন্ধান বৃথা হয় না। আমার সামান্য বুদ্ধিতে বোধ হয়, সেই মূলের সহিত যথেষ্ট কবি কল্পনা মিশ্রিত হইয়াছে। প্রকৃত মূল কতটুকু, এবং কবিকল্পনা কতটুকু তাহা পৃথক্ করা বাঞ্ছনীয় ; নতুবা আমাদের শাস্ত্রের কোন কোন 'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার' ন্যায় 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িবে। নানা কারণে সকলের প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমান হইতে পারে না ; কিন্তু যে ব্যাখ্যা দ্বারা অধিকাংশ কথা সুবোধ্য বা সঙ্গত হয়, তাহাই গ্রাহ্য। অবান্তর বিষয়ে ব্যাখ্যার ভিন্নতা থাকিলেও, মূল বিষয়ে ভিন্নতা হইলে কোন ব্যাখ্যাই পাঠকের তুষ্টি সম্পাদন করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গত অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত সমুদ্র মন্থনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতেছি।

আমি স্বীকার করি, সমুদ্রমন্থন অর্থে পার্থিব সমুদ্রমন্থন নহে। অন্তরীক্ষের এক নাম সমুদ্র ছিল, এবং এই অন্তরীক্ষসমুদ্র অবলম্বন করিয়া পুরাণে সমুদ্রমন্থন নামক অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাখ্যার এইটুকু ছাড়া অন্যান্য অংশ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। দুই একটা আপত্তি জানাইতেছি।

(১) "প্রাচীন কালে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি কারণে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জিত হইল।" কিন্তু এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবাদির উল্লেখ সমুদ্রমন্থন উপাখ্যানে দেখিতে পাই না। সুরাসুর দ্বন্দ্বেও রাষ্ট্রবিপ্লবের উল্লেখ কিংবা জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন বর্জ্জনের কথা নাই।

(২) "জ্যোতিষ শাস্ত্রামৃতের পুনরুদ্ধার জন্য দেবাসুরে সন্ধি স্থাপিত হইল।" ইহার কোন প্রমাণ পাইলাম না। জ্যোতিষ-শাস্ত্র অমৃততুল্য হইতে পারে, কিন্তু তাহারই উদ্ধারের নিমিত্ত দেবাসুরের সন্ধি হইয়া ছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্যে হয় নাই, তাহা বলিবার হেতু কি ? কেবল অমৃত নহে, সমুদ্র মন্থনে অনেক দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছিল ; সকল পুরাণের মতে এই সকল উৎপন্ন দ্রব্যও সমান নহে।

(৩) "মন্দর পর্ব্বত স্বরূপ ক্রান্তি পাত বিন্দু"। বিন্দুকে পর্ব্বতের সহিত উপমা করিতে নিষেধ নাই, সত্য ; কিন্তু মন্দর পর্ব্বতটী মন্থন যষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং একটি বা দুইটী বিন্দু, যষ্টির সমতুল্য মনে করিতে পারা যায় না। তদ্ভিন্ন, মেরু পর্ব্বতের পার্শ্বেই মন্দর পর্ব্বত দেখিতে পাই।

(৪) "দিবা রাত্রি + + গোল ও বিলোড়িত ও মথিত করিল।" কিন্তু দিবারাত্রির আবির্ভাব ও তিরোভাব নিত্য ঘটনা। ইহাদের সহিত মন্থনে সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

এইরূপ অনেক উক্তিরই বিশেষ আধার দেখিতে পাইলাম না। বাহুল্য ভয়ে, সমুদয়ের উল্লেখ করিলাম না। লক্ষ্মী, শশাঙ্ক, কৌস্তুভমণি, ও ধন্বন্তরির কোন প্রকার অর্থ পাইলাম। কিন্তু অপ্সরা, হস্তী, অশ্বাদি, এবং অবশেষে হলাহলও উৎপন্ন হইয়াছিল। "ধন্বন্তরিরূপে কুম্ভরাশি ধনুরাশির ত্রিশ অংশ অন্তরে স্থাপিত হইল।" কিন্তু আমার বোধ হয়, যখনই মেষাদিরাশি কল্পনা হইয়াছিল, তখনই ধনুরপর মকর, এবং মকরের পর কুম্ভরাশি স্থাপিত হইয়া ছিল। অতএব ধন্বন্তরির উদ্ভবে কুম্ভরাশির নির্দ্দেশ মনে করিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যাকার মহাশয় সমুদ্র মন্থনের একাংশ মাত্র লইয়াছেন। বোধ হয়, এই কারণে তাঁহার প্রদত্ত ব্যাখ্যা সুসঙ্গত হইতে পারে নাই। (১) দেবাসুরের চির বিবাদ, (২) তাহাদিগের সন্ধি, (৩) সমুদ্র মন্থন, (৪) রাহু-কেতুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি প্রত্যেক স্থূল কথার ব্যাখ্যান আবশ্যক। বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত হইতে উদ্ধৃত প্রমাণে ঠিকই বলা হইয়াছে। মন্থন ব্যাপারের শেষ সূর্য্য 'প্রসন্নভা' হইয়া স্বীয় পথে চলিতে লাগিলেন ; তবেই মনে হয়, যেন এমন কোন ঘটনা হইয়াছিল, যাহাতে সূর্য্য 'প্রসন্নভা' ছিলেন না। চলিতে ছিলেন কিনা, তাহাও বুঝিতে পারা যায় নাই। আমার বিবেচনায় সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে এই অনুমান সমর্থন করিবার সুযোগ নাই।

চন্দ্রের স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। প্রশ্নউপনিষদের উক্তি মান্য করি, কিন্তু পুরাণে বা অন্য শাস্ত্রে চন্দ্রকে স্ত্রীরূপে কল্পিত হইতে দেখি না। তিনি তারা-পতি, রোহিণী পতি, চন্দ্র বংশের আদি ছিলেন ; রোহিণীর প্রতি অত্যধিক অনুরাগ বশতঃ তাঁহার যক্ষ্মারোগ প্রভৃতি বিবরণ পুরাণ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন ; সুতরাং চন্দ্রকে স্ত্রী কল্পনা করিতে গেলে অনেক পৌরাণিকী কথার বিসম্বাদ হয়। প্রশ্ন-উপনিষদের উক্তির অর্থ অন্যবিধ কিনা, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। পুরাণে চন্দ্রকে দেব বলিয়াই জানি। ফলিত জ্যোতিষে তিনি স্ত্রীগ্রহ বলিয়া তিনি কদাপি স্ত্রী নহেন। * সুধাকরের এক নাম লক্ষ্মীসহজ হইবার কারণ কি চন্দ্রবিম্ব ও চন্দ্রজ্যোতিষ

* যোষিতাং চন্দ্রভার্গবৌ—অর্থে চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীজাতীয় নহেন, ইহার অর্থ, চন্দ্র ও শুক্র স্ত্রীদিগের অধিপতি বা স্বামী। সর্ব্বার্থ চিন্তামণি স্ত্রী গ্রহ, পুংগ্রহ পদ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অর্থ, স্ত্রীদিগের পুরুষদিগের গ্রহ।

পৃথক কল্পনা? একদা লক্ষ্মীর সহিত চন্দ্রও সমুদ্র মন্থনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।* যে দুই একখানি পুরাণ দেখিয়াছি, অন্ততঃ তাহাতে চন্দ্রবিম্বের ও চন্দ্রজ্যোতির পৃথক্ কল্পনা দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বত্রই এক চন্দ্রদেবকেই দেখিতে পাই।

সোম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সোম শব্দে সোমলতা বুঝি, এবং দেবগণ সোমরস প্রিয় বলিয়া জানি। ঋগ্বেদের মধ্যে সোম কোথায় চন্দ্র, এবং কোথায় বা সোমলতা, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে সংশয় দূর হইতে পারে। এক সোম হইতে অন্য সোমে আসা বিচিত্র নহে।† 'গোলকে সর্ব্বদেব-দর্শন' নামক প্রবন্ধগুলির মধ্যে মধ্যে জ্যোতিষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে প্রচলিত শব্দের পরিবর্ত্তে নূতন শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। যে গুলিকে নূতন শব্দ মনে করিতেছি, সেগুলি লেখকের রচিত কি না, তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। নূতন রচিত শব্দ হইলে তাহা পাঠককে স্পষ্ট বলা অবশ্যক, নতুবা যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে চর্চ্চার অবহেলায় "ভয়াবহ বিভ্রাট ভারতে উপস্থিত" (৫ম বর্ষ। ৩৫২ পৃষ্ঠা), সেই বিভ্রাটই থাকিয়া যাইবে। অধিকন্তু বিভ্রাট বৃদ্ধি হইবে। এরূপ কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করিতেছি।

গোলক শব্দের অর্থে লেখক বলেন, "তদুত্তরে (ধ্রুবলোকের) যে মণ্ডলে ধ্রুববিন্দু কদম্ববিন্দুকে প্রদক্ষিণ করে, সেই মণ্ডলকেই গো-লোক—বৃন্দাবন বলে।" (৬ষ্ঠ বর্ষ। ৬২ পৃঃ)। অন্যত্র আছে, "ব্রহ্মাণ্ডের অপর নাম গোলক।" (৫ম বর্ষ। ২৮৬ পৃঃ)। "পৃথিবীস্থ জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর মেরুদণ্ড (axis) উত্তরে প্রসারিত করিয়া গোলকে যে বিন্দু প্রাপ্ত হন, তাহার নাম ধ্রুব বিন্দু রাখিয়াছেন; এবং পৃথিবী হইতে দৃশ্য গোলক, বি-ষু-পৎ মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা করিয়াছেন।" (৫ম বর্ষ। ৩৫১ পৃঃ)। এখানে গোলক শব্দের অর্থ কি? দৃশ্য গোলক কি? বিষুবন্ মণ্ডল অর্থে সিদ্ধান্তে অন্য কথা বলে। "যেমন বি-ষু-প মণ্ডল পৃথিবীকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে" (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭পৃঃ)। প্রকৃত কথা বিষুবমণ্ডল করে না, নিরক্ষমণ্ডল করে। বিষুবন্ মণ্ডল আকাশে। এই ভুলটি অনেক লেখক করিয়া থাকেন।

"ঐ কেন্দ্র [রাশিচক্রের] হইতে দৃশ্য গোলক অয়ন মণ্ডল দ্বারা দ্বিধা" হইয়াছে। রাশিচক্রের কেন্দ্র, পৃথিবী; পৃথিবীর চারিদিকে রাশিচক্র ঘুরিতেছে। সুতরাং লেখকের কথা আদৌ বুঝিলাম না। যদি মেরু শব্দের পরিবর্ত্তে কেন্দ্র বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও কথাটা বুঝিলাম না। অয়নমণ্ডল সংজ্ঞাটি লেখক কোথায় পাইলেন, বলিতে পারি না। অপম ও ক্রান্তিমণ্ডল বা বৃত্ত শব্দদ্বয় সিদ্ধান্তে দেখিতে পাই। এই চির প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ ত্যাগকরিবার কারণ পাইলাম না। "পুরাণে

* চন্দ্রার্ঘ্যে আছে, লক্ষ্মী ভ্রাতঃ নমোস্তুতে।

† কয়েক মাস পূর্ব্বে "সাহিত্য" পত্রে এই বিষয় সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিত হইয়াছিল।

অয়নমণ্ডল নক্ষত্ররাজ বলিয়া বর্ণিত।" (৬ষ্ঠবর্ষ, ৭পৃঃ)। কোন্ পুরাণে? "জ্যোতির্বিদশাস্ত্রে আমরা বলি চিত্রানক্ষত্র এবং ধ্রুবতারা। চিত্রাতারা বা ধ্রুবনক্ষত্র বলা রীতি নহে"। (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯পৃঃ)। বস্তুতঃ তাই কি? চিত্রাতারা বলিলে চিত্রা নামক একটি তারা বিশেষকে বুঝিয়া থাকি। চিত্রা যোগতারা বলিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। লেখকও কয়েক পংক্তি পরে "রোহিনী তারা" লিখিয়াছেন।

"পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগতারা অনল-তারক (Pollux) (৯পৃঃ)। অনলঅর্থে অগ্নি বুঝি। কিন্তু অগ্নি তারক Pollux নহে, অন্য একটি।

নক্ষত্রসমূহের নামের অর্থ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসা আছে। "সুন্দর চিত্রিত আকৃতি বলিয়া চিত্রা নাম;" ধনুদ্বয় + + হইতে পুনর্ব্বসু নাম, অথবা অয়নরেখা দ্বিধাভক্ত বলিয়া পুনর্ব্বসু নাম;" "তূর্ণস্থিত বলিয়া পুষ্যা নাম;" ইত্যাদি নামের সার্থকতা বুঝিলাম না।

"এক্ষণে দক্ষিণাকাশে একবার দৃষ্টি সঞ্চালন কর, দেখিবে, দক্ষিণাকাশে আর একটি তারক স্থিরভাবে রহিয়াছে, ঐ তারকের নাম পরধ্রুব।" (৫ম বর্ষ, ২৮৯পৃঃ)। বলা বাহুল্য, যাম্যধ্রুব আমাদের ক্ষিতিজের নিম্নে অবস্থিত, সুতরাং আমাদের দৃষ্টির অতীত। উত্তর ধ্রুবতারার ন্যায় যাম্যধ্রুবতারাও খগোলে নাই।

"হৃৎমণ্ডলের নাম ঔরিকমণ্ডল (Auriga constellation)।" (৫বর্ষ, ২৯০পৃঃ)। এখানে হঠাৎ মনে হয়, যেন হৃৎমণ্ডল ও ঔরিকমণ্ডল—দুইটি নামই আমাদের শাস্ত্রে আছে। লেখক নক্ষত্রের পাশ্চাত্য নামের এইরূপ বাঙ্গালা নাম করিয়াছেন। বোধ করি, "পিনাক," "অজার" প্রভৃতি নামগুলিও লেখকের রচিত। কিন্তু পাঠককে কিছু না বলিয়া এরূপ নাম করণ করিলে অনিষ্ট হইতে পারে। তদ্ভিন্ন মণ্ডল শব্দের অর্থ নক্ষত্র (Constellation) কোথাও পাই নাই। জ্যোতিষে মণ্ডল শব্দে বৃত্ত বুঝিয়া থাকি। যথা বিষুবন্ মণ্ডল।

কোন কোন ব্যাখ্যানে লেখক মহাশয় অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছেন যে, (১) প্রাচীনগ্রীকেরা নক্ষত্রসমূহের (Constellation) যেমন রূপ কল্পনা করিত, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণও ঠিক সেইরূপ কল্পনা করিতেন; (২) সেই পাশ্চাত্য রূপ কল্পনা করিয়া আমাদের পৌরাণিকগণ পুরাণকথা লিখিয়াছেন। কিন্তু উভয় অঙ্গীকারই প্রমাণ সাপেক্ষ। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটিব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মাণ্ডের উত্তর মেরুদেশে ঐ যে ভীষণ অজাগর (Draco) দেখিতেছ, যাহার ফণামণ্ডলে দীপ্তিমান মাণিক্য জ্বলিতেছে; জগতের ঐ মূলাধার দেবতার নাম অনন্তদেব।" (২৭পৃঃ)। কোন নক্ষত্রকে গ্রীকেরা (Draco) বলিত। কিন্তু আমাদের পিতামহগণও যে তাহাকে—Draco না বলুন—অজাগর বলিতেন, তাহার প্রমাণ কি? বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান,—অর্থে বুঝিতাম, তিনি অনন্ত দেশব্যাপী। লেখক বলেন,

আকাশের যে নক্ষত্রকে গ্রীকেরা Draco (অজাগর) বলিত, সেই নক্ষত্রের শিরোদেশে বিষ্ণু (কোন্ তারা?) শয়ান রহিয়াছেন! পুরাণ কথার কবিকল্পনা নাই, সমস্তই জ্যোতিষিক রূপক বলিতে গেলে সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিতে হয়। লেখক মহাশয়ও স্থানে স্থানে কবিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। "ভীষণ অজাগর," "দীপ্তিমান মাণিক্য" ইত্যাদিতে কবিকল্পনা নাই, বলিতে পারি না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোন কোন ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। প্রীত হইবার একটি কারণ এই যে, লেখক মহাশয় যে অনুমানে আসিয়াছেন, আমিও সেই অনুমানে আসিয়াছিলাম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তারাহরণ উপাখ্যান উল্লেখ করিতেছি। জ্যোতিষিক বিষয় সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার বিস্তর মতভেদ আছে। যথা "চন্দ্র ২৭½ দিনে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই ২৭½ দিনে একমাস গণনা হইত।" (৬ষ্ঠ, বর্ষ ৭১পৃঃ)। ২৭॥০ দিনে মাস গণনার কোনও উল্লেখ কোথাও পাই নাই। আমার বিবেচনায় প্রথমে চান্দ্রমাস গণনা প্রচলিত ছিল। বহুকাল পরে বার্হস্পত্যবর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। বেদ যতকালের, চান্দ্রমাস গণনাও ততকালের ন্যূন সময়ের নহে। কিন্তু বার্হস্পত্যবর্ষ সম্ভবতঃ চারিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে এদেশে প্রচলিত ছিলনা। পরিশেষে, পাঠকের ও লেখকের অনুমতি লইয়া আমার পুস্তক হইতে তারা-হরণ-উপাখ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিতেছি। "এই উপাখ্যানে পুরাণকার প্রকৃতব্যাপার স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন।" সংগ্রামের নাম "তারকময়।" সিদ্ধান্তে সংগ্রাম বা যুদ্ধ অর্থে নক্ষত্র ও গ্রহের সমাগম বুঝায়; সুতরাং এই উপাখ্যানের মূলে যে কোন তারা ঘটিত ব্যাপার ছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

রাজমার্ত্তণ্ডে বুধের এই নামগুলি আছে,

বুধশ্চন্দ্রসুতো জ্ঞেয়ো বিবুধো বোধনস্তথা।
কুমারো রাজপুত্রশ্চ তারাপুত্র স্তথৈবচ॥

এখানে জ্ঞেয়, বিবুধ, বোধন নামগুলি বুধশব্দের প্রতিশব্দ। চন্দ্রসুত, কুমার, রাজপুত্র, ও তারাপুত্র নাম নামগুলির মূলে উক্ত উপাখ্যান।

কিন্তু কোন্ তারা লইয়া চন্দ্র ও বৃহস্পতির বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল? যে তারাই হউক্, সেটি এমন যে, তাহার নিকটে চন্দ্র-বৃহস্পতি-শুক্রসহ দেবাসুর-সংগ্রাম উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল। পুষ্যার সহিত বৃহস্পতির ঘনিষ্টসম্বন্ধ ছিল ('বৃহস্পতি' দেখুন) পুষ্যার দেবতা বৃহস্পতি। সুতরাং এই উপাখ্যানের তারা পুষ্যা নহে। বুধের একটিনাম রৌহিণেয় আছে। এজন্য মনে হয় যে, রোহিনীতারা লইয়া বিবাদ। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। রোহিনী চন্দ্রের প্রেয়সী; তাঁহার সহিত বৃহস্পতির সম্পর্ক থাকিতে পারে না। বুধ চন্দ্রের পুত্র, এবং রোহিনী চন্দ্রের প্রধানা মহিষী। এজন্য বুধের নাম রৌহিণেয় হইয়াছিল।

তবে কোন্ তারার পতি বৃহস্পতি ছিলেন? মহাভারত-বনপর্ব্বে দেখা যায়, বৃহস্পতি-পত্নী তারারগর্ভে ছয়পুত্র এবং একপুত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, এই ছয় পুত্র ও তাহাদের পুত্র বিভিন্ন যজ্ঞের ও অন্যান্য অগ্নির নামান্তর। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টিতারা স্পষ্ট এবং অপর একটি অস্পষ্ট দৃষ্ট হয়। + + + কার্ত্তিকাদি বার্হস্পত্যবর্ষ গণনায় কৃত্তিকা ও বৃহস্পতির সম্বন্ধ প্রকাশিত আছে। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, কৃত্তিকাতারাই বৃহস্পতির পত্নী ছিলেন। এই জন্য বুধের নাম কুমার আছে। বেদে অগ্নি, কুমার। পুরাণে কার্ত্তিকেয়, কুমার। বুধ ও কার্ত্তিকেয় ঈষিকাস্তম্বে জাত। তারকাসুর বধ করিতে কার্ত্তিকেয়, পরাশর বলেন অসুর বধ করিতে বুধও জন্মিয়াছিলেন। গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে আছে, ধনিষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীতে বুধের জন্ম হইয়াছিল (শব্দকল্পদ্রুম)। ধনিষ্ঠার সহিত কৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে। ধনিষ্ঠায় রবির অয়ন নিবৃত্ত হইলে কৃত্তিকায় বিষুবন্ থাকে। + + + বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই দীপ্তিশালী। কৃত্তিকাও ক্ষীণপ্রভা নহে। সময় বিশেষে বুধ উজ্জ্বল দেখায়। নিকটে চন্দ্র, কিঞ্চিৎ দূরে ব্রহ্মাদৈবত রোহিণীনক্ষত্র। বস্তুতঃ এরূপ সমাগম দর্শনীয় ব্যাপার। এ বৎসর (শক ১৮২০, ৩ ভাদ্র) সায়ং সন্ধ্যার পর পশ্চিম আকাশে হস্তানক্ষত্রে বৃহস্পতি ও শুক্রের সমাগম অনেককেই চমৎকৃত করিয়াছিল। বোধ করি, কোন অতীত কালে উক্ত জ্যোতির্গণের সমাগম তৎকালের আর্য্যগণকে মোহিত করিয়াছিল, এবং কৃত্তিকাকে চন্দ্র ত্যাগ করিলে দেখিতে দেখিতে বুধগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল।" ইত্যাদি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, ।
বিজ্ঞান-অধ্যাপক, রেভেন্‌সা কলেজ
কটক ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম—কথিত।)

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজে গমন ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতির সহিত কথোপকথন।]

কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। ইংরাজি ২৬শে নবেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ শ্রীযুক্ত মণিমল্লিকের বাটীতে সিন্দুরিয়াপটী-ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশন হইত। বাড়ী চিৎপুর রোডের উপর, পূর্ব্বধারে; হ্যারিসন রোডের চৌমাথা—যেখানে বেদান

পেস্তা, আপেল এবং অন্যান্য মেওয়ার দোকান আছে, সেখান হইতে কয়েক খানি দোকানবাড়ীর উত্তরে। সমাজের অধিবেশন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতালা হলঘরে হইত। আজ সমাজের সাম্বৎসরিক; তাই শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক মহোৎসব করিয়াছেন। উপাসনা-গৃহ আজ আনন্দপূর্ণ, বাহিরে ও ভিতরে হরিৎ বৃক্ষ-পল্লবে, নানাপুষ্প ও পুষ্পমালায় সুশোভিত। গৃহমধ্যে ভক্তগণ আসন গ্রহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, কখন উপাসনা হইবে। গৃহমধ্যে সকলের স্থান হয় নাই, অনেকেই পশ্চিমদিকের ছাদে বিচরণ করিতেছেন বা যথাস্থানে স্থাপিত সুন্দর বিচিত্র কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মাঝে মাঝে গৃহ-স্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে অভ্যাগত ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্ম ভক্তগণ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহারা আজ একটী বিশেষ উৎসাহে উৎসাহন্বিত। আজ শ্রীযুক্তরামকৃষ্ণ পরমহংসের শুভাগমন হইবে। পরমহংসদেবের ব্রাহ্মদের উপর বিশেষ দৃষ্টি। ব্রাহ্মদের তিনি বড় ভাল বাসেন, ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃগণ কেশব, বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ভক্তগণকে তিনি প্রাণতুল্য ভালবাসেন। তাই তিনি ব্রাহ্ম-ভক্তদের এত প্রিয়। পরমহংসদেব হরিপ্রেমে মাতওয়ারা, তাঁহার প্রেম, তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহার বালকের ন্যায় ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন, ভগবানের জন্য তাঁহার ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন, তাঁহার মাতৃজ্ঞানে স্ত্রীজাতির পূজা, তাঁহার বিষয়কথা বর্জ্জন ও তৈল ধারা তুল্য নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বর-কথা-প্রসঙ্গ, তাঁহার সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় ও অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাবলেশশূন্যতা, তাঁহার ঈশ্বরভক্তের জন্য রোদন, এই সকল ব্যাপার ব্রাহ্মভক্তদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। তাই আজ অনেকে বহুদূর হইতে তাঁহার দর্শন লাভার্থে আসিয়াছেন।

[শিবনাথ ও সত্যকথা।]

উপাসনার পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তদের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করিতে লাগিলেন। সমাজ-গৃহে আলো জ্বালা হইল, অনতিবিলম্বে উপাসনা আরম্ভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিলেন "হ্যাগা! শিবনাথ আস্‌বেনা?" একজন ব্রাহ্মভক্ত বলিলেন "না আজ তাঁর অনেক কাজ আছে, আস্‌তে পারবেন না"। পরমহংসদেব বলিলেন "শিবনাথকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়, আহা যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে, আর যা'কে অনেকে গণে মানে, তা'তে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালী বাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়। এই রকম আছে যে, সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকিলে ভগবান্ লাভ হয়। সত্যে আঁট

না থাকিলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হ'য়ে যায়। আমি এই ভয়ে, যদি কখনও ব'লে ফেলি যে, বাহ্যে যাব, আর বাহ্যে যদি না পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই যে পাছে সত্যের আঁট যায় যখন আমার এই অবস্থা পর মাকে ফুল হাতে ক'রে ব'লেছিলুম 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও; মা! এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও'—যখন এই সব ব'লেছিলুম, তখন একথা বল্‌তে পারি নাই 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য'। সব মাকে দিতে পাল্লুম কিন্তু সত্য মাকে দিতে পাল্লুম না"।

(উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন ও পরমহংসদেবের সমাধি)

ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা আরম্ভ হইল। বেদীর উপরে আচার্য্য, সম্মুখে সেজ। উদ্বোধনের পর আচার্য্য পরব্রহ্মের উদ্দেশে বেদোক্ত মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মভক্তগণ সমস্বরে সেই পুরাতন আর্য্য ঋষির শ্রীমুখনিঃসৃত, তাঁহাদের সেই পবিত্র রসনার দ্বারা উচ্চারিত নাম গান করিতে লাগিলেন। বলিতে লগিলেন "সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দমমৃতম্ যদ্বিভাতি শান্তম্ শিবদ্বৈতম্ শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"। এই প্রণব সংযুক্ত ধ্বনি ভক্তদের হৃদয়াকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেকের অন্তরে বাসনা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইতে লাগিল। চিত্ত অনেকটা স্থির হইল ও ধ্যান প্রবণ হইতে লাগিল। সকলেরই চক্ষু মুদিত—ক্ষণকালের জন্য বেদোক্ত সগুণ ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পরমহংসদেব ভাবে নিমগ্ন হইলেন। স্পন্দহীন, স্থিরদৃষ্টি, অবাক, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া রহিলেন। যেন আত্মাপক্ষী কোথায় আনন্দে বিচরণ করিতেছে; আর দেহটী মাত্র শূন্য মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে।

সমাধি ভঙ্গের অব্যবহিত পরেই পরমহংসদেব চক্ষু মেলিয়া চরিদিকে চাহিতে লাগিলেন, দেখিলেন, সভাস্থ সকলেই নিমীলিত নেত্র; তখন "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" বলিয়া হঠাৎ দণ্ডায়মান হইলেন। উপাসনান্তে ব্রাহ্মভক্তেরা খোল করতাল লইয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, আর নৃত্য করিতে লগিলেন। সে মধুর নৃত্য সকলে মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতে লগিলেন। অনেকে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ও কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিয়া এককালে সংসার ভুলিয়া গেলেন। ক্ষণকালের জন্য তাঁহারা হরি-রস-মদিরা পান করিয়া বিষয়ানন্দ ভুলিয়া গেলেন। বিষয় সুখের রস তিক্তবোধ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে সকলে

আসন গ্রহণ করিলেন। এক্ষণে পরমহংসদেব কি বলেন, শুনিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলেন।

(গৃহস্থের প্রতি উপদেশ।)

সমবেত ব্রাহ্মভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি ব'লতে লাগিলেন ;—

"নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার করা বড় কঠিন। প্রতাপ (মজুমদার) বলেছিল, "মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। জনক নির্লিপ্ত হ'য়ে সংসার ক'রেছিলেন, আমরা তাই করিব"। আমি বল্লুম, "মনে করেই কি জনক রাজা হওয়া যায়? জনক রাজা কত তপস্যা করেছিলেন। তিনি হেটমুণ্ড উর্দ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্যা ক'রে তবে জ্ঞানলাভ ক'রেছিলেন। জ্ঞান লাভ ক'রে তবে সংসারে ফিরে-গিছ্‌লেন।" তবে সংসারীর কি উপায় নাই? হাঁ অবশ্য আছে। দিন কতক নির্জ্জনে সাধন ক'র্ত্তে হয়। নির্জ্জনে সাধন ক'ল্লে ভক্তিলাভ হয়, জ্ঞান লাভ হয়, ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তারপর গিয়ে সংসার কর, দোষ নাই। যখন নির্জ্জনে সাধন ক'র্‌বে, তখন সংসার থেকে একেবারে তফাতে যাবে, তখন যেন স্ত্রী, পুত্র কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। নির্জ্জনে সাধনের সময় ভাব্‌বে আমার কেহ নাই, ঈশ্বরই আমার সর্ব্বস্ব। আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তির জন্য প্রার্থনা ক'র্‌বে।

যদি বল, কতদিন নির্জ্জনে সংসার ছেড়ে থাকব, তা একদিন যদি এই রকম ক'রে থাক, সেও ভাল, তিন দিন থাক্‌লে আরও ভাল। বা বারদিন, একমাস তিন মাস, এক বৎসর যে যেমন পারে, জ্ঞান-ভক্তি লাভ ক'রে সংসার কল্লে আর বড় বেশী ভয় নাই।"

"হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে হাতে আঁটা লাগে না।

"চোর চোর যদি খেল, বুড়ী ছুঁয়ে ফেল্লে আর ভয় নাই।

একবার পরেশমণিকে ছুঁয়ে সোণা হও। সোণা হবার পর হাজার বৎসর যদি মাটীতে পোতা থাক, মাটী থেকে তোলবার পর সেই সোণাই থাক্‌বে। "মনটী" দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার জলে রাখ, তা হ'লে দুধে জলে মিশে যাবে তাই দুধকে নির্জ্জনে দই পেতে মাখন তুল্‌তে হয়। মন-দুধ থেকে যখন নির্জ্জনে সাধন ক'রে, জ্ঞান-ভক্তি রূপ মাখন তোলা হ'লো, তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনো সংসার জলের সঙ্গে মিশে যাবে না সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সবে গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেখানে অনেক দিন নির্জ্জনে বাস ও সাধুসঙ্গ হইয়া ছিল। এক্ষণে তিনি গৈরিক বসন পরিধান

করিয়াছেন। অবস্থা ভারী সুন্দর, যেন সর্ব্বদা অন্তর্মুখ। পরমহংসদেবের নিকট হেঁটমুখ হইয়া রহিয়াছেন, যেন মগ্ন হইয়া কি ভাবিতেছেন।

বিজয়কে দেখিতে দেখিতে পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন "বিজয়! তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

"দেখ দু'জন সাধু ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এক সহরে এসে পড়েছিল। একজন হাঁ ক'রে সহরের বাজার, দোকান, বাড়ী দেখ্‌ছিল, তখন অপরটীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তখন সে সাধুটী বল্লে, তুমি যে হাঁ ক'রে সহর দেখছ, তলপী তাল্‌পা কোথায়? প্রথম সাধুটী বল্লে, আমি আগে বাসা পাক্‌ড়ে তল্‌পীতালপা রেখে ঘরে চাবি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেরিয়েছি। এখন সহরে রং দেখে বেড়াচ্ছি। (বিজয় প্রতি) তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি, তুমি কি বাসা পাক্‌ড়েছ?"

(মাষ্টার ইত্যাদির প্রতি।) "দেখ বিজয়ের এতদিন ফোয়ারা চাপা ছিল, এইবার খুলে গেছে।"

[বিজয় ও শিবনাথ। নিষ্কামকর্ম্ম ও সকাম কর্ম্ম।]

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "দেখ শিবনাথের ভারী ঝঞ্ঝাট। খবরের কাগজ লিখ্‌তে হয়, আর অনেক কর্ম্ম কর্ত্তে হয়। বিষয়কর্ম্ম কল্লেই অশান্তি হয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এসে যোটে।"

"শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধৌত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিলকে একটী গুরু ক'রে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল এসে একটা মাছ ছোঁমেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে প্রায় এক হাজার কাক চিলকে তাড়া ক'রে গেল এবং এক সঙ্গে কা কা ক'রে বড় গোলমাল কর্ত্তে লাগ্‌লো। চিল মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলোও তাড়া করে সেই দিকে যেতে লাগ্‌লো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাক গুলাও সেই দিকে গেল, আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্বদিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগ্‌লো শেষে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে মাছটা তার কাছ থেকে পড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিল তখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়া বস্‌লো। বসে ভাব্‌তে লাগলো, "ঐ মাছটা যত গোল ক'রেছিল। এখন মাছ কাছে নাই, তাই আমি নিশ্চিন্ত হলুম।"

"অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা ক'ল্লেন যে, যতক্ষণ মুখে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।"

তবে নিষ্কাম কর্ম্ম ভাল। তাতে অশান্তি হয় না। কিন্তু নিষ্কাম করা বড় কঠিন। মনে ক'চ্ছি, কিন্তু কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, জানতে দেয় না।

আগে যদি অনেক সাধন থাকে, সাধনের বলে কেউ কেউ, নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে পারে। ঈশ্বর দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম্ম অনায়াসে করা যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর প্রায় কর্ম্ম ত্যাগ হয়; দুই একজন যেমন নারদাদি লোক-শিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে।

(সঞ্চয়—'Take no thought for to-morrow')

শ্রীরামকৃষ্ণ—(বিজয়ের প্রতি) "অবধূতের আর একটী গুরু ছিল—মৌমাছি। মৌমাছি অনেক কষ্টে অনেক দিন ধ'রে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু সে মধু নিজের ভোগ হয় না। আর একজন এসে চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মৌমাছির কাছে অবধূত এই শিখলেন যে, সঞ্চয় কর্‌তে নাই। সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোলআনা নির্ভর ক'র্‌বে তাদের সঞ্চয় কত্তে নাই।

এটী সংসারীর পক্ষে নয়। সংসারীর সংসার প্রতিপালন কত্তে হয়। তাই সঞ্চয়ের দরকার হয়। পাখী আর দর্ব্বেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না, কিন্তু পাখীর ছানা হ'লে সে সঞ্চয় করে—ছানার জন্য মুখে ক'রে খাবার আনে।

(বিজয়ের প্রতি,)"দেখ বিজয়, সাধুর সঙ্গে যদি পুটলী পাটলা থাকে, পনরটা গাঁটওয়ালা যদি কাপড় বুচ্‌কি থাকে, তাহ'লে তাদের বিশ্বাস কোরো না। আমি বটতলায় * ঐরকম সাধু ছিলাম। দু'তিন জন বসে, আছে, কেউ ডাল বাচ্ছেন, কেউ কেউ কাপড় সেলাই কচ্ছেন, আর বড় মানুষের বাড়ীর ভাণ্ডারের গল্প বাচ্ছেন। ব'ল্‌ছেন "আরে ও বাবুনে লাখো রুপেয়া খরচ কিয়া হ্যায়, সাধুলোককো বহুত খিলায়া হ্যায়, পুরী, জিলেবী, পেঁড়া, বরফী, মালপোয়া, বহুৎ চিজ তৈয়ার কিয়া"। সকলের হাস্য।

বিজয়। আজ্ঞা হাঁ। গয়ায় ঐরকম সাধু দেখেছি। গয়ার লোটাওয়ালা সাধু। (সকলের হাস্য,)

[প্রেম ও কর্ম্মত্যাগ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আস্‌লে কর্ম্মত্যাগ আপনি হ'য়ে যায়। যাদের ঈশ্বর কর্ম্ম করাচ্ছেন, তারা করুক। তোমার এখন সময় হয়েছে সব ছেড়ে তুমি ব'লো "মন তুই দ্যাখ্ আর আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে"।

এই বলিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অতুলনীয় কণ্ঠে মাধুর্য্য বর্ষণ করিতে করিতে গান গাইলেন:——

গান।

যতনে হৃদয়ে রেখ আদরিণী শ্যামামাকে। মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, আয় মন বিরলে দেখি। রসনারে সঙ্গেরাখি, সে যেন মা ব'লে ডাকে॥
(মাঝে মাঝে সে যেন মা ব'লে ডাকে)॥

কুরুচি কুমন্ত্রী যত, নিকট হ'তে দিওনাকো। জ্ঞান-নয়নকে প্রহরী রেখো. সে যেন সাবধানে থাকে॥
(খুব যেন সাবধানে থাকে)

* রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে যে পঞ্চবটী আছে, সেইখানে।

[অষ্টপাশ ও জীব]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিজয়ের প্রতি) ভগবানের শরণাগত হ'য়ে, এখন লজ্জা, ভয়, এ সব ত্যাগ কর। 'আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বল্‌বে,—এ সব ভাব ত্যাগ কর।

"লজ্জা, ঘৃণা, ভয়। তিন থাক্‌তে নয়॥"

লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি, অভিমান, এ সব জীবের পাশ। এ সব গেলে তবে সংসার হ'তে মুক্তি হয়।

(পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।)

ভগবানের প্রেম বড় দুর্লভ জিনিস। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয়। তবেই ভক্তি হয়। শুদ্ধাভক্তি হওয়া বড় কঠিন। ভক্তিতে প্রাণ-মন ঈশ্বরেতে লীন হবে।

তারপর ভাব। ভাবেতে মানুষ অবাক্ হয়। বায়ু স্থির হ'য়ে যায়। আপনি কুম্ভক হয়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময়, যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে, সে বাক্যশূন্য হয় ও তার বায়ু স্থির হ'য়ে যায়।

প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হ'য়েছিল। ঈশ্বরে প্রেম হ'লে, বাহিরের জিনিস সব ভুল হ'য়ে যায়। জগৎ ভুল হ'য়ে যায়। আর নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিস, তাও ভুল হ'য়ে যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব আবার গান গাহিতে লাগিলেন:—

[গান।]

সে দিন কবে বা হবে?

হরি বলিতে ধারা বেয়ে পড়্‌বে (সে দিন কবে বা হবে?)
সংসার-বাসনা যাবে (সেদিন কবে ......)
অঙ্গে পুলক হবে (সেদিন কবে ......)

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে নিমন্ত্রিত আর কয়েকটি ব্রাহ্ম ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি পণ্ডিত ও উচ্চপদস্থিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীরজনী নাথ রায়।

পরমহংসদেব, ভাব হইলে বায়ু স্থির হয়, এই কথা বলিতেছেন। আরও বলিতেছিলেন, "অর্জ্জুন যখন লক্ষ্য বিঁধিতেছিলেন, তখন কেবল মাছের চোখের দিকে দৃষ্টি ছিল—আর কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। এমন কি, মাছের চোক ছাড়া মাছের আর কোন অঙ্গ দেখিতে পান নাই। এইরূপ অবস্থায় বায়ু স্থির হয়, কুম্ভক হয়।

ঈশ্বরদর্শনের একটি লক্ষণ—ভিতর থেকে মহাবায়ু গর্ গর্ ক'রে উঠে। উঠে মাথার দিকে যায়। তখন যদি সমাধি হয়, ভগবানের দর্শন হয়।"

(পাণ্ডিত্য।)

শ্রীরামকৃষ্ণ—(অভ্যাগত ব্রাহ্ম ভক্ত দৃষ্টে) "যাঁহারা সুধু পণ্ডিত, কিন্তু ভগবানে ভক্তি হয় নাই, তাঁদের কথা গোলমেলে। সামাধ্যায়ী ব'লে এক পণ্ডিত ব'লেছিল, "ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজেদের প্রেম-ভক্তি দিয়ে সরস কর।" বেদে যাঁকে "রস স্বরূপ" ব'লেছে, তাঁকে কিনা নীরস বলে! আর এতে বোধ হচ্ছে, সে ব্যক্তি ঈশ্বর কি বস্তু, তা কখনও জানে নাই। তাই এরূপ গোলমেলে কথা।

একজন ব'লেছিল, 'আমার মামার বাড়ীতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে,' এ কথায় বুঝ্‌তে হবে, ঘোড়া আদবেই নাই। (সকলের হাস্য।)

(ঐশ্বর্য্য, বিভব, মান, পদ)

কেউ কেউ ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার করে—বিভব, মান, পদ, এই সবের অহঙ্কার করে; কিন্তু এ সব দুই দিনের জন্য, কিছুই সঙ্গে যাবে না।

(গান।)

"ভেবে দ্যাখ্ মন কেউ কারো নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলনা দক্ষিণে কালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে॥
যার জন্য মর ভেবে, সেকি তোমার সঙ্গে যাবে?
সেই প্রেয়সী ছড়া দিবে অমঙ্গল হবে বলে॥
দিন দুই তিনের জন্যে ভবে, কর্ত্তা বলে সবাই মানে,
সেই কর্ত্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে॥

আর টাকার অহঙ্কার কত্তে নাই। যদি বল, আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে।

সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে, আমি এই জগৎকে আলো দিচ্চি। কিন্তু নক্ষত্র যাই উঠ্‌লো, অমনি তার অভিমান চ'লে গেল। তখন নক্ষত্রেরা ভাব্‌তে লাগলো, আমরা জগৎকে আলো দিচ্চি। কিছু পরে চন্দ্র উঠ্‌লে তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হ'য়ে গেল। চন্দ্র মনে কল্লেন, আমার আলোতে জগৎ হাস্‌চে, আমি জগৎকে আলো দিচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অরুণ উদয় হ'লো; সূর্য্য উঠ্‌চেন। চাঁদ মলিন হ'য়ে গেল—ক্ষণিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না!

এই গুলি ধনীরা যদি ভাবে, তা' হ'লে ধনের অহঙ্কার হয় না।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত মণি মল্লিক অনেক উপাদেয় খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক যত্ন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তগণকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। যখন সকলে বাড়ী প্রত্যাগমন করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছিল; কিন্তু কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১

য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

অন্বয়ঃ—একঃ অবর্ণঃ নিহিতার্থঃ যঃ (পরমাত্মা) বহুধা শক্তিযোগাৎ অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি, (যস্মাৎ) আদৌ বিশ্বম্ এতি (যত্র) চ অন্তে বি-এতি। স দেবঃ নঃ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু।

বিষমপদব্যাখ্যা অবর্ণঃ—বর্ণরহিতঃ নিরাকার। বহুধা শক্তি-যোগাৎ—অনন্ত শক্তি। শালিতা হেতু। বিচৈতি—এতি, বি+এতি, চ পদত্রয়ৈক্যেতৎ। বর্ণান্—রূপরসগন্ধস্পর্শাদিবিষয়নির্বহান্। শুভয়া—পরমহিতয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া, মোক্ষদানাত্মিকয়া পরম হিতকারী, সংযুনক্তু—সংযুক্ত করুন্। নিহিতার্থঃ—বিগত প্রয়োজন; স্বার্থনিরপেক্ষঃ ইতি ভাষ্যে। স্বার্থ—নিরপেক্ষ, নিঃস্বার্থ।

বঙ্গার্থঃ—যিনি অদ্বিতীয়, নিরাকার এবং স্বার্থনিরপেক্ষ, যিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত-ভাবে স্বকীয় অনন্ত মহিমা বলে অনন্ত বিষয় সৃষ্টি করিতেছেন, আদিকালে যে অনাদি পুরুষ হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয় এবং অন্ত কালে যাঁহার অনন্তসত্তায় বিলীন হইয়া যায়, সেই সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্তা পরম পুরুষ পরমাত্মা আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, অর্থাৎ আমাদিগকে আত্ম-হিতকরী বুদ্ধি দান করিয়া অন্তরে বাহিরে মঙ্গল-আভা প্রকাশ করুন। তাঁহার চিরমঙ্গলময় জ্যোতির্জালে আমরা জ্যোতিষ্মান্ হই।

এই অনুশাসনে পরমাত্মাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ বলিয়া ভঙ্গান্তরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই সূত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রাচীন কবির নিম্নলিখিত সুমধুর দার্শনিক ভাবে বদ্ধ শ্লোকটি মনে পড়ে—তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্ প্রলয়স্থিতিনির্গানাম্ একঃ কারণতাংগতঃ।

২

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

অন্বয়—তৎ এব অগ্নিঃ তৎ এব আদিত্যঃ তৎ এব বায়ুঃ তৎ উ—এব চন্দ্রমাঃ তৎ এব শুক্রম্ তৎ এব ব্রহ্ম, তৎ এব আপঃ তৎ এব (চ) প্রজাপতিঃ॥

বিষমপদব্যাখ্যা-শুক্রম্—তেজঃ তদস্তি অস্য ইতি অর্শ আদিত্বাৎ অ—শুক্রম্ তেজোময় পদার্থজাতম্ নক্ষত্রাদিকমিত্যর্থঃ। শোকতি গচ্ছতি ইতি শুক গতৌরক্ শুক্রম্ তেজোরেতসীত বীজ বীর্য্যেন্দ্রিয়াণি চ॥ ইতি অমরঃ। শুক্রশব্দের অর্থ তেজময় পদার্থ অর্থাৎ নক্ষত্রাদি

ব্রহ্ম—ব্রহ্মন্—বৃংহতি বর্দ্ধতে প্রমাণাৎ ইতি বৃংহ+নন্ নকারস্য অকারশ্চ ইতি ব্রহ্মন্ তথাচ॥ বৃহৎ অস্য শরীরম্ অপ্রেমেয়ম্ প্রমাণতঃ, বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তম্ ব্রহ্ম তেনায়মুচ্যতে॥ ইতি শাম্বপুরাণম্, বৃহত্বাৎ বৃংহণত্বাৎচ তদ্রূপম্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥ ইতি চ বিষ্ণুপুরাণম্—যিনি অপ্রমেয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে প্রমাণাতীত।

বঙ্গার্থঃ—তিনিই পরম পাবন, বৈশ্বানর; তিনিই স্বপ্রকাশস্বরূপ আদিত্য এবং তিনিই রমণীয়-কান্তি চন্দ্রমা। দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্ক নিকর বা বিশ্ব-জীবন সলিল-রাশি, এ সমস্তই তাঁহার বিভূতির প্রকাশভেদ মাত্র, তিনি স্বয়ং রূপাতীত হইলেও তাঁহার স্বারূপ্য এই জগতের স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তিনিই ব্রহ্মা এবং তিনিই প্রজাপতি। এই সূত্রেরই তাৎপর্য্য গীতায় ভগবান্ ভঙ্গ্যন্তরে বলিয়াছেন, যথা—

আদিত্যানামহংবিষ্ণুর্জ্যোতিষাংরবিরংশুমান্
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী॥
অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এবচ॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী॥

৩

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বংজীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবাসি বিশ্বতোমুখঃ।

অন্বয়—ত্বম্ স্ত্রী, ত্বম্ (এব) পুমান্ অসি, ত্বম্ কুমারঃ উত বা কুমারী অসি ত্বম্ জীর্ণঃ (জরাযুক্তঃ সন্) দণ্ডেন বঞ্চসি (বিহরসি) ত্বম্ বিশ্বতঃ মুখঃ (ভূত্বা) জাতঃ ভবসি।

বিষমপদব্যাখ্যা—স্ত্রী স্ত্যাতি আপ্যায়তি সংহতঃ গর্ভঃ যত্র ইতি স্ত্যাতেঃ ড্রট্ স্ত্রিয়ামীঃ যত্র গর্ভস্থানি সন্তি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে স স্ত্রী প্রকৃতিরিতি বাস্তবার্থঃ। যাহাতে সংহত হইয়া গর্ভ কাঠিন্যযুক্ত হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতি

অর্থাৎ জগদুৎপত্তির মূল কারণ। পুমান্ পুনস্—পুনাতি পবিত্রয়তি বা প্রকাশয়তি জগৎ য সঃ—যিনি জগৎ প্রকাশক, বঞ্চসি—বিহরসি—বিহার কর বা বিচরণ কর। বিশ্বতোমুখঃ—বিশ্ববিষয়জ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বব্যাপী। অথবা নানাপ্রকারে নব নব ভাবে উদ্ভাসিত হউক।

বঙ্গার্থঃ—হে ভগবান্! তুমিই স্ত্রী এবং তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার এবং তুমিই কুমারী, তুমিই জরাজীর্ণ হইয়া দণ্ড ধারণ করিয়া বৃদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাক, আবার তুমিই বিশ্বতোমুখ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপীরূপে নব নব ভাবে নবীনতর হইয়া শিশুরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতেছ। এই মহীমণ্ডলে তুমি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমিই উৎপাদ্য এবং তুমিই উৎপাদক, আবার স্বাধীন মহিমা বলে তুমিই উৎপন্ন হইতেছ। এইব্যক্তি স্ত্রী, এইব্যক্তি পুরুষ, এই ব্যক্তি যুবক, এই ব্যক্তি যুবতী এবং এই ব্যক্তি বৃদ্ধ বা এই শিশু সদ্যোজাতঃ ইত্যাদি পার্থক্য জ্ঞান অজ্ঞানছায়াবৃত লোক-নয়নের অলীক অবলোকনের ফল মাত্র; বস্তুতঃ তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয় এবং তুমিই সমস্ত। আদিও তুমি, মধ্যও তুমি এবং অন্তও তুমি। জন্ম, বৃদ্ধি এবং বিনাশ, এই অবস্থাত্রয় তোমারই বিভূতির প্রকার ভেদ-মাত্র। তুমিই অনন্ত এবং তুমিই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ।

বিশেষার্থ। পাঠক! এস্থলে এক বার এই উপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ১৬শ সূত্রটী স্মরণ করুন—

এষ হ দেবঃ প্রদিশোঽনুসর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ সউ গর্ভে অন্তঃ।
স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ॥

(পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)

আবার মনু বলিতেছেন—

দ্বিধা কৃতাত্মনো দেহং অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥১।৩২

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ আপনার দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধেক অংশে নারী সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই নারীর গর্ভে বিরাটকে উৎপাদন করিলেন। অতএব ইহা দ্বারাও ভগবান্ মনু বলিতেছেন যে, পুরুষ বা নারী, উৎপাদ্য বা উৎপাদক, এ সমস্ত আর কিছুই নহে, কেবল তাঁহার আত্ম-শক্তির বিভিন্ন প্রকার স্ফুরণ মাত্র।

এ দিকে দেখুন—ভগবান নিজেই বলিতেছেন,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়-স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ গীতা—১০।২০
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন! গীতা—১০।৩২

হে জিতেন্দ্রিয়! সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থিত আত্মা আমিই। ভূত-নিবহের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার আমিই; এ সমস্ত আমারই বিভিন্নবদ্ভাসমানা অলৌকিকী অবস্থার বিকাশ। হে অর্জ্জুন! আমিই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত; অর্থাৎ আমিই শিশুরূপে জাত হইয়া কৌমারে কুমাররূপে বর্দ্ধিত হই, আবার আমিই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধরূপে পরিণত হইয়া জীর্ণ কায়া পরিহার পূর্ব্বক জলৌকাবৎ দেহান্তর আশ্রয় করি। জন্ম-বৃদ্ধি-মরণ আমারই অবস্থাভেদ মাত্র। আমিই সমস্ত। মদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।

৪

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষঃ
তড়িদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
অনাদিমত্ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে
যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ॥

অন্বয়ঃ—নীলঃ পতঙ্গঃ লোহিতাক্ষঃ হরিতঃ, তড়িদ্গর্ভঃ (জলদঃ), ঋতবঃ, সমুদ্রাঃ চঃ (ত্বম্ এব অসি)। অনাদিমৎ ত্বম্ বিভুত্বেন বর্ত্তসে, যতঃ (ত্বত্তঃ) বিশ্বাঃ (বিশ্বানি) ভুবনানি জাতানি।

বিষমপদব্যাখ্যা—হরিতঃ—শুকাদি পক্ষী। তড়িৎ-গর্ভঃ—তড়িৎ গর্ভে যস্য স মেঘঃ। বিদ্যুদ্দাম—বিকাশিত নেত্র-রমণীয় জলদশ্রেণী। অনাদিমৎ—আদিশূন্য অর্থাৎ অনাদি। ত্বম্—তুমি। বিভুত্বেন—ব্যাপকত্বেন সর্ব্বব্যাপিরূপেণেত্যর্থঃ—সর্ব্বব্যাপিরূপে। বিশ্বাঃ—বিশ্বানি (অত্র ক্লীবত্বভাগ্ভুবনশব্দস্য বিশেষণীভূত—বিশ্বশব্দস্য পুংস্ত্বম্ ছান্দসম্) সমগ্র।

বঙ্গার্থ—নয়নরঞ্জন নীল পতঙ্গ নিবহ, মনোমোহকর লোহিতনেত্র শুকাদি সুকণ্ঠ পক্ষিকুল, বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতনেত্র রমণীয় জলদমালা, নবজীবনপ্রদ উল্লাসময় বসন্তাদি ঋতু নিকর এবং অনন্ত অতলস্পর্শ জলধি, এ সমস্ত তুমিই, তোমারই প্রকার-ভেদ মাত্র। তোমার আদি নাই, অথচ এই বিশ্বভুবনের সত্তা আদিকর্ত্তা তোমাতে বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ তুমি নিজে অনাদি হইয়াও জগতের আদি রূপে বিরাজ করিতেছ। তোমার অচিন্তনীয় শক্তি সন্নিধানে কার্য্যকারণের অবস্থা হইয়াছে। অনাদি কারণ তুমি অনাদিমান্ ভুবনের কর্ত্তা। তুমি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপকরূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান রহিয়াছ। যেহেতু এই বিশ্বভুবন তোমা হইতে উৎপন্ন হইতেছে। তোমার ব্যক্তিত্বই এই বিশ্বোদ্ভাবনের নিদান।

বিশেষার্থঃ। চঞ্চলমনোরম পতঙ্গ শ্রেণী, শ্রবণরঞ্জন সুকণ্ঠ শুক-পিকাদি বিহঙ্গম-কুল তোমারই অংশ, তোমার করুণা-প্রস্রবণের সুশীতল সলিলকণা। হাস্যময়ী সৌদামিনীর ঘনকৃষ্ণ জলদ-ক্রোড়ে নর্ত্তন তোমারই বিভূতি। বসুন্ধরার রত্নাভরণ-প্রতিম প্রসূন ও সৌরভামোদিত বসন্তাদি ঋতু-সন্দোহ তোমারই মহিমার প্রতিকৃতি।

সুনীল প্রশস্ত অনন্ত সমুদ্র তোমারই করুণা-বারিধির রূপান্তর মাত্র। এ জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রীতিময়, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, তাহা তোমারই অংশ। তুমি নিজে নিত্য সুন্দর, শুদ্ধ, শান্ত, নির্ম্মল, তাই তোমার অংশজাত পদার্থও তদ্রূপ। হে নাথ! তুমি নিজেই বলিয়াছ—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বম্ শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোঽংশসম্ভবম্॥

এই ধরাধামে যা কিছু শ্রীমান্, যাকিছু বিভূতিমান বা যা কিছু প্রতিভাবান্, তাহা আমারই অপ্রতিহত তেজের অংশ-সম্ভূত। আমরা দৃষ্টিহীন—বিবেক-হীন, তাই সর্ব্বভূতে বিরাজমান তোমার বিরাট সত্তা অবলোকন বা মনে ধারণ করিতে সমর্থ হইনা। তুমি আমাদের নয়নে নয়নে নয়ন রাখিয়া ক্রীড়া করিতেছ, কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছিনা! যখন অন্ধকারময় মাতৃগর্ভে অপ্রতিবুদ্ধভাবে শয়ান ছিলাম, তখন তুমিই তোমার সকরুণ করস্পর্শে আমাদিগকে জীবিত রাখিয়াছিলে। আবার যখন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলাম, তখন তুমিই জননীরূপে তোমার সুকোমল স্নেহ-সিক্ত অঞ্চলে আমাদিগকে স্থান দান করিয়াছিলে। তৎপর হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তুমিই রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ; আবার হে নিরঞ্জন! তুমিই শুক-পিক-পতঙ্গাদি, শশাঙ্ক-তারকা-চন্দ্রিকা প্রভৃতি, তড়িন্মেঘাবলী ও শারদ বসন্ত প্রভৃতি দ্বারা নিয়ত আমাদের হৃদয়রঞ্জন করিতেছ। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

গীতার্থ।

ভূমিকা

(১। গীতার মুখ্য উপদেশ)

(১) লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর বশীভূত নাহইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা উচিত।

২। ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য এক হইলেও জীবের প্রকৃতি (স্বভাব) এবং স্বাভাবিক জ্ঞানানুরূপ ধর্ম্মও স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যাহার যেরূপ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম সম্পাদন করা তাহার কর্ত্তব্য এবং যাহার যে কর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা করা অকর্ত্তব্য।

৩। জ্ঞানালোকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পরীক্ষা করিয়া নিষ্কাম ও অনাসক্তভাবে ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে উচিত।

৪। স্বভাবতঃ জীবধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ এবং মানবের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্নরূপ হইলেও সত্য ধর্ম্ম এক ; অতএব মানবের স্বধর্ম্ম (Duty) পালন দ্বারা কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে এবং লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য রূপ অজ্ঞানাবরণ দূরীভূত হইলে, জ্ঞানালোকে ঐ নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সোপান দ্বারা সত্য-ধর্ম্ম-মন্দিরের প্রাসাদারোহণ করা যায় ; উহা মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য।

৫। প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়-শক্তির ধ্বংস বা শক্তির হ্রাস কি কর্ম্ম পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম নহে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না এবং ইন্দ্রিয় ধ্বংস হইলে কামনানল নির্ব্বাপিত হয় না ; মনঃসংযম ও মনোবৃত্তি বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়াদিও বশীভূত হয় ; অতএব নিস্বার্থভাবে মনঃসংযম পুরঃসর ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন অভ্যাস করিতে করিতে কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয়, উহারই নাম যোগাভ্যাস। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কামনার অধিষ্ঠান-ভূমি। ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তুর চিন্তা হইতে ঐ ভোগ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি জন্মে, ঐ আসক্তি হইতে বস্তু-প্রাপ্তির কামনা বলবতী হয় ; কামনা বলবতী হইলে, স্বীয় স্বার্থের জন্য মানব দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়। জগতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা কামনা-জনিত স্বার্থপরতা হইতে সম্পন্ন না হইতে পারে, এইজন্য সর্ব্বাগ্রে আসক্তি ও কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন করা উচিত। ঐ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও আয়ত্তাধীন হইলে, মন নিশ্চল ও বুদ্ধি স্থির হয় এবং মানব অনাসক্ত, নিষ্কাম এবং যথার্থ কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। কামনা-জনিত স্বার্থের বিঘ্ন হইলে, দুঃখ উপস্থিত হয়। কামনানল নির্ব্বাপিত (অর্থাৎ বিবেকাধীন) হইলে, কামনা-জনিত সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ থাকে না ; অতএব কামনানল নির্ব্বাপিত করিয়া স্বীয় স্বার্থপরিত্যাগ ও কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বপতির বিশ্বসেবা দ্বারা ধর্ম্ম-মন্দিরের উচ্চশিখররূপ জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ যাহাতে লাভ করা যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাই গীতার উপদেশ ও মুখ্যউদ্দেশ্য।

(২। গীতার উচ্চনীতি।)

সত্যধর্ম্ম কি ? মানবের জ্ঞানাতীত ঈশ্বরে কর্ম্মফল কি প্রকারে সমর্পিত হইবে ? বা সচ্চিদানন্দ লাভ কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ?

এই কয়েকটি কঠিন প্রশ্নের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ এবং উচ্চনীতি যাহা গীতায় অতি সুকৌশলে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত আছে, তাহা যদিও শ্লোক ব্যাখ্যায় সমস্ত বিশদ হইবে, তথাচ এই ভূমিকায় সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আভাস প্রকাশ করা আবশ্যক ; তদ্দ্বারা গীতার পূর্ব্বোল্লিখিত উপদেশ এবং উদ্দেশ্য বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি, শিব সংহারশক্তি এবং বিষ্ণুই বিশ্বের স্থিতি-শক্তি। এই ত্রিশক্তি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছে ; ঐ ত্রিশক্তির আধারই ঈশ্বর। প্রকৃতপক্ষে জীব ব্যষ্টি, ঈশ্বর সমষ্টি ; যথা—

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টি সমষ্টিতা॥
সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোহন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥

(পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক, ২৪। ২৫ শ্লোক।)

উপরোক্ত শ্লোক দ্বয়ের তাৎপর্য্যার্থ——ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণ পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গ-শরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর, তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এইজন্য তাঁহার নাম হিরণ্য-গর্ভ। পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও, এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি ব্যষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভি-মানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টীভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্য-গর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি স্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যষ্টিস্বরূপ॥ ২৪

লিঙ্গশরীরোপাধি বিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্ রূপ জ্ঞান করে॥২৫ (সরল তাৎপর্য্য বা সার-নীতি) যাঁহার আপনার সহিত সর্ব্বপ্রাণীর অভেদজ্ঞান, যাঁহার আপনার ন্যায় সর্ব্ব-প্রাণীর সুখ দুঃখে সমবেদনা, যাঁহার জগতের হিতই আপনার হিত, তিনিই ঈশ্বর বা মুক্তপুরুষ। অতএব সর্ব্বপ্রাণীর আপনার সহিত অভেদজ্ঞান নিশ্চয় হইলে, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া যে শিবত্ব প্রাপ্তি বা ব্রহ্মত্ব লাভ হয়, তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। সমস্ত জীবের আত্মা এক; তবে পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতে আত্মজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হওয়ায় পৃথক্ পৃথক্ আমিত্বের উপলব্ধি অর্থাৎ আপনাকে অন্য হইতে পৃথক্ জ্ঞান ও আপনার শারীরিক এবং মানসিক সুখ-দুঃখ অন্যের সুখ দুঃখ হইতে পৃথক্ উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিও পৃথক্ আমিত্বজ্ঞাপক ব্যষ্টিতত্ত্ব নহে। চিদ্বিম্বিতা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ী ঐ শক্তিই ঐশ্বরী-শক্তি এবং ঐশক্ত্যুপহিত চিদ্বিম্ব বা চৈতন্যাকারই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। জীবের বুদ্ধি রজস্তম-মিশ্রিতা; কাম, কর্ম্ম, ভ্রান্তি ও মোহাদি-দূষিতা; অতএব মলিনসত্ত্বগুণোৎপন্না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের, রজো-গুণদ্বারা প্রবৃত্তি এবং তজ্জনিত কর্ম্মের ও তমোগুণদ্বারা সত্য জ্ঞানানন্দের আবরণ রূপ ভ্রান্তি, মোহ, অজ্ঞানতা ও জড়ত্বের বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধি, মন সত্ত্বগুণোৎপন্ন,

প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি রজোগুণোৎপন্ন, পঞ্চভূত ও ভৌতিক জড়-জগৎ ও জীবদেহ তমোগুণোৎপন্ন। সত্ত্বগুণোৎপন্ন বুদ্ধি তত্ত্বচৈতন্যের দর্পণ স্বরূপ। ঐ দর্পণ নির্ম্মল হইলে, সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণস্থ চৈতন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পূর্ণ চৈতন্যাকারে বিম্বিত হয়। ঐ চিদ্বিম্বিত বুদ্ধি-দর্পণের উপরিভাগ কামরঙ্গে রঞ্জিত এবং তমোময় জড়াবরণে আবরিত হয়। ঐ আবরণ ভেদ করিয়া এক একটী পৃথক্ পৃথক্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন স্বচ্ছ বিন্দু প্রতিবিম্বিত মলিন চিদাভাস মাত্র বাহ্য জগতে প্রকাশিত হয়। ঐ আবরণই জড়জগৎ এবং বিন্দুকারে প্রতিবিম্বিত পৃথক্ পৃথক্ মলিন চিদাভাসই জীব। ঐ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীবই মনুষ্য, উদ্ভিদ এবং পশু-পক্ষ্যাদি। জীব-জগৎ তমোময় জড়াবরণে আবরিত—চিদগ্নি ধূমায়মান মাত্র। উদ্ভিদ্-জগতে বাহ্যজ্যোতির অপ্রকাশ। পশু পক্ষ্যাদি জীব-জগতে সামান্য অস্পষ্ট-প্রকাশ। অতএব ঐ জীবশ্রেষ্ঠ মানবে অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞান-জ্যোতি কথঞ্চিৎ বিকাশিত হওয়ায়, মানব যদি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন কর্ম্ম বিশুদ্ধ সত্ত্বাভিমুখে করিতে পারে, তবে পূর্ব্বোক্ত দর্পণের তমাবরণের মধ্য দিয়া সত্ত্ব-জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ঐ সত্ত্ব-জ্যোতিতে তমাবরণ আলোকিত হইলে, বুদ্ধিরও মলিনত্ব দূরীভূত হয়। বুদ্ধির মলিনত্ব দূরীভূত হইলে, এক বিন্দুর সহিত অন্য বিন্দুর মধ্যে আবরণ জনিত ব্যবধান বা ব্যবচ্ছেদ অন্তর্হিত এবং ঐ বিন্দু-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই সমষ্টি-বুদ্ধি-দর্পণ-বিম্বিত পূর্ণ চৈতন্যের সহিত একীভূত ও মিলিত হয়; অর্থাৎ বিন্দুতে অনন্ত প্রতিভাত হয়।

যখন সর্ব্বজীবের আত্মা এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্ম-জ্যোতি, কেবল ভ্রান্তি-রূপ আবরণ হেতু বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চিজ্জ্যোতি ক্ষুদ্র এবং মলিন প্রতিভাত হওয়ায়, জড় দেহই আমি এবং দেহের ও দেহ-সংসৃষ্ট মনের সুখ-দুঃখই আমার, অনুভূত হয়; তদ্ধেতু পৃথক্ আত্মা বলিয়া প্রতীতি হয়; তখন ভ্রান্তিরূপ আবরণ অন্তর্হিত এবং কর্ম্ম নিষ্কাম হইলে, জ্ঞানালোক দ্বারা আপনাতে সমস্ত জীব এবং সমস্ত জীবে আপনাকে দৃষ্ট হয়। বর্ণনানুসারে বিশ্বের সমগ্র জীব এক ঈশ্বরে অবস্থিত বা সমগ্র জীবে ঈশ্বর বিদ্যমান থাকায়, কর্ম্ম বিশ্বহিতের নিমিত্ত বা অন্ততঃ সাধারণ মানব-সমাজের হিতের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে* অবশ্য কর্ম্মফল ঈশ্বর-সমর্পিত হয়। বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্মই যজ্ঞ; বিষ্ণু সর্ব্বজীবে বর্ত্তমান থাকায় বা সর্ব্বজীব বৈষ্ণবী শক্তিতে অবস্থিত থাকায়, সাধারণের হিতজনক কর্ম্মই যে বিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম বা যজ্ঞ, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, জগতের সাধারণের হিতকর কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে বিশ্বহিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে কর্ম্মও ঈশ্বরে সমর্পিত হয় এবং আপনার আত্মা বিশ্বের আত্মায় মিশাইতে পারিলে, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয়।

* সমগ্র মানবজাতির হিতের সহিত অন্যান্য জীব-জগতের হিত যে সংসৃষ্ট আছে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

(৩। আসক্তি ও কামনাত্যাগ।)

আধুনিক ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবাগণের মধ্যে অধিকাংশই এই বলিয়া তর্ক করেন যে, "মানব আসক্তি বা কামনাশূন্য হইতে পারেনা। বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম কি কামনা-জনিত নহে? পরহিতে আসক্তি না জন্মিলে, কখনই পরহিতানুষ্ঠান হইতে পারেনা" ইত্যাদি; ইহার উত্তর এক কথায় এই দেওয়া যাইতে পারে, মনের সমতা উপস্থিত হইলে এবং সমস্ত কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র বিশ্বহিত হইলে, তাহাকে কামনা বা আসক্তি সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারেনা। কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয় অন্য হইতে পৃথক্‌রূপে পরিচয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ চিনিবার নিমিত্ত তাহার একটী নাম বা সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তদনুসারে নিজের সুখের নিমিত্ত আপনার কি আত্মীয়, সুহৃদ্ ও পোষ্যবর্গের ভোগ্য বা কাম্য বস্তু প্রাপ্তি বা রক্ষার অভিলাষকে কামনা এবং অনুরক্তিকে আসক্তি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য বিশ্বহিত হইলে, যদি ঐ মহৎ উদ্দেশ্যকেই কামনা ও আসক্তি নামে অভিহিত কর, তবে তোমার নিজের ভোগ্য বস্তুর কামনা ও আসক্তিকে কি ঐ একই নামে অভিহিত করিবে? এই জন্য প্রাচীন ঋষিরা বিশ্বহিতজনক কর্ম্মের উদ্দেশ্যকে নিষ্কাম সংজ্ঞা দিয়াছেন, ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। ইহাই তাঁহাদের বর্ণনার অভিপ্রেত। প্রকৃত পক্ষে বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্মের ফলও বিশ্বহিতে নিয়োজিত এবং বিশ্ব-পতির চরণে সমর্পিত হয়। নিজের স্বার্থের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অধিকাংশস্থলে বিবেক, ন্যায় ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-বিগর্হিত; কেবল আসক্তি ও কামনা-প্রসূত হয়; যেহেতু বিষয় বিশেষে আসক্তি ও কামনা প্রবল হইলে, মন এবং বুদ্ধি ঐ আসক্তি এবং কামনার যন্ত্র-স্বরূপ হওয়ায়, ঐ আসক্তি ও কামনা মানবকে স্বীয় দাসত্বে নিয়োজিত, কর্ত্তব্য কর্ম্ম-ভ্রষ্ট এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করিয়া ঐ বুদ্ধিরূপ যন্ত্রদ্বারা অভীপ্সিত কার্য্য (যতই পরানিষ্ট ও দুষ্কর্ম্ম হউক না কেন) সম্পাদন করিয়া লয়; কিন্তু বিশ্ব-হিতের নিমিত্ত কর্ম্ম তদ্রূপ বিষয় বিশেষে আসক্তি বা কামনা হইতে অনুষ্ঠিত হইতে পারেনা; কেবল বিবেক এবং স্বাধীন কর্ত্তব্য বুদ্ধিদ্বারা সম্পাদিত হয়। বিশ্বে বহু জীব থাকায়, বহু লোকের বা বহু সম্প্রদায়ের হিতজনক কর্ম্ম হইলেও, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের অহিতকর হইতেও পারে, অথবা এক পক্ষে হিতজনক, পক্ষান্তরে অহিত-জনক হইতেও পারে; এই জন্য প্রত্যেক কর্ম্ম হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-নির্ণীত এবং তদ্দ্বারা কর্ম্ম নির্বাচিত হইয়া অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোন একটী প্রবল মনোবৃত্তির বেগ বশতঃ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ঐ কর্ম্ম কখনই জ্ঞানালোক দ্বারা পর্য্যবেক্ষিত এবং ন্যায়বিচার-প্রসূত হইতে পারেনা। জ্ঞানালোকদ্বারা পর্য্য-বেক্ষিত অন্তর্দৃষ্টি, যুক্তি ও বিবেক-অনুমোদিত, ন্যায় ও বিচার-প্রসূত এবং কর্ত্তব্য-

বুদ্ধিদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মে আসক্তি ও কামনার বেগ এবং নিজের স্বার্থের গন্ধ থাকিতে পারেনা, তদ্ধেতু ঐ কর্ম্মকে কখনই সকাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারেনা। মনে কর, ধর্ম্মাধিকরণে যে বিচারকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঐ কর্ম্মকে সাধারণের হিতজনক কার্য্য বলা যাইতে পারে, যেহেতু বিচার কার্য্য দ্বারা সমাজের অনিষ্ট নিবারিত এবং ইষ্ট বা মঙ্গল সাধিত হয়। বিচার কার্য্যের উদ্দেশ্যই সাধারণের হিত। ঐ বিচার কালে অবস্থা ও প্রমাণাদি পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণীত হয়; উহাকেই বিবেক, যুক্তি ও ন্যায়-বিচার-মূলক কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ বিবেক ও যুক্তি-মূলক ন্যায় বিচার দ্বারা যাহা কর্ত্তব্য নির্ণীত হয়, তাহাতে নিজের বিশেষ লাভের হানি হইলেও ঐ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। কাম্য ও ভোগ্য বস্তু লাভের অভিলাষ-কেই কামনা বলে; অতএব নিজের লাভের বিরুদ্ধ কিম্বা যাহাতে নিজের লাভালাভ কিছু মাত্র নাই, তদ্রূপ ন্যায়বিচার-মূলক পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে কি সকাম বলিবে? অবশ্যই স্থলবিশেষে ন্যায়, যুক্তি ও বিবেক-প্রণোদিত কার্য্যও কামনার অনুকূল হইতে পারে, কিন্তু ঐস্থানে কামনা গৌণ; বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় মুখ্য; উহাও কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে পরি-গণিত।* নিজের ভোগ-লিপ্সা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিলে, ঐ কর্ম্মকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। ঐ নিষ্কাম কর্ম্ম বিশ্বহিতে নিয়োজিত হইলে, ঐ কর্ম্মের ফলও ঈশ্বরে সমর্পিত হয়, তদ্দ্বারা যোগসিদ্ধি বা ব্রহ্মলাভ হয়।

জ্ঞান, কর্ম্ম এবং ভক্তির উদ্দেশ্য।

গীতায় মুখ্যতঃ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ, এই ত্রিবিধ যোগের বিষয় বর্ণিত আছে; কিন্তু ঐ তিনটী পথ চরমে এক হইয়া এক গম্য স্থানে পৌঁছিয়াছে; অথবা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণীর সঙ্গমের ন্যায় একী-ভূত হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে। সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগের ফল যে এক, তাহা গীতার ৫ম অধ্যায়ের ৪র্থ ও পঞ্চম শ্লোকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উভয়ের একই লক্ষণ ঐ ৫ম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। জ্ঞান-যোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগীকে যোগারূঢ় বা যোগ-যুক্ত যোগী কহে। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক হইতে ৫৯ শ্লোকে এবং যোগীর লক্ষণ ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোক হইতে ২৩ শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত আছে। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ বা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীর সহিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগীর কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। যিনি রাগ, দ্বেষ, ভয়, ক্রোধ ও স্নেহের বশীভূত না হইয়া মনের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুভাশুভ সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি সত্ত্বে কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় ভোগ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ ও অন্তর্হিত

* কার্য্যকারীও বিশ্বের অন্তর্গত; বিশ্বের হিতের সহিত কার্য্যকারীর হিতও সংসৃষ্ট, এই তত্ত্ব হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, যথাস্থানে তাহার মীমাংসা হইবে।

করিতে এবং পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মন হইতে বিষয়-রস বা ভোগাভিলাষ নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যিনি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না এবং সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করেন, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী ও মুক্ত। যিনি সর্ব্ব কামনা হইতে নিস্পৃহ, যাঁহার অন্তর নিবাতস্থ দীপের ন্যায় স্থির, যিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই নিত্য সুখলাভ করায় যাঁহাকে গুরু দুঃখেও বিচলিত করিতে পারেনা, যাঁহার সর্ব্বজীবের আত্মাই নিজ আত্মা, যিনি জিতেন্দ্রিয় ও আত্মজয়ী, তিনিই যোগী। ঐ যোগী ব্যক্তি আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করেন। উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ দুইটী নদীর সঙ্গমস্থান একই, প্রদর্শিত হইল; এক্ষণে গীতার ভক্তিরূপা নদীর উপরোক্ত সঙ্গমে মিলন প্রদর্শিত হইবে। যিনি সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্টা (অর্থাৎ দ্বেষশূন্য) মৈত্র, কৃপালু, মমতাহীন, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, সংযতচিত্ত, মদ্বিষয়ে (ঈশ্বর বিষয়) স্থিরলক্ষ্য অর্থাৎ ঈশ্বরে মন-বুদ্ধি সমর্পণকারী, যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও চিত্ত-ক্ষোভ হইতে মুক্ত, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে নিস্পৃহ, শুচি, কার্যদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগী, যিনি প্রিয় বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, ইষ্ট নাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী, যাঁহার শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞান, যিনি মানে অপমানে একরূপ, শীত-উষ্ম-সুখ-দুঃখ-বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা-প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, বাক্-সংযমী এবং অল্পে সন্তুষ্ট, তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও প্রিয়। অতএব উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা ভক্তিরূপা নদীও উপরোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মরূপা নদীর সহিত মিলিত হইয়া ঐ ত্রিস্রোতে এক মহানদী রূপে পরিণত হইয়াছে। এখন বুঝিলাম যে, জ্ঞানী সংযতমনা, ইন্দ্রিয় ও কামজয়ী এবং স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিরবুদ্ধি হইয়া আপনাতে বিশ্ব এবং বিশ্বের প্রত্যেক ভূতে আপনাকে দেখিয়া, বিশ্ব-হিতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পরম জ্ঞান ও পরমানন্দ লাভ করেন। কর্ম্মযোগী ভোগাভিলাষশূন্য হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূত অবস্থিত দর্শন করিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিমান্ হইয়া সর্ব্বকর্ম্ম বিশ্ব-হিতে নিয়োজিত ও বিশ্বেশ্বরের পদে সমর্পণ পূর্ব্বক নিষ্কাম জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া পরম সুখী হন।

ভক্ত সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, কৃপালু, শত্রু-মিত্রে সমজ্ঞানী, নিন্দা-স্তুতি-মানাপমানে একরূপ, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, শুচি, কর্ম্মদক্ষ, অনলস, পক্ষপাতশূন্য, সদা সন্তুষ্ট ও সর্ব্ববিষয়ে গতরাগ হইয়া নির্লিপ্তভাবে ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের কর্ম্ম জ্ঞানে সর্ব্বকর্ম বিশ্বেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া বিশ্ব-পতির বিশ্ব সেবায় নিয়োজিত হইয়া পরা ভক্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের আধ্যাত্মিক ও লৌকিক ব্যাখ্যা)

গীতার পূর্ব্বোক্ত ত্রিস্রোতা এক মহানদরূপে পরিণত হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। যেমন পার্ব্বত্যীয় সামান্য ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী সমতল ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে স্রোতের বেগ বশতঃ ঐ সমতল নিম্ন ভূম ভেদ পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর পরিবর্দ্ধিত করিয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করে, সেইরূপ গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি-রূপা নির্ঝরিণী স্বীয় বেগ বশতঃ সংসার-ক্ষেত্র ভেদ ও স্বীয় আয়তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বিশ্বনাথের বিশ্ব সাগরে মিলিত হয়। গীতায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি-যোগের বিবরণ এবং জ্ঞানী, কর্ম্মী ও ভক্তের লক্ষণ যেরূপ বিশদভাবে বর্ণিত আছে, ঐ সকল যোগের কার্য্য-পদ্ধতি তদ্রূপ বিশদভাবে নাই, কেবল আভাষ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গীতার প্রথমে সাংখ্যযোগের লক্ষণ-নির্ণয় মধ্যে কর্ম্মযোগে ও ভক্তি-যোগের বিশদ বর্ণনা, সর্ব্বশেষে পুনর্ব্বার জ্ঞানযোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য-যোগের তাৎপর্য্য আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয়; কর্ম্মযোগের তাৎপর্য্য অনা-সক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ এবং ভক্তি-যোগের তাৎপর্য্য ঈশ্বরে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-সেবা দ্বারা বিশ্বে-শ্বরত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ। উপরোক্ত তিন প্রকার পথই কঠিন। সাধক নিজের স্বার্থ বা কামনা জনিত সুখাভিলাষশূন্য না হইলে, নিষ্কাম কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন বা প্রকৃত বিচার দ্বারা তত্ত্ব-নির্ণয়, কি ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ হয়না। এই জন্য শরীর ও মন আয়ত্তাধীন করা আবশ্যক। উহার পর্য্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া বা কার্য্যপদ্ধতি গীতায় বিশদভাবে নাই, তবে কিঞ্চিৎ আভাষ যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যার সময় প্রদর্শিত হইবে। উপরোক্ত পর্য্যায়ক্রমিক কার্য্যপদ্ধতি গীতায় না থাকার কারণ এই যে, গীতা প্রণয়নের সময় ভারতবাসী আর্য্যগণের কালোচিত শিক্ষা ও কার্য্যপ্রণালী যাহা প্রচলিত ছিল, তৎব্যতীত উহার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতি গীতায় সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই; তবে যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার আভাষ গীতায় আছে। তৎকালে বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রম প্রচলিত ছিল। বাল্যে গুরুগৃহে সংযমী ও নিয়মী হইয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, পুরাণ, স্মৃতি, গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ ও তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বা তাৎপর্য্যার্থ বিশদরূপে পরিগৃহীত হইত এবং তাহার কার্য্যতঃ ব্যবহারোপযোগী শিক্ষাও প্রদত্ত হইত; সংযম বা যম অর্থে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (পরদ্রব্যাপহরণ হইতে নিবৃত্তি) ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (বাসনা ত্যাগ); নিয়মার্থে শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বর-প্রণিধান বুঝায়। তপস্যা তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। *

* গীতার ১৭ অধ্যায়ের ১৪। ১৫। ১৬ শ্লোকে ত্রিবিধ তপস্যার লক্ষণ আছে; উহা সম্পূর্ণ নীতি-শাস্ত্রমূলক। ঐ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

আসন, প্রাণায়াম এবং প্রত্যাহার তপস্যার অন্তর্গত; অতএব আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অভ্যাস করা হইত। উপরোক্ত যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, এবং প্রত্যাহারকে পঞ্চাঙ্গ-যোগ বলে। ঐ পঞ্চাঙ্গযোগ অনুশীলন দ্বারা শরীর এবং মন আয়ত্তাধীন হয়। প্রণিধান দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূরীভূত এবং বুদ্ধি স্থির হয়। তদ্দ্বারা মনের ভাব-সংশুদ্ধি এবং আত্মপ্রসন্নতা লাভ হয়; তদ্ভিন্ন ধারণাশক্তিরও বিকাশ হয়। ব্রহ্মচারী বাল্যকাল হইতে প্রথম যৌবন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে উপরোক্ত শিক্ষা লাভ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া, পূর্ণ যৌবনে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। আর্য্য-সমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতা-প্রণয়ন কালে উহা কার্য্যতঃ বিকৃত হইলেও, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম একেবারে লোপ পায় নাই; তজ্জন্য গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-শিক্ষার স্বতন্ত্র কার্য্যপদ্ধতির পর্য্যায়ক্রমে সন্নিবেশ আবশ্যক হয় নাই। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন মানবের শিশুকালে উপযুক্ত শিক্ষালাভ এবং চরিত্রগঠন হইলেও, যৌবনকালে ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে ও লোভ, মোহ, কামাদি-রিপু-প্রভাবে নীতিমার্গ হইতে বিচ্যুতি এবং পদস্খলন হইতে পারে; সেইরূপ শিক্ষা এবং উচ্চনীতি—পূর্ব্বসমাজের যৌবনাবস্থায় ঐশ্বর্য্য-মদ-মত্ততা এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হেতু সমাজও নীতি-মার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া ঘোর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতে পারে। যখন পূর্ব্বোল্লিখিত শিক্ষিত যুবা নীতিভ্রষ্ট ও স্খলিতপদ হইয়া পাপপঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত ও ঘোর কষ্টে নিপতিত হয়, তখন ঐ কষ্ট তাহার অন্তরের অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মাকে জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপ আত্মা জাগরিত হইলে, ঐ আত্মজ্যোতি-প্রতিবিম্বিত সদ্বুদ্ধি ও বিবেক উদিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রিপুগণকে ধ্বংস পূর্ব্বক নীতি-মার্গভ্রষ্ট যুবাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিয়া স্বীয় গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়; কিন্তু ঐ পথ-প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ যুবার বাল্যকালের অধীত গ্রন্থাদি পুনঃ পাঠের বা তাহার কার্য্যপদ্ধতি পুনঃ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। একটী মানবের পক্ষে যে নিয়ম প্রযোজ্য, মানব-সমষ্টি লইয়া যে সমাজ স্থাপিত হয়, ঐ সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম প্রযোজ্য। মানব-দেহের যেরূপ শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আছে, সমাজ-দেহেরও তদ্রূপ আছে। ব্যক্তিগত ভাবে মানবের অন্তরের ন্যায় সমাজের অভ্যন্তরেও সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী ও আসুরী শক্তি অন্তর্নিহিত আছে এবং অনবরত তাহাদের সংগ্রাম চলিতেছে। ইন্দ্রিয়-পরবশ যুবার যৌবনকালের ন্যায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত সমাজের যৌবন কালে আসুরী শক্তি দৈবী শক্তিকে পরাভব এবং সমাজনেতাগণকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় পরিণত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাজকে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত করিতে পারে। যখন তদ্রূপে সমাজ পাপ-পঙ্করূপ নরকে নিমজ্জিত হয়, তখন সমাজের প্রধান এবং সমাজের নেতা ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অত্যাচারে এবং

পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ, হিংসা, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি অপব্যবহার দ্বারা অধিকাংশ লোক প্রপীড়িত এবং ঘোর কষ্টে নিপতিত হইয়া তাহাদের (অর্থাৎ প্রপীড়িত সমাজের) অন্তরের বেদনা অন্তরের গূঢ়তম স্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ সমাজের বিরাট আত্মা বা সমষ্টি-আত্ম-শক্তি জাগরিত করাইতে পারে; তদ্রূপে সমাজের আত্ম-শক্তি জাগরিত হইলে, সর্ব্বজ্ঞান ও সর্ব্বমঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব-নিয়ামিকা জ্ঞান ও কার্য্য-শক্তি জাগরিত হয়, এবং তাঁহার সেই বিশ্ব-নিয়ামিকা পরমজ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত সমাজের আভ্যন্তরিক দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ পুনঃ বিকাশিত এবং তৎকর্ত্তৃক আসুরী শক্তি বা আসুরী সম্পদ্ বিনষ্ট হয়; অতএব পূর্ব্বোক্ত সমাজের বিরাট আত্মা-স্বরূপ পরমজ্ঞান-জ্যোতি বা পরমাত্ম-জ্যোতিই শ্রীকৃষ্ণ। সমাজের অন্তরের সদ্বৃত্তি-রূপা দৈবী শক্তি বা দৈবী সম্পদ্ই পাণ্ডব-পক্ষ এবং অসদ্বৃত্তি রূপা আসুরী শক্তি বা আসুরিক সম্পদ্ কুরু-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। বিবেক সদ্বৃত্তির মধ্যে একটি প্রধান, যেহেতু বুদ্ধি প্রভৃতির ন্যায় বিবেক ইন্দ্রিয় বা কামনার বশীভূত হইয়া কার্য্য করেনা, স্বাধীনভাবে কার্য্য করে; কিন্তু বিবেকে প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতি-ভাসিত না হইলে, কর্ত্তব্য বা সদ্‌ভ্রমে বিবেক কর্ত্তৃক অকর্ত্তব্য ও অসৎ কার্য্য অনু-ষ্ঠিত হইতে পারে; অতএব অর্জ্জুনরূপ বিবেক প্রথমতঃ নিবৃত্তিরই ঔচিত্য বোধে প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত হইয়াছিলেন; তদনন্তর ঐ অর্জ্জুন রূপ বিবেক, শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরমজ্ঞান কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বা ঐ জ্ঞান-জ্যোতি-প্রতিভাসিত হইয়া যে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন, ইহাই গীতার আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা। * এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা লৌকিক ইতিহাসের প্রতিকূল নহে এবং এই আধ্যাত্মিকী ব্যাখ্যা দ্বারা ঐতিহাসিক কৃষ্ণার্জ্জুন ও কুরু-পাণ্ডবের সত্তা বিলুপ্ত হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, সমাজের অন্তরের বেদনা অন্তরতম স্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সমাজের বিরাট আত্মা জাগরিত হন; প্রকৃতপক্ষে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি বা পরম-জ্ঞান-জ্যোতি সমাজস্থ কোন আদর্শ মানববিশেষে ঘনীভূত ও প্রতিবিম্বিত হয়; তদ্রূপ না হইলে এবং তদাভাসে সমাজের কতকাংশ উচ্চমনা ব্যক্তির অন্তর প্রতিভাসিত ও উজ্জ্বল না হইলে, নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট এবং পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত সমাজ কখনই উদ্ধৃত এবং পুনঃ ন্যায় ও নীতিমার্গ-গামী হইতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

* প্রকৃত জ্ঞান-জ্যোতি প্রতিভাসিত না হইলে, বিবেক কর্ত্তৃক প্রকৃত কর্ত্তব্যানুষ্ঠান হয় না। উভয়ের নৈকট্য সম্বন্ধ মৎপ্রণীত মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানযোগ—অন্তর্জগৎ প্রবন্ধে বিশদভাবে আছে। ১৩০১র অনুষ্ঠান-পত্রিকা দ্রষ্টব্য। দস্যু কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকট যাদব-পত্নী-হরণ ইহার একটী দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইন মতে রেজিষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩০৬ সাল, ১৮২১ শকাব্দা।

গীতার্থ।

ভূমিকা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বিশ্বের প্রকৃতি-সমুদ্রের অভ্যন্তরে সদসদ্বৃত্তিরূপা দৈবী এবং আসুরী শক্তি না থাকিলেও, তদভ্যন্তরে অনন্ত-জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং ঐ ভাণ্ডারস্থ-বিশ্ব-নিয়ামিকা শক্তি ও জ্ঞান না থাকিলে, জীবে সদসদ্বৃত্তির স্ফুরণ এবং তাহার নিয়ামিকা শক্তির অঙ্কুর রূপ জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ কখনই হইত না এবং সর্ব্বসামঞ্জস্য কখনই সুরক্ষিত হইত না। মানব, প্রকৃতি-সমুদ্রের বারি-বিন্দু সদৃশ; ঐ সমুদ্রের মধ্যে অমৃত ও বিষ উভয়ই অন্তর্নিহিত থাকায়, তাহার বিন্দুরূপ মানবেও অমৃত ও বিষ উভয়ই আছে। মানব-দেহ বিষ ও অমৃত উভয়েরই আধার; অতএব দম্ভাহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অসদ্বৃত্তির আধার দুর্য্যোধন-প্রমুখ কুরু-পক্ষ এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান, সৎসাহস, বিবেক, যুক্তি ও ন্যায় প্রভৃতি সদ্বৃত্তির আধার যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডব-পক্ষ সাব্যস্ত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্ব-নিয়ামিকা শক্তির আধার ও সর্ব্বসামঞ্জস্য বা সর্ব্বজ্ঞানের অবতার, ইহা বলা বাহুল্য। গীতার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী হউক বা লৌকিকীই হউক, গীতার উপদেশের ন্যায় সারাৎসার নীতি-গর্ভ উপদেশ জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানব-জীবনের কঠিন রহস্যোদ্ভেদ গীতায় যেরূপ আছে জগতের কোন ভাষার কোন গ্রন্থে তদ্রূপ থাকা দৃষ্টিগোচর হয় না। গীতা সংসার-যাত্রীর পথ-প্রদর্শক, জ্ঞানার্ণব-যাত্রীর ধ্রুবনক্ষত্র এবং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের কষ্টিপাথর। ঐ কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় এমন একটি প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রারম্ভ, যাহা জ্ঞানীর পক্ষেও মীমাংসা করা কঠিন।

(৬)

[কর্ত্তব্যাকর্ম্মের ব্যাখ্যা।]

লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশীভূত না হইয়া অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করাই গীতার মুখ্য উপদেশ; কিন্তু ঐ উপদেশ কেবল গীতার নহে, বেদ, কোরাণ, বাইবেল, দর্শন, বিজ্ঞান, পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ, হিন্দু

বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা নাস্তিক পর্য্যন্তও মানবকে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে উপদেশ দেন। এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কাহাকে বলে এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি, ইহা কার্য্যকালে নির্ব্বাচন ব্যতীত ইহার সাধারণ কোন সংজ্ঞা উপরোক্ত কোন গ্রন্থে নাই; বস্তুতও উহার সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া অতীব কঠিন। আবশ্যকমত কার্য্যকালে বিবেক, যুক্তি ও নিঃস্বার্থ বিচার দ্বারাই যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয়, ইহাই প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রের মত। কিন্তু বিবেক, যুক্তি এবং বিচার নিঃস্বার্থ হইলেও, মোহ বশতঃ, যাহা প্রকৃত ধর্ম্মসঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত বা কর্ত্তব্য নহে, তাহাই ধর্ম্ম-সঙ্গত, ন্যায়সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অর্থাৎ কর্ম্মের উদ্দেশ্য সৎ হইলেও, ভ্রান্তি দ্বারা সদ্ভ্রমে অসৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সৎ কর্ম্মের মধ্যে অসৎ কর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্মের মধ্যে সৎকর্ম্ম আছে, উহা নির্ব্বাচন করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা অনেক স্থলে পণ্ডিতের পক্ষেও কঠিন; এইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে, যাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় এবং যিনি সেই নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া খাটি কর্ত্তব্য পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন, তিনিই বুদ্ধিমান ও প্রকৃত পণ্ডিত। উপরোক্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কঠিন প্রশ্ন লইয়াই গীতার প্রথম অবতারণা। মনুষ্যহত্যা, বিশেষতঃ আত্মীয়, স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ অতীব দুষ্কর্ম্ম; ঐ জ্ঞাতি-বন্ধুর বধরূপ দুষ্কর্ম্ম সাধন দ্বারা নিজের রাজ্য, ধন-সম্পদলাভ এবং তাহা ভোগকরা অত্যধিক ঘোরতর দুষ্কর্ম্ম। আবার যে স্থলে ঐ বধ্য জ্ঞাতি-বন্ধুগণ সংখ্যায় অতিরিক্ত এবং স্বজাতি, স্বগোত্র ও স্বদেশের মধ্যে শক্তিমান, ক্ষমতাশালী এবং বীরশ্রেষ্ঠ হন, সে স্থলে তাঁহাদের ধ্বংসে বীরবংশ লোপ, জাতির বা কুলের ধ্বংস; ঐ কুল ধ্বংস হইতে—পরিণামে কুলস্ত্রীগণের অধর্ম্ম-মতি ও তৎপরিণাম সতীত্ব-নাশ হইতে—বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলে কুলনাশক বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি; ঐ বর্ণসঙ্কর হইতে কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্মের বিনাশ; ঐ কুলধর্ম্ম এবং জাতিধর্ম্মের বিনাশ হইতে আর্য্যজাতির অধোগতি ও ঘোর অধঃপতন সম্ভব; অতএব যুদ্ধে উপরোক্ত স্বজন, জ্ঞাতি, বন্ধুর বধ ঘোরতর অধর্ম্ম, ইত্যাদি চিন্তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের মনে উদিত হওয়ায়, অর্জ্জুন সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিপক্ষ জ্ঞাতিগণ যদি লোভোপহিত-চিত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কুলক্ষয় প্রভৃতি দোষ বিবেচনা না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তথাচ এই কুলক্ষয়কর যুদ্ধ করিয়া রাজ্য, ধন ও সম্পদ উদ্ধার আমার কর্ত্তব্য নহে এবং ত্যাগ-স্বীকারই কর্ত্তব্য। আপাততঃ উপরোক্ত যুক্তি অতীব ন্যায় ও ধর্ম্ম-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় না কি? কিন্তু একটু গভীর চিন্তা অর্থাৎ উহার অভ্যন্তর ভাগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অর্জ্জুনের উপরোক্ত যুক্তি-তর্ক এবং সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম-ন্যায়-সঙ্গত এবং কর্ত্তব্য নহে। কণ্টকপূর্ণ ক্ষেত্র অপেক্ষা নিষ্কণ্টক ক্ষেত্র ভাল, ক্ষেত্র [illegible] না হইলে, ক্ষেত্র ধর্ম-শস্যপূর্ণ হইতে পারে না। অর্জ্জুনের বিপক্ষ দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতি

শত্রু নৃপতিবৃন্দ সমাজের অত্যাচারী, পরস্বাপহারী, সাধু ও সাধ্বীগণের প্রতি আক্রমণকারী, সম্মানাপমানকারী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ ও প্রবঞ্চক হওয়ায়, তাহাদের কর্ত্তৃক আর্য্য-সমাজ দূষিত, কলুষিত এবং ক্রমে অধঃপাতিত হইতেছিল; তদ্দ্বারা সমাজে ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হওয়ায়, ভারত-সমাজ ঘোর নরক সদৃশ পূতিগন্ধময় হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং কয়েকজন পরস্বাপহারী ক্রূরকর্ম্মা দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতি * ধর্ম্ম-রাজ্যের ও কোটি কোটি লোকের কণ্টকস্বরূপ হওয়ায়, ঐ কণ্টক দ্বারা রত্নগর্ভ ভারত-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ঐ কণ্টকবৃক্ষ ছেদন ব্যতীত ক্ষেত্র পরিষ্কার এবং পুনঃ ধন-ধান্যপূর্ণ হইতে পারে না। দশের ধর্ম্ম রক্ষার্থে একের বিনাশ ——— নীতি ও ধর্ম্মবিগর্হিত নহে। উহা রাজনীতি। যেস্থলে নীতিমার্গ-ভ্রষ্ট, সমাজ-কলুষকারী, রাজবিদ্রোহী এবং অধর্ম্মের নেতা কয়েকজন নৃপতির ধ্বংস ব্যতীত, ধর্ম্ম-রাজ্য রক্ষা, কোটি কোটি লোকের উদ্ধার ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন, পাপ-পঙ্ক হইতে জাতীয়জীবন-উদ্ধার,† সাধুগণের পরিত্রাণ এবং পুনঃ ধর্ম্মসংস্থাপনের উপায় না থাকিলে, সেই স্থলে ঐ সমাজের কণ্টক স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্মের নেতা কতিপয় রাজ-বিদ্রোহী নৃপতির ধ্বংস সাধন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন পূর্ব্বক পাপপঙ্ক হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। যদি ধর্ম্মরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া ঐ অধর্ম্মের নেতারূপ বিষ-বৃক্ষ সমূহ ছেদন করিতে গেলে, তদানুষঙ্গিক লতা-গুল্মরূপ তাহাদের পৃষ্ঠপোষক সৈন্যসামন্তবর্গও বিনষ্ট হয়, তথাচ লতা-গুল্মসহ বিষবৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যরূপ উদ্যান রক্ষা করা প্রকৃত সম্রাট্ ধর্ম্মরাজের বা অর্জ্জুন প্রভৃতি রাজপুরুষগণের অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। ঐ বিষবৃক্ষ অবৈধ-রূপে কোটি কোটি লোকের আশ্রয়স্থান হইলেই, ঐ বৃক্ষই ঐ কোটি কোটি লোকের প্রাণনাশক এবং ঘোরতর অপকারক বিধায়, তাহা ছেদন করা অতীব আবশ্যক। তৎ-কালের অত্যাচারী ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের ধ্বংস দ্বারা জাতীয় জীবন নষ্ট হয় নাই; যে জাতীয় জীবনের ভিত্তি কেবল প্রবঞ্চনা, পাশব বল, অধর্ম্ম ও অত্যাচার ছিল, সে জাতীয় জীবন ক্ষণস্থায়ী। যাহার বল—ধর্ম্ম, অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কাম-কর্ম্ম,‡ সেনাপতি—বিশ্বপ্রেম, সৈন্য—

---

* উক্ত দুর্নীতি পরায়ণ নৃপতিবৃন্দের বিরুদ্ধে অর্জ্জুনের অস্ত্রধারণ রাজবিদ্রোহ নহে; প্রকৃতপক্ষে যুধিষ্ঠিরই ভারত-সম্রাট্ ছিলেন। দুর্য্যোধন-প্রমুখ নৃপতিগণই রাজবিদ্রোহী; অতএব রাজবিদ্রোহী এবং সমাজ-কলুষ-কারীগণকে দমন করা ধর্ম্মসঙ্গত।

† প্রপীড়ন এবং সংক্রামকব্যাধি হইতে জাতীয় জীবন উদ্ধারও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বুঝাইবে। যেহেতু শ্রেষ্ঠদিগের অনুকরণ সকলের স্বভাবসিদ্ধ; অতএব কংস, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন শিশুপাল প্রভৃতির অনুকরণই সমাজের কিরূপ ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের নিদান, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ক্রমে বিশদ হইবে।

‡ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের নিষ্কামভাবে যুদ্ধের উপদেশ শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় সমালোচিত হইবে। ঐ যুদ্ধ নিষ্কাম, তাহার সন্দেহ নাই। উপরোক্ত "অস্ত্র—জ্ঞান, যুদ্ধ—নিষ্কামকর্ম্ম" প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লৌকিক ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্য আছে, তাহাও যথাস্থানে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

শিখন্ডিত, সে জাতীয় জীবন অক্ষয় ও অমর; সে রাজ্যের ধ্বংস নাই, এইজন্যই সুদর্শন-নীতি-চক্ররূপ জ্ঞানাস্ত্রধারী বিশ্বপ্রেমের অবতার যে রাজ্যের সহায়, সেই রাজ্য ধর্ম্ম-রাজ্য ও রাজা ধর্ম্ম-পুত্র। যাহাহউক, সর্ব্বকালেই দেশ-হিতকর উন্নতি-বিধায়ক শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, সর্ব্বমঙ্গল বিধায়ক, সুখ-শান্তি-স্থাপয়িতা প্রজাবৎসল রাজা বা রাজ্ঞীই ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী এবং রাজ্যই ধর্ম্ম-রাজ্য। এই ধর্ম্মতত্ত্ব উপলক্ষ করিয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য-নির্ব্বাচনের কষ্টিপাথর স্বরূপ জগৎ-পূজ্য ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করিয়া, যাহার যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহার সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। গীতার প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের মধ্যে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি যে প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা শ্লোক-ব্যাখ্যার সময় বিশদ হইবে। কিন্তু গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং তাহার ঐতিহাসিক ঘটনা কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক। তাহা বিবৃত না হইলে, শেষোক্ত মতটি যে ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইবে।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আবশ্যকতা এবং ঐতিহাসিক ঘটনা।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রয়োজন দর্শাইতে হইলে, ভারতবর্ষের তৎকালের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থার আলোচনা কিঞ্চিৎ আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চদশীব্যাখ্যা।

ভূতবিবেক।

সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭২ ।

টীকা—নন্বাকাশকার্য্যস্য বায়োরকারণভূতেন সদ্বস্তুনা তাদাত্ম্যপ্রতীত্যযোগাৎ সতো বিবেচনমপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধাভাবেঽপি পরম্পরয়া সম্বন্ধোঽস্তীত্যাহ যথা সদ্বস্তুন্যেক দেশস্থা সদ্বস্তুনি—এক দেশস্থা মায়া, তত্র মায়ৈকদেশগমাকাশ-স্তত্রাকাশেঽপি একদেশগতো বায়ুঃ, প্রকল্পিতঃ—কল্পিতবান্ ইত্যর্থঃ। ৭২

বঙ্গানুবাদ—সদ্বস্তুর একদেশস্থিতা মায়া, মায়ার একদেশস্থিত আকাশ, আকাশের একদেশগত বায়ু কল্পিত হইয়াছে।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশ-ব্যাপিত-দুর্ভিক্ষকালে খুলনাজেলার দক্ষিণাংশে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষাকারী কোন রাজপুরুষের বিদায় উপলক্ষ্যে এই প্রবন্ধ-লেখকের ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে বিশ্বপতির হস্তে সর্ব্বমঙ্গল রূপ শঙ্খ, সুনীতি রূপ সুদর্শনচক্র, শাসনদণ্ড রূপ গদা এবং সুখ-শান্তিরূপ পদ্ম থাকায়, সেই বিশ্ব-পতির পালন-শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী মঙ্গল-সুনীতি, শাসন এবং সর্ব্বশান্তির সহিত যে ভারতে বিকাশিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহারই উপরোক্ত চতুঃশক্তির কিয়দংশ রাজপুরুষে সংক্রমিত হওয়ায়, এই দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মুমূর্ষু প্রজাবর্গের জীবনরক্ষা এবং দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনসমূহ পুনঃ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইত্যাদি কথা ছিল। উপরোক্ত বক্তৃতায় ধর্ম্মরাজ্য এবং ধর্ম্মপুত্র বা ধর্ম্মপুত্রী কি অর্থে ব্যবহৃত হইল, তাহা বিশদ হইবে, সেইজন্য এই টীকাটি এই স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল।

তাৎপর্য্যার্থ—যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সদ্বস্তুর কার্য্য-কারণভাবাদির কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্ত বায়ু ও সদ্বস্তু, এই উভয় পদার্থ পরম্পরা-সম্বন্ধদ্বারা সম্বন্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সদ্বস্তুর ঐক্য-সম্ভাবনা না থাকিলেও, পরম্পরা-সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য-সম্ভাবনা আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সদ্বস্তু পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরম্পরা-সম্বন্ধ নিরূপণ করিতেছেন। মায়া সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপের একদেশ ব্যাপিয়া আছে, এবং আকাশ সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের একদেশবর্ত্তী মায়ার একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, পরমাত্মার কার্য্য মায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; সুতরাং পরস্পর কার্য্যকারণ-রূপে পরম্পরা-সম্বন্ধে ন্যূনাধিকাক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সদ্বস্তু পরমব্রহ্মের সহিত বায়ুর পরম্পরায় কার্য্য-কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয়॥ ৭২

শোষস্পর্শৌ গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ॥৭৩
বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্ কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়া স্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ॥৭৪।

টীকা—এবং সদ্বায়োঃ সম্বন্ধং প্রদর্শ্য তয়োর্ধর্ম্মতো ভেদজ্ঞানায় বায়ৌ প্রতীয়মানান্ ধর্ম্মনাহ বায়ৌ, শোষস্পর্শৌ গতির্বেগ ইমে ধর্ম্মাঃ কথিতাঃ সৎ মায়া ব্যোম্নাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবা-স্তেঽপি বায়ুগা বায়ৌ সন্তি যথা বায়ুঃ অস্তি—ইতি সদ্ভাব ব্যবহার হেতুঃ সদ্রূপত্বং সদ্বস্তুনোধর্ম্ম একঃ, সতিবায়ৌ পৃথক্ কৃতে সতি বায়ৌ সদ্বস্তুনো বিবেচিতে সতি নিস্তত্ত্বরূপত্বং সমায়াধর্ম্মো দ্বিতীয়ঃ শব্দঃ ব্যোম্নঃ সকাশাদাগতস্তৃতীয় ইত্যর্থঃ ৭৩।৭৪

বঙ্গানুবাদ—শোষ—(রসাকর্ষণ) স্পর্শ, গতি এবং বেগ, ইহা বায়ুর ধর্ম্ম; তদ্ভিন্ন সৎ, মায়া এবং আকাশের যে ত্রিবিধ স্বভাব, তাহাও বায়ুতে আছে, যথা বায়ু আছে (অস্তিত্ব), ইহা সতের ভাব; সদ্বস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুতে মায়ার নিস্তত্ত্ব-স্বভাব এবং আকাশের শব্দও (বায়ুতে) আছে, ইহা আকাশের স্বভাব।

তাৎপর্য্যার্থ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুর সহিত সদ্বস্তু স্বরূপ পরমব্রহ্মের পরস্পর কার্য্য-কারণ-রূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটি গুণ আছে, যথা রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশ, ইহা-দিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধ হয়। [illegible]

গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অনুভূত হয়। মায়ার যে অনিরুক্ততারূপ গুণ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সত্তা হইতে পৃথক্ করিলে, তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে, এবং আকাশের স্বভাবিক গুণ যে শব্দ, তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে ॥৭৩॥৭৪॥

সত্ত্যানুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরোদিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং নব্যাহতং বচঃ ।৭৫।
ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ।৭৬

টীকা—সর্ব্বত্র সত্যস্যানুবৃত্তি ব্যোম্নো ন অনুবৃত্তি পুরা কথিতং অধুনা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেব কথিতং তে তব বচো কথং নব্যাহতং সবিরোধং স্যাৎ। নমু ব্যোম-বিবেচন প্রস্তাবে বাযাদিষমুবৃত্তং সৎ নতু ব্যোমেতি ভেদধীরিত্যত্র বায়াদাকাশানুবৃত্তিঃ নিবারিতা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে অতঃ পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ইত্যাশঙ্ক্য ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি আকাশস্য অনুবৃত্তি র্ন ইতীতি পূর্ব্বোক্তিস্তুপুনঃ অধুনা ইয়ম্ শব্দানুবৃত্তিরেব কথিতা অতঃ কথং বচসো ব্যাহতিঃ বিরোধস্যাৎ পূর্ব্বমবকাশ লক্ষণানুবৃত্তির্নিবারিতা ইদানীং ধর্ম্মানুবৃত্তিরেব আভিধীয়তে নতু স্বরূপানুবৃত্তির্ন ব্যাহতিঃ বিরোধ ইতি পরিহরতি।

বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে সত্তের অনুবৃত্তি কথিত হইয়াছে, ব্যোমের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে; এখন ব্যোমের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে; অতএব পরস্পর বাক্যের বিরোধ হইবে না কেন? (তদুত্তরে কথিত হইয়াছে), পূর্ব্বে আকাশের অনুবৃত্তি নহে, বলা হইয়াছে, এক্ষণে শব্দের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে, ইহাতে বাক্যের বিরোধ হইবে কেন?

তাৎপর্য্য—এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইতঃপূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব বিচার প্রস্তাবে কথিত আছে যে, বায়ু প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থে সত্ত্ব অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ "শব্দ" বায়ুতে উপলব্ধ হয়, সুতরাং কার্য্য-কারণতারূপ পরম্পরা-সম্বন্ধে আকাশও বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধ স্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তের এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরি-উক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশ স্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ কার্য্যভূত পদার্থ অনুবৃত্ত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ কেবল মাত্র "শব্দ" বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছেনা, কারণ, আকাশ আর [illegible] উভয় এক পদার্থ নহে, উহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই বিভিন্ন-

পদার্থ আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শব্দ" মাত্র বায়ুতে অনুবৃত্ত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল, ইহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না ॥৭৫।৭৬॥

নন্বু সদ্বস্তু পার্থক্যাদসত্ত্বঞ্চেৎ তদা কথম্।

অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥৭৭॥

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।

সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥৭৮॥

সদসত্ত্ব বিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাম্।

অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্ ॥৭৯॥

টীকা—নন্বু সদ্বস্তু পার্থক্যাৎ চেৎ যদি অসদ্বদসি তদা অব্যক্ত মায়া বৈষম্যাৎ কথং অমায়াময়তাপি ন বদসি? বায়োঃ সদ্ব্রহ্ম বিলক্ষণত্বাদসত্ত্ব লক্ষণ মায়াময়ত্বং যদুচ্যতে তর্হি অব্যক্তস্বরূপ মায়া-বৈলক্ষণ্যাৎ অমায়াময়ত্বমপি কিং নস্যাৎ? ৭৭ তদুত্তরং—

অত্র তস্য বায়োঃ প্রযোজিকা নিস্তত্ত্বরূপত্বা যা মায়া সা এব কারণভূতা শক্তিরত্র প্রযুজ্যতে ন অব্যক্তত্বং মায়াময়ত্বে প্রযোজকং কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপত্বং তত্তু মায়ায়ামিব বায়্বাদৌ অপি অস্তিতী ন মায়াময়ত্ব হানিরিতি পরিহরতি। ৭৮

নন্বু শক্তিকার্য্যয়োরপি নিস্তত্ত্বরূপতায়ামবিশিষ্টয়োঃ ব্যক্তাব্যক্তত্ব লক্ষণো ভেদঃ কুত-ইত্যাশঙ্ক্য তদ্‌বিচারঃ প্রকৃতানুপযুক্ত ইতি পরিহরতি যথা—সদসত্ত্ববিবেক—অস্য প্রস্তুতত্বাৎ সচিন্ত্যতাং অসতো মায়া তৎ কার্য্যরূপস্য অবান্তর ভেদ ব্যক্ত-অব্যক্তত্ব রূপ ভেদ তৎ অত্র কিং চিন্তয় আস্তাং? ন প্রয়োজন ইত্যর্থঃ। ৭৯

বঙ্গানুবাদ—যদি সদ্বস্তু হইতে পার্থক্যহেতু অসৎ বল, তবে অব্যক্ত মায়া-বৈষম্যহেতু অমায়াময় কেন না বলিবে? ।৭৭

এস্থানে নিস্তত্ত্বরূপা মায়া ইহার প্রয়োজিকা মাত্র; সেই শক্তি এবং কার্য্য তুল্য, কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদমাত্র। ৭৮

সৎ-অসৎ বিবেচনা করিতে হইলে, সদসত্তের মধ্যেই বিচার আবশ্যক। অসত্তের অন্তরস্থ ভেদ দেখা অনাবশ্যক। ৭৯

তাৎপর্য্যার্থ—অনন্তর অপর প্রশ্ন এইযে, যদি সদ্বস্তু পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা বশতঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্তু মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে বায়ুকে শক্তি-স্বরূপ অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেন না স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন, অব্যক্তস্বরূপা শক্তি অথবা ব্যক্তরূপ কার্য্য, ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির ন্যায় অব্যক্ত

কিম্বা কার্য্যস্বরূপ পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত ? এস্থলে উভয় পক্ষেই সমান। প্রকৃত পক্ষে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন বস্তু অসৎ, এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সৎ ও অসৎ, উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তুর অন্তরস্থ যে কতপ্রকার প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৭। ৭৯

সদ্বস্তু ব্রহ্মশিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥৮০

টীকা—বায়ৌ যঃ সদংশস্তদ্ব্রহ্মরূপং, শিষ্টোঽংশো নিস্তত্ত্ব রূপাদি বায়োঃ স্বরূপং সচ বায়ুঃ মিথ্যারূপত্বাৎ এব আকাশবন্মিথ্যা ইত্থং বায়োর্মিথ্যাত্বং চিরং বাসয়িত্বা মরুতং ত্যজেৎ মরুৎ সত্য ইতি বুদ্ধিং ত্যজেৎ ইত্যর্থঃ। ৮০

বঙ্গানুবাদ—বায়ুতে যে সদংশ, তাহাই ব্রহ্ম—নিস্তাংশ আকাশের ন্যায় মিথ্যা; অতএব মিথ্যাত্ব হেতু মরুৎ ত্যজ্য।

তাৎপর্য্যার্থ—বায়ুতে সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইলে, অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব-বুদ্ধি করিও না। ॥৮০॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মীমাংসা-দর্শনম্।

জৈমিনিসূত্রং।

(পূর্ব্বানুবৃত্তং)

কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ ॥৬॥

পদপাঠঃ। কর্ম্ম। একে। তত্র। দর্শনাৎ ॥

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম—কার্য্য। একে—কেহ কেহ (বলিয়া থাকেন।) তত্র—সেখানে (প্রযত্নের উত্তর সময়ে।) দর্শনাৎ—দেখা যায় বলিয়া। (উপলব্ধি হয় এই নিমিত্ত।)

ভাবার্থ। কেহ কেহ বলেন, শব্দ কার্য্যপদার্থ। কেননা, উচ্চারণার্থ প্রযত্নের পরসময়ে উপলব্ধ হয়। [illegible]

বিশদব্যাখ্যা। পূর্ব্বসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, শব্দ এবং অর্থ, ইহারা পরস্পর নিত্য সম্বন্ধে বদ্ধ। সম্বন্ধ নিত্য হইলে, সম্বন্ধিদ্বয় তদ্রূপ হওয়া আবশ্যক। সম্বন্ধ [illegible] অপেক্ষা করে। সেই পদার্থদ্বয় যদি সহসাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অথবা [illegible] মধ্যে কোনওটি কালের আক্রিয়া গ্রহণ করে, তবে সম্বন্ধও যে [illegible]

হইতে বাধা হয়, ইহা নিঃসংশয়। "শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য" এই প্রতিজ্ঞাপাশে চিত্তকে বদ্ধ করিতে হইলে, শব্দ এবং অর্থের নিত্যতাবধারণ অত্যাবশ্যক। পদার্থতত্ত্বনির্ণয় প্রতিজ্ঞা করিলেই পূর্ণতা লাভকরে, এমন নহে। কাজেই শব্দের প্রত্যক্ষানুভূতকার্য্যতা-নিরসন প্রয়োজন।

প্রাচীন পণ্ডিত-মণ্ডলী পূর্ব্বপক্ষের যথাযথ ব্যবস্থাপন পূর্ব্বক উত্তরপক্ষের স্থাপনে মনোনিবেশ করিতেন, এই রীত্যনুসারেই প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সূত্র হইতে একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাদীর অভিপ্রায়ই বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। শব্দ ও অর্থ নিত্য হইলে, সম্বন্ধের নিত্যতাবিচার সঙ্গতির সহিত পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারে, সুতরাং নিত্যত্বে প্রথমতঃ বিপক্ষের বিপ্রতিপত্তি বিনাশ বিধেয়।

শব্দ নিত্য, এ বিষয় এতই আশঙ্কাসঙ্কুল যে, অপর-প্রমাণের অপেক্ষা দূরে থাকুক, প্রমাণপটলের প্রধান প্রত্যক্ষেরও ইহাতে সাক্ষাৎসম্মতি নাই। উচ্চারণার্থ প্রযত্নের অব্যবহিত পরকালে শব্দের উপলব্ধি। কার্য্য-কারণভাবের অবধারণ করিতে হইলে, আপাততঃই পরবর্ত্তিপদার্থের কারণ বলিয়া অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিব্যাপার অথবা বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রযত্নের পরেই শব্দ শ্রবণ-পথের আতিথ্য অঙ্গীকার করে, পূর্ব্বে নহে। অন্বয় ও ব্যতিরেক-বলে বুঝিতে পারা যায়, প্রযত্ন জন্য শব্দ উৎপন্ন হয়। নিত্যত্বের আবাসে উৎপত্তির গতি নাই; বিনাশেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ; সুতরাং "শব্দ-নিত্যত্ব" কার্য্যক্ষেত্রে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া প্রলাপ মাত্রে পর্য্যবসিত হইল। পূর্ব্বপক্ষের এই আপত্তির প্রতিপত্তিপ্রণাশের নিমিত্ত যদি সিদ্ধান্তী মীমাংসকমহোদয় বলেন, "শব্দের উৎপত্তি প্রযত্ন নিমিত্ত নয়, তবে অভিব্যক্তির কারণ প্রযত্ন হইতে পারে। বিদ্যমানপদার্থ-প্রকর সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। অভিব্যক্ত বস্তু নিচয়েরই গ্রাহ্যতা সম্ভব আছে। শব্দ নিত্য, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহার শ্রাবণ-প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই। অভিব্যক্ত শব্দই শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।" তাহাহইলে বক্তব্য এই যে, "অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রযত্নজ" এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অগ্রেই শব্দের নিত্যত্বনির্দ্ধারণ প্রয়োজনীয়। শব্দ-নিত্যত্ব যদি প্রমাণান্তর-প্রসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যবস্তুর বিনাশ সম্ভব নাই বলিয়া অগত্যা আবির্ভাবে সম্মতিপ্রদান করিতে হয়; নচেৎ প্রতিজ্ঞামাত্রে স্বার্থসিদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত হয় না। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগণ ঐ অভিব্যক্তি অথবা আবির্ভাবের পূর্ব্বে শব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে অনুমোদন করে না। অপ্রমাণ-বিষয়-রূপ স্নেহকে উপলক্ষ্য করিয়া যে মত-মঞ্জরী জীবিত থাকিতে চায়, গগণ-কুসুমের ন্যায় তাহার সত্তায় সততই অনাশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব প্রযত্নই শব্দের উৎপাদক, অভিব্যঞ্জক নহে। উৎপত্তিশীল বস্তু নিত্যনামে কথিত হইতে নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং শব্দের নিত্যতাসাধনের সাধ অপূর্ণই রহিল।*

অস্থানাৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। অস্থানাৎ—ন-স্থানাৎ।

ব্যাখ্যা। অস্থানাৎ—স্থিতির অভাববশতঃ, অর্থাৎ উৎপন্ন শব্দ দীর্ঘকাল স্থিতিলাভ করে না (বলিয়াও অনিত্য।)

বঙ্গার্থ। শব্দ (যেমন উৎপন্ন হয়,) পরে আর থাকে না, এই হেতুক উহা কার্য্যবস্তু। (নিত্য নহে।)

বিশদব্যাখ্যা। কোনও বিচারে বস্তুর স্বরূপ ও অসাধারণস্বভাব নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ নিয়মের অনুসরণ করিতে হয়। জ্যামিতিকক্ষেত্রে অনেকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সেখানে তাহাদের স্বতঃসিদ্ধতা-বিষয়ে প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা বিবেচিত হয় না। স্বতন্ত্র প্রকারে যুক্তি-তর্কাদির দ্বারা পরিশোধিত হইয়া উহারা সাধারণ্যে নির্ব্বিবাদে নিঃসন্দেহ-প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রয়োগস্থলে উহার সত্যতায় বিবাদ উপস্থিত হয় না। দার্শনিক-স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম "যাহার কাল-কবলে কবলিত হইতে হয় না এবং উৎপন্ন বলিয়া অবনীমণ্ডলে অবধারিত হইতে হয় না, তাহাই নিত্য।" বিনাশী নিত্য নয়, উৎপাদশীলও ঐ নাম ধারণের যোগ্য নয়। এই তথ্য প্রমাণ-পরতন্ত্ররূপে এ প্রসঙ্গে উপস্থিত নয়। কেননা এটী প্রয়োগক্ষেত্র। এখানে বিনাশ দৃষ্ট হয় বলিয়াই কার্য্যতা বলা হইতেছে। পূর্ব্বসূত্রে উৎপত্তিনিবন্ধন অনিত্যতা দেখান হইয়াছে। শব্দ যে বিনাশী, তাহা অনুভবসিদ্ধ। শ্রবণ-বিবরে যে শব্দমহাশয় ইতঃপূর্ব্বে মহান্ গোলযোগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, সহসাই তিনি অনন্তের অনন্তপ্রাণে আত্মসমর্পণ করিলেন। যাহার নিষ্ঠুর তাড়নে শ্রবণাধিষ্ঠানের পেশীরাশি বিষমরূপে বিড়ম্বিত হইতেছিল, এখন তাহার সত্তাও খুঁজিয়া মিলে না। যদি বলা যায়, "বিদ্যমান শব্দও আমাদের শ্রবণপথে আরূঢ় হয় না; বিশেষবাধক তাহার কারণরূপে গণ্য।" তবে আমাদের প্রত্যুত্তর এই যে, দ্রব্যান্তর অনুপলব্ধিবিষয়ে দূরত্ব, সূক্ষ্মতা প্রভৃতি কারণ। সে সমস্ত কারণের সন্তান এখানে সম্ভাবনার সহিত পরিচিত নহে। অবকাশেই শব্দের উপলব্ধি। এখানে মহান্ অবকাশ রহিয়াছে, শুনিবার উপকরণ কর্ণও যথাস্থানে সন্নিবেশিত। শব্দ থাকিলে, শ্রবণ-ব্যাপার অবশ্যই নিষ্পন্ন হইতে পারিত। যখন হয়না, তখন শব্দ যে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সহজেই মনস্বীদিগের মানস-লোচনে এ দৃশ্য পতিত হইবে। অতএব শব্দের কার্য্যতায় সংশয় হয় না; কেননা, উৎপাদ-বিলয়শালিত্বরূপ কার্য্যত্বের অসাধারণ পরিচায়ক বিদ্যমান।

করোতি শব্দাৎ ॥৮॥

পদপাঠঃ। করোতি—শব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। করোতি—শব্দাৎ—"করিতেছে" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ হয় বলিয়া।

বঙ্গার্থ। "করিতেছে" এইরূপ শব্দ ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই হেতুক (শব্দ কার্য্যবস্তু।)

বিশদব্যাখ্যা। কার্য্য-পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই. "কর" "করিতেছি" "করিল" ইত্যাদি ব্যবহারিক শব্দ-প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কেননা কার্য্য সম্পাদ্য বা সাধ্য-পদার্থ। নিত্য-বস্তু সিদ্ধ। ন্যায়মতে আকাশের নিত্যতা স্বীকার করা হয়, সেখানে "আকাশ করিতেছে" "করিয়াছিল" কিম্বা "কর" এরূপ প্রয়োগ দেখা যায় না। কার্য্যপদার্থ ঘটকে লক্ষ্য করিয়া "ঘট করিয়াছিল" "করিতেছে" ইত্যাদি প্রয়োগ সর্ব্বদাই প্রবর্ত্তিত হইতেছে। শব্দ যদি নিত্য হইত, তবে "শব্দকর" ইত্যাদি সজ্জন-বচনও উন্মত্তপ্রলাপ বোধে উপেক্ষিত হওয়া আবশ্যক। নিরপরাধের উপর এ শাস্তি সমুচিত নয়, সুতরাং সাধুলোকের মর্য্যাদা ও অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের প্রামাণ্য রক্ষার্থ অপ্রমাণ-কল্পনাপুষ্ট-স্বার্থ-জুষ্ট শব্দ-নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে দোষপঙ্ক-শঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্তানস্তরে চ যৌগপদ্যাৎ ॥৯॥

পদপাঠঃ। সন্তানস্তরে। চ। যৌগপদ্যাৎ॥

ব্যাখ্যা। সন্তানস্তরে—দেশান্তরে, স্থানান্তরে অর্থাৎ নানাস্থানে। চ—ও। যৌগপদ্যাৎ—যুগপদ্ভাব—অর্থাৎ এককালীন বহুত্ব বশতঃ।

বঙ্গার্থঃ। নানাস্থানে যুগপৎ শব্দের উপলব্ধি হেতুক (কার্য্যতা সাধিত হইতে পারে)

বিশদব্যাখ্যা। দূর্ব্বাদল-মণ্ডিত শ্যামল-ধরাতলে দণ্ডায়মান হইয়া পথিক তারস্বরে পঞ্চমে তান তুলিয়া গগণ-প্রাঙ্গণে সুমধুর-সঙ্গীত-সুধা-ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। গীত-লহরী দিগ্‌দিগন্তে বিধাবিত হইয়া চির-শক্র-নীরবতার নিবিড়-দুর্গ ভেদ করিয়া ফেলিল, চতুর্দ্দিকে বহু ব্যক্তির শ্রবণ-মার্গে সম সময়ে ঐ স্বর-স্রোত প্রবাহিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যক্তিভেদে একই নিত্য-শব্দ শ্রুত হইয়াছে, একথা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বিশেষ ব্যতিরেকে নিত্য-বস্তুর অনেকত্ব অনুভব-সিদ্ধ নয়। যদি কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে অভিঘাত-জনিত উৎপন্ন-শব্দ, "কদম্ব-কোরক" ন্যায় অথবা "বীচি-তরঙ্গ" ন্যায়ানুসারে পর পর যথানিয়মে শব্দ-প্রবাহ উৎপাদন করে, তবে বহুস্থানে বহু ব্যক্তির কর্ণপটহে উৎপন্ন বহুশব্দ একদা উপস্থিত হইতে পারে। কার্য্যত্ব স্বীকার করিলেই যৌগ-পদ্যের অনুভব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। প্রতিশব্দই সংযোগাদি বাহুল্যবশতঃ বহুশব্দ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং নিয়তির নিভৃত-ক্রোড়ে শয়ন করিতে বাধ্য হয়। একই নিত্য-শব্দ অভিব্যক্ত হইলে, নানাদেশে যুগপৎ তাহার উপস্থিতি অত্যন্ত অসম্ভব। নিত্য-পদার্থ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া বহুধা বিভিন্ন স্থানে অনুভূত হইলে, তাহার নিত্যত্ব "কথার কথা" বই আর কিছুই নয়। বিকার-প্রাপ্ত-বস্তু হইলে, শব্দের বিনাশ ও উৎপত্তিস্বরূপ কার্য্যত্ব আপনা হইতেই আপতিত হইল।

প্রকৃতি-বিকৃত্যোশ্চ ॥১০॥

পদপাঠঃ। প্রকৃতি—বিকৃত্যোঃ। চ।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি-বিকৃত্যোঃ—প্রকৃতি এবং বিকৃতি, এই উভয়ের (বিদ্যমানতা-হেতুক।) চ—ও। (শব্দের কার্য্যতা ব্যবস্থাপিত হয়।)

বঙ্গার্থঃ। প্রকৃতি ও বিকৃতির সত্তানিবন্ধনও (শব্দ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।)

বিশদ-ব্যাখ্যা। বিকৃতি অর্থাৎ বিকার হইতে পদার্থের অনিত্যতা নিরূপিত হইয়া থাকে। বিকার অর্থাৎ অবস্থান্তরাপত্তি। যে বস্তু স্বাভাবিক রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাকার ধারণ করে, তাহাকে বিকারী বলা হয়। যদি বিকারতা প্রমাণসিদ্ধ হয়, তবে নিত্যতাপ্রতিপাদনের বাসনা সুদূরপরাহত। মৃত্তিকা বিকার প্রাপ্ত হইয়া ঘটাকারে পরিদৃশ্যমান হইল। এখানে ঘট যে মৃত্তিকা-বিকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যাকরণের সন্ধি সূত্রে "ই"কারস্থানে "য"কার হইবার বিধান আছে। "ই"কারই "য" কাররূপে পরিণত হইল, এইহেতু "ই"কার প্রকৃতি ও "য"কার বিকৃতি বলিয়া শিষ্ট-সম্প্রদায়ের ব্যবহার আছে। যাহা বিকৃতি, তাহা অনিত্য, সুতরাং "য"কার অনিত্য। যদি, প্রকৃতি-বিকারভাব কিরূপে অবধারিত হইল, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদানার্থ আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়, তখন আমরা অসঙ্কোচে বলিতে প্রবৃত্ত হইব যে, য-কারে ই-কার-সাদৃশ্য আছে; তাহাই উভয়ের প্রকৃতি-বিকৃতিভাবের পরিজ্ঞাপক। ইকার দেখিতে য-কারের মত নয়, সুতরাং আকার গত সাধর্ম্ম্য সাদৃশ্য নহে; উচ্চারণগত সমত্বই হইবে। বঙ্গে অন্তাস্থ "য" কারের উচ্চারণে বর্গ্য "জ" কারাপেক্ষা সামান্য পরিমাণেও বৈষম্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে এ রীতি বহুমানে সর্ব্বত্র সমাদৃতা ও সযত্নে অনুষ্ঠিতা। তাঁহারা "য" কারের উচ্চারণে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। আমাদের উচ্চারিত "আচার্য্য" শব্দ ও "আচার্জ্য" শব্দের উচ্চারণগত বিশেষত্ব কিছুই মিলেনা। অপর প্রণালীর উচ্চারক-সম্প্রদায় "আচার্য্য" শব্দে "জ"কারের উচ্চারণ করেন না, পরন্তু "আচারি+অ" এই রূপে "ই+অ" উচ্চারণ করেন। এই সাদৃশ্যটুকু এতদ্দেশ-প্রচলিত নিয়মে দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, বিশেষরূপে লিখিত হইল। শব্দ বলিলে—সাধারণতঃ দ্বিবিধ পদার্থের অববোধ জন্মে। ধ্বনি ও বর্ণ। ধ্বনিরূপে শব্দের এক অভিব্যক্তি, বর্ণ-স্বরূপে অন্য। পরিজ্ঞানার্থ-চিহ্নগুলি শব্দ (বর্ণাত্মক) নহে। এই সূত্রে বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যতানিরাসার্থ—পূর্ব্বপক্ষবাদী প্রয়াস পাইয়াছেন। পূর্ব্বসূত্রগুলিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দের উপর কার্য্যতা-ব্যবস্থাপনার্থ নিত্যতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করা হইয়াছে। অপর সূত্রের সহিত ইহার এই পার্থক্যটুকু সকলের স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক।

বৃদ্ধিশ্চ কর্তৃভূম্নাঽস্য ॥১১॥

পদপাঠঃ। বৃদ্ধিঃ। চ। কর্তৃভূম্না। অস্য।

ব্যাখ্যা। বৃদ্ধিঃ—বর্দ্ধিত হওয়া। চ—ও। কর্তৃভূম্না—কর্তার বহুত্ব দ্বারা। অস্য—ইহার। (শব্দের।)

বঙ্গার্থঃ। কর্তার বাহুল্যদ্বারা শব্দের বৃদ্ধিও হইয়া থাকে। (সুতরাং শব্দ অনিত্য।)

বিশদব্যাখ্যা। অল্পতা এবং আধিক্য, এই দুইটী পদার্থগত ধর্ম্ম। কারণবিশেষে উহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হয়। নিত্যপদার্থ চিরদিনই অবিচলিত—একাকারে অবস্থিত। শত শত বজ্রাঘাতেও তাহার একটী কণিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের তাড়নেও তাহা বিকারপ্রাপ্ত হয় না। উহা অদাহ্য, অচল, অটল। অনেক ব্যক্তি একদা শব্দোচ্চারণ করিলে, উহা একোচ্চারিত শব্দাপেক্ষায় মহান হয়। এইরূপে উচ্চারয়িতার সংখ্যাধিক্য অনুসারে শব্দের অল্পতা ও মহত্ত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। যদি নিত্য-শব্দের প্রযত্ন বশতঃ অভিব্যক্তিপক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে এই প্রত্যক্ষানুভূত অল্পাধিক্য-জ্ঞান অনুপপত্তির করালগ্রাসে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যদি শব্দের অভিব্যক্তি মাত্রই বলিতে হয়, তবে দশজনের উচ্চারণপ্রযত্ন দ্বারা অভিব্যক্তই হউক, একজনের প্রযত্ন দ্বারা আবির্ভূতই হউক, উহার স্বরূপ সমানই থাকিবে। শব্দ যেরূপেই অভিব্যক্ত হউক না কেন, তাহার স্বরূপের কিয়দংশ পরিত্যাগরূপন্যূনতা অথবা পররূপগ্রহণাত্মকরূপ ন্যূনতা-আধিক্যের সম্ভব নিত্যত্ব পক্ষে দুর্ঘট। কখনও অনেকের প্রযত্নে মহত্ত্ব, কভু বা একের প্রযত্নে অল্পত্ব দেখিয়া কর্তার আধিক্য মহত্ত্বে এবং অল্পত্ব ন্যূনতায় কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়। মহত্ত্ব পূর্ব্বাবস্থা হইতে অধিক অবয়বের উপচয় এবং অবয়বের অপচয়ই হ্রস্বতা। কর্তার আধিক্যে প্রযত্নের অধিকতা; প্রযত্ন বাহুল্যে অবয়ব-বহুলতা, তাহাই বৃদ্ধি। স্বরূপে অল্পতার অবধারণ করিতে হইবে। এতদ্দৃষ্টে অনুমিত হইতে পারিবে যে, প্রত্যেকের দ্বারা একটী একটী অবয়ব রচিত হইলে, বহুকর্তার দ্বারা অবয়বোপচয়-রূপ বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অবয়বের পরিবর্ত্তন নিত্য বস্তুর সম্ভব নাই। অবয়বোৎপত্তি দ্বারা শব্দের কার্য্যত্ব প্রমাণিত হইল। এইখানে পূর্ব্বপক্ষের অবসান। আগামীতে শব্দ-নিত্যতাব্যবস্থাপনে মীমাংসাচার্য্যের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাওয়া যাইবে।

ক্রমশঃ—

ব্রহ্মচারি-আশ্রমস্থ বেদবিদ্যালয়। শ্রীকেদারনাথ ভারতী সাংখ্যরত্ন সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর।

বৈশেষিক দর্শন।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং ॥৪॥ সূত্রং॥

পদব্যাখ্যা। ধর্ম্মবিশেষ—ঐহিক বা জন্মান্তরীয় সুকৃত বিশেষ। প্রসূত—উৎপন্ন। (পুণ্যবিশেষ হইতে উৎপন্ন) এইটী তত্ত্বজ্ঞানাৎ—এই স্থলীয় তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ, এজন্য পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া 'প্রসূতাৎ' এইরূপ হইয়াছে। দ্রব্য—ক্ষিতি জল-তেজঃ ইত্যাদি, গুণ—রূপ-রস-গন্ধ ইত্যাদি। কর্ম্ম—গমনাদি। সামান্য—জাতি। দ্রবত্ব—ক্ষিতিত্ব, মনুষ্যত্বাদি। বিশেষ—পরমাণুদিগের পরস্পর ব্যাবর্ত্তক পদার্থ বিশেষ। সমবায়—নিত্য সম্বন্ধ বিশেষ। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ-কর্ম্মের সম্বন্ধ, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির সম্বন্ধ এবং নিত্য দ্রব্য বিশেষের সম্বন্ধ। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়—ইহাদের। পদার্থানাং—এই স্থলীয় পদার্থের সহিত অভেদ অন্বয় হওয়াতে ষষ্ঠী বিভক্তি করিয়া 'সমবায়ানাং', এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থানাং—পদার্থদিগের। সাধর্ম্ম্য, সজাতীয়ের ধর্ম্ম, যথা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, পশুর পশুত্ব ইত্যাদি। বৈধর্ম্ম্য—বিরুদ্ধধর্ম্ম, যথা জলত্ব তেজের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এবং তেজস্ত্ব জলের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম; ঐরূপ শরীরত্ব আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম ইত্যাদি। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং—সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে,—গো পশুত্বরূপে অশ্বের সজাতীয়, কিন্তু গোত্বরূপে তাহার বিজাতীয়, এই প্রকারে। তত্ত্বজ্ঞানাৎ—যাথার্থ জ্ঞান হইতে। নিঃশ্রেয়সং—মুক্তি হয়।

অনুবাদ। ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরের সৎকার্য্য জনিত সুকৃত বিশেষ থাকিলে, তাহা হইতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই সমস্ত পদার্থের পরস্পর সজাতীয় ও বিজাতীয় ধর্ম্ম সহকারে যাথার্থ্য জ্ঞান জন্মে এবং ঐ যাথার্থ্য জ্ঞান হওয়াতে মিথ্যাজ্ঞানাদির নাশ হয়, সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে।

তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের প্রয়োজন কি এবং কোন্টী, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়ের সহিত শাস্ত্রের কিরূপ সম্বন্ধ, এই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, তাহার অধ্যয়নে বিবেচক পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হয় না, এ কারণ মহর্ষি সম্প্রতি স্বরচিত শাস্ত্রের প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক পদার্থদিগের নির্দ্দেশ করিতেছেন। নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন, পদার্থ সকল অভিধেয়—অর্থাৎ নিরূপণীয় বিষয় এবং মুক্তির সহিত এই শাস্ত্রের প্রয়োজ্য-প্রয়োজকভাবরূপ সম্বন্ধ। পদার্থদিগের যাথার্থ্যজ্ঞান না

হইলে মুক্তি হয় না; ঐ যাথার্থ্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা প্রয়োজনীয় হয়; সুতরাং মুক্তিই এস্থলে প্রযোজ্য এবং শাস্ত্রই প্রযোজক হইয়াছে। এই শাস্ত্র পদার্থদিগের প্রতিপাদন করিতেছে বিধায়, পদার্থের সহিত শাস্ত্রই প্রতি-পাদ্য-প্রতিপাদক ভাব সম্বন্ধ এস্থলেও বুঝিতে হইবে। প্রথম সূত্রের অর্থে প্রকাশ পাইয়াছে যে, যাহারা শ্রবণাদিবিষয়ে সক্ষম এবং অসূয়াদি দোষরহিত, এতাদৃশ মোক্ষ-প্রার্থী ব্যক্তিগণই এই শাস্ত্রে অধিকারী। এই সূত্রে প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ দেখান হইল; সুতরাং বুঝাযাইতেছে যে, প্রবৃত্তির উপযোগী অধিকারী, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ, এই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট থাকাতে, এই শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিবেচক-পুরুষদিগের প্রবৃত্তি হওয়ার কোনও বাধা নাই। অনেকের হয়ত শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্তিই জন্মে না এবং যাঁহারা অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যেও সকলের সমান জ্ঞান হয়, এমন নহে। কাহারওবা শাস্ত্রকারের বাক্যে বিশ্বাস না থাকায়, প্রকৃত পদার্থের অবধারণ হয় না, এ নিমিত্ত ধর্ম্মবিশেষকে অবশ্য পদার্থতত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিতে হইবে। তাই সূত্রে "ধর্ম্মবিশেষ-প্রসূত" এইটি তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষণ দিয়াছিলেন। যাহার ইহজন্মের কিম্বা জন্মান্তরীয় শক্তিবিশেষ থাকে, তাহারই বস্তুতঃ পদার্থদিগের যাথার্থ্য জ্ঞান হইয়া থাকে। পদার্থ সকল প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভাব ও অভাব। তন্মধ্যে ভাবপদার্থ ছয় প্রকার,—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এস্থলে সূত্রে উক্ত ভাব-পদার্থেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন; পরে দ্বিতীয়াহ্নিকে "কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাব" ইত্যাদি সূত্রে অভাব পদার্থের উল্লেখ থাকায়, ভাব ও অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থের সমষ্টিতে দ্রব্য প্রভৃতি সাতটি পদার্থ কণাদের সম্মত বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই সমস্ত পদা-র্থের প্রত্যেকের লক্ষণ উত্তরোত্তর সূত্রে বলিবেন। সাধারণতঃ বুঝিতে হইলে, যাহাতে গুণ কিম্বা ধর্ম্ম থাকে, সেইগুলি দ্রব্য। যেমন মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের শরীরে রূপ আছে এবং গমনাদি ক্রিয়া দেখা যায়। ঐরূপ তরু-লতা প্রভৃতি উদ্ভিদের এবং ঘট, পট, জল, স্থল, তেজ প্রভৃতি জড়পদার্থের রূপাদি গুণ ও স্পন্দনাদি ক্রিয়ার উপ-লব্ধি হইয়াছে। বায়ুর রূপ নাই বটে, কিন্তু স্পর্শ ও চলন আছে। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে কোনও ক্রিয়া নাই, কিন্তু আকাশে শব্দাদিগুণ আছে এবং কালে ও দিকে সংযোগ-বিভাগ প্রভৃতি ও আত্মাতে জ্ঞান-ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ রহিয়াছে। ঐরূপ মনে সংখ্যাদি গুণ ও গতিক্রিয়া আছে, সুতরাং এই সমস্তগুলিকে দ্রব্য বলিয়া জানিতে হইবে। স্থলবিশেষে প্রয়োগ করা যায় যে, একটি শ্বেতকায় দীর্ঘাকার মনুষ্য সুগন্ধ ও সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিতে করিতে গমন করিতেছে। এস্থলে মনুষ্য ও ফল, এই দুইটি দ্রব্য। মনুষ্যের একত্ব সংখ্যা, শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘপরিমাণ, এবং ফলের সুগন্ধ ও মধুর রস, এই সমস্ত গুণ। ভক্ষণ ও পদ-সঞ্চারণ রূপ গমন, এই দুইটি কর্ম্ম। মনুষ্য-শরীরে মনুষ্যত্ব, ফলে ফলত্ব, একত্ব সংখ্যায় সংখ্যাত্ব, শ্বেতরূপে রূপত্ব, দীর্ঘপরিমাণে

পরিমাণত্ব, সুগন্ধে গন্ধত্ব, মিষ্টরসে রসত্ব ও গমনক্রিয়ায় গমনত্ব, এই সমস্ত সামান্য পদার্থ অর্থাৎ জাতি। মনুষ্য শরীরে মনুষ্যত্বরূপ জাতি আছে বিধায়, বিভিন্নপ্রকৃতিক বঙ্গ, হিন্দুস্থান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি নানাদেশের নিবাসী ব্যক্তিগণ সকলেই মনুষ্য বলিয়া অভিহিত ও প্রতীত হয়েন, এবং আম, জাম, নারিকেল, বেদানা, আঙ্গুর প্রভৃতিতে ফলত্ব থাকায়, ঐ সকল ফল বলিয়া কথিত হয়। এইপ্রকারে রূপত্ব জাতি থাকাতে, শ্বেত, পীত, নীল প্রভৃতি সমস্ত বর্ণকেই রূপ বলে এবং সৌরভ ও অসৌরভ, উভয়েই গন্ধত্ব-জাতি আছে বলিয়া গন্ধ, আর মধুর-অম্ল-তিক্ত প্রভৃতিতে রসত্ব-জাতি থাকায়, ঐসকল রস বলিয়া ব্যবহৃত ও প্রতীত হয়। এইরূপে দ্রব্যত্ব-জাতি থাকায়, ক্ষিতি-জল-তেজ প্রভৃতি দ্রব্য, গুণত্বজাতি থাকায়, রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি গুণ ও কর্ম্ম-জাতি থাকায়, গমন, আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি কর্ম্ম বলিয়া কথিত ও জ্ঞাত হইয়া থাকে। উক্তস্থলে মনুষ্য-শরীরের সহিত তাহার শ্বেতরূপ, গমন ক্রিয়া ও মনুষ্যত্বাদি-জাতির অবশ্য কোন সম্বন্ধ আছে, বলিতে হইবে; ঐ সম্বন্ধের নাম সমবায়। বস্তুর অবিভাজ্য ক্ষুদ্র অংশকে পরমাণু বলে; ঐ পরমাণুদিগের অবয়ব নাই এবং সকল পরমাণুই অনুপরিমাণ বিশিষ্ট। অবয়ব নাথাকায় কিম্বা পরিমাণের কোন পার্থক্য নাথাকায়, ঘট-পটাদি স্থূল দ্রব্যের ন্যায় অবয়ব-ভেদে কিম্বা পরিমাণ ভেদে পরমাণুদের দুইটীর পরস্পর ভেদ থাকার সম্ভাবনা নাই। এ নিমিত্ত পরমাণুদিগের পরস্পর বিশেষভেদক, প্রত্যেক পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন এবং আকাশ, কাল, আত্মা, দিক, এই সমস্ত নিত্যদ্রব্যেরও অবয়ব নাই এবং প্রত্যেকরই পরিমাণ অতি মহৎ, এজন্য তাহাদের ভেদক রূপেও বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশেষ পদার্থ নিত্যদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। সমবায় নামক একটিমাত্র সম্বন্ধ, উহা নিত্য। বৃক্ষাদি অবয়বী পদার্থের শাখা-পল্লব প্রভৃতি অবয়বে যে সম্বন্ধ আছে, ক্ষিতিপ্রভৃতি দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ আছে এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উক্ত সমবায় ব্যতীত অন্য নহে। প্রত্যেকস্থলে সমবায়কে পৃথক্ পৃথক্ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই বিধায়, সর্ব্বত্রই উহাকে একই বলিয়াছেন। অভাব-পদার্থ দুইপ্রকার, অন্যোন্যাভাব ও সংসর্গাভাব। দুইটী পদার্থের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের যে অভাব থাকে, যেমন মনুষ্য বৃক্ষ নহে কিম্বা বৃক্ষ মনুষ্য নহে, ঐরূপ জল আগুণ নহে কিম্বা আগুণ জল নহে, এই প্রকার অভাবকে অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ভেদ বলে। ভেদ ভিন্ন অভাবের নাম সংসর্গাভাব; ঐ সংসর্গাভাব তিন প্রকার, প্রাগ্‌ভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব। এইস্থলে ঘট জন্মিবে, এইরূপ বলিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ঘটের অভাব প্রতীত হয়, উহাকে প্রাগ্‌ভাব বলে; ঐ অভাবটী ঘট জন্মিলে আর থাকে না। বিনাশরূপ অভাবকে ধ্বংসাভাব বলাযায়। এই ধ্বংসাভাবটী জন্য; সুতরাং যে অভাবটী জন্মে, তাহার নাম ধ্বংস। এইরূপ আকাশ মেঘশূন্য, বায়ুতে রূপ থাকে না, আগুণ নীরস, জল গন্ধবিহীন, আত্মাতে কোন রূপ নাই, শরীর

জ্ঞানের কারণ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহাতে জ্ঞান থাকে না; এইরূপ প্রতীতিদ্বারা অত্যন্তাভাব স্থির হয়। সংসর্গাভাবের মধ্যে এই অভাবটীই নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয় শূন্য; সুতরাং নিত্য সংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব বলিতে হইবে। যে জাতির পদার্থে যে ধর্ম্মটি থাকে, সেই তাহার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সজাতীয়ের ধর্ম্ম, এবং যেখানে যেটী না থাকে, সেই তাহার বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধধর্ম্ম। প্রধানতঃ দেখিতে গেলে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার সাধর্ম্ম্য, শরীরের উহা বৈধর্ম্ম্য এবং রূপ স্পর্শরূপ প্রভৃতি শরীরের সাধর্ম্ম্য; কিন্তু আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এইপ্রকার জগতের সৃষ্টি ও রক্ষণাদি ঈশ্বরের ধর্ম্ম, উহা অস্মদাদি প্রাণীবর্গের বৈধর্ম্ম্য। এইরূপে সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পদার্থদিগের তত্ত্বনিশ্চয় হইলে, পুনরায় আর মিথ্যা জ্ঞান জন্মিতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞান এবং মিথ্যাজ্ঞানজনিত সংস্কারই জগতে জীবগণের অশেষবিধ দুঃখের মূলীভূত কারণ। কোন অন্ধকারাবৃত স্থানে সম্মুখে রজ্জু দেখিয়া তাহাতে যদি সর্পভ্রম জন্মে, তবে সর্পে দংশন করিবে বলিয়া, তখনই অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হওয়ায় দুঃখেরঅনুভূতি হয়। ভ্রমবুদ্ধিতে অন্ধকারে বিভীষিকাদর্শন করিয়া, ব্যক্তিবিশেষের চিরদুঃখের কারণীভূত কোনও রোগাদিও জন্মিতে পারে। প্রাণিগণ যদি দেহকে আমি বলিয়া না বুঝিত, কিম্বা সেই দেহ সম্পর্কিত স্ত্রী-পুত্রাদিতে আমার স্ত্রী আমার পুত্র ইত্যাদি প্রকারে সংস্কারপন্ন না হইত, তবে দেহের অপচয় সম্ভাবনায় অথবা স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে কদাচ দুঃখ অনুভব করিত না। মিথ্যাজ্ঞান অনেকপ্রকার, আত্মা বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ নাই; শরীরই আত্মা। এই শরীরকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারিলে, সুখভোগও অতিরিক্ত হইতে পারে। ধন ব্যতিরেকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, এ নিমিত্ত পরপীড়ন, পরদ্রব্যাপহরণ বা পরপ্রতারণাদি দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে। এই শরীরেই কার্য্যের ফলভোগ হইয়া থাকে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, যে কর্ম্মেরদ্বারা সুখভোগ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। সুন্দররূপ সন্দর্শনে চক্ষুর পরমপ্রীতি জন্মে, সুমধুরদ্রব্য আস্বাদন করিলে রসনার তৃপ্তি সাধন হয়। সুগন্ধ দ্রব্যজাতের সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরমপ্রীতি লাভকরে, সুকোমল বস্তুনিচয়ের স্পর্শে ত্বগিন্দ্রিয়ের চরিতার্থ জন্মে, শ্রুতি-মধুর-বাক্যাবলি শ্রবণ করিলে শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, এবং সর্ব্বথা অভীপ্সিত বিষয়টী সিদ্ধহইলেই মনের সন্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়নিচয়ের পরিতৃপ্তি হইলেই আত্মতৃপ্তি জন্মে; সুতরাং সুন্দরীরমণিগণের রূপ-লাবণ্য কটাক্ষাদির অবলোকনদ্বারা নয়নের, সুগন্ধিদ্রব্য সম্পর্কিত শরীরের সুগন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, আস্যকমলের পরিচুম্বনে রসনার, পরিপূর্ণসুমধুরবাক্যাবলিতে শ্রবণের, আলিঙ্গনাদিদ্বারা স্পর্শেন্দ্রিয়ের, কিম্বা প্রযত্নকৃতপরিচর্য্যাদিহইতে অন্তঃকরণে পরিতুষ্টি সম্পাদন করিতেহইলে, প্রমদাগণ সম্বন্ধে স্বকীয়ত্ব-পরকীয়ত্ব বিবেচনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাণিগণের জন্ম, কিম্বা মরণ, স্বভাব সিদ্ধ; তাহার প্রতি অন্য কোন

বিশেষ কারণ নাই, দেহাবসানেই মুক্তি হয়। বৈশেষিকদর্শন সম্মত মুক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর জিনিষ, ঐ মুক্তিকালে কোন কার্য্যই থাকে না, সমস্ত কার্য্যের উপরতি হইলে সুখের সামগ্রী কিছুই থাকিল না। যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, বরং বৃন্দাবনে শৃগাল হইয়া থাকিব, তথাপি মুক্তিকে কখনই প্রার্থনা করিব না (বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং নতু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন)। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান সন্তুতি, কদাচ তত্ত্বজ্ঞানীর সমক্ষে স্থান পায়না। তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভ্রান্তবুদ্ধির বিনাশ হইলে দেহাদির অনুকূল বিষয়ে উৎকট অনুরাগ, কিম্বা প্রতিকূল বিষয়ে যেরূপ দোষের উচ্ছেদ হয় — রাগদ্বেষাদিরূপ দোষের বিগম হওয়াতে, সদসৎ কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি থাকেনা; সুতরাং ফলাফল, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপে অদৃষ্টের আর উৎপত্তি হয়না। অদৃষ্টের অভাব হওয়ায় কারণ নাথাকাতে, শরীরান্তরপরিগ্রহরূপ জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা, এবং জন্ম নাহইলে পুনরায় দুঃখোৎপত্তিও হয়না; সুতরাং পুরুষ মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ইহাই "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সং" ইত্যন্ত সূত্রদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। নিঃশ্রেয়স শব্দে নিরতিশয়মঙ্গলরূপ মুক্তি অর্থাৎ দুঃখের অবসান বুঝায়। সাংসারিকদিগের পক্ষে সাময়িক দুঃখাপগমটী ঘটিয়া থাকে সত্য; কিন্তু সময়ান্তরে তাদের ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ ঐ ক্ষণিক দুঃখাপগমনকে মুক্তি বলা যায়না। পূর্ব্বে বলাহইয়াছে উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। মোক্ষদশাতে দুঃখের ঐ প্রাগভাবটী থাকেনা, কারণ পরে আর দুঃখ জন্মেনা; সুতরাং তৎকালীন দুঃখ নিবৃত্তিকে অবশ্য দুঃখের প্রাগভাব সমানকালীন বলিয়া বুঝাইতেছে, অতএব দুঃখ প্রাগভাব সমানকালীন দুঃখ ধ্বংসরূপ আত্যন্তিকীদুঃখনিবৃত্তিই, মুক্তি পদবাচ্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইতেছে। এতাদৃশ মুক্তিতে প্রমাণ কি? জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে বলিতে হইবে যে, মুক্তপুরুষ ব্যতীত তৎকালীন দুঃখনিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ জানিতে পুরুষান্তরের সামর্থ্য নাথাকিলেও, শ্রুতি ও অনুমানরূপ প্রমাণদ্বয়হইতে মুক্তির অস্তিত্বোপলব্ধি হইবার বাধা নাই। শ্রুতি বলিতেছেন "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি অশরীরংবাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে নস্পৃশতঃ" তত্ত্ব সাক্ষাৎকারানন্তর জীব দুঃখহইতে অত্যন্ত বিমুক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহার আত্যন্তিকীদুঃখনিবৃত্তি জন্মে। তখন শরীরবিহীনআত্মাকে প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ অথবা দুঃখ, কেহই স্পর্শ করিতে পারেনা। মুক্তিতে অনুমানও প্রমাণ হইতেছে, দৃষ্টান্ত মূলকই অনুমান হয়। যেমত কোন দীপশিখা সন্ততি তাহার উপকরণ তৈলাদির অভাবে এককালে অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মাতে দুঃখসন্ততির ও উপকারণীভূত শরীর অদৃষ্ট প্রভৃতির অসদ্ভাবে অত্যন্ত ধ্বংস হইয়া থাকে। "দুঃখ সন্ততিরত্যন্ত মুচ্ছিদ্যতে সন্ততিত্বাৎ প্রদীপ সন্ততিবৎ" দুঃখ সন্ততির অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে, ইহা অনুমান লভ্য হইতেছে। এই অনুমানে সন্ততিত্ব হেতু, কেননা, যাহাতে সন্ততিত্ব আছে, তাহারই অত্যন্তোচ্ছেদ দেখাযায়।

যেমন প্রদীপ প্রভৃতি। এই মুক্তি পদার্থটি সুখের বিরোধী, এজন্য ইহাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এইরূপ আশঙ্কা অন্তঃকরণে স্থান পাইবার যোগ্য নহে; কারণ সুখের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিও আমাদের স্বতঃ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পদার্থে প্রবৃত্তি জন্মিবার বাধা কি? অনশনজনিত দুঃখের নিবৃত্তিবাসনায় কদন্নাদির ভক্ষণেও পুরুষের প্রবৃত্তি দেখা যায়, কদন্ন ভক্ষণ যে সুখের সাধক নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? ভট্টমতাবলম্বিব্যক্তিগণ বলেন যে, নিত্যসুখের সাক্ষাৎকারই মুক্তি পদ বাচ্য, তাহাতে পুরুষ প্রবৃত্তির কোন অনুপপত্তি নাই। এই মতটী বিচারসহ নহে, কেননা, সুখের নিত্যত্বে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ, দেখা যায় জন্যভাব মাত্রেই অনিত্য; সুতরাং মুক্তপুরুষের সুখ সাক্ষাৎকারটীও অনিত্য। যদি অনিত্য হইল, তবে সাংসারিকের সুখ সাক্ষাৎ হইতে তাহার কোন বৈষম্য থাকেনা। ঐ সাক্ষাৎকারের অপগমন হইলে পুনরায় মুক্তদশা হইতে জীব সংসার দশায় পতিত হউক, এই প্রকার আপত্তিও হইতে পারে। ত্রিদণ্ডিমতে ব্রহ্মাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়াকে, মুক্তি বলে। জীব-ব্রহ্মের বস্তুগত্যা ভেদ না থাকিলেও, লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া আত্মা জীবভাব ধারণ করেন। যেমত ঘট বিনাশে ঘটাকাশ বিশুদ্ধাকাশে বিলীন হয়, তদ্রূপ লিঙ্গশরীরের বিগমে জীবেরও পরমাত্মাতে লয় হয়। এই লিঙ্গশরীর আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর স্থূল শরীরের বীজস্বরূপ, মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রা পঞ্চভূত সূক্ষ্ম একাদশেন্দ্রিয় সমষ্টি। এই লিঙ্গশরীর বিশিষ্ট আত্মারই দুঃখভোগ হইয়া থাকে, এজন্য লিঙ্গশরীরের নাশে দুঃখের উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং ফলবলতঃ মুক্তি দুঃখনিবৃত্তিতে পর্য্যবসিত হইতেছে।

(ক্রমশঃ)

সাংখ্যদর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা।

২৩

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মোজ্ঞানংবিরাগ ঐশ্বর্য্যং।

সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্বিপর্য্যস্তং॥

পদপাঠঃ। অধ্যবসায়ঃ। বুদ্ধিঃ। ধর্ম্মঃ। জ্ঞানং। বিরাগঃ। ঐশ্বর্য্যং। সাত্ত্বিকং। রূপং। তামসং। অস্মাৎ। বিপর্য্যস্তং।

ব্যাখ্যা। অধ্যবসায়ঃ—নিশ্চয়। (বুদ্ধির অসাধারণ ধর্ম্ম) বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণ সাত্ত্বিকা বলিয়া অভিহিত হয়।) ধর্ম্মঃ—অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সাধন। জ্ঞানং—প্রকৃতি পুরুষের ভিন্নপ্রতীতি অর্থাৎ পৃথগ্‌ভাবের অবধারণ। (সাংখ্যমতে) বিরাগঃ—রাগ

অর্থাৎ আসক্তি, তাহার অভাব। ঐশ্বর্য্যং—ঈশ্বরভাব অর্থাৎ আধিপত্য। (অণিমাদি) সাত্ত্বিকং—সত্ত্বাংশকার্য্য। এতদ্রূপং—এইরূপ। (ইহা) তামসং—তমোগুণাংশকার্য্য। অস্মাৎ—ইহা হইতে। বিপর্য্যস্তং—বিপরীত।

বঙ্গার্থঃ। অধ্যবসায়ই বুদ্ধি। বুদ্ধির সাত্ত্বিক ধর্ম্ম—ধর্ম্ম, (অভ্যুদয়াদিহেতু।) জ্ঞান, বিরাগ, ঐশ্বর্য। তামসধর্ম্ম ইহা হইতে বিপরীত।

বিশদ ব্যাখ্যা। অন্তঃকরণসামান্যকে সূক্ষ্মদর্শিসাংখ্যাচার্য্যেরা সাধারণতঃ ত্রিধা কল্পনা করিয়াথাকেন। কোনও কোনও অসাধারণ কারণ অবলম্বন করিয়াই, ঐ ত্রৈবিধ্য কল্পনার লীলাতরঙ্গ দর্শনসম্প্রদায়ের অঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে।

অনেক অভিজ্ঞ-মহোদয়ের অভিমত, একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে কখনও বুদ্ধি, কখনও চিত্ত ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ সমাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সংকল্প-বিকল্প বৃত্তিক অন্তঃকরণ মন নামে, অভিমান বৃত্তিক অন্তঃকরণ অহঙ্কার আখ্যায়, নিশ্চয়-বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ বুদ্ধি বলিয়া, ও স্মরণবৃত্তিক অন্তঃকরণ চিত্ত সংজ্ঞায় সমাখ্যাত হইয়া থাকে। সাংখ্যশাস্ত্রে চিত্তকে বুদ্ধির অন্তর্গতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, স্বতন্ত্র সংজ্ঞার বিশেষ আবশ্যকতা স্বীকার করা হয় নাই। একই ব্যক্তির বৃত্তি বা ব্যাপার অথবা ব্যবসায় ভেদে নানা নামে আখ্যাত হওয়ার দৃষ্টান্ত নিতান্ত অসুলভ নহে। পাককালে পাচক, ধাবন সময়ে ধাবক, ও অধ্যয়ন দশায় পাঠক সংজ্ঞা এক ব্যক্তির দূষণীয় অথবা অসম্ভব বলিয়া বিচারিত হয় না।

এইদিকে চিন্তনীয় এই যে, স্মরণ বা সঙ্কল্প সামর্থ্যে সংজ্ঞাভেদ স্বীকার করিলে, সংশয়বিপর্য্যয় নিদ্রাক্রোধাদিরও ঐরূপ অভিধান পার্থক্যে নিমিত্ত রূপে পরিগণন উপযুক্ত হইয়া উঠে, এবং ক্রমশঃ অন্তঃকরণ অনেক নামে হইতে থাকে। ঐ গৌরব দার্শনিক কল্পনা প্রসঙ্গে রৌরবের নিকটবর্ত্তী; বিশেষতঃ, উহাতে ইষ্টসিদ্ধির অপ্রশস্ত মার্গ আরও অতীব দুর্গম হইয়া উঠিবে। এখানে আচার্য্যেরা আরও একটু চিন্তার বীজ বচনাবলীর অন্তরালে নিহিত রাখিয়াছেন। একই পদার্থ গুণভেদে ত্রিধা, চতুর্দ্ধা, অথবা যথেচ্ছারূপে কল্পিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বাগ্‌ব্যবহারের পরিপুষ্টি সম্ভাবনা দেখাযায়না। পাচকতা ধাবকতাই পরস্পরের পার্থক্য প্রাণে পুষিয়া রাখিল। তাহাতে পাচক ও ধাবক এই বাক্য ব্যাপারের প্রবৃত্তি ব্যতীত পদার্থ অন্যরূপ হইতে পারিলনা। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার [illegible] প্রকৃতিপরিণামক প্রতিভার প্রতিকৃতিস্বরূপ [illegible] ঐ পদার্থ-ত্রয়ের কার্য্যকারণভাব প্রতিপাদনে [illegible] স্বীকার করিয়াছেন। যদি পরমার্থতঃ পৃথক্ না হইয়া নামমাত্রই ভিন্ন হয়, তাহাহইলে নিমিত্ত [illegible] চিত্ত [illegible] উদ্‌ঘাটন করিয়া, সেইখানেই [illegible] পাইতে প্রস্তুত হইবে। [illegible] সংশপর্য্যের ন্যায় পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতার পরিচয় [illegible] একটিকে [illegible] বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। [illegible]

অবয়ব গুলি পরস্পর পৃথক হইতে বিশেষ বাধা নাই। অধ্যবসায়বুদ্ধির অবয়ব বিশেষ বুদ্ধি ঐরূপে অপরাপরের অবধারণ করিতে হইবে। সমগ্র অবয়বের সাধারণ অন্তঃকরণসামান্য। অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি নহে। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তিই অধ্যবসায়। ধর্ম্মিপদার্থ ও অসামান্য ধর্ম্ম এতদুভয়ের অভেদ বিবক্ষায় ঐরূপ প্রয়োগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অসাধারণ ধর্ম্মই ইতর নিবৃত্তিপূর্ব্বক পদার্থের প্রকৃত ভাবের অনুমাপক। উহা লক্ষণ নামেও কথিত হয়। এখানে অধ্যবসায়ই বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া, "অধ্যবসায়" এই পদের সহিত "যস্যা লক্ষণং" এই অধ্যাহৃত পদের সম্বন্ধ করিয়া "সা বুদ্ধি" এইরূপে অন্বয় করিলেই অনুপপত্তির প্রতিঘাত সহ্য করিতে হয় না; কোনও দার্শনিকের অভিপ্রায়ানুসারে এরূপ বলাও অসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বে যে মতে বস্তুভেদ হইলনা বলিয়া কার্য্যকারণ ভাব অনুপপন্ন বলা হইয়াছে, তাঁহারাও বলেন বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যকারণ ভাব নিবন্ধন একই পদার্থে সংক্রামিতদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া, নিমিত্তনৈমিত্তিক ভাব কল্পনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃত্তিগুলিই যথাসম্ভব একে অপরের কারণ। তৎপ্রকারের অববোধ উদ্দেশ্য করিয়া পদার্থের কার্য্যকারণতা-ব্যবহার বিহিত আছে।

অব্যক্ত এবং ব্যক্ত এই দুই ভাগে সামান্যতঃ জড়জগতের বিভাগ। প্রকৃতিই অব্যক্ত। বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রকৃতির অপেক্ষায় প্রকটীভূত তত্ত্ব। কেননা, বিকার হইতে ক্রমশঃ প্রকটভাবের আবির্ভাব হয়। ঐ পদার্থগুলি পরবর্ত্তিবিকার বলিয়া বিবেচিত হইতে শ্রুতি-স্মৃতি ও অনুমানাদির অনুমতি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বকারিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাহইতে অব্যক্ত বিচার চরিতার্থতালাভ করিয়াছে। ব্যক্ততত্ত্বের বিশদানুসন্ধান বর্ত্তমান কারিকা হইতে আরব্ধ হইল। "প্রকৃতির প্রথম বিকার" এই হেতু বুদ্ধিতত্ত্বই সর্ব্বাগ্রে ব্যক্তবৃন্দের মধ্যে বিবৃত হইবার যোগ্য। অপর তত্ত্বগুলিরও ঐ বুদ্ধি আবির্ভাব নিমিত্ত; সুতরাং সঙ্গতির অসদ্ভাব শঙ্কা বিষয় হইতে পারিল না। বুদ্ধির স্বরূপ নির্ব্বাচনপূর্ব্বক অনপাজ্ঞানের উপযোগিবিধায় সাত্ত্বিক ও তামস-বুদ্ধি ধর্ম্মগুলির প্রদর্শনে মনোনিবেশ করিতে কারিকাকার বাধ্য হইয়াছেন। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অখিলবিকারনিদানভূতা-প্রকৃতি-দেবীই জড়তত্ত্বের পরমোপাদান। কারণগুণানুসারে কার্য্যগুণের উৎপত্তি হয়, সুতরাং বুদ্ধি-তত্ত্বের সাত্ত্বিক, রাজস, তামস, এই কারণাগত ভাবত্রিতয় সযুক্তিক। রজোগুণ কেবল সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্যজননে সহায়তা করে মাত্র। অপরের কার্য্যে প্রবর্ত্তীকরণ ব্যতীত রজোগুণের স্বতন্ত্র কোনও কার্য্য নাই। যাহা উভয়ের কার্য্য, তাহাই রাজস। [illegible] এই মতের পরিপোষক। তিনি তজ্জন্যই বুদ্ধির সাত্ত্বিক ও তামস ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া নিবৃত্তিলাভ করিয়াছেন।

---

* অধ্যবসায়োবুদ্ধিঃ। এইরূপে।

বুদ্ধির অপর নাম [illegible] বিরাগ। ইহার প্রতিলিপ্সার্থ গ্রহণেই আর্য্যঋষি [illegible] হইবে। রাগ অর্থাৎ আসক্তির অভাবই বৈরাগ্য। আমরা এই সংসার-চক্রের অবিরাম পরিবর্ত্তনে অনন্তকাল ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। কখনও সুখস্বপ্নে আনন্দোল্লাসে পুরিত, কখনও প্রমত্ত পিশাচের অট্টহাস্যে বিকম্পিত। চপলাচমকে চক্ষুঃস্থ পেশীগুলি কখনও বা অকর্ম্মণ্য হইয়া বিলাপ করে, আবার মানসমোহন রুচির দৃশ্যসংযোগে স্নিগ্ধতার স্রোতে আপ্লুত হয়। কখনও দুরন্ত দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র বিভূষিত, প্রাণপক্ষী দেহগৃহের মায়াদয়া ত্যাগকরিতেই যেন উৎকণ্ঠিত। আবার অঙ্কদেশে পুত্রপরিজনের প্রেমমাখা মুখদর্শনে তৃপ্ত, যেন নিরতিশয় আনন্দসরোবরের অমলকমলে বিমলজলে স্নান করিয়া শান্তিসুধায় সকলক্ষুধার অবসাদ মিটাইয়াছে। এই ব্যত্যাস বিপর্য্যাস কিসের জন্য? কাহার অনুগ্রহে সলিলসিঞ্চনে এইবিপত্তি লতিকা লাবণ্যমাখা শরীরে ধীরে২ বর্দ্ধিত হইতেছে? উত্তর—আসক্তির প্রতি ভক্তি ভাব ইহাইত বটে? আসক্তির বিনাশ সহসাই সংঘটন হয়না। সুদীর্ঘকাল সুনিয়মে সংবর্দ্ধিত সবলশাখা সুদৃঢ় মূলবৃক্ষকে কি অনায়াসেই উচ্ছিন্ন করাযায়? উহা আয়াস ও সময় সাপেক্ষ। আসক্তি কমাইয়া ক্রমে২ উহাকে নিঃশেষিত করা যাইতে পারে। এই ক্রম আশ্রয় করিয়া শিষ্ট মহাশয়েরা বৈরাগ্যের চারিটী স্তর আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার যে সংজ্ঞাগত স্বতন্ত্রতা আছে, তাহা সহজতঃই বুঝা যায়। প্রথমস্তর যতমান সংজ্ঞা, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয়, চতুর্থ বশীকার। ইহাই শেষ সোপান। শাস্ত্রকারগণ ইহাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমার নয়ন অনুক্ষণ প্রাণপ্রতিমপুত্রের বদন-সুধাকরের চকোর হইয়া থাকিতে চায়, সে সেই পীযূষেই প্রীত। এইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রযোজক কে? রাগ বই আর কিছুই সম্ভব হয়না। এই রাগ চিত্ত গত কষায় বলিয়া কথিত হয়। ইহার প্রভাবেই ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খল পরিচরণ। যদি বিষয়সংযোগ লোপ করা যায়, তবে রাগের প্রসার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ইন্দ্রিয়গণ যথেচ্ছ বিষয়ে প্রবৃত্ত না হউক, এই রূপ প্রযত্নই যতমান সংজ্ঞা। এই স্থানেই রাগের পরিপাকার্থ প্রথম উদ্যম প্রবর্ত্তিত। ইহা রাগোচ্ছেদের যত্ন মাত্র বলিয়াই যতমান এই সংজ্ঞার সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে। পরে ব্যতিরেক। যত্ন বলে কোনও কোনও বিষয়ক আসক্তির পরিপাক অর্থাৎ [illegible] উপস্থিত হইয়াছে, কতকগুলি যেমন তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে। এই [illegible] উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে গুলি পচ্যমান অর্থাৎ ভবিষ্যতে পচন [illegible] হইবে, বর্ত্তমানে অপক্ব, তাহাদের হইতে পক্বগুলির পৃথগবধারণই ব্যতিরেক। [illegible] মধ্যে সংশোধিত এবং অসংশোধিতের ব্যতিরেকাবধারণ [illegible] [illegible] বিশেষরূপে প্রমাণ পাইবার একটী সমাচীন উপায় উপস্থিত [illegible] [illegible] এই [illegible] আংশিক শুদ্ধি সংঘটিত হইয়াছে।

তদন্তর একেন্দ্রিয়। লোচন আর অভীপ্সিত পদার্থের দর্শনে সন্তর্পিত হননা। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রাগের বহি প্রবৃত্তি রুদ্ধ, আসক্তির কিন্তু অবসান নাই। দেখিনা, কিন্তু দর্শনের উৎসুকতা চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাপার অপারসাগরে ভাসিয়াছে, আসক্তির শক্তি এখনও কম নয়। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক একই মন ইন্দ্রিয়ে ঔৎসুক্যরূপে অবস্থানই একেন্দ্রিয় নামের অন্বর্থতার কারণ।

পরিশেষে বশীকার। ঔৎসুক্যটুকু যাহা টিপটিপ করিয়া জ্বলিতে ছিল, তাহাও নিবিয়াছে। সহস্র সহস্র প্রলোভন ও এখন বিচিত্ত করিতে সমর্থ নয়। সুবাসিত সলিল সম্মুখেই সর্ব্বদা আছে, কিন্তু চায়কে ? পিপাসা যে ফুরাইয়াছে। মধ্যাহ্ণগগণের অরুণ-কিরণের মত তরুণীর তীব্র কটাক্ষ অবিরতই আপন কর্ত্তব্য পালন করিতেছে, কিন্তু মনের আবিলতা আর নাই। শারদীয় সুন্দর জ্যোৎস্নাময় আকাশের ন্যায় সুবিমলতা আর এখন সুলভা বই দুর্ল্লভা নয়। ইন্দ্রিয় আর পরের কথায় আমার অনিষ্টে মনোযোগ করেনা, মন এখন আমার কথায় মন দেয়। কৃতঘ্নতা দোষে এখন আর সে কলুষিত নয়। সকলেই বশীভূত। সে উচ্ছৃঙ্খলতার পৈশাবভাব কোন্ অজ্ঞাত লোকে অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে, এখন সর্ব্বত্রই সমতা, সকলস্থানেই শান্তি। বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যই প্রকৃতপক্ষে বিরাগপদ প্রয়োগের মুখ্য উদ্দেশ্য যুক্ত। এই বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, বিবেকী সংসারবিরাগী কবি কোকিল পঞ্চমে তান তুলিয়া গাহিয়াছেন,

"সর্ব্বংবস্তু ভয়ান্বিতং ভুবিনৃণাং বৈরাগ্য মেবাভয়ং।"

অপর সাত্ত্বিক বুদ্ধি ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্লোকে ঐশ্বর্য্যের অষ্টবিধতা পরিগণন করিয়াছেন। অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ যত্র কামাবসায়িতা। এই আটটীই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ঐশ্বর্য্য। প্রথমতঃ অণিমা। যোগ চর্য্যা বিশেষের পরিণাম ফল অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য। অণুভাবাপত্তি অণিমা। সান্দ্রিস্ত শরীরধারী মহাশয় এই ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে, অণুরূপে শিলার অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিতে পারেন। দ্বিতীয় লঘিমা। লঘুভাব ধারণই এই ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ। জলের উপর বিচরণ করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ আমাদের শরীরের সমায়তন জলের ভার অপেক্ষা শরীরের ভার অনেক অধিক, তজ্জন্যই আমরা নীরতলে নিমজ্জিত হই। যদি শরীরের লঘুভাব হয়, তবে জলে শরীর ডুবিবেনা। অনেক সাধু সন্ন্যাসী জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, এরূপ কিংবদন্তী এখন ও প্রচলিত আছে। পাদুকা ধারণ পূর্ব্বক স্রোতস্বতীর পর পারে উপস্থিত হওয়ার বিষয় অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। প্রবাহের উপর পদচার লঘিমার প্রসাদে উপপন্ন হইতে পারে। প্রাপ্তিতৃতীয়, প্রাপ্তির ব্যাঘাত থাকেনা। ভূমিস্থ ব্যক্তি করাগ্রে গগণমণ্ডলস্থ শীতরশ্মি মহাশয়কে স্পর্শ করিতে পারেন। দূরত

ঐশ্বর্য্য নিবন্ধন প্রাপ্তির বাধা জন্মাইতে পারিলনা। পুরুষোত্তম মন্দিরে (পুরী) বসিয়া প্রাপ্তি সম্পন্ন সাধক বারাণসীস্থ শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রভুর মস্তকে বিল্বপত্র প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলে অকৃতার্থ হইবেন না। চতুর্থ প্রাকাম্য। ইচ্ছার অনভিঘাত অর্থাৎ অবাধভাব। জল তরল পদার্থ। অবগাহন করিলে নিজেরা স্থানান্তরিত হইয়া ভদ্রলোকের মত আগন্তুকের স্থান প্রদান করে। স্নেহের আধার না হইলে এরূপ সরলতার পরিচয় কি অন্যত্র সম্ভব? এখানে উন্মজ্জন নিমজ্জন যাঁহার যেমন মন তেমনই করিতে পারেন। ভূমিতে উন্মজ্জনের চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যে কতদূর সম্ভব তাহা সকলেরই কল্পনা করিতে সামর্থ্য আছে। সে কঠিন স্থান! কাহারও প্রত্যাশা পূরণ সেখানে খাটেনা। প্রাকাম্যের মাহাত্ম্যে সাধকমহাশয় মাটীতে নিমজ্জিত হইবেন, বাধকনাই। পঞ্চম মহিমা, মহত্বই উহার স্বরূপ। আমি যেমন তাদৃশই আছি। ইচ্ছামাত্রেই শরীর মহত্ত্বের আবির্ভাব আমার আয়ত্ত নয়। অবতার বিশেষের অনুচর অঞ্জনাতনয় অন্য অঙ্গের কথায় কাজ কি একেবারে লাঙ্গুলটীকে পঞ্চাশ বা ষাট যোজন বড় করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কোন্ বিদ্যার পরিচয় বলিতে পারিনা তবে "মহিমার" মহিমায় নাগ নগরাদি পরিমিত বিশাল শরীর ধারণ করিতে পারাযায় ইহা শাস্ত্রের ঘোষণা। আপাততঃ অসম্ভব বলিয়া আপত্তি উঠিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করা উচিত, কাজের বেলায় কথায় কাঁটেনা। করিলে হয় কিনা তাহার বিচারে অনুষ্ঠাতারাই অধিকার, যাহাদের সহিত বাক্য ব্যয় ব্যতীত আর কোনও সম্বন্ধ নাই, বলিতে হইলে প্রতিবেশীর মত খাঁতির টুকুও মিলেনা, সেই আমরা, সেই বাগজাল পাঁতিবার শিক্ষাগুরু আমরা, প্রকৃত তত্ত্বের "হয় নয় বিচারে" একান্ত অনধিকারী। ঈশিত্ব ষষ্ট। ভূত ভৌতিক পদার্থের স্থিত্যুৎপত্ত্যাদির প্রভুত্ব। তক্ষক দষ্ট-বৃক্ষকেও পুনর্ব্বার যথাকারে স্থাপন করিবার সামর্থ্য সাধারণতঃ দুর্ল্লভ। ঈশিত্বের অনুগ্রহে তাদৃশ ক্ষমতার সম্ভাবনা আছে। বশিত্ব সপ্তম। নিজের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় মন ইহারাই অধীনভাবে অবস্থিতি করিতে অমত প্রকাশ করে, প্রিয় পুত্রও বাক্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ। সাধারণতঃ আমরা পরাধীন। বশিত্বের বলে ভূত ভৌতিক সৃষ্টিতে বশী অর্থাৎ স্বতন্ত্র হওয়া যায়। অপরের অপেক্ষায় সময় ক্ষেপ করিতে হয় না। স্বতন্ত্রতার আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়া যথামত সময়-স্রোতের চাতুর্য্যালোচনে অবসর জন্মে। কামাবসায়িতা অষ্টম। কাম অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ জাগতিক পদার্থের ব্যবস্থাপন সামর্থ্য। ইহা ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা নহে, মানস-সঙ্কল্প মাত্রেই কার্য্যের নিষ্পত্তি। আমরা পদার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে যে পদার্থ যে রূপে উপলব্ধি করি তাহার তদ্রূপেই নিশ্চয় হয়। যোগী কামাবসায়িতার প্রসাদে যেরূপ সঙ্কল্প করিবেন বস্তু সেইরূপেই বিপরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যমান থাকিবেন তাঁহার কামানুযায়ী পদার্থের নিশ্চয়। এই অষ্টৈশ্বর্য্য সাত্ত্বিকবুদ্ধি ধর্ম্ম। তামস ধর্ম্ম ইহার বিপরীত। সাত্ত্বিক—ধর্ম্ম, তামস অধর্ম্ম। সাত্ত্বিক

জ্ঞান, তামস অজ্ঞান। সাত্ত্বিক বৈরাগ্য, তামস অবৈরাগ্য। সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য, তামস অনৈশ্বর্য্য। বুদ্ধির অসাধারণ বৃত্তি এবং সাত্ত্বিকাদি ধর্ম্ম ভেদ প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইল। এখন অহঙ্কারাদির নির্ব্বাচনে মনোযোগ বিধেয়।

অভিমানোঽহঙ্কার স্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চগণস্তন্মাত্র—পঞ্চকশ্চৈব ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। অভিমানঃ। অহঙ্কারঃ। তস্মাৎ। দ্বিবিধঃ। প্রবর্ত্ততে। সর্গঃ। একাদশকঃ। চ। গণঃ। তন্মাত্র পঞ্চকঃ। চ। এব।

ব্যাখ্যা। অভিমানঃ—গর্ব্ব। অহঙ্কারঃ—অহঙ্কার (নামে কথিত হয়।) তস্মাৎ—তাহা (অহঙ্কার) হইতে। দ্বিবিধঃ—দুই—প্রকার। প্রবর্ত্ততে—প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ আরব্ধ হয়। সর্গঃ—সৃষ্টি। একাদশকঃ—একাদশ সংখ্যক। (ইন্দ্রিয় সমূহ।). চ—ও। গণঃ—সমূহ বা সমষ্টি। তন্মাত্রপঞ্চকঃ—তন্মাত্র অর্থাৎ ভূত সূক্ষ্ম পাঁচটী। চ—এবং। এব—(অবধারণার্থে।)

বঙ্গার্থ। অভিমানই অহঙ্কার। তাহা হইতে দুই প্রকারের সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। একাদশ ইন্দ্রিয়। (এক) ও (অপর) পঞ্চতন্মাত্র।

বিশদ ব্যাখ্যা। যেরূপ অধ্যবসায়কে অসাধারণ বৃত্তি বলিয়া বুদ্ধির লক্ষণ অথবা কদাচিৎ বুদ্ধি বলিয়াই বলা হয়, তদ্রূপ অহঙ্কারের অসামান্য ধর্ম্ম এই হেতু অভিমানকেও লক্ষণ কিম্বা অভেদ বিবক্ষায় অহঙ্কার বলা যাইতে পারে। এখানে আর এ বিষয় বিশদরূপে বলিবার বিশেষ কারণ দেখিনা। বুদ্ধির কার্য্য অহঙ্কার। অহঙ্কার একাদশেন্দ্রিয়ের উৎপাদক। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এই একাদশটী পদার্থ এখানে "একাদশকঃ" শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছে।

যাঁহাদের মতে রজোগুণের স্বতন্ত্র কার্য্য স্বীকৃত আছে, অর্থাৎ সত্ত্ব ও তমোগুণের কার্য্য জননে প্রবৃত্তি প্রদান ব্যতীত যাঁহারা রজোগুণের স্বতন্ত্র তত্ত্বোপাদানত্ব প্রতিপাদন করেন; তাঁহারা বলেন "একাদশানাং পূরণঃ একাদশকং মনঃ। "সাত্ত্বিকমেকাদশকং প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাদহঙ্কারাৎ" ২অ-১৮সূ এই কাপিল সূত্র হইতে তাঁহারা মনকে অহঙ্কারের সাত্ত্বিক কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্রিয়গণ অহঙ্কারের রাজস কার্য্য, ভূতসূক্ষ্ম তামস কার্য্য। তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ "বৈকারিক স্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহংত্রিধা। অহন্তত্ত্বাদ্বিকুর্ব্বাণান্মনো বৈকারিকাদভূৎ। বৈকারিকাশ্চ যে দেবা অর্থাভিব্যঞ্জনংযতঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যেব জ্ঞানকর্ম্মময়ানি বৈ। তামসোভূত-সূক্ষ্মাদি যতঃ খং লিঙ্গমাত্মনঃ। এই পুরাণ বাক্য। "রাজসাদিন্দ্রিয়াণ্যের সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ।' এই অধ্যাত্মরামায়ণীয় শ্লোকটী রজোগুণের রাজসাংশ কার্য্য দশেন্দ্রিয় এবং মন

সাত্ত্বিক কার্য্য এই সত্য ঘোষণা করিতেছে। একাদশক শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ-বিশেষ অর্থাৎ মন। পরবর্ত্তী গণশব্দ মনের বহুবৃত্তি ভেদে অথবা বাস্তব বহুত্ব লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত। রাজস কার্য্য দশেন্দ্রিয় একথা একারিকায় স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই তবে "চ"কার থাকায় উহা কথঞ্চিৎ সূচিত হইয়াছে। পরকারিকার তৈজস-দুভয়ং" অর্থাৎ তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয় অহঙ্কারের দ্বিবিধ কার্য্য, এই আচার্য্যবচন ব্যর্থ হয় বলাযায়না, কেননা, মন ও ইন্দ্রিয়। সুতরাং উহার জন্য স্বতন্ত্র শ্রেণী কল্পনা অনাবশ্যকীয়।

আমরা কিন্তু মনে করি সাত্ত্বিক একাদশকঃ এই শব্দের প্রয়োগ, "গণঃ" শব্দব্যবহার ও দ্বৈবিধ্য কথন, ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় আবিষ্কার করে। রজোগুণের স্বতন্ত্রকার্য্য স্বীকার তাঁহার নিকট সমাদৃত নয় বলিয়া বোধ হয়। মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে সাধারণের অনেক আপত্তি আছে। আমরা উহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণে অদ্যাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিলামনা। ইন্দ্রিয় একটী সংজ্ঞাশব্দ, উহার ব্যবহারে বিবাদ কেন বুঝিনা। যৌগিক শব্দ হইলেও ব্যুৎপত্তিবিচারে বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে। ইন্দ্রিয় শব্দের যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দশেন্দ্রিয়ের সমস্তই সমভাবে কার্য্যকারী হয়না। মনত গেল অনেক দূরে।

তন্মাত্রের কথা কথঞ্চিৎ বহুপূর্ব্বে বলাহইয়াছে। বর্ত্তমানে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। যথা সময়ে স্বরূপবিচার প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়াই বলা হইতেছে, "এব"। এতদ্ব্যতীত অহঙ্কার তত্ত্বের সাক্ষাৎ বিকাশ আর কিছু নয়, এইখানেই তাহার পর্য্যবসান। এই নিশ্চয় বুঝাইতেই "এব" শব্দের ব্যবহার।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্ত সংসার।

অনন্ত কাল অনন্তে ছুটিতেছি, কখনও শান্তির কমনীয় কান্তি দেখিয়া নয়ন-যুগলের পিপাসাশান্তি করিতে পারিলাম না ত! বিশাল সমুদ্র বক্ষে বিষম ঝঞ্ঝাবাত তাড়িত সকল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া কতকালই চলিতেছি; বারিরাশির গভীর গর্জ্জনে শ্রবণ বিবর ব্যথিত, পেশী সকল নিষ্পেষিত। লহরীমালার সাক্রোশ পদাঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া গেল, মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল হইল, হৃৎপিণ্ডস্থ ধমনীগণ অমনি প্রতিশোধ-কলুষিত প্রাণে রক্তিমাকার ধারণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে ক্ষণ কাল নিস্পন্দ রহিল, আবার ধৈর্য্য ধরিয়া সব সহিল, পরে কর্ত্তার কাছে সংবাদ দিতে চলিল, জ্যোতির্ম্ম লোচনে জল গলিল; এত বিড়ম্বনা, এত যাতনা, এত বেদনা, এত তাড়না, এত ক্লেশ, শেষে আবার যা তাই। কিছুই যেন মনে নাই। এই যে বিপুল ঝটিকায় শ্বাসমাত্রশেষ হইতে হইয়াছে, এই যে অনাশ্বাস আসিয়া বিশ্বাস পাত্র হইতে চাহিয়াছে, কত মোহন

তাঁনে ভুলাইতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিছুই ত কার্য্যকর হইল না! কোনও আশার ত সঞ্চার বাড়িল না! যন্ত্রণায় অধীর হইলে কৃপাভিক্ষার প্রার্থনা হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল, মলীমস সান্ধ্য আকাশে চপলাবালার বিমল হাঁসিটুকুর মত উহা আবার কোনও অদৃশ্যস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কোনও শিক্ষাক দিয়া গেলনা! অধীরতার আবির্ভাবে হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, নীরবতার নিবিড় রবে তাহার ক্ষীণ স্বর কর্ণপথে উঠিত না; যেন ঢাকিয়া গিয়াছিল! কিন্তু কই পলক না পড়িতে সবই যে নড়চড়ং হইয়া গেল! অধীরতার পরাভব, অভাবের বৈভব, সহসাই বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন! আবার শ্রবণরঞ্জক উদ্যমব্যঞ্জক ললিতের কোমল আলাপ! এ নির্লজ্জ উদ্যম এতক্ষণ কোথায় ছিল? নিশার শেষে উষার মত অকস্মাৎ কোন দেশ হইতে আসিল? কে আনিল? বলিয়াই বা কে দিল? কেন যাই? কিসের আশায় থামিয়াও যাই? তাড়িত লাঞ্ছিত দণ্ডিত ঘৃণিত হইয়াও যাই? যাহা নাই অথচ চাই, যদি তাহাই পাই জীবনের যত জ্বালা সবই জুড়াই, তবে কি কষ্টের মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিতে প্রাণের পোঁড়ায় তাজায় ভাঁজা ভাঁজা হইতে আবার যাই?

মোহকুহেলিকার প্রসার কমিল, সংসার বিকারের প্রবল পিপাসা অনেক পরিমাণে মিটিল, অন্ধকারের গর্ভে অপ্রকাশিত কত মণির খনি ফুটিল, নিবৃত্তিসুবাস ছুটিল, প্রবৃত্তির অমর ভ্রমর আজ টুটিল, বুঝাগেল কেন যাই? পথ পাই বলিয়াই যাই। অকুল সাগরে আকুল হইয়া আবার কাহার বলে কোন্ ছলে চলি? দিঙ্-নির্ণয়ে গোল যোগ ঘটিল কি না, জানিনা, কিন্তু চলিতে ত বাধা নাই! সম্ভবতঃ লক্ষভ্রষ্ট হইনাই। "জীবনের ধ্রুবতারা" ঐ না! অপারবারিধিতে উহাইত এপর্য্যন্ত আমার দিগ্‌দর্শনের অভাব পূরণ করিতে ছিল। তবে ত আমি লক্ষ দুঃখেও লক্ষ্য ভুলি নাই, তাই আবার নবোদ্যমে প্রমত্ত! যদি ধ্রুব আমার লোচন পথে এতক্ষণও নিজের আলোয় জল্‌জল্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তবে আমার এ বিপত্তি কেন? এত কষ্টের পিষ্টপেষণে আমি ক্লান্ত কেন? দুর্দ্দৈবমেঘে সময় সময় আমার চক্ষে আবরণ দেয়, অমনি আমি কেমন কি হইয়া যাই, অবকাশে শত্রুগণের আক্রমণ। সে তীব্রবেগ অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়া শূন্যমনে গগণ পানে চাহিয়া দেখি ধ্রুব আমার মেঘের বক্ষবিদীর্ণ করিয়া উকি ঝুকি মারিয়া দেখিতেছে, তখন দ্বিগুণ বলে সকল ভুলিয়া সেই দিকে অগ্রসর হই! শত বার সহস্রবার নির্লজ্জ বলিলেও উদ্যমের অঙ্গে আঘাত লাগেনা। ধ্রুব যে হৃদয়মন্দিরের ইষ্টদেবতা! দেখিতে দেখিতে কোথায় পলায়, পাইনা বলিয়া আশাত আমায় বিদায় দেয়না! কাজেই অপূর্ণ আশার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ছুটিতেছি। শুধু কি আমি? এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু। যে দিকে নয়ন নিক্ষেপ করি দেখিতে পাই প্রত্যেক বস্তুই অভাবনীয় অভাবার্ণবে নিমগ্ন। যেন্ কি আঁধারের আলোক, পিপাসার পানীয়, বেদনার ঔষধ, কি সঞ্চিত ধন

হারাইয়াছে। কিছুতেই তৃপ্তি নাই। যেন প্রাণের উপর বিষাদের আগুণ দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে, আত্মহারা দগ্ধপ্রাণ অনবরত ছোটাছুটী করিতেছে; এদিক্ ওদিক্ করিয়াই কাল যাপন করিতেছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কত সাজেই সাজিতেছে, কিন্তু কালের শাসন কি কঠোর, অমনিই বিষণ্ণ বদনে খুলিয়া ফেলিতেছে। বাল্যাবস্থায় অপরিতৃপ্ত বকুলতরু শাখা পত্রাদির বহুলতায়ও তাই। তখন মুকুলোদ্গমের আশা। কই? মুকুলেও ত আকুলতা কমিলনা। আবার প্রসূন প্রকাশের জন্য আয়াস, তাতেও ত আশার পর্য্যবসান হইলনা। বুঝাগেল—এবাসনা আরও অনেক দিন অসম্পূর্ণই থাকিবে, অগত্যা কুসুমে ইষ্টসিদ্ধি নাই বলিয়া অযত্ন আসিল। অনাদরে ম্লানমুখ কুসুম অভিমানে ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। তরুর অভাব যেমন তেমনি রহিল। কাজেই পুনর্ব্বার শত শত বিঘ্ন বিনাশ পূর্ব্বক ইষ্ট সাধনের জন্য উচ্ছৃঙ্খল গমন। সরোবরের অমলকমলাকীর্ণ বিমলজলে চক্ষুঃ স্থাপন করিলে দেখা গেল সৌরসন্তাপে অনবরত বাষ্পাকার ধারণ পূর্ব্বক সলিল রাশি অনন্তের অনন্ত প্রাণে মিশিতেছে, আবার পরিণতিবশে মেঘাকার গ্রহণ; বর্ষণোন্মুখ জলধরে সহসা স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শ। হায়! সে সকল স্নেহ কোথায়? এ যে কাঠিন্যের কারাগার, নাম মাত্রেই চিত্তচমৎকার! সহসা শিলাকার! জীবন এ জীবন নাশক মূর্ত্তিগ্রহণেও তৃপ্ত হইতে পারিলনা কাজেই "ফিরে রাধাকমলিনী।" এই নানা চক্রে পরিভ্রমণ করিয়াও শান্তি নাই। সুনীল গগনে চাহিলাম, সম্মুখে শশী, কোথায়! যেন কালের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। একতিল ও বিরাম নাই সুতরাং আরাম নাই। যেন কোনও হারানিধি খুজিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। গতি মন্দ বই তীব্র নয়। বোধ হয় সে নিধি দেখা যায়, তবে ধরা দেয় না। সুতরাং অবিশ্রাম অনুগমন করিতে হইতেছে। চাঁদের পরে নজর দিয়া মনে করিতে ছিলাম, নক্ষত্র বুঝি তৃপ্ত। আঃ কপাল! সেটাও যে কথার কথা যেটী দশহাত তফাতে ছিল, এখন দেখি মাথার পরে। আর বুঝিতে বাঁকি নাই সকলেই অভাবসাগরে ভাসিল।

দুইহাতে এত কাল অকূল জল রাশি অতিক্রম করিয়া, আঘাতের পর আঘাত সহিয়া, এতই চলিতেছি, এবার কারণ জানা গেল। এই জন্যই আমি আজীবন তৃপ্তিবিহীন। বাল্যকালের ধুলাখেলায় মনের জ্বালা জুড়াইল না। কিশোর সময়ের অনাস্বাদিত আনন্দের আশায় প্রাণ পর্য্যাকুল হইল, কিন্তু পাইয়াও পরিতৃপ্তি নাই। যৌবনের তরল প্রবাহ আমার নয়ন পথের পথিক হইল, কত বিলাস, কত লালসা, কত সাহস, ক্ষণেক সরস, ক্ষণে নীরস, কত ভাবই আবির্ভাব প্রাপ্ত হইল। কিছুতেই অভাব পুরিলনা। সুরূপ কুসুমে নয়ন ভৃঙ্গ লাগিয়া রহিল, বোধ হয় যেন আর ছাড়িবেনা, সংসার একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাবিয়া আবার পরিত্যাগ করিল। রসনার উপর রসগোল্লার রস প্রবাহ প্রবাহিত হইল; কত সাদর গ্রহণ!

অভ্যর্থনায় বোধ হইল, আর ছাড়িতে পারিবেনা; স্বভাবের ব্যবহার কি নীরস, একেবারেই উদরসাৎ! যদি বুঝিল-শান্তি নাই, আবার দিলে কেন অগ্রসর হইয়া গ্রহণ করে? আশার মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ, তাই বুঝি ভাবে—"এবার পাইব।" শ্রবণ শ্রীরাগে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিল; অনুমান হয় সেই রসেই মজিয়াছে, কাজে কিন্তু কিছুই নয়, শান্তির সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তৃষ্ণার অসাধারণ চতুরতাই একমাত্র নিদান। যে পোষাকে শান্তি নাই, তাহাকে কেন সুখসাধক বলিয়া বুঝা হয়। তৃষ্ণাদেবীর মুক্তা মালা ইত কারণ। নীরস মরুভূমির মধ্যে সুশীতল জলের অন্বেষণ করিতে যে শিক্ষা গুরুর নিকট শিখিয়াছি, শুষ্ক কুঞ্জকাননে যাহার উপদেশমতে ফুল ফলের লোভে সলিলসিঞ্চন করিতে করিতে স্বেদ জলে কপোল তল স্নান করাইতে অভ্যাস করিয়াছি, যাহার আদেশে অনিশ্চিত শস্যের জন্য কতবার কঠোর ভূমিতল কর্ষণ করিয়াছি, সেই তৃষ্ণা, সেই সংসার কুসুমের গ্রন্থি স্বরূপ তৃষ্ণা, সেই পক্ষে কুৎসিত জ্ঞানের উপদেষ্ট্রী তৃষ্ণা আমাকে যা তাই দেখাইয়া ভুলাইতেছে। প্রমত্ত আমি অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহাই বুকে রাখি, যখন অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, পাগল হইয়া দূরে ফেলিয়া দেই।

গভীর নিশায় নিদ্রার নির্ম্মল ক্রোড়ে শয়ন করিয়া অনেকাংশে নিষ্পত্র হইতে পারিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, এ সুখ সুষুপ্তি বুঝি চিরস্থায়ী। সংসার কাননে দাবাগ্নি বুঝি আর আমায় আক্রমণ করিতে পারিবেনা। এই শান্তিনীরে নিমজ্জনেই বুঝি সকল অশান্তির অবসান হইবে। কিন্তু মনের কথা মনেই রহিল, গাছের প্রসূন ডালেই শুকাইল, কাণে কাণে কে আসিয়া কি কহিল; চমকিয়া জাগিলাম, যাহা দেখিলাম সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কবির ভাণ্ডারে তত কল্পনা নাই যে সে রূপের পরিমাণ করে চিত্রকরের তুলিকায় সে রঙ কখনও স্থান পায় নাই যে বর্ণে সে মূর্ত্তি শোভিত। কত কি মধুরতাময় জিনিস দেখিয়াছি, ইহার কাছে সকলই জঘন্য! এ যে সুষমার নিভৃত বাসস্থান। কলকণ্ঠের কোমল আলাপ প্রাণ ভুলাইল; উপদেশে অমনোযোগ করে কার সাধ্য? বাধ্য হইয়া যা বলে তাই করি! বল প্রকাশের আবশ্যক নাই, স্বেচ্ছায়ই সব করি। অনুবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে কৃতার্থ হই, অনুগ্রহই চাই, আগ্রহ আর লাগেনা, যেন সঞ্চিত সমস্ত জিনিষই মহাজোয়ারে ধুইয়া গিয়াছে। কাজেই সবল শূন্য ভাবে যা দেখায় তাই লই, যা করে তাই সই। পিশাচীর পৈশাচ প্রবৃত্তি আমাকে ক্রীড়া পুত্তলিতে পরিণত করিয়াছে রাক্ষসী হৃদয়ে সকল রক্ত শুষিয়া খাইল, হৃদয়াসনে চামুণ্ডা সাজিয়া বসিল, তবু সাধ পুরেনা। আমাকে বানর নাচাইয়া খল্ খল্ করিয়া হাসিতেছে। আনন্দে যেন গলিয়া যাইতেছে, উৎসবের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছে, স্বেচ্ছাচারের ভরপুর তুফান বহিয়া যাইতেছে, আর আমি ক্রন্দনের রোলে আকাশ কাঁপাইতেছি, শান্তি পিপাসায় অনবরত ধাবিত হইতেছি। কিন্তু ঐ তৃষ্ণার কুটিল কটাক্ষের সুধাচালে কাজেই যা দেখায়, তাহাকেই শান্তিপ্রদ বলিয়া মনে করি।

জ্বালা সহিতে সহিতে, দুঃখভার বহিতে বহিতে, প্রাণের কথা কহিতে কহিতে, কুহকিনীর কাছে রহিতে রহিতে, কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে উপনীত হইয়াছি। তমাল ডালে কোকিলের কলকাকলীও কাণে লাগেনা, আরও প্রাণে যেন বিরক্তিবাণ বিদ্ধ করিয়া দেয়। মধুকরের মধুমাসের মধুর ঝঙ্কার মন মজাইতে পারেনা, আমার কর্ত্তব্য আমি তাতে ভুলিনা। পুত্রশোকাতুরা রমণীর আর্ত্তস্বরেও হৃদয় গলেনা, বালকের নধর অধরে মধুর হাসিতেও আপন হারা হইনা, আমার কাজে আমি অবিরত যাই, কাহারও দিকে চাইনা, কেবল তৃষ্ণা যাহা দেখায়, তাহার দিকেই বিনা ওজরে নজর করি। একের অভাবেই সকল শূন্য। আজ বুঝিলাম শান্তির অভাবেই এসংসার এত আকুল! চারিদিকে অভাবের বিভীষণ মূর্ত্তি আমায় গ্রাস করিতে বদন ব্যাদন করিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাই এ চিরন্তন পলায়ন! অভাব! তোমার এই অসাধারণ প্রভাব দর্শন করিয়া কি বেদান্তবিৎ তোমাকে অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন? বোধহয় এদারুণ দৃশ্য লোকলোচনে সহিবেনা বলিয়াই তোমার এ সংহারকমূর্ত্তির কথা লুকাইয়া তোমাকে ভাবরূপে বলা হইয়াছে। অনন্ত কাল আমি শান্তির জন্য লালায়িত, তুমি অনুসরণ করিতেছ যতনায় কাতর করিতেছ, কিন্তু তাই বলিয়া আসল ভুলিব? কখনই নয়। যেমন যাইতেছি, তেমনিই যাইব। আমার পাওয়া চাই, তাই লইয়া কথা।

আর তোমার শঙ্কায় শঙ্কিত নাই। ঐ তৃষ্ণাপিশাচীর প্রলোভন কুয়াসায় নয়ন আর অন্ধনয়! মোহনিদ্রা যেন অপসৃত হইতে চলিয়াছে, ঘুমের ঘোর আছে, কিন্তু তাহাতে বিভোর নহি, ভোর সম্মুখে আসিয়াছে। তরুণ অরুণের মৃদু কিরণে দশ দিক্ প্রকাশিত, আলোক পাইয়া জীবজগৎ পুলকিত, তৃষ্ণার অত্যাচারে সংসার পরিভ্রমণে কত যে কদর্থনা ভোগ করিয়াছে, তাহা একেবারেই বিস্মৃত, পুরাতন অবস্থা— যাহা দুরদৃষ্টের দুরন্ত তাড়নে অদৃশ্য হইয়াছিল, সেই সনাতন ভাব আবার আসিয়াছে দেখিয়া চমকিত, অদূরে শান্তিপুরের যাত্রী দর্শনে, গন্তব্যস্থানের নিকটে পৌঁছা বুঝিতে পারিয়া আনন্দিত, তৃষ্ণার সরসবদনে বিষাদ কালিমা দর্শনে চিন্তিত, কিন্তু এখনও উৎকণ্ঠার অনিবৃত্তিতে অপরিতৃপ্ত! তৃষ্ণাপাশচ্ছিন্ন করিতে না পারিলে যে, সে অবিনাশিতৃপ্তিলাভের উপায় নাই। পিশাচীর সহবাসে যে কলুষিত হইতে হইয়াছে, তাহার সেই কলঙ্কপঙ্ক মার্জ্জনে উঠাইয়া দিলাম বটে কিন্তু কারণ যে পরিত্যাগ করিতে পারিনাই। নেশা ছুটিয়াছে বটে, মাদক ত সঙ্গেই আছে, আবার আমার কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটে, কেমন করিয়া বলিব! থাক-দূরে ফেলিয়া চলিয়া যাই! আঃ বিপদ এবে আমার পশ্চাদনুসরণ করে! বুঝিয়াছি পৈশাচ প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় নাই। চাইনা বলিলেও যায় না, তিরস্কারকেও পুরস্কার বলিয়া মনে করে, পদাঘাতও "প্রেমসম্ভাষণ" ভাবে, বিরক্তিজ্ঞাপক নয়ননিঃক্ষেপও সপ্রেম কটাক্ষ বলিয়া আনন্দিত হয়